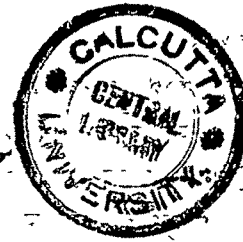


757.5
04/1/75
35/1/75
C/L-110/1943-23-23255
সাপ্তাহিক সূচী

35/1/75-9-22



শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৬৮—আশ্বিন ১৩৬৮

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

(কবিতা)—শ্রীপদ সেনগুপ্ত	৩৮৭	ঘুম দাও (কবিতা)—সন্তোষকুমার অধিকারী	৩৮৬
কাষটিত (গল্প)—শ্রীশোণবীন্দ্র জুনিয়র	৬৮৬	ছোট বাড়ি (কবিতা)—বীরেন্দ্র মল্লিক	৫২২
কবিতা)—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	৫২১	জনগণের রবীন্দ্রনাথ—শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়	১২১
সন্ধান (রূপক গল্প)—অচ্যুত গোস্বামী	৮২	জন্মান্তর (গল্প)—অশোক বসু	৩৫৬
ব—(কবিতা)—কুমুদ ভট্টাচার্য	২২৬	জুয়াড়ী (গল্প)—অমলেন্দ্রনাথ ঘটক	২৫৫
ক মন ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)		ট্রেড সিক্রেট (গল্প)—রাণু ভৌমিক	৬৭৩
—দেবব্রত ভৌমিক	১২২	ডায়ারীতে রবীন্দ্র—প্রসঙ্গ—সনৎকুমার গুপ্ত	৭৩
(কবিতা)—শ্রীঅপূর্বকুমার ভট্টাচার্য	২৭২	তবু (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক	১৫৪
রবীন্দ্র-সংগ্রহ হইতে—শ্রীসজনীকান্ত দাস	৮২	তবে কেন (গল্প)—ভূপেন্দ্রমোহন সরকার	৪৬২
কবিতা)—শ্রীকুমুদবঙ্গন মল্লিক	৫৩২	ত্যাগ (গল্প)—মানবেন্দ্র পাল	৬৬৩
লিপটাসের ছায়া (কবিতা)		ত্রিধারা (গল্প)—জগদীশ মোদক	১৭৭, ২৩৭
—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	২৭২	দক্ষিণের পথে বিপথে	
কবিতা)—কৃতাস্তনাথ বাগচী	৫২০	—শ্রীস্বধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬২৩
কবিতা)—শ্রীকরণাময় বসু	৬৮৭	দুর্ভিক্ষ প্রতিবোধে বিতাসাগর (প্রবন্ধ)	
বানিশ (একাঙ্কিকা)—মন্মথ রায়	৫৪৬	—শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ	২৮২
সদেশ (গল্প)—কুমারেশ ঘোষ	৬৪২	দুঃ মতি (গল্প)—অচ্যুত গোস্বামী	৪৮১
গেলে (কবিতা)—অমূল্যকুমার চক্রবর্তী	৫২২	দ্বন্দ্বিক (সম্পূর্ণ উপন্যাস)—ভূপেন্দ্রমোহন সরকার	৫৫২
মল—নারায়ণ দাশগুপ্ত	৬২২	ধুলোমাটিতেই (কবিতা)—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৫২২
ময় (কবিতা)—সনৎকুমার মিত্র	৬৮৭	নতুন ইহুদী (কবিতা)—অরূপ ভট্টাচার্য	২২৬
সমা (কবিতা)—“বনফুল”	১৫৪	নিরস্ত (কবিতা)—অনির্বাক	৫৩৬
সোম (কবিতা)—সন্তোষকুমার দে	৬৬	নীলিমকুমার (কবিতা)—“বনফুল”	১৫৩
শান্ত (কবিতা)—সন্তোষকুমার দে	৬৬	পাশা (গল্প)—বিমলকুমার ঘোষ	৩৭৭
সী—জগদীশ ভট্টাচার্য	২৪২, ৩৬৭, ৪৪৩	পুরাণ কাহিনীর রূপক ব্যাখ্যায় রাজেন্দ্রলাল	১২৩
সম্পূর্ণ উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২	মিত্রের পত্র (প্রবন্ধ)—দুর্গামোহন ভট্টাচার্য	৫৩
চিঠি (ভ্রম)—শ্রীঅমিয়ময় বিহাস	৪৬৬	প্রতিচ্ছায়া (গল্প)—মায়া বসু	২১৭
(কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়	৫৩৩		
চয়	২৩১, ৩২২, ৪১৭, ৫১৫		

প্রসঙ্গ কথা :

পনেরই আগস্ট : বিলীয়মান বিশ্বাস

—নারায়ণ দাশশর্মা

রাষ্ট্র বনাম মহাত্মা—নারায়ণ দাশশর্মা

লেখা ও লেখকের ব্যক্তিত্ব—অচ্যুত গোস্বামী

ষাট দশকে—পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রাণপাথেয় (উপন্যাস)—শ্রীদেবব্রত রেজ

ফাহুস (গল্প)—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফিরিঙ্গিভয়-হাবী ব্রহ্মবান্ধব (প্রবন্ধ)

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

ফিরে আসা (কবিতা)—অসিতকুমার ভট্টাচার্য

বিশ শতকের ঐতিহাসিক সমস্তা (প্রবন্ধ)

—শংকর দত্ত

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র—শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সাহা

১৫২, ২৫২, ৩৮২, ৫১১

বিশ্বয় (কবিতা)—“বনফুল”

বেদে (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণদে

ভ্রমলোক (গল্প)—সুশীল রায়

ভোরের প্রসাদ (কবিতা)—জগদীশ ভট্টাচার্য

মঞ্চকথা (উপন্যাস)—ধনঞ্জয় বৈরাগী

মিউনিকের চিঠি—দক্ষিণারঞ্জন বসু

মেঘমল্লার (কবিতা)—সন্তোষকুমার অধিকারী

যাচাই (গল্প)—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি-উপাসক (স্বতিকা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রবি-প্রশান্ত (প্রবন্ধ)—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ—সন্তোষকুমার দে

রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারীচরিত্র—রাধু ভৌমিক

রবীন্দ্র-গল্প প্রসঙ্গে—মনোজ্যোবসু

রবীন্দ্র-চেতনায় “শিব” (প্রবন্ধ)

—শ্রীজ্যোত্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সংলাপ—দীপেন্দ্রকুমার সাহা

রবীন্দ্র-সাহিত্য-সংবাদ

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক আদর্শ সংকট (প্রবন্ধ)

—অসিতকুমার ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্য-সাধন (প্রবন্ধ)

—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান (প্রবন্ধ)—“বনফুল”

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণ (প্রবন্ধ)

—অরুণ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নারী (প্রবন্ধ)

—শ্রীকালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথের দুইটি অপ্রকাশিত পত্র

রম্যাপি বীক্ষা (ভ্রমণ)

—শ্রীজ্যোত্মোহন চক্রবর্তী

রামায়ণ (গল্প)—“সমুদ্র”

রাষ্ট্রচিন্তায় টলস্টয় গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)

—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

লবণাক্ত (গল্প)—মায়ী বসু

লঙ্কাত (কবিতা)—সুনীলকুমার লাহিড়ী

সংবাদ-সাহিত্য

১৩৭, ২৩৩, ৩২২

সংস্কৃত প্রজ্ঞাপারমিতা-সাহিত্যের উৎপত্তি-স্থান

(প্রবন্ধ)—শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সমস্তা (গল্প)—অচ্যুত গোস্বামী

সাহিত্যের পূর্বসূরী-প্রণাম (প্রবন্ধ)

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সাহিত্যের হাটে—শ্রীখোশনবীস জুনিয়র

২২৭

স্বনয়না (কবিতা)

—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই আমি (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

হারামণি (কবিতা)

—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিসাব (গল্প)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী



রবীন্দ্রনাথের দুইটি অপ্রকাশিত পত্র

27

[ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যকে লিখিত]

দুঃখজয়

[শান্তিনিকেতন]

শ্রীয়েষু

লকাতায় থাকতে যেদিন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম
নেই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি। সন্তোষ তোমাকে চিঠি
ছিলুম, কেন পাওনি কিছুই বুঝতে পারিনি।
র শেষ দিন পর্যন্ত আমার কাজের অন্ত ছিলনা,
যে নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি।

জীবনে গুরুতর দুঃখের সঙ্গে আমার বারবার
দুঃখ হয়েছে। দুঃখের কারণ যে কষ্ট দেয় তাব
পালার উপায় কারো হাতে নেই।
এই আশা যে, সেই কষ্ট একেবারে ব্যর্থ
না। গাছের উপরে যে সূর্যের তাপ এসে
সেই তাপকে গাছ নিজের প্রাণ-ভাণ্ডারে
সঞ্চিত করে। দুঃখও আমাদের ঐশ্বর্য
ওঠে যদি আমরা তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ
পারি। অবস্থার একান্ত দাস হয়ে পড়বে
যদি এটা মনুষ্যত্ব নয়। তার আত্মা অবস্থাকে
ক্রম ক্রমে জয়ী হবে এইটেই হচ্ছে মানুষের
। দুঃখ যখন আমাদের মাঝে থাকে তখন
অস্বীকার করতে পারি এমন শক্তি
আমাদের আছে। বস্তুত সেইটেই মানুষের
।

আর তোমাকে ঐশ্বর্য দিন, ব্রহ্ম দিন, তোমার সকল
গভীর ভাবে সার্থকতা দিন এই আমি কামনা
করছি। তোমার আশীর্বাদ জানিয়ে। বিশ্বের
সকল আরোগ্যের ভাণ্ডারী যিনি মনে মনে

তাঁর কোলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দিয়ে দুর্গা যেন
অন্তরেব মধ্যে নির্ভর সহিত 'বার বার জপ করে' বলতে
পারে, আমার কোনো রোগ নেই, কোনো রোগ নেই।
ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩৩০ [১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩]

শ্রীমদ্রথায়ী

শ্রীমদ্রথায়ী ঠাকুর

কবির বক্তৃতার রিপোর্ট ও তাঁহার

“হাস্যরস ক্ষমতা”

কল্যাণীয়েষু

মা ভৈঃ। আমি লেশমাত্রও রাগ করিনি। আমার
মজা লেগেছিল এই কথা মনে কবে যে—

সাধারণত আমবা কত অশ্রমস্ব হয়ে শুনি,
সেই জন্তে যা কানে আসে তাব চেয়ে অনেক কম
শুনতে পাই। আমাদের মন যে আইডিয়াতে
অভ্যস্ত সেইটেই আগেভাগে প্রত্যাশা কবে—
অলক্ষ্যে সেই অশ্রুত কথাটা মিশে যায় শ্রুত
কথাটার সঙ্গে। আমার বক্তৃতাটির এমন কোনো
রিপোর্ট দেখিনি যাতে এই মনস্তত্ত্বের প্রমাণ
হয়নি।

যাই হোক আমাকে রাগী মেজাজের লোক
বলে ভুল কোনো না—আমাব সহজেই হাসবার
ক্ষমতা আছে, সেই হাস্যবস অহিংস নীতির
সহায়তা করে।

আমার আশীর্বাদ নিখো। বটমলিকে তোমার বই
[‘ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা’] পাঠানো
হয়েছে।

২৮/২/৩৭

রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যের পূর্বসূরী-প্রণাম (রবীন্দ্রনাথের স্বীকার ও স্বাক্ষর)

শ্রীসজনীকা

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাতষটি বৎসরের ছাপাব দলিলে রক্ষিত সাহিত্য-জীবনে প্রকৃতি, মানুষ, স্বদেশ, বিশ্ব, দেবতা (হিন্দু 'প্যান্থিযনে'র) ও একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্তুতি, প্রশস্তি বন্দনা, পূজা ও প্রণাম জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সকল বচনা গঠেপঠে সমান বিস্তৃত। একেখরের বন্দনা সর্বাধিক। তাঁহার অন্তর্নিহিত উপনিষৎ ও বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয়সজ্জাত আত্মোপলব্ধি শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ভগবদ্গীতাবলী ও ধর্মমূলক বচনাবলী। রবীন্দ্রনাথকে অনেকে বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি বলিয়া থাকেন, বিভিন্ন ঋতু ও বিচিত্র পরিবেশ ভেদে প্রকৃতির এত বিচিত্র রূপ পৃথিবীর আব কোনও কবি কল্পনা করেন নাই। মাটি, স্বদেশ, বিশ্ব ও অনন্ত মহাকাশ সম্পর্কিত তাঁহার রচনাবলীও এই প্রকৃতি-সাহিত্যেব অন্তর্ভুক্ত। দেবতাদের মধ্যে শিব, সরস্বতী ও মৃত্যু (personified) তাঁহার রচনার অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বস্তুতঃ শিব, ভৈরব, শঙ্কর বা ঋত্নের প্রতি তাঁহার কাব্যিক আকর্ষণ দৃষ্টে তাঁহাকে কালিদাসের মত, শৈবকবি বলিলেও অত্যাধিক হইবে না। কালিদাসের মতই তাঁহার শিব সন্ন্যাসী হইলেও গৃহী, তিনি কখনও উমা বা সতী ছাড়া নন। এই শিবই রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যুরও দেবতা। সবস্বতী ব তো তিনি বরপুত্র।

মানুষকেও ব্যাষ্টি ও ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কম মর্যাদা দেন নাই। বুদ্ধ-শ্রীষ্ট, শাজাহান-শিবাজী, অববিন্দ-গান্ধীকে এক বা একাধিক দীর্ঘ কবিতায়, জগদীশচন্দ্রকে অনেক কবিতায়, রামকৃষ্ণ-চিত্তবঞ্জন-পিয়র্সনকে কণিকা-কবিতায়, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রকে গল্পে যে প্রশস্তি কবিয়াছেন তাহা সাহিত্যেতর। বহু আত্মীয় পবিজনকে গ্রন্থ উৎসর্গের নামে অথবা অন্তভাবে এবং পরবর্তী জীবনে বহু ভক্তজনকে কবিতার দ্বারা বন্দিত,

নন্দিত বা আশীর্বাদ কবিয়াছেন। সবগুলি প্রকাশিত হইলে একটি বিচিত্র গ্রন্থ হইবে।

আমি সাহিত্যিক পূর্বসূরীদের প্রতি ববীন্দ্রনাথের কবিতাকে স্বতন্ত্র কবিয়া দেখিতেছি। ইহা ও গল্প দুই ভাগে বিভক্ত। দুই একজন অনুজ সাঁ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া রবীন্দ্র-চিত্তকে ও তাঁহাদের সম্বন্ধে বাণীমুখব করিয়াছেন। সতীশচ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অতুলপ্রসাদ সেন ইহাদে উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণ-মহাভাবত দিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য সূত্রপাত এবং সঙ্গে সঙ্গেই কালিদাসের আঁ রামায়ণ-মহাভাবত—বাগ্মীকি-বাস টুকরা টুকরা কবিতার দ্বারা এখানে ওখানে বন্দিত হইয়াছেন ক 'প্রাচীন সাহিত্যে'ই তাঁহারা যথার্থ মর্যাদা পাই একটু উদ্ধৃত কবিতাঃ

"এক শ্রেণীব কবি আছে, যাহার রচনা ভি একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনাব আপনাব অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে চিবন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। এই শ্রেণীব মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশেব সমগ্র জাতিব ইহাদিগকে আশ্রয় কবিতাে পাবেন—ইহাবা যাঃ করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের বচনা মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতি দেশেব ভূতল-জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই আশ্রয়চ্ছায়া দান কবিয়াছে। রামায়ণ মহাভ মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলেব ত্রায ভারতেবই—বাস বাগ্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র। ...

ধন্য সেই কবিযুগলকে কালের মহাপ্রাস্তে যাহাদের নাম হাবাইয়া গেছে কিন্তু যাহাদে

মহানারীষ দ্বাবে দ্বাবে আজিও অজস্র ধাবায়
শান্তি বহন করিতেছে, ণত শত প্রাচীন শতাব্দীর
ভিত্তি। অহবহ আনয়ন করিয়া ভাবতবর্ষেব চিত্ত-
কাজিও উর্বরা কবিতা বাধিতেছে। ভারতবর্ষেব
সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই
হাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ষেব মধ্যে চিরকালের
সিনে বিবাজমান।”

আমি যখন ‘বঙ্গভূমি’র সম্পাদক ছিলাম (১৯৩৪)
জনাথকে প্রশ্ন কবিতা ছিলাম, কোন্ কোন্ গ্রন্থ তাঁহার
মনকে সর্বাধিক প্রভাবিত করিয়াছে। তিনি রামায়ণ
ভারত ও উপনিষদের নাম করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নে
তার কুতিবাস-কাশীদাস-প্রশস্তিও স্মরণীয় :—

“এ কথা আমাদের নিশ্চিত জানা উচিত যে, ভাগীবতী
ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে
ও শস্ত্রে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, যবে যবে চিরদিন
যা যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল
দেয়া আসিতেছে—কুতিবাসেব রামায়ণ এবং
রামের মহাভারতও তেমনি করিয়া চিরদিন আমাদের
অন্নপানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া বহিয়াছে। এই
গ্রন্থ না থাকিলে, আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কিরূপ
জা ও চিবহুভিক্ষা বিরাজ করিত, তাহা আজ আমাদের
কল্পনা করাও কঠিন।”

বীর্ষ-সাহিত্যে কালিদাস ওতপ্রোত হইয়া আছেন।
কবিতা কত প্রবন্ধেব জালে ববীন্দ্রনাথ যে কালি-
কে ধরিয়া বাঙালী পাঠকেব একান্ত নিজস্ব করিয়া
উয়াছেন পণ্ডিতজন তাহা অবগত আছেন। “মেঘদূত”
যি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে” প্রভৃতি
মতায় এবং “মেঘদূত” “কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা” ও
“জ্ঞানা” প্রভৃতি প্রবন্ধে কালিদাসেব চিত্র, উপমা ও
নাকে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর হৃদয়দ্বারে পৌছাইয়া
ছেন। কালিদাস সম্বন্ধে তাঁহার এই উক্তি স্মরণীয়—
“কালিদাসের সৌন্দর্যচাক্ষুরের মাঝখানে ভোগ-
প্য সুক্ক হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন
কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যেব কাব্য বলা যায়, তেমনি
দ্যাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং
জিবিরতিব কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য

সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় না—তাহাকে অতিক্রম
করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।”

ইহাব পবেই ববীন্দ্রজীবনে মহাজন-পদাবলীর স্থান,
জয়দেবকে দিয়া আরম্ভ, বসন্ত রায়ে শেষ, মাঝখানে
চণ্ডীদাস বিছাপতি জ্ঞানদাস বলরামদাস রায়শেখর ও
গোবিন্দদাস। এই সাহিত্যেব প্রতি তাঁহার হৃদয়েব
উচ্ছ্বসিত প্রীতি ‘ভালুসিংহ ঠাকুরেব পদাবলী’তেই
চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। মেঘদূত, গীতগোবিন্দ ও
বৈষ্ণবপদাবলীকে রবীন্দ্রনাথ ‘সোনার তরী’র ‘বর্ষাযাপন’
কবিতায় চিবস্মরণীয় কবিতা তুলিয়াছেন। ‘মানসী’র
“পত্র” কবিতা হইতে উদ্ধৃত এই কয়েকটি পংক্তিতে বৈষ্ণব
কবিতাব প্রতি ববীন্দ্রনাথের প্রীতি যেন গলিয়া গলিয়া
পড়িয়াছে—

“পড়ে যনে ববিষার বৃন্দাবন অভিসার।

একাকিনী রাধিকাব চকিত চরণ,

শ্রামল তমালতল,

নীল যমুনার জল,

আর দুটি ছলছল নলিন নয়ন।

এ ভরা বাদর দিনে

কে বাঁচিবে শ্রাম বিনে,

কাননেব পথ চিনে মন যেতে চায়।

বিজন যমুনাকূলে

বিকশিত নীপমূলে

কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিবহ ব্যাখ্যায়।”

ভালুসিংহ-পর্ব শেষ হইতে না হইতে প্রথম বিলাত-
যাত্রাব পথে আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরীতে
বসিয়া ইংরেজী সাহিত্যেব পাঠ। মুর, চ্যাটারটন,
শেক্সপীয়ার, শেলী, ব্রাউনিং, বায়রণ, বার্নস, টেনিসন প্রভৃতি
আইবিশ, ইংরেজ ও স্কচ কবিবাই কেবল নন, ইউরোপের
গ্যোটে, পেত্রার্ক, দান্তে, হাইনে এবং আমেরিকাব লংফেলো
হুইটম্যান শুধু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণই করেন নাই
তিনি ‘ভারতী’র প্রথম চার বৎসরকে (১২৮৪-১২৮৭)
ওই সকল কবিদেব আলোচনায় ও অনুবাদে ভবাইয়া
দিয়াছেন। মুরের ‘আইবিশ মেলডিজ’, শেক্সপীয়ারের
‘ম্লোকবেথ’, বার্নস ও হাইনের গান কৈশোর ও প্রথম
যৌবনে তাঁহার জীবনকে কী ভাবে প্রভাবিত কবিতা
রবীন্দ্র-জীবনীর সহিত পবিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা
জানেন। পাশ্চাত্য কবিদের প্রতি তাঁহার সুবিপুল
শ্রদ্ধাব নিদর্শন স্বরূপ কেবল শেক্সপীয়ার-প্রশস্তিটুকুই

এখানে মুদ্রিত করিতোছ, ইহা ১৩২২ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ রচিত ও 'বলাকা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত :

“যেদিন উদিলে, তুমি, বিশ্বকবি, দুব সিদ্ধপারে,
ইংলণ্ডের দিকপ্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন, উজ্জল ললাট তব চুমি’
রেখেছিল কিছুকাল অবণ্য শাখার বাহুজালে,
টেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা অঞ্চল-অস্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির উজ্জল
পরীদের খেলার প্রান্তরে। ঘীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠেনি জেগে কবি-সুখ-বন্দনা সঙ্গীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর গ্রহরে গ্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে,
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রেদেশে
বিশ্চিহ্ন উন্মাদিয়া, তাই হের যুগান্তর শেষে
ভাবতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি,
নাবিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি ॥”

বাংলা সাহিত্যে মহাজন পদাবলীর পরবর্তী যুগে মুহম্মদ-রাম ও মঘমসিংহ-পূর্ববঙ্গ-গীতিকার কবিগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা তিনি অকুণ্ঠিত ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণকমল, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ‘জীবনস্মৃতি’ ও ‘আধুনিক সাহিত্যে’ ইহার প্রমাণ মিলিবে। মধুসূদনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অবিশুদ্ধ ছিল।

“বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম মথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গল্প সাহিত্যের সূচনা হইয়া ছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গল্পে কলাবৈশিষ্ট্যের অবতারণা করেন।”

“বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদয়ঙ্গম সেই প্রথম উদঘাটিত হইল।”

বিহারীলাল সঙ্কল্পে—

“সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের
সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার
“সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তবঙ্গিত
থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরবে দীর্ঘত্বতা এবং
অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই
তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্ত তাঁহার অমি
এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অমূল্য
যায়।”

সঞ্জীবচন্দ্র সঙ্কল্পে—

“তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহীণী
ছিল না।”

‘চাৰিত্ৰপূজা’ ও ‘আধুনিক সাহিত্যে’র উপরে
প্রশস্তির সহিত সকলেরই পরিচয় আছে।
পরবর্তী সুরীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁহার
প্রশংসা পাইয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জীবনেব প্রায় আটবটি ব
কবি রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় কোনও পূর্বসূরী সাহি
সাধককে কবিতায় বন্দনা করেন নাই। এই ব্যাপারে
প্রতি আমিই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ কবি এবং তাঁহার ক
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি কাব্য-প্রশস্তি প্রার্থনা
কবি সম্মত হন। মেদিনীপুরে তখন বিদ্যা
স্বত্বসৌধ নির্মাণের আয়োজন চলিতেছিল।
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভিত্তিপত্রের স্থাপন করিবেন।
শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রতিশ্র
কথা শ্রবণ কবাইলাম। তিনি আমাকে বিমুগ্ধ করি
না এবং পরদিনই কবিতাটি রচনা করিয়া স্বহস্ত-লিখি
মূল ও তাহার একটি নকলে নিজ স্বাক্ষর যোগ করি
আমাকে দিলেন, এবং বলিলেন মূলটি বিদ্যাসাগর স্মৃতিসৌ
থাকিবে। নকলটি আমি রাখিতে পারিব। আমি
নিকট রক্ষিত বিদ্যাসাগর-বন্দনার প্রতিলিপি এখানে মুদ্রি
হইল তাঁহার স্বাক্ষর সহ—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের যিনি শুরু ছিল তঁার আবেশে
 অমর্যাত জড়ত্বভার অভিধৃত। কী পুন্য নিমেষে
 তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিত প্রদীপ্ত প্রতিভা,
 প্রথম আশার বন্নি নিয়ন্ত্রণ প্রভুত্বের বিভা,
 বঙ্গভাষার আলো পবান প্রথম জয়চিহ্ন।
 রুহুভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিবন,
 যে বিদ্যাসাগর, পূর্বদিগন্তের বনে উপবনে
 নব উদ্বোধন গাথা উদ্ভাসিত বিস্মিত গগনে।
 যে বানী আনিল বহি' নিষ্কলুষ অহা শুপ্রকৃতি,
 সুরুকন মাহাত্ম্যের পুন্য সম্মাননে অহা শুচি।
 ভাষার প্রাঙ্গণে তব আরি করি ভোমারি অভিশ্রু;
 ভাষার পূজা তব চয়ন করেছি আরি গীতি;
 সেই শুভতম হস্ত যা ভাষার প্রসাদ সিক্ত
 সুরুক পাখার ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে ^{মহান} ~~কি~~ কল ॥

ঈশ্বরচন্দ্র

বিজ্ঞানাগবের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম আশ্রয় দ্বিতীয়
স্বাক্ষর সংগৃহীত হইল।

১৯৩৮ সনে বঙ্কিমজন্মের ষতবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে
জাতীয় কর্তব্য পালনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উদ্যোগী
হইলেন। তখন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি। আমি
তাঁহার দূতরূপে পাইকপাড়া রাজবাটিতে অস্থিতব্য

সভায় (৮ এপ্রিল ১৯৩৮) তাঁহাকে যোগ দিবাব জন্ত
নিমন্ত্রণ করিতে গেলাম এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার
কাব্য-প্রশস্তি প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার শরীর তখন
খুবই অপটু।

তিনি আমাব হাতেই সেই কথা জানাইয়া এবং
বঙ্কিমের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া একটি পত্র দিলেন।
বঙ্কিম সম্বন্ধে প্রথম স্বাক্ষর। পত্রটি এই—



"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

প্রিয়স্বামী
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে
উপস্থিত হাকা আমার সম্বন্ধে দুঃস্বপ্ন। দুঃখ থেকে
এইটুকু নিতদূর করি। যার ক্ষতি আমার
মহাত্ম্যকে বহন করে তার ক্ষতি, তিনি আমার
কীর্তি দ্বারা দেশকে যে সম্মান দিচ্ছেন তারি সার্থক
স্বীকারই উপলক্ষ্যকে যে আমার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে
সমস্ত চেষ্টা করি। ইতি ১৩/৩/৩৮

আমরনাথ

চন্দ্রনাথ

কবি কাব্য-প্রশস্তি প্রতিক্রিয়া যথাসময়ে পালন সভায় সেই কবিতা আমিই পাঠ কবিতাম। নিম্নে কবিতা
করিয়া একটি কবিতা স্বহস্তলিপিতে আমাকে পাঠাইলেন। স্বাক্ষর সহ কবিতাটির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল—

বাহী ষষ্ঠ্য

যাত্রীর মতোম চাই সন্নিবিষ্ট তিমির হানিবারে,
মুদ্রিতমাত্রা পার্শ্ব দীপ্য হত্যাম নিভিছে বাধে বাধে।
কালের নির্মিত তেজ সূর্যের কীর্তির চলে নানি,
নিশ্চলতার আবর্তনায় নিশ্চিহ্ন কোথায় যাবতামি।
যাত্রার সাক্ষিতে আছে অনন্ত মূলের সাত্বত
সূর্যের যাত্রায় সেই দিগে পাবে আসনার ভয়।
তাই সূর্যের তরু তারি লগ্নি উঠিছে সূর্যনা
ভাষ্যের যাত্রা সূর্যের ভিষ্ম নহে, নহে দীর্ঘকাল্যকমা
একুই তরুনা যাত্র, দিনান্তের অবসার মান
আবহুই যাত্র অবসাম।

মে সূর্যনা পূর্বাংগে, হে বহিষ্ণু, কালের মে বহু
এনেছ আসনে হাত নহে তায় নিজীব সূর্য।
নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি মনুষ্যলোকে
চিরচলমান স্রোতে গাঙ্গাইছে স্রোত অভিনব
এ বর্ষের চিত্তক্ষেপে, চলিতেছে স্রোতের স্রোত
নিজ নব স্রোতালয়ে স্রোতের অবস্থানে।
তাই বৃন্দিতোছ আজি মে বর্ষের তরু কল্লোলে,
বহিষ্ণু, তোমার নয়, তব কীর্তি সেই স্রোত দোলে।
বর্ষের তরুনা যাত্রা স্রোতের তোমার আয়ু মনি,
তাই তব কবি কবিতা।

বহিষ্ণুনাথকে

এই কবিতাটির তারিখ ৩রা এপ্রিল ১৯৩৮।

বর্ষকল্যাণকে দিয়া এই ছুটি মহৎ কর্তব্য পালন কবাইবাব গোববে আমি গোববাবিত।

ক রু গা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

গ্রামের মধ্যে অনুপকুমারের গ্রাম্য ধনবান আর কেহই ছিল না, অতিথিশালা নির্মাণ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি নানা সংকর্ষে তিনি ধনব্যয় কবিতেন। তাঁহার সিন্ধুক-পূর্ণ টাকা ছিল, দেশ-বিখ্যাত বশ ছিল, ও রূপবতী কন্যা ছিল। সমস্ত ধোবন-কাল ধন উপার্জন করিয়া অনুপ বৃদ্ধ বয়সে বিপ্র্যাম করিতেছিলেন। এখন কেবল তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল যে, কন্যার বিবাহ দিবেন কোথায়। সৎপাত্র পান নাই ও বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আশ্রয়স্থল কন্যাকে পরগৃহে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই, তজ্জগৎ আর্জ কাল করিয়া আব তাঁহার ত্রুহিতার বিবাহ হইতেছে না।

সঙ্গিনী-অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন স্থখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্ত্ত মাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহাব একটি পাখী ছিল, সেই পাখীটি হাতে করিয়া অন্তঃপুবেব পুষ্কবিণীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্মাণ কবিত। কাঠবিড়ালীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি কবিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিত। এক একটি গাছকে আপনার সঙ্গিনী, ভগ্নী, কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য সত্যই সেই রূপ যত্ন করিত, তাহাঙ্গিকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানা প্রকার আদর করিত, এবং তাহাদের পাতা শুকাইলে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে অতিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতাব নিকট যা কিছু গল্প শুনিত, বাগানে পাখীটিকে

তাহাই শুনান হইত। এই রূপে করুণা তাহার জীবনের প্রভাব-কাল অতিশয় স্থখে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাব পিতা ও প্রতিবাদীরা মনে করিতেন যে, চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে করুণার একটি সঙ্গী মিলিল। অনুপের অল্পগত কোন একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মন্দিরবাস সময় তাঁহার অনাথ পুত্র নরেন্দ্রকে অনুপকুমারের হস্তে সঁপিয়া যান। নরেন্দ্র অনুপের বাটিতে থাকিয়া বিজ্ঞাত্যাম করিত, পুত্রহীন অনুপ নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রের মুখশ্রী বড় শ্রীতিজ্ঞক ছিল না, কিন্তু সে কাহারো সহিত মিশিত না, খেলিত না, ও কথা কহিত না বলিয়া ভাল মানুষ বলিয়া তাহাব বড়ই সূখ্যাতি হইয়াছিল; পল্লীময় রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রের মত শাস্ত শিষ্ট স্ববোধ বালক আব নাই, এবং পাড়ায় এমন বৃদ্ধ ছিল না যে তাহার বাড়ীর ছেলেদের প্রত্যেক কায়েই নরেন্দ্রের উদাহরণ উত্থাপন না করিত। কিন্তু আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে, “নরেন্দ্র তুমি বড় ভাল ছেলে নও।” কে জানে নরেন্দ্রের মুখশ্রী আমাব কোন মতে ভাল লাগিত না। আমল কথা এই, অমন বাল্য-বৃদ্ধ গভীর স্ববোধ শাস্ত বালক আমাব ভাল লাগে না।

অনুপকুমারের স্থাপিত পাঠশালায় বহুনাথ সার্কভৌম নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন, তিনি নরেন্দ্রকে অপরিমিত ভাল বাসিতেন, নরেন্দ্রকে প্রায় আপনার বাড়িতে লইয়া যাইতেন এবং অনুপের নিকট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

এই নরেন্দ্রই করুণাব সঙ্গী, করুণা নরেন্দ্রের সহিত সেই পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া কাঁদাব ঘর নির্মাণ করিত, ফুলের মালা গাঁথিত, এবং পিতার কাছে যে সকল গল্প শুনিবাহিল, তাহাই নরেন্দ্রকে শুনাইত, কাল্পনিক বালিকার যত কল্পনা সব নরেন্দ্রের উপরে গ্রস্ত হইল। করুণা নরেন্দ্রকে এত ভাল বাসিত যে, কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে ভাল থাকিত না, নরেন্দ্র পাঠশালা গেলে সে সেই পাখীটি হাতে করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত, দূর হইতে নরেন্দ্রকে দেখিলে তাড়াতাড়ি তাহাব হাত ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর পাড়ে সেই নাবিকেল গাছেব তলায় আসিত, ও তাহাব কল্পনা-বচিত কতকি অভূত কথা শুনাইত।

নরেন্দ্র ক্রমে কিছু বড় হইলে কলিকাতায় ইংবাজী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কলিকাতার বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতকগুলি উৎকর্ষ রোগ জন্মিল। শুনিয়াছি জ্বলের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয় যাহা কিছু পাইত তাহাতে নরেন্দ্রের তামাকের খরচটা বেশ চলিত। প্রতি শনিবারে দেশে যাইবার নিয়ম আছে, কিন্তু নরেন্দ্র তাহাব সঙ্গীদের মুখে শুনিব যে, শনিবারে যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া হয় তবে গলায় দড়ি দিয়া মরাটাই বা কি মন্দ? বালক বাটীতে গিয়া অনুপকে বুঝাইয়া দিল যে, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন বাড়িতে থাকিলে সে পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অনুপ নরেন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসে অল্পস্বাগ দেখিয়া মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন যে, বড় হইলে সে ডিপুটি মাজিষ্টার হইবে। তখন দুই এক মাস অন্তর নরেন্দ্র বাড়িতে আসিত, কিন্তু এ আর সে নরেন্দ্র নহে, পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্রাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শ্বের দুই সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কনুইবল্লদের ভীতিজনক যে নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত, গাড়িতে ভ্রমলোক দেখিলে কদলীর অল্পকরণে বুদ্ধ অল্পষ্ট প্রদর্শন করিত, নিবীহ পাশ্বে বেচারীদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দোষীর মত আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ সে নরেন্দ্র নহে, অতি নিবীহ, আশিয়াই অনুপকে টিপ করিয়া প্রণাম করে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মুদুস্থরে, নতমুখে, অতি দীন ভাবে উত্তর

দেয় এবং যে পথে অনুপ সর্বদা যাতায়াত করেন সেই খানে একটি ভয়েব্‌টার ডিক্‌যনারী বা তৎসদৃশ অস্ত্র কোন দীর্ঘকায় পুস্তক খুলিয়া বসিয়া থাকে।

নরেন্দ্র বহুদিনের পর বাড়ি আসিলে করুণা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। নরেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া কতকি গল্প শুনাইত, বালিকা গল্প শুনাইতে যত উৎসুক, শুনিতে তত নহে। কাহারো কাছে কোন নূতন কথা শুনিলেই যতক্ষণ না নরেন্দ্রকে শুনাইতে পাইত, ততক্ষণ উহা তাহাব নিকট বোঝা-স্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু করুণার এই রূপ ছেলেমানুষীতে নরেন্দ্রের বড়ই হাসি পাইত, কখন কখন সে বিরক্ত হইয়া পলাইবার উত্তোগ করিত। নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিকটে করুণার কথা-প্রসঙ্গে নানাবিধ উপহাস করিত।

নরেন্দ্র বাড়ি আসিলে পণ্ডিত মহাশয় সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এমন কি, সেদিন সন্ধ্যার সময়েও গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বাঁশঝাড়ময় পল্লীপথ দিয়া রাম নাম জপিতে জপিতে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, নরেন্দ্রকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ কবিয়া লইয়া নানাবিধ কুশল সংবাদ লইতেন। এই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া দুই এক জন সঙ্গী নরেন্দ্রকে তাহাব টিকি কাটিতে পরামর্শ দিয়াছিল, এবিষয় লইয়া গভীর ভাবে অনেক পরামর্শ ও অনেক বড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিন্তু দেশে নরেন্দ্রের তেমন দোঁদগু প্রতাপ ছিল না বলিয়া পাণ্ডিত মহাশয়ের টিকিটি নির্বিকল্পে ছিল। এই রূপে দেশে আদর ও বিদেশে আমোদ পাইয়া নরেন্দ্র বাড়িতে লাগিল।

নরেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইল। অনুপ এখন অতিশয় বৃদ্ধ, চক্ষে দেখিতে পান না, শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, এক মুহূর্তও করুণাকে কাছ-ছাড়া করিতেন না; অনুপের জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; তিনি নরেন্দ্রকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, অন্তিম কালে নরেন্দ্র ও পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকাইয়া তাহাদের হস্তে কণ্ঠকে সমর্পণ কবিয়া গেলেন।

অনুপের মৃত্যুর পর লাক্সবৌ মহাশয় নিজে পৌরোহিত্য করিয়া নরেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ দিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যাহা মনে কবিতা ছিলাম তাহাই হইয়াছে, নরেন্দ্র যে কিরূপ লোক তাহা এত দিনে পাড়াব লোকেরা টের পাইল, আর হতভাগিনী করুণাকে যে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা এত দিনে তাহাবা বুঝিতে পারিল, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় দুয়ের কোনটাই বুঝিলেন না।

করুণা আজকাল কিছু মনেব কষ্টে আছে। মনের উল্লাসে বিজন কাননে সে খেলা করিবে, বক্ষে করিয়া লইয়া পাখীর সঙ্গে কতকি কথা কহিবে, কোলেব উপর রাশি বাশি ফুল রাখিয়া পাছুটি ছড়াইয়া আপন মনে গুন গুন করিয়া গান গাইতে গাইতে মালা গাঁথিবে, যাহাকে ভাল বাসে তাহাব মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুট আঁহ্লাদে বিহ্বল ও অশ্রুট ভাবে ভোব হইয়া যাইবে, সেই বালিকা বড় কষ্ট পাইয়াছে। তাহার মনের মত কিছুই হয় না; অভাগিনী যে নরেন্দ্রকে এত ভাল বাসে, যাহাকে দেখিলে খেলা ভুলিয়া যায়, মালা ফেলিয়া দেয়, পাখী রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসে, সে কেন করুণাকে দেখিলে যেন বিরক্ত হয়? করুণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কি বলিতে আসে সে কেন অকুণ্ঠিত করিয়া মুখ ভার কবিতা থাকে? করুণা তাহাকে কাছে বসিতে কত মিনতি করে, সে কেন কোন ছল করিয়া চলিয়া যায়? নবেন্দ্র তাহাব সহিত এমন নিষ্কর্ষ ভাবে এমন নীরস ভাবে কথাবার্তা কয়, সকল কথায় এমন বিরক্ত ভাবে উত্তর দেয়, সকল কাজে এমন প্রভুভাবে আদেশ করে যে, বালিকার খেলা ঘুরিয়া যায় ও মালা গাঁথা সাজ হয় বুঝি, বালিকাব আর বুঝি পাখীর সহিত গান গাওয়া হইয়া উঠে না।

মূল কথাটা এই, নরেন্দ্র ও করুণায় কখনই বন্ধিতে পারে না; দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নিম্মিত, নরেন্দ্র করুণার সেই ভালবাসাব কতকি অসংলগ্ন কথার মধ্যে কিছুই মিষ্টতা পাইত না, তাহাব সেই প্রেমে মাথানো অতৃপ্ত স্থির দৃষ্টি-মধ্যে ঢল ঢল লাভণ্য দেখিতে পাইত না, তাহার সেই উচ্ছ্বসিত নিষ্কর্ষিত ত্রায অবীর সৌন্দর্যেব মিষ্টতা নবেন্দ্র কিছুই বুঝিত না। কিন্তু সরলা করুণা সে অত কি বুঝিবে? সে ছেলে বেলা হইতেই নবেন্দ্রের গুণ ছাড়া দোষের কথা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু করুণার একি দায় হইল? তাহার কেমন কিছুতেই আশ মিটে

না, সে আশ-মিটাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে পায় না, সে আশ-মিটাইয়া মনের সকল কথা নরেন্দ্রকে বলিতে পারে না, সে সকল কথাই বলে অথচ মনে করে যেন কোন কথাই বলা হইল না।

এক দিন নরেন্দ্রকে বেশ পবিত্র করিতে দেখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা কবিল, “কোথায় যাইতেছ?” নরেন্দ্র কহিলেন—“কলিকাতায়।” “ক।—কলিকাতায় কেন যাইবে?” নবেন্দ্র অকুণ্ঠিত করিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল “কাজ না থাকিলে কখনো যাইতাম না।” একটা বিভ্রাল-শাবক ছুটিয়া গেল, করুণা তাহাকে ধবিত্তে গেল, অনেক ক্ষণ ছুটাছুটি কবিতা ধরিতে পারিল না, অবশেষে ঘরে ছুটিয়া আসিয়া নবেন্দ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল “আজ যদি তোমাকে কলিকাতায় যাইতে না দিই?” নরেন্দ্র কাঁধ হইতে হাত ফেলিয়া দিয়া কহিল “নব, দেখ দেখি আর একটু হলেই ডিক্টারিটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আর কি?”

করুণা—“দেখ, তুমি কলিকাতায় যাইও না, পণ্ডিত মহাশয় তোমাকে যাইতে দিতে নিষেধ করেন।” নরেন্দ্র কিছুই উত্তর না দিয়া শিশু দিতে দিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন। করুণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও এক শিশি এসেন্স আনিয়া নরেন্দ্রের চাদরে খানিকটা ঢালিয়া দিল। নরেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, করুণা দুই একবাব বাবণ কবিল, কিছু হাঁ হাঁ না দিয়া লক্ষ্মী ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ নরেন্দ্রকে দেখা যায় করুণা চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া মনেব বেগ শান্ত হইতেই চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া পাখীটি হাতে করিয়া লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে মালা গাঁথিতে বসিল।

বালিকা স্বভাবতঃ এমন প্রফুল্ল-হৃদয় যে, বিষাদ অধিক ক্ষণ তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারে না। হাসিব লাভণ্যে তাহার বিশাল নেত্র দুটি এমন মগ্ন যে বোদনের সময়ও অশ্রু-রেখা ভেদ করিয়া হাসির কিরণ জলিতে থাকে। যাহা হউক করুণার চপল ব্যবহারে পাড়ার মেয়ে মহলে বেহায়া বলিয়া তাহার বড়ই অখ্যাতি জন্মিয়াছিল, “বুড়াখাড়ি মেয়ের” অতটা বাড়াবাড়ি তাহাদের ভাল

লাগিত না। এ সকল নিন্দার কথা কল্পনা বাড়ির পুরাতন দাসী ভবির কাছে সব শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহাতে তাহাব আইল গেল কি? সে তেমনি ছুটাছুটি করিত, সে ভবির গলা ধরিয়া তেমনি করিয়াই হাসিত, সে পাখীর কাছে মুখ নাড়িয়া তেমনি করিয়াই গল্প করিত। কিন্তু এই প্রফুল্ল হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, এই হাস্যময় অজ্ঞান শিশুর মত চিন্তাশূন্য সরল মুখশ্রী একবার যদি দুঃখেব অন্ধকারে মলিন হইয়া যায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লতাটির স্থায় ভ্রমের মত ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিল-সেকে, বসন্তের বায়ু-বীজনে আর বোধ হয় সে মাথা তুলিতে পারে না।

নরেন্দ্র অনুপের যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পল্লিগ্রামে বেশ স্থখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। অনুপের জীবদশায় ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানেব শাক-সবজি ফল মূলে দৈনিক আহার-ব্যয় যৎসামান্য ছিল। ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, নিয়মিত পূজা অর্চনা দান ধ্যান, ও আতিথেয় ব্যয় ভিন্ন আব কোন ব্যয়ই ছিল না। অল্পপের মৃত্যুর পর অতিথিশালাটি বাবুর্চিখানা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগুলার জালায় গোটা চাবেক দবোয়ান রাখিতে হইল, তাহার প্রত্যেক ভট্টাচার্য্যকে রীতিমত অর্দ্ধ চন্দ্রের ব্যবস্থা করিত, এবং প্রত্যেক ভট্টাচার্য্য বিধিমতে নরেন্দ্রকে উচ্চিস্থ যাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইত। নরেন্দ্র গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি ডিম্পলসরী স্থাপন করিলেন। শুনিয়াছি নহিলে সেখানে ব্রাণ্ডি কিনিবার অথ কোন সুবিধা ছিল না। গবর্ণমেণ্টের সস্তা দোকান হইতে বায় বাহাদুরের খেলানা কিনিবার জন্ত ঘোড়দোড়ের চাদা-পুস্তকে হাজার টাকা সহ কবিয়াছিলেন, এবং এমন আরো অনেক সংকর্ষ্য কবিয়াছিলেন যাহা লইয়া অমৃত বাজারের একজন পত্রপ্রেরক ভাবি ধুমধাম করিয়া এক পত্র লেখে, তাহার প্রতিবাদ ও তাহাব পুনঃ প্রতিবাদের সময় অমূলক অপবাদ দেওয়া যে ভদ্র লোকেব অকর্তব্য ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়।

নরেন্দ্রকে পল্লীর লোকেরা জাতিচ্যুত কবিল, কিন্তু নরেন্দ্র সে দিকে কটাক্ষপাতও করিলেন না, নরেন্দ্রের

একজন সমাজ-সংস্কারক বন্ধু তাহাব “মরাল করেং লইয়া সর্ভায় তুমুল আন্দোলন করিলেন।

নরেন্দ্র বাগবাজারে এক বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন কাশীপুবে এক বাগান ক্রয় করিয়াছেন। এক ি বাগবাজারের বাড়িতে সকালে বসিয়া নরেন্দ্র খাইতেছেন। নরেন্দ্রের সকাল ও আমাদের সকাল অনেক তফাৎ, সে দিন শনিবারে কুঠি যাইবাব ল দেখিয়া আসিলাম, নরেন্দ্রের নাক ডাকিতেছে। দুইট সময় ফিরিয়া আসিবার কালে দেখি, চোক রগড়াইতেছে তখনো আন্তরিক ইচ্ছা আর এক ঘুম দেন। যাহা হউক নরেন্দ্র চা খাইতেছেন এমন সময়ে সমাজ-সংস্কার গদাধর বাবু, কবিতা-কুসুম-মঞ্জরী-প্রণেতা কবির স্বরূপচ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম অভ্যর্থনা সমা হইলে সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

নানাবিধ কথোপকথনের পর গদাধর বাবু কহিলে “দেখুন মশায় আমাদের দেশের জ্বীলোকদের দশা ব শোচনীয়।” এই সময়ে নরেন্দ্র শোচনীয় শব্দের অ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরূপচন্দ্র বাবু কহিলেন ‘Deplorable নরেন্দ্রের পক্ষে উভয় কথাই সমান ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র-এ প্রতিশব্দটি শুনিয়া শোচনীয় শব্দের অর্থটা যেন জ বুঝিয়া গেলেন। গদাধর বাবু কহিলেন “এখন আমাদের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া অমনি নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন, কিন্তু এটা কত হাতে পাবে তাই দেখা যাক, তেমন সুবিধা পাই অস্তঃপুরের প্রাচীর অনেক সময় ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ করে বটে কিন্তু পুলিশের লোকেরা তাহাতে বড়ই আপা কবিলে, ভাঙ্গিয়া ফেলা দূরে থাক একবার আমি অন্তঃপুরে প্রাচীর লঙ্ঘন কবিলে গিয়াছিলাম ম্যাজিস্ট্রেট তা আমাব উপব বড় সন্দেহ হয় নাই। অনেক তর্কের ও গদাধর ও স্বরূপে মিলিয়া নরেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে সত্য সত্যই অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবাব প্রস্ত হইতেছে না, তাহাব তাৎপর্য্য এই যে, জ্বীলোকে অস্তঃপুর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গদাধর বাবু কহিলেন “কত বিধবা একাদশীর যন্ত্রণ বোধন কবিতেছে, কত কুলীন পত্নী স্বামী জীবিত সত্ত্বে বৈধব্য-জালা সহ্য করিতেছে।” স্বরূপ বাবু কহিলেন-

“এ বিষয়ে আমার অনেক কবিতা আছে, কাগজওয়ালারা তার বড় ভাল সমালোচনা কোবেছে; দেখ নরেন্দ্র বাবু, শবৎ কালের জ্যোৎস্না-বাজে কখনো ছাতে শুয়েছ? চাঁদ যখন ঢল ঢল হাসি ঢালতে ঢালতে আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ? আবাব সেই হাস্তময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফ্যালে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয় তাকি কখন দহু কোরেছ? তা যদি কোরে থাক তবে বল দেখি স্বীলোকের কষ্ট দেখলে সেইরূপ কষ্ট হয় কি না?” নরেন্দ্রের সম্মুখে এতগুলি প্রশ্ন একে একে খাড়া হইল, নরেন্দ্র ভাবিয়া আকুল, অনেক ক্ষণের পর কহিলেন “আমার এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।” গদাধর বাবু কহিলেন “এখন কথা হচ্ছে যে, স্বীলোকদের কষ্ট মোচনে আমরা যদি দৃষ্টান্ত না দেখাই তবে কে দেখাইবে? এস, আজ থেকেই এবিষয়ের চেষ্টা করা যাক।” নরেন্দ্রের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না, তিনি মনে মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন এখন কাহার অস্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিতে হইবে? গদাধর বাবু কহিলেন “স্মরণ থাকতে পারে-মোহিনী নামে এক বিধবার কথা সে দিন বলে ছিলুম, আমাদের প্রথম পরীক্ষা তাহাব উপর দিয়াই চলুক। এবিষয়ে যা কিছু বাধা আছে তা আলোচনা কোরে দেখা যাক, যেমন এক একটা পোষা পাখী শৃঙ্খল-মুক্ত হলেও স্বাধীনতা পেতে চায় না, তেমনি সেই বিধবাটিও স্বাধীনতাব সহস্র উপায় থাকিতেও অস্তঃপুরের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চায় না, সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য তাহাকে স্বাধীনতার স্মিষ্ট আশ্বাদ জানাইয়া দেওয়া।” নরেন্দ্র কহিলেন সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। সে বিধবার ভরণ পোষণ বাস-স্থান ইত্যাদি সমুদয় বনোবস্তের ভার নরেন্দ্র নিজ স্বন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র, বিশ্বম্ভর, ও জন্মেজয় বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেটু আসিল, বোতল আসিল। গদাধর বাবু জ্ঞানীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপ বাবু জ্যোৎস্নারাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ কবিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভর বাবু স্থলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও জন্মেজয়

কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন বুঝা গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র

মহেন্দ্র এত দিন বেশ ভাল ছিল। ইঞ্জুলে ছাত্র-বৃত্তি পাইয়াছে, কলেজে এলে, বিয়ে, পাস করিয়াছে, মেডিকাল কলেজে তিন চার বৎসর পড়িয়াছে, আব কিছু দিন পড়িলেই পাস হইত, কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর হইতেই অমন হইয়া গেল কেন? আমাদের সঙ্গে আর দেখা করিতে আসে না, আমরা গেলে ভাল করিয়া কথা কয় না, এসব ভাল লক্ষণ নয়। সহসা এরূপ পবিবর্তন যে কেন হইল, আমবা ভিতরে ভিতরে তাহার সন্ধান লইয়াছি। মূল কথাটা এই, কন্ডা-কর্তাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কন্ডার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন, তাহা মহেন্দ্রের বড় মনোনীত হয় নাই, মনোনীত না হইবারই কথা বটে; তাহার নাম বজ্রনী ছিল, বর্ণও বজ্রনীই আয় অন্ধকার, তাহাব গঠনও যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা নয়, কিন্তু মুখ দেখিলে তাহাকে অতিশয় ভাল মাহুষ বলিয়া বোধ হয়। বেচারী কখনো কাহারো কাছে আদর পায় নাই, পিড়ালিষে অতিশয় উপেক্ষিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার রূপের দোষে বর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যাহাব-তাহাব কাছে তাহাকে নিগ্রহ সহিতে হইত, কখনো কাহারো সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই, এক দিন আয়না খুলিয়া কপালে টিপ পরিতেছিল, বলিয়া কত লোকে কত রকম ঠাট্টা বিক্রপ করিয়াছিল, সেই অবধি উপহাসের ভয়ে বেচাবী কখনো আয়নাও খুলে নাই, কখনো বেশভূষাও করে নাই। স্বামী-আলয়ে আসিল। সেখানে স্বামীর নিকট হইতে এক মুহূর্তেব নিমিত্তও আদর পাইল না, বিবাহ-রাত্রের পবদিন হইতে মহেন্দ্র তাহাব কাছে শুইত না। এদিকে মহেন্দ্র এমন বিদ্বান, এমন মুহূ-স্বভাব, এমন সদ্গু ছিল, এমন আশোদ-দায়ক সহচর ছিল, এমন সদ্গুয় লোক ছিল যে, সেও সকলকে ভাল বাসিত, তাহাকেও সকলে ভাল বাসিত, বজ্রনীর কপাল-দোষে সে মহেন্দ্রও

বিগড়াইয়া গেল। মহেন্দ্র পিতাকে কখনো অভক্তি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিতাকে যাহা বলিবার নয়, তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে। পিতা ভাবিলেন, তাঁহাবই বুঝিবার ভুল, কলেজে পড়িলেই ছেলেরা যে অবাধ্য হইয়া যাইবে, ইহা ত কথাই আছে।

রজনীর গম্ভীর বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে গিয়া বুঝাইলাম, আমি বলিলাম, রজনীর ইহাতে কি দোষ আছে, তাহার কুরূপেব জ্ঞাত সে কিছু দোষী নহে, দ্বিতীয়তঃ তাহার বিবাহের জ্ঞাত তোমার পিতাই দোষী, তবে বিনা অপরাধে বেচারীকে কেন কষ্ট দাও? মহেন্দ্র কিছুই বুঝিল না বা আমাকেও বুঝাইল না, কেবল বলিল তাহাব অবস্থায় যদি পড়িতাম, তবে আমিও একুপ ব্যবহার করিতাম, এ কথা যে মহেন্দ্র অতি ভুল বুঝিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গল্পেব অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।

এ সময়ে মহেন্দ্রের কলেজ ছাড়িয়া দেওয়াটা ভাল হয় নাই, পড়ো জমিতে কাঁটা গাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লোহে মবিচা পড়ে, মহেন্দ্র এমন অবস্থায় কাজ কর্তব্য ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কুফল ঘটবার সম্ভাবনা। আমি আপনি মহেন্দ্রের কাছে গেলাম, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম, মহেন্দ্র বিবস্ত হইল, আমি আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একটা কিছু আমোদ নহিলে কি মানুষে বাঁচিতে পারে? মহেন্দ্র যেকুপ কৃত-বিজ্ঞ, লেখা পড়ায় সেত অনেক আমোদ পাইতে পাবে, কিন্তু পরীক্ষা দিয়া দিয়া বইগুলার উপর মহেন্দ্রেব এমন একটা অকুচি জন্মিয়াছে যে, কলেজ হইতে টাটকা বাহির হইয়াই আব একটা কিছু নতুন আমোদ পাইলেই তাহার পক্ষে ভাল হইত। মহেন্দ্র এখন একটু আধটু করিয়া সেবী খায়, কিন্তু তাহাতে কি হানি হইল? কিন্তু হইল বৈকি, মহেন্দ্রও তাহা বুঝিত, এক একবার বড় ভয় হইত, এক একবার অতুতাপ কবিত, এক একবার প্রতিজ্ঞা করিত, আবাব এক এক দিন খাইয়াও ফেলিত এবং খাইবার পক্ষে নানাবিধ যুক্তিও ঠিক করিত। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্র অধোগতির গহ্বরে এক এক সোপান করিয়া নাবিতে লাগিলেন। মজুটা মহেন্দ্রের এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। আমি কখনো

জানিতাম না, এমন সকল সামান্য বিষয় হইতে এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, সেই ভাল মানুষ মহেন্দ্র জ্বলে যে ধীবে ধীরে কথা কহিত, মুছ মুছ হাসিত, অতি সম্ভরণে চলাফিরা করিত, সে আজ মাতাল হইয়া অমন যা-তা বকিতে থাকিবে, সে অমন বুদ্ধ পিতাব মুখের উপর উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। সর্কাপেক্ষা অসম্ভব মনে করিতাম যে, ছেলেবেলা আমার সঙ্গে মহেন্দ্রের এত ভাব ছিল, সে আজ আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হইবে, আমাকে দেখিলেই ভয় করিবে যে, বুঝি ঐ আবার লেক্চার দিতে আসিয়াছে। কিন্তু আমি আর তাহাকে কিছু বুঝাইতে যাইতাম না, কাজ কি, কথা মানিবে না এখন, কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র, তখন তাহাকে বুঝাইয়া আর কি কবিব? কিন্তু তাহাও বলি, মহেন্দ্র হাজার মাতাল হউক, তাহার অল্প কোন দোষ ছিল না, আপনার ঘবে বসিয়াই মাতাল হইত, কখনো ঘরের বাহির হইত না। কিন্তু অল্প দিন হইল, মহেন্দ্রের চাকর শতু আসিয়া আমাকে কহিল যে, বাবু বিকাল হইলে বাহির হইয়া যান আর অনেক রাত্রি হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন, এই কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল; খোঁজ লইলাম, দেখিলাম দৃশ্য কিছু নয়, মহেন্দ্র তাহাদের বাগানের ঘাটে বসিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কারণ কি? এখনও ত বিশেষ কিছু সন্ধান পাই নাই।

সংস্কাবক মহাশয় যে বিধবা মোহিনীর কথা বলিতেছিলেন, সে মহেন্দ্রের বাড়ির পাশেই থাকিত, মহেন্দ্রেব বাড়িও আসিত, মহেন্দ্রও রোগ বিপদে সাহায্য করিতে তাহাদের বাড়ি যাইত। মোহিনীকে দেখিতে বেশ ভাল ছিল, কেমন উজ্জল চক্ষু, কেমন প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর, সমস্ত মুখের মধ্যে কেমন একটি মিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বলিবার নয়।

যাহা হউক, মোহিনীকে স্বাধীনতার আলোকে জানিবার জ্ঞান নানাবিধ যড়যন্ত্র চলিতেছে। মোহিনীকে একাদমী করিতে হয়, মোহিনী মাছ খাইতে পায় না, মোহিনীর প্রতি সমাজের এই সকল অত্যাচার দেখিয়া গদাধর বাবু অত্যন্ত কাতব আছেন। স্বরূপ বাবু মোহিনীর উদ্দেশে নানা সংবাদ পত্রে ও মাসিকপত্রিকায় নানাবিধ প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে

আমাদের বান্দাল সমাজকে ও দেশাচারকে অনেক গালি দিলেন ও অবশেষে সমস্ত মানব জাতির উপর বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে বড় বিষগ্ন হইয়া গেলেন ও সমস্ত দিন রাত্রি অনেক নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের কাশীপুত্র বাগানের পাশেই মোহিনীর বাড়ি। যে ঘাটে মোহিনী জল আনিতে যাইত, নরেন্দ্র সেখানে দিন কতক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। এই সকল দেখিয়া মোহিনী বড় ভাল বুঝিল না, সে আর সে ঘাটে জল আনিতে যাইত না। সে তখন হইতে মহেন্দ্রের বাগানের ঘাটে জল তুলিতে ও স্নান করিতে যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিনীর ও মহেন্দ্রের মনের কথা

“এমন করিলে পারিয়া উঠা যায় না। মহেন্দ্রের বাড়ি ছাডিয়া দিলাম, ভাবিলাম দূর হোক্গে, ওদিকে আর মন দিব না। মহেন্দ্র আমাদের বাড়িতে আসিলে আমি বাগাঘরে গিয়া লুকাইতাম, কিন্তু আজ কাল মহেন্দ্র আবার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকে, কি দায়েরই পড়িলাম, তাহাব জন্ত জল আনা বন্ধ হইবে নাকি? আচ্ছা না হয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন? লোকে কি বলিবে? আমার বড় লজ্জা করে। মনে কবি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু না যাইয়া কি কবি? আব কেনই বা না যাইব? সত্য কথা বলিতেছি, মহেন্দ্রকে দেখিলে আমার নানান ভাবনা আইসে, কিন্তু সে সব ভাবনা তুলিতেও ইচ্ছা করে না। বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কি? হানি হয় হউক গে, আমি ত না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে, তাহাকে ভাল বাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুসী তাহাই কবিবে। আব এ সকল ভালবাসাবাসির কথা রাষ্ট্র হওয়াও কিছু নয়” এই ত গেল মোহিনীর মনের কথা।

মহেন্দ্র ভাবে “আমি ত রোজ ঘাটে বসিয়া থাকি, কিন্তু মোহিনী ত এক দিনও আমার দিকে ফিরিয়া চায় না। আমি যে দিকে থাকি, সে দিক দিয়াও যায় না, আমাকে দেখিলে শশব্যস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়, পথে

আমাকে দেখিলে প্রান্ত-ভাগে সরিয়া যায়, মোহিনীর বাড়িতে গেলে কোথায় পলাইয়া যায়, এমন করিলে বড় কষ্ট হয়। আগে জানিতাম মোহিনী আমাকে ভাল বাসে, ভাল না বাসুক যত্ন করে, কিন্তু আজ কাল অমন করে কেন? এ কথা মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে কি দোষ আছে? মোহিনীকে ত আমি কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, মোহিনীর বাড়ির সকলে আমাকে এত ভাল বাসে যে, মোহিনীর সহিত কথাবার্তা কহিলে কেহ ত কিছু মনে করে না।”

এক দিন বিকালে মোহিনী জল তুলিতে আসিল। মহেন্দ্র যেমন ঘাটে বসিয়া থাকিত, তেমন বসিয়া আছে। বাগানে আর কেহ লোক নাই। মোহিনী জল তুলিয়া চলিয়া যায়। মহেন্দ্র কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল “মোহিনী,” মোহিনী যেন শুনিতে পাইল না, চলিয়া গেল। মহেন্দ্র ফিরিয়া আর ডাকিতে সাহস করিল না। আর একদিন মোহিনী বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল, মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর্মান্ত-ললাট হইয়া কত কথা কহিল, কত কথা বাধিয়া গেল, কোন কথাই ভাল কবিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না। মোহিনী শশব্যস্তে কহিল “সরিয়া যান, আমি জল লইয়া যাইতেছি।”

সেই দিন মহেন্দ্র বাড়ি গিয়াই একটা কি সামান্য কথা লইয়া পিতার সহিত ঝগড়া করিল, নির্দোষী রজনীকে অকারণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া তিরস্কার করিল, শত্ৰু চাকরটাকে দুই তিন বাব মাঝিতে উত্তত হইল, ও মদেব মাত্রা আরো খানিকটা বাড়াইল। কিছু দিনের মধ্যে গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের আলাপ হইল, তাহার দিন চারেক পরে স্বরূপ বাবুর সহিত সখ্যতা জন্মিল, তাহার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন্দ্রের সহিত পরিচয় হইল, ও মাসেকের মধ্যে মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সভায় সন্ধ্যাগমে নিত্য অতিথিরূপে হাজির হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ

পূর্বের রঘুনাথ সার্কভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল। অর্থাভাবে অল্প দিনেই টোলটি উঠিয়া যায়। গ্রামের

বন্ধিষ্ণু জমিদার অনুপকুমার ঘোষ পাঠশালা স্থাপন করেন, অল্প বেতনে তিনি তাহার গুরুমহাশয়-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু গুরুমহাশয়েব পদে আসীন হইয়া তাঁহার শাস্ত-প্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

পণ্ডিত মহাশয়-বলিতেন, তাঁহার বয়স সবে চল্লিশ বৎসর; এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা যায় তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসরের ন্যূন নয়। সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না; তিনি খুব টস্টোমে বসিক পুঙ্খ ছিলেন না বা খটখটে ঘটপট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলিব চক্রান্ত কবিতেন না, শাস্ত্রের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদ্যায় আদায়ের কোন আশাই রাখিতেন না, কেবল মিল ছিল প্রশস্ত উদরটিতে, নস্ত্রের ডিবাটিতে, ক্ষুদ্র টিকিটিতে ও শ্মশ্রুবিহীন মুখে। পাঠশালার বালকেরা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। এই বালকদের জন্ত তাঁহার অনেক সন্দেশ খরচ হইত, সন্দেশের লোভ পাইয়া বালকেবা ছিনা জোঁকের মত তাঁহার বাড়ির মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। পণ্ডিতমহাশয় বড়ই ভাল মানুষ ছিলেন এবং ছুট বালকেরা তাঁহার উপর বড়ই অভ্যাচার করিত। পণ্ডিত মহাশয়েব নিম্নাতি এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি গুলেই ঘুমাইতেন, বসিলেই ঢুলিভেন ও দাঁড়াইলেই হাই তুলিভেন, এই স্ববিধা পাইয়া বালকেরা তাঁহার নস্ত্রের ডিবা, চটিজুতা ও চসমাব তুঙ্গিটি চুরি করিয়া লইত। একে ত পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় আলগা লোক, তাহাতে পাঠশালার ছুট বালকেবা তাঁহার বাটিতে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রাখিত না। পাঠশালায় সাইবার সময় কোন মতে তাঁহার চটিজুতা খুঁজিয়া পাইতেন না, অবশেষে শূন্তপদেই সাইতেন। একদিন সকালে উঠিয়া দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন তাঁহার শয়ন-গৃহে বোল্‌তায় চাক করিয়াছে, ভয়ে বিব্রত হইয়া সে ঘরই পরিত্যাগ করিলেন, সে ঘরে তিন পরিবাব বোল্‌তায় তিনটি চাক বাঁধিল, ইঁদুরে গর্ভ কঁবিল, মাকড়সা প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পিপীলিকা সাব বাঁধিয়া গৃহময় রাজপথ বসাইয়া দিল। বালীর পক্ষে ঋষ্যমুখ-পর্বত যেরূপ, পণ্ডিত মহাশয়েব পক্ষে এই ঘরটি সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গমনে

অনিচ্ছুক কোন বালক যদি সেই গৃহে লুকাইত তবে আর পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ধরিতে পারিতেন না।

গৃহের এইরূপ আলগা অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় অনেক দিন হইতে একটি গৃহিণীর চিন্তায় আছেন। পূর্বকার গৃহিণীটি বড় প্রচণ্ড জ্বীলোক ছিলেন। নিরীহ প্রকৃতি সার্বভৌম মহাশয় দিল্লীখয়ের জায়, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। জ্বী নিকটে থাকিলে অল্প জ্বীলোক দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিয়া থাকিতেন। একবার একটি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার দিকে চাহিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার পত্নী সেই বালিকাটির মৃত পিতৃপিতামহ প্রপিতামহের নামোল্লেখ কবিতা যথেষ্ট গালি-বর্ষণ করেন, ও সার্বভৌম মহাশয়ের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “তুমি মব, তুমি মর, তুমি মর।” পণ্ডিত মহাশয় মরণকে বড় ভয় কবিতেন, মরণেব কথা শুনিয়া তাঁহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। জ্বীর মৃত্যুর পর দৈনিক গালি না পাইয়া অভ্যাস-দোষে দিনকতক বড় কষ্ট অনুভব কবিতেন। যাহা হউক অনেক কাৰণে পণ্ডিত মহাশয় বিবাহের চেষ্টায় আছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের একটা কেমন অভ্যাস ছিল, যে তিনি সহস্র মিষ্টায়ের-লোভ পাইলেও কাহারো বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকিতেন না, কাহারো বিবাহের সংবাদ শুনিলে সমস্ত দিন মন খারাপ হইয়া থাকিত। পণ্ডিত মহাশয়ের এক ভট্টাচার্য্য বন্ধু ছিল, তাঁহার মনে ধাবণা ছিল যে, তিনি বড়ই রসিক, যে ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া না হাসিত, তাহার উপরে তিনি আন্তরিক চটিয়া সাইতেন। এই বসিক বন্ধু মাঝে মাঝে আসিয়া ভট্টাচার্য্যীয় ভদ্রী ও স্বরে সার্বভৌম মহাশয়কে কহিতেন “ওহে ভায়া—শাস্ত্রে আছে “ধাবয় বিন্দতে জায়াং ভাবদকো ভবেৎ পুমান্। যন্ন বাঁলৈঃ পরিবৃত্তং অশানমিব তদগৃহম্।” কিন্তু তোমাতে তর্দৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্ছে, কারণ কিনা, যখন তোমাব ব্রাহ্মণী বিত্তমান ছিলেন তখন তুমি ভয়ে আশঙ্কায় অর্দ্ধেক হোয়ে গিয়েছিলে, জ্বী-বিষোগের পর আবার দেখতে দেখতে শবীর বিগুণ হোয়ে উঠল। অপরন্তু শাস্ত্রে যে লিখ্‌চে বালকেব দ্বারা পবিত্র না হইলে গৃহ অশান-সমান হয়, কিন্তু বালক কর্তৃক পরিবৃত্ত হওয়া প্রযুক্তই তোমার গৃহ অশান-সমান হোয়েছে।” এই বলিয়া সমাপন সকলকে চোচ্

টিপিতেন, ও সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিলে পর তিনি সন্তোষের লহিত মুহুমূর্ছঃ নশ্ত লইতেন। ওপারের একটি মেয়ের সঙ্গে সার্কভৌম মহাশয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। এক কথ দিন পণ্ডিত মহাশয় বড় মনেব ক্ষুধিতে আছেন। পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। আজ পাণ্ড দেধিতে আসিবে, পাড়ার কোন ছুটে লোকের পরামর্শ শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় নরেন্দ্রের নিকট হইতে এক জোড়া ফুল মোজা, জরিব পোষাক ও পাগড়ি চাহিয়া আনিলেন। পাড়ার ছুটে লোকেরা এই সকল বেশ পবাইয়া তাঁহাকে সং সাজাইয়া দিল। ক্ষুদ্র পরিসর পাগড়িটি পণ্ডিত মহাশয়ের বিশাল মস্তকের টিকির অংশটুকু অধিকার কবিয়া রহিল মাজ, চার পাঁচটা বোতাম ছিঁড়িয়া কণ্ঠে স্বেষ্ট পণ্ডিত মহাশয়ের উদরের বেড়ে চাপকান কুলাইল। অনেক ক্ষণের পর বেশ ভূষা সমাপ্ত হইলে পব সার্কভৌম মহাশয় দর্পণে একবার মুখ দেখিলেন। জরির পোষাকের চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন বড় তৃপ্ত হইল। কিন্তু সেই ঢলঢোলে জুতা পরিয়া, আঁট সাঁট চাপকান গায়ে দিয়া চলিতেও পারেন না, নড়িতেও পাবেন না, জড় ভবতের মত একস্থানে বসিয়াই রহিলেন। মাথা একটু নিচু কবিলেই মনে হইতেছে পাগড়ি বুঝি খসিয়া পড়িবে। ঘাড় বেদনা হইয়া উঠিল, তথাপি যথাসাধ্য মাথা উচু করিয়া রাখিলেন। ঘণ্টা খানেক এইরূপ বেশে থাকিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, অনর্গল ঘর্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পল্লীর ভদ্রলোকেবা আসিয়া অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্তন করাইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার অব্যবস্থিত গৃহ পরিকৃত ও সম্ভিজত কবিবার নিমিত্ত নানা খোঁষামোদ করিয়া নিধিরাম ভট্টকে আহ্বান করিয়াছেন। এই নিধিরামের উপর পণ্ডিত মহাশয়ের অতিরিক্ত ভক্তি ছিল, তিনি বলিতেন, গার্হস্থ্য ব্যাপার স্বেচ্ছা রূপে সম্পন্ন করিতে নিধি তাঁহার পূর্বাতন-গৃহিণীর সমান, মকদ্দমাব নানাবিধ জটিল তর্কে সে স্বয়ং যোজ্ঞেষ্ঠার সাযেবকেও ঘোল পান করাইতে পারে এবং সকল বিষয়ের সংবাদ বাঞ্ছিতে ও চতুরতা পূর্বক সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সে কালেক্সের ছেলের সমানই হউক বা কিছু কমই হউক।

চতুরতাভিমানী লোকেবা আপনার অভাব লইয়া

গর্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবহার চতুরতা জানাইতে চায়, সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব করে, অর্থাৎ অর্থের অভাব সত্ত্বেও কেমন হুচাক রূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন কবিতেন। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব কবিতেন। গল্প-বাগীশ লোক মাজেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি বড় অস্বকুল, কারণ নীচবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিত মহাশয়ের মত আব কেহই ছিল না। এই গুণে বনীভূত হইয়া নিধি মাসেব মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহেব গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডাল পালা ছাঁটিয়া ছুটিয়া দিলে সার মর্ম এইরূপ দাঁড়ায়—নিধিরাম ভট্ট বর্ণ পরিচয় পর্যন্ত শিখিয়াই লেখা পড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিচার অভাব পূরণ কবিতেন। নিধির বিবাহ করিবাব ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এমন খণ্ডর পৃথিবীতে নাই, যে নিধির মত গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কণ্ঠা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাণ্ড্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পাকী আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পরিয়া গুটি কতক কাগজের ভাড়া হাতে করিয়া কণ্ঠা-কর্তাদিগের সম্মুখেই পাকীতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন “ও নিধি, আজ যে তোমাকে দেখতে এয়েছেন।” নিধি কহিলেন “না দাদা, আজ সাহেব সকাল সকাল আসবে, ঢের কাজ ঢের লেখা পড়া আছে, আজ আব হোচ্ছে না।” কণ্ঠা-কর্তাবা জানিয়া গেল যে, নিধি কাজ কর্ম করে, লেখা পড়াও জানে। তাহার পর দিনেই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাপিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি; পাড়ার একটা এন্টেল ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজে পড়, তবে বলিও বিবঙ্গ কলেজে।” দৈবক্রমে বিবাহসভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিল বিবাক্ত কালেজে। ভাগ্যে কণ্ঠা-কর্তারা নিধিব মূর্খতাকে বসিকতা মনে করে তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।

নিধি আসিয়াই মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। ওরে ও—ওরে তা—এ ঘরে একবার, ও ঘরে একবার,

এটা ওন্টাইয়া, ওটা পান্টাইয়া দুই একটা বাসন ভাঙ্গিয়া দুই একটা পুঁথি ছিঁড়িয়া, পাড়া শুদ্ধ তোল পাড় করিয়া তুলিলেন। কোন কাজই করিতেছেন না অথচ মহা গোল, মহা ব্যস্ত; চটি জুতা চট্ট চট্ট করিয়া এঘব ওঘর, এবাড়ি ওবাড়ি, এপাড়া ওপাড়া করিতেছেন, কোনখানেই দাঁড়াইতেছেন না, উর্দ্ধ্বাশ্রয়ে ইহাকে দুই একটি উহাকে দুই একটি কথা বলিয়া আবার সট সট করিয়া গুরুমহাশয়ের বাড়ি প্রবেশ করিতেছেন। ফলটা এই, সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখিব, সার্কভোম মহাশয়ের বাড়ি যে কে সেই, তবে পূর্বে একদিনে যাহা পরিষ্কৃত হইত, এখন এক সপ্তাহেও তাহা হইবে না। যাহা হউক, গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটয়াছিল, ঝাঁটার আঘাতে, লোক জনেব কোলাহলে তিন ঘর বোলতা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিধিবামের নাক মুখ ফুলিয়া উঠিল, চটি জুতা ফেলিয়া, টিকি উড়াইয়া, কোঁচাব কাপড়ে পা জড়াইতে জড়াইতে, চোকাটে হুঁচুট খাইতে খাইতে, পণ্ডিত মহাশয়কে গালি দিতে দিতে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ির ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খল বোলতার দল উড়িয়া বেড়াইত; বেচারী পণ্ডিত মহাশয় দশ দিন আব অবক্ষিত গৃহে বোলতার ভয়ে প্রবেশ করেন নাই, প্রতিবাসীর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, ও বাইবাব সময় ঘটি ঘড়া ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিবার সময় তাহা আর দেখিতে পাইলেন না।

অন্য বিবাহ হইবে। পণ্ডিত মহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বহুকালের পুবাণো সেই ঝাঁটা গাছটি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এটি তাঁহার শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। হাসিতে হাসিতে প্রভুঘোষেই শয্যা হইতে গাজোখান করিয়াছেন। চেলীর জোড় পরিয়া চন্দন-চর্জিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বলিয়া আছেন। থাকিয়া থাকিয়া সহসা পণ্ডিত মহাশয়ের মনে একটি দুর্ভাবনার উদয় হইল, তিনি ভাবিলেন, সকলই ত'হইল এখন নৌকায় উঠিবেন কি করিয়া। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন; বিশ বাইশ ছিলিম তাম্রকূট ভস্ম হইলে ও দুই এক ডিবা নস্ত ফুয়াইয়া গেলে পর একটি সন্ধ্যায় নির্দ্বারিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে,

নিধিবামকে সঙ্গে লইবেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নিধিবাম সঙ্গে থাকিলে নৌকা ডুববার কোন সম্ভাবনাই নাই। নিধিব অশেষণে চলিলেন, সেদিনকার দুর্ঘটনার পবে নিধি, আর পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়িমুখা হইব না বলিয়া স্থির করিয়াছিল, অনেক খোঁষামোদে স্বীকৃত হইল। এইবাব নৌকায় উঠিতে হইবে। সার্কভোম মহাশয় তীব্র দাঁড়াইয়া নস্ত লইতে লাগিলেন। আমাদের নিধিবামও নৌকাকে বড় কম ভয় কবিতেন না, যদি কত্কা কর্তাদের বাড়িতে আহ্বারের প্রলোভন না থাকিত তাহা হইলে প্রাণান্তেও নৌকায় উঠিতেন না। অনেক কষ্টে পাঁচ ছয় জন মাঝিতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে ত নৌকায় তুলিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা যতই নড়ে চড়ে পণ্ডিত মহাশয় ততই ছটফট করেন। পণ্ডিত মহাশয় যতই ছটফট কবেন, নৌকা ততই টলমল; মহা হান্সাম, মাঝিরা বিরত, পণ্ডিত মহাশয় চিংকার করিতে আবস্ত কবিলেন, ও মাঝিদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যদিই পাড়ি দিতে হইল তবে যেন ধাব ধার দিয়া দেওয়া হয়। নিধিবামের মুখে কথাটি নাই, তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে, একটু বাতাস উঠিলে বা একটু মেঘ দেখা দিলেই নৌকার মাস্তুলটা লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। পণ্ডিত মহাশয় আকুল ভাবে নিধির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দুই এক জায়গায় তরঙ্গ-বেগে নৌকা একটু টলমল করিল, নিধি লাফাইয়া উঠিল, পণ্ডিত মহাশয় নিধিকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখনো তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে প্রাণহানির কোন সম্ভাবনা নাই। নিধি সার্কভোম মহাশয়ের বাহুপাশ ছাড়াইবাব জ্ঞত বথাসাধ্য চেষ্টা কবিতে লাগিলেন, পণ্ডিত মহাশয় ততই প্রাণপণে আঁটিয়া ধরিতে লাগিলেন। শীর্ণকায় নিধি দারুণ নিষ্পেষণে কঙ্কশাস হইয়া যায় আর কি, রোষে, বিরক্তিতে, যন্ত্রণায় চিংকার কবিতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিতে করিতে নৌকা তীব্র লাগিল। মাঝিরা এরূপ নৌকা-যাত্রা আর কখনো দেখে নাই, তাহাবা ইপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কণ্ঠাগত-প্রাণ নিধি নিশ্বাস লইয়া বাঁচিলেন, পণ্ডিত মহাশয় এক ঘটি জল খাইয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের সন্ধ্যা উপস্থিত, পণ্ডিত মহাশয় টিকিমুক্ত

শিরে টোপর পবিয়া গদির উপর বসিয়া আছেন। অনাহারে, নৌকার পরিশ্রমে ও অভ্যাস-দোষে দারুণ চুলিতেছেন, মাথার উপর হইতে মাঝে মাঝে টোপর খসিয়া পড়িতেছে, পার্শ্ববর্তী নিধি মাঝে মাঝে এক একটি গুঁতা মাঝিতেছে, সে এমন গুঁতা যে তাহাতে মৃত ব্যক্তির গুঁ চৈতন্ত হয়, সেই গুঁতা খাইয়া পণ্ডিত মহাশয় আবার খড়ফড়িয়া উঠিতেছেন ও শিবচ্যুত টোপরটি মাথায় পরিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন, সভাময় চোক টেপাটেপী করিয়া হাসি চলিতেছে। লগ্ন উপস্থিত হইল, বিবাহের অকুষ্ঠান আবস্ত হইল। পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, পুরোহিতটি তাঁহারি টোল-আউট-শিষ্ট। শিষ্ট মহা লজ্জায় পড়িয়া গেল, পণ্ডিত মহাশয় কানে কানে কহিলেন, তাহাতে আর লজ্জা কি, এবং লজ্জা করিবার যে কোন প্রয়োজন নাই একথা তিনি স্বন্দ ও কঙ্কিপুবাণ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্কর্ভোম মহাশয় বিবাহ-আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত যন্ত্র বলিবার সময় একটি ভুল করিল। সংস্কৃতে ভুল পণ্ডিত মহাশয়েব সহ হইল না, অমনি মুগ্ধবোধ ও পাণিনি হইতে গুণ্ডা আষ্টেক সূত্র আওড়াইয়া ও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। পুরোহিত অপ্রস্তুত হইয়া ও ভেবাচেকা খাইয়া আরো কতকগুলি ভুল করিল। পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন যে, তিনি টোলে তাহাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, পুরোহিত বাবাজি চাল কলার সহিত তাহা নিঃশেষে হজম কবিয়াছেন। বিবাহ হইয়া গেল, উঠিবার সময় সার্কর্ভোম মহাশয় কিরূপ বেগতিকে পায় পা জড়াইয়া তাঁহার খণ্ডবের ঘাড়ে পড়িয়া গেলেন, উভয়ে বিবাহ সভায় ভূমিমাৎ হইলেন। ববের কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, টোপর ভাঙ্গিয়া গেল, খণ্ডবের শূলবেদনা ছিল, শূলকায় ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার উদর চাপিয়া পড়াতে তিনি বিষম চিংকার করিয়া উঠিলেন। ৭৮ জন ধরাধরি করিয়া উভয়কে তুলিল, সভাশুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল, পণ্ডিত মহাশয় মর্মান্তিক অপ্রস্তুত হইলেন ও দুই একটি কি কথা বলিলেন, তাহার অর্থ বুঝা গেল না। এক বাব দৈবাৎ অপ্রস্তুত হইলে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতেই হইবে। অন্তঃপুরে গিয়া গোলেমালে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার

শাঙড়িব পা মাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার শাঙড়ি “নাঃ— কিছু হয় নাই।” বলিলেন ও অন্তরে গিয়া মিত্র বস্ত্রখণ্ড তাঁহার পায়ের আঙ্গুলে বাধিয়া আসিলেন। আহা করিবার সময় দৈবক্রমে গলায় জল বাধিয়া গেল, আধঘণ্টা ধরিয়া কাশিতে কাশিতে নেত্র অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। বাসর-ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একটা আরজুলা আসিয়া তাঁহার গায়ে উড়িয়া বসিল। অমনি লাফাইয়া বাঁপাইয়া, হাত পা ছড়াইয়া, মুখ বিকটাকার করিয়া তাঁহার শালীদের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন। আবার দুইটি চারিটি কান মলা খাইয়া ঠিক স্থানে আসিয়া বসিলেন। একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, স্ত্রী-আচাব করিবার সময় পণ্ডিত মহাশয় এমন উপযুক্ত পরি হাঁচিতে লাগিলেন, যে চারি দিকের মেয়েরা বিব্রত হইয়া পড়িল। বাসর ঘরের বিপদ হইতে কি করিয়া উদ্ধার হইবেন এবিষয়ে পণ্ডিত মহাশয় অনেক ভাবিয়া ছিলেন, সহসা নিধিকে মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু নিধির বাসব-ঘরে যাইবার কোন উপায় ছিল না। যাহা হউক ভাল মানুষ বেচারী অতিশয় গোলে পড়িয়া ছিলেন। গুনিয়াছি দুটি একটি কি কথার উত্তর দিতে গিয়া স্মৃতি ও বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করে, অনেক পীড়াপীড়ির পর গাহিয়া ছিলেন “কোথায় তারিণী মাগো বিপদে তারহ স্মৃতে।” এই তিনি মনের সঙ্গে গাহিয়া ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য মহাশয় রাগিণীর দিকে বড় একটা নজর করেন নাই, যে স্মরে তিনি পুঁতি পড়িতেন, সেই স্মরেই গানটি গাহিয়া ছিলেন। যাহা হউক অনেক কষ্টে বিবাহ-রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র নরেন্দ্রদের দলে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো মহেন্দ্রের আচার-ব্যবহারে এমন একটি মহত্ব জড়িত ছিল যে, নরেন্দ্র তাহাব সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না, এমন কি সে থাকিলে নরেন্দ্র কেমন একটা অস্থখ অস্থভব করিত, সে চলিয়া গেলে কেমন একটু শান্তিলাভ করিত। অলক্ষিতভাবে নরেন্দ্রের মন মহেন্দ্রের মোহিনী শক্তির পদানত হইয়াছিল।

মহেন্দ্র বড় মুহূর্তসময় লোক, হাসিবার সময় মুচকিয়া হাসে, কথা কহিবার সময় মুহূর্তসময় কথা কহে, আবার অধিক লোকজন থাকিলে মূলেই কথা কহে না, সে কাহারো কথায় সায়া দিতে হইলে “হাঁ” বলিত বটে, কিন্তু সায়া দিবার ইচ্ছা না থাকিলে হাঁও বলিত না, নাও বলিত না। এ-মহেন্দ্র নবেঙ্গের মনের উপর যে অমন আধিপত্য স্থাপন করিবে তাহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় বটে।

মহেন্দ্রেব সহিত গদাধরের বড় ভাব হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া দেশাচারের বিরুদ্ধে নিদারুণ কাল্পনিক সংগ্রাম করিতেন। স্বাধীন বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সংস্কারক মহাশয়ের সহিত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন, কিন্তু বহুবিবাহ নিবারণ-প্রসঙ্গে তাঁহার তেমন উৎসাহ থাকিত না। এভাবে তাৎপর্য যদিও গদাধর বাবু বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছি।

গদাধর ও স্বরূপেব সঙ্গে মহেন্দ্রের যেমন বসিয়া গিয়াছিল, এমন নরেন্দ্র ও তাহার দলবলের সহিত হয় নাই। মহেন্দ্র ইহাদের নিকট ক্রমে তাহাব দুই একটি করিয়া মনেব কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে মোহিনীর সহিত প্রণয়েব কথাটাও অবশিষ্ট রহিল না। এই প্রণয়ের কথাটা শুনিয়া স্বরূপবাবু অত্যন্ত উন্নত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন মহেন্দ্র তাঁহার প্রণয়ের অম্মায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন, অনেক দুঃখ করিয়া অনেক কবিতা লিখিলেন, এবং আপনাকে একজন উপগ্রাস নাটকেব নায়ক কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু ভুগু হইলেন।

গদাধর কোন প্রকারে মোহিনীর পারিবারিক অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া তাহাকে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন করিবার জন্ত মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তিনি কহেন, গৃহ হইতে আমাদের স্বাধীনতা শিক্ষা করা উচিত, প্রথমে পারিবারিক-অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশঃ আমরা স্বাধীনতা-পথে অগ্রসর হইতে পারিব। ইংবাজী শাস্ত্রে লেখে “Charity begins at home” তেমনি গৃহ হইতে স্বাধীনতার স্বরূপ। সংস্কারক মহাশয় নিজে বাল্যকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন, বারো বৎসর বয়সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, ষোল বৎসর বয়সে

শিক্ষকেব সহিত বিবাদ করিয়া ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার জ্বর সহিত মনান্তর হয়, এবং তাহাকে তাঁহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন এবং এইরূপে স্বাধীনতা মোপানে মোপানে উঠিয়া সম্প্রতি ত্রিশ বৎসর বয়সে নিজে সমস্ত কুসংস্কার ও প্রেজুডিসের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া অসভ্য বৃন্দদেশের নির্দয় দেশাচার-সমূহকে বক্তৃতার ঝটিকায় ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু গদাধরের সহিত মহেন্দ্রেব মতের ঐক্য হইল না, এমন কি মহেন্দ্র মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল, গদাধর আর অধিক কিছু বলিল না, ভাবিল, আরো দিনকতক ধাক্কা, তাহার পরে পুনরায় এই কথা তুলিব।

আরো দিনকতক গেল, মহেন্দ্র এখন নবেঙ্গদেব দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছে। মহেন্দ্রের মনে আর মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই, গদাধর আর একবার পূর্বকার কথা পাড়িল, মহেন্দ্রের তাহাতে কোন আপত্তি হইল না।

মহেন্দ্রের নামে কলঙ্ক ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্রের হৃদয়ে এতটুকু লোক-লজ্জা অবশিষ্ট ছিল না যে, এই অপবাদে তাহার মন তিলমাত্র ব্যথিত হইতে পারে।

মহেন্দ্রের ভগিনী, পিতা ও অগ্রাঙ্ক আত্মীয়েরা ইহাতে কিছু কষ্ট পাইল বটে কিন্তু হতভাগিনী বঙ্গনীও হৃদয়ে যেমন আঘাত লাগিল এমন আর কাহারো নয়। যখন মহেন্দ্র মদ খাইয়া এলোমেলো বকিতে থাকে তখন বঙ্গনী কি মর্শাস্তিক ইচ্ছা হয় যে, আর কেহ সেখানে না আসে। যখন মহেন্দ্র মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে আইসে বঙ্গনী তাহাকে কোন ক্রমে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন তাহার কতই না ভয় হয় পাছে আর কেহ দেখিতে পায়। অভাগিনী, মহেন্দ্রকে কোন কথা বলিতে, পরামর্শ দিতে বা বারণ করিতে সাহস করিত না, তাহার যতদূর সাধ্য কোন মতে মহেন্দ্রের দোষ আব কাহাকেও দেখিতে দিত না। মহেন্দ্রেব অসম্মত অবস্থায় বঙ্গনী ইচ্ছা করিত, তাহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখা, যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। কেহ তাহাব সাক্ষাতে মহেন্দ্রের নিন্দা করিলে সে তাহাব প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, অন্তরালে গিয়া ক্রন্দন করা ভিন্ন তাহার আর

কোন উপায় ছিল না। সে তাহার মহেন্দ্রের জন্ত দেবতার কাছে কত প্রার্থনা কবিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র তাহার মন্ত অবস্থায় রজনীব মরণ ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা কবে নাই। রজনী মনে মনে কহিত, রজনীব মরিতে কতক্ষণ, কিন্তু রজনী মরিলে তোমাকে কে দেখিবে?

এক দিন রাত্রি দুইটার সময় টলিতে টলিতে মহেন্দ্র ঘবে আসিয়া ভূমিভলে শুইয়া পড়িল। রজনী জাগিয়া জানালায় বসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র তখন অচেতন। রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কতক্ষণের পর মহেন্দ্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইল। আর কখন সে মহেন্দ্রের মাথা কোলে বাধে নাই, সাহসে বুক বাঁধিয়া আজ বাঁধিল। একটি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস কবিত্তে লাগিল। ভোবের সময় মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিল, পাখা দুবে ছুঁড়ি ফেলিয়া কহিল ‘এখানে কি করিতেছ? ঘুমাওগে না।’ রজনী ভয়ে খতমত খাইয়া উঠিয়া গেল। মহেন্দ্র আবার ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতের রোদ্দ মুক্ত বাতায়ন দিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পড়িল, বজনী আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ কবিয়া দিল।

বজনী মহেন্দ্রকে যত্ন কবিত, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে করিতে সাহস করিত না, সে গোপনে মহেন্দ্রের খাবার শুছাইয়া দিত, বিছানা বিছাইয়া দিত, এবং সে অল্পস্বল্প ঘাহা কিছু মাসহারা পাইত, তাহা মহেন্দ্রের খাণ্ড ও অগ্ন্যস্ত্র আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যয় করিত, কিন্তু এসকল কথা কেহ জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকা, প্রতিবেশিনীরা, এত লোক থাকিতে নির্দোষ রজনীরই প্রতি-কার্য্যে দোষারোপ করিত, এমন কি বাড়ির দাসীবাও মাঝে মাঝে তাহাকে দুই এক কথা শুনাইতে ক্রটি করিত না, কিন্তু রজনী তাহাতে একটি কথাও কহিত না; যদি কহিতে পাবিত তবে অত কথা শুনিতেও হইত না।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে, মেঘ কবিয়াছে, একটু বাতাস নাই, গাছে গাছে পাতায় পাতায় হাজার হাজার জ্বোনাকি পোকা মিট মিট করিতেছে। মোহিনীদের বাড়িতে একটি মাল্লুস আর জাগিয়া নাই, এমন সময়ে তাহাদের খিড়কির দরজা খুলিয়া দুই জন তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিল। একজন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল

আর এক জন গৃহে প্রবেশ করিল। যিনি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন তিনি গদাধর, যিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন তিনি মহেন্দ্র। দুই জনেবি অবস্থা বড় ভাল নহে, গদাধর এমন বক্তৃতা করিবাব ইচ্ছা হইতেছে যে, তাহা বলিবার নহে, এবং মহেন্দ্রের পথের মধ্যে এমন শয়ন করিবাব ইচ্ছা হইতেছে যে কি বলিব। ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, গদাধর দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন, কিন্তু পরোপকারের জন্ত কি কষ্ট না সহ করা যায়, এমন কি, এখনি যদি বজ্র পড়ে, গদাধর তাহা মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এই কথাটা অনেকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এখনি তাহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন, বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর অনেক উপকার কবিত্তে পারিবেন, বৃষ্টি-বজ্রের সময় বৃক্ষতলে দাঁড়ানো ভাল নয় জানিয়া একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়া বসিলেন, বৃষ্টি দ্বিগুণ বেগে পড়িতে লাগিল।

এদিকে মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া মোহিনীর ঘরের দিকে চলিল, যতই সাবধান হইয়া চলে ততই থন্ থন্ শব্দ হয়। ঘরের সম্মুখে গিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা মারিল, ভিতর হইতে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন ‘মোহিনী! দেখ ত বিড়াল বুঝি! দিদিমাব গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি সরিবার চেষ্টা দেখিলেন, সরিতে গিয়া এক রাশি হাঁড়ি-কলসির উপর গিয়া পড়িলেন, হাঁড়ির উপর কলসী পড়িল, কলসীর উপর হাঁড়ি পড়িল, এবং কলসী হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল, হাঁড়িতে কলসীতে, খালায় ঘটিতে লাকণ ঝন্ ঝন্ শব্দ বাধাইয়া দিল, এবং কলসী হইতে ঘড় ঘড় শব্দে জল গড়াইতে লাগিল, বাড়িব ঘরে ঘরে ‘কি হইল, কি হইল’ শব্দ উপস্থিত হইল, মা উঠিলেন, পিসি উঠিলেন, দিদি উঠিলেন, খোকা কাঁদিয়া উঠিল, দিদিমা বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে পোড়ার মুখা বিড়ালের মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, মোহিনী প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল, দেখিল মহেন্দ্র; তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া কহিল, ‘পালাও পালাও।’ মহেন্দ্র পলাইবার উত্তোগ করিল, ও মোহিনী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিল। দিদিমা চক্ষে কয় দেখিতেন বটে, কিন্তু কাণে বড় ঠিক ছিলেন, মোহিনীর কথা শুনিতে পাইলেন, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন,

“কাহাকে পলাইতে বলিতেছিলাম মোহিনী?” দিদিমা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পলায়নের ধূপ ধাপ্ শব্দ শুনিতে পাইলেন; দেখিতে দেখিতে বাড়ি শুদ্ধ লোক জমা হইল।

মহেন্দ্র ত অগ্র পথ দিয়া পলায়ন করিল। এদিকে গদাধর বাগানে বসিয়া ভিজিতেছেন, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিতেই শুইয়া পড়িলেন, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর হাততালীর ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; সভায় গবর্ণর জেনারেল উপস্থিত ছিলেন, তিনি বক্তৃতা-অন্তে পবন তুষ্ট হইয়া আপনি উঠিয়া ঘেঁহুয়াও করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে দারুণ এক লাঠির আঘাত লাগিল, ধড়ফড়িয়া উঠিলেন, একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল “এখানে কি করিতেছিলাম? কে তুমি?” গদাধর জড়িত-স্ববে কহিলেন “দেশ ও সমাজ-সংস্কারের জন্ত প্রাণ দেওয়া সকল মনুষ্যেরই কর্তব্য। ভাল ও ভাত সঞ্চয় করাই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেও পৃথিবীর কোন অনিষ্ট হয় না। দেশ-সংস্কারের জন্ত রাজি নাই, দিবা নাই, আপনাদের বাড়ি নাই, পরের বাড়ি নাই, সকল সময়ে সর্বত্রই কোন বাধা মানিবে না, কোন বিঘ্ন মানিবে না, কেবল ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবে; যে না করে সে পশু, সে পশু, সে পশু! অতএব—” আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না, প্রহারের চোটে তাঁহাব এমন অবস্থা হইল যে, আর অল্পক্ষণ থাকিলে শরীর-সংস্কারের আবশ্যকতা হইত। অতিশয় বাড়াবাড়ি দেখিয়া গদাধর বক্তৃতা-ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া গোঁড়ানি-চ্ছন্দে তাঁহার মৃত পিতা, মাতা, কনষ্টেবল, পুলিশ ও দেশের লোককে ডাকাডাকি আবশ্য করিলেন। তাহারা বুঝিল যে, অধিক গোলযোগ করিলে তাহাদেরই বাড়ির নিন্দা হইবে, এই জন্ত আশ্বে আশ্বে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।

মোহিনীর উপরে তাহার বাড়ি শুদ্ধ লোকে বড়ই সন্দেহ হইল। রাত্রে কে আসিয়াছিল, এবং কাহাকে সে পলাইতে কহিল, এই কথা বাহির কবিয়া লইবার জন্ত তাহার প্রতি দারুণ নিগ্রহ আবশ্য হইল, কিন্তু সে

কোনমতে কহিল না। কিন্তু এ কথা ছাপা থাকিবার নহে, মহেন্দ্র পলাইবার সময় তাহার চাদর ও জুতা ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সকলে বুঝিতে পারিল যে মহেন্দ্রেরই এই কাণ্ড। এই ত পাড়াময় টীটা পড়িয়া গেল, পুকুরের ঘাটে, গ্রামেব পথে, ঘরের দাওয়ায়, বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপে এই এক কথাবই আলোচনা হইতে লাগিল। মোহিনীব ঘব হইতে বাহির হওয়া দায হইল, সকলেই তাহার পানে কটাক্ষ করিয়া কথা কয়, না কহিলেও মনে হয় তাহারই কথা হইতেছে। পথে কাহারও হস্ত-মুখ দেখিলে তাহার মনে হইত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি তামাসা চলিতেছে, অথচ মোহিনীর ইহাতে কোন দোষ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন, তখনো অনেক বাত আছে। দেশা অনেকক্ষণ ছুটিয়া গেছে। মহেন্দ্রের মনে এক্ষণে দারুণ অল্পতাপ উপস্থিত হইয়াছে। স্বপ্নায়, লজ্জায়, বিরক্তিতে ত্রিযমান হইয়া শুইয়া পড়িল। একে একে কত কি কথা মনে পড়িতে লাগিল; শৈশবের এক একটি স্মৃতি বজ্রের ত্রায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। যৌবনের নবোন্মেষের সময় ভবিষ্যৎ-জীবনের কি মধুময় চিত্র তাঁহাব হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কত মহান আশা, কত উদার কল্পনা তাঁহার উদ্দীপ্ত হৃদয়ের শিবাশ শিরায় জড়িত বিজড়িত ছিল। যৌবনের স্মৃতিস্বপ্নে তিনি মনে কবিয়াছিলেন যে, তাঁহার মান মাতৃভূমির ইতিহাসে গোবরের অক্ষয়-অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাঁহার জীবন তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতাদের আদর্শ-স্বরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎকাল আদরে তাঁহাব যশ বক্ষে পোষণ করিতে থাকিবে। কিন্তু সে হৃদয়ের, সে আশার, সে কল্পনার আজ কি পবিণাম হইল? তাঁহার যশ কলঙ্কিত হইয়াছে, চবিত্ত সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, হৃদয় দারুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কালি হইতে তাঁহাকে দেখিলে গ্রামের কুলবধূগণ সঙ্কোচে সবিসা যাইবে, বন্ধুরা লজ্জায় নতশির হইবে, শত্রুদের অধর ঘৃণার হাস্যে কুটিল হইবে, বৃদ্ধেরা তাঁহাব শৈশবের এই অনপেক্ষিত পরিণামে দুঃখ করিবে, যুবকেরা অন্তরালে তাঁহার নামে তীব্র উপহাস

বিজ্ঞপ্তি কবিরে, সর্কাপেক্ষা। তিনি যে নিরপরাধিনী বিধবার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ কবিলেন, তাহার আব মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। মহেন্দ্র মর্শ্বেদী কষ্টে শয্যা পড়িয়া বালকের গ্রায কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্রের বোদন দেখিয়া রজনীব কি কষ্ট হইতে লাগিল, বজ্রনীই তাহা জানে, মনে মনে কহিল, “তোমার কি হইয়াছে বল; যদি আমার প্রাণ দিলেও তাহাব প্রতিকার হয়, তবে আমি তাহাও দিব।” রজনী আর থাকিতে পারিল না, ধীবে ধীরে ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল; কতবার মনে করিল যে, পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে, কি হইয়াছে, কিন্তু সাহস করিয়া পারিল না, মুখের কথা মুখেই বহিয়া গেল। মহেন্দ্র মনের আবেগে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গেল, বজ্রনী ভাবিল সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র চলিয়া গেল। আর থাকিতে পারিল না, কাতর স্বরে কহিল, “আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি শোও!” মহেন্দ্র তাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্য মনে চলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল। তখন মেঘমুক্ত চতুর্থী চন্দ্রমা জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। বাতায়নের নিম্নে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধাবের পরস্পর-সংলগ্ন অন্ধকার নারিকেল-বৃক্ষের মস্তকে অক্ষুট জ্যোৎস্নার-বজ্রত বেধা পড়িয়াছে। অক্ষুট জ্যোৎস্নায় পুষ্করিণী-তীরের ছায়ায় অন্ধকার গভীরতর দেখাইতেছে। জ্যোৎস্নায় গ্রাম যতদূর দেখা যাইতেছে, এমন শান্ত, এমন পবিত্র, এমন ঘুমন্ত, যে মনে হয় এখানে পাপ তাপ নাই, দুঃখ যন্ত্রণা নাই; এক স্নেহ হান্তময় জননীর কোলে যেন কতকগুলি শিশু এক সঙ্গে ঘুমাইয়া বহিয়াছে। মহেন্দ্রের মন ঘোব উদাস হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, “সকলেই কেমন ঘুমাইতেছে, কাহারও কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, কাল সকালে আবার নিশ্চিন্তভাবে উঠিবে, আপনার আপনার কাজকর্ম করিবে, কেহ এমন কাজ করে নাই, যাহাতে পৃথিবী বিনীত হইলে সে মুখ লুকাইয়া বাঁচে, এমন কাজ কবে নাই যাহাতে প্রতিমুহূর্তে তীব্রতম অল্পতাপে তাহাব মর্মেমর্মে শেল বিদ্ধ হয়। আমিও যদি এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিতাম, নিশ্চিন্তভাবে জাগিতে পারিতাম! আমার যদি মনের মত বিবাহ হইত, গৃহস্থের মত

বিনাভ্রুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতাম, স্ত্রীকে কত ভাল বাসিতাম, সংসারের কত উপকার করিতাম, কেমন সহজে দিনের পর বাত্রি, রাত্রেব পর দিন কাটিয়া যাইত, সমস্ত বাত্রি জাগিয়া ও সমস্ত দিন ঘুমাইয়া এই বিরজ্জিময় জীবন বহন করিতে হইত না। আহা—কেমন জ্যোৎস্না, কেমন রাত্রি, কেমন পৃথিবী! আধার নারিকেলবৃক্ষগুলি মাথায় একটু একটু জ্যোৎস্না মাকিয়া অত্যন্ত গভীর ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া আছে, যেন তাহাদের বুকের ভিতর কি একটি কথা লুকান রহিয়াছে, তাহাদের আধার ছায়া আধার পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিমজ্জিত।” মহেন্দ্র কতক্ষণ দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, “আমার ভাগ্যে পৃথিবী ভাল কবিয়া ভোগ করা হইল না।” মহেন্দ্র সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ কবিতো মনস্থ কবিল, ভাবিল পৃথিবীতে যাহাকে ভাল বসিয়াছে, সবলকেই ভুলিয়া যাইবে। ভাবিল সে এপর্যন্ত পৃথিবীর কোন উপকার করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন হইতে পরোপকারের অল্প তাহাব স্বাধীন-জীবন উৎসর্গ কবিরে কিন্তু গৃহে বজ্রনীকে একাকিনী ফেলিয়া গেলে সে নিরপরাধিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে? একথা ভাবিলে অনেকক্ষণ ভাবা যাইত, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না, ভাবিল না।

মহেন্দ্র তাহাব নিজ দোষের যত কিছু অপবাদ-যন্ত্রণা, সমুদয় অভাগিনী রজনীকে সহিতে দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বায়ু শুষ্কিত, গ্রাম-পথ আধার করিয়া দুইধাবে বৃক্ষ-শ্রেণী শুষ্ক-গভীর-বিষন্ন ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই আধার-পথ দিয়া, ঝটিকাময়ী নিনীথিনীতে বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র একখানি মেঘখণ্ডের গ্রায মহেন্দ্র যেদিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

বজ্রনী ভাবিল যে, সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র অগ্রত চলিয়া গেল, বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্না-স্পষ্ট পুষ্করিণীর জলের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ককণা ভাবে এ কি দায হইল, নবেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসে না কেন? অধীর হইয়া বাড়িব পুরাতন চাক্বানী

ভবির কাছে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র কেন আসিতেছেন না। সে হাসিয়া কহিল, সে তাহার কি জানে? করুণা কহিল “না, তুই জানিস।” ভবি কহিল, “ওমা, আমি কি করিয়া বলিব?” করুণা কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, ভবির বলিতেই হইবে, নরেন্দ্র কেন আসিতেছে না। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়িতেও ভবির কাছে বিশেষ কোন উত্তর পাইল না। করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কামিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা কবিল যে, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নবেন্দ্র না আসেন, তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে। ভবি বুঝাইয়া দিল যে, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই যে, নবেন্দ্রের আসিবার বিশেষ কোন স্ববিধা হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহার কথা শুনে কে? না আসিলে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

বাস্তবিক নরেন্দ্র অনেক দিন দেশে আসে নাই, কিন্তু পাড়ার লোকেরা বাঁচিয়াছে, কারণ আজকাল নরেন্দ্র যখন দেশে আসে, তখনই গোটা দুই তিন কুকুর এবং তদপেক্ষা বিরক্তিকরক গোটা দুই চার সঙ্গী তাহার সঙ্গে থাকে, তাহার দুই তিন দিনের মধ্যে পাড়া গুলু বিব্রত করিয়া তুলে, আমাদের পণ্ডিত মহাশয় এই কুকুরগুলি দেখিলে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয়ের বিবাহের কথাটা লইয়া পাড়ায় বড় হাসিতামাসা চলিতেছে, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশ বাইশ ছিলিম তামাকের ধূমায়, গোটাকতক নস্তুর টিপে এবং নবগৃহীণীর অভিমানে-কুঞ্চিত ক্রমেঘ-নিষ্ফিষ্ট দুই একটি বিদ্যুতালোকের আঘাতে সকল কথা ভুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেন। নিধিয়াম ব্যতীত পণ্ডিত-মহাশয়কে বাটা হইতে কেহ বাহির করিতে পারিত না। পণ্ডিতমহাশয় আজকাল একখানি মর্পণ ক্রয় করিয়াছেন, চসমাটি সোণা দিয়া বাঁধাইয়াছেন, দূরদেশ হইতে স্নানশুভ্র উপবীত আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী পাড়ার মেয়েদেব কাছে গল্প করিয়াছে- যে, মিলা নাকি আজ কাল মুছ হাসি হাসিয়া উমরে হাত বুলাইতে বুলাইতে রসিকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের নামে পূর্বে কখন একরূপ কথা উঠে নাই। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের বসিকতাব যে দুই একটা নিদর্শন

পাইয়াছি তাহার মর্মার্থ বুঝা আমাদের সাধ্য নহে; তাহার মধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, প্রেমা, অবিজ্ঞা, বজ্রুতে মর্পদ্রব্য, পর্তোবহিমান ধূমায় ইত্যাদি নানাবিধ দার্শনিক হাদ্যমা আছে। পণ্ডিতমহাশয়ের বোদান্তস্বত্র ও সাংখ্যেব উপর মাকড্‌সায় জাল বিস্তার করিয়াছে, আজকাল জয়দেবেব গীতগোবিন্দ লইয়া পণ্ডিত মহাশয় ভাবে ভবপুর হইয়া আছেন। এই ত গেল পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থা। আব আমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরাণীটি দিন কতক আসিয়াই পাড়ার মেয়ে মহল একেবারে সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার মত গল্পগুজব কবিত্তে পাড়ায় আব কাহারো সামর্থ্য নাই, হাত পা নাড়িয়া, চোক মুখ বুঝাইয়া চতুর্দশ ভুবনের সংবাদ দিতেন, একজন তাঁহার নিকট কলিকাতা মহরটা কি প্রকার, তাহারই সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সেখানে বড় বড় মাঠ, সায়েবরা চাস করে, রাস্তার দুধাব সিপাহি শাস্তিরি গোরার পাহারা, ঘরে ঘরে গরু কাটে ইত্যাদি আরো অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন, সকল কথা আবার মনেও নাই। কাত্যায়নীর পতিভক্তি অতিবিক্ত ছিল; এবং এই পতিভক্তি সংক্রান্ত নিন্দাব কথা তাঁহার কাছে যত শুনিতে পাইবো এমন আর কাহারো কাছে নয়, পাড়ার সকল মেয়ের নাড়ীনক্স পর্ধ্যন্ত অবগত ছিলেন; তাঁহার আর একটি স্বভাব ছিল যে, তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সকলকে মনে করাইয়া দিতেন যে, মিছা মিছি পরের চর্চা তাঁর কোনমতে ভাল লাগে না, আর বিন্দু, হারার মা ও বোসেদের বাড়ির বড় বোঁ যেমন বিশ্বনিন্দুক এমন আর কেহ নয়। কিন্তু তাহাও বলি, কাত্যায়নী ঠাকুরাণীকে দেখিতে মন্দ ছিল না, তবে চলিবাব, বলিবাব, চাহিবাব ভাবগুলি কেমন এক প্রকাবের, তা’ হউক গে, অমন এক এক জনের স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের অনেকগুলি দোষ জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু করুণাকে সে সকল কথা কে বলে বল দেখি? সে বেচারী কেমন বিশ্বস্ত চিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সে স্বপ্ন ভাঙাইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু সে অত শত

বুঝেও না, অত কথাই কাণে দেয় না; কিন্তু রাত দিন
শুনিতে শুনিতে দুই একটা কথা মনে লাগিয়া যায় বৈকি।
ককর্ণার অমন প্রফুল্ল মুখ, সেও দুই একবার মলিন হইয়া
যায় নয় ত কি? কিন্তু নরেন্দ্রকে পাইলেই সে সকল
কথা ভুলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে মনেই থাকে না,
অবশ্যই পায় না, তাহাব অন্ত্র এত কথা কহিবার আছে
যে, তাহাই ফুরাইয়া উঠিতে পারে না, ত অন্ত কথা।
কিন্তু ককর্ণার এতাব আর অধিক দিন থাকিবে না তাহা
বলিয়া রাখিতেছি। নরেন্দ্র যেকপ অন্ত্র আরম্ভ
করিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। নরেন্দ্র এখন আর
কলিকাতায় বড় একটা যাতায়াত করে না। ককর্ণাকে
ভাল বাসিয়া যে, যায় না, সে ভয় যেন কাহারো না হয়।
কলিকাতায় সে যথেষ্ট ঋণ করিয়াছে, পাণ্ডানদারদেব ভয়ে
সে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

দিনে দিনে ককর্ণার মুখ মলিন হইয়া আসিতেছে,
নরেন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকিত ছিল ভাল, চব্বিশ ঘণ্টা
চোখেব সামনে থাকিলে কাহাকেই বা না চিনা যায়?
নরেন্দ্রের স্বভাব ককর্ণার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে
লাগিল। ককর্ণার কিছুই তাহাব ভাল লাগিত না।
সর্বদাই খিটু খিটু, সর্বদাই বিরক্ত। এক মুহূর্তও ভাল
মুখে কথা কহিতে জানে না, অধীবা ককর্ণা যখন হর্ষে
উৎফুল্ল হইয়া তাহার নিকট আসে তখন সে সহসা এমন
বিরক্ত হইয়া উঠে যে ককর্ণাব মন একেবারে দমিয়া যায়।
নরেন্দ্র সর্বদাই এমন রুষ্ট থাকে যে ককর্ণা তাহাকে সকল
কথা বলিতে সাহস করে না, সকল সময় তাহার কাছে
যাইতে ভয় করে, পাছে সে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া
উঠে। তদ্বিধি সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারো
যেঁসিবার ঘো ছিল না, সে মাতাল হইয়া বাহা ইচ্ছা
তাই করিত। বাহা হউক ককর্ণার মুখ দিনে দিনে মলিন
হইয়া আসিতে লাগিল; অলৌকিক কল্পনা বা সামান্য
অভিমান ব্যতীত অন্ত কোন কারণে ককর্ণাব চক্ষু প্রায়
জল দেখি নাই, এইবার ঐ অভিমানী আন্তরিক মনের
কষ্টে কঁাদিল। ছেলেবেলা হইতেই সে কখনো অনাদর
উপেক্ষা সহ্য করে নাই, আজ আদর করিয়া তাহার
অভিমানের অশ্রু মুছাইবার আর কেহই নাই।
অভিমানের প্রতিদানে তাহাকে এখন বিরক্তি সহ্য করিতে

হয়। বাহা হউক ককর্ণা আর বড় একটা খেলা করিয়া
বেড়ায় না, সেই পাখীটি লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে বসিয়া
থাকে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গেলে দেখিয়াছি
এক এক দিন ককর্ণা সমস্ত জ্যোৎস্না বাজি বাগানের সেই
বাঁধা ঘাটটির উপরে শুইয়া আছে, কত কি ভাবিতেছে
জানি না, ক্রমে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের স্ফুটন দিয়া
সমস্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র যেমন অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তেমনি ঋণও
সঞ্চয় করিতে লাগিল। সে নিজে এক পয়সাও সঞ্চয়
করিতে পারে নাই, টাকার উপর তাহাব তেমন মাস্তাও
জন্মে নাই, তবে এক, পরিবারের মুখ চাহিয়া লোকে অর্থ
সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, তা নরেন্দ্রের সে সকল খেয়ালই আসে
নাই। একটু আধটু কবিতা যথেষ্ট ঋণ সঞ্চিত হইল।
অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঘর হইতে দুটা
একটা জিনিষ বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইল।

ককর্ণার শবীর অস্থস্থ হইয়াছে। অনর্থক কতকগুলো
অনিয়ম করিয়া তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। নরেন্দ্র
কহিল, সে দিবারাত্র এক পীড়া লইয়া লাগিয়া থাকিতে
পারে না, তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।
এদিকে ককর্ণার তত্ত্বাবধান করে কে তাহার ঠিক নাই;
পণ্ডিত মহাশয় যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু
তাহাতেই বা কি হইবে? ককর্ণা কোন প্রকার ঔষধ
খাইতে চায় না, কোন নিয়ম পালন করে না। ককর্ণার
পীড়া বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল; পণ্ডিত মহাশয় মহা বিব্রত
হইয়া নরেন্দ্রকে আনিবাব জন্ত এক চিঠি লিখিলেন।
নরেন্দ্র আসিল, কিন্তু ককর্ণার পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া
নয়, কলিকাতায় গিয়া তাহার এত ঋণ বৃদ্ধি হইয়াছে যে
চারিদিক হইতে পাণ্ডানদারেরা তাহার নামে নালিশ
আরম্ভ করিয়াছে, গতিকা ভাল নয় দেখিয়া নরেন্দ্র সেখান
হইতে সরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রের এবার কিছু ভয় হইয়াছে, দেশে ফিরিয়া
আসিয়া ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এবং মদের
পাত্রের মধ্যে মনের সমুদয় আশঙ্কা ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা
করিতেছে। আর কাহার সঙ্গে দেখা করে নাই, কথা

কহে নাই, তাহাব সে ঘরটিতে কাহারো প্রবেশ করিবার যো নাই। নরেন্দ্র ঘেরূপ রুট ও ঘেরূপ কথার কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চাকর বাকরেরা তাহার কাছে ঘেসিতেও সাহস করে না। পীড়িতা করুণা খাওয়া দিচ্ছাইয়া ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ কবিল, নরেন্দ্র মহা রুদ্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল যে, কে তাহাকে সে ঘরে আসিতে কহিল? এক ধার উত্তর আর কি হইতে পারে? তাহার পরে পিশাচ যাহা করিল তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়, পীড়িতা করুণাকে এমন নিষ্ঠুর পদাঘাত করে যে সে সেইখানেই মূচ্ছিত হইয়া পড়িল, নবেন্দ্র সে ঘর হইতে অত্যাচার চলিয়া গেল।

অল্পদিনের মধ্যে ককণাব এমন আকার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পাওয়া যায় না। তাহার সে গীর্ণ বিবর্ণ বিষন্ন মুখখানি দেখিলে এমন মায়ী হয় যে, কি বলিব। নরেন্দ্র এবার তাহার উপর যত দূর অত্যাচার করিবার তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সরলা সমস্তই নীরবে সহ করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নবেন্দ্রের নিকটে এক মুহূর্তের জন্ত রোদনও করে নাই; এক দিন কেবল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া অনেক ক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “আমি তোমার কি করিয়াছি?” নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অত্যাচার চলিয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

এক বার ঋণের আবর্ত মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। যখন কেহ নালিশের ভয় দেখাইত, নরেন্দ্র তখনই তাড়াতাড়ি অস্ত্রের নিকট হইতে অপরিমিত শুদ্ধ ঋণ করিয়া পরিশোধ করিত। এইরূপে আসল অপেক্ষা শুদ্ধ বাড়িয়া উঠিল, নরেন্দ্র এবার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল, নালিশ দায়ের হইল, সমনও বাহির হইল। এক দিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্তে নবেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল ও ধীরে ধীরে শ্রীঘরে বাস করিতে চলিলেন।

বেচারী করুণা না খাওয়া না দাওয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার কবিয়া দিল, কি কবিতো হয় কিছুই জানে না, অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় এ কুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি

করিতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক জানিবার কথা নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিধিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; নিধি জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া ধার শুধিতে পৰামর্শ দিল। এখন বিক্রয় করে কে? সে স্বয়ং তাহার ভার লইল। করুণার অলঙ্কার অল্পই ছিল, পূর্বেই নবেন্দ্র তাহাব অধিকাংশ বন্ধক দিয়াছে, ও বিক্রয় করিয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত আনিয়া দিল। নিধি সেই সমুদয় অলঙ্কার ও অত্যাচার গার্হস্থ্য দ্রব্য অধিকাংশ নিজে যৎসামান্য মূল্যে, কোন কোনটা বা বিনা মূল্যেই গ্রহণ করিল ও অবশিষ্ট বিক্রয় করিল। পণ্ডিত মহাশয় ত কাঁদিতে বসিলেন, ভয়ে কষ্টে করুণা অধীর হইয়া উঠিল। বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাওয়া গেল, তাহাতে পণ্ডিত মহাশয়-নিজের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দিয়া দেয়-অর্থ কোন প্রকারে পূরণ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু ঋণ হইতে মুক্ত হইল না। তন্নিম্ন এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষাও হইল না। - যে রকম করিয়াই হউক না কেন, এখন মদ নহিলে তাহার আর চলে না। করুণার প্রতি কিছুমাত্র সদয় হয় নাই, করুণা গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি কেন অমন কবিয়া বিক্রয় করিল, তাহাই লইয়া নরেন্দ্র করুণাকে যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছে।

গদাধর ও স্বরূপ এখানে আসিয়াও জুটিয়াছে। সেবারকাব প্রহারের পরও গদাধরের অন্তঃপুং-সংস্কার-প্রিয়তা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানেই ষাউক না কেন সেখানেই তাহার ঐ চিন্তা, নবেন্দ্রের দেশেও তাঁহার সেই উদ্দেশ্যেই আগমন, ইচ্ছা আছে এখানেও দুই একটি সং উদাহরণ বাখিয়া যাইবেন। পূর্ব পবিচিত বন্ধুদেব পাইয়া নরেন্দ্র বিলক্ষণ আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গদাধরের নিকট আরো অনেক ঋণ করিলেন, তাহার জ্ঞানিত না যে নবেন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছে, স্তত্রাং বিশ্বস্তচিত্তে কিঞ্চিৎ স্বদের আশা কবিয়া ধার দিল। গদাধরের হস্তে এইবার একটি কাজ পড়িয়াছে, নরেন্দ্রের মুখে সে কাত্যায়নী ঠাকুরাগীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া সে মহা জলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এত বয়সের তাবতম্য কোন হৃদয় সম্পন্ন মনুষ্য সহ করিতে পারে না;

বিশেষতঃ সমাজ সংস্কারই বাহাদেব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, হৃদয়েব প্রধান আশা, অবকাশেব প্রধান ভাবনা, কার্যক্ষেত্রেব প্রধান কার্য, তাহাবা সমাজের এসকল অগ্নায় অবিচার কোন মতেই সহ্য কবিতে পারে না। ইহা সংশোধনেব জন্ত, এপ্রকার অগ্নায়রূপে বিবাহিত জ্বীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্ত সংস্কারকদিগের সকল প্রকাব ত্যাগ স্বীকার করা কর্তব্য, এবং আমাদেব কাত্যায়নী দেবীর উদ্ধাবের জন্ত গদাধর সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার কবিতেই প্রস্তুত আছেন। আর যখন স্বরূপ বাবু তাহার ক্ষুদ্র কবিতাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন, তাহার মধ্যে “রাহুগ্রাসে চন্দ্র” নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে, যে বিধাতা কুসুমের কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, কোকিলে কুরূপ দিয়াছেন, তাহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটি বিবাহ বর্ণনা লিখিত ছিল, আমবা গোপনে সন্ধান লইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তাহা কাত্যায়নী ঠাকুরাণীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়, অনেক সমালোচক নাকি তাহাতে অশ্রু সঞ্চরণ করিতে পারেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন মেঘ-মেঘ কবিতা আছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, বাদলার আর্দ্র বাতাস বহিতেছে, আজ করুণা মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিতে গিয়াছে। কাঁদিয়া কাটিয়া প্রার্থনা কবিল, যেন তাহাকে আর অধিক দিন একরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়, এবার তাহার যে সন্তান হইবে সে যেন পুত্র হয়, কন্যা না হয়, নাবী-জন্মেব যন্ত্রণা যেন আর কেহ ভোগ না কবে। করুণা প্রার্থনা কবিল, তাহার মরণ হউক, তাহা হইলে নরেন্দ্র স্বচ্ছামতে অকণ্টকে স্থখ ভোগ করিতে পাইবে।

এই দুঃখেব সময় নরেন্দ্রের এক পুত্র জন্মিল। অর্থের অনটনে সমস্ত ধনচপত্র চলিবে কি করিয়া তাহার ঠিক নাই। নরেন্দ্রের পূর্বকার চাল কিছুমাত্র বিগড়ায় নাই; সেই সন্ধ্যাকালে গদাধর ও স্বরূপেব সহিত বসিয়া তেমনি মদটি খাওয়া আছে, তেমনি ঘড়িটি, ঘড়ির চেনটি, ফিন্ফিনে ধুতিটি, এসেন্সটুকু, আতরটুকু সমস্তই আছে, কেবল নাই অর্থ। করুণার গার্হস্থ্য পটুতা কিছুমাত্র নাই, তাহার সকলই উলটা পালটা গোলমাল। গুছাইয়া কি করিয়া খরচ

পত্র করিতে হয় তাহার কিছুই জানে না, হিসাব পত্রের কোন সম্পর্কই নাই, কি করিতে যে কি করে তাহার ঠিক নাই। করুণা যে কি গোলে পড়িয়াছে তাহা সেই জানে, নরেন্দ্র তাহাকে কোন সাহায্য করে না, কেবল মাঝে মাঝে গালাগালি দেয় মাত্র, নিজে যে, কি দরকার, কি অবদকার, কি করিতে হইবে, কি না করিতে হইবে, তাহার কিছুই ভাবিয়া পায় না। করুণা রাত দিন ছেলোট লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কি করিয়া সন্তান পালন করিতে হয় তাহাব কিছু যদি জানে! ভবি বলিয়া বাড়ির যে পুরাতন দাসী ছিল, সে করুণার এই দুর্দশায় বড় কষ্ট পাইতেছে। করুণাকে সে নিজ হস্তে মাহুষ করিয়াছে, এই জন্ত তাহাকে সে অত্যন্ত ভালবাসে। নরেন্দ্রের অগ্নায়চরণ দেখিয়া সে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে খুব মুখনাড়া দিয়া আসিত, হাত মুখ নাড়িয়া যাহা না বলিবার তাহা বলিয়া আসিত। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইয়া কহিত “তুই বাড়ি হইতে দূর হইয়া যা!” সে কহিত “তোমার মত পিশাচের হস্তে করুণাকে সমর্পণ করিয়া কোন প্রাণে চলিয়া যাই?” অবশেষে নরেন্দ্র উঠিয়া দুই চারিটি পদাঘাত করিলে পরে সে গরুগব করিয়া বকিতে বকিতে কখনো বা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইত। ভবিই বাড়ির গিন্নি, সেই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করিত, করুণাকে কোন কাজ করিতে দিত না। করুণাব এই অসময়ে সে যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। ভবির আর কেহ ছিল না, যাহা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত করুণার জন্ত ব্যয় করিত। করুণা যখন একলা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত, তখন সে তাহাকে সাঙ্গনা দিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। করুণাও ভবিকে বড় ভাল বাসিত, যখন যেনেব কষ্টের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন দুই হস্তে ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন কাঁদিয়া উঠিত যে, ভবিও আর অশ্রু সঞ্চরণ করিতে পারিত না, সে শিশুর মত কাঁদিয়া একাকার করিয়া দিত। ভবি না থাকিলে করুণা ও নরেন্দ্রের কি হইত বলিতে পারি না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপ বাবু কহেন যে, পৃথিবী তাহাকে ক্রমাগতই জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্ত মাহুষকে তিনি

শিশাচ জ্ঞান করেন, কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে তিনিই দেশের লোককে জ্ঞানভান কবিয়া আসিতেছেন, তিনি যাহাব সহিত কোন সংগ্রহে আসিয়াছেন, তাহাকেই অবশেষে এমন গোলে ফেলিয়াছেন যে, কি বলিব।

স্বরূপ বাবু সর্বদা এমন কবিত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকেন যে অনেক ভাকাডাকিতেও তাঁহার উত্তর পাওয়া যায় না ও সহসা অ্যা বলিয়া চমকিয়া উঠেন। হয়ত অনেক সময়ে কোন পুঙ্খবিলীর্ণ বাঁধা ঘাটে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ যে, সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে মানুষ আছে তাহা টেবও পান নাই, অথবা যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা টের পায় নাই যে তিনি টের পাইতেছেন। ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হয়ত থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া যান, জিজ্ঞাসা কবিলে বলেন, জানালায় ভিতর দিয়া তিনি একখণ্ড মেঘ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তেমন স্তম্ভর মেঘ কখনো দেখেন নাই। কখনো কখনো তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন, ভুলিয়া দুই একখণ্ড তাঁহার কবিতা লিখা কাগজ ফেলিয়া যান, নিকটস্থ কেহ সে কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলে তিনি ‘ও!—এ কিছুই নহে’ বলিয়া টুকুরা টুকুরা কবিতা ছিঁড়িয়া ফেলেন। বোধ হয় তাঁহার কাছে তাহার আর একখানা নকল থাকে, কিন্তু লোকে বলে যে, না, অনেক বড় বড় কবির ঐরূপ অভ্যাস আছে। মনের ভুল এমন আর কাহাবও দেখি নাই, কাগজপত্র কোথায় যে কি ফেলেন তাহার ঠিক নাই, এইরূপ কাগজপত্র যে কত হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু স্মৃতির বিষয়, ঘড়ি ঢাকা, বা অন্য কোন বহুমূল্য দ্রব্য কখনো হারান্ নাই। স্বরূপ বাবুর আর একটি রোগ আছে, তিনি যে কোন কবিতা লিখেন, তাহার উপরে বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে ‘বিজ্ঞান কাননে’ বা ‘গভীর নিশীথে’ লিখিত, বলিয়া লিখা থাকে, কিন্তু আমি বেশ জানি যে, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্ভানগণ দ্বারা পরিবৃত্ত গৃহে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের স্বরূপবাবু বড় প্রেমিক স্বস্তি। তিনি যত শীঘ্র প্রেমে বাঁধা পড়েন এত আব কেহ নয়, ইহাতে তিনিও কষ্ট পান, আর অনেককেই কষ্ট দেন।

স্বরূপ বাবু দিবা রাত্রি নরেন্দ্রের বাড়িতে আছেন, মাঝে মাঝে আঙালে আবডালে করুণাকে দেখিতে পান, কিন্তু

তাহাতে বড় গোলযোগ বাধিয়াছে। তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে ও বাজে ঘুম হইতেছে না। তিনি ঘোর উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াছেন, স্মৃতিরাং এখন তাঁহাকে কোকিলেও চোঁকরায় না, চন্দ্রকিরণও দৃষ্ট করে না বটে, কিন্তু হইলে হয় কি, পৃথিবী তাঁহার চক্ষে অরণ্য আশান হইয়া গিয়াছে, ফুল শুকাইতেছে আবার ফুটিতেছে, সূর্য্য অস্ত যাইতেছে আবার উঠিতেছে, দিবস আসিতেছে ও যাইতেছে, মানুষ শুইতেছে ও খাইতেছে, সকলি যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু হায়! তাঁহার হৃদয়ে আর শান্তি নাই, দেহে বল নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে স্মৃতি নাই, এক কথায়, যাহাতে যাহা ছিল, তাহাতে আর তাহা নাই। স্বরূপ কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিল, তাহাতে যাহা লিখিবাব সমস্তই লিখিল। তাহাতে ইঙ্গিতে ককণার নাম পর্য্যন্ত গাঁথিয়া দিল। এবং সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া মধ্যস্থ নামক কাগজে পাঠাইয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিধি নরেন্দ্রের বাড়িতে মাঝে মাঝে আইসে। কিন্তু আমরা যে ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিতেছি, সে সূত্রের মধ্যে কখনো পড়ে নাই; এই বার পড়িয়াছে। স্বরূপ বাবু তাঁহার অভ্যাসানুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা দৈব-ক্রমেই হউক, একখণ্ড কাগজ ঘরে ফেলিয়া গিয়াছেন, নিধি সে কাগজটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে কাগজটিতে গুটি দুয়েক কবিতা লিখা আছে, অল্প লোক হইলে সে কবিতাগুলির সরল অর্থটি বুঝিয়া পড়িত ও নিশ্চিত থাকিত, কিন্তু বুদ্ধিমান নিধি সেরূপ লোকই নহে। যদি বা তাহার কোন গূঢ় অর্থ না থাকিত তথাপি নিধি তাহা বাহিব করিতে পারিত। তবু ইহাতে ত কিছু ছিল। নিধির সে কবিতাগুলি বড় ভাল ঠেকিল না, ট্যাকে গুঁজিয়া রাখিল ও ভাবিল, ইহার নিগূঢ় তাহাকে জানিতে হইবে। অমন বুদ্ধিমান লোকেব কাছে কিছুই ঢাকা থাকে না, ইঙ্গিতে সকলি বুঝিয়া লইল। চতুরতাভিমানী লোকেরা নিজ বুদ্ধিব উপর অসম্বন্ধ রূপে নির্ভর করিয়া এক এক সময়ে যেমন সর্বনাশ ঘটায়, এমন আর কেহই নহে।

“দিদি, কেমন আছ, দেখিতে আসিয়াছি” বলিয়া নিধি করুণার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নিধি ছেলেবেলা হইতেই অনুপেব অন্তঃপূবে যাইত ও করুণার মাকে মা বলিয়া ডাকিত। নিধি এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই করুণা কেমন আছে দেখিতে আইসে। এক দিন নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছে, নরেন্দ্র কবে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, করুণা, স্বরূপ বাবুর নিকট ভবিকে জানিয়া আসিতে কহিল। নিধি আডাল হইতে শুনিতে পাইল, মনে মনে কহিল “হুঁ হুঁ—বুঝিয়াছি, এত লোক থাকিতে স্বরূপ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠান কেন, গদাধর বাবুকে জিজ্ঞাসা কবিলেও ত চলিত।” এক দিন করুণা ভবিকে কি কথা বলিতেছিল, দূর হইতে নিধি শুনিতে পাইল না, কিন্তু মনে হইল, করুণা যেন একবার ‘স্বরূপ বাবু’ বলিয়াছিল, আর একটি প্রমাণ জুটিল। আর এক দিন নরেন্দ্র, স্বরূপ ও গদাধর বাগানে বসিয়াছিল, করুণা সহসা জানলা দিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গেল, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, করুণা স্বরূপেবই দিকে চাহিয়াছিল, নিধি এই ত তিনটি অকাটা প্রমাণ পাইয়াছে, ইহা অল্প লোকেব নিকট যাহাই হউক কিন্তু নিধির নিকট ইহা সমস্তই পরিষ্কার প্রমাণ! শুদ্ধ ইহাই যথেষ্ট নহে, করুণা যে দিনে দিনে শীর্ণ, বিষণ্ণ, রুগ্ন হইয়া যাইতেছে, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার কারণ আর কিছুই নয়,—স্বরূপের ভাবনা!

এখন স্বরূপের নিকট কথা আদায় করিতে হইবে, এই ভাবিয়া নিধি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ গিয়া কহিল, “করুণা ত ভাই তোমার জন্ত একেবারে পাগল!” স্বরূপ একেবারে চমকিয়া উঠিল, আশ্চর্য্যে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা কবিল “তুমি কি করিয়া জানিলে?” নিধি মনে মনে কহিল “হুঁ-হুঁ আমি তোমাদের ভিতরকার কথা কি কবিয়া সন্ধান পাইলাম, ভাবিয়া ভয় পাইতেছ? পাইবে বৈ কি, কিন্তু নিধি বামেব কাছে কিছুই এড়াইতে পায় না।” কহিল “জানিলাম, এক রকম কবিয়া!” বলিয়া চোক টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন গিয়া আবাব স্বরূপকে কহিল, “করুণার সহিত তুমি যে গোপনে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছ ইহা নরেন্দ্র যেন টেব না পায়।” স্বরূপ কহিল

“সেকি? করুণার সহিত একবাবো ত আমার দেখা সাক্ষাৎ কথা বার্তা হয় নাই।” নিধি মনে মনে কহিল “নিশ্চয় দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নহিলে এত করিয়া ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে কেন?” ইহাও একটি প্রমাণ হইল, কিন্তু আবাব স্বরূপ যদি বলিত যে “ইহা দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল” তবে তাহাও একটি প্রমাণ হইত।

যাহা হউক নিধির মনে আর সন্দেহ রহিল না। এমন একটা নিগূঢ় বার্তা নিধি আপনাব বুদ্ধি-কৌশলে জানিতে পারিয়াছে, একথা কি সে আর গোপনে রাখে? তাহাব বুদ্ধির পরিচয় লোকে না পাইলে আর হইল কি? “তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, আমি ভিতরকার কথা সকল জানি।” চতুরতাভিমानी লোকেবা ইহা বুঝাইতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হয়। নিধির কাছে যদি বল যে, “রামহরি বাবু বড় সংলোক।” অমনি নিধি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবে “কি বলিতেছ? কে সংলোক? রামহরি বাবু? ওঃ—” এমন করিয়া বলিবে যে তুমি মনে করিবে, এ বুঝি রামহরি বাবুর ভিতরকার কি একটা দোষ জানে। পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, “সে অনেক কথা।” নিধি সন্তোষিত যে গুপ্ত খবর পাইয়াছে তাহা পরামর্শ দিবার ছলে নরেন্দ্রকে বলিবে এইরূপ মনে মনে স্থির করিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন ধরিয়া ছোট ছেলেটিব পীড়া হইয়াছে। তাহা হইবে না ত কি? কিছুই ত নিয়ম নাই, করুণা ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল, ডাক্তার আসিয়া কহিল পীড়া শস্ত হইয়াছে। করুণা ত দিন রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল, পীড়া বাড়িতে লাগিল, করুণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মারা হইল, গ্রামের নেটিব ডাক্তার কপালীচরণ বাবু পীড়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহাকে ফি দিবার সময় তিনি কহিলেন থাক, থাক, পীড়া অগ্রে শার্ক। পণ্ডিত মহাশয় বুঝিলেন, নরেন্দ্রদের দূরবস্থা শুনিয়া দয়ার্জ ডাক্তারটি ফি লইতে বুঝি রাজি নহেন। দুই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, তিনিও অম্মান বদনে আসিলেন।

নরেন্দ্র এক্ষণে বাড়িতে নাই। ওপাড়ার পিতৃমাতৃহীন

নাবালক জমিদারটি সম্প্রতি নাবালক হইয়া উঠিয়া জমিদারী হাতে লইয়াছেন, নরেন্দ্র তাঁহাকেই পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারি স্বন্ধে চাপিয়া নরেন্দ্র দিব্য আরামে আশ্রয় করিতেছেন এবং গদাধর ও স্বরূপকে তাঁহারি হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গদাধর ও স্বরূপকে যে শীঘ্র তাঁহার স্বন্ধ হইতে নড়াইবেন, তাহার যো নাই, গদাধরের একটি উদ্দেশ্য আছে, স্বরূপেবও এক উদ্দেশ্য আছে।

ছেলেটির পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠান হইল। ডাক্তারটি তাহার হস্ত দিয়া, তাঁহার ভুবেলার ঘাতাত্তের দরুণ যাহা পাওনা আছে সমস্ত হিসাব সমেত এক বিল পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেটি অবশ হইয়া পড়িয়াছে, করুণা তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখেব পানে চাহিয়া আছে, সকল কর্মে নিপুণ নিধি মাঝে মাঝে তাহার নাড়ি দেখিতেছে, কহিল নাড়ি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আকুল হৃদয়ে সকলেই ডাক্তারের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে বিল লইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিল। সকলই সম্বরে জিজ্ঞাসা করিল ডাক্তার কই? সে সেই বিল হাজির করিল। সকলেই ত অবাক্। মুখ চোক শুকাইয়া পণ্ডিত মহাশয় ত ঘামিতে লাগিলেন, নিধির হাত ধরিয়া কহিলেন “এখন উপায় কি?” নিধি কহিল “টাকার যোগাড় করা হউক।” লহনা টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? এদিকে পীড়ার অবস্থা ভাল নহে, ষত কাল বিলম্ব হয় ততই খারাপ হইবে, মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, করুণা বেচারী কানিতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় বিব্রত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, হাতে যাহা কিছু ছিল আনিলেন। কাত্যায়নী ঠাকুরাণীটি টাকা বাহিব করিয়া দিবার সময় অনেক আপত্তি করিয়া ছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া তবে টাকা বাহির করেন। ভবি তাহার শেষ মন্ডল বাহির করিয়া দিল। অনেক কষ্টে অবশেষে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। ডাক্তারটি অগ্নান বদনে কহিলেন “ছেলে বাঁচিবে না।”

এমন সময় টলিতে টলিতে নরেন্দ্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ

করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া ঘরে যে কিসের গোলমাল কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিছু ক্ষণ শূন্যনেত্রে পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে কি বিড় বিড় করিয়া বকিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল, পণ্ডিত মহাশয়ও মহা গোলযোগে পড়িয়া গেলেন, ডাক্তার ছাড়াইতে গেলেন, তাঁহার হাতে এমন একটি কামড় দিল যে রক্ত পড়িতে লাগিল।* এইরূপ গোলযোগ করিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল।

ক্রমে শিশুর মুখ নীল হইয়া আসিল। করুণা সমস্ত গোলমালে অর্ধ হতজ্ঞান হইয়া বালিসে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে শিশুর মৃত্যু হইল, কিন্তু দুর্বল করুণা তখন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আহা, বিষম করুণাকে দেখিলে এমন কষ্ট হয় যে, ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়াও তাহার মনের যন্ত্রণা দূর্ব করি। কত দিন তাহাকে আর হাসিতে দেখি নাই। ভাল করিয়া আহ্বার করে না, স্নান কবে না, ঘুমায়ে না; মলিন, বিবর্ণ, ত্রিয়মাণ, শীর্ণ; জ্যোতিহীন চক্ষু বসিয়া গিয়াছে; মুখশ্রী এমন দীন, করুণ হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না যে, এ বালিকা কখনো হাসিতে জানিত। ভবির হস্তে যাহা কিছু অর্থ ছিল সমস্ত প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, কি করিয়া সংসার চলিবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে কোন মতে দিন চলিতেছে।

নিধি স্বরূপের উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল “সে বাবুটি কি করে বলিতে পার?”

নরেন্দ্র—কেন, বল দেখি?

নিধি—ও লোকটিকে আমার ত বড় ভাল ঠেকে না।

নরেন্দ্র—কেন কি হইয়াছে?

নিধি—না কিছুই হয় নাই, তবে কি না—সে কথা থাক্,—বাবুটির বাড়ি কোথায়?

নরেন্দ্র—কলিকাতা।

নিধি—আমিও তাহাই ঠাকুরাইয়াছিলাম, নহিলে এমন স্বভাব হইবে কেন?

নরেন্দ্র—কেন, কি হইয়াছে, বলই না।

নিধি—আমি সে কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু উহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দেও।

নরেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল—কি কথা বলিতেই হইবে।

নিধি কহিল—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাব আর চাবা নাই, কিন্তু সাবধান থাকিও, ও লোকটি আর যেন বাড়ির ভিতরের দিকে না যায়।

নরেন্দ্র।—সে কি কথা, স্বরূপ ত বাড়ির ভিতরে যায় নাই। নিধি—সেকি তোমাকে বলিয়া গিয়াছে? নরেন্দ্র অবাক হইয়া নিধির মুখের দিকে চাহিয়া বহিল।

নিধি কহিল—আমি ত ভাই আমার কাজ করিলাম, এখন তোমার যাহা কর্তব্য হয়, কর। নরেন্দ্র ভাবিল, এসকল ত বড় ভাল লক্ষণ নয়। স্বরূপ কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, করুণা তাহার জন্ম একেবারে পাগল। একথা নিধি সহসা তাহাকে কেন কহিল? বুঝিল, নিশ্চয় করুণা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে। স্বরূপ ভাবিল, তবে আমিও তাহাব প্রেমে পাগল, একথাও ত তাহাকে জানানো উচিত। স্থির করিল, স্ত্রীবিধা পাইলে নিজে গিয়া জানাইবে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। ছেলেবেলা করুণা যেখানে দিনরাত্রি খেলা কবিতা বেড়াইত সেই বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্না রাত্রির সঙ্গে, সেই মুহূর্ত-বাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেল বনটির সঙ্গে তাহার ছেলেবেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহাব তার ছেলেবেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্রুশানে বায়ু-উচ্ছ্বাসের জ্বাল করুণার প্রাণের ভিতর গিয়া ছু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণাব বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বাগানে আর দুই জন লোক লুকাইয়া আছে, নরেন্দ্র ও স্বরূপ। নরেন্দ্র চুপি চুপি স্বরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, দেখিবে স্বরূপ কি করে। করুণা সহসা দেখিল একজন লোক আসিতেছে, চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল “কেও?” স্বরূপ কহিল “আমি স্বরূপচন্দ্র। নিধিকে দিয়া যে কথা বলিয়া পাঠান হইয়াছিল তাহা

কি স্বরণ নাই?” করুণা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় নরেন্দ্র আব না থাকিতে পাবিয়া বাহির হইয়া পড়িল। করুণা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র ভাবিল তাহাকে দেখিতে পাইয়াই করুণা ভয়ে পলাইয়া গেল বুঝি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কহিল “হতভাগিনি, বাহির হইয়া যা।” করুণা কিছুই কহিল না। “এখনি দূর হইয়া যা।” করুণা নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র মহা ক্রুদ্ধ হইল, অগ্রসর হইয়া কঠোর ভাবে করুণার হস্ত ধরিল, করুণা কহিল ‘কোথায় যাইব?’ নরেন্দ্র করুণার কেশগুচ্ছ ধরিয়া নিষ্ঠুরভাবে প্রহার কবিতো লাগিল, কহিল “এখনি দূর হইয়া যা।” ভবি ছুটিয়া আসিয়া কহিল ‘কোথায় দূর হইয়া যাইবে?’ এবং স্বরণ করাইয়া দিল যে, ইহা তাহাব পিতার বাটি নহে। নরেন্দ্র তাহাকে উচ্চতম স্ববে কহিল, ‘তুই কি করিতে আইলি?’ ভবি মাঝে পড়িয়া করুণাকে ছাড়াইয়া লইল, ও কহিল, “আমার প্রাণ থাকিতে কেমন তুমি করুণাকে অপূর্ণের বাটি হইতে বাহিব করিতে পার দেখি।” নরেন্দ্র ভবিকে যতদূর প্রহার করিবার করিল ও অবশেষে শাসাইয়া গেল যে ‘পুলিসে খবর পাঠাইয়া দিইগে।’ ভবি কহিল “ইহাতো আর মগের মলুক নহে।”

নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর, করুণা ভবির গলা জড়াইয়া ধবিয়া কাদিতে কাদিতে কহিল “ভবি, আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দে, আমি চলিয়া যাই।” ভবি করুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল “সে কি মা, কোথায় যাইবে, আমি যত দিন বাঁচিয়া আছি, তত দিন আর তোমাকে কোন ভাবনা ভাবিতে হইবে না।” বলিতে বলিতে ভবি কাদিয়া ফেলিল। করুণা আর একটি কথা বলিতে পারিল না, তাহার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাদিতে লাগিল। সমস্ত দিন করুণা কিছু খাইল না, ভবি আসিয়া কত সাধ্য-সাধনা করিল, কিন্তু কোন মতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

সমস্ত দিন ত কোন প্রকারে কাটিয়া গেল; সন্ধ্যা হইল, পল্লীর কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে,

পূজার বাড়িতে শয্যাঘণ্টা বাজিতেছে। সময়ান্ত দিন করুণা তাহার সেই শয্যাতেই পড়িয়া আছে, রাত্রি হইলে পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল। সেখানে কতক্ষণ ধবিয়া বসিয়া রহিল, রাত্রি আরো গভীরতর হইয়া আসিয়াছে, পৃথিবীকে ঘুম পাড়াইয়া নিশীথের বায়ু অতি ধীর-পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে, এমন শান্ত ঘুমন্ত গ্রাম যে, মনে হয় না, এ গ্রামে এমন কেহ আছে, যে এমন রাত্রে মর্মভেদী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মরণকে আহ্বান করিতেছে।

করুণাবিজ্ঞান ভাবনায় সহসা ব্যাঘাত পড়িল। করুণা সহসা দেখিল নরেন্দ্র আসিতেছে। বেচারী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। নরেন্দ্র আসিয়া অতি করুণ স্বরে কহিল, “আমি উইকে প্রতি ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, উনি কি না বাগানে আসিয়া বসিয়া আছেন। আজ রাত্রে যে বড়—বাগানে আসিয়া বসি হইয়াছে? স্বরূপ ত এখানে নাই?” করুণা মনে কবিল, এইবার উত্তর দিবে, নিরপরাধিনীর উপর কেন নরেন্দ্রের এইরূপ সংশয় হইল, জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু কি কথা বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না, নরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। নরেন্দ্র কহিল “আয়, বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকিতে পাইবি না।” করুণা একটি কথাও কহিল না, কিসের অলঙ্কিত আকর্ষণে যেন সে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার সে মনে করিল বলিবে, ভবির সহিত দেখা করিয়া যাই, কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না। গৃহের দ্বার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে দেখিল, সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত মাঠে জন প্রাণী নাই। মনে করিল, সে নরেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া বলিবে, তাহার বড় ভয় করিতেছে, সে যাইতে পারিবে না, সে পথ ঘাট কিছুই চিনে না, কিন্তু মুখে কথা সবিল না; ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে গেল; নরেন্দ্র কহিল, “কালি সকালে তোকে যদি গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাই” তবে পুলিশের লোক ডাকাইয়া বাহির করিয়া দিব।” দ্বার রুদ্ধ হইল, ভিতর হইতে নরেন্দ্র তাল বন্ধ করিল। করুণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, করুণা আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া প্রাচীরের উপর পড়িয়া গেল।

কতক্ষণের পথ উঠিল, মনে করিল, ভবির সহিত একবার দেখা হইল না? কতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য মননে বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাচীরের বাহির হইয়া দেখিল, তাহার সেই বাগানের গাছ-পালা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, দেখিল, দ্বিতীয় তলের যে গৃহে তাহার পিতা থাকিতেন, যে গৃহে সে তাহার পিতার সহিত কৃত দিন খেলা করিয়াছে, সে গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ভিতরে একটি ভয় খাট পড়িয়া আছে, তাহার সম্মুখে নিশ্বেজ একটি প্রদীপ জলিতেছে। কত ক্ষণের পর নিশ্বাস ফেলিয়া করুণা ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজ্ঞান কক্ষে একটি মাত্র মুমূর্ষু প্রদীপ জলিতেছে। ছেলে-বেলা বাহারা করুণাকে স্বপ্নে খেলা করিতে দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই আপন কুটীরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাদের সেই কুটীরের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তাহার পিতার কক্ষে এখনো সেই প্রদীপটি জলিতেছে। সেই গভীর নীরব নিশীথে অসংখ্য তারকা নিমেষহীন স্থির নেত্রে নিম্নে চাহিয়া দেখিল—দিগন্ত প্রসারিত জনশূন্য অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া একটি রমণী একাকিনী চলিয়া যাইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত মহাশয় সকালে উঠিয়া দেখিলেন, কাত্যায়ণী ঠাকুরাণী গৃহে নাই। ভাবিলেন, গৃহিণী বুঝি পাড়ার কোন মেয়ে মহলে গল্প-ফাঁদিতে গিয়াছেন। অনেক বেলা হইল, তথাপি তাহার দেখা নাই, তা মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি এরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় আর বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, যেখানে যেখানে ঠাকুরাণীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল, খোঁজ লইতে গেলেন। যেহেতু চোক টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, “মিসা এক দণ্ড আব কাত্যায়নীপিসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কোথায় গিয়াছে বুঝি, তাই খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন; কিন্তু পুরুষমানুষের অতটা ভাল দেখায না।” তাহার মানে, তাহাদের স্বামীরা অতটা করেন না, কিন্তু যদি করিতেন, তবে বড় সুখের

হইত। যেখানে কাত্যায়নীর ঘাইবার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে ত পণ্ডিত মহাশয় খুঁজিয়া পাইলেন না, যেখানে সম্ভাবনা ছিল না, সেখানেও খুঁজিতে গেলেন, সেখানেও পাইলেন না। এই ত পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকুল হইয়া মুহমূহ নশ্ত লইতে লাগিলেন। উর্দ্ধ্বাসে নিধিদের বাড়ি গিয়া পড়িলেন। নিধি জিজ্ঞাসা করিল, ঘোষেদের বাড়ি দেখিয়াছেন, মিত্রদের বাড়ি দেখিয়াছেন, দত্তদের বাড়ি খোঁজ লইয়াছেন? এই রূপে মুখুষ্যে, চাটুষ্যে, বীড়ুষ্যে, ইত্যাদি যত বাড়ি জানিত, প্রায় সকল গুলিবই উল্লেখ করিল, কিন্তু সকল তাতেই অমঙ্গল উত্তর পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জ্ঞাত ভাবিতে লাগিল। অবশেষে নিধি নিজে নরেন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। শূন্য গৃহ যেন হাঁ হাঁ করিতেছে। বিষয় বাড়ির চারিদিক যেন কেমন অন্ধকার হইয়া আছে, একটা কথা कहিলে দশটা প্রতিধ্বনি যেন ধমক দিয়া উঠিতেছে। একটা চাকর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সোপানের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, নিধি তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “গদাধর বাবু কোথায়?” সে কহিল “কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আজো আসেন নাই, বোধ হয় কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন।” নিধি ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে কহিল “যদি খুঁজিতে হয়, ত, কলিকাতায় গিয়ে খোঁজগে।” পণ্ডিত মহাশয় ত একথা বলাই বুঝিতে পারিলেন না। নিধি কহিল, “গদাধর নামে একটি বাবু আসিয়াছেন, দেখিয়াছ?” পণ্ডিত মহাশয় শূন্যগর্ভ একটি হাঁ দিয়া গেলেন। নিধি কহিল “সেই ভক্তলোকটিব সঙ্গে কাত্যায়নীপিসি কলিকাতা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।” পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল; কিন্তু তিনি একথা কোনক্রমেই বিশ্বাস কবিতো চাহিলেন না। তিনি কহিলেন, তিনি নন্দীদের বাড়ি ভাল করিয়া দেখেন নাই, সেখানেই নিশ্চয় আছেন। এই বলিয়া নন্দী আদি করিয়া আর একবার সমস্ত বাড়ি অন্বেষণ করিয়া আসিলেন, কোথাও সন্ধান পাইলেন না। যান বন্দনে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। নিধি কহিল “আমি ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, এরূপ ঘটবে।” কিন্তু তিনি পূর্বে কোন দিন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। সিন্দুক খুলিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, কাত্যায়নী

ঠাকুরাণী শুদ্ধ যে নিজে গিয়াছেন, এমন নহে, যত কিছু গহনাপত্র, টাকাকড়ি ছিল, তাহার সমস্ত লইয়া গিয়াছেন। দ্বাব রুদ্ধ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত দিন কাঁদিলেন। নিধি কহিল ‘এসমুখই নরেন্দ্রের যড়যন্ত্রে ঘটয়াছে, তাহার নামে নালিস করা হউক, আমি শাস্তী তৈয়ার করিয়া দিব।’ নিধি এরূপ একটা কাজ হাতে পাইলেই বাঁচিয়া যায়। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, যাহা তাঁহার ভাগ্যে ছিল হইয়াছে, তাই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের নামে নালিস করিতে পারেন না।

নিধিকে লইয়া পণ্ডিত মহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। একদিন দুই প্রহরের রৌদ্রে পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রান্ত স্থল দেহ, কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুড়বু খাইতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে একটি সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয়েব মন্দির দেখা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে চলিয়া যাইবেন তাহার চেষ্টা কবিতোছেন; গাড়ি দেখিয়া তাহা অধিকার করিবার আশয়ে কোন প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া ঝুলিয়া, সেই দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গাড়ি হইতে প্রথমে একটি বাবু, ও তাহার পরে একটি রমণী হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে গাড়ি হইতে নামিলেন ও হেলিতে তুলিতে মন্দিরভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সে রমণীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, সে রমণীটি তাঁহারি কাত্যায়নী ঠাকুরাণী! তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাত্যায়নী তাঁহার উচ্চতম স্বরে কহিলেন, ‘কেরে মিলে? গায়ের উপর আসিয়া পড়িস্ যে? মরণ আর কি!’ এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা গালাগালি বর্ষণ করিয়া অবশেষে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার চোখের মাতা খাইয়াছেন কি না ও বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় দুইটি প্রশ্নের কোনটির উত্তর না দিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন এখনি মুহিত হইয়া পড়িবেন। কাত্যায়নীর সঙ্গে যে বাবু ছিলেন, তিনি ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার ঠিকের বাড়ি পণ্ডিত মহাশয়কে দুই একটা গৌজা মারিয়া ও বিজাতীয় ভাষায় যথেষ্ট মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, ইংরাজী অর্ধশুট স্বরে পাহারাওয়াল

পাহারাওয়ালা করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। পাহারাওয়ালা আসিল, ও পণ্ডিত মহাশয়কে ঘিরিয়া দশ-সহস্র লোক জমা হইল। বাবু কহিলেন, এই লোকটি তাঁহার পকেট হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ে আকুল হইলেন, ও কান্দো কান্দো স্বরে কহিলেন “না বাবা আমি লই নাই, তবে তোমাব ভ্রম হইয়া থাকিবে, আর কেহ লইয়া থাকিবে।” চোর, চোর, বলিয়া একটা ভারি কলরব উঠিল, চারিদিকে কতকগুলো ছোঁড়া জমিল, কেহ তাঁহার টিকি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে চিমটি কাটিতে লাগিল, পণ্ডিত মহাশয় খতমত খাইয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ট্যাঁকে যত টাকা ছিল, সমস্ত লইয়া বাবুটিকে কহিলেন, “বাবা, তোমাব টাকা হারাইয়া থাকে যদি, তবে এই লও, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমাব পায়ে পড়িতেছি আমাদের রক্ষা কর।” ইহাতে তাঁহার দোষ অধিকতর সপ্রমাণ হইল, পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত ধরিল। এমন সময়ে নিধি চোক্ষ মুখ রাঙাইয়া ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধির এক স্টুট চাপকান পেণ্টলুন ছিল, কলিকাতায় সে চাপকান পেণ্টলুন ব্যতীত যব হইতে বাহিব হইত না। চাপকান পেণ্টলুন পরা নিধি আসিয়া যখন গভীর স্ববে কহিল, “কোনু হায় রে!” তখন অমনি চাবিদিক শুদ্ধ হইয়া গেল। নিধি পকেট হইতে এক টুকুরা কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার নম্বর কত, ও সে কোন থানায় থাকে, এবং উত্তর না পাইতে পাইতে সম্মুখস্থ ছেকুরা গাড়িব কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, লালদিঘির এণ্ড্রুসাহেবের বাড়ি জান ? পাহারাওয়ালা ভাবিল, না জানি এণ্ড্রুসাহেব কে হইবে ? ও দাঁড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে বাবু, বাবু করিতে লাগিল। নিধি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয়, আপনাব বাড়ি কোথায় ? নাম কি ?” বাবুটি গোলমালে সট করিয়া সরিয়া পড়িলেন, এবং সে পাহারাওয়ালাটিও অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল। ভিড় চুকিয়া গেল, নিধি ধরাধরি করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে একটি গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিল, এবং সেই রাত্রেই দেশে যাত্রা করিল। বেচারী পণ্ডিত মহাশয়, লজ্জায়

দুঃখে কষ্টে বালকের জায় কান্দিতে লাগিলেন। নিধি কহিল, কাত্যায়নীর নামে গহনা ও টাকা চুবির নালিশ করা যাক। পণ্ডিত মহাশয় কোন মতে সম্মত হইলেন না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয় করুণার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনি কহিলেন, “এ গ্রামে থাকিয়া আব কি কবিব। শূন্য গৃহ ত্যাগ করে কাশী চলিলাম। বিশেষরূপে চরণে এ প্রাণ বিসর্জন কবিব।” এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় ঘরছাড়ার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশী চলিলেন। পাড়াব সমস্ত বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি সকলকে আদর করিলেন। এমন একটি বালক ছিল না, যে তাঁহার মুখেব পানে চাহিয়া কান্দিয়া ফেলে নাই। এইরূপে কান্দিতে কান্দিতে পণ্ডিত মহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু তেমন ভাল মানুষ আর দেখিলাম না।

নরেন্দ্রের বাড়িঘর সমস্ত মিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নবেজ গ্রাম ত্যাগ কবিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে, কে জানে !

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে রজনী মনে কবিল, আমিই বুঝি মহেন্দ্রের চলিয়া যাইবাব কাবণ। মহেন্দ্রের মাতা মনে করিলেন যে, বজ্রনী বুঝি মহেন্দ্রের উপর কোন কর্কশ ব্যবহার করিবাছে, আসিয়া কহিলেন—“পোড়াবমুখী, ভাল এক ডাকিনীকে ঘবে আনিয়াছিলাম।” রজনীর শব্দব আসিয়া কহিলেন, “রাক্ষসী ! তুই এ সংসার ছাবখাব করিয়া দিলি !” রজনীর নন্দ আসিয়া কহিলেন—“হতভাগিনীর সহিত দাদার কি কুক্ষণেই বিবাহ হইয়াছিল।” রজনী একটি কথাও বলিল না। বজ্রনীর নিজেবই যে আপনাব প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সেই ঘৃণার যন্ত্রণায় সে মনে করিল, বুঝি ইহার একটি কথাও অজ্ঞান নহে, সে মনে করিল, যে তিরস্কার তাহাকে কবা হইতেছে, সে তিরস্কার বুঝি তাহার যথার্থই পাওয়া উচিত। রজনী কাহাকেও কিছু বলিল না, একবার কান্দিলও না, এ কয়দিন তাহার মুখশ্রী অতিশয় গভীর—

অতিশয় শাস্ত—যেন মনে মনে কি একটি সংকল্প কবিযাচ্ছে, মনে মনে কি একটি প্রতিজ্ঞা বাঁধিয়াছে। এই দুই মাস হইল মহেন্দ্র বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, এই দুই মাস ধরিয়া রজনী যেন কি একটা ভাবিতেছিল, এতদিনে সে ভাবনা যেন শেষ হইল, তাই রজনীব মুখ অতি গম্ভীর, অতি শাস্ত দেখাইতেছে।

সন্ধ্যা হইলে ধীরে ধীরে সে মোহিনীব বাড়িতে গেল। মোহিনীর সহিত দেখা হইল, খতমত খাইয়া দাঁড়াইল, যেন কি কথা বলিতে গিয়াছিল, বলিতে পারিল না, বলিতে সাহস করিল না। মোহিনী অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা কবিল, ‘কি রজনী? কি বলিতে আসিয়াছিস?’ রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, ‘দিদি আমাব একটি কথা বাগতে হবে।’ মোহিনী আগ্রহের সঙ্গে কহিল, ‘কি কথা বল?’ রজনী কতবার না বলি না বলি করিয়া অনেক গীড়াপীড়ির পর আস্তে আস্তে কহিল, মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে। কাহাকে লিখিতে হইবে? মহেন্দ্রকে। কি লিখিতে হইবে? না তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসুন; তাঁহাকে আর অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে না। রজনী তাহার দিদিব বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসেব মধ্যাহ্ন। রোজ বাঁঝা কবিতোছে। রাশি রাশি ধূলি উড়াইয়া গ্রামের পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা গরুর গাড়ি মস্তুর গমনে যাইতেছে। দুই এক জন মাত্র পথিক নিভৃত পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। শুদ্ধ মধ্যাহ্নে কেবল একটি গ্রাম্য বাঁশী স্বর শুনা যাইতেছে, বোধ হয় কোন রাখাল মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া বাজাইতেছে।

ককণা সমস্ত বাত চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে। ককণা যে কোন কুটীবে আতিথ্য লইবে, কাহাবো কাছে কোন প্রার্থনা কবিবে সে স্বভাবেরই নয়। কি করিলে কি হইবে, কি বলিতে হয়, কি কহিতে হয়, তাহার কিছু যদি ভাবিয়া পায়। লোক দেখিলে সে ভয়ে আকুল হইয়া পড়ে—এক এক জন কবিয়া পথিক চলিয়া যাইতেছে, ককণার ভয় হইতেছে, এইবার এই

বুঝি আমার কাছে আসিবে, ইহার বুঝি কোন ছরভিসন্ধি আছে। বেলা প্রায় তিন প্রহর হইবে, এখনো পর্য্যন্ত করুণা কিছু আহ্বার কবে নাই। পঞ্চম্রমে, ধূল্য, অনিদ্ৰায়, অনাহারে, ভাবনায় করুণা এক দিনের মধ্যে এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এমন বিষন্ন বিবর্ণ মলিন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে দেখিলে সহসা চিনা যায় না।

ওই এক জন পথিক আসিতেছে, দেখিয়া ভাল মনে হইল না, করুণাব দিকে তাব ভাবি নজর, বিতানুন্দরের মালিনী মাসীব সম্পর্কেব একটা গান ধবিল, কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর রমিকতা করিবার ভাল অবসব নয় বুঝিয়া সেত গান গাইতে গাইতে পিছন ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। আর এক জন আব এক জন আর এক জন এইরূপ একে একে কবিয়া কত পথিক চলিয়া গেল। এ পর্য্যন্ত করুণা ভদ্র পথিক এক জনো দেখিতে পায় নাই—কিন্তু কি সর্বনাশ! ওই একজন প্যান্টলুন চাপ্‌কানধারী আসিতেছে, অনেক সময়ে ভদ্রলোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থে যেক্রমে ব্যবহৃত হয়) যত ভয় হয় এত আর কাহাদেরো নয়। ওই দেখ করুণা যে গাছের তলায় বসিয়াছিল সেই দিকেই আসিতেছে, করুণা ত ভয়ে আকুল, মাটির দিকে চাহিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। পথিকটি ত বলা নয় কথা নয়, অতি শাস্ত ভাবে আসিয়া সেই গাছের তলাটিতে আসিয়া বসিল কেন? বসিতে কি আর জায়গা ছিল না, পথের ধারে কি আর গাছ ছিল না? পথিকটি স্বরূপ বাবু। স্বরূপ বাবুর জীলোকদিগেব প্রতি যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহারই আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া গাছের তলায় আসিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি জানিতেন না যে করুণাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন করুণাকে দেখিলেন, চিনিলেন। তখন তাঁহার বিশ্বাসের ও আনন্দের অবধি বহিল না। করুণা দেখে নাই, পথিকটি কে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে যাইবে মনে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। কিছুক্ষণ ত বিশ্বাস ও আনন্দের তোড় সামলাইতে গেল, তার পর স্বরূপ অতি মধুব গদ গদ স্বরে কহিলেন “করুণা”। করুণা এই সম্বোধন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, পথিকের দিকে চাহিল—

দেখিল স্বরূপ বাবু! তাহার চেয়ে একটা সাপ যদি দেখিত করুণা কম ভয় পাইত। করুণা কিছুই উত্তর দিল না। স্বরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল, এ কয় রাত্রি সে করুণার জন্তে কত কষ্ট পাইয়াছিল তাহার সমস্ত বর্ণনা করিল। সেই স্থখ-রাত্রে তাহাদের প্রেমালাপের যখন সবে স্ত্রপাত হইয়াছিল, এমন সময়ে ভদ্র হওয়ার্তে অনেক দুঃখ করিল, সে অতি হতভাগ্য, বিধাতা তাহাকে চির জীবন দুঃখী করিবার জন্তই বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কোন আশাই সফল হয় না। অবশেষে, করুণা নরেন্দ্রের বাড়ি হইতে যে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা লইয়া অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল—কহিল, আরো ভালই হইয়াছে, তাহাদের দুই জনের যে প্রেম যে স্বর্গীয় প্রেম, তাহা নিম্নটকে ভোগ করিতে পারিবে আরো এমন অনেক কথা বলিল, তাহা যদি লিখিয়া লওয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক বড় বড় নভেলের রাজপুত, ক্ষত্রিয়, বা অগ্ন্যাগ্ন মহা মহা নায়কের মুখে স্বচ্ছন্দে বলা যাইত, কিন্তু করুণা তাহার রসাস্বাদন কবিত্তে পারে নাই।

স্বরূপ এলাহাবাদে-যাইবে, তাই ষ্টেশনে যাইতেছিল পথের মধ্যে এই সকল ঘটনা। স্বরূপ প্রস্তাব করিল, করুণা তাহার সঙ্গে পশ্চিমে চলুক তাহা হইলে আর কোন ভাবনা ভাবিতে হবে না। করুণা কাল রাত্রি হইতে ভাবিতে ছিল, কোথায় যাইবে—কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় নাই—আজিকার দিন ত প্রায় যায় যায়, রাত্রি আসিবে তখন কি করিবে, কত প্রকার লোক পথ দিয়া যাওয়া আসা করিতেছে, এই সকল নানান ভাবনার সময় এ প্রস্তাবটা করুণার মন্দ লাগিল না। ছেলে বেলা হইতে যে চিরকাল গৃহের বাহিবে কখনো যায় নাই সে এই অনাবৃত পৃথিবীর দৃষ্টি কি করিয়া সহিবে বল? সে একটা আশ্রয় পাইলে, লোকের চোখের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে। তার মনে হইতেছে যেন সকলেই তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া আছে। তাহা ছাড়া করুণা এমন শ্রান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, যে আব সে সহিতে পারে না। একবার মনে করিল স্বরূপের প্রস্তাবে নাথ দিয়া যাইবে। কিন্তু স্বরূপের উপর তাহাব এমন একটা ভয় আছে, যে পা আর উঠিতে চায় না।

করুণা ভাবিল এই গাছের তলায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকি, না খাইয়া না দাইয়া মরিয়া যাইব। কিন্তু রক্ত মাংসের শরীবে কত সহিবে বল—এ ভাবনা আর বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। স্বরূপের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সন্ধ্যা হইল। করুণা ও স্বরূপ এখন ট্রেনের মধ্যে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপ ও করুণা কাশীতে আছে। করুণার দুর্বস্থা বলিবার নহে। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া সে যে কি অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে; তাহা সেই জানে। স্বরূপের ভ্রম অনেক দিন হইল ভাদিয়াছে; এখন বুঝিয়াছে করুণা তাহাকে ভাল বাসে না। সে ভাবিতেছে—একি উপাত্ত—এত কবিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া মিলাম—সকলি ব্যর্থ হইল? সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। সে মনে করিয়াছিল, এত দিন কবিতায় যাহা লিখিয়া আসিয়াছে, কল্পনায় চিত্র করিয়াছে, আজ সেই প্রেমের স্থখ উপভোগ করিবে, কিন্তু সে কাছে আসিলে করুণা ভয়ে জড়নড় আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া যায়, তাহার সঙ্গে কথাই কহে না। স্বরূপ ভাবিল “একি উপাত্ত, এ গলগ্রহ বিদায় করিতে পারিলে যে বাঁচি!” ভাবিল, দিন কতক কাছে থাকিতে থাকিতেই ভালবাসা হইবে। স্বরূপ ত তাহার যথাসাধ্য করিল, কিন্তু করুণার ভালবাসার কোন চিহ্ন দেখিল না। করুণা বেচাবীর ত আরাম বিশ্রাম নাই। এক ত সর্বক্ষণ পরের বাড়ীতে, অচেনা পুরুষের সঙ্গে আছি বলিয়া সর্বদাই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে। তা ছাড়া স্বরূপেব ভাব গতিক দেখিয়া সেত ভয়ে আকুল—সে কাছে বলিয়া গান গায়, কবিতা শুনাইতে থাকে, মনের দুঃখ নিবেদন করে—অবশেষে মহারুদ্ধ ভাবে গাড়িভাড়ার টাকাব জন্ত নাগিল করিবে বলিয়া শাঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণা যে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না—ভয়ে বেচারী সারা হইতেছে। স্বরূপ রাত দিন খিটু খিটু করে, এমন কি করুণাকে মাঝে মাঝে ধমকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণার কিছু বলিবার মুখ নাই, সে শুধু কাঁদিতে থাকে। এইরূপে কত দিন যায়—স্বরূপের এলাহাবাদে যাইবার সময় হইয়াছে। সে ভাবিতেছে

“এখন করুণাকে লইয়া কি করি। এইখানে কি ফেলিয়া যাইব? না এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম, এত দিন রাখিলাম, অবশেষে কি ফেলিয়া যাইব? আরো দিন কতক দেখা যাক।” অনেক ভাবিয়া মাঝিয়া করুণাকে ত ডাকিল। করুণা ভাবিল, “যাইব কি না? কিন্তু না যাইয়াই বা কি করি? এখানে কোথায় থাকিব? এত দূর দেশে অচেনা জায়গায় কার কাছে যাইব? দেশে থাকিতাম তবু কথা থাকিত।” করুণা চলিল। উভয়ে টেনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ি ছাড়িতে এখনো দেরী আছে। জিনিষ পত্র পুটুলি বোঁচকা লইয়া যাত্রীগণ মহা কোলাহল করিতেছে। কানে কলম গোঁজা রেলোয়ে ক্লকগণ ভারি উঁচু চালে ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ফব্ ফব্ করিয়া বেড়াইতেছেন। পান সোডাওয়াটার নানা প্রকার মিষ্টানের বোঝা লইয়া ফেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপ ত অবস্থা। এমন সময়ে এক জন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেক্ষে আসিয়া বসিল। করুণা উঠিয়া যাইবে যাইবে করিতেছে। এমন সময়ে তাহার পার্শ্বস্থ পুরুষ বিস্ময়ের স্বরে কহিয়া উঠিল—“মা তুমি যে এখানে?” করুণা পণ্ডিত মহাশয়ের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অনেক ক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না, অনেক ক্ষণ নির্জল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—“সার্কভৌম মহাশয়, আমার ভাগ্যে কি ছিল?” পণ্ডিত মহাশয় ত আর অশ্রু সঞ্চরণ করিতে পারেন না। গদগদ স্বরে কহিলেন—“মা যাহা হইবার তাহা হইয়াছে তাহার জন্ত আর ভাবিও না—আমি প্রয়াগে যাইতেছি আমার সঙ্গে আইস—পৃথিবীতে আর আমার কেহই নাই, যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছি, তত দিন আমার কাছে থাক, তত দিন আর তোমার কোন ভাবনা নাই।” করুণা অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে নিধি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধি পণ্ডিত মহাশয়ের খবরে কাশী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় তজ্জন্ত নিধির কাছে অত্যন্ত রুতজ্ঞ আছেন তিনি বলেন, নিধির ঋণ তিনি এজ্ঞে শোধ করিতে পারিবেন না। করুণাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল। কহিল—“ভট্টাচার্য্য মশায় একটা কথা আছে।”

পণ্ডিত মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া গেলেন। নিধি কহিল—“ঐ বাবুটিকে দেখিতেছেন?” পণ্ডিত মহাশয় চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন স্বরূপ। নিধি কহিল “দেখিলেন—করুণার ব্যবহারটা একবার দেখিলেন—ছি-ছি, স্বর্গীয় কর্তার নামটা একেবারে ডুবাঁইল?” পণ্ডিত মহাশয় অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—অবশেষে হাত উল্টাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,

“জিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্ত ভাগ্যং

দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ”

নিধি কহিল “আহা নরেন্দ্র এমন ভাল লোক ছিল। ওই বাবুসাহী ত তাহাকে মষ্ট কবিয়াছে।” নরেন্দ্র যে ভাললোক ছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের মংশয় ছিল না, এখন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহারো প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু এতক্ষণে কেন যে খাবাপ হইয়া গিয়াছে তাহার কারণটা জানিতে পারিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের জীজ্ঞাসিত উপর দারুণ ঘণা জন্মাইল। পণ্ডিত মহাশয় ভাবিলেন—“আর না—জীলোকেই তাঁহাব সর্বনাশ কবিয়াছে—জীজ্ঞাসিকে আর বিশ্বাস করিবেন না।” নিধি লাল হইয়া কহিল—“দেখুন দেখি মহাশয়—পাপাচরণ করিবার আর কি স্থান নাই?—এই কাশীতে?” একথা পণ্ডিত মহাশয় এতক্ষণ ভাবেন নাই—শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে অবাক হইয়া নিধির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—ভাবিলেন—“সত্যই ত!” একটা ঘণ্টা বাজিল মহা ছুটীছুটি চোঁচামেচি পড়িয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় বেক্ষেব কাছে বোঁচকা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন তাড়াতাড়ি লইতে গেলেন—এমন সময় স্বরূপ তাড়াতাড়ি করুণাকে ডাকিতে আসিল—পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া সট কবিয়া সরিয়া পড়িল। করুণা কাতর স্বরে পণ্ডিত মহাশয়কে কহিল “সার্কভৌম মহাশয়, আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না।” পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—“মা—অনেক প্রতাবণা সহিয়াছি—মনে করিয়াছি, বৃদ্ধবয়সে আর কোন দিকে মন দিব না—দেবসুেবায় কএকটি দিন কাটাইয়া দিব।” করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিত মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল—কহিল—“আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না।” পণ্ডিত মহাশয়ের নেত্রে অশ্রু পূরিয়া আসিল—ভাবিলেন—“যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে—ইহাকে ত ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।” নিধি

ছুটিয়া আসিয়া মহা একটা ধমক দিয়া কহিল—“এখানে ই করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কি হইবে? গাড়ি যে চলিয়া যায়।” এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হাত ধরিয়া হড হড করিয়া টানিয়া একটা গাড়ির মধ্যে পুরিয়া দিল। করুণা অঙ্ককার দেখিতে লাগিল—মাথা ঘুরিয়া মুখ চক্ষু বিবর্ণ হইয়া সেইখানে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। স্বরূপেব দেখা সাক্ষাৎ নাই, সে গোলেমাতে অনেকক্ষণ হইল গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় অঙ্কুরের ভাণ্ডে আর্জনাৎ করিয়া লৌহময় গজ হন হন করিয়া অগ্রসর হইল। ট্রেনে আর বড় লোক নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে মহেন্দ্রের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাইয়াছিলাম,—তাহার একখানি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

ভাই!—যে কষ্টে, যে লজ্জায়, যে আত্মগ্লানি বশুণায় পাগল হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিলাম, তাহা তোমার কাছে গোপন কবি নাই, সেই আধার বাত্রে বিজয় পথ দিয়া যখন যাইতে ছিলাম—কোন কারণ নাই—কোন উদ্দেশ্য নাই—কোন গম্য স্থান নাই—তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই—মনে করিয়াছিলাম এ পথের যেন অন্ত নাট, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চির-জীবন চলিতে হইবে—চলিয়া—চলিয়া চলিয়া তবু পথ ফুরাইবে না—রাজি পোহাইবে না। মনের ভিতর কেমন এক প্রকার ঔদাস্যের অঙ্ককার বিরাজ করিতেছিল তাহা বলিবার নহে। কিন্তু রাত্রের অঙ্ককার যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, দিনেব কোলাহল যতই জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল ততই আমার মনের আবেগ কমিয়া আসিল। তখন ভাল করিয়া সমস্ত ভাবিবার সময় আসিল। কিন্তু তখনো দেখে ফিরিবার জন্ত এক তিলও ইচ্ছা হয় নি। কত দেশ দেখিলাম—কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম—কত দিন কত মাস চলিয়া গেল, কিন্তু কি দেখিলাম কি করিলাম, কিছু যদি মনে আছে! চোকের উপর কত পর্বত, নদী, অবণ্য, মন্দির, অট্টালিকা, গ্রাম উঠিত কিন্তু সে সকল যেন কি; কিছুই নয়। যেন স্বপ্নের মত যেন

মায়াব মত যেন মেঘেব পর্বত অরণ্যের মত। চোখের উপর পড়িত তাই দেখিতাম, আর কিছুই নহে। এই রূপ করিয়া যে কত দিন গেল তাহা বলিতে পারি না—আমাব মনে হইয়াছিল এক বৎসর হইবে—কিন্তু পরে গণনা করিয়া দেখিলাম চাব মাস। ক্রমে ক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন ভবিষ্যত ও অতীত ভাবিবাব অবসর পাইলাম। আমি এখন লাহোবে আসিয়াছি। এখানকার একজন বান্ধালী বাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম, ও অল্প অল্প করিয়া ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার মনদ আয় হইতেছে না, কিন্তু আয়ের জন্ত ভাবি না ভাই, আমার ক্ষম্যে যে নূতন মনস্তাপ উত্থিত হইয়াছে তাহাতে যে আমাকে কি অস্থির করিয়া তুলিয়াছে বলিতে পারি না। আমার নিজের উপর যে কি ঘৃণা হইয়াছে তাহা কি করিয়া প্রকাশ করিব? যখন ঘেষে ছিলাম তখন রজনীর জন্তে একদিনো ভাবি নাই—যখন দেশ ছাড়িয়া আসিলাম তখনো এক মুহূর্তের জন্ত রজনীর ভাবনা মনে উদ্ভিত হয় নাই—কিন্তু দেশ হইতে যত দূরে গিয়াছি, যত দিন চলিয়া গিয়াছে, হতভাগিনী বঙ্গনীব কথা ততই মনে পড়িয়াছে, আপনাকে ততই মনে পড়িয়াছে—আপনাকে ততই নিষ্ঠুর পিশাচ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমাব ইচ্ছা কবে এখনি দেশে ফিরিয়া যাই তাহাকে যত্ন করি—তাহাকে ভালবাসি—তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবি। সে হয়ত এতদিনে আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছে। আমি তাহার কাছে কি বলিয়া দাঁড়াইব? না ভাই আমি তাহা পাবিব না। * * *

মহেন্দ্র।”

আমি দেখিতেছি, যে সকল বাহ কারণে মহেন্দ্রের রজনীর উপর বিরাগ ছিল, সে সকল কারণ হইতে দূরে থাকিয়া মহেন্দ্র একটু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। যতই তাহাব আপনাব নিষ্ঠুরাচরণ মনে উদ্ভিত হইয়াছে—ততই রজনীর উপর মমতা তাহাব দৃঢ়মূল হইয়াছে। মহেন্দ্র এখন ভাবিয়াই পাইতেছে না তাহাকে কেন ভালবাসে নাই—এমন মৃদু, কোমল, স্নিগ্ধ-স্বভাব, তাহাকে ভাল বাসে না এমন পিশাচ আছে? কেন, তাহাকে দেখিতেই বা কি মন্দ? মন্দ? কেন এমন স্বন্দর স্নেহপূর্ণ চক্ষু!

অমন কোমল ভাব-ব্যঞ্জক মুখশ্রী! ভাব লইয়া কপ, না বর্ণ লইয়া? রজনীর যাহা কিছু ভাল তাহাই মহেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার যাহা কিছু মন্দ তাহাও মহেন্দ্র ভাল বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে রজনীকে যতই ভাল বলিয়া বুঝিল—আপনাকে ততই পিশাচ বলিয়া মনে হইল।

মহেন্দ্রের সেখানে বিলক্ষণ পশাব হইয়াছে। মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জন করিত। কিন্তু প্রায় সমস্তই রজনীর কাছে পাঠাইয়া দিত, নিজেব জন্ম এত অল্প টাকা রাখিয়া দিত যে আমি ভাবিয়া পাই না, কি কবিয়া তাহার খরচ চলিত।

অনেক দিন হইয়া গেছে মহেন্দ্রের বাড়ি আসিতে বড়ই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সকল কথা মনে উঠিলে আব ফিরিয়া আসিতে পা সরে না। মহেন্দ্র একটা চিঠি পাইয়াছে, পাইয়া অবধি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই মোহিনীর চিঠি। চিঠির শেষ ভাগে লিখা আছে—“আপনি যদি রজনীকে নিতান্তই দেখিতে না পারেন— যদি রজনী এখানে আছে বলিয়া আপনি নিতান্তই আশিতে না চান—তবে আপনার আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই, সে তাহাব দিদির বাড়ি চলিয়া যাইবে। রজনী লিখিতে জানে না বলিয়া আমি তাহার হইয়া লিখিয়া দিলাম। সে লিখিতে জানিলেও হয়ত আপনাকে লিখিতে সাহস করিত না।”

ইহাব যুহু তিরস্কার মহেন্দ্রের মর্মেব মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে, সে স্থির কবিয়াছে, দেশে ফিরিয়া যাইবে।

রজনীর শরীর দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে—মুখ বিবর্ণ ও বিষন্নতর হইতেছে। এক দিন সন্ধ্যাবেলা সে মোহিনীর গলা ধরিয়া বলিল, “দিদি—আর আমি বেশীদিন বাঁচিব না।” মোহিনী কহিল “সেকি রজনী, ওকথা বলিতে নাই।” বজনী বলিল “হাঁ দিদি আমি জানি, আব আমি বেশী দিন বাঁচিব না, যদি এর মধ্যে তিনি না আসেন তবে তাঁকে এই টাকাগুলি দিও।

তিনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন কিন্তু আমার খরচ করিবার দরকার হয় নাই, সমস্ত জমাইয়া রাখিয়াছি।” মোহিনী অতিশয় স্নেহের সহিত বজনীর মুখ তাহার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল “চুপ কর, ওসব

কথা বলিসনে। মোহিনী অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ কবিয়া মনে মনে কহিল “মা ভগবতি, আমি যদি এব দুঃখের কারণ হোষে থাকি তবে আমাব তাতে কোন দোষ নাই।”

হাত অবসর পাইলেই রজনীব শাশুড়ি রজনীকে লইয়া পড়িতেন—নানা জন্তুর সহিত তাহার রূপের তুলনা কবিতেন, আর বলিতেন যে বিবাহেব সম্বন্ধ হওয়া অবধিই তিনি জানিতেন যে এই রূপ একটা দুর্ঘটনা হইবে, তবে জানিয়া শুনিয়া কেন যে বিবাহ দিলেন সে কথা উত্থাপন করিতেন না। রজনী না থাকিলে মহেন্দ্র-বিয়োগে তাঁহার মাতার অধিকতর কষ্ট হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই, এই যে মাঝে মাঝে মন খুলিয়া তিরস্কার করিতে পান, ইহাতে তাঁহাব মন অনেকটা ভাল আছে। মহেন্দ্রের মাতার স্বভাব যতদূর জানি তাহাতে ত এক এক বার আমার মনে হয়—এই যে তিরস্কার করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় মহেন্দ্রের বিয়োগও তিনি ভাগ্য বলিয়া মানেন। মহেন্দ্রের অবস্থান-কালে, রজনী যে দিন কোন দোষ না করিত, সে দিন মহেন্দ্রের মাতা মহা মুক্তিলে পড়িয়া যাইতেন। অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া দুই বৎসরের পুরাণো কথা লইয়া তাহার মুখেব কাছে হাত নাড়িয়া আসিতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহাব তিরস্কারের ভাণ্ডার সর্বদাই মজুত রহিয়াছে, অবসর পাইলেই হয়। ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের মা মহেন্দ্রকে এক লোভনীয় পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার “বাবাকে” তিনি নিশ্চিন্ত হইতে কহিয়াছেন, ও সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্মে একটি সুন্দরী কন্যা অল্পসন্ধান করা যাইতেছে। এই চিঠি পাইয়া মহেন্দ্রের আপনার উপর দ্বিগুণ লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে। “তবে সকলেই মনে করিয়াছে আমি কপের কান্দাল? রজনী দেখিতে ভাল নয় বলিয়াই আমি তাহার উপব নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি? লোকের কাছে মুখ দেখাইব কোন্ লজ্জায়?” কিন্তু বজনীর আজ কাল অল্প তিরস্কারই অত্যন্ত মনে লাগে, আগেকার অপেক্ষাও সে কেমন ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর যতই খারাপ হইতেছে ততই সে ভয়ে ভ্রস্ত ও তিরস্কারে অধিকতর ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে।

ক্রমাগত তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে সত্য সত্যই দোষী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। মোহিনী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাহার কাছে আসিত—প্রত্যহ তাহাকে ষথাসাধ্য ষড়্ধ করিত ও প্রত্যহ দেখিত সে দিনে দিনে অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। এক দিন রজনী সংবাদ পাইল, মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। আফ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কিসের আফ্লাদ? মহেন্দ্র ত তাহাকে সেই ঘণা-চক্ষে দেখিবে। তাহা হউক—কিন্তু তাহার জ্ঞাত মহেন্দ্র যে গৃহ পবিত্র্যাগ কবিয়া বিদেশে কষ্ট পাইতেছে, এ আত্মপ্রাণির ষড়্ধা হইতে অব্যাহতি পাইল—যে কাবণেই হউক মহেন্দ্র যে বিদেশে গিয়া কষ্ট পাইতেছে ইহা রজনীর অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কানীর ষ্টেশনে করুণা-সংক্রান্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, এক জন ভদ্রলোক তাহা সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বরূপকে দেখিয়া তিনি কেমন লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন সকলে চলিয়া গেল এবং করুণা মুচ্ছিত হইয়া পড়িল তখন তিনি তাহাকে একটা গাডিতে তুলিয়া তাহার বাসাবাড়িতে লইয়া যান—তাহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু যাওয়া হইল না। করুণার মুখ দেখিয়া, এমন কে আছে যে তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে? মহেন্দ্রও তাহাকে সন্দেহ করে নাই—বলিতে তুলিয়া গিয়াছিলাম সেই ভদ্রলোকটি মহেন্দ্র। লাহোর হইতে আসিবার সময় একবার কানীতে আসিয়াছিলেন; কলিকাতার ট্রেনের জ্ঞাত অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে। করুণা চেতনা পাইলে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্রের মুখে এমন দয়ার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যে করুণা শীঘ্রই সাহস পাইল। কাদিতে কাদিতে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে কহিল এবং ঠিক সে যেমন করিয়া ভবিকে জিজ্ঞাসা করিত তেমন করিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কবিল, কেন নরেন্দ্র তাহার উপর এমন রাগ করিল? মহেন্দ্র বালিকার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না—কিন্তু এই প্রশ্ন শুনিয়া

তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে মহেন্দ্র বেশ চেনে, সে সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিল। পণ্ডিত-মহাশয় যে কেন তাহাকে এমন করিয়া ফেলিয়া গেলেন তাহাও করুণা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অনেক ক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাও মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেন্দ্র তাহার ষথার্থ কারণ যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা গোপন করিয়া নানাকপে বুঝাইয়া দিলেন। এখন করুণাকে লইয়া যে কি করিবে মহেন্দ্র তাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল তাহাদের বাড়িতেই লইয়া যাইবে। মহেন্দ্র করুণার নিকট তাহার বাড়ির বর্ণনা করিল—কহিল তাহাদের বাড়ীর সামনেই একটি প্রাচীর দেওয়া বাগান আছে, বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্পবিগী আছে, পুষ্পবিগীর উপরে একটি বাধানো সানের ঘাট, কহিল তাহাদের বাড়িতে গেলে করুণা তাহার একটি দ্বিদি পাইবে, তেমন স্নেহশালিনী—তেমন কোমল-হৃদয়া—তেমন ক্ষমাশীল (আরো অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল) দ্বিদি কেহই কখনো পায় নাই। করুণা অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি ভবির দেখা পাইবে। মহেন্দ্র ভবির সন্ধান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। জিজ্ঞাসা কবিলেন করুণা তাহাকে ভ্রাতার মত দেখিবে কি না, করুণার তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, এত দিন পরে করুণার মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম, এতদিন পরে সে তবু আশ্রয় পাইল। কিন্তু বারবার করুণা মহেন্দ্রকে পণ্ডিত মহাশয়ের তাহার উপবে রাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

অবশেষে তাহারা যাইবার জ্ঞাত প্রস্তুত হইল, কানী পরিত্যাগ করিয়া চলিল, কে কি বলিবে, কে কি করিবে, কখন কি হইবে এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ও যদি কেহ কিছু বলে তবে তাহার কি উত্তর দিবে, যদি কেহ কিছু করে তবে তাহার কি প্রতিবিধান করিবে, যদি কখনো কিছু হয় তবে সে অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিবে, এই সমস্ত ঠিক করিতে করিতে মহেন্দ্র গ্রামেব রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। লজ্জায় স্ত্রিয়মান হইয়া, সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পথিকদিগের চক্ষু এড়াইয়া ও কোন মতে পথ পার হইয়া গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। কতবার সাত পাঁচ করিয়া পরে প্রবেশ করিল। দাদাবাবুকে দেখিয়াই

বি কাটা রাখিয়া ছুটিয়া বড় মাকে খবর দিতে গেল। বডমা তখন রজনীর স্নমুখে বসিয়া বজনীর রূপের ব্যাখ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে খবর পাইলেন যে আব একটি নতুন বধু লইয়া তাঁহার 'বাবা' ঘরে আসিয়াছেন। মহেন্দ্রের ও করুণাব সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল, যখন সকলে মিলিয়া হলু দিবাব উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে করুণা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপাব খুলিয়া বলিল। সে সমস্ত বৃত্তান্ত মহেন্দ্রের মাতার বড ভাল লাগে নাই, মহেন্দ্রের স্নমুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই রাতে মহেন্দ্রের পিতাব সহিত তাঁহার ভারি একটা পরামর্শ হইয়া গিয়াছিল ও অবশেষে রজনী পোড়ারমুখীই যে এই সমস্ত বিপত্তিব কাবণ তাহা অবধারিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথাটা লইয়া মহেন্দ্রের পিতাব অতিরিক্ত আনাড়য়েকের তামাকু ব্যয় হইয়াছিল ও দুই চাবিজন বুদ্ধ বিজ্ঞ প্রতীবাসিনীগের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর অধিক কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই। রজনী তাহার দিদিব বাড়ি ধাইবাব সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহার স্বপ্তর শান্তিডরা এই বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনী বড় দুর্বল বলিয়া এখনো সমাধা হইয়া উঠে নাই। এই খবরটি আসিয়াই মহেন্দ্র তাঁহার মাতার নিকট হইতে গুনিতে পাইলেন, আশ্চর্যের স্বরে কহিলেন, "দিদির বাড়ি ধাইবে, তার অর্থ কি? আমি আসিলাম আর অমনি দিদির বাড়ি ধাইবে?" মহেন্দ্রের মাও অবাক, মহেন্দ্রের পিতা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে ঠুঙ্গি হইতে চসমা বাহির করিয়া পরিলেন এবং মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি মিলাইয়া দেখিতে চান যে এ মহেন্দ্রের সহিত পূর্বকার মহেন্দ্রের কোন আদল আছে কি না, এ মহেন্দ্র বুটা মহেন্দ্র কি না। মহেন্দ্র অধিক বাব্য ব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ রজনীর ঘরে চলিয়া গেলেন ও কর্তা গৃহিণীতে মিলিয়া ফুসফুস করিয়া মহাপরামর্শ করিতে লাগিলেন। রজনী মহেন্দ্রকে দেখিয়া মহা শবব্যস্ত হইয়া পড়িল, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মনে-করিতে লাগিল, মহেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া কি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার তাড়াতাড়ি বলিবার ইচ্ছা হইল, যে, "আমি এখনি ধাইতেছি, আমার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে।" যখন সে এই গোলমালে পড়িয়া কি

কবিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, তখন মহেন্দ্র ধীবে ধীবে তাহাব পার্শ্বে গিয়া বসিল। কি ভাগ্য! বিষন্ন স্ববে জিজ্ঞাসা কবিল, "তুমি নাকি আজই দিদিব বাড়ি ধাবে? কেন বজনি?" আর কি উত্তর দিবার যো আছে? "আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তাহা কি ক্ষমা করিবে না?" ওকি মহেন্দ্র, অমন করিয়া বলিও না, রজনীর বুক ফাটিয়া ধাইতেছে। "বল—তাহা কি ক্ষমা করিবে না?" রজনীর উত্তর দিবাব কি ক্ষমতা আছে? সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিল "একবার বল ক্ষমা কবিলে?" রজনী ভাবিল—সে কি কথা! মহেন্দ্র কেন ক্ষমা চাহিতেছেন? সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, সেই মহেন্দ্রের নিকট অপরাধী, কেন না তাহাব জন্তই মহেন্দ্র এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, গৃহ ত্যাগ করিয়া কত বৎসর বিদেশে কাল যাপন করিয়াছেন, সে কোথায় মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিবে, তাহা না হইয়া একি বিপরীত! ক্ষমা চাহিবে কি? সে নিজেই ক্ষমা চাহিতে সাহস করে নাই, সে কি ক্ষমার যোগ্য? মহেন্দ্র বজনীর দুর্বল মস্তক কোলে তুলিয়া লইল, রজনী ভাবিল এই সময়ে যদি মরি তবে কি স্নুখে মবি। তাহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের ক্রোড তাহার নিকট যেন ভিখাবীর নিকট সিংহাসন।

মহেন্দ্র তাহাকে কত কি কথা বলিল, সে সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না, সে ভাবিল এ মধুর স্বপ্ন চিরস্থায়ী নহে—এই মুহূর্ত্তে মবিতে পারিলে কি স্নুখী হই। কিন্তু এ অবস্থা কতক্ষণ রহিবে? বজনীর এ সঙ্কোচ শীঘ্র দূর হইল। রজনী তাহার কোলে মাথা রাখিয়া কতক্ষণ কত কি কথা কহিল—কত অশ্রুজল কত কথা কত হাসি—সে বলিবাব নহে। মহেন্দ্র যখন উঠিয়া ধাইতে চাহিল তখন রজনী তাহাকে আর একটু বসিয়া থাকিতে অহরোধ করিল, যাহা আর কখনো কবিতে সাহস করে নাই। রজনীর একি পরিবর্তন? যে স্নুখ সে কখন আশা কবে নাই, আপনাকে যে স্নুখ পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, সেই স্নুখ সহসা পাইয়াছে, আক্লাদে তাহার বুক ফাটিয়া ধাইতেছিল—সে কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল

না। সেই সন্ধ্যাবেলাই সে মোহিনীর বাড়িতে গেল, তাড়াতাড়ি তাহাব গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাদিতে বসিল, মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল “কেন রজনী, কি হোয়েছে?” সে মনে করিল মহেন্দ্র না জানি আবার কি অত্যাচারণ করিয়াছে। রজনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল—শুনিয়া মোহিনীও আহ্লাদে কাদিতে লাগিল। বজ্রনীর দুই এক মাসের মধ্যে যে কোন ব্যাধি বা দুর্বলতা হইয়াছিল তাহাব কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কখনো রজনীর ঘরকন্নার কাজে এত উৎসাহ কেহ দেখে নাই—শাণ্ডি মহা উগ্রভাবে কহিলেন “হোয়েছে, হোয়েছে ঢের হোয়েছে, আর গিম্পিনা কোরে কাজ নেই, দুদিন উপোস করে আছেন, সবে আজ ভাত খেয়েছেন, ওঁর গিম্পিনা দেখে আব বাঁচিলে।” এই থানে একটা কথা বলা আবশ্যক—রজনী যে দুদিন উপোস করিয়াছিল সে দুদিন কাজ কবিতো পারেনি বলিয়া তাহাব শাণ্ডি মহা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে যখন রজনীর দোষের অভাব পড়িবে সেই দুই দিনের কথা লইয়া আবার বক্তৃতা যে দিবেন ইহাও নিশ্চিত—এবিষয়ে কোন পাঠকের সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

দেখিতে দেখিতে করুণার সহিত রজনীর মহা ভাব হইয়া গেল। দুই জনেব ফুস ফুস করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল—তাহাদেব কথা আর ফুরায় না। তাহাদেব স্বামীদের কত দিনকার সামান্য যত্ন, সামান্য আদরটুকু তাহারা মনেব মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে, তাহাই কত মহান ঘটনাব মত বলাবলি করিত, কিন্তু এবিষয়ে ত দুই জনেরি ভাণ্ডার অতি সামান্য, তবে কিষে কথা হইত তাহারাই জানে। হয়ত সে সব কথা লিখিলে পাঠকেরা তাহার গাভীর্ঘ্য বুঝিতে পারিবেন না, হয়ত হাসিবেন হয়ত মনে করিবেন এসব কোন কাজেরি কথা নয়—কিন্তু সে বালিকারা যে সকল কথা লইয়া অতি গুপ্ত ভাবে, অতি সাবধানে আন্দোলন করিয়াছে, তাহাই লইয়া যে সকলে হাসিবে—সকল কথা তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিবে তাহা মনে করিলে কষ্ট হয়। কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পাবিয়া উঠে না, সে এক কথা সাতবার করিয়া বলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেষ্টা করিয়া, কোন কথাই ভাল করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া রজনীর এক প্রকার

মুখ বন্ধ কবিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কথা ফুবায নাই ত কেমন ক’বে সে বজ্রনীর কথা শুনিবে। তাহার কি একটা আধটা কথা, তাহার পাখীর কথা, তাহার ভবিষ্যৎ কথা, তাহার কাঠবিড়ালীর গল্প—সে কবে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল—তাহাব পিতাব নিকট দুই রাজার কি গল্প শুনিয়াছিল, এসমস্ত কথা তাহাব বলা আবশ্যক। আবার বলিতে বলিতে যখন হাসি পাইত, তখন তাহাই বা থামায় কে? আব, কেন যে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝে কাহার সাধ্য? রজনী বেচাবাব বড় বেশী কথা বলিবাব ছিল না, কিন্তু বেশী কথা নীরবে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। বজ্রনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক এক সময়ে অগ্রমনস্ক হইত বটে, তা, তাহাতে করুণাব কি ক্ষতি? করুণার বলা লইয়া বিষয়। করুণাকে লইয়া মহেন্দ্রের মাতা বড় ভাবিত আছেন। তাহাব বয়স বড় কম নহে, পঞ্চাশ বৎসর, এই পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি ভ্রলোকের ঘরে এমন বেহায়া মেয়ে কখনো দেখেন নাই, আবার তাহার প্রতিবেশিনীর। তাহাদের বাপেব বয়সেও এমন মেয়ে কখনো দেখে নাই বলিয়া স্পষ্ট স্বীকাব করিয়া গেল। মহেন্দ্রের পিতা তামাকু খাইতে খাইতে কহিতেন যে, ছেলে মেয়েরা সবাই খুঁটান হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের মাতা কহিতেন “সে কথা মিছা নয়।” মহেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে বজ্রনীকে নবোদ্বোধন করিয়া করুণার দিকে কটাক্ষপাত কবিয়া কহিতেন “আজ বাগানে বড় গলা বাহিব করা হইতেছিল! লজ্জা করে না।” কিন্তু তাহাতে করুণা কিছুই সাবধান হয় নাই। কিন্তু এ ত করুণার শাস্ত অবস্থা, করুণা যখন মনের স্বপ্নে তাহার পিতৃভবনে থাকিত, তখন যদি এই পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞ গৃহিণী তাহাকে দেখিতেন তবে কি করিতেন বলিতে পারি না। আবার এক একবার যখন বিষন্ন ভাব করুণার মনে আসিত, তখন তাহার মূর্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, হাসি নাই, গল্প নাই, সে এক জায়গায় চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবে—রজনী পাশে বসিয়া “লক্ষ্মী দিদি আমার” বলিয়া কত সাধাসাধি কবিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষন্ন হইত, কতক্ষণ ধরিয়া কাদিয়া কাদিয়া তবে সে শান্ত হইত। একদিন

কাদিতে কাদিতে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, “নরেন্দ্র কোথায়?” মহেন্দ্র কহিল “আমি ত জানি না।” করুণা কহিল, “কেন জান না?” কেন জানে না সে কথা মহেন্দ্র ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না, তবে নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে স্বীকাব করিল। কিন্তু নরেন্দ্রের অধিক সন্ধান করিতে হইল না। নরেন্দ্র কেমন কবিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছে। এক দিন করুণা যখন বজ্রনীর নিকট দুই বাজার গল্প করিতে ভারি ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একখানি চিঠি আসিল। এপর্যন্তও তাহার বয়সে সে কখনো নিজের নামেব চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণাব মহা আশ্চর্য হইল, সে জানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজাবাজডাদেবই অধিকার। আস্ত চিঠি ছিঁড়িয়া খুলিতে তাহার কেমন মায়া হইতে লাগিল, আগে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিচ্ছার সহিত লেফাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া তাহার মুখ শুখাইয়া গেল, থর থর কবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল। নরেন্দ্র লিখিতেছেন—“তিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্বনাশ; না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।” করুণা কাদিয়া উঠিল। করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল “কি হবে?” মহেন্দ্র কহিল কোন ভাবনা নাই, এখন টাকা লইয়া সে যাইতেছে। নরেন্দ্রের ঠিকানা চিঠিতে লিখা ছিল, সেই ঠিকানা উদ্দেশে মহেন্দ্র চলিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র দেশে আসিয়া অবশি মোহিনীর বড় খোঁজ খপর পাওয়া যায় না। মহেন্দ্র ত তাহার কোন কাবণ খুঁজিয়া পায় না,—এক দিন কি অপরাধ করিয়াছিলাম তাহার জ্ঞাত কি দুই জনেব একজনের মত ছাড়াছাড়ি হইবে? সে মনে করিল হয় ত মোহিনী রাগ করিয়াছে—হয়ত মোহিনী তাহাকে ভাল বাসে না। পাঠকেবা শুনিলে বোধ হয় সন্দেহ হইবেন না যে, মহেন্দ্র এখনো মোহিনীকে ভাল বাসে। কিন্তু মহেন্দ্রের সে ভালবাসাব পক্ষে যে যুক্তি কত, তাহা শুনিলে কাহাবো আর কথা কহিবাব যো থাকিবে না। সে বলে মাহুষকে ভালবাসিতে দোষ কি? আমি ত মোহিনীকে তেমন

ভাল বাসি না, আমি তাহাকে ভগিনীর মত, বন্ধুর মত ভাল বাসি—আমি কখনো তাব অধিক তাহাকে ভাল বাসি না—এই কথা এত বিশেষ করিয়া ও এত বার বার বলিত যে তাহাতেই বুঝা যাইত তদপেক্ষাও অধিক ভাল বাসে—সে আপনার মনকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিত, স্তব্ধতাং ঐ এক কথা তাহাকে বার বার বিশেষ করিয়া বলিতে হইত, ঐ এক কথা বার বার বলিয়া তাহার মনকে বিশ্বাস করাইতে চাহিত, তাহার মন এক এক বার অল্প অল্প বিশ্বাস করিত। সে বলিত আপনার ভগিনীর মত বন্ধুব মত যদি মোহিনী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তাহাতে দোষ কি? বরং না আসিলেই দোষ।—কেন, মোহিনী ত আর সকলের সঙ্গেই দেখা করিতে পাবে, তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না কেন? যেন সত্য সত্যই আমাদের মধ্যে কোন সমাজ বিরুদ্ধ ভাব আছে—কিন্তু তাহা ত নাই—নিশ্চয় তাহা নাই—তাহা থাকা অসম্ভব। আমি রজনীকে প্রেমের ভাবে ভাল বাসি—সকলের অপেক্ষা ভাল বাসি—আমি মোহিনীকে কেবল ভগিনীর মত ভাল বাসি। মহেন্দ্র এই রূপে সকল কথা মনের মধ্যে তোলা পাড়া করিত। এমন কি, রজনীকেও তাহাব এই সকল যুক্তি বুঝাইয়াছিল, রজনীর বুঝিতে কিছুই গোল বাধে নাই, সে বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। সে নিজে গিয়া মোহিনীকে ঐ সমস্ত কথা বুঝাইল, মোহিনী বিশেষ কিছুই উত্তর দিল না। মনে মনে কহিল “সকলের মন জানি না, কিন্তু আমার নিজের মনের উপর আমার বিশ্বাস নাই।” মোহিনী ভাবিল, আর না, আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে। মোহিনী কাশী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিল, বাড়িব লোকেরা তাহাতে অসম্মত হইল না।

কাশী যাইবার সময় করুণা ও রজনীর সহিত এক বাব দেখা করিল। করুণা কহিল “তুমি কাশী যাইতেছ, যদি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় তবে তাহাকে বলিও আমি ভাল আছি।” করুণা জানিত যে, পণ্ডিত মহাশয় নিশ্চয় তাহার কুশল সংবাদ পাইবার জন্ত আকুল আছেন, করুণা যাহা মনে কবিয়াছিল তাহা যথার্থ নহে। নিধিব পীড়াপীড়িতে রেলের গাড়িতে চড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়ের এমন অসুস্থতা হইয়াছিল যে

অনেক বার তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ি থামাইতে অহুরোধ করিয়াছিলেন, “গাঁড়োয়ান” যখন কিছুতেই ব্রাহ্মণের দোহাই মানিল না, তখন তিনি ক্ষান্ত হন। কিন্তু বার বার কাতর স্বরে নিধিকে বলিতে লাগিলেন “কাজটা ভাল হইল না।” দুই চার বাব এই রূপ বলিতেই নিধি মহা বিরক্ত হইয়া বিলক্ষণ একটি ধমক দিয়া উঠিল; পণ্ডিত মহাশয় নিধিকে আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু গাড়ির কোণে বসিয়া এক ডিবা নম্র সমস্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন ও তাঁহার চাদরের এক অংশ অশ্রুজলে সম্পূর্ণরূপ ভিজাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল গাড়িতে নয়, যেখানে গিয়াছেন নিধিকে বার বাব ঐ এক কথা বলিয়া বিরক্ত করিয়াছেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া যখন করুণাকে দেখিতে পাইলেন না তখন তাঁহার আর অহুতাষেব পবিসীমা রহিল না। নিধিকে ঐ এক কথা বলিয়া এমন বিবস্ত্র করিয়া তুলিয়া ছিলেন যে সে এক দিন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সমস্ত উত্তোগ কবিয়াছিল।

মোহিনী কহিল “ভোমাদের পণ্ডিত মহাশয়কে ত আমি চিনি না, যদি চিনা শুনা হয়, তবে বলিব।” করুণা একেবারে অবাক হইয়া গেল, পণ্ডিত মহাশয়কে চিনে না? সে জানিত পণ্ডিত মহাশয়কে সকলেই চিনে—সে মোহিনীকে বিশেষ কবিয়া বুঝাইয়া দিল কোন পণ্ডিত মহাশয়েব কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহাতেও যখন মোহিনী পণ্ডিত মহাশয়কে চিনিলা না তখন করুণা নিরাশ ও অবাক হইয়া গেল। কাদিতে কাদিতে বজ্রমৌর কাছে বিদায় লইয়া মোহিনী কাশী চলিয়া গেল।

চতুর্বিবংগ পল্লিচ্ছেদ

বর্ষা কাল। দুই তিন দিন ধরিয়া বাদলার বিরাম নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার রাস্তায় ছাতির অরণ্য পড়িয়া গিয়াছে। সমস্তোচ পথিকদেব সর্বদা কাদা বর্ষণ কবিত্তে করিতে গাড়ি ছুটিতেছে।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধ্যানে বাহির হইয়াছেন। বড় বাস্তায় গাড়ি দাঁড় কবাইয়া একটি অতি সঙ্গীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুটা একটা খোলার ঘর ভাঙ্গিয়া চুবিয়া পড়িতেছে ও তাহার দুই প্রোচা

অধিবাসিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার বন্দোবস্ত কবিত্তেছে। ভাঙ্গা হাঁড়ি—পচা ভাত আমের আঁটি ও পৃথিবীর আবর্জনা গলির যেখানে সেখানে রাশীকৃত রহিয়াছে।

একটি দুর্গন্ধ পুঙ্খরিণীর তীরে আন্তাবল-বক্ষকের মহিলারা আঁচল ভবিয়া তাঁহাদের আহারের জন্ত উদ্ভিজ্জ সংগ্রহ করিতেছেন। ছ'চট খাইতে খাইতে—কখনো বা একহাঁটু কাদাষ, কখনো বা একহাঁটু ঘোলা জলে জুতা ও পেণ্টলুনটাকে পেন্সন দিবার কল্পনা করিতে করিতে—সর্বদা কাদামাখা দুই চারিটা কুকুরের নিকট হইতে অশ্রান্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতে মহেন্দ্র গোবর আচ্ছাদিত একটি অতি মুমূর্ষু বাটিতে গিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারে আঘাত করিলেন, দীর্ঘ শীর্ণ দ্বাব বিরক্ত রোগীর মত যুহু আর্তনাদ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্তু বৎসর কয়েকের মধ্যে পুলিশের কনষ্টেবল ছাড়া নরেন্দ্রের গৃহে আর কোন অতিথি আসে নাই—এই জন্ত দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্ধান কবিয়াছেন। দ্বার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জনা ও দুর্গন্ধময় এক প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। সে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা কূপ আছে, সে কূপের কাছে কতকগুলো আমের আঁটি হইতে ছোট ছোট চারা উঠিয়াছে। সে কূপের উপরে একটা পেয়ারা গাছ বুকিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সঙ্কচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন নিম্ন ও এমন সৈৎসৈতে ঘর বৃষ্টি মহেন্দ্র আব কখন দেখে নাই, ঘর হইতে এক প্রকার ভিজা ভাপা গন্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টিব আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ভগ্ন জানালায় একটা ছিন্ন দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এককালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরূপ একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এক জায়গায় ইটের মধ্যে একটি গর্তে খানিকটা তামাক গোঁজা আছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি অবিখ্যাস-জনক তক্তা (যদি তাহার প্রাণ থাকিত তবে তাহা ব্যবহার করিলে পশু নৃশংসনিবারিণী সভাষ অনেক টাকা জরিমানা দিতে হইত) তাহার উপরে মললিপ্ত মসৌবর্ণ একখানি মাত্র ও তত্প্রযুক্ত বালিশ ও সর্বোপরি স্বকার্যে অক্ষম দীনহীন একটি মশারি। গৃহে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র একটি দাসীকে

দেখিতে পাইলেন। সে দানীটি তাঁহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মুছ ভৎসনার স্বরে কহিল, “কেম গো বাবু, মাহুবেব গায়েব উপর না পড়িলেই কি নয়?” মহেন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তত দুই হস্ত ব্যবধানে ছিলেন ও তাহার দুর্গন্ধ বস্ত্র ও ভয়জনক মুখশ্রী দেখিয়া আরো দুই হস্ত ব্যবধানে যাইবার সংকল্প করিতেছিলেন—কিন্তু মহেন্দ্রের যে তাহার কাছে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল, ইহা কল্পনা কবিতা সে দানীটি মনে মনে মহা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক এই দানী গিয়া ভীত নরেন্দ্রকে অনেক আশ্বাস দিয়া থাকিয়া আনিল। নরেন্দ্র মহেন্দ্রকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইল না, সে যেন তাঁহারি প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু মহেন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—এমন পরিবর্তন সে আর কাহারো দেখে নাই। অনাবৃত দেহ, অল্পপরিসর জীর্ণ মলিন বস্ত্রে হাঁটু পর্যন্ত আচ্ছাদিত। মুখশ্রী অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, কেশপাশ অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল, সর্বদাই হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ণ এমন মলিন হইয়া গিয়াছে যে আশ্চর্য্য হইতে হয়—তাঁহাকে দেখিলেই কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। নরেন্দ্র অতি শাস্তভাবে মহেন্দ্রকে তাঁহাব নিজের ও তাঁহার সংক্রান্ত সমস্ত লোকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—কাজ কর্ম কিরূপ চলিতেছে তাহাও খোঁজ লইলেন। মহেন্দ্র নরেন্দ্রের এই অতি শাস্তভাবে দেখিয়া অত্যন্ত অবাক হইয়া গিয়াছেন—মহেন্দ্রকে দেখিয়া নরেন্দ্র কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। মহেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া নরেন্দ্রের চিঠিটি তাহার হস্তে দিল, সে অবিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল “হী মশায়—সম্প্রতি অবস্থা মন্দ হওয়াতে কিছু দেনা হইয়াছে, তাই বড় জড়াইয়া পড়িয়াছি।” মহেন্দ্র কহিলেন—“তা আপনাব স্ত্রী নিকট সাহায্য চাহিবার অর্থ কি? উপার্জনের ভার ত আপনার হাতে। আর তিনি অর্থ পাইবেন কোথা?” নির্লজ্জ নরেন্দ্র কহিল—“সে কি কথা? আমি সন্ধান লইয়াছি, আজ কাল সে খুব উপার্জন করিতেছে। দিন কতক স্বরূপ বাবু তাহাকে পালন কবিতা ছিলেন, সুনীলাম আজ কাল আর কোন বাবুর আশ্রয়ে আছে।” মহেন্দ্র ইচ্ছা পূর্বক কথাটি বন্দ অর্থ না লইয়া কিঞ্চিৎ

দৃঢ় স্ববে কহিলেন, “আপনি জানেন তিনি আমার বাটিতেই আছেন।” নরেন্দ্র কহিলেন, “আপনারই বাটিতে? সেত ভালই।” মহেন্দ্র কহিলেন—“কিন্তু তাঁহাব কাছে অর্থ থাকিবার ত কোন সম্ভাবনা নাই।” নরেন্দ্র কহিলেন “তা যদি হয় তবে আমার চিঠির উত্তরে সে কথা লিখিয়া দিলেই হইত।” মহেন্দ্র যেরূপ ভাল মাহুষ, অধিক গোলযোগ করা তাহার কর্ম নয়—বকাবকি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর অন্ত হইবে না জানিয়া মহেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন, নরেন্দ্র যদি তাঁহার কুঅভ্যাসগুলি পবিত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁহাব সাহায্য কবিবেন। নরেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল, কহিল, “কুঅভ্যাস কি মশায়? নূতন কুঅভ্যাস ত আমার কিছুই হয় নাই, আমার যা অভ্যাস আছে সেত আপনি সমস্ত জানেন।” এই কথায় তালমাহুষ মহেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, সে তেমন ভাল উত্তর দিতে পারিল না। নরেন্দ্র পূর্বে এত কথা কহিতে জানিত না, বিশেষ মহেন্দ্রের কাছে কেমন একটু সঙ্কোচ অনুভব কবিত, সম্প্রতি দেখিতেছি সে ভারি কথা কাটাকাটি করিতে শিখিয়াছে। তাহার স্বভাব আশ্চর্য্য বদল হইয়া গিয়াছে! মহেন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র তাহার সহিত স্নানাগার কবিতা লইয়া তাহাকে টাকা দিলেন; ও কহিলেন, ভবিষ্যতে নরেন্দ্র যেন তাঁহার স্ত্রীকে অশ্রদ্ধা ভয় দেখাইয়া চিঠি না লেখেন। মহেন্দ্র সেই আর্দ্র বাষ্পময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন, ও পথের মধ্যে একটা ডাক্তারখানা হইতে এক শিশি কুইনাইন কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। ঘরের নিকট দানীটি বসিয়া ছিল, সে মহেন্দ্রকে দেখিয়া অতি মধুর দুই তিনটি হাস্য ও কটাক্ষ বর্ষণ করিল, ও মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিল, সেই কটাক্ষের প্রভাবে মলয়-সম্মারগে, চন্দ্র-কিরণে মহেন্দ্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ভ্রাজ কাল রজনী ভারি গিগি হইয়াছে। এখন তাহার হাতে টাকা কড়ি আসে। পাজার অধিকাংশ বুদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিণীরা বজনীব শান্তিভির সন্ধ পরিত্যাগ করিয়া শিং ভাদিয়া রজনীর দলে মিশিয়াছেন। তাঁহাবা ঘণ্টাখানেক ধরিয়া বজনীর কাছে দেশের লোকের নিন্দা

করিয়া, উঠিয়া যাইবার সময় হাই তুলিতে তুলিতে পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে আবশ্যক মত টাকাটা সিকিটা ধার করিয়া লইতেন এবং রজনীব স্বামীর, রজনীর উচ্চবংশের, ও চোখের জল মুছিতে মুছিতে রজনীর মৃত লক্ষ্মীস্বভাবা মাতার প্রশংসা কবিতা শীঘ্র সে ধারগুলি শুধিতে না হয়— এমন বন্দোবস্ত কবিতা যাইতেন। কিন্তু এই পিসি-মাসী-শ্রেণীর মধ্যে করুণার দুর্নাম আব ঘুচিল না, ঘুচিবে কিরূপে বল? মাসী যখন সন্তোষজনকরূপে ভূমিকাটি শেষ করিয়া রজনীব কাছে কাজেব কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাত করুণা কোথা হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া রজনীকে টানিয়া লইয়া বাগানে চলিল। মাঝে মাঝে তাঁহা বা করুণার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন “ভূমি কেমন ধারা গা?” সে যে কেমন ধারা, করুণা তাহার কোন হিসাব দিতে চেষ্টা করিত না। কোন পিসির বিশেষ কথা, বিশেষ অঙ্গভঙ্গী বা বিশেষ মুখশ্রী দেখিলে এক এক সময় তাহার এমন হাসি পাইত যে সে, সামলাইয়া উঠা দায় হইত, সে রজনীর গলা ধরিয়া মহা হাসিব কল্লোল তুলিত, বজনী স্বল্প বিব্রত হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া বজনীর গিন্নিগণা দেখিয়া সে এক এক সময়ে হাসিয়া আর বাঁচিত না। -

কিছু দিন হইতে মহেন্দ্র দেখিতেছেন, বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে—করুণার আমোদ আহ্লাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে—হাস্তময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত, সে এক দিনেব জন্ম নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য শূন্য ঠেকিত, কি যেন অভাব বোধ হইত। কয় দিন হইতে করুণা এমন বিষন্ন হইয়া গিয়াছিল, সে এক জায়গায় চূপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাঁদিত, কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। করুণা যখন এই রূপ বিষন্ন হইয়া থাকে, তখন বজনীর বড় কষ্ট হয়—সে বালিকার হাসি আহ্লাদ না দেখিতে পাইলে সমস্ত দিন তাহার কেমন কোন কাজই হয় না। নরেন্দ্রের বাড়ি যাইবে বলিয়া করুণা মহেন্দ্রকে ভারি ধরিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বলিল—সে বাড়ি অনেক দূরে, করুণা বলিল, তা হোক! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়ি বড় খারাপ; করুণা কহিল, তা হোক! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়িতে থাকিবার জায়গা নাই; করুণা

উত্তর দিল তা হোক! সকল আপত্তির বির “তাহোক” শুনিয়া মহেন্দ্র ভাবিলেন, নরেন্দ্রের ভাল বাড়িতে আনাইবেন ও সেইখানে করুণাকে যাইবেন। নরেন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন। বাড়ি দিবাব সময় হইয়াছে বলিয়াই হউক বা মহেন্দ্র বাড়ির ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই নরেন্দ্র সে বাড়ি হইতে উঠিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র বৃথা অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না। এই বার্তা অবধি করুণার আব হাসি নাই, বিশেষ অবস্থায়, সময়ে সহসা এক একটা কথা শুনিলে যেমন বুকে লাগে, করুণার তেমনি আঘাত লাগিয়াছে। এত দিনেও কি করুণার সহিয়া যায় নাই? করুণার উপর কত শত দুর্ভাবহার কবিতা, আ তাহার এক স্বানাস্তর সংবাদ পাইয়াই কি তাহ লাগিল? কে জানে, করুণার বড় লাগিয়াছে হয়, ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া হইয়া তাহ কেমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ এই একা আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। বোধ হয় এবার করুণা বড়ই আশা করিয়াছিল, যে, বুঝি নরেন্দ্রের আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তাহাতে নিবাস। পৃথিবীর সমুদয় বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, হয়ত নিরাশা হইতেই তাহার বিবাস হইয়াছে, তাহ কিছুতেই স্বপ্ন হইবে না। করুণার মন একেবারে পড়িল—যে ভাবনা করুণার মত বালিকার ম প্রায় অসম্ভব, সেই মরণের ভাবনা তাহাব মনে তাহাব মনে হইল এ সংসারে সে কেমন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে আর পাবিয়া উঠে না, এখন মরণ হইলে বাঁচে। এখন আব অধিক লোক জন কাছে আসিলে তাহার কেমন কষ্ট হয়—সে আমাকে এইখানে একলা রাখিয়া দিক, আপ একলা পড়িয়া থাকিয়া মরি—সে, সকল লোকে জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আব পারে না, বিষয়েই কেমন বিরক্ত, উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। বেচারী কত কাঁদিয়া তাহাকে কত সাধ্য কবিয়াছে; কিন্তু এই আহত লতাটি জন্মের মত হইয়া পড়িয়াছে, বর্ষার সলিল-সেকের, বসন্তের ব আর সে মাথা তুলিতে পারিবে না।

কিন্তু একি সংবাদ? মহেন্দ্র নবেন্দ্রের সন্ধান আবার পাইয়াছে শুনিতেছি! মহেন্দ্র ককণা ও নরেন্দ্রের জ্ঞাত একটি ভাল বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। নরেন্দ্র মহেন্দ্রের ব্যয়ে সে বাড়িতে বাস করিতে সহজেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু একবার মন ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাতে আর ক্ষুণ্ণি হওয়া সহজ নহে—ককণা এই সংবাদ শুনিল, কিন্তু তাহার অবসন্ন মন আব তেমন জাগিয়া উঠিল না। ককণা মহেন্দ্রের বাড়ি হইতে বিদায় হইল—যাইবাব দিন রজনী ককণাব গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই কাঁদিতে লাগিল, ককণা চলিয়া গেলে সে বাড়ি যেমন কেমন শূণ্য শূণ্য হইয়া গেল। সেই যে ককণা গেল, আর সে ফিবিল না, সে বাড়িতে সেই অবধি ককণার সেই স্মৃতির হাসির ধ্বনি এক দিনের জ্ঞাত আর শুনা গেল না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়িত অবস্থায় ককণা নরেন্দ্রের নিকট আসিল। মহেন্দ্র প্রায় মাঝে মাঝে ককণাকে দেখিতে আসিতেন; ককণা কখনো খারাপ থাকিত, কখনো ভাল থাকিত, এমনি কবিতা দিন চলিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র ককণাকে মনে মনে ঘৃণা কবিত, কেবল মহেন্দ্রের ভয়ে এখনো তাহার উপর কোন অসদ্ব্যবহার কবিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নরেন্দ্র প্রায় বাড়িতে থাকিত না—দুই এক দিন বাদে যে অবস্থায় বাড়িতে আসিত, তখন ককণার কাছে না আসিলেই ভাল হইত। তাহার অবর্তমানে পীড়িতা ককণাকে দেখিবাব কেহ লোক নাই! কেবল সেই দাসীটি মাঝে মাঝে আসিয়া বিবস্ত্রিত স্বরে কহিত, “তোমার কি ব্যামো কিছুতেই সাব্বে না গা? কি যন্ত্রণা!”

নরেন্দ্রের উপর এই দাসীটির মহা আধিপত্য ছিল; নরেন্দ্র যখন মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইত, তখন ইহার যত ঈর্ষা হইত, এত আব কাহাবো নয়। এমন কি নরেন্দ্র বাড়ি ফিবিয়া আসিলে তাহাকে মাঝে মাঝে কাঁটাতে ক্রটি করিত না, মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর ইহার অভিমানই বা দেখে কে? ককণাব উপবেও ইহার ভারি আক্রোশ ছিল, ককণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জালাতন করিয়া মারিত। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের সহিত ইহার মহা মারামারি বাধিয়া যাইত—দুজনেই দুজনের

উপর গালাগালি ও কিল চাপড় বর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিত। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি আছে, নরেন্দ্র তাহার বিপদের দিনে ইহার সাহায্যে দিন যাপন করিতেন।

নরেন্দ্রের ব্যবহার ক্রমেই ক্ষুণ্ণি পাইতে লাগিল। যখন তখন আসিয়া মাতলামী কবিত, সেই দাসীটির সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়া দিত। ককণা এই সমস্তই দেখিতে পাইত, কিন্তু তাহার কেমন এক প্রকাবের ভাব হইয়াছে, সে মনে করে, যাহা হইতেছে, হউক, যাহা যাইতেছে চলিয়া যাক। দাসীটি মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর রাগিয়া ককণার নিকট গব্ গব্ করিয়া মুখ নাড়িয়া যাইত, ককণা চুপ করিয়া থাকিত, কিছুই উত্তর দিত না। নরেন্দ্র আবশ্যক মত গৃহ-সজ্জা বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাতেও কিছু হইল না—অর্থ সাহায্য চাহিয়া মহেন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখিবার জ্ঞাত ককণাকে পীড়া-পীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। ককণা বেচাবী কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কোথায় সে মনে কবিতেছে, যে যে যাহা কবে করুক আমাকে একটু একেলা থাকিতে দিক; না; তাহাকে লইয়াই এই সমস্ত হাদ্যাম। সে কি করে, মাঝে মাঝে লিখিয়া দিত। কিন্তু বার বার এমন কি করিয়া লিখিবে? মহেন্দ্রের নিকট হইতে বারবার অর্থ চাহিতে তাহার কেমন কষ্ট হইত, তন্নিম্ন সে জানিত অর্থ পাইলেই নরেন্দ্র তাহা দুষ্ট্রমে ব্যয় কবিলে মাত্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র আসিয়া মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার জ্ঞাত ককণাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ককণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, “পায়ে পড়ি, আমাকে আর চিঠি লিখিতে বলিও না।” সেই সময় সেই দাসীটি আসিয়া পড়িল—সেও নরেন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিল—কহিল “তুমি এমন একজুয়ে মেয়ে কেন গা! টাকা না থাকলে গিলবে কি?” নরেন্দ্র ক্রুদ্ধ ভাবে কহিল “লিখিতেই হইবে!” ককণা নরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল “ক্ষমা কর, আমি লিখিতে পাবিব না!” “লিখিব না? হতভাগিনী, লিখিব না?” ক্রোধে রক্ত বর্ণ হইয়া নরেন্দ্র ককণাকে প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া পণ্ডিত মহাশয় প্রবেশ করিলেন; তিনি ভাড়াভাড়া গিয়া নরেন্দ্রকে ছাড়াইয়া দিলেন, দেখিলেন দুর্বল ককণা মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিত মহাশয় নিধির টানা টানিতে গাড়িতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কখনই ভাল ছিল না। তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে মনে করিতেন, তাঁহার স্নেহভাগিনী করুণাব দশা কি হইল। এইরূপ অল্পতাপে যখন কষ্ট পাইতেছিলেন, এমন সময়ে দৈবক্রমে মোহিনীর সহিত সত্য সত্যই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহার নিকট করুণাব সমস্ত সংবাদ পাইয়া আব থাকিতে পাবিলেন না, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিলেন; প্রথমে মহেন্দ্রের কাছে গেলেন, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ির সন্ধান লইলেন, বাড়িতে আসিয়াই নরেন্দ্রের ঐ নিষ্ঠুর অভ্যচার দেখিতে পাইলেন।

সেই মুর্ছাব পর হইতে করুণাব বারবার মুর্ছা হইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় মহা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময়ে তিনি নিধির অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রকে ডাকিতে গেলেন। মহেন্দ্র ও রজনী উভয়েই

আসিল। মহেন্দ্র যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। করুণা মাঝে মাঝে রজনীর হাত ধরিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কথা কহিত, পণ্ডিত মহাশয় যখন অল্পতপ্ত হৃদয়ে করুণার নিকট আপনাকে থিকার দিতেন, যখন কাদিতে কাদিতে বলিতেন “মা, আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়াছি,” তখন করুণা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অতি ধীর স্বরে তাঁহাকে বারণ করিত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, নবেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে, সে কহিত “কাজ নাই।” সে জানিত নবেন্দ্র কেবল বিবস্ত হইবে মাত্র।

আজ রাত্রে করুণাব গীড়া বড় বাড়িয়াছে। শিয়রে বলিয়া রজনী কাদিতেছে। আব পণ্ডিত মহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর ছায় অধীর উচ্ছ্বাসে কাদিতেছেন। নবেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবাব জন্ত মহেন্দ্রকে অহরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহাব চক্ষু লাল—মুখ ফুলিয়াছে কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধি প্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শস্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।

[‘ভারতী’ আশ্বিন ১২৮৪—ভাদ্র ১২৮৫]

*
* *

রবীন্দ্রনাথের আত্মসন্ধান*

বনফুল

সমবেত ভক্তমহিলা এবং ভক্তমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। বিশ্বব্যাপী যে উৎসবে আজ আমাদের কবি প্রতি শ্রদ্ধার্থী অর্পিত হইতেছে সে উৎসবে যোগদান করিতে পারিষা আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ আজ সমস্ত পার্থিব প্রয়োজনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, নিজের স্মৃতি কীর্তির অমরবাহীতে তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত—এ সব উৎসবে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের আছে। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরাই উপকৃত হইব, আমরাই আনন্দিত হইব, আমাদেরই মনুষ্য-দেহাশ্রয়ী পশু হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কিছু আশ্বাদ পাইয়া আত্মসচেতন হইয়া উঠিবে। এই প্রয়োজনই এখন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব আছে, আমাদের বেকার-সমস্যা সমাধান হয় নাই, আমাদের দেশের অনেক জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল ফলানো প্রয়োজন, বাণিজ্য-ব্যবসাও স্বদেশী উৎপাদনের বচক্ষেত্রে এখনও আমরা স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই, আমাদের অভাব অনেক, প্রয়োজনও অনেক, কিন্তু আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভাব মনুষ্যত্বের, আমাদের সমগ্রিক প্রয়োজন মনুষ্যত্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। শঙ্কবাচার্য, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজ্ঞানাগর, বিবেকানন্দে দেশে এখনও মনুষ্যবেশধারী পশুর সংখ্যা অর্গণিত। এই পশু-মানবের দল যে আধুনিক যুগেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বোমাঞ্চকর পাশবিকতার

অনেক উদাহরণ মিলিবে। এই পশুত্বের বঙটা খুব পাঁকা, প্রকৃতির সৃষ্টিকার সহিতও ইহাব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাই ইহা সহজে আমাদের স্বভাব হইতে লোপ পায় না। অবশ্য একমাত্র মানুষই এই পশুত্বের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চায়, এই মুক্তিরই সে নাম দিয়াছে সভ্যতা। যাহা বা সত্যসত্যই পশু, এ বিষয়ে তাহাদের কোন আগ্রহ নাই। মানুষদের মধ্যে এ বিষয়ে যাহারা সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহশীল আমাদের অভিধানে তাঁহাদের অনেক নাম। সাধু, তপস্বী, ঋষি, মহাপুরুষ, যোগী প্রভৃতি অনেক নামেই তাঁহারা পরিচিত, কিন্তু প্রাচীন যুগে, বিশেষ করিয়া উপনিষদের যুগে তাঁহাদের আর এক নাম ছিল কবি। যাহাদের উপনিষদের সহিত কিকিৎসাতত্ত্ব পরিচয় আছে তাঁহারা ইহা জানেন যে কবি এবং ব্রহ্মবিৎ তাঁহাদের কাছে সমার্থক ছিল। ব্রহ্মকে তাহারা রসো বৈ সঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রস তাঁহাদের সংজ্ঞায় ব্রহ্মাশ্বাদ সহোদর, কবিও তাই তাঁহাদের বিচারে ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শী। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা বিলম্বিত কবিতাও আমরা দেখিতে পাই যে মূলতঃ তিনি কবি ছিলেন, ব্রহ্মোপলব্ধির বিচিত্র লীলা, সীমার মাঝে অসীমেব আবির্ভাব, তাঁহার রিরাট সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে নানা ভাবে নানা ছন্দে নানা রূপ-ভঙ্গিমায় রসিক পাঠক-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতায়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে যে কথ্যটি তিনি বারংবার নিত্য নূতন স্ববে বলিয়াছেন সে কথাটি এই—‘এই লভিছ সঙ্গ তব স্তম্ভর হে স্তম্ভর, ধন্য হল অঙ্গ মম, পুণ্য হল অন্তর’। যে অরূপ-বতনের আশায় তিনি বাবংবার রূপসাগরে বাঁপ দিয়াছেন সে অরূপ-বতনেব দিব্যদ্ব্যভিতে বদ্বাণীর মন্দির আজ আলোকিত, সে

* রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গাটনার স্মরণ পরিষদ ও হেমচন্দ্র গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

আলোক আজ বিশ্ববাণীর মন্দিরকেও উজ্জ্বল করিয়াছে,
রবীন্দ্রনাথের বাণী আজ বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের বাণী।
সে বাণীর অন্তর্নিহিত মন্ত্র চিবন্তনের স্বরে বাঁধা, বিবাট
ভূমার অক্ষবস্ত্র আমন্ত্রণে সে বাণী, চির-অভিসারিকা।
নির্বাবের স্বপ্নভঙ্গে যাহাব যাত্রা শুরু হইয়াছিল সে যাত্রা
কোথাও থামিয়া যায় নাই, তাহা অশেষ, তাহা চির-
প্রসারিত, যাত্রা-পথের বাক্যে বাক্যে তাহা নিত্য নূতন
শোভায় বিস্তৃত, আনন্দিত, অভিভূত। কয়েকটি
উদাহরণ দিতেছি—

আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙিব পাষণ-কারা
আমি জগৎ প্রাণিয়া বেড়াব গাহিয়া
আঁকুল পাগল-পাবা

কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল গেয়ে কল কল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর
এত স্বপ্ন আছে, এত সাধ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর।
কী জানি কী হ'ল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

—প্রভাত সঙ্গীত

* * *
একখানি ছোট ক্ষেত, আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে থেলা
পবপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা
এ পাবেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা ॥

—সোনার তরী

* * *
ও গো পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল
দে দোল দোল।
পশ্চাৎ হতে হা হা করে হাসি
মস্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি

যেন সে লক্ষ বক্ষ শিশুব অট্টরোল
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে ইট্টগোল
দে দোল দোল।

—সোনার তরী

* * *
ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে
দেউটি জলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া পথখানি ছায়া কবা
ছেয়ে গেছে বারে পড়া বকুলে
সাবি সারি নিকেতন, বেড়া-দেওয়া উপবন
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জলিছে দূরে দেউলে।

—চিত্রা

* * *
ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহ-বন্ধন
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে-ছলনা
ওবে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অদ্বন্দ
উষা দিশা-হারা নিবিড় তিমির আঁকা
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

—কল্পনা

* * *
সব ঠাই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মবি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি সেই দেশ লব মুন্সিয়া
পববাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তাবি মাঝে মোর আছে যেন ঠাই
কোথা দিয়া দেখা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব মুন্সিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাশ্রয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

—উৎসর্গ

* * *
হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত ভূমি চাহ কবিবারে পান

আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমাব মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনাব গান।
—গীতাঞ্জলি

* * *
• আমি পথিক, পথ আমারি সাথী
দিন সে কাটায়, গনি গনি বিশ্বলোকের চরণ ধ্বনি
তাবার আলোয় গায় সে সাবা রাতি।
কত যুগের রথের রেখা বক্ষে তাহার আঁকে লেখা
কত কালের ক্রান্ত আশা
ঘুমায তাহার ধূলায়, আঁচল পাতি ॥
—গীতাঞ্জলি

* * *
তোমাব ছুটি নীল আকাশে, তোমাব ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থই-হারা ওই, দীঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুল তলায়, গোলাবাড়ি বকোণে
তোমার ছুটি ঝোপে-ঝাড়ো, পারুল ডাঙার বনে
তোমার ছুটির আশা কাঁপে কাঁচা ধানের ক্ষেতে
তোমাব ছুটিব খুনী নাচে নদীর তরঙ্গেতে
—শিশু ভোলানাথ

* * *
মহাবাজ, কোনো মহারাজ্য কোন দিন
পারে নাই তোমাবে ধরিতে
সমুদ্রস্তুপিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমায়ে ভরিতে
নাহি পাবে,
তাই এ ধরাবে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মুৎ পাজের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের বথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিবে তোমার
বারম্বার।
—বলাকা

* * *

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রক্ত সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি, যুগে যুগে আমি
তব তপোবনে।
হুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোব ডালা
উদ্ধামের উত্তরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী
কিশলয়ে কিশলয়ে কোঁতুহল কোলাহল আনি
মোর গান হানি।
—পূববী

* * *
হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান ভরা ধন
বৎসরের শেষে
শুধু এক বাব মর্ত্যে মূর্তি ধর ভুবন মোহন
নব বববেশে
তারি লাগি তপস্বিনী কি তপস্যা করে অশ্রুক্ষণ
আপনাবে তপ্ত কবে ধৌত কবে ছাড়ে আভরণ
ত্যাগেব সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্থ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।
—বনবাণী

* * *
উড়াব উর্ধ্ব প্রেমের নিশান হুর্গম পথ মাঝে
হৃদম বেগে, হুঃসহতম কাজে।
রক্ষ দিনের হুঃখ পাই তো পাব
চাই না শান্তি, সাধনা নাহি চাব,
পাড়ি দিতে নদী, হাল ভাঙ্গে যদি ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব, তুমি আছ আমি আছি
—মহুয়া

* * *
কাব যেন এই মনের বেদন চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়
ঝুমকো লতার চিকন পাতা কাঁপেরে কার চমকে চাওয়ায়।
হারিয়ে যাওয়া কার সে বাণী কাব সোহাগেব স্মরণখানি
আমেব বোলেব গন্ধে মিশে, কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়।
—গীতবিতান

* * *
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি
নিত্য কালের আলো আমি

সৃষ্টি-উৎসের আনন্দ ধাওয়া আমি

অকিঞ্চন আমি

আমার কোন কিছুই নেই অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘেরা।

—শেষ সপ্তক

*

*

*

নক্ষত্র বেদীর তলে আসি

একা শুদ্ধ দাঁড়াইয়া উর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—

হে পুষ্প, সংহরণ করিয়াছ তব বশ্মি জাল

এবাব প্রকাশ করো তোমাব কল্যাণতম রূপ

দেখি তাবে যে পুরুষ, তোমার আমার মাঝে এক ॥

—প্রান্তিক

ববীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা স্বদীর্ঘকাল নানাভাবে যে বিরাট আত্মোপলব্ধির বৈচিত্র্যসম্ভারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে— তাহারই স্বল্প নিদর্শন এই উদ্ধৃতিগুলি। ববীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি এই নিখিল বিশ্বের নিত্য নবীনরূপে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা উপনিষদের ঋষিবাণিত সত্যের মতই নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবয়বং নিরঞ্জনম্, তাহা অণোবগীশ্বর মহতো মহীয়ান। এই অবর্ণনীয়কেই তিনি সারাজীবন বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এই শব্দাভীতকে শব্দের মালায় গাঁথিয়া বঙ্গবাণীকে উপহাস দিয়াছেন, অব্যক্তকে ব্যক্ত কবিবার আকুলতাই তাঁহার কাব্য-লক্ষ্যের অলঙ্কার-শিঞ্জনে, প্রসাধন-কলায়, ছন্দে, গন্ধে, রূপে, রসে প্রকাশিত। ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ কবিত্তে পারেন নাই— ববীন্দ্রনাথও পারেন নাই—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “ওই একটি জিনিসই কখনও এঁটো হয় নি”—কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মোপলব্ধির অপূর্ব উজ্জ্বল প্রকাশ কেবল তাঁহার কাব্যকেই উদ্ভাসিত করে নাই তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকেও মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রভাব সাধকের চরিত্রে যে সকল দিব্যগুণাবলীর সমাবেশ করে ব্যক্তিগত জীবনে তাহার প্রকাশ অহঙ্কার-মুক্ত স্বভাব সৌম্যভাব, কিন্তু সেই স্বভাব সৌম্যতাই রূঢ় প্রতিবাদে রূপান্তরিত হয় যখনই কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বর্বরতা মহত্ত্বকে মহিমাকে আঘাত করে, যখনই মানবের আত্মা অপমানিত হয়, আধ্যাত্মিকতাব্যবসায়নে যখন সমগ্র মানবিক সভ্যতা

কলঙ্কিত হয়। যে সব ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ সংসারত্যাগী,

বৈরাগ্যের সাধনাতেই বাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত, তাঁহারা

সংসারের অবিচার অত্যাচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু যে ব্রহ্মদর্শী কবি ঘোষণা কবিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ—

তিনি সংসারের, সমাজের অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি

সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। ‘মাহুশের ধর্ম’

প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, “আমার মন যে সাধনাকে

স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে আপনাকে ত্যাগ

না করে আপনায় মধ্যেই সে মহান পুরুষকে উপলব্ধি

করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা।

তাকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোন অমানব বা অতি-মানব

সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে

কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেন না, আমার

বুদ্ধি মানব-বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব-হৃদয়, আমার

কল্পনা মানব-কল্পনা। ..মানব-নাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে

লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম

সকলকে। এই যে দেখা একে ছোট বলব না। এও

সত্য। জীবন দেবতাব সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই

হুংখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।”

এই মুক্তির সন্ধান করিতে গিয়া প্রত্যাহের কুশাঙ্কুরে

তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, পৃথক্বে সংঘাতে তাঁহার

মহত্ত্ব বিচলিত হইয়াছে এবং তীব্র প্রতিবাদে বাবংবার

তিনি বাঙাল্য হইয়া উঠিয়াছেন। মানবসমাজে যে সব

হৃদয়বশী দানব বর্তমান, তাহাদের আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহার

বৃহৎ আত্মসম্মান নানা স্তরে বহুবার ছন্দিত হইয়াছে।

জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়াও তিনি লিখিয়াছেন—

মহাকাল সিংহাসনে

সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে

কণ্ঠে মোর আনো বঙ্গবাণী, শিশুঘাতী, নাবীঘাতী

কুৎসিত বীভৎস পথে দ্বিধার হানিতে পারি যেন।

লিখিয়া গিয়াছেন—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস

শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পবিত্রাস,

বিদায় নেবার আগে তাই

ডাক দিয়ে যাই

দানবেব সাথে যারা সংগ্রামের তরে

প্রস্তুত হ'তেছে যবে ঘরে।

আহত আত্মসম্মানের বাণী, পশুত্বের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের উদাত্ত উদ্বোধনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু স্বাধীনতা, ললিতবাণীব মোহে মুগ্ধ হইয়া নাচগানের হজুগে মাতিয়া আমরা আমাদের এই দুর্দিনেও রবীন্দ্রনাথের পৌরুষের দিকটা একেবারে ভুলিয়াছি। মাঝে মাঝে এ নন্দেহও হয় যে বোধ হয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত আমাদের অনেকেরই সম্যক পরিচয় নাই, পল্লবগ্রাহিতাব সংক্ষিপ্ত সহজ পথে ববীন্দ্রনাথের স্বল্প পবিচয় পাইয়াই আমরা সন্তুষ্ট আছি এবং ববীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অংশভাক্ হইবার জন্ত লালায়িত হইয়াছি। তাহা না হইলে আজ আমাদের এ দুর্দশা কেন? স্বাধীনতার জন্ত ববীন্দ্রনাথের যে বাণীমন্ত্র একদা বঙ্গবাণীর মন্দিরকে মন্ত্রিত করিয়াছিল সে বাণী আজ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে না কেন? নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা-লজ্জার কাহিনী সাড়ম্বরে সংবাদপত্রে ছাপাইয়া নির্বীৰ্য নপুংসকদের মত অহোবাত্র থিয়েটারী ভদ্রিতে আড়ম্ব ও আমরা কেবলমাত্র হায় হায় কবি কেন? আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিনি না, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আমরা পাঠ কবি নাই। যদিও বা কবিতা থাকি তাহা আমাদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে নাই, মনকে স্পর্শ করে নাই, আমাদের পশুত্বের ঘন অন্ধকাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার জ্যোতির্ময় আবেদনও ব্যর্থ হইয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আত্মসম্মানের যে চিত্র দেখিতে পাই তাহার মূল কথা আত্মশক্তির উদ্বোধন, কোনও বাহিরের শক্তিতে নয় আত্মার শক্তিতেই বিশ্বাস স্থাপন।

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা

বিপদে আমি না যেন করি ভয়

দুঃখ-তাপে-ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সাহস

দুঃখে যেন করিতে পাবি জয়

সহায় মোব না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে

সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা

নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায়, বহু প্রবন্ধে বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার আত্মসম্মান তাঁহাকে আত্মমুখী করিয়াছে, তিনি কাহারও কাছে কখনও শিক্ষাপাত্র প্রসাবিত করেন নাই। শিক্ষা করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। একটি উদাহরণ দিতে পাবি। তিনি যখন স্বকীয় আদর্শের অম্লরূপ শান্তিনিকেতন স্থাপন করেন তখন তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু অর্থের জন্ত কাহারও নিকট তিনি শিক্ষা করেন নাই। শুধু একবার নহে একাধিক বার শান্তিনিকেতনের আর্থিক সঙ্কট তাঁহাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়াছে, যখন তাঁহার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী তখনও তিনি এ দুশ্চিন্তামুক্ত হন নাই এবং তখন ভারতবর্ষের ধনী অথবা বাজন্তবর্গের দ্বারস্থ হইলে তাঁহার শান্তিনিকেতন হয়তো অর্থাভাবমুক্ত হইতে পারিত—মালবীয়জীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রাজন্তবর্গের বদান্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান তাঁহাকে এ পথে অগ্রসব হইতে দেয় নাই। স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে যাহা দিয়াছে তাহা অবশ্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও বদান্যতার উপর তিনি শিক্ষাব দাবি চাপাইতে চাহেন নাই। তিনি শান্তিনিকেতনকে চালাইতে চাহিয়াছিলেন স্বোপার্জিত অর্থদ্বারা। নিজেব পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তো দিয়াছিলেনই, কিন্তু তাহাতেও যখন কুলাইতেছিল না তখন বৃদ্ধ বয়সে নাচ-গান-অভিনয় করিয়া ভারতবর্ষের শহবে শহরে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া যুবিয়া বেড়াইতেছিলেন, তবু কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই। শেষে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া জোব কবিতা তাঁহাকে নিবস্ত করেন এবং শান্তিনিকেতনের তাত্কালিক অর্থাভাব মিটাইয়া দেন।

তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যে আত্মসম্মানের এরূপ বহু নিদর্শন বর্তমান। তাঁহার জীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাই আত্মাকে সম্মান করিতে পারেন। তাঁহাদের চিত্ত বিবাট উপলব্ধির মহান্ আমন্দে সদাপ্রদীপ্ত, তাই তাঁহারা নির্ভীক, কোন কারণেই তাঁহারা আত্ম-অপমান বা আত্ম-অবনতির পক্ষে অবলিপ্ত হইতে চাহেন না। যখনই মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব, সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ লাঞ্চিত ব্যাহত হয় তখনই তাঁহারা সমস্ত ভয় ভাবনা তুচ্ছ করিয়া

সমস্ত ক্ষমক্ষতির উপরে উঠিয়া রাজবোষ বা রাজদণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া অকুতোভয়ে বলিয়া উঠেন—

দেবতাব দৌপ হস্তে যে আনিল তবে
সেই রুদ্র-দূতে বল কোন্ রাজা কবে
পাবে শান্তি দিতে। বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি কবে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। কষ্ট রাহ
বিধাতার স্বর্ধপানে বাড়াইয়া বাহ
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক পরে
ছায়ার মতন। শান্তি? শান্তি তার তবে
যে পায়েরা শান্তি ভয়ে হইতে বাহির
লজ্জিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর
কপট বেটন, যে নপুংস কোনদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অগ্রায়ের বলে নি অগ্রায়, আপনার
মহুয়া বিধিদ্ভূত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভা-মাঝে, দুর্গতিব করে অহংকার,
দেশের দুর্দশা লয়ে যাব ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃ-রক্ত প্রায়
সেই ভীকু নত-শির চির শান্তিভাবে
বাজ-কারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে

অরবিন্দ-নমস্কারে ববীন্দ্রনাথ নিজের আত্মা ঐশ্বর্যকেই উদ্ঘাটিত কবিয়াছেন। তাঁহার দেশাত্মবোধ এবং আত্ম-সম্মান একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। দেশ যখন ইংবেজের অধীনে ছিল তখন দেশের দুর্দশা মোচনের জন্ত রাজ-সবকারে আবেদন-নিবেদন করা তিনি আত্মসম্মান-হানিকর মনে করিতেন।

১৩১১ সালে “সফলতার সহুপায়” প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন, “ইংবেজ যদি বলে, সাধারণ মহুয়া-স্বর্ভাবের যে নিম্নতম কোঠায় আমি আছি সেই কোঠায় তুমিও এস, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই, স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ কর, স্বজাতির উন্নতির জন্ত তুমি প্রাণ দিতে না পার অস্ত্রত আরাম বল, অর্থ বল, কিছু একটা দাও। তোমাদের দেশের জন্ত আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না।” এ কথা বলিলে

তাহার কী উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কী দিতেছি, কে কী কবিতেছি! আব কিছু না কবিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি—আলস্তপূর্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস, ইংবেজ রচনা কবে, আমরা তর্জমা করি, ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে আমরা মুখস্থ করিয়া লই। ঘরের পাশে কি আছে জানিতে হইলেও ‘হাটাব’ বই গতি নাই। তারপর দেশেব কৃষি সম্বন্ধে বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল নিজের চেষ্টা দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্য পালন সম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে উপদেশ কোনও দিনই কোনও কাজে লাগিতে পাবে না। কারণ যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে তাহার দায়িত্ব আছে—যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে তাহাব দায়িত্ব নাই—এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনই ষথার্থ আদান প্রদান চলিতে পারে না। এক পক্ষে অনেক টাকা আছে অত্র পক্ষে শুধু মাত্র চেক বহিখানি আছে এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক ভাঙ্গানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবীস্বরূপে বরাবর চলে না, ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, এক একবার মনে হয় আমাকে অপমান কবিয়া ফিরাইয়া দিল, কিন্তু সে অপমান, সে ব্যর্থতা তারস্ববেই হউক আব নিঃশেষেই হউক গলাধঃকরণ-পূর্বক সম্পূর্ণ পবিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাট সভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড় কঠিন তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা কবিয়া বেড়াই পবের দিনে তাহাব জন্ত বৈজ্ঞানিক ভাষাতে হয় না।”

এ প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল .৩১১ সালে, আজ ১৩৬৮ সাল। এই প্রবন্ধেব প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মধ্যে কি কোনও পরিবর্তন আসিয়াছে? পরিবর্তনের মধ্যে তখন আমাদের প্রভু ছিলেন বিদেশীরা, এখন হইয়াছেন স্বদেশীরা। কিন্তু এখনও আমাদের দুর্দশা যেমন ক্রমবর্ধমান আমাদের জড়ত্বও তেমনি। যে বঙ্গব্যবচ্ছেদ লইয়া

রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ, বহু কবিতা, বহু গান লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সাহিত্য-কীর্তির একটা প্রধান অঙ্গ, সে বঙ্গব্যবচ্ছেদ তাঁহার যুত্বাব পর হইয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহা সঙ্কল্পে কবিয়াছি। মাঝে মাঝে আত্মকাল আমরা কোলাহল কবিয়া থাকি বিফিউজিদের প্রাপ্য ভিক্ষার আঁকাডু চাউল ঠিকমত বণ্টিত হইতেছে না বলিয়া, মাঝে মাঝে আমাদের খবরের কাগজে সবকারেব হুমকি ছাপা হয় অমুক তারিখের মধ্যে এই গৃহহাবা ভিখারী বদল বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরের অনিশ্চয়তার মধ্যে যদি কাঁপাইয়া না পড়িতে চায় তাহা হইলে তাহারিগের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে সম্ভ্রান্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাব' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহা লইয়া আমাদের গর্বের অস্ত্র নাই, যেখানে-সেখানে ইহা লইয়া আমরা আফালন কবিয়া থাকি, কিন্তু ইহা কি আমাদের মনে সত্যই কোন দাগ কাটিয়াছে? সত্যই কি আমরা আত্মসম্মানে উদ্ভূত হইয়াছি? কই, আসাম হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হইয়া কোনও উপাধিবাহীকে তো উপাধি ত্যাগ করিতে দেখিলাম না। সে কালেও যেমন ঘো-হুজুরের দল আশা করিত যে ইংরেজ সত্য জাতি, তাহার আত্মদের লব্ধে সাম্যনীতির প্রয়োগ করিবে, একালের ঘো-হুজুরের দলও ঠিক তাহাই মনে করিতেছেন। তাঁহার ববীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভুলিয়া গিয়াছেন কিংবা ভুলিয়া থাকিবাব তান করিতেছেন—“সাম্য নীতি সেইখানেই খাটে যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। যুরোপীয়ের প্রতি যুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই, তাহা দেখিবা আশাবিত্ত হইয়া উঠা অক্ষমের লুপ্ততা মাজ। অশক্তের প্রতি শক্তি যদি সাম্যনীতি অবলম্বন কবে তবে সেই প্রজ্ঞা কি অশক্তের পক্ষে কোনো মতে প্রেষণ্য হইতে পারে? সে প্রজ্ঞা কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর? অতএব, সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মহত্ত্বমাজের কর্তব্য। তাহার অন্তর্থা কবা কাপুরুষতা।”

পূর্বে বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মানের ভিত্তি তাঁহার আত্মশক্তিতে এবং তাঁহার আত্মশক্তির মূল তাঁহার ব্রহ্মবোধে। বহুকাল পূর্বে ১৩০২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার

“নববর্ষ” প্রবন্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীন সত্তার যে বিশিষ্টতা অল্পভব করিয়াছিলেন, স্বাধীন ভাবভেব যে রূপ তিনি কল্পনা কবিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ধানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

“আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম কবিয়া আসিলাম। তিনি ফললোভুপ কর্মের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিচলিত জনতার জড়পেয়ণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বে মগ্নে আসীন এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব-কালিয়া হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্মের বাসনা, জনসম্মেলের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে, ভয়হীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। যুরোপ বাহাকে ‘ক্রীডম’ বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীক, তাহা স্পর্ষিত তাহা নিষ্ঠুর। তাহা পরেব প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিক্রম করিতে চাহে। তাহা কেবলি অন্ধকে আঘাত করে, এই অন্ধ অন্ধের আঘাতের ভয়ে রাজি দিন বর্ষে চর্মে অন্ধেষণে কণ্টকিত হইয়া বলিয়া থাকে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া বাধে, তাহার অসংখ্য সৈন্ত মহত্ত্ব-ভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্র মাজ। এই দানবীষ ‘ক্রীডম’ কোনও কালে ভারতবর্ষের তপস্তার চরম বিষয় ছিল না, কারণ আমাদের জনসাধারণ অস্ত্র সকল দেশের চেয়ে স্বার্থভাবে স্বাধীন ছিল। এখনও আধুনিক কালের বিচার সত্ত্বেও এই ক্রীডম আমাদের সর্বসাধারণের চেষ্টাব চব্বতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল। এই ক্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে মহত্ত্ব যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্তার ধন তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আধা হন করিয়া আনি, অস্তরের মধ্যে আমরা লাল কবি তবে ভারতবর্ষের নগরচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুঠ পবিজ হইবে। আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ পুরাতনই চিবনবীনতার

অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিশলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসব-বস্ত্র পরিয়াছেন এ বস্ত্রখানি আজিকাব নহে—যে ঋষি কবির ত্রিষ্টুত ছন্দে তরুণী উষাব বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মন্থন চিকণ পীত-হরিৎ বস্ত্রখানিতে বনত্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন—উজ্জয়িনী বপুরোত্তানে কালিনাসেব মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এই সমীর-কম্পিত কুমুদগন্ধী অঞ্চল প্রান্তটি নব সূর্যকরে বলমল করিয়াছে। নৃতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অলুভব করিলে তবেই অমেয় ধোবন-সমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান কবিতে পায়।...

ববীজনাথের আত্মসন্মান স্বাধীন ভারতবর্ষকে তাহার সনাতন গুহ্র সত্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিল। বাহিরের কোনও জড়বাদী সভ্যতার নকলে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইবে এ কল্পনা তাহার আত্মসন্মানকে আঘাত করিত। সর্বপ্রকার অন্ধ অনুকরণ এবং ভণ্ডামির ছদ্মবেশকে তীব্র ব্যঞ্জে বারংবার তিনি ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। দুই-একটা উদাহরণ দিই—

কে-তুমি কিরিছ পরি প্রভুদেব সাজ
ছদ্মবেশে বাড়ে নাকি চতুঃপাশে
পববস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান।
তোমাবেই করিছে না নিত্য অপমান ?
বলিছে না “ওরে দীন যত্নে মোরে ধব
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর ?”

* * *

ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিকাব দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে ?
বলিতেছে যে মন্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি রূপায়।
সর্বদা লাজনা বহি এ কি অহঙ্কার
ওর কাছে জীর্ণ চীব জেনো অলঙ্কার।

সাহেবিয়ানার নকলকেই তিনি যে কেবল ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা নয়, অন্তঃসাবশ্যক ভণ্ড আর্থামিকেও করিয়াছেন।

“এটা আমাদের স্বরণ নেই যে যোগাসনে যাঁপরম সন্মানার্থ, সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন অপবিত্র ভাঁব না থাকলে বাহ্যকুষ্ঠানও তরুণ।... তোমার আমাব মত লোক বারা তপস্তাও করিনে, হবিষ্ণও খাইনে, জুতো মোজা পরে ট্রামে চড়ে

পান চিবতে চিবতে নিষমিত অকিসে জ্বলে বাই, যাদের আত্মোপান্ত তন্ন তন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, জরৎকার, বৈশম্পায়ন কিংবা ভগবান কৃষ্ণ বৈপায়ন, ছাত্রবৃন্দ, যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ পর্যন্ত কারো ভ্রম হয়নি একদিন তিন সন্ধ্যা করে একটা হবিতকী মুখে দিলে যাদেন্দ্র তারপর একাদিক্রমে কিছুকাল অক্ষিস কিংবা কলেজ কামাই কবা অত্যাশঙ্কক হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে এরকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাদম্বব করা, পৃথিবীর অধিকাংশ উত্তোগ-পবায়ণ মায়া জাতীয়ের প্রতি ধব নাসিকা সিটকার করা, কেবলমাত্র যে অজুত, অসদ্বৃত, হাশুকব তা নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।...অতএব হয় সত্যই তপস্তা কর, নয় তপস্তার আডম্বর ছাড়।”

ভারত-সভ্যতার যে রূপ তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র তাহার আধ্যাত্মিক রূপই নয়, তাহা কর্মে প্রচেষ্টায় প্রতিভায় প্রেবণায় সমৃদ্ধ প্রাণবন্ত রূপ।

“নৃতন ও পুরাতন” প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন—“আমবা যখন একটা জাতির মত জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ, বাণিজ্য শিল্প, দেশেবিদেশে গভায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিত্তার আদান-প্রদান, মিথিঞ্জয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসব এবং বহু প্রভেদের ব্যবধান থেকে কালের সীমান্ত দেশে আমবা সেই ভারত-সভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতি দূরবর্তী একটি তপঃপুত হোম ধুম রচিত অলৌকিক সমাধিরাড্যেব মত দেখতে পাই এবং আমাদের এই বর্তমান কর্মহীন নিদ্রালস নিশ্চল পল্লীটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অলুভব করে থাকি, কিন্তু সেটা কখনই প্রকৃত নয়। আমরা যে কল্পনা করি আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল, আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা একলা বসে আপন আপন জীবাঁআটি হাতে নিয়ে কেবলি শান দিতেন, তাকে একেবারে কর্মহীন, অতিশূন্য জ্যোতির রেখাটুকু করে তোলবার চেষ্টা করতেন, সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্চপ্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারি প্রেতযোনি মাত্র।...

সমাজ হইতে এই প্রেতযোনিকে দূর করিবার জন্ত রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান তাঁহাকে দিয়া অনেক প্রবন্ধ, অনেক কবিতা লিখাইয়াছে। এ প্রেতযোনি শুধু অতীতের নয়, বর্তমানেরও। শুধু সামাজিক নয়, রাজনৈতিকও। তাঁহার “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” “সভ্যতার সংকট” যদিও ইংবেজের শাসনকালে লিখিত হইয়াছিল কিন্তু উহাদের বক্তব্য চিরন্তন সত্যের বাণী। যখনই একদল অত্যাচারী শাসনকর্তা ক্ষমতা-মদ-দুষ্ট হইয়া অসহায় জনসাধারণের উপর যথেষ্টাচারের স্ত্রীমরোলার চালাইতে যাইবে তখনই উক্ত প্রবন্ধ দুইটির বক্তব্য সচকিত করিয়া তুলিবে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়কেই।

“কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” হইতে সামান্য একটু উদ্ধৃত করি—“প্রেজিড। ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ওই তো কর্তা, ওই তো আমাদের কবিকঙ্কনের চণ্ডী, ওই তো বেহুলা কাব্যের মনসা, ত্রায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় শুঁড়া হইয়া যাইবে। অতএব—

বা দেবী রাজ্যশাসনে প্রেজিডক্লপেন সংস্থিত।

নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমোনমঃ।”

সমাজেব কল্যাণের ক্ষেত্রে স্টেটের হস্তক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ কাম্য মনে করিতেন না। আমাদের জল-ভূষণ নিবাবণেব জন্ত সরকারের দ্বারস্থ হওয়াটা তিনি আত্মসম্মান-হানিকর বলিয়া গণ্য কবিয়াছেন। তাঁহার “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, “এখন বাংলার সেই পল্লীকোড় হইতে বাঙালির চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহাব জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠেনা। কাজেই এখন জলদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্তও সরকার বাহাদুরের দ্বারে গলবজ হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্ত তাহার সমস্ত লীর্ণ শাখা-প্রশাখা উপরে তুলিয়া দবখান্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী?” সম্মানের

জন্তও তিনি সমাজের দিকেই চাহিতে বলিয়া গিয়াছেন, রাজদরবারের দিকে নয়। উক্ত প্রবন্ধেই একস্থানে তিনি বলিতেছেন, “পূর্বে ষাঁহার। বাদশাহের দরবারে রায় রাঁধা হইয়াছেন, নবাবরা ষাঁহাদের মন্ত্রণা ও মহায়ত্নের জন্ত অপেক্ষা করিতেন, তাঁহার। এই রাজ-প্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না, সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চ ছিল। তাঁহার। প্রতিপত্তি লাভের জন্ত নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লী তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পাবে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্ত তাঁহাদিগকে অখ্যাত জম্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকে বলিবে মহাদাশয় ব্যক্তি ইহা সবকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। জম্মভূমির সম্মান ইহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীব মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইহাদের চিত্তকে নিজেব পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই।”

রবীন্দ্রনাথের এই অমিত আত্মসম্মানের নিদর্শন তাঁহার সাহিত্যকৃতির বহুস্থানে লিপিবদ্ধ। তাঁহার ‘কথা ও কাহিনী’, ‘সমাজ’, ‘স্বদেশ’, ‘আত্মশক্তি’, ‘নৈবেদ্য’, ‘শান্তিনিকেতন’, ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’, ‘রাশিয়ার চিঠি’, ‘গোবা’ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার অজস্র পবিচয় বর্তমান। এই সব গ্রন্থ ছাড়াও বহু পত্রে, বহু গল্পে, বহু নিবন্ধে ও কবিতায়, তাঁহার বহু আলাপ-আলোচনায় প্রদীপ্ত আত্মসম্মানের দ্র্যতি তাঁহার চাবিত্তিক মহত্বকে উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আত্মসম্মানের আর একটা বৃহৎ পরিচয় আমরা পাই তাঁহার শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়াসে। মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার সপক্ষে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্কুল-কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ আইন-শৃঙ্খলে নিজের আবদ্ধ না করিয়াও দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে ঘরে পড়িয়া নিজেব মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও তিনি শ্রীনিকেতনে করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষার একটি অর্থই স্পষ্ট ছিল মহত্ত্বলাভ, ডিগ্রী অর্জন করিয়া চাকুবিলাভ নয়। আত্মসম্মান অক্ষুর রাখিয়া দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে নিজের চেষ্টায় নিজের

পায়ে দাঁড়াইতে পারে তাহারও অনেক আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন ত্রীনিকেতনে। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার এই আত্মসম্মানবোধ দেশের লোকের নিকট কিন্তু তেমন প্রত্ন্য পায় নাই। দেশের সম্বন্ধে দেশের উন্নতিকল্পে যখনই তিনি সভ্য-ভাষণ কবিতাছেন, দেশের জড়তাকে বা মেকী অতিআধুনিকতাকে যখনই তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন তখনই দেশের লোক তাঁহার উপর যে খড্গহস্ত হইয়াছেন ইহার অজস্র প্রমাণ পুরাতন পত্রিকাব ফাইল ঘাঁটিলেই পাওয়া যাইবে। এ সবার উত্তরও তিনি মাঝে মাঝে দিয়াছেন, কিন্তু সে উত্তরের মধ্যেও তাঁহার শালীনতা তাঁহার আত্মসম্মানের দীপ্তি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার “নিম্নকের প্রতি নিবেদন” নামক কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র এই—

হউক ধৃত তোমার যশ, লেখনী ধৃত হোক

তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে জাগাক সপ্ত লোক।

যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি আমি ছেড়ে দিব ঠাই

কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ ঘেষ, বিক্রপ কেন ভাই।

এই প্রবল আত্মসম্মানের জন্ত তাঁহার প্রতি নিষ্কিণ্ণ নিন্দা বা কটুক্তি বা এ সম্বন্ধে দেশবাসীর ঔদাসীন্যকে তিনিও ঘেন তেমন একটা আয়ল দেন নাই।

আমেবিকার কান্টম্‌স্‌ হাউসের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতায় বিরক্ত হইয়া তিনি যে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এ সংবাদ অনেকদিন দেশবাসীর গোচর হয় নাই। ত্রীমুক্ত অমল হোম প্রণীত ‘পুরুষোত্তম ববীন্দ্রনাথ’ পুস্তক হইতে প্রথম জানিতে পারিলাম যে তিনি যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতায় ক্ষুব্ধ হইয়া ‘সাব’ উপাধি ত্যাগ করেন তখন তাহা অমৃতসর কংগ্রেসে উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, যদিও সে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু এবং প্রধান পাণ্ডাঘের মধ্যে ছিলেন এমন অনেকে যাহারা আজ ববীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। ত্রীমুক্ত অমল হোম লিখিয়াছেন—“শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে পাঞ্জাব-ব্যাপারে বডলাটেব কাছে ববীন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে কোন প্রস্তাবই পেশ বা পাস হ’ল না। অমৃতসরে বেঙ্গল ডেলিগেটদের ক্যাম্পে এ নিয়ে কোন চাঞ্চল্য দেখি নি।... ববীন্দ্রনাথের এই উপাধি বর্জন ব্যাপারটা সেদিনের

কংগ্রেস মহলে কি এ দিনে গান্ধিজীর আসন্ন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কোন দিন বিশেষ কোন সাড়া জাগায় নি।” ববীন্দ্রনাথের উপাধি বর্জনের কথাটাই অনেকে জানেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর পাইয়া তাঁহার আহত আত্মসম্মান যে কি পর্যন্ত মুহমান হইয়াছিল তাহার খবরও উক্ত গ্রন্থে আছে। তখন শান্তিনিকেতনে নিদারুণ গ্রীষ্ম। ভাইসরয়কে চিঠি লিখিবার আট দিন পূর্বে তিনি লেডি বাণু মুখার্জীকে একটি পত্রে লিখিতেছেন—“আকাশের এই প্রতাপ আমি এক রকম সহিতে পারি, কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবেই আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখেব তাপ আমার বুকের পাঁজব পুড়িয়ে দিলে।” মৈত্রেয়ী দেবী ব ‘মংপুতে ববীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আছে—“ভনে যে কি প্রবল কষ্ট অসহ্য কষ্ট হয়েছিল তা আজও মনে করতে পাবি। কেবল মনে হ’তে লাগল—এব কোন উপায় নেই? কোন প্রতিকার নেই? কোন উত্তর দিতে পারব না? এও যদি নীরবে সহিতে হয় তা হলে জীবনধারণ যে অসহ্য হয়ে উঠবে।” ইহাব পর তিনি কলিকাতায় গেলেন বিখ্যাত এক দেশনেতার কাছে প্রেস্টেট মিটিংয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্ত। তিনি রাজী হন নাই। আরও কয়েক জনের কাছে গিয়াছিলেন, কেহই রাজী হইলেন না—ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টেব ভয়ে। তিনি অবশেষে মহাত্মা গান্ধিজীকে জানাইলেন যে তাঁহার সহিত তিনি পাঞ্জাবে যাইতে প্রস্তুত আছেন। গান্ধিজীও ইহাতে সন্মত হন নাই।

তখন তাঁহার নিজের হাতে ধতুটুকু কবিবাব ছিল, তাহাই করিলেন। একখানি অমর পত্র লিখিয়া বর্জন করিলেন ছার ‘সাব’ উপাধিটাকে।

ইহার পর কবি বিলাতে যান। সেখানেও তিনি এক সংবর্ধনা সভায় এ বিষয়ে ভাইকাউন্ট সেনিল, অধ্যাপক গিলবার্ট মারে এবং অন্যান্য মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ফলে কিছুই হয় নাই। পার্লামেন্টের ডিবেটে হাউস অব লর্ডস্‌ জেনারেল ভাষারকে সমর্থনই করেন। এই প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ এও জ সাহেবকে লিখিলেন—“The unashamed condona-

tion of brutality expressed in their speeches and echoed in their news papers is ugly in its frightfulness...The late events have conclusively proved that our salvation lies in our hands...the one path of fulfilment is the difficult path of suffering and self-sacrifice."

যেখানেই দেশের এবং মনুষ্যত্বের মর্যাদা ভুলুষ্ঠিত হইয়াছে সেইখানেই কবি প্রতিবাদ করিয়াছেন। জাপান যখন চীনের উপর অত্যাচার কবিত্তেছিল তখনও তিনি প্রতিবাদ কবিয়াছিলেন, আফ্রিকায় যখন অসহায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শোভা পুরুষদের বীরত্ব মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছিল তখনও তিনি নীরব থাকেন নাই। যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বাঙ্গালার টিলকের অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথই বার্ষিক্যে কারাকন্ড জওহরলালের হইয়া জবাব দিয়াছিলেন মিস র্যাথবোনকে।

রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান তাঁহার নিজের বিবেকের প্রতিই সম্মান। কোন কারণেই তিনি কখনও নিজের বিবেকের নির্দেশ অগ্রাহ করেন নাই। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকতাও অনেকদিন করিয়াছিলেন কিন্তু যখনই সমাজের সহিত তাঁহার ব্যক্তিসত্তার সংঘাত বাধিল তিনি সম্পাদকের আসন হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দেশাত্মবোধের, তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষণার জ্যোতির্ময় দীপ্তি তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যে দেদীপ্যমান, তিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গান রচনা করিয়া কংগ্রেসমণ্ডপে গাহিয়াছিলেন, তিনি বিখ্যাত 'বন্দেমাতবম্' সঙ্গীত নিজের দেওয়া স্বরে গাহিয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস সভাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন— কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সহিত বা দেশের রাজনীতির সহিত সম্পর্ক বন্ধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ রাজনীতির হীন চক্রান্ত ও দলাদলির মোংরা মি তাঁহাব পক্ষে অসহ্য ছিল। বিদেশীর অত্যাচারে কংগ্রেস অধিবেশনও তিনি পছন্দ করিতেন না। দেশের জনসাধারণের সহিত মিলিবার জন্য আমাদের দেশের মেলাগুলিকেই তিনি সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু নিয়মিত খদ্দব পবিতেন না, চরকাও কাটেন নাই। গান্ধীজী যে আদর্শ শাস্তিনিকেতনে প্রচলিত কবিত্তে চাহিয়াছিলেন তাহাও তিনি পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আত্মসম্মানবোধে বুটী বা মেকী কিছু ছিল না, তাহা ছিল তাঁহার বিবেকের অকুণ্ঠিত প্রকাশ। তিনি চিরকাল নবীনের পূজারী। তিনি বারবার দেশের যৌবনকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন—

ওবে নবীন, ওরে আমার কাঁচা

ওরে সবুজ, ওরে সবুজ

আধ-মবাদের ঘা মেয়ে তুই বাঁচা।

কিন্তু অতিআধুনিকদের উন্নতিকতা বা শ্রাকামি তিনি সহ্য করেন নাই। তাঁর ব্যঙ্গে তাহাকে বারংবার ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মসম্মানের আর একটি দিকের কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। তিনি নিজেকে কখনও বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। তাঁহার উদার চেতনা সমস্ত ভারতকে তো বটেই, সমস্ত মানবজাতিকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

কত অজানারে জানাইলে তুমি

কত ঘরে দিলে ঠাই

দূরকে করিলে নিকট বন্ধু

পরকে কবিলে ভাই

তিনি লিখিয়াছেন—

হে মোব চিন্তা পুণ্যতীর্থে

জাগোরে ধীরে

এই ভারতের মহামানবের

মাগর তীরে—

তিনি লিখিয়াছেন—

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো

"জয়তু শিবাজি

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, একসঙ্গে চলো

মহোৎসবে আজি।

আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূর্ব

দক্ষিণে ও বামে

একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌবব
এক পুণ্য নামে

তিনি লিখিয়াছেন—

জনগণমন অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মাঝা মাঝি উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা।

ভাবতেব সভ্যতাকে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে, ভারতের
সমগ্রতাকে, ভারতের ভাব-বিগ্রহকে তিনি সারাজীবন
নানাভাবে বন্দনা করিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি
নিজেকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে কখনও কুণ্ঠিত
হন নাই। তিনি উচ্ছসিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায়
বাঁশি।

* * *
বাংলার মাটি বাংলাব জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা বাঙালীর কাজ, বাঙালীর
ভাষা

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

* * *
তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে
তব আশ্রয়নধেবা সহস্র কুটীরে
দোহন মুখর গোষ্ঠে ছায়া বটমূলে
গঙ্গার পাশাপাশি ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্য কল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গ জননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহনিশি হাস্যমুখে।

আজি কি তোমার মধুর স্মৃতি
দেখিছ শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্রামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে
পারেনা বহিতে নদী জল-ধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎ কালের প্রভাতে।

শুধু বাংলার প্রকৃতিকেই নয় বাংলার ছেলেকে, বাংলার
মেয়েকে, বাংলার সমাজকে, বাংলাব নেতাকে, বাংলার
বাউলকে, বাংলাব কীর্তনকে, বাঙালী-প্রতিভার
বৈচিত্র্যকে তিনি সগৌরবে তাঁহার সাহিত্য-কৃতির মধ্যে
স্থান দিয়া গিয়াছেন। এই কথা আজ বিশেষ ভাবে
উল্লেখযোগ্য, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই আমি
বাঙালী একথা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিতে শঙ্কিত হন
পাছে কেহ তাঁহাদের প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট বলিয়া মনে
করেন। এ আশঙ্কা অমূলক নয় এবং এ আশঙ্কার মূল
আমাদেরই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিহিত আছে। আমরা
সত্যই আজ সকলে মনে মনে প্রাদেশিকতার পঙ্কে
নিমজ্জিত, তাই বাহিরে একটা সর্বভারতীয়তাব মূখোশকে
আঁকড়াইয়া থাকিতে চাই। আসলে আমরা সকলেই
প্রায় ছিন্নমূল ভণ্ডের বেশে সাময়িক আত্মপ্রসাদ লাভ
করিবার জন্ত সচেষ্ট। যে ঘুড়ি আকাশে স্বচ্ছন্দে ওড়ে
সে লাটাইয়ের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করে না। সে
সম্পর্ক স্বীকার করিয়াই সে নিজের আকাশ-ভ্রমণ সার্থক
করিতে পারে। কিন্তু যে ঘুড়ি কাটিয়া গিয়াছে,
লাটাইয়ের সহিত যাহাব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন, সে যতই না কেন
আকাশ-বিহারের আফালন করুক তাহাকে কিছুক্ষণের
মধ্যেই মাটিতে পড়িতে হয়। আমাদের অনেকেরই অবস্থা
অনেকটা এই ছিন্নমূল ঘুড়ির মত।

এই প্রবন্ধে আমি বিশেষ করিয়া ববীন্দ্রনাথের
আত্মসম্মান লইয়াই আলোচনা করিলাম। সে আত্ম-
সম্মানের উৎস যে তাঁহার বিরাট ব্রহ্মোপলব্ধি তাহাই
দেখাইবার জন্ত তাঁহার কাব্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত

করিয়াছি। আমাদের আজ যা অবস্থা তাহাতে তাঁহার কাব্যের মাধুর্য, নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য, সঙ্গীতের ঐশ্বর্য, অথবা গল্প উপন্যাস প্রভৃতির অপূর্ব বসোত্তীর্ণতা লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। সে আলোচনা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আমাদের আছে কি? রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা এবং বিচিত্র কাব্য-সম্ভার স্বস্থ সবল আত্মসম্মানশীল, রসিক, সভ্য, উন্নত সমাজের অনুধাবন যোগ্য। আমরা রবীন্দ্রনাথের গান নাকী স্বরে গাহিয়া এবং রবীন্দ্র-মৃত্যুর বার্থ নকল করিয়া যাহা করিতেছি তাহা নিতান্তই হান্তকর। আমরা যদি কোনদিন স্বস্থ সবল প্রাণবন্ত জাতি হইতে পারি তবেই রবীন্দ্র-আলোচনা আমাদের পক্ষে সার্থক হইবে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান এবং রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ব-মর্যাদাবোধের আদর্শই এখন আমাদের রক্ষা কবিত্তে পারে যদি আমরা সে বিষয়ে সচেতন হই। কিন্তু সচেতন হইব কি?

রবীন্দ্রনাথ যে পরনির্ভরতার গ্লানি হইতে আমাদের উদ্ধার করিবার জন্য প্রবন্ধে পর প্রবন্ধ কবিতার পর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, স্বাধীনতা পাইবার পর আমাদের সেই পরনির্ভরতা, সেই প্রভুদের পদলেহন প্রবৃত্তি যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আত্মরক্ষা, আমাদের চরিত্র গঠন, আমাদের সাহিত্যের বা শিল্পের মান নির্ণয় সমস্ত কিছুই আমরা আজ দিল্লীর দরবারের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। মনে হইতেছে অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীর দরবার আমাদের দাম্পত্য-প্রণয়, পিতামাতাব স্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম এবং বন্ধুত্বের প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট বা উপাধি বিতরণ করিবে এবং আমরা তাহা কৃতার্থ হইয়া গ্রহণ করিব। আমরা যেন মানুষ নই, আমরা যেন একদল ভিক্ষুক, একদল স্তাবক, একদল মতলববাজ অভিনেতা। আমাদের আত্মসম্মান নাই, মেরুদণ্ডের জোব নাই, সত্যকথা বলিবার

সাহস নাই, অত্যাচাবেব বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার স্পর্ধা নাই। চাতুর্যপূর্ণ কৌশলাকৌণ রাজনীতির দাবা-খেলার চালে বারবার মাত হইয়াও আমাদের লজ্জা নাই। আমরা কি রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করিবার যোগ্য?

কিন্তু না, হতাশ হইলে চলিবে না। আত্মন, আজই আমরা সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে আমরা মনুষ্যত্ব-মর্যাদায প্রতিষ্ঠিত হইবই। মনুষ্যত্বই একমাত্র আধার যাহা আমাদের ক্ষুধার অন্ন ধারণ করিবে, মনুষ্যত্বই একমাত্র যষ্টি যাহার উপর ভর করিয়া আমরা বাধার দুর্গম হ্রাবোহ পর্বত লঙ্ঘন করিব, মনুষ্যত্বই একমাত্র আলোক যাহা আমাদের সমস্ত অন্ধকার বিদূষিত করিবে, মনুষ্যত্বই একমাত্র আদর্শ যাহার জন্ত মবিয়াও স্বধ পাইব, মনুষ্যত্বই একমাত্র সঞ্জীবনী যাহা মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার করিবে, মনুষ্যত্বই একমাত্র স্বেদা যাহা মৃত্যুভীতকেও রূপান্তরিত কবিবে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরে।

এই স্বেদা-লাভ করিবার জন্য যদি আমাদের সমুদ্রমন্ডনও করিতে হয়, তাহাও আমরা করিব। আত্মন, আজ আমরা বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথের বিশাল মনুষ্যত্ব দ্বারা উদ্ধৃত হইয়া তাঁহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করি—

চিন্তা যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শিব
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাণতলে দিবস-শরীর
বসুধারে বাখে নাই ক্ষুদ্র খণ্ড করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস-মুখ হ'তে
উচ্ছৃমিয়া ওঠে, যেথা নির্বাসিত শ্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি
বিচারের শ্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেবে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব-কর্ম-চিন্তা আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নারী

শ্রীকালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবৎকালেই তাঁহার সমাজ-সংসারের চারিপাশে বাঙালী নারীর রূপবদল দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শেষ বয়সের কবিতায় সেই আধুনিকাদের উল্লেখ আছে কিন্তু কবিশুষ্ক নিজে তথাকথিত সমাজ-সচেতন ও আধুনিক হইতে পারেন নাই। সেই রূপান্তরিতা নারী তাঁহার চোখে রোমাঞ্চিক হইয়া উঠে নাই। কাজেই তাঁহার কবিত্বদৃষ্টিতে সেই নারীজীবন কাব্যরচনাব পক্ষে শুচিশোভন, রসায়ুকুল বা কলাসম্মত মনে হয় নাই। সেই আধুনিকাদের কবিতায় তিনি প্রকার আসন দিতে পারেন নাই। কবির মনে হইয়াছে তাহাদের স্থান গল্প-উপন্যাসে, কবিতায় তাহাদের সাহায্যে মাধুর্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ‘উপন্যাস হল ঘর-সংসার, আর কবিতা যে নাট্যমন্দির।’

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি,—সারা বিশ্বের সহিত তাঁহার সৃষ্টির যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তিনি যে প্রধানতঃ বাংলারই কবি তাহা তিনি একদিনও ভুলিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন তাহা ভুলিলে তাঁহার সৃষ্টি সর্বত্রগামী হইতে পারে, সর্বাত্মস্বন্দর হইবে না।

বাংলার চিরন্তনী নারীরই তিনি বৈভালিক ছিলেন—যে নারী নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া বিদেশীভাবাপন্ন নব্যা সভ্যা হইয়াছে সেই আধুনিক বিনোদিনীদেব আশ্রয় করিয়া কবি পরিহাসই করিয়াছেন, কোন সরস কবিতা রচনা করিতে পারেন নাই।

বর্তমান যুগের বৈদেশিক ভাবে আবিষ্ট নগরের পরিবেশও বাংলাব চিরন্তনী নারীর পক্ষে সমঞ্জস নয় বলিয়া তিনি তাহাকে গ্রাম্য পরিবেশেই বাণীরূপে দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দিতা নারীর হাতে ‘শত চাঁদে গড়া শোভন শব্দ’—এই শব্দ বাদনে যে সকল অহুষ্ঠানে অধিবাসন করে, সকল যজ্ঞলাচরণে উৎসবলক্ষ্মীর উদ্বোধন করে, তাহার শিরে তীর্থসলিলের ঝারি। সে সত্তা-স্নানান্তে ‘এলো কেশপাশে শুভ্রবসনে চন্দন ঘষে, আলিপনা দেয়, নৈবেদ্য সাজায়। করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।’

উর্বশী কাহারো বধু নয়, বধু হইলে সে গোষ্ঠে যখন প্রাস্তদেহে স্বর্ণাঞ্চল টানিয়া লক্ষ্য নামে, তখন সে কোন গৃহপ্রান্তে লক্ষ্য-দীপখানি জালিঙ না, সে শুদ্ধ অধরাতে নব্রনৈত্রপাতে দ্বিধায় জড়িত পদে কপ্তবক্ষে প্রিয়তমের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিত।

রবীন্দ্রকাব্যের নারীর দুই হাতে দুইটি সোনার গণ্ডী কঁকন দুখানি—এই দুঃখ-দৈন্তে ভরা মানবের গেহে—গৃহলক্ষ্মীব স্বন্দর বন্ধন হইয়া—বিরাজ করে। সে নারীর স্নেহ প্রেম করুণার মাঝে ‘শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।’ সোনার কঁকনের স্থলে সোনার হাতবড়ি কবি তাঁহার কাব্যের নারীর হাতে পরাইতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের নারী বেলা পড়িয়া আসিলে দীঘির ঘাটে ‘জলকে চলে’।

‘যেখানে পথের বাঁকে গেল চলি নত আঁখে

ভরাবট লয়ে কাঁখে তরুণী।’

এ নারী ‘কুহুম ভুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে

প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগ।’

‘বুকভরা মধু’ পল্লীবধু-রূপে সে কঁকনে কঁাথের কলসকে কাঁদাইয়া নদী বা দীঘি হইতে জল লইয়া যায়—তখন

তাহাকে দেখিলে 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে
'আসে জল ভরে।'

শহবেব বাথরুমের নারীরূপের কথা তাঁহার কবিতায়
নাই।

রবীন্দ্রনাথের নারীব হ্রীই জী। তাঁহার কাব্যের
রমণীকে রমণীয়া করিয়াছে সজ্জা নয়, লজ্জা।

রবীন্দ্রনাথের নারীর 'চরণ বাঙাতে কীট দেয় প্রাণ
তাব।'—এ কীট লাফা কীট, রেশম কীট নয়। যে
চিরায়মানাকে কবি বলিয়াছেন—

'এস দ্রুত চরণ দুটি ভ্রূণের পরে ফেলে,

ভয় কোরো না, অলঙ্কারাগ

মোছে যদি মুছিয়া যাক

নুপুর যদি খুলে পড়ে না হয় বেথে এলে।...

হের গো ঐ আধার হ'ল আকাশ ঢাকে মেঘে।

ওপার হতে দলে দলে

বকের শ্রেণী উড়ে চলে

থেকে থেকে শূন্য মাঠে বাতাস ওঠে জেগে।

ঐ যে গ্রামের গোষ্ঠমুখে ধেছরা ধায় বেগে।

হেব গো ঐ আধার হল আকাশ ঢাকে মেঘে।'

সে চিরায়মানা এই বাংলায়ই পল্লীবধু, নাগরিক কবির
আহ্বান একালের কোন নাগবীর উদ্দেশে নয়। কবির
নারীব যে গৃহলক্ষ্মীর রূপ 'মগ্ন থাকে আপনার গৃহের
সঙ্গীতে।'—যে রূপে সে ভক্তদাসী হইয়া খ্যাতিহীন
প্রিয়জনের আরাধনা কবে, কবি নারীর সেই সেবিকা-
রূপের বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

'সে সুন্দর করে

ধূলি কাঁট দাও তুমি আপনার কবে

সেই ত মহিমা ভব সেই ত গরিমা,

সকল মাধুর্য চেয়ে তারি মধুরিমা ॥'

কবি নারীব যে কল্যাণী প্রতিমার জন্ম তাঁহার
সর্বশেষেব গানখানি রাখিয়াছেন—তাহাব কল্যাণময়ী
রূপজী বাংলার চিরন্তনী নারীব।

'প্রভাত আসে তোমার দ্বারে পূজার সাজি ভরি'

সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতিব বরণভালা ধরি।

সদাই তোমার ঘরের মাঝে

নীরব একটি শব্দ বাজে

কাকন দুটির মঙ্গল-গীত উঠে মধুর স্ববে।'

এই কল্যাণীর দীপ্ত শিরে পুণ্য শীতল তীর্থসলিল ঝরে।

এই কল্যাণীর কণ্ঠে বিদুষীদের বরণমালা পবাইবার কথা—

অনাদর বা উপেক্ষা করার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নারীর প্রভাতেব রূপ চায়ের
টেবিলের রূপ নয়। প্রভাতের রূপ—

'আজি নির্মল বায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে,

স্নান অবসানে শুভবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।

তুমি বাম করে লবে সাজি

কত তুলিছ পুষ্পসাজি

দূরে দেবালয় তলে উষাব রাগিণী বাঁশিতে উঠেছে বাজি।

এই নির্মল বায় শান্ত উষায় জাহ্নবীতীরে আজি।

দেবি, তব সৌখিন্যে লেখা

নব অরুণ সিঁদুর বেখা

তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খ বলয় তরুণ ইন্দুলেখা।

একি মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি প্রভাতে দিয়েছ দেখা।'

এই নারী প্রভাতে কেটলি হইতে চায়ের কাথ ঢালে না
পেয়ালায়, ভৃঙ্গার হইতে গদ্যাজল ঢালে তুলসী-তরুর
ঝারায়।

মর্ত্যের যে নারীব আকর্ষণে কবি স্বর্গের অপ্সবী-
মণ্ডলীর রঙ্গসভা হইতে বিদায় লইয়া আসিতে চাহেন—
যে নারী—

'...শিশুকালে

নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে

আমারে মাগিয়া লবে বর—

...একদা স্বপ্নে

আসিবে সে আমার ঘরে সন্নত নয়নে

চন্দনচর্চিত ভালে, রক্তপট্টাঘবে

উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তারপরে

স্বদনে ছুঁদিনে কল্যাণ কঙ্কন করে

সীমন্তসীমায় মঙ্গল সিন্দুর বিন্দু

গৃহলক্ষ্মী স্বখে দুঃখে পূর্ণিমার ইন্দু

সংসারের সমুদ্রে শিয়বে।'

কবি তাঁহাব কাব্যে যে নারীদের কথাই অঙ্কাসহকারে
বলিয়াছেন, কবি প্রত্যাশা করেন সে নারীদেরই হাতে
তাঁহাব গান বিকাইতে পারে। তাঁহাব গানকে লম্বাধন
করিয়া বলিয়াছেন—

‘ভাঙারেতে লক্ষ্মীবধু যেথায আছে কাজে
ঘরে ধায় সে ছুটি পায় সে যখন মাঝে মাঝে ।
বালিশ-তলে বইটি চাপা টানিয়া লয় তারে,
পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া শিশুর অভ্যাচারে
কাজল আঁকা সিঁদুর মাথা চুলের গঞ্জে ভরা ।
শয্যাশ্রান্তে ছিন্নবেশে, চাস কি যেতে ত্বরা ।

বুকের পরে নিখসিয়া শুদ্ধ রহে গান,

লোভে কম্পমান ।’

আধুনিক বিলাসিনীদেবও অনেকে সন্তানের জননী হন,
কিন্তু তাঁহারা কি কবির রুপ্তি জননীর কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ
মিলাইয়া শিশুসন্তানকে বলিতে পারেন ?—

ছিল আমার পুতুল খেলায়

প্রভাতে শিবপূজার বেলায়

তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি ।

তুই আমার ঠাকুরের সনে

ছিল পূজাব সিংহাসনে

তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি ॥’

কবি যে মায়েব কথা স্ববর্ণ কবিতা শিশুকে
বলিয়াছেন—

‘মায়ের প্রাণে তোমার লাগি

জগৎমাতা রয়েছে জাগি

ভুবন মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন ভুলানি ।’

এই মা নিশ্চয়ই আধুনিকা মা নয়। কোন কলেজের
বালিকাও রবীন্দ্রনাথের চিন্তে কবিত্বের প্রবেশা যোগায়
নাই। যে বালিকা তাঁহার চিন্তে রস সঞ্চার করিয়াছে
সে বালিকা এই—

‘ভরাঘট লয়ে মাথে

বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডানহাতে

ধরি শিশুকব, জননীর প্রতিনিধি,

কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি ।’

অথবা

‘এক কক্ষে ভাই লয়ে অল্প কক্ষে ছাগ

দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ ।’

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মুকুলিতা নারীর রূপ এই।

নারীর কথা বলিতে গেলেই কবির লেখনীতে পল্লী
পরিবেশ আসিয়া পড়িয়াছে—পৌব পটভূমিকায় তাঁহার
প্রবেশ নারীকে তিনি যেন আনিতে চাহিতেন না।
ইহার অঙ্গ দৃষ্টান্ত তাঁহার কবিতা হইতে দেখিয়া যায়।
ছুটির উদাহরণ দিই। “বিরহ” কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

‘তুমি যখন চলে গেলে তখন...

চৈত্র মাসের নানা ক্ষেতের নানা গন্ধ নিয়ে

আসতেছিল তপ্ত হাওয়া মুক্ত দুয়ার দিয়ে ।

ছুটি ঘুঘু সারাটা দিন ডাকতেছিল আশ্চর্যবিহীন

একটি ভ্রমর ফিরতে ছিল কেবল গুলগুনিয়ে ।...

তুমি যখন চলে গেলে তখন দুই পহর ।

শুষ্কপথে দৃষ্টি মাঠে রৌদ্র খরতর ।

নিবিড় ছায়া বটের শাখে কপোত দুটি কেবল ডাকে,

একলা আমি বাতায়নে শূন্য শয়ন ঘর ।’

“গ্রাম” কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গায়ে,

বাঁকা পথের ডাইন পাশে ভাঙ্গাঘাটের বাঁয়ে ।...

এই দীঘি ঐ আমেব বাগান, ঐ যে শিবালয়,

এই আদ্যিনা ডাক নামে তাব জানে পবিচয় ।

এই পুকুরে তারি সঁতার কাটা বাবি,

ঘাটের পথ-রেখা তারি চবণ-লেখাময় ।’

যে নারী রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের প্রীতিপ্রদা লাভ
করিয়াছে সে বিদেশী প্রভাববর্জিতা সাধারণ ঘবেব পল্লী-
বাসিনী হিন্দুনারী। রবীন্দ্রনাথের শিষ্ঠগণ সমাজসচেতন
নয়, আধুনিক মনোভাবে আবিষ্ট নয় বলিয়া তরুণ-সমাজে
ধিকৃত হইতেছেন—হায কবিশুদ্ধ, শিষ্ঠদের চেয়ে তুমিই
যে ঢের বেশী অপবোধী ।

“রবি বই কার দেখে সে মুখ—
কবি বই কার কথায় থাকে ?”

শ্রীমতাং গেহে জন্ম, অত রূপ, অত ঐশ্বর্য, অমন লোকোত্তর প্রতিভা, অমন কণ্ঠ, অত ভাববিভূতি—জীবিতকালে এমন বিশ্বব্যাপী সম্মান ও খ্যাতি কোন যুগেব কোন দেশেব কোন কবির ভাগ্যে ঘটে নাই—যাহা লাভ করিয়াছিলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ। তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, তাঁহার স্নেহকণা পাইয়াছি ইহাই পরম সম্পদ মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সূর্যের স্নায়ই যশের সর্বোচ্চ শিখরে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিলেন। I awoke one morning and found myself famous এ দাবি তিনি করেন না। অর্ধ শতাব্দীর আগেকার কথা বলিতেছি। আমাদের বর্ধমান জেলার জামনাব কাছে ‘ন পাড়া’ পল্লীগাম। সেখানকার প্রসন্নকুমার মজুমদার পুঁটিয়ার প্রান্তঃস্বরগীয়া মহারাণী শবৎসুন্দরীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার অন্নদান ও বদান্ধতা দেশবিখ্যাত ছিল। তাঁহার পুত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সাব-ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তদানীন্তন রবি-উপাসক-দলের অত্যন্ত প্রধান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া লেখেন—

“শামলা আঁটিয়া নিত্য

তুমি কর ডেপুটিব।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘কল্পনা’ কাব্যখানি উৎসর্গ করেন শ্রীশচন্দ্রের নামে। ‘ছিন্ন পত্রে’ একখানি চিঠিতে ‘রবি উপাসক’ কথাটি আছে—তাহা শ্রীশচন্দ্রেরই লেখা।

শ্রীশচন্দ্র নিজে স্মৃতি-সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁহার ‘শক্তি-কানন’ ‘ফুলজানি’ ‘বিশ্বনাথ’ প্রভৃতি উপন্যাস যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছিল। ‘বিশ্বনাথ’ বা বিশেষ ডাকাত অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। উহা এখন আর পাওয়া যায় না। কথাটিও রূপায়িত হয় নাই। ওইকপ একখানি মদগ্রস্ত লুপ্ত হওয়া বেদনাদায়ক। জনসাধারণের স্মৃতি যে

কত অল্পদিন স্থায়ী তাহা ইহাতে বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র উভয়ে ‘পদবিন্দাবলী’ নামে একখানি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদাবলীও প্রকাশ করেন। শ্রীশচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’, ‘সাধনা’ ও ‘সাহিত্যে’ লিখিতেন। ‘বিশ্বনাথ’ ধাবাবাহিক-ভাবে বোধ হয় ‘সাহিত্যে’ই প্রকাশিত হয়। শ্রীশচন্দ্র কবিতাও লিখিতেন, তবে খুব কম। ‘সাধনা’য় তাঁহার বালিকা জ্যোষ্ঠা কন্তা ‘মইলু’ নামে যে কবিতাটি লেখেন আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল।

শ্রীশচন্দ্র কেবল নিজেই ‘রবি-উপাসক’ ছিলেন না, তাঁহার পরিবারের অনেককেই দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং একটি স্নিগ্ধ স্তম্ভব পরিমণ্ডল গঠন করিয়াছিলেন। সকলেই একভাবে অল্পপ্রাণিত।

শ্রীশচন্দ্রের সহোদর শৈলেশচন্দ্র মজুমদারও বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি রসবচনায সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ‘সাহিত্য’ ‘প্রদীপ’ ‘সাধনা’ ‘বঙ্গদর্শনে’ তিনি লিখিতেন। তাঁহার “দাদার কাণ্ড,” “আমার সম্পাদকী” আমরা ছাত্রাবস্থায় বারবার পড়িয়াছি। তাঁহার ‘চিত্র বিচিত্র’ অতি স্তম্ভব সুপাঠ্য গুস্তক, উহাও আব বাজারে পাওয়া যায় না। উহার পূর্ব মুদ্রণ বাঙ্গালীয়া। শৈলেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের এস্টেটের পতিসবের তিনি নায়ক ছিলেন এবং নবপর্যায়েব ‘বঙ্গদর্শনে’র তিনিই প্রকাশক, ২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটেব বিখ্যাত মজুমদার লাইব্রেরীর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। এমন সৌম্য সবল মহাত্মা মূর্তি বিবল।

এই একই পরিবারের স্নেহোদয় মজুমদার জয়পুর্বেব স্বনামধন্য সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ের জামাতা। শাস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ সহকর্মী এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সী ভক্ত। তিনি মজুমদার লাইব্রেরীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং রবিপরিমণ্ডলের একটি সম্পদস্বরূপ ছিলেন। অমন ভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য অথবা কাহাকেও পড়িতে দেখি নাই। যেমন স্তম্ভব মূর্তি তেমনি স্তম্ভব ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের

কবিতার অমল আৰুতি-কার কমই দেখিয়াছি। এই সঙ্গে শৈলেশচন্দ্রের ভ্রাতৃপুত্র প্রবোধচন্দ্র মজুমদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদয় স্বকণ্ঠ ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। গোটা পরিবারটি রবি-উপাসক।

২৯ নং শাঁখারিটোলা লেন (এক্ষণে মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট) বাসাবাড়ির একটি কক্ষে তাঁহাদেব পাঠগৃহে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা হইত। উহা যেন রবীন্দ্র-উপাসকদেব শ্রীধাস অঙ্গন ছিল। আমি তখন এনট্রান্স পড়ি, বুঝিবার শক্তি না থাকিলেও মাঝে মাঝে বাইতাম। ক্ষীরোদচন্দ্র আমার সহপাঠী ছিলেন, তাঁহার নিকট নূতন নূতন গান শুনিবার জগুই বেশী আগ্রহ

ছিল। বৈকালে ছাদে বসিয়া তিনি নানা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিতেন, আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম।

নব পর্ষদের 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক মজুমদার লাইব্রেরীর শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। ওইখানেই বহুৎ রবি-পবিত্রগুলের আসর স্থানান্তরিত হইল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসিতেন। কৃত গুণী-জ্ঞানীর সমাগম হইত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক মহোৎসব, নিজেই এক মহাতীর্থ। আমি তখন কলেজে পড়ি—মাঝে মাঝে সেখানে বাইতাম। কিন্তু ২৯নং শাঁখারিটোলার সেই ক্ষুদ্র স্নিগ্ধ আসবটিক জগু ব্যথা অসুভব করিতাম। একদিন দেখিলাম সে কক্ষটি রুদ্ধ, জনপ্রাণী নাই—

ধুলোট হয়ে গেছে, ভাঙিয়া গেছে মেলা—
পাতার চোঁড়া লয়ে কাকেরা করে খেলা।

কবি-প্রশস্তি

সন্তোষকুমার দে

জয় জয়, তব জয়,
কবি জয় জয়, তব জয়।

শত বরষের এপারে দাঁড়ায়ে কবি,
উদার আকাশে দেখি উজ্জল ববি।
জয় জয় তব জয়, কবি জয় জয় তব জয়
বিশাল জাতির হৃদয়-আকাশে তোমার অভ্যুদয় ॥

অন্ধকারের বন্ধন নাশি কবিয়াছ সচেতন,
অশান্ত দেশে গড়িয়া তুলিলে শান্তির নিকেতন।
বিশ্ব যেক্ষণ এক নীড়ে ঠাঁয়
বিশ্বভারতী সেথা শোভা পায়,
জাগিয়াছে দেশ তাহারই প্রভায় করি প্রাণ সঞ্চয়।
বিশাল জাতির হৃদয়-আকাশে তোমার অভ্যুদয় ॥

ভারতভাগ্যবিধাতার দান ঋষি কবি হে মহান,
তোমাতে প্রকাশে ব্যাস-বাক্যীকি মহিমা যে মহীয়ান।
কাব্যলক্ষ্মী মালা পরায়,
স্বরস্বম্বরী বন্দনা গায়,
নিখিল বিশ্ব পুলকিতকায় তোমারে বরিয়া লয়।
বিশাল জাতির হৃদয়-আকাশে তোমার অভ্যুদয় ॥

কবি-প্রণাম

সন্তোষকুমার দে

হে ভারতভাগ্য, শত বরষের পারে,
জগতজনের বন্দনা বাজে সঙ্গীতে শতধারে।

হে অমর কবি, তোমার নয়ন-প্রসাদে জাগিছে জাতি,
নীরবে নিভূতে বঞ্চিত চিতে জ্বলেছে আশার বাতি।
দেখায়েছ পথ বিশ্বজনে এক নীড়ে দিয়ে ঠাঁই,
বিভেদ-বিরোধ, বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুই তো নাই ॥

হে কবি, তোমার সৃষ্টির পথ বিচিত্র বহুধার,
শত শতাব্দী পাবেও জাগাবে মাহুষ্যেব প্রাণে সাড়া।
তব সঙ্গীতে মাতিবে ধরণী যতদিন রবে গান,
বিবহে-মিলনে, জনমে-মরণে তুমি আছ দিনমান ॥

হে কবি, বিশ্বমানবের আজি মহামিলনোৎসবে
এক আঙ্গিনায় তোমার পূজায় মিলিয়াছে আজি সবে।
জগৎ জুড়িয়া বন্দনা গান বাজে তাই বারে বারে,
হে ভারতভাগ্য, শত বরষের পারে—

প্রণামি সবে তোমারে ॥

অনি-প্রশস্তি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ নতুন করিয়া গড়িয়া ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় এ সাহিত্য যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, বিশ্বসাহিত্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। এ কথা আজ আমরা সর্ববে ঘোষণা করিয়া ধন্য হইতেছি। নীমাসংখ্যাহীন অবদানপরম্পরায় রবীন্দ্র-সাহিত্য মহনীয়। জগতের কোন একটি বিশেষ লেখক সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এমনই বহুমুখী যে অল্প পরিসরের মধ্যে সে বিরাট সাহিত্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। কাব্যে সঙ্গীতে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, সমালোচনায়, ধর্মসম্বন্ধীয় নিবন্ধে, পবিভাষা সঙ্কলনে—সাহিত্যের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যাহা তাঁহার দানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই! বাংলা সাহিত্যের বিরাট মানদণ্ড-স্বরূপ যে রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ আমাদের মুখ চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশমান, নগাধিরাজ হিমালয়ের মত তাহার উত্তম শিখরদেশ সাধারণ দৃষ্টিব নাগালের বাহিবেব জ্বিনিস।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল প্রেরণা সৌন্দর্য ও অল্পভূতি। তাহার বাহ্য অলঙ্কার প্রকাশ হইয়াছে অপূর্ব শব্দ-চয়ন, ছন্দধ্বনি ও অলঙ্কার প্রকাশের কৌশলের দ্বারা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্যগুলির মূল ভিত্তি হইতেছে সৌন্দর্য্যভূতি। Leonardo-র Gioconda অথবা বের্টোল্ডের পরিকল্পিত Symphony-র যে-সৌন্দর্য, ইহাদের প্রথমটিব মূলে আছে রেখা ও বর্ণের অপূর্ব সমাবেশ ও দ্বিতীয়টিব মূলে স্বকৌশল ধ্বনি-সমৃদ্ধ। তথাপি এ কথাও অনস্বীকার্য যে এই দুইটি শিল্প-কার্য আমাদের চিত্তে যে কল্পলোক রচনা কবে তাহা নিশ্চয়ই কেবলমাত্র দৃশ্যমান বর্ণ-সমষ্টি বা শ্রুতধ্বনিব সমষ্টি

উদ্ভূত হইতে পাবে না। বস্তুতঃ এই আনন্দলোক সৃষ্টির মূলে আছে, এই ধ্বনি ও বর্ণনাভীত কোন অদৃশ্য প্রভাব এবং একটি ইন্দ্রিয়াভীত অল্পভূতি। আবার, যদিও এই বর্ণ ও ধ্বনির মাধ্যমেই সেই অতীন্দ্রিয় আত্মিক অল্পভূতির বিকাশ সম্ভব হয়, ইহাও নিশ্চিত যে এই অল্পভূতি বর্ণ ও ধ্বনির বহু উর্ধ্বে স্থাপিত এক মহত্তর সত্য। কবি রসবদ্ধ বাক্য পাঠ করিয়া বা রচনা করিয়া যে আনন্দাল্পভূতির সন্ধান পান, একজন খ্রীষ্ট, বুদ্ধ অথবা চৈতন্যসদৃশ ব্যক্তি বিশুদ্ধ আত্মিক উপলব্ধি পথেই সে আনন্দের সন্ধান পাইতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষমতা নিম্নতর কোন মানুষের আয়ত্ত হইবার কথা নয়। কাব্য-সাহিত্যের এই মূল স্রষ্টা দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমরা দেখিতে পাইব রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য-সাহিত্যেব ক্ষেত্রে ভগীরথের গ্রায় নবতীর্থ-জল আনিয়াছেন তাঁহার প্রতিভার গভীর শঙ্খধ্বনিব সহযোগে। এই জাতির মর্মস্থল তাঁহার চিন্তার আলোকপাতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় প্রতিভাব চাবণ তিনি। দেশে যে-প্রতিভাব সৃষ্টি আদর লাভ করিয়াছে, যে-ভারতীয় প্রতিভার সৃষ্টি উপনিষদ্ পাঠ করিয়া দার্শনিক মপেনহর বলিয়াছিলেন—উপনিষদ্ তাঁহাব জীবনে সাধনার কারণ হইয়াছে, মৃত্যুভেদে তাহাই হইবে, যে-ভারতীয় প্রতিভাব সৃষ্টি শকুন্তলা পাঠ করিয়া কবির গ্যেটে বলিয়াছেন—যদি কেহ এক স্থানে শরতের বসন্তের সম্পদ—স্বর্গের ও মর্ত্যের মিলন প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে শকুন্তলা পাঠ করিলে তাঁহাব সেই বাসনা পূর্ণ হইবে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতীয় প্রতিভার মূর্ত প্রতীক, নানা ভাবে নানা রূপে ভাবতীয় অল্পভূতি ও ভাবরাশিকে তিনি প্রতীচ্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার

শিখালদহ হায়ে শিলাইদহ

শান্তিনিকেতনের বন্ধুব খোঁষাই থেকে শিলাইদহের প্রমত্ত পক্ষা

অনেক দূৰ। 'উর্মিল লাল কাঁকবেব নিঃশতস্থ ভোলপাড়' থেকে

শান্ত বৃপসীৰ মতো প্রসাবিত তনু পক্ষাব উচ্চ-তটতল—কাঁব মনেব

এই ক্রমঃ পাববত'নেব বিচিত্র-পথ হয়ত শান্তিনিকেতন থেকে

শিলাইদহ পর্যন্ত প্রসাবিত। বাবংবাব কাঁবব এই পথ-পাবিত্র্যাব সহস্র

স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বয়েছে শতাব্দী-প্রাচীন শিখালদহ।



শিখালদহ ১৩৬৮



পূর্ব রেলওয়ে

STATIONER

প্রতিভার আলোকরশ্মি-সম্পাতে সাহিত্যের যে-শাখায় তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাই সোনা হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ তাঁহার ছোট ছোট গল্পগুলির কথা বলিব। ছোটগল্প বলিয়া কোন জিনিস রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। যাহা ছিল, তাহা ছোট-গল্প নহে, কাহিনী। অথবা অসার্থক উপত্যাসের কয়েকটি অধ্যায়। কাহিনী এবং ছোটগল্পে প্রভেদ বিস্তর। ছোটগল্প একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গি “কথা”র। আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যে “কথা” ছিল। যেমন, কথাসরিৎ-সাগর ও পঞ্চতন্ত্র। দত্তীয় দশকুমার চরিত। গোড়লকৃত উদয়-সুন্দরী কথা ইত্যাদি। ছোটগল্প এই শ্রেণীর “কথা” নয়। ইহাতে একটি বিশেষ ধবনের আঁট প্রকাশিত। অথবা যে কথা এইরূপ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই ছোটগল্প। যে কথায় এই মাধ্যম ব্যবহৃত হয় নাই তাহা ছোটগল্প নহে—কাহিনী মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী সাহিত্যে conte বলিয়া এক শ্রেণীর ‘কথা’ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আলফাস দোদে প্রভৃতি ক্ষমতাশালী কথ্য-লেখকের হাতে conte অপূর্ব সামান্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই conte ক্রমে ফরাসী দেশ হইতে ইউরোপের সর্বস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইহা একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। ফরাসী conte বিভিন্ন দেশে গিয়া তাহার রূপ বদলাইয়া ফেলিল, বিভিন্ন লেখকের হাতে একটু-আধটু অদলবদল হইতে লাগিল। তথাপি এই মাধ্যমের মূল কোশলটি সকলেই যথাযথভাবে অভ্যাস করিলেন। এই মূল কোশলটি হইল ছোট-গল্পের ‘মূহূর্ত’ বা moment। এই মূহূর্ত সৃষ্টিই ছোট-গল্পের আঁটের প্রাণ-বস্তু। যিনি ইহা যত যথাযথরূপে ও যত স্বচ্ছভাবে খাটাইতে পারেন, ছোটগল্প লেখক হিসাবে তিনি তত সক্ষম, এ কথা অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে conte আমদানি করিলেন, যাহার ফলস্বরূপ আমরা পাইলাম ‘গল্পগুচ্ছে’র অপূর্ব গল্পগুলি। ১২৮৪ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় তাঁহার

প্রথম ছোটগল্প “ভিখারিনী” বাহির হয়। পরে পরে তাঁহার ছোটগল্পগুলি বাহির হইতে লাগিল। তখন বাঙালী পাঠকের মনে সেগুলি একটি নূতন বাগিণীর মত ধ্বনিলোক স্বজন কবিতা চলিল।

ফরাসী সাহিত্যের গল্পের নিয়মগুলি এত স্থিতিশীল ও স্থিতিশীল যে তাহার সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্রমগুলির তুলনা করা চলে। প্রথম অংশটি ‘ভূমিকা’, দ্বিতীয় অংশ ‘সম্প্রসারণ’, তৃতীয় অংশ ‘পুনরাবৃত্তি’, চতুর্থ অংশ ‘বিরতি’ ও সর্বশেষ অংশ coda বা ‘ক্লাইমাক্স’। ছোটগল্পের বিভিন্ন অংশেও এইরূপ ক্রম বজায় রাখিতেই হইত, এবং এই স্বর্ণ-নিগড়ের মধ্যে বন্দিনী কথা-সরস্বতী শিল্পীর সাধনা ও উপাসনায় পরিভূষ্ট হইয়া যে অমর বর দান করিতেন শিল্পীকে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা পাই জুল ক্রোৎ, ফ্রান্সোয়া কোম্প, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আনাতোল ফ্রান্সের অনবদ্য ছোটগল্পগুলি। আনাতোল ফ্রান্সের ‘জুডিয়াস শাসনকর্তা’ নামক অপূর্ব গল্পটিকে প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকবা ছোটগল্প-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাতে ছোটগল্পের ক্রমগুলিকে গোঁড়া শিল্পীর মত মানিয়া লইয়াও শেষ অল্পচ্ছেদে লেখক একটি অদ্ভুত ও আশ্চর্য-জনক মুহূর্তের সৃষ্টি করিয়া ছোটগল্প শিল্পের প্রকৃত রূপটিকে সর্বমুখে প্রকটিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটগল্প এ বিষয়ে একেবারে নিখুঁত ফরাসী আঁট। যেমন অপূর্ব তাহার পরিবেশ, তেমনি অপূর্বতর তাহার মুহূর্ত ‘সৃষ্টি’। মুহূর্ত সৃষ্টির সাহায্যেই ছোটগল্প অমর হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অমর মুহূর্ত সৃষ্টি কবিয়াছেন তাঁহার “পোস্টমাস্টার”, “কাবুলিওয়ালার”, “দৃষ্টিদান”, “ব্যবধান”, প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলিতে। এই মুহূর্তগুলি এতই সুস্পষ্ট ও যথাযথ, যে কখনও ছোটগল্প পড়ে নাই বা ছোটগল্পের আঁট যে জানে না—সেও এগুলির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি অল্পভূতি-প্রধান, সে যুগে বড় বড় শিল্পীদের গল্প ছিল এ ধরনের সূক্ষ্ম অল্পভূতির পরিবেশনের মাধ্যম, এ যুগে প্রতীচ্য শিল্পীদের মধ্যে

ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ডের গল্পগুলি এ দিক দিয়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

বলা বাহুল্য, অল্পভূতিপ্রধান না হইয়া ঘটনাপ্রধান হইয়াও ছোটগল্প সাফল্য অর্জন করিতে পাবে এবং ভালভাবেই পারে—তাহাব প্রমাণ আধুনিক যুগের অধিকাংশ লেখকের গল্প। রবীন্দ্রনাথের ঘটনাপ্রধান গল্পের মধ্যে “গুপ্তধনে”র কথা হঠাৎ মনে পড়িল। এই গল্পটাকে আধুনিক কালের ঘটনাপ্রধান যে কোনও ছোটগল্পের মধ্যে সামবে ও সমস্মানে চালানো যায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে ফরাসী conte আর ধ্বনিত হয় নাই, যেমন “বৈষ্ণবো” প্রভৃতি গল্প। ফরাসী শিল্পের মাসাশৃঙ্গল সবলে ছিন্ন করিয়া তাহাব শক্তিশালী মন তখন গল্প লিখিবার নিজস্ব একটি অপূর্ব ধারা আবিষ্কার করিয়াছে যাহাব চরম পরিণতি আমরা দেখিতে পাই ‘চতুবঙ্গ’ এবং ‘দামিনী’ ‘খ্রীবিলাস’, ‘জ্যাঠামশাই’ প্রভৃতিব মধ্যে। ইহার পৃথক পৃথক গল্প নয়। একই সূত্রে গ্রথিত কয়েকটি অমূল্য মণিব নিপুণ হার—শুধু বঙ্গসাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যের দববারে ‘চতুরঙ্গ’র জুড়ি মেলা ভাব। ‘চতুরঙ্গ’র গভীর অন্তর্দৃষ্টি সাধারণ জ্ঞেয়ব আয়ত্তের বাহিরে।

রবীন্দ্র-প্রতিভাব বহুমুখী দিকের একটি মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। সমস্ত দিকের সম্বন্ধে বলিবার অধিকার আমার নাই। তাহার সম্বন্ধে আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে তাহার বাল্য ও কৈশোরকালেও তাহার প্রতিভার দীপ্তি সে-যুগের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহাদেব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই এই অদ্ভুত বালক ও কিশোর সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চের ‘সাধারণী’ হইতে নিম্নোক্ত অংশই বিশিষ্ট প্রমাণ।

“আমরা নিরাশ মনে নবগোপালবাবুকে অভিসম্পাত করিয়া ফিবিয়া আসিতেছি এমন সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু দিল্লীর দববার সম্পর্কে একটি কবিতা ও একটি গল্প বচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষছায়ে দুর্বাসনে

উপবিষ্ট হইয়া তাহার কবিতা ও গল্পটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্রনাথ তখনও বালক, তাহার বয়স যোল কি সতেরো বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাহাব কবিত্তে আমরা বিস্মিত ও আশ্রিত হইয়াছিলাম। তাহার স্বকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। একজন সুপরিচিত কবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, যখন এই কবি প্রস্তুতিত কুস্মমে পবিণত হইবেন, তখন ছুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্নলাভ হইবে।”

এই কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র সেনের ‘আমাব জীবন’ গ্রন্থের চতুর্থভাগে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন।

“স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে [বসন্ত ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ] আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে “নেশনাল মেলা” দেখিতে গিয়াছিলাম।... একজন সুপরিচিত বন্ধু মেলাব ভিড়ে আমাকে ‘পাকডাও’ করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমাব সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পবিহিত একটি স্থলর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শাস্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—‘ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।’ তাহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোশাক। হানিমুখে কবয়র্দন কার্যটি শেষ হইলে তিনি পকেট হইতে একটি ‘নোটবুক’ বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনীলাঞ্জনকণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্মৃটনোমুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।”

যে রবীন্দ্রনাথের যশঃগৌরব উত্তরকালে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে—সেই রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে খ্যাতিলোলুপ অকুণ্ঠ মনোব সমস্ত উৎসাহ ঢালিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিদের নিজে যাচিয়া যাচিয়া কবিতা

শোনাইতেছেন ও গান গাহিতেছেন—এ ছবিটি আমাদের বড় মুগ্ধ কবে। কল্পনামেত্রে আমরা দেখিতে পাই হিন্দুমেলায় লোকেব ভিড়ের আড়ালে একটি নিভৃত বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান যশঃলোলুপ সলজ্জকণ্ঠ কিশোর রবীন্দ্রনাথকে। নবীনচন্দ্র সেনেব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই।

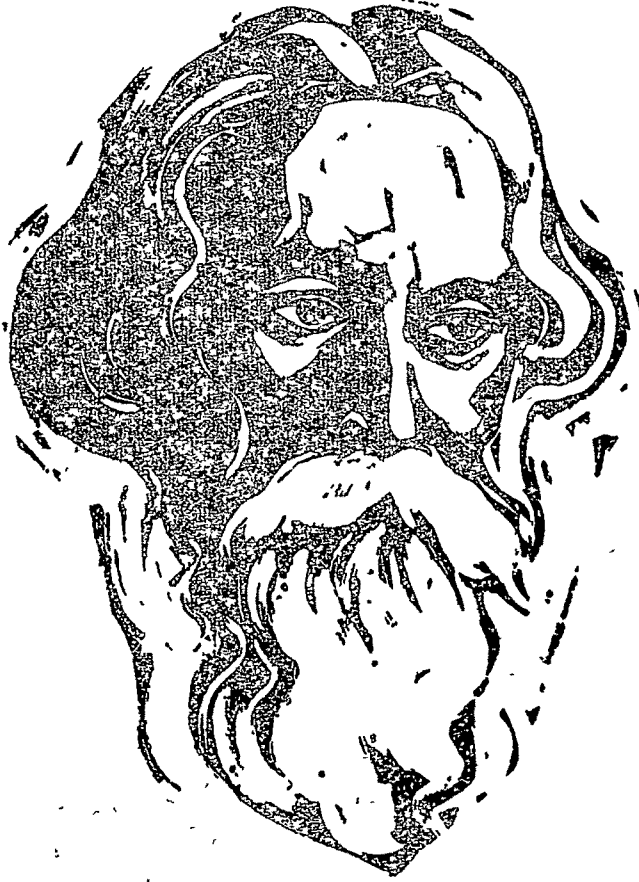
রবীন্দ্রনাথের কথা শেষ হইবার নয়, সে চেষ্টা করিব না। তবে একটি কথা না বলিলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না—সেটি হইতেছে রবীন্দ্রনাথের উপর বিশ্ব-প্রকৃতির অদ্ভুত প্রভাব। তাঁহার সারা কাব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই দুইটি উৎস্বক নেত্রের পিপাসুদৃষ্টিব পরিচয় ও তাহাদের বস দর্শন কবিবার লোকান্তর ক্ষমতা। উপনিষদের ঋষিরা ভারতের কোন্ সুপ্রাচীন বনাস্থলীতে বলিয়া নিভৃত ধ্যানে প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন, জগতের সত্যমূর্তি ‘বসো বৈ সঃ।’ কিংবা ‘আনন্দাদেব খন্নিমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে।’

আজ এই ব্ল্যাকমার্কেটের দিনে, পরস্পর পদগোবব-লোলুপতার হানাহানিব দিনে, স্বার্থাঘেষী ভক্তদিগের মিথ্যাবাদিতার দিনে, কে বুঝিবে উদাসীনতার এই সেই অমর বাণী। প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে যাহারা গন্ধমধুর অক্ষরারের পথে দাঁড়াইয়া বন, আকাশ, নক্ষত্র ও নদীতটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—‘পশুং দেবস্তু কাব্যং ন মমাব ন জীর্ঘ্যতি অহো’, বিশ্বদেবতার এই অমরকাব্য প্রত্যক্ষ কর, যা কখনও জীর্ণ হয় না, কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। চিবানন্দলোক হইতে আমাদের চিরনির্বাসন হইয়াছে, মানবপ্রকৃতির সেই মিলনতীর্থ আজ নাই। আজিকার দিনে রবীন্দ্র-সাহিত্যেব এই একটি অতি বিরাট দিককে আমরা চিনিতে পারিব কজন? যাহাদের পেটে অন্ন নাই, দৈনন্দিন অন্ন-সংস্থানেব জন্ত যাহাদের ছুটাছুটি করিতে হয় দু-বেলা, তাহাদের বনাস্থলীর্ষে বসন্তের শিবরণ দেখিবার অবকাশ নাই। যাহাদের আছে, তাহারা সহস্র

হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে কোটিপতি হইবাব স্বপ্ন দেখিতেছেন—তাঁহাদেরই বা রবীন্দ্রকাব্যের এই অমৃত-লোকে বিচরণ করিবার সময় কোথায়?

কবিগুরুকে আজ আমাদের অভিনন্দন জানাই। তিনি প্রকৃতির সহিত শিশুমনের সংযোগসাধন করিবার জন্ত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গড়িয়াছিলেন। মুক্ত বাতাসে ছায়াঘন আম্রকুঞ্জে যাহাতে শিশুরা বলিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, শৈশবেব মাহেন্দ্রক্ষেপে যাহাতে শিশু দুই চোখ মেলিয়া সুন্দর বিশ্বের দিকে চাহিতে শিখে, ইহাই ছিল তাঁর এই ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা শান্তিনিকেতন অমর হোক ও সেই সঙ্গে আমাদের বস্তুবাদী জীবনযাত্রার পথ কিছু সুবিয়া যাক। আমরা যেন রবীন্দ্র-উৎসবকে প্রাণশূন্য ছজুকে পরিণত না করি, যেন তাঁহার কাব্য আমাদের করে দৃষ্টিমান এবং সে দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্বদেবতাব অমর কাব্য যাহার ক্ষয় নাই ও যাহা জীর্ণ হয় না—তাহা পাঠ করিবার ক্ষমতা লাভ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের নামে একটি রাজপথ বা একটি উত্তান অথবা একটি নগরী করিয়া তাঁহার জন্মদিনে অবকাশ ঘোষণা করিয়া আমরা তাঁহাকে কতটুকু সম্মান দেখাইতে পারিব? তাঁহার অমর কীৰ্তি তাঁহাব রচনাবলী বহু যুগ-যুগান্তর লোকে তাঁহার বাণী পৌছাইয়া দিতে পারিবে। আমাদের ইট কাঠ পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ অতদূর যাইতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না।

হে অমর কবি, স্বাধীন ভারতের মুক্তিকায় দাঁড়াইয়া আমরা শুভ ২৫শে বৈশাখে তোমার কথাটি স্মরণ কবি। তুমি দেশেব মুক্তিসাধনাব অগ্রতম অগ্রদূত, কিন্তু স্বাধীন দেশকে তুমি দেখিয়া বাও নাই। আজ তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন বিশ্বব মাঝে নগৌরবে দাঁড়াইবার শক্তি আমরা লাভ করি। দেশেব গৌরবময় ঐতিহ্য যেন আমাদের আচরণে লজ্জিত হইয়া না পড়ে। আমরা তোমাকে অন্তরের সাদর অভিনন্দন জানাই।



পূর্ব দিগন্তেব যে ববিবন্দী ধবগীর দিক্দিগন্ত আলো ও আনন্দে
উদ্ভাসিত কবেছিল, চিবকালের ববগীয সেই
বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

GOOD YEAR

ডায়ারীতে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

সনৎকুমার গুপ্ত

সাহিত্য-পথের পথিক হইয়া পথ পর্যটন করিতে করিতে যাত্রাপথেই যে পথিকেব জীবন শেষ হয়, সেই অপরিচিত পথিক ‘সাহিত্য-সেবক’ নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০) তাঁহাব ডায়ারী বা দিনলিপি মध्ये সমসাময়িক সাহিত্য-চিন্তার যে উপকরণ বাখিয়া গিয়াছেন, তাহাব মধ্য হইতে কেবল রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কীয় তথ্যগুলি চয়ন করিয়া এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর সাহিত্য-সম্পাদক স্ববেশচন্দ্র সমাজপতি ‘সাহিত্য সেবকের ডায়ারী’ নামে এগুলি ‘সাহিত্যে’ ১৩১০-১১ ও ১৩১৩-১৫ সালে প্রকাশ করেন।

নিত্যকৃষ্ণ ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাশ করিয়াছিলেন। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে জীবন আরম্ভ করিয়া ও তৎপরে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত কবিয়া তিনি শিক্ষকতাব কার্ঘ্যে ব্রতী হন। তাঁহাব দুইজন সহপাঠী জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (I. C. S.) ও প্রমথনাথ কর (পল্টু কর : অ্যাটর্নি) দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জীবনে সাফল্য অর্জন করেন।

নিত্যকৃষ্ণ ‘সাহিত্য’-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন তাহা তাঁহাব এই ডায়ারী পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে। মুক্তপ্রাণ ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত এই সাহিত্য-সেবকেব অকাল-প্রয়াণে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা তাঁহাব বন্ধুগণ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাব অন্ততম হৃদয় অক্ষয়কুমার বড়াল একটি চতুর্দশপদী কবিতায় বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিলে সকলেই অন্তবে দুঃখ বোধ কবিবেন। উক্ত কবিতাটি বড়াল-কবির ‘শব্দ’ (১৯১০) পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

নিত্যকৃষ্ণেব ডায়ারী হইতে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কবির

ভক্ত ও একান্ত অজ্ঞবাগী হইয়া পড়েন। তিনি লিখিয়াছেন :

“ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের উদয় হইয়াছিল...ক্রমশঃ তাঁহাব সহিত পরিচিত হইলাম। প্রথম প্রথম সর্বস্থলে ভাল কবিতা বুঝিতে পারিতাম না। তথাপি সেই উদীয়মান রবির অপূর্ব আলোকে আমার হৃদয়াকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র সমুদায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।”

॥ ডায়ারী ॥

১৯ ও ২০ পৌষ, ১৩০০ : পৌষ মাসের “সাহিত্য” মুদ্রিত হইতেছে। রবীন্দ্র বাবুর “মানসী” নামক কবিতা-পুস্তকের সমালোচনা দেখিলাম। এমন...সমালোচনা কখনও পাঠ করিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। ইহা প্রকৃত সমালোচকেব স্বাধীন মতের অভিব্যক্তি নহে, অন্ধ ভক্তের স্তুতিমাত্র। লেখক মহাশয় সমালোচনায় হাত না দিয়া মানসী-মঙ্গল কাব্য লিখিলে তাঁহার উদ্দেশ্য বোধ হয় অধিকতর সুসিদ্ধ হইত। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, বাঙ্গালা দেশে এখনও প্রকৃত স্বাধীন সমালোচনার সাফাৎ পাইলাম না।...আমার বোধ হয়, তাঁহার আদর্শ দেবতা মনে মনে হাসি সংবরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্র বাবু যে নিজের দোঁড় বুঝেন না, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার প্রতিভা আছে। প্রতিভার গতি সর্বত্র। পবকেও যেমন বুঝে, আপনাকেও তেমনি।

যে দীপ লইয়া জগতের—বিশ্বের অতুল রহস্যপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, তাহা কি নিজের হৃদয়ে প্রবেশ কবিতা একেবারে নির্বাপিত হইয়া যায়? আমার বিশ্বাস এই, যে কবি পরেব জ্ঞান নিজের আত্মাটিকেও বিশ্লেষণ করিতে পারেন না, তাঁহার প্রতিভা অসম্পূর্ণ। Self-

consciousness of Genius বলিয়া যে কথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

ভক্ত ও গোঁড়া মহাশয়দিগের অর্থ্যা ও অসংযত জ্ঞতিবাদে কাব্য-রাজ্য উচ্ছিন্ন হইতে বলিয়াছে। কে আমাদেরকে সাবধান করিয়া দিবে?

২ মাঘ, ১৩০০ : সকালে স্ন—ব বাটীতে রবি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। “সোনার তরী” কথা উত্থাপিত হওয়াতে তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি তাঁহার প্রথম ও শেষ কবিতার সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই। তিনি বলেন,—“উহাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকিতে পারে, আমি তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই। একটু সযত্ন অবশ্যই আছে।” আমার বোধ হয়, দুইটি কবিতার ভাব ও গঠনের সামঞ্জস্য করিয়া উহাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিশদ করিয়া দিলে, কবি তাঁহার কাব্যের কতকটা উন্নতি করিতে পারিতেন। গোড়ার কবিতার অর্থ যে কি, তাহা ত আজিও বুঝিলাম না। কবিতার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠককে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ফেলিয়া দিয়া, কেবল দুই চারিটা ললিত ও সরল কথার সদৌত শুনাইয়া কি ফল?—রবি বাবুর ভাষা উপর আধিপত্য দিন দিন বাড়িতেছে... “প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য,” “প্রলয় ত বিধাতার চরম আনন্দ,” “বাজার সতর্ক দৃষ্টি পড়ুক সর্বত্র” ইত্যাদি লাইনে ছন্দের স্বাক্ষর আদৌ নাই, ইহা তিনিও স্বীকার করিলেন, আর বলিলেন, “অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আমি একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ঠিক নহে;—আমার ভ্রম।” বাস্তবিক কবিতার ভাষা সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই পথ ভুলিয়া যান। “পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা,” “নীলাশ্বরে মগ্ন চরাচর”—প্রভৃতি দুই চারিটা স্বর্ণীয় স্বাক্ষর কেবল যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়ে।

১৬ মাঘ, ১৩০০ : মাঘ মাসের “সাধনা”র ববিবাবুর “বিদায়-অভিশাপ” শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কথোপকথনের আকারে লিখিত কচ ও দেবদানীর বিদায়দৃশ্য। রবিবাবু মিত্রাক্ষরের সহিত অমিত্রাক্ষরের পদ্ধতি মিণাইয়া আজ কাল যেরূপ কবিতা

লিখিতে আবশ্য করিয়াছেন, তাহা বেশ প্রীতিপ্রদ। “বসুন্ধরা”র পর ইহা বাহির হওয়াতে আমি রবীন্দ্রের ভাষা ও ছন্দের অবনতি মনে করিতেছিলাম। কিন্তু শুনিলাম, ইহা “বসুন্ধরা”র বহু পূর্বে রচিত। সুতরাং কবিতার ভাষা সম্বন্ধে তিনি যে দিন দিন উন্নতি করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্তমান কবিতায় “ধর্ম জ্ঞানে প্রভাবণা করি নাই” ইত্যাদি গগনময় পংক্তি এবং যতি ও শব্দবিচ্ছাসের দোষ অনেক স্থলে দেখিলাম। কিন্তু ঠাকুর-কবির স্বভাবস্বলভ স্বন্দর বর্ণনা ও সহজ কবিত্তে মুগ্ধ হইয়া কবিতাটি পড়িতে বিরক্তিবোধ হয় না। ব্রাহ্মণতনয় কচ স্বার্থময় প্রেমের উপর কর্তব্যের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে মহত্ব দেখাইয়াছিলেন, এবং দেবদানীর কঠোর অভিশাপের বিনিময়ে যে উদ্ধার আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তাহাই এই কবিতার বর্ণনীয়। উদ্দেশ্যের জন্ত যতটুকুর প্রয়োজন, কবিতাটিকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। কচের চরিত্র মহাত্ম্যরত হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

১৭ মাঘ, ১৩০০ : কেহ কেহ বলেন, মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পদ্ধতির একত্র সংমিশ্রণ রবীন্দ্র বাবুর নিজের উদ্ভাবিত। ঠাকুর-কবি যে অনেক বিষয়ে, অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষায়, নূতনত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার সকল প্রণালীর পক্ষপাতী না হইলেও, আমি স্বীকার করি। কিন্তু বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাঁহার উপাসকদিগের একটু সাবধান হইয়া মতপ্রকাশ কবা উচিত। এক জন ইংরাজ সমালোচক, “There is nothing new under the Sun” এই প্রবাদবাক্যের প্রমাণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, ইংরাজী সাহিত্যে এই মিশ্রিত পদ্ধতির বয়স তিন শত বৎসরেরও অধিক হইয়া গেল। মাক্কাতার আমলের জন চল্‌খিল্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া লে হট্ট, কীটস্, শেলী, ব্যারী করণওয়াল প্রভৃতি অনেকেই এই প্রকার অল্পবর্তী হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আব, আমাদের দেশেও ইহা নিতান্ত নূতন নহে; মাইকেলের কবিতার স্থানে স্থানে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়; হেমচন্দ্র সে কথা মহাকবির “মেঘনাদ”-সমালোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন। তার পর,

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী (নির্বাসিতের বিলাপ) কবির নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালী লেখকগণও ইহার বহুল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও রবীন্দ্রনাথ যে ইহাকে দিন দিন মার্জিত ও উন্নত করিয়া আনিতেছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার বোধ হয়, ঠাকুর-কবি বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মোহ অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তবে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবদিগের পর আব কবি জন্মায় নাই, তাঁহার এ মতটা এখনও আছে কি না, বলিতে পারি না।

২০ ফাল্গুন, ১৩০০ : ফাল্গুন মাসের “সাধনা”য় রবীন্দ্র-বাবুর “প্রেমের অভিষেক” ইতিশীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার আজকালকার প্রিয় সেই মিশ্রিত পদ্ধতিতে লিখিত। কবিতাটিতে কঠোর কার্ষময় জীবনের সহিত কাব্যের কল্পনাপূর্ণ আলম্বন বাস্তবের একটুকু বেশ মধুর বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিরোধটা দুই এক স্থলে একটু হাস্যাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলিতেছেন, বাহিরে (অর্থাৎ কলিকাতার কর্মক্ষেত্রে, ইংরাজের আফিসে) তিনি শত তাজিল্য বা অপমান সহ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই,—যুক্তিকার উপর আধিপত্য তিনি অকাতরে ইংরাজের করে ছাড়িয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে, তাঁহার উদার, প্রশান্ত প্রেমের প্রসুতিত কুঞ্জে,—সেখানে তিনিই একমাত্র রাজা, তাঁহার প্রেমময়ী প্রণয়িনী অসীম সোহাগ ও সৌন্দর্য-গর্বে গৌরবাসিত। সেখানে ইংরাজের আফিস, আদালত, চাকুরী, লাঞ্ছনা—কিছুই নাই। তথায় কেবল মহাশেতা, শকুন্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতি হৃদয়ের গৃহ প্রেমের সৌরভে পূর্ণ করিয়া, বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, আব কবি আপনাকে তাহাদেরই এক জন নিতান্ত আত্মীয় ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছেন।—বর্তমান কবিতায় ঠাকুর-কবি ভাষা ও ছন্দের উপর তেমন আধিপত্য দেখাইতে পাবেন নাই। তা’ না পারুন, কবিতাটি মন্দ নহে।—

২৮ চৈত্র, ১৩০০ : চৈত্র মাসের “সাধনা”য় রবীন্দ্রনাথ বাবুর একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটির নাম “এবার ফিরাও মোরে।” কবি বলিতেছেন,—এতদিন

তিনি সংসারের বাহিরে কেবল তাঁহার কল্পনার বাগীচ লইয়া, কোথায়, কোন্ স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বিজ্ঞানকে, শিক্ষার অবস্থায়, তিনি পাঠে মনোনিবেশ না করিয়া, জ্বলন্ত পবিত্যাগ-পূর্বক কেবল নিকুঞ্জের ছায়ায়, গাছের তলায় উপবেশন করিয়া নবল পড়িয়া সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তার পর, কতদিন জীবন-সংগ্রামে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবে আপনার আনন্দবিলাসে আপনি কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। কালধর্মের একরূপ জ্ঞানোদয় সকলেরই হইয়া থাকে। তবে এই চেতনা কিছু দিন পূর্বে হইলে আরও ভাল হইত। তিনি এখন আপনার কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া, আপনার অভীষ্ট দেবতাকে বলিতেছেন,—আমি বহুকাল কেবল বিলাসে হাসি ও বাগীচ লইয়া, আনন্দ উল্লাসে বৃথা অপব্যয় করিয়াছি। আর আমি একপে থাকিতে চাহি না,—“এবার ফিরাও মোরে।” রবীন্দ্র বাবুর প্রত্যাবর্তনে আমার শ্রায় আব কাহাবও হৃদয়, বোধ করি, এত দূর উৎফুল্ল নহে। আমি আজীবন তাঁহাকে এবং তাঁহার সহধর্মী কবিদিগকে যে কথা বলিয়া আসিতেছি, আজ তাহারই সাক্ষ্য দেখিলাম। উদাসীন বিলাসপ্রিয় জীবন, কবির যোগ্য নহে। কবি যদি এক জনেরও হৃদয় হইতে দুঃখ দৈন্তের পাথবখানা নামাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার জন্ম সার্থক।

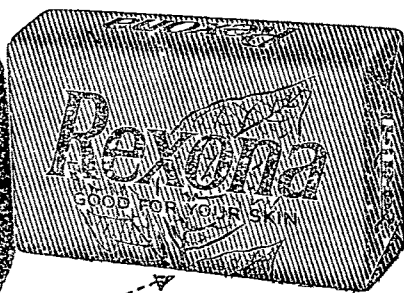
৮ বৈশাখ, ১৩০১ : রবীন্দ্রনাথের “রাজা ও বাগী” নাটকের আলোচনা প্রায়ই কবিতা থাকি। আজও উহার পাতা উলটাইয়া এখানে সেখানে দেখিতেছিলাম। সমগ্র পুস্তকের মধ্যে চাষিটি কি পাঁচটির বেশী ভাল এবং Spirited passage নাই। আমি সেই চারি পাঁচটি স্থল সর্বদাই পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু আজ সে কথা লেখা আমায় উদ্দেশ্য নহে। আমি আজ তাঁহার অমিত্রাক্ষর সঙ্ক্ষে আপত্তি করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ একদিন স্বীকার করিয়াছিলেন বটে যে, তিনি অমিত্রাক্ষর সঙ্ক্ষে যে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সমীচীন নহে। তথাপি মনের ভিত্তর আজ যে কথাটা জাগিতেছে, তাহা



দিনে দিনে
তুকে নবীন লাভণ্য আসে

নতুন রেজোনার পরশে

যতবারই মাথুন রেজোনার অবাধ পরশ যেন প্রতিবাহই আপনার তুকে নবীনতা এনে দেয়। ফেনিল রেজোনায ক্যাডল আছে, বিশেষ ধবনেব এই সৌন্দর্য বর্ধক তেলটি তুকের প্রতি রক্তে রক্তে যায় অপর তুকে কোমল ও মসৃণ করে তোলে, চেহারায আপনার লাভণ্য আনে। মিষ্টি গন্ধ ভবা রেজোনা প্রতিদিন স্নানের পক্ষে আদর্শ সাবান। একবার মাথলে আপনি এয গন্ধ অনেকক্ষণ ধবে পাবেন।



নতুন রেজোনা নতুন মোড়ক,
নতুন আকাব আব নবীন সবুজ
বউ আপনায নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

নতুন রেজোনা-তুকের সেবা যত্নের সহায়ক

লিখিয়া রাখায় কোন দোষ নাই। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর অধিকাংশ স্থলেই চতুর্দশাক্ষরপরিমিত মাপকাটির সাহায্যে কাটিয়া লওয়া সাধারণ গুণমাত্র। বাক্যের আবস্ত এবং শেষ সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই দৃষ্টিহীন। মাত্রাধীনটাকেও সব সময়ে বাদ দেওয়া যায় না। স্বীকার কবি, গল্পের গুণময় সামান্য অংশগুলিকে কাব্যের ভাষায় আবৃত করা অনেক সময়ই অসম্ভব। আব অসম্ভব না হইলেও তাহা সর্বস্থলে বাঞ্ছনীয় নহে। উহাতে ভাষা যেন কতকটা কৃত্রিম (affected) হইয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি, আমার বিশ্বাস যে, কবি সাবধান হইলে উভয় দিক বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন।

১১ বৈশাখ, ১৩০১ : কবি-জীবন ঘাপন করিতে হইলে, কাব্য লিখিয়া লোকেব মনোহরণ করিতে হইলে যে অসীম সাধনার আবশ্যক, তাহাব অবসব রবীন্দ্র বাবুর ত যথেষ্ট। আর একটা বিষয়েও তাঁহার খুব সুবিধা। উদরার্নের নিমিত্ত বাজিদিন হাডভান্স পরিশ্রম করিতে হয় না। তিনি সম্প্রতি যে কাজ কবিত্তেছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়নিহিত শক্তিসমূহ-পরিষ্কৃটনের বিশেষ সুবিধাই হইয়াছে। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, নানাবিধ লোকের সহিত মিশিয়া, তিনি যুগ্ম-হৃদয়ের বৈচিত্র্য চর্চা করিবার বেশ অবকাশ পাইয়াছেন। বাহ ও অন্তর্জগত দুই-ই তাঁহার সহায়। তিনি কবি হইতে না পাবিলে আর কে হইবে? কাব্য-সমুদ্রেব অভ্যন্তরে রত্ন-সংগ্রহার্থ তিনিই প্রবেশলাভ করিতে- পাইয়াছেন। আমরা কেবল তাঁরে দাঁড়াইয়া উপলব্ধি সংগ্রহ করিতেছি।

১৫ বৈশাখ, ১৩০১ : “বাজা ও রানী”র অধিকাংশ চরিত্রই কতকটা রহস্যময়। যেন আগাগোড়া সঙ্গতি নাই। প্রথমে বিক্রমদেবের চবিত্ত ধরা যাক। বিক্রমদেব বিলাস-পরায়ণ বটে। প্রেমের গাভীরের অপেক্ষা উদ্ধামতাই তাঁহাতে বেশী বর্তমান। প্রকৃত প্রেম যে কর্মাত্মক ও বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। তিনি উহাকে কেবল ক্রিয়াহীন ভোগের অবস্থা বলিয়াই জ্ঞান করেন। এরূপ চরিত্রের বিপর্যবর্তন দেখাইতে হইলে উহাকে কর্মক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতে হয়। কবিও তাহা

করিয়াছেন। আবার মাঝে মাঝে তাঁহার হৃদয়ে যে পুরাতনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে, কবি তাহাও দেখাইয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু কবিকে অবশেষে একটু ভ্রান্ত দেখিতে পাই। কবি বিক্রমকে আবার “নব প্রেমে”র জন্ত ফেপাইয়া তুলিলেন কেন? ইলার প্রতি বিক্রমের প্রেমটা নিতান্ত ইতরজনোচিত হইয়াছে। বিক্রমকে ইতর করা বোধ হয় কবির উদ্দেশ্য নহে। আবার যখন বিক্রম গুলিলেন যে, ইলা অস্ত্রের প্রতি আসক্তা, অমনি তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া পুনর্বীর সেই পুরাতনের পশ্চাতে ছুটিলেন। বিক্রমচবিত্রে এরূপ চাকল্যের কিছুতেই সামঞ্জস্য হয় না। যে ছিল কেবল স্বপ্নময় আর চিন্তাময়, কবি তাহার পরিণাম শক্তিময় আর কর্মময় করিতে পারেন। ইহাতেই বিক্রমের জয়। অথবা, তাহাকে কেবল ঘটনা-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, কবি তাহার পরাজয়ও দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু আমরা বিক্রমকে অব্যবস্থিতচিত্ত দেখিবার আশা করি নাই। কুমাবসেনের চিত্রও এইরূপ অসঙ্গত। বাহুবল ও প্রেমবলের আধাব বীর কুমাবসেনের মুণ্ডটা যে আমরা অবশেষে একটা থালের উপর আম জামের “ত্বের” গায় দেখিব, এমন আশা করি নাই। আর স্মিত্রা যে শেষে ভ্রাতৃহত্যাকপ একটা মহাপাপ করিবে, ইহাও নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যক। নাটক লিখিতে হইলে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন; রবীন্দ্র বাবু আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার চরিত্রগুলিতে তাঁহাকেই ছদ্মবেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬ বৈশাখ, ১৩০১ : চৈতন্য-লাইব্রেরী কর্তৃক আহৃত বঙ্কিমচন্দ্রের শোক-সভায় যোগ দিবার জন্ত বৈকালে স্টার-থিয়েটার-গৃহে উপস্থিত হইলাম।...রজনী বাবুর [রজনীকান্ত গুপ্ত] বক্তৃতা শেষ হইয়া রবীন্দ্রবাবুর বচনা-পাঠ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।...রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রায় এক ঘণ্টা চলিল।...রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা পাঠ করিবার কায়দা আছে। স্বরটি বেশ মিষ্ট। তার উপর আবার স্পন্দব চেহারার সন্মিলন। ইহাতে যে অনেকটা কাজ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।



একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায় তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা।



না দেখলে বিশ্বাসই হতনাঃ শব্দর সীতার
পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সাটটা দেখে
দাক্ষণ ধুসো। আব শুধু কি একটা সাট দেখুন
না জামাকাপড়, বিছানাব, চাদর আর তোষা-
লের স্থপ—সবই কিবকম সাদা ও উজ্জল
এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে।
সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেনা
কাপড়কে পরিপাটি করে পরিষ্কার এবং
কোথাও এক কুঁচিও ময়লা থাকতে পাবেনা।
আপনি বিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না
কেন . আজই।



সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জল করে

২৪ বৈশাখ, ১৩০১ : “সাধনা”য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “বঙ্কিমচন্দ্র” প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। লেখক বাঙ্গালীর অকৃতজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া, বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলালের কোনরূপ স্থিতি চিহ্ন স্থাপিত হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। তাব পব রামমোহন যে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার ভিত্তি স্বদৃঢ়রূপে স্থাপিত করেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র আপনার অসমী প্রতিভার সাহায্যে কিরূপ সৌন্দর্য এবং সম্পূর্ণতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতি উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের যে বিশালতা, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই কীর্তি। তিনি তৎ-পূর্ববর্তী কোনও আদর্শের সাহায্য পান নাই। নিজেরই হৃদয়-মন্দিরে মাতৃভাষার যে অভীষিত মূর্তি অবলোকন করিয়াছিলেন, আজীবন তাহারই প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠার তাঁহাকে লেখক ও সমালোচক উভয়েরই আসন গ্রহণ কবিতে হইয়াছিল। এক হস্তে মাতৃসম মাতৃভাষার স্ববর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠাপনার্থ অমূল্য উপাদান সকল সংগ্রহ কবিতেছেন, অপর হস্তে আবির্জনাবাশি দূরীকৃত কবিতেছেন। শাস্ত্র ও যুক্তির কিস্তি সমন্বয় করিতে হয়, বঙ্কিমই তাহাব প্রকৃত আদর্শ দেখাইয়াছেন। ইত্যাকার বহুবিধ কথার স্বন্দর আলোচনায় প্রবন্ধটি বেশ মনোহর হইয়াছে। সেদিনকার সভার রবীন্দ্রই মান রাখিয়াছিলেন, নহিলে কেবল বঙ্গনী[কান্ত]গুপ্ত মহাশয়ের উপর নির্ভর কবিলে শ্রোতৃবৃন্দকে বডই নিরাশ হইতে হইত।

৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ : রবীন্দ্রনাথের “সোনার তরী” কাব্যের প্রথম কবিতা “সোনার তরী”র আলোচনা করিতেছিলাম। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এ পর্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেবল স্ব—চন্দ্র ও ন—বাবু, বাস্তবিক বুকুন আব না বুকুন, বুঝিবার ভান বিলক্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্দেশ্যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা তিনি সেদিন এক বন্ধুর নিকট বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—আমি মাতৃভূমিকে আমার ধ্যানসর্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট অক্ষয় যশ প্রতিদান স্বরূপ চাহিলাম। কিন্তু

প্রতিদান পাইলাম না, অর্থাৎ আমি নিতান্ত দীন দরিদ্র, আমার বাহা কিছু ছিল, তাহাও অতি সামান্য, স্মরণ্য আমি বঙ্গীষ সমাজে স্মরণীয় হইতে পারিলাম না। অর্থ মন্দ নহে, কিন্তু কবিতার ভাষায় এই অর্থ পরিষ্কৃত হইয়াছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া, উদ্দেশ্য ও অর্থ মিলাইতে মিলাইতে শেষ শ্লোকের নিকট এক রকমে পৌছিলাম। তাব পর,

ঠাই নাই, ঠাই নাই, চোট সে তরী,

আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি,

এইখানে আসিয়া একবারে হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। স্মরণ্য রবীন্দ্র বাবুর নিজকৃত ব্যাখ্যা সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ : “জ্যৈষ্ঠ মাসের সাধনা” রবীন্দ্রনাথ বাবুর একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটির নাম “মৃত্যুর পরে।” বোধ হয় স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে। আমাদের সম্পাদক স্ব—চন্দ্র ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, এমন কি “সাধনা” হইতে সেই কয়েক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া যত্নপূর্বক রাখিয়া দিবেন, এইরূপ ইচ্ছাও জানাইয়াছেন। আমি কিন্তু সমগ্র কবিতাটির তেমন স্থখ্যাতি করিতে পারিতেছি না। আজ কাল রবীন্দ্রের কবিতার একটা প্রধান দোষ এই যে, উহাবা প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। বর্তমান কবিতাটির আধখানা বাদ দিলেও বোধ হয় কোন ক্ষতি হয় না। বিষয়টিব গাভীরের সহিত তুলনা করিলে কবির নির্বাচিত ছন্দের গতি কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় দ্রুত বলিয়া অনুভূত হয়। অপেক্ষাকৃত ভাল শ্লোকগুলি রাখিয়া, অপরগুলি বাদ দিলে কবিতাটি বেশ স্বন্দর হইতে পারিত। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরিয়া কবিতার চর্চা করিতেছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার fitness ও propositionএব জ্ঞান যদি দেখিতে না পাই, তবে উহা বডই দুঃখের কথা। স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি তাঁহার pegasus-কে সংযত কবিতে পারিতেছেন না; সে

স্বচ্ছাঙ্গসারে প্রচণ্ডবেগে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার ঠিক নাই।

৫ আষাঢ়, ১৩০১ : ...জ্যৈষ্ঠ মাসের “সাধনায়” রবীন্দ্রনাথের “মৃত্যুর পরে” ইতি শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটি কাহার মৃত্যুর পরে লিখিত, তাহা স্পষ্ট বুঝিবার ঘো নাই। অথচ সাধারণ ভাবে লইলে আত্মোপাস্ত অর্থ তত সঙ্গত হয় না। ছ’ একটা কথা বারংবার পুনরুক্ত হইয়াছে। তাহা ব্যক্তিগত বলিয়াই বোধ হয়। আমি প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুই উপলক্ষ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে গোপাল বাবুর কথা শুনিয়া, উহা যে...মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ দৃঢ়রূপে প্রতীত হইতে লাগিল।...উপলক্ষ যাহাই হউক, কবিতার শেষ কয়টি শ্লোক আমার বেশ লাগিয়াছে। এত দীর্ঘ না করিয়া, কাটিয়া ছাটিয়া, নিকৃষ্ট ও অনাবশ্যক অংশ সমুদয় বাদ দিয়া প্রকাশ করিলে কবিতাটি বেশ সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইতে পারিত। আজকাল রবিবাবুর একটা প্রধান দোষ, তিনি বিনা প্রয়োজনে অতি দীর্ঘ হইয়া পড়েন। পাঠকের সহিষ্ণুতার উপর এতটা জুলুম চলে না।

১৫ আশ্বিন, ১৩০১ : রবিবার সকালে রবিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সম্ভ্রান্ত কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লোকটি সর্ববিষয়েই অতি সুন্দর। কথাবার্তা অনেক প্রকার হইল। রবিবাবু বাঙ্কিত বহুস্বর-বেটন, আগামী সোমবার চৈতন্য লাইব্রেরী সভায় তাঁহার বক্তৃতা, কাব্যের উদ্দেশ্য, তাঁহার “সমুদ্রের প্রতি” কবিতায় জড়বাদিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ব—চন্দ্র নবীনচন্দ্রের

“কুরুক্ষেত্রে”র কথা পাড়িলেন। রবিবাবু উক্ত কাব্যের সমালোচনা লিখিবেন। তিনি, নবীনবাবু বাংলা ভাষার উপর তাদৃশ দখল নাই, এই মত প্রকাশ করিলেন। বাঙালিকই কবির ভাষার প্রাণের সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যে ভাষা তেমন অপ্রতিভত স্বাধীন প্রবাহ নাই; তাঁহার অমিত্রাক্ষরে বিরাম-বৈচিত্র্যের প্রায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, রবিবাবুর সমালোচনা পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিলাম। কুরুক্ষেত্রের যত দোষই থাকুক, উহা যে সাবধান আলোচনার সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবিবাবু একটা ভাব দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। তিনি ভদ্রতা ও মৌজন্তে বেশ তৎপর, কিন্তু আত্মীয়তার দিকে বড় সহজে অগ্রসর হইতে চাহেন না। আমার সহিত কয়েকবার দেখাশুনা ও কথাবার্তাও অনেক হইয়াছে, তথাপি আমার নিজের খবর, বিষয় ব্যবসায়, ঘরকন্নার কথা অবগত হইবার একটু বাসনাও তাঁহার মনে উদয় কখনও হয় নাই। আমার বিষয় সামান্য বোধে ছাড়িয়া দিলেও,—চন্দ্রের সহিত আলাপ ত বড় অল্প নহে; কিন্তু রবিবাবুর কেমন স্বভাব, তাঁহার মেখা করিতে আসিয়াও, তিনি কেমন আছেন, অথবা তাঁহার ঘরের অন্ত কোনও সংবাদ জানিবার জন্য একটা প্রশ্নও করিলেন না। আশ্চর্য প্রকৃতি! তিনি যেন কেবল বসন্তের বাতাসের মত শূন্যে ভাসিয়া কুসুমের শুধু দেহ-সৌরভটুকু লইয়া যাইতে চান, তাহার প্রাণের অন্তঃপুবে প্রবেশ করিয়া প্রেম-মধুর সহিত পরিচিত হইতে নিতান্তই নারাজ। কবির পক্ষে ইহা বড় স্থখ্যাতিব কথা নহে।

*

* *

রবীন্দ্র-সাহিত্য-সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের অব্যবহিত পরে তাঁহার স্মৃতিসভা। রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আসিয়া ভিড়ের চাপে প্রবেশ-পথ পান না। বিপর্যস্ত-পর্যুদস্ত অবস্থায় মঞ্চে উপস্থিত হইয়া গোড়াতেই তিনি বলিলেন, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাবাহুল্যে জীবিতের প্রতি অকরণ হওয়া সমীচীন নয়। আজ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্র-ভক্তেরা যে ভাবে তাঁহার আড়াই হাজাৰ, সারে চাবি শত, তেইশ বৎসর পূর্বে এবং সাত বৎসর পবে মৃতদের উপর ঋণাভাব ঘা চালাইতেছেন তাহাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হইতেন। গত ৯ই বৈশাখ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে একজন ঐতিহাসিক বক্তা প্রমাণ কবিতেন চাহিলেন, রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ ও চৈতন্যের অপেক্ষা বড় ছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে করুণার এবং চৈতন্যকে প্রেমের অবতারণা করিয়াছেন এবং অবতারেরা সর্বদাই সাধারণ-অসাধারণ মাত্রায় অপেক্ষা এই কারণে বড় যে তাঁহারা যে ভাষাভাষী ছিলেন তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলেও মাত্রবের চিত্তে জীবন্তভাবে বাঁচিয়া থাকেন। কবিদেব নোভাগ্য ততখানি নয়। গত ২৩ বৈশাখ ওই পরিষৎ-মন্দিরেই আব একজন বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক বামমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী মনান্তরের ব্যক্তিগত চিত্র দিতে গিয়া context বর্জিতভাবে গান্ধীজীব কথা তুলিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন। সম্পূর্ণ সত্য ১৯২১ ১৩ই এপ্রিল সংখ্যা এবং ১৯২৫ ৫ই নবেম্বর সংখ্যা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়িলেই উদ্ঘাটিত হইবে।* যে নবকৃষ্ণকে অবাঙালী বলিয়া জাহির

করিতে পাবিলে সমসাময়িক বাঙালীরা অনেক লজ্জার হাত হইতে বাঁচিতেন তাঁহাবই একজন বংশধর শ্রীহারীত-কৃষ্ণ দেব রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ-সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার ১৩৩ পৃষ্ঠায় বামেন্দ্রসুন্দরকে অবাঙালী বলিয়া তাঁহার বাংলা বচনার সার্টিফিকেট দিয়াছেন। বামেন্দ্রসুন্দর যদি অবাঙালী তাহা হইলে বাঙালী কে? মুর্শিদাবাদ-জেমোর বামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতা-শোভাবাজারের দেবদেবের অপেক্ষা অনেক বেশী বাঙালী। 'বঙ্গলক্ষ্মী' ব্রতকথা' মাতৃভাষার পূজামণ্ডপে তাঁহাবই শাস্ত্রত অর্ঘ্য। এই সকল গুরুতর ভুলের প্রতিবাদ না হইলে রবীন্দ্রনাথই পীড়িত হইবেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে রচনাটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, অধুনালুপ্ত ও সম্পূর্ণ বিস্মৃত 'অভ্যুদয়' নামক সাময়িক পত্র হইতে শ্রীমৎকুমার গুপ্ত তাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বনফুল অনিবার্য কারণে পাটনায় যাইতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার "রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান"টিকে প্রবন্ধরূপেই গণ্য করিতে হইবে, ভাষণরূপে নহে।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দুইখানি মূল্যবান ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থের প্রকাশ ঘোষণা করিতে পাইয়া আমরা খুশী হইয়াছি। হাজার পৃষ্ঠার সচিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্মরণার্থিত সঙ্কলন 'বিচিত্রা' মাত্র ছয় টাকা মূল্যে দিয়া বিশ্বভারতী দ্বিধা দেশবাসীকে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিতরণই কবিয়াছেন বলিতে হইবে। প্রকাশক কানাই সামন্তকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দিতেছি। প্রত্যেকেরই সংগ্রহ করা উচিত।

পুলিন সেনের কীর্তি বাক্সসাহিত্য কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র 'রবীন্দ্রায়ণ' (১ম খণ্ড ১০৮) চিত্রে ও মুদ্রণ সৌষ্ঠবে লোভনীয়। স্মৃতিসম্মান চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমথনাথ বিশী অতি স্মৃতিস্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যবে ঘরে বাথিবার মত বই।

* 13. 4. 21

Ram Mohan and Tilak (leave aside my case) were so many pigmies who had no hold upon the people compared with Chaitanya, Shankar, Kabir and Nanak.

5. 11. 25

I do not remember any occasion save one when I had to use Ram Mohan Roy's name. That was in connection with western education. This was on the Cuttack sands now four years ago. What I do remember having said was that it was possible to attain highest culture without western education. And when some one mentioned Ram Mohan Roy, I remember having said that he was a pigmy, compared to...

আমার রবীন্দ্র-সংগ্রহ হইতে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথের ঝড়তিপড়তি লেখা সংগ্রহ ও প্রকাশে তাঁহার যে আপত্তি ছিল না তাহাব একটি দলিল এখানে দাখিল কবিলাম :—

মাছতলায় জুড়িলো মাছের নীচে কড়ি-পড়া কঁচা মাছ
কলা ফিটু না ফিটু মাছের মাং। আমার অসঙ্কীর্ণ হিন্দু
মাছের মর্মে থেকে যে লেগেছে চুকাবার সুখি আমার
কুন কুন কুড়িলে সে যোচন মনে হইছে সে সুখি মাছতলায়
ভোজে গ্রহণের কবার চাওয়া হই। তাই কুই তবু খাব
ভাত্যারে ভোজন্যের প্রসার করিলেন আমার সম্মতি দিলাম।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' ২য় সংস্করণেব ভাব
রবীন্দ্রনাথ আমাকে দেন তখন এই পত্রটি লিখিয়াছিলেন :—

৩৩

আমার অসঙ্কীর্ণ হিন্দু
কলা ফিটু না ফিটু মাছের মাং। আমার অসঙ্কীর্ণ হিন্দু
মাছের মর্মে থেকে যে লেগেছে চুকাবার সুখি আমার
কুন কুন কুড়িলে সে যোচন মনে হইছে সে সুখি মাছতলায়
ভোজে গ্রহণের কবার চাওয়া হই। তাই কুই তবু খাব
ভাত্যারে ভোজন্যের প্রসার করিলেন আমার সম্মতি দিলাম।

যখন 'প্রবাহিনী' (১৩০২) ছাপা হইতেছিল তখন আমিই
ছিলাম গানগুলির ভাণ্ডারী। সেই সঙ্কিত ভাণ্ডার হইতে
পাঁচটি গান ও একটি কবি-সংশোধিত ছাপা গানের
প্রতিলিপি নিয়ে দিলাম। "জলে ভোবা" গানটি 'প্রবাহিনী'র
অন্তর্ভুক্ত নয়। গানটি ১৩২৯ সালের ৩১ আষাঢ় রচিত ও
"ভাসে" শিবোনামায় ১৩২৯ ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত।

৩৪

জলে-ভোবা চিহ্নের নাম
কচি চাষের জোরে মাছ,
এক নদীর চারে চারে
হাসতলি হাঁক মাঝে মাঝে,
দুলে দুলে ইঁদে ভাসে।
আমি কবেই কবে জাবে
দুই হাতখান চীৎ চীৎ
দুই-বেলাখান চীৎ চীৎ
সেই ভাসে মাং নীল মাছমাং।
আমি কবেই অলস মাঝে
একল আমার চীৎ কোলা,
মাঝে কখন মাঝে মকান
মাং ভাসে এক একায়ে।
আমি কবেই কবে জাবি
দুই মাছুইর ওভরমাছুইর
ভাসে কখন কখনমাঝে
আমার চুকে দীর্ঘশ্বাসে।

৩৫

আমার বন্ধী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ଆକାଶ ହେଉ ଆକାଶ ପଥେ ହାତୀର ଯୋଡ଼େ
 ଶରତେ ଶଗଡ଼ କରଣା ଧାରୀର ମୂଢ଼ା
 ଆମାର ଶରୀର ଅଧୀର ଧାରୀର ମାଧୁରୀ ବହିତେ ଅବିରତ ।
 ହୁଏ ଏବାହର ଘାତେ ଘାତେ ଗାନ ମିଳେ ରାତେ,
 ଗାନେ ଗାନେ ଆଗାର ଆଗେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କତ ଶୁଣ ।
 ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେ ଗାନ ଛଡ଼ାଏ ଶତ ଶତ ଶୁଣ;
 ଆକାଶ-ଡୋବା ଧାରୀର ଘୋରୀ ଘୁଲି ଅବିରତ ।

୧ ନୂଆ-ମାଗଲ ବାକିଲାତା ବିଧି ପରାଣେ
 ନିଜ ଆମାସ ଆଗିସେ ଗାଧେ ଶାନ୍ତି ନା ମାନେ ।
 ଚିରାବିନେର କାଳାହାସି ଗାଧେ ଗାଧି ଗାଧି,
 ଦେଖିଲେ ଗାଧି ନିଆହାରା ନୟନ ଅବନତ ।
 ସେହି ନୟନେ ନୟନ ଆମାର ହୋଇଲା ନିମେଷହତ ।
 ୨ ଆକାଶ ଡୋବା ଦେଖାର ମାଧେ ଦେଖ ବ ଅବିରତ ॥

ହୁଅନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଆମର ଆମର ଗୋ
 ତୋର ଆମର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥
 ତୋର ଗୋର ଆମର ଗୋର
 ହୁଅନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଆମର ଗୋ-ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର;

୧- ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର

ଗୋର ଗୋର ଗୋର

୧- ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଆମର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର;
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର;
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର;
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର,
 ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର

ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ଗୋର ॥

আমার কথা শ্রীমতী উমার অটোগ্রাফ-বহিতে এই কবিতাটি আমি ফরমান দিয়া
লিখাইয়া নইয়াছিলাম :

"ইহা, আমার নাইলে তোমারে কবিরে ক্বা!
উমা এমন, তোমার দুখের সৈনিক,
কবিতা পদক লে মের।"

শিলাদির জ্বলিত সঁজিয়া,
"তোমারে আমি ৮ সঁজিয়া
হি হাফি, এমন নাইকি আমার চল,
তোমার চিনা এহি ক্ষুদ্র জীবন
কেনি এতদ্বন্দ্ব।"

"আমি বিশ্বাস করিলে তুমি কবিরে হাফি,
তুই শিল্পিত্বের দ্বারা দিত পদক,
বাসিলে পদক লে মের।"—

শিল্পিত্বের দ্বারা আমি
কহিলে তুমি হাফি,
"তোমার ইহা আমি বহি তোমারে কবিরে;
তোমার ক্ষুদ্র জীবন ~~কবিরে~~ হাফির
হাসিলে পদক কবিরে।"

হে উমা, কবিরে হাফি, আমার কবিরে পদক
কবিরে উমাফিল।

হে আম, তুমি হাফি পদক ক্ষুদ্র জীবন কবিরে
কবিরে উমাফিল।

হে হিফি, কবিরে হিফি, কবিরে কবিরে
কবিরে উমাফিল।

কবিরে আমার কবিরে হাফি, হে আম
কবিরে উমাফিল ॥

কবিরে উমাফিল



রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারীচরিত্র

বাণু ভৌমিক

আধুনিক কবি বা লেখকেরা নায়ক-নায়িকার দেহবর্ণনা নিয়ে বেশী মাথা ঘামান না। নায়িকার গাত্রবর্ণ পদ্ম কি গোলাপের মত, চোখ হরিণের মত এবং তিলফুল জিনি নাসিকা কিনা—এ সব প্রশ্ন তাঁদের নিকট অবাস্তব। এ যুগে শুধু মনের খেলা। দৈহিক সৌন্দর্যবর্ণনা প্রায়ই চরিত্র-চিত্রণের পটভূমিকা রচনা করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ মনঃপ্রধান ঔপন্যাসিক। তাঁর বারখানি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম ছুটিতে (বউঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি) নায়িকা চরিত্র, বিশেষতঃ তাদের মনোবিশ্লেষণে তিনি বিশেষ মনোযোগী হন নি।

কিন্তু ‘সোনার তরী’তেই তাঁর সোনার প্রতিমাদের জয়যাত্রা শুরু হল। ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয়, ‘মানসী’র পরই তাঁর মনে মানস-নায়িকাদের রূপ সন্ধান কল্পনা দানা বাঁধে। শৈশব থেকেই তিনি অন্তরের মণিকোঠায় যে রাজকন্যাকে বন্দি করি বোধেছিলেন, সে তাঁর চোখের সামনে এসে বিচিত্ররূপে খেলা করতে থাকে।

কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে অসংখ্য নারী-চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে আমি শুধুমাত্র উপন্যাসের নারী-চরিত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করছি।

তাব নায়িকাদের মোটামুটি তিনটি টাইপে ভাগ করা যায়। অবশ্য, এই বিভাগ মনোগত বিশ্লেষণের দিক দিয়ে—(১) অল্পপস্থিত মন, (২) সক্রিয় মন, (৩) নিষ্ক্রিয় মন।

অল্পপস্থিত মনের দলে আমরা ফেলতে পারি, ‘চোখের বালির’ আশা, ‘মৌকাডুবির’ কমলা, ‘শেষের কবিতার’ কেটি, ‘ঘরে বাইরে’র মেজবউরাণী, ‘দুই বোনে’র শর্মিলা ও ‘মালকে’র নীরজাকে। এদের মন আছে কিন্তু সেই মন এক সজ ফোটা ফুলের মত। সে মন শুধু আছে, এইমাত্র—তার বিচার কিংবা বিশ্লেষণের কোন ক্ষমতা নেই।

প্রিয়জনকে আশ্রয় করেই এদের জীবন। প্রিয়কে প্রচ্যুত হলে এরা ভাবসাম্য হাবিয়ে ফেলে, যেমন ফেলেছিল কেটি।

এরা গৃহের শান্তিদায়িনী কল্যাণী লক্ষ্মীমূর্তি। যে নারী প্রভাতে গৃহমার্জনা করে, পবিবারের সকলেব সেবায় সমস্ত দিন পবিত্রম করে—স্বামীকে যে দেবতাব মত ভক্তি কবে, তাঁর বাইরের গতিবিধি কিংবা মনের ভাবাতিরেক নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা কবা দূরে থাক, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই যার মনে উদ্ভিত হয় না, স্বামীর খোলসটাই যার নিকট যথেষ্ট—ব্যক্তি নয়।

এরা একটুখানি জায়গা পেলেই ঘরকন্না পেতে বসে। সে জায়গা বাঁট দিয়ে, পরিষ্কার কবে আসন বিছিয়ে খাবার সাজায়।

কমলা বমেশকে স্বামী জেনে সেবায়, যত্নে, প্রীতিতে পূর্ণ হৃদয়পাত্র তার দিকে ভুলে ধবেছিল—যখন জানতে পারল রমেশ তাব স্বামী নয়—দৈবকৃত একটি ভুলের বশে সে রমেশের ঘর করেছে, তখন একমুহূর্তেই তার হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে গেল। পবে একবারও তার রমেশের কথা মনে হল না—বরঞ্চ শৈলজার মুখে শুনতে পাই, ভাগ্যিস তুই রমেশবাবুর মত ভদ্রলোকের হাতে পড়েছিলি নইলে কি দশা হত। কিন্তু কমলা একটি কৃতজ্ঞতার কথাও উচ্চারণ না করে নলিনাক্ষেব পাছুকা পূজা কবতে থাকে। এটি লেখারই দোষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারত, কিন্তু পাশাপাশি হেমলিনীর চরিত্র দেখে বোঝা যায় লেখক ইচ্ছে করেই কমলাকে এ ভাবে সৃষ্টি করছেন।

আশাও কমলারই অল্পরূপ। বিহারীর সঙ্গে আশার বিয়ের কথা হয়েছিল, কিন্তু মহেন্দ্র বকুর জন্ত কনে দেখতে গিয়ে আশাকে পছন্দ করায় বিহারী ত্যাগস্বীকার করে। কিন্তু বিহারীর সঙ্গে বিয়ে হলে যে আশা তাকে মনে মনে পূজো করত মহেন্দ্র-পত্নী সেই আশাই বিহারীকে দু চোখে দেখতে পারে না—যেন বিহারী এক পরম পাষাণ।

কেটির মুখের এনামেলের ও মেমসায়েরী উচ্চারণের অন্তরালেও ঠিক এই একই মনোভাব। একদিন অমিত তাকে আংটি পুঁথি দিয়েছিল, সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের চিহ্ন ছিল না। তাবপরে, দিন কেটে গিয়েছে। কেটির মুখে প্রলেপ প্রসাধন পড়েছে, উজ্জ্বল হয়ে সে ঘুরেছে—কিন্তু সে তো অমিতের জন্তই। লাবণ্য ঠিকই বলেছিল, এই কেটি অমিতের অনাদরে গড়া। অমিতেব মন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মত করে নিজেকে সাজিয়েছে। অমিতকে পেয়ে ‘কেটি’ আবার ‘কেয়া’ হল।

দেবরকে কেন্দ্র করে মেজ-বউরাণীর জীবন। এবং মনের সেই অপূর্ণীয় আকাঙ্ক্ষার অবদমিত বিকৃতিবশতঃই তিনি বিমলাকে হিংসা করেন, যুবতী দাসী দ্বারা দেবরকে প্রলুব্ধ করাব চেষ্টা করেন, কিন্তু যখন যাবার সময় হয় তখন বিনা আত্মানেই সব ছেড়ে দিয়ে প্রিয়কে আশ্রয় নেন।

নীরজা আদিত্যকে খুশী করবার জন্তই মালধের মালিনী। যখন সে রোগশয্যায় পড়ে রইল তখন আবার স্বামীকে খুশী করবার জন্তই সরলাকে তার হাতে ভুলে দিতে চাইল। শেষ মুহূর্তে লেখক একটি অতি-নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যা উপন্যাসের সুরেব সঙ্গে কিংবা চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় নি।

‘ছুই বোনে’ রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের সৃষ্টির ব্যাখ্যাকার হয়ে শর্মিলাকে মায়েব জাত বলেছেন। কিন্তু, আমরা একটু লক্ষ্য করলে তাব মাতৃমূর্তির আড়ালে সেই একই মনোবৃত্তি দেখতে পাই। তাই সে নিজের সমস্ত টাকা স্বামীব ব্যবসায় দেয়, বোনকে সতীনরূপে গ্রহণ কবতে চায়।

স্বামীকে কেন্দ্র করেই এদের জীবন—এরা সেই মেয়ে আগে যাবা মাতাল স্বামীব পদাঘাত খেয়েও সেই পা পূজো করত। এখন যুগ পালটেছে, স্বামীব ব্যবহারেবও তারতম্য হয়েছে, কিন্তু এদেব সেই একই সহিষ্ণু, সেবা-পরায়ণ মনোবৃত্তি। স্বামীব মনের কোন খবর এরা রাখে না। কারণ, এদের নিজেদেরই মন অস্থির।

কিন্তু, পুরুষ তো শুধু দেহ চায় না, চায় দেহাতীত আরও কিছু। দেহের জন্ত একান্ত প্রয়োজন সংসার-সজিনী, কিন্তু এরা কামনা করে মনেব মানসীকে। সেই

মানসী চঞ্চলা—কাছে থেকেও সে স্বদূর—সে যত দূর তত মধুব। Frailty, thy name is woman—এ কথা পুরুষ আক্ষেপভরে নয়, আনন্দভরেই বলেছে।

এই নারীদেব জীবনও পুরুষকে কেন্দ্র কবেই আবর্তিত হয়। এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, পুরুষের আশ্রয় ভিন্ন এরা বাঁচতে পারে না। কিন্তু এরা অধিকার করতে চায় সম্পূর্ণ মাহুযটা, তাই কখনও ছলনা, কখনও কল্পনা, কখনও সত্য, কখনও মিথ্যা, কখনও সেবা, কখনও কাজ দ্বারা এরা পুরুষকে ভুলিয়ে রাখে। এরা নদীর মত উজ্জল, চঞ্চল, প্রাণের আবেগে পূর্ণ। বাধা পেলে পাড় ভেঙে লোকেব সর্বনাশ কবতেও এরা দ্বিধা করে না, কিন্তু বাধা না পেলে স্নিগ্ধ প্রবাহে সকলেব মনে শান্তিদান কবে।

বিনোদিনী (চোখেব বালি), ললিতা (গোরা), দামিনী (চতুর্ভঙ্গ), শ্রামা (যোগাযোগ), বিমলা (ঘরে বাইরে), সরলা (মালধ), উর্মিলা (ছুই বোন)—এই নারিকাদের রবীন্দ্রনাথ এইভাবে সৃষ্টি করেছেন। এরা অনেকাংশে উর্বশী আর কতকাংশে সেবাপরায়ণা লক্ষ্মী-মূর্তিতে গড়া।

এর মধ্যে বিনোদিনী ও শ্রামা প্রিয়-আশ্রয়হীনা কাজেই বিকৃত অধিকারলিপ্সায় পরের ঘরে আগুন দিতে উদ্যত হয়েছে। বিনোদিনী যখনই বিহারীর মধ্যে প্রার্থিত পুরুষকে আবিষ্কার করতে পারল এবং তার মনের স্পষ্ট প্রেমকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হল তখনই তার উন্মাদনা কেটে গিয়ে শুভবুদ্ধি জেগে উঠল। সে নিজেকে নত কবতে পারল—ত্যাগ করতে সক্ষম হল।

শ্রামা মধুসূদনকে ভালবেসেছিল নিতান্তই স্থূলভাবে এবং তার প্রাপ্তিও অত্যন্ত স্থূল—শাড়ি, গয়না ও উপগৃহিণীর আসন।

ব্যক্তিস্বহীন ভালমাহুয বিনয়কে গোবাব কর্তৃত্বমুক্ত করবার ইচ্ছাই প্রথমে ললিতাকে নানাকূপ ছলনার সাহায্য নিতে বাধ্য করেছিল। রূপের ফাঁদ নয় কাজেব ফাঁদে সে বিনয়কে বেঁধেছিল। সে প্রথমে অভিনয় করতে চায় নি, কিন্তু বিনয়কে নামাবার জন্তই সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিনয়ে স্বীকৃত হল। তারপরে, সে বিনয়কে ভালবাসল এবং তার জন্ত সমাজ, সংসার এমন কি ধর্মের অহুশাসনও অগ্রাহ করল। তীর বিনয়কে সে মাহুয করে তুলল—

কিন্তু, তাকে সে চিরদিনই নিজেব অধীন ববে রাখল।
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই কটি চরিত্রের মধ্যে একমাত্র
বিমলাই বিবাহিতা ও স্বামীগৃহে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী
তাকে ভালবাসেন কিন্তু ভবুও কপহীনতাব জন্ত যে
হীনমন্ত্রতা তাব মনে সর্বদা জাগ্রত ছিল তা-ই তাকে এই
কর্মের নেশায় ডাক দিয়ে সংসারের সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত
করে দেয়।

উর্মিলার সংজ্ঞা লেখক নিজেই দিয়েছেন যে সে
প্রিয়াজাতের কিন্তু উর্মিলা নিতান্তই ব্যর্থ সৃষ্টি।

স্থির সৌদামিনীর মত প্রখর-যৌবনাদামিনীর বিজ্রোহ—
আশ্রয়হীনতার ব্যাকুল প্রাণের বিকারমাত্র। শচীশের
প্রতি প্রেমে এই বিজ্রোহ মধুর সেবায় ভরে ওঠে। কিন্তু
শচীশের নিকট প্রতিদান না পেয়ে সে আবার বিজ্রোহী
হয়। শেষ পর্যন্ত জীবিলাসের প্রেমে সে সার্থকতার পথ
খুঁজে পায়।

এদের আমি 'সক্রিয় মনে'র দলে ফেলেছি। সক্রিয়
এই হিসেবে যে এরা যা চায় তা নিজের চেষ্টায় পেতে
চেষ্টা করে। দৈবের ওপব নির্ভর করে চোখের জল ফেলে
না। বিনোদিনী নানা ছলনায় মহেন্দ্রকে প্রলুব্ধ কবতে
চেষ্টা করে এমন কি আশার জ্বালনীতে চিঠি পর্যন্ত লেখে,
শ্রীমা লাল আলোয়ান গায়ে দিয়ে প্রদীপ হাতে মধুসূদনের
পথে দাঁড়িয়ে থাকে, ললিতা সমস্ত বাধা অগ্রাহ করে
বিনয়ের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠি ত্যাগ করে চলে আসে,
দামিনী গুহায় অভিলাষ করে, বিমলা সন্দীপের সঙ্গে
রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে, উর্মিলা আদিত্যকে
নিয়ে মজতাজ ঘুরে বেড়ায়। স্বেচ্ছামত পথে চলতে গিয়ে
প্রায়ই এরা ভুল পথে চলে কিন্তু সে ভুল নিজেরাই শুধরে
নিয়ে আবার অগ্রসর হয়।

আর এক টাইপের চরিত্র রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করে
গেছেন—যারা গভীরভাবে ভালবাসে কিন্তু কিছুতেই
নিজেদের প্রকাশ কবে না। সন্ধ্যাতারার মত পবিত্র
সুন্দর দীপ্তিতে এরা দেদীপ্যমান আর তেমনিই সূদূর।
কথায়, কাজে কিংবা সেবায়—কোনভাবেই এরা গায়ে
পড়ে এগিয়ে আসে না। এরা আত্মস্থ, আত্ম-সমাহিত,
নির্লিপ্ত। তুষার-ঢাকা গিরিশৃঙ্গের গায় অপরূপ সৌন্দর্য

ও অল্পমম মহিমায় এরা ধীর স্থির হয়ে আছে। প্রেমের
সার্থকতায় এরা চঞ্চল কিংবা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না,
প্রেমের ব্যর্থতায়ও নীরব ধীর। কারণ, সাংসারিক তুচ্ছ
চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্ব উঠে গেছে এরা। ভালবাসা
লৌকিক গুণী ছেড়ে অলৌকিক লাভ কবেছে। কোন
কর্ম দ্বারা নিজেদের মনোভাব প্রকাশ কবে নী বলেই
আমি এদের মনকে নিষ্ক্রিয় বলেছি। হেমনলিনী
(নৌকাডুবি), সূচরিতা (গোরা), লাবণ্য (শেষের
কবিতা), কুমুদিনী (ষোণাষণ) এই শ্রেণীর নারী।

হেমনলিনী রম্যরূপে গভীরভাবে ভালবেসেছিল—
কিন্তু শুধু একবারমাত্র সে তার মনোভাব প্রকাশ
করেছে—‘দাদা, আমি প্রমাণের অপেক্ষা করি না—
তোমরা তাঁহার বিচার করিতে চাও কর—আমি তাঁহার
বিচাবক নছি—বিবাহেব কথা কে বলিতেছে?...কিন্তু,
আমার মন ভাঙাইবার জন্ত মিথ্যা চেষ্টা কবিতেছ।’

যে ম্যাজিস্ট্রেটের অস্থায়ি অবিচারে গোরা সশ্রম
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল, তাঁরই বাড়িতে উৎসব উপলক্ষে
সূচরিতাব অভিনয় করবার কথা। বিনয়, ললিতা ঘৃণায়
ম্যাজিস্ট্রেটের আতিথ্য ত্যাগ কবে কলকাতায় চলে গেল,
কিন্তু সূচরিতা গেল না। তাব আসতে ইচ্ছা ছিল না,
কিন্তু যখন এসেছে তখন কর্তব্য করতেই হবে। ললিতার
প্রব্বের উত্তরে শুধু একবার বলল, নরকযন্ত্রণাও সহিতে হয়।
আজকেব দিন জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।

লাবণ্য বলে, ভয় কিসের মিতা। এ আগুন-পোড়া
প্রেম, এ স্থখের দাবী করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি
দেয়—এর পেছনে ক্লান্তি আসে না, স্নানতা আসে
না।

কুমুদিনী এক অপূর্ব সৃষ্টি। সে আশ্চর্য সুন্দরী।
নিজেই নিজে সম্পূর্ণ। দেবতার মত সহজ। সাধারণ
মেয়ের মত কোন অশোভন প্রগলভতা নেই। মধুসূদন
তাকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসে। কুমুদিনীও স্বামীকে
গ্রহণ করবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে এসেছে, তবু তার জীবন
টাজ্জবী। কারণ, হেমনলিনী, সূচরিতা, লাবণ্যের মত
কুমুদিনীর প্রেম অনেক উঁচু স্তরে বাঁধা, অলৌকিকত্বের
গুণী ঘেরা, মধুসূদনের স্তূলতা সে সহ করতে পারে না।

অমৃতের সন্ধানে

[রূপক গল্প]

অচ্যুত গোস্বামী

আমার চাবদিকে গাঢ় অন্ধকার। নিশ্চিহ্ন নিরেট অন্ধকার—যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। এ অন্ধকার অবশ্য আজ মতুন নয়, কিন্তু কোনদিন জানতাম না যে আমরা এমন অন্ধকারের মধ্যে বাস করছি।

আমাদের জাতি খুব প্রাচীন জাতি। এমন কি ঐতিহাসিক গবেষণায় যদি প্রমাণিত হয় যে আমরা পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি তা হলেও একটুও বিস্মিত হব না। সিন্ধু সভ্যতা বা ঈজিপ্সিয়ান সভ্যতা আমাদের বয়সের তুলনায় নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমাদের জীবৎকালের মধ্যে কত সভ্যতা এসেছে গিয়েছে, কত জাতি উদয়শিখরে আবোহণ করে অস্তাচলগামিনী হয়েছে। আমরা কোনদিন তাদের খবর বাখি নি, তাবাও সমুদ্র মরুভূমি আর দীর্ঘ অবগ্যানী পার হয়ে কোনদিন আমাদের খবর নিতে আসে নি। পৃথিবীতে কত পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গিয়েছে, অথচ হাজার হাজার বছর ধরে আমরা অকরণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে একই নিয়মে কঠোর জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে এসেছি আর একই ধরনের ঋজু অনমনীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন করে এসেছি। ইতিহাস আমরা রাখি নি; কী করে ইতিহাস লিখে রাখতে হয় তা আমরা জানি না। তাই সঠিকভাবে বলতে না পারলেও অনুমানের উপর নির্ভর করে অনায়াসে এ কথা বলতে পারি যে বিশ হাজার কি ত্রিশ হাজার বছর কিংবা তাব চেয়েও দীর্ঘকাল ধরে এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীর মধ্যে আমরা এক পৃথিবীবিচ্ছিন্ন অপরিবর্তনীয়

মাছুষের দল বেঁচে রয়েছি। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা অন্ধকারের জীবনযাপন করছি। শুধু এটা যে অন্ধকার তা জানতাম না।

হঠাৎ একদিন পশ্চিমদেশের রক্তলোলুপ বণিকের দল লোন্ডনের পিছনে ছুটে ছুটে সমুদ্র পেরিয়ে, মরুভূমি অরণ্য পেরিয়ে আমাদের দেশে এসে হাজির হল। তারা আমাদের অশেষ ধন্যতা দিয়েছে এবং দিচ্ছে। তবু তারা এসেছিল বলেই হঠাৎ একসময় পৃথিবীর দরজা আমাদের সামনে খুলে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম এক বিরাট সমুদ্রমেখলাবেষ্টিত দিগন্তবিস্তৃত পৃথিবী আলোয় আলোময়। দেখলাম আর সেই প্রথম বুঝতে পারলাম আমরা এত দীর্ঘকাল ধরে এক নিশ্চিহ্ন ধাবমান অন্ধকাররাশির মধ্যে বাস করছি।

অন্ধকার কার ভাল লাগে? আমাদেরও ভাল লাগে নি বলে আমরা আলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেছি। আমার দেশে আজ নবজাতকের আবির্ভাবের সম্ভাবনা ঘোষিত হয়েছে; তাবই প্রসববেদনার শব্দে আজ আকাশ-বাতাস মুখবিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বৈদেশিক শাসনরঞ্জু ছিন্ন করে আমাদের মুক্তির দিন এখন আর খুব বেশী দূরে নয়। কিন্তু সেটাই তো বড় কথা নয়। তারপরেও যে আমাদের দীর্ঘ যাত্রাপথ সামনে প্রসারিত রয়েছে। আমরা আলোর পথিক; আলোকের পথ বেয়ে যে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

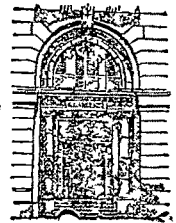
আমরা পশ্চাদ্বর্তী জাতি। বিদেশীকে অঙ্কুরণ



সে যুগে মানুষ তার
লাঙ্গল ও তাঁত,
তার তীর ও
ধনুক এবং
রথের ব্যবহার
করত তার
জীবনের বিকাশের
উদ্দেশ্যে, ঠিক তেমনি
আজকের দিনেও
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে
মানুষের কল্যাণের জগুই
নিয়োজিত করতে হবে।

কবিগুরু 'নগর ও গ্রাম' ইংবেজী
প্রবাসন অংশবিশেষে বাংলা অনুবাদ।
বিশ্বভারতী বুলেটিনের ১৯৪৭ সালের
১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড, দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড, বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড,
দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়্যাকন কোং লিঃ এবং দি হুগলি ডকিং অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং কোং লিঃ কর্তৃক প্রচাষিত।



আমাদের করতেই হবে। কিন্তু কী ভাবে? কতখানি? আমরা যদি নিছক অল্পকরণের পথে চলি তবে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির প্রভাবে যেমন করে দিক্‌ভ্রষ্ট সামুদ্রিক নৌকো পরস্পর বিপরীত বাতাসে শুধু আন্দোলিত হতে থাকে, তীরের দিকে যেতে পারে না, তেমনই করে আমরা অর্থহীনভাবে আন্দোলিত হব আর অসুস্থ হয়ে যেতে উঠব। এই সম্ভাবনার হাত এড়াতে গেলে আমাদের একটি নিজস্ব আদর্শ লক্ষ্য অথবা দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। বিদেশ থেকে আমাদের অনেক জিনিস গ্রহণ কবতে হবে। কিন্তু কোনটুকু গ্রহণ করব, আর কোনটুকু বর্জন কবব তা নির্ধারণ করার জন্য একটি নিজস্ব মাপকাঠি আমাদের দরকার।

গভীর ভ্রমশ্রায় ডুবে বয়েছি; কোথায় সেই মাপকাঠি খুঁজে পাব? মাপকাঠির সন্ধানে একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এতক্ষণে বোধ কবি আমি কোন্ দেশের লোক তা ভাল কবেই বুঝতে পেরেছেন। তবু যদি খটকা থেকে থাকে তবে আর একটু বিবরণ দিই। আমার গায়ের বঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আমার চোখের নীচের হাড় দুটো একটু বেশী উঁচু, আর আমার নাকটা অতটা খ্যাবড়া না হলেও চলত। আমার এবং আমার দেশ সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী পবিচয় আপাততঃ দিতে পারছি না, কারণ তাতে আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে।

প্রথমে গিয়েছিলাম প্রাচীন পৃথিবীতে সভ্যতাব পীঠস্থান বলে খ্যাত এক দেশে। এ দেশের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, যান্ত্রিক উন্নতি দেখে আমি মুগ্ধ হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হতে চলেছে, তখন এ সব একদিন আমাদের দেশেও আসবে। কালের অমোঘ নিয়মকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু যান্ত্রিক উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের আত্মার যাতে অপমৃত্যু না ঘটে আমি তারই বীজমন্ত্রের সন্ধানে বেরিয়েছি। তারই খোঁজে আমি এ দেশের প্রধান শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

প্রথমেই আবিষ্কার করলাম এ শহরের একশ্রেণীর

মেয়ে কত কম পোশাক পরে একটি মেয়ের চলতে পাবে তারই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারা আমাকেও ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মুখে শুনলাম, আমি কৃষ্ণবর্ণ বলে তাদের কোন আপত্তি নেই। রূপো থাকলে রূপের অভাবে কোন অস্ববিধা হবে না। তারা আমাকে আখ্যান দিল যে সভ্যতার মাদক-রস আমাকে আকর্ষণ পান করাবে যদি আমার কাছে রূপো থাকে।

চলে যাচ্ছিলাম। একটি মেয়ে আমার পথ রোধ কবে দাঁড়াল। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের দেশে কি পোশাক পাওয়া যায় না?

মেয়েটি রাগ করল। রাগের একটা মুদ্রা করে বলল, এখানে যদি বাঙালি বাঙালি পোশাক দাঁড়িয়ে থাকত তা হলে কি মৌমাছিব দল এখানে ঘুর ঘুর করে বেড়াত?

নাই বা বেড়াত। মৌমাছিদের দিয়ে কী দরকার?

দরকার আছে বইকি। আমরা তাদের শোষণ করব।

শোষণ করবে? শোষণ করা কি ভাল?

শোষণ যদি না করি, তবে অপরে আমাদের শোষণ করবে।

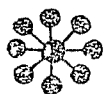
হঠাৎ আমার মনে হল এই মেয়েটি শুধু যে কাম-মুগ্ধ পুরুষকে শোষণ করে তা নয়, এক অমানুষিক সমাজ-ব্যবস্থার দ্বারা এ নিজেও প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে শোষিত হচ্ছে।

এই নগ্নিকা যেন এই বিখ্যাত দেশের প্রতীক। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ দেশ এক আশ্চর্য গণভক্ত গড়ে তুলেছে। গড়ে তুলেছে পৃথিবীর বিস্ময় সাহিত্য আর শিল্প। তারপর সেই অজিত সম্পত্তিকে অঞ্জলিবদ্ধ করে অনায়াসে পূজার নৈবেদ্য হিসাবে উপচার দিয়েছে নগ্নতা দেবীর পায়ে। সমস্ত সম্পদ এইভাবে উপচার দেওয়ার পর অবশিষ্ট রয়েছে শুধু স্বরা। সভ্যতার সেই স্বরা এ দেশ আকর্ষণ পান করেছে। কিন্তু সভ্যতার স্বরা আমি চাই না, আমি খুঁজতে বেড়িয়েছি সভ্যতাব অমৃত।

এ দেশ থেকে প্রণালী পেরিয়ে গেলাম বিশ্ববিজয়ী দ্বীপে। নেমেই দেখলাম চারদিকে বিরাট আয়োজন। বাড়িঘর বাস্তাঘাটে বঙ-বেরঙের আলোর বাজার। শিশুরা



“..... এই বড়ো
 মৃত্যুর চাপনামা ওর কাবছার
 তোমার মতো ঢালি দাঁড়িয়ে
 নানা বন্দনসুয়ে।”



স্বপ্ন শ্রমিক ১৩৬৮

উজ্জল রঙ ভালবাসে জানতাম। এ দেশের লোকেরা সেই শৈশবে ফিরে যেতে চাইছে নাকি। শুধু আলোই নয়, সমস্ত শহরটাকে যেন বিয়ে-বাড়ির মত করে সাজানো হয়েছে। আমার গায়ের রঙ কালো দেখে কেউ আমার প্রশ্নের জবাব দিতে চায় না। অনেক কষ্টে জানতে পাবলাম যে এখানে-রানীর পূজা কবা হচ্ছে। দেখলাম সিনেমা-অভিনেত্রীর মত জমকালো স্কার্ট-পরা সিনেমা-অভিনেত্রীর মত চট্টল চেহারার এক তরী মেয়েকে সাড়ম্ববে পূজা করা হচ্ছে। আর মেয়েটি লজ্জেলুপ খাওয়ার মত মুখ করে মিটিমিটি হাসছে আর পূজা নিচ্ছে। যেন এটা একটা মস্ত খেলা, সে নিজেই এই পুতুল-খেলার পুতুল। তার পাশে তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনুগত আঞ্জা-বাহকের মত মুখ করে ভৃত্য-গোছের একটি লোক। ওনলাম সে বানীব তল্লাবাহক নয়—রানীব স্বামী।

রানীর পূজা! আমাদের দেশেও আমবা এমনি করে সর্দাবদের বা রাজাদের—যাদের বুদ্ধি একটু বেশী, মানবিক অনুভূতির দিক দিয়ে যারা সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু খাটো—পূজা করি। যে জিনিস আমাদের ঘবেই রয়েছে, সে জিনিসের জন্তু কি তবে এতদূর ছুটে এসেছি!

একজন দীর্ঘকায় খেতান ভদ্রলোক বললেন, আমাদের রানীকে শুধু দেখছ, এ দেশের গণতন্ত্রটা দেখলে না? রানীর তো আসলে কোন ক্ষমতাই নেই।

বললাম, বানীর যদি কোন ক্ষমতাই নেই, তবে পৃথিবীর এই সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় মানুষটির জন্তু জনসাধারণের অর্থের এই বিপুল অপব্যয় কেন?

আমি অজ্ঞ মূর্খ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি বলে ভদ্রলোক আমার অশিষ্ট উক্তিকে হেসে ক্ষমা করলেন।

বললেন, আমাদের বানী একটি প্রতীক মাত্র।

বললাম, যে গণতন্ত্র একটি সামান্য অর্থহীন প্রতীকের মোহ ছাড়তে পারে না, সে গণতন্ত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ফাঁকি আছে।

ভদ্রলোক এবারও আমাব অর্বাচীনতাকে ক্ষমা করলেন। বললেন, কালো আদমিদের থাকার জন্তু

শহবে দু-একটি হোটেল আছে। তাড়াতাড়ি চলে যাও, না হলে জাফগা পাবে না। আমাদের-রাস্তার ফুটপাথ অবশ্য তোমাদের শোবার ঘরের থেকে ভাল। কিন্তু এখানে রাত্রিবাসের নিয়ম নেই।

কাজেই আমাকে দু-চারদিনের মধ্যেই গণতন্ত্রের পীঠস্থান সেই রত্নভবা দ্বীপ ছাড়তে হল। গণতন্ত্র হল আলো, মানে ফরসা; আর আমি হলাম অন্ধকার, মানে কালো। দুয়ের মধ্যে মিশ খেলো না।

তারপর গেলাম নবজাগ্রত নবীন সভ্যতার দেশে। সেখানে আমি কালো বলেই বিশেষভাবে সন্মতি হলাম। পুনর্কিত হয়ে ভাবলাম অবশেষে এখানে বুঝি আমি আমার কামনার বস্তু লাভ করব। একটি শহবে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে দেখলাম হাজার হাজার মানুষ সাবিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং সাবিটি আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। কিছু বুঝতে পারার আগেই আমিও সারির মধ্যে সামিল হয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে এগুতেও লাগলাম। এক ব্যক্তি আমার হাতে কিছু ফুল দিয়ে দিল। ঘণ্টা তিন-চার এমনি শব্দক গতিতে এগিয়ে যাওয়ায় পর আমি এক মহাপুরুষের সংরক্ষিত শব্দদেহের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। এই মহাপুরুষ অনেক বছর আগে গত হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য, বৈজ্ঞানিক কৌশলে রক্ষিত তাঁর শব্দদেহকে দেখলে মনে হয় তিনি যুগিয়ে আছেন।

তাঁর পদপ্রান্তে ফুলের গুচ্ছ বেখে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ভাবতে লাগলাম। আমাদের দেশে টোটম পূজা, অর্থাৎ আমাদের কল্পিত পশু-পূর্বপুরুষদের পূজার বিধান আছে বলে আমরা নিন্দিত। টোটম পূজা বর্বরতার অকাটা প্রমাণ। কিন্তু এই অত্যন্ত হুমুভ্য দেশে যা দেখলাম তাও কি এক ধরনের টোটম পূজা নয়? অবশ্য এই পূর্বপুরুষটি পশু নয়—মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্ততম। কিন্তু তাই বলে দেব-দেবতাদের এককালে যে-ভাবে পূজা করা হয়েছে সেইভাবে একজন মৃত মানুষকে পূজা করা কেন? এই নৃবসভ্যতা থেকে তবে কি আমি এই শিখব?

“পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অত্যাশ্চর্য
সজ্জা দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন থরৎ করেছে।”

রবীন্দ্রনাথ



naa/SER-RC.2

কবিগুরুর জন্ম-শতবর্ষ পুঁতি উপলক্ষে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রকাশনা

একজন পূর্ব-পরিচিতকে জিজ্ঞেস করলাম, এই মহাপুরুষটি তো মৃত ?

হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর আত্মা এখনও আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছে। তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করেই আমরা এত বড় হয়েছি। • যদি পৃথিবীবাসী তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলে তবে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে।

আমরা দেব-দেবতাদেব পূজো করি। মানুষ—বিশেষ করে মৃত মানুষকে পূজো করা কেন ?

কারণ মানুষ হলেও—তিনি সাধারণ মানুষ নন, তিনি ছিলেন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মানুষ। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষের জাগকর্তা হিসাবে। জীবনে তিনি একটিও ভুল করেন নি বা ভুল কথা বলেন নি।

বললাম, পৃথিবীতে দু হাজার বছর আগে আব একজন জাগকর্তা এসেছিলেন। তাঁর শিষ্যদামস্তুবা বলে—এই সেদিন অবধিও বলেছে যে—তিনি যা বলে গিয়েছেন তা সবই অজাস্ত; তাব থেকে অল্পকম কিছু বলা পাপ।

আমার সঙ্গীটি একটু অসহিষ্ণুতাব ভঙ্গী করে বললেন, ও-সব ধর্মের বুজুকির কথা ছেড়ে দাও। ধর্ম হচ্ছে আফিম—ওপিয়াম বা মর্ফিয়া। আমাদের মহাপুরুষ যা বলে গিয়েছেন তা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-নির্ভর। কাজেই সম্পূর্ণ সত্য।

তিনি তা হলে ভগবানের মতই নিভুল ?

ভগবান আমরা বিশ্বাস করি না। তবে তোমাদের কল্পিত ভগবান অনেক ভুল করেছেন, তিনি কখনও ভুল করেন নি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ভগবান ভুল করেছেন ?

তিনি সৃষ্টিকার্যে এগুবার আগে যদি একবার আমাদের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন, তবে তাঁর সৃষ্টিকার্যে এত দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতা থাকত না। আর সেই ত্রুটি সংশোধন করার জন্ত আমরাও এত পরিশ্রম করতে হত না।

ঘুরতে ঘুরতে সেদিন একটা সুন্দর জিনিস দেখলাম। একটা ফাঁকা জায়গায় তাঁর খাটিয়ে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আড়ম্বরের আভিষ্য নেই,

শোভনতা আছে। এ সৌন্দর্য আপন গর্বে লোকের কাছে জাহিব করে জানায় না তার খরচ কত, অথচ তার পরিচ্ছন্ন মাধুর্য চোখকে তৃপ্তি দেয়। শুনলাম নাজানো হয়েছে সম্পূর্ণভাবে এক স্থপ্রাচীন দেশেব পদ্ধতিতে। বেতের কাজ করা তোরণ, আলপনা, মদল-কলস, বরণডালা প্রভৃতি জিনিষগুলোর সাধারণ অসাধারণত্ব আমাদের মুগ্ধ করল।

খবর নিয়ে জানতে পারলাম ভারতবর্ষের এই প্রাচীন দেশে এক খণ্ডদেশ আছে, সেই দেশে জন্মেছিলেন এক কবি রবীন্দ্রনাথ; তাঁর জন্মশতবারিকীর আয়োজন করা হয়েছে এত দূর দেশে। কবির রচিত গান কবিতা নাটক প্রভৃতি শুনলাম। সব কিছু যে বুঝতে পারলাম তা নয়, কিন্তু অভিভূত হলাম।

মনে মনে অনুমান করলাম, যে মহাপুরুষের কথা এত দূর দেশের লোককে অবধি আকৃষ্ট করেছে, সে মহাপুরুষের বাণীব মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে। আমি যে জিনিস অনুসন্ধান করছি হয়তো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তা খুঁজে পাব।

এই প্রাচীন দেশটির নাম শুনেছিলাম, কিন্তু কোনদিন সে দেশ সন্ধানে কোন উৎসাহ বোধ করি নি। তার কারণ অবশ্য প্রধানতঃ অজ্ঞতা। এ দেশ সন্ধানে শুধু এটুকুই জানতাম যে সেখানে সুদূর অতীতে এক সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই স্তিমিত-গৌরব দেশ আমাদের চেয়ে সামান্যই অগ্রসর, আমাদেরই মত অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশগুলোর পিছনে পিছনে ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে।

সেইজন্মই আমার বিশ্বাসের সীমা রইল না। কী ছিল এই পশ্চাত্তরী দেশের কবির মধ্যে যার জন্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি আজ তাঁকে প্রণতি জানাচ্ছে।

আমার মনে হল এই প্রশ্নের জবাবটা আমার সর্বাগ্রে জানা দরকার। প্রাচীন দেশের কবির বাণী হয়তো আমার পক্ষে উপযোগী হবে। এই সেদিন পর্যন্তও পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশ ছিল আমাদেরই মত এক পরাধীন জাতি। যে মন্ত্র এই মৃতকল্প জাতিকে উজ্জীবিত করেছে

ব্রিটানিয়া বিস্কুট



বাজারের সেরা

সেই মন্ত হয়তো আমার দেশের পক্ষে বড় বড় অগ্রসর দেশের চিন্তাধারার চেয়ে বেশী কার্যকরী হবে।

আশ্চর্য! এ দেশের কথা আমি এতকাল পর্যন্ত একবারও ভাবি নি। ইতিমধ্যে আমি এক এক করে কত দেশ ঘুরেছি। এবপর নতুন পৃথিবীতে যাব যাব ভাবছিলাম। এদের কোন দেশই আমাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করে নি, কিন্তু একবকম ধরেই নিয়েছিলাম, আমাকে যদি কেউ কিছু শেখাতে পাবে তবে এরাই তা পাববে।

মত বদলিয়ে ফেললাম। ঠিক করলাম উক্ত প্রাচীন ভূমির অন্তর্গত কোন এক দেশে আমি যাব। যে দেশের নাম কেউ জানে না, যে দেশের কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, আমি সেই অবজ্ঞাত অবহেলিত দেশে যাব পবম-প্রাপ্তির সন্ধানে। রবীন্দ্রনাথের কথা যদি জানতে হয় তবে অত্র দেশে কেন? তাঁর দেশ তো এ যুগে এমন কিছু দূরবিগম্য স্থান নয়।

এ সব কথা চিন্তা করে আমি আর নব সভ্যতার দেশে একদিনও দেরি করলাম না। প্লেনের টিকিট কেটে প্রাচ্য ভূমি ব উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

তুই

রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমির দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি— এ দেশের সবচেয়ে বড় শহরে। বিশ্বের বড় বড় শহরগুলোর তুলনায় এ শহর অনেক নিম্নত। তবু এ শহর আমার ভাল লাগল এর পরিকল্পনাহীন স্বাভাবিক বিস্তারের দরুন। এ শহরের সৌন্দর্য্য এব প্রত্যাশিত শৃঙ্খলার মধ্যে নয়, এর অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতাব দরুন। যেখানে যে জিনিসের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, সেখানে সে জিনিস দেখতে পাওয়াই এখানকার বিশেষত্ব।

মানবজাতির একদল বিচিত্র প্রতিনিধি এ দেশে বাস করে। তারা দুর্বল দেহ এবং ধ্বংস—মাত্র এইটুকুই তাদের সাধারণ গুণ। পান্চাত্ত্যেব যত গৌরবর্ণ থেকে

শুরু করে আমার মত কৃষ্ণবর্ণ এবং এর মাঝামাঝি ধতরকমের রঙের ভাঁজ কল্পনা করা যায় তার সবই এ দেশে আছে। মুখের আকৃতির মধ্যে এরিয়ান মোদলয়েড নিগ্রোয়েড তিনরকম আদলই লক্ষ্য কবতে পাবলাম। বুঝতে পারলাম, যা নেই এ দেশে তা নেই জগতে।

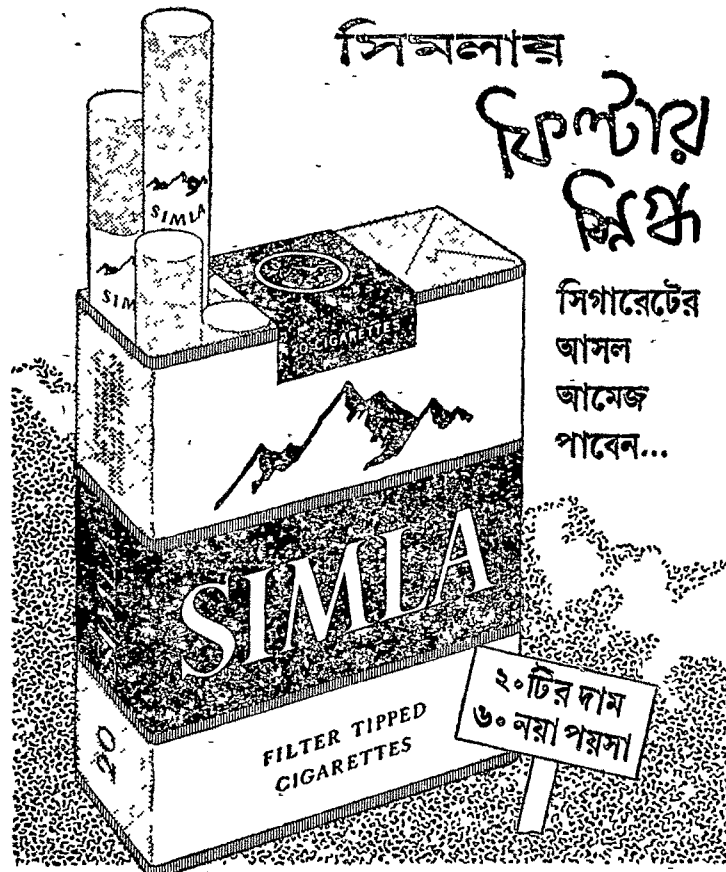
একটি স্থানীয় লোকের পরিচালিত হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমার জন্ম নির্দিষ্ট একাধিকবিশিষ্ট ঘরটাতে ঢুকে জিনিসপত্র রেখে সবে একটু বিশ্রাম নিতে শুরু করেছি, এমন সময় পাশের ঘর থেকে এক শীর্ণদেহ পৈতে গলায় জড়ানো ভদ্রলোক আহুত গায়ে এসে আলাপ জমালেন। মাত্র মিনিট দশেক সময়ের মধ্যেই ভদ্রলোক গড়গড় করে প্রায় মুখস্থ বলার মত করে বাঙালী জাতির যত দোষ আছে তার আত্মপূর্বিক বিবরণ দিয়ে গেলেন। এ জাতি অলস, পরিশ্রমবিমুখ, পরশ্রীকাতর, একতাবিহীন, আত্মস্থ-সর্বস্থ, এবং অভিধানে আর যে সব চারিত্রিক দোষেব বিবরণ আছে তার সবকিছু। একজন মানুষের মধ্যে অতগুলো দোষ কল্পনা করলে তার মধ্যে আর ভাল কিছু অবশিষ্ট থাকে কিনা সন্দেহ। অথচ ভদ্রলোকের মতে এ দেশের বাসিন্দা মাজেই ওই সব দোষের অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে আরম্ভ করে লেখক শিল্পী মায় দোকানদার পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত তাঁর কথার স্রোতে বাধা দিয়ে বললাম, কেন, আপনাদের মধ্যে তো রবীন্দ্রনাথ ছিলেন!

ভদ্রলোক যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। নিভান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, ওই একটা লোক ক্ষমাঘোষা করে এ দেশে জন্মেছিল বলেই এ দেশের নামটা এখনও পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছেন, না হলে তো এতদিনে গোটা জাতটাই ধুলোর সঙ্গে মিশে যেত।

দিন কয়েকের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম আত্মনিন্দাটা এ জাতির চারিত্রিক বিশেষত্ব। এর থেকে আমি দুটো জিনিস অনুমান করতে পারলাম। প্রথমতঃ, এদের এটুকু আত্মবিশ্বাস আছে যে তাদের যেটুকু প্রকৃত সম্পদ, শত নিন্দাতেও তা নষ্ট হওয়াব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এরা নিজেদের এক অনন্ত বিশেষত্ব-

ফিল্টার টিপ সিমলা সিগারেটে তামাকের স্বাদ পুরোপুরি পাবেন



ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানির তৈরী

SC-7 BEN

সম্পন্ন জাতি বলে মনে করে, কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে কবে না। এই শেখোক্ত গুণটি নেহাত তুচ্ছ নয়। আমি যে-সব বড় বড় দেশে গিয়েছি, সে-সব দেশের লোকেরা নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করে। কেউ ঝুঁকখাটা সাড়ম্ববে প্রচার করে, কেউ বা করে না। এই অহমিকাবোধ বিশ্বযুদ্ধের অন্ততম কারণ কিনা সেটা পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়।

আমি খুব ভাল সময়ে এ দেশে এসে উপস্থিত হলাম। বৈশাখ মাস সবে শুরু হয়েছে। দিকে দিকে মার্ভণ্ড-দেবের অমিত করুণা প্রচণ্ড ধাবায় বসিত হচ্ছে। তবুও এ দেশের মাঠের ঘাসের বৃক্ষশাখার পাতার আশ্চর্য সবুজ বিনষ্ট হয় নি। সাদা মেঘের পাড়-বসানো নীলাববীথানা পরে উদার আকাশ যেন অজস্রধারায় হাসছে। বঙ্গোপসাগরের বাতাসেব সঙ্গে সেই হাসির শব্দ ভেসে আসে যেন ক্লান্ত অবসন্ন সায়াহু বেলায়।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিপুল উত্তমে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন শুরু হল। মোড়ে মোড়ে রবীন্দ্র-তোষণ, রাস্তায় রাস্তায় আলপনা, শহরের সমস্ত খোলা জায়গাগুলোতে তাঁবু পড়েছে বিভিন্ন অল্পঠান-মুঠা পালন করার জন্য। রাস্তায় রাস্তায় বাড়িতে বাড়িতে পার্কে পার্কে অজস্র অজস্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, রবীন্দ্রনাথের মর্মর আর মুময়মূর্তি।

আয়োজনের অবিচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ততাটুকু আমার ভাল লাগল। কোথাও জাঁকজমকের অবধি নেই, কোথাও-বা দীনদরিদ্রের ভোজে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ। যদি এক সর্বাঙ্গিক পরিকল্পনা অমুযায়ী আয়োজন ঘটত, তা হলে সবকিছু অনেক বেশী শোভন আর পরিচ্ছন্ন হতে পারত। কিন্তু সেই সঙ্গে তা হত অনেক বেশী একঘেয়ে। কল্পনা যেখানে দীন, সেখানে দীনতা প্রকাশ পেত না; কল্পনা যেখানে খাপছাড়া সেখানে বেথাপ্লার দেখা মিলত না।

চারদিকে আলোব সমারোহ। শঙ্খধ্বনি আর হলুধ্বনির সঙ্গে মিশেছে যান্ত্রিক উৎপাত মাইকের কাংক্ষধ্বনি। কেউ শুধু বা না শুধু, যান্ত্রিক রেডিও অমাহুযিক স্বরে বিভিন্ন অল্পঠানের ধারাবিবরণী বা

অল্পঠানের বিভিন্ন অংশ বলে করে শুনিয়ে চলেছে। এই বিপুল সমারোহের মধ্যে আমি নিঃসঙ্গ যাত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিকেল থেকে রাত বারটা-একটা অবধি। শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

ভাল লাগছে। মনের মধ্যে তবু এক আশঙ্কার কাঁটা খচ খচ করে বিঁধছে। যেমন দেখেছি রানীর পূজা, যেমন দেখেছি পূর্বপুরুষের পূজা, এ দেশের রবীন্দ্র-পূজা কি তারই এক রকমফের? রবীন্দ্রনাথ কি শুধু মাত্র এক অবয়বহীন ভাবালুতাসর্ব্ব আইডিয়া মাত্র? রবীন্দ্রনাথ কি শুধুমাত্র একটি জাতীয় গর্বের প্রতীক মাত্র? রবীন্দ্রনাথের কোন শিক্ষা জাতির মর্মমূলে প্রবেশ করল না, কেবল মাত্র একটা নাম নিয়ে এই বিপুল মাতামাতি শুরু হয়েছে?

আমাব এই অনির্দেশ্য ঘোরাঘুরির স্রুজে একদিন একটি খুব জমকালো তোবণ পার হলাম। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি উজ্জল বর্ণে শোভিত তাঁবু ফেলা হয়েছে। প্রবেশপথের মাথায় লেখা রয়েছে—আনন্দং খলিদং ব্রহ্ম। আমি নিরানন্দ দেশেব লোক—আনন্দের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ ভিতরে ঢুকলাম। যা দেখলাম তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ভয়ে এবং বিস্ময়ে। আমার পার্থিব চোখ দিয়ে যে এমন অপার্থিব দৃশ্য দেখব তা কোনদিন কল্পনা করি নি। চারদিকের যা-কিছু সাজসজ্জা সব সবুজ শ্রামল তরুণ বর্ণোজ্জল। কোথাও এতটুকু মালিন্য নেই, রঙ কোথাও ফিকে হয়ে যায় নি বা সবুজে ধূসরের আমেজ লাগে নি।

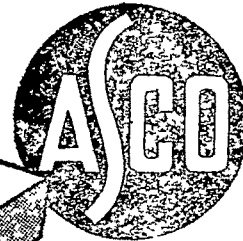
আমি ভিতরে ঢুকতেই একটি লোক আমার আপাদ-মস্তক সবুজ আলখাল্লায় ঢেকে দিল।

জিজ্ঞেস করলাম, এ আলখাল্লা কেন?

লোকটি বলল, সবুজ হচ্ছে প্রাণের প্রতীক, আনন্দের প্রতীক।

খানিক দূরে গিয়ে দেখলাম ছাতিমগাছের তলায় মাটির তৈরি একটি মঞ্চের উপর একদল প্রবীণবয়সী লোক আতুড় গায়ে উদ্বাহ হয়ে নৃত্য করছেন। ভদ্রাটী কীর্তনের, কিন্তু ছন্দটা মনে হল রাবীন্দ্রিক। ধারা

এ্যাসকো
সাবান
কাচাই
মহজ



বার ও ট্যাবলেট

এক টুকরো এ্যাসকো সাবানে
কম সময়ে অনেক বেশী
কাপড়চোপড় পবিস্কার হয়
প্রচুর ফেনা হয়
জামাকাপড় টেকেও বেশী।

এশিয়াটিক সোপ কোং — কলিকাতা

কোনদিন ইজিচেয়ার ছেড়ে নড়েন নি তাঁদের এই কষ্টকর প্রয়াস দেখে হাসি এসে যাচ্ছিল। প্রবল চেষ্টায় হাসিটা চেপে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার—হাসি তো চলবে না।

ইন্টারপ্রিটার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এঁরা কারা ?

ইন্টারপ্রিটার উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে স্থাপন করে বললেন, এঁরা সবাই পূজনীয় ব্যক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

তঁর দেখাদেখি আমিও নমস্কার জানালাম। বললাম, বটে। তা এঁরা কি পেটের মেদ কমানোর জন্য ব্যায়াম কবছেন নাকি ?

ভদ্রলোক কটমট করে আমাব দিকে তাকালেন। বললেন, তুমি বিদেশী। তাই তোমাকে লাঠ্যোষধি দিয়ে আব ছুঁথ দিলাম না। দেখতে পাচ্ছ না এঁরা নাচছেন।

লাঠির ভয়ে কথাটা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে গেলাম। বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। ঠিক তো। আমারই ভুল হয়েছিল সার, মাফ করবেন। তা এঁদের নাচের তাৎপর্যটা কী ?

এ নাচের নাম আনন্দ-নৃত্য। রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদেব কবি ছিলেন। সেই আনন্দকে এঁরা ছন্দ রূপায়িত করছেন।

বেচারি অধ্যাপকদের দিকে তাকিয়ে বড় মায়ী হল। তাঁরা অধিকাংশই বেশ স্থলকায়, প্রত্যেকেবই পেটে বেঁটে অলাবুর আকারের একটি বাচ্চা ভুঁড়ি আছে। নাচের পরিশ্রমে তাঁদের গা দিয়ে দরদর ধারায় ঘাম ঝরছে। কারও কোমর গিয়েছে বেঁকে, কারও শিরদাঁড়া গিয়েছে কুঁজো হয়ে। অধিকাংশের পা-ই মাটি ছেড়ে ওঠার সময় 'আর পারি না আর পারি না' বলছে।

বললাম, রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন। জীবনের আনন্দ তিনি প্রচণ্ডভাবে অহুভব করেছেন। কিন্তু এঁরা তো অধ্যাপক। জীবনে কোনদিন এঁরা জীবনের কাছে যান নি, আনন্দ কাকে বলে তা অহুভব করেন নি। এঁদের এই কষ্টকর প্রয়াস কেন ?

ইন্টারপ্রিটার বললেন, এঁরা কোনদিন আনন্দ অহুভব করেন নি তো কী হয়েছে ? এঁরা তত্ত্বজ্ঞানের পথিক। আনন্দ এঁরা না অহুভব করে থাকলেও আনন্দবাদের তত্ত্ব এঁরা ভাল বোঝেন।

প্রসঙ্গান্তরে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ক্যাম্পের এমন আশ্চর্য ঘাস আপনারা কী করে তৈরি করলেন ? এমন আশ্চর্য সবুজ নিটোল কচি ঘাস আমি কখনও দেখি নি। আর এমন অপরূপ সুন্দর গাছই বা আপনারা কোথায় পেলেন ?

ভদ্রলোকটি গবিতভাবে হাসলেন : খুব অবাক হয়েছেন, না ? অবাক হওয়ারই কথা, কারণ এ সবের কিছুই প্রকৃতির থেকে নেওয়া নয়। যা কিছু আমরা প্রকৃতিতে দেখি তা সবই অসম্পূর্ণ, খুঁতে ভরা। মাঠেব ঘাসেব মধ্যে আদ্যেক থাকে শুকনো ডাল ; কত জায়গায় বোদে ঘাসের রঙ বিবর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতির গাছে কত ডাল থাকে বিলী বাকা। কত পাতা থাকে বিকৃত বিবর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাই ভাব-কল্পনাব মধ্যে বিশুদ্ধ চিবনবীন উর্বলী-সৌন্দর্যকে ধরতে চেষ্টা করেছেন। সেই জন্য আমাদের এই ঘাস, এই গাছ, এই পাখি—সব প্রাণিকের তৈরি। এ ঘাস কখনও রোদ লেগে শুকিয়ে যাবে না, এ গাছের পাতা কখনও কালেব স্রোতে বৃদ্ধ হয়ে জীর্ণ হয়ে ঝবে পড়বে না। এ পাখির ডানা কখনও ঝড়ে ভেঙে যাবে না।

এরপরও ভদ্রলোক আবও বলছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি সবে পড়লাম। বক্তৃতা লম্বা হতে শুরু কবলেই আমি ভয় পাই। এ দেশেব লোকেরা বক্তৃতা-বিলাসী, বক্তৃতা খুব ভালবাসে। আমি বাসি না।

আর এক জায়গায় গিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। দেখলাম ছেলেব দল মারামারি বাধিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড করে তুলছে। তাড়াতাড়ি ছুটে পালাতে যাচ্ছি, এক ভদ্রলোক হাত ধরে টানলেন।

ভয় পেলেন নাকি ?

বিরক্ত হয়ে বললাম, ছেলেগুলো মারামারি করে মরছে। থামাতে চেষ্টা করুন না।

ঘরে ঘরে এর সমাদর



ব্রুক বন্ড

চা

অজা এবং সেরা



ব্রুক বন্ড ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

TBB 362DB

ভদ্রলোক হাসলেন, এ মারামাতি নয়। খেলা।

খেলা ?

ই্যা। চারদিকে যে রক্ত দেখছেন এ রক্ত নয়, রঙিন জল। সামনে ঘাসের উপর যে লাল দাগ রয়েছে একটু লক্ষ্য করে দেখুন।

লক্ষ্য করলাম। অলক্ষ্যের মধ্যেই ভ্যানিসিং কালার উড়ে গিয়ে সবুজ ঘাস বেরিয়ে পড়ল।

জিজ্ঞেস করলাম, এবাং মানে কি ?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আনন্দময় আনন্দের জন্ম যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তা আনন্দময়। হিংসা তাই মিথ্যা মায়া। হিংসা অহিংসায় পরিণত হয়ে আনন্দের পাত্র পূর্ণ কবে তোলে।

বক্তৃতার ভয়ে ভদ্রলোকের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এলাম। আবার এক বিচিত্র অভিনব দৃশ্যের সামনে এসে পড়ায় আপনা থেকেই পা থেমে গেল।

কী অপূর্ব দৃশ্য। বেনারসী, জর্জেট, নাইলন প্রভৃতি দামী দামী শাড়ি-পড়া স্ত্রী বঙ্গললনাগণ বৃকের উপর আলুলায়িত কুন্তল ছড়িয়ে দিয়ে অঝোরে কাঁদছেন। তাঁদের চোখ দিয়ে মুক্তাবিন্দুর মত জল রুজ-পাউডারের প্রলেপের ভিতর দিয়ে পথ ভৈরব করে নেমে আসছে। কিন্তু তাঁদের মুখে কৌতুকের হাসি।

ইন্টারপ্রিটার বললেন, পৃথিবী আনন্দময়। দুঃখ তাই মায়া। হাসিই আসল সত্য।

আবার সেখান থেকে পাললাম। আনন্দবাদের আক্রমণে পমূদন্ত হয়ে বেশ জোরে জোরেই পা চালাতে লাগলাম। শেষে একটা গেটে 'এক্সিট' লেখা আছে দেখে সেদিকে অগ্রসর হলাম। গেটের কাছাকাছি আর এক দৃশ্য।

একটি উঁচু জায়গা থেকে একটি মানুষ পড়ে গিয়ে পাতালের দিকে গড়িয়ে গেল। তারপর সে আবার আঙনের মত পোশাক পরে পক্ষ বিস্তার করে উঠে শূন্যের দিকে ষাড়া করল। বুঝলাম এটা একটা যান্ত্রিক কৌশল।

এর অর্থ কি তাই ভাবছিলাম। এমন সময় মাইকে ধ্বনিত হল :

পলকে পলকে

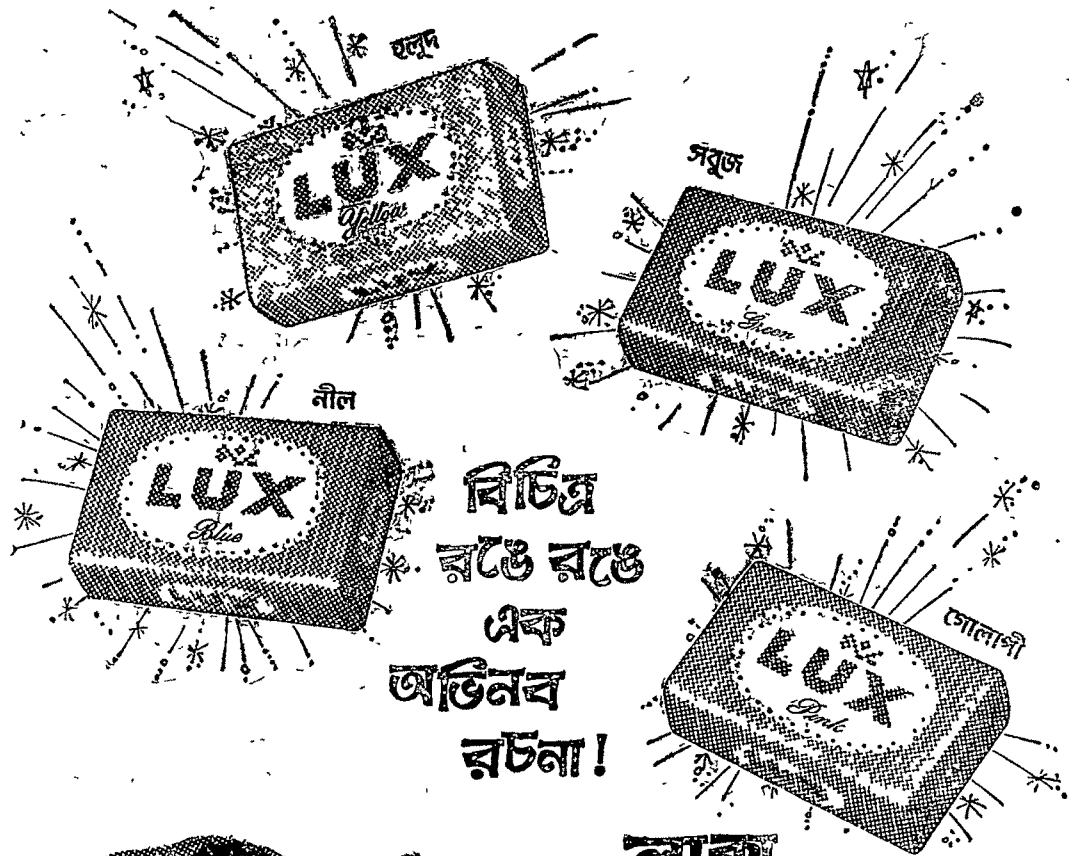
মৃত্যু গুঠে প্রাণ হয়ে বলকে বলকে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মৃত্যু হল মহাজীবনের তোরণদ্বার, ইত্যাদি।

বহুকষ্টে আনন্দলোক থেকে বেবিয়ে আমি অত্যন্ত নিরানন্দ মন নিয়ে আমার আত্মানায় ফিরে গেলাম। এই যদি রবীন্দ্রনাথের বাণী হয়, তবে সে বাণী খুব সুন্দর। কিন্তু সে সুন্দরকে আমি দূর থেকে প্রগতি জানিয়ে শূন্য হাতে দেশে ফিরে যাব। দুঃখের দেশের মানুষ আমি। দুঃখরাতেব রাজা রুজবেশে নিত্য আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমার পায়ে পায়ে হিংসা হিসহিসিয়ে চলে। দুঃখ আমার খাতের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। নির্মম মৃত্যু আমার কাছে আসে ঘুমের ছদ্মবেশে। আমার কাছে দুঃখই সত্য, আনন্দই মায়া।

পরদিন আবার ষাড়া শুরু করলাম। আবার আশায় বুক বাঁধলাম। এখনও অনেকগুলো ক্যাম্প ঘোরা বাকি বয়ে গিয়েছে। কে জানে সে সবে মধ্য হয়ে তো রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পারব। এমন কিছু যা আমার জীবনের মূল্যবান পাথর হয়ে উঠবে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা তোরণের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। তোরণ নয়, যেন বস্ত্রী-আলোর একটা ঘূর্ণি। ভয়ে ভয়ে অপরের দেখাদেখি সেই ঘূর্ণি পার হয়ে ভিতরে ঢুকলাম। একটা উঁচু বেদীর মত জায়গায় পা দেওয়া মাত্র ভোজবাজীৰ্ব মত আমি উপবের দিকে উঠতে লাগলাম। উদ্বিগ্ন গতি শেষ হল তো আমি এক বিচিত্র চক্রাকার গতির ক্রীড়নক হয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতে আমি উদ্বেগে উঠছি। তাকিয়ে দেখলাম এ ক্যাম্পের সবই গতিশীল। দর্শকের দল, ঘোষকের দল, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রতিকৃতি—সব। সেই চলার অবস্থাতেই দেখতে পেলাম এক বুদ্ধ সাদা দাড়িশোভিত ভদ্রলোক অতি শুভ্র প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে একটি সুন্দর তাজমহল তৈরি করলেন। তারপর সেই তাজমহলটার দিকে মুহূর্তকাল



**বিগুন, কোমল লোম্ব এবং
৪টি নাম-রঙে**
আর আপনার প্রিয় সঙ্গাটিও রয়েছে!

লাস দেখুন! বিচিত্র বরণ আর মানানসই বড়ী বোডক!

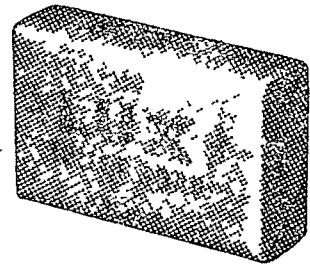
সঙ্গাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার অতি প্রিয় বিগুন লোম্ব—

চোখাব ফর নিতে যে সাবান আপনি চিবদিনই চেয়েছেন।

**"এই বিচিত্র রঙের
মেলা থেকে আপনার মনের
মতো রঙ বেছে নিন!"**

ওলাহেদা জেহান্নেও

সেই কথাই বলেন



মাত্র তাকিয়ে থেকে তিনি উর্ধ্বে উঠতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে তিনি তাজমহলের সীমা পেরিয়ে মহাশূণ্ডে মিলিয়ে গেলেন। তাজমহল আর্দ্রতায় বলে উঠল—
যতদূর চাই—নাই নাই সে পথিক নাই।

শুনতে পেলাম মাইকে ধ্বনিত হচ্ছে : রবীন্দ্রনাথ গতিবাদের কবি। প্রথমদিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত এক বিপুল গতির উন্মাদনায় কবি কাব্যরচনা কবেছেন। অকারণ অবারণ চলাই মহাকালের বাঁতি, জীবনেরও। জীবন তাই প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করছে। আজ যা নতুন, কাল তা প্রাচীন জীর্ণ হয়ে স্থবির এক বাধায় পবিণত হচ্ছে। তখন মহাকালের চক্র এসে তাকে নিঃশেষে ধ্বংস কবে আর এক নতুনের জন্ম দিচ্ছে। মহাকাল এক সর্ববিস্তৃত সন্ন্যাসী। কিছু তিনি কুড়িয়ে নেন না, কিছু সঞ্চয় করেন না। যে মুহূর্তে তিনি পূর্ণ সেই মুহূর্তেই তাঁর কিছু নেই। মহাকালের এই ছন্দে জীবনের স্রবকে বেঁধে নিতে হবে। তবেই জীবন সার্থক। হে মাহুয়, সঞ্চয়েব মনোভাব ত্যাগ কর। বৃহৎ পরিকল্পনার অহঙ্কার ত্যাগ কর। কারণ তোমার আজকের রচিত ইমারত কালকের স্বচ্ছন্দ গতির পথে দুস্তব বাধা হয়ে দাঁড়াবে। মুহূর্তের পুঞ্জারী হও, ক্ষণিক দিনের আলোতে মহাকালের আনন্দের যে কণিকা প্রসাদ লাভ করবে তাই তোমার পরম প্রাপ্তি। হোক ফুল, হোক তাহা গান।

খানিকক্ষণ পরে সেই যাত্রিক গতিশীলতা আমাকে ধপাস করে নামিয়ে দিল শক্ত অচঞ্চল মাটির উপর। হাঁপ ছেড়ে ভাললাম, গতি আমি ভালবাসি না, আমি ভালবাসি স্থিরতা, নির্ভরতা, নিশ্চিন্ততা। সারাটা জীবন বাউণ্ডুল ছেলে হয়ে কাটিয়ে দেওয়ার আদর্শ আমাকে একটুও মুগ্ধ করে না। আমি এক স্থবির সমাজের প্রতিনিধি। হাজার হাজার বছর ধরে কালের গতিকে আমি বন্ধ করে রেখেছি। সভ্যতাকেও আমি দেখেছি। আমি দেখেছি যে সঞ্চয়ই সভ্যতা। হাজার বছর ধরে জ্ঞান বিজ্ঞান সংস্কৃতিকে সঞ্চয় করে রেখেই সভ্যতা বড় হয়। সভ্যতা এক বিরাট সংগ্রহশালা, এক বিন্দু পাথেরকেও সে পরম মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে।

সভ্যতার পরিকল্পনাও বিরাট, যুগ থেকে যুগান্তরে তা প্রসারিত। সভ্যতা প্রাচীনকে ধ্বংস করে না, প্রাচীনের ভিত্তির উপর নতুন ইমারত গড়ে। মুহূর্তের আনন্দ যদি মানুষ্যের একমাত্র উপজীব্য হয় তবে আমার দেশের সৈনিকদের কী বলব? জীবনের এক বিরাট পবিকল্পনাব অংশ হিসেবে যে বীর সৈনিকরা স্বাধীনতার জন্ত আত্মহত্যা দিচ্ছে, মুহূর্তগুলো যে তাদের কাছে বেদনায় নীল হয়ে গিয়েছে।

আবার দূর থেকে স্মিতহাস্তময় রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার জানালাম।

পরদিন আর একটি অভিনব ক্যাম্পের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। লাল সাঁলু দিয়ে মোড়া তার তোরণ-ঘার। লাল হল বক্তের প্রতীক। তোরণের সামনে এক শীর্ণদেহ হাড়-জিরজিরে বাঙালী বীর আঁড় গায়ে পরনে এক ফালি ঝাকড়া জড়িয়ে বুক চাপড়িয়ে বলছে, রক্ত চাই, বিপ্লব চাই।

ভিতরে ঢুকে দেখলাম বিরাট আয়োজন। চারদিকে ফেঁস্টুনের ছড়াছড়ি, তাতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লাইন লেখা। অন্ন চাই, বল চাই, প্রাণ চাই। ভগবান ভূমি যুগে যুগে দূত। ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাভল; যাত্রা কর যাত্রা কর যাত্রীদল—ইত্যাদি।

আমাকে দেখতে পেয়ে একটি যুবক এগিয়ে এসে আমার হাতে একখানা চিঠি বই দিল।

বইটির মসাতে লেখা রয়েছে—রবীন্দ্রনাথের সারাংশ।

জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী?

রবীন্দ্রনাথের আসল পরিচয় যে লেখাগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় এ বইখানা তারই সংকলন।

সে কী! এ তো মাত্র কয়েক পাতা! শুনেছি রবীন্দ্রনাথ হাজার হাজার পাতা লিখেছেন।

হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর এই কয়েকটি লেখাই ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করতে পারছি না কথাটা। তিনি কি হাজার হাজার পাতা শুধু বাজে জিনিস লিখেছেন!

ভক্তলোকটি চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গল।



“দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতব অভাব আবোগ্যেব,
আধমবা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড কাজেব পত্তন
সম্ভব নয়, তাবা কাজে কাঁকি দেয প্রাণেব দায়ে, আব সেই
কাবণেই প্রাণেব দায ঢুকহ হ'যে ওঠে।

আমবা অনেক সময় দোষ দেই বাহু কাবণকে — কিন্তু
বোগজীর্ণতা পুকষানুক্রমে আমাদেব মজ্জাব মধ্যে বাস
ক'বে গুরুতব কর্তব্যেব ভাবকে ভগ্ন উত্তমেব ফাটল দিয়ে
পথে পথে সে ছড়িয়ে-দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্লই পৌছায়—”
—রবীন্দ্রনাথ

খাটো করে বললেন, দেখুন, এই ডামাড়োলের বাজারে সত্যি কথা তো বলার জো নেই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী, অধ্যাত্মবাদী। মাল্লখের বাস্তব সমস্তার কথা, জীবনের অগ্রগতির পথে মাল্লখের সংগ্রামের কথা তিনি কতটুকু লিখেছেন? তিনি ছিলেন গজদন্তমিনারের বাসিন্দা—অলদ কল্পনার ফাল্গুন দিয়ে রাশিরাশি ফেনা তৈরি করেছেন। আগামী দিনে যে সভ্যতা আসছে তাতে মাল্লখ ঘোরতর বাস্তববাদী হয়ে উঠবে। এসব ফেনা দিয়ে তারা কী কববে। ফেনাগুলো সব চূপসে যাবে।

কথাগুলো আমার মনে লাগল। কয়েকদিন নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করে আমারও সেইরকম একটা ধারণা হচ্ছিল।

বেরিয়ে এসে বইখানা পড়ে কিন্তু বড় নিরাশ হলাম। এ তো শুধু কতকগুলো ফাঁকা স্লোগান মাত্র। মাল্লখের দুঃখ আর অত্যাচারের কয়েকটি রেখাচিত্র মাত্র। কোথায় এর মধ্যে জীবনবৎ মহৎ পরিকল্পনার আভাস? মাল্লখের আত্মা যার মধ্যে অবগাহন করে দখল হবে, মাল্লখের জীবনের পাত্র যা নিয়ে কানায় কানায় ভরে উঠবে, কোথায় সেই পাথর?

এব পর এক এক করে আমি আরও অনেকগুলো ক্যাম্প দেখে ফেললাম। পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে সেগুলোর বিস্তৃত বিবরণ দিতে চাই না। সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখ করছি মাত্র।

একটি ক্যাম্পের নাম মানব-দরদী রবীন্দ্রনাথ। গেট দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ে একজন শ্রমশক্তি বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা করুণাপারাবার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে অব্যোম ধারায় কাঁদছেন। ভিতরে নানাবিধ ছবি, মাটির তৈরি মূর্তি প্রভৃতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মাইকে ঘোষণা করে বলা হচ্ছে—অহো! আমরা কী নিষ্ঠুর! রবীন্দ্রনাথের কোমল পেলব প্রাণ-কোরকটির উপর আমরা কত তত্ত্ব, কত অধ্যাত্মবাদ, বাস্তববাদ এবং বিপ্লববাদের বোকা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের যে হৃদয় ছিল ফুলের পাপড়ির মত নরম আর ভদ্র, আকাশের জলহারী মেঘের মত

ছিল পাতলা আব শুভ্র, সেই হৃদয়ের উপর কত অত্যাচারই না আমবা করেছি আর করছি। কবির অন্তর ছিল সত্যোন্মিষ্যবনা কিশোরীর মত, সামান্য আনন্দে তা বসন্ত বাতাসের মত হিল্লোলিত হয়েছে, সামান্য দুঃখে তা অশ্রুবন্যায় হোয়াং হো নদীর মত দু কুল প্রাবিত করে দিয়েছে। দয়া করে এইটুকু দয়া করো, হে বন্ধুগণ, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্নেহচূর্ণল করুণাঘন অসহায় অবাধ মাল্লখের অশ্রুসজল গীতি ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করো না।

আর একটি ক্যাম্পের নাম যোগী-রবীন্দ্রনাথ। কবির 'নির্বাবের স্বপ্নভঙ্গে' আমরা যে কবি-হৃদয়ের আনন্দের পরিচয় পাই তা আর কিছুই নয়—যোগতত্ত্ব প্রথম উন্মেষের আনন্দ। 'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ'র মধ্যে আমরা কবিমানসে যোগতত্ত্বের বিকাশের পরিচয় পাই। তাঁর মন এখন জাগতিক সম্পর্কের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। নাবীকে বিগুহ কামনারূপে কল্পনা করে তিনি তাঁর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এ কথার মধ্যে কবি স্পষ্টতঃই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, সম্যাস প্রভৃতি সমস্ত মার্গকে ত্যাগ করছেন। 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে', অর্থাৎ অসংখ্য যৌগিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে তিনি মুক্তির স্বাদ পেতে চান, ইত্যাদি।

ঘুরতে ঘুরতে সেদিন দেখলাম প্রেমময় রবীন্দ্রনাথ নামে একটি ক্যাম্প হয়েছে। সেই ক্যাম্পে আফসোস করে বলা হয়েছে যে প্রেমই যে কাব্যের একমাত্র উৎস, প্রেরণা এবং উপজীব্য এ কথা ভুলে যাওয়াব ফলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে অনেক জটিল করে ভুল বুঝেছি। রবীন্দ্র-রচনাবলী আসলে প্রেমমুদ্রে—গীতা একখানি মালা। অনেক বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ তথ্য মূক্তির দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে—নগরে নগরে বন্দরে বন্দরে দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত কাব্য এই মানসীদেব উদ্দেশ্য করে লেখা। এ কথাটা মনে রাখলে কবির দুঃস্বপ্ন কবিতাও 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র মতই সহজ বলে বোধ হবে। রবীন্দ্র-কাব্যে

সীমা-অসীমের সমস্তা, জীবনমেরুতার সমস্তা সব জলের মত স্বচ্ছ বলে বোধ হবে।

আর একটি ক্যাম্পের নাম 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্যেব পূজারী রবীন্দ্রনাথ'। সেখানে বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন তত্ত্ব নেই, কোন মানবীয় ভাব বা সমস্তাও নেই, কোন অতি-মানবীয় উপলব্ধিও নেই। আছে শুধু আর্ট। মহৎ আর্টেব লক্ষণই এই যে তা এই ভাস্ত ধারণা সৃষ্টি করে যে তার মধ্যে বুঝি কোন গভীর অর্থ বা তাৎপর্য আছে। আসলে এই make-believeটা সৌন্দর্যসৃষ্টির উপাদানমাত্র। ছন্দ আর ভাষা আলোচনা মানেই রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনা। কাজেই রবীন্দ্র-কাব্যেব শেষ বিশ্লেষণে দেখা যাবে আর্ট হচ্ছে ছন্দ।

এ সব ছাড়া দুঃখবাদী রবীন্দ্রনাথ, বাস্তববাদী রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আবও কয়েকটি ক্যাম্পও ঘুরলাম। সেদিন অনেক ঘোবাঘুরিব পরে লিফ্ট খুলে মিলিয়ে দেখলাম যে তখনও গোটাপঞ্চাশেক ক্যাম্প দেখা বাকি রয়েছে। প-কা-শ-টা। দারুণ হতাশায় আমার ক্রান্তি দেখে ক্রান্তি ঘেন জাঁকিয়ে বসল।

কিন্তু কী হবে এমন কবে একেব পর এক ক্যাম্প ঘুরে। এতগুলো ক্যাম্প তো ঘুবলাম, রবীন্দ্রনাথের সন্ধান কি আমি পেয়েছি? রবীন্দ্রনাথ যেন এক আলোয়া—যতই এগিয়ে চলেছি, মধ্যবর্তী দূরত্ব তবু হ্রাস পাচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথ যেন এক ভাঙা মন্দির। মন্দিরের চুন-বালি মাথানো এক-একখানা ইট এক-একজন মানুষের হস্তগত হয়েছে। সেই লোক পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাত নেড়ে, গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে বলছে—এই দেখ, এই ইটখানাই সমগ্র রবীন্দ্রনাথ।

সমস্ত ইটগুলো সংগ্রহ করে আমি যদি মন্দিরটি গড়ে তুলি? এই ইটগুলো দিয়ে আমি যা খুশি তা বানাতে পারব—মন্দির মসজিদ গীর্জা মঠ। কিন্তু যে মন্দিরটি রবীন্দ্রনাথ—তাকে কিছুতেই বানাতে পারব না। তাঁকে যে আমি দেখি নি—কেউ দেখে নি।

ভিন

পাথের মোড়ে একটা গাছ দেখতে পেয়ে তার নীচে মানুষের পায়ে ধুলোয় ভরা ফুটপাথের উপরেই বসে পড়লাম হতাশ হয়ে। হাত-পা টনটন করছে, শিউঁদাঁড়া বেকে গিয়েছে। গলায় আকর্ষণ পিপাসা। কিন্তু যে জিনিস আমি এত খোঁজাখুঁজি করলাম তা পেলাম কোথায়?

একই গাছের তলায় আমাব থেকে অনেকটা দূরে এক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিথিরি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার পেটের জায়গাটায় গভীর এক গর্ত। ভিথিবিটির প্রতি বড় মমতা বোধ কবলাম। সাবাদিন তার খাওয়া জোটে নি—যেমন সাবাদিন ঘুবে ঘুবেও আমার মনের খোঁরাক মেলে নি।

গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে ফুটপাথের উপর আলপনা একে দিয়েছে। বাতাসে গাছটা ছলছে বলে আলপনাও ছলছে ইতস্ততঃ। ময়দান পেরিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস আমার গায়ে এসে লাগছে। যেন সাঝনা দিচ্ছে। যেমন কবে অবোধ বালিকা চিন্তাক্রান্ত পিতাকে সাঝনা দিতে চেষ্টা করে গায়ে হাত বুলিয়ে।

দূরে দূরে পাথের কুকুরেব দল চিৎকার করছে অর্থহীন জৈবিক অভ্যাসেব তাড়নায়।

বোধ করি একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, কে গো তুমি আমাব ছবিখানাকে অমন কবে ধুলোর মধ্যে ফেলে দিয়েছ? জান না, তোমাদেব অবহেলা আমার হৃদয়কে চিবকাল ছুঁচের মত বিঁধেছে?

ঘুমে জড়িত চোখ নিয়ে ফুটপাথের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেমন করে যেন কবির একটি ছোট্ট প্রতিরুতি আমার পকেট থেকে ফুটপাথের উপর পড়ে গিয়েছে। ছবিটা ভুলে নিয়ে পকেটে বেধে চোখ বুজলাম। হঠাৎ মনে পড়ল ছবির কথাটা কে যেন বলেছে সামনে দাঁড়িয়ে। কে? ক্রান্ত চোখ-জোড়াকে আবার খুলে সামনের দিকে তাকিয়ে বিষ্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। হাত দিয়ে

চোখ বগড়িয়ে আবার তাকালাম। শেষে পকেট থেকে রুমাল বার করে ভাল করে চোখ মুছে আবার তাকালাম।

না, ভুল নয়। আমার সামনে কুড়ি ফুট লম্বা আর অক্লুপ প্রস্থবিশিষ্ট এক বিরাট কাগজের মূর্তি। ভয়ে আতঙ্কে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাবলাম, কী আর করবে—কাগজ তো!

কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

জবাব হল, আমি রবীন্দ্রনাথ।

সত্যি সত্যি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম যে এমনি আর কোন সাদৃশ্য না থাকলেও মূর্তিটির দু হাত পিছন দিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ঈষৎ কঁক্সো হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গীটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি পরিচিত ভঙ্গীর আভাস রয়েছে।

তবু অবিশ্বাস প্রকাশ কবে বললাম, হতেই পারে না। তুমি তো কাগজের মূর্তি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কবে মারা গিয়েছেন।

মূর্খ! নির্বোধ! রবীন্দ্রনাথ অমর। যেমন মানুষ অমর।

তোমাব ওই সেন্টিমেন্টাল ধাঁচের কথার মধ্যে একটু রবীন্দ্র-রবীন্দ্র ভাব আছে এ কথা ঠিক, তা তুমি যদি রবীন্দ্রনাথ, তবে মৃত্যুর ওপার থেকে এতদূরে কেন এসেছ বল দিকি?

বুদ্ধির ভুলে। শতাব্দিকীতে আমার নাম এত বেশী উচ্চারিত হচ্ছে শুনে ভাবলাম মরলোকে একবার দেখা দিয়ে আসি, মানুষকে তো আমি সত্যিই ভালবাসতাম।

তাই নাকি? জানতাম না তো! যাক গে, তারপর কী হল?

যা হবার তাই হল। আমার দেশে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে এতগুলো ক্যাম্প হয়েছে। সব আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। যেখানেই গিয়ে বলেছি—তোমরা রবীন্দ্রনাথকে চিনতে বুঝতে এত চেষ্টা করছ, এই দেখ, স্বয়ং আমি উপস্থিত হয়েছি, সেখানেই সকলে মারমুখো হয়ে আমার দিকে ছুটে এসেছে আর বলেছে, কক্ষনো না—তুমি মেকী, নকল, আসল রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিনি এবং এ

পৃথিবীতে একমাত্র আমরাই চিনি। এবং তার বিবরণ জানতে পাববে এই কাগজগুলোর মধ্যে। এই বলে তারা আমার সারা গায়ে রাশিরাশি কাগজ স্টেটে দিয়েছে। সব ক্যাম্প থেকে এরকম কাগজ দেওয়ার ফলে, দেখ, আমি কী বিরাট বোঝা হয়ে গিয়েছি।

খুব স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক। কেন স্বাভাবিক?

আমি তো এতদিন ধবে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। কিন্তু এই তো তুমি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ। কই, এতটুকু উৎসাহও তো বোধ করছি না।

করছ না? কিন্তু কেন?

সে কথা না-ই শুনলে। মিছিমিছি তোমার মন ধারাপ হবে।

তবু বল। আমি সত্যকে জানতে চাই।

তুমি তো ভাববাদী কবি। আনন্দবাদ তোমার শিক্ষা। আমি নিরানন্দ দেশের লোক—কী করে তোমাকে ভালবাসব?

কে বলে আমি শুধু ভাববাদী? আমার উপন্যাসগুলো পড়ে দেখেছ মূর্খ? তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদের ভিত্তিতে আমি কি বাস্তবের সমস্তা নিয়ে আলোচনা করি নি?

উপন্যাসগুলো পড়া ছিল না। কাজেই ভিন্ন রাস্তায় অগ্রসর হলাম। বললাম, মানুষের হৃৎথে তুমি তো অনেক কুস্তিরাস্ত্র বিসর্জন কবেছ? কিন্তু হৃৎথ মোচনের উপায় কিছু দেখিয়েছ কি কোথাও?

দেখিয়েছি বইকি।

তোমার দশ হাজার পাতা রচনার মধ্যে সে-কথা লেখা আছে মাত্র পঞ্চাশ পাতায়। বাকি হাজার হাজার পাতা ভরে তুমি যা লিখেছ তা মানুষের কী কাজে লাগবে?

কিন্তু নিছক সাময়িক সমস্তার উপর হাজার হাজার পাতা কেন লিখব? এই গতিশীল বিশ্বজগতে প্রতিমুহূর্তে বর্তমান অতীতে পরিণত হচ্ছে। আজকের সমস্তা কাল আর থাকবে না। কাল আর এক সমস্তা দেখা দেবে।

মনে পড়েছে বটে। তুমি গতিবাদের কবি। তুমি বলেছ—কুড়িয়ে লও না কিছু করো না সঞ্চয়। তুমি

সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা



শতকরা ৬৫ জন ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখানো ত্রিপুরাবাসীর নিকট এখন আর অসম্ভব নয়। উন্নততর জীবনযাত্রার পথে ত্রিপুরাবাসী আরও কয়েকটি সুবিধা লাভ করিয়াছেন। রোগে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা হাসপাতাল

বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়া চিকিৎসা-সংক্রান্ত সর্বরকম সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন। আনন্দের বিষয়, হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। রোগ-প্রতিষেধক টিকাদি গ্রহণে জনসাধারণ যথেষ্ট আগ্রহী। এই সমস্ত ব্যাপারে পূর্বের মত কুসংস্কার এখন আর কাহারো নাই বলিলেই চলে। বর্তমানে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, ডাক্তার ও নাস্ত্র সাবাক্ষণই কর্মব্যস্ত। ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য। রাস্তা ও পুল তৈয়ারি করিয়া তাঁহারা ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলগুলিতেও সংযোগ স্থাপন করিতেছেন। ত্রিপুরার ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটিরশিল্পসমূহ, ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইতেছে। এই ধরনের শিল্প-সংস্থাপনের তৈয়ারী হাতের কাজ অতীব হুল্লর। ক্ষুদ্রাযতন শিল্পগুলিও ত্রিপুরায় চালু কবা হইতেছে। উন্নতশ্রেণীর কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করায় ফসলের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছে। পশু-চিকিৎসালয় ও পোলট্রি কার্খগুলিতে নিযুক্ত চিকিৎসকগণ জনসাধারণকে উন্নতপদ্ধতিতে পশুপক্ষী প্রতিপালনদম্পর্কে উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। বাঘাবর শ্রেণীর জুঁমিবা আদিবাসীগণ স্থপবিকল্পিত কলোনীগুলিতে পুনর্বাসন লাভ করিয়া ক্রমশঃ স্থায়ী চাষকার্যে অভ্যস্ত হইতেছেন। জনসাধারণ সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় সমন্বয় সমিতির সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। এইভাবে নূতন আশার আলোকে উদ্দীপিত ত্রিপুরাবাসী পরিকল্পনার সার্থক কপাষণে ব্যস্ত রহিয়াছেন—

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্ম

পারিকল্পনাকে সফল করতে ত্রিপুরা বঙ্গপরিষদ

ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রচাষিত

স্বপ্নের বিরোধী, ঐতিহ্যের বিরোধী, ক্রমবিকাশের বিরোধী। তোমার গতি শুধু অর্থহীন গতি—এক শূন্য থেকে আর এক শূন্যে যাত্রা।

আবার আর একটা মিথ্যা কথা বললে, কে বলেছে আমি ঐতিহ্যবিরোধী। ঐতিহ্যকে ভালবাসি বলেই তো উপনিষদের তত্ত্বকে আমি নিজের করে নিয়েছি।

ভাল ভাল। উপনিষদে বিশ্বাস কর বলেই তো জগৎসংসার তোমার কাছে মায়া, মিথ্যা। তুমি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আদর্শ বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছ।

কেন যে তোমরা সাধারণ জিনিসগুলো বুঝতে পার না! আমি আদর্শ সৌন্দর্য সৃষ্টি কবেছি বটে, কিন্তু তাব প্রেরণা পেয়েছি বস্তুজগৎ থেকে। বস্তুজগৎকে আমি কোনদিন অস্বীকার করি নি। জগৎকে আমি ভালবাসি।

ও ভালবাসা বাঁধ যেমন তাব শিকারকে ভালবাসে তেমনি। ওটুকু ভাল না বাসলে তুমি কবিতা লিখতে কী নিয়ে?

গভীর সহানুভূতির সাহায্যে আমি মানব-মনের গভীরতম কন্দরকে পর্যন্ত উন্মোচন করেছি। মানুষকে ভালবেসেছি বলেই আমি মানব-কল্যাণবিরোধী সমাজনীতি ও ধর্মনীতিকে আক্রমণ করেছি।

কিন্তু তোমার শেষ আশ্রয় ঈশ্বর।

সেজন্ত আমি লজ্জিত নই।

তবে তোমাকে আমি কী বলব? আমি তো দেখছি তুমি একটা—একটা bundle of opposites, কতকগুলো পরস্পরবিরোধী জিনিসের সমাবেশ মাত্র।

এ কথা শুনে কাগজের মূর্তি রাগল না, লজ্জিত হল না, হাসল মাত্র।

তার কারণ রবীন্দ্রনাথ জীবনের কোন নির্দিষ্ট তত্ত্ব নয়, ভাঙ্গা নয়; অবিকল জীবনবহিঃ শিল্পরূপায়ণ মাত্র। জীবনে যে পরস্পরবিরোধের সমাবেশ রয়েছে রবীন্দ্রনাথও তা রয়েছে। জীবন যখন যেভাবে কবির অহুভূতিতে ধরা দিয়েছে, যখন যে প্রয়োজন নিয়ে কবির সামনে উপস্থিত হয়েছে, কবি তাকেই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য

করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রয়োজনের কবি, অপ্রয়োজনের কবি, জগতের কবি, অধ্যাত্মলোকের কবি, গতির কবি, স্থিতির কবি; সাময়িকের কবি, চিরকালের কবি; মানুষের কবি, ভগবানের কবি।

বুঝলাম। তা হলে তোমার থেকে আমবা কী শিক্ষা লাভ করব?

শিক্ষালভের কোন অভিপ্রায় না নিয়ে যদি গড় তবে আমাব সাহিত্য থেকে অনেক শিক্ষালাভ করতে পারবে।

হঠাৎ আমার মনে কী যে ভাবান্তর উপস্থিত হল, আমি উঠে সেই কাগজের মূর্তিকে প্রণাম করলাম।

এ কী! হঠাৎ প্রণাম করলে যে?

তোমার ওই কথাটা শুনে। আজ পর্যন্ত আমি যত জায়গায় গিয়েছি সর্বত্রই লোকে আমাকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে। এই প্রথম তুমি বললে তোমার থেকে আমি শিক্ষা পেতে পারি, কিন্তু তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে চান না।

হ্যাঁ, আমি তাই বলেছি। আমি প্রত্যেক মানুষের আত্মার স্বাধীনতায় বিশ্বাস কবি। মানুষ কেবল নিজেই নিজেকে শিক্ষা দিতে পারে। আর কেউ সে ভার নিতে পারে না। আমি যা পারি সে শুধু উপকরণ যোগানো। সে উপকরণেব কতটুকু তুমি বর্জন করবে, কতটুকু গ্রহণ করবে, কী ভাবে তা সাজাবে, সে কেবল তুমিই জান। কেউ যদি তোমাকে জোর করে শিক্ষা দিতে চায়, তবে সে আরোপিত শিক্ষা তোমার ক্ষতিই করবে।

তোমার কথাগুলো মনে রাখব। হয়তো কোন একদিন কথাগুলোর তাৎপর্য বুঝতে পারব। কিন্তু আমি এক সংকটাপন্ন দেশের মানুষ। আমাকে তুমি কোন বাণী দেবে না?

আমি শুধু এই বাণীই তোমাকে শোনাতে পারি যে কখনও অচলায়তন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর না। কোন খুব ভাল তত্ত্ব, কোন খুব সুন্দর জীবনযাত্রাপ্রণালী চিরকাল সব মানুষের পক্ষে উপযোগী হবে এ কথা বিশ্বাস কর না। তুমি যদি এক অপরিবর্তনীয় আদর্শ সমাজ গড়ে তোল তবে সে আদর্শ সমাজ মানুষের বন্দী আত্মার

দীর্ঘনিখাসে কলুষিত হয়ে উঠবে। আমার সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত যদি কোন সাধনা করে থাকি তো সে অচলায়তন ভাঙার সাধনা।

তুমি অচলায়তন ভাঙার কথা বলছ আবার তুমি ঐতিহ্যেরও ভক্ত। ঐতিহ্য তো অচলায়তন সৃষ্টি করে।

দেখ, একটা স্ববিরোধী কথা বলি। মানুষ প্রতিদিন নতুন মানুষে পরিণত হচ্ছে, অথচ মানুষ আসলে কখনও বদলায় না। এ কথার তাৎপর্য যদি বুঝতে পার তবে ঐতিহ্য আর পরিবর্তনশীলতার সম্পর্ক কী তা বুঝতে পারবে।

কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট হচ্ছে হোক। ব্যস্ত হওয়াব কিছু নেই। আস্তে আস্তে একদিন বুঝতে পারবে।

ঠিক আছে। কিন্তু আমার দেশের এই সংকটময় মুহুর্তে তুমি আমাকে কিছু পথনির্দেশ দেবে না?

আমি শুধু তোমাকে এই নির্দেশই দিতে পারি যে তোমার পথ তোমাকে নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে।

এই কথাটুকু শোনাব জগাই কি আমি এতদূর এসেছিলাম?

হ্যাঁ। এই কথাটুকু বলার জগাই পৃথিবীতে ববীন্দ্রনাথের মত কবিব জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়েছিল।

আমি অনিশ্চিতভাবে হাসলাম।

হাসলে যে?

কিছু না। ওটা বোকার হাসি। বলে আমি আবার কাগজের মূর্তির পাথের ধুলো নিলাম।

তোমার তো বেশ ভক্তি দেখতে পাচ্ছি।

ভক্তিটুকু তো তুমি ভালই বাস। তুমি তো চিরকালের গুরুদেব।

কাগজের মূর্তি খুকখুক করে একটু হাসল।

আমি পৃথিবীর মানুষ ছিলাম বলে মনুষ্যস্বভাব কিছু কিছু দুর্বলতা আমার ছিল। অবশ্য আমি গুরুদেব ছিলাম বটে, কিন্তু আমার একজন্মও শিষ্য ছিল না। সে কথা থাক গে, তুমি বাছা আমার একটু উপকার করবে?

করব বইকি। কী উপকার?

বাশিবাশি কাগজের চাপে আমি পিষ্ট হয়ে যাচ্ছি।

কাগজের বন্দীদশা থেকে আমাকে মুক্ত কব।

তৎক্ষণাৎ ছুরি বের করে আমি কাগজ কাটতে শুরু করলাম। কত যে হাজার হাজার সমালোচনা আর ভাঙের বই, সংকলন গ্রন্থ স্মারক গ্রন্থ আর বিশেষ সংখ্যার পত্রিকা আমি কেটে কেটে নামালাম তার নীমা সংখ্যা নেই। কাটার পরিশ্রমে আমার গা বেয়ে ঘাম ববতে লাগল। হাত রক্তাক্ত হয়ে উঠল। তবু কাগজ আর ফুরতে চায় না।

হঠাৎ পরিষ্কার চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে উঠল ছাকিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ ববীন্দ্র রচনাবলীর পুরো সেট।

মনে পড়ল, কাগজের মোড়কে বাঁধা ববীন্দ্র রচনাবলীর পুরো সেট আজকেই আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।

সেই ছাকিশ খণ্ড বই নিয়ে পরদিনই দেশের উদ্দেশে যাত্রা করব বলে মনে মনে সঙ্কল্প করলাম।

রবীন্দ্রচেতনায় “শিব”

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় ঐতিহ্যের রূপায়ণে “শিব”চেতনা এক অপরূপ সুষ্পন্দ। কালসমুজ্জের প্রাণহিল্লোলে, তার তরঙ্গ-বিভঙ্গে কত রূপই না ফুটে উঠেছে। এই মনমুগ্ধনে আমরা পেয়েছি অমৃত, আমরা পেয়েছি গরল, আমরা পেয়েছি তত্ত্ব, আমরা পেয়েছি তথ্য, এসেছে সমাজবেদনা, প্রকৃতিচেতনা, রূপ নিয়েছে সাধন নিবেদন, প্রেমিকের আবেদন, ভক্তের আকৃতি, কর্মীর বিচার, সাধাবণ মাহুষের আচার, মানা বেঁধেছে ইতিহাস তার মালমসলা নিয়ে, পুঁথিপুস্তক বগলে শাস্ত্রও এসেছে শস্ত্রপাণি হয়ে কথা ও কাহিনীতে জড়িয়ে। যুগ যুগ ধরে এই শিবকে আমরা গড়েছি, ভেঙেছি, মনন দিয়ে, চিন্তা দিয়ে সাজিয়েছি, সাধ দিয়ে সাধ্য দিয়ে রঙ দিয়ে রূপ দিয়ে বসোত্তীর্ণ করবার চেষ্টা করেছি, সাধনোচিত মার্গে স্থাপন কবেছি, বেদবেদান্তের পরমতত্ত্বে পরিণত করেছি, আবার তাকে টেনে নিয়ে এসেছি হাটে মাঠে বাটে, ভাঙ খাইয়েছি, কোঁদল করিয়েছি। নিবাতনিষ্কম্প মহাধোঁগীকে কল্পনা কবেছি গবীষ ব্রেশাখোব শম্মানবাসী পাগল ভোলানাথ-রূপে—যে খেতে দিতে পাবে না তার জীকে, ভরণপোষণ করতে পাবে না তার পুত্রকন্যাদেব। এই “শিব”কে নিয়েই তর্ক করেছি আমরা যে তিনি অনার্যদেব দেবতা নাকি—বেদের রুদ্রই কি তিনি—হিবণ্যকেশিন্ গৃহসমুজ্জের শত-রুদ্রীয়ে প্রতীক, তন্ত্রদের দেবতা পশুপ, কল্পনা কবেছি যে ষাঙ্ক ও সায়ন্ যাদের ঘোবতর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বললেন সেই শিল্প-দেবতাদেব মানসভোম রূপই কি শিব। ঋষি উপমহ্ম্য কোন রুদ্র ও দেবীর উপাসনা প্রবর্তন করেছিলেন, কৃষ্ণবাসুদেব জাধবতীব সঙ্গে কোন ‘দেব্যা সহ মহেশ্বরেব’। মহাভারতে তিনি দিগবাস, নগ্ন, উগ্র, ধোঁগী, সিদ্ধধোঁগী, মহাতপা, ঘোরতপা। একদিকে এঁকেই কবা হল লিঙ্গ-পূজার প্রতীক আবার ইনিই ‘নিত্যেন ব্রহ্মচর্যেন স্থিত’ শিব। লোকসাহিত্যে তিনি ভিক্ষুক ভোলানাথ, পাগল দিগম্বর, আত্মবিস্মৃত, শম্মানবাসী আবার তাঁরই গৃহিণী

যিনি তিনি অন্নপূর্ণা, বাজরাজেশ্বরী বরদাজী। মহাশয় কাবণব্যাহেও তাঁকে দেখেছি অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে। বৌদ্ধচিন্তায় তিনি লোকনাথ, তিনি মহাকাল, তিনি ত্রিকালেশ্বর, বজ্রমন্ত্র বজ্রধব, ভোম্বী শবরী চণ্ডালীব লীলা-সহচর—আদরিণী ‘নৈরামণি’র কক্ষে ও বক্ষে তিনি বিহার করেন মহাস্থচক্ষে। কাশ্মীরের কুলীশরা, দক্ষিণেব শৈবসিদ্ধান্তী বা তামিল নাথনাথবা, বাংলাব আগমবাগীশরা অষ্টাদশলীলা মৃতকে পঞ্চক্রিয়ায় সৃষ্টিস্থিতিসংহাব তিরোভাব অল্পগ্রহের পরিপূর্ণ ঐক্যের মধ্যে যে দেবতাকে দেখলেন, তিনিই কি সজ্জম সাহিত্যের কবি-পরিষদের সভাপতি শিব কবিমনীষি। শঙ্করাচার্য আবার তাঁকে শুধু লৌকিক দেবতারূপে কল্পনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁকে বৈদান্তিক ব্রহ্মত্বও নিয়ে গেলেন। তিনি পবমাত্মা, তিনি অজ, তিনি শাস্ত, তিনি কারণসমূহেব কারণ, আদিঅন্তহীন নিরীহ নিরাকার। তাঁতেই বিশ্ব লয় হয়, বিশ্ব পালিত হয়। তাঁব তম্রা নেই, নিদ্রা নেই, দেশ নেই, বেশ নেই, তিনি ত্রিমূর্তি, জ্যোতিষাং জ্যোতি। সাবা ভারতময় আজও ধ্বনিত হচ্ছে—শিব, শিব—চিদানন্দরূপ। চারিধামে আজও ভক্ত গাইছেন—

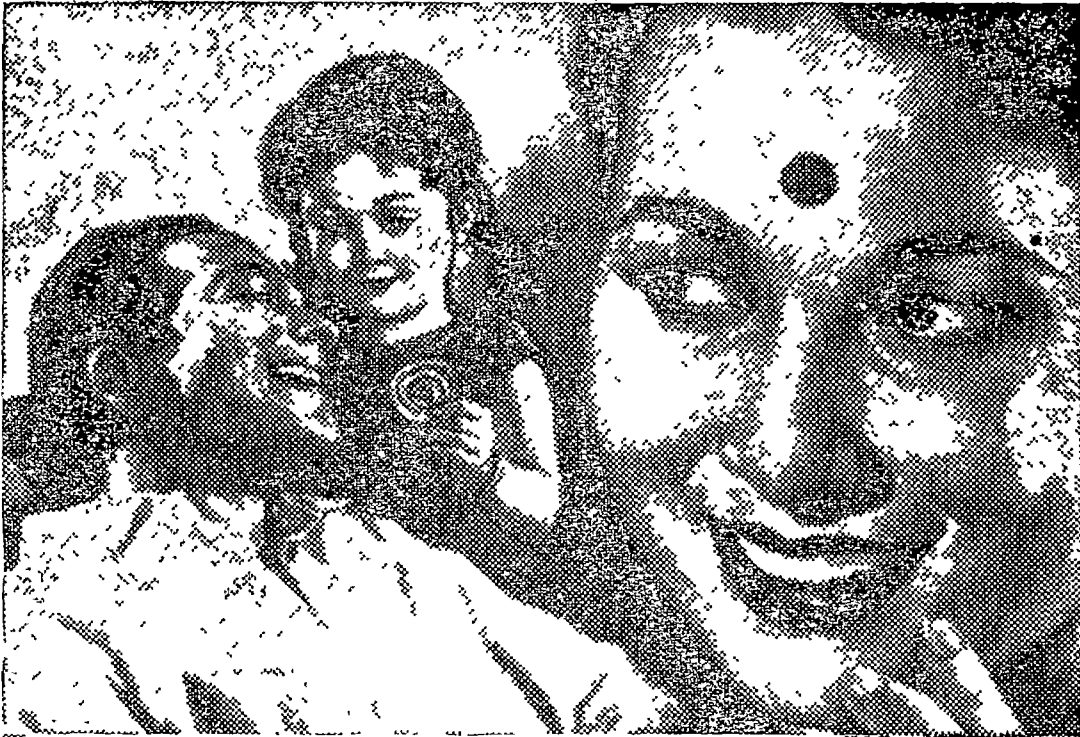
ক্ষন্তব্যোমেহপবাধঃ শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো।

তিমিরহৃদবিদারণ জলদগ্নি নিদারুণ

মরুশম্মান সঙ্কর

শংকর শংকর

এই সত্য সনাতন “শিব”চেতনা রবীন্দ্রনাথের মত স্পর্শকাতর মননশীল মানসেও প্রতিক্রিয়া তুলবে—এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই মনে রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক যুগসন্ধিক্ষেপে এবং এমন এক শ্রীমতাং গেছে যেখানে পৌত্তলিকতার সূত্র বিদায় হয়েছে। তাঁকে যেদিন উপনয়নেব মাধ্যমে সাবিত্রী মন্ত্রের দীক্ষা দিলেন মহর্ষি, তখন সে মন্ত্র, সে পদ্ধতি সনাতন প্রথাহুয়ানী নয়। সামাজিক জীবনে পুরনো কাল

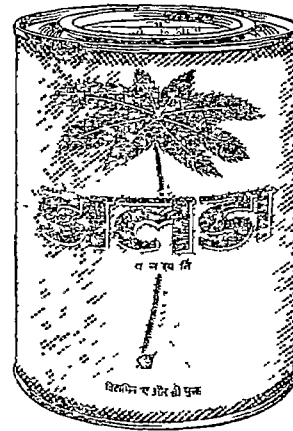


মমতাময়ী মায়ের সংসারে সদা সেরা জিনিষই চাই...

পরিবারের জন্য মায়ের পছন্দ

ডালডা

লীল আকাশের বিশালতা নিয়ে, সোহাগের ডানা মেলে
মা আগলে বাঁধতে চান তাঁর সোনার সংসার, যত্ন দিয়ে গড়ে
তুলতে চান এক সুখী পরিবার। শান্তি হৃদের ঐ ছোট্ট নীড়ই
তাঁর স্বপ্ন, ঐ তাঁর পৃথিবী। • সদা তাঁর মনে ছেয়ে থাকে পরিবারের
মঙ্গলচিন্তা। মায়ের দবনী প্রাণ চায় সবাব হাতে সেবা
জিনিস ভুলে দিতে। যত সংসারের এক বিরাট দিক, রান্নার
বেলাতেও তাঁর পছন্দ ডালডা। • তাব কাগণও আছে।
সবচেয়ে সেবা ভেষজ তেল থেকে ডালডা তৈরী। দৈনিক
পুষ্টিসাধনের প্রয়োজনীয় উগাদান ভিটামিনও এতে রয়েছে।
মায়ের হাতের নিষ্ঠা রান্নায় ডালডা বাবারকে আবও সুখান্ন
করে তোলে। পেঁখে তুটি, খেয়ে আনন্দ—তাই আপনাব
বাড়ীতেও আদর থেকে ডালডাই চাই।



ডালডা বনগুটি—রান্নার, খাঁটি সেরা স্নেহপদার্থ

পিছন ফিরলেও নতুন কালেক নৌকো সবে তার সপদা নিয়ে বাটে পৌঁছেছে। একদিকে খসে পড়ছে রঙমহল শীশমহলের নবাবী আমল, যমুনা কল্লোল সাথে মহবতে তান মিলিয়ে যাচ্ছে, আবাব আর একদিকে গড়ে উঠছে নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তা, নতুন শিক্ষাদীক্ষাচেতনা, রাষ্ট্রবোধ। ববীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যকে আত্মস্থ কবে বিংশ শতাব্দীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রূপে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীঅবিনন্দেব কথায় বলা যেতে পারে যে তিনি একাধারে legend ও symbol.

ভাবভেব মহামানবের সাগবতীরে এই যে শিব-চেতনা, তা বাবে বারে রূপ নিয়েছে সময়ের ধাবায়, সমীকরণেব চেষ্টায়। ভারত-ইতিহাসের মূলমন্ত্রই এই। রবীন্দ্রনাথের মত উত্তম পুরুষেব কাছে এই চেতনা ধরা দিল বিশ্বরূপের খেলাঘরে, নটবাজের তালে তালে, বিশ্ববাসনার ফুল্ল অরবিন্দের কেন্দ্রমাঝে, লৌকিক সাধনার অঙ্গরূপে যেমন তেমনি পবমচেতনার স্বরূপত্বেও।

১২৮৮ সাল। নিব্বারেন স্বপ্ন তখনও ভঙ্গ হয় নি। কবির মননে জেগে উঠল স্থিতিস্থিতিপ্রলয়ের এক অপূর্ব ছবি। তিনি দেখছেন মহাছন্দে বন্দী হয়েছে যুগ যুগ—যুগ-যুগান্তর।

উঠিল আকুল আর্তস্বর

‘জাগো’ ‘জাগো’ ‘জাগো’ মহাদেব

... ..

জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর

তিন কাল ত্রিনয়ন মেলি

হেরিলেন দিক-দিগন্তর

প্রলয় পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী

পদতলে জগৎ চাপিয়া

জগতেব আদি-অন্ত থব থব থব থব

উঠিল কাপিয়া

ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল জগতেব সমস্ত বাঁধন

উঠিল অনীম শূন্য গরজিয়া তরঙ্গিয়া

ছন্দোমুক্ত জগতের উন্নত কোলাহল।

মহা-অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া

জগতের মহা-চিতানল

সব চূর্ণ হয়ে গেল—কিন্তু কবির কল্পনার শিব নিরুদ্বেগ, শান্ত, শুদ্ধ সমাহিত

মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান

করিতে লাগিল মহাধ্যান

এরই দু বছর পরে দেখি (১২৯০) ‘ভাবতী’তে ‘ধর্ম’ (আষাঢ় ১৩৬৭ শনিবারের চিঠিতে উদ্ধৃত) প্রবন্ধে তখন কবি লিখছেন—শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অনীম অন্ধকার-দিক-বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ততাওবে উন্নত। কঠোর মধ্যে বিষ পূর্ণ বহিয়াছে, তবু নৃত্য। মবণের বঙ্গভূমি শ্মশানেব মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিনী কালী তাঁহার বস্ত্রের উপবে সর্বদা বিচরণ কবিতোছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই। হাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রসবণ, এত হলাহল, এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে। সর্পেব ফণা হলাহলের নীলছাতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি, কিন্তু তাঁহার জটাজ্বলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চিরশ্রোত অমৃত-নিষ্কান্দিনী পুণ্য ভাগীরথী আনন্দকল্লোল কি শুনা যাইতেছে না? নিজের ভয়কল্পনিতে, নিজের অশ্রুট হর্ষগানে উন্নত হইয়া নিজে যে অবিজ্ঞান নৃত্য করিতেছেন, তাহার গভীর কাণে কি দেখিতে পাইতেছি? বাহিরের লোকে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে কিন্তু তাঁহার গৃহেব মধ্যে দেখ দেখি, অম্লপূর্ণা চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর ওই যে মলিনতা দেখিতেছি, শ্মশানের ভঙ্গ দেখিতেছি, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছি, ও কেবল উপরে—ওই শ্মশানভঙ্গের মধ্যে আচ্ছন্ন রজত-গিরি-নিভ চাক্র-চন্দ্রাবতঃস অতি সুন্দর অমর-বপু দেখিতেছি না কি? উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর মৃত্যুকে কি আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে বিকট কবালদশনা লোল-রমনা মূর্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ওই মৃত্যুই ইহার প্রিয়তমা, ওই মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। কালীর স্বার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু আকারে প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু ভক্তেবা জানেন কালীও যা, গৌরীও তাই, আমরা তাঁহার করালমূর্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে সকলে যোগী বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন?

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে
বিভূতিভূষিত শুভদেহ নাচিছ দিক্বসনে
মহা-আনন্দে পুলক কায়
গঙ্গা উখলি উছলি যায়
ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়

জটাজুট ছায় গগনে

‘সারদামঙ্গল’ের কবির প্রভাব এখানে প্রবল

কিন্তু এ শুধু গোড়ানন্দ কবির স্বপ্নমঙ্গলের হিংটিংছট
নয় যে

ত্রাণকের জিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ

শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদে দিশুণবিগুণ

শব্দরসিক কবির বক্তোক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

কবি চলেছেন পদ্মার তীরে তীব্র, বড়ল, আত্মীয়
নদীর ধারে ধারে ভাঙনধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে।
হাজার হাজার গাউশালিখরা উড়ে গেল, একটা বড় মাছ
জলের তলা থেকে ক্ষণিক কলশব্দে লাফ দিয়ে উঠে
জানিয়ে দিয়ে গেল যে জল স্ববনিকার অন্তরালে নিঃশব্দ
জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের আভাস আছে।
হঠাৎ সেই অবচেতনের সমুদ্র থেকে ভেসে উঠল—

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

মধ্যখানে চর

আর কালশ্রোত বেয়ে বেরিয়ে পড়ল গ্রাম্য ও
লোকসংগীত ছড়া ও পাঁচালিতে আচ্ছন্ন মন—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুব

নদী এল বান

শিবঠাকুরের বিয়ে-হল তিন কণ্ঠে দান

এক কণ্ঠে বাঁধেন বাডেন এক কণ্ঠে খান—

এক কণ্ঠে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান্

কবি বলছেন, “আমার মানসপটে একটি ঘন মেঘাঙ্ককার
বাদলার দিন এবং উত্তাল তরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া
দেখা দিত, তাহার পব দেখিতে পাইতাম সেই নদীর প্রান্তে
বালুর চরে গুটি দুয়েক পানসি নৌকা বাঁধা আব
শিবঠাকুরের নববিবাহিত বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাখাবাড়া
করিতেছে। মধ্যমাই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী।

ওপারেতে কালো রং

বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম

মেঘের পরে মেঘ জমে, ভৈরবের বাঁশী বাজে, ঈশানের
বিষাগ ওঠে, সন্ন্যাসীর মনে গান ঘনায়—গুরু গুরু গুরু
নাচের ডমরু। আসেন তিনি, যিনি দুর্দম, যিনি নিশ্চিত,
যিনি নিষ্ঠুর, যিনি নূতন, যিনি সহজপ্রবল স্নিগ্ধকৃষ্ণ
ভয়ঙ্কর। ধ্যানভঙ্গ হয় বারে বারে, জটাজুটের জট হয়
প্রকম্পিত, আর্ত কবি বলেন—

তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে

এখানে শিব শুধু ভদ্রদেবতা নন, কদ্র দেবতা তিনি নটরাজ,
নটেশ।

মেঘের বুকে যেমন মেঘের মল্ল জাগে

বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে

তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও

যাবার আগে যাও গো আমার রাড়িয়ে দিয়ে

রক্তে তোমার চরণদোলা লাগিয়ে দিয়ে

রং যেন মোর মর্মে লাগে

আমার সকল কর্মে লাগে

কবি বলতেন যে নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক
পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে
প্রকাশ পায়, তাঁর অগ্র পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের
রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে,
মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারলে
জগতে ও জীবনে অথও লীলারস উপলব্ধির আনন্দে
মন বন্ধন মুক্ত হয়।

আমি নটরাজের চেলা

চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,

বাঁধন খোলার শিখছি সাধন

মহাকালের বিপুল নাচে।

তাই তো মন্ত্র হল—

মুক্ত যিনি দেখ না তারে

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মুক্তিকা শৃঙ্খলে

শক্তি আছে কাব ?

শুধু তত্ত্ব নয়, গ্রাম্য সাহিত্যের লৌকিক শিবও কবিকে
টেনেছে। শরৎকালের আগমনী গান কোন্ কবিকে
না টানে। কল্যাণবিরহকাতর মন যে আপনি বলে—
যেতে নাহি দিব—তবু যেতে দিতে হয়।

বৎসর গত হয়েছে কত কবছে শিবের ঘর

যাও গিরিবাজ আনিতে গৌরী কৈলাস শিখর

এখানে শিবের সঙ্গে শিবানীকে দেখছি। হবগোঁরী বা
রাধাকৃষ্ণ নিষে ববীন্দ্রনাথকে কোথাও ভাবগদগদ হতে
দেখি নি। বড়জোর তিনি লিখলেন—

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্ঘদল রক্ত আঁধি
দেখে, তব শুভ্রতরু রক্তাংগকে রহিয়াছে ঢাকি

প্রাতঃ সূর্যকচি।

অস্থিমালা গেছে খুলি মাধবী বল্লরীমূলে
ভালে মাথা পুষ্পবেণু চিতাভঙ্গ কোথা গেছে মুছি
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে
সে হাস্তে মঞ্জিল বাঁশি স্তম্ভবের জয়ধ্বনি গানে
কবিব পরাণে।

কবি উমাপতিধর, শুভাংগ, ভগীবদন্তের যুগ হতে বাংলার
চিত্তাকাশে হবের সঙ্গে গোঁরীকে সংযুক্ত দেখেছি।
বিদ্যাপতিরও হবগোঁরীর পদ আছে। শিবকে নিয়ে
গোঁরী পাগলিনী—যে শিব ভয়সমাধি রুদ্ধরক্ত, যে
গোঁরী হরহৃদয়-তড়াগরাজহংসী। রবীন্দ্রনাথকে বারে
বারে কালিদাসের কালেও চলে যেতে দেখেছি। নগর-
গুপ্তনক্ষান্ত নিশ্চর সন্ধ্যায় কবি চলেছেন

স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুবে

মহাকাল মন্দিরের মাঝে

তখন গভীরমস্ত্রে সন্ধ্যাবতি বাজে

মহাকাল সমুদ্রের তটে তিনি দেখছেন চঞ্চলের চলমান
ছবি, শুনেছিলেন ভৈরবেব ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী,
তারপর

রজনীর অন্ধকার

উজ্জয়িনী কবি দিল লুপ্ত একাকার

দীপ দ্বার পাশে

কখন নিভিয়া গেল দূরন্ত বাতাসে

শিপ্রা নদী তীরে

আবতি ধামিয়া গেল শিবের মন্দিরে

এ শিবকে বুঝেন কবি, কিন্তু লোকগাধার

হাতে শূলী কাঁধে থলি, শব্দ ফেরে গলি গলি

শব্দ নিবি শব্দ নিবি এই কথাটি বলি

শাখারীকৃপী এই শিবকে ববীন্দ্র-মন গ্রহণ করেছিল কি ?
কিংবা

কহ গো নিরুপমা, কাহার বোলে রামা

ইচ্ছিল বৃড়া জটায়ু

হইয়া স্নানাবী

ভজহ ভিখারী .

দরিদ্র বর দিগম্বরে

অবশ্য ‘ভিখারী শিবের কোল সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া
পার্বতীরে’ তবু তাঁর কাছে আলোকছায়াই “শিব-
শিবানী”।

কুহেলি গেল আকাশে আলো দিল যে পবকাশি

ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

এ যেন শঙ্কবাচার্যের অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা
মন্দারমালা পরিশোভিতায়ৈ কপালমালা পরিশোভিতায়
দিব্যাস্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবার্যৈ চ নমঃ শিবায়।
মদনভাস্কর পর কবির কল্পনায় নতুন চিন্তা এলো, শিবকে
ডেকে বললেন—

পঞ্চমবে দণ্ড করে, করেছে এ কী সম্যাসী।

এ প্রহ্ম চিরকালের।

একদিন রবীন্দ্রনাথ মরণকেই শ্রামসমান করে দেখেছিলেন
কিন্তু শিবের মৃত্যুরূপও তাঁকে চঞ্চল করেছে।

যবে বিবাহে চলিল বিলোচন

ওগো মরণ হে মোর মরণ

তাঁর কতমত ছিল আয়োজন

ছিল কতশত উপকরণ

তাঁর লটপট করে বাঘছাল

তাঁর বুধ রহি রহি গরজে

তাঁর বেঠন করি জটাজাল

যত ভুজঙ্গ দল ভরজে

তাঁব ববম্ ববম্ বাজে গাল

দোলে গলায় কপালাভরণ

তাঁর বিঘাণে ফুকারি ওঠে তান

ওগো মরণ হে মোর মরণ

তাঁর কাছে শিব শিশু ভোলানাথবও প্রতীক হয়েছেন—

লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিস্তাহীন আপনা-বিস্মৃত

অন্তবে ঐশ্বর্য তোর অন্তরে অমৃত।

দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি ত্রোরে কবে না অশুচি,

নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।

আবার এই ভোলানাথই তাঁর কাছে খাপা মহেশ্বর।

তাই কবির কাছে পাগল শব্দটা ঘৃণাব শব্দ নয়—তিনি
বলছেন, ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়,

আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ



“আমিও ভেবেছিলাম এমন দিন আসুক...”

সমাজ সেবিকা বোম্বে শীমতী নোরেন অমলিক বলেন

‘আমি জানতাম সবাব ঘরেই পরিবর্তন একদিন না একদিন আসবেই। আর তা এসেওছে। বোজাই গৃহিনীদের সাথে দেখা করটাও আমার একটা কাজ। আমি তাঁদের দেখেছি তাঁরা যুগের সাথে তালে তাল মিলিয়ে গৃহস্থলীর কাজে নিতাই আধুনিক উপায়ের অনুসরণ করছেন।’ সার্ফে বখাই ধকন। গৃহিনীদের কাছে এই আধুনিক কাপড় কাচাব পাউডারটির জনপ্রিয়তা দিনদিনই বেড়ে চলেছে। আর তাব কারণও আছে। আমি নিজে সার্ফ ব্যবহার করে জানি বাতীতে কাপড় কাচাব কাজটা এতে একেবারেই সহজ হয়ে গেছে।’

‘সার্ফে’ কাচাবও কোন বস্তু নেই। অথচ কাপড়ও এতে চমৎকার ধবসা হয়। শাড়ী, ব্রাউজ সার্ট, প্যাণ্ট বাড়ী সব কাচাকুটিতে আমি সার্ফ ব্যবহার করি।’

আধুনিক গৃহিনীরা সবাই এরমত—সার্ফে কাপড় কাচার শক্তি অতুলনীয়। মুহূর্তে কাপড়ের লুকোনো ময়লাও টেনে বার করে সার্ফ সাদা কাপড় জামাকে অপূর্ণ ধবসা করে। আপনিও বাতীতে কাপড় জামা সার্ফে কাচুন।

সার্ফে কাপড়জামা সবচেয়ে ফরসা করে কাচে
হিন্দুস্থান লিডারের তৈরী।

তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া। সেই পাগল
দিগদ্বারকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রোদ্দ-
প্রাভনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নেব হৃৎপিণ্ডের
মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমক বাজিতেছে—ভোলানাথ,
আমি জানি, তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুতরূপেই
তুমি তোমার ভিষ্কার কুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে
হিসাবকিতাব নাস্তানাবুদ কবিয়া দিয়াছ। তোমার
নন্দীভূক্তীব সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহার।
তোমার সিদ্ধি প্রসাদ যে এক ফোঁটা আমাকে দেয় নাই
তাহা বলিতে পাবি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে,
সমস্ত ভুল হইয়া গেছে।

এই শিবচেতনা কবিকে সাধক করে তুলেছে। তিনি
বলছেন—হে রুদ্র, তোমার ললাটেব যে ধ্বকধ্বক অগ্নি-
শিখাব স্কলিঙ্গমায়ে অন্ধকাবে গৃহের প্রদীপ জলে ওঠে—
সেই শিখাতেই লোকালয়ে মহেশ্বর হাহাধ্বনিতে নিনীথ
বাজে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শঙ্কু, তোমাব নৃত্যে
তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও
মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। সংহারের বস্ত্র-আকাশের
মাঝখানে তোমার ববিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন
ঋষ্যোত্তিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করে
তোলে। নৃত্য কবো হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই
নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ কোটি যোজনব্যাপী
উজ্জলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমান হতে থাকবে তখন
আমার বক্ষের মধ্যে ভয়েব আক্ষেপে যেন এই রুদ্র-
সংগীতের তাল না কেটে যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের
সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যেই তোমার জয় হোক—

মুক্তধারায় দেখি যন্ত্রবাজ বিভূতি বহু বৎসরের চেষ্টায়
লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলে উত্তরকূটের পার্বত্য মুক্তধারাকে
বৈধেছিন্ন। সে দেশের দেবতা হচ্ছেন উত্তরভৈরব, তিনি
সংশয়ভেদন, তিনি বন্ধনছেদন, তিনি সংকটসংহব। তিনি
শঙ্কব, তিনি ময়োভব, ময়োক্ষর। তাঁর মন্ত্র তো লৌহগলন
শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র নয়, তাঁর তন্ত্র তো পঞ্চভূত বন্ধন
কর ইন্দ্রজাল তন্ত্র নয়। তাঁব বাণী যখন বজ্রঘোষ বাণী
হয়ে বাজে তখন মৃত্যুসিঙ্হাস্তবণ আপনি হয়। তাঁর
আঙ্গল ভক্তই পারে

মারের সাগব পাড়ি দিতে
বিষম ঝড়ের বায়ে

রবীন্দ্রনাথের শিবচেতনায় বৈরাগীর সাধনা আর ভৈরবের
উপাগনা এক হয়ে যায়

বাজে রে বাজে ডমক বাজে
হৃদয় মাঝে হৃদয়-মাঝে
নাচে রে নাচে চবণ নাচে
প্রাণের কাছে প্রাণের কাছে
প্রহর জাগে প্রহরী জাগে
তারায় তারায় কাঁপন লাগে
মরমে মরমে বেদনা ফুটে
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে

কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই চেতনা উপনিষদের সেই মূল
চেতনারই অঙ্গ হয়ে ফুটেছে—অবচেতনার লৌকিক শিব
অধিচেতনার বৈদিক শিবং হয়ে এমন সুন্দরভাবে মিশে
গেছে যে শৈব রবীন্দ্রনাথ, গায়ত্রীমন্ত্রের উদগাতা সৌর
রবীন্দ্রনাথ, উপনিষদ রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণববাউল রবীন্দ্রনাথ,
রূপপিপাসু তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, যুক্তিবাদী ‘এগনষ্টিক’
রবীন্দ্রনাথ, সকলে এসে মিশে গেছেন এক বিচিত্র
সমন্বয়ভূমিতে—যেখানে শেষ কথা

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে বোমাধ লাগে
মর্ত্যধূলিব ঘাসে ঘাসে

মর্ত্যে সেই যে তিমিরজয়ী প্রভু

অজ্ঞেয় আত্মার রশ্মি তারে দিতে সীমা

প্রেমেব সে ধর্ম নহে কভু

সেই প্রসারণের দিকে তাঁব শিবকল্পনা চলেছে—সেইখানেই
তার মহৎ, বৃহৎ বসে, সেইখানেই দেখি শিবতব শিবতমকে
যশস্যমশ্বিন্ আত্মনি তেজোময়োহমৃতময় পুরুষ সর্বারুভূকে
তাই মহাশৈব কবি বললেন—দুঃখ আসে তো আত্মক,
মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক, মাতুষ
আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক—সমস্ত দেশকালকে
ধ্বনিত করে বলতে পারুক—‘সোহম’।

যখন দ্বিধা অবসান হয় তখন সব নমস্কার একটি
নমস্কারে পৌঁছয়। কবির কথাব—তখন নমঃ শিবায় চ
শিবতবায় চ—তখন স্মৃতে মঙ্গলে আর ভেদ নেই, বিরোধ
নেই—তখন শিব শিব, শিব তখন শিব এবং শিবতর।
আজ সাহিত্য-পরিষদ ও রামেন্দ্রসুন্দর কণা সত্য
হয়েছে। ‘কবির, শংকর তোমায জয়যুক্ত করুন’।



লাইফবুয় যেখানে, স্বাস্থ্যও সেখানে !

অনৈব আনন্দ লাইফবুয়ে ! লাইফবুয় সাবান মেখে স্নান করলে শরীরটা
কত স্বচ্ছবে লাগে, মনেও এক সজীবতা আনে। ঘবে বাইবে ধুলো ময়লা আপনার
লাগবেই। লাইফবুয়ের প্রচুব কার্যকারী ফেনা ধুলো ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয়া
পরিবাবে সবাব স্বাস্থ্যেব যত্ন নিতে লাইফবুয় মাখুন।

জনগণের রবীন্দ্রনাথ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গোবিন্দর ডাক-নাম গবু।

সেই গবু একদিন শরৎচন্দ্রকে বলেছিল, দেখুন, আপনার লেখা যেমন সহজে বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব লেখা তেমন ভাল করে বুঝতে পারি না।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, তা তো বুঝবেই না। রবীন্দ্রনাথ তো তোমাদের জন্তে লেখেন না। তিনি লেখেন আমাদের জন্তে। আর আমরা লিখি তোমাদের জন্তে।

কথাটা অনেকদিনের। ভেবেছিলাম এখন আর সেটা সত্যি নয়। গোবিন্দ না বুঝুক, এখন বোধ হয় তাব ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথের লেখা বুঝতে পারছে।

তাব পরেও অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র দু'জনেই মৃত্যুর সিংহদ্বার পেরিয়ে চলে গেলেন অন্তলোকে। পরাধীন দেশ স্বাধীন হল। বিশ্বভারতী হল বিশ্ববিদ্যালয়। ভাবত-সরকার রবীন্দ্রশত-বার্ষিক উৎসবের হজ্জ তুলল। মাঝ দেশে হজ্জোড লেগে গেল। রবীন্দ্রনাথের নাটক যারা অভিনয় করতে পারে, যারা নাচতে পারে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত যারা গাইতে পারে, তারা পাড়ায়-বেপাড়ায় বাঘনা ধরতে লাগল। ছ'পয়সা রোজগারের মরশুম পড়ল তাদের। শুধু কবি-সাহিত্যিকেব বেলা লবডকা। তাদের ভাগ্যে না জুটল রবীন্দ্র-পুস্কার, না জুটল কিছু, শুধু ঘন-ঘন ডাক আসতে লাগল রবীন্দ্র-পূজার পৌরোহিত্য করবার। শুকনো একটা ফুলের মালা গলায় পরে তাদের সভাপতিত্ব করতে হবে। কিছু বলতে না পারলেও বলতে হবে।

যাব না যাব না করেও যেতে হল দু'একটা সভায়। গোলাম শুধু সেই যে সেই গোবিন্দ, যার ডাক-নাম গবু, শরৎচন্দ্রকে যে বলেছিল, রবীন্দ্রনাথের লেখা বুঝতে পারি না, তার নাতি-নাতনীদেব দেখতে পাব বলে। তারা

এতদিনে নিশ্চয়ই তাদের পিতামহের অজ্ঞতাব জ্ঞত লজ্জিত।

দেখলাম গবুব অগণিত বংশধরে সভা সরগরম।

চেনা-চেনা মুখ। দেখেই চিনতে পেরেছি ঠিক।

বক্তৃতা হচ্ছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা হচ্ছে, অধ্যাপকেরা চমৎকার বলছেন, স্রমুখে তাকিয়ে দেখি, বসবার চেয়ারগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। গবুর বংশধরেরা কখন উঠে বাইরে চলে গেছে বুঝতে পারি নি।

বক্তৃতা শেষ হল। বাইরে যেতেই নজ্জবে পড়ল, ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ছোকরা সিগ্রেট ফুঁকছে। ফুল প্যাণ্টের ওপর ঝোলানো সার্ট, দেখেই চিনেছি গবুর ক্যামিলি।

জিজ্ঞাসা করলাম, উঠে এলে যে? বক্তৃতা শুনলে না? শুনেছি তো।

ভাবলাম একবার জিজ্ঞাসা করি, রবীন্দ্র-সাহিত্য তারা বুঝতে পারে কি না। কিন্তু চট্ কবে সে কথা জিজ্ঞাসাই বা করি কেমন করে?

একজন বলে উঠল, সেই এক কথা বোঝ রোজ ঘ্যানবু ঘ্যানবু ভাল লাগে না।

কথাটা সে আমাকে বলে নি। তবু জবাব দিলাম। বললাম, এক কথা কেন হবে? রবীন্দ্রনাথের নানান দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তো।

হ্যাঁ, তা হচ্ছে।

বললাম, তাহলে বুঝতে পারছ না, বোধ হয় ভাল লাগছে না।

একজন তো মায়মুতি হয়ে তেড়ে এল। বুঝতে পারছি না কি রকম?

আরেক জন একটু হেসে বলল, উনি আমাদের ইয়ে ভেবেছেন।

বুঝলাম, যুগ বদলে গেছে। এদের পিতামহ গবুর যুগ আব নেই।

রবীন্দ্র-সাহিত্য ঠিক বুঝতে পারে না, সে কথা গবু অকপটে স্বীকার কবতে কুণ্ঠিত হয় নি। সে ছিল অশিক্ষিত। এরা শিক্ষিত হয়েছে। সত্যকে এরা গোপন করতে শিখেছে। ‘বুঝতে পাবে না’ বলার মধ্যে লজ্জা আছে, তা এরা জানে।

ভেতরে হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল।

একজন বলে উঠল, চল।

সবাই ছড়মুড় করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, বললাম, আবার ঢুকছ কেন? তোমরা বাডি যাও।

ভেতর থেকে কে এক জন বলে উঠল, সোনার চাঁদ।

একজন বলল, পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছি আবার নাচ হবে। দেখব না?

বুঝলাম তারা কি জন্তে এসেছে।

শেষ শো দু’ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“আজি হতে শত বর্ষ পরে

কে তুমি পড়িছ বলি আমার কবিতাখানি

কৌতূহল ভবে।”

কিন্তু তার এখনও তিবিংশ-বত্রিশ বছর বাকি।

তাই ভাবছি এই স্বল্পপবিসব সময়ের মধ্যে গবুর প্রপৌত্রেরা কি রবীন্দ্র-অনুবাগী হয়ে উঠবে? রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, তাঁর সত্য উপলব্ধি, তাঁর সাধনাব ফলশ্রুতি কি তাদের জীবনচর্যায় প্রতিফলিত হবে?

হয়ত হবে না।

রবীন্দ্রনাথ জনগণের কবি, কিন্তু জনতার কবি নন।

এ ব্যবধান অবশ্য তিনিই রচনা করে গেছেন।

একই দেশের জনগণের জন্ত রচিত দু’জন কবির দুটি গান সম্বন্ধে একটু চিন্তা করুন। একই যুগেব এক জনপ্রিয় কবি লিখেছেন—

“বন্ধ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।”

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

“জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভাবত ভাগ্যবিধাতা।”

দু’জনেরই লক্ষ্য এক। দু’জনেরই লক্ষ্য মানবজন্ম। কিন্তু দুই কবি দুই বিভিন্ন পথে সে-জন্মকে স্পর্শ কবেছেন।

সব দেশেরই সাধারণ জনতা সব সময়েই একটুখানি স্থূল, একটুখানি ভৌতা।

তাই আমাদের দেশেব জনতাব অধিদেবতা গণপতি— গণেশ। নরদেহে হস্তিমুণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ সেই স্থূলকে সূক্ষ্ম করতে চেয়েছেন। জনগণেব রুচিকে করতে চেয়েছেন মার্জিত। জীবনবোধকে কবতে চেয়েছেন জাগ্রত।

শুচিশুদ্ধ একটি পবিচ্ছন্ন পবিত্রতাই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য।

তাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মে দেখতে পাই সেই পরিমার্জিত রুচিবোধ, নিত্যসত্যেব প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর একটি অপক্লপ কপময়তা।

যে-সব কবি আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ কবেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁদের সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্র এই জন্ত যে রবীন্দ্রনাথ যেমন করে তাঁর কাব্য বচনা কবেছেন, তেমনি করে তাঁর জীবনটিকেও রচনা করেছেন।

কাজেই তিনি একাধারে মহাপুরুষ এবং মহাকবি।

আজ সেই অলোকসামান্য প্রতিভাধর ঋষিকল্প মহাকবির জন্মশতবার্ষিক স্মরণোৎসব।

তাই যে-মাহুঘটির মধ্যে একটি পরমাশ্চর্য শক্তির অত্যাশ্চর্য প্রকাশ দেখে বিস্মিত হয়েছি, সত্যজ্ঞা যে ঋষিকবির অমৃতময় কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনেছি অনাগত সহস্র বৎসরের ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁরই উদ্দেশে রাখলাম আমার অন্তরের প্রগতি আর রাখলাম একটি ক্ষীণ আশা—দেশের আপামরসাধারণ সেই অমৃতবাণী শোনবার জন্ত উদগ্রীব হয়ে উঠুক, অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করুক! রূপ পবিগ্রহ করুক রবীন্দ্রনাথের বড় সাধের স্বপ্নের ভারতবর্ষ।

রবীন্দ্র-গল্প প্রসঙ্গে

মনোজ বসু

৬৬ “একরাত্রি” গল্পটা পড়ি কিশোর বয়স আমার তখন। সে যে কী কষ্টের পড়া! গ্রাম্য স্কুলের ছাত্র। হিতবাদী সংস্করণের রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী একখানা চুরি কবে নিজের তাঁবে এনেছি। কিন্তু স্কুলের পাঠ্য বই ছাড়া বাজে বই পড়ছি টের পেলে কড়া অভিভাবক রক্ষা বাধবেম না। জানলার মাথায় সরদাল, আমসত্ত্ব ও কাশ্মিন্দব হাঁড়ি সেখানে, তার মধ্যে অতি সন্তর্পণে বইখানা রেখেছি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিঃসংশয় হয়ে নিই, কেউ দেখছে না। তখন এক কাঠের সিন্দুকের উপর দাঁড়িয়ে সরদালের কাঠের উপরে বই খুলে যতটুকু পারি পড়ে নিই। কাছাকাছি পদস্বর পেলে চক্ষের পলকে নেমে এসে ভাল মানুষ হয়ে পাঠ্যব্যাপারে মনোনিবেশ করি। চাউস বই নীচে নামিয়ে আনতে সাহস হয় না। সন্ধ্যার মুখে তাড়াতাড়ি যে পাঠ্যবইয়ের নীচে লুকিয়ে ফেলব, সে উপায় নেই। তবু কে কখন অমনি অবস্থায় দেখে ফেলেছে। রটনা হয়ে গেল, আমসত্ত্ব চুরি করে খাই আমি। মা আমসত্ত্বের হাঁড়ি সরিয়ে ফেললেন। কপাল ভাল, রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর দিকে নজর পড়ে নি।

কয়েকটা গল্প পড়েছিলাম—তার মধ্যে “একরাত্রি”। মার্টিন গারিবালাডি উভয়কেই ভালভাবে জানি। দৌলতপুর কলেজের দাদার। ছুটির সময় বাড়ি এসে নিয়মিত বিপ্লবের পাঠ দেন। ভারত-উদ্ধারের কারণে প্রাণ দেওয়া আশু কর্তব্য, আমাদেরও সে সম্বন্ধে মতবৈধ নেই। গল্পের নায়কের সঙ্গে দিব্যি অতএব নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছি। অভাবটা আপাতত নায়িকা-স্বরবালার। কিন্তু কল্পনা তার জল তিলেক থমকে থাকে না। বিলের প্রান্তে বাড়ি। ভরা বর্ষা বাইরে-বাড়ির উঠান অবধি জল এসেছে। আবও বাড়ুক জল, বান ডাকুক। বোধনতলা

উঠানের উপর। বেলগাছের নীচেটা হটে বাধান—ভূঁই থেকে বেশ খানিক উঁচু। ভাবতে চমৎকাব লাগে আমাদের বাগেব পুকুর বানে ভেসে গিয়ে ঘর-উঠানে থই থই করছে জল। নিশিরাতে গ্রাম-বালক দক্ষিণেব কোঠা ছেড়ে দবদালান রোয়াক উঠান পার হয়ে ছুটতে ছুটতে বোধনতলার উঁচুতে গিয়ে উঠল। আর স্বরবালাও কোথা থেকে জল ছপছপ করে বাক্যহীনা বসল এসে অনতিদূরে। মানুষজন কোন দিকে কেউ নেই, একটা কথা নেই আমাদের মুখে। কতক্ষণ এমনি কেটে যাবে। ভোরের আভাস দিল। বানের জল কমে গেল। পাখি কিচিরমিচির করছে বাঁশবাগানে। স্বরবালা আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে কোনদিকে আবার ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়। আমিও দক্ষিণের কোঠায় ফিরে গিয়ে মায়ের পাশে শুয়ে পড়েছি। কে সেই স্বরবালা, সঠিক জানি নে। বাল্যসঙ্গিনী মেয়ে কজনকে ভেবে দেখি। কারও সঙ্গে মেলে না। মনে মনে মেলাতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ কবি। চেনাজানাব মধ্যে নায়িকা স্বরবালা নেই। পূর্বের বিল কাঁপিয়ে, উত্তবেব নাথপাড়া শীতলাতলা পার হয়ে অথবা পশ্চিমে মধ্যবাড়ির দোমহলা দালানেব চোরকুঠুরির অঙ্গিসন্ধি থেকে—ঠিক যে কোনখানে আকস্মিক আবির্ভাব ঘটবে কিছুমাত্র জানা নেই। কিন্তু সে আছে কোন এক ঠিকানায়, এবং আসবেও স্নিগ্ধচিত। একটি মহাপ্রলয়ের অপেক্ষা শুধু। যখন অন্ধকারে বিশ্বদংসার অবলুপ্ত, এবং পদপ্রান্তে মৃত্যুর তরঙ্গবিক্ষেপ।

কতকাল পরে আজকে আবার পড়লাম সেই “একরাত্রি”। সে কালের সেই কিশোর মরে গেছে, এখন ভিন্ন মানুষ। আমরা হলে কি ভাবে গল্পটা দাঁড়



পাল্কি চলে

কোথাও যাযাবর বেছইন দস্যদল দিগন্তে বিলীন বিশাল মক-প্রান্তবেব বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে গ্রামল অবণ্যে শিকাবেব অশ্বেষণে বিচরণ কবছে হিংস্র স্বাপদ... কাজল-কালো অথৈ জলে ভেসে চলেছে 'ময়ূরপঙ্খি নাও' — আবার কোথাও বয়েছে উর্ষিমুখব বিস্তীর্ণ নীলাঙ্গু... অদূবেব হাতছানি যখন কিশোর ববীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল কবে তুলত তখন তিনি ঠাকুমা'ব আগলেব একটা পুবনো পাল্কিব ভিতবে চুপি চুপি ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসে পড়তেন। তাবপব চোখ দু'টি বুজে কল্পনা কবতেন পাল্কিটা যেন যাহ্নমন্ত্রে ভবা একটা উড্ডত গালিচা, তাঁকে নিয়ে শূন্যপথে ভেসে চলেছে মাযায় যেবা অচেনা অজানা কোন বাজ্যে। দেশ-দেশান্তবেব স্বপ্নে বিভোব হয়ে থাকতেন তিনি। উত্তবকালে কবিগুরু মাযা পৃথিবী পবিত্রমণ কবেছেন। 'জগতেব আনন্দ-যজ্ঞে' নানা বৈচিত্র্য ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যেব মধ্যে তিনি দু'টি নয়ন মেলে অপকপকে দেখেছেন—বৈশোবে একটা পাল্কিব মধ্যে বসে দেখা স্বপ্ন 'সত্য' হয়ে উঠেছে।



কর্তৃক প্রচারিত

'পৃথিবী কবি' পর্দাঘের অঙ্কন

করাতাম? আজকের দিনে পাঠকের নানান বাঘনাক। সবকারি উকিল আর স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার পাশাপাশি বাস করছে, উকিলের শুল্কবাড়ি আর মাস্টারের বাড়ি একই গ্রামে; উকিল-গিন্নি সুরবালার সঙ্গে মাস্টার বাল্যবয়সে বউ-বউ খেলেছে, এবং বিস্তর হুকুমহাকাম চালিয়েছে ঘেরোটা উপর। অথচ নওয়াখালিও সেই ছোট্ট শহরের প্রবাস-জীবনে সুরবালা কখনও মাস্টারের দৃষ্টির সামনে এল না, সামান্য অতি সাধাবণ একটি কথাও হল না তার সঙ্গে। উকিলবাবু বাড়িতে গিয়ে মাস্টার ঘণ্টাখানেক দেড়েক আলোচনা চালাচ্ছে—পাশের ঘরে তখন চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের খদখদানি, ক্ষীণ পদশব্দ, এবং জানলার ফাঁকে এমন কি কোঁতুলী চোখের কালো কালো তারা। তবু কিন্তু সেদিন বা কোম্ব একদিন লহমার জন্তে দেহমূর্তি দেখা গেল না সুরবালার। ১২২৯ অব্দ বলেই কোনরকম প্রশ্ন তোলেন নি পাঠক। আজকে কৈফিয়তের দায়ে পড়তে হত। লাগসই অজুহাত খুঁজতে খুঁজতে প্রাণান্ত। অথচ গল্পের রসধন সংহত সমাপ্তি স্থিতির জন্ত এমনিই প্রয়োজন। কোন একদিনের অতি-পরিচিতা নাথিক। মনিকার অন্তরালে দৃষ্টান্তীত হয়ে আছে, প্রলয়যাত্রিতে শুধুমাত্র তার ক্ষণিকের আবির্ভাব। সর্বগ্রামী বস্ত্রাশ্রোতে কাছাকাছি এসে পড়েও একটি বাক্যবিনিময় হল না। আর একটিমাত্র প্রবল টেউ—জনতলগত পৃথিবীর স্বল্পাবশেষ এই পাঁচ-ছয় হাত পরিমিত সামান্য স্থান নিশ্চিহ্ন হবে, বিচ্ছেদের সামান্য বৃন্তটুকু খসে গিয়ে এক হয়ে যাবে দুটি প্রাণী। কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি, দুই বাল্যসঙ্গীও অমোঘ স্নেহতা মৃত্যুর নিত্যান্ত সান্নিধ্যেও বিচূর্ণিত হত না। কিন্তু এল না সেই চব্ব মণ। গল্প তাহলে এমন উত্তর পর্যায় উঠত না, শেষ সুরটি এত মধুর ও মর্যাস্তিক হত না। ঝড় খামল, জল নেমে গেল, উষা আভাস দেখা দিল আকাশে। সুরবালা বাসায় ফিরে গেল, এবং ইস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারও। ক্ষণকালের জন্ত পরম বাত্রির উদয়—পবনায়ু তার অনন্তজীবী হয়ে রইল।

পুনরপি প্রশ্ন : রামলোচন না হয় মকদ্দমা নিয়ে বাইরে গেছে। কিন্তু বস্ত্রার তাড়নায় বাসাবাড়ি ছেড়ে সুরবালা

পুকুরপাড় গিয়ে উঠল—তার ছেলেমেয়ে? বলবেন যে ছেলেমেয়ে নেই, সুরবালা বক্ষ্যা। গল্পের কোনখানে তাব-ইদ্রিতমাত্র নেই, বরঞ্চ উলটোটাই পাচ্ছি—সেকেণ্ড মাস্টারের শুভ কামনার মধ্যে (স্বামীপুত্রগৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক)।

মানসিক কথোপকথন আছে, অনেকটা স্মৃতি-কুমতির ঘন্দের মত। তোমার সুরবালা কোথায় গেল!...তোমার সুরবালা কী না হইতে পাবিত! আজকের দিনে এমন চলে না। কৌশল ভেবে ভেবে সাবা হতে হয় আমাদের। হয়তো এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু যোগাড় করতাম, যার কাছে মাস্টারমশায় স্বচ্ছন্দে সকল কথা বলতে পারে। নানান হাদ্যাম। নায়কের মনের ভিত্তব দুই পক্ষ বানিয়ে ১২২৯ সালে লেখক কত সহজে সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

পরন্তু সুরবালার সম্পর্কে নায়কের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা এসেছে। কিন্তু শুধুমাত্র মনেব চিন্তা, তার অধিক কিছু নয়। এইটুকু নীতিশৈথিল্যের জন্ত কত সঙ্কোচ, সরল স্পষ্ট ভাষায় কত রকমের কৈফিয়ৎ। “আমি মানব-সমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত।” এখনকার লেখক আমরা রীতিমত নিরঙ্কুশ এই দিক দিবে। নায়ক ইস্কুলের শিক্ষক, সেই জন্তই কি এমন নীতিবাগীশ? অথবা ১২২৯ সালের পাঠকদের কথা বিবেচনা করে?

কিন্তু এহ বাহ। জন্মশ্রোতে ভেসে-আগা একদিনের নবকলিকা আবার একদিন পূর্ববিকশিত পুষ্পরূপে মৃত্যু-শ্রোতে অতি-নিকটে এসে গেল। মানসিক সন্তোষ শুধুই, এমন কি পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র হল না। কিন্তু কী অল্পম অনন্ত স্থিতি! আজকে পরিণত জীবনের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই আমারও ক্ষণকালের দু-একটি অনন্ত মুহূর্ত। অতিশয় নিঃশব্দ এবং স্পর্শভীরু বলেই মনেব উপরে গাঢ় ছায়া ফেলে থাকে, কোনদিন তার বিলয় হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক আদর্শ সংকট

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

ইন্সটিটুটের প্রতিধ্বনি করে বলতে হয় যে বর্তমানের বিন্দুতে আমরা সকলেই অন্ধ। যেখানে প্রতিটি কণা ঘূর্ণমান, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকেব সম্বন্ধ সর্বদা অস্থির, অনিশ্চিত ও পরিবর্তমান, সেখানে কোঁকসুনিদ্রিত পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া অসম্ভব এবং স্থির পরিপ্রেক্ষিত, অন্ততঃ তার সঙ্গে স্থির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে চিত্রপটের ধারণা করাও চলে না। আর বর্তমানের বিন্দুতে তো দৃশ্য ও শ্রুতি উভয়েই চঞ্চল, মুহূর্ত্তে আন্দোলিত এবং সে আন্দোলন সমান্তরাল নয়, তার গতি প্রাথমিকঃ পরস্পরবিরোধী, কখনও বা পরস্পরস্বী। সেইজন্মেই স্বীয় যুগেতে না বা যুগধর্ম সম্বন্ধে যুগ বিশেষের উক্তি পববর্তী-যুগে প্রায় অনিবার্য ভাবেই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ এবং শেষতঃ অর্থার্থ বলে প্রতীত হয়। বর্তমানের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে তাব পূর্ব অবয়ব আমাদের চোখে পড়ে না, আমাদের দৃষ্টিকে বাধা দেয়, ধারণাকে পঙ্কু করে। বর্তমান কাল সম্বন্ধে তাই আমরা যে উক্তিই করি না কেন, তা আংশিক হতে বাধ্য, অসম্পূর্ণ না হয়ে পারে না।

তবু এ কথা স্বীকার কবেও বলতে হয় যে বর্তমান কাল এক অসহ্য আদর্শ-সংকটের কাল। যেন হঠাৎ আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি গেছে সরে। যা কিছু এতাবৎকাল মহৎ জেনে এসেছি তা যেন ক্রুর ইতিহাস-দেবতার প্রতাবণা বলে আঘাত কবছে, এতদিন যা সর্বান্তঃকরণে চেয়ে এসেছি, অকস্মাৎ তা পাবার পর যেন শূন্যতার স্বাদে আত্মা আচ্ছন্ন হয়েছে আমাদের। শুধু তাই নয়, মানুষ হিসেবে আমাদের আত্মপরিচয়ে এতকাল যা প্রধান বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য ছিল—ক্রমশঃ তাও আব খাকে না বুঝি। মনঃসমীক্ষণ যে দিনই আমাদের মনের রুদ্ধতাব পাতাল-পুর্বী খবর দিল, যেদিনই আমাদের ধ্বংসকামিতা, আত্মদ্রোহ ও মৃত্যুশাখের অনিবার্য উপস্থিতির বিষয়ে সচেতন হলাম আমরা, সেই দিনই বুঝি বহুকালবাহিত মানবতাবাদের মূলে কুঠারাঘাত হল। প্রাতোব যুক্তিগীলতা নয়, নয় রুশোর উদ্যব উজ্জল সৌন্দর্যসচেতন মুক্তিপ্পহা, মানব-প্রকৃতির বিষয়ে ফবাসী বিপ্লবের যে মহৎ বিশ্বাস সে সব কিছু ছাড়িয়ে ছাপিয়ে এক অন্ধ আদিম প্রায় উন্মাদ আবর্তই মানুষের পরিচয় বলে নিরূপিত হল। স্বীকার করি, মনঃসমীক্ষণ বিভার গুণক সেইটেই মানব-প্রকৃতির সর্বস্ব বলেন নি। কামতৃষ্ণা ছাড়াও বিবেক

বুদ্ধির সচেতন শাসনের সত্যও তাঁব দর্শনে সর্বদা স্বীকৃত। তবু তা যেন অনেক ওপর-ওপর, ভাসা-ভাসা, বসন্ত পুঞ্জের উপর বৃষ্টি পিতাব মত নিষ্ফল শাসন তাত্র, গতি-বোধের ক্ষমতা নেই, শুধু বিকার ও ছলনাকে আবদ্ধ করে তোলে। এর আগে উনিশ শতকেই যখন প্রকৃতির রাজ্যে অস্তিত্বের সংগ্রামের কথা ঘোষিত হয়েছে, প্রাণীর উত্তরনে প্রাণেব নিরন্তর অপচয়ের তত্ত্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে মানুষকে, সেই দিনই রুশো আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি নিহত হয়েছে। এবং উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের সূচনায নব পদার্থবিজ্ঞান বলী কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক দার্শনিক যখন কার্য-কাবণসূত্রের অথও অমোঘ সত্যতায় সন্দেহ আরোপ করেছেন তখনই সর্ববিধ স্থাবিত্ত ও শৃঙ্খলাব অনিবার্য গতিপ্রগতির সংস্কার নাড়া খেয়েছে। এব মধ্যে কোন্টা কতটুকু সত্য তার বিচার উপেক্ষণীয় নয় এবং একমল দার্শনিকমুগ্ধ ছদ্ম-সাংবাদিক বাহু-গান্ধীর্থে স্কোত হয়ে যতই আফালন করুন না কেন, উপরোক্ত কোন বিষয়েই আজ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌছনো যায় নি। টমাস মানের অনুসরণে যদি স্বীকার কবতে হয় যে মনঃসমীক্ষণের libido, দর্শনের will to power (নীংশে) ও will (শোপেনহাউয়ার)-এর পরস্পরাগত ফল মাত্র, তা হলে নিছক ঐতিহাসিক সত্যের গতিব উপর নির্ভর করেই বলা চলে যে, libido তার অগ্রজ ধারণাগুলিব মতই আংশিক সত্যের অধিকারী, তদতিরিক্ত কিছু নয়। এবং জীববিজ্ঞাব আলোচনায় এ কথা স্বীকৃত যে শুধু সংগ্রাম নয় জীবের বিবর্তনে জৈব সহযোগিতাও (symbiosis) একান্ত সত্য। স্মৃতাং আধুনিকতা বা বৈজ্ঞানিকতার নাম কবে কোনও মতবিশেষের একাধিপত্য স্থাপনা কবা চলে না। এবং এ-জাতীয় মতপ্রাধাণ্য স্থাপনের যে প্রেরণা তা আধুনিকও নয়, বৈজ্ঞানিকও নয়।

তবু এ সমস্ত স্বীকার করে নিয়েও মানতে হয় যে বর্তমান চিন্তাধর্মের যা প্রকৃতি—বিবিধ নেতি-বাচক ধারণাব যে আঘাত এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার যা পরিণাম—এই সব কিছুর সমবায়ে আমরা এমন একটা মানসমণ্ডলের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছি যেখানে মানুষের শুভবুদ্ধির উপব আস্থা শিথিল হয়ে আসে, নিত্যতাকে কাল্পনিক মনে হয়, এবং কোনও স্থিব লক্ষ

বা অচঞ্চল আদর্শকে ভ্রান্তিকর মনোবিলাস বলে সন্দেহ জাগে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আজ সকলেই এই সংকটের দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবিত।

সত্যবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে অবিশ্বাস ও বিরোধে বিক্ষুব্ধ এই মানসমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ও আদর্শবাদের স্থান কোথায়? তিনি জীবনজিজ্ঞাসার যে সমাধানে উপনীত হয়েছিলেন, তা কি এমন এক সহজ সমাধান যাতে জীবনের অজস্র নিহিত দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধের পূর্ণ তাৎপর্যকে স্বীকার করা হয় নি? তাঁর আশাবাদ কি এক অবাস্তব কাল্পনিকতা? মানবমহত্বে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি কি নিছক একটা সংস্কার এবং অল্প সময়ের সংস্কারের মতই ভিত্তিহীন? এ সব প্রশ্ন আজ অনেক বুদ্ধিজীবী সামনে তুলে ধরা হচ্ছে এবং রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অটুট আস্থা রেখেও আজ অনেক বুদ্ধিজীবী এই সব প্রশ্নের কোন যথাযথ উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। ব্যথিত হয়েছেন তাঁরা, বিচলিত হয়েছেন, কিন্তু নিরুত্তর থেকেছেন।

অথচ রবীন্দ্রনাথকে—তাঁর সাহিত্য ও জীবনকে সমগ্র-ভাবে ধরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন, এই সব প্রশ্ন তাঁদের স্বাগত করা উচিত ছিল, কারণ রবীন্দ্র-চেতনার মধ্যেই এর যথার্থ সমাধান নিহিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে ধরা কতিপয় মত-বিশ্বাসের সমষ্টি বলে দেখে এসেছেন, তাঁদের কাছেই শুধু উপবোক্ত প্রশ্নগুলি অস্বস্তিকর হতে পারে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যা মহত্তম উত্তবাধিকার আমরা পেয়েছি তা কোনও মত-বিশেষের মধ্যে নিহিত নেই, কোন বিশেষ শিল্পবীতির মধ্যে তার শেষসীমা চিহ্নিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের যে উত্তবাধিকার বিশেষতঃ রাবীন্দ্রিক—যা শুধু আমরা তাঁর কাছেই পেয়েছি—তা হল তাঁর দৃষ্টি, তাঁর জীবন ও মনের গতি, জীবন ও তত্ত্বের সত্য নির্ণয়ে যে মানসিকতার পরিচয় তিনি সারা জীবনভোর দিয়ে গিয়েছেন, সেই মানসিকতা। কি সেই মানসিকতা? সংক্ষেপে বলা প্রায় অসম্ভব জেনেও যদি বলতে হয়, তা হলে বলতে হবে যে, প্রয়াস, নিরন্তর সত্য সন্ধান ও উপলব্ধির প্রয়াস, এবং সেই কাবণে শুধু বুদ্ধির নয়, সমগ্র জীবনব্যাপী প্রস্তুতি—সমস্ত মন মুক্ত রেখে, ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি আশ্রিত রেখে, পরিণামফল তুচ্ছ করে জীবনসত্যে উপনীত হবার প্রয়াস। যেখানে সকলেই গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রয়োজনে জ্ঞাত সত্যকে ছেঁটেকেটে চালু সত্যের অবয়ব গড়তে ব্যস্ত এবং তার ওপর ছোট ছোট মতবাদের

লাঞ্ছন মুদ্রিত করে বিশ্বকে নিজের প্রয়োজনানুযায়ী সীমাবদ্ধ রূপ দিতে ব্যস্ত—সেখানে রবীন্দ্রনাথ একক ঘাট্রী, কোনও মত, কোনও বাদ, কোনও বিশ্বাস, কোনও স্বার্থই তাঁর কাছে বড় নয়, সত্যসন্ধানের চেয়ে সত্যোপলব্ধি এবং উপলব্ধিকে জীবনে সত্য করে তোলার চেয়ে, সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে কোনও মত-বিশেষের সঙ্গে, কোনও সাময়িক উচ্চারণের সঙ্গে একান্ত করে দেখা ভুল, মহৎ ভুল। বাববার তিনি নিজেকে উত্তরণ করে গিয়েছেন, প্রবল আগ্রহে যাকে গ্রহণ করেছেন, অটুট ঔদাসীণ্যে বর্জন করেছেন তাকেই, কোনও অবস্থাতেই নিজের আত্মাকে আচ্ছন্ন হতে দেন নি, অজানিত পথে চেতনাকে ধাবিত করেছেন, এবং অজানার অন্ধকাব থেকে উথিত সত্যকে নির্দিষ্ট উচ্চারণ কবতে কুণ্ঠিত হন নি কখনও। তাই পূর্ণ যৌবনে যিনি হিন্দুত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তন্ময়, প্রৌঢ় বয়সে ও বার্ধক্যে তিনিই ‘অচলায়তনে’র বিরুদ্ধে বিদ্রোহমুখর। তাই ‘পীতাম্বরী’তে যিনি বিরামের আধো আলোছায়াতে স্থিতি প্রয়াসী ‘বলাকা’র তিনি গতিবেগমত্ত, ‘প্রান্তিকে’ অবসর চেতনার অন্ধকারে বিপ্লিষ্ট চেতন, একক। কোনও বিশ্বাস, কোনও মতই স্থাপু হয়ে বসে নি—তাই রবীন্দ্রনাথকে কোনও বিশ্বাসের পরিধিতে স্থাপন করলে তাঁর বিকলাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হবে শুধু—কাবণ বিশ্বাসের মূলে যে জীবনের ব্যবহার ও মননলব্ধ সত্য-উপলব্ধি থাকে, তাই ছিল রবীন্দ্র-সত্যের প্রাণ—কোনও মত নয়, কোনও বীতিও নয়।

আজকের বুদ্ধিজীবী তাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ সহযাত্রী রূপেই গ্রহণ কবতে পারেন—এবং যদি তা কবেন তা হলেই বোধ হয় তাঁর প্রভাব সব্বিয়ে সক্রিয় হবে আমাদের চিন্তায়, আমাদের জীবনে। গুরুদেব হিসেবে গ্রহণ কবলে অনড় আদেশ-নির্দেশের উৎসরূপে দূরে থাকবেন তিনি, আমাদের জীবনে সহজে সঞ্চারিত হবেন না। এবং আজকেই সর্বাধিক প্রয়োজন তাঁর উন্মুক্ত ও নির্ভীক বুদ্ধির যা কোন গুরুবাদের পদে আন্তঃসমর্পণ করে সহজ শান্তির সন্ধান করে নি, কোন ফ্যাশনের চটকে মুগ্ধ হয়ে উন্নাসিক অধঃসত্যের অতি-উচ্চারণে আত্মহারী হয় নি কখনও এবং সর্বোপরি যা ব্যক্তি হিসেবে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনেই সামাজিক বিবেকের জন্ম দিয়েছে—সামাজিক প্রয়োজনের নাম করে ব্যক্তিবিবেকের বলিদান মেনে নেয় নি কোনদিন।

This Age of Sillimanite

WITHOUT REFRACTORIES

the WATER we drink



cannot be purified by lime and chlorine,

both produced with the aid of Refractories. FOOD



is obtained with the aid of potash,

phosphates and nitrogenous fertilizers, none of which can be produced in adequate

quantities without Refractories. CLOTHING



cannot be produced in sufficient quantities

if Refractories are not available for the power plant Power plants using Refractories

provide your home with heat for COOKING,



LIGHT for comfort,



and power for essential domestic appliances It would be impossible to construct FURNACES



to extract metal from ORES



or to operate



Rail Road

LOCOMOTIVES. There will not be high octane AVIATION spirit nor LUBRICANTS



as suitable furnaces cannot be constructed. STEEL plates cannot be produced for building SHIPS.



It will be impossible to make LORRIES



TANKS



GUNS



SHELLS



Invasion BARGES



BATTLESHIPS even ALUMINIUM and

MAGNESIUM used in the manufacture of AEROPLANES



cannot be produced.

CHEMICALS



used in explosives cannot be manufactured The large POWERPLANTS

supplying power, heat and light cannot operate



ORDERS NOW UNDERTAKEN :—

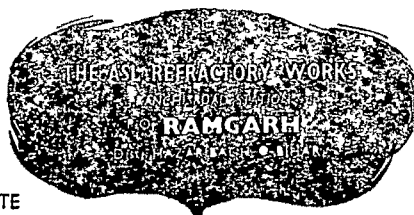
To Sizes .Shape.. Specifications. ...Requirements for Sillimanite Cement * Powder
Spray * Motors Mixes Sillimanite Glass-Tank Blocks * Pots * Tubes.

OUR SPECIALISED PRODUCTS .

Sillimanite Crucibles and Thermo-Couple Sheaths.



THE SUPER REFRACTOR
NATURAL KHASI SILLIMANITE
ASSAM SILLIMANITE LTD.



Managing Agents :
**THE UNITED PROVINCES
COMMERCIAL CORPORATION**
6 GANESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA 13



আধুনিক মন ও রবীন্দ্রনাথ

দেবব্রত ভৌমিক

তখন সম্ভবত আমি ক্লাস সেভেনের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে স্কুল থেকে দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিলাম—যেমন দল বেঁধে দেখতে যেতাম রথের মেলা কি দশমীর ভাসান। মনে আছে, জোড়াসাঁকোর বাড়ির লোহার দরজা ভেঙে ফেলেছিল ভক্ত জনতা। সারা বাড়ি তছনছ কবে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম সবাই। তাবপর ছাদেব উপর থেকে দেখেছিলাম শেষযাত্রা—উন্মাদ জনতার তরঙ্গের মাথায়-মাথায় বাসী ফুলের মালার মত ভেসে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ। পরে গুজব শুনেছিলাম, ভক্তেরা অনেকে নাকি স্মারক-চিহ্ন হিসাবে তাঁর দাঁড়ি ছিঁড়ে রেখেছিল। কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যেও ছিল না।

রবীন্দ্রনাথকে সেই আমার প্রথম দেখা, এবং সেই শেষ। সেই দিনই মনেমনে স্থির কবেছিলাম, এই উন্মাদ ভক্তের দলে নাম লেখাব না কোনদিন। লেখাইনিও।

কথাটা বোধ হয় এভাবে বললে ঠিক বলা হয় না। বোধ হয় বলা উচিত : রবীন্দ্রনাথের উন্মাদ অমুরাগী হবার সাধ্য আমাব ছিল না, এবং আজও নেই। এটা যে কেবল আমার ইচ্ছাবশতঃই ঘটেছে, তা নয়, ঘটেছে বৃহত্তর অতীত-অনেক অমোঘ শক্তির প্রভাবে।

আমাদের, যাদের জন্ম তিরিশের দশকে অথবা তার কিছু আগে কিংবা পরে, তাদের কাছে রবীন্দ্র-শিল্পের জগৎ সেই মন্দনকাননের তুল্য—যে স্বর্গীয় উত্থান থেকে আমরা মাটির মাছেরা ভ্রষ্ট হয়েছি বছরদিন। দূর থেকে তার রূপাতীত রূপ আমাদের মনে আজও স্বপ্ন আনে, তার পারিজাত লৌবতে আমরা চঞ্চল হই। কিন্তু তাকে আমাদের হাতের নাগালেও পাই নে কখনও। ভোজবাড়ির বাইরে থেকেই ববাহুত অভাজনের মত কেবল ভিতরের বহুবর্ণ উজ্জল আনন্দ-কোলাহলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় আমাদের।

এ-কথা এই বয়সের আবণ্ড-অনেকের পক্ষে যেমন সত্য, তেমনি সত্য আমার নিজের দিক থেকেও। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে আজও দূরের দেবতা—কাছেব মাহুশ নয়। কথাটা কারও দিক থেকেই কোন দোষ-গুণের কথা নয়। দোষ যদি কাবণ ঘাড়ে চাপাতেই-হয়, চাপাব আমাব দেশকালের উপরে, আমার যুগ-সমাজ-পরিবেশের উপরে, কেন-না আমার মনের বিশেষ গড়নের পিছনে তাদের হাতই যে সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু না, আমি দোষ দেব না কাউকে। এ আমাদের বিধিলিপি। আমাব, আপনাব—এবং এ-যুগের আরও-অনেকেব।

মনে আছে, প্রথম যৌবনে যখন মেয়েদের দেবী বলে মনে হতে শুরু হয়েছে, কুমু-লাবণ্য-সুচরিতার স্বপ্ন দেখেছি তখন। কিন্তু সংসারে কোথাও তাদের দেখা পাই নি কোনদিন। পরে বুঝেছি বাস্তবে ওদের পেতে চাওয়াটাই আহাম্মকি। সুচরিতারা সংসারে আসে না কখনও। কবির মনেই ওদের জন্ম, এবং কবির মনেই ওদের বাস। আসলে ওরা কোন বিশেষ মানবী নয়,—নারীসেব ভাবমূর্তি। ওরা তিলোত্তমা—যার চূড়ান্ত প্রতিমা নন্দিনী। কথাটা বুঝতে পেরে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কেন-না, কোন মেয়েকে ভাল না বেসে এবং কারও ভালবাসা না পেয়েও কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা যায়—এটা নিতান্তই বাস্তব সত্য।

কিন্তু সমস্তাব এখানেই শেষ নয়। আছেন আনন্দ-ময়ীরা, আছেন পরেশবাবুরা। আমি জানি নে তাঁদের মত মা-বাবা কোন সৌভাগ্যবান কোনদিন পেয়েছেন কিনা। - যারা পান নি, ভবিষ্যতে কোনদিন পাবেন বলেও কল্পনা কবাব স্বযোগ নেই তাঁদের, কেন-না মা-বাবারা আমাদের কল্পনা-শক্তি তৃষ্টির আগে থেকেই বর্তমান। তাঁরা যে-রূপে আছেন, তাঁদের আমরা সে-রূপেই মনে নিতে বাধ্য। বধূকে আমবা গ্রহণ না-ও

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা

ছবির অ্যালবাম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে টাটা আয়বন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানী কবির অঙ্কিত বাবোথানি বর্ণাঢ্য চিত্রের একটি সংকলন (৩৬ সি এম × ৩৪ সি এম) প্রকাশ করেছেন। ছন্দোময় বেথায় ও বর্ণসম্পদে অনবদ্য এই চিত্রগুলির বিষয়বস্তু মাতৃষের আবক্ষ ও পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, কাল্পনিক পশু ও পাখী। ভূমিকার পাতাটিতে কবির স্বহস্তে অঙ্কিত প্রতিকৃতির ছোট একটি ছবি এবং চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব লেখার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই চিত্র-সংকলনের কিছু কপি জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি কপির দাম ৮ (১২ শিলিং বা ২০০ ডলার)। বিক্রয়-লব্ধ সমস্ত অর্থ চ্যাম্পেলোবেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জয়ন্তী তহবিলে দেওয়া হবে।

একমাত্র পরিবেশক -

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

কলিকাতা • এলাহাবাদ • বোম্বাই
সমস্ত সম্ভাব্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল

রবীন্দ্রায়ণ

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

॥ রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবে প্রের্ত রচনার্ঘ্য ॥

প্রথম খণ্ডে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে উৎকৃষ্ট রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই খণ্ডের লেখকসূচীতে আছেন—অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীস্বকুমার সেন, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীহনুমানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসোমনাথ মৈত্র, শ্রীসুনীলচন্দ্র সবকার, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীলীলা মজুমদার, শ্রীবীবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও শ্রীকানাই সামন্ত।

চিত্রকলা সংগীত দর্শন রাষ্ট্রনীতি দেশচর্চা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে বিশিষ্ট লেখকসমূহের মূল্যবান আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅতুল বসু, বমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি অঙ্কিত রবীন্দ্র-আলেখ্য এবং

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রে সুসমৃদ্ধ।

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ।।। প্রতি খণ্ড দশ টাকা

বাক-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

করতে পাবি; কিন্তু মা-বাবার অস্তিত্বকে অস্বীকার করব কি কবে!

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এইখানেই আমার সমস্তা। কথাটা আব-একটু বিস্তারিত কবলে বলা যায়: ববীন্দ্রনাথের মানুষ আর আমরা ঠিক এক নই। আমরা রবীন্দ্রনাথের মানুষ হয়ে উঠতে পারছি না। অথচ, আমরা যা আছি, তা আমরা আছিই,—তাব অস্তিত্বকে অস্বীকার করার সাধ্য নেই আমাদের। আর, এ-দুয়েব মাঝে মিল ঘটানো আপাততঃ অসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের মানুষ সাধাবণভাবে কোন দেশকালের সীমায় আবদ্ধ বিশেষ মানুষ নয়। এটাই তাদের চবিত্তের সামান্য লক্ষণ। আসলে তাঁব বাস্তবতার বোধটাই আমাদের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর কাছে বস্তুর বস্তুরূপটাই চরম নয়, ওটা রূপকমাত্র। অর্থাৎ, বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপের আড়ালে অসীম-অরূপের যে সামান্য রূপ, তাঁর কাছে তাই চরম-পরম।

কিন্তু এভাবে জগৎকে দেখার ক্ষমতা নেই আমাদের। তাই রবীন্দ্রনাথের মানুষ বা গান্ধীজির মানুষ আমাদের মনে শ্রদ্ধা জাগালেও স্বাভাৱ্য জাগায় না। তাদের আমরা দূর থেকে প্রণাম করতে পারি, কিন্তু ভালবেসে বুকে টানতে পারি না।

ভালবাসতে পাবি যাকে, আপন মনে করতে পারি যাকে, সে আমাদের মাটির মানুষ—দেশকালের সীমায় আবদ্ধ। শুধু জীবন্ত মানুষ হিসাবেই তাঁর চরম এবং পবন পরিচয়। সে-মানুষ মানবিক দোষগুণের অতীত নয়। ভালবাসার আনন্দে, ব্যর্থতার বেদনায়, কাম্যে-ক্রোধে-লোভে-মোহে সে-মানুষ আবিষ্ট।

আমার শৈশব থেকেই সেই মানুষকে আমি দেখে আসছি চারিপাশে। আমার কৈশোর কেটেছে যুদ্ধের দাবদাহের উত্তাপে দগ্ধ হয়ে। আমাদের চোখের সামনেই হিরোশিমা-নাগাসাকির লক্ষ-লক্ষ মানুষ নিমেষে নিহত হয়েছে। আমার চোখের সামনেই ঘটেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ঘটেছে দেশ-বিভাগ। আমি দেখেছি মানুষ কত সহজে হননের উল্লাসে উন্মত্ত হতে পারে, কত সামান্যের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করতে পারে। আমাদের চোখের সামনেই কেবল দু-মুঠো অন্নের অভাবে কত মানুষ পথে

পড়ে মবেছে, কত মা সন্তানকে ত্যাগ কবে গেছে, কত স্বামী স্ত্রীকে বিক্রয় করেছে। এখনও আমার চারিপাশে দেখছি—ধর্মের ভণ্ডামি, পাণ্ডিত্যের মুঢ়তা, মহত্বের বর্ববতা।

তবু এই মানুষকেই আমি ভালবাসি। দেশকালের সীমায় আবদ্ধ এই মানুষই আমার চেনা-মানুষ। অসীমের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। অসীম আমার কাছে কেবল অন্ধকার শূন্যতা।

আমি এই উন্মত্ত যুগেবই মানুষ। কেবল অস্তিত্ববন্ধার সংগ্রামেই আমি অহরহ অস্থির। কেবল অপ্রেমের বেদনায় আমি অবিরত পীড়িত। কেবল অসহ শূন্যতার যন্ত্রণায় আমি জর্জর। মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেবল ঈর্ষার, সন্দেহের আর প্রতিযোগিতার। এই সম্পর্ক বিশ্বকে আমার প্রতিকূল করেছে। বিক্রপ বিধে আমি নিয়ত একাকী হয়েছি।

কিন্তু এ আমি চাই না; এ অস্তিত্ব আমার কাছে বিভীষিকা। আমি ভালবাসতে চাই; ভালবাসা পেতে চাই। দয়া চাই, ক্ষমা চাই, স্নেহ চাই, মমতা চাই। আমি শান্তি চাই।

আকর্ষ পিপাসায় আমি মূমূর্ষু। সামনে শান্তির পারাবার আছে জানি। সে-পারাবার রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর একবিন্দু জলও গ্রহণের সাধ্য নেই আমার। আমি যে তাঁর জগতের মানুষ নই। আমি দেশকালের সীমায় আবদ্ধ। তাঁব অসীমে-মহত্ব-বিরাটে আমার বিশ্বাস নেই। তাঁর সত্যে আমরা সত্যে অনেক তফাত।

রবীন্দ্রনাথের মানুষ অথও, পবিত্র, আনন্দময়। এই অস্বস্তি যুগের মানুষ আমি তাঁর জীবনের শরিক নই। তাই, তাঁর আনন্দ আমাকে আনন্দ দেয় না—আমার দরিদ্র-দুঃস্থ অস্তিত্বকে বিদ্রূপ করে শুধু। তাঁর নির্মল শান্তিকে আমার মনে হয় কেবল ব্যর্থ পরিহাস।

অন্ততঃ বর্তমানে এই আমার সত্য। জানি নে, হয়তো ভবিষ্যতে কোনদিন আমিও ববীন্দ্রনাথের মানুষ হতে পারব।

কিন্তু সে কবে?

এ-প্রশ্নের উত্তরে নীরব হতে হবে আমাকে। কেন-না, আমার সামান্য জ্ঞানের গণ্ডিতে আর যে বিত্তেই পড়ক—জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ে না।

রবীন্দ্র-সংলাপ

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ পূর্ব কথা ॥

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যত কথা আজ পর্যন্ত বলা হয়েছে সেগুলির চেয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন কথা বলেছেন, অজস্র আশ্চর্য যে কথার ফুল ফুটিয়েছেন জীবন-ভোর, উত্তরকালের জন্তে সেগুলি ছাপার অক্ষরে রেখে যাবার প্রয়োজনীয়তা তুলনায় অনেক বেশী। তাঁর জন্মশতাব্দী উপলক্ষ্যে মূর্তির আবরণ উন্মোচন, তাঁর নামে সৌধ অথবা সরোবরের নামকরণ, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন—এর মূল্য আছে কি নেই সেই তর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় এগুলি মূল্যবান মাত্র, রবীন্দ্র-রচনা অমূল্য।

গুরুকবি বাল্মীকির মূর্তি ভারতবর্ষের কল্পনায় ছাড়া আজ আর কোথাও নেই; আগামী কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও যদি না থাকে তা হলেই বা ক্ষতি কার এবং ক্ষতি কতটুকু। ঈশ্বরের মতই কবির কোনওকালে মূর্তির মধ্যে থাকেন না, বচনায় মধ্যেই মূর্তি হন। ‘আজি হতে শত বর্ষ পবে’,—শত শতাব্দী পবেও রবীন্দ্রনাথ থাকবেন মান্নভের ভাবনায় চিন্তায় গানে-গুঞ্জে, কল্পনায়, ভালবাসায়, যেমন আছেন ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, গোটে, সেক্সপীয়ার।

কিন্তু থাকবে না সেদিন রবীন্দ্রনাথের সেই সব কথা ছাপার অক্ষরে যা উচ্চারিত নয়। পথ চলতে যাসেব ফুল তারা অগোচরে রয়ে যাবে রবীন্দ্রদর্শন-শ্রবণ-বঞ্চিত হতভাগ্য আগামীকালের। পথে ও পথের প্রান্তে, ঘবোয়া আটপৌরে আয়োজনে, কখনও বা বিচিত্র কাব্যের শিখরদেশ থেকে নেমে এসে সকলের সঙ্গে সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে খেলাচ্ছলে যে চিত্রকাব্য বচনা করেছেন মহাকবি, মহাকাল তাকে হরণ করবার আগেই তার ছ-চারটে উদাহরণ উজ্জল করে রাখার দায়িত্বই রবীন্দ্র-জন্মশতাব্দীতে আমাদের সবচেয়ে পুণ্য, সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব।

কারণ, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর থাকবে, থককবে না মুহূর্তে উচ্চারিত রবীন্দ্রকৌতুকের কণামাত্র। ‘ক্ষণিকা’ও থাকবে, ‘কণিকা’ও থাকবে, থাকবে না কেবল নটরাজের ‘কথাকলি’।

॥ অপূর্ব কথা ॥

একবার রবীন্দ্রনাথের অস্বস্থ্যতাব পব, মহাত্মাজী এসেছেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথকে একদিন তিনি বলেছেন : গুরুদেব, একটা ভিক্ষে দিতে হবে; দুপুরে খাবার পর আপনাকে একটু করে ঘুমোতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বললেন : ঘুমোই নি যে দুপুরে কখনও! মহাত্মাজী তবুও অহরোধ করেন : না ঘুমান, কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে বিশ্রাম নেবেন।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন বাদে একদিন আচার্য ক্ষতিমোহন সেন দুপুরে রবীন্দ্রনাথের ঘরে এসে দেখেন তিনি ঘুমোচ্ছেন। ফিরে যাচ্ছেন আচার্য ক্ষতিমোহন, এমন সময়ে রবীন্দ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হল : ঘুমোই নি আমি—‘তবে’?—

‘মহাত্মাজীকে ভিক্ষে দিচ্ছিলাম—’

॥ পূর্ব কথা ॥

কথার পিঠে কথা বলা কথা-বলার সবচেয়ে বড় আর্ট। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থেও স্বার্থ কথাসিল্পী ছিলেন।

॥ অপূর্ব কথা ॥

একজন অভ্যাগত অল্প বয়সে তাঁর মাথায় টাক পড়ার কারণ দিতে গিয়ে বলছিলেন : আমার মাথায় নয় কেবল; আমার বাবার মাথায়ও অভ্যস্ত অল্প বয়সে টাক পড়েছিল, আমার ঠাকুরদার মাথায় আরও অল্প বয়সে টাক—

কথা শেষ হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বলেন—এ টাক তো তা হলে নিশ্চয়ই শিরোধার্য!

॥ পূর্ব কথা ॥

‘Pun’ কথাটা বাংলায় ভুল অর্থে চলে। পান হচ্ছে স্নেহ। কথার মধ্যে একবার ব্যবহার হবে, কিন্তু দু-অর্থে। অর্থাৎ শাঁখের করাতির মত তা যেতে একবার কাটবে, আসতে কাটবে আর একবার। এই ‘পান’ লেখাক্ষ অথবা কথায় বেশী কবতে গেলে সে ‘পান’ যেমন পানসে হয়ে যায় তেমনি কচিং কদাচিং ঠিক ঠিক জায়গায় পড়লে কোটিতে যা হয় না একটিতে তাই হয়। ষার্থ স্নেহও তাই কোটিকে গোটিক।

॥ অপূর্ব কথা ॥

বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই সেদিন রবীন্দ্রনাথের ঘরে উপস্থিত হওয়ামাত্রই গুরুদেব নির্দারণ গম্ভীৰ্বকণ্ঠে বলেন : শাস্ত্রীমশাই, আপনি কাল গুরুতর ভুল করেছেন ; একজনে আপনাকে দণ্ড পেতেই হবে আজ। একঘর লোকের মধ্যে ববীন্দ্র-স্বভাব-অসিদ্ধ তিরস্কারে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় বিধুশেখরকে মুহূর্তে উদ্ধাব করেন স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ। পেছনে লুকোনো শাস্ত্রীমশায়ের লাঠিগাছা বাব করে তাঁর হাতে তুলে দিতে দিতে বলেন : কাল ভুলে ফেলে গিয়েছিলেন, নিন আপনার দণ্ড।

তদুত্তরেই অবস্থা বিধুশেখর আশ্বস্ত হন। বোঝেন এমন দণ্ডদান গুরুদেবেই সম্ভব।

॥ পূর্ব কথা ॥

রাগে এবং অহুরাগে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল সমান আত্মসমাহিত। অহুরাগে উচ্ছল হন নি; রাগে উজ্জল হয়েছেন। কখনও ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হন নি, শালীনতার শোভনভার সমার্থক রবীন্দ্রনাথ। দুঃসহ শাবীৰিক যন্ত্রণাতেও চালিয়ে গেছেন আলাপ অথবা বক্তৃতা; জানতে দেন নি বক্তা কিংবা শ্রোতাকে মুখের কুঞ্চিত একটি রেখাতেও তার আঁঙ্গাস।

॥ অপূর্ব কথা ॥

এই রবীন্দ্রনাথ একবার ট্রেনে করে যাচ্ছেন কোথায়। একলা গাড়িতে গুনগুন করছেন কবি। স্বর আসছে

মনে। সেই স্বরের গুটিপোকা থেকে আরেকটু বাদেই বেরবে কথার প্রজ্ঞাপতি। এমন সময় ট্রেন থামল আব তৎক্ষণাৎ কামবার দবজা খুলে নয়, প্রায় ভেঙে ঢুকে পড়লেন এক গলদঘর্ম বিপুলবপু ভদ্রলোক—সঙ্গে মালের গন্ধমাদন পর্বত সমেত। নিব্বায়েব স্বপ্নভঙ্গ হল আরেকবার দুখদাম হটোপুটিব শব্দে। ববীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোকেব মুখের দিকে। ভদ্রলোক একটু বাদে কুপিত হন। দর্শনবত রবীন্দ্রনাথকে বলেন : কি দেখছেন অমন করে? আমিও মানুষ—। স্মিতহাস্তে অপক্লপ রবীন্দ্রনাথ যেন সন্নিহিত ফিরে পেয়েছেন এমন স্বরে উত্তর কবেন : ষাক! সন্দেহভঞ্জন হল।

॥ পূর্ব কথা ॥

দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামের ষারা সৈনিক তাঁরা যেমন প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ, তেমনই মাতৃভাষার মুক্তিসংগ্রামেব সৈনিক মধুসূদন, বঙ্কিম, বিজ্ঞানাগর এবং ববীন্দ্রনাথও চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে উৎকণ্ঠিত চাতকপাখির মত রবীন্দ্রনাথ একদিন আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন বাংলা ভাষায় বাঙালীৰ শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করবার জন্তে। সে আবেদনেব ভাষা ও বক্তব্য সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী ববীন্দ্রনাথের লেখনীতেই সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিম এবং ববীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মুক্তিসংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ।

॥ অপূর্ব কথা ॥

রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। সেখানে তাঁর স্বদেশীয় একজন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কবতে এসে কিস্ত-কিমাকার ইংরেজিতে অনর্গল বকে চলবার অনেকক্ষণ পব কবি বললেন কেবল এইটুকু : তোমার মুশকিল হচ্ছে এই যে বিলাতে এসে তুমি বাংলাও ভুলে গেলে, এদিকে ইংরেজিটাও ভাল করে শিখলে না।

কবিগুরু ববীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা ও বন্দনা করাব একমাত্র উপায়— তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে এবং বিভিন্ন পাঠাগারে ববীন্দ্রনাথের বচনা ও তাঁর সম্বন্ধে যত কিছু প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে সব পাঠ করা, অমুখাবন করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন, রচনা ও লোকোত্তর প্রতিভা সম্বন্ধে বর্তমান যুগের পুরোধা সাহিত্যিকদের রচনার বসোত্তীর্ণ সংকলন মধুরাংশে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশ করেছি।

নূতন প্রকাশিত হইল

শতাব্দীর সূর্য

মূল্য ৫.০০

(রবীন্দ্র জীবন, ধর্ম ও কর্মের আলোচনা)

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

নূতন প্রকাশিত হইল

মধুরাংশ

মূল্য ৪.৫০

প্রায় তিন শত পৃষ্ঠার স্ববৃহৎ রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সাহিত্য-সংকলন

(উৎকৃষ্ট কাগজে জেল বাঁধাই, ক্রাউন সাইজ)

সম্পাদক—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

এবারকার মধুরাংশ বাঁদের রচনার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে :

কৃষ্টিমোহন সেন, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, কবিশেখর কালিদাস রায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রবালেশ্বর সেনশাস্ত্রী, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীমন্তেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, ডঃ সূধাকর চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, ডঃ নীলদববর্ণ চক্রবর্তী, ডঃ সুনীলকুমার গুপ্ত, অধ্যাপক অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রঘুবীর চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রলাল নাথ, শ্রীঅশোক সেন, অধ্যাপক শ্রীভোলানাথ ঘোষ, অধ্যাপিকা অমিতা মিত্র, শ্রীদীপকর সেন, শ্রীরণজিৎকুমার সেন, শ্রীজয়দেব বায়, শ্রীস্ববোধকুমার চক্রবর্তী, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, লিও নিরুলিন (সোভিয়েৎ লেখক), ডঃ মার্টিন সি. ক্যারল (আমেরিকান লেখক)

এছাড়া বহু লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবি রবীন্দ্র-বিষয়ক কবিতাও সংকলনটিকে রসমধুর করে তুলেছে।

নূতন প্রকাশিত হইল

শরৎচন্দ্র (সমালোচনা সাহিত্য) ৪.০০

ডঃ স্ববোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

নব প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ

দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী

অভিনয় শিল্পের নূতন ধরণের গ্রন্থ

অভিনয়-শিল্প ও নাট্য-প্রযোজনা

৩.০০

শ্রীঅশোক সেন

নবপ্রকাশিত একাঙ্ক নাটক সংকলন

টাদের হাট ৫.০০

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

নূতন প্রকাশিত হইল

তারাকঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত

কাদম্বরী ৪.০০

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

ববীন্দ্র-প্রতিভার গভীর গহনের
পথ-সন্ধান

আপনাব সহায়তা কববে আমাদের

রবি-রশ্মি প্রথম ৮.৫০, দ্বিতীয় ৭.০০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বলাকা-কাব্য-পরিভ্রমণ ৪.০০

আচার্য কৃষ্টিমোহন সেনশাস্ত্রী

রবি-পরিভ্রমণ ২.০০

অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-কাব্যলোক ৫.০০

অধ্যাপিকা অমিতা মিত্র

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন ২.৫০

ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী

রবীন্দ্র-নাট্যপরিভ্রমণ ৬.০০

শ্রীঅশোক সেন

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ৩.৫০

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ববীজ্ঞনাথের কাছে আমাদের ঋণ

অরুণ ভট্টাচার্য

ববীজ্ঞনাথ ‘নির্ববের স্বপ্নভঙ্গ’ লিখতে বসে যতটা উত্তেজনা বোধ করেছিলেন, বালক বয়সে আমিও কবিতাটির প্রথম পাঠে তাব চেয়ে কম উত্তেজনা বোধ করি নি। মনে পড়ে, কোন এক ছুটির দিনে, নিস্তব্ধ ছপুববেলায়, বড়দার আদেশমত নীল কাগজে বাঁধানো মোটা ‘চয়নিকা’ থেকে কবিতাটি জোবে জোরে আবৃত্তি করেছিলুম। একবার দুবাং পড়বার পব একটা মাদকতা আমাকে ভব করেছিল। দীর্ঘদিন বাদে, নিজের কাব্যচর্চাব সময় বুঝতে পেবেছি, সেই মাদকতা কবির কাছে আশীর্বাদ। ‘নির্ববের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটির পরিমার্জিত রূপান্তরে অনেক অংশ ববীজ্ঞনাথ নিজেই সংশোধন করেছেন, নির্মমভাবে কেটেছেন, কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই কবিতাটিই তাঁব প্রথম কবিতা, যেখানে তিনি যত দুর্বলভাবেই হোক অথবা যত সোচ্চারবেই হোক, নিজেকে প্রকাশ কববার চেষ্টা করেছেন। সদর স্ট্রিটেব বাসা থেকে নবীন সূর্যোদয় দেখে তাঁব মনে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে উঠেছিল সত্য কিন্তু কবি যখন সেই অল্পভবকে কাব্যে প্রতিষ্ঠা কবলেন তখন তাঁব কাব্যচেতনা একান্তভাবেই পার্থিব ও বস্তুনির্ভর শিল্পরূপে আমাদের কাছে উজ্জলতব হয়ে উঠল। এমনি কবেই ববীজ্ঞনাথ বহু কবিতাতেই অধ্যাত্মচেতনাকে মানবমনের ঘনিষ্ঠ প্রতীতিতে রূপান্তবিত করেছেন। ববীজ্ঞনাকাব্যের মুক্তি ও বসাস্বাদ, আমার মনে হয়, তাঁব অধ্যাত্মচেতনার উত্তবণে নয, ববং এই ভাববাদকে বস্তুতাত্ত্বিক এক জটিল নকশায় দাঁড কবানোব বৈশিষ্ট্য; সেখানে নৈর্ব্যক্তিক চেতনাকে নানা বঙে বসে, আলিম্পনে, বিণেষ ঘনত্বে একটি পবিপূর্ণ রূপ দান কবতে সক্ষম হওয়ায়। ‘সোনার তবী’র অসংখ্য ব্যাখ্যায় আমাদের মন ভবে না, ববং কোন আধুনিক

কবির কাছে সেই ছোট্ট কবিতাটির অপূর্ব চিত্রধর্মিতাব ও সূক্ষ্ম কাককার্যেব আবেদনই মুখ্য হয়ে দাঁডায়। ববীজ্ঞনাথের কবিতা যেখানে তত্ত্ব ও ঘটনানির্ভব সেখানে তিনি দার্শনিক বা ঐতিহাসিক, যেখানে রূপ বস রঙের বর্ণাঢ্য সমাবোহে ঘনিষ্ঠ সেখানে তিনি আধুনিক কবিদের প্রথম পথপ্রদর্শক। বস্তুতঃ আমাদের সময়ে ববীজ্ঞনাথের থেকে বহু দূবে বাস করে, আমবা কবিতাকে এক নতুন অর্থে বোঝবার চেষ্টা কবেছি। সেটা এই যে, ‘সোনার তবী’র অন্তর্নিহিত ভাবেব গভীরত্বে আমবা মুগ্ধ হযেছি, কিন্তু কবিতাটির অপূর্ব শিল্পকৌশলে আমাদের মন কবি ববীজ্ঞনাথের একেবারে পাশে গিয়ে দাঁডিয়েছে। সেই একই কারণে ‘বলাকা’ব অন্তর্গত কাব্যগুলিব গতিতত্ত্বে আমবা তত উৎসাহিত নই, যতটা বিমুগ্ধ সেই সকল কবিতাবলীব নিহিতার্থ প্রাণরসে, অবিবাম ধারায়, চিত্রগুলিব অল্পপম সৌন্দর্যে, মুক্ত চন্দ্রেব অবাধ স্বাধীনতায়।

আধুনিক হিসাবে আমাদের আপসোস এই যে ববীজ্ঞনাথ তাঁব জীবনের মধ্যপর্বে কাব্যবচনায় অধ্যাত্ম অল্পভূতিব প্রভাবকে একেবারেই আত্মগত কবেছিলেন। এমন কথা বলি না যে বিশেষ অধ্যাত্মচেতনায় মন নিবিষ্ট হলে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু একথাও সমপবিমাণে সত্য যে শিল্পীব নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিই তাকে শিল্পরূপ চিন্তে সাহায্য কববে। অধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন থাকলে বিষযাস্তরে মনক টেনে নিয়ে যাওয়া দুর্লব, বস্তুতঃ সেও একরকমেব বন্ধন। শিল্পীব জীবনে absolute freedom-এর প্রযোজন যে এত জরুরী তার কাবণ হিসাবে ববীজ্ঞনাথেরই অল্প বচনাব নির্দেশ দেখানো যেতে পাবে। মধ্যবয়সে যখন ববীজ্ঞনাথের শিল্পসৃষ্টির পূর্ণ

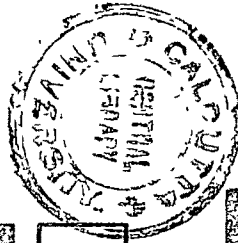
অথও রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি তখন গীতাঞ্জলি, গীতালি বা গীতিমাল্যের অধিকাংশ কবিতা আমাদের কিছুটা নিরাশ কবেছে বৈকি এবং যদিও আন্তর্জাতিক সম্মান তিনি লাভ কবলেন এই বইগুলিবই অনূদিত ইংরেজী ভাষ্যে, বলতে দ্বিধা নেই, তার পূর্বে এবং উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশী - সার্থক ও উজ্জল কবিতাবলী রচনা কবেছেন। কবিতাব অত্যন্তম যে বিশেষ সর্ভ, আবেগ, রবীন্দ্রনাথে তা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকলেও, তিনি বহু সময়ে তাকে পরিহাব কববার চেষ্টা কবেছেন। অথচ রবীন্দ্রকাব্যের শৈশবে বা তাঁর জীবনের গোঁড়লিবেলায় তাঁর সকল বচনাই আবেগপ্রধান ছিল। ইংরেজীতে এয যথাযথ প্রতিশব্দ passion—এই বিশেষ গুণের অভাবে যে-কোন শিল্পই কিছুটা প্রাণহীন নির্জীব হতে বাধ্য। সে কারণে ‘সোনার তবী’ ‘চিত্রা’ বা পরবর্তীকালে ‘বলাকা’র কবিতা যে পবিমাণে আমাদের কাছে টানে, ‘গীতাঞ্জলী’র কবিতা ততটা ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। আমাদের মনে রবীন্দ্রনাথের ঋষিভূত্যা ও বিবাত মহিমামণ্ডিত সাধকের চিত্রটি ভক্তি ও সন্ত্রম যোগায় বটে, কিন্তু ‘গল্পগুচ্ছে’র রবীন্দ্রনাথ বা ‘চিত্রা’র কবি একেবাবে পাশে এসে দাঁড়ান।

২

একথা যদিও আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে তৎকালীন তরুণেবা বলেছিলেন, রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তিতেই আধুনিক কবিতাব সার্থকতা, ভাল করে খতিয়ে দেখলে আমাদের মনে হবে ঠিক তার উল্টোটি। অর্থাৎ

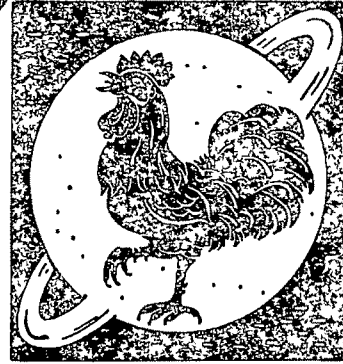
রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় ভাবে জানায় ও তাঁকে গভীর ভাবে অনুধাবনেই আধুনিকতাব সিদ্ধি। কেন না রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন আধুনিকতাবই পৃষ্ঠপোষণা কবে গেছেন। ‘বলাকা’র ছন্দ বা ‘লিপিকা’র গন্ত বাঙ্গলাদেশে ত্রিশের দশকে কি দুঃসহ বকম আধুনিক ছিল তা ইতিহাসেব আলোয় বিচার করলে আজও ভাবতে অবাক লাগে। বঙ্কিমের উপন্যাসের পাশে ‘গোব’র কথা মনে আনলেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

যে প্রসাদগুণে আধুনিক কবিতা সর্বসাধারণে আজ স্বীকৃত তা মূলতঃ এয চিত্রধর্মিতা ও স্ববস্তুষ্টির আবহ। বস্তুতঃ এখানেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের পূর্বপুরুষ। যে সকল অনুরূপ চিত্রযোজনা তিনি তাঁর কাব্যে প্রথম থেকে শেষ অবধি কবে গেছেন তার তুলনা একমাত্র তিনিই। আব স্বরের কথা নতুন কবে কি বলাব আছে। শেষ জীবনে যে সকল গন্তকবিতাগুলিব মাধ্যমে তিনি নতুন কবে কাব্যবীতির চর্চা করেছিলেন তারও বিশিষ্ট স্ববস্তুতায় সমৃদ্ধ। ছবি ও গানের পারস্পর্ষে যে উৎকৃষ্ট কবিতাব জন্ম হতে পারে, শৈশবেই হয়তো বা তিনি বুঝেছিলেন, যখন অনুরূপ নামে তাঁর অধুনা-অখ্যাত কবিতাব বইটি প্রকাশিত হয়। সার্থক কবি-প্রতিভা শব্দের অনন্ত অর্থের অনুরূপ নামে তৎপব থাকে, রবীন্দ্রনাথও শব্দের যথাযথ প্রযোগে কাব্যশরীরকে গোঁবব দান করেছেন। চিত্রে ও সঙ্গীতে, ধর্মির ব্যঞ্জনায় ও শব্দের অলৌকিক আত্মদে তাঁর কাব্যপ্রতিম সৃষ্টি আমাদের আরো সুদূব দিগন্তেব গোঁড়লিকে স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জলতর করবে।



শ নি বা রে র

চি চি



৩৩শ বর্ষ,
৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

সংবাদ-সাহিত্য

“দুঃখের আঘাত”

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের আনন্দ-উৎসবের উপরে প্রথম “দুঃখের আঘাত” হানিয়াছেন আমাদের চালিহা-সরকাব। দ্বিতীয় শোচনীয় আঘাত গত ৩রা জুন সকাল আটটায় দেয়া হুনে রবীন্দ্রনাথের বর্তমানে একমাত্র বংশধর রথীন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা পাইয়াছি। ১৮৮৮ সনে রবীন্দ্রনাথের সাতাশ বর্ষ বয়সে তাঁহার জন্ম। ১৯০২ সনে মাত্র চৌদ্দ বৎসরের মাতৃহারা বালক ত্রিগ্নান বর্ষ বয়স পর্যন্ত পিতার স্নেহে ঘেঁষে প্রাণে লালিত হইয়াছিলেন। রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষ পুঁতি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ও প্রবন্ধে পুঁত্রে অভিনন্দিত করিয়া বিশ্বভারতী পবিকল্পনার কৃতিত্ব তাঁহাকে দান করেন। রথীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ছাত্র ও চর্ম-শিল্পের সাধক ছিলেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধজীবনীর আংশিক অনুবাদ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হাতের চামড়ার কাজ শিল্পীজনের প্রশংসালভ করিয়াছিল। শেষ বয়সে ইংবেজীতে শ্রুতিকথাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা অনেক অজ্ঞাত খবর পাই।

মাতৃভাষায় তাঁহার পিতৃস্মৃতি-কথা গ্রন্থাকারে বাহির হয় নাই; সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেই ছড়াইয়া আছে। সেগুলি রবীন্দ্র-জীবনী অতি মূল্যবান উপকরণ। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত ‘আনন্দবাজার

পত্রিকা’র ২৫শে বৈশাখ সংখ্যায় তাঁহার “রামগড় পাহাড়” প্রবন্ধে আমরা রামগড়ে লেখা ‘বলাকা’র কয়েকটি কবিতার মর্মকথার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাইয়া লাভবান হইয়াছি। কিন্তু বৈশাখ ১৩৬৮ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী-সংখ্যা ‘বহুধারা’র রথীন্দ্রনাথ “দুঃখের আঘাত” প্রবন্ধে বিংশ শতকের প্রায় গোড়া হইতে পিতার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-বিবোধ-দুঃখের এবং তপস্বী কবি চিত্তে তাহার প্রতিক্রিয়ার যে অপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, নিজের মৃত্যু দ্বারা যেন সেই চিত্র সম্পূর্ণ করিয়া গেলেন। এই কাবণেই “দুঃখের আঘাত” প্রবন্ধটি স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বিংশ-শতাব্দীতে কবি-শোকের সূত্রপাত ১৯০২ সনে সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে। তাহার পব, পর পর দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার (১৯০৩), পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৯০৫), কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের (১৯০৭), প্রথম কন্যা বেলার (১৯১৮) এবং সর্বশেষ একমাত্র দৌহিত্র নীতুব (১৯৩২) মৃত্যু যেন ঢেউয়েব পরে ঢেউয়ের মতই আসিয়াছে। রথীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দেখিতেছি শেষ দুঃখের আঘাতে এই চিরন্তন সাজ্জনা কবিচিত্ত হইতে ধ্বনিত হইয়াছিল—

“যে বিবাদের মধ্যে তার [নীতুব] গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক। সেখানে আমাদের সেবা পৌছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌছয়—নইলে ভালোবাসা এখনো টিকে থাকে কেন?”

সন্দেহে সংশয়ে ছিন্ন হইলেও এই বিশ্বাসই মানুষকে দুঃখের আঘাত হইতে রক্ষা করে, রথীন্দ্রনাথের আত্মীয়দেরও কবিবে।

আত্মরক্ষা

আমাদের বাংলাভাষা বিপন্ন, সেইজন্য ভাষা-আন্দোলন চালানো হইতেছে—এই ধবনের উজ্জ্বলিত বাঙালী জাতির বৃহত্তম সমস্তা—জীবনমরণ-সমস্তাকে খেলো করিয়া দেখানো হইতেছে। ইহা কাছাড়-করিমগঞ্জ-গৌহাটি-ডিব্রুগড়ের সমস্তা মাত্র নয়। ইহা বঙ্গভাষাভাষী সমগ্র বাঙালী জাতির টিকিয়া থাকার সমস্তা। বৃহৎ বটবৃক্ষের মূল থাকে মাটিব তলায়। কিন্তু ইহার শাখাপ্রশাখা দিক্‌দেশব্যাপী হইতে পাবে। সুদূরবর্তী প্রশাখাতেও কুঠাবাঘাত করিলে সমূল কাণ্ডের প্রাণশক্তি খণ্ডিত হয়। বৃক্ষ ইহার প্রতিবাদে নিশ্চয়ই শাখা-প্রশাখা-আন্দোলন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। সমূল সমস্ত শক্তি দিয়া আঘাতের প্রতিরোধ করে; অর্থাৎ আত্মরক্ষা করে।

রথীন্দ্রনাথ এখন আমাদের ধ্যানে জ্ঞানে, স্মরণে তাঁহাকেই নজিবস্বরূপ দাখিল কবিতোছি :

“নমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান প্রদানের উপায় স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি, সে হচ্ছে ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে—নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হ’ত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, এমন সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহীনা, তাদের প্রকাশ নেই, জ্যোতিষ্কগুলোর মধ্যে তারা অখ্যাত। জীবজগতে মানুষ জ্যোতিষ্কজাতীয়। মানুষ দীপ্ত নক্ষত্রের মতো কেবলি আপন প্রকাশ-শক্তি বিকীর্ণ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে।...

জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে এ আমাদের বিম্বিত করে না, যেমন বিম্বিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি...। মানুষকে মানুষ করে তোলবার তার এই জাতিক সত্তার উপরে। সেই জন্যে মানুষের সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা এই জাতিক সত্তাকে রক্ষা করা।

এই তার বৃহৎ দেহ তার বৃহৎ আত্মা। এই আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের মধ্যে দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ। জাতির নিবিড় সম্মিলিত শক্তি তাদের পোষণ করে না, রক্ষা করে না। তারা পরস্পর বিস্মিষ্ট হয়ে থাকে—এই বিস্মিষ্টতা মানবধর্মের বিরোধী। বিস্মিষ্ট মানুষ পদে পদে পবাভূত হয়, কেন না তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়।”

—‘বাংলাভাষা পরিচয়’ (১৯৩৮) পৃ ৩-৬

বাঙালী জাতির আত্মরক্ষাব এখন একমাত্র পথ কেন্দ্রীয় ক্ষমিতে বিস্মিষ্টীয়মান (৭) জাতিকে বিস্মিষ্ট হইতে না দেওয়া, ঐক্যবোধ স্বদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। এই জাতিক সত্তা রক্ষাব জন্য বঙ্গভাষাভাষী যে যেখানেই থাকুক আর্থিক কায়িক ও আত্মিক সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবে—ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই। যাহারা ভাগ্যবিড়ম্বনায় ঘটনাস্থলে থাকিতে বাধ্য হইয়া নির্মম অত্যাচার ও নৃশংস বর্বরতার সম্মুখীন হইয়াছেন ও এখনও হইতেছেন; যাহারা প্রাণ দিয়াছেন ও যাহারা অনশনে পীড়নে প্রাণ দিতে বন্ধপবিকব তাঁহারা যেন সর্বদা অল্পভব কবেন তাঁহারা একক এবং বিস্মিষ্ট নহেন, সমগ্র জাতিক সত্তা নিকটে দূরে সম্মুখে পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেছে। প্রত্যেক বাঙালীর সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের সময় আসিয়াছে। গ্যালারি-মাত-করা অভিনয় চলে “দিই লাফ” হুমকির কাল আর নাই, নাইটহুড-ত্যাগী রথীন্দ্রনাথের মত একেবারে লাফ দিতে হইবে। ডি.এল. রায়ের সাজাহানকে চাই না, রাণা প্রতাপকে চাই। যাহারা জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছেন, অর্থবল ও লোকবলের অপ্রতুলতা যেন তাঁহাদের না ঘটে, নিজ বাংলাদেশ হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে নিয়মিত পাঠাইতে হইবে, ধারা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

কিন্তু সংগ্রাম অস্বাভাবিক অবস্থা। তাহা চিরকাল চালানো যায় না। যে সমস্তার জন্য সংগ্রাম, তাহার মীমাংসার একটা পথ করাই লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্বে সংগ্রাম চরম পন্থামাত্র। কেন্দ্রপ্রেরিত ক্ষমতাবান ব্যক্তির—গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর এখন পর্যন্ত মীমাংসার যে ফরমূলা নির্দেশ কবিয়াছেন তাহা বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ অন্তঃপুরে খিড়কিপথে হিন্দী-

অল্পপ্রবেশের কৌশল ছাড়া কিছু নয়—সাময়িক উচ্ছাসমত্ত জগৎহরলাল নেহরু যতই ইহাব প্রশংসা করুন। মীমাংসাব পথ কি তবে নাই? নাই বলিতে পারি না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অশীতিপর বিধানচন্দ্র যে স্ফুটিত নির্দেশ দিয়াছেন, ভারতের সংবিধান পরিবর্তনের দ্বারা সমগ্র ভারতে তাহা কার্যকরী হইলে এই সর্বনাশা ভাষাসম্রাট হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা পাইতে পারে। পৃথিবীর বহু রাজ্যেই একাধিক ভাষার সমান অধিকার নির্বিবাদে চলিতেছে, ভারতের রাজ্যগুলিতেই বা চলিতে পারিবে না কেন?

যতদিন পর্যন্ত এই ধরনের কোনও সমীচীন ফবমূল্য বা সূত্র কার্যকরী না হইতেছে ততদিন অহিংস সত্যগ্রহই একমাত্র বিধান। প্রত্যক্ষদর্শীরা [ডাঃ ত্রিগুণা সেন প্রভৃতি] বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর জীবৎকালেও তাঁহার আদর্শ-অল্পপ্রাণিত এমন চমৎকার সত্যগ্রহ আর হয় নাই। কাছাড়ের সত্যগ্রহীরা শত অত্যাচাবসত্ত্বেও এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিলে শেষ পর্যন্ত তাঁহাদেব জয় অবশ্যজ্যাবী। এখানে আমাদের দায়িত্ব শুধু উপাদান যোগান দিয়া এই সংগ্রামকে চালু রাখা। বাংলা ভাষার মর্যাদা বাখার মানেই যে বাঙালীর “জাতিক সত্তা” অর্থাৎ বাঙালীর প্রাণশক্তিকে রক্ষা করা, রবীন্দ্রনাথের উক্তিই আমাদের তাহা প্রণিবান করিয়াছি। বাংলা ভাষা পূর্ববঙ্গে প্রবল বিরোধিতাসত্ত্বেও মাতৃভাষার ভক্ত ও উৎসর্গিতপ্রাণ শহীদদের সাধনায় শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হইয়াছে। কাছাড়-করিমগঞ্জে একরূপ না হইবার কোনই কারণ নাই, যদি কেন্দ্রের প্রণাদভিক্ষু বাঙালীরাই না বাদ মাখে।

আসামে ভাষাবিচ্ছেদের গোড়ার কথা

আমবা বিগত কাটিক (১৩৬৭) সংখ্যাব “সংবাদ-সাহিত্যে” “আসাম” প্রসঙ্গে ১৩১১ বঙ্গাব্দের রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ‘নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে’র আষাঢ় সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত “বঙ্গভাষা বনাম আসামী ভাষা” নিবন্ধের সারমর্ম উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৫৪ সন হইতেই মার্কিন পাদরি ব্রনসনের প্ররোচনায় ও কৌশলে আসামে ভাষাবিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। তদানীন্তন স্কুল-ইনস্পেক্টর ইংরেজ উইলিয়ম

রবিনসন এই বিচ্ছেদ-চেষ্টার নিন্দা করিয়া যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন, “আসামের ভাষা ও বঙ্গদেশের ভাষা ভিন্ন নয়, আসামী বঙ্গভাষাবই একটি প্রাদেশিক রূপ।” কিন্তু ১৮৫৪ সনে সাম্রাজ্যলোলুপ ব্রিটিশ আসামের কল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় অধিকতর তৎপর হইয়া মার্কিন পাদরিদিগকেই সমর্থন করেন। উক্ত প্রদেশকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র চীফ-কমিশনারের শাসন প্রবর্তিত হয়। এই বিচ্ছেদের সর্বনাশা পরিণাম ১০৬ বৎসর পরে ১৯৬০ সনের জুলাই মাস হইতে বঙ্গ-ভাষাভাষীদের পক্ষে মাঝাক্রম হইয়া দেখা দিয়াছে।

১৯৪৭ সনে স্বাধীনতালভের পর আমবা আশা করিয়াছিলাম স্বাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের অপকৌশল ও ভেদনীতি অমুহুত হইবে না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পাপচক্র ধামে নাই, ভিন্ন আকারে আরও সর্বনাশা রূপ ধারণ করিয়া একই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদকে প্রাণ্ডয় দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীর শেষে ১৮৯৮ সনে যখন মাত্র এক-বৎসরের জন্ম ‘ভারতী’র সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন তখনই এই “ভাষাবিচ্ছেদ” সম্রাট তাঁহাকে ভাবিত করিয়াছিল। ‘দেশ’ সাপ্তাহিকের গত ২৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১০ই জুন ১৯৬১) ১৩০৫ সালের প্রাণ সংখ্যা ‘ভাবতী’র রবীন্দ্রনাথের সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘দেশ’ ভ্রমক্রমে ১৩০৫কে ১৩০৩ করা হইয়াছে। ‘দেশ’ যে অংশ উদ্ধৃত করেন নাই আমবা সেই প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে পুনর্মুদ্রিত কবিত্তেছি:

“...উপভাষা আপন জন্মস্থান হইতে একেবারে লুপ্ত হয় না। তাহা পূর্বপুরুষের রসনা হইতে উত্তর পুরুষের রসনায় সংক্রামিত হইয়া চলে। কিন্তু লিখন-ভাষা যত বৃহৎ পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত হয় ততই দেশেব পক্ষে মঙ্গল।

ব্রিটিশ দ্বীপে স্কটলাণ্ড, আয়ারল্যান্ড ও ওয়েলসের স্থানীয় ভাষা ইংল্যান্ডি সাধুভাষা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে ইংল্যান্ডের উপভাষাও বলা যায় না। উক্ত ভাষা সকলের প্রাচীন সাহিত্যও স্বল্পবিদ্যুত নহে। কিন্তু প্রবল ইংল্যান্ডি ভাষাই ব্রিটিশ দ্বীপের সাধুভাষারূপে গণ্য হইয়াছে। এই ভাষার একো ব্রিটিশ জাতি যে উন্নতি ও

বল্লাভ কবিযাছে, ভাষা পৃথক থাকিলে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইত না।...

স্থানীয় চাকরী পাওয়া সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা বাঙালীর বিরুদ্ধে যে গণ্ডী টানিয়া দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বেহাবী প্রভৃতি বঙ্গশাখীদের সহিত যে একটি ঈর্ষাব সম্বন্ধ দাঁড় কবাইয়াছেন তাহা আমরা স্বল্প অন্তরেই কাবণ মনে কবি,—কিন্তু ভাষার ঐক্য, যাহা নিত্য, যাহা স্বেচ্ছাভীর, যাহা আমাদের এই বিচ্ছিন্ন দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহাকে আপন রাজশক্তির দ্বারা পরাহত করিয়া ইংরাজ আমাদের নিকপায় দেশকে চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া রাখিতেছেন।

ইংরাজি ভাষা কোন উপায়েই আমাদের দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। কারণ, তাহা অত্যন্ত উৎকর্ষ বিদেশী। এবং যে সকল ভাষার ভিত্তি বহুসংস্কৃত বৎসরের প্রাচীন ও মহৎ সংস্কৃত বাণীর মধ্যে নিহিত, এবং যে সকল ভাষা বহুসংস্কৃত বৎসরের পুরাতন কাব্য দর্শন সমাজরীতি ও ধর্মনীতি হইতে বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া নরনারীর হৃদয়কে বিবিধরূপে সজল সফল শস্ত্রশাশ্বত করিয়া রাখিয়াছে তাহা কখনই মরিবার নহে।

কিন্তু সেই সংস্কৃতমূলক ভাষা রাজনৈতিক ও অগ্ৰাণ্য নানাপ্রকার বাধায় শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্থানে স্বতন্ত্ররূপে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের মধ্যে শক্তিপরীক্ষা ও যোগ্যতমের জয়চেষ্টার অবসর হয় নাই।

এক্ষণে সেই অবসরের স্তম্ভপাত হইয়াছিল। এবং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের আধীন হস্ত থাকে তবে বাঙলা ভাষার পরাভবের কোন আশঙ্কা নাই।...চতুর্দিকে জীবনদান এবং জীবন গ্রহণ করিবার শক্তি ইহার জন্মিয়াছে। ইহার দেশপরিধি যত বাড়িবে ইহার জীবনীশক্তিও তত বিপুলতর হইয়া উঠিবে। এবং বেগবান বৃহৎ নদী যেমন যে দেশ দিয়া যায় সে দেশ স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে বাণিজ্যে ও ধনে ধাত্তে ধন্য হইয়া উঠে তেমনি ভারতবর্ষে যতদূর পর্যন্ত বাঙলা ভাষার ব্যাপ্তি হইবে ততদূর পর্যন্ত একটা মানসিক জীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া দুই

উপকূলকে নিত্য নবনব ভাবসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিবে।

সেইজন্ত বলিতেছিলাম আসাম ও উড়িষ্যায় বাঙলা যদি লিখনপঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে শুভজনক হইবে তেমনি সেই দেশের পক্ষেও।”

বাজনীতিব বিষক্রিয়া বিভিন্ন রাজ্যেই এমন ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথের তেষ্টি বৎসর পূর্বের আশা যে পূর্ণ হইবে এমন আমরা এখন কল্পনাও করি না। কিন্তু বাংলা ভাষার শক্তি সম্বন্ধে তিনি তখনই যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা যে সত্য হইয়াছে ভারতবর্ষের অগ্ৰাণ্য প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যদৃষ্টে আমরাও তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। রবীন্দ্রনাথের এই পুরাতন উক্তির উদ্ধৃতির দ্বারা আমরা চারিদিক হইতে আক্রান্ত বঙ্গভাষাভাষীদেরকে আশ্বাসেত্তন, নির্ভয় ও উৎসাহিত করিতে চাহিতেছি। রবীন্দ্রনাথের মত আমরাও যেন বিশ্বাস কবিতে পারি—

“বাঙলা ভাষার পরাভবের কোন আশঙ্কা নাই।”

“চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও—”

বাংলাদেশের পরম দুর্ভাগ্য দেশের ঘোর সঙ্কটকালে লেখক-সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন বাঙালী অভিশয় ঘৃণ্য আত্মপ্রীকাতবতাবশতঃ স্বজাতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে ধূলিসাৎ করিবার কাজে পৈশাচিক উল্লাস বোধ করিতেছেন। একদল সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলাসাহিত্যকে পণ্ডিত্যচ্যুত করিতে পারিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, অগ্র একদল এযুগের বিশ্বকবি উচ্চাঙ্গনে স্প্রতিষ্ঠিত বাঙালী রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাবই জন্মশতবর্ষের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বিদেশীদের কৃচ্ছ্রে হেয় করিবার ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছেন। দুই দলের উদ্দেশ্য একই—স্বজাতি-দূষণের দ্বারা হীন স্বার্থসিদ্ধি।

শুনিতোছি, প্রথম দল ইহার মধ্যেই পরম্পরের চুকলি খাইতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা নিজেদের কীর্তিতে লজ্জা পাইয়াছেন। স্তত্রাং তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দল যে সর্বনাশা মীবজাকরী মনোবৃত্তি লইয়া ইংরেজী ভাষার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ধ্বংস করিয়া সাময়িক বৈদেশিক প্রভুদের

তোষণে মাতিযাছেন তাহার খবর বাঙালী মাজেরই জানা উচিত এবং অচিরেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। ইহাদেব একজন স্ববীজনাথ দত্ত, তাঁহার প্রতি একান্ত স্নেহপরায়ণ কবি বৃকে শেষ একাঙ্গীবাণ নিষ্ক্ষেপ করিয়া গতাস্থ হইয়াছেন। তাঁহার কীতিকথা পরবর্তী প্রসঙ্গে বলিব। পালের গোদা বুদ্ধদেব বহু শিষ্য নরেশ গুহ সহ আমেরিকায় ফ্রান্সে ইংরেজীয়ানাব গোঁববে দাপাদাপি কবিয়া ফিরিতেছিলেন। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী পাশ্চাত্য জাতি এই দুইটি বাঙালী ক্লাউনকে দিয়াই ভারতমহিমা খর্ব করিয়া মার্কাস জমাইয়া তুলিয়াছেন। জার্মানীর বিখ্যাত হেগেনবেক মার্কাস একবার স্বদেশীয় ক্লাউনদের দিয়া গান্ধীমহিমা খর্ব করিবার প্রয়াস কবিয়াছিল, অনেকের তাহা শ্রবণ থাকিতে পারে। দুঃখ ও লজ্জার কথা এই যে পরপদলেহী বাঙালীরই সন্ধান এবাবে তাঁহারা পাইয়াছেন এবং তাহাদের দিয়াই রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের উজ্জলতাকে কদমমলিন করিতে পারিতেছেন।

দোষ আমাদেরই। আমরাই প্রশ্রয় দিয়া গর্ভধাবিনীর প্রতি যৌন 'সাদা'-জাগা নাগকের স্রষ্টা চ্যাংডা বুদ্ধদেবকে বিধাতাব দেমা শোধ করিবার জন্ত কটুগন্ধ অঙ্ককারে নিষ্কিপ্ত হইতে দিয়াছি। এই প্রশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথেরও অংশ ছিল—ইহাই হইল রবীন্দ্রভাগ্যের সর্বাধিক বিড়ম্বনা। প্রশ্রয় পাইতে পাইতে এই অর্বাচীন যখন, বঙ্গের মহাকবি মধুসূদন বাংলা লিখিতে জানিতেন না—এইরূপ স্পর্ধিত উক্তি করিতে সাহসী হইল তখনও আমরা চাঁচি মাঝিয়া মাথা মুড়াইয়া বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কার তো করিই নাই, অধিকন্তু 'সম্মানিত অধ্যাপকেব আসনে বসাইয়া তাহাকে মীরজাফরী দল পাকাইবার স্বেচ্ছা-দিয়াছি। তাহার পব বুদ্ধদেবের মস্তিষ্ককোটব হইতে নিঃশেষিত প্রতিভার শেষটুকুও যখন আশ্চর্যভিতা-শ্রোণ হোঁ মারিয়া লইয়া গেল এবং তাঁহার প্রতিভাহীন মত্ত চক্ষু বাংলা সাহিত্যের 'এক একর সবুজ ঘাসে' মাত্র একটি বুড়িগঙ্গা-ফড়িংকে চরিতে দেখিয়া 'তাহাকেই ম্যামথের মর্দাদা দিয়া উল্লাস প্রকাশ করিল তখনও আমরা সাবধান না হইয়া দৈতো হাসি হাসিয়া অধ্যাপনার উচ্চতর পদে তাঁহাকে বহাল কবলাম। স্বেচ্ছতর আমেরিকানরা প্রতীক্ষায় ছিল। এমন একটি স্বজাতি-

দ্রোহী চীজকে ধার করিয়া লইয়া স্বদেশে চালান দিয়া কুট মতলব হাঁসিলের স্বেচ্ছা তাহারা ছাড়িল না। সঙ্গে গেলেন উপযুক্ত শিষ্য নরেশ গুহ। এই মতলবের ফল ফলিল রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে—বুদ্ধদেব বহুব প্যারিসেব ইঙ্গফরাসী দ্বিভাষিক পত্রিকায় ('টু সিটিজ') ইংরেজীতে লেখা "রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্যেব প্রভাব" প্রবন্ধে এবং নরেশ গুহেব ইউ. এস. আই. এস-প্রচারিত ইংরেজীতে লেখা "পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে।

বুদ্ধদেব বহুর প্রবন্ধেব অনুবাদ ১৯৬১ তম জুন সংখ্যা 'ঘুগবাণী'তে মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদক মন্তব্য কবিয়াছেন, "প্যারিসে কয়েকটি ছাত্র ঐ প্রবন্ধটি বুদ্ধদেবের নাকের উপর ছাঁড়িয়া দিয়া আসিয়াছিল।" আরও স্থখী হইলাম গত ১০ই জুন শনিবারের 'ঘুগাস্তর' পত্রিকায় 'জনাস্তিকে' নিবন্ধে মল্লিনাথ বুদ্ধদেবের উক্তি সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ এই ভাবে জানাইয়াছেন দেখিয়া—

"ইঙ্গজিৎ মেঘের আড়াল থেকে শক্তিশেল নিষ্ক্ষেপ করে রামানুজ লক্ষ্মণকে প্রায় যমের দুয়ারে পাঠিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বহুও রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে কবিগুরু প্রতি শক্তিশেল নিষ্ক্ষেপ করেছেন। কবিগুরু জীবিতাবস্থায তিনি কিংবা তাঁর দলের কেউ রবীন্দ্রনাথের মনীষা অথবা বিদ্যাবত্তাব ওপর কোনো কটাক্ষ কবেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শততম জয়ন্তী উপলক্ষে এই মহামনীষী অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছেন যে, রবীন্দ্র-প্রতিভা আসলে একটি বিরাট ফাঁকি। ভদ্রলোক দীর্ঘদিন বেঁচে বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি কবেছেন বটে, আসলে তাঁর তেমন কোনো পাণ্ডিত্য ছিল না। কাবণ, রবীন্দ্রনাথের রচনাতে পাশ্চাত্য লেখকদের উল্লেখ প্রায় নেই বল্লেই চলে। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে মাত্র গোটা ছয়েক বই রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন। তিনি দাস্তে কিংবা গ্যোটেব রচনা পড়েন নি। স্কাইনবার্ণ, ভার্লেন, ভালেবি কিংবা রিলকের কবিতা পড়বার চেষ্টা করেন নি। শেক্সপীয়ার পড়লেও পছন্দ করেন নি। প্যারিস থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের এই মহারথী এই অবমাননাকর প্রবন্ধটি লিখেছেন। এর আসল উদ্দেশ্য, শততম জয়ন্তী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্বকে পাশ্চাত্য দেশবাসীদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা। এখানেই তিনি বক্তব্যের উপসংহার

টানেন নি। তিনি আরেকটি মহৎ আবিষ্কার ফবাসী-বাসীদেব কাছে তুলে ধরেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ('আর কতদূরে নিঘে যাবে যোরে হে সুন্দরী!') কবিতার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী কবি শার্ল বোদলেয়ারের 'দি ভয়েজঃ এবং আর্থার রিনবো-ব 'দি ড্রাকেন বোট' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধরনের আবও অনেক বাতুলোক্তি শ্রীবসু পশ্চিমী পাঠকদের উপহাস দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে স্বদেশে পাণ্ডার্থ নিবেদন কবে, বিদেশে এই গুরু-নিন্দাব পশ্চাতে কোনো অদৃশ্য হস্ত কাজ করেছে কিনা সে সম্পর্কে জানবার জ্ঞান আমবা উৎসুক হয়ে বইলাম।"

বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ হইতে বেশী উদ্ধৃতি দিতে চাই না, এই পাণ্ড যত কম প্রচার হয় ততই ভাল। তবে তাঁহার মোদা কথাটা—যাহা দিয়া তিনি প্রবন্ধ গুরু করিয়াছেন, পড়িলেই তাঁহার মতলব সকলে বুঝিতে পারিবেন :

"পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্যেব সংঘর্ষ-প্রবণতার বিরোধী এবং শান্তির ভক্ত এক প্রাচ্য ঋষি বলিয়া মনে করা ফ্যাশান হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে প্রশংসা লাভের আগে এবং পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁব সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মিতে দিয়াছেন। মোদা কথা, চোখ খুলিয়া যাহারা বাঙ্গলা কবিতা পড়ে তাহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী পবিমাণে ইউরোপীয় ছিলেন।" 'যুগবাণী', পৃ. ২৪৮

এই মতলববাজ বিশ্বপণ্ডিত স্বদেশে ফিবিয়া আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের মহিমময় আসনে বসিয়া বাঙালী ছাত্রদের কাঁচা মাথা চিবাইয়া খাইবেন, ইহা ভাবিলেও শঙ্কিত হইতে হয়। যে দেশে খোঁড়াইয়া চলিব অথচ পায়ের সামান্য কাঁটাটা তুলিব না—ইহাই রেওয়াজ, সেদেশে আরও মারাত্মক স্বদেশ-স্বভাষা-দ্রোহিতা ইহা বা অবাধে কবিত্তে পারিবেন।

আকাশ-প্রদীপের উচ্ছিষ্ট

কবি রবীন্দ্রনাথ দত্ত লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃতের সঙ্গে কোন্দল করা অশোভন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু পূর্বে এমন একটি অপকর্ম করিয়া গিয়াছেন যাহার প্রতিবাদ না করিলে আমরা কোনদিনই নিজেদের ক্ষমা

করিতে পারিব না। ইংরেজী ত্রৈমাসিক *Quest* পত্রিকা রবীন্দ্র-সংখ্যায় [মে, ১৯৬১] রবীন্দ্রনাথের 'গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ ছাপিয়াছেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রজীবন সম্পর্কে তিনি এমন একটি কুৎসিত উক্তি করিয়াছেন যাহা আমাদের বিবেচনায় রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত সমস্ত রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আপত্তিকর মিথ্যাভাষণ। 'কোয়েস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যকে অবহেলা করা সমীচীন হইবে না, কারণ এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা কলিকাতা বোম্বাই ও দিল্লিকে একমুত্রে গাঁথিয়াছে। ইহার সম্পাদকমণ্ডল হইলেন কলিকাতাব আবু নৈয়দ আবু ও অন্মান দত্ত, ইহা প্রকাশিত হয় বোম্বাই হইতে এবং ইহা বা দাবি করিতেছেন যে পত্রিকাখানি 'ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডম' কর্তৃক পরিপোষিত।

রবীন্দ্রনাথের লেখাব উপব গুরুত্ব আরোপ করার আর একটি কারণ এই যে, তিনি রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের একজন বিশিষ্ট কবি, উপরন্তু তিনি কবিগুরুর স্নেহ-সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। 'আকাশ-প্রদীপ' কাব্যখানি তাঁহার নামেই উৎসর্গ। উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'আমাব রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।' উত্তরস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র' হইতে কবিগুরুর রচনা এবং সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনকে গ্রহণ করিয়া কিতাবে সেই স্নেহের ঋণ শোধ করিয়াছেন তাহারই চূড়ান্ত নিদর্শন 'গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

Then too he was ever lonely : very much older in age, his famous brothers had their proper talents to tend ; and the compulsory company of his female relations induced an inferiority complex, from which he could not escape except by taking refuge in the manorial gardens

of his retiring father to watch the play of sunlight on the shadowy pond That in course of time he and the wife of his brother Jyotirindranath fell desperately in love with each other did not mend matters at all, and when the family married him off presumably to prevent scandal, had got worse and worse until his sister-in-law killed herself.

[Quest, p. 21

অর্থাৎ স্বধীন্দ্রনাথের মতে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁহার বোঁঠান বেপবোঁঠানভাবে পরস্পরের প্রেমে পড়িয়াছিলেন। কেলেক্সারি চাকিবাব জন্ত অভিভাবকগণ রবীন্দ্রনাথের বিবাহেব ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল, অবশেষে রবীন্দ্রনাথের বোঁঠান আত্মহত্যা করেন।—এই উক্তির দ্বারা স্বধীন্দ্রনাথ শুধু রবীন্দ্রনাথকেই নয়, সমস্ত ঠাকুরবাড়িকেই জড়াইয়াছেন। ১২২১ সালের ৮ই বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী চব্বিশ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ আত্মহত্যা করেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেইশ বৎসর; সাড়ে চারি মাস পূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যাকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়াইয়া সেই যুগ মহর্ষি-পরিবারের শত্রুগণ যে কুংসা রটনা করিয়াছিলেন তাহারই পূর্ণাঙ্গিতা মিলেন স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত কবিব শতবার্ষিক মহোৎসবে। কাদম্বরী দেবীর প্রতি নিজের গভীর অহুসারের কথা কবির অসংখ্য বচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বহু উপকরণ আবিষ্কৃত ও সংকলিত হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া ‘শনিবাবের চিঠি’তে জগদীশ ভট্টাচার্য ‘কবিমানসী’ নামে ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। ‘কবিমানসী’র লেখক তথ্যানিষ্ঠ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের পবিত্রহৃদয়ের অল্পভূতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কবিতা ইহাকে প্লেটোনিক প্রেমের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন এই সম্পর্ক কলুষমুক্ত ছিল বলিয়াই সারাজীবন কবিমানসে বিচিত্র প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। তা ছাড়া, কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার সঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের কোনও সম্পর্ক নাই, এবং তিনি যে স্বাধীন আচরণে

ক্ষুদ্র হইয়া তাঁহারই প্রতি অভিমানবশে আত্মঘাতী হইয়াছিলেন তাহাও সংশয়াতীতভাবে ‘কবিমানসী’র লেখক প্রমাণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অত্যাঁজ বহু যুক্তির সঙ্গে বিহারিলাল চক্রবর্তীর ‘সাধের আসন’ কাব্যগ্রন্থের ‘পতিব্রতা’ সর্গ হইতে অকাট্য প্রমাণ উদ্ধার কবিতা তিনি দেখাইয়াছেন যে, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুব জন্ত বিহারিলাল জ্যোতিবিন্দ্রনাথকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী কবিতা তাঁহাকে কঠিনতম ভাষায় তৎসনা করিয়াছেন। এই আবিষ্কারেব দ্বারা জগদীশ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে এক ছুপনের কলঙ্ক হইতে চিরদিনের মত মুক্ত করিয়াছেন, এইজন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধাবান মালুম্যাত্রেবই কৃতজ্ঞতাভাজন।

স্বধীন্দ্রনাথ আজ সমালোচনার অতীত। তিনি অন্তিম বিকারেব ঘোরে যে প্রলাপ বকিয়াছেন, তাহা ষাঁহারা প্রচার করিয়াছেন সমগ্র বাঙালী জাতির দিক্কার তাঁহাদেবই প্রাপ্য।

দাদার ভীমরতি

রবীন্দ্রনাথ নামো বাংলাতে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখিতে গিয়াছেন। রুদ্ধদাব খুলিতেই দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখা গেল চাপকান গায়ে বসিয়া কার্ডবোর্ডের বাক্স বানাইতেছেন। ছোট ভাইকে দেখিয়া উল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইতেই ছোট ভাই প্রমাদ গণিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ একেবাবে অন্তর্দ্বাসশূন্য। রবীন্দ্রনাথ কোনও গতিকে পলাইয়া বাঁচিলেন। পূর্ববৎ দাব রুদ্ধ করিয়া বড়দাদার খাস চাকর মুনীন্দ্রবকে সতর্ক করিয়া দিয়া গেলেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ “রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা” ‘প্রবাসী’ব (হায় প্রবাসী!) দ্বার খুলিয়া আমরাও আমাদের পূজ্যপাদ নরেন্দ্রদাদাকে (শ্রীনবেন্দ্র দেব) অসম্ভূত অবস্থায় দেখিয়া খুবই অসোয়াস্তি ভোগ করিয়াছি। মুনীন্দ্রকে পাই নাই, কাজেই দাদার আর পাঁচজন ভাইকে সতর্ক করিতেছি। দাদাবও বয়স হইয়াছে, অতএব মস্তিষ্ক-বিকৃতির আশঙ্কা নাই। বয়সকালে ভীমরতি সবলেরই হইয়া থাকে, এই যা সাঙ্গনা।

দাদা “রবীন্দ্র-বিদ্যুণের গ্রহেলিকা”-রূপ বাক্স বানাইতে বসিয়াছেন স্মৃতি-ঘুড়ির কাগজ লইয়া। উপরের আবরণ

ঠিকই আছে কিন্তু ভিতরেই যে গলদ, সে খেয়াল নাই। ‘শনিবারের চিঠি’র রবীন্দ্র-বিদ্যুৎগণের কাহিনী ফাঁদিতে বসিলে দাদার অনেক ঘা-সওয়া অবচেতন মন তাঁহাকে ঠকাইল। তিনি উদ্যোব পিণ্ডি বুড়োর ঘাড়ে চাপাইয়া লিথিয়া বসিলেন—

“কবিব ‘ঘরে-বাইবে’ উপস্থানে তিনি নাকি ভারত-পুজ্যা মহীয়সী নারী-চরিত্র নীতাকে ‘অসতী’ আখ্যা দিবে নিম্নিত্তা ক’রে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন এ অভিযোগ ‘শনিবারের চিঠি’ই প্রথম কবিব বিরুদ্ধে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের দেশের অনেক অল্প-শিক্ষিত পাঠক শনিবাবের চিঠির ধূয়া ধ’রে কবির প্রতি এই নীতা-অমাত্যের জন্ত খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

কবিকে শেষে এক দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়ে সকলকে বোঝাতে হয় যে, লেখকের রচনার মধ্যে পাত্র-পাত্রীদের মুখে যেসব সংলাপ দেওয়া হয় সেগুলি সেই চরিত্রের আসল রূপটি পাঠকদের সামনে ফুটিয়ে তোলবার জন্তই সেই চবিত্তোপযোগী কথাই তার মুখে দিতে হয়। তার অর্থ এ নয় যে, গ্রন্থকাবও নিজে সেই মত পোষণ করেন। কতকগুলি দেশী-বিদেশী লেখকের নজির তুলেও দেখাতে হয়েছিল কবিকে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে।”

‘ঘরে-বাইবে’ ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে ‘সবুজ পত্র’ে বাহিব হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে, ইংরেজী ১৯১৬। ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’র অষ্টম খণ্ডের ‘গ্রন্থ-পরিচয়ে’ (পৃ: ৫২১) এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

“উপস্থানখানি যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছিল তখনই ইহার নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে থাকে।”

কবির যে ‘দীর্ঘ কৈফিয়ৎ’-এর উল্লেখ দাদা করিয়াছেন তাহা ১৩২২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘সবুজ পত্র’ে প্রকাশিত হয়। ‘শনিবারের চিঠি’ সাপ্তাহিক আকারে প্রথম বাহির হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। মাত্র ছয় মাস সাপ্তাহিক রূপে বাহির হইয়া উঠিয়া যায়। এই ছয় মাসে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ পর্যন্ত নাই, কারণ ইহা তখন পলিটিকাল কাগজ ছিল। পবে মাসিক আকারে ১৩৩৪

বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস হইতে সাহিত্যপত্ররূপে ‘শনিবারের চিঠি’ পুনর্বাভূত হয়। অর্থাৎ ‘ঘরে-বাইবে’ লইয়া আন্দোলন চুকিয়া-বুকিয়া ঘাইবার পূর্বা বার বৎসর পরে ‘শনিবাবের চিঠি’র আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ ‘ঘরে-বাইবে’ উপস্থানে নীতার অপবাদ প্রসঙ্গে সর্বশেষ জবাব দিয়াছেন ১৩২৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসেব ‘প্রবাসী’তে “সাহিত্য-বিচার” প্রবন্ধে। সেও ‘চিঠি’র জন্মের ৮ বৎসর আগে। মজার কথা এই যে সেই ‘প্রবাসী’ই বিয়াল্লিশ বৎসর পবে নরেন্দ্রার ভীমরতির পাত্রী হইয়াছেন। ‘জামাই-বাবিক’ প্রথার নিন্দা দীনবন্ধু শতাব্দীকাল পূর্বে করিলেও দেখিতেছি খণ্ডরকুলকে লাক্ষিত করিবার জন্ত জামাইদের বেল্লিকপনা এখনও থামে নাই।

জাতীয় অধ্যাপক কে. এস. কৃষ্ণন

“সংবাদ-সাহিত্য” শেষ করিবার মুখে নির্দারুণ হৃঃসংবাদ পাইলাম, আকস্মিক হৃদরোগে ভারতের অন্ততম জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর কৃষ্ণনের মৃত্যু হইয়াছে। ভারতে মৌলিক গবেষণায় কাজে যে দুই-চারিজন মাত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের একজন। অধ্যাপক সি. ভি. রমনের মত তিনিও কলিকাতাতেই বিজ্ঞান-সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। রমনের তিনি সহযোগী ছিলেন। ১৯৩৪ সনে যখন কলিকাতার দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সে মহেন্দ্রলাল সরকার প্রফেসরশিপ স্থাপিত হয়, প্রফেসর কৃষ্ণনই প্রথম প্রফেসররূপে নিযুক্ত হইয়া বহু সহকর্মীর সঙ্গে সেখানেই গবেষণাদ্বারা বিজ্ঞানের বহু তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৯৪০ সনে ম্যাগনেটিক অ্যানি-সোট্রপি ও ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার বিষয়ক এখানে নির্বাহিত গবেষণার জন্ত রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন, ১৯৪২ সনে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাঁহার বিয়োগে সমগ্র ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া কলিকাতাবাসীর চিত্ত শোকসম্পৃক্ত। বিজ্ঞানের যুগে মৌলিক গবেষণায় কৃতী বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের সমুদ্র ক্ষতি হইল।

আগামী সংখ্যা হইতে জীজগদীশ ভট্টাচার্য বচিত “কবিমানসী”

পুনরায় ধারাবাহিকভাবে শনিবাবের চিঠিতে প্রকাশিত হইবে।

রাষ্ট্র বনাম মনুষ্যত্ব

নাবায়ণ দাশশর্মা

ভূমিকা

সপ্তদশ মহাশয়, এবারের মত আমাকে অব্যাহতি দিন, প্রসঙ্গকথা আলোচনার গুরুভার দায়িত্ব আমাব উপর অর্পণ করবেন না।

কারণ বাঙালীর সামনে আজ ষে-ঘটনা এই মুহুর্তে প্রাসঙ্গিক, যে একটিমাত্র ঘটনাক্রমে বঙ্গদেশ মুহমান, সে সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই। আজ থেকে এক বৎসর কাল সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ আমি করব না, পণ করছি। সম্বৎসব মৌনব্রত উদ্‌ঘাপনের পর এই প্রসঙ্গে যদি বা কিছু বলতে হয়, তখন তো আব এর প্রাসঙ্গিকতা অবশিষ্ট থাকবে না, আমি ভুলে যাব, আপনি ভুলে যাবেন, তিনি এবং তাঁরাও সম্পূর্ণ ভুলতে পারবেন এই তিন ঘটনাগুলি। প্রসঙ্গকথার প্রসঙ্গে আজ নাই বা গেলাম তাই। কেন না আমি তো শুধু বাঙালী নই, ভারতীয়, বাঙালী নই, শুধু ভারতীয়।

যতদিন বাঙালী ছিলাম ততদিন ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি ভাবতীয় হিসাবে কোন ঘটনায় কী প্রতিক্রিয়া হওয়া আমাব পক্ষে সমুচিত, দেশাত্মবোধিক ও সংবিধান-সম্মত অবজেক্টিভ বিশ্লেষণ করতে পারতাম না অনেক ঘটনার। তাই সাধনা করেছি ভারতীয় হবার, পড়ি নি বাংলা সংবাদপত্র, এমন কি কলকাতা থেকে প্রকাশিত কোন ইংরেজী সংবাদপত্রও—একমাত্র স্টেটসম্যান ছাড়া। তাও কচিং, রেডিয়োর অখিল ভারতীয় কার্যক্রম ভিন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীতে কান দিই নি; ভাত খাওয়া না পারলেও ছেড়ে দিয়েছি মাছ খাওয়া (তার পেছনে, বিশ্বাস করুন,

আর্থিক কারণ ছিল না), পাছে ধুতি-চাদর অঙ্গে ভুলতে হয় সেই ভয়ে কোন সামাজিক নিমন্ত্রণে যাই নি; একমাত্র অফিস যাবাব সময়ে বাসের হাতল অবলম্বনে প্রলয় হওয়া ছাড়া বাঙালীজন্মোচিত কিছুমাত্র কাজ করি নি এতদিন। আশা করি আমার সাধনা অচিরে ফলবতী হবে, বাঙালীত্বের কুপমণ্ডক একদিন আবিষ্কার করবে ভারতীয়ত্বের নূতন দিগন্ত।

সেই দিগন্তের প্রতীক্ষায় আমি মৌনী; আমার তপোভঙ্গ করবেন না।

কিন্তু ভাবতের দিগন্ত ছাড়িয়ে আর একটি বৃহৎ দিগন্ত আছে, স্পষ্টতব ও উজ্জলতব সেই দিগন্ত মানুষের দিগন্ত, মনুষ্যত্বের দিগন্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ যদি আজ তাঁকায় গোরেশ্বরের দিকে, শিলচরের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে, তবে বেদনায় ও করুণায় সেই জাতীয়তা-উত্তীর্ণ মানুষের বুক কি ভরে উঠবে না? সেই সঙ্গে তাঁর জবুটিতে কি জেগে উঠবে না ঘৃণা ও ক্রোধ?

সে বেদনা বাঙালী কিংবা বাংলা ভাষার জন্ত নয়, সে ঘৃণা আসিয়ার আততায়ী বা সরকারের উদ্দেশ্যে নয়; সে বেদনা মনুষ্যত্বের জন্ত, সে ক্রোধ মনুষ্যত্বের শত্রু এক ক্ষীণকায় দানবের উদ্দেশ্যে—যে দানবের নাম রাষ্ট্র।

আবব্য উপস্থানের সেই কমিষ্ঠ দৈত্যের মত রাষ্ট্র একদিন মানুষের জন্তে কী না করেছিল। মানুষের সেবার

ছিল সে মতত তৎপর—যতদিন রাষ্ট্র ছিল মানুষের হাতে। তারপর মানুষকে অতিক্রম করে একদিন রাষ্ট্র তাব স্বকীয় ছুই আত্মা নিয়ে জেগে উঠল, শিকল পরিয়ে দিল মনুষ্যত্বের গলায়, মানুষের জন্ত রাষ্ট্র নয়—রাষ্ট্রের জন্ত মানুষকে হতে হল দাসে পরিণত। রাষ্ট্রদানব সেই থেকে নিরঙ্কুশ।

প্রতিবাদ উঠেছে বহুবার মানুষকে নিপীড়িত আত্মা থেকে। মার্কস ও এঙ্গেলস্‌ শুনিযেছেন ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্রের—*withering of the State*—ভবিষ্যৎদ্বাণী: তাঁদের অক্ষয় শিখকুল গুরুবাক্যের নিষ্ঠবতম অবমাননা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে বাশিয়ার ও চীনেব উচ্চ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রদানবের কুটিলতম মুখব্যাদান। আমেরিকাব একাধিক মনোবী ঘোষণা করেছেন মানবিক অধিকারের বিজয়স্বাক্ষর—*fundamental right of the individual*: তাঁদের উত্তরসূরী জন্মেছে—ম্যাককাথি ও অ্যালান ডালেস্‌ প্রমুখ রাষ্ট্রদানবের হিংস্র পুরোহিত। মহাত্মা গান্ধী—রাষ্ট্রনীতির ছুরাঙ্গাদের ইতিহাসে যিনি এক এবং অদ্বিতীয় মহাত্মা—নিয়ন্ত্রে এসেছেন সর্বোদয়ের অমৃতবাণী: তাঁর স্বদেশে তাঁরই মানসপুঞ্জের কর্ণধারত্বে রাষ্ট্রকে দেখছি বিকেন্দ্রিত হবার পবিত্র অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিত হবার উদ্বাদনায মত্ত। রাষ্ট্রদানবের কুটিল দস্ত থেকে মানুষকে, মনুষ্যত্বকে বাঁচাবে কে?

আমাদের বাল্যকালে পল্লীগ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষ নানাপ্রকার অদ্ভুত জনশ্রুতি শুনত, শোনাত এবং বিশ্বাস করত। আমবা শুনেছিলাম পদ্মা নদীর উপর দিয়ে টানা রেলপথ করার জন্ত যে সারা-ব্রিজ তৈরি হয়েছে, তার খামগুলোকে রাক্ষসী পদ্মার আক্রোশ থেকে রক্ষা করার জন্ত একশো আঁটটি নরবলি প্রয়োজন হয়েছে। হাওড়ার নতুন পুলের ভিত্তিও পত্তন হয়েছে অনেক শিশুর নিষ্পাপ ছিন্নমুণ্ডের উপবে। এই ভাবে দেশের যেখানে যত স্থাপত্যবিজ্ঞানের বিস্ময় মাথা তুলেছিল, আমবা জানতুম, তার প্রত্যেকটির সাফল্যের পিছনে বয়েছে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গুচ্ছ কৌশল—নরবলি যার *sine qua non*।

এ কাহিনীগুলোকে আমবা, পল্লীগ্রামের সংস্কারাচ্ছন্ন স্বাভাবিক বাসিন্দারা, আক্ষরিক সত্য হিসাবেই বিশ্বাস

কবেছি; প্রতীকী সত্যের রূপকার্থ বোঝার মত মানসিক ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আজ যখন মোমেব আলোব স্নিগ্ধ পবিবেশে কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের জাহ্নবী সান্নিধ্যে বসে আবৃত্তি কবি, “তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোবণ”—তখন অকস্মাৎ শিহবিত স্বায়ুর বিদ্যুৎচমকে যেন ফিবে আসে বাল্যের সেই অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার বিভীষিকা: এক একটি সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর রঞ্জিত কবে রাখা শত শত নববলির ভয়ঙ্কর কাহিনী। আমারই প্রতিবেশী কালো কালো তবঙ্গাকুল বিষখালিব সেতুবন্ধন-প্রয়োজন যদি আসে কোনদিন, আতঙ্কের দৃঢ়মুষ্টিতে মাথের আঁচল আঁকড়ে ভাবি, তবে কি আমাকেও বলি দেবে ওরা? এই সব ভাবাবহ স্মৃতি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সভ্যতার কথা, রাষ্ট্রের কথা নয়। সভ্যতার জয়তোবণকে উন্নত করার জন্ত যদি মাথা পেতে রাখতে হয় তাব ভিত্তিপ্রস্তরের নির্দয় কাঠিগে, সে মৃত্যুতে লজ্জা নেই, গোঁবব আছে; আতঙ্ক নেই, আছে আমন্ত্রণ। সেই গোঁববের ছদ্মবেশ পরে, সেই আমন্ত্রণের কপট লিপি যে-খুলে ধরে আমাদের সামনে, সে সভ্যতা নয়—রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সহস্র বলিব আয়োজন হয়; দেশান্ত্রবোধের ছলনায়, জাতীয়তাবাদের ধাপ্পায়, ‘ইজমের’ প্রতারণায় ভাষা-ধর্ম-জাত-গোষ্ঠী-পার্টি ইত্যাদিব বিপন্নতাব স্ফোগানেব জালিয়াতিতে রাষ্ট্র সেই হতভাগ্য বলির মানুষ সংগ্রহ করে অবাদে। চিরকাল এই চলেছে, উত্তরোত্তর হিংস্রতর বুদ্ধক্ষায়; কিন্তু চিবকালই কি চলবে?

বামায়ণের হয়তো বা কোন দুর্বোধ নিগূঢ়ার্থ রয়েছে; কিন্তু সোজা অর্থে সীতাকে উদ্ধাব আর সীতাকে বর্জন দুই-ই তো শ্রীরামচন্দ্রের যহৎ কর্তব্যমাত্র ছিল—রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। এবং শঙ্করের মুণ্ডচ্ছেদ? পাঞ্চালীব অবমাননার সম্মুখে বিক্ষারিতনয়ন ধর্মপুঞ্জের ক্রৈব্য আনয়ন করেছিল যে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, কুরুক্ষেত্রের অগণিত মৃত্যুও তো—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছুঁয়ে বলতে পাবি—সেই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেরই কারণে।

কিন্তু পুরাণের কথা থাক। পৌরাণিক কাহিনীতে ঘটনার চাইতে ব্যাখ্যার সংখ্যা অনেক বেশী, সংবাদের চাইতে বিসংবাদ। আসল সে যুগের রাষ্ট্র ও এ যুগের রাষ্ট্রে

মিল এতই সুস্মরকম মৌলিক যে কালীপূজার হাউই এবং গাংগারিনের রকেটের মধ্যে তার চেয়ে ঢের বেশী নিকট সম্পর্ক। পূর্বাণ ছেড়ে তাই ইতিহাসের নজিরে দৃষ্টিপাত করা যাক।

রাষ্ট্রের নিষ্ঠুরতা কেমন করে মহত্বের ছদ্মবেশ ধারণ করে, জাতীপামাব কাহিনী তাব একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মাঘের আশ্বস্ত বৃকে পরম বিশ্বাসে যুগ্মস্ত সন্তানকে পান্না আততায়ী ছুরিকাব মুখে এগিয়ে দিয়েছিল কোন্ মহত্বের আহ্বানে? সে তো মানবিক মহত্ব নয়, এমন কি সে নয় কেবলমাত্র প্রভুভক্তির তমোশুণ্যবিত দাস্তাভাব, তাব সঙ্গে ছিল রাজভক্তির সার্থকস্বত্তা। কী পৈশাচিক রাজভক্তি, কী অভিশপ্ত দেশাত্মবোধ, মাতৃয়ের উজ্জলতম সূর্যকে আচ্ছন্ন কবে দিল কী আত্মরিক রাষ্ট্র-রাহ! চারণ-গাথাব ইতিহাসে পান্নার মূঢ়তাকে আকাশচুম্বী প্রশংসার প্রচাবণা দিয়ে উজ্জল করে রাখাব প্রয়াস আছে, হতভাগিনীব অহুতপ্ত অশ্রুধারাব চিহ্ন সেখানে অহুপস্থিত। কেন না ইতিহাস তো মানুষের ইতিহাস নয়; সে যে দেশের ইতিহাস, রাজার ইতিহাস, রাজ্যের ইতিহাস, রাষ্ট্রের ইতিহাস।

পুরাণের যুগ থেকে ফিউড্যাল যুগ পর্যন্ত বাষ্ট্রের পৃথক আত্মা স্পষ্ট নয়, রাজার মধ্যেই তার প্রকাশ। রাজনীতিই রাষ্ট্রনীতি, রাজভাষাই রাষ্ট্রভাষা। দোষেগুণে রক্তমাংসের বাজা প্রকট, বাষ্ট্রের অল্পকম্পা ও উৎসাহে তাই জটিলতা ছিল কম। গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের আত্মা পৃথক হয়ে উঠল, বেড়ে গেল জটিলতা বাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূর্তি লোকচক্ষুর অদৃশ্য, বেতালের মত তার কীতিকলাপ নব নব মৃতদেহের আশ্রয়ে, আর সেইজন্তই এ যুগের রাষ্ট্র হিংস্রতায় ও পৈশাচিকতায় ভয়ঙ্কর। গণতান্ত্রিক অর্থে আমি অবশ্য কোন বিশেষ ভঙ্গীর রাষ্ট্রের কথা বলছি না, এ যুগের ডেমোক্রেটিক, নব-ডেমোক্রেটিক ও সোশ্যালিস্টিক সর্বপ্রকাব আধুনিক বাষ্ট্রকেই এককথায় গণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়েছি।

প্রবল পবাক্রম এ যুগেব বাষ্ট্র তাব মুহুমূহ কশাঘাতে ক্রীতদাস মানুষদের বিক্ষত করবেই, রাষ্ট্র ও মানুষ—এ দুয়ের peaceful co-existence অসম্ভব।

আজকের শিলচবে, কালকের গোরেখরে, পরশুর জবলপুরে এবং বিগত ও আগামী কালের শত শত ট্রাজেডিতে যদি কাউকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়, তবে গুণ্ডা কিংবা পুলিশ, রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কেন, প্রকৃত আসামী তো গুণ্ডা এবং পুলিশ এবং গভর্নেন্ট ইত্যাদি যার হাতিয়ার সেই রাষ্ট্র নামক অভিযান্ত্রিক দানব।

সমসাময়িক ঘটনাগুলিব পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধ বচনা করতে বসে আমার বাঙালী-বক্তে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, আমি তা শাস্ত করাব প্রয়াস কবেছি। চেষ্টা করেছি বাঙালী হিসাবে ঘটনাগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে বৃহত্তর কোন দৃষ্টিকোণ আবিষ্কারের। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বৃহৎ নেতৃবর্গের বক্তৃতাবলীও আমি অল্পধাবন কবেছি। কিন্তু 'ক্ষুদ্রতা'—বাঙালীত্ববোধ যদি সত্যই ক্ষুদ্রতা হয়—ত্যাগ করলে ভারতীয় হিসাবে, কেবলমাত্র ভারতের অধিবাসী হিসাবে নিজেকে চিন্তা করাও তো ক্ষুদ্রতা। সকল সম্বর্গতার উর্ধ্বে উঠতে হলে দাঁড়াতে হয় দেশের গণ্ডী পার হয়ে মনুষ্যত্বের দিগন্তে।

দাবি কবব না সর্বথা' নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে শিখেছি। তবু মনে হল, ভারতের পূর্ব সীমান্তে যে ভাষা-ভাষা বন্দ, তা যেন অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—বৃহৎ এক নাটকের একটি দৃশ্য মাত্র। কোন ভাষা, কোন জাতি বা কোন সংস্কৃতি বিপন্ন বললে সম্পূর্ণ বলা হবে না যেন, বিপন্ন হয়েছে আত্মার ভাষা, মানুষ জাতি ও মানবিক সংস্কৃতি। আর তা বিপন্ন হয়েছে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রশক্তির হাতে।

এ নাটকের বিষয়বস্তু তাই রাষ্ট্র ও মনুষ্যত্বের সংগ্রাম।

এক

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী—এই প্রশ্ন যদি কোন সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় করা হয়, তবে এই কটি উত্তর বাঙালী পরীক্ষার্থীদের খাতায় অবশ্যই দেখতে পাব : ১. রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন, ২. রাষ্ট্রীয় পূর্বস্কাবের তালিকায় বাংলা ভাষার রচিত গ্রন্থের অহুপস্থিতি; ৩. আসামে বাংলা ভাষার অধিকার বক্ষার সংগ্রাম।

উল্লিখিত ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিই বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত; তার কারণ এ নয় যে ভারতের ঘটনাস্রোতে যা কিছু উল্লেখ্য তাতেই বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক-সম্পর্ক থাকবে; এর কারণ এইমাত্র যে বর্তমান লেখক ও তার পাঠকগোষ্ঠী বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা সম্পর্কে, নেহাতই ঘটনাচক্রে, বেশী-আগ্রহশীল। কিন্তু আমার বক্তব্য, যার ইঙ্গিত রয়েছে গোড়ার ভূমিকায়, অথবা যে কোন ভারতীয় রাজ্য কিংবা অথবা যে কোন দেশ ও রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতেও সমান বিস্তৃতিতে আলোচনা করা চলতে পারত। অর্থাৎ আমার আলোচ্য ফলিত বাজনারীতি নয়, বলতে পারেন, বাস্তব দর্শন।

দুই

পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের জন্মশতাব্দী তুমুল উৎসাহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমার কাছে যা সর্বাঙ্গীণ পীড়াদায়ক লেগেছে, তা হল, এই উৎসবের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারী আয়োজন। ভারতের বাইরে, সাংস্কৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত ঢাকা নগরী থেকে শুরু করে সাগরিকা ইন্দোনেশিয়া, কর্মযোগী জাপান এবং গুণগ্রাহী ইংলও-পর্বন্ত সমস্ত পৃথিবীতেও উৎসব অল্পাধিক হয়েছে প্রধানতঃ সেই সকল স্থানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে। এ ব্যতিক্রম নেই এমন নয়, কয়েকটি উজ্জল ব্যতিক্রমে অনেকগুলি অস্থান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম মাত্র। সত্যজিৎ রায়ের আশ্চর্য ডকুমেন্টরি (এটি আমার প্রত্যক্ষদর্শন লাভ ঘটে নি সেই চিত্রশিল্পের) থেকে শুরু করে দেবকী বসুর দৃষ্টিকটু অর্থাৎ পর্বন্ত সকল প্রয়াসেবই উদ্যোগী রাষ্ট্র।

এই রকম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পীড়াদায়ক হতে না, যদি আধুনিক রাষ্ট্রের আত্মা মানবিক আত্মা থেকে এত পৃথকধর্মী না হত। মাহাত্ম্যের আত্মা আরেগ সংবেদনশীলতা প্রেম বেদনা ইত্যাদি বহু সূক্ষ্ম অল্পভূতির সঙ্গে সুপরিচিত, রাষ্ট্রের আত্মা সকল প্রকার সূক্ষ্ম অল্পভূতি থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রের আত্মা কতকগুলি বাধ্যধর্মী সূত্র অল্পভূতি পরিচালিত, তার সমগ্র অস্তিত্ব কতকগুলি কর্তব্য পালনের জন্ত এবং সেই সমগ্র কর্তব্য একখানি সংবিধান গ্রন্থে সংহিতাবদ্ধ। অতএব, রাষ্ট্রের শিল্পবোধ থাকতে

পারে না, যা থাকতে পারে তা কেবলমাত্র শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে সূত্রাভূমায়ী শুরু কর্তব্য। রাষ্ট্রের প্রধান বা তাঁর সরকারের কর্তব্যধারণ শিল্পবোধে সংবেদনশীল অবস্থাই হতে পারেন, এমন কি তাঁদের শিল্পী হতেই বা বাধা কী, কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের শিল্পাভূমায়ী জন্মায় না।

সেইজন্তই রাষ্ট্রের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন প্রতিবাদের বস্তু হওয়া উচিত। সে রাষ্ট্রের কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একান্ত শ্রদ্ধাশীল হলেও তথাপি প্রতিবাদ। রাষ্ট্রের প্রেম নেই-আব-যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখান গান নাহি জাগে। সাহিত্যিক ও অন্যান্য শিল্পী সম্পর্কে রাষ্ট্রের যা আছে তা হচ্ছে প্রয়োজন ও কর্তব্য; কর্তব্যের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনের কর্তব্য।

ডক্টর জিভাগো-কার প্যাস্টারনাকের কথা স্মরণ করুন। স্বল্পপঠিত ও বহুল-আলোচিত এই সাহিত্যশিল্পী (আসলে কবি) কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির লাইমলাইটে আসতে বাধ্য হলেন এবং অল্প একটি রাষ্ট্রের বিপরীত প্রয়োজনে স্বদেশে নিষিদ্ধ ও স্বজনত্যাগ হলেন। নীতাউদ্ধার আর নীতাবর্জন যেমন বামচক্রের রাজকর্তব্য ছিল, প্যাস্টারনাকেরও তেমনি পুনরুদ্ধার ও তিরস্কার বাম এবং-বাম দুইটি পৃথক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথকেও তিব্বত করার প্রয়োজন যদি রাষ্ট্রের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সে তাতে পেছপাও হবে না; তাঁর নর্থ, উত্তরসূরী আমাদের, সৌভাগ্য শুধু এই যে তেমনতর প্রয়োজন কোনও রাষ্ট্রেরই আসে নি, আশা করি আসবেও না। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব। রাষ্ট্রের কুটিল দস্তকে তিনি শিল্পীর অস্ত্রে জয় করেছেন। কিন্তু তাই বলে যে অস্থানের পেছনে অল্পভূতি নেই, শ্রদ্ধা নেই, প্রেম নেই, নিষ্ঠা নেই, তেমন ভণ্ড অস্থান রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে হতে কেন দেব আমরা?

দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য তিব্বত সৃষ্টি প্রয়োজন দেখি না, তবু একটি উদাহরণ দিই। রেভিয়োতে রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী বিবৃত হচ্ছিল আবৃত্তি ও সঙ্গীত সহযোগে। ‘বলাক’ কাব্যগ্রন্থের যুগ আলোচনা প্রসঙ্গে সূত্রধার বললেন, “এই সময়ে একদিন কবির চোখে পড়ল কাদম্বরী দেবীর একখানি ছবি। কবি লিখলেন—

তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা ?” ইত্যাদি।
আবৃত্তি যখন এই পর্দায়—“মোর চক্ষে এ নিখিলে দিকে
দিকে তুমিই লিখিলে রূপের তুলিকা ধরি বসেব মুরতি,”
তখন সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ আবৃত্তিকার বদলে ফেললেন
কবিতাটি ; ওই পংক্তি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে একটি নিঃশ্বাস
পতনের স্মৃতিমাত্র না দিয়ে তিনি থিয়েটারি আবেগে
বলে গেলেন—

“হে সন্নাট কবি,
এই তব জন্মের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত
...চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিষা—
ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।”

কাদম্বরী দেবীর বিষয়-প্রসঙ্গ ও “সাজাহান” কবিতার সেই
বিশেষ কয়টি পংক্তি বিশেষ উদ্দীপ্তিতে আবৃত্তির একটি মাত্র
অসমুদেষ্টা থাকাই সম্ভব। জানি না, তা কতদূর সিদ্ধ
হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে এর জন্ত আমি রাষ্ট্রকে দোষারোপ
করছি কেন ? দোষারোপ এই জন্ত, প্রবল পবাক্রম
রাষ্ট্রের ইচ্ছাপূরণের জন্ত ও তার অল্পকম্পা লাভের
উদ্দেশ্যে অক্ষম-ব্যক্তিগণ এই রকম অহুষ্ঠানের অধিকার
লাভ করে, ফলে শ্রদ্ধার্থের নামে এই সব অদ্ভুত কাণ্ড
ঘটে থাকে। ‘অর্থ’ নামক চলচ্চিত্রে “পূজাবিলী” লিখতে
বর্ণাশুদ্ধি ঘটেছিল শুনেছি ; এতেও রাষ্ট্রের অপরাধ
এই যে, যেহেতু রাষ্ট্র প্রয়োজনের খাতিরে শ্রদ্ধাহীন হয়ে
শ্রদ্ধা নিবেদনের ভান কবে, সেইজন্য অধিকারী-অনধিকারী
ভেদ করা সে নিষ্প্রয়োজন বোধ করে।

সত্যকার শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির কি এমন মতিভ্রম অসম্ভব ?
অসম্ভব হয়তো নয়। কিন্তু শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি, যার মানবিক
আত্মা আছে, এমন কোন অপরাধ কবলে অহুতপ্ত হত,
প্রায়শ্চিত্ত করত, হয়তো অপরাধের মাত্রাধিক্য ঘটলে
সে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে পড়ত আত্মহত্যার মত প্রচণ্ড—যা
সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্রাইম, কিন্তু শিল্পীর পক্ষে যা
স্বাভাবিক। রাষ্ট্র কি পাবে অহুতাপ করতে, প্রায়শ্চিত্ত
করতে, প্রয়োজন হলে আত্মহত্যা করতে ? পারে না,
কারণ রাষ্ট্রের মানবিক আত্মা নেই।

যার মানবিক আত্মা নেই, মহামানবকে শ্রদ্ধা
নিবেদনে তার একান্ত অনধিকার।

ভিন্ন

বাংলা ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ উত্তম সাহিত্য বলে
বিবেচিত হয়ে বাঙালী পুস্তকপায় পাণ্ডিত্য, এ সংবাদে আমি
আনন্দিত হয়েছিলাম।

আনন্দিত হয়েছিলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম
বাঙালী, বিশেষতঃ বাঙালী সাহিত্যিকের মত
আত্মাভিমানী জাত এই আঘাতে উপকৃত হবে। রাষ্ট্রীয়
পুস্তকপায় প্রত্যাশা কবার চরম অবমাননা আর সে
মাথা পেতে নেবে না। তারা একযোগে রাষ্ট্রকে জানিয়ে
দেবে যে ভবিষ্যতে কোনও বাঙালী গ্রন্থকার আর রাষ্ট্রীয়
পুরস্কার ও প্রশংসা গ্রহণ কবতে স্বীকৃত হবে না। এবং
যেহেতু ভারতে, অস্তুতঃ উত্তর-ভারতে, বঙ্গ-সাহিত্য
সকল ভাষার সাহিত্যের অগ্রজ, সেইজন্য কালক্রমে
অন্যান্য ভাষাভাষী সকল ভারতীয় সাহিত্যিকের যৌথ
প্রতিবাদে সাহিত্যেব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিরুদ্ধ হবে।

কিন্তু আমার আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হল। অচিরেই
জানলাম, বাঙালী সাহিত্যিককুল ক্ষুদ্র হয়েছেন বটে
কিন্তু সেই ক্ষোভ সমুচিত পথে না গিয়ে বক্রগামী হয়েছে।
তারা পরবর্তীবার পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় তদ্বির শুরু
করেছেন এবং কেউ বা রাষ্ট্রীয় খেতাবের তকমা এঁটে
কৃতার্থ বোধ করছেন। এতে আমি ব্যথিত হয়েছি ;
এবং ব্যথিত চিন্তে মনে হয়েছে এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য
স্পষ্টোক্তিতে ঘোষণা করার প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনকালে যখন সাহিত্যিক বলতে একমাত্র কবি
ছিলেন, তখন কাব্যচর্চায় রাজকবিব একটি বিশেষ স্থান
ছিল। তাঁকে মাঝে মাঝে রাজস্বত্বের সন্মত রচনা
কবতে হত এবং তার বিনিময়ে তিনি জীবিকানির্বাহের
গণ্যমণ্য কর্তব্যেব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতেন ; অথবা কি
মালিনীতে বিশ্বাসের স্ততিগীতে দুটি একটি ছোটখাটো
পুথি রচনায তাঁর বিদ্বৎ দৃষ্টি না।

কিন্তু এখন দিন বদলেছে ; নির্বিঘ্ন কাব্যচর্চায় জন্মে
রাজকবি হওয়া আর তেমন অপরিহার্য নয়। দুঃভাগ
না হোক ভালভাভের সংস্থান হতে পারে শুধু সাহিত্যের
সেবা কবেই, রাজ্য সেবা করার আর তেমন
প্রয়োজন দেখি না। তা ছাড়া অন্নের সংস্থানই যার
হয় নি তেমন কবির পক্ষে এ যুগের নিবাকার রাজ্য

সন্দর্শনই বা হবে কী করে? এই কাঞ্চন-কৌলীন্তের যুগে? মলিনমুখ উপবাসী কবিকে দেখে এ যুগের রাষ্ট্র তো কখনই বলবে না—বসিয়া কে ওই, এস তো মল্লী সন্ধান লই। অতএব এ যুগের সাহিত্যিকের রাজকবি হবার কোন জরুরী প্রয়োজন নেই।

এ যুগের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের তুচ্ছ এসেছে অল্প কারণে। সাহিত্যিক স্বভাবতঃ আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু যুগের চরিত্র-বশতঃ এ যুগের সাহিত্যিকও অংশতঃ প্রচারধর্মী। একালে কোন ভক্ত কবির কুটির-প্রান্তে গিয়ে তাঁর কাব্য-আত্মদানের স্বযোগ প্রার্থনা করবে না; সে যাবে কলেজ স্ট্রিটের দোকানে, নগদ মূল্য আড়াই টাকা দিয়ে কিনে আনবে প্রিয় কবির সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। অর্থাৎ কবির সকাশে পাঠক নয়, পাঠকের বাড়ি বাড়ি কবিকে (কবি বলতে সাহিত্যিকমাত্রকেই বোঝাচ্ছি) ঘুরে বেড়াতে হবে—প্রকাশক, মুদ্রক ও দপ্তরির ঘোষ দোত্যা-মারফত। এবং এই বিপরীত অভিনায়ে কিঞ্চিৎ প্রসাধনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্তি হচ্ছে প্রসাধনকুল-শিবোমণি। সাহিত্যিকদের এই যুগধর্মী দুর্বলতাটুকু পাঠকগণ আশা করি মার্জনার চক্ষেই দেখে থাকেন, নতুবা পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় প্রেরিত পুস্তকের পাঠক-সংখ্যা হ্রাস পেত।

কিন্তু রাষ্ট্রই এই দৃষ্টিকে সাহিত্যিক স্বীকৃতি দেবে কেন? সাহিত্যসৃষ্টির বিচারক স্বয়ং মহাকাল—সমগ্র পৃথিবী তাঁর বিচারবালা এবং বিচারের কালব্যাপ্তি নিরবধি কাল।

সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে রাষ্ট্রের অধিকারের সীমা হওয়া উচিত ন্যূনতম। সে অধিকার নির্বোধ ওদাসীন্তের, তার চেয়ে বেশী নয়। শিল্পচর্চায় উৎসাহদানের অভিপ্রায় যদি সত্যি রাষ্ট্রের হয়ে থাকে, তবে বিচারাসন থেকে নীচে নেমে আসতে হবে তাকে। বিচারক নয়, নির্বিচার ভক্তের পর্যায়ে নেমে বাস্তু যদি সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায় করুক। সাহিত্যিকদের নিজস্ব সংস্কার বিবেচনায় যে-কোন ব্যক্তি সার্থক সাহিত্যস্রষ্টা বলে বিবেচিত হবেন তাঁরই গ্রন্থপ্রকাশে রাষ্ট্র অর্থ-নিয়োগ করুক; শিল্পীর চিত্রশিল্প ক্রয় করুক উপযুক্ত কাঞ্চন-মূল্যে। তার বেশী নয়; আপেক্ষিক মূল্য বিচারের অনধিকার-চর্চা রাষ্ট্রের মানায় না।

এই অনধিকার-চর্চাব নিষ্প্রতিবাদ প্রচলনের সর্বাধিক কুফল হয়েছে, একাধিক সার্থক সাহিত্যস্রষ্টা শিল্পীর স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। রেডিয়োতে একাধিকবার সর্ব-ভারতীয় কবি-সম্মেলনের অনুষ্ঠান আমি শুনেছি; শুনেছি উদ্ভব-ভারতের অনেক কবি (অবশ্যই তাঁরা প্রতিভাবান না হোন, দক্ষ কবি) কাব্যপাঠের নামে রাষ্ট্রের স্তুতিবাদ, সরকারের স্তাবকতা এবং পঞ্চবার্ষিকী যোজনার ঢকানিনাদ

শোনাচ্ছেন। সরকার, রাষ্ট্র এবং তাদের কার্যকলাপের প্রশংসায় আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকত না যদি সে প্রশংসা সত্যি স্বতঃ-উৎসারিত কাব্যরূপে ফুটে উঠত; দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সেই সকল তথাকথিত কাব্যের অধিকাংশই (‘অধিকাংশ’ বিশেষণটি আমি স্বাভাবিক নম্রতাবশতঃ ব্যবহার কবছি।) মিল, ছন্দ, অলঙ্কার ও ইনসিগনিস্যারিটি ছিল, কাব্য ছিল না। বাঙালী কবিদের রচিত কাব্যে বাস্তুই প্রকাশ্য স্তুতি তেমনতর প্রকট হয়ে উঠতে আমি শুনি নি, কিন্তু জনশ্রুতি শুনেছি বুদ্ধিমান বাঙালী তাব স্তুতিবাদগুলি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত না করে আরও ভালভাবে প্রকাশ কবাব কৌশল নাকি আয়ত্ত কবেছেন। জনশ্রুতিটি মিথ্যা হলে খুশী হব কিন্তু সত্য হলে বিস্মিত হব না। শিল্পীমাত্রই যখন সংবেদনশীল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অল্পভূতসমূহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-আশ্রয়ী বড়-রিপুর—যাব একটি লোভ—সম্পর্ক যখন নিবিড়।

আধুনিক রাষ্ট্র সকলকেই নীতিচ্যুত কবে, শিল্পীকেও। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেই নীতিচ্যুতির প্রধান অস্ত্র। আর শিল্পীর নীতি তো শিল্পনীতি, তা থেকে বিচ্যুত হওয়া অর্থ শিল্পীর অপমৃত্যু।

এ বছর বাঙালী সাহিত্যিকদের উপর থেকে বাস্তু সেই মারণাস্ত্র সংবরণ করেছে। এই স্বযোগে বাঙালীর সাহিত্য-সৃষ্টি সার্থকতার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাক, রবীন্দ্র-শতাব্দী পরিপূর্তির লগ্নে এর চেয়ে শুভকামনা আব কী করতে পারি আমরা?

চার

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে যে কথা বলেছি, ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে ভাষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্তব্য ও অনধিকার-চর্চাব বিষয়েও অল্পরূপে কথা বলা উচিত। অর্থাৎ কর্তব্য—অহস্তক্ষেপ, এবং বস্তুতঃ কবা হচ্ছে—অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ।

ইংরেজী official language কথাটির তর্জমা হিসাবে যেদিন রাষ্ট্রভাষা শব্দটির প্রাচুর্য্য হল, সেইদিনই বুঝছি আমাদের কপাল পুড়ল।

রাষ্ট্রদানবের পূজার উপর ভিত্তি করে যে মানবতা-বিরোধী ধর্ম (যার নাম কোথাও ডেমোক্রেসি, কোথাও বা কম্যুনিজম) একালে প্রবর্তিত হয়েছে, সকল পুরাতন ধর্মের মতই সে ধর্মেরও বিভিন্ন টোটেম এবং রিটুয়াল আছে। (ইংরেজী শব্দগুলি নিরূপায় হয়ে ব্যবহার করছি, বাংলা প্রতিশব্দের পৃথক ব্যাখ্যায় ভুল অর্থবোধ হবার আশঙ্কা আছে; বস্তুতঃ ধর্ম শব্দটিও এখানে রিলিজিয়ন অর্থে ব্যবহৃত—রবীন্দ্রনাথ যে বৃহৎ অর্থে ধর্ম বলেছেন, সে অর্থ আমার অনভিপ্রেত।) বাস্তুপতি, বাস্তুীয় পতাকা, রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত ইত্যাদি ‘বাস্তু’ বা ‘বাস্তুীয়’ বিশেষণযুক্ত

বস্তুগুলি সেই নূতন রাষ্ট্রধর্মের প্রতীক ; এবং এদের প্রতি তর্কাতীত শ্রদ্ধাগুলি দান সেই ধর্মের রিটুয়াল। বলা প্রয়োজন, পুর্বাতন ধর্মসকল যতক্ষণ মন্দির-মসজিদ-গির্জা ইত্যাদি মধ্যে এবং বিশ্বাসী ভক্তগণের ব্যক্তিগত আশ্রয়ে প্রভাব বিস্তার কবছে, যতক্ষণ সে ধর্ম রোমান চার্চের মত সর্বভূক মূর্তি ধারণ না কবছে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে আমাব যেমন কোনও অভিযোগ নেই, নূতন ধর্মও তেমনি যতক্ষণ আমার নিবিবোধ জীবনযাত্রাব নিজস্ব রুচিব উপব আঘাত না করছে ততক্ষণ তাকে আমি সহ্য করতে প্রস্তুত। এমন কি, সামাজিক ঐক্যের খাতিরে যেমন আমি বিজয়ার কোলাহুলি করি (অত্যন্ত অনিচ্ছাকে প্রাণপণে দমন করে), তেমনি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের খাতিরে রাষ্ট্রপতিকে প্রশিপাত করতে, রাষ্ট্রীয় পতাকাকে অভিবাদন করতে ও জনগণমন সঙ্গীতের ধ্বনি কানে যাওয়ামাত্র নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এই রিটুয়ালগুলি নিঃসন্দেহে অহিংস।

কিন্তু অধিপতি, পতাকা ও সঙ্গীত (বিশেষতঃ ‘জনগণমন-অধিনায়ক’-ব-মত উদাত্ত সঙ্গীত, যা ধ্বনি-গান্ধীর্ষে ও অর্থব্যঞ্জনায় মাহুঘের মাথা আগনি হুইয়ে দেয়) এই সকল প্রতীক আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করতে আসে না। কিন্তু ভাষা? ভাষা তো কেবল চিন্তার বাহন নয়, আজকের মাহুঘের ভাষা যে অনেকাংশে চিন্তাব লষ্টাও। চিন্তাকে শুধু ভাষায় প্রকাশ কবি বললে অর্ধসত্য বলব, সজ্ঞান চিন্তার অতীত আমার সমগ্র অবচেতন মন যে ভাষা-আশ্রয়ী। আমাব পূর্ব-পুরুষের সকল চিন্তা-কর্ম-সাধনা ভাষার মাধ্যমে জড়িয়ে আছে আমার স্মৃতি ও বিশ্বাসিততে। ভাষা অর্থ ঐতিহ্য, ভাষা অর্থ সংস্কৃতি। যে অর্থে শব্দ ব্রহ্ম, সেই অর্থে ভাষা আমার আত্মার আত্মা। ভাষাকে নিয়ে, কোন একটি বিশেষ ভাষাকে নিয়ে, রাষ্ট্রধর্মের প্রতীক করে রাখলে আমার সাধ্য কি তাকে বিমূঢ় কুনিশে অভিবাদন করি।

Official language একেবারে অস্ত্র কথা। আসলে ইংলণ্ডেই কি official ভাষা ইংরেজি নাকি? সে তো এক বিশেষ ভঙ্গীত Queen’s English, যে ভাষায় শুধু সরকারী দপ্তর চলে; কোন ইংরেজ, এমন কি স্বয়ং কুইন যে ভাষায় অবশ্যই বাক্যালাপ করেন না। এই এখনই এদেশে অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে যে ইংরেজি চলছে, ইংবেজিতে পণ্ডিত হলেই কি সে ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মায়? সেই সব with reference to, draft may issue, p. u. d. be filed, ইত্যাদির অর্থ কে বুঝবে বাহু কেরানী ছাড়া? আদালতের অসংখ্য ল্যাটিন-কটকিত জজিয়তির ইংরেজি জজ আর উকিল ছাড়া কারও বোঝবার দরকার কী?

অফিসিয়াল ভাষা তাই বা-ইচ্ছে-তাই হোক, হিন্দি

কিংবা উর্দু কিংবা হিন্দুস্তানি (এ তিনটিব মধ্যে কী যে পার্থক্য কে জানে!)—অফিসে যারা কাজ করছে তারা ছাড়া অগ্রদেব তত শিবঃপীড়ার কারণ দেখি না, কিন্তু তাকে বাষ্ট্রভাষা নাম দিলে আশঙ্কার কারণ হয়ে পড়ে।

আব আশঙ্কার কারণ একবার যখন ঘটেছে তখন আর নায পালটে দিলেও ভবসা ফিরে আসে কই? বাজ্যে রাজ্যে বাষ্ট্রভাষা নিয়ে, কিংবা বলুন তাকে রাজ্যভাষা, তাই এত কলহ-অশ্রু-বক্তপাত। তামিলনাদে হিন্দির বিরুদ্ধে, জলন্ধরে পাঞ্জাবীর বিরুদ্ধে, দার্জিলিঙে বাংলার বিরুদ্ধে, কাছাড়ে অসমীয়ার বিরুদ্ধে তাই এত বিক্ষোভ। শুধু দপ্তরের ভাষা হলে এত বিমূঢ় কোলাহল বুঝি উঠত না।

কিন্তু না, দপ্তরের ভাষা নিয়েও আজ কোলাহল উঠবে, মৃত্যু ঘটবে। কেন না, রাষ্ট্র রক্তপিপাসু; ভাষার সঙ্গে ভাষাব বিবোধ, রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের বিবোধ রাষ্ট্রের প্রয়োজন। নইলে ভাষা যদি সংস্কৃতি তবে সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধের অবকাশ কোথায়? বাষ্ট্র চায়—প্রবল পবাক্রম আধুনিক রাষ্ট্রদানব চায়—মাহুঘের সংস্কৃতিব উপর তার আধিপত্য; বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিবোধ না ঘটলে সহজে মেলে না সেই আধিপত্য।

ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় অসমীয়াভাষী সংখ্যাগুরু, জ্বরমা-ববাক উপত্যকায় বঙ্গভাষী, পর্বতে পার্বত্যজাতি। অথচ বহুপ্রশংসিত পন্থ-ফর্মুলার সমাধান—আসামের রাজ্যভাষা হবে অসমীয়া-ইংবেজী-হিন্দি; অসমীয়া ও বাংলা, অসমীয়া ও পার্বত্য কিংবা বাংলা ও পার্বত্য নয়। পুনরুক্তি করছি, হিন্দির বিরুদ্ধে আমার বিদেঘ নেই; বিদেঘ হিন্দির (বা অস্ত্র যে কোন ভাষাব, বাংলা ভাষাকেও বাদ দিয়ে নয়) মাধ্যমে রাষ্ট্রের আধিপত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রসার-প্রয়াসের বিরুদ্ধে।

কিন্তু এ যদি শুধু দপ্তরের ভাষা, তবে তাকে নিয়ে এত তিক্ততা কেন? তিক্ততা এইজন্ত যে রাষ্ট্রীয় দপ্তরের আয়তন প্রত্যহ এতই ক্রমবর্ধমান যে, মনে হওয়া বিচিহ্ন নয়, অচিরেই দেশের চাইতে দপ্তর বৃহত্তর হয়ে উঠবে। বিচারালয়-পুলিস-রাজস্ব এই নিয়ে এদেশে রাষ্ট্রীয় দপ্তরের যেদিন পত্তন হয়েছিল, ইংরেজ বাজত্বের সেই প্রথম যুগে নাকি দপ্তরের ভাষা ছিল ফারসি; তা নিয়ে তেমন কোন আপত্তি কারও হয় নি। কিন্তু আজকে কিলের দপ্তর নেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে? বাণিজ্যের দপ্তর, কৃষির দপ্তর (তাতে আবার আলু এবং পেঁয়াজের দপ্তর পৃথক!), শিক্ষার দপ্তর, স্বাস্থ্যের দপ্তর এ সব তো আছেই, লোকরঞ্জন দপ্তর আছে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দপ্তর আছে, আছে ভরতনাট্যম্ ও কথাকলির ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর, সাহিত্য এবং নাটক, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি—হেন বিষয় নেই যার জন্ত রাষ্ট্রীয় দপ্তরের পত্তন না হয়েছে। ফলে দপ্তরের চাকুরিজীবীর সংখ্যা

হয়েছে-অগণ্য (এ দেশের নিয়োগকর্তাদের মধ্যে-বাষ্ট্র শুধু বৃহত্তম নয়; অচিরে একতম হবার লক্ষণ এখনই প্রকট) এবং মণ্ডরের ভাষায় জ্ঞানের বাড়তি-কমতির উপর মানুষের অবস্থান নির্ভর করছে। ভাষা নিয়ে সংগ্রাম তাই অনেকের কাছে জীবন-মরণের সংগ্রাম।

সে কথা রাষ্ট্র জানে। এবং জানে বলেই ভাষা-সমস্তার সমাধান রাষ্ট্র খেঁচায় করে না।

পাঁচ

এই নাটকের ভিলেন হিসাবে আমি রাষ্ট্রকে দাঁড় করিয়েছি, সরকারকে নয়। সরকার যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী হচ্ছে রাষ্ট্র। এবং রাষ্ট্র বলতে ভারতীয় রাষ্ট্র নয়, দেশের সীমানা-ছাড়ানো রাষ্ট্র নামক অতিকায় দানবই আমার ভিলেন।

আব সেই নাটকের হীরো হচ্ছে মানুষ। নাটকই বা বলি কেন, এ হল মহাকাব্য। চিরকালের মহাকাব্যে মহানায়ক মানুষ; তার অঙ্কে-অঙ্কে সর্গে-সর্গে ভিলেন পরিবর্তিত হয়, নায়ক থাকে অপরিবর্তিত। একদিন ভিলেন ছিল প্রকৃতি, বিজিত হয়ে নায়িকার রূপ ধরে এল সে পরবর্তী যুগে। এ যুগে-নাটকের এই পঞ্চমাস্ত্রে, মহাকাব্যের এই সপ্তম সর্গে, রাষ্ট্র হয়েছে ভিলেন।

কত রকম তার কূটকৌশল। মানুষকে সে শিথিয়েছে বাজনারতির অপরা বিজ্ঞ। তাকে লুপ্ত কবেছে ক্ষমতাব মদিরা পানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ডেকে এনেছে নির্বাচন, গৃহযুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের দ্যুতক্রীড়ার আসরে। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা ও আঘাত-প্রত্যাঘাত; কিন্তু এহ বাহু, প্রকৃত হানাহানি বাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের—যে হানাহানির বিরতি নেই, সন্ধি নেই, নেই কোন আপোস। সেই প্রকৃত যুদ্ধে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী বিবোধী মেন্তা থেকে শুরু করে দীনতম প্রজা-পর্বস্ত সকলে এক শিবিরে—সে যে মানুষের শিবির; 'দুর্ভাগ্য শুধু এই' যে একই শিবিরের অধিবাসী আমরা পরস্পরকে চিনি না, বন্ধুকে শত্রুজ্ঞানে অসুয়া করি। কেন না, রাষ্ট্রের চক্রান্তে মানুষের মানুষ পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে ধর্মের আড়ালে; ভাষার আড়ালে, শ্রেণী-দল-গোষ্ঠী ইত্যাদি পরিচয়ের তুচ্ছতার আড়ালে। রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করতে চাই আমরা প্রত্যেকে অপর

প্রত্যেককে বঞ্চিত করে। জানি না যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা মানুষ অধিকার করতে পারে না; পিশাচ-সিদ্ধ হওয়া অর্থ পিশাচের ক্রীতদাস হওয়া। পরন্তু রাষ্ট্র আমাদের আত্মাকে অধিকার করে—ডাকুলা যেমন করে মানুষের আত্মা অধিকার করত রক্তলুপ্ত হিংস্রতায়।

রাষ্ট্রদানবের মারাত্মক দাবাখেলার একটি অধ্যায় চলেছে আমাদের। বাংলা ভাষা বনাম অসমীয়া, অসমীয়া বনাম পার্বত্যজাতি; তারপর কাছাড় বনাম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, আবাব কাছাড়ী হিন্দু বনাম কাছাড়ী মুসলমান, বেঙ্গ বনাম রাজ্য, রাজ্য বনাম জিলা, জিলা বনাম মহকুমা; অর্থাৎ মানুষ বনাম মানুষ। কে জিতবে এলড়াইয়ে? কেউ না, শুধু রাষ্ট্র। কেন না, যে জিতবে—সেই তো রাষ্ট্র, অর্থাৎ তারই আত্মাকে অধিকার করবে রাষ্ট্র নামক বেতাল।

মারাত্মক এই খেলা তো আজকে আরম্ভ হয় নি। শ্রীহট্টের মানুষ একদিন আমাদের অধিপতি হয়েছিল, ব্রহ্মপুত্রের মানুষ শ্রীহট্টকে একদিন ছুঁড়ে ফেলল আসাম থেকে বাইরে—ভাবত থেকে বাইরে। সেই কৃতঘ্নতা-প্রতিকৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা-প্রতিবিশ্বাসঘাতকতার দাবাখেলা আজও চলেছে আমাদের। এবং শুধুই কি আমাদের—অশ্রদ্ধ নয়?

মানুষের মর্মস্থল অসংখ্য। ধর্মের নামে সে উন্মাদ হয়; ধর্ম নামক মর্মস্থলে আঘাত দিয়ে রাষ্ট্র একদিন পাকিস্তানের খেলা খেলেছে, সম্পদ স্তম্ভ গৃহ ও প্রাণ-বিসর্জন দিতে হয়েছে অগণিত মানুষকে। ভাষার নামে সে উন্মাদ হয়; ভাষা নামক মর্মস্থলে আঘাত দিয়ে রাষ্ট্র আবার নতুন খেলা খেলেছে। এবার মানুষ মৃত্যু-উত্তীর্ণ হোক। বলুক, মর্মস্থলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিরুদ্ধ কর। ধর্ম নিয়ে, ভাষা নিয়ে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে রাষ্ট্রের দ্যুতক্রীড়া সহ্য করব না।

কিন্তু সে তো হবার নয়। রাষ্ট্র স্থাপ্ত থাকতে পারে না; তার হস্তক্ষেপের সীমা ক্রমশঃ বেড়ে চলে বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে, মর্ম থেকে কোমলতর মর্মে। মানুষ সহ্য করে, মানুষ জীবন উৎসর্গ করে, মানুষ আত্মা বিক্রয় করে। বিনিময়ে হয় পিশাচসিদ্ধ, অর্থাৎ রাষ্ট্র-ক্ষমতার ক্ষণস্থায়ী অধিকারী।

কিন্তু মানুষ কী পায়?

নীলিম্‌কুমার

“বনফুল”

শিলচবেতে চলছে গুলি
খবর শুমছি বেতারে
একটু পরেই শুমব ইমন
গৎ বাজবে সেতারে,
হুপুরবেলা লম্বা ঘুমে
কাটবে দিবা স্বপন-চুম্বে
বিকেলবেলা সিনেমাতে
দেখে আসব ‘নাস্তিক’
কমলবানী দেখতে ভালো
এবং ভালো গান্ধিকা।

শিলচবেতে চলছে গুলি
ফাটল বুঝি ফোড়াটা
তার চাইতে ভালো খবর
‘বেস’ জিতেছে ঘোড়াটা,
মহানন্দে দাড়ি কামাই
বাংলা নিয়ে মাথা ঘামাই
এমন মাথা শ্রীভগবান
দেন নি আমার ধড়েতে
বদন থেকে একটি কথাও
বেরোয় না সাত চড়েতে।

যা শুনি সব হজম কবি
চুপটি করে রই শুনে
দিবস এবং রাত্রি কাটে
আহার নিদ্রা মৈথুনে।
বলি বটে বাংলা বুলি
কিন্তু বাবা গোলাগুলি
তার সামনে এগিয়ে যাব
নইকো তত মূখ্য তো
এই কথাটা বুঝে না কেউ
এইটে আমার দুঃখ তো।

দেশের ষত হোমবা-চোমরা
দেখছ নাকো কবছে কি?
গোলাগুলির সামনে গিয়ে
একটি জ্বনও মবছে কি!
ঠাণ্ডা ঘরে বসে বসে
গবম বুলি ছাডছে কবে
সাথে সবাই খাতির করে!
কত রকম ভোল জানে
দেখিয়ে নানা কেরামতি
নিজের কোলে ঝোল টানে।

তোরাও বাপু তাই কব না
মবে গিয়ে ফয়দা কি,
প্রাণের ময়ান ঢালবি কোথা
ওরা কলের ময়দা কি!
পায়ের উপর জিত জুবড়ে
পড়তে হবে মুখ খুবড়ে
তবেই দাছ বাঁচতে পাবি
নইলে জুজু ধরবে যে
স্বাধীন দেশে বাঁচতে পেলে
চোদ্দপুরুষ তরবে যে।

আমার দিকে দেখ না চেয়ে
রঙটি আমাব টুকটুকে
নাছস-ছছস শরীবখানি
তেলেজলে চুকচুকে।
নামটি আমার নীলিম্‌কুমার
আকাজ্জা নেই ভূমার-টুমার
চাই যে শুধু খোঁচা চুলকে
লতার মতন নামাতে
এবং কতু ভুলি নাকো
সকাল বিকাল কামাতে।

কবন্ধ-বন্দনা

“বনফুল”

১

যে মস্তক নাই তব সে মস্তক কবেছ বিক্রয়
 শুনিতেছি লোকমুখে,—জাগিতেছে পরম বিষয়।
 মস্তক তো নাই বন্ধ, সে বালাই কবে গেছে চুকে
 মনে হয় বহুকাল দাঁড়াও নি মর্পণ-সমুখে।
 সে ছিন্ন মস্তক তব থেয়ে গেছে শকুন শেখাল,
 কোকেনে বিহ্বল ছিলে, তাই তত কর নি খেয়াল।
 বহু পূর্বে ওরা তব করিয়াছে মস্তক-হরণ
 দিয়া নব-কোকেনেব অপক্লপ স্মৃতিকাভরণ
 বখ্শিশ বাহার নাম,—আসলে যা তীক্ষ্ণ ‘গিলোটিন’
 রূপবন্ধ মূঢ়জনে অকস্মাৎ করে মুণ্ডহীন।
 স্মরণে মাথা লয়ে চলিবে না আর ব্যবসায়
 মস্তক ব্যাপারে বন্ধ, তুমি আজ দেউলিয়া হায়।
 তবু আজ মনে পড়ে, হে কবন্ধ, ভূতপূর্ব বীর,
 একদা আছিল তব কি বলিষ্ঠ সমুন্নত শির।

২

আজ তুমি কি বীভৎস, কি করুণ, কত হাস্যকর,
 হে কবন্ধ ;—মহিমার শ্মশানেতে প্রেত ভয়ঙ্কর।
 একদিন ছিল যাহা সপ্ত-স্বর মনোরমা বীণা,
 আজ তাহা ছিন্ন-তন্ত্রী ; বক্ষে বহি মঞ্জবী নবীন।
 ছিল যাহা পুষ্পপাত্র, আজ তাহা ঘৃণ্য ‘ডাস্টবিন’!
 অসঙ্কোচে বহিতেছে প্রভুদের উচ্ছিষ্ট মলিন
 জঘন্ত জঞ্জালভার, অতি তুচ্ছ ছিন্ন পাতুকারে
 মগোরবে আছে বক্ষে চাপি, পুরীষে গুচ্চারে
 ভাবিতেছে রাজ-ভোগ বৃষ্টি। রাজপুত্র যুধিষ্ঠির,
 চাটুকাব কঙ্ক হযে কার পাষে বিকিয়েছ শির ?
 কাক-তাদুয়াব শিরে আন্দোলিত কেলে ইাড়িটাবে
 মস্তক ভাবিবে কেহ ? হেন মূর্খ আছে কি সংসারে ?
 তোমারে কবাবে শ্রদ্ধা নাই বন্ধ নাই হেন জনও
 সবচেয়ে মর্মান্তিক তুমি তাহা বোঝ নি এখনও।

তবু

শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক

চারিদিকে লেগেছে আগুন,—
 দলাদলি, হানাহানি,
 স্বার্থ আব লোভ আর ক্ষুধা আব
 পশুত্ব—প্রভুত্বের আত্মঘাতী কি সংগ্রাম।

মানুষ মানুষে মারে
 মানবতা কাদে রুদ্ধশ্বাস,
 হত্যার ধুমাস্ত বাস্পে
 মসীলিপ্ত পৃথিবীর সমস্ত আকাশ।

ভারাক্রান্ত দেহের মনের
 তবু এক কোণে
 জেগে থাকে বৃষ্টি,
 গত্য আর স্তম্ভের বীজ।

রোজ তাই
 লতা-ঘেরা ক্ষুদ্র এই বাতায়নে
 অন্ধকারে নিভুতে নির্জনে,
 দিনান্তেব মন-ভাঙা
 প্রাণ-ভাঙা স্বপ্ন-ভাঙা খাটুমির শেষে,
 জালিয়াছি প্রাণেব প্রদীপ,
 অতি ক্ষীণ আলোকে তাহার
 দেখেছি তোমার মুখ,
 কখনও বা কোনদিন
 ধরিয়া তোমার হাত
 দক্ষিণা বাতাসে প্রিয় মেলে দিই প্রাণ,
 যদিও ক্ষণেক ;—
 তবু মন ভরি গাই
 সত্য আর স্তম্ভের গান।

রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্য-সাধন

শ্রীত্ৰিপুবাশঙ্কর সেন

চিন্তা বা ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে বাঙালী চিরদিনই বিপ্লবী। এই বিপ্লবের প্রকাশ ঘটানোছে বাংলার তান্ত্রিক ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও বাউলের সাধনায়। বাংলা-দেশে ক্রিয়াকাণ্ডবহুল বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ঘটানোছে যুগে-যুগে কিন্তু সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। আচার-ব্যবহারে ক্রিয়াকলাপে পাল-পার্বণে সর্বত্রই সে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

বাঙালী জীবন ও জগৎকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেয় নাই। শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে সে গ্রহণ কবে নাই। এ কালের রামমোহন বা বিবেকানন্দ শঙ্করের অসুবর্তী হইলেও যথাক্রমে ‘লোক জ্যেষ্ঠ’ ও ‘নর-নারায়ণ-সেবা’র আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বতবাং তাঁহাদিগকে ‘মায়াবাদী’ বলা চলে না। প্রাচীন পণ্ডিত মধুসূদনও পুরাপুরি অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। আমাদের বিচিত্র পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক স্বাধাদের কাছে এমন সত্য, এমন মধুর, তাঁহারা কেমন করিয়া ‘মায়াবাদী’ হইবেন? তাঁহাদের বরঞ্চ মায়া-বিলাসী বলা চলে।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, চিন্তকে একাগ্র করিবার উপায় হইতেছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। গীতায় শ্রীভগবান ঠিক এই কথাটিই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, মন যে অতি-চঞ্চল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মনকে নিরুদ্ধ করাও অত্যন্ত কঠিন, তবু অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারা মনের রোধ করা সম্ভবপর। বৈরাগ্য কথাটির অর্থ ভোগ্যবস্তুতে বিরক্তি বা ভোগ্যপদার্থ হইতে মনের বিবর্তি। এই বিরক্তি বা বিরতি জন্মাইবার জ্ঞান মাহুযকে নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়। স্বতবাং বৈরাগ্য কথাটা শুনিলেই কৃচ্ছ্রসাধনের কথাটাই মনে আসে। কিন্তু

বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই কৃচ্ছ্রসাধন বা দৈহিক কর্ষণের আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ‘মুক্তবৈরাগ্য’ ও ‘মুক্তবৈরাগ্যে’র মধ্যে একটা পার্থক্য কবিয়াছেন। তাঁহারা মর্কট-বৈবাগ্যের কথাও বলিয়াছেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন শ্রীশান-বৈবাগ্যের কথা। ধনি-সন্তান রঘুনাথ দাস যখন ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমবাবের জ্ঞান মহাপ্রভুর শরণ লইয়াছিলেন, তখন শ্রীমন্নমোহনপ্রভু বলিয়াছিলেন—

‘মর্কট-বৈবাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া ॥

স্থি হৈয়া ঘরে যাও ন হও বাতুল।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধ-কুল ॥’

‘মর্কট-বৈবাগ্য’ কথাটির অর্থ কপট বৈরাগ্য। ‘মর্কট’ অর্থে ‘বানর’, বানর কপট বৈরাগী, কাবণ, সে বাসা বাঁধে না, অথচ সন্তান-সন্ততি লইয়া বাস করে। অতএব মর্কট-বৈরাগী বলিতে প্রচ্ছন্ন ভোগীকেই বোঝায়। আমাদের এই ভাবতবর্ষে এরূপ ভোগী সংখ্যা হয়তো নিতান্ত অল্প নয়। যুরোপেও যে বহু সন্ন্যাসী আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। ‘মর্কট বৈবাগ্যে’র জ্ঞান অবস্থা ‘শ্রীশান-বৈবাগ্য’ নিম্নলিখিত নয়, কিন্তু উহা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মূল্যহীন। শ্রীশানে যখন আমরা প্রিয়জনের শব দৃষ্ট হইতে দেখি, তখন মনে হয়, সংসারের অনিত্যতা যেন আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, মায়ার বন্ধনকে যেন আমরা অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণরূপে মোহ-মুক্ত হইয়াছি। কিন্তু এই নেশার আবেশ কাটিয়া গেলেই আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের বিষয়ের প্রতি অহুন্নক্তি এতটুকু শিথিল হয় নাই, আমরা শুধু নিজের মনকে ফাঁকি দিয়াছি মাত্র।

ছোট হরিদাসকে বর্জন করিবার সময়েও মহাপ্রভু
'মর্কট-বৈরাগ্য' কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন—

'ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাঞা বলে প্রকৃতি সজ্জাষিয়া ॥'

কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের পথকেও তিনি কল্যাণের
পথ বলিয়া স্বীকার করিয়া লন নাই। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের
ফলে আমাদের মনে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, উহাকে
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাবলি বুলিয়াছেন ক্ষুদ্র-বৈরাগ্য। এ বৈরাগ্যও
স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না; মানুষ কোন বৃহত্তর
স্বার্থ বা আনন্দের আশ্বাদন না পাইলে ইন্দ্রিয়স্বার্থ ত্যাগ
করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা বলেন—ভগবানে
যে বিশেষরূপ রাগ বা অমুরাগ, তাহাকে বলে বিরাগ,
আর এই বিরাগের ভাবকেই বলে বৈরাগ্য। সুতরাং
বৈরাগ্য কথার একটি অর্থ হইতেছে—অমুরাগ। গীতায় বলা
হইয়াছে—যাহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বাব রুদ্ধ করে, তাহাদের
বিষয় নিবৃত্ত হয়, কিন্তু আসক্তিটুকু থাকিয়াই যায়।
পরমাত্মা বা ভগবানের দর্শন পাইলেই তবে আসক্তির
নিবৃত্তি ঘটে।

'বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহাবশ্ত দেহিনঃ।

রসবর্জ্জং বনোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥'

এইজ্ঞাই শ্রীমদ্‌মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে উপদেশ
দিয়াছিলেন—

'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।'

ইহা যেন ঈশোপনিষদের 'তেন্ন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'
কথারই প্রতিধ্বনি। এখানে ত্যাগবৃত্তির দ্বারা ভোগ
করার কথাই বলা হইয়াছে। (অবশ্য, সকল ভাষ্যকার
এ অর্থ গ্রহণ করেন নাই।)

শ্রীমদ্‌মহাপ্রভু আর একটি গভীর কথা বলিয়াছেন।
সাধনার পথে মানুষকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়।
এখানেও মানুষকে কালের প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। এইজ্ঞাই
মহাপ্রভু বলিলেন—

'ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।'

এই প্রসঙ্গে মদন বাউলের একটি গান মনে পড়ে।

গানটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট কবিয়াছিল।
তিনি একাধিক প্রসঙ্গে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'নিষ্ঠুর গরজী,

তুই-কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে ?

ও তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে ?

ও আমার পরমগুরু সাঁই,

সে যে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই।'

বাস্তবিক, তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু যিনি শিশুর মানস-
মুকুলকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলেন। একজন
পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন—'কাল হইতেছে হোমিও-
প্যাথিক ডাক্তারের মত, তাহার কাজে কোন তাড়াহুড়া
নাই।'

তুই

বৈরাগ্য-সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, কি,
তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহার ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার
সম্পর্কে একটু আলোচনা কবা দরকার। রবীন্দ্রনাথের—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ।'

প্রভৃতি পংক্তিগুলি উদ্ধৃত কবিয়া যাহারা প্রমাণ করিতে
চান, রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যসাধনার বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা
নিজেবাও বিভ্রান্ত হন, অপরকেও বিভ্রান্ত করেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের
উত্তরাধিকারী, জীবন-বাউল-বৈষ্ণবের রসধাবায় ছিল
তাঁহার চিত্তভূমি সিক্ত। রাজা বামমোহন ব্রাহ্মধর্মের
বীজ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মহানির্বাণ তত্ত্বের একটি শ্লোকের
মধ্যে। শ্লোকটি এই—

'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্ত্রীং তত্ত্বজ্ঞানপবায়ণঃ।

যদ যৎ কর্ম প্রকুরীত-তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥'

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন, তত্ত্বজ্ঞানই হইবে তাঁহার
শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তিনি যে কোন কর্ম কবিবেন, তাহা
পরম ব্রহ্মে সমর্পণ কবিবেন।

‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থে মহাবি দেবেজ্ঞনাথ শ্লোকটিব ঘে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

‘মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী ও স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিবাবগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে না। সেই সম্বন্ধ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করা কর্তব্য নহে। গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবে।

কিন্তু যিনি সেই শুভাবহ সম্বন্ধেব যোদ্ধয়িতা, তাঁহাকে বিশ্বৃত হইয়া মোহপাশে আবদ্ধ হইবে না। তাঁহাতেই যোদ্ধিত-চিত্ত হইয়া সংসারধর্মের অতুর্গমন করিবে। সম্পদকালে তাঁহারই অল্পগত হইয়া চলিবে, বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবে। * * কর্মের সমন্বয় তাঁহাতে থাকিয়াই কর্ম করিবে, বিশ্রামের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই বিশ্রাম করিবে। * যাহা তাঁহাব আদেশ বলিয়া জানিবে, তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে, যাহা তাঁহার ইচ্ছাব বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইবে।’

রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য বন্ধনাব মধ্য দিয়া ‘মহানন্দময়’ মুক্তির আশ্বাদ পাইতে চান, এখানে তাঁহার সৌন্দর্যবস-পিপাসু মন্য কবির ভাষায় তাঁহার পিতৃদেবের বাণীরই প্রতিধ্বনি কবিয়াছে। পৃথিবীর বিচিত্র দৃশ্যে গন্ধে গানে তিনিই ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে প্রকাশ করেন, যিনি আনন্দরূপময়তম, তাই ‘যেমন বৈদিক ঋষির’ চোখে, তেমনই কবিশুন্দের চোখে মধুময় পৃথিবীর ধূলি, ‘মধুমৎ পার্থিবং রজঃ,’ শুধু তাই নয়, আমাদের বিচিত্র মানবীয় সম্পর্ক যদি সত্য হয়, তবে উহার মধ্য দিয়াও আমরা পাই সেই ভূমাকে উপনিষদ বাঁহাব সম্পর্কে বলিয়াছেন—‘রসো বৈ সঃ’।

ভারতের চতুর্বাশ্রমের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইয়াছেন—পূর্ণভালাভের সাধনার চাবিটি স্তর। এদেশে গার্হস্থ্যের মধ্য দিয়াও মানুষ আত্মত্যাগ শিক্ষা করিয়াছে। ভাবতকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

‘গৃহীবে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার,
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে,

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,

নির্মল বৈবাগ্যে দৈন্ত্য করেছ উজ্জল,

সম্পদের পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল।’

প্রাচীন ভারতের তপোবনবাসী ঋষিগণ আদর্শ গৃহস্থ ছিলেন। রাজবৃত্ত্য প্রথমে ছিলেন গৃহস্থ; তাঁহার দুই পত্নী ও বিপুল সম্পত্তি ছিল। তিনি যখন সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিতে চাহিলেন, তখনই মৈত্রেয়ী প্রস্ত করিয়াছিলেন—‘আমি যাহার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিব, তাহার দ্বারা কি করিব?’ মৈত্রেয়ী এই প্রশ্নের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ভারতের অন্তরাত্মার জিজ্ঞাসা শুনিতে পাইয়াছেন।

কবির দৃষ্টিতে উমা-মহেশ্বর ভারতের দাম্পত্য জীবনের আদর্শ। ত্যাগীশ্বর শিবের সঙ্গে কল্যাণময়ী অন্নপূর্ণার মিলন যেন শ্রেয় ও প্রেয়েব মিলন। মদনের প্রতাপ যেখানে ব্যর্থ হইয়াছিল, তাপসী অপর্ণার দুঃখবরণ সেখানে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ‘কুমারসম্ভবে’র এই কাহিনী যে কবি-চিত্তে গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছে, কবির বহু বচনায় তাহার প্রমাণ আছে।

যাহারা স্বেচ্ছায় তপস্তার দ্বারা সর্বপ্রকার মোহের বন্ধনকে অতিক্রম করিতে চান, প্রকৃতি তাহাদিগকে মোহে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কবির অল্পবয়সে রচিত ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’র ইহাই প্রতিপাত।

কিন্তু এই প্রশ্নে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের এই ভারতে যাহাবা ধর্মের সংস্থাপন বা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাবা অনেকেই ছিলেন সন্ন্যাসী আর ইহাদের সকলের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। বুদ্ধদেবকে তিনি সর্বোত্তম মানব বলিয়া মনে করিতেন, খ্রীষ্টদেবকে তিনি প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ বলিয়া জানিতেন, আব আচার্য শঙ্করব সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও তাঁহাব প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। ভারতের বাহিরে যে সব মহামানবের প্রশস্তি তিনি গাহিয়াছেন, ঈশ্বর-পুত্র ঈশা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর

এই ঈশাও ছিলেন সম্যাসী। সম্যাসী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রশস্তিও এখানে উল্লেখযোগ্য—

‘বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অক্ষের শক্তি ; বলেছিলেন, দরিদ্রের-মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একেই বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোনও বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অহুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনাই এসে পড়েছে—তার দ্বারা রাষ্ট্রিক আত্মত্বের স্বযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে, সেই অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।

বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।’

অতএব দেখা যায়, সম্যাস যেখানে মানব-কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে কবি উহাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। কিন্তু নিখিল বিশ্বে যে রূপ ও বসেব প্রাবন বহিয়া যাইতেছে, উহা হইতে তাঁহার কবিমন দূরে থাকিতে পারে নাই, তিনি মোহ বা আসক্তির মধ্য দিয়াই যথার্থ বৈরাগ্যের অধিকারী হইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য এ বৈরাগ্যের অর্থ শূণ্যতা নয়, জীবনের পরিপূর্ণতা। কবির পক্ষে মোহ কিন্তু আসক্তি নয়, উহা তাঁহার বিলাস বা বিনোদমাত্র। ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থে কবি “নদী”কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

‘শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও

উদ্দাম উধাও—

ফিরে নাহি চাও,

যা কিছু তোমার সব ছুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

কুড়ায়ে লও না কিছু কব না সঞ্চয়,

নাই শোক, নাই ভয়,

পথেব আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।’

সংসাবে আসক্তিই তো বন্ধন, কবির পক্ষে মোহের প্রয়োজন শুধু বস-সন্তোগের জন্ত, কিন্তু এ মোহ কখনও তাঁহার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই। তিনি ‘বহতা নদী’র মত শুধু সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

‘মোহ মোব মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া’

কবি বলেন, স্বয়ং জগৎ-প্রভু বন্ধনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ‘সৃষ্টি-বীধন পরিয়া সকলের কাছে বীধা পড়িয়াছেন’। সুতরাং হে অন্ধ মানব, তুমি মুক্তির সন্ধানে জগৎ হইতে কোথায় পলায়ন করিবে? জগতের বিচিত্র বর্ণ-গন্ধে-গানে সেই আনন্দ-রূপ অমৃতমের প্রকাশ উপলব্ধি কর, আর সেই সঙ্গে জগতের দুঃখ-আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া কঠোর মনুষ্যত্ব অর্জন কব। তোমার মোহই তোমাকে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিদান করুক।

এই যে মোহের মধ্য দিয়া মোহমুক্তির সাধনা, ইহাও একপ্রকার বৈরাগ্যেরই সাধনা। কবি যেখানে বৈরাগ্য-সাধনাকে অস্বীকার করিয়াছেন, সেখানে উহার অর্থ ক্রুদ্ধ সাধনা। কিন্তু কবির অন্তরে ছিল এক সদানন্দময় বৈরাগী নিত্যজাগ্রত, ধনঞ্জয় বৈরাগী বা দাদঠাকুর ইহাবই প্রতিক্রম। তাই লীলাবাদী বা লীলাবিলাসী কবি গাহিয়াছেন—

‘অন্তবে মোর বৈরাগী গায়,

তাইরে নাইরে নাইরে না।’

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার

সাহিত্য

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

থি নাট্কেটিয়ান্স [এক]

‘ভীষণ রঙ্গে ভবতবদে ভাসাই ভেলা’—

১৮৮৮ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি রাজিবেলা।

পাবীর বিদ্যুৎ-বিচলিত ঝঙ্কারবিস্কৃত আকাশে এসেছে প্রলয়াস্ত্রান। মেঘের কেশব ফুলে উঠেছে ঝড়ের সিংহর। তার ক্ষুধিত ছঙ্কারে কাঁপছে পাবীর পৃথিবী। দাঁতে দাঁত ঘষছে সে, বিদ্যুৎ-নখরে ছিন্নভিন্ন করছে তার শিকার। আতঙ্কে গুরুগুরু করে ওঠা নিশীথরাজির নিরাবরণ নিরাভরণ আশঙ্কায় নীল বুক। আর সেই পুঞ্জীভূত আক্রোশে ফেটে-পড়া আকাশের নীচে প্রমোদে ঢেলে দিয়েছে মন সমস্ত পারী। উত্তেজনায অস্থির পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহ মুহূর্তে গুনছে পাদপ্রদীপের আলোয় কখন যবনিকা উঠবে। নতুন একটি নাটকেব সেদিন প্রথম রজনী। নাটকের নাম হেনরী থার্ড; নাট্যকারের নাম আলেকজান্দার ডুমা।

প্রথম রজনীর দর্শকরা কেউ জানে নি নেপথ্যে অভিনীত হচ্ছে তখন আর একটি নাটক। ‘হেনরী থার্ডের’ প্রথম রজনীতে উপস্থিত হবার জন্তে প্রস্তুত হতে আরম্ভ করেছিলেন নবীন নাট্যকার সঙ্কো হবার অনেক আগে থেকেই [“Hurry, I mustn't be late!”]। হাতের কাছেই রয়েছে সার্ট ট্রাউজাব কোট জুতো। পবপর সেগুলি পববার পর আবিষ্কার করেন নবীন নাট্যকার, কলার নেই একটাও। মুহূর্তকাল মাত্র। মাথায় খেলে যায় কিংকর্তব্য। কাঁচি দিয়ে সাদা কার্ডবোর্ড কেটে তৈরি হয় ফলস্ কলার। বেকুবাব মুহূর্তে তাকান গৃহেব একমাত্র আসবাব একখানা চোঁকিব দিকে। সেখানে শুয়ে আছেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অর্চৈতন্ত্য অবস্থায় তাঁর মা—

যে একজনকে প্রদক্ষিণ করে আজও ঘোরে নবীন নাট্যকারের পৃথিবী।

চোখে জল আসবার আগেই সামলে নেন। চোখের জল মোছবার জন্তে একটিও ক্রমাল নেই কার্ডবোর্ড ক্যাভেলিয়ারের।

পারীর বঙ্গমঞ্চে, পাদপ্রদীপের আলোয় জলে উঠেছে তখন একটি নতুন নাটক—‘হেনরী থার্ড’, আলোকিত হয়েছে একটি নতুন নাট্যকারের নাম—আলেকজান্দার ডুমা।

রঙ্গমঞ্চের বাইরে জনবিরল রাস্তায় তখনও বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ কবে। মেঘের গর্জনস্বর আকাশে আবার উঠি-উঠি কবছে একটি কি দুটি তাবা। ভেতরে প্রত্যেক অঙ্গের যবনিকাপতনে পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহের মুহূর্ত করতালিতে কান পাতা যায় না রঙ্গমঞ্চের কোথাও। শুধু সেই করতালিধ্বনি যাচ্ছে না একজনের কানে। সেই একজন প্রতি অঙ্গের অন্তর্বর্তী বিরামকালে লম্বা লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেছে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত অর্চৈতন্ত্য মায়ের পাশে—যদি কিছু প্রয়োজন হয় তাই।

সেই প্রথম রজনীর শেষে নতুন নাট্যকার যখন নতমস্তকে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন, তখন : “his head uplifted so high that his disordered mop of hair threatened to take fire from the stars.” সেই প্রথম রজনীর শেষে যখন নবীন এক নাট্যকারের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে পারীর নাট্যজগৎ, সেদিনও ছেঁড়া মাহুরের ওপর শুয়ে রাত কাটাচ্ছেন আলেকজান্দার ডুমা, মায়ের চোঁকি থেকে একটু দূবে।

ঘুম আসে নি সে রাতে একবারও। জানলার

ওপারে বৃষ্টি-ধোমে-বাওয়া আকাশে দপদপ করছে দুটো তারা, একটির নাম, অনরে জ বালজাক, আর একটির নাম, ভিক্তব হগো। তৃতীয় তারা যেটি সেই রাতে সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হল পারীতে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই সারা জগৎ তাব নাম জানবে; সেই নতুন তারার নাম আলেকজান্দার দুমা।

জীবনকে কথামিল্লীরা উপন্যাসে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। বালজাক, হগো এবং আলেকজান্দার দুমা তাঁরা তিনজনেই চেষ্টা করেছিলেন উপন্যাসকে জীবনে রূপ দেবার। বালজাক, হগো এবং দুমা ফরাসী সাহিত্যের এই তিন তাবাই—বিশ্বসাহিত্যের থ্রি মাস্টার্স।

এই আলেকজান্দার দুমার বয়স যখন বছর চার তখন তাঁর বাবা মারা যান। যে ঘরে তাঁর বাবার মৃতদেহ তখনও পড়ে আছে সেই ঘর থেকে সত্ত-নিষ্কাশিত আলেকজান্দারের মা দেখেন আলেকজান্দার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে; তাব চেয়ে অনেক ভারী একটা রাইফেল ওপরে টেনেহিঁচড়ে তুলতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে তার, তবুও। আলেকজান্দারের মা অবাক। ‘ও কি করছ তুমি? কোথায় যাচ্ছ?’ আলেকজান্দার তার যিষ্টি দুর্বোধ্য-উচ্চারণে উত্তর করে: ‘স্বর্গে!’—‘কেন?’ আলেকজান্দারের উত্তেজিত কণ্ঠ আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে: “To fight a duel with God for killing my father.”

‘থ্রি মাস্টার্স’র মতই তার অষ্টাও জীবনের শুরু থেকেই দুরতিক্রম্য বাধার সঙ্গে দুবস্ত সংগ্রামের স্বপ্ন দেখে।

দুমার ঠাকুরদার পদবী কিন্তু দুমা ছিল না কোনওদিন। তাঁর অভিজাত পদবী ছিল Pailleterie। রক্তের ভাকে নাড়া দিতে নর্যাণ্ডি ছেড়ে তিনি যান San Domingo-র দ্বীপে। সেখানে সম্রাট জোন্সের মত একগালা কুচকুচে কালো ক্রীতদাস-দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করতে থাকেন। এবং সেখানেই একদিন এক ক্রীতদাসী—“Louise Dumas, bore him a mulatto son to whom he gave the name Thomas-Alexandre.”

তমাস আলেকজান্দার বড় হয়ে বলে: “I want to enlist in the army.” তাঁর বাবা বলেন, “Very well, but you must enlist under your mother’s name. I’d be disgraced if a mulatto soldier bore the noble name of Davy de la Pailleterie.”

১৭৯৩ সনে ফরাসী সৈন্যদলে তমাস আলেকজান্দার নাম লেখান ‘দুমা’ এই মাতৃদত্ত পদবী নামের সঙ্গে যুক্ত কবে। সাত বছরের মধ্যে সেপাই থেকে সর্বাধ্যক্ষের পদে উত্তীর্ণ এই তমাস আলেকজান্দার জনতার হয়ে লড়েন নেপোলিওঁর-নেতৃত্বে। নেপোলিওঁ যখন ডিক্টেটর হয়ে দেখা দেন তখনও তমাস আলেকজান্দার জনতার প্রতিনিধি। নেপোলিওঁ তাঁকে সৈন্যধ্যক্ষের পদ থেকে চ্যুত এবং সৈন্যদল থেকে দূরপন্থে কলঙ্কের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে তাঁর নাম খাবিজ্ঞ কবেন।

ইতিমধ্যে তমাস বিবাহ করেছিলেন। লম্বাষ আঠার ইঞ্চি, ওজনে ন পাউণ্ড একটি পুত্র প্রসব করে তাঁর স্ত্রী কৃতজ্ঞ হন ভগবানের কাছে: “‘Thank God!’ the child was born white. Pink skin, light hair, blue eyes. The only evidence of his mulatto descent was a thickness about the lips.

They named the child Alexandre.”
[Living Biographies of Famous Novelists]

দেহে এবং মনে দুরন্ত বাঁলক আলেকজান্দার দুমার জীবনের প্রথম প্রতিজ্ঞা হয়: “That wicked man (Napoleon) has disgraced my father. I shall fight all my life against wicked men.”

‘থ্রি মাস্টার্স’ কালিতে ডুবিয়ে কলম দিয়ে লেখেন নি দুমা। ‘থ্রি মাস্টার্স’ আলেকজান্দারের রক্তাক্ত জীবন দিয়ে রচিত।

আলেকজান্দার দুমার মা পর্যায়ক্রমে চেয়েছিলেন আলেকজান্দার পণ্ডিত, বেহালাবাদক অথবা পুরুত হবে। আলেকজান্দার কোনটাই হতে চান নি। গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ে মা বলেছিলেন: “The only thing he can do is write a good hand. But any idiot can do that.”

পাঠ্যপুস্তকে যম বসাতে না পারলেও চোখ-কান খোলা রেখেছিলেন দুমা। জীবনের পাঠ নিচ্ছিলেন তিনি।

১৮৫৩ সনের জুন মাস তখন। আলেকজান্ডার একদিন শুনতে পেলেন Villers-Cotterets-এর প্রধান রাজপথে হযরাজের হেঁচা। বলিষ্ঠ দেহ বীরোজ্জ্বল আনন একজন অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন; প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, সংকল্পে অবিচল সেই পুরুষের বিশ্বব্যাপ্ত পবিচয়, নেপোলিওঁ বোনাপার্ট ["It's Napoleon, speeding on to Waterloo"]। এর কয়েকদিন পর আবার অশ্বক্ষুরধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে দেখলেন আলেকজান্ডার, ঘোড়ার পিঠে উলটোমুখে ফিবে চলেছেন সেই একই লোক। কিন্তু এবারে বীর্যবৎ বদলে বিষগ্নতার ছাপ মুখেচোখে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পবিবর্তে বিপুল হতাশায় ভেঙে পড়া, সংকল্পে বিচলিত ভগ্নোন্ময় একটি যতটুকু জীবিত তাব চেয়ে মৃত লোক, এক মুমূর্ষু পলাতক ["Napoleon, running away from Waterloo"]।

নেপোলিওঁর পরাজয়ের পব আলেকজান্ডারের মা হতাশ্বস্তা পুনরুদ্ধারের পথে প্রথম পদক্ষেপের মুহূর্তেই জিজ্ঞেস করেন পুত্রকে, কোন্ পদবী সে পছন্দ করে, অভিজাত 'de la Pailletterie', না, অখ্যাত অবজ্ঞাত Dumas? মায়ের প্রশ্নের উত্তরে, "I shall remain Alexander Dumas"—জানায় নির্দিষ্টায় সেই বিজ্ঞোহী তরুণ।

de la Pailletterie—বুদুদের মত মিলিয়ে গেছে বিশ্বস্তির অতলে, কালের জরুটিকে তুচ্ছ করে চিরকালের জন্তে বয়ে গেছে কেবল 'দুমা' এই পদবী। আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তবে সে পেয়েছে তাব দাম।

পরিচ্ছন্ন স্বন্দর হস্তাক্ষরের জন্তে আলেকজান্ডার কাজ পেয়েছে শেষ পর্যন্ত; Copy clerk-এর কাজ পেয়েছে দুমা-পবিবারেব শুভাকাজক্ষী এক liberal notary-র অফিসে। আলেকজান্ডার দুমাব বয়স তখন ষোল। কাজ হচ্ছে তার নকল করা। সে কাজ না করে দুমা তখন ভলতেয়ার পড়ছে রাত্রিদিন। আর প্রেমে পড়ছে, Adele Dalvin থেকে শুরু করে একটির পব একটি কিশোরবীর সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই দুমার নতুন নাম হল "Don Juan of Villers Cotterets."

কিন্তু গ্রামের সঙ্কীর্ণ পরিবেশ পার হয়ে পারীর পথে

পাড়ি জমানোব স্বপ্ন দেখছে তখন সেই কিশোর। যাবার পাথেষ নেই দুমাব। তবু সিন্ধুর উদ্দেশে নির্গত নদীর পথ রুদ্ধ কববে কে? বাজি ধবে বিলিয়ার্ড খেলে জেতে দুমা এবং সেই টাকায় পারী পর্যন্ত যেতে আটকাব না তাব।

এবং সেখানে গিয়ে সোজা ওঠে সেই অখ্যাত দবিজ্ঞ দুঃসাহসী কিশোর সেদিনকার পাবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় Theatre Francais-এর সমস্ত বাধানিষেধ অস্বীকার করে সর্বশ্রেষ্ঠ ফবাসী ট্র্যাগিক অভিনেতা Talma-র ড্রেসিংরুমে ["There was no stopping this streak of lightning in human form"]। প্রবীণ অভিনেতা দুঃসাহসের তাবিক কবতে জিজ্ঞেস কবেন: 'What, my friend, is your business?'

'I am a notary's clerk, Sir. But I'd like to be a writer.'

'Why not? Corneille too, you know, began as a notary's clerk.'

'Thank you, Sir And please, Sir, would you mind touching my forehead for good luck?'

'Not at all, I hereby baptize thee poet, in the name of Shakespeare, Corneille, and Schiller.'

ঠাট্টাই কবতে চেয়েছিলেন সেদিন Talma মরবার জন্তে দুমার পাখা উঠতে দেখে। 'থি, মাস্কেটিয়ার্স'র মধ্যে দিয়ে Talmaকে দিগন্তের ঠাট্টা করে গেছেন দুমা। কিন্তু কেবল Talmaকে নয়, 'থি, মাস্কেটিয়ার্স'র মধ্যে দিয়ে সারা জগৎকে চিরকালের জন্তে দাক্ষণ পরিহাস করে গেছেন আলেকজান্ডার দুমা। -চেয়ে না পাবার বেমনার চেয়ে পেয়ে না চাওয়ার পরিহাস যে কত বেশী মর্যাস্তিক, 'থি, মাস্কেটিয়ার্স'র মর্য যে গ্রহণ কবতে পাববে কেবল সেই-ই শুনতে পেয়েছে ওই কমেডি'র ট্র্যাগিক মর্যবাণী।

প্রাপ্তি ও মিলনে সমাপ্ত বলেই 'থি, মাস্কেটিয়ার্স' কমেডি নয়; প্রাপ্তিব মধ্যে অপ্রাপ্তি, পূর্ণের মধ্যে অসম্পূর্ণেব, মিলনের পায়ে বিরহের অমৃত বহন কববে বলেই 'থি, মাস্কেটিয়ার্স' বিশ্বসাহিত্যে অগ্রতম মহৎ ট্রাজেডি।

স্কটের 'আইভানহো'র নাট্যরূপদানই ছুমার প্রথম নাট্যকর্ম। কিন্তু সে নাটকের জন্ত শেষ পর্যন্ত তিনি একজন প্রযোজকও পান নি। না পেলেনও হতাশায় হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন তিনি। প্রত্যাখ্যাত হলে ছুমার প্রত্যুত্তর ছিল: "Thank you, I'm not easily discouraged. I shall come again."

ছুমার প্রথম যে নাটক অভিনয়ের জন্তে নির্বাচিত হয় তা কিন্তু তাঁর বিপুল সমর্থিত 'হেনরী থার্ড' নয়, সে নাটকের নাম—'কুইন ক্রিস্চিনা অফ স্কুইডেন'। কিন্তু এ নাটক নির্বাচিত হবার পর, পাত্রপাত্রীর ভূমিকা বিলি হবার পূর্বে, কয়েকদিন মহলা চলবার পরও শেষ পর্যন্ত ছুমা-ইচ্ছাতেই পাদপ্রদীপের আলো দেখতে পায় নি। ওই সময়েই একজন বৃদ্ধ নাট্যকার—জীবনে তাঁর কোনও নাটক কোনও বন্ধুত্ব নেয় নি—একই বিষয়ে একটি নাটক লিখেছিলেন, ছুমা জানতেন না। জানতে পারা মাত্র সরে দাঁড়ালেন ছুমা পথ ছেড়ে: "Let the poor fellow have his fling before he makes his earthly exit."

এর পরেই তাঁর নতুন নাটক প্রথম অভিনয়ে ব্রহ্মোঙ্গেই সাফল্যের লক্ষ্যভেদ করে। আগেই সে-নাটকের নাম করা হয়েছে—'হেনরী থার্ড'।

জীবনে সাফল্যের তীরে যৌবনের সোনারতরী লাগবাব আগেই ভীষণ রঙ্গে ভবভরঙ্গে ভেলা যিনি ভাসিয়েছিলেন সেই ছরস্তু জন্মবেপরোয়া আলেকজান্ডার ছুমা এক হাতে তলোয়ার আর, আর এক হাতে তলোয়ারের চেয়েও ধারালো লেখনী নিয়ে নেমেছিলেন জীবনযুদ্ধে। কিন্তু তার জন্তে যৌবনের নানা বঙের দিনের ডাকে লাড়া দিতে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। কুমারীকতার গর্ভে তাঁর গুরুসজাত পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁর ঝকঝকে মূর্ত্তের মত দাঁতেব রমণীয় হাসির শ্রোতে, তাঁর দীর্ঘ স্থায়ী দেহের সমুদ্রে ভেসে যাবার জন্তে রমণীয় অভাব হয় নি কখনও। পরবর্তী কালেও যখন দেহের সেই ত্রি নেই আর তখনও: "Once, a friend called on the great novelist, in the middle of the afternoon, and found him almost smothered with girls. One was sitting on his knee, another was lying

at his feet, and still another was standing behind his chair and leaning over to kiss his puffy lips; and all three of these girls didn't have on enough clothes to make a respectable bathing suit for a humming bird." ['Little Known Facts about Well Known People.']

কিন্তু কেবল যৌবনরঙ্গে নয়, জীবনরঙ্গেও সমান মেতেছিলেন ছবস্ত ছুমা। সমস্ত যুরোপ চষে বেড়াচ্ছেন যখন তিনি, কখনও বশ-না-মানা দুর্দান্ত তুরঙ্গপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে স্বয়ং, অথবা বাহিত হয়ে-রাজকীয় জুড়িগাড়ি তখনও বিরাম নেই অপ্রতিরোধ্য দুর্নিবার সৃষ্টির খেলায়, সৃষ্টির পর সৃষ্টির রঙমহলের দরজা অবাবিত করে চলেছেন ছুমা। একসঙ্গে পাঁচটি ধারাবাহিক উপগ্রাস বেরচ্ছে সাময়িক-পত্রে তখনও। যুদ্ধে কখনও রক্তাক্ত, কখনও হাস্যাস্পদ, কখনও অতিরিক্ত ভোজন কখনও অতি রিক্ত-আহার, কখনও প্রমীলাক্রান্ত, কখনও নিঃসঙ্গ এই চিরদামাল কখনও লেখার হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। কারণ, লেখা তাঁর কাছে লেখা ছিল না, ছিল আর এক ধরনের খেলা। সৃষ্টির বিবামহীন আনন্দে মত্ত বিধাতাব মতই ছুমাও অবিবাম আনন্দসৃষ্টিতে উন্নত দ্বিতীয়, আসলে অদ্বিতীয় আর এক বিধাতা। সমস্ত জীবন ধরে যতরকম অপকর্ম সম্ভব তা থেকে নিজেই মুক্তমুক্ত পর্যন্ত চ্যুত না করেও সৃষ্টির ধর্মবিচ্যুত হন নি তিনি। নাটক, উপগ্রাস, এবং অগ্রান্ত রচনা মিলিয়ে তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বারশো ষণ্ড ["This is almost twice the entire output of John Galsworthy, George Bernard Shaw, Robert Louis Stevenson, H. G. Wells, Rudyard Kipling, Mary Roberts Rinehart and Jane Grey taken all together"]

বিধাতার এক অতিবঞ্জিত সৃষ্টি এই আলেকজান্ডার ছুমা!

রসের ক্ষেত্রেই নয় কেবল, রসনার ক্ষেত্রেও তাঁর জুড়ি কম যে তাঁর প্রমাণ: "An epicure and a gourmet, he was nearly as famous for his ability to concoct a sauce or roast a duck as for his ability to write a novel. He would consume a meal of caviar, pate de foie gras, fish, filet mignon, roast partridge,

half a dozen kinds of vegetables, and top it off with vast quantities of cheese."

কিন্তু তবুও জীবনে কখনও মৃত্ত অথবা তামাক স্পর্শ করেন নি দুয়া। স্পর্শ করাব প্রয়োজনই বোধ করেন নি। সে কেন প্রয়োজন বোধ করবে কৃত্রিম নেশাব, সৃষ্টিব নেশায় বৃন্দ জীবন-মাতাল যে স্ফাপা যৌবনের সুরায় খুঁজলে পেয়েছিল জীবনের সুর।

সব সময়ই যে খেতে পেয়েছেন দুয়া তা নয়। সৃষ্টির উন্মাদনায় অস্থি জীবনের নানা রঙের দিনগুলো শুধু বসন্তের আবশ্যহিল্লোল বহন করে আনে নি। রক্ষ দিনের দুঃখ দিয়েছে তাঁকে। সাফল্যের সূর্যকরোজ্জ্বল দিনেও যেমন, সৌভাগ্যের তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারেব দুদিনেও তেমনই দুর্দমনীয় আলোকজান্দার দুয়া।

'হেনরী থার্ডের' আশ্চর্য অনবদ্য সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবন এবং যৌবনের খ্যাতির এবং কামনার সিংহদ্বার অব্যাহত হয় সামনে ["'A youth who is feeling the coming of dawn.' New plays, new triumphs, new mistresses."]। কিন্তু কেবলমাত্র খ্যাতি আর কামনার গঙ্গাধুনায় গা ভাসালেই সব বাসনার সমাপ্তি সম্ভব যার, তাঁর নাম আর যাই হোক—দুয়া নয়। নতুন নতুন উত্তেজনার পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথে যাত্রা না করা পর্যন্ত তাঁর চরিত্রের চরিতার্থতা অসম্ভব। ঘরছাড়া দিকহারা অলসার বরপুত্র তলোয়ারের চেয়ে ধারালো কলম হাতে সমাজেব শবব্যবচ্ছেদেই মাত্র শান্ত নয়; পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে যা না পাবার তাই পাবার উন্মাদনায় বেরিয়ে না পড়া পর্যন্ত সান্ত্বনা কোথায়?

দশম চার্লস প্রেসের মুখ সাপ্রেস করতে চেয়েছিলেন গায়ের জোরে। পারীর বুদ্ধিজীবীরা গায়েব জোবেই তা ঠেকাতে চেয়েছিল। বাধা দিলে বাধবে লড়াই তারা জানত; তবু তারা মরতেই চেয়েছিল। সেই জীবন-মরণের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুয়া। কুচকাওয়াজের চেয়ে এ যুদ্ধে আওয়াজই বেশী করলেন তিনি ["His own part in the fighting was like that of a 'the fly on the coach wheel.'"] তবুও দুয়াই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী হাল্লা বাধাবার জাহুতে মস্তমুগ্ধ Lafayette-এর কাছ থেকে আদায় করলেন এই প্রশংসাপত্র: "M. Dumas, you have just achieved your finest drama."]

কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতেও দেরি হল না ["The rebels had merely succeeded in replacing a bad king with a worse king."]। দুয়া ফিবে গেলেন জীবনের নাটক থেকে নাটকের জীবনে। নতুন নাটকের নাম: 'এণ্টনি'। এই নাটকে ত্রিকোণ প্রেমের তীব্রতর

তির্যকতর তীক্ষ্ণতর নতুন উপসংহারে উপনীত হতে ভেঙে পড়ল পারী ["In the enthusiasm of the first night, the ladies tore away the skirts of his coat 'Mon dieu, what a daring young dramatist! And what a delightful young man!'"]।

মিন্দা এবং প্রশংসার পাখায় ভর করে স্বদূরেব পিয়ানী চির-চঞ্চল আলেকজান্দার দুয়া উড়ে চললেন শুধু দিগন্ত থেকে দিগন্তে। পিছন ফিরে তাকালেন না একবারও। সামনে কি আছে, চড়াই না উৎরাই, সন্ধান নিলেন না তার। এক সিঁদুপাব থেকে আবে এক সিঁদুপারে নিত্য ধাবমান এই বাসাহারা মানব-পাখি কখনও প্রাণ দেবার উত্তেজনায়, কখনও গান গাইবার উন্মাদনায় হেঁকে চলেন কেবল সৃষ্টির প্রথম ও পবন বাণী—হেথা নয়, হেথা নয়, অগ্ন কোথা, অগ্ন কোনখানে।

১৮৩২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি আলেকজান্দার দুয়ার নতুন নাটক 'Teresa'-র নামলেন 'নতুন মুখ' এক তরুণী; নাম—Ida Ferrier। প্রথম বঙ্গবীষ স্বনিকাপতনের পরেই দুয়ার আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন: "M. Dumas, you have made my reputation: How can I ever repay you?" রমণীরা সব ঋণ যে রমণীয় উপায়ে শোধ কবতে পারে তাবই আভাস দিয়ে দুয়া প্রত্যুত্তর করলেন: "Easily enough." ঋণ শোধের পালা ঋণ শোধের পরেও শেষ হয় না যখন ["For several years she kept repaying him for his kindness—but not in legal tender"], তখন সকলের চোখ কপালে তুলতে বাধ্য করে বিবাহ করলেন Idাকে দুয়া ["Dumas resigned to a domestic life—the lightning contented to be chained."]

বাড়ির টবে বসেব স্বপ্ন দেখেছে যাহুয কিন্তু বনস্পতির জন্ম দিতে পেরেছে কে? বিদ্যুতকে বন্দী করেছে বাল্বে কিন্তু তার মুখে বজ্রের ভাষা দিতে পেরেছে কে? স্বদূরেব বিহঙ্গকে বেঁধেছে সোনার শেকলে, কিন্তু তার গলায় মুক্তির গান জাগাতে পেরেছে কে? ["But the chains hung loosely upon his impetuous strength. Again and again he left his fireside for adventures abroad. And he allowed his wife generously to seek for her own adventures at home."]

'Live and let live'—এই ছিল আলেকজান্দার দুয়ার দৃষ্টিকোণ।

[ক্রমশঃ]

মঞ্চকথা

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[পূর্বাহ্নবৃত্তি]

মঞ্চকথা।

স্বরজিৎ শুনতে পেয়েছে মঞ্চকথার কাহা, বুঝতে পেরেছে তাব বন্দিদা দশাব ছুঃখ কি গভীর। কিন্তু রাতদিন চিন্তা করেও তাকে উদ্ধার করার কোন পথ সে খুঁজে পায় নি। কলেজ-জীবনের শুরু থেকে স্বরজিৎ মঞ্চকথার স্বপ্ন দেখেছে, সে তাকে কল্পনা করেছে রূপবতী রাজকুমারীরূপে। বিরাট প্রাসাদের মধ্যে মঞ্চকথা বাস করে—যে প্রাসাদের হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, অন্তর মহলে কত দাসদাসী। স্বরজিৎ ভাবত মঞ্চকথা বড় হয়ে উঠলে স্বয়ংস্বর বাবস্থা হবে, দিক-দিগন্ত থেকে আসবে স্বপুরুষের দল, তাদেবই ভেতর থেকে একজনকে বেছে নিয়ে মঞ্চকথা গলায় মালা পরিয়ে দেবে। সেই ভাগ্যবান পুরুষটির মুখ স্বরজিৎ বহু চেষ্টা করেও দেখতে পায় নি, অঙ্ককারে ঢাকা থাকে। কে সে? এইটাই প্রশ্ন। হয়তো কোন অলসমুখ মুহূর্তে ওই অনিশ্চিত পুরুষটির সঙ্গে সে নিজের তুলনা কবেছে, মঞ্চকথাকে আপন কবে প্রাণের কল্পনায় মুগ্ধ হয়েছে।

কিন্তু সে কোনদিন ভাবতে পারে নি সেই রূপবতী মঞ্চকথা আজ বন্দিদা। বাক্সেরা তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে গভীর বনের মধ্যে। এক মায়াপুরীতে সে অতি ছুঃখ দিন কাটাচ্ছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দৈত্যদেব সেবা তাকে করতে হয়, সেখান থেকে পালাবার কোন পথ নেই, চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরী। কোন্ রাজপুত্র সেই মায়াপুরীর আড়িনায় প্রবেশ করবে, কোন্ শক্তির

বলে দৈত্যকে হত্যা করবে, তা না হলে তো মঞ্চকথাকে উদ্ধার কবা যাবে না।

সেদিন কবী থিয়েটার থেকে চলে আসার পর ওই একই চিন্তা তার মাথাব মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে, কোন কাজে মন বসে নি। কেন জানি না তার মনে হয়েছে, যে নাট্যানন্দোলনের আমবা বড়াই করছি, তার মধ্যে গভীরতা নেই, সবটাই হুজুক। বণিক-মঞ্চের আওতা থেকে মঞ্চকথাকে বার করে নিয়ে আসার শক্তি এ নাট্যানন্দোলনের নেই। স্বরজিৎের নিজেকে বড় অসহায় বোধ হল, অথচ সে নিকপায়। কি-ই বা তার করার আছে।

এই অসহায়তা বোধ যে কতখানি মর্মান্তিক তা স্বরজিৎ উপলব্ধি করল আর এক সপ্তাহ বাদে, যেদিন হুসীবাবু বৃহৎ গাড়ি এসে দাঁড়াল তার বাড়ির দরজায়। স্বরজিৎ প্রথমটা তাঁকে দেখে অবাক হয়েছিল। হুসীবাবু যে এই প্রথম তাব বাড়িতে এলেন শুধু তাই নয়, একেবারে খবর না দিয়ে যে হঠাৎ এভাবে এসে পড়বেন তা সে বুঝতে পারে নি। কিন্তু হুসীবাবুর মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে তিনি কোন বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত।

স্বরজিৎ বলল, আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি।

হুসীবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আজ নয় স্বরজিৎবাবু, আর একদিন পবে আসব এখন।

আমায় কিছু বলবেন?

হ্যাঁ, মানে—

হুসীবাবু থেমে যান।

স্বরজিৎ প্রশ্ন করে, থামলেন কেন, বলুন।

হুসীবাবু স্বগম্ভীর স্বরে বললেন, বুঝতে পারছি না, আপনার নাটক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব কি না।

স্বরজিৎ চমকে উঠল : কেন, কি হয়েছে !

আপনার নাটকের নায়িকা আর অভিনয় করবেন না।

সুচরিতা দেবী !—একটু ধৈর্যে স্বরজিৎ জিজ্ঞেস কবে, কাবণটা জানতে পারি ?

হুসীবাবু মুখে বিজ্ঞপ ফুটে উঠল : কাবণ আবাব কি হবে, নিশ্চয় টাকা বাড়াতে চায়।

কত টাকা ?

তা কি আর পরিষ্কার কবে কেউ বলে।

স্বরজিৎ হুসীবাবুর চিস্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, আপনি নিজে একবার ওর সঙ্গে পবিত্তাব কবে কথা বলে নিন না।

হুসীবাবু হাতের লাঠিটা ফুটপাথের ওপর ঠুকলেন : গত তিনদিন ধরে বোজাই তো ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। আজ এইমাত্র উনি জানিয়ে দিলেন রুবী থিয়েটারে আর অভিনয় করবেন না। বুঝতে তো পেবেছে নাটক জমে গেছে, এখন আমাকে মোচড় দেবার চেষ্টা। কিন্তু সুচরিতা বহু আমাকে চিনতে পারে নি। সাবস্টিটিউট আর্টিস্ট দিয়ে আমি বই চালাব। যদি বিক্রি না হয় ক্ষতি স্বীকার করব, কিন্তু নায়িকাব হুমকি শুনে টাকা বাড়াতে আমি রাজী নই।

রাগে হুসীবাবুর শরীর খব খব করে কাঁপছে। এতখানি চটে যেতে স্বরজিৎ তাঁকে এই প্রথম দেখল। একটু চুপ করে থেকে বলল, কী করবেন সে সিদ্ধান্ত যখন করেই ফেলেছেন তখন আর ভাবনার কি আছে। সুচরিতা বহুর জায়গায় কাকে নিচ্ছেন ?

হুসীবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, মন্দিরা। পাঁচ ওর তৈরি আছে, কোন অসুবিধে হবে না।

তাহলে মন্দিরার পাঁচ কে করবে ?

বীধি সেন। আগে এ থিয়েটারেই প্লে করব।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বরজিৎ জিজ্ঞেস কবল, আমাকে কি যেতে হবে শেখাবার জন্তে ?

হুসীবাবু ছোট্ট উত্তর দিলেন, না, তার দরকার নেই।

হুসীবাবু গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। স্বরজিৎ ভেবে পেল না হঠাৎ তিনি তার কাছে এলেনই বা

কেন, এ সব কথা তাকে জানাবার দরকারই বা কি ছিল।

তবু মনটা স্বরজিৎকে বিগড়ে গেল। সুচরিতা বহু সম্বন্ধে তার অগ্নি ধাবণা ছিল। ঠিক টাকার জন্তে সে যে এভাবে চলে যাবে তা না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। সত্যি, ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে। কী জাতের শিল্পী এরা—টাকা ছাড়া আব কি কিছুই বোঝে না !

ঘরের মধ্যে ঢুকে স্বরজিৎ পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপিয়ে নেয়। মাধবী কলেজে যাবার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে, এখন বেরচ্ছিস নাকি রে দাদা ?

স্বরজিৎ অগ্রমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

অফিস যাবি না ?

দেখি।

কোথায় যাচ্ছিস ?

জানি না।

স্বরজিৎ চটি পরে আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

পদ্মাবতী পাশের বারান্দায় কাজ করতে করতে বোধ হয় এদের কথা শুনছিলেন, বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, খোকা কখন ফিববে কিছু বলে গেল না ?

মাধবী বাইবের দিকে তাকিয়ে ছিল, শুকনো মুখে বলল, দাদা একটা কিছু খুব ভাবছে। তুমি লক্ষ্য করেছ মা, ও যেন দিন দিন কিবকম বদলে যাচ্ছে ?

পদ্মাবতী ঘরের জিনিসপত্রগুলো গোছাতে শুরু করেন : খোকাকে আমি বুঝতে পারি না। কত ইচ্ছে ছিল খোকার বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে আসব। তারই হাতে সংসার তুলে দিবে বিশ্বাস কবব, কিন্তু সে আশা বোধ হয় আর নেই।

এ কথা কেন বলছ মা ?

পদ্মাবতী শুকনো হাসলেন : হাজাব হোক আমি মা তো। এটুকু অন্ততঃ আমি বুঝতে পারি, খোকা আর পাঁচটা সাধাবণ ছেলের মত নয়।

মাধবী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মামনি, দাদা যদি আর পাঁচটা ছেলের মতই হত তুমি তাতে আরও বেশী খুশী হতে ?

অজানতে পদ্মাবতীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল : কি জানি !

এইটুকুই বুঝতে পেরেছি আমার মুক্তি নেই। চৌদ্দ বছর বয়সে সংসারের জোয়ার কাঁধে নিয়েছিলাম, বোধ হয় মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য এ সব কথা বলেই বা কি লাভ—যার যা অদৃষ্ট।

মাধবী ইচ্ছে করেই আর কোন কথা বলে না, কারণ সে জানে দাদার ওপর মায়েব এমনই একটা লুকনো অভিমান আছে যে এ সব নিয়ে বেশী আলোচনা কবতে গেলে অকারণে পদ্মাবতীর চোখ সজল হয়ে উঠবে।

একটু পরে পদ্মাবতী নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলেন, অলক কি আজ আসবে?

বলে তো ছিল সন্ধ্যার পব একেবাবে কাজ সেরে আসবে।

অলককে বলিস বোঝবার সকালে যদি ও ব্যবস্থা কবে, আমি বেলুড়ে যেতে পারি।

মাধবীর চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল : ও সব ঠিক করেই রেখেছে, তোমাকে নিয়ে যাবার খুব ইচ্ছে।

পদ্মাবতী হাসলেন : অলকটা একেবারে পাগল, যেটা যখন মাথায় চাপে, না করে ছাড়ে না। কতদিন থেকে যে বলছে আমায় বেলুড়ে নিয়ে যাবে।

নিজের মনেই বিভ্রিড় করতে করতে পদ্মাবতী পাশেব ঘরে চলে যান।

স্বরজিৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা গেল চায়ের স্টলে। কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ বসতে ভাল লাগল না। এক কোণে বসে কয়েকটি ছেলে, দেখলে মনে হয় সব কলেজে ঢুকেছে। চা আর সিগারেট খেতে খেতে সশব্দে আলোচনা করছে চলমান ছবির নায়ক নায়িকাদের নিয়ে। ঠিক তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন রেস্টুরাঁর রকে বসা কয়েকটি যুবক আজকের রাজনীতি নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। কোন দিকে কোন দিতে ইচ্ছে করল না স্বরজিৎের। ভাবল চা শেষ কবে উঠে পড়বে। ঠিক এই সময় রেস্টুরাঁয় ঢুকল তাদের পাড়ার একটি ছেলে। নাম মধু। বয়সে স্বরজিৎের চেয়ে কিছু ছোট।

স্বরজিৎকে দেখে মধু উৎসাহেব সঙ্গে এগিয়ে এল : আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাবে আমি ভাবতে পারি নি স্বরজিৎদা।

স্বরজিৎ ম্যান হাসল : কি ব্যাপার?

ভাবছিলাম আপনার বাড়ি যাব, কয়েকটা টিকিট বিক্রি কবতে।

কিসের টিকিট?

আমাদের ক্লাব থেকে ‘ব্লেবর্গী’ নাটকেব অভিনয় করছি। জানেন তো আজকের দিনে কত খবচ? বেশ-কিছু টিকিট বিক্রি না হলে চলে না।

একে স্বরজিৎের মন সকাল থেকেই ভাল ছিল না, তাব ওপর মধুর কথাবার্তা শুনে আরও যেন বিরজি জন্মাল। নীরস গলায় বলল, তোমরা ছল্লোড় করার জন্তে থিয়েটার করছ, তার জন্তে আমরা পয়সা দেব কেন?

এ কথায় মধুর আত্মাভিমান লাগে : আপনি কী করে বললেন আমবা ছল্লোড় কবছি। আজ না হয় আপনি প্রফেশনাল থিয়েটারে সুযোগ পেয়েছেন, আমবাও হয়তো একদিন পাব, সেইজন্তেই তো এ নাট্য-আন্দোলন।

স্বরজিৎ চমকে ওঠে : এসব বড় বড় কথা ছাড়। নাট্য-আন্দোলনের তোমরা কোন মানেই জান না।

কি বলতে চাইছেন?

স্বরজিৎ পালটা প্রশ্ন করল, থিয়েটার হবে কোথায়?

মধু সর্গর্বে উত্তর দেয়, আমবা চারশো টাকা দিয়ে কবী থিয়েটার ভাড়া নিয়েছি।

স্বরজিৎ তেতো গলায় বলে, আমিও তাই ভেবেছিলাম। বড় থিয়েটার ভাড়া নিয়ে একদিনের জন্তে মুখে চুনকালি মেখে সঙ সেজে তোমরা তামাশা করবে, আর তাব পয়সা যোগাতে হবে আমাদের। এই যদি নাট্যআন্দোলন হয় তবে সে আন্দোলনের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

মধুরও আর উপদেশ শুনতে ইচ্ছে করে না, বিজ্ঞপ করে বলে, বুঝতে পেরেছি, এখন পেশাদার মঞ্চ ছাড়া আর কিছুতে আপনার মন উঠছে না।

স্বরজিৎ যেন ঠিক এই কথাটারই প্রতীক্ষা করছিল, কঠিন স্বরে বলল, তোমরাই বা অপেশাদার কিসে?

স্টেজ ভাড়া নিচ্ছ, সেখানে তোমরা টাকা দাও—লাইট ম্যান, মেকআপ ম্যান, ড্রেসার, এমন কি প্রম্পটার পর্যন্ত সকলেরই নগদ বিদ্যায়েব ব্যবস্থা আছে। বেশীর

ভাগ ক্লাবে মেয়েদেরও তো পার্ট করাব জন্তে টাকা দিয়ে নিয়ে আসা হয়। তার মানে দাঁড়াল কজন পুরুষ শিল্পী শুধু অপেশাদার, তা নিয়ে আর গর্ব করাব কি আছে ?

মধু কিন্তু এতটুকু দমে না পড়ে সোজা প্রশ্ন করল, তার মানে, বলুন, টিকিট আপনি কিনবেন না।

স্বরজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, না, কিনব না। এ ধরনের উৎকর্ষ শব্দকে প্রশ্রয় দেওয়া অত্যাচার।

স্বরজিৎ বেশুরা থেকে বেরিয়ে যায়। মধু গিয়ে যোগ দিল কোণে বসা ছেলেদেব সঙ্গে—যারা এতক্ষণ সিনেমার আলোচনা করছিল।

মধুকে দেখে তারা জিজ্ঞেস করল, কি বে মেথো, নাট্যকারের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?

মধু বাগে গরগর কবতে করতে বলে, হ্যাঁ, ল্যান্ড ফুলে কলাগাছ হয়েছে। একখানা নাটক রবী থিয়েটারে নিয়েছে, তাতেই কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। অপরাধের মধ্যে দুখানা টিকিট কিনতে বলেছিলাম। সেইজন্তে এতক্ষণ জ্ঞান দিয়ে গেল।

একজন মন্তব্য কবল, নাট্যকার হলে কি হবে, পকেট গডের মাঠ। সাবাক্ষণ ঝাঁঝি পোকা ডাকছে, কি কবে টিকিট কিনবে শুনি।

আর একজন বলে ওঠে, সে তোরা ঘাই বলিস, নাট্যকার বিচক্ষণ লোক, বোনের জন্তে দিব্যি অলক ঘোষকে লটকে নিয়েছে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

বেশুরা থেকে বেরিয়ে স্বরজিতের কিন্তু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করল না। বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল পশ্চিম দিকে। মোড়ের মাথায় একটা ভাস্করখানা। প্রয়োজনের সময় বহুদিন সে এখান থেকে পয়সা দিয়ে টেলিফোন করেছে। আজ এই ভাস্করখানার কাছ দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ তাব মনে হল সূচরিতা বস্তুকে একবার টেলিফোন করলে হয়। যদিও স্থবীবাঁবু স্বরজিতকে কোনরকম অসুবোধ করে যান নি সূচরিতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তবু যেন স্বরজিতের মনে হল সূচরিতাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে স্থবীবাঁবু খুশীই হবেন।

ভাস্করখানায় ঢুকে কম্পাউণ্ডারের হাতে পয়সা দিয়ে

পকেট-ডায়াবি থেকে সূচরিতার টেলিফোন নম্বর দেখে নিয়ে স্বরজিৎ ডায়াল করল। স্বরজিৎ মনে মনে তৈরি হয়ে নেয় কিভাবে সে কথা পাড়বে। অনেকক্ষণ বাদে বেয়ারা এসে বিসিভার তুলল, জানাল মেমসাহেব বাড়িতে নেই, বেবিয়ে গেছেন।

সূচরিতা বহুর সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পেয়ে স্বরজিৎ যে মনঃক্ষুণ্ণ হল তা নয়, বরং মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এই ভেবে যে এখনি তাকে কোনরকম ভিক্ত আলোচনার মধ্যে লিপ্ত হতে হবে না।

ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে। সূর্যের তেজ ক্রমশঃ প্রথব হয়ে উঠছে। অফিসের ভিড কমে গেছে, ট্রাম বাস ফাঁকা—বিশেষ করে যেগুলো এসপ্লানেডের দিকে যাচ্ছে। স্বরজিৎ একটা ট্রামে উঠে পড়ল, ফাঁকা ট্রামে ঘুরে বেড়াবার অভ্যাস তার বহুদিনের, হাতে সময় থাকলে কতদিন সে জানলার ধারের সীটে বসে শহরের এক প্রান্ত থেকে আঁব এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছে। বাইবের যে দৃশ্যগুলো সিনেমার ছবির মত একের পর এক বদলে যায়, জানলা দিয়ে দেখতে তা বড় ভাল লাগে। এলগিন রোড পর্যন্ত বেশ একটা বাঙালী পাড়ার ভাব দেখা যায় চতুর্দিকে, ওই রাস্তাটুকু পেরিয়ে গেলেই সাহেব পাড়ার ইশারা। পাড়া বলা ভুল, এখানে সব বড় বড় বাড়ি, অনেক নির্জন। রাস্তায় আবর্জনা কম। বা পাশ জুড়ে ময়দান, দম-বন্ধ-করা শহরের মধ্যে তবু খানিকটা নিঃশ্বাস নেবার জায়গা।

পার্ক স্ট্রিটের পর থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত আরও কেতাহরস্ত কলকাতা। সাহেবী ধরনের হোটেল, দামী দামী দোকান, রাস্তা সারা রাস্তায় চোখ-ধাঁধানো নিয়নের বিজ্ঞাপন জলে। ইংরেজী সিনেমা হাউসের সামনে ভিড করে ঘুরে বেড়ায় নানা বয়সের ছেলেরা, পরনে তাদের পাঞ্জাবি আর মাকিনী স্টাইলের পাঞ্চ-করা বিচিত্র বেশভূষা। পোশাক দেখে সন্দেহ না হলেও হয়তো এদের মধ্যে অনেকে পকেটমার।

স্বরজিৎ কলকাতার ছেলে। শুধু তাই নয়, কলকাতাকে সে ভালবাসে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার আভিজাত্যময় বনেদী আবহাওয়া তার যেমন ভাল লাগে তেমনি সে পছন্দ করে দক্ষিণ কলকাতার স্পন্দন

আন্তঃপ্রাদেশিক, জীবনধারণ। রাতের কলকাতা তার মনে মোহ বিস্তার করে—সে পুণিমা কি অমাবস্তা যে তিথিই হোক না কেন। এমন কি মধ্যদিনের কলকাতাকেও সে ভালবাসে। অবশ্য সূর্যের তেজ খুব বেশীমাত্রায় প্রথর মনে হলে সে আশ্রয় নেয় ময়দানের দীর্ঘ ছায়াঢাকা গাছের নীচে। কিংবা হয়তো হগ মার্কেটে।

কলকাতার এই আর একটা জায়গা—যার জুড়ি স্বজিৎ খুঁজে পায় নি ভারতের অন্য প্রদেশে। সে হল এই হগ মার্কেট। এমন কোন জিনিস নেই যা এই বাজারে পাওয়া যায় না। হয়তো দাম বেশী পড়ে। কিন্তু পাওয়া যায় ঠিক। এমন কি অকালের ফলটি পর্যন্ত দরকাবেব সময় কোথা থেকে যেন বার করে দেয়। এখানে ঢুকলে স্বরজিৎ‌র মনে হয় সারা বছর ধরে যেন প্রদর্শনী চলছে। কত রকমের দোকান। কত বকমারি করে সাজানো। শুধুই যে এখানে দামী জিনিসের ভিড় তা নয়, সস্তায় সওয়া করাও দোকান আছে।

হাতে সময় থাকলে বুড়ির সময় ভেজবাব ভয়ে কতদিন স্বরজিৎ হগ মার্কেটে ঢুকে পড়ে। আর কিছু না হোক বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে বইয়ের স্টলগুলো, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা রকম ইংরেজী বই দেখা যায়। বিশেষ করে কাগজ-বাঁধাই মাকিন সংস্করণের বইয়ের আড়ত এখানেই সবচেয়ে বেশী।

আজও ট্রাম থেকে নেমে লিঙসে স্লিট দিয়ে এসে স্বরজিৎ ঢুকেছিল হগ মার্কেটে। একবার চারদিকটা ঘুরে এসে দাঁড়াল বইয়ের দোকানে, দেখল খানকয়েক বই, কিনল দুখানা সাপ্তাহিক কাগজ। সাধারণতঃ বইয়ের স্টল থেকে বেয়িয়ে উত্তর দিকের গলি ধবে সোজা এগিয়ে যায়, কারণ এর দু দিকে কসমেটিকের দোকান। এখানে পাওয়া যায় ক্রীম স্নো পাউডার থেকে শুরু করে রূপসজ্জার যাবতীয় সরঞ্জাম। তাই প্রায়ই এসব দোকানে দেখা যায় আধুনিক মেয়েদের। আজও স্বরজিৎ এই সব দোকানের কাছ দিয়ে হাঁটছিল, হঠাৎ মনে হল ডান দিকের কোণের দোকানে ঘন নীল রঙের শাড়ি পরা দীর্ঘাঙ্গী যে মেয়েটি পেছন ফিরে কথা বলছে সে যেন তার চেনা। মেয়েটি মুখ তুলে তাকাতো

সন্দেহেব আর অবকাশ রইল না। সকাল থেকে যার কথা শুনে স্বরজিৎ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, যাব সঙ্গে দেখা করার জন্তে মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল এ সেই সূচবিভা বসু।

সূচরিতার হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট, চোখে কালো চশমা। দোকান থেকে বেরুতেই স্বরজিৎ‌কে সে দেখতে পেল, কিন্তু তবু যেন না চেনার ভান করে বা দিক দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করল।

স্বরজিৎ ইচ্ছে কবে তাকে থামাল : নমস্কার সূচরিতা দেবী।

সূচরিতা ফিরে তাকিয়ে আড়ষ্ট হাঙ্গল : ও, আপনি! আমি প্রথমটা লক্ষ্য করি নি।

আমি আজ আপনাকে ফোন কবেছিলাম।

হঠাৎ কি ব্যাপার?

স্বরজিৎ ইতস্ততঃ কবে বলে, ভাবছিলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করি।

সে আমার সৌভাগ্য। সামনের মাসে আমাদের বাড়িতে একদিন চা খান, সেই সঙ্গে গল্প করা যাবে।

সূচরিতা তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরেও স্বরজিৎ বলল, কয়েকটা বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা কবা দরকার। মনে হয় তাতে আমাদের দুজনেবই উপকাব হবে।

সূচরিতা বসু স্পষ্ট গলায় উত্তর দেয়, যদি রুবী থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে চান সে নিয়ে কথা বলতে আমি প্রস্তুত নই। আমার যা কিছু বক্তব্য হযাবাবুকে বলে দিয়েছি।

আমার যতদূর মনে হয় হযাবাবু আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারেন নি। কিংবা ইচ্ছে কবে বুঝতে চাইছেন না।

কেন, উনি কি বলেছেন?

স্বরজিৎ সূচরিতার মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকিয়ে বলল, আমি অন্ততঃ বিশ্বাস কবতে রাজী নই যে আপনি শুধু টাকার জন্তে থিয়েটার ছেড়ে দিলেন।

সূচরিতার চোখমুখ কঠিন হয়ে যায় : হযাবাবু এই কথা বলেছেন?

তা না হলে আর আমি জানব কি করে।

সুচরিতা কি যেন ভাবে, হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, কয়েকটা কথা আপনাকেও বলা দরকার মনে হচ্ছে। যদি হাতে সময় থাকে, চলুন না, পাশেই একটা ভাল রেস্টুরাঁ আছে। এ সময় বিশেষ ভিড় হবে না, এক কোণে বসে খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

স্বরজিৎ সাগ্রহে রাজী হল : আমি প্রস্তুত, চলুন।

রেস্টুরাঁয় বসে স্বরজিতের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সুচরিতা কাবাব পর্বোটা আর মুরগির কারির অর্ডার দিল। মুখে বলল, এ শুধু আপনার জন্তে নয়, আমার নিজেরও বেশ খিদে পেয়েছে।

স্বরজিৎ বলল, এত সব খেয়ে বাড়িতে তো আর থাওয়া যাবে না।

দুপুরে বড় একটা আমি বাড়িতে থাই না। বেশীর ভাগ দুপুরই তো স্টুডিওয় কাটে। আর অল্পদিন অবকাশটাও রেস্টুরাঁয় ঢুকতে ইচ্ছে করে।

এ ধরনের ছু-চাবটে মামুলী কথাবার্তার পর স্বরজিৎ সেই আগের প্রসঙ্গ তুলল : আপনি যে রবী থিয়েটারে ছেড়ে দিচ্ছেন এ বিষয়ে একেবারে মনস্থির করে ফেলেছেন, তাই না ?

সুচরিতা জানাল, হ্যাঁ, তাব আর নড়চড় হবার উপায় নেই।

যদি আপত্তি না থাকে হঠাৎ কেন ছেড়ে দিলেন বলবেন ?

হঠাৎ তো নয়, অনেকদিন ধরেই ছাড়ব ছাড়ব করছি। তবু স্বামীবাবুর অহরোধে কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চালাচ্ছিলাম, শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না।

এতদিন পর্যন্ত সুচরিতা বহুর সঙ্গে স্বরজিতের বা আলাপ হয়েছে তা শুধু ভদ্রতা রক্ষাব মত সামান্য কথা কিংবা নাটকের প্রয়োজনে অভিনয় নিয়ে আলোচনা। এর বেশী আর কিছু নয়। আজ সুচরিতা তার জীবনের অনেক কথাই অকপটে প্রকাশ কবল স্বরজিতের সামনে।

সুচরিতার ছেলেবেলা কেটেছে পূর্ব বাংলায়। বাবা বড় কাজ কবতেন, বদলির চাকরি, ঘুরে বেড়াতে হত এক জেলা থেকে আর এক জেলায়। লেখাপড়া করার জন্তে সুচরিতা থাকত মামার বাড়ি ঢাকায়। স্কুল-জীবন থেকে সে আবৃত্তি করত আর নাচত ছোটখাটো অহুঠানে।

কলেজ-জীবনে ঢোকায় সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের শখ জেগে উঠল। সুচরিতাব মামা ছিলেন স্বাভিনেতা। তাদের নিজের বাড়িতেই একটা ক্লাব ছিল, সেখান থেকে প্রত্যেক বছর অন্ততঃ দুটো নাটকের অভিনয় কবত। মামার কাছেই বলতে গেলে সুচরিতাব অভিনয়-জীবনের হাতে-খড়ি। ওদেব ক্লাবেই থিয়েটার করে সে-স্বনাম কেনে। বিষে হয় তার ঢাকাতেই, স্বামীর ঘর করতে সে এল কলকাতায়। স্বামী শ্রীঅজিত বহু উদারপন্থী মানুষ, স্বীর কোন ইচ্ছেতেই তিনি বাধা দেন না, কিন্তু কলকাতার জীবনে মঞ্চে অভিনয় করার কোন সুযোগ আসে নি সুচরিতার। বিবাহিত জীবনের প্রায় পাঁচ বছর বাদে সুচরিতা সিনেমায় যোগ দেয়। সেও আকস্মিকভাবে। তার স্বামী এক বন্ধু হঠাৎ ছবির প্রযোজনা করবেন বলে ঠিক করেন, তাঁব ইচ্ছে-হয় সুচরিতা নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে। আশ্চর্য ববাত, সে ছবি না চললেও ওই এক অভিনয়ে সুচরিতাব নাম চিত্রজগতে ছড়িয়ে পড়ল। একের পর এক কণ্ট্র্যাক্ট আসতে লাগল তার বাড়িতে। সামান্য ক বছরবে চেষ্টায় সে এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় চিত্রশিল্পী।

এতদূর পর্যন্ত বলে সুচরিতা স্থির দৃষ্টিতে স্বরজিতের দিকে তাকায়। বলে, বিশ্বাস ককন স্বরজিৎবাবু, ছবিতে অভিনয় করে কোন আনন্দ পাই না।

কেন ?

আমি ভালবাসি মঞ্চ। কলেজ-জীবন থেকে মঞ্চ আমাকে আকর্ষণ কবেছে, কিন্তু ঠিক সুযোগ কোনদিন পেলাম না। তাই রবী থিয়েটারের কাছ থেকে যখন আমন্ত্রণ পেলাম আপনার নাটকে অভিনয় করার জন্তে, এতটুকু দ্বিধা না করে আমি যোগ দিয়েছি। জানি না আপনার স্বজিত চরিত্রে আমি যথাযথ রূপ দিতে পেরেছি কি না। কিন্তু নিজে অভিনয় করে বড় আনন্দ পেয়েছি।

স্বরজিৎ লক্ষ্য করে, সুচরিতা একেবারে ভেতর থেকে কথা বলছে, এর মধ্যে কোথাও মিথ্যে নেই।

সুচরিতা স্নান হেসে বলে, স্বামীবাবু এখন টাকার কথা বলছেন, শুনে হাসি পাচ্ছে, কত টাকা সারা মাসে আমাকে রবী থিয়েটার দেয় ? একদিন স্টুডিওব ফ্লোবে গিয়ে দাঁড়ালে আমি তার চেয়ে বেশী টাকা পাই। যদি

টাকাটাই বড় কথা হত তাহলে আমি গোড়া থেকেই থিয়েটারে যোগ দিতাম না। আমি থিয়েটার ভালবাসি, অভিনয় করতে চাই, সেইজন্মেই গিয়েছিলাম। অথচ থাকতে পারলাম না।

-স্বরজিৎ বোঝে এর মধ্যে কথা বলে কোন লাভ নেই, সূচরিতার ঘটনাক্রম বলবার নিজের থেকেই সে বলবে।

বেয়ারা ইতিমধ্যে খাবার দিবে গিয়েছিল। সূচরিতা খেতে খেতে বলতে শুরু কবে, কি করে যে রুবী থিয়েটারে এই ক মাস কাজ করেছি, ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। কী অসহ্য পরিবেশ!

স্বরজিৎ খামিয়ে দিবে বলে, অথচ আমাব মনে আছে প্রথম দিকে আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম কি রকম লাগছে, আপনি বলেছিলেন আশাতীত ভাল।

সূচরিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে : বলেছিলাম ঠিকই, তখন আমি বুঝতে পাবি নি। ওই মন্দিরা, ওই বসময়—ওরা যে কী মারাত্মক জীব, কী ভয়ঙ্কর প্যাচ কষে ওরা—সত্যিই, বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

বিশ্মিত স্বরজিৎ প্রশ্ন করে, এ আপনি কি বলছেন?

প্রথম প্রথম ওরা এমন চমৎকার ব্যবহার করত আমার সঙ্গে, ভাবতাম আমার বিরুদ্ধে ওদের কোন নালিশ নেই। কিন্তু ক্রমে বুঝলাম ওটা ওদের লোক-দেখানো ব্যবহার। প্রথম ওদের মুখোশ খুলে পড়ল, যখন কাগজে আমার অভিনয়ের স্থখ্যাতি করল। শুনলাম ওরা তাই নিয়ে কানাকানি করছে। এমন কি আমার কানে গেল বসময় বলছে, কাগজে ভাল বললে কি হবে, লোকে আমার অভিনয় নেবে না। কিন্তু রাতের পব রাত দর্শকদের আমি অভিনন্দন পাচ্ছি দেখে ওদের গায়ে ঘেন জালা ধরল। তারপর থেকেই শুরু হল ওদের বাঁদরামি।

তাবপর সূচরিতা যা বলে গেল স্বরজিৎ নিজের কানে না শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস কবতে পারত না। প্রায়ই সূচরিতার ঘর থেকে জিনিসপত্র চুরি গেছে, মেক-আপের সরঞ্জাম প্রয়োজনের সময় লুকিয়ে রেখেছে, জামাব ভেতবে লাগিয়ে দিয়েছে এমন কোন ফল বা পাতার রস যা পরে অভিনয় কবতে গিয়ে সারা গা জালা করেছে। কারুব সঙ্গে কথা বলার উপায় ছিল না, ইচ্ছে করে সূচরিতাব সামনে এমন সব অগ্নীল আলোচনা করত

যা থেকে পালিয়ে থাকার জন্তে সে অভিনয় ছাড়া বেকার ভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকত নিজেব ঘরে। একের পব এক এমনই বিরক্তিব কারণ ঘটবেছে এরা যে সূচরিতার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। সূচরিতা গাঢ়স্বরে বলে, কে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে জানেন? একটি অন্ধ বুড়ী। রুবী থিয়েটারে হযতো দেখেছেন, বোজ এসে বসে থাকত।

স্বরজিৎসে সেই বুড়ীব কথা মনে পড়ে যায়। বলে, ইয়া, আমি তাকে দেখেছিলাম।

সেই বুড়ীই আমায় বলে শেষ রুবী থিয়েটারে সাবধানে থাকাব জন্তে। তাকে অন্ধ জেনে অনেক সময় ওবা হযতো এমন সব বিষয়ে আলোচনা করেছে যা আশ্রাব পক্ষে জানার কোন উপায় ছিল না। আমার জলেব সঙ্গে খাবারের মধ্যে এমন কিছু ওবা মিশিয়ে দেবাব চেষ্টা কবছিল যাতে আমার নেশা হয়, পাটে আমি ভুল কবি, বদনাম কিনি। একদিন জল খেয়ে মাথা ঘূবে আমি পড়েও গিয়েছিলাম।

স্বরজিৎ অবাক হয়ে সব শুনছিল, বলে, এও কি সম্ভব!

সূচরিতা কঠিন স্বরে বলে, তা না হলে আর আমি স্বেচ্ছায় মঞ্চকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসি! ওরা চেয়েছিল আমাকে তাড়াতে। হুঁসিয়ারুকে যখন বললাম এ বিষয়ে অনুসন্ধান কবতে, তিনি গা করলেন না। আপনিই বলুন, নিজের জীবনকে বিপন্ন করে কি আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব?

স্বরজিৎ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি আপনাব মনের অবস্থা। আপনাব সঙ্গে এভাবে খোলাখুলি আলাপ না হলে আমি জানতেও পারতাম না দীর্ঘ মাহুকে কত নীচে নামিয়ে দেয়।

বিল চুকিয়ে দিয়ে ওবা উঠে পড়ল। সূচরিতা বহু প্রশ্ন করে, আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

স্বরজিৎ উদাস কণ্ঠে উত্তর দেয়, কোন ঠিক নেই।

যদি দক্ষিণ দিকে যান আমি লিফ্ট দিতে পারি, সঙ্গে গাড়ি আছে।

ধন্যবাদ, তার দরকার নেই, আমি অন্তর্যমিকে যাব।

স্বরজিৎ নমস্কার করে বিদায় নিতে যাচ্ছিল, সূচরিতা ইতস্ততঃ করে বলে, একটা কথা বলব?

বলুন।

যদি কোন চরিত্রে অভিনয়েব জ্ঞান আমার প্রয়োজন মনে করেন নিঃসঙ্কোচে জানাবেন, অভিনয় করতে পেলেন আমি খুশী হব।

স্বরজিৎ মুখ তুলে দেখল, স্বচরিতাব চোখে গভীর অল্পরোধেব দৃষ্টি। বলল, বেশ, এ কথা আমার মনে থাকবে।

স্বচরিতা বস্তুকে গাভিতে তুলে দিয়ে স্বরজিৎ ঠিক করল একবার রুবী থিয়েটারে যাবে, হুদীবাবুব সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন। ঘড়িতে সাড়ে বারোটো বাজে, মাকে একটা খবর দেওয়া দরকার যে সে আজ ছুপুরে বাড়িতে থাকবে না। স্বরজিতের নিজের বাড়িতে টেলিফোন না থাকলেও জ্যাঠাইমাদের খবর দিবে দিলে মাকে তাঁবা জানিয়ে দেবেন।

কাছের এক সিনেমা-হল থেকে টেলিফোন করে দিয়ে স্বরজিৎ সোজা চলে গেল রুবী থিয়েটারে। বিমঝিমে ছুপুর, অতবড় থিয়েটার যেন নিস্তেজ হয়ে বিমুছে। স্বরজিৎ প্রাঙ্গণেব মধ্যে ঢুকে এল। চাবদিকের দেওয়ালে পোস্টার-মাঝা বক্স-অফিসের দিকে না গিয়ে ইচ্ছে ছিল সোজা স্টেজেব মধ্যে ঢুকে নিজের ঘরে গিয়ে বসবে। কিন্তু একটু না এগোতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল : আরে, স্বরজিৎবাবু যে !

স্বরজিৎ মুখ ফিরে তাকাল। মন্দিরা গুহ।

মন্দিরা এতক্ষণ বসেছিল বক্স-অফিসে, টিকিটবাবুর পাশে।

স্বরজিৎকে দেখতে পেয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কথা বলল।

স্বরজিৎ মোটেই ভাবে নি এ সময় মন্দিরার সঙ্গে দেখা হবে। তাই একটু মুহূ হাসল : এই এলাম একবার।

মন্দিরা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, অফিস যান নি ? না।

আমি বুঝতে পেরেছি কেন আপনি এসেছেন। হুদীবাবু আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাই না ?

স্বরজিৎ মাথা নাড়ল : না তো।

মন্দিরা স্বরজিতের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এগুতে থাকে

মঞ্চের দিকে। বলে, শুনেছেন, তো, কি কাণ্ড হয়েছে। হুদীবাবুব নাগরিক কেটে পড়েছে।

স্বরজিৎ ছোট্ট উত্তর দিল, শুনলাম।

জানতাম পালাবে। বাবা, স্টেজের ওপর রাতেব পর রাত শো করা কি সহজ ব্যাপার! ওই সব ননীব পুতুলরা ধকল সহাবে কি করে!

স্বরজিৎ ইচ্ছে করেই এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় : এখন তো আপনি ওই পার্ট করছেন ?

মন্দিরা গুহ হাসে, অগত্যা। আর কি উপায় বলুন, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমবা তো আছিই। প্রথমে যখন হুদীবাবুকে অল্পবোধ কবেছিলাম ওই পার্টটা আমায় দিতে, দিলেন না। বললেন, চেহারায় মানাবে না। এখন নিজে যেই প্যাচে পড়েছেন, শো বন্ধ হবার ঘোণাড়, অমনই তিনবার করে মুকুল নন্দীকে পাঠাচ্ছেন আমার বাড়ি। আচ্ছা, আপনিই বলুন, এত অল্প সময়ের মধ্যে কি একটা চরিত্রে রূপ দেওয়া যায় ?

স্বরজিৎ বলল, আপনার নিজের কি মনে হয় ? করতে পারবেন না ?

মন্দিরা সর্গর্বে বলে, না বলতে তো আমরা শিখি নি স্বরজিৎবাবু। আমরা থিয়েটারের মেয়ে—যে পার্টই দিন না, প্রাণ দিয়ে অভিনয় করব। পরশুদিন তো থিয়েটার আছে, আসুন না একবার দেখতে—মনে হয় স্বচরিতার চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ করব না।

চেট্টা করব আসতে।—স্বরজিৎ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে।

মন্দিরা নীচে থেকে জিজ্ঞেস করল, ঘরে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ, দু-একটা কাজ আছে। হুদীবাবু এলে একবার দেখা কবে তারপর বাড়ি যাব।

আমিও নীচে আছি। রসময়না আসবে, রিহার্সাল হবে।

স্বরজিৎ মুকুল নন্দীকে ডেকে নিজের ঘর খুলিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। টেবিলের উপর প্রচুর চিঠি জমা হয়েছে, বেশীর ভাগই একটি চাল দেবার অল্পবোধ। পড়তে ইচ্ছে করল না, চুপ করে বসে রইল স্বরজিৎ। মাথার উপরে পাখাটায় কিচকিচ করে শব্দ হচ্ছে, জানলা

দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাশের বস্ত্রব খানিকটা অংশ, খোলার চালের ছায়ায় দুটো লোক নিশ্চিন্ত আরামে খাটির উপর ঘুমচ্ছে।

মুকুল নন্দী একবার ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল। স্বরজিৎ জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবেন নাকি?

মুকুল নন্দী ঘাড় চুলকায়ঃ সাব, আপনি এখন কিছুক্ষণ বলবেন তো?

হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

না, ঠিক আছে। আমি পাশের ঘরটা খুলে দিচ্ছি।

ব্রিহাঙ্গল হবে বুঝি?

মুকুল নন্দী বলা উচিত হবে কি না একবার ভেবে নিয়ে নীচু গলায় বলে, দুপুরের দিকটায় বড় গবম পড়ে কি না। এক অন্ধ বুড়ী আছে, বড় গরিব। আগে থিয়েটারে পার্ট করত। দুপুরের দিকে এলে আমবা পাখার তলায় শুতে দিই। সাধারণতঃ আপনার ঘর তো খোলা হয় না, এখানেই মাটিতে মাছব বিছিয়ে শোষ। আজ না হয় পাশের ঘরেই শোবে।

স্বরজিতের মনে পড়ে গেল বুড়ীর কথা। একদিন সে নিজের থেকেই এসেছিল তার সঙ্গে আলাপ করতে। খেয়াল হল স্ফুরিতাও উল্লেখ করে বলেছে, ওই বুড়ীই তাকে সাবধান করে দিয়েছিল অন্ধদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্তে।

বলল, ওকে একবার এখানে নিয়ে আসুন তো, আমি কথা বলব।

মুকুল নন্দী খুশী হয়ে বলে, আপনি ডেকেছেন শুনে বুড়ী এখনই ছুটে ছুটে আসবে।

কথাটা মিথ্যে নয়। একরকম হাঁফাতে হাঁফাতে মুকুল নন্দীর হাত ধরে বুড়ী এসে ঘরে ঢুকল। চেয়ারেব উপব বসে পড়ে বলল, আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

স্বরজিৎ সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ, কয়েকটা কথা জানবার ছিল।

নিশ্চয়ই বলব। এ আমার কতবড় সৌভাগ্য, আপনি আমায় ডেকেছেন। কেউ তো আজকাল আমায় ডাকে না, সবাই দূরদূর করে।

মুকুল নন্দীকে ঘব থেকে সবিয়ে দেবার জন্তে স্বরজিৎ দুটো ভাব আনতে পাঠিয়ে দিল। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে স্বরজিৎ প্রশ্ন করে, আপনি তো শুনেছেন স্ফুরিতা দেবী রুবী থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন?

বুড়ী স্থির স্বরে উত্তর দিল, হ্যাঁ বাবা, শুনেছি।

স্বরজিৎ ইচ্ছে বরই বলল, আমার মনে হয় এ ভাবে থিয়েটার ছেড়ে দেওয়া স্ফুরিতাব উচিত হয় নি।

একটু চুপ করে থেকে বুড়ী আগের স্বরেই উত্তর দিল, এ ছাড়া স্ফুরিতার কোন উপায় ছিল না।

কেন?

ও ভালমানুষ মেয়ে, কী কবে মন্দিরাদের সঙ্গে পারবে। মন্দিরা আর বসময়—ওরাই তো আসলে এ থিয়েটার চালাচ্ছে।

এ আপনি কী বলছেন?

বুড়ীর মুখে করণ হাসি ফুটে ওঠেঃ এইজন্তেই তো থিয়েটারগুলো নষ্ট হয় বাবা, কয়েকজনে মিলে দল পাঁকায়, বাইরের লোককে ওরা টিকতে দেয় না। এই রুবী থিয়েটারের কথাই ভাব না, কত ভাল ভাল শিল্পী সব এল গেল, কেউ এখানে টিকতে পেবেছে? রসময়রা টিকতে দেয় না।

স্বরজিৎ প্রশ্ন করে, রুবীবাবু এ কথা জানেন?

হয়তো জানেন, উনিও মন্দিরাদের হাতেব পুতুল মাত্র।

কিন্তু কেন?

বুড়ীর মুখে অর্থপূর্ণ হাসিঃ সে কথাও বুঝিয়ে বলতে হবে বাবা। চেহারা যাই হোক, মন্দিরা সোমথ মেয়ে তো।

কথাটা শুনেই স্বরজিতের গা ঘিনঘিন করে উঠল। অল্পভব করল কান দুটো গরম হয়ে উঠছে।

বুড়ী তখনও বলে যায়, আপনারা নতুন এসেছেন, এ লাইনের নোংরামি কথা জানেন না। আমার সারা জীবনটা শুধু এই মঞ্চের উপর কেটেছে বলেই বুঝতে পারি কী অভিশপ্ত এই জীবন।

স্বরজিতের কৌতুহল জন্মায়, প্রশ্ন করে, আপনার নামটা জানতে পারি?

চিনতে পারবে না বাবা, আমার পুরনো যুগের লোক। আসল নাম অন্নদা। থিয়েটারে নাম দিয়েছিল পূর্ণবালা।

স্বরজিতের মনে পড়ল নামটা তার একেবাবে অপরিচিত নয়, থিয়েটারের প্রাচীন বই ঘাঁটতে গিয়ে শিল্পীদের মধ্যে এ নাম সে দেখেছে। বলল, খুব বেশীদিন আপনি অভিনয় করেছিলেন কি?

না বাবা, মাত্র দশ বছর। তবে ওরই মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খানপঞ্চাশেক নাটকে পার্ট করেছি। ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে আমিই ছিলাম নায়িকা। প্রথম প্রথম আমার পেছনেও অনেকে লাগত, জোট বেঁধে সবিয়ে দিত, সে সময় এক থিয়েটার থেকে আর এক থিয়েটারে ঘুরে বেড়িয়েছি। তাবপর এই রুবী থিয়েটার যখন শুরু করলাম তখন থেকে ক বছর নিশ্চিন্ত মনে পার্ট কবতে পেয়েছিলাম।

স্বরজিৎ মন দিয়ে কথা শুনছিল, পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্তে প্রশ্ন করল, রুবী থিয়েটার আপনারা শুরু করেছিলেন?

অন্নদা দীর্ঘশ্বাস ফেললঃ তখন এর নাম রুবী থিয়েটার ছিল না। আমি সাধ করে নাম রেখেছিলাম ‘মৃণালিনী’। একজন অভিনেতার নাম শুনেছেন—রত্নপ্রতাপ?

শুনছি বইকি। তিনি তো স্বনামধন্য ছিলেন।

হ্যাঁ বাবা, স্বনামধন্যই বটে। তিনি ছিলেন নায়ক, আমি ছিলাম নায়িকা। অভিনয়ের পর বেশীর ভাগ রাত্রিই তিনি আমার সঙ্গে কাটাতেন আমার ঘবে। বড় ভালবেসেছিলাম তাঁকে। কী অপূর্ব কণ্ঠস্ব, চোখে কী দ্যুতি। অসাধারণ অভিনয় করতেন। একটাই দোষ ছিল—প্রচণ্ড মাতাল। মদ খেলে আব মাথার ঠিক থাকত না। বনৈদী ঘরের ছেলে, কিন্তু বাপ মা, বউ ছেলে কারুর সঙ্গেই বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। থিয়েটার করত, আর থাকত আমার বাড়ি। থিয়েটারের দিন ইচ্ছে করেই বেশী মদ খেতে আমি দিতাম না।

স্বরজিৎ হঠাৎ প্রশ্ন করল, আপনাব বাড়িতে আর কে ছিল?

অন্নদা শুকনো গলায় বলে, আব কে থাকবে বাবা। আমরা তো আর ভ্রমরঘরের মেয়ে নই। আমাব মায়ের খুব রূপ ছিল, নগদ টাকা, সোনার গয়না। একখানা পাকা বাড়ি আমার জন্মে রেখে দিয়েছিলেন। আমি তাঁর একমাত্র মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই মা আমাকে তাঁর মত করেই মানুষ করেছিলেন, নিত্য নতুন পুঙ্খ নিয়ে আমার জীবন কাটে, তার উপর থিয়েটারে ঢুকেছিলাম বলে মায়ের চেয়েও আমার বেশী স্নেহগার ছিল। যখন আমার সবচেয়ে বেশী নাম, শবীরে ভরা ঘোবনের জোয়ার, হাতে অনেক টাকা, সেই সময় ভালবাসলাম রুজ-প্রতাপকে। ওঃ, সে যেন এক দুঃস্বপ্ন।

বুড়ী থেমে যায়। স্বরজিৎ মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে, তারপর কি হল?

সে রাত্রিটা আমার আজও মনে আছে। ফরাশের ওপর বসে আমরা মদ খাচ্ছি, রুজপ্রতাপ তাকিয়ার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে তামাক টানছে। হঠাৎ বলল, জান অহু, আমি কি স্বপ্ন দেখি? নিজে যদি একটা থিয়েটার করতে পারতাম। দেখিয়ে দিতাম লোককে নাটক কাকে বলে। নতুন নতুন নাটক—তুমি হতে নায়িকা, আর আমি নায়ক। তুমি শৈবলিনি, আমি প্রতাপ, তুমি আবেষা, আমি ওসমান। আঃ, পার্ট করে কী আনন্দ হত বল তো?

তখন আমার সব নেশা ধরেছে। বললাম, একটা থিয়েটার খোল না প্রতাপ।

সে বলল, আমার টাকা কোথায়?

বললাম, টাকা আমি দেব।

প্রতাপ ঘন ঘন মাথা নাড়ল: তা হয় না, যদি লোকসান যায়। থিয়েটার যদি না চলে, তোমার টাকা আমি কি কবে ফেরত দেব?

তার কোলের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, নিজেকে যখন তোমার কাছে সমর্পণ করেছি, আমার যা কিছু টাকাকড়ি আছে, সবই তোমার। প্রতাপ

সেদিন আমাকে খুব কাছে টেনে নিল, গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করল।—অন্নদা দম নেবার জন্মে একবার থামে। আবার বলতে শুরু করে, ছ মাসের মধ্যে আমরা থিয়েটার খুললাম, আমার টাকা গয়না সব দিয়ে দিলাম প্রতাপকে, এমন কি বাড়িটাও বাঁধা পড়ল। শুরু হল ‘মৃণালিনী’ থিয়েটার, প্রথম নাটক ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’। বছর দুয়েক খুব সরগরম কবে থিয়েটার চলল, অনেক রকম নাটক করলাম আমরা, লাভও হল প্রচুর। কিন্তু সেই বোধ হয় কাল হল। প্রতাপ মদেব মাত্রা বাড়িয়ে দিল, আর আমাব কথা শুনত না। মদ খেয়ে বেহাশ হয়ে পড়ে থাকত। কত রাত্রে মধ্যে নামতে পারত না বলে টিকিটের দাম ফিরিয়ে দিতে হত আমাদের। ক্রমে ক্রমে দর্শকরাও হতাশ হয়ে পড়ল, লোক আসা কমে গেল আমাদের থিয়েটারে। এ নিয়ে রাতের পর বাত প্রতাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি। শুধু মদ নয়, নতুন নতুন মেয়েও আসতে লাগল ওব জীবনে।

বুড়ীর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল, আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছে ফেলে বলে, তখন আমার মনেব অবস্থাটা একবার ভাব। কী যে করব বুঝতে না পেয়ে একদিন প্রতাপকে শাসিয়ে বলেছিলাম, যদি তুমি এখনও নিজেকে সংযত না কর, থিয়েটারকে না বাঁচাও, তা হলে এর সব দায়িত্ব আমি নিজের হাতে নিয়ে নেব। দরকার হলে অন্য থিয়েটার থেকে ছেলে এনে আমি নায়কের পার্ট করাব, কিন্তু এভাবে চোখের সামনে ‘মৃণালিনী’ থিয়েটারকে আমি উঠে যেতে দেব না।

প্রতাপ তার জবাবে বলেছিল, যাতে তোমাকে দেখতে না হয় তার ব্যবস্থাই আমি করব।

এই পর্যন্ত বলে বুড়ী একটু কেমন যেন বিষন্ন হয়ে যায়। তারপর বলে, প্রতাপের ব্যবস্থা যে এত নির্মম তা আমি বুঝতে পারি নি বাবা। ও আমাকে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাওয়াত। প্রাণে মবলাম না, বোধ হয় মারতেও সে চায় নি, কিন্তু চোখ দুটো জন্মের মত গেল। সেইদিন থেকে আমি অন্ধ, আমি নিঃশ্ব, আমি রূপার পাত্রী।

স্বরজিৎ থবথব করে কেঁপে উঠল: আপনাব টাকাকড়ি সব ওরা মেরে দিলে?

অন্নদা সজল চোখে বলে, টাকা যে আমার তার তো কোন প্রমাণ ছিল না বাবা, সবই তো প্রতাপের হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমি। আব অভিনয় কবতে পারলাম না, কোন রকমে লাঠিতে ভর দিয়ে এসে ওই নীচেব বেঞ্চে বসে থাকতাম, শুনতাম নাটক হচ্ছে। শুনতাম নায়ক প্রতাপকে নতুন নায়িকা প্রেম নিবেদন করছে। শুনলাম মৃণালিনী থিয়েটারে দেনাব দ্বায়ে বদ্ধ হয়ে গেল। শুনলাম প্রতাপ বিবাগী হয়ে চলে গেছে, শুনলাম নতুন মালিকরা এখানে রুবী থিয়েটার খুলল। আমার কিন্তু

এ পর্যন্ত একদিনও কামাই হয় নি। প্রত্যেকদিন এসেছি—থিয়েটার যে আমি ভালবাসি বাবা। একে ছেড়ে কোথায় যাব। চোখে না দেখতে পেলেও বুঝতে পারি ফুটলাইটে আলো জ্বলছে, বাজনা বাজছে, লোকেরা হাততালি দিচ্ছে। সে একটা অল্প জীবন।

অন্নদা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, বলে, এবার আমি যাই, তোমার অনেক সময় নষ্ট কবেছি।

স্বরজিৎ স্থির স্বরে বলে, আপনাব মুখ থেকে না শুনলে এ ঘটনা আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

অবিশ্বাস করাব তো কিছু নেই, থিয়েটার লাইনে দেখছি সবই সম্ভব। তাই তো সূচবিতাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। মন্দিরা আর রসময় ওকেও হয়তো বিষ খাওয়াত কিনা কে বলতে পারে।

কথাটা ভাবতেই শিউবে উঠল স্বরজিৎ

বুড়ী আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল, স্বরজিৎ কিন্তু আব ঘরের মধ্যে বসে থকতে পারল না। সামনের বারান্দায় বেবিযে এসে দেখে মঞ্চের উপর মন্দিরা আর রসময় রিহার্সাল দিচ্ছে।

মঞ্চ আর কেউ নেই। প্রেক্ষাগৃহও অন্ধকার। মুকুল নন্দী যদিও বা কাছাকাছি কোথাও থাকে তা হলে নিশ্চয়ই কোন গ্রীনরুম বিমুছে। মন্দিরার ভাবতে পারে নি স্বরজিৎ ওপব থেকে ওদের রিহার্সাল দেখছে। অভিনয় করতে করতে বসময় একসময় মন্দিরার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, চকিতের মধ্যে কাছে টেনে নিয়ে চুষন করল ইংবেজী অভিনয়ের কায়দায়।

মন্দিরা চমকে উঠলেও খুলী-ভরা গলায় প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার? পার্ট করতে করতে রস উথলে উঠল যে।

রসময় একটা চোখ ছোট করে বলে, মনেব মত মেয়ে পেলেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বাবা, এ যে মুখে খই ফুটছে দেখছি।

তা ফুটবে না। তুমি এখন হিরোইন, আমাকে এখন বোঁখে কে। এতদিন ভাঁড়ের পার্ট কবেছি, এবার আমি হিরো হব।

মন্দিরা ছোট মেয়ের মত বসময়ের বকের ওপর শরীরটা এলিয়ে দেয়। বলে, আব একটা স্প্রবব দেব।

রসময় সাগ্রহে জিজ্ঞেস কবে, কি স্প্রবব মনো?

সামনের মাস থেকে তোমার মাইনে বাড়ছে।

সত্যি।

লাস্‌ময়ী মন্দিরা হাসতে থাকে : কাল হুবুড়াকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি—তুমি না হলে রুবী থিয়েটার চলবে না।

রসময়ের চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে : মাইরি মনো, তাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব। হুবুড় সন্দেহ কখন দেখা হল?

মন্দিরা সর্গর্বে বলে, কেন, কাল বাতে তো বুড়ো প্রাণ একটার সময় বাড়ি ফিবেছে। ওর অফিস-ঘবেই দুজনে ছিলাম। বিলিতি বোতল আনিযে ছিল। সূচবিতাব নামে এমন সব কথা বলে দিয়েছি যে আজ সকালে গিয়ে বুড়ো ওব সঙ্গে সব সম্বন্ধ কাটিয়ে চলে এসেছে।

রসময় মন্দিরার হাত দুটো কাছে টেনে নিয়ে বলে, আর ভাবনা নেই, এ থিয়েটার এখন আমাদেরই হয়ে যাবে। মন্দিরা, তুমি হবে নায়িকা, আমি হব নায়ক। আমরা এখানে 'বিজ্ঞা' করব, তুমি বিজ্ঞা, আমি নবেন। তুমি সাজবে উদ্দিপুরী আমি আলমগীর।

আব শুনতে ইচ্ছে কবল না স্ববজিতব। আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গেল। কেন জানি না, তার মনে হল, এ তো রসময় নয়—রুদ্রপ্রতাপ কথা বলছে। মন্দিরা নর, শুনছে অন্নদা। আশ্চর্য এই নায়ক নায়িকা সাজবাব প্রলোভন। তাব জন্তে মানুষ কত না নীচে নামতে পারে, কী না করতে পারে। যুগে যুগে এই রুদ্রপ্রতাপ আব অন্নদাবা জন্মেছে মঞ্চরাজ্যে। তাদের দৌরাণ্যে মঞ্চের এই ছুববস্থা। রসময় অন্নদাব মতই মন্দিরাকে ব্যবহার করবে তাব কার্যসিদ্ধির যন্ত্র হিসেবে। তারপর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই একদিন তাকে সরিয়ে দেবে। শুধু মঞ্চ থেকে নয়, হয়তো এ জীবন থেকে। চোখের সামনে ভেসে উঠল অন্ধ বুড়ীর চেহারটা, মনে মনে শঙ্কিত হল স্বরজিৎ। কে বলতে পাবে মন্দিরার ও এই ভবিষ্যৎ কিনা।

স্বরজিৎ মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল। দোতলার বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নামল একেবাবে সামনের লবিতে। ইচ্ছেও করল না হুবুড়াবু খবর নিতে উনি থিয়েটারে এসেছেন কি না। কী লাভ ওব সঙ্গে কথা বলে। নাটক সম্বন্ধে উনি কিছুই বোঝেন না। থিয়েটার ওর কাছে শুধুমাত্র টাকা রোজগারের একটা ব্যবসা। তবে ইট কাঠ কিংবা স্তবকির মত একেবারে নীবস ব্যবসা নয়। এখানে বসেব যোগান দেয় মন্দিরার মত মেয়েরা। ওটা হল থিয়েটারি ব্যবসার উপরি পাওনা। নাটক বা নাট্যাশালার উন্নতি নিয়ে হুবুড়াবু মাথা ঘামাতে যাবেন কেন। ওর যা কিছু নজর থিয়েটারের ওপর নয়, সামনের ওই ছোট ঘরখানিকে কেন্দ্র করে।

ওই ছোট ঘরটি এ মঞ্চবাজ্যের সোনার কোটো, যার আর একটি চলতি নাম বক্স-অফিস। এর রহস্য যে একবার ভেদ করতে পারে তার আর ভাবনা নেই, নাট্যজগতে সে রথী-মহাবথী হয়ে পড়ে অতি সহজে।

স্বরজিৎ লবি থেকে বেরিয়ে সামনের পানওয়ালার দোকানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ফিরে তাকাল রুবী থিয়েটারের বক্স-অফিসের দিকে। ওই ছোট ঘরে বসে লাল নীল পেনসিল নিয়ে চার্টের ওপর

যারা কাঁটাকুটি খেলে তারাই যেন এ জগতের ভাগ্য-নিষ্পত্তা। যে নাটকে বাতের পর রাত লাল কালির আঁচড় পড়ে সবচেয়ে বেশী, বক্স-অফিসের কষ্টিপাথরে সে নাটক নিখাদ সোনা বলে বাজারে চালু হয়। হয়তো সাহিত্যের বিচারে তার দাম এক বতিও নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? দর্শকের রুচি বুঝে যে নাট্যকার গাড়েবত্রিশভাজা পরিবেশন করতে পাবেন তাঁবই জয়জয়কার।

স্বরজিতের অজানতে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভেবে দেখল এ কষ্টিপাথরের বিচার বড় সাংঘাতিক। স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। মধুসূদন বাংলা নাটকের জনক হলেও ককণ ভাবে ফেল করেছেন। দীনবন্ধুর কথা ছেড়েই দিলাম, সাধারণ দর্শককে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে না তাঁর একটা নাটকেরও নাম। এঁরা ছিলেন নাট্যকার, সত্যিকারের নাটক লিখেছেন, সোনার কোটোর রহস্যের কথা জানতেও চান নি। তাই এঁদের জায়গায় নাট্যজগতে নাট্যকার হিসেবে আসর জাঁকিয়ে বসল তাবা যারা সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তাকিয়ে রইল শুধু সোনার কোটোর দিকে। এ সাধনায় অবশ্য ফল পেল হাতে হাতে। রাতাবাতি নাট্যকার হিসেবে নাম, ব্যাকে টাকা। তবে আর তারা সোনার কোটোর মায়ায় ভুলবে না কেন? আদর্শকে আঁকড়ে থেকে লাভ কি হবে? তার চেয়ে মঞ্চ-মালিকের মজিমত, দর্শকের রুচি অলুয়ায়ী, জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখে সুবিধে মত সংলাপ লিখে দেওয়াই তো শ্রেয়। নাটক এঁরা লেখেন না, জনপ্রিয় নাটক তৈরি করেন—অনেকটা টুকবো কাপড় জুড়ে দরজীদেব জামা তৈরি করার মত। তবু নাট্যকার বলে সোনার কোটোর কষ্টিপাথরে এদের নাম স্বর্ণাঙ্কবে লেখা থাকে।

স্বরজিতের সমস্ত মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল। রুবী থিয়েটারের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে বাইরে এসে বাসে কিংবা ট্রামে উঠতে আর ইচ্ছে করল না। কিছুদূর এগিয়ে ট্যান্ডি ধরল সে। অবসন্ন দেহটা পেছনের সীটের উপর এলিয়ে দিল। সোনার কোটোর চিন্তা এখনও তার মাথা থেকে যায় নি। মনে হল এর মায়ায় ভোলে নি এমন শিল্পীও তো নাট্যজগতে পাওয়া শক্ত। বক্স-আর্টিস্ট হবার জন্তে দর্শকদের খুশীমত মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিল্পীদের যে বান্দব-নাচও দেখতে হয়, আবার তা দেখে দর্শকরা হাসলে বা হাততালি দিলে ডিগবাজী খেতেও এরা কার্পণ্য করে না। সত্যিকারের অভিনয়কলাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে না পারলে কী করে তারা নাট্যজগতের চন্দ্রসুর্ধগ্রহভারকা হতে পারবে। সেইজন্তে মনে হয় প্রতিদিন মঞ্চে ওঠবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে তারা প্রার্থনা করে—ঠাকুর, তুমি আমার শিল্পবোধ স্তিমিত করে দাও। আমাকে

আর শিল্পী রেখ না, অভিনেতা করে দাও। শিল্প নিয়ে আমি যেন অভিনয় করতে পারি, তবেই আমি বক্স-আর্টিস্ট হতে পারব। তবেই আমার ছবি বেরবে সিনেমা-পত্রিকার মলাটে।

কলেজ স্ট্রীট ধরে ট্যান্ডি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। স্বরজিতেব মনে হল আশপাশেব বাড়িগুলো যেন কাঁপছে। কিছুক্ষণের জন্ত স্বরজিৎ বিস্মৃত হল যে সে ট্যান্ডিতে বসে আছে। বুঝতে পারল না কোথায় যাচ্ছে সে। নাট্যজগতেব অধোগতির সঙ্গে তার চলার পথও কি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে! সেও কি নামছে ওপর থেকে নীচে! আবার সেই সোনার কোটোর চিন্তা তাব মস্তিষ্ক ফিরিয়ে আনল। মনে হল নেপথ্য শিল্পীরূপে বক্স-আর্টিস্টের মত তাদের শিল্পী-মনকে বলি দিয়েছে সোনার কোটোর হাড়ীকাঠে। আজকের আলোক-শিল্পী শুধু নাটককে সাহায্য কবাব জন্তেই চরিত্রের উপর আলোকপাত করে না, সে আলোর বস্ত্রায় দর্শকদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই নাটক নিশ্বেজ হয়ে পড়ে, দর্শকরা ঝিমোয়, তখনই আলোকশিল্পী অকারণে বিদ্যুৎ চমকিয়ে তাদের মনে ঝড়ের সম্ভাবনা তুলে অমথ্য ভয় দেখায়। শিল্পনির্দেশকও আজ পেছিয়ে নেই। পাঁচ মিনিট অন্তর মঞ্চ ঘুরিয়ে, ঘন ঘন দৃশ্যপরিবর্তন কবে সেও আজ দর্শকদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এই দক্ষিণ কলকাতার বডলোক ব্যারিস্টারের প্রাসাদ, তাবপরই কুঁড়েঘর বস্তি, সেখান থেকে এক লাফে জাহাজের ডেক কিংবা গুহার অন্ধকার, আবার সেই পার্শী থিয়েটারকে ফিবিয়ে আনা হয়েছে; পরী ওড়ার জায়গায় আজকের নাটক অলুয়ায়ী উড়ছে প্লেন, মঞ্চে ঘোড়ার বদলে আসছে ট্রেন।

স্বরজিৎ মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। বনিক-মঞ্চের এইসব কারসাজিভরা প্রযোজনার বিরুদ্ধে কথা বলবে কে! কোথায় সেই আগেকার দিনের নির্ভীক সমালোচকের দল। নিয়ন্ত্রণ কবে পাঠালেও আজকের দিনের সমালোচক প্রথম বাজে নাটক দেখতে আসেন না—পাছে যদি বেকাস কিছু লিখে ফেলেন; ভাল নাটককে ভাল বলারও তো বিপদ আছে! যদি মাত্র পঞ্চাশটি অভিনয়ের পর অল্প শেষ রজনী লিখতে হয় তখন সেই বিজ্ঞ সমালোচকের মান থাকে কোথায়! আবার খারাপ নাটককে খারাপ বলার বিপদও ততোধিক, কে বলতে পারে সেই নাটকই হয়তো পাঁচশো রজনী চলে নাট্যজগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে। সেইজন্তে সমালোচকবা আসেন কিছুদিন বাদে, যদি জানতে পারেন সোনার কোটোব রিপোর্ট ভাল, তা হলে আর বলতে হয় না। বেশ ফলিয়ে পাঁচ কলম লিখে দেন।

স্বরজিৎ চোখ দুটো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে, ভেতরটা তার জালা করছে। ভাবে, যে দেশে সমালোচকরা

সোনাব কোঁটোর ভয়ে নিজেদের মনের কথা লিখতে পারে না, সে দেশে দর্শক যে গড্ডলিকাগ্রবাহের মত যেখানে ভিড় সেখানে গিয়েই ভিড় কববে, এতে আর আশ্চর্য কি। এই বিজ্ঞানসর্বশ্ব যুগের বিজ্ঞান দর্শক প্রত্যেক শত রজনীতে অন্ততঃ তিনবার করে তৃতীয় শ্রেণীর একই নাটক দেখে আসে।

স্বরজিতের চোখে জল এল। বেশ কিছুদিন বাদে আজ আবার তার নটগুরুর কথা মনে পড়ল। কত নতুন নাটক কত বকমভাবে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, অথচ দর্শক পেলেন না। হায় নটগুরু! তুমি সত্যিকারের ভাল নাটক দিতে চেয়েছিলে, তুমি তো সোনাব কোঁটোর দিকে চোখ বেখে নাটক নামাতে না, তাই তো তোমাকে নাট্যজগৎ থেকে অভিমানভরা মনে বিদায় নিয়ে চলে আসতে হল।

ভবানীপুরের কাছাকাছি এসে স্বরজিতের ট্যাক্সি হঠাৎ ব্রেক কষল। তবু সামলাতে পারল না, ধাক্কা মাবল একটা কুকুরকে। বাস্তার বেওয়াবিশ কুকুর, তার হয়ে ঝগড়া করতে কেউ ছুটে এল না, কাদতে কাদতে সে ফুটপাথের দিকে চলে গেল, ট্যাক্সি-ড্রাইভার আবার স্টার্ট দিল গাড়িতে। কয়েক সেকেন্ডেব মাত্র ঘটনা। তবু ওই নমুশটুকু জন্তো অন্ততঃ স্বরজিতের চিন্তার শ্রোত থেমেছিল। কিন্তু গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওই আর্ট কুকুরটাব কান্না যেন ছুটেতে লাগল। চারদিক থেকে যেন কান্নার রেশ ভেসে এসে একটা ব্যাকুল ধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে। স্বরজিৎ নিজের মাথার মধ্যে গুনছে তার প্রতিধ্বনি। গুমবে গুমবে কে যেন কাদছে। কিন্তু কে সে।

বিদ্যুতের আলোব মত চমকে উঠল একজনের করুণ মুখ, স্বরজিৎ তখনই চিনতে পারল তাকে।

মঞ্চকন্ঠা।

বন্দিনী মঞ্চকন্ঠা দৈত্যেব কাছ থেকে মুক্তি পাবাব জন্তো আকুল স্বরে কাদছে। কিন্তু কে তাকে উদ্ধাব করবে, কে তার চোখের জল মোছাবে।

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভেসে আসছে দৈত্যকুলের অট্টহাসি। কারণ সে জানে মঞ্চকন্ঠার নিফল কান্না শোনবার মত কোন সংসাহসী লোক তার মায়াপুরীতে নেই।

স্বরজিৎ ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে যখন বাড়িতে ঢুকল প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পদ্মাবতী তাব জন্তো অপেক্ষা কবছিলেন, মাডা পেয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। কিন্তু স্বরজিতের চেহারা দেখে মনে মনে বিচলিত না হয়ে পারলেন না। অবিশ্রান্ত শুকনো চুল, চোখের তলায় কালি। কপালেব শিরগুলো ফুলে উঠেছে। উদ্বিগ্ন স্বরে

প্রশ্ন করলেন, এ কি চেহারা হয়েছে রে? কোথায় ছিলি সাবাদিন?

স্বরজিৎ অত্মমনস্কভাবে উত্তর দিল, ঘুরছিলাম।

সারাদিন ধরে?

আরও ঘুরতাম, কিন্তু শবীবটা ভাল লাগল না, তাই ফিবে এসেছি।

পদ্মাবতী স্বরজিতের কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন: গা যে পুড়ে যাচ্ছে থোকা। চল, শুবি চল।

স্বরজিৎ বাধা দিল না, মায়ের সঙ্গে গিয়ে বিছানাব উপর শুয়ে পড়ল। নরম বিছানাব মধ্যে আশ্রয় নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। বলল, জরই হবে বোধ হয়, মাথায় বড ঝঙ্কা।

পদ্মাবতী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন: তুই যে আজকাল কাকর কথা শুনিস না। যত্ন না নিলে কি শরীর থাকে? এখন চুপচাপ শুয়ে থাক। মাধু ফিবে আসুক, দরকার হলে ডাক্তার ডাকতে হবে।

স্বরজিৎ চোখ বুজে ক্লান্ত স্বরে বলল, ডাক্তাবেব দরকার নেই মামণি, তুমি আমাব কাছটিতে বসে কপালে একটু হাত বুলিয়ে দাও।

পদ্মাবতী স্নেহে ছেলের মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কী এত ভাবছিস থোকা? সাবান্ধ কপাল তোর কুঁচকে থাকে?

স্বরজিৎ চোখ মেলে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় প্রশ্ন করল, কবে সে আসবে মামণি?

পদ্মাবতী ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস কবলেন, কার কথা জিজ্ঞেস করছিস থোকা?

সেই রাজকুমার।

রাজকুমার!—পদ্মাবতী বিস্মিত হন।

স্বরজিৎ একই ভাবে বলে যায়, আমি জানি একদিন না একদিন রাজকুমার এ মঞ্চরাজ্যে আসবেন—যেমন এসেছিলেন গিবীশচন্দ্র, এসেছিলেন শিশিরকুমার। সেই নতুন যুগেব রাজপুত্র ঠিক খুঁজে বার কববে সোনাব কোঁটো, ভেদ করবে তার রহস্য। সোনাব ভোমবাকে টিপে মেরে নিধন করবে দৈত্যকুল। তবেই মঞ্চকন্ঠা মুক্তি পাবে।

মঞ্চকন্ঠা।—এ তুই কী সব বলছিস থোকা?

স্বরজিৎ আকুলস্বরে বলে, তুমি তাব কান্না গুনতে পাচ্ছ না মামণি? আমি যে স্পষ্ট গুনতে পাচ্ছি। আমার মঞ্চকন্ঠা কাদছে।

চিন্তিত পদ্মাবতী স্বরজিতকে আর কোন কথা না বলে পাশের ঘবে গিয়ে চাকরকে হুকুম করলেন শীগগির ডাক্তারবাবুকে খবব দিতে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

জি থা রা

জগদীশ মোদক

সকালে ধীরার সঙ্গে একটু বাগারাগি হয়েছিল। অফিস যাওয়াব আগে অনিমেঘ মেঘ-থমথমে আবহাওয়া দেখে গিয়েছিল। কিন্তু বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখল সে মেঘ কেটে গেছে। সমস্ত আকাশ জুড়ে নীল নরম প্রশান্তি বিরাজ কবছে; ঘবের টুকিটাকি কাজকর্ম কবতে কবতে ধীরা গুনগুন স্তবে গান গাইছে। ওকে যেন বড় খুশী আর উজ্জল দেখাচ্ছে।

আবহাওয়া দেখে অনিমেঘ আশস্ত হল। ইঞ্জি-চেনারটায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, তুমি আবার এই দুর্বল শরীর নিয়ে এত কাজকর্ম করছ কেন? রতনের মা কোথায় গেছে?

সে খোকনকে নিয়ে একটু বেড়াতে গেছে।— অনিমেঘের দিকে তাকিয়ে ধীরা হেসে জবাব দিল। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে সুরমাধনাও চলতে লাগল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অনিমেঘ বলল, আজ হঠাৎ এমন খুশীর বান ডাকল কেন?

চিঠি।—ধীরা হেসে জবাব দিল। তাব চোখেমুখে একটা কোঁতুক নাচতে লাগল। অনিমেঘের কাছে ব্যাপারটা কেমন রহস্যময় মনে হল। তবু সে রসিকতা করে বলল, তাব মানে! আমাব অসাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে প্রেমপত্র বিনিময় কবছ নাকি আজকাল।

কপট ক্রোধে চোখ পাকিয়ে ধীরা এগিয়ে এল। অনিমেঘের চুলে হুঁ টান দিয়ে বলল, আর এমন কথা বলবে!

অনিমেঘ হাসতে হাসতে বলল, অগ্নায়টা কি বলেছি। তোমার এই ব্যবহারেই তো আমার কথাব সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

আবার।—বলে ধীরা অনিমেঘের চুলে আর একটা টান দিল।

এবার ধীবার হাত ধরে তাকে কাছে টানল অনিমেঘ। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল ধীরা। কিন্তু দুর্বল শরীরে পেবে উঠল না। অনিমেঘ তাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় দেখল না ধীরা। অনিমেঘ তাকে আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করল, কার চিঠি পেয়েছ?

স্বলতার।—ধীরা জবাব দিল।

স্বলতা, মানে তোমার সেই বন্ধু, যার পলাশবনীতে বিয়ে হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—ধীরা বলল, তোমার ছাড়া তো কোনও কাজ হল না। আজ পর্যন্ত একটা জায়গা সিলেক্ট কবতে পারলে না। অথচ দেখ এক সপ্তাহের মধ্যে আমি কেমন ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

কি বকম?—অনিমেঘ উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করল।

ধীরা বলল, স্বলতাব কাছে গুনেছিলুম পলাশবনীতে অনেকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্তে বেড়াতে যায়। তাই একটা চিঠিতে ওকে অনুরোধ করেছিলুম, ওদেব ওখানে মাসখানেকের জন্তে একটা বাড়িভাড়া ব্যবস্থা করে দেওয়াব জন্তে। তাতে ও লিখেছে আলাদা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কোনও দবকার নেই। কোম্পানি থেকে ওবা যে কোয়ার্টার পেয়েছে তা ওদেব দুজনের প্রয়োজনের পক্ষে অতিরিক্ত। স্বতরাং আমরা গেলে ওদেব কোয়ার্টারেই স্বচ্ছন্দে থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। তাতে ওদের পক্ষে কোনও রকম অসুবিধের কারণ নেই। বরঞ্চ গেলে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে খুব খুশী হবে। কিছুদিন বেশ আনন্দে দিন কাটাতে পারবে।

এত কথা একসঙ্গে বলে ধীরা এবার মুখ তুলে অনিমেঘের চোখে চোখ রাখল। তারপর অপূর্ব ভঙ্গীতে গ্রীবা হেলিয়ে বলল, কেমন ব্যবস্থাটা করলুম বল তো!—এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার ক্রেডিট।

অনিমেঘ কোনও জবাব দিল না। ধীরার মুখের দিকে কেমন বোবা চোখে তাকিয়ে রইল।

ধীরা বলল, কি মশায়, চুপ করে রইলে যে! তোমার চেয়ে আমি যে ষাণ্ঠে করিতকরী এখন স্বীকাব করছ তো?

অনিমেঘ কোনও জবাব দিল না। তেমনি নীরবেই তাকিয়ে রইল।

কি, পরাজয় স্বীকাব করতে লজ্জা হচ্ছে বুঝি!—কৌতুকে চোখ নাচিয়ে ধীরা জিজ্ঞেস করল।

অনিমেঘকে তবু চুপ করে থাকতে দেখে তার গলায় এবার একটু বিরক্তি প্রকাশ পেল। তোমার মতলবটা কি বল তো? কথাটা শুনে এমন চুপ করে গেলে কেন? চেঞ্জে যাওয়ার ইচ্ছে নেই নাকি?

না, মানে—

অনিমেঘের গলায় একটু ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ পেল। কি জবাব দেবে ভেবে ঠিক করতে পারল না।

কি?—ধীরা অনিমেঘের দিকে তাকিয়ে বইল।

একটা ঢোক গিলে অনিমেঘ বলল, না, বলছিলুম যে ব্যবস্থাটা কি ভাল হবে?

ধীরা অসহিষ্ণু গলায় জবাব দিল, মন্দটা যে কি তা তো আমি বুঝতে পারছি না। তারা নিজেবাই যখন এই ব্যবস্থাটা কবতে চাইছে তখন আমাদের পক্ষে এই হেজিটেশানের কোনও মানে হয় না।

অনিমেঘ আমতা আমতা করে বলল, না, তা নয়, তবে—

কি তবে?—অনিমেঘের বিব্রত ভাব দেখে ধীরা এবার রীতিমত রেগে উঠল।

অনিমেঘ গলার স্বরে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল : না, বলছিলুম যে পলাশবনী জায়গাটা তো এমন কিছু ভাল নয়। বরঞ্চ অল্প কোথাও যাওয়া ষাক।

অল্প আর কোথায় যাবে তুমি। আজ পনেরো-ষোল দিন থেকে তো কিছুই ঠিক কবতে পাবলে না। আমি উজোগী হয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা কবলুম তো তোমার অমনি অপছন্দ হল। থাক্ তবে—কোথাও আব গিয়ে কাজ নেই।

ধীরা রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনিমেঘ কিছুক্ষণ বিমূঢ় অবস্থায় চেয়াবটায বসে রইল। তারপর একসময় উঠে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে এল।

একটা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ধীরা বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনিমেঘ আস্তে আস্তে এসে তার পিছনে দাঁড়াল। তার কাঁধের ওপর আলতো করে একটা হাত রেখে মুহূ গলায় বলল, যখন পয়সা খরচ কবে যাচ্ছি তখন কোনও ভাল জায়গায় যাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত নয় কি? মিছিমিছি তুমি এত অবুঝ এত উতলা হচ্ছে কেন?

ধীরা বাইরের দিকে তাকিয়েই জবাব দিল, পলাশবনী জায়গাটা যে ভাল নয় তা তোমায় কে বললে? স্থলতার কাছে গুনেছি ওখানে দলে দলে চেঞ্জারবা যায়।

অনিমেঘ কোনও জবাব দিল না। ধীরা বলল, আসলে এই রকম ছুতোনাতা কবে ব্যাপারটাকে তুমি এড়িয়ে যেতে চাও।

ছি ছি ধীরা, এসব কি বলছ!

ঠিকই বলছি।—ধীরা অভিমানক্ষুদ্র গলায় বলল, আমার জীবনের থেকে পয়সার ওপর মায়াটা তোমার বেশী।

আবার ছেলেমানুষী শুরু করলে।—অনিমেঘ এবার ধীরাব মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। দেখল, অভিমানে ধীরার চোখ ছুটিতে সত্যিই জল এসে গিয়েছে। ধীরার রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি দেখে বড় মায়া হল। মনটা বড় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ধীরার মাথাটা নিবিড় করে বুকের ওপর চেপে ধরে স্নেহার্জ গলায় বলল, যাব—ওইখানেই যাব। তুমি স্থলতাকে একটা চিঠি লিখে দাও।

অনিমেঘের বুকের ভেতর মাথাটা গুঁজে ধীরা আবেশ-জড়ানো গলায় বলল, তা হলে তুমি তাড়াতাড়ি ছুটি নেওয়াব্য ব্যবস্থা কব।

অনিমেঘ তখন দুর্বল মুহূর্তে কথাটা বলে ফেলেছিল বটে, কিন্তু পরে নিজের নিবুদ্ধিতার কথা ভেবে শিউরে উঠল। ভাবল, না—তা হয় না। আর যেখানেই যাওয়া সম্ভব হোক না কেন, পলাশবনীতে যাওয়া তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না।

পলাশবনীর কথা ভাবলেই অনিমেঘের মনটা কেমন যেন একটা গ্লানিতে ভরে ওঠে। আট বছর আগের ব্যাপারটা এখন হৃৎস্পন্দনের মত মনে হয়।

হৃৎস্পন্দনের মতই যে ব্যাপারটাকে যেন থেকে বোড়ে

ফেলেছে তাকে আবার টেনে এনে বর্তমানের স্থায়ী জীবনটাকে চিড় খাওয়াতে চায় না।

কিন্তু এ কি অঘটন ঘটতে চলল! অনিমেষ ভাবে, হঠাৎ এভাবে ধীরার প্রস্থাবে সায় দিল কেন। সে নিজেই তো নিজের সর্বনাশ ডেকে আনার ব্যবস্থা করছে।

অনিমেষ ভাবে, কি করে পলাশবনীতে যাওয়ার প্রোগ্রামটা বানচাল করা যায়? কিন্তু কোনও উপায়ই খুঁজে পায় না।

এদিকে ধীরাও স্থলতাকে চিঠি পাঠিয়ে মনের আনন্দে কদিন খুব গোছগাছ করছে।

রোজ একবার এই নিয়ে অনিমেষের সঙ্গে আলোচনায় বসছে। কি কি সঙ্গে নিতে হবে, কি বাদ দিতে হবে, কতদিন থাকা হবে, ইত্যাদি। তাব স্মৃতি এবং উৎসাহ দেখে অনিমেষও যেন আরও বিব্রত হয়ে পড়েছে। ধীরার মনেব উৎসাহ আনন্দ দিন দিন যত বেড়ে চলেছে গুরুত্ব হুশিঙ্গাটা তত ভারী হয়ে বৃকে চাপছে। এদিকে দিনও ঘনিষে আসছে। আর চারদিন পরেই তারা যাত্রা করবে বলে স্থির করেছে। হুশিঙ্গাটা তাই পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে অনিমেষকে।

একদিন কাজ থেকে ফেরার পথে অনিমেষ সংকল্প করল, না, আর নয়, এই হুশিঙ্গার নিষ্পেষণ থেকে সে মুক্ত হবে। আজকেই এর একটা বিহিত করবে। ধীরার কাছে একটা মিথ্যা অজুহাত ফাঁদবে।

বিকলে চা খেতে খেতে বা চা খাওয়ার পর কথাটা পাড়বে ভেবেছিল। কিন্তু ধীরা সব ভেস্তে দিল। আবদারে গলায় বলল, কতদিন বেহালাটা নিয়ে বস নি, আজ একটু বস না।

অনিমেষ প্রথমটায় একটু বিচলিত বোধ কবল। তারপর ভাবল, বরঞ্চ সেই ভাল, বেহালা শুনে ধীরাব মেজাজটা যখন খুলীতে ভবে থাকবে সেইসময় সে কথাটা পাড়বে। তাতে হয়তো কাজ হবে।

ধীরা নিজেই বেহালাটা এনে অনিমেষের হাতে দিল। অনিমেষ চেয়ার ছেড়ে বিছানার ওপর এসে বসল।

দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছিল। ধীরা আজ আর ঘরে আলো জালল না। অন্ধকারে সমস্ত চেতনাকে মুগ্ধতায় কেন্দ্রীভূত করে বেহালা শুনতে লাগল।

মনে একটা গ্লানি চেপে থাকার দরুন অনিমেষ আজ আর তেমন আন্তরিকভাবে বাজাতে পারছিল না। নেহাত যেন যান্ত্রিকভাবেই বাজাচ্ছিল। ধীরার কাছে সেটা ধবা না পড়লেও অনিমেষেব নিজের কানেই তা বিদ্রী লাগছিল। তাই বেশীক্ষণ বাজাতে পারল না।

থামলে কেন?—ধীরা বলে উঠল।

অনিমেষ ক্রান্ত গলায় জবাব দিল, ভাল লাগছে না। আজ মেজাজটা বড় বিগড়ে আছে।

কেন, কি হয়েছে?

অন্ধকারে ধীরার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ আস্তে আস্তে বলল, মহা মুশকিলে পড়েছি ধীরা। কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না।

কি হয়েছে?—ধীরা উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করল।

একটু চুপ করে থেকে অনিমেষ বলল, আমাদের সেকশানে আর একজন যে কেমিস্ট ছিলেন তিনি ছুটি নিয়েছেন। তিনি জয়েন না করা পর্যন্ত আমাকে ছুটি দেবে না বলছে।

তিনি কবে জয়েন করবেন?

কালকেই তাঁর জয়েন কবাব কথা ছিল, কিন্তু তিনি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে আরও এক মাসের ছুটি চেয়েছেন।

তার মানে এক মাস পবে তিনি জয়েন করবেন! তা হলে আমাদের যাওয়া হবে কি করে?

তাই তো আমি ভাবছি। অনিমেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ধীরা খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। তারপর একসময় বলল, না, শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হবে না দেখছি। অথচ আমি স্থলতাকে চিঠি দিয়ে বসেছি।

ধীরার গলার স্বরটা বড় ত্রিগুণ শোনা। শুনে অনিমেষ যেন একটু হুঃখ পেল। তার মনে পড়ল, সেই প্রথম দিন থেকেই—যেদিন ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিল ধীরাকে নিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গা থেকে ঘুরে আসার জন্তে, সেইদিন থেকেই ধীরা মনে কত আশা কত আনন্দ লালন করে আসছে। কলকাতার বাইরে জীবনে সে কখনও কোথাও গিয়ে থাকে নি। পাহাড়, ঝরনা, নদী, তরঙ্গায়িত প্রান্তর, প্রান্তর জুড়ে নীল আকাশের বিস্তৃত চেহারা—এ সব তার কাছে যেন স্বপ্নলোকের

মায়া। গল্প উপস্থাসে বিবরণ পড়ে মনের মধ্যে একটা ছবি আঁকা হয়ে আছে। সেই ছবির রাজ্যে বেড়াতে যাওয়ার স্বযোগ পেয়ে স্বভাবতই তার মনটা ছেলেমানুষের মত আনন্দ আর খুশীতে উচ্ছল হয়ে আছে। কোথায় যাওয়া হবে, কতদিন থাকা হবে—এইসব নিয়ে রোজ দুবেলা কত উৎসাহে অনিমেষেব সঙ্গে আলোচনা কবতে বসেছে। ওর এতদিনের সেই উৎসাহ এবং উত্তমকে আজ এমনই করে নিবিষে দিতে অনিমেষেব বড় কষ্ট হচ্ছিল। সে বড় বিচলিত বোধ কবতে লাগল। যে কথাটা বলবে ভেবেছিল তা আর বলা হল না।

অন্ধকারে ধীরার একটা হাত টেনে নিয়ে সাঙ্গনা দেওয়ার ছলে সে বলল, তুমি অত মন খারাপ করছ কেন? দেখি, শেষ পর্যন্ত কি করতে পাবি।

ছুটি যখন পাচ্ছ না তখন কি আর করবে।—অন্ধকারে ধীরার গলার স্বরটা কান্নাব মত শোনাল।

একটা কিছু উপায় নিশ্চয় করব।—অনিমেঘ আশ্বাস দিয়ে উঠে পড়ল।

অনিমেঘের আশ্বাসে ধীরার মনে কিন্তু এতটুকু আশা ফিরে আসে নি। হতাশায় সে যেন একেবারে মুণ্ডে পড়েছে। বেড়াতে যাওয়ার আনন্দে ওর মনে কদিন ধরে যে উচ্ছলতা ছিল তা যেন একেবারে খিতিয়ে পড়েছে। কাজকর্ম, কথাবার্তা—কোন কিছুতে তেমন উৎসাহ নেই। বেচারীকে এইভাবে দেখে অনিমেঘের বড় কষ্ট হচ্ছিল। বড় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কবছিল।

দ্বিতীয় দিনে সে বড় বিচলিত হয়ে পড়ল। রাত্রে ধীরাকে কাছে টেনে আদর করতে করতে বলল, ধীরা, আমি একটা কথা ভেবেছি।

কি?—ধীরা নিরুৎসাহে জিজ্ঞেস কবল।

ধীরার কপালের ওপর এসে-পড়া আলতো চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে অনিমেঘ বলল, ভেবে দেখলুম, আমি না যেতে পারার জন্তে তোমাব যাওয়া বন্ধ রাখার কোন মানে হয় না। কারণ যেখানে যাওয়া স্থির হয়েছে সেখানে আমি না গেলে তোমায় যে খুব অস্ববিধেয় পড়তে হবে তা তো মনে হয় না। ওঁদেব কোথার্টারে যখন থাকার ব্যবস্থা আছে তখন আর অত ভাবনা কি।

তোমার বান্ধবী আছেন, তাঁর খামী আছেন। কোন অস্ববিধেয় পড়লে তাঁরা নিশ্চয় কর্তব্যে কোনরকম ত্রুটি রাখবেন না।

তা হয়তো বাখবেন না, তাই বলে আমি একা যাব নাকি!—ধীরা মুহু গলায় জবাব দিল।

তাতে অস্ববিধেটা কি?—অনিমেঘ আশ্বাসে আশ্বাসে বলল, কোন অস্ববিধেয় তোমায় পড়তে হবে না। তুমি তোমার বান্ধবীকে একটা চিঠি লিখে দিও। কবে, কখন, কোন্ ট্রেনে এখান থেকে যাচ্ছ সে কথা চিঠিতে উল্লেখ করে সময়মত ওঁদের স্টেশনে থাকার জন্তে অনুরোধ করো। ওখানে স্টেশন থেকে ওঁরা তোমায় তাঁদের বাড়ি নিয়ে যাবেন আর এখানে আমি ট্রেনে তুলে দেব। স্বতরাং তোমার অস্ববিধেটা কিছুই হচ্ছে না।

তা না হোক, তবু আমি একা যাব না।—ধীরা দৃঢ় গলায় জবাব দিল।

অনিমেঘ চুপ করে রইল। ধীরার কপালের ওপর তার হাতটা কিছুক্ষণ থেমে বইল। ধীরাও কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ দুজন শুধু পরস্পরের খাসপ্রশ্বাস শুনল। একসময় অনিমেঘ আশ্বাসে আশ্বাসে ডাকল, ধীরা।

কেন?—ক্লান্ত গলায় ধীরা জবাব দিল।

একা যেতে তোমার আপত্তি কেন?

ধীরা মুহু অভিমানের স্ববে জবাব দিল, একা গিয়ে আমার কি কিছু ভাল লাগবে?

ওঃ, এইজন্তে!—অনিমেঘ হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করতে চাইল। তারপর ধীরাকে আরও নিবিড় আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিয়ে স্নেহবিজড়িত গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার বুঝি খুব কষ্ট হবে?

ধীরা কোন জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ পরে ধীরা একসময় বলল, জান, আজ আবার স্থলতার একটা চিঠি পেয়েছি।

কি লিখেছে?

লিখেছে—ভুই আসবি শুনে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে তা কি বলব। কিন্তু তারপর আর কোন চিঠিপত্র দিলি না কেন? কবে আসবি জানাস—এইসব কথা।

ভদ্রমহিলা দেখছি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।—অনিমেঘ মুহু হেসে বলল।

হবে না, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটাই তো ছিল অল্প রকম। একটু নীরব থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে বলল, সত্যি আমিও কত আনন্দে ছিলাম দুই বছর কতদিন পবে আবার দেখা হবে—এই কথা ভেবে।

ধীরে দীর্ঘশ্বাস শুনে অনিমেঘ ভাবল, শুধু দেশভ্রমণের আনন্দেই ধীরে মেতে ওঠে নি, প্রিয়সখীর সামিধ্য পাওয়াব আকর্ষণও তার মনকে খুশীতে ভবিষ্যে বেঁধেছিল। আর তাই বুঝি ও পলাশবনী ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চাইছে না।

অনিমেঘ ভাবল, অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইলেও ওকে যখন রাজী করানো যাবে না তখন পলাশবনীতেই ওর যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং তা করতেই হবে। কেন না ওর স্বাস্থ্যের জন্তে ওইরকম একটা জায়গায় গিয়ে কিছুদিন থাকা ওর পক্ষে এখন বিশেষ প্রয়োজন।

ধীরে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনিমেঘ আবার বলল, যা বললুম, তুমি তাই কর। নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তোমার এইরকম ছেলেমানুষী না কবাই উচিত।

আমি একা যাব নাকি।

তোমার অস্থবিধে তো কিছু হচ্ছে না। তুমি চলে যাও। তারপর দেখি, পরে যদি আমি ছুটির ব্যবস্থা করতে পারি তো গিয়ে হাজির হব।

ধীরে কোন জবাব দিল না। আবার নানা কথার পর অনিমেঘ শেষ পর্যন্ত ধীরাকে রাজী করাল। তারপর সেই রাত্রেই ঠিক হল, কবে কখন কোন্ ট্রেনে ধীরে থোকনকে নিয়ে যাত্রা করবে। সঙ্গে ধীরে কি কি নেবে তারও মোটামুটি একটা ফিরিস্তি তৈরি হল।

যাবার দিন ধীরে চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। অনিমেঘকে বার বার বলতে লাগল, সত্যি, এভাবে যেতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। তুমি কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পার ছুটি নেওয়ার ব্যবস্থা কর।

ধীরার দিকে তাকিয়ে ওকে এই মুহূর্তে বড় অসহায় আর করুণ মনে হচ্ছিল অনিমেঘের। ওকে এইভাবে ছেড়ে দিতে তার নিজেরও মনে বড় কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু এর জন্তে সে কীহ বা করতে পারে।

সাহসনা দেওয়ার ছলে অনিমেঘ একসময় বলল, যাব, আমি নিশ্চয় যাব, তুমি ভেব না।

ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত অনিমেঘ পাশে বসে থেকে ধীরাকে নানা কথায় সাহসনা দিতে লাগল। থোকনকে কোলে বসিয়ে আদর করতে লাগল।

শেষ ঘণ্টা বেজে গেল। অনিমেঘ ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। তারপর গাড়ির জানলায় ধীরার হাতের ওপর হাত রেখে চলন্ত ট্রেনে বসে কিছুক্ষণ এগিয়ে চলল।

ধীরে ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে তারও মনটা বেদনায় আগুত হতে চাইছিল। গাড়ির গতি একটু বাড়তেই সে হাতটা ছেড়ে দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। তাবপর যতক্ষণ দেখা গেল চলন্ত গাড়িটার দিকে বড় করুণ চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

দুই

অনিমেঘ বলে দিয়েছিল ভোর পাঁচটায় ট্রেনটা পলাশবনীতে পৌঁছবে। ধীরার তাই চিন্তা ছিল, অত ভোরে এসে হযতো কেউ স্টেশনে তার অপেক্ষায় থাকবে না। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমেই ওদেব দেখা পেল। স্থলতা দেখতে পেয়ে ছুটে ছুটে এসে প্ল্যাটফর্মের ওপরেই তাকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে থোকনকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে চুমু খেতে খেতে বলল, ইস, কি লাভলি দেখতে হয়েছে তোমার বাচ্চাটাকে রে!

* * *

ছোট্ট শহরের একপ্রান্তে বেশ নিরিবিলিতে ওদের কোয়ার্টার। গাড়ি কবে আসতে আসতে ধীরে বাস্তার হুপাশের চেহারা দেখছিল। শহরের খানিকটা জায়গা একটু ঘিঞ্জি মত। তারপরেই অন্তরকম চেহারা। বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় এক একটি স্ববন্দ্য বাড়ি। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িরই চারপাশ ঘিরে অনেকখানি জায়গা। পাঁচিল ঘেবা। তাতে নানারকম ফুলের গাছ থেকে শুরু করে আম জাম দেবদারু—সবকিছুই আছে। কোন কোন বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে একরকম লম্বা লম্বা গাছ দেখল ধীরে যা আগে কোথাও দেখে নি। স্থলতাকে জিজ্ঞেস করে তার নাম জানল, ইউক্যালিপটাস।

এখানকার সবকিছু বড় অদ্ভুত আর ভাল লাগছিল

ধীরার। একসময় উচ্ছ্বসিত হয়ে স্থলতাকে বলেই বলল,
কি অদ্ভুত ভাল লাগছে রে তোদের এই জায়গাটা।

স্থলতা বলল, কিছুদিন থাক না, দেখবি আরও কত
ভাল লাগবে।—একটু চুপ করে স্থলতা আবার বলল,
ভদ্রলোক এলেন না, এই যা দুঃখ।

স্থলতার গলায় আক্ষেপের স্বর বেজে উঠল।
কিছুক্ষণের জন্ত ধীরার মন আবার বিষাদে ছেয়ে গেল।

*

*

পলাশবনীতে কিছুদিন থাকার পর স্থলতার কথার
সত্যতা ধীরা সত্যিই উপলব্ধি করল। পলাশবনীর
চারপাশেব প্রাকৃতিক পরিবেশ তার চোখে যেন মোহেব
অঙ্গন মাখিয়ে দিল।

রোজ দুবেলা বেড়াতে বেরোয়। খুব ভোরে উঠে
স্থলতাদের বেড়াতে বেরুনো অভ্যাস। প্রথম দু-একদিন
অত ভোরে ধীবাকে ঘুম থেকে তুলতে ওদের রীতিমত
সঙ্কোচ হয়েছিল। কিন্তু ধীরার আগ্রহ দেখে এখন
রোজই ওকে ডেকে তোলে। তারপর ভোবের অস্পষ্ট
আলোয় তারা বেড়িয়ে পড়ে। ভোরেব স্নিগ্ধ বাতাসটা
বড় ভাল লাগে। হাঁটতে হাঁটতে এক-একদিন তাব
শহর ছেড়ে বহুদূরে চলে যায়। কোনদিন ক্ষীণস্রোতা
নদীটার ধারে গিয়ে নরম বালুচরে শয়ন করে খালি পায়ে
পায়চারি করে। কোনদিন গোড়ালি-ডোবা জল পেরিয়ে
ওপারের শালবন থেকে ঘুরে আসে। কোনদিন বা কোন
টিলার ওপর গিয়ে বসে। হাসি গানে গল্পে মুহূর্তগুলো
মুখর হয়ে ওঠে।

স্থলতার মত বীরেনও খুব আমুদে। সারাদিন
হাসপাতালে ছুরি কাঁচি রোগ শোক কামাব সঙ্গে
মোলাকাত করেও ভদ্রলোকের মনের উচ্ছলতা এতটুকু
কমে না। বাড়িতে যতটুকু সময় থাকে সব সময় প্রাণের
উচ্ছলতায় সবাইকে মাতিয়ে বাখে। খোকনটা তো এই
কদিনেব মধ্যেই তার খুব বশীভূত হয়ে পড়েছে। সব
সময় তার কাঁধে-পিঠে উঠে লাফালাফি করছে।

তবু এত আনন্দের ভেতরেও ধীরা মাঝে মাঝে বড়
আনমনা হয়ে পড়ে। অনিমেষের জন্তে মনটা কেমন করে
ওঠে। ভাবে, অনিমেষ থাকলে এই আনন্দ আরও কত
মধুর হয়ে উঠত।

প্রতি সপ্তাহেই সে অনিমেষকে দুখানা কবে চিঠি
লিখেছে, এর প্রত্যেকটি চিঠিতেই সে অনিমেষকে ছুটি
নিষে আশার জন্তে অত্ননয় করেছে। একটা চিঠিতে তো
সে বীতিমত কাব্যি করেছে। লিখেছে, তুমি কাছে
নেই অথচ মনে হয় তোমার সমস্ত সত্তা আমাকে সব সময়
ঘিরে রয়েছে। বাতাসের শব্দে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে
পাই। বেড়াতে বেড়িয়ে ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস যখন
কপালেব ওপর এসে-পড়া চুলগুলো নিয়ে খেলা করে তখন
মনে হয় যেন তুমিই আমায় আদর করছ। চোখের
পাতা দুটো আবেশে বুজে আসে। আমি যেন পাগল হয়ে
যাই। ওগো, এমনি করে কেন তোমার হৃদয়েব সব
মাধুরী আমায় ঢেলে দিলে। আমি যে আমাব ছোট্ট
হৃদয়পাত্রে তা ধবে রাখতে পারছি নে। কেমন করে এই
ভার বয়ে বেড়াব—ভাবনায় মরি।

এই চিঠিব জবাব লিখতে বসে অনিমেষের হৃদয়ও
যথেষ্ট উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। চিঠির ছত্রে ছত্রে তা প্রকাশ
পেয়েছিল এবং এখানে আসবে বলে ধীরাকে যথেষ্ট আশ্বাস
দিয়েছিল। পরবর্তী অগাচ্ছ চিঠিতেও সে আশ্বাস দিয়ে
এসেছে। কিন্তু আজ সন্ধ্যা-পাওয়া তার শেষ চিঠিটার স্বর
অন্ত রকম। তাতে অনিমেষ জানিয়েছে ওদের সেকশানের
আর একজন কেমিস্ট—যিনি ছুটিতে ছিলেন—তিনি
আরও এক মাস ছুটি নেওয়ার জন্তে ও এখন ছুটি পাচ্ছে
না। স্বতরাং ওর পক্ষে এখন পলাশবনীতে আসা সম্ভব
নয়। না আসতে পারাব জন্তে ও খুব দুঃখ প্রকাশ করেছে।
এবং সবশেষে ধীরাকে শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ে থাকার
জন্তে অনেক উপদেশ দিয়ে চিঠি শেষ করেছে।

এই চিঠিটা পেয়ে ধীরার মন আরও খারাপ হয়ে
গেছে। সারাটা দুপুর বিষন্নতায় কেটেছে। বিছানায়
শুয়ে খানিকক্ষণ চোখেব জলও ফেলেছে।

বিকেলের তাকে মনমবা অবস্থায় বসে থাকতে
দেখে স্থলতা বিস্ময়ে বলল, কি ব্যাপার বল তো! তুই
যে দেখছি নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েদেরও হার মানালি।
তারাও তো এত উতলা হয় না।

ধীরা বিষন্ন স্ববে বলল, না রে, আমার কিছু ভাল
লাগছে না।

স্থলতা হাসতে হাসতে বলল, তা মাঝে মাঝে এই

রকম কিছু ভাল না লাগার পর্ব আসা ভাল। তাতে ভালবাসাটাকে উপলব্ধি করা যায়।

একটু থেমে ধীরার পিঠে একটা চাপড় মেরে স্থলতা আঁবাব বলল, নে, ওঠ তাতাভাতি। উঠে হাতমুখ ধুয়ে নে। ওঁর ফেরার সময় হল। এসে যদি তাকে এমনি অবস্থায় দেখেন তো হাজীব রকম কৈফিয়তে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন। তা ছাড়া এমন বিকেলটাও মাঠে মারা যাবে, আজ হয়তো বেড়াতে যেতে চাইবেন না।

ধীবা আরও কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থেকে পূর্বের জানলাটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বইল। বাইরে নিম-গাছেব ঘন সবুজ পাতায় শেষবেলার সোনালী রোদ্দুর ঝিলমিল করছে। আকাশটা আজ প্রশান্ত নীল। পূর্ব-আকাশে মেঘের মাথায় রূপোলী পাড বসানো।

ধীরার বড় ভাল লাগল। সবকিছু কেমন যেন স্মৃতিবাহী বলে মনে হল। স্মৃতির ঝাঁপি হাতভাতে লাগল—কবে কোথায় ঠিক এই রকম একটি বিকেল কাটিয়েছে।

হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়ছে, সেই যে বিয়ের মাস দুই পরে একদিন অনিমেষের সঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল, সেইদিন এমনি একটি বিকেল দেখেছিল। সেদিনও ছিল এমনি শরৎকাল। আকাশ আর বোদুরের ঠিক এমনি রঙ আর এমনি আমেজ ছিল। সেদিনও মাঠের গাছগুলো শেষবেলার রোদ্দুরে এমনি প্রসাদিত হয়ে ছিল। আকাশের এক প্রান্তে ছিল এমনি রূপোলী পাড়ের মেঘ। সেই বিকেলটাই যেন আজ এসে হাজির হয়েছে। হাজির হয়েছে তাদের সেদিনের সেই প্রগাঢ় এবং সলজ্জ চাউনির মাধুরী নিয়ে। সেই মাধুরী যেন মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে ধীরার মনে।

সেই মনোরম বিকেলে মাঠের নির্জনে স্বামীর পাশে বসে একটি নববধূর মনে সেদিন যে রকম আমেজ এসেছিল আজও যেন ঠিক সেই রকম একটি মধুর আমেজে ভরে থাকল ধীরার মনটা। একটু আগের সেই বিবাহ কোথায় দূর হয়ে গেল।

আবেশভরা মন নিয়ে ধীবা শুয়ে থেকে আঁবাব কিছুক্ষণ আকাশ আর রোদ্দুর দেখল। দেখতে দেখতে ভাবল, আজকের এমন সুন্দর বিকেলটাকে সে নষ্ট হতে দেবে না।

হাঁটতে হাঁটতে আজ তারা অনেক দূরে চলে যাবে। এই ভেবে ধীরা যেন লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল।

বীরেন ডিউটি থেকে ফেরার আগেই তার প্রসাধন বেশবাস সবকিছু হয়ে গেল।

বীরেন ফিরলে একসঙ্গে বসে তারা চা খেল। সবাই আগে ধীরার চা খাওয়া হয়ে গেল। স্থলতা আর বীরেন গল্প করতে করতে বড় তাবিষে তারিষে চা খাচ্ছে।

এখন আর রোদ্দুরটা নেই, কিন্তু আলোটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে আছে। ধীবা ভাবল, বেরুতে বেরুতেই হয়তো এই আলোটা স্নান হয়ে যাবে। সে তাই মনে মনে ওঁদের ওপর একটু বিরক্ত হল।

চা খাওয়া শেষ করে বেরুতে সত্যিই একটু দেরি হয়ে গেল। আলোর উজ্জ্বলতা আর একটু স্নান হয়ে এসেছিল। তাবা নদীর দিকের পথটা ধরে এগুতে লাগল।

এই রাস্তাটা দিয়েই তারা বেশীভাগ দিন বেড়াতে আসে। রাস্তাটি বড় সুন্দর। দু পাশে দেওদার আর গুলমোদের সারি। শহরের যত শৌখিন লোক সব যেন এই রাস্তারই দু পাশে বাড়ি তৈরি করেছে। অনেকখানি জায়গা ঘিরে ফাঁকায় ফাঁকায় এক একটি সুরম্য বাড়ি। এই সৌন্দর্যের মধ্যে 'মাধবী ভিলা' নামের বাড়িটা যেন বড় বেমানান অবস্থায় পড়ে আছে। বাড়িটার গায়ে স্ত্রাওলা জমেছে। জায়গায় জায়গায় দেওয়ালের পলস্তারা খসে গেছে। সমস্ত বাগানটা জংলা গাছপালা আর কাঁটালতা ঘেঁষে আছে। তবু বাড়িটার সুন্দর ডিজাইন এবং বাগানেব বিলিতি ঝাউগাছগুলো দেখে বোঝা যায় এ বাড়িটা এককালে দেখতে কত সুন্দর ছিল এবং এ বাড়ি বাসিন্দারা কত শৌখিন ছিল।

এই রাস্তা দিয়ে যেতে আসতে পোড়ো বাড়িটাকে দেখে ধীরার মনে অনেকদিন প্রাণ জেগেছে, এমন সুন্দর বাড়িটা এভাবে অস্বস্তি নষ্ট হচ্ছে কেন! মনে নানারকম কৌতূহল জেগেছে। প্রায় ভেবেছে বাড়িটা সম্পর্কে স্থলতা কিংবা বীরেনকে কিছু জিজ্ঞেস করে। কিন্তু জিজ্ঞেস করা আব হয় নি। আজ মাধবী ভিলাব সামনে দিয়ে যেতে যেতে বীরেনকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা, এই বাড়িটা পোড়ো অবস্থায় আছে কেন? দেখে তো মনে হয় কোন শৌখিন লোকেরই বাড়ি ছিল এটা।

বীরেন বলল, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। যার বাড়ি তিনি খুব শোখিন এবং পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। একজন বিটার্ড জজ। বিটার্ড হওয়ার পর এইখানে এসে মনের মত করে এই বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন।

ধীরা বলল, তা তো বুঝলুম, কিন্তু বাড়িটা এরকম অবস্থায় পড়ে আছে কেন?

ভদ্রলোক আজ পাঁচ-ছ বছর যাবৎ নিরুদ্ভিষ্ট।

কারণ?

বীরেন বলল, কারণ বলতে গেলে তো এক ইতিহাস বলতে হয়।

বলুন না শুনি।—ধীরা আবার উৎসুক হয়ে উঠল।

স্বলতা বিরক্ত গলায় বলল, অল্প একদিন শুনিস। আমি সব জানি। তোকে একসময় বলব ব্যাপারটা। বেড়ানোর সময় ওসব গল্পটল ভাল লাগছে না।

বীরেন বলল, হ্যাঁ, সেই ভাল, আর একদিন বরং আপনাকে গল্পটা শোনানো যাবে।

আচ্ছা, সংক্ষেপেই ব্যাপারটা একটু বলুন না।

স্বলতা হাসতে হাসতে বলল, তুই দেখছি বড় জেদী। তোব পাল্লায় পড়ে সেই ভদ্রলোক যে খুব স্থখে আছেন তা তো মনে হয় না।

স্বলতার বেণীতে একটা টান দিয়ে ধীরা বলল, ভদ্রলোকের ভূঁখে এত যখন কাতর হয়ে পড়েছিস তখন তাঁর দুঃখ লাঘব করাব ভারটা তুই নিজেব হাতেই নে না।

বীরেনও সে রসিকতায় ধোঁগ দিল: ঠিক মতলব দিবেছেন মিসেস মজুমদার। তাতে ওবও মনে শান্তি আসবে এবং আমিও ওব হাত থেকে নিস্তাব পাব।

নিস্তার পাওয়াব ইচ্ছেটা দেখছি খুবই প্রবল।—স্বলতা কটাক্ষ হেনে বলল।

হাসতে হাসতে বীবেন বলল, তা কি করি বল, তোমার আসক্তিটা যদি অল্প কোথাও পড়ে থাকে তো আমায়ও নিস্তারের পথ খুঁজতে হবে বইকি।

ধামুন তো আশনি।—মধ্যস্থতা করে ওদের ঝগড়া ধামিয়ে দিয়ে ধীরা বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন এমনই ঝগড়া না করে বা জানতে চাইছিলুম তাই বলুন।

কি আর শুনবেন।—বীরেন নিরুৎসাহে বলল, এমন কিছু ব্যাপার নয়, সেই চিবাচরিত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি

অর্থাৎ অবৈধ প্রণয়, বিরোধ, আত্মহত্যা—এইসব আর কি।

ধীরা জিজ্ঞেস করল, সেই বিটার্ড ভদ্রলোকেরই এইসব কেলেঙ্কারি নাকি?

বীবেন হাসতে হাসতে বলল, না না, তুমি করতে যাবেন কেন! তাঁর মেয়ে মাধবী—মানে যাব নামে এই মাধবী ভিলা।

দেশলাইয়ের গায়ে একটা সিগারেট বার তুই ঠুকে বীরেন সেটাকে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজলো। তারপর একটু থেমে সিগারেটটা ধবিষে আবার হাঁটতে শুরু কবল। সিগারেটে তুটো টান দিষে বীবেন বলতে শুরু করল, রিয়েলি, মেয়েটিকে দেখতে বড় লাভলি ছিল। তার সেই স্বন্দর কমনীয় চেহারাটা এখনও যেন আমার চোখের সামনে জলজল করছে। বাপের আত্মবে মেয়ে ছিল। জাষ্টিস মুখার্জি ছিলেন বিপত্নীক। ওই মেয়েটিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সখল। ওই মেয়েটি ছাড়া সংসারে আপনার বলতে কেউ ছিল না।

ওঁরা এখানে আসার পর শহরের বহু যুবকেরই মাধবী দিকে নজর পড়েছিল। অনেকেই ওর দিকে ঘেঁষবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কারোর দিকে ওর ক্রক্ষেপ ছিল না। ও নিজের রূপ এবং আভিজাত্য সম্পর্কে বড় বেশী সচেতন ছিল। সব সময় নিজেকে একটা গান্ধীধের পরিমণ্ডলে ঘিরে রাখত। কারুর সাহস ছিল না সে-যেব ডিঙিয়ে ওর কাছে ঘেঁষে। কিন্তু একটা যুবক যে কি করে অত অল্পদিনের মধ্যে ওর সঙ্গে অমন ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল, সেইটাই আমাদের কাছে বড় আশ্চর্য লাগে। যুবকের নামটা ঠিক খেয়াল করতে পাবছি না। কি যেন বেশ নামটা ছিল।

নামটা অবশ্যে আনাব জন্তে বীরেন খানিকক্ষণ চেষ্টা করল। ধীরা বলল, ষাক গে, নামের জন্তে কিছু এসে যাবে না, আপনি কাহিনীটা বলুন।

হ্যাঁ, তাই বলি।—বলে বীরেন আবার বলতে শুরু কবল, যুবকটি এখানকার 'হাডসন অ্যাণ্ড ডেভিডসন' কোম্পানিতে কেমিস্টেব চাকরি নিয়ে এসেছিল। বড় অ্যাট্রাক্টিভ চেহারা ছিল ওর। রাস্তা দিষে যখন হাঁটত তখন মনে হত কোথাকাব যেন এক প্রিন্স চলেছে।

কিন্তু শুধু চেহারার জন্তেই যুবকটি মাধবী ভিলার অ্যাট্রাকশন ড্র করে নি, আসলে ভাল বেহালা বাজাতে পাবার গুণটুকু থাকার জন্তেই ও-বাডিব গেটপাশ পেয়েছিল।

কি বললেন!—ধীবা যেন হঠাৎ চমকে উঠল।

হঠাৎ এ ভাবে তাকে চমকে উঠতে দেখে স্থলতা আর বীরেন একটু অবাক হল। বীরেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হল মিসেস মজুমদার? আপনি হঠাৎ এমন চমকে উঠলেন কেন?

বীরেন আর স্থলতাব চোখের বিষয়ে ধীরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। একটু দম নিয়ে স্বাভাবিক হওয়াব চেষ্টা করল : না, মানে—আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। আপনার কথাটা ঠিক শুনতে পাই নি।

বীরেন একটু হাসল। হেসে বলল, গল্প শুনতে চেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া—এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার! ষাক, যা বলছিলুম, ই্যা, সেই যুবকটি খুব ভাল বেহালা বাজাতে পাবত। আর জাস্টিস মুখার্জি ছিলেন খুব সঙ্গীত-রসিক। শুনতে পাই তাঁর মেয়েরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ইন্টারেস্ট ছিল। এবং একটু-আধটু শেখারও বাসনা ছিল।

একটু খামল বীরেন। আধপোড়া সিগারেটটা রাস্তায় জুতো দিয়ে চেপে তার আগুনটা নিবিয়ে দিল। তারপর আবাব বলতে শুরু করল।

কেমন যেন একটা দুর্বলতা বোধ কবছিল ধীবা। বীরেনের গলাব আওয়াজে তাব মনে হচ্ছিল যেন দু কানের পাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ভোমরা ভেঁ ভেঁ করে ডেকে চলেছে।

বীরেন বলতে লাগল, কেমন করে যে সেই কেমিস্ট যুবকটির সঙ্গে জাস্টিস মুখার্জির আলাপ হয়েছিল তা জানা নেই। বোধ হয় লোকাল কোন ফাংশনেই ওর গুণের পরিচয় পেয়ে জাস্টিস মুখার্জি আলাপ কবে থাকবেন। তারপর যা হয়ে থাকে আব কি—যথারীতি চায়ের নেমস্তম্ভ, নেমস্তম্ভের অজুহাতে বেহালা শোনার স্বযোগ নেওয়া। প্রথম প্রথম জাস্টিস মুখার্জি এবং মাধবীর অল্পরোধ রাখতে মাঝে মাঝে যুবকটি মাধবী ভিলায় যেত।

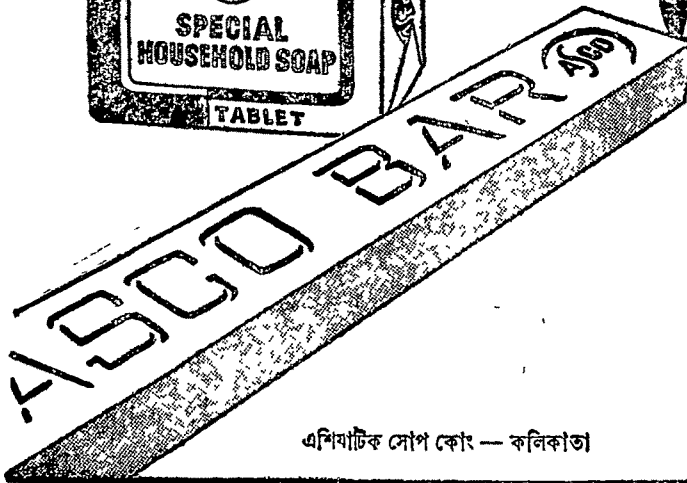
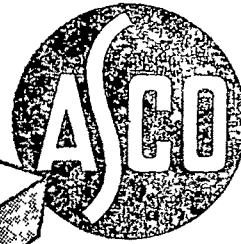
গিয়ে বেহালা শোনাতে। পরে আব অল্পরোধ নয়, ওর নিজের দিক থেকেই প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। প্রায় রোজই ওকে যেতে দেখা যেত। এক-একদিন অনেক রাত পর্যন্ত মাধবী ভিলা থেকে বেহালার স্বর ভেসে আসত। এই ষাওয়া-আসা এবং অবোধ মেলামেশার ফলে ওদের ভেতর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

জাস্টিস মুখার্জি খুব কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি যেদিন ওদেব পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণের ব্যাপারটা টেব পেলেন এবং হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলেন সেদিন থেকে সেই যুবকটির জন্তে মাধবী ভিলার দরজা বন্ধ হল। কিন্তু তাতে ওদেব মেলামেশা বন্ধ করা গেল না। এরপর ব্যাপারটা আরও বিস্তীর্ণ দাঁড়াল; মাধবীকে যত্রতত্র সেই কেমিস্টেব সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। কখনও কখনও তার বাড়িতেও দেখা গেছে। এই নিয়ে সারা শহরে বেশ একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। জাস্টিস মুখার্জির মত বাশভারী এবং দৃঢ়চেতা মানুষও তাতে বড় বিচলিত হয়ে পড়লেন। এদিকে মেয়ের ওপব তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতা থাকার দরুন মেয়েকেও খুব শাসনে রাখতে পারছিলেন না। এই সংকটে পড়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সেই কেমিস্টকে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা কবলেন। হাডসন অ্যাণ্ড ডেভিডসন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার পার্কারের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সন্ডাব ছিল। তাঁকে বলে সেই কেমিস্টকে এখান থেকে সবালেন। কিন্তু সেটা বড় দেব্রিতে হয়ে গিয়েছিল। যুবকটি এখান থেকে চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরে মাধবী যখন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল তখন জানা গেল সে তিন মাসের অন্তঃসন্ডা ছিল।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার!—ধীরা হঠাৎ কাতরস্বরে বলে উঠল।

তাবপর : বীরেন বলে চলল, একমাত্র মেয়েব শোকে জাস্টিস মুখার্জি যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। ওই রকম উদভ্রান্ত অবস্থায় একদিন কোথায় যে নিরুদ্দিষ্ট হলেন কেউ তাব খবর রাখল না। সেই থেকে বাড়িটা এমনই পোডো অবস্থায় পড়ে আছে।

এ্যাসকো
সাবানে
কাচাই
মহুজ



বার ও ট্যাবলেট

এক টুকরো এ্যাসকো সাবানে
কম সময়ে অনেক বেশী
কাপড়চোপড় গবিস্কাব হয়
প্রচুব ফেনা হয়
জামাকাপড় টেকেও বেশী।

এশিয়াটিক সোপ কোং — কলিকাতা

ধীরা এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে ঘটনাটা শুনছিল। শুনতে শুনতে তার মাথাটা ঝিমঝিম কবছিল। পা দুটো যেন টলছিল। চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার মধ্যে একটা কালভার্টের ওপর বসে পড়ল। ব্যস্ত গলায় বীরেন বলে উঠল, কি হল মিসেস মজুমদার! আপনি এভাবে হঠাৎ বসে পড়লেন কেন!

স্বলতাও ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে এল। ধীরা বড় কাতরস্বরে আশ্তে আশ্তে বলল, আমার মাথাটা বড় ঘুরছে, সারা শরীরটা যেন টলছে। আমি আর চলতে পারছি না।

হঠাৎ এরকম হল নাকি?—ধীরার পাশে বসে পিঠে হাত রেখে স্বলতা জিজ্ঞেস করল।

কোনও জবাব দিতে পারল না ধীরা। মাথাটা নীচু করে চূপচাপ বসেই রইল। তার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। একটা বিষাদ যেন তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে পিষে মারছে।

একটা গাড়ি ডাকব কি?—বীরেন প্রশ্নব্যস্তে জিজ্ঞেস করল।

ধীরা কোনও জবাব দিল না। তেমনি চূপ করেই বসে রইল। স্বলতা বীরেনকে তাড়া দিয়ে উঠল: তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? জিজ্ঞেস করাব কি আছে? যাও, যেখান থেকে পার তাড়াতাড়ি একটা গাড়ি ডেকে আন।

স্বলতা ধীরার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

কোনও জবাব নেই।

ধীরার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্বলতা আরও কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পর ধীরা হঠাৎ তার কাঁধে মাথাটা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। তার কান্নায় স্বলতা আরও বিচলিত হয়ে পড়ল। ধীরার শরীরে মুহূর্তে বাকানি দিয়ে বলল, হ্যাঁ রে, তোর কি কষ্ট হচ্ছে বল?

ধীরা কোনও জবাব দিল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরেন কোথা থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হল। ধীরা স্বলতার শরীরে ভব দিয়ে

গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়িতেও সে কোনও কথা বলল না। বাড়িতে এসে চূপচাপ নিজের বিছানাটিতে শুয়ে পড়ল।

স্বলতা স্বামীকে বলল, তুমি ওকে একটু পরীক্ষা কর।

ধীবা এতক্ষণে কথা কইল। বলল, না, তার দরকার নেই।

স্বলতা বলল, দরকার আছে কি নেই সে আমরা বুঝব। তুমি চূপ করে শুয়ে থাক।

ধীবা এবার হাত জোড় করে অল্পনয়ভরা গলায় বলল, স্বলতা, প্রীজ—আমায় তোমরা একটু একা থাকতে দাও।

হঠাৎ এই কাতর গলায় প্রার্থনা শুনে ওরা স্বামী-স্ত্রী বড় অবাক হয়ে গেল। পরস্পরের দিকে ধানিকক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আশ্তে আশ্তে ঘর থেকে বেবিয়ে গেল।

আলোটা বড় অসহ্য লাগছিল। ধীরা উঠে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আবার এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

অন্ধকাবে সেই দুশ্চিন্তাব অতলে তলিয়ে গিয়ে ব্যাপারটাকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করতে লাগল। ধীরা ভাবল, না, এত মিল অল্প মানুষের সঙ্গে থাকতে পারে না। বীরেনের বিবরণের সঙ্গে প্রত্যেকটি ব্যাপারই তো মিলে যাচ্ছে—প্রিন্সের মত চেহারা, কেমিস্ট, ভাল বেহালা বাজাতে জানে। এ অনিমেষ ছাড়া আর কেউ নয়। এত মিল কি অল্প কাকুর সঙ্গে থাকতে পারে!

ধীরা ভাবল, কিন্তু এ কি করে সম্ভব হয়! চার বছর ধরে যাব চারিজনিক মাধুর্যে সে অভিভূত হয়ে থেকেছে, সে এত হীনচরিত্র এত শয়তান হয় কি করে! তবে কি চার বছর ধরে সে তার সঙ্গে কেবল ছলনা করে এসেছে! ধীবা ব্যাপারটাকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ বীরেনের কাছে শোনা ঘটনাটাকেও অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এই টানাটানোয় ধীরার সমস্ত চিন্তাভাবনা যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। অথচ সে

নিরুদ্ভিগ্ণ হতে পাবছে না। দুশ্চিন্তার ভীমকলট। যেন মগজের ভেতর কেবল ডেকেই চলেছে।

ধীরা এখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে অলুধাবন করছে। এখন সে বুঝতে পারছে, এখানে আসতে প্রথম থেকেই অনিমেঘ কেন গররাজী হয়েছিল। তারপর যদিও বা তাকে রাজী কবানো গেল কিন্তু শেষে কেমন ছুটি না-পাওয়ার একটা অজুহাত দেখিয়ে এখানে আসা এড়িয়ে গেল। তারপর ধীরাকে একা পাঠিয়ে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিছুদিন পরে ছুটির ব্যবস্থা করে সে আসবে। সে প্রতিশ্রুতিও সে কেমন চালাকি করে এড়িয়ে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাকে এখন খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে ধীরাব।

কি সাংঘাতিক চরিত্রের লোক!—কপালে করাঘাত কবতে করতে ধীরা বাব বার নিজের মনকে প্রশ্ন করতে লাগল, তা হলে এই চার বছর ধরে ও আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করে এসেছে তা কি শুধুই অভিনয়। শুধু হলনা! চার বছর ধরে যার ভালবাসাকে আমি প্রতিটি অণুপবমাণু দিয়ে উপলব্ধি করেছি, যে আনন্দের ধারায় আমি প্ৰথম স্তম্বে অবগাহন কবেছি, যাকে আমি জীবনের পরম সত্য বলে জেনেছি তা কি সবই মিথ্যে।

ভগবান, তুমি আজ এমন করে কেন আমার সমস্ত বিশ্বাসকে চুরমার করে দিলে। আমার জীবনের সবকিছুই যদি এমনি মিথ্যে হয়ে যায় তা হলে আমি কি নিয়ে বাঁচব। আমাব যে আর কিছুই রইল না।—বালিশে মুখ গুঁজে ধীরা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সারারাত্ ওর এমনি কান্না আর দুশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে কেটে গেল।

রাত্রে খাওয়ার সময় বীরেন আর সুলতা একবার ডাকতে এসেছিল। ধীরা তখন বালিশে মুখ গুঁজে নিঃশাড়ে পড়েছিল। ওরা দু-চারবার ডাকার পর ধীরা তেমনি বালিশে মুখ গুঁজে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিল, তাব খাওয়াব ইচ্ছে নেই। অনুরোধ-উপরোধ করে কিছু খাবে না জেনে ওরাও আর বেশী কিছু বলে নি। আলোটা

আবার নিবিষে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘব থেকে বেবিষে গেছে। তারপর সারাটা রাত যে কি দুঃসহ অবস্থায় কেটেছে—কখনও উঠে ধীরা সারা ঘরময় পায়চারি করেছে, কখনও বা বাইরের বারান্দার থামে হেলান দিয়ে বসে নক্ষত্রভবা আকাশের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ চেয়ে থেকেছে।

পরের দিন সকালে তাব চোখমুখের ক্লান্ত চেহারা দেখে বীরেন বলল, মিসেস মজুমদার, আপনাকে কিন্তু বড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনার কী কষ্ট হচ্ছে আমায় খুলে বলুন। আমার সামান্য ডাক্তারী বিত্তেটুকু আপনার প্রয়োজনে লাগাতে পারলে খুশী হতুম।

বীরেনের এই উদ্বেগ এবং বিনয়ে ধীরা মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে হাসিতে ক্লান্তিই বাড়ে পড়ল। ধীরা আস্তে আস্তে বলল, আমার জন্তে আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না মিস্টার সেন। আমাব কিছুই হয় নি। আমাকে শুধু দয়া করে একটু ঘুমের ওষুধ দিন।

ও, নিশ্চয় নিশ্চয়। ঘুমের ওষুধ আমার ঘরেই আছে। অনিদ্রারোগে আমাকেও মাঝে মাঝে ভুগতে হয়, তাই ওটা সব সময় স্টকে রাখি।—বলে বীরেন ওষুধ আনার জন্তে নিজের ঘরে গেল।

ধীরা সুলতাকে বলল, আমি তাই আজকালের মধ্যেই এখান থেকে চলে যেতে চাই।

সুলতা অবাক হয়ে বলল, সে কি! কই, তোর যাওয়ার তো কিছু ঠিক ছিল না।

না, তা ছিল না। কিন্তু আমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।

কেন রে, আমাদের এখানে কি তোর কোনরকম অস্ববিধে হচ্ছে?

না না, এসব কথা বলে কেন আমাকে মিছিমিছি লজ্জা দিচ্ছিস।

বীরেন ইতিমধ্যে একটা মেজার গ্লাসে কিছু ব্রোমাইড

মিজ্জাচার এনে হাজির হয়েছিল। সে ওদের কথাবার্তা শুনে বলল, কি হল আবার ?

স্বলতা বলল, ধীরা আজকালের ভেতরেই চলে যাবে বলছে।

কেন ?—ধীরার দিকে বীরেন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।
ধীরা মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল : অনেকদিন তো রইলুম। এবার ফিরতে হবে বইকি।

কিন্তু আপনার শরীরটাকে সাবিয়ে তোলাব জন্তে আরও কিছুদিন থাকার প্রয়োজন ছিল।

তা হয়তো ছিল, কিন্তু এখানে আর আমার এতটুকু ভাল লাগছে না। তা ছাড়া একটা প্রয়োজনে আমার এখন যাওয়া বিশেষ দরকার। আমায় আর অহরোধ করবেন না মিষ্টার সেন।—শেষের দিকে ধীরার গলাটা একটা অস্বাভাবিক অহুনয়ে ভেঙে পড়ল। বীরেন আর স্বলতা একটু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

কিছুক্ষণ নিশেবে কাটবার পর বীরেন অবশেষে বলল, বেশ, যাবেন। যাওয়াটা যখন আপনার বিশেষ প্রয়োজন তখন আমরা আর থাকার জন্তে অহরোধ করব কেন।

একটু থেমে বীরেন জিজ্ঞেস করল, কবে যাবেন ঠিক করেছেন ?

আজকে যেতে পারলেই ভাল হয়।—ধীরা দু চোখে অহুনয় নিয়ে বলল।

আজকেই।

হ্যাঁ।—ধীরা বলল, রাত্রে যে ট্রেনটা আছে সেই ট্রেনেই দয়া করে আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

ধীরাকে এভাবে অহুনয়ে ভেঙে পড়তে দেখে বীরেন বা স্বলতা কেউ কোনও আপত্তি করল না।

ভিন

ভোরবেলা হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ধীরা একটা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে একটা রিকশা নিল। এত ভোবে একা ট্যাক্সিতে

যাওয়াটা তার কাছে নিরাপদ বলে মনে হল না। গন্তব্যস্থানের নির্দেশ দিয়ে থোকনকে নিয়ে সে বিকশায় বসল। রিকশাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া সম্পর্কে সে আর কোন কথা বলল না। বলার মত তার মনের অবস্থা ছিল না। মনটা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ছিল। মনে মনে মহড়া দিচ্ছিল—কিভাবে কথাটা উত্থাপন করবে অনিমেষের কাছে।

হাওড়ার পুল পেরিয়ে হ্যারিসন রোড ধরে যেতে যেতে সে দেখল, এখনও শহরে তেমন ব্যস্ততা জাগে নি। সারা শহরে যেন এখনও রাতঘুমের আলস্য জড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে যাত্রীবিরল দু-একটা ট্রাম বাস মন্থরগতিতে চলেছে। দু-একটা চা আর খাবারের দোকান ছাড়া সমস্ত দোকানপাটই বন্ধ। রাস্তার ওপরে একঝাঁক কাক খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে।

বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নেমে বাবকয়েক কড়া নাড়তেই দরজাটা খুলে গেল।

অনিমেঘের দু চোখে ঘুমের আলস্য জড়ানো। দরজা খুলে সামনে ধীরা আর থোকনকে দেখে সে বড় অবাক হয়ে গেল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। দীর্ঘদিন পরে বাবাকে পেয়ে থোকনেরও ক্ষুদ্র হৃদয় উচ্ছ্বসিত আবেগে ভরে উঠেছে।

এই দৃশ্য দেখে ধীরাব মনের উত্তেজনা যেন একটু দ্বিধায় পড়ল। অনিমেষের ভাবভঙ্গী আচার-আচরণে কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতার আভাস আছে বলে তার মনে হল না।

থোকনকে আদর করতে করতে অনিমেষ এবার ধীরাব দিকে তাকাল। ধীরা চোখ নামিয়ে নিল। অনিমেষ বলল, কি ব্যাপার ? হঠাৎ এ ভাবে চলে এলে যে।

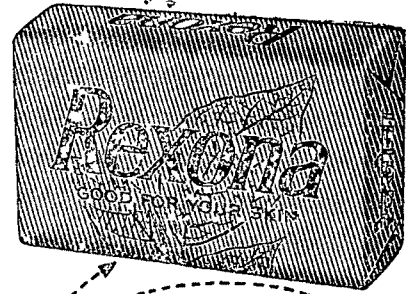
জবাব দিতে ধীরা একটু ইতস্ততঃ করল। অনিমেষ বলল, কি হয়েছে, মুখখানা অমন ভার করে আছ কেন ? যাই নি বলে বুঝি তোমার অভিমান হয়েছে ?

অভিমান হবে কেন।—ধীরা এবার একটু শানিত হওয়ার চেষ্টা করল, কেন যে যাও নি তাব কারণ বুঝতে তো আর আমার বাকী নেই।



দিনে দিনে
তুকে নবীন লাভ্য আসে
নতুন রেজোনার পরশে

মৃত্যবাহুই মাথুন বেজোনার অবাধ
পবন যেন প্রতিবাহুই আপনাব
তুকে নবীনতা এনে দেয়। ফেনিল
বেজোনায ক্যাডল আছে, বিশেষ
ধবনের এই সৌন্দর্য বর্ধক তেলটি
তুকে প্রতি বন্ধে বন্ধে যায় আব
তুকে কোমল ও মসৃণ কবে
তোলে, চেহায়া আপনাব লাভ্য
আনে। যিষ্ঠি গন্ধ ভরা বেজোনা
প্রতিদিন স্নানের পক্ষে আদর্শ
সাবান। একবার মাথলে আপনি
এর গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে পাবেন।



নতুন রেজোনার নতুন মোড়ক,
নতুন আক্যাব আব নবীন সবুজ
বঙ আপনাব নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

নতুন রেজোনা-
তুকের সেবা যাড়ের সহায়ক

ধীরার এই প্রচ্ছন্ন কথার সূত্রপাতটা কার্যকরী হল।
অনিমেঘ রীতিমত চমকে উঠে বলল, কি—কি তুমি বুঝতে
পেরেছ ধীরা?

শুধু বুঝতে নয়, অনেক তথ্য জানতেও পেবেছি।—
ব্যাপারটাকে ভালভাবে পরখ করে নেওয়ার জন্য ধীরা
ইঙ্গিতটাকে আরও স্পষ্ট করল।

অনিমেঘের মুখচোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে
উদ্বেগকম্পিতস্ববে জিজ্ঞেস করল, কি—কি তুমি জেনেছ?

জেনেছি তোমার অনেক কীর্তিকলাপের কথা।—
অতীতকে তাকিয়ে ধীরা যেন এবার সহজ নির্লিপ্ততার
কথাটা বলল।

অনিমেঘ একটু দম নিয়ে আশ্তে আশ্তে যেন বিড়বিড়
করে বলল, কি যে তুমি বলছ, আমি কিছুই বুঝতে
পারছি না।

থাম, আর ভালমানুষী কর্তে হবে না।—ধীরার গলা
এবাব যেন বিজপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, চরিত্রহীন লম্পট
কোথাকার!

ধীরা, এ সব কি বলছ!—অনিমেঘের স্বরে করুণ
আঁতি।

একটি মেয়ের সর্বনাশ কবে তাকে তুমি মৃত্যুর দিকে
ঠেলে দিয়েছ।

না না ধীরা, বিশ্বাস কব।

অনিমেঘ এগিয়ে এসে অল্পনয়ে ধীরার একটা হাত
চাইল। ধীরা তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে
চৌকি থেকে উঠল, ছাড়, তোমার ছায়া মাড়াতেও
না পারছি।

আঃ, চূপ কর। একশোবার লম্পট লম্পট বলে এমন
চৌকিও না।—অনিমেঘ দরজাটা বন্ধ কবে দিয়ে করুণ গলায়
প্রার্থনা জানাল।

অনিমেঘের লোকলজ্জার বহর দেখে ধীরা যেন আরও
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আরও এক পর্দা গলা চড়িয়ে বলল,
বলবই তো তুমি লম্পট, তুমি শঠ, তুমি শঠতা করেছ
সেই মেয়েটির সঙ্গে, শঠতা করেছ আমার সঙ্গে।

আঃ ধীরা, চূপ কর, প্রীত। ডোট বী ম্যাড। তোমার

চৌকামেচি শুনে এখুনি হয়তো বাড়িছুদ্ধ লোক এসে জড়ো
হবে।

আত্মক, শুদ্ধক তারা তোমার কীর্তিকলাপের কথা।

তাতে কি তোমার কিছু মান বাড়বে?—ধীরার
বাঁড়াবাড়ি সহ করতে না পেয়ে অনিমেঘ এবার অসহিষ্ণু
গলায় বলে উঠল।

খুব হয়েছে, থাক। আমাব মানসম্মত নিজে তোমাব আর
মাথা না ঘামালেও চলবে। মানসম্মত তো কতই রেখেছ।

ধীরা, তুমি পাগলের মত বড বেসী বাজে বকতে শুরু
করেছ। কবে তোমার মানসম্মতের হানি ঘটিয়েছি?
তোমার সঙ্গে কি শঠতা করেছি?

করেছ বইকি, নিজের চরিত্র গোপন রেখে আমার
সঙ্গে তুমি শঠতা করেছ, আমার মা-বাবাব সঙ্গে শঠতা
করেছ। তাদের বংশমর্যাদা, তাদের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ
করেছ।

অনিমেঘ সহসা কোন জবাব দিতে পাবল না। ধীরা
তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, কি, চূপ করে রইলে যে?

তুমি যদি মনে করে থাক যে তোমাদের বংশমর্যাদা
ক্ষুণ্ণ করেছি, তোমার সঙ্গে শঠতা করেছি, তা হলে আর
আমার কি বলাব আছে।

তার মানে! তুমি কি বলতে চাও যে তুমি অস্ত্রায়
কর নি?

না।—অনিমেঘ এবার দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল।

তা মনে করবে কেন!—তীক্ষ্ণকণ্ঠে ধীরা বলল, শ্রায়-
নীতি বোধটা থাকলে তো! তাই অমন অপরাধ কবেও
আবার সাফাই গাইছ।

অনিমেঘ হঠাৎ দপ করে জলে উঠল : এসে অবধি যা
শুরু করেছ তা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে করে বলে তো
আমার মনে হয় না।

কি বললে!

যা বললুম তা তো শুনলেই।—বলে অনিমেঘ আর
সেখানে দাঁড়াল না। ঘরের ভিতব গিয়ে ঢুকল। ঘরে
ঢুকে কৈফিয়তের স্বরে ধীরা বলল, এ ভাবে আমার মা-
বাবাকে অপমান করার কি অধিকার আছে তোমার?

অনিমেষ এবার হাত দুটো জোড় করে কাঁতব অহুমনে বলল, প্রীজ—প্রীজ ধীবা, তুমি চুপ কর। আমাকে এ ভাবে জালিও না। না হয় বল, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই।—বলতে বলতে অনিমেষ সত্যি সত্যিই সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেল।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে লাগল। সমস্ত বাড়িটার কোলাহল আঁব ব্যস্ততা জেগে উঠল। একটু পরে বতনের মা কাজে এসে ধীরাকে দেখে আঁব গলায় বলে উঠল, বউদিমণি কখন এলে গো?

আজ সকালে।—একটু থেমে ধীরা বলল, তুমি আগে খোকনের কিছু খাবার ব্যবস্থা কর। ওর বোধ হয় খিদে পেয়েছে। আমাকে আজ আর কোন কাজে ডেক না, যা করার তুমি কর।

ধীরা শুনেতে পেল, রতনের মা বাঁমাঘরে কাজ করতে করতে কাঁব সঙ্গে যেন কথা বলছে। ধীর সঙ্গে কথা বলছে তিনি একজন বয়স্ক মহিলা বলে মনে হল তাঁব। গলার স্বরটা অপবিচিত।

কিছুক্ষণ পরে রতনের মা ঘরে এসে নিজে থেকেই বলল, জান বউদিমণি, তুমি যাওয়াব কদিন পরেই সামনের ঘবে এক নতুন ভাড়াটে এসেচে—মা আর ছেলে। বড় ভাললোক।

ধীবাকে চুপ করে থাকতে দেখে বতনের মায়ের উৎসাহে ভাটা গড়ল। খানিক পবে প্রসঙ্গ পালটে সে বলল, দাদাবাবুকে দেখচি না যে! কোথাও গেছে নাকি?

হ্যাঁ।—ধীরা মুহূর্তের জবাব দিল।

বতনের মা আপন মনে কাজ করতে লাগল। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ধীরাকে লক্ষ্য করছিল। ধীরাব কথাবার্তা আর গলার স্বরে আবহাওয়াটা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। কাজ শেষ করে সে চলে গেল।

ট্রেনের ধকল, মানসিক উত্তেজনা, অনাহার—এই সমস্ত নানা কারণে ধীরার শরীরটা বিজী ম্যাজম্যাজ

করছিল। মাথাটা অসম্ভব ভার হয়ে ছিল। বাথরুমে ঢুকে ধীবা প্রায় আঁধ ঘণ্টা ধরে স্নান করল।

স্নানান্তে খাওয়াদাওয়াব পর দুপুরে ঘুমতে পারলে দেহমনের এই অবলাদ দূর হয়ে যাবে মনে করে সে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুতেই চোখে ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে সাঁবাটা দুপুর এপাশ-ওপাশ করল। অথচ ঘুমোতে না পেরে একটা অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল; দৈহিক ক্লান্তি এবং মানসিক হুঁচুতা তাকে যেন পিষে মারছিল। অস্বস্তিটা একসময় এতই দুঃসহ হয়ে উঠল যে সে মানসিক যন্ত্রণায় কেঁদেই ফেলল। কঁাদতে কঁাদতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, ভগবান, তুমি আবার একি করলে! এমন করে কেন আমার আহাব নিজে, স্বথশান্তি সবকিছু কেড়ে নিলে। এভাবে আমি বাঁচি কি কবে। আমার শান্তি দাও, স্বথ দাও, দু চোখ ভরে একটু ঘুম দাও।

এমনি ভাব-মহুরগতিতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল।

বিকলে বতনের মা কাজে এসে জিজ্ঞেস করল,

দাদাবাবু বুঝি এখনও ফেরে নি?

ধীরা কোনও কথা বলল না। তবে রতনের মায়ের কথায় তাঁব মনেও একটু ঝটকা জাগল। কিন্তু গেলই বা কোথায়? ওই বেশবাস নিয়ে এমন কোথায় যেতে পাঁবে যেখানে এত দীর্ঘ সময় তাঁর পক্ষে কাটানো সম্ভব, ধীরা ভেবে কুলকিনারা পেল না। সে সম্ভব অসম্ভব অসম্ভব কিছুই ভাবতে লাগল। তাঁরপর একসময় বিরক্ত চিন্তাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল।

একটু পবে সামনের ফ্ল্যাটের সেই বাঁমাঘর আলোপ কবতে এসে বললেন, তুমি এসেছ শুনে তোমার সঙ্গে আলোপ কবতে এসে যিহা? শুনলুম তোমার শরীর খাবাপ। তা এখান থেকে চলে যাও? ভদ্রমহিলাকে দেখে ধীরার বড় ভয় লাগল। তাঁর আলোপের অন্তরঙ্গতাকে এই মুহূর্তে মনকে বড় স্পর্শ করল।

খোকনকে দেখে ভদ্রমহিলা তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেতে খেতে বললেন, তুমি বুঝি সেই দুষ্টটো।

তোমার গল্প এই এক মাস ধরে তোমার বাবাব কাছে কত যে শুনেছি তার ঠিক নেই।

ধীরা বলল, ওকে অত প্রশংসা দেবেন না। এব পর ওর আবদার সামলানো আপনার পক্ষেই দায় হয়ে উঠবে।

না না, বিরক্ত হব কেন।—ভদ্রমহিলা কথার মাঝে একটু বিরতি দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা এমনই ভাগ্য যে বুড়ো বয়সে নাতিনাতনির মুখ দেখে যাওয়া বৃষ্টি আর হবে না।

কেন, আপনার ছেলের বিয়ে দিলেই তো সাধ-আহ্লাদ সব মেটে।

য়ে তো দিবেছিলাম মা। প্রতিমার মত সুন্দরী হয়ে এনেছিলুম। তা ছেলেব কপালে সইল না। চালে মারা গেল। তা সন্তানটাও যদি বেঁচে পড়ত একটা সন্তান দিতে পারতাম মনকে। কিন্তু মাস তিনেকের বেশী বাঁচিয়ে রাখা গেল না। সেই ছোট ছেলেপুলে দেখলে মনটা বড় হতাশ করে।

ধীরা বলল, তা ছেলেব আবার বিয়ে দিন না।

চেঁচা কি আর করি নি?—ভদ্রমহিলা আক্ষেপের স্বরে বললেন, কিন্তু কিছুতেই ওকে রাজী করানো যাচ্ছে না।

কি করেন আপনার ছেলে?—ধীরা কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করল।

খবরের কাগজের আপিসে কাজ করে।

রতনের মা দু কাপ চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে ভদ্রমহিলা যখন গল্পের মজলিশটা আরও জমিয়ে তুলেছেন সেই সময় রতনের মা এসে খবর দিল, মা, দাদাবাব এসেছেন।

প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ধীরা কেমন যেন চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল, বৃষ্টি অনিমেষের ফেরার সংবাদটাই রতনের মা তাকে জানাচ্ছে। কিন্তু পরে ভদ্রমহিলাকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ভদ্রমহিলা উঠতে উঠতে কৃত্রিম বিবক্তির স্বরে বলতে লাগলেন, ওব জ্ঞে কি কোথাও দু দণ্ড শান্তিতে বসে গল্প করার জো আছে।

যাওয়ার সময় তিনি ধীরাকেও তাঁব ঘরে যাওয়াব জ্ঞে বারবার অনুরোধ করে গেলেন।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করে ধীরার বড় ভাল লাগল। ভাবল, মনের এই প্রানিময় অবস্থায় এমনি একটি সজ্জন স্নেহশীলা মহিলাব সাহচর্য তার কাছে একান্ত কাম্য। ওঁব সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে সারাদিনের প্রানিভারটা যেন কিছুটা হালকা হয়ে গেল। উনি চলে যাওয়ার পর ধীরা একটা গল্পের বই নিয়ে বসল। মনটাকে আবণ্ড শান্ত রাখার জ্ঞে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না, কিছুক্ষণ আগের সেই চমকে ওঠার বেশটুকু তখনও বৃষ্টি তাঁব মনের মধ্যে ছিল। সেইটাই আবার আশ্বে আশ্বে ধিকিয়ে উঠল।

সত্যি সৈ ওইরকম, বেশবাসে গেল কোথায়! কোথায় যাওয়া তাঁব পক্ষে সম্ভব। সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছে আব এখন সন্ধ্যা হতে চলল এখনও ফেরার নাম নেই! এরপর যদি না ফেবে তবে ধীরাই বা প্রতিবেশীর কাছে কি কৈফিয়ত দেবে?

ধীরা বড় চিন্তিত হয়ে পড়ল। সন্ধ্যার ছায়াটা যত গড়িয়ে গড়িয়ে রাতেব অন্ধকারের দিকে এগুতে লাগল দুশ্চিন্তাব পাখরটাও যেন তত ভারী হয়ে বৃকের ওপর চেপে বসল।

এমনি দুশ্চিন্তার ভেতর দিয়েই বাত বাড়তে লাগল। রতনের মা অনেকক্ষণ হল বাতের রান্না এবং যাবতীয় কাজকর্ম সেরে চলে গেছে। চাবতলার যে ভদ্রলোকটিব প্রামবাজাবে কাপডেব দোকান আছে, তিনিও দোকান বন্ধ করে অনেকক্ষণ আগে বাড়ি ফিবেছেন। ধীরা জানলা দিয়ে দেখল, গলির মোড়ে নেবুলালের পানবিড়ির দোকানটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ওপবতলা-নীচতলার কোন ফ্ল্যাটেরই বাসিন্দাদের আর গলা পাওয়া যাচ্ছে না। সামনেব বাড়ির নতুন বউটির ঘর থেকে এতক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিলম্বিত স্বর শোনা যাচ্ছিল। সে কণ্ঠও স্তব্ধ হয়ে গেছে, উচ্চকণ্ঠে এগারোটা বাজাব নক্কেতধ্বনি ঘোষণা কবে রেডিওটা থেমে গেছে। বউটির ঘরে যে নীল আলোটা এতক্ষণ মায়াবী পরিবেশ বচনা



লাইফবয় যেখানে, স্বাস্থ্যও সেখানে !

মানব আনন্দ লাইফবয়ে। লাইফবয় সাবান মেখে মান কবলে শবীরটা
কত কাবববে লাগে, মনেও এক সজীবতা আনে। ঘবে বাইবে ধুলো মষলা আপনার
লাগবেই। লাইফবয়ের প্রচুব কাণ্যকাবী কেনা ধুলো মষলাব বোগ বীজান্ত ধুখে দেয়া
পবিবাবে সবাব স্বাস্থের বস্ত্র নিতে লাইফবয় মাখুন।

করে ছিল, সে আলোটাও নিবে গেল। গলিতে একটা ট্যাক্সি চুকতে দেখে ধীরার মনটা একটু আশাবিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ট্যাক্সিটাকে সোজা চলে যেতে দেখে সে আবাব হতাশায় মুগ্ধে পড়ল। এমনই উৎকর্ণ হয়ে থেকে যতবার গলিতে গাড়ির শব্দ শুনল বা মানুষের গলা পেল ততবার জানলাব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উৎকর্ণ হয়ে দেখতে লাগল।

কোথায় একটা বেড়াল বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল। বাজির নিশ্চলতায় এই কান্না ধীবাব মনে কেমন যেন একটা ভয়ের অহুভূতি ছড়াল। ভয়ে ছুটে এসে সে খোকনকে জাপটে ধরল। কিন্তু বেড়ালের কান্নাটা তখনও থামল না। বিনিয়ে বিনিয়ে তখনও কেঁদে চলেছে।

ধীবাব বড় বিস্মী লাগছিল। মনের মধ্যে সেই ভয়ের অহুভূতিটা যেন আবও বেশী করে ছড়াতে থাকল। তার মনে হল বেড়ালের কান্নাটা যেন কি এক অশুভ সংকেত ঘোষণা করছে। ভয় ভাবনা আশঙ্কায় তাব মনটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

উদগত কান্নাকে কোনরকমে চেপে বেধে ধীরা দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে কতক্ষণ যে বসে ছিল তা ওর খেয়াল ছিল না। একসময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে উৎকর্ণ হল। না, তুল নয়, দরজাতেও মুহূ কড়া নাড়ার শব্দ শুনল। ধীরা উঠে ক্লান্ত পায়ে এসে দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল। অনিমেষ উদ্ভ্রান্তের মত চেহারা নিয়ে ভেতরে ঢুকে একবার তার দিকে মুখ তুলে চাইল। পলকের জন্তে হুজনের ভেতর নীবব দৃষ্টিবিনিময় হল। তাবপর ধীরাও চোখ ফিরিয়ে নিল এবং অনিমেষও মাথা নীচু করে ক্লান্ত পায়ে টলতে টলতে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। কেউ কোনও কথা বলল না। ধীরা পেছন থেকে শুধু অনিমেষের ক্লান্ত উদ্ভ্রান্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পাশের ঘরে এসে বসল।

অনিমেষের ঘরে টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা আছে। আলো না জাললে সে হয়তো তা জানতে পারবে না।

তাকে তা জানাবে কিনা, এ ঘরে বসে ধীরা তাই ভাবতে লাগল।

একটু পরে যখন আলো জ্বলে উঠল তখন ধীরা একটু আশ্বস্ত হল। তারপর আস্তে আস্তে জানলার কাছে এসে একবার উঁকি মেবে দেখল। দেখল, অনিমেষ সত্যিই আহাবের জন্ত প্রস্তুত হয়েছে।

ধীরা পা টিপে টিপে আবাব ঘবে ফিবে এল। নিজের এই চিত্তদৌর্বল্য নিজেকেই যেন বড় লজ্জা দিতে লাগল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, এর পবও অনিমেষের জন্তে এমন বিচলিত হয়ে পড়া তাব পক্ষে মোটেই সমীচীন নয়। সে সংকল্প করল, এবার থেকে নিজের মনকে শক্ত করবে। আব কখনও এমন বিচলিত হয়ে নিজেকে ছোট করবে না।

চার

বিকেলের প্রসাধন সারছিল ধীরা। এইটুকু সময়ের অন্তর্যমন্ডলতার ভেতর খোকনটা কোথায় পালিয়েছে। প্রসাধন সেরে খোকনকে দেখতে না পেয়ে ধীরা রতনের মাকে জিজ্ঞেস করল।

রতনেব মা রান্নাঘরের ভেতর থেকে জবাব দিল, কই, আমি তো দেখি নি।

সামনের ফ্ল্যাটের দরজাটা খোলা ছিল। নীহারকণা বাগ্নাঘরে ছিলেন। ধীরা উচ্চকণ্ঠে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, মাসীমা, খোকনকে দেখেছেন?

দেখ তো কনকের ঘরে আছে কিনা।

কনকেন্দুব ঘরে উঁকি দিয়ে ধীরা দেখল, হ্যাঁ, সত্যিই মুতিমান এ ঘরে এসে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। হুজনের অন্তবদ্ধ ভঙ্গীটা দেখে হাসি পেল; কনকেন্দু সামনের টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়াবে বসে একটা বই পড়ছে, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়বার কি আর উপায় আছে, খোকন তার সামনে টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে তার সঙ্গে গল্প কবছে।

দৃশ্যটা দেখে ধীরা খানিকক্ষণ দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে

মুখ টিপে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, প্রাণ দিয়ে দিয়ে আপনি ছেলেরা যেমন মাথা খাচ্ছেন, তেমনি নিজেরও কাজকর্ম পড়াশুনা সব মাটি কয়ছেন।

ধীরার কণ্ঠস্বরে কনকেন্দু চমকে উঠল। ব্যস্ত গলায় বলল, আপনি! কখন এলেন?

আপনার আতিথেয়তার ক্রটি হয় নি। এইমাত্র এলাম।—ধীরা হাসতে হাসতে জবাব দিল।

টেবিল থেকে পা নামিয়ে কনকেন্দু বলল, বসুন, দাঁড়িয়ে বইলেন কেন?

না, বসতে আসি নি। ছেলেরা খোঁজে এসেছিলুম।—তারপর একসময় বলল, আপনার বইটা কিন্তু আজও ফেবত দিতে পারলুম না। আমার পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু বইটা টেবিলে দেখছি না। উনি বোধ হয় পড়তে নিয়েছেন।

বোধ হয় মানে! আপনি কি সঠিক জানেন না, উনি পড়তে নিয়েছেন কিনা?

ধীরা একটু অপ্রস্তুতে পড়ল। কিছুটা বা লজ্জায়। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভেতর যে মনোমালিঙ্গ এবং আলগা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেটাকে তারা বাইরেব লোকের সামনে স্বতটা সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাপারটা যে কথায় কথায় এমন বৈক্য হয়ে যাবে ধীরা অত খেয়াল কবে নি। অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে উঠে ধীরা জবাব দিল, না, মানে আমাকে বলে তো উনি নেন নি, আর আমিও গুঁকে জিজ্ঞেস করি নি।

আপনি কি আবও বই চান?—কনকেন্দু তাব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

একটা ফেরত না দিয়ে আর একটা নিই কি করে!

তাতে কি হয়েছে!—কনকেন্দু ধীরার চোখে চোখ রেখে বলল, সন্কেচ করা কিছ নেই মিসেস মজুমদার। আমি থাকি বা না থাকি, আপনার যখন কোনও বইয়ের দরকার পড়বে এসে নিয়ে যাবেন। আপনাদের জন্তে আমার আলমারির দ্বার অব্যাহত রইল।

এব পর খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর ধীরা এক সময় বলল, ওই বইখানা দেখলুম আপনি

লেখকের কাছ থেকে পেয়েছেন। আপনার আলমারির অধিকাংশ বই বোধ হয় ওইভাবে পাওয়া?

কনকেন্দু বলল, না, তা হবে কেন। কেনা বইও প্রচুর আছে। তবে খবরের কাগজে কাজ কবি তো, তাই বহু লেখকের সঙ্গে আলাপ আছে। তাবা অধিকাংশই তরুণ। তরুণ লেখকরাই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়—হয়তো খবরের কাগজের পাতায় লেখা ছাপানোর স্বার্থে।

একটু থেমে কনকেন্দু আবার বলল, অবশ্য এইসব লেখকদের যে একেবারে শক্তি নেই এমন নয়, আসলে সংবাদপত্রে সাহিত্য করতে খুব বেশী খাটতে হয় না এবং পয়সাটা ঠিকমত পাওয়া যায় বলে ওবা এইমিকে খোঁকে।

ধীরা একটু চুপ করে বইল। তাবপব কি মনে হতে আধো হাসি আধো লজ্জা জড়ানো স্বরে বলল, জানেন, আমিও একসময় গল্প লেখার চেষ্টা করেছিলুম। বহু কাগজের অফিসে লেখাও পাঠাতুম। আপনাদের কাগজেই যে কত লেখা পাঠিয়েছি তার কি ঠিক আছে।

ছাপা হয়েছে?

কে আর ছাপবে বলুন। তবে দু-একটি মেয়েদের কাগজে দু-চারটি গল্প ছাপা হয়েছে।—একটু থেমে ধীরা হাসতে হাসতে বলল, তখন যদি আপনার সঙ্গে আলাপ থাকত তবে কি ভালই না হত, তখন আপনাদের কাগজের পাতায় গল্প ছাপানোর কত স্বপ্নই না দেখতুম।

কনকেন্দু হাসতে হাসতে বলল, তা এখন যখন পরিচয় হয়েছে তখন স্বপ্নটা তো এখনও সার্থক হতে পারে।

সে সব বাতিল কবে মন থেকে ছুটে গেছে। ধীরা গ্রীবা হেলিয়ে আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বড় অদ্ভুত ভঙ্গীতে কথাটা বলল।

কনকেন্দু ধীরার সেই অপরূপ ভঙ্গিমাব দিকে তাকিয়ে কৌতুক মিশ্রিত গলায় বলল, কেন, জীবনটা বৃষ্টি এখন গল্প-উপন্যাসেব চেয়ে মাদক রোমান্সে ভাবে আছে?

ধীরা কোনও জবাব দিল না। আঙুলে তেমনি আঁচল জড়াতে জড়াতে মুখ নীচু করে হাসতে লাগল।

কি একটা দবকারে অনিমেষ কনকেন্দ্র খোঁজে এসে ঘরের ভেতর ধীরাকৈ বসে থাকতে দেখে দরজার কাছে একটু থমকে দাঁড়াল। একটু ইতস্ততঃ করল। তারপব সেইখানে দাঁড়িয়েই স্বাভাবিক গলায় কনকেন্দ্রকে বলল, কি, আপুনি যে এখনও বসে আছেন! সকালের কথাটা খেয়াল নেই নাকি?

অনিমেষের কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে কনকেন্দ্র পিছন ফিরে তার দিকে তাকাল। তারপব লজ্জিত ভঙ্গীতে বলল, ও হো, আমি একেবারে ভুলেই গেছি। আপনি তো রেডি হয়েই এসেছেন দেখছি। দাঁড়ান, আমি চট করে জামাকাপড়টা পালটে নি।

ধীরা ওদের কথার মাঝে উঠে চলে যাচ্ছিল। কনকেন্দ্র হঠাৎ অনিমেষকে বলে বসল, তা মিসেসকে বাদ দিচ্ছেন কেন? ওঁকেও নিয়ে চলুন না?

অনিমেষ একটু অপ্রস্তুতে পড়ল। কোন জবাব দিতে পারল না।

ধীরা কনকেন্দ্রর কথা শুনে থেমে পড়েছিল। সে জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

কনকেন্দ্র বলল, সিনেমায়, লাইটহাউসে একটা ভাল ফিল্ম হচ্ছে। চলুন, দেখে আসি।

ধীরা একটু ইতস্ততঃ করে একটা অজুহাত খুঁজে বার করল, আমার শরীরটা আজ ভাল নেই। মাথাটা অসম্ভব ব্যথা হয়ে আছে।

কথাটা বলে সে আব দাঁড়াল না। দ্রুত বেরিয়ে গেল।

বাস্তায় বেরিয়ে কনকেন্দ্র আবার অনিমেষকে কথাটা বলল, মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে এলেই পারতেন অনিমেষবাবু। আপনি কোন কথা বললেন না দেখে আমিও বিশেষ পীড়াপীড়ি করলুম না।

অনিমেষ সিগারেট টানতে টানতে নির্বিকার গলায় বলল, ও আসত না।

একটু থেমে কনকেন্দ্র সর্কোতুকে বলল, দুজনের কুজন আলাপের ভিতর তৃতীয় ব্যক্তিটির উৎপাতই কি ওঁর না যাওয়ার কারণ?

কনকেন্দ্রর কথায় অনিমেষ মনে মনে হাসল। কনকেন্দ্র অবশ্য জানে না ওর কথাটার ভেতর কি নির্ভর পবিহাস আছে। জানলেও নিশ্চয় এমন কথা বলে অনিমেষকে আঘাত দিত না। কথাটা শুনে অনিমেষের মনটা যেন একটা বিষগ্নতায় ছেয়ে গেল।

বিয়ে হওয়ার পর ধীরাকে সঙ্গে না নিয়ে কোনদিন কোন সিনেমায় গেছে বলে তার মনে পড়ে না। যখনই কোন ছবি বা কোন অল্পস্থান দেখতে ইচ্ছে হয়েছে, তারা একসঙ্গে গেছে। দুজনে পাশাপাশি বসে মিলিত আনন্দে সে অল্পস্থান উপভোগ করেছে। তারপর হঠাৎ বাইরে এসে কোন রেস্টুরেন্টে বসে খেয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে পথেঘাটে বা কোন পার্কে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে তারপর বাড়ি ফিরেছে।

সেই দিনগুলোর কথা ভেবে অনিমেষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আজ দু মাসের বিচ্ছেদে মনে হল কতদিন কত দীর্ঘকাল যেন তাবা দুজন পরস্পরের সঙ্গে কোন কথা বলে নি।

আজ বিকেলে নতুন পাটভাঙা শাড়িতে আর প্রসাধিত মুখের লাভণ্যে ধীরাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। কপালের ওপর কুমকুমের টিপটা আর বিহ্বল চোখেব পাভায় পাউডারের হালকা প্রলেপটা যেন বড় স্নিগ্ধ মাধুরী ছড়াচ্ছিল। চলন্ত বাসে বসে অনিমেষ যেন বুকের মধ্যে ধীরার সেই ঢলঢল লাভণ্যে ভরা মুখখানির নিবিড় স্পর্শ পেল। বুকের রোমকূপে বোমকূপে যেন সেই অল্পভূত সত্তার শ্বাসপ্রশ্বাস অল্পভব করল। সেই অল্পভবে হৃদয়টা বিগলিত হতে গিয়ে শূন্যতার বেদনায় টনটন করে উঠল।

এই শূন্যতাব বেদনা অনিমেষের মনে অনেকক্ষণ ছেয়ে থাকল। পৌনে তিন ঘণ্টা সিনেমায় বসে কি যে দেখল তা ওব খেয়াল রইল না। ফেরার সময় কনকেন্দ্র একটা কাফেতে নিয়ে গেল। সেখানে চুপচাপ বসে কনকেন্দ্রর ফরমায়েগ দেওয়া কেক আর এক পেয়লা চকোলেট খেল। বাসে বসেও কনকেন্দ্রব সঙ্গে বড় একটা কথা বলল না।

আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ



“আমিও ভেবেছিলাম এমন দিন আসুক...”

সমাজ-সেবিকা বোধের শীঘ্রী নোবেল অমলিক বলেন

‘আমি জানতাম সবান ঘনাই পরিবর্তন একদিন না একদিন আসবেই। আর তা এসেওছে। বোজাই গৃহিনীদের সাথে দেখা কবটাও আমার একটা বাজ। আমি তাঁদের দেখেছি তাঁরা যুগের সাথে তালে তাল মিলিয়ে গৃহস্থলীর কাজে নিজাই আধুনিক উপায়েন অনুসরণ করছেন।’ ‘সার্ফে’র কথাই ধরুন। গৃহিনীদের কাছে এই আধুনিক কাপড় কাচার পাউডারটির জনপ্রিয়তা দিনদিনই বেড়ে চলেছে। আর তার কারণও আছে। আমি নিজে সার্ফ ব্যবহার করে জানি বাড়ীতে কাপড় কাচার কাজটা এতে একেবারেই সহজ হয়ে গেছে।’

‘সার্ফে’ কাচার কোন বস্তু নেই। অথচ কাপড়ও এতে চমৎকার দরসা হয়। শাটী, ব্লাউজ সাট, প্যান্ট বাড়ীর সব কাচাকুটিতে আমি সার্ফ ব্যবহার করি।’

আধুনিক গৃহিনীরা সবাই এখন—সার্ফে’র কাপড় কাচার শক্তি অতুলনীয়। মুহূর্তে কাপড়ের লুকোনো ময়লাও টেনে বার করে সার্ফ সাদা কাপড় জামাকে অপূর্ণ দরসা করে। আপনিও বাড়ীতে কাপড় জামা সার্ফে কাচুন।

সার্ফে কাপড় জামা সবচেয়ে ফরসা করে কাচে

হিসেব লিভারের তৈরী।

SU, 11-XS2 RD.

বাস থেকে নেমে বাড়ির দিকে যত এগুতে লাগল ততই বেন বেদনার সঙ্গে একটা দুর্বল তৃষ্ণা তাকে উদ্বেলিত করতে লাগল।

মনের এমনই এক অবস্থায় সে এসে ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজায় করাঘাত করল।

বার দুই টোকা দিতে ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ শুনল সে। আস্তে আস্তে দরজার শাল্লাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ধীরা দরজাটা বন্ধ কবে দেওয়ার জন্তেই বুঝি দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল আনন্ডমুখে। পরনে এখনও সেই বিকেলের শাড়িটাই রয়েছে। কপালে কুমকুমের টিপটাও তেমনই শোভা পাচ্ছে। রাত্রি বহুশ্রম্যতা আরও বেন তার চেহারাটাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

অনিমেষ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিহ্বল চোখে ওকে দেখতে লাগল। আজ হৃদয়ের আকুলতায় বাধাবিহীন মান-অপমান সবকিছুই বেন তার মন থেকে ছুটে গেছে। সে একইভাবে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে লাগল। যত দেখল ততই বেন তৃষ্ণাটা প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। ধীরা চোখ তুলে একবার তাকাল। চোখোচোখি হওয়া মাত্র চোখ নামিয়ে নিল। একটু বেন বিব্রত বোধ কবতে লাগল। তারপর অনিমেষের সামনে থেকে সরে গেল। অনিমেষ বিহ্বল চোখে তাব গতিভঙ্গিমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেও পিছু পিছু ধীরার ঘরে এল।

ঘরের ভিতর ধীরা চূপচাপ দাঁড়িয়েই ছিল। অনিমেষ এসে তার একটা হাত চেপে ধরে ব্যাকুল গলায় বলে উঠল, ধীরা, তুমি আমার ক্ষমা কর।

ধীরা তার হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

আজ আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না। বল তুমি আমার ক্ষমা করেছে।—বলতে বলতে অনিমেষ নিবিড় আলিঙ্গনে ধীরাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষকে সঙ্গে করে এক ধাক্কা দিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ধীরা বলল, বেরিয়ে যাও

এ ঘর থেকে। ক্ষমা, ক্ষমা চাইতে এসেছ তুমি। লজ্জা করে না তোমার?

অনিমেষ এর আগে কখনও ধীরার এমন চেহারা দেখে নি। সে ঘরের ভিতর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। তার বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দরজার শাল্লা ছুটো বেন তার শিঠের ওপর সশব্দে আছড়ে পড়ল।

সেই রাত্রিটা বড় দুশ্চিন্তায় কাটল অনিমেষের।

ধীরার এই নিষ্ঠুরতা নির্মমতায় সে যেমন আঘাত পেয়েছে, তেমনই আবাব বিশ্বাস বোধ করেছে। সে বুঝতে পারছে না, চার বছরের ভালবাসাটা আজ হঠাৎ এমন মূল্যহীন, এমন অবিখ্যাত হয়ে পড়ল কি করে।

অনিমেষ ভাবতে লাগল, চার বছর ধরে ওকে যে ভালবেসে এসেছি—তা তো মিথ্যে নয়। এই সত্যটাকে আমি যেমন দেহের রক্তমাংসের সঙ্গে উপলব্ধি করছি, সেও কি তা উপলব্ধি করে না। ভালবাসাটা কি এতই রূনকো জিনিস যে, যে কোনও সময়ে যে কোনও একটা কারণে তা ভেঙে যায়। মন থেকে মুছে যায়।

তুমি এত সহজে তা মুছে ফেললে কি করে। ধীরাবকে বেন সামনে রেখে অনিমেষ বলতে লাগল, প্রথমে ভেবেছিলুম তোমার এই রাগ নেহাতই একটা সাময়িক অভিমান মাত্র। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার ওপর তোমার এই রাগ বিদ্রোহ ঘৃণা কী প্রবল, কী সাংঘাতিক। এই দু মাসে তুমি আমার কোনও খবর রাখ নি। কখন বাড়ি আসছি, কখন বাড়ি থেকে যাচ্ছি, শারীরিক কুশলে আছি কি না, সে সব কিছুই তুমি খবর রাখ না।

কেন, কেন ধীরা তোমার এত বিদ্রোহ, এই অবহেলা। আমি কী এমন অত্যাচার করেছি। একটু মেয়েকে ভালবেসে-ছিলুম—এই আমার অত্যাচার, এই আমার অপরাধ?

ভালবাসাটা অত্যাচার নয় ধীরা। এ যে জৈবিক নিয়ম।

তুমি কি শুনেছ এবং কার কাছ থেকে কী ভাবে ব্যাপারটা জেনেছ জানি না। তাই হয়তো ভেবেছ, আমি পশুর মত মাধবী নাবীতাকে অপমান করেছি।

কিন্তু বিশ্বাস কর, বিয়ে করব এইরকম একটা সংকল্প ছিল বলেই আমরা অতদূর এগিয়েছিলুম। আমাদের সেই সংকল্পের পথে মাধবী বাবা যদি বাধা সৃষ্টি না করতেন, তা হলে এই সর্বনাশ হত না এবং আমাদের সেই ভালবাসার গায়েও এমন কলঙ্কের দাগ পড়ত না।

মাধবী বাবা যখন ওপরওয়ালার সঙ্গে যোগসাজস করে আমার চাকরিটা নষ্ট কবলেন তখন পলাশবনী ছেড়ে আসতে আমি বাধ্য হলাম। তার কয়েকদিন পরেই আমাদের রেজেক্সি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই গোলমাল আর মানসিক অশান্তিতে তা আর হল না।

আসবার সময় মাধবীকে কথা দিয়েছিলুম, কলকাতায় কোন রকমে একটা চাকরি জুটিয়ে ব্যবস্থাটা পাকাপাকি কবব। কিন্তু ভাগ্যের কি ফের মেথ। কলকাতায় এসে তিন মাস চরকির মত ঘুরেও একটা চাকরি জোটাতে পারলুম না। সেই দিনগুলো যে কী দুঃসহ ভাবে কেটেছে তা ভাবতে গেলে এখনও আমি শিউরে উঠি। বেকারত্বের জালা, মাধবীর জন্তে মানসিক উদ্বেগ—সবকিছু মিলে আমাকে যেন পাগলের মত করে তুলেছিল। দুশ্চিন্তায় এক এক সময় যেন খাঁসখাঁস বন্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু মাধবীর বুঝি এত ধৈর্য ছিল না। ছিল না লজ্জা গোপন করার সময়। এবং আমাব ওপর বিশ্বাসটাও বোধ হয় দিনে দিনে হারিয়ে ফেলেছিল, হতাশায় ভেঙে পড়েছিল। তাই নিজের লজ্জা গোপন করার জন্তে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল।

পলাশবনী থেকে লেখা আমার এক বন্ধুর চিঠিতে যেদিন ওর আত্মহত্যার খবরটা পেলুম সেদিন আমি যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলুম। মনে আছে সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কাছে ঘাসের ওপর একটা বড় ঘোড়ানিমের ছায়ায় শুয়ে

কাটিয়েছিলুম। তারপর তিন-চার দিন যে কী অবস্থার ভেতব দিয়ে কেটেছে তা আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। শুধু রাস্তায় রাস্তায় উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। সব সময় মাধবীর ফুলের মত নুবন্ন মিষ্টি চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। মৃত্যু এসে সেই সুন্দর দেহটাকে বিনাশ করেছে এবং সেই মৃত্যুর জন্তে আমিই দায়ী—এই চিন্তাটা সব সময় যেন আমার অন্তরটাকে দগ্ধ করেছে। সেই দহনজ্বালয় আমি ছুটফট করেছি।

ভেবেছিলুম মনের এই ক্ষত সারাজীবন বুঝি দগদগে হয়েই থাকবে। কিন্তু তা হল না। সময়ের প্রলেপে সেই ক্ষত ধীরে ধীরে শুকতে লাগল। তারপর একদিন শুধু দাগটুকুই রয়ে গেল।

এরপর ভূমি এলে। তোমায় পেয়ে আমার সেই অতৃপ্ত কামনা বাসনা যেন চরিতার্থ হতে চাইল। হৃদয়ের সেই বৃষ্টিগুলো আবার নতুন করে জেগে উঠল। নতুনেব মাঝে আমি যেন সেই পূর্বনোকেই খুঁজে পেলুম। তোমায় ভালবাসতে শুরু কবলুম।

জানি না এব ভেতব কি অত্যাশ আমি করেছি। মাধবীকে ভালবেসে আমি যেমন অত্যাশ করি নি, তাতে যেমন কোন ফাঁকি ছিল না, তেমনই তোমার প্রতি ভালবাসাতেও আমার এতটুকু ফাঁকি নেই, তোমায় ভালবেসে কিছু অত্যাশ করেছি বলে আমার মনে হয় না।

কিন্তু ধীরা, আমার হৃদয়ের এ সমস্ত কথা যে তুমি বুঝবে না। তোমাকে আমি বোঝাই কী করে। এত কথা তোমায় বোঝানো যাবে না।

অঙ্ককারে বিছানায় শুয়ে অনিমেঘেব দুশ্চিন্তায় গ্রহর কাটিতে লাগল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বসন্তাণি বীক্ষা

মধ্যভারত পর্ব ॥ শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ॥

তেইশ

সাঁচী থেকে আমরা বাঁসি যাব, ভিলসায নামব না।
হাতে যথেষ্ট সময় ও পকেটে অচেল পয়সা থাকলে
আমারও আপত্তির কাবণ থাকত না। আমি জানি,
কলকাতায় ফিরে অফিসে আমাকে অল্পপস্থিতির জগ্ন
কৈফিয়ত দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ অনেকবার আমাকে
সতর্ক কবেছেন, এবারে তাড়িয়ে না দিলে শেষবারের মত
সতর্ক হতে বলবেন। এ সবের জগ্ন আমার আপনোস
নেই। জীবনের জমার খাতায় মোটা জমা পড়েছে। সে
সম্পদ ধরে বাঁথতে না পাবলেও স্বত্বটুকু অক্ষয় হয়ে
থাকবে।

ওয়েটিংরুমে আমরা গাড়িও অপেক্ষা করছিলুম।
মিনতি চুপিচুপি কখন পাশে এসে বসেছিলেন জানতে
পারি নি। হঠাৎ বললেন : স্বাতির সঙ্গে আমার
ভাব করতে ইচ্ছে হয়েছিল।

আমি চমকে উঠেছিলুম।

মিনতি বললেন : ভয় পেলেন নাকি ? আমি
পুরুষমানুষ নই।

হেসে বললুম, আপনি পুরুষমানুষ হলেও ভয় পেতুম
না। স্বাতি আমল দিত না। আমি আপনাকে এখানে
দেখে চমকেছি।

তা হলে কি আমাকে ভয় পান ?

তাও না।

তবে ?

ভয় না পেলেনও মানুষ চমকায়। গেল গেল!

কী গেল ?

হেসে বললুম : চমকে উঠলেন তো ?

উত্তরে মিনতিও হাসলেন। তারপরে বললেন :
দুর্ভাবনাও আপনি যে কাতব হয়ে পড়েছেন, তাতে আমার
সন্দেহ নেই।

গম্ভীর ভাবে বললুম : খাঁটি কথা।

খুশী হয়ে মিনতি বললেন : দেখেছেন তো, ঠিক ধরে
ফেলেছি।

আপনার বাহাদুরী আছে।

এব পবে মিনতি সবাসবি প্রশ্ন করলেন : এবারে
আপনাব দুর্ভাবনাব কথা বলুন, দেখি কোন সাহায্য
করতে পারি কিনা।

কী সাহায্য করবেন ?

অগ্নি কিছু না পাবি, পরামর্শ দিতে পারব তো।

আবও গম্ভীর হয়ে বললুম : পরামর্শে নিস্তার পাব
না।

মিনতি এবাবে জোর করলেন : বলুন না শুন।

আমি আব দেরি করলুম না। বললুম : এতদিন
পালিয়ে আছি যে, চাকরিটা আব বাঁচানো যাবে না।

চোখের উপর হাত রেখে বিরূপাক্ষ বিমুচ্ছিলেন,
হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন। মিনতি অভ্যস্ত
লজ্জিতভাবে উঠে গেলেন। আমিও যেন লজ্জা পেলাম
মিনতির লজ্জা দেখে। আমি 'মিথ্যা' বলে তাকে



‘একটু আগে
জামাটা পরিয়েছি
— দেখুন কি দশা কবেছে!’

‘একটু আগে জামাটা পরিয়েছি, দেখুন কি দশা কবেছে।
এদেব মতো ছুইদেব সামলাতে আপনাকেও কিন্তু আমার পথই
বেছে নিতে হবে।’ কাপড়জামা সবই সানলাইটে কাচুন।
সুতাই বলছি, কত কি ব্যবহার কোবলাম, কিন্তু সানলাই-
টেব মতো এত ভাল কবে কাপড় আব কোন সাবানেই
কাচতে পারিনি। এতে কাপড়জামা মনেব মতো ফবসা হয়,
তাই কেচেও আনন্দ!

বোম্বের (২ নং মে. ফোর, বাল্লা) শ্রীমতী
আস্তাবাম বাড়ীর সব কাপড়জামা বিত্তক.
কোমল সানলাইটে কাচেন। আপনিও
কাপড়ের আরও ভাল ফল নিতে সানলাইটে
কাচুন।

সানলাইট

কাপড় জামার সঠিক যত্ন নেয়!



ঠকিয়েছি। নিজের দুর্বলতা গোপনের জগুই আমাকে
মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

সত্যিই আমি স্বাতির কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম
তার আচরণের কথা। তাকে আমি চিনেও যেন
চিনি নি, জেনেও জানি নি তাকে। বড় দুর্বোধ্য মনে
হচ্ছে তাকে। হবারই কথা, যে কোন মানুষেব হবে।

পুনা থেকে যখন আমরা বোম্বে ফিরে এলাম, জো' রায়
স্টেশনে এসেছিলেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে। মামা
মামী প্রথম শ্রেণী থেকে নামলেন, আব আমরা নামলাম
তৃতীয় শ্রেণী থেকে। স্বাতি আমার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ
হয়ে রইল যে মামীর চোখে তা অশোভন মনে হল।
তিনি মাঝখানে আসবার আগেই আমি তফাতে সরে
গেলুম।

জো রায় হেঁট হয়ে মামা মামীর পায়ে ধুলো নিলেন।
কথা মামীই প্রথমে কইলেন : পুনা যাওয়া হঠাৎ স্থির
হল, তাই তোমাকে জানাতে পারলাম না।

জো রায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তা তাঁর উত্তরেই ধরা
পড়ল। বললেন : তাতে কী হয়েছে।

মামী বললেন : কী হয়েছে মানে, তোমাকে বললে
তুমিও হয়তো যেতে পারতে।

তা পারতুম। আপনারা জন্তে আজ আমি ছুটি
নিষেধিলাম।

তাই নাকি ! দেখলে তো !

বলে মামী তাঁর অভিযোগ জানালেন মামাকে।

মামা কিছুই বললেন না।

জো রায় বললেন : আস্থন।

পা বাড়াবাব আগে স্বাতি আমার দিকে তাকিয়েছিল।
তার দৃষ্টিতে আমি কী দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। তখন
আমি নিজের মনের স্বপ্নে স্বাতিকে রাঙা দেখছিলাম।
ভেবেছিলাম, জো বায়ের কথায় সে কৌতুক বোধ কবেছে।
তখন আমার এতটুকু সন্দেহ হয় নি যে স্বাতি অল্প কিছু
ভাবতে পারে, কিংবা অল্প কিছু ভাবা তার পক্ষে সম্ভব।
এখন আমি অনেক চেষ্টা করেও তার দৃষ্টিটা মনে করতে
পারছি না। মনে পড়ছে না, সে হেসেছিল না লজ্জিত

হয়েছিল। দুইই তো সম্ভব ! তবে কেন আমি মনে
করেছিলাম যে স্বাতি কৌতুক বোধ করেছে।

স্টেশনের বাইরে একখানা ছোট গাড়ি ছিল।
জো রায়েব নিজের গাড়ি, কিন্তু সবাই মিলে বসার
অনুবিধা ছিল। মামা আমাকে বললেন : একখানা
ট্যাক্সি ধর।

মামী বললেন : না না, এতেই হবে।

আমি বললাম : আপনারা যান, আমি বাসে বাছি।

স্বাতি বলে উঠল : সেই ভাল গোপালদা, আমবা
বাসেই যাই।

মামী বললেন : পাগল নাকি !

তার বেশী আর কিছু বললেন না। বলবার দরকার
হল না। মামা পিছনে উঠেছিলেন। স্বাতিকে নিয়ে
মামী তাঁর পাশে বসলেন। একটু ঘোঁষাঘোঁষি হল, কিন্তু
তাব চেয়ে মামীর স্বস্তি হল বেশী। আমি সামনে জো
রায়েব পাশে বসে এই ঘটনাটি উপভোগ করেছিলাম বলে
মনে পড়ছে।

জো রায় আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে
গেলেন না। গল্প করলেন অনেকক্ষণ, মামীর অনুরোধে
খেলেনও আমাদের সঙ্গে, তারপর সকালেই আবার
আসবেন বলে ফিরে গেলেন। দিল্লীর রানার মত বোম্বাই
দেখাবার ভার নিলেন বোম্বের জো রায়। মামা বললেন :
গাড়ি আমবা ভাড়া করব।

সহাস্ত্রে জো রায় বললেন : দেখি।

অর্থাৎ বড় গাড়ির ব্যবস্থা হয়তো তিনিই করবেন।

স্বাতি এতক্ষণ কিছুই বলে নি, জো রায় চলে যাবার
পরেও কিছু বলল না। বলল পরের দিন ভোববেলায়।
বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে আমায় ডেকে তুলল, বলল : আর
ঘুমবে কত ?

বাবান্দায় বেরিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম।
আকাশে একটু আলো ফুটেছে বটে, কিন্তু বাবান্দায়
অন্ধকার আছে।

অমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন ?

তোমার কাণ্ড দেখে।

পড়ে পড়ে শুধু ঘুমবে, কেউ ডেকে দিলেই দোষ।
মাহুশ মাত্রেই বাতে ঘুমর, যারা শ্রাওড়া গাছে থাকে
তাদের কথা আলাদা।

স্বাতি রাগের ভান করল : ঘাড় মটকাব।
বলেই চলে যাচ্ছিল। আমি ডেকে বললুম : কী
হুকুম ছিল, বললে না ?

ভূত হলে বলতাম।

তোমার জন্তে আজ তাই আমি।

স্বাতি হেসে বলল : চট করে তৈরি হও, এখনি বেবব।
সে কি !

সে কথা পথে হবে।

স্বাতি তার অপেক্ষা না করে নিজেব ঘরে গিয়ে ঢুকল।
আমি বোধ হয় শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম কিছুক্ষণ।
তারপর নিজের ঘরে এসে মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে
নিয়েছিলুম। আমি জানতুম, তার সংকল্পে দৃঢ়তা
আছে। কারও কথাই সে মানবে না। মামা আপত্তি
করবেন না, মামী একবার বলেই ক্ষান্ত হবেন, আর স্বাতি
বেরিয়ে যাবার পরে মামাকে দায়ী করবেন তাঁর শাসনের
অভাবেব জন্ত।

স্বাতির আগেই আমি তৈরি হয়েছিলুম আর নেপথ্যে
থেকে মা ও মেয়ের কথোপকথন শুনেছিলুম। মামী
বোধ হয় ঘুমছিলেন, কিংবা কোন শব্দে তাঁর ঘুম
ভেঙেছিল। স্বাতিও হয়তো জাগিয়ে থাকতে পাবে।
বলল : আমি একটু বেরছি মা।

কোথায় ?

বেড়াতে। ফিবতে দেরি হবে।

মানে ?

মানে ছপুয়ে হয়তো ফেরা হবে না, একেবাবে
সন্ধ্যাবেলায় ফিরব।

মামী বোধ হয় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, কিংবা ঘুমের
ঘোরে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি, বললেন : ওগো,
শুনছ ?

মামা যে জেগে ছিলেন তা বোঝা গেল তাঁর কথা
শুনে। বললেন : গোপালকে ডেকে নিও।

আমার মনে হল, এ সবই তাঁর জানা ছিল। স্বাতি
যে আমাকে জাগিয়ে এসেছে, তাও হয়তো তিনি লক্ষ্য
করেছেন। কিন্তু মামীকে তা জানতে দিলেন না।

ঘরের বাইরে এসেই স্বাতি চটে উঠল : লুকিয়ে
আমাদের কথা শুনছিলে বুঝি ?

আমি তার কানের পাশে লালের আভা দেখেছি।
বললুম : চটলে কি লজ্জা ঢাকবে ?

কিসের লজ্জা ?

এগোতে এগোতে বললুম : তোমার কান সাক্ষী।

স্বাতি অস্বীকার করল না, বলল : তোমাব শকুনের
দৃষ্টি।

আমি হেসে তাকে প্রসন্ন কবলুম।

প্রভাতের সূর্যকিরণে পথ তখন ঝকঝক করছে।
স্বাতির পায়ের দিকে তাকিয়ে আমার মনেহ রইল না
যে তার মনও ওই আলোর মত ঝকঝক করছে।

বললুম : আজ এ কী খেলা হল ?

খেলা আবার কিসের ?

এ খেলা নয় বুঝি ?

একদিন লুকিয়ে করেছিলাম। আজ না হয় জানিয়েই
করলাম।

লুকিয়ে কবে করেছিলে ?

কেন, মনে নেই ?

না।

তোমার সঙ্গে পবিচয় হবার ঠিক দুদিন পরে, তৃতীয়
দিনে, মাজাজেও এমনি কবে বেরিয়ে আসি নি কি ?

মনে পড়েছে। মাজাজে সেদিন খুব ভোরে ঘুম
ভেঙেছিল। রাতে বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিল। সকালটি
মধুর ছিল আজকেব মতই। ধীরে ধীরে আমি কয়ুম
নদীর পুলের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলুম। স্বাতি যে
আমাকে অনুসরণ কবেছিল, আমি তা দেখতে পাই নি।
তার কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। বললুম :
এসেছিলে।

তবে ?

তবে এই হৃদনের আসার ভেতর প্রভেদ আছে
আকাশ-পাতাল।

কী রকম ?

সেদিন লুকিয়ে এসেছিলে সত্যি। কিন্তু বিদ্রোহ
জানিয়ে আস নি। সেদিন ধরা পড়লে একটু লজ্জা পেতে,
আজকের কাক্সের পরিণাম হবে নিষ্ঠুর।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকান, কোন প্রশ্ন
জানাল না।

বললুম : বিয়েটা আটকে গেল।

ও।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা কবলুম : আব কিছু
বলবে না ?

যদি বলি, মতলবটা ওই রকমই কিছু ?

কোন ভাগ্যবানের জন্তে জানতে পারি কি ?

সে থাকে তালগাছের মাথায়, কারিয়া পিরেত বা।

জিত কেটে উত্তর দিলুম : আবে মুংরি, তেবা সাবম
নেহি বা।

দুজনেই হাসলুম অনেকক্ষণ ধবে। তারপরে জিজ্ঞাসা
করলুম : কোথায় নিয়ে যাবে ?

অত নীরস কেন, একটু কবিত্ব কর।

কবিতা মানেই তো রবীন্দ্রনাথ। বললুম :

আর কতদূবে নিয়ে যাবে মোরে

হে সুন্দরী ?

বল কোন পার ভিড়িবে তোমার

সোনার তরী ?

স্বাতি বলে উঠল : নিরুদ্দেশে।

সে আবার কোথায় ?

কেন, ভয় পেলে নাকি ?

ভয় পাওয়া উচিত কিনা ভাবছি।

আমি মেরিন ড্রাইভের দিকে পা বাড়িয়েছিলুম।

স্বাতি বলে উঠল : না না, ওদিকে নয়, আমরা উলটো
দিকে যাব।

উলটো দিকে ?

কিছু খেতে হবে না—দই-বড়া, চাট ছবকা ?

বুঝেছি।

কিছুই বোঝা নি। হোটেলের এখন আমরা ফিব
না। ছপুবে না, বিকেলেও না।

তারপর ?

সে পরে ভাবব।

সেদিন সত্যিই আমরা পরিজ্ঞ আর পাউরুটি খাই নি,
ডিমের পোচ বা ওমলেটও না। খেয়েছিলুম হিঙের
কচুরি আব গোলগাপ্পা। সোল্লাসে স্বাতি বলেছিল :
আজ তোমাকে ফতুব করে দেব।

আমি তো ফতুর হয়েই আছি।

বিপদ এখন বুঝবে না, তাই জবাব দিচ্ছ। ছ পা
এগিয়েই খেতে চাইব।

রাজভোগ খেতে চাইলে ভয়ের কারণ ছিল, তুমি
তো আমারই মত বাদশাহ। যুগনি আর পকৌড়ার
রসিক।

সাবান্নিন গাড়ি চড়ব।

গরুর গাড়ি, না—

তোমার পকেটে কত পয়সা গোপালদা ?

অনেক।

শুনি না কত।

আছে কয়েকটা ফুটো পয়সা।

পকেটটা ফুটো নয়তো ?

স্বাতিব এমন ছেলেমানুষি আমি কোনদিন দেখি নি।
মনে হচ্ছিল, কোন স্থলেব মেয়ে আজ স্থল থেকে ছাড়া
পেয়েছে, আনন্দের তার সীমা নেই। বললুম : জুছ
যাবে ?

পাংল হয়েছি।

কেন ?

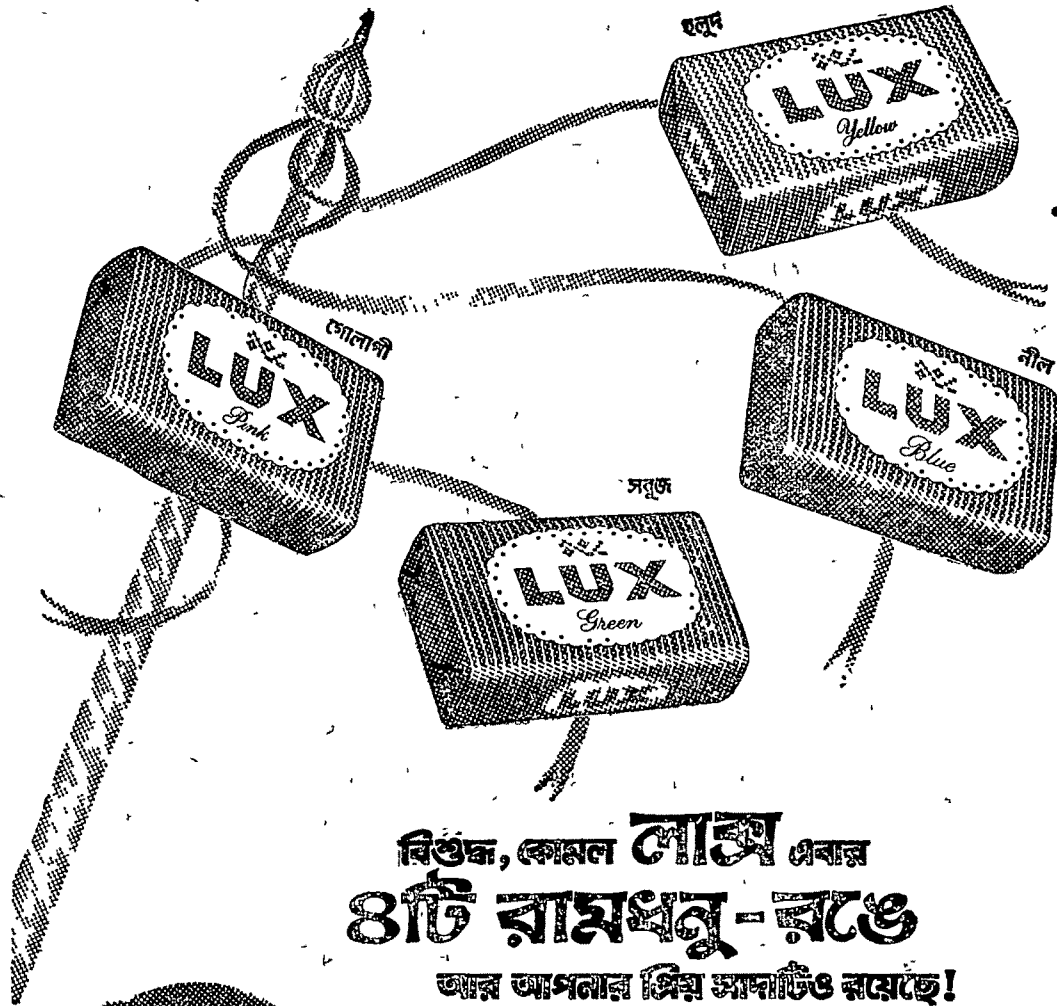
তোমার স্নানের জামা আছে ?

না।

তবে সেখানে কী করবে ?

তোমারও তো নেই। দুজনে না হয় বসেই থাকব।

অন্ধের স্নান দেখলে লোকে কী বলবে জান ?



বিশুদ্ধ, কোমল লোম্মি এবার ৪টি রামধনু-রঙে

আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!

দেখুন! লাক্স এবার চমৎকার কত সব নতুন রঙে ধবা দিয়েছে—
সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—তবে
যত্ন নিতে যে সাবান আপনি চিবদিনই চেয়েছেন।



মঞ্জুলা ব্যানার্জী বলেন
'আমার প্রিয় লোম্মি যেন
রঙের মেলা লেগেছে,
এ এক অভিনব রচনা!'



চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য-সাবান

বোকা বলবে না।

অসত্য বলবে।

সেই তো সত্যতা। যে যত অসত্য হতে পারে,
তাইই নাম তত সত্য।

এ তোমার দুর্বলতার কথা।

হোক দুর্বলতা। শক্তিব যে ছবি দেখেছি, তাতে
দুর্বল থাকতেই আমি গৌরব বোধ কবি।

সত্যিই আমি কিছু ছবি দেখেছি। জুহুর সমুদ্রবেলায়
প্রায় নিবাবরণ নরনারী উন্নত হয়ে স্নান কবছে, বিশ্রাম
করছে, টলাটলি কবছে। আমাদের অনভ্যস্ত চোখে
বড় অশোভন লাগে। ওদের সঙ্গে মিলে গেলে যে
আব খারাপ লাগবে না, তা জানি। কিন্তু মেলা যে
মুশকিল।

স্বাতি বলল : এও তোমার প্রগতি-বিবোধী মনোব
পরিচয়।

হযতো তাই। কিন্তু তুমি যাবে কোথায় বল ?
কোথাও না।

তবে ?

এমনি কবে ঘুরে বেড়াব।

সর্বনাশ !

সর্বনাশ কেন ?

সর্বনাশী ব পাল্লায় পড়েছি।

তোমার আছে কী, যে সর্বনাশের ভয় ?

প্রাণ আছে।

প্রাণ থাকলে খুশী হতে।

খুশী হই নি কি, কিন্তু সে কথা স্বীকার করা চলে
না। তাই বললুম : প্রাণের ভয়টা সকলের আগে।

স্বাতি বলল : তর্ক থাক্। মহালক্ষ্মীর মন্দিরে চল।
অনেকদিন মন্দির দেখি নি।

একটা স্থিতি নিঃশ্বাস ফেলে বললুম : বাঁচালে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসেছিল। ভারি
দুঃস্থ হাসি, মিষ্টিও। কিন্তু সেই হাসি দিয়ে সে তার
মতলব রেখেছিল লুকিয়ে। আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করি
নি, অবকাশ পাই নি সন্দেহ করবার। যখন বুঝলাম,

তখন দেরি হয়ে গেছে। তখন আর প্রশ্ন কববার সময়
নেই, শুধু সন্দেহ আর শঙ্কায় সমস্ত মন উদ্বেল হল।

বিরূপাক্ষের বাঁকানিতে আমার তন্দ্রা হঠাৎ ছুটে
গেল। ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলেন : ঘুমলেন
নাকি মশাই ? বাঁসির গাড়ি যে এসে গেল !

তাই তো, বাইরের প্ল্যাটফর্মে যে কোলাহল শুরু
হয়ে গেছে। সাঁচীতে ট্রেন বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না।

চব্বিশ

রাজিবে ট্রেন। সকাল আটটার পরে বাঁসি পৌঁছেবে।
মিনতির জায়গা পেতে অসুবিধা হল না, অভিমতটাকে
নিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। বিরূপাক্ষ সিগারেট ধবালেন,
আর আমি এক ভদ্রলোকের পাশে বসে চুলতে লাগলুম।
বিনায় এ গাড়িটা দীর্ঘ সময় দাঁড়ায়, ঘন্টা তিনেক। সে
সময় নাকি আমাদের মত জনকয়েক লোক গাড়িতে
থাকে। শুয়েই ঘুমনো যাবে। হঠাৎ আমার পাশেব
ভদ্রলোক বললেন : আপনারা এ গাড়িতে কেন উঠলেন ?

বললুম : উপায় ছিল না।

আপনারা যে টুরিস্ট দেখছি।

আজ্ঞে।

সাঁচীর বদলে ভিলসায় এলে যে কোন ট্রেন ধরতে
পারতেন। ভিলসায় সব ট্রেন দাঁড়ায়।

ঠেকে ঠেকে শিখছি।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন : আপনারা কি
কলকাতা থেকে আসছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ?

শিবপুর্বী থেকে।

সে আবার কোথায় ?

শিবপুর্বী জানেন না ?

ভদ্রলোক ভারি আশ্চর্য হলেন। তাঁর বিস্ময় দেখে
মনে হল যে সে স্থান সাঁচী বা বাঁসির চেয়েও মনোরম।
তবু আমি নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করলুম : জানি নে।

রাত এমন কিছু বেশী হয় নি। বিনা পৌঁছেবে

বারটার কাছাকাছি। ভদ্রলোক ঘড়িতে একবার সময় দেখে বললেন : গোয়ালিয়র রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস।

শৈলাবাস ?

আপনাদের দার্জিলিংয়ের মত শৈলাবাস নয়, নীচু মালভূমির ওপব গ্রীষ্মাবাস। সমুদ্রতল থেকে চৌদ্দশো ফুট উঁচু। বিহারের হাজারিবাগ রাঁচীর মত হতে পারে।

ভদ্রলোক আগ্রহ কবে আমাদেরকে শিবপুরীর গল্প শোনালেন। বোম্বে থেকে আগ্রা যাবার বড় সড়কের উপর শিবপুরী, গোয়ালিয়র থেকে ত্রিযাত্র মাইল দূরে। অরণ্যময় পরিবেশ, কয়েকটি হ্রদও আছে দূরে দূরে। দু'ধারে সবুজ পাহাড়, মাঝখানে রাজপথ। পলাশে পলাশে পাগল হয়ে বসন্তের ছোয়ায় মনে হবে পৃথিবীটাই যেন জ্বলছে। পলাশ নয়, ও রঙ বৃষ্টি আগুনের। খেলনার মত একটা রেলের লাইন কখনও পাশে পাশে, কখনও এ-পাশ থেকে ও-পাশে গেছে, আবার ফিরে এসেছে ও-পাশে। গোয়ালিয়র-রাজার নিজের রেল ছিল। এখন ভারত-সরকারের সম্পত্তি হয়েছে।

চল্লিশ মাইল পৌছবার আগেই পথ একটু ঘুবে স্থলভানগড় ফল্গুসে পৌছেছে। অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে পার্বতী নদী লাফিয়ে নেমেছে নীচের প্রশস্ত উপত্যকায়। পরিবেশ মুগ্ধ হয়ে থাকে গভীর কলধ্বনিতে।

বাঘের গর্জনও শোনা যায়। দু'ধারের গভীর বনে বাঘ নেকড়ে চিতা সবরকম জানোয়ারই আছে। এ রাজ্যেব আটান্ন মাইল জোড়া গ্রামশাল পার্ক। কোন কোনদিন পথের মাঝখানেই বাঘের দর্শন মেলে। শিবপুরী পৌছবার মাইল ছয়েক আগে কুয়ত বাবা নামে একটা সুন্দর জায়গা আছে। সেখানে ঘন লতাগুল্লের ভিতর দিয়ে একটা ঝরনার মত নদী বয়ে গেছে। এই নদীতে নিয়মিত বাঘ আসে ভূষণ নিবারণে।

শিবপুরী থেকে চার মাইল দূরে চান্দ-পথ নামে একটা বিরাট হ্রদ। সাত মাইল তাব পরিধি। লোকে একে সাখ্যাসাগরও বলে। পাড়ে একটা বোট ক্লাব আছে।

নৌকায় চড়বার জন্তে অসংখ্য লোক আসে। চাবিদিকে মনোহর পাহাড়, পাথরের রঙ যেন লাল, আর গাছের পাতার রঙে হালকা বেগনি ছায়া। নীচেব নীল জল আব উপবের নীল আকাশে মিশে একটি মায়াময় পবিবেশ। একটি ভাল সঙ্গী পেলে উঠে আসতে ইচ্ছা হবে না।

এই সাখ্যাসাগরেই একটা সুন্দর কুণ্ড আছে। তার নাম ভাদাইয়া কুণ্ড। বর্ষায় ও তাব পবেও জলের তোড় দেখে আশ্চর্য হতে হয়। জায়গাটা বাঁধিয়ে এমন সুন্দর কবা হয়েছে যে নীরস মানুষেরও তা ভাল লাগবে।

তারপরে রাজ্যের ছত্রিগুলো। বর্তমান মহারাজাব পিতা মাধো রাও তাঁর মাতা মহারাণী সাখ্য রাজা সিদ্ধিয়ার একটি ছত্রি নির্মাণ করেছিলেন। চমৎকাব একটি বাগানের ভিতর হলদে বালি পাথরে তৈরি এই ছত্রি। এবই সামনে মহারাজা মাধো রাওয়ের ছত্রি। প্রচুর অর্থব্যয়ে এই ছত্রি নির্মিত হয়েছে। শুধু মার্বেল পাথর নয়, ভিতরে ভিতরে অল্প দামী অস্ত্র পাথরও আছে।

তাঁতিয়া তোপেকে মনে পড়ে ?

ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা কবে বসলেন।

আপনি কি সিপাহী বিদ্রোহের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ।

ভারতবর্ষ তাঁকে কোনদিন ভুলবে না।

তাঁর চবুতরা আছে শহরে। সার্কিট হাউসের কাছে একটা জায়গায় ইংরেজ সেই দেশপ্রেমিক বীরকে ফাঁসি দিয়ে মেরেছিল। একশো বছর পরে সেই রক্তাক্ত স্থানের উপর স্বাধীন সরকার তাঁর চবুতরা নির্মাণ করেছে।

ভদ্রলোকের বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছিল। আমার মন চলে গিয়েছিল সেই অতীতের দিকে। স্বাধীনতাব সংগ্রামকে ইংরেজ বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছে।

ইতিহাসে আজও আমবা সিপাহী বিদ্রোহের কথা পড়ি। আজও এই ঘটনা একটা সম্মানের নাম পায় নি। তাঁতিয়া তোপে আজও একজন বিদ্রোহী নেতা, বীর দেশপ্রেমিক মন। স্বাধীন ভারতে সত্য ইতিহাস এখনও রচিত হয় নি।

কানপুরে তাঁতিয়া তোপে নানা সাহেবের সেনাপতি ছিলেন। পেশোয়া বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেব কানপুর অধিকার করে নিজেকে পেশোয়া বলে প্রচার করেছিলেন, হ্যাভলকের হাতে পরাজিত হয়ে দুজনেই পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। নানা সাহেব নেপালে হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর আর খবর পাওয়া যায় নি। তাঁতিয়া তোপে যোগ দিয়েছিলেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সঙ্গে। ধরা পড়ে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল গুরুতব। কানপুরে একটা কাঁচা দেওয়ালের আড়ালে প্রায় এক হাজার ইংরেজ সৈন্য ও নাগবিক কোমরকমে আত্মরক্ষা করছিল। নানা সাহেব নাকি তাদের নির্বিঘ্নে এলাহাবাদ যাবাব ভবসা দিয়ে গঙ্গাতীরে তামেব হত্যা করেন। শ দুয়েক নারী ও শিশু হত্যা করে একটা কুপে নিক্ষেপ করেছিলেন। কানপুরে সেই কুপ আজও আছে। একটা কাঁচা দেওয়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে বেসীক্ষণ আত্মরক্ষা করা যায় না। নানা সাহেব সেইখানেই তাঁদের হত্যা করতে পারতেন, তাব জন্ত নৌকায় তুলে এলাহাবাদ পাঠাবার ভরসা দেবার দবকাব ছিল না। নারী ও শিশু হত্যার কাহিনীটা অমাহুষিক বটে, কিন্তু সত্য কিনা তা যাচাই হয় নি। তাঁতিয়া তোপে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলেই শিবপুরীতে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল। হত না। ভারতবাসীর সেই স্বাধীন হবার চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হত না। সিপাহীদের সঙ্গে শুধু দেশপ্রেমিকরাই যোগ দিয়েছিলেন। সাধারণ জনতা এগিয়ে আসে নি। জনতাকে জাগাতে যে রকম নেতার প্রয়োজন সে নেতাব অভাব ছিল দেশে। স্বাধীন বাজারা তো বিখ্যাস-ঘাতকতাই করেছিলেন। নিজামের মন্ত্রী সার্ব সালাংর জঙ্ক ও গোয়ালিয়রের মন্ত্রী সাব্ব দিনকর রাও প্রাণপণে ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁতিয়া তোপেব জীবনাবসান এই গোয়ালিয়র রাজ্যে।

ধানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কি এখন ঝাঁসি যাচ্ছেন ?

আজ্ঞে ইয়া।

ঝাঁসির দুর্গটা দেখে নেবেন। আর—

একটু থেমে বললেন : জেনে নেবেন লক্ষ্মীবাইয়ের কথা।

বলতে পারতুম আপনি বলুন। তা না বলে বললুম, আচ্ছা।

গোয়ালিয়র দেখবেন না ?

বললুম : সময় নেই।

একটা দিনও নেই ?

ঝাঁসি থেকে আমরা খাজুরাহো দেখতে যাব, সেখান থেকে সোজা কলকাতা।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : ও।

— মনে হল, ভদ্রলোক যেন মর্মান্বিত হলেন। তাড়াতাড়ি বললুম : গোয়ালিয়র বুঝি সুন্দর শহর ?

সুন্দর নয়। গোয়ালিয়র দুর্গকে কী বলা হয় জানেন ? “A pearl in the necklace of the castles in India.”—ভারতবর্ষে দুর্গের কণ্ঠহারে একটি মুক্তার মত। পাহাড়ের উপর একটি অপূর্ণ দুর্গ।

এই দুর্গ নির্মাণের সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প আছে। এই অঞ্চলে সুরষ সেন নামে একজন সর্দার ছিলেন। তাঁর কুষ্ঠ হয়েছিল। অনেক চিকিৎসা করিয়েও তিনি কোন ফল পান নি। মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন। একদিন একটা হরিণেব পিছনে ছুটেতে ছুটেতে একটা পাহাড়ের উপর উঠে যান। খুব ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। হঠাৎ একজন তপস্বীকে দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে জল খেতে চান। সাধু তাঁর বিনয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নিকটের এক জলাশয় থেকে জল এনে মন্ত্রপূত করে সুরষ সেনকে খেতে দেন। জলের কী আশ্চর্য গুণ। সেই জলের স্পর্শেই কুষ্ঠ তাঁর সেরে গেল। সুরষ সেন সাধুর পূজা করলেন। সাধু খুশী হয়ে বললেন, তুমি এই পাহাড়ে একটা দুর্গ নির্মাণ কর, আর এই জলাশয়কে বড় কর। তোমার নাম দিলাম সুরষ পাল। যতদিন তোমরা এই পাল পদবী রক্ষা করবে, ততদিন তোমরা সুখে রাজত্ব করবে। এই আদেশ

পেয়েই সুরষ পাল পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্মাণ করলেন। সাধুর নাম ছিল গোয়ালিপা, তাঁর নামেই দুর্গের গোয়ালিয়ার নাম হল। আর জলাশয়ের নাম হল সুরষ কুণ্ড।

তারপর সুরষ পালের বংশের কী হল জানতে চাইছেন তো? তারও একটা গল্প আছে। সবাই সাধুর আদেশ মানতেন, এবং নিবিঁয়ে রাজত্ব করে গেছেন। পাল উপাধি ছাড়াতে কেউ সাহস করেন নি। অনেকদিন পরে তেজকরণ নামে একজন রাজা বললেন, আমি এসব মানি নে। এবং পাল উপাধি তিনি বর্জন করলেন। এক বছর রাজত্ব কববার পরে তিনি পরমল দেও প্রতিহাব নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের হাতে রাজধানীর ভার দিয়ে প্রতিবেশী দেওসা রাজ্যের রাজকন্যাকে বিবাহ করতে গেলেন। বছরখানেক পবে ফিরে এসে দেখলেন যে রাজ্যে আর তাঁর অধিকার নেই। প্রতিহাব তাঁকে তাড়িয়ে দিল। পাল বংশের শেষ হল এইখানে।

মানসিংহের সঙ্গে গোয়ালিয়ার দুর্গের নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। এই মানসিংহ আকবর বাদশাহর সেনাপতি জয়পুররাজ মানসিংহ নন। ইনি তোমর বংশের প্রায় শেষ রাজা। মানসিংহের পরে এই বংশের একজন মাত্র বাজা রাজত্ব করেছিলেন। তোমর বংশের কথা বলতে গেলে তৈমুর লঙের কথা বলতে হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই খোঁড়া তৈমুর ভারতবর্ষের মাটিতে রক্তের স্রোত বইয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক এই সময় বীর সিং দেও নামে তোমর জাতের একজন বীর গোয়ালিয়ার অধিকার কবে বসেন। শিল্পপ্রতিভায় এ বংশের অনেক দান। মানসিংহ রাজত্ব করেছিলেন ১৪৮৬ থেকে ১৫১৬ পর্যন্ত। দুর্গের ভিতর মানমন্দির নামে প্রাসাদটি তিনিই নির্মাণ করেন। এর চেয়ে ভাল গৃহনির্মাণের নমুনা হিন্দুস্থাপত্যে আর নেই।

গুজরি মহল মানসিংহের আব একটি অপরূপ কীর্তি। এর সঙ্গে একটি প্রেমের কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে। একদা রাজা এক গ্রামে গিয়েছিলেন শিকারে। সেখানে শিকারের বদলে সাফাং পেলেন এক সুন্দরী কন্যা, নাম তাঁর যুগনয়না। যত তাঁর রূপের খ্যাতি, তত তাঁর শক্তির

বাহাহুবি। একদিন নাকি এক বুনা মহিষকে একা কারু করেছিলেন। এইসব কাহিনী শুনে রাজা তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন। যুগনয়না বললেন, তাঁর শক্তিব-উৎস হল বাই নদীর জল। সেই জল তিনি রোজ পান করেন। রাজা যদি বাই নদীকে দুর্গের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করতে পাবেন, তা হলে তাঁর বিবাহে সম্মতি আছে। রাজা বললেন, তখাঙ্গ। মানসিংহ তারপর গুজরি মহল তৈবি করলেন, তাব ভিতরে এল বাই নদীর একটি ধারা।

মোগল আমলে গোয়ালিয়ার দুর্গ অনেক ধাক্কা সামলেছে। শেষ তোমর রাজা পাণিপথের যুদ্ধে বাববের কাছে হেরে গেলেন। বাবরের পুত্র হুমায়ুনকে হটিয়ে শেরশাহ এই দুর্গ অধিকার কবেছিলেন। তারপর আকবর বাদশাহ লড়েছিলেন মানসিংহের নাতির সঙ্গে। সিদ্ধিয়ারা এই দুর্গ অধিকার করেন ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

ভদ্রলোক বললেন : একবার না দেখলে এই দুর্গের সম্বন্ধে আপনার সঠিক ধারণা হবে না। পাহাড়টা শ তিনেক ফুট উঁচু আর লম্বায় মাইল দেড়েক। চওড়া কোথাও ছশো ফুট, কোথাও বা আটশো। তিরিশ ফুট উঁচু একটা প্রাচীরে চারিদিক ঘেবা। একটা-দুটো নয়, পাঁচ-পাঁচটা ফটক পেরিয়ে দুর্গে ঢুকতে হয়। আলমগীর গেটের পর হিন্দোলা গেট পেরিয়ে গুজরি মহল। এর কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। যুগনয়না গুজর জাতেব মেয়ে, তাঁর জন্মে তৈরি মহল বলে নাম গুজরি মহল। দোতলা বাড়ি, মাঝখানের উঠোনের চারিদিকে ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। এখন এই বাড়িতে হয়েছে সরকারী জাহাঙ্গির।

গণেশ গেটের বাইরে ছিল গোয়ালিপার মন্দির। মুসলমানেরা এই মন্দির ভেঙে মসজিদ করে দিয়েছিল। লক্ষ্মণ গেটের বাইবে একটি ছোট মন্দির এখনও আছে। চতুর্ভুজ মন্দির নামে বিষ্ণুর মন্দির। হাতী গেট শেষ গেটের নাম। একসময় নাকি একটি প্রমাণ আকারের হাতী ছিল গেটের পাশে। এখান থেকে মানমন্দির প্রাসাদে ঢুকতে হয়। সাহেবরা একে পেটেড প্যালেসও বলেছেন। রঙীন টালি আর মোজেকে, নীল সবুজ আর

সোনালী বড়ের হাঁস ময়ূর আর হাতির ছবিতে বড় বড় দেওয়ালগুলো চিত্রিত। উপবে গম্বুজেব সারি, নীচে বড় বড় অঙ্গন ঘিরে ঘর। প্রাসাদটি উপবে দোতলা, নীচে দুটো তলা আছে। জ্ঞানসিংহ গ্রীষ্মাবাস হিসেবে ব্যবহার কবতেন, আব মোগলরা রাখত বন্দীদের। খানিকটা দূবে পাহাড়ী পবিবেশে দুটি মন্দির। বড় মন্দিরটিতে বিষ্ণুর মূর্তি। একটি সংস্কৃত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষে মহীপাল এটি নির্মাণ করেছিলেন। দরজাগুলো অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। এক জায়গায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনেবই মূর্তি আছে। ছোট মন্দিরটিতেও বিষ্ণুর মূর্তি। এক জায়গায় একদল নৃত্যপরা নারীমূর্তি দেখে শিল্পীর প্রশংসা আপনাকে করতেই হবে।

তেজি কা মন্দিরের ছবি বোধ হয় গাইড বইয়ে দেখেছেন। এটি দুর্গেব পশ্চিম প্রান্তে, সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির—নবম শতাব্দীর। তেলেঙ্গানার অপভ্রংশ তেলি, তেলেঙ্গানাদের মন্দির বলে নাম তেলি কা মন্দির। দুর্গের ভিতর এই মন্দিরটিই সবচেয়ে উঁচু, প্রায় একশো ফুট। জাবিড শৈলীর একটি নিখুঁত নিদর্শন।

সুব্রহ পালের সূর্যকুটের কথা বলেছি। দুর্গেব মাঝখানে তা অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি নিশ্চয়ই জৈন নন ?

না।

আমার জিজ্ঞাসা করাই ভুল হয়েছে। বাঙালী জৈন আমি আজও পর্যন্ত দেখি নি।

কিন্তু হঠাৎ ধর্মের কথা কেন ?

ধর্মের কথা ঠিক নয়। বলছিলাম যে জৈন স্থাপত্যের অনেক নমুনা আছে এই দুর্গে। পাঁচ জায়গায়। চব্বিশ তীর্থঙ্করেরই মূর্তি আছে। তার মধ্যে আদিনাথের দাঁড়ানো মূর্তিটিই সবচেয়ে বড়। কম করেও সাতায় ফুট উঁচু, পায়েব মাংগই ন ফুট লম্বা হবে। এক জায়গায় একশটি বিবটি মূর্তি আছে। এগুলো নাকি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভোদ্র সিংয়ের রাজত্বকালে নির্মিত।

এ সবই দুর্গেব ভিতরে ?

দুর্গ থেকে নামবার পথে—এই সব পাবেন।

বললুম : আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, গোয়ালিয়রে যা-কিছু দেখবার আছে, তা সবই ওই দুর্গে। গোয়ালিয়রে চিনেমাটির যে বাসন তৈরি হয়, সেই কারখানাটা নিশ্চয়ই শহরে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন : কাবখানা ছাড়াও আরও কিছু আছে। তানসেন আর মুহম্মদ গাউসেব কবর।

মুহম্মদ গাউস কে ?

একজন ফকির। আকবরের ঠাকুবদা বাবরও তাকে শ্রদ্ধা করতেন।

তারপবেই জিজ্ঞাসা কবলেন : আপনি কি গায়ক ?

রক্ষে করুন।

আপনার সঙ্গী কেউ ?

কেন বলুন তো ?

গানের শখ থাকলে তানসেনেব কবর আপনাকে দেখতেই হবে। কবরের পাশে যে তেঁতুল গাছ আছে, তার পাতা চিবিয়ে খেলে কণ্ঠস্বর হয় তানসেনের মত। এই বিশ্বাস এমন গভীর যে হুবু গায়কেরা কবরে ভিড় কবেই আছে।

বলেই ভদ্রলোক হেসে উঠলেন।

গাড়ির অনেকেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। যাবা শোবার জায়গা পান নি, তাঁরা বসে বসেই চুলছিলেন। এই হাসির শব্দে কেউ কেউ চমকে উঠলেন। ভদ্রলোক এই চমকানি দেখে বোধ হয় লজ্জিত হলেন। আন্তে আন্তে বললেন : আব নয়, রাত অনেক হল। নতুন শহর লঙ্করের কথা পরে বলব। আব বলবারই বা কী আছে! জয়বিলাস আর মতিমহল নামে দুটি প্রাসাদ, জয়াজি চক আর সরাসা। যদি সময় পান স্টেশনেব ধারে জাহ্নবরটা একবার দেখে নেবেন।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুমের আর দোষ কী! রাতের ঘুম তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তার সঙ্গে ক্লান্তি আছে। কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, টের পাই নি।

পাঁচিশ

অনেক রাতে শোবার খানিকটা জায়গা পেয়েছিলুম।
বোধ হয় বিনায়। যতক্ষণ জেগে ছিলুম, ততক্ষণ ট্রেন
ছাড়ে নি। ট্রেন ছেড়েছিল শেষ রাতে। তখন আমরা
ঘুমে অচেতন। ভোরবেলায় জেগে দেখি, আমার পাশের
ভদ্রলোক তখনও ঘুমচ্ছেন। ওধারে অভিমত্নাকে নিয়ে
মিনতিও ঘুমে অচেতন। শুধু বিরূপাক্ষ আর কয়েকজনের
মত উঠে বসেছেন। মুখের সিগারেট দেখে মনে হচ্ছে যে
বেশীক্ষণ তাঁর ঘুম ভাঙে নি। আমাকে উঠে বসতে
দেখে বলে উঠলেন : গুড মনিং সার।

গুড মনিং।

বাংলায় আমরা স্বপ্নভাত বলি না, নমস্কারও বলি
না। গুরুজনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, ওপর-
ওয়ালাকে বা স্বল্প-পরিচিত ভদ্রলোককে বলি নমস্কার।
বন্ধুকে জ্ঞাপুত্রপরিবাবকে সম্বোধন করার রেওয়াজ
আমাদের নেই। একটা কিছু থাকলে ভাল হত। মন
ভরত।

বিরূপাক্ষ বললেন : ঘুম কেমন হল ?

বললুম : যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু হয়েছে। মানে,
সারাদিন ধকল দেওয়া সম্ভব হবে।

একটা আশাব কথা আছে।

কী বকম ?

হরপালপুরে আমরা সন্ধ্যেরাতেই পৌছব। সারারাত
টেনে ঘুমেনো যাবে।

উঠতে হবে ভোরবেলাতেই। বাস নাকি রাত
থাকতে ছাড়ে।

বলেন কি ?

আমার এক বন্ধু গিয়েছিল সাতনা হয়ে। ভোর
ছটায় বাস ছাড়বার কথা, পাঁচটাতোই সব জায়গা দখল
হয়ে যায়।

তবু ভাল।

কেন ?

রাত চারটেখ বলেন নি। কিংবা তারও আগে।

তাতেই বা কী ! কষ্টের দিন তো ফুরিয়ে এসেছে।

ঠিক মনে পড়ছে না। আমরা কষ্ট করতে বেশি-
ছিলুম, না, আনন্দ করতে।

মনে পড়ার দরকার নেই।

কেন ?

কেন ?

গরীবের ভ্রমণ হল বৌদ্ধদের নির্বাণের মত !

একটু বুঝিয়ে বলুন।

ভিক্ষু নাগসেন গ্রীসের রাজা মিলিন্দকে এই নির্বাণের
মানে বুঝিয়েছিলেন। তাই একটু সরল করে বলি।
রাজার রাজ্যশাসন যদি সাধারণ জীবনযাত্রা হয় তো
নির্বাণ হল রাজ্য-স্বথ। আমাদের এই কষ্ট স্বথের
ভূমিকামাত্র।

বিরূপাক্ষ বললেন : গরীবের কেন বলছেন ?

যড়লোকদের এই ভূমিকার দরকাব নেই। পয়সার
জোর থাকলে রাজ্যশাসন কববে মন্ত্রী ও সেনাপতি,
রাজার রাজ্যস্বথ হবে সারাক্ষণের। এই গাড়িবই প্রথম
শ্রেণীর কামরা থেকে তাঁবা নামবেন। মুখহাত ঘুমে
ছোটাহাড়রি করবেন, তারপরে মোটরে যাবেন
খাজুরাহো।

ভুল হল, এই গাড়ি থেকে আমরা ঝাঁসিতে নামব,
হরপালপুরে নয়।

পয়সা যথেষ্ট থাকলে গাড়িতে ওঠানামাও করতে
হয় না। যথেষ্ট কেটে জুড়ে যাত্রতর যাওয়া যায়।

ভাগ্য থাকলে পয়সারও দরকার হয় না।

কী বকম ?

বিরূপাক্ষ বললেন : আমাদের কর্তাদের দেখুন, আর
দেখুন মন্ত্রী আর মোডলদের।

হাতেব সিগারেটটা তাঁর শেষ হয়ে এসেছিল।
পর পর কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে পোড়া টুকরোটা জানলা
দিয়ে ফেলে দিলেন।

ইতিমধ্যে আমার পাশের সেই ভদ্রলোক জেগে
উঠেছেন। প্রথমে গাড়ির ভিতরে পরে বাইরে তাকিয়ে
জিজ্ঞাসা কবলেন : আমরা কতদূর এসেছি ?

বললুম : জানি নে।

সেকি মশাই, আপনারাও কি এখুনি উঠলেন নাকি !

তা নয়। যে সব টেশনে দাঁড়াচ্ছে, তার একটারও নাম জানি নে, দেখেও মনে রাখতে পারছি নে।

আমরা কি ঝাঁসি পেরিয়ে গেছি ?

আজ্ঞে না। গাড়িতে আমাদের না দেখলে সেই আশঙ্কা করবেন। আমরা ঝাঁসিতে নামছি। কাল রাতেই বোধ হয় বলেছি।

তা হবে। ঘুমিয়ে ওঠার পর সব ঠাণ্ডা করতে আমার একটু সময় লাগে। কিছু মনে করবেন না।

বললুম : আমি অল্প কথা মনে করছি। আপনার তো দূরের পাল্লা, আপনি কেন এই গরুর গাড়িতে উঠেছেন ?

তার কারণ কি আমি বলি নি ?

বলে থাকলেও মনে নেই।

ভদ্রলোক বললেন : ছুটো কাবণ। প্রথমটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভাড়া কম। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে, রাতটা গাড়িতে কাটিয়ে হোটেল খরচটা বাঁচালাম।

আপনি যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তার প্রমাণ দিলেন।

কিন্তু নিবুদ্ধিতা এখনও আছে।

কী রকম ?

ভেবেছিলাম, আপনি গোড়াতেই সব বুঝে ফেলেছিলেন।

বললুম : ঘুমিয়ে আপনি কথায় মায় দিয়েছেন দেখছি।

ঘুমিয়ে নয় খিদেয়। দেখতে পান না, দেশেব ভিখিরিরা কত চেষ্টায়। যার পেটে যত খিদে, তার চিংকার তত তীক্ষ্ণ।

শাজ্জেও তাই বলে—শূদ্ধ কলসীর আওয়াজ বেশী।

পেট ভরলেই গুপগুপ আওয়াজ। সবটাকেই হুঁ হুঁ, না কিছুতেই না।

বিরূপাক্ষ বাইরের দিকে চেয়ে ছিলেন। আমাদের কথা বোধ হয় শোনা যাচ্ছিল না, তাই তাঁর কান এদিকে ছিল না। হঠাৎ আমাদের জিজ্ঞাসা কবলেন : ঝাঁসিতে দেখবার কী আছে ?

বললুম : রাণী লক্ষ্মীবাদীর দুর্গ।

আর কিছু ?

জানি নে।

ভদ্রলোক আমাদের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, বললেন : আর কিছুই নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এই শহর পত্তন করেছিলেন বৃন্দলা বাজা বীরসিং দেও। রাণী লক্ষ্মীবাদী না জন্মালে এ শহরের নাম ভারতবিশ্ব্যাত হত না।

আমাদের কথাবার্তায় মিনতিরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উঠে বসতে গিয়ে অভিমুখ্যকে জাগিয়ে দিলেন। বোধ হয় হাতের ছোঁয়া লেগেছিল। বললুম : লক্ষ্মীবাদীরেব গল্প অভিমুখ্যর ভাল লাগবে।

ভদ্রলোক বললেন : আমি তো বাংলায় বলতে পারব না।

অভিমুখ্য চোখ রগড়ে উঠে বসেছিল, বলল : কিসেব গল্প ?

বললুম : ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাদীরেব।

গম্ভীরভাবে সে বলল : হিন্দী আমি বুঝি।

ভদ্রলোক বললেন : সত্যি নাকি ?

মিনতি বললেন : আমাদের পাশের কোয়ার্টারে থাকেন ওঝা। তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওর ভারি ভাব।

তাই বুঝি।

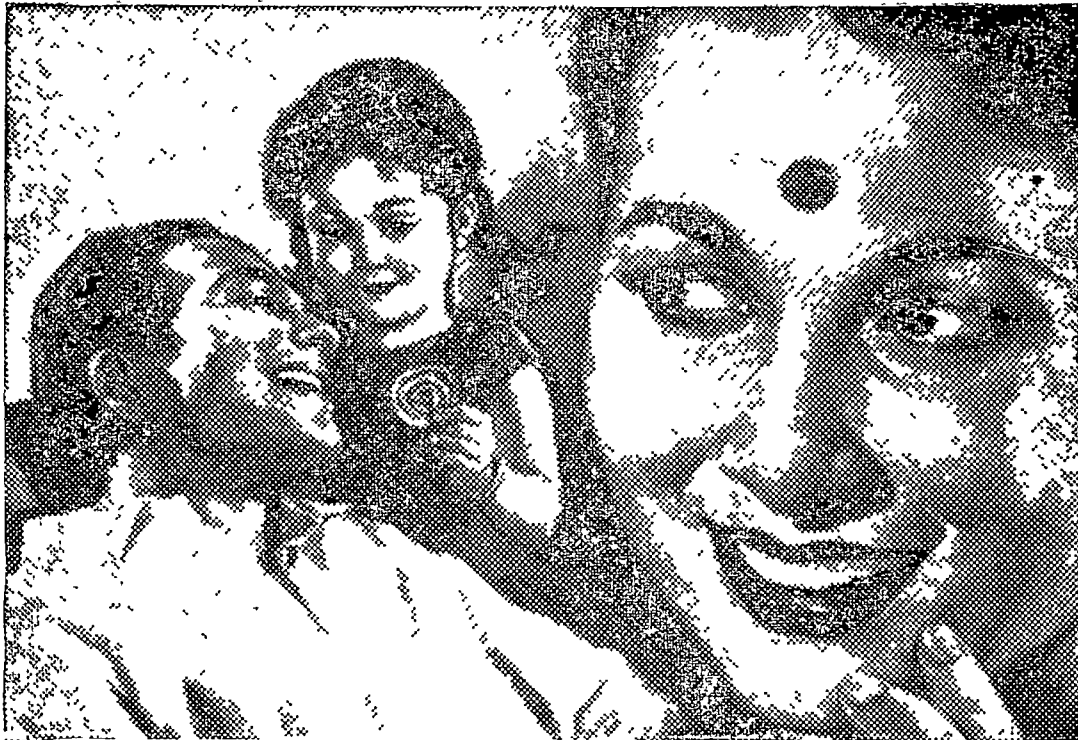
বললুম : বলুন এবারে।

ভদ্রলোক বললেন : লক্ষ্মীবাদীরেব গল্প বলতে হলে নানা সাহেবের কথাও বলতে হয়।

তাই বলুন।

তা হলে গোড়া থেকেই শুরু কবি। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে বাজীরাও হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নাম। শিবাজীর পরে প্রথম বাজীরাও শ্রেষ্ঠ মারাঠা বীর ছিলেন, আর শেষ বাজীরাও আট লক্ষ টাকায় পেশওয়ার রাজ্য ইংরেজের কাছে বিক্রি করে কানপুরে এসে বসবাস করছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ নেই, বিদ্রোহ প্রজ্ঞাশাসন নেই, নিশ্চিন্ত বিলাসে ভদ্রলোকের জীবন, বাজীরাও মহা খুশী, শুয়ে বসে গড়িয়ে তাঁর জীবন স্মৃতি কাটছিল। শুধু একটা ক্ষোভ তাঁর কোন সন্তান নেই।

এমনই সময়ে নানাকে তিনি পেলেন। নানার পিতার নাম মাধবরাও নারায়ণ ভট্ট, আর মাতার নাম



মমতাময়ী মায়ের সংসারে সদা সেরা জিনিষই চাই...

পরিবারের জন্য মায়ের পছন্দ ডালডা

নীল আকাশের বিশালতা নিয়ে, সোহাগের ডানা মেলে
মা আগলে রাখতে চান তাঁর সোনার সংসার, বহু দিবে গড়ে
তুলতে চান এক সুখী পরিবার। শান্তি সুখের ঐ ছোট্ট নীড়ই
তাঁর স্বপ্ন, ঐ তাঁর পৃথিবী। • সদা তাঁর মনে ছেয়ে থাকে পরিবারের
সুন্দর চিন্তা। মায়ের দরদী প্রাণ চায় সবার হাতে সেরা
জিনিষ তুলে দিতে। যার সংসারের এক বিরাট দিক, রান্নার
বেলাতেও তাঁর পছন্দ ডালডা। • তাব কারণও আছে।
সবচেয়ে সেবা ভেদে তেল থেকে ডালডা তৈরী। দৈহিক
পুষ্টিসাধনের প্রয়োজনীয় উপাদান ভিটামিনও এতে রয়েছে।
মায়ের হাতেব মিষ্টি রান্নায় ডালডা খাবারকে আরও সুস্বাদু
করে তোলে। রেখে ভুটি, খেয়ে আনন্দ—তাই আপনার
বাড়ীতেও আজ থেকে ডালডাই চাই।



ডালডা বনস্পতি—রান্নার, খাঁটি সেরা স্নেহপদার্থ

গদাধারী। বাস করতেন মহারাজের বেগুনীমে।
সম্রাটবংশে জন্মেও তাঁরা অভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন।
শেষ পর্যন্ত কানপুরে এলেন পেশোয়ার দরবারে কোন
চাকরির আশায়।

নানাকে দেখে বাজীরাম মুগ্ধ হলেন। শুধু চাকরিই
দিলেন না, নানাকে নিলেন দত্তক পুত্ররূপে। রাজার
প্রাসাদে নানা বাজপুত্রের মত বড় হতে লাগলেন।

এদিকে এক ছোট মেয়ে হল নানার খেলার সাথী।
নাম তার ছাবেলী। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনই সুন্দর
ব্যবহার। তার সাহসেবও তুলনা নেই। তার বাবা
খোবাপস্ত তাহে আর মা ভাগীরথীবাঈ। তাঁরাও সম্রাট
মারাঠা পরিবার, কানপুরে এসে বাজীরামের দরবারে
চাকরি পেয়েছিলেন।

নানা ও ছাবেলী একসঙ্গে পড়লেন, একসঙ্গে খেললেন।
ঘোড়াষ চড়লেন, তলোয়ার চালানো শিখলেন। কিন্তু
জীবনের অন্ধনে তাঁরা মিলিত হলেন না, হলেন যুদ্ধের
অন্ধনে। ছাবেলীর বিবাহ হল ঝাঁসির বাজার সঙ্গে,
কিন্তু তিনি অপুত্রক মারা যেতেই ইংরেজ সে রাজ্য
অধিকার করে। কানপুরেও তাই হল। বাজীরামের
মৃত্যুর পর নানাকে ইংবেজ অধীকার করল। কিন্তু নানা
যে আগুনের ফুলিঙ্গ। ইংবেজের বিধান এত সহজে
মানবে কেন। কিন্তু ইংরেজের শক্তিও তিনি জানতেন,
মানতেনও, তাই নিজের মনে আগুন তিনি ধীরে ধীরে
সমস্ত ভাবে সঞ্চারিত করলেন। স্বাধীনতাব আগুন।
আঠারো শো সাতান্ন সনে সেই আগুন দাউ দাউ করে
জ্বলছিল, আর আমবা সেই আগুনের আলায় আবাব
দেখলাম নানা ও ছাবেলীকে, সিপাহী যুদ্ধের দুই নেতা
নানা সাহেব আর ঝাঁসির বাগী লক্ষ্মীবাঈ। বিধবা
লক্ষ্মীবাঈয়ের বয়স তখন কুড়ি বছর।

অভিমত তার মাকে কী একটা প্রশ্ন করেছিল।
আমি শুনেতে পাই নি। মিনতিব জবাবটা কানে এল :
হ্যাঁ।

তবে ?

তবে কী ?

দুজনেরই একজন মা ?

এইভাবে মিনতি হেসে উঠলেন।

বিরূপাক্ষ বললেন : হাসছ কেন ?

তোমার ছেলের কথা শোন। নানা সাহেবের মায়ের
নাম গঙ্গা, আর ভাগীরথী নাম লক্ষ্মীবাঈয়ের মায়ের।
ভাগীরথী মানে যখন গঙ্গা, তখন দুজনেরই মা এক।

এবারে বিরূপাক্ষও হাসলেন।

অভিমত্যা বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছিল। আমি বললুম :
তুমি ঠিক বলেছ অভিমত্যা। সমস্ত বীরের মায়েরই এক
নাম। নেপোলিয়নের মায়ের নাম তুমি সুরধুনী বলতে
পার। ওই স্বর্গের জল দিয়ে স্নান না করালে কি অমন
ছেলেমেয়ে হয় ?

মিনতি এবারে গম্ভীর হলেন। বিরূপাক্ষ ধরালেন
আর একটা সিগারেট। আমি আমার পাশের ভদ্রলোককে
বললুম : সিপাহী যুদ্ধের গল্পটাও তা হলে শোনান।
অভিমত্যা ভাল লাগছে।

ভদ্রলোক আবার গল্প শুরু করলেন : মাঝা
ভারতব্যাগী বিদ্রোহের আগুন জালিয়ে তোলাটাই নানা
সাহেবের সবচেয়ে বড় কীর্তি, এই কাজে তিনি যার সাহায্য
পেয়েছিলেন, তাঁর নাম ভারতের ইতিহাস থেকে মুছে
গেছে। আজিমুদ্দিন নামে একটি গবীব মুসলমান ছেলে
পেটের দাঁয়ে ইংরেজদের কাছে বয়-বাবুর্চার কাজ
করতেন। ইংবেজী আর ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন
সাহেবদের কাছে। তারপর কিছু টাকা জমলে স্থলে
পড়ে একটা স্থলের মাস্টার হলেন। নানা সাহেব তাঁর
সঙ্গে আলাপ কবে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁকে নিজের
কাছে টেনে নিলেন। এই দুজনে মিলে বিপ্লবের আয়োজন
শুরু করলেন। আজিমুদ্দিন দু বছর ধরে বিলেত ও
ইয়োরোপ ঘূরে ইংরেজের অবস্থা দেখে এলেন। কোন্
দেশের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে, তাও ঠিক করে
এলেন। তারপর দেশে তাঁদের প্রচার শুরু হল।
জনসাধারণের কাছে তো আর অশ্রদ্ধা নেই, শিক্ষিত
মৈত্রও নয় তাঁরা। প্রথমে তাই সিপাহীদের মধ্যে
প্রচার শুরু হল। সাধু আর ফকির সেজে দলে দলে

লোক ভারতব্যাপী প্রচার চালাতে লাগল। ঠিক হল ১৮৫৭ সনের জুন মাসে বিপ্লব শুরু হবে। একশো বছর আগে যেদিন পলাশীর যুদ্ধে ভারত পরাধীন হয়েছিল, সেইদিনই পরাধীনতাব শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে বিপ্লব ঘোষণা কবে।

সিপাহীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। অনেকদিন ধরে তাবা বোধ হয় এই রকমই কিছু চাইছিল। উৎসাহের তাদের অন্ত নেই, তারা অধীর হয়ে পড়েছে। এমন সময় ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল অপ্রত্যাশিতভাবে। এত বড় একটা বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা ভারতবর্ষের কোন ইংরেজ কোনখানে জানতে পারে নি। ঘুণাঙ্করে সম্মেহও কবে নি কোনদিন। ছোট ছোট দুর্ঘটনা দেখে চর নিয়োগ করেও কোন হদিস পায় নি। স্থানীয় একটা গোলযোগ মনে করে নিশ্চিন্ত থেকেছে।

বিপ্লবের নেতারা তখন দায়িত্ব গ্রহণ কবেছেন। দিল্লীতে বাদশাহ বাহাদুর শাহ, কানপুরে নানা সাহেব নিজে, লক্ষ্মীতে মৌলভী আহমদ শাহ, বিহাবে জগদীশপুরের জমিদার কুয়ার সিং, কলকাতায় অধোধ্যায় উজ্জীর নক্কি খান এবং দাক্ষিণাত্যে রঙ্গ বাপুজী। তাঁতিয়া তোপে আর লক্ষ্মীবাড়ী পরে যোগ দিয়েছিলেন।

এমন সময় এল সেই বিখ্যাত টোটা। দাঁত দিয়ে কেটে তা বন্দুক ভরতে হয়। প্রচার হয়ে গেল যে তার ভেতর গরুর চৰ্বি আর শুষোবের চৰ্বি দুই আছে। একসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের জাত নেবার ব্যবস্থা কবেছে ইংরেজ সরকার। ব্যারাকপুরের একদল সৈন্য বলল, মানি নে হুকুম। আর একদলকে বলা হল, ছিনিয়ে নাও ওদের অস্ত্র ও পোশাক, তারপর তাড়িয়ে দাও। তারা বলল, না, তাও করব না। বিপ্লবের দিন তখনও আসে নি। কলকাতা থেকে নক্কি খানের হুকুম এল, সবুর

সবুর। কিন্তু মদল পাণ্ডে নামে একটি মুবক সৈন্তের তর সইল না, বন্দুক নিয়ে সে একে ওকে মেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা কবে চারিদিক সামলাল।

মীবাটের ঘটনা একটু অল্প রকম হল। একই অপবাধে যখন একদল সিপাহীর উপর হুকুম হ'ল আর একদলেব অস্ত্র ও পোশাক ছিনিয়ে নেবার, তখন প্রাণের ভয়ে তাবা না বলতে পাবল না। ইংরেজ গোলন্দাজ সৈন্য কামান উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সহকর্মীদের পোশাক কেড়ে নিয়ে তাদের অস্ত্র বিপদ হল। পথে বেকতেই মেঘেরাও তাদের টিটকিরি দিল বীরপুরুষ বলে। কতদিন তাবা সহ্য করবে! একদিন জলে উঠল বান্ধবের মত, বেপবোয়া ইংরেজদের হত্যা করে দিল্লীর দিকে রওনা হয়ে গেল। দিল্লীতে আগুন লাগল এর পর। সারা ভারতে সেই আগুন ছড়াতে একটুও সময় লাগল না। বিপ্লব ঘোষণা করবার আগেই বিপ্লব শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু আমাদের দেশেই শত্রু ছিল। পাঞ্জাব থেকে রণজিৎ সিংহের বংশধরবা দিল্লীতে এল ইংরেজকে সাহায্য করতে। গুর্খা এল। এল অনেক দেশীয় রাজা। কিন্তু জনগণ সংঘবদ্ধভাবে এল না সিপাহীদের পাশে। বিপ্লব আর কিছুদিন পবে শুরু হলে হয়তো আঁগত। নানা সাহেব পালিয়ে গেলেন, তাঁর আর খোঁজ পাওয়া গেল না, বুদ্ধ বাহাদুর শাহ বন্দী হয়ে নির্বাসিত হলেন, তাঁতিয়া তোপেব ফাঁসি হল। কিন্তু ঝাঁসির রাণী ধরা দিলেন না, শত্রু তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নি। শত্রু নিপাত করতে করতে রক্তাক্ত বর্ণাঙ্গনে তিনি জীবন বিসর্জন দিলেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ঝাঁসির রাণীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

প্রতিচ্ছায়া

মায়া বসু

আজও কথা দিয়ে কথা রাখতে পাবল না আমি।

অথচ কাল থেকে মনে মনে ভেবে বেখেছিল আজ যেমন করেই হোক, একটু আগেই রওনা হবে। স্বভ্রতর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কী মজাই না হবে যদি একটু দেরি হয় স্বভ্রতর আসতে! অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে অহুযোগ করে আমি তা বলবে, বাবাঃ, এত দেরি করে এলে? এর বেলা কিছু নয়, যত দোষ বুঝি আমার বেলায়।

কিন্তু এবাবেও আমি তার দেরি। এবারেও স্বভ্রত তারই প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। চোখের দৃষ্টিতে, কপালের বৈখ্য স্পষ্টই বিরক্তির চিহ্ন।

বাস থেকে নেমে স্বভ্রতর কাছে এসে দাঁড়াল আমি। বিকেলের পড়ন্ত রোদ লেগে গাল দুটি আরক্ত। মুখে ঠোঁটের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘামের ছিটে। খোঁপার শাসন-মুক্ত খুচবো চুলগুলো কপালের উপর উডছে। শব্দ করে কোমরে বাঁধা আঁচলটা খুলে আঙুলে জড়াতে জড়াতে লজ্জিত কণ্ঠে বলল, একটু দেরি হয়ে গেল। কতক্ষণ এসেছ? রাগ করেছে?

রাগ একটু হয়েছে বইকি। স্বভ্রতর সঙ্গে ডেট আর এনগেজমেন্টের সময়টা কোনদিনও ঠিক থাকে না আমি তার। বিশেষ করে আজ ওর চায়ের নিমন্ত্রণেই যখন এসেছে স্বভ্রত।

কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে সব রাগই জল হয়ে যায়। আমি তার ওপর রাগ করে থাকবার মত ক্ষমতা কি কখনও ছিল তার?

কথার উত্তরে শুধু ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটু চাপ দিল স্বভ্রত। তারপর রাস্তার লোকজন বাঁচিয়ে আমি তার কানের কাছে মুখ এনে বলল,

অনেক দেরি কবেছ, অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছ। যতটা সময় দেরি করেছে আসতে, আজ তার চেয়ে বেশী সময় তোমায় আটকে রাখব। কোন ওজব আপত্তি শুনব না।

স্বভ্রতর সঙ্গে রেস্টুরেন্টটার দিকে যেতে যেতে আমি তা ধমক দিল ওকে : আঃ, হাত ছাড়। দেখছ না কত লোকজন রাস্তায়? তোমার কি একটু লজ্জাও নেই?

হুদিন বাদে যাকে বিয়ে কবব, তার হাতটা ধরলেই কি মহাতারত অনুভব হয়ে যায়? না, তুমি বড় সেকেন্সে।

হ্যাঁ, তাই। চল তো এখন।

রেস্টুরেন্টটার ভিতর একটা পর্দাটাকা কেবিনে মুখোমুখি বসল দুজন। বয় এলে খাবারের অর্ডার দিল আমি।

স্বভ্রত আর একটা সিগারেট ধরাল। একটানে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, আমাব কথার উত্তর পাই নি। আজ তোমাকে সহজে যেতে দেব না। খাওয়া শেষ হলে কাছাকাছি সিনেমাটায় যাব ভাবছি।

মিনতিপূর্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল আমি : না না, আজ নয়। আজ কিছুতেই যেতে পারব না।

সিগারেটের ছাইটা অ্যাশট্রেতে ফেলতে ফেলতে স্থির-দৃষ্টিতে আমার চোখেব দিকে তাকাল স্বভ্রত : সত্যি করে বল তো আমি, তোমার আপত্তিটা কোথায়? আমার সঙ্গে তুমি কোথাও যেতে চাও না। আমার কাছে বৈশিষ্ট্য থাকতে চাও না। শুধু তাই নয়, তোমার বাড়িতে পর্যন্ত আমায় যেতে বল না। তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয় আমাকে রেস্টুরেন্টে—একটা অপবিচিত বাইরের লোকের মত। কেন? কেন এ লুকোচুরি?

বিষয় বিষয় মুখে কি-একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল অমিতা। বয় আসছে চা খাবার নিয়ে।

মাছেব ফ্রাই, মাংসের চপ, কাটলেট। আমিষ প্লেটটা স্বতন্ত্র সামনে এগিয়ে দিয়ে অমিতা ভেজিটেবল দু-একটা খাবার-ভরা প্লেট নিজের দিকে টেনে নিল। টি-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বলল, শুধু অমর জন্তো। ভুগে ভুগে কী ভীষণ খিটখিটে হয়ে গেছে ছেলেটা। বাইরের কোন লোককে ও সহ করতে পারে না। আমাব সঙ্গে কাউকে দেখলে ও খেপে যায়।

কিন্তু এভাবে তো আর বেশীদিন চলবে না অমিতা। আর কিছুদিন বাদে, মানে বিয়ের পব আমরা একসঙ্গেই তো থাকব। এখন থেকে মাঝে মাঝে তোমাব সঙ্গে আমার দেখলে ভবিষ্যতে ওর কাছে আমাদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে আসবে। নয় কি?

নিরন্তর অমিতা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আমার মনে হয় এতে ওর পক্ষে ভালই হবে। আমাদেরও ভালবাসতে পারবে আশ্চর্য আশ্চর্য।

মানসিক অস্থিতি গোপন করতে কথাটা চাপা দিল অমিতা: আমারও তাই মনে হয়। যা হোক একটা কিছু করা দরকার। এভাবে আর কদিন চলবে?

এবার স্বতন্ত্র অমিতাব ডিশের প্রতি দৃষ্টি দিল: আজও ভূমি নিরামিষ খাচ্ছ? এটাও একটু একটু করে ছাড়তে হবে। এবারে মাছমাংস অভ্যাস কব।

অপ্রস্তুতমুখে অমিতা বলল, হবে হবে। সব অভ্যাস হবে। অনেকদিন খাই নি, তাই এখন একটু গন্ধ লাগে। ভূমি ভেব না।

বিল-মিটিয়ে বাইরে চলে এল দুজনে। স্বতন্ত্র আশা-ভঙ্গ মুখের দিকে তাকিয়ে অল্পনয় করে অমিতা বলল, আজ আমাকে অমর জন্তো তাড়াতাড়ি ফিরতেই হবে। ওকে বলে বুঝিয়ে আসি নি, না যাওয়া পর্যন্ত দুধ ওয়ুধ কিছু খাবে না। ওইটুকু ছেলে হলে কি হয়, সর্বদা যেন আমাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। আমি কি করি, না করি, কোথায় যাই, না যাই—সব যেন টেব পাগ ও।

বেশ, তবে বল কবে সিনেমা যাবে?

মনে মনে হিসেব করে অমিতা বলল, পরশু ছটায়।

মনে থাকবে তো?

দেখি করে এসেছি বটে। কিন্তু কবে কথা দিয়ে কথা রাখি নি বল তো?

ওটুকু দেখিও আর সহ্য হয় না আমাব। আর কতদিন প্রতীক্ষা কবিয়ে রাখবে বলতে পার? শোন, টিকিট কেটে আমি পাঠিয়ে দেব তোমাকে। আমি আলাদা চলে যাব। সেদিন যেন দেখি কবো না লক্ষ্মীটি।

দুজনের হৃৎপিণ্ড পথ। অমিতাকে ট্রামে তুলে দিয়ে অনমনস্বভাবে স্বতন্ত্র হাঁটতে শুরু করল উলটো দিকে।

সন্ধ্যাবেলার চৌবন্ধী। লোকজন, আলো—নিয়নের ফুলঝুরি। জীবনের বিচিত্র সমারোহ।

একটি স্মরী মেয়ে ব্যাগ ছুলিয়ে স্বতন্ত্র পাশ ঘেঁষে চলে গেল। একটা মৃদু স্বগন্ধ ছড়িয়ে গেল চারদিকে—স্বতন্ত্র গায়ে, চোখে মুখে।

অমিতা সেট মাখে না কেন! আগে তো মাখত! স্বতন্ত্রই কিনে এনে ওর চুলে মাখিয়ে দিয়েছিল। সেই গন্ধমাখা শরীরে সকলের সামনে বেরতে হবে বলে কী লজ্জাই না পেয়েছিল সেদিন। নির্লজ্জ বেহায়া বলে স্বতন্ত্রকেই কি কম বকুনি দিয়েছিল!

আচ্ছা, সে সেণ্টটার কি যেন নাম ছিল! অকুণ্ঠিত করে একটা সিগারেট মুখে গুঁজে পকেটে হাত দিল স্বতন্ত্র। এ পকেট ও পকেট! না, নেই। দেশলাইটা ফেলেই এসেছে বেস্টুবটে।

সামনেই একটা পানের দোকান। এগিয়ে গিয়ে একটা দেশলাই কিনে সিগারেট ধরিয়ে দাম দিতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল দোকানে টাঙানো মস্তবড় আরশিটার দিকে।

একশো পাওয়ারের জোর আলোতেও অবশ্য পাকাচুল ধরা পড়বে না। কিন্তু তবু দেখি হয়ে গেছে। অনেক দেখি করিয়ে দিয়েছে অমিতা। যেমন সব ব্যাপারেই ও দেখি করে।

স্টপেজে এসে পর পর কয়েকটা বাস ছেড়ে দিয়ে

একখানা দোতলা বাসে উঠে পড়ল। মোজা দোতলায় উঠে জানলাব ধারে বসে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে। শূণ্যঘরে ফিরতে যখন হবেই, তখন বাইরে এখানে-ওখানে একা একা ঘুরে লাভ কি!

আজ অমিতা একদিকে, আর সে অল্পদিকে—দুজনে দুদিকে যাচ্ছে। দুটো আলাদা বাড়িতে। যা কিছতেই হত না, হবাব কথা ছিল না। আজ অসুস্থ অমরেশের জন্তে যে ভাবনা একলা অমিতাকে ভাবতে হচ্ছে, সেই ভাবনাই কি দুজনে হত না! আজ অমরেশের বাবা সমরেশ না হয়ে স্বরতই হত। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের নির্ধারণ যত্নে, নাকি নিয়তিব নিষ্ঠুর পরিহাসে কী থেকে কী হয়ে গেল! যা অগ্নেও ভাবা চলে না, এমন অঘটনও ঘটে গেল দুজনের জীবনে।

স্বরত আর অমিতার মাঝখানে হঠাৎ মস্তবড় একটা পর্বতের মত আড়াল করে দাঁড়াল সমরেশ। কালবৈশাখী ঝড়ের মত সব লগুভগু করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল দুটো জীবনকে। অমিতাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল সে ঝড়। হতসর্বস্ব স্বরতকে একলা ফেলে রেখে।

সেদিন মনের মধ্যে একটা গভীর আক্রোশ আর আদিম অন্ধ প্রতিহিংসা ছাড়া স্বরতব আর কিছুই ছিল না। যদি সম্ভব হত, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মত দৈবত্ব যুদ্ধে ছিন্নভিন্ন কবে ফেলত সমরেশকে।

প্রথম যেদিন সমস্ত কথা জানতে পেরেছিল, সেদিন আত্মহত্যার কথাটাও মনে পড়েছিল ওর। কিন্তু তাতেও বাদ সেধেছিল—সমরেশ শেষ পর্যন্ত কী ভাবে, এই ভাবনা।

আত্মহত্যা করেছে ভীকু কাপুরুষটা! শক্ত শক্ত দাঁত বার করে প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠে বলিষ্ঠ হাতে অমিতাকে কাছে টেনে তার কানে শোনাতে পরাজিত অপমানিত দুর্বল লোকটার মৃত্যুসংবাদ।

কত জন্মের শত্রু ছিল সমরেশ ওর! কে জানে! প্রথম দেখার দিন থেকেই ওর সঙ্গে একটা ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার সম্বন্ধই জেগে উঠেছে মনের মধ্যে। সেই ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা দিনে দিনে বেড়ে উঠে শাখায় প্রশাখায় বিশাল মহীকবের মতই আচ্ছন্ন করেছে দুজনকে।

অথচ সবদিক দিয়ে দুজনের মধ্যে কত তফাতই না ছিল।

শুধু এক কলেজেই নয়। বোল-নয়বও পর পর। সমবেশ বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহ স্পোর্টসম্যান। জোরে হাসে, জোরে কথা বলে। তিনজনের খাবার একলা খায়। বড়লোকের ছেলে, মস্তবড় গাড়ি ইাকিয়ে কলেজে আসে, ইচ্ছামত দু হাতে পয়সা ওড়ায়। বন্ধুদেব খাওয়ায় বেস্টুবেটে। নিষে ঘাঘ সিনেমায়। পয়সায় জোরে দালালি আর ঘোড়ালি করে বেড়াই সব জায়গায়। বন্ধু চাষ না ও, ও চায় সবাইকে মোসাহেব করতে। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু পরীক্ষার সময়। মোটা টাকা খরচ করে গোটা দুই তিন প্রফেসর রেখে কৌনমতে পার হয়ে যাওয়া।

প্রায় সবাইকে দলে টানতে পেরেছে, কিন্তু অটল অনড় স্বরত উদাসীনতা আর নিস্পৃহতার বর্মে আড়াল করে রেখেছে নিজেকে সমরেশের কাছ থেকে।

গরিব স্কুলমাস্টারবেব ছেলে। পাতলা ছিপছিপে রোগা বোঁগা চেহারা। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। স্কুল থেকে কলেজ। ফার্স্ট ডিভিশন থেকে ফার্স্ট ক্লাসের সাধনায় এগিয়ে চলেছে ধাপে ধাপে। বই ছাড়া ওর পৃথিবীতে আব কিছু ছিল না। কলেজের ম্যাগাজিনের সম্পাদক। সারগর্ভ প্রবন্ধ ও কবিতা রচনায় খ্যাতি রটেছিল স্নেহলব্ধ বলে।

প্রত্যেক প্রফেসর ভালবাসতেন ওকে। প্রশংসা কবতেন পঞ্চমুখে। স্বরতের স্বভাবচরিত্র, পড়াশুনা প্রত্যেকটি ছাত্রের আদর্শস্থল হওয়া উচিত—এ কথা অকুণ্ঠিত ভাবেই প্রকাশ্যে বলে বেড়াতেন তাঁরা।

সেইসব কথা শুনে হিংসার ছুঁচ বিঁধতো অমরেশের গায়ে। চাপা বাখার দরকারও মনে করত না। ঠাট্টা কবত ওকে গুডবয় বলে। রাতদিন বই মুখে করে বসে থাকলে একটা গাধাও ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারে, কিন্তু রীতিমত অসুশীলন করেও একটা গাধা ঘোড়ার মত দৌড়তে পারবে না জীবনেও।

তর্ক করত না স্বরত। শুনেও শুনত না। আরও

মনোযোগ দিত বইয়ের প্রতি। এসব কথা তার কৃতিত্বের প্রতি সমরেশের ঈর্ষা, এটা বুঝতে তার মেরি হত না।

ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে সম্মানে কলেজ থেকে বেবিযে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিদেশী ওষুধের কোম্পানিতে রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি পেয়ে গেল স্বভত। ঘুরে বেড়াতে হবে। ভাল মাইনে।

হোঁচট খেল সমরেশ। শুধু সেইবার নয়—পর পর দু-তিনবার। তারপর কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে বাবার ব্যবসায় ঢুকে পড়ল।

দু দিকে চলে গেল দু জনে।...

তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিল স্বভত শেষ হয় নি এই সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আবার দেখা হবে। চরম পরীক্ষায় এবারে জয়ী হবে সমবেশই। হেরে যেতে হবে তাকেই।

কে জানত অমিতার দূর-সম্পর্কের ভাই সমরেশ। অমিতার মা সমরেশের মায়ের লতায়পাতায় বোন।

ধনী আত্মীয়ের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতার আপত্তি ছিল অমিতাব বাবার। তাঁর অবস্থা অসচ্ছল, কিন্তু আত্মমর্ধ্যদাবোধ কিছু কম ছিল না।

সমরেশের তরফ থেকেও আগ্রহ ছিল না তেমন। স্বভরাং আসা-যাওয়া যেমন কম ছিল, অন্তরঙ্গতাও মোটেই ছিল না। তবু কালেভদ্রে বাড়িতে কোন উৎসব উপলক্ষে যাওয়া-আসা বা দেখাশোনা চলত। বিজ্ঞান প্রণয়, নিমন্ত্রণ করতেও আসত সমরেশ।

নীল আলোটা তখনও জ্বলছিল। বাসটা স্পীড বাড়িয়ে পেরিয়ে যাবে ভেবেও পারল না। লাল আলোর চোখরাঙানিতে হঠাৎ ধামতে হল তাকে। প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল বাসটা। পড়তে পড়তে সামলে নিল যাত্রীরা। আকস্মিক ধাক্কা মাথাটা ঘুরে গেল স্বভতর। শক্ত করে চেপে ধরল সামনেব হাতলটা।

আজকের মত ঠিক সেদিনও ওইরকম অবস্থা হয়েছিল ওর। যেদিন প্রথম সমরেশকে দেখেছিল অমিতাদের বাড়িতে।

দামী স্যুট পরা। ঝকঝকে নতুন মোটরগাড়িটা

থেকে নেমে খোলা দরজা দিয়ে সোজাসুজি ঘরে ঢুকেছিল। দু আঙুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট।

এখানেও সমরেশ! মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গিয়েছিল। চেয়ারেব হাতলটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছিল। আর কয়েকটা বছর পার হয়ে গেলেও স্পষ্ট মনে আছে স্বভতর, নিজের অজানতে কখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, এ কি সমরেশ, তুমি এখানে।

সমরেশও কম বিস্মিত হয় নি। ওর পাশে বসে-থাকা অমিতাকে আর স্বভতকে বাবকতক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যাচাই করার ভঙ্গিতে দেখে নিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে চক্রাকারে ছাড়তে ছাড়তে যেন দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিয়েছিল, এটা আশাব সম্পর্কে মাসীর বাড়ি। এখানে আসাটা আমার পক্ষে কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু তুমি এখানে কোন্ দিক দিয়ে? তোমারও ওরকম একটা কিছু সম্পর্ক আছে নাকি?

মুখ লাল করে উত্তরকণ্ঠে স্বভত উত্তর দিল, না, লতায়পাতায় জড়ানো কোন সম্পর্ক নেই, তবে আশা করছি কয়েক মাস বাদে একটা চিরস্থায়ী সম্বন্ধই হবে।

বিস্মিত দৃষ্টি অমিতার দিকে ফেরাতেই একটু হেসে যেন সম্মতি জানিয়েই ও মুখ নীচু করল।

ও, এই ব্যাপার!—উচ্চকণ্ঠে বিক্রপের হাসি হেসে সমবেশ দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, কনগ্র্যাচুলেশন উইশ ইউ গুড লাক।

তারপর সাহেবী কাষদায় সামনের দিকে মাথাটা কাত করে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল অমিতার মায়ের কাছে।

তারপর থেকেই কী হল সমবেশের। আসা-যাওয়া বাড়তে লাগল অমিতাদের বাড়ি। মেলামেশাও অতি আপন জনের মত। মাঝে মাঝে অমিতার ভাইবোনদের জন্তে এটা ওটা উপহাস আনা, গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। প্রথম প্রথম অমিতা সহজে মিশত না। কিন্তু ওর সহজ সরল ব্যবহারে, মায়ের ইচ্ছেয়, আস্তে আস্তে সেও সহজ হয়ে এল।

যতই মিশতে লাগল ততই যেন নতুন চোখে নতুন

কবে অমিতার পরিচয় পেতে লাগল সমরেশ। ও যেন সেই গরিব আত্মীয়-কত্য় নয়, কুমারী গোবীর মত স্ত্রী সুন্দরী। আপন আত্মমর্যাদায় আভিজাত্যে অভুলনীয়। শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্র। সমবেশেব পরিচিত। বান্ধবীদেব সঙ্গে ওর যেন তুলনাই হয় না। আশ্চর্য, এতদিন কি অন্ধ ছিল সমবেশ। এতদিন কেন এমন করে চোখে পড়ে নি অমিতাকে।

ওরই পরিচিত, ধরতে গেলে হাতের মুঠোর মধ্যে, অথচ ওকে আবিষ্কার কবল স্বত্বতই।

কেমন করে? কোথা থেকে?

আর শুধু কি আবিষ্কার? একেবারে দখল কবে বসেছে। অধিকার করেছে ওর হৃদয় মন। এক তিলার্থও শূন্য নেই। স্বত্বত জুড়ে বসে আছে সব জায়গাটা।

রূপে গুণে এমন দুর্লভ মূর্ত্যামালী শেষ পর্বস্ত স্বত্বতর গলাতেই দুলাবে! সমবেশেব চোখের উপর দিয়ে বিজয়ী ব হাসি হেসে অমিতার হাত ধবে চলে যাবে স্বত্বত। যেমন করে কলেজের প্রত্যেকটি পবীক্ষায় জয়লাভ করে হারিয়ে দিয়ে এসেছে সমরেশকে চিবদিন।

এত বড় অপমান নিঃশব্দে আবার সহ্য করতে হবে সমরেশকে।

কিছুদিন আগেও যদি নজর পড়ত অমিতাব দিকে। পরম অবহেলায়, দরিত্র আত্মীয় বলে যদি দূবে সবে না থাকত, তবে আজ স্বত্বতব বদলে সেই কি পেত না অমিতাকে।

কিসে সে কম স্বত্বতর চেয়ে।

না, এত সহজেই হার মানার ছেলে নয় সমবেশ। অমিতাকে ভাল লেগেছে তার। ভালবেসেছে সেও— না হয় দুদিন পরে, স্বত্বত দুদিন আগে। অমিতার মনের পবিবর্তন হতেও তো পারে। তা ছাড়া কথাতেই আছে Nothing is unfair in Love and War!

বিয়ে ঠিক হয়েছে আছে। অমিতা বি. এ. পবীক্ষার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছে। আর এর মধ্যেই টুবেব প্রোগ্রামে মালকযেকের জন্তে কলকাতার বাইরে যেতে হবে স্বত্বতকে। ফিরে এলে বিয়ে হবে।

নিশ্চিন্ত অমিতার মা-বাবাও। অবশ্য প্রথমটা সমবেশের ঘন ঘন আসা, গায়ে পড়ে অমিতাব সঙ্গে মেলামেশা দৃষ্টিকটু লেগেছিল, তবে সে স্বত্বতবই বন্ধু সহপাঠী জেনে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন তাঁরা।

অনেক ভেবেচিন্তে স্বযোগ সময় বুঝে সমরেশই কথাটা পাড়ল অমিতার কাছে। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে ক্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত। স্বত্বতর সঙ্গে অমিতাব বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—এ কথা মনে মুখে আনাও অগ্রায, তবু অমিতাকে ভালবাসে ও। তাকে বিয়ে কবতে চায়।

কথাটা শোনাযাত্র দপ কবে জলে উঠল অমিতা।

অপমান কবল সমবেশকে বিশ্বাসহস্তা বন্ধু বলে। ওর মনে মনে এই মতলব ছিল জাবলে ওর সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাক্ কথাও বলত না অমিতা, স্বত্বতর সঙ্গে যে ওর তুলনাই হয় না, এ কথাও ভাল করে জানিয়ে দিল।

এত বড় অপমান! এত অহঙ্কার! এত দর্প! নিঃশব্দে সমস্ত হজম কবে মাথা নীচু করে ক্ষমা চেয়ে নিল সমবেশ।

আব কখনও এমন কথা উচ্চারণ কববে না সে, এই শর্তে শাস্ত হল অমিতা।

অপমানিত বেজাহত ভূজ্জ ঘুমন্ত আগ্নেয়গিবিব মত প্রতীক্ষা করতে লাগল স্বত্বত হলাহল উদগিরণের। গলিত আগ্নেয় ধাতু নিঃসরণের।

সমরেশকে এভাবে অপমান করার প্রতিশোধ যে কত ভয়ঙ্কর কত মর্মান্তিক তা কি মুহূর্তেব জন্তে স্বপ্নেও ভেবেছিল অমিতা।

আবার সহজ হয়ে গেল সব। বরং এবার যেন সাধুনা দেবাব জন্তে অমিতাই একটু বেশী অন্তরঙ্গ হল অপ্রতিভ হয়ে।

তার পর এল সেই দিন। অমিতার জীবনে অবিস্মরণীয়। বন্ধু স্বজাতার বিয়ে। অনেক দূরে বাড়ি। যাওয়া-আসার বড় অসুবিধে। বাড়িতে বাবার অসুখ। যাবে না-ই স্থির কয়েছিল। কিন্তু সমরেশ শুনেই বলেছিল সে গাড়ি করে পৌছে দেবে। তাকে ব্যবসা-সংক্রান্ত কি সব কাজে ওদিকে যেতেই হবে। রাত্রে যদি ইচ্ছে

বাবীর সকলেরই প্রিয়



সকল প্রিয়

৮৮

তাজা ও সেরা



ব্রুক বন্ড ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

JWTBB 363 D

হয় তবে অমিতাকে সে আবার বাড়িতে রেখে যাবে। কিন্তু তার দরকার হবে না। অমিতা অনেক রাত্রে বিষে দেখে সকালেই ফিরবে। স্বতবাং মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাওয়া স্থির করল অমিতা। বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস না করে মেয়েকে ওর সঙ্গে পাঠালেন অমিতার মা-বাবা।

সন্ধ্যাবেলা ওকে নিয়ে মোটরে স্টার্ট দিল সমরেশ। গর্জন করে ছুটে চলল গাড়ি। বড় বাস্তা থেকে অলি-গলিতে। আলো থেকে নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে। পৃথিবী থেকে কোন নরকেব অতল গহ্বরে।

বাসটা হঠাৎ ব্রেক কষল। মাথায় একটু আঘাত লাগল স্বভ্রতর। তাকাল রাস্তার দিকে। কী সর্বনাশ। এখনি অ্যাক্সিডেন্ট হত। এক চুলের জন্তে বেঁচে গেছে লোকটা।

সেদিন কিন্তু এক চুলের জন্তেও বাঁচে নি অমিতা।...

নিয়মিত চিঠি লিখত দুজন দুজনকে।

কিছুদিন পরই জানতে পাবল স্বভ্রত, অমিতা অসুস্থ। পরীক্ষা দেওয়া বোধ হয় হবে না। তারপর থেকেই আশ্তে আশ্তে সব স্বব যেন কেটে যেতে লাগল। চিঠি লেখাও প্রায় বন্ধ কবল অমিতা।

সমস্ত কাজ-সেয়ে স্বদীর্ঘ কয়েক মাস দিল্লী বোম্বাই এলাহাবাদ কানপুর ঘুরে কলকাতায় ফেরার সময় অমিতার শেষ চিঠিখানা পেল স্বভ্রত।

বাধ্য হয়ে অন্য কোন উপায় না দেখে বাপ-মা সমাজের মুখ চেয়ে সমরেশকে সে রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করেছে। স্বভ্রত যে অমিতাকে রেখে গিয়েছিল সে অমিতা মরে গেছে।

আজ মনে পড়লেও ভয় হয়, সে চিঠি পাবাব পর কী অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় কেটেছিল ওর সেই সময়কার দিনরাতগুলো।

মনে হয়েছিল, বুঝি সে পাগলই হয়ে যাবে। এক এক সময় ইচ্ছে হয়েছিল দুর্বল প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে একবার মুখোমুখি হয় সমরেশের।

ইচ্ছে করেই আবার কলকাতায় ফেরা রদ করে ঘুরেছে বাইরে বাইরে। যতদিন পারা যায়।

কিন্তু ফিরতে একদিন হলই। হঠাৎ অমিতার ভাইয়ের সঙ্গে পথে দেখাও হল। তার মুখেই শুভল সব কথা।

অদ্ভুত! অবিশ্বাস! এ যুগেও যে এমন হয় জানা ছিল না। সমরেশ প্রায় বন্দিনী করে রেখেছে অমিতাকে। দীর্ঘ সন্দেহের জালায় জলছে সমবেশ-সদা-সর্বদা। বাইরে বেরুনোর ছকুম নেই অমিতার সমরেশের সঙ্গে ছাড়া। জোর করে, ছলেবলে দখল করা সম্পত্তির উপর সব সময় পাহারা দিয়ে রেখেছে সে। অমিতা ভালবাসে না তাকে একবিন্দুও, তাই ভয় হয় কোন সময় সে বুঝি ফাঁক পেলেই পালিয়ে যাবে স্বভ্রতর কাছে।

অথচ প্রচণ্ড ভাবে ভালবাসে তাকে সমরেশ। টাকা পয়সা অজস্র গয়নাগাঁটি দিয়ে-যেন রানীর মতন রেখেছে ওকে।

বড় কষ্টে দিন কাটছে অমিতার। ছেলেটাও হয়েছে চিরকণ। বলতে বলতে যেন কেঁদে ফেলল ছেলেটা।

বুকের উত্তপ্ত রক্তশ্রোত সেদিন আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। খুন করতে ইচ্ছে হয়েছিল সমরেশকে।

কিন্তু সব সয়ে গেছে নিঃশব্দে অমিতারই মুখ চেয়ে। তার জন্তে ওকে কত কষ্ট সহ করতে হচ্ছে সমরেশের হাতে। সমরেশের হাত থেকে মুক্তি নেই অমিতার। কী করে তাকে উদ্ধার করবে স্বভ্রত!

অসম্ভবও এ পৃথিবীতে সম্ভব হয় মাঝে মাঝে।

প্রথম খবরটা খবরের কাগজ থেকেই জানতে পারল স্বভ্রত। ছোটখাটো অক্ষরে একটা দুর্ঘটনাব সংবাদ। প্রত্যেক দিন যেমন বহু দুর্ঘটনার সংবাদ আভাবিক ভাবেই ছাপা হয় খবরের কাগজে।

ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আসানসোল থেকে কলকাতায় ফেরার পথে রাশ ড্রাইভিংয়ের ফলে নিদারুণ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে সমরেশ।

অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে বুঝি মুক্তি দিয়ে গেল অমিতাকে।

তারপর আবার দেখা হল দুজনের। শুভ সিঁথি আর নানা শাড়িতে পবিত্রতার প্রতিমূর্তি কুমাবীকন্টার মত অমিতা ফিরে এল স্বভ্রতর জীবনে আগেকার মতই।

সমরেশ যেন একটা বিগত রাত্রির বিভীষিকা। ঘন অন্ধকার রাত্রিশেষে নিঃশব্দ প্রভাতে তার দুঃস্বপ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে নিয়ে গেছে নিজের সঙ্গে সঙ্গী।

সমরেশ বলে যেন কেউ আসে নি অমিতার জীবনে! বাস থামল স্টপেজে। নেমে পড়ল স্বরত। খুব কাছেই তার বাড়ি।

সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাবার অনেক পরে এল অমিতা। আজও সেই একই কৈফিয়ত। ছেলের জন্তে। তার বায়না তাব কান্না তাব অস্থির আরও কত কী।

কথাগুলো আজ যেন কানে খুব ভাল লাগল না স্বরতর। অমিতা যেন রেকর্ড কবিয়ে রেখেছে কথাগুলো। স্বয়ংগ বুঝে চালিয়ে দেয়।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসার পর আসল কথাটা স্পষ্টই বলে ফেলল স্বরত।

আবার বাইরে যেতে হবে তাকে। এবারে বেশ দেরিও হতে পারে—একেবারে সমস্ত ব্রাঞ্চগুলো ইন্সপেকশন করে ফিরতে হবে। বিয়েটা সেবে ফেলে তবে সে নিশ্চিত মনে যেতে পারে।

স্বরতর মনের ফোভ টের পেতে দেরি হয় নি অমিতার। সমস্ত বিব্রত ভাব সব অস্বস্তি মন থেকে মুছে ফেলে সম্মতি জানাল সে। এভাবে চলতে পারে না। স্বরতর কাছে তার আর সঙ্কোচ করা চলবে না। ছেলের সঙ্গে দেখা হোক স্বরতর। আশ্বে আশ্বে সহজ হয়ে উঠুক ওদের সম্বন্ধটা। স্বরত বার বার অমরেশকে দেখতে চেয়েছে, কিন্তু অমিতা কেন যে এতদিন আড়াল করে বেখেছে ওকে, সেটাও দুর্ভাগ্য স্বরতর কাছে। এতটুকু একটা নির্দোষ অস্থির শিশুকে দোষ। অমিতাব চেয়েও তাকে বেশী করে ভাল বাসবে সে।

স্থির হল শনিবার সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলা অমরেশকে দেখতে যাবে স্বরত ওদের বাড়িতে।

দরজা খোলাই ছিল। নিউমার্কেট থেকে কেনা একবোকা খেলনার প্যাকেট হাতে করে সোজা ড্রইংরুম

তুলল স্বরত। বয়স্ক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বিষয়মুখে কথা বলছে অমিতা।

স্বরত-তুকতেই উজ্জল হয়ে উঠল তার মুখ : ডাক্তার-বাবু, আপনি এঁকে সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলুন। ইনিই স্বরতবাবু।

তারপর স্বরতকে বলল, ইনি আমার জ্যারামশাইয়ের মত। অমুকে চিকিৎসা করছেন বহুদিন। বিখ্যাত শিশু চিকিৎসক। আমি আসছি এখুনি, তুমি একটু কথা বল ওঁর সঙ্গে।

ডাক্তারবাবু ভীষ্মদৃষ্টিতে তাকালেন স্বরতর দিকে : অমিতাব মুখে আপনার কথা শুনেছি। আপনি তো জানেন মায়ের কাছে সন্তানের অস্থিরের কথা খুলে বলতে আমাদের কত অস্ববিধে হয়।

শঙ্কিত কণ্ঠে স্বরত বলল, আপনি আমার কাছে অমরেশের অস্থিরের সমস্ত কথাই খুলে বলতে পারেন। আচ্ছা, ও ভুগছে তো অনেকদিন। ওব অস্থিটা কি?

কপালে পর পর কয়েকটা বেথা পড়ল প্রবীণ ডাক্তারের। পোলিওমাইলিটিস। নিয়ন্ত্রণের মাসুলগুলো অ্যাট্রিফি হয়ে গেছে। অ্যাসেনডিং টাইপের মতই হয়েছিল। তবে আশা করা যায় চেকড হয়ে গেছে।

বেচারী অমরেশ!—সমবেদনায় ব্যথিত কণ্ঠে স্বরত জিজ্ঞাসা করল, কতদিনে সারবে ডাক্তারবাবু?

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন ডাক্তারবাবু। এ রোগ সহজে সারবার নয়। প্যারালিসিসে পা দুটোই পড়ে গেছে। হাঁটতে চলতে পারবে কিনা জীবনে সেটাই ভাবনার বিষয়। সবই ভগবানের হাত।

জীবনের আশঙ্কা নেই তো?—প্রশ্ন করল স্বরত। এবার নিশ্চিত মনে হাসলেন ডাক্তারবাবু : সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন। এ টাইপের পোলিওতে শিশুরা সহজে মারা যায় না। আচ্ছা, আজ তবে উঠি। নমস্কার। ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

অমিতা এল হাসিমুখে। বাবা, কত খেলনা এনেছ! এ যে দেখছি খেলনার পাহাড়। চল, তোমরা দুজনে আলাপ করবে। পাশের ঘরে বসে আছে অমু।

পাশের ঘরে ঢুকল দুজনে। ওদের সাড়া পেয়ে খাটের গদির ওপর বসে-থাকা অমরেশ মুখ তুলে তাকাল স্বতন্ত্র দিকে।

ছেলেকে আদর করে অমিতা বলল, দেখ অমু, কে এসেছেন। তোমার সঙ্গে কত রকম খেলনা এনেছেন। সবগুলো উনি তোমায় দেবেন।

অমু! এই অমরেশ! সোলা সরল পথে চলতে চলতে যেন একটা অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড ঝাক্স লেগে হৌচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্বতন্ত্র।

কোমর থেকে পা ছুঁটা সরল সরল আর বাদবাকি শরীরটা ওর বয়সের পক্ষে অনেক বাড়ন্ত। মাথা চোখমুখ যেন ঠিক প্রাপ্তবয়স্ক একজন পুরুষমানুষের মত।

আর ওব ওই ছু চোখের ভয়ানক দৃষ্টি।

না। এতটুকুও তুলে যাবার নয়। আগুনের তুলি দিয়ে আঁকা আছে স্বতন্ত্রর হৃদয়ে।

সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে এল। মুখে দিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না স্বতন্ত্র।

অমিতা লক্ষ্য করল না স্বতন্ত্রর এই ভাবান্তর। বলল, কই, এস। খেলনাগুলো তুমি নিজেই দাও ওকে। তাব কর ওর সঙ্গে। আমি বরং চা-টা এ বরেই নিয়ে আসি।

এতক্ষণ একদৃষ্টে স্বতন্ত্রর দিকে তাকিয়েছিল অমরেশ। অমিতা ঘর থেকে চলে যেতেই শক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, তুমি স্বতন্ত্রবাবু? আমি জানি তুমি কেন এখানে এসেছ। মা বলেছে।

আত্মসংবরণ করে কোনমতে এই কঠিন প্রশ্নটা এড়িয়ে স্বতন্ত্র সহজ হাতে চেষ্টা করল। মোড়ক খুলে এক একটা খেলনা ওর হাতে দিতে দিতে বলল, এই নাও মোটর গাড়ি। লম্বা দিলেই চলেবে। আর এটা রেলগাড়ি। এটা বন্দুক, আর এটা মেকানোর শেট, এ দিয়ে চমৎকার একটা বাড়ি তৈরি করব দুজনে মিলে, কেমন?

কথাটা শেষ হল না। গাড়িটা তুলে নিয়ে স্বতন্ত্রর মুখের উপরে ছুঁড়ে মারল অমরেশ। অসমতর্ক স্বতন্ত্রর কপালের উপর আঘাত করল। কপাল কেটে রক্ত পড়তে লাগল। ছু হাতে মুখ ঢাকল স্বতন্ত্র।

খিলখিল করে হেসে উঠল অমরেশ ওর অবস্থা দেখে। একটা একটা করে খেলনাগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল ওর গায়ে। মেকানো, এরোপ্লেন, বন্দুক, ছবির বই আরও সব। বলল, চাই না—খেলনা চাই না আমি। তুমি চলে যাও এ বাড়ি থেকে। কিছুতেই মাকে নিয়ে যেতে দেব না আমি। চলে যাও—

এ কার কথা শুনছে স্বতন্ত্র! কী ঘৃণা, কী বিদ্বেষ! এ কি একটা কচি শিশুর কণ্ঠস্বর, না, আর কেউ কথা বলছে ওর মুখ দিয়ে।

অমরেশের চিংকারে খেলনা ছোঁড়ার শব্দে ছুটে এল অমিতা, আয়া। অমিতা স্বতন্ত্রকে টেনে নিয়ে এল ডাইনিংরুম। লজ্জিত অপ্রস্তুত বিবর্ণ। বলল, দেখলে তো, বা বলেছিলাম? একদণ্ড চোখের আড়াল হলেই ও বিগড়ে যায়—দাঁড়াও একটু, শুধু এনে লাগিয়ে দি কপালটায়,—চলে গেল অমিতা দ্রুতপদে।

কিন্তু ততক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়েছে স্বতন্ত্র। অমিতাকে মুক্তি দেয় নি অমরেশ মবে গিয়েও। কোনদিন দেবে না। অমিতার আর তার মাঝখানে ভয়ঙ্কর একটা প্রাচীরের মত উদ্ভত হয়ে জেগে থাকবে চিরকাল। কোনদিন সে ছুস্তর ব্যবধান পার হবে অমিতাকে কাছে টেনে নিতে পারবে না স্বতন্ত্র।

ওই জড় পঙ্খ ছেলেরা—কখনও ইটিবে না, কখনও চলবে না, একমুহূর্ত সরে যাবে না স্বতন্ত্রর চোখের সামনে থেকে। শুধু মূর্তিমান অভিযানের মত সদাঙ্গাগ্রত অতল প্রহরীর মত পাহারা দেবে অমিতাকে সমবেশের প্রতিচ্ছায়ার মত।

ওষব থেকে অমরেশের স্তম্ভীকৃত হাসির শব্দ ভেদে এল কানে। অমিতাদের বাড়িতে প্রথম সাংকাতের দিনে অমরেশের সেই হাসিটাই না ওটা! উইশ ইউ গুড লাক! কনগ্র্যাচুলেশন!

রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত কপালের উপর কোনমতে রুমালটা চাপা দিয়ে—অমিতা এসে পড়বার আগেই—একরকম ছুটেতে ছুটেতে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল স্বতন্ত্র।

নতুন ইহুদী

অরুণ ভট্টাচার্য

তুমি তো গেয়েছ দ্বিজ দৃষ্ট কণ্ঠে ধনিয়া আকাশ
সবার উপরে সত্য মর-দেহে অমর্য মানব
তোমার সে মঞ্জু-গাথা আজ শুধু জুর পরিহাস
এস প্রেম-পুরোহিত দেখে যাও হে কবি-বাসব !

বুদ্ধের শরণ লয়ে কেন তবে অধিপ অশোক
অঙ্গে তুলে নিয়েছিল 'ভিক্ষুদের কাষায়-চীবর
শৈলে শৈলে গুহা-গাঙ্গে আরোপিয়া অহিংসার শ্লোক
গরিমায় দীপ্ত করে দিয়েছিল দিক-দিগন্তর !

পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পূর্বকূলে নবজন্ম লভি
উদাত্ত গম্ভীর স্বরে করে গেছে সাম-স্তুতি গান
আরও এক ব্রহ্মবাদী দূরদর্শী দার্শনিক কবি
ভারতের আচণ্ডাল সবে মানি আত্মীয় সমান ।

এস জ্ঞানী হে বৈরাগী দার্শনিক খেখা আছ যত
দেখে যাও কেমনে যে মিথ্যা হয় প্রাণের পিরীতি
ছুর্ভর দশনাঘাতে বর্ষরেরা করিতেছে ক্ষত
ধরণীর স্তন-বৃগ ; মণী-লিপ্ত অহিংসার নীতি ।

এ ভারত-পুণ্য-তীর্থে জিঘাংসার এ কি বিভীষিকা ?
মবণের যুপকাঠে বলি দিয়া মল্লজ মানবে
ললাটে আঁকিয়া হস্তা নিজ হস্তে তাবই রক্তটিকা
মাটিরে জিনিতে পারে, কেমনে সে স্বর্গ জিনি' লবে ?

জন্মিলে মরিব মানি, অস্ত্রহীন নহে পরমাযু
তবু সে আমাব মৃত্যু জন্মে জন্মে হোক স্বাভাবিক
নিধন-উৎসবে কেন শিশাচেরা বিষাইবে বায়ু
অস্তক আসিয়া মোর প্রাণ-বায়ু হরে নেয় 'নিক' ।

হে কবি তোমার বাণী আর-বার করি উচ্চারণ
“এই সব মৃঢ় যান মুক মুখে দিতে হবে ভাষা” -
প্রেমের মুরতিখানি জুড়ে থাক প্রাণ-সিংহাসন
মৈত্রীর আসব-রসে তৃপ্ত হোক রক্তের পিপাসা ।

দাঁড়াইয়া জীবনের মহাসিন্ধু বারিধি-বেলায়
ভাবিতেছি মনে মনে আগুতাশ চক্ষু ছুটি যদি
কোথা বৃদ্ধ ! কোথা ষষ্ঠী ! দেখা দাও প্রাণের খেলায়
ভারতের মুক্তিকাতে সজ্জিয়া না নতুন ইহুদী !

আজ তবে—

কুমুদ ভট্টাচার্য

পৃথ্বী বিপ্লবী নয় । আজ সে তো সর্বপ্ৰমাণ-
তবে কাল নিরবধি এতে ভুল নেই এতটুকু ।
সুতরাং কী হবে যে কী হবে না নিরবধি কালে
জানে মাত্র মহাকাল । তুমি আমি মিছেই ধোয়াই ।

কল্পনা উত্তুলে তুলে যা ভাব নি, একদিন তাই
ঘটবে না কে বলবে । রাত্রির তপশ্চা কোনদিন
দিনকে আনতেও পারে । দেবতার অমর-মহিমা
মাহুয়ের মর্ত্যখণ্ডে দেখা দিতে পাবে দূর-দিনে ।

কিন্তু আমি কুপাশ্রয়ী ভেক-। ক্ষীণকায়, ক্ষণজীবী ।
অতল সমুদ্রগাথা শুনে কোন্ উল্লাস আমার ।
যেদিন সমস্ত হবে, এ মর্ত্যের দুঃখ হবে দূর
সেদিন সে-স্বর্গরাজ্যে তুমি আমি ফিরে আসব কি ?

আসি ভাল । যাব যবে সে-কল্পনা সাথে নিয়ে যাব ।
আজ তবে গেয়ে নিই দুদিনের দুঃখের গান !

সাহিত্যের হাতে

শ্রদ্ধা হইতে শ্রদ্ধা

পণ্ডিতেরা বলেন, শ্রদ্ধা হইতেই 'শ্রদ্ধ' শব্দ নিঃসৃত হইয়াছে। খ্রীশোশনবীল পণ্ডিত নহে। - কাজেই এ-উক্তিও এতকাল তাহার কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধাই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মত পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। বুঝিয়াছি, পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। বুঝিয়াছি, শ্রদ্ধা হইতেই শ্রদ্ধ আসিয়াছে। অর্থাৎ, যাহারা আমাদের শ্রদ্ধে, আমরা তাঁহাদেরই পিণ্ড দিই, তাঁহাদেরই শ্রদ্ধ করি। শ্রদ্ধা প্রকাশের ইহাই এ-দেবীয় রীতি।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষেই কথাটি বুঝিতে পারিলাম। উৎসবের-তোড়জোড় শুরু হইয়াছে অনেক পূর্ব হইতেই। দেশে-বিদেশে সরকারী-বেসরকারী আধা-সরকারী সকল শ্রেণীর সকল প্রতিষ্ঠানই-প্রাণপণে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রতিদিন 'কলম' ভরিয়া এই বিপুল আয়োজনের খবর বাহির হইয়াছে। দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়াছি, স্মরণীয় কাণ্ড একটা-কিছু ঘটবেই।

অবশেষে শুরু হইল শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আসল গর্ব। প্রথম খবর আসিল স্বদূর বোম্বাই হইতে। বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের আসরে কবিজন্মশতবার্ষিকীর পূজা দেওয়া হইল। এই উপলক্ষে সমুদ্রপার হইতে বিখ্যাত যবন পণ্ডিতদিগকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। আসিলেন আমেরিকার নরম্যান ক্যাজিনস। - আসিলেন ইতালির আলবার্তো মোরাভিয়া। সংবাদপত্রে বারংবার তাঁহাদের নাম ঘোষিত হইল। সকলের উৎসুক দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি নিবদ্ধ হইল। নির্ভেজাল খেতচর্ম সাহেব আসিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিতে। অহো, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যেব বিষয় আমাদের আর কী হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই বা ইহা অপেক্ষা গৌরবের আর কী থাকিতে পারে। অতএব, যে বিখ্যাত কোম্পানি এই ধারনিক পণ্ডিতদিগকে আসরে নামাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহার বিখ্যাত

চিরস্থায়ী কর্তব্যক্ৰিয়া সর্বদা বক্ষণে প্রসারিত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, - এবং আমরা ভক্তিগদগদ নেত্রে ফালফাল করিয়া তাকাইয়া রহিলাম।

আসরে নামিয়া মোরাভিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি প্রায় কিছুই জানেন না; কেবল শুনিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এক মহৎ কবি, এবং নোবেল-লরিয়েট। এই বলিয়াই মোরাভিয়া আয়ত গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত রবীন্দ্রভক্তের চট্‌চট করতালি এবং ভক্তিগদগদ সাধু সাধু রবে সভাস্থল পরিপূরিত হইল। অতঃপর ক্রাডাকাড়ি পড়িয়া গেল - কাহার আগে কে যাইতে পারেন। - কে মোরাভিয়ার পার্শ্বে গিয়া এক মুহূর্ত দাঁড়াইবেন, কে তাঁহার কোটের প্রান্তভাগ একটু স্পর্শ করিবেন, কে তাঁহার সহিত কিঞ্চিৎ মধুর বাক্যালাপ করিবেন, এবং কে তাঁহার পার্শ্ববর্তী হইয়া দস্তকুচি-কোমুরী বিকশিত করিয়া ফোটো তোলাইবেন - ইহা লইয়া রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হইল।

দেখিয়া-শুনিয়া রুমিল্যাম, ইহার। স্বার্থ ই রবীন্দ্র-ভক্ত; রবীন্দ্রপ্রীতি ইহাদের মজ্জায়-মজ্জায়। রবীন্দ্রনাথের শিল্প এবং জীবনদর্শকে ইহারাই স্বার্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা গেল দূরের কথা। এবার ঘরের কথায় আসা যাউক।

রৈশাখ শুরু হইতে না হইতেই প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়ের হায রবীন্দ্রোৎসবের বজা আসিয়া পড়িল। পাড়ায়-পাড়ায় কমিটী, মাঠে-মাঠে সভা, হলে-হলে নৃত্যনাট্য। দেশের সকল রেকার যুবক স্রকার হইল, চাঁদার রহি লইয়া দিয়ারাজ ঘুরিতে লাগিল, চতুর্দিকে সভাপতি ধরিলার জাল ফেলিতে লাগিল। ডেকরেটার কাজ পাইল, গায়ক-গায়িকা নর্তক-নর্তকী রাখা পাইল, সাহিত্যিক নিমন্ত্রণ পাইল, এবং বাকি সকলে প্রদত্ত চাঁদার রসিদ পাইল। রবীন্দ্রনাথের নামে মেলা হইল, ভবন হইল, সরোবর হইল। গাদা গাদা গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, প্রজিকার বিশেষ সংখ্যা বাহির হইল। লেখকেরা লিখিয়া-লিখিয়া হুয়রান হইলেন, যাহা কলমে আসে

তাহাই লিখিলেন, এবং তাহাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ বচনা বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইল। বক্তারা বকিয়া-বকিয়া গলা ভাঙিয়া ফেলিলেন, যখন বাহা মুখে আসে তখন তাহাই বকিলেন, এবং তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় বলিয়া দাবি করা হইল। পাঠকেরা কিছুই পড়িলেন না, শ্রোতারা কিছুই শুনিলেন না, কিন্তু সময়োচিত গান্ধীরের সহিত সকলেই প্রচুর সাধুবাদ করিলেন, এবং সহর্ষে বিপুল কবতালি বর্ষা তুলিলেন। মহিলারা প্রত্যহ সাজিয়া-গুজিয়া সভাকক্ষে আসিলেন। যতক্ষণ সভা চলিল তাঁহার পবম্পরকে দেখিলেন, এবং পুরুষেরা তাঁহাদের দেখিল, এবং সুবিজ্ঞ বক্তা লাডঘরে আপন বিচার ঢাক পিটাইয়া চলিলেন। বক্তৃতাব মঞ্চে শ্রোতা ধরিয়া আনিতে হইল, এবং নৃত্যনাট্যের হলের বাহিরে টিকিটক্রয়েচ্ছু বিদগ্ধ বসিক জনতার ভিড় বাড়িতে লাগিল; এবং তাহাতেই প্রমাণিত হইল যে রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসী জনপ্রিয়তম চিত্রতারকা অপেক্ষা খুব-বেশী ছোট বলিয়া মনে করে না।

বাহা হউক, আপন-আপন মনোভিলাষ পূরণের সুযোগ পাওয়ার জন্য সকলেই রবীন্দ্রভক্তিতে আকুল হইলেন, এবং সহস্রমুখে রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিলাম, ইহাকেই বঙ্গদেশে শ্রদ্ধা কহে। বঙ্গজগৎ এইরূপেই শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধা জানায়।

দুর্গাপূজা, কালীপূজার তায় রবীন্দ্রপূজাও যথারীতি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হইতেছে। ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। কিন্তু পূজার একটি অঙ্গের কথা কেহ বোধ কবি ভাবিয়া দেখেন নাই। উহা হইতেছে বিসর্জন। রবীন্দ্র-সরোবর তো বহিয়াছেই। এখন পূজাবসানে ঠাকুরকে বিসর্জন দিয়া আসিলেই পূজা সর্বানন্দময় হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ত্রিখোশনবীসের আরও একটি প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটি রবীন্দ্র-শিষ্যদিগের প্রতি। তাঁহার আপন-আপন গুরুভক্তির অসাধারণত্ব প্রচারের জন্য প্রাণপণে দেশময় সভায়-সমিতিতে মাইকেল করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু উহার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বলি কি : উহারও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সরোবরের জলে ডুবুন। উহাতে বাজি চূড়ান্তরূপে মাত হইবে। দড়ি-

কলসির জন্ত ভাবনা নাই; উহার ব নবীসের। সংবাদপত্রের বিশেষাণ্টিক এবং বন্দোবস্তও আমিই করিব।

* * *

নয়া বোদ্ধ বাণী

বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এবং ষাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বসাহিত্য-পা মহাশয় রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব উপা গিয়াছিলেন। পথে প্যাবিসে তিনি : বক্তৃতা দিয়াছেন, এবং একটি ইঙ্গ-পত্রিকায় তাঁহার একটি প্রবন্ধও প্রকৃ সহযোগী 'সুগবাণী'র (নব পর্যায়, পঞ্চা সংখ্যা) খবরে প্রকাশ যে ওই নিবন্ধটি হওয়ায় কিছু-সংখ্যক ছাত্র উহা হজা নাই; উহা ছিঁড়িয়া বহু মহাশয়ের নাকে দিয়া আসিয়াছে। (আহা, বহু মহাশয়ে ভোঁতা হইয়া যায় নাই তো! তাহা সমাজে তাঁহার আসন বজায় থাকিবে কি বাহা হউক, প্রবন্ধটি যে অত্যন্ত মৌ এবং অসাধারণ সাহিত্যবোধের প ত্রিখোশনবীসের কোন সংশয় নাই। উ আমি সুগপং যেদ রোমাঞ্চ বেশথু ইত একরূপ আগ্নুত হইয়াছি যে বারংবার অহিংসার বাণী শুনাইয়া স্থির বাধিতে হ একটু দীর্ঘ হইলেও সাহিত্যের হা এই অমূল্য প্রবন্ধটির একটি বঙ্গানুবাদ থাকিতে পারিতেছি না।—

রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্যে

‘রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকৃতপা লিখিত ইউরোপীয় সাহিত্য এবং একরূপ ন একজন আধুনিক বাঙালী কবির এই অতিরঞ্জিত; কিন্তু একরূপ অতিরঞ্জনের প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। গৌড়া রবী: ছাখিত হইতে পারেন। পাশ্চাত্য জগ পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ-প্রবণতার বিরোধী

এক প্রাচ্য ঋষি বলিয়া মনে করা ক্যাশান হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে প্রশংসা লাভের আগে এবং পরে রবীন্দ্রনাথ নিজের তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মিতে দিয়াছেন। মোট কথা, চোখ খুলিয়া বাহারা বাংলা কবিতা পড়ে তাহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী পরিমাণেই যুরোপীয় ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা বড় অসুবিধা এই যে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে তথ্য অত্যন্ত কম। আমরা জানি না কত বই তিনি পড়িয়াছিলেন, কোন্ কোন্ বই পড়িয়াছিলেন, কোন্গুলির শুধু পাতা উলটাইয়াছিলেন, কোন্গুলি পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং কোন্গুলি যত্নেব সঙ্গে পড়িয়াছিলেন। নিজের লেখায় অল্পের বইয়ের নাম তিনি প্রায় উল্লেখ করেন নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ, কালিদাস এবং বৈষ্ণব কবিদের নাম ছাড়া আর কোন নামেব উল্লেখ প্রায় নাই। পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে কেবল তিনটি নাম করিয়াছেন—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী এবং কীটস্। ইহাদের একজনের কবিতা হইতে তিনি যে সরাসরি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সন্ধান সবাই জানে। 'বর্ষশেষ' কবিতাটিকে 'Ode to the West Wind' এবং 'মানসসুন্দরী'কে 'Hymn to Intellectual Beauty'-র সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। উহাদের সাববস্তু একই। প্রভাব হইতে সোজাসুজি গ্রহণ আলাদা। আর কত কবিতা তিনি অপর হইতে লইয়াছেন তাহা আবিষ্কার করা এখনও বাকি আছে। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের কবিতায় ইবসেন এবং জন ডানের উল্লেখ আছে। যুরোপীয় কবিতার একটি লাইন তিনি বারবার প্রশংসা ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন—সৌন্দর্যই সত্য এবং সত্যই সৌন্দর্য। ইহা আশ্চর্যের কথা। এই উল্লেখ তিনি কবিতা হিসাবে করেন নাই, সৌন্দর্যের খণ্ডিত্তে তাঁহার ফরমূলা হিসাবে করিয়াছেন।

যদি মনে করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ গোটা ছয়েকেব বেশী বই পড়েন নাই, তবুও বহু রকমের বহু বইয়ের পাতা নিশ্চয়ই তিনি উলটাইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য লেখকদের মত তিনি নিজের ক্রমবিকাশের বিবরণ রাখিয়া যান নাই, অহুসঙ্কিস্ত দৃষ্টি হইতে তাহা গোপনই করিয়াছেন। তিনি চিঠি লিখিয়াছেন অজস্র, কিন্তু তাঁর

প্রেরণার বিভিন্ন উৎস কোথায় ছিল উহাতে তাহার অতি সামান্য পরিচয় আছে। তিনি নিজেকে যে-সব প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার কুচি সম্বন্ধেও আমরা নিশ্চিত হইতে পারি না। তাঁহার সমসাময়িক বা অল্প আগের বোলসেয়র, সুইনবার্ণ, ভার্লেন, মালার্মে ভ্যালেরি অথবা রিলকে প্রভৃতি নতুন প্রামাণ্য কবিশ্বের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই। একটিবারও তিনি রাশিয়ার কোন উপন্যাস, ফ্রান্সের কোন ছবি অথবা জার্মানীর সঙ্গীতের নাম করেন নাই। ইয়েটস্ সম্বন্ধে অতি সামান্য স্কেচ দিয়াছেন, তাহাতে অত বড় আইরিশ কবির কিছুই বোঝা যায় না। অথচ পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গে সকল সময় তাঁহার যোগ ছিল এবং উচ্চশ্রেণীর বহু যুরোপীয় লেখকের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল।

কিন্তু ইহাতে কি বুঝিব যে পাশ্চাত্যকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন? তাহা নয়। পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁহার অমুরাগ অত্যন্ত গভীর ছিল। তিনি নিজেকে তাহা অহুত্ব করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত প্রকাশ্য অমুরাগ প্রদর্শন খাপ খাইত না। ঠিক এই কারণে তিনি পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অমুরাগ নিজের লেখার মধ্যে গোপন বা প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। ফরাসী বিপ্লবের পর যুরোপে যে-সব উন্নতি হইয়াছে তাহার প্রশংসা না করা মাঝেমাঝে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি যুরোপ ভ্রমণের সময় তিনি বারবার পাশ্চাত্য জীবনের উন্নয়নের আশ্চর্য বোধ করিয়াছেন এবং বাঙালী গৃহের শান্তিতে ফিরিয়া বাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহার লেখায় একটি অদ্ভুত কথা আছে—তিনি বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জাতিরা ভারতবর্ষ আবিষ্কার না করিলে তিনি খুশী হইতেন। কিন্তু তাহারা যদি তাহা না করিত তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ আজ এত গৌরবের রশ্মি বিকিরণ করিতে পারিতেন না। এবং এ কথা তিনি নিজেকে জানিতেন।

রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে একটি ছলনাপূর্ণ সংগ্রাম চলিয়াছিল তাহা সহজেই ধরা যায় : কবি এবং জাতীয়তাবাদী, শিল্পী এবং ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক, সৌন্দর্যপ্রেমিক এবং সাম্রাজ্যবাদের শত্রু—এই কয়টি

বিরোধে তাঁহার মন পূর্ণ ছিল। যে ঐতিহাসিক অবস্থায় তিনি পড়িয়াছিলেন তাহাতে এই বিরোধ অবশ্যস্বাভাবিক। ইহা মনে রাখিলে তাঁহার জীবন ও রচনাবাহু পবনস্পর্শ-বিরোধিতার তাৎপর্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। এই পরস্পরবিরোধিতার ফলে তাঁহার আত্মার দুইটি দিক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—একটি দিক ছিল বহির্বিশ্বে, অন্যটি অপরটি প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার গভীরতম অতি হৃদয়ঙ্গম কবিতায়। যে-দিকটি তিনি বিশ্ব চোখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন সেটি তাঁহার জনপ্রিয় রূপ। এই রূপ উপনিষদের ভাবধারা পুষ্ট এক উদার ঋষি রূপ, যে শাস্ত্র ধ্যানপরায়ণ হিন্দু শাস্তিকে মানবের অন্তিম সর্বোচ্চ মূল্য দিয়া থাকেন, ইহা সেই রূপ। তাঁহার অপর রূপ প্রকটিত হইয়াছে অল্প কয়েকটি ছন্দোময় সরল কবিতায়। এইগুলিতে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য বিজ্ঞান, কবিতাগুলি উজ্জ্বল এবং ভাবাবেগপূর্ণ—এক কথায় 'আধুনিক যুরোপীয়'।

এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ যুরোপীয় সাহিত্য পড়ার বিষয় দিয়াছেন। দাস্তে এবং গ্যেটে পড়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পড়েন নাই, কারণ, মূল ভাষা জানিতেন না এবং অনুবাদ পছন্দ করিতেন না। শাস্ত্রনিকেতনে এক জার্মান মহিলার সাহায্যে হাইনে পড়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশীদিন ধৈর্য রাখিতে পারেন নাই। শেক্সপীয়ার পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক পছন্দ করেন নাই।

খিওরির দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবধারা রোমান্টিকতার বিরোধিতা করিয়াছিলেন কিন্তু কাক্ষণিক কবিরাছেন? তিনি বলিয়াছেন, গ্যেটে পড়েন নাই এবং হাইনের রচনার সহিত পরিচয় সামান্যই ছিল। এদিকে দেখি সতেরো বৎসর বয়সেই তিনি গ্যেটে এবং তাঁহার প্রেমসীদেব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, হাইনের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়াছে। 'ক্ষণিকা'র শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি পড়িলে বোঝা যায়, এই হিন্দু ঋষি এবং জার্মান ইহুদীর মধ্যে যোগাযোগ কত গভীর। প্রত্যক্ষভাবে তিনি শেক্সপীয়ারের প্রতি বিরূপ ছিলেন, কিন্তু

তাঁহার দুটি স্বন্দব কমেডিতে শেক্সপীয়ারের নাট্যকৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ট্রাজেডিতে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও মধুসূদন অথবা মিলটন অপেক্ষা অনেক বেশী মাত্রায় শেক্সপীয়ার হইতে গৃহীত।

এ-বিষয়ে আরও প্রমাণ দিবার জন্য তাঁহার ছবিগুলি বলা না বলিলেও চলে। রচনাবলীতে যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট। তাঁহার আনুষ্ঠানিক কবিতা (ceremonial verse) আলাদা হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার প্রামাণ্য কবিতাগুলিতে অক্ষকাবেশ বিক্ষোভ, হৃদয়, সংগ্রাম এবং এমন কি মর্মবেদনাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুরোপীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তিনি যতটা জানিতেন বলিয়া নিজে স্বীকার করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা অধিক জানিতেন—এ কথা নিশ্চয়ই আমার বক্তব্য নহে। আমি কেবল বলিতে চাই যে কবিদের জানিবার জন্য ছাত্র বা অধ্যাপকের যে-জ্ঞান আবশ্যিক ততটা জানার প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। এক কবির দ্বারা অপর কবিকে প্রভাবান্বিত হইতে হইলে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ বা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। শেক্সপীয়ার কেবল গল্প শুনিয়াই পাশ্চাত্য ঐতিহ্য এবং নবজাগরণের বাণী আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই বা তাহা পারিবেন না কেন? তিনি যে-সকল কবি বা রচনার উল্লেখ করেন নাই, তাহা হইতে যে তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই এ কথা আমরা ভাবিতে পারি না। তাঁহার যৌবনে জ্ঞানের যে-সকল কবি যুরোপীয় কবিতায় নূতন প্রাণসঞ্চার করিতেছিলেন তাঁহাদের কবিতা তিনি পড়িয়াছিলেন কি না তাহা আমরা ঠিক জানিতে পারি না। তাঁহার 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির সহিত বোদেলেরার 'The voyage' এবং রিনবোর 'The Drunken Boat'-এর আশ্চর্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার রহস্যময়ী নাবী বিদেশিনী এবং সোনার তরী যাত্রা করিয়াছে পশ্চিম অভিমুখে। ইহাই কি পাশ্চাত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক প্রাণের স্বীকৃতি নহে?

শ্রীধোশনবীস জুনিয়র

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক প্রদর্শন

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি ও শতবার্ষিক উৎসবে ভারতবর্ষে বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত চিত্রের অ্যালবাম, স্মারকগ্রন্থ ও কবির বিবিধ রচনাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্মারকগ্রন্থ বহু ভাষায় সচিত্র ও বি-চিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের ও ভারতের বাহিরের অধিকাংশ সাময়িকপত্র-পত্রিকা এই উৎসবক্ষেত্রে বিশেষ রবীন্দ্র-সংখ্যা বাহির করিয়াছেন—সেগুলির মাত্র তালিকা দিতে গেলেও আমাদের পত্রিকার একটি গোটা সংখ্যায় কুলাইবে না। এ সকলের পিছনে একটা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার আবেদন আছে এবং রবীন্দ্রনাথ যে নিখিল বিশ্বের চিত্ত ক্রতধানি জয় কবিয়াছিলেন তাহার প্রমাণও এই সকল গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার মধ্যে মিলিবে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালায় কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণ সচিত্র ও সূচ্যাক্রমে মুদ্রিত কবিতা বাহিব করিয়াছেন এবং এখনও কবিতা চলিয়াছেন। আমরা কয়েকটির পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। নিম্নে অঙ্গ-গুলির উল্লেখমাত্র করিতেছি :

১। রক্তকরবী (সচিত্র)। চার টাকা দ্বিশ নয়া পয়সা।

২। Letters from Russia (সচিত্র)। চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

৩। শ্যামলী (সচিত্র)। পাঁচ টাকা।

৪। শেষ সপ্তক (সচিত্র)। চার টাকা।

৫। বীথিকা (সচিত্র)। ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

৬। কালান্তর (সাতটি নূতন প্রবন্ধসহ)। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

৭। জীবনস্মৃতি (সচিত্র)। বারো টাকা।

‘জীবনস্মৃতি’র এই সংস্করণটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে এবং বহু অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া সম্পাদক-মণ্ডলী ইহাকে রবীন্দ্র-জীবনীরও মর্যাদা দিয়াছেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় এই দুই বৎসরে (১৯৬৭-৬৮) ‘গীতবিতানে’রও অথও স্মৃতিসহ চমৎকার-সংস্করণ এবং ‘সঙ্গমিতার’ রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় “পৃথিবী” কবিতার পূর্বতন পাঠ-সম্বলিত নূতনতম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। সূচ্য যথাক্রমে সতেরো টাকা ও বারো টাকা।

শতবর্ষপূর্তি-ও-পূর্ণ-শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে সকল নূতন গ্রন্থ ও পুরাতন গ্রন্থের নূতন-সংস্করণ আমাদের হাতে আসিয়াছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দিলাম :—

১। রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান : বিমান-বিহারী মজুমদার। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬। ছয় টাকা।

ডক্টর ব্রজেননাথ শীলের নিকট লিখিত একটি পত্রে (১৩২৮, ১৬ই কাতিক) রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছেন, “বৈষ্ণবসাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনে হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহা বা মিশিয়াছে।” বস্তুতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যে অর্ধেক বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রেরণার দান এবং এই প্রেরণা বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথকে নবপদাবলী রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই আকর্ষণের কাহিনী ‘জীবনস্মৃতি’তে আছে। ইহাবই ফলে ১২৯২ সালে কবির মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় বৈষ্ণব-পদাবলী সংগ্রহ ‘পদরত্নাবলী’র প্রকাশ। বাংলাদেশের আধুনিক শ্রেষ্ঠ গীতিকবিব সম্বলিত প্রাচীন গীতিকবিতার এই নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। এই ইতিহাস চাপা পড়িয়াছিল। ডক্টর মজুমদার এই সম্বলনকে টাকা ও ভূমিকাব সহিত প্রকাশ করিয়া নবজীবন দান করিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় রসিক বৈষ্ণব ছিলেন মজুমদার মহাশয় তাহা চমৎকারভাবে দেখাইয়াছেন। আটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ভূমিকাটিও বাংলা পদাবলী-সাহিত্যে (পুরাতন ও আধুনিক) আলোচনায় অষ্টমিক নির্দেশক দৃষ্টদর্শন স্বরূপ বিবেচিত হইবে।

২। রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য : সজনীকান্ত দাস। শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন, কলিকাতা-৭। ছয় টাকা।

ইহা একাধারে রবীন্দ্রনাথের কর্মময় ও কাব্যময় জীবনের আলোচনা। বহু অজ্ঞাতপূর্ব নূতন তথ্য দ্বারা রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য আলোকিত-করা হইয়াছে।

৩। Twelve Paintings by Rabindranath Tagore : The Tata Iron and Steel Company Ltd কর্তৃক প্রকাশিত। আট টাকা।

বৃহৎ আকারে মুদ্রিত এই সুনির্বাচিত রবীন্দ্র-চিত্রগুলি শিল্পরসিকদের মনোরঞ্জন করিবে।

৪। মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ : নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়। ভারতী বুকস্টল, কলিকাতা-২। তিন টাকা।

ইহাতে প্রাক-স্বদেশীয়গুণের, স্বদেশীয়গুণের ও স্বদেশী-যুগোত্তর কালের রবীন্দ্রনাথের জাতীয় উদ্দীপনাময় সাহিত্যের ও স্বদেশ-সেবামূলক কর্মের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের স্বদেশিকতার আদর্শ ও জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনামূলক মোট পাঁচটি স্থলিখিত প্রবন্ধ আছে।

৫। শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ : প্রতিভা গুপ্ত। ওবিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। ছয় টাকা।

ছয়টি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তা ও কর্মের নির্ভরযোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ সুন্দর আলোচনা।

৬। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা : প্রবোধচন্দ্র সেন। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স, কলিকাতা-১৩। পাঁচ টাকা।

ইহাতে বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী-গ্রন্থ, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাসম্রাজ্ঞা, শিক্ষার মুক্তি, ভাষার মুক্তি ও সাহিত্যের মুক্তি এই মাত্ৰটি স্ফুটিত প্রবন্ধ আছে।

৭। শতাব্দীর সূর্য : দক্ষিণারঞ্জন বসু। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

অল্প পরিসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন, কর্ম ও ধর্মের সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের গান, ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা, পত্রসাহিত্য, ছবি ও সাংবাদিকতা বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

৮। শারদোৎসব দর্শন : সমীরণ চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

শারদোৎসব-নাটকের মনোহর উদ্ঘাটনের সাধুপ্রয়াস।

৯। রবি-পরিচয় : শ্রীরাধপুর রিষডা রবীন্দ্র-স্মরণতথ্যবিক্রী সমিতির পক্ষে গোপালদাস নাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ১৫ জন কৃতী লেখক-লেখিকার ১৪টি কবিতা ও প্রবন্ধের সংকলন। সুনির্বাচিত।

১০। রবীন্দ্র বৈজ্ঞানিকতা : ২য় সং, শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত। শ্রীশঙ্কর লাইব্রেরি, কলিকাতা-৬। দুই টাকা।

প্রারম্ভে যোজিত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি ও গ্রন্থকারের "আভাষিকা" এই মূলতঃ কাব্যজ্ঞানের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। কবিতাগুলি চমৎকার, রবীন্দ্র-চরিত্র ও সুনির্বাচিত।

১১। লহ প্রণাম : বিত্তা হরকার। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২। এক টাকা চার আনা।

কাব্যে সার্থক রবীন্দ্র-বন্দনা।

১২। রবি-তর্পণ : সত্যেন্দ্রনাথ জানা। প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২, তিন টাকা।

সুরচিত কবিতায় ও নাটকে সার্থক রবি-তর্পণ।

* * *

চণ্ডীদাসের পদাবলী : শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা-৬। মাড়ে বারো টাকা।

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বৈষ্ণব সাহিত্যের চৈতন্যজীবনী শাখা এবং পদাবলী শাখার গবেষণায় প্রভূত ব্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সারসংক্ষেপ মিত্র মহাশয় ১২৭৮ সালে 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' বিতরণিত পদাবলী প্রকাশের যে গোড়াপত্তন করেন ১৩৫০ বঙ্গাব্দে বহু

গবেষণা ও স্ফুটিত বিচারের সাহায্যে মজুমদার মহাশয়ই তাহার সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রস্তুত ও প্রকাশ করিয়া রসিকমাজেরই ধন্যবাদার্থ হইয়াছিলেন। তিনি অল্পরূপ গবেষণা ও বিচারের দ্বারা চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিরাট গড়নাদান হইতে বিশাল্যকরণী-মৃতসঞ্জীবনী সন্ধান করিয়া রসিকসমাজে চণ্ডীদাস সম্পর্কে নবজীবনের প্রেরণা দিলেন। তিনি পদগুলিকে অ-সন্দ্বিগ্ন ও সন্দ্বিগ্ন দুই ভাগে প্রকাশ করিয়াছেন এবং যুক্তি দিয়া প্রত্যেকটি পদেব বিচার করিয়া প্রথম অথবা দ্বিতীয় ভাগে ফেলিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ভূমিকাটি মূল্যবান বহু তথ্যের আকর। ইহাতে বিভিন্ন চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, মহাজিয়া চণ্ডীদাসগণ, চণ্ডীদাসেব পবিচয়, বিজ চণ্ডীদাস, বড় চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাসের পদের বৈশিষ্ট্য, ভণিতা বিভ্রাট, উপজীব্য পুথির-বিবরণ, উপজীব্য সংকলন গ্রন্থের বিবরণ— এই দশটি শিরোনামায় গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্ট চারিটিও প্রয়োজনীয় তথ্য পূর্ণ।

ডক্টর মজুমদারের পাণ্ডিত্য ও ইতিহাসনিষ্ঠা তাঁহার রসবোধকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই, তাই তাঁহার 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' বন্দ-কলহের কচকচিপূর্ণ রণাঙ্গনে পরিণত হয় নাই, ইহা পাঠককে পদাবলী-সাহিত্যের নিত্য রসলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

বঙ্গসাহিত্যে হান্তরসের ধারা : অজিতকুমার ঘোষ। ভারতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২। চৌদ্দ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে হান্তরস লইয়া এতাবৎকাল সামান্য আলোচনা মাত্র চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দুই একজনে করিয়াছেন। তথ্যনিষ্ঠ পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা এই প্রথম। অতিশয় যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীমান অজিতকুমার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার হইতে মণিমুক্তা সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকটির স্বাধাধ মূল্যবিচার করিয়াছেন। তাঁহার স্ফুটিত গবেষণা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট সন্মান দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে হান্তরসের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সংক্ষেপে ও সুন্দর ভাবে। দ্বিতীয় খণ্ডে চর্চাপন্ন হইতে প্রমথনাথ বিনী পর্যন্ত হান্তরসিকদের সৃষ্টি-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত আলোচনাকে সূষ্ঠ ও সম্পূর্ণ বলিতে পারি। কিন্তু আধুনিক কালের সূর্য্যার রায়, রবীন্দ্রনাথ, মৈত্র, বনজুল, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির কৃতিত্বের অল্পক্ষেপে পুস্তকের শেষাংশ খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ আছে। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

শ নি বা রে র

চি চি



৩৩শ বর্ষ,
৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৮

সং বা দ - সা হি ত্য

হরির লুটও দিব

প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ে ভয় পাইয়া সৃষ্টির আদিকাল হইতেই মানুষ দেবতাজ্ঞানে প্রকৃতির বন্দনা করিয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক উপাত্তের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেও কসুর করে নাই। এই সংগ্রামের প্রয়োজনেই তাহার বিজ্ঞান-বুদ্ধি নখর-দস্তের মত উদ্ভূত হইয়া ক্রমিক-অল্পশীলনেব ফলে শাণিত তীক্ষ্ণ ও ধর হইয়া উঠিয়াছে। হাতে কলম ও মুখে বক্তৃতার সুযোগ থাকাতে মানুষ নিজেদের মধ্যে বাবংবার রটনাব ঘাটা এই মিথ্যা বিশ্বাসটাকেও অবলম্বন করিয়াছে যে মানুষ বর্বর বন্ত ও উদ্ভাম প্রকৃতিকে বন্দী ও বশ করিয়া তাহার উপর জয়ী হইয়াছে। প্রকৃতিবই মাটি পাথর ওষধি বনস্পতি ও জল লইয়া প্রকৃতিব আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নানা সরঞ্জামই সে শুধু উদ্ভাবন ও নির্মাণ করে নাই, প্রকৃতির আদিমাতা ধরিজীব বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া খাতু নিষ্কাশন করিয়া, তদ্বা বা আত্মরক্ষা ও আত্মসুখভোগের দাবতীয় আয়োজনকে সূদৃঢ় সুরক্ষিত ও স্থলভ করিয়াছে। তাহার স্পর্ধা তাহাকে দুয়ারোহ দুর্গম অজলিহ হিমাল-চূড়ার খানিকটা শৈত্য ও তাহার সূদূর্বর্তী কল্পনারও অধিকাব-বহির্ভূত মহাকাশকে ক্ষুদ্র মথিত ক্ষত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া সেখানকার খানিকটা শূন্য খুবলাইয়া আনিবার অমানুষিক মহিমা দান করিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতিও শাস্ত স্থিব নিশ্চেষ্ট নাই। দম লইবার জন্ত সাময়িকভাবে রুদ্ধনিশ্বাস হইয়া থাকিলেও সুযোগ পাইলেই মহাকালী রণচণ্ডী ভৈরবী মূর্তিতে করালবদনে লেলিহ জিহ্বা বিস্তার কবিয়া উদ্ভাম কেশজাল দিগ্ দিগন্তে উড়াইয়া ছড়াইয়া উলঙ্গ তাণ্ডবনৃত্যে মানুষের শিবকে পদতলে দলিত করিয়া সে খলখল অট্টহাস্তে মানুষের পল্লী জনপদ নগরকে কাঁপাইয়া দেয়, ভাসাইয়া দেয়; ছারখার করিয়া দিয়া হুঃখপের মত মিলাইয়া যায়। মানুষ হাজার হাজার বছরের সাধনলব্ধ বুদ্ধি জ্ঞান ও বিজ্ঞান লইয়া মূঢ়ের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া খানিক চাহিয়া থাকে, আবার দড়িদড়া লইয়া ভাঙা ঘর মেরামত করিতে বসে। প্রকৃতি-মানুষে এই দড়ি-টানাটানি বিজ্ঞানের সুবিপুল উন্নতি সত্ত্বেও যে শেষ হয় নাই, ভারতবর্ষের উত্তবে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বস্তার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার কথা প্রত্যহ সংবাদপত্রে পড়িয়া তাহাই উপলব্ধি করিতেছি। নদীর বস্তা দার্শনিক চিন্তার বস্তা মনে বহাইয়া দিতেছে।

ভাবিতেছি, এত আশ্ফালন এত আয়োজন সত্ত্বেও এই পরাজয়, এত পরিকল্পনা, এত বাঁধ বাঁধিবার পরও এই অবাধ জলস্রোতের সর্বগ্রাসী অভিযানে হাবুডুবু খাওয়া—অহঙ্কারী মানুষ একেবারে মদমত্ত না হইলে তুলিতে পারে না। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নিম্নে দত্তের বৃকে যখন পরাজয় ও বিফলতার গ্লানি জগদল পাথরের মত

চাপিয়া বলিত তখনই সে মদ খাইত এবং ইংরেজী কবিতা আওড়াইয়া বলিতে থাকিত—

“Man being reasonable must get drunk,
The best of life is but intoxication.”

অর্থাৎ—মদের বহুয় বুদ্ধিকে জাহান্নমে না দেওয়া পর্যন্ত মানুষের পবিত্রাণ নাই, নেশাব ঘোবে জীবনের যতটুকু কাটে ততটুকুই সর্বোত্তম।

অসংখ্য মানুষের ভার বাহাদিগকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গ্রহণ বা বহন করিতে হয় তাঁহারা তাই এক একটা নেশার ঘোরে থাকেন। মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিজাত প্রেম-স্নেহ-ভালবাসাকে ভুলিবার জন্ত হিটলার আধামির নেশা ধরিয়াছিলেন, মুসোলিনি ধরিয়াছিলেন অহং-এর নেশা, স্টালিনকে খুনের নেশা ধরিতে হইয়াছিল। এই সকলই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই এবং পরাজয়ের গ্লানির ফল। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীকে বিহার-ভূমিকম্পের পর বলিতে শুনিয়াছিলাম, উহা মানুষের পাপের ফল। মহাত্মা গান্ধী পাপ-পুণ্যের নেশায় বুদ্ধ থাকিতেন। বর্তমান কালে আমেরিকার সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রয়াস সত্ত্বেও টেম্লেসি ভ্যালি যখন ভাসিয়া যায়, ইংলণ্ডের উপকূল হইতে যখন ঘরকার যদুকুলরমণীদের মত ইংলণ্ডীয়দেরও সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, গ্রীষ্মাধিক্যে যখন শিকাগো-নিউইয়র্কের ছাপ্পান-তলা বাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বৈজ্ঞানিক মানুষ আত্মহত্যা করিতে থাকে অথবা জাপানে বাড়ে ভূমিকম্পে টাইফুনে মানুষের মৃত্যু ঘটে তখন কেনেডি ম্যাকমিলান হিরোহিতোরা কখনই সাদা চোখে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। লৌহযবনিকার অন্তরালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কত মানুষ মরে রাশিয়ার বুক-ফাটে-তো-মুখ-ফোটে-না নীতির কল্যাণে আমরা তাহা জানিতে পারি না বটে, কিন্তু ক্ষমতার নেশাখোর ক্রুশ্চেভের বাতচিত্ত শুনিয়া অলুমান করিতে পারি। বিবিধ পরিকল্পনা ও বাঁধ সত্ত্বেও ভাবভবর্ষে এই ভীষণ বহুতাণ্ডব আমাদের জগৎহবলাল অপ্রমত্ত থাকিলে কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। “আফটার মি দি-ডেলুজ” নামীয় মত্তের নেশায় তিনি এমনই বুদ্ধ হইয়া আছেন যে আত্মপ্রসাদ-বিজড়িত অগ্নান হাঙ্গসহকারে অবাধে বিভ্রান্ত স্বদেশ-বাসীকে বহুপ্রাণবিত জমিতে ভবিষ্যৎ পলিমাটির স্তর দেখাইয়া আশ্বস্ত করিতেছেন।

কাজেই মার্কস-প্রজেক্টর ও হাইড্রোজেন-রকেটের দিকে শ্রদ্ধাভক্তিভয়বিশ্ববিস্ফাবিত নেত্রপাত করিয়া “বৈদিক যুগের মত আজিকাব মানুষও প্রশ্ন করিতেছে—

কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেয় ?

আমরা কোন্ দেবতাকে হবিঃ নিবেদন করিব ? প্রকৃতিকে, না, পুরুষসাধিত বিজ্ঞানকে ? খ্রীষ্টীয় পাদরিদের কল্যাণে বরিশাল-বাখবগঞ্জ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের বৃহস্পতি মানুষেরা নিরাপদ অন্ন-আশ্বাসে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে। এইরূপ এক ব্যক্তিকে একবার সন্ধ্যায় হরির লুট দিতে দেখিয়া প্রশ্ন কবা হইয়াছিল, তুই না খ্রীষ্টান ? লোকটি বিমুদ্রাজ লজ্জিত বা অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়াছিল, বলেন কি মশাই, না হয় রমাই-কাত্তিক হইয়া যীশুই ভজিয়াছি, তাই বলিয়া হরির লুট দিব না ?

উপব-তলায় সেখানে সেখানে লড়াই চলিতেছে কিন্তু নীচুতলাব মানুষ আমরা কি কবিব ? যীশুও ভজিব, হরির লুট দিব।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯২০ সনের গোড়ায় প্যাবিসপ্রবাসী প্রবীণ লেখিকা গারট্রুড স্টাইন (জন্ম ১৮৭৪) তরুণ হেমিংওয়েকে (জন্ম ১৮৯৮) উদ্দেশ করিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন। ইহাতে তিনি সমপর্যায়ের (জেনারেশন) কয়েকজন আমেরিকান লেখক—হেমিংওয়ে, উইলিয়াম ফকনার, স্কট ফিটজ্জেবাল্ড, জন ডস প্যাসোস, মিনক্লেয়ার লিউইস ও জেমস গোল্ড কল্লেজমসকে “দি লস্ট জেনারেশন” বা পথভ্রষ্টের দল বলিয়া অভিহিত করেন। এই মার্কিন তরুণ সাহিত্যিকেরা আমাদের বাংলাদেশের উনিশ শতকের মাঝামাঝি কালের “ইয়ং বেঙ্গল” দলের মত পূর্বতন সকল ঐতিহ্য ও সর্ববিধ জাতীয় সংস্কারের প্রতি আস্থাহীন হইয়া নূতন বিশ্বাস, নূতন জীবন-নীতির খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন। শিকারী পিতার শক্ত পুত্র আর্নেস্ট হেমিংওয়ে যে মাছধরা ছিপ, বাঘমাঝা বন্দুক ও সর্বসংস্কারবর্জিত কলমেব জোরে শেষ পর্যন্ত নিজের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন ‘ফর হুম দি বেল টৌলস’ (১৯৪০) এবং পুলিটজার ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৫৪) ‘দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সি’ তাহাব সাক্ষ্য হইয়া আছে। যে গ্রাকামি ও মেয়েলিপনায় পৃথিবীর সাহিত্য প্রায়

নেতাইয়া আসিতেছিল হেমিংওয়ের বিদ্রোহ ছিল তাহাব বিরুদ্ধে, এইজন্ত নির্মম রুচতাবী হইতে ও তথাকথিত সাহিত্যিক-স্রীলতা পরিহার করিতেও তাঁহার আটকায নাই। সমালোচক নর্মান ফোয়েরস্টাব এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

“His name came to connote not only a distaste for all shams but also a taste for physical prowess, toughness, obscenity, sex, and drinking, the whole colored by an obsession with death.”

গত ২রা জুলাই স্বহস্তনিষ্কিপ্ত বন্দুকের গুলিতে তাঁহার অপঘাত-মৃত্যু নিয়তির অমোঘ পবিহাস বলিয়াই মনে হয়।

হেমিংওয়ে আধুনিক পৃথিবীর রক্তহীন সাহিত্যে রক্ত-সঞ্চা করিবার জন্তই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বসূরী জন ফেনিমোর কুপার ও হাবমান মেলভিলের তিনি মানসপুত্র। কুপারের ‘দি ডায়াল-স্লেয়ার’ ১৮৪১, এবং মেলভিলের ‘মবি ডিক’ ১৮৫১, ইহার পবেই হেমিংওয়ে ‘দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সি’, ১৯৫৩। নারীধর্মী প্রকৃতিকে জীবনে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্যে অবিবাম সংগ্রামের দ্বাবা বশ করিবার মিশন ছিল তাঁহার। কুপারের ‘দি লাস্ট অব দি মোহিকানস’ (১৮২৬) তিনিই। কুপার দীর্ঘকাল বিদেশ-ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরিয়া আমেরিকানদের ও আমেরিকার সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী হইয়াছিলেন, হেমিংওয়ে ফ্রান্স স্পেন আফ্রিকায় দীর্ঘকাল ভ্রমণের শেষে যবে ফিরিলে মাতৃভূমি প্রতি তাঁহার অহুসাগ দৃষ্টিগত হয়। ‘দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সি’-গতকাব্যে তাঁহার পিতার স্মৃতিকেই তিনি চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। ‘ঘোল আনা পুরুষ সাহিত্যিক হেমিংওয়ে প্রতি আমাদের অন্ধা চিরজাগরুক থাকিবে।

কম্যুনিষ্ট শিবিরে রবীন্দ্রনাথ

কম্যুনিষ্টদের হাতে রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাহাদের নানা ভাটিখানায় ধোলাইপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি পিতৃভূমি রাশিয়ায় কবির অপ্রত্যাশিত সমাদর দেখিয়া মাতৃভূমিতে ইহার বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছে। তাহা ছাড়া সম্মুখে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন। শাসনভাব করায়ত্ত হওয়া স্বদূরপর্যন্ত হইলেও টাইদের মানিক

ভাতার স্ববন্দোবস্ত করিতে তো হইবে। কবিকে শেষ পাবানিব কডি হিসাবে ব্যবহার করিবার অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত। অতএব ভোল পালটানো-প্রয়োজন। তাই এতদিন যে-রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখপাত্র বলিয়া অপখ্যাত হইয়াছেন তিনিই আজ ইহাদের কপট ভক্তির দৃষ্টিতে ধবা দিয়াছেন ‘দার্বভৌম কবি’ রূপে। কিন্তু ইহাদের রবীন্দ্র-ভক্তির এই ভণ্ডামি যে কবিকে দলে টানিয়া কার্যসিদ্ধির একটি সুপরিপক্কিত অপকৌশল মাত্র, দেশেব কল্যাণকামী নিরোহ পনের আনার কাছে তাহা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কম্যুনিষ্ট শিবির হইতে ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামে একটি “শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন” প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংকলনে মুদ্রিত ইহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের রচনাবলী বিশ্লেষণ করিলেই ইহাদের স্বরূপ ধরা পড়িবে। ইহাদের দার্শনিক প্রবক্তা হইলেন সুশোভন সরকার। ইনি লিখিয়াছেন “রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ” নামে এই সংকলনের মূল বক্তব্যের ভিত্তিস্থানীয় প্রধান প্রবক্তা। ইহার বক্তব্যের সারমর্ম হইল, “যে সমাজবাদ আমাদের কাম্য” পশ্চিমী সংস্কৃতি হইতেই তাহার উদ্ভব ও পরিণতি, আব “রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা বহিল অব্যাহত।” অতএব...? সিদ্ধান্তটি জ্যামিতির ‘ইহাই প্রতিপাত্ত বিষয়ে’র জায়গাই প্রাপ্ত।

সুশোভন সরকার তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাংলার নবজাগরণের যে স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে পরিচিত না হইলে বুঝিতে পারা যাইবে না তিনি কি স্বকৌশলে রবীন্দ্রনাথকে সমাজবাদী শিবিরে টানিয়াছেন। সরকার মহাশয়ের বক্তব্য হইল “বাংলার রেনেসাঁদের... দুই প্রধান ধারা—পশ্চিমী দৃষ্টি আর প্রাচ্যাভিমান...”। প্রাচ্যাভিমান প্রতিক্রিয়াশীল আর পশ্চিমী দৃষ্টি প্রগতিশীল। প্রতিক্রিয়া আর প্রগতি শব্দ দুইটি সরকার মহাশয় ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম তাহাই। কারণ তাঁহার মতে প্রাচ্যাভিমানে প্রথম আশ্রয় হইল “প্রাচীন গোববের উপাসনা”, দ্বিতীয় “হিন্দুত্ববোধ”, তৃতীয় “ভক্তিব্রবণতা”। আর পশ্চিমী দৃষ্টির ফল হইল “সমাজ-সংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ”। সরকার

মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তব্য হইল, এই প্রাচ্যাভিমান ও পশ্চিমী দৃষ্টির “পরস্পর বিরোধিতাকে অস্বীকার করার উপায় নাই।” তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই বিরোধ ছিল। কবির প্রাচ্যাভিমান প্রবল হইয়া উঠিল ১৯০২ সনে। উদাহরণ হিসাবে “নববর্ষ” ও “বারোয়ারি-মঙ্গল” হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া তিনি বলিয়াছেন, “এব মূল স্বরটি একেবারে জ্ঞাতোফিল।” তাঁহার মতে ১৯০৭ হইতে রবীন্দ্রনাথের লেখায় আর একটা মোড় ফিরিবার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। “তার মধ্যে প্রাচ্যাভিমান থেকে যে-দিকে তাঁর মুখ ফিরেছে, সে হল হিন্দুত্ব নয়, নতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন, যাকে আমাদের বিশ্লেষণে পশ্চিমী দৃষ্টি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়ার উপায় নেই।” আর পূর্বেই বলা হইয়াছে, সরকার মহাশয়ের মতে এই পশ্চিমী দৃষ্টি আর সমাজবাদ সমার্থক। “যে সমাজবাদ আমাদের কাম্য জ্ঞাত্যত তার সঙ্গতি পাই প্রাচ্যাদর্শে নয়, পশ্চিমী দৃষ্টিরই মধ্যে, যে-পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে তার উদ্ভব ও পরিণতি।” সরকার মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের অন্তিম অঙ্কচ্ছেদে তাঁহার মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, “রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত।... পরিণত জীবনের শেষার্ধেরও বেশী জুড়ে বিরাজ করল ভবিষ্যতের উপযোগী পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আন্তরিক প্রীতি।”

বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে সরকার মহাশয় যে অপব্যখ্যা করিয়াছেন সে প্রশঙ্গে আমরা পরে আসিতেছি। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার মারাত্মক অপপ্রচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিব। প্রবন্ধকারের বক্তব্য হইল, যে-সমাজবাদ কম্যুনিষ্টদের কাম্য তাহা পশ্চিমী দৃষ্টির ফল, তাহার সঙ্গে প্রাচ্যচেতনা মিশাইলে চলিবে না, কারণ এই উভয় চেতনা পরস্পরবিরোধী। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে এই পশ্চিমী দৃষ্টিরই জয়যাত্রা, ভবিষ্যতের উপযোগী এই পশ্চিমী আদর্শের প্রতিই তাঁহার আন্তরিক প্রীতি। বলাই বাহুল্য, পশ্চিমী সমাজবাদ জড়বাদ বা মেরিটরিয়েলিজমের দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সরকার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অল্পসারে এই পশ্চিমী জড়বাদী সমাজবাদের আদর্শের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের “আন্তরিক প্রীতি” ছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি রবীন্দ্রনাথের

প্রবন্ধ-সাহিত্য হইতে ইতস্ততঃ কতকগুলি উদ্ধৃতি সংকলন করিয়াছেন। এই জাতীয় উদ্ধৃতি ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অরণীয় উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য। ‘কালান্তর’ গ্রন্থে “রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত” প্রবন্ধে কবি বলিয়াছেন, “দলিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে-জিনিষটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণশব্দে গণ্য করা চলে না। কেন না অল্প পক্ষের উকিলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন; তার কারণ, বাছাই-কবা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।” সরকার মহাশয়ের “বিশেষ-রূপে বাছাই করা” উদ্ধৃতিগুলি যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জগুই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাহা ছাড়া সরকার মহাশয় প্রাচ্যাভিমানের বিরোধী পাশ্চাত্য দৃষ্টিরই জয়যাত্রা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে দেখিয়াছেন। তাঁহাকে রবীন্দ্রজীবনের সর্বশেষ অরণীয় রচনা এবং মৃত্যুব মাত্র সাতানব্বই দিন পূর্বে শান্তিনিকেতনে প্রস্তুত তাঁহার অন্তিম ভাষণ “সত্যতার সংকটে”র উপসংহারে উচ্চারিত কবির অন্তিম বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তাহা মানব-সমাজের হাতে রবীন্দ্রনাথের এই “লার্ট টেস্টামেন্টে”র চিরঅরণীয় বাক্যটিতে কবি বলিতেছেন, “আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বচলনের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।... নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভ্রাণি পশ্চতি।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্চতি ॥”

বনপর্ব হইতে এই উদ্ধৃতি মহাভারতের মূল কথা, ইহাই কবির শেষ বিশ্বাসের কথা, “পশ্চিমী দৃষ্টি” এই মহৎ আদর্শ হইতে লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত।

আসলে পশ্চিমী জড়বাদী সমাজবাদকে যাহারা অবিমিশ্র ভাবে ভারতের মাটিতে আমদানি করিতে চায় তাহাদেরই মুখপাত্র হিসাবে সরকার মহাশয় বাংলার নবজাগরণের সমস্ত ইতিহাসটিকেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভুল ব্যাখ্যার দ্বারা বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলার নবজাগরণের বিবর্তনে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দৃষ্টির সমন্বয়ের ফলে যে

জীবনবোধের সৃষ্টি হইয়াছে সেই সময়ের জীবনবোধেরই সর্বদৃষ্টির প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বকীয় মহাশয় ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি লিখিয়াছেন, “বাংলার নবজাগরণকে বেনেসাঁস আখ্যা দেওয়াটা মনে হয় হাল ফ্যাশানের কথা, গত পনেরো কুড়ি বছরে এর বহুল প্রচলন হয়েছে।” যামবপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান-অধ্যাপকের ইতিহাস সম্পর্কে এই অজ্ঞতা ক্ষমার অযোগ্য। বাংলার নবজাগরণকে বেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া “হাল ফ্যাশানের কথা” নয়, এখন হইতে তেতারিশ বৎসব আগে ১৯১৮ সনে ভারতের নবজাগরণ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ যে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা নাম ‘The Renaissance in India’। উক্ত গ্রন্থে ভারতের বেনেসাঁসের স্বরূপ বিশ্লেষণে ঋষি অরবিন্দ লিখিয়াছেন “a new age of an old culture transformed, not an affiliation of a newborn civilization to one that is old and dead, but a true rebirth, a renaissance.” [পৃ. ৩৫] এই বেনেসাঁসের বিবর্তনের তিনটি স্তরপর্যায়ের বিশ্লেষণ করিয়া অবিন্দ বলিতেছেন—

“The first step was the reception of the European contact, a radical reconsideration of many of the prominent elements and some revolutionary denial of the very principles of the old culture. The second was a reaction of the Indian spirit upon the European influence sometimes with a total denial of what it offered and a stressing both of the essential and the strict letter of the national past, which yet masked a movement of assimilation. The third, only now beginning or recently begun, is rather a process of new creation in which the spiritual power of the Indian mind remains supreme, recovers its truths, accepts whatever it finds sound or true, useful or inevitable of the modern idea and form, but so transmutes and indianises it, so absorbs and so transforms it entirely into itself that its foreign character disappears and it becomes another harmonious

element in the characteristic working of the ancient goddess...” [পৃ. ৩৫-৩৬]

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় বেনেসাঁসের এই তৃতীয় স্তরেরই প্রতিনিধি। তাই কবি “ভারততীরে” এই সঙ্গতিময় মিলনের স্বরই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে— “দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।” কিন্তু প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের এই মিলনসাধনায় পশ্চিমী জড়বাদী সমাজবাদের ভিত্তিমূলই ধসিয়া পড়ে, তাই স্বশোভন সরকারের প্রয়োজন ইতিহাসের অপব্যাখ্যা। ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ইহাদের দৃষ্টি চিরদিনই অন্ধ থাকিবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও ইহাদের সিদ্ধান্ত তাই অন্ধের হস্তিদর্শনের স্থায়ী।

কিন্তু ইহারা জ্ঞানান্ধ নয়, জ্ঞানান্ধ, জ্ঞানপাপী। এই জ্ঞানান্ধদের পরিচয় দিব আলোচ্য সংকলনের আরও দুইটি প্রধান প্রবন্ধ হইতে। বিষ্ণু দে “চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ” সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু রবীন্দ্রনাথকেই নয়, তাঁহার পিতৃদেবকেও রেহাই দেন নাই। এই প্রবন্ধটিই এই কণ্ঠ সঙ্কলনে সর্বাপেক্ষা ইতর রচনা। “আভিজাত্য যে দেশে দুর্লভ ও প্রায়ই পঙ্গু, সে দেশে প্রকৃত অভিজাত হওয়ার স্কোচ-বাধা” রবীন্দ্রনাথকেও নাকি ভুগিতে হইয়াছিল। “এ প্রসঙ্গে মহর্ষির আত্মজীবনীতে অভিজাত ধনিকের ভগবদ্ভক্ত অচেতনতার উদাহরণ শুধুমাত্র উল্লেখ করলেই হবে, যেমন তাঁর উদ্ভবভারতে নৌবিহার বা লিমলা থেকে পলায়নকাহিনী অথবা রাজনারায়ণকে ফেলে ডুবু-ডুবু নৌকা থেকে বড় নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি।” [পৃ. ১০৩] রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে এই মহর্ষি-বিদূষণ যে কেন প্রয়োজন হইল তাহা আপাত-দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে না। এই জগুই ইহাদিগকে শুধু জ্ঞানান্ধ নয়, জ্ঞানপাপী বলিয়াছি। বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “আমরা প্রভাতবাবুর জীবনীতে জানতে পারি যে তরুণ কবি ইংরোপে মানবমনের স্বাধীন উল্লাসে যখন সমধিক মুগ্ধ হলেন, তাঁর ঋষি-প্রতিম পিতৃদেব তখন তাঁকে বাড়ি ফিরে আসতে বলেন। রবীন্দ্রনাথকে যে হঠাৎ বিবাহে বন্ধ হতে হয়, সেও প্রভাতবাবু বলেন, তাঁর গুরুজনের উদ্বিগ্ন নির্বন্ধে।” [পৃ. ১০৩] বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের

“সবকারী জীবনীকার” প্রভাতবাবুর নামে এই সকল কথা চালাইতেছেন। প্রভাতবাবু এই সকল কথা কোথায় কিভাবে বলিয়াছেন আমরা জানি না, যদি তিনি মতলববাজদের আপ্যায়িত করিবার জন্ত এরূপ কথা-বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে, বলাই বাহুল্য, তিনি নিজে ভ্রান্ত হইয়া অপরের নষ্টামিস প্রার্থ্য দিয়াছেন।

আলোচ্য সংকলনেব প্রথম প্রবন্ধ, “সার্বভৌম কবি”, লিখিয়াছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝিতেছি, প্রাচীন শাস্ত্রকাবেবা কেন বলিয়াছিলেন সাহিত্যবিচারে অধিকারী-ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদেব মতে সমানধর্মী সহৃদয় ব্যতীত কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার জাহারও নাই। মাঘস্বত-মন্দিরে হবিজন-আন্দোলনের ফল কি হয় তাহারই উদাহরণ হীরেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি। আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং প্রবন্ধকারের মূল বক্তব্যটি শুধু উদ্ধার করিব। তিনি লিখিতেছেন, “...কাব্যরাজ্যে পরিসর তো মহতম বস্তু নয়, মানসিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে অল্পভূতির ভীততা ও গভীরতা বিনা তো কাব্যের কৈলাসে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।...এই ভীততা আর গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবির সারিতে না বসিয়ে তাদেরই কাছে, কিন্তু একটু নামিয়ে, জায়গা দেওয়াই হয়তো সমীচীন।” [পৃ. ২৪] আধুনিক কাব্য-কৈলাসেব যুগ্মমান ভূমির এই উক্তি টিপ্পনীর অপেক্ষা রাখে না। শুধু হীরেন্দ্রনাথের অপূর্ব বাচনভঙ্গির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথকে কবি-সমাজের কোথায় বসাইতে হইবে? পৃথিবীর সবচেয়ে সেবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবির সারিতে অবশ্যই নয়। তবে “তাদেরই কাছে,” “কিন্তু একটু নামিয়ে”।

রবীন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া ভারতবর্ষকেই টানিয়া নামাইবাব এই সুপবিকল্পিত প্রথাস সম্পর্কে সকলকে অবহিত করিবার জন্ত এই অবাস্তব প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম।

জুডাস ইষ্কারিয়ট

আদি গসপেল-প্রচারকেবা ম্যাথু মার্ক লুক ও জন,

প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে যীশুব দ্বাদশ শিষ্যের অন্ততম জুডাস ইষ্কারিয়টের স্বন্ধে শয়তান ভর কবিষাছিল, তাই সে যীশুখ্রীষ্টকে ধরাইয়া দেওয়াক্রপ কঠিনতম পাপে লিপ্ত হইয়াছিল, ত্রিশ মুদ্রার প্রলোভন উপলক্ষ্য মাত্র। খ্রীষ্ট সত্য ও নিষ্কলুষতার অবতার ছিলেন; তাই যখন একালের একজন যীশুতে সমর্পিত-প্রাণ রোমান ক্যাথলিক পাদরি সম্যাসীকে মিথ্যা ভাষণে লিপ্ত হইতে দেখি, এবং শুনি- তিনি যাদবপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার উদ্ভবতন “বসে”র পক্ষে এই মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছেন তখন মনে প্রশ্ন জাগে ইহা শয়তানের লীলা, না, ত্রিশ মুদ্রার খেলা। ফাদার পিয়ের ফালোঁ, এম. জে. আমাদের স্নেহাস্পদ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁহাকে সত্যনিষ্ঠ সাধু বলিয়াই জানি, তাই হঠাৎ তাঁহাকে বুদ্ধদেব বহুর পক্ষে নিজের চরিত্রকে মসলিপ্ত করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। যখন জানিলাম তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অফিসিয়েটিং অধ্যক্ষের আসনে বসিবার দাবিতেই ওই কার্য করিয়াছেন তখন দুঃখিত হইলাম এবং জুডাস ইষ্কারিয়টকে স্বতঃই মনে পড়িল। তিনি বেলজিয়ান, তাঁহার মাতৃভাষা ফরাসী। আমাদেরই-মত ইংরেজী তাঁহার পরভাষা। বুদ্ধদেব বহু তাঁহার ‘টু সিটিজে’ প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে হেয় করিবার চেষ্টা করেন নাই, ‘যুগান্তরে’ প্রকাশিত ওকালতিতে (২৮ জুন, ১৯৬১) কেবলমাত্র এই যুক্তি দিলে আমবা ইহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম যে তিনি ইংরেজী প্রবন্ধের মর্ম গ্রহণ কবিত্তে পারেন নাই। কিন্তু ‘যুগবাণী’র অনুবাদকে “জাল” এবং ‘বেতার জগতে’র রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত স্বয়ং বুদ্ধদেবকৃত অনুবাদকে খাটি ও আসল বলিয়া জাহির কবাত্তে বুঝিতেছি ভাষাজ্ঞানের অভাবমাত্র নয়, অহং-জ্ঞানের মাত্রাধিক্য-বশতঃই এই অবিচার তাঁহার পক্ষে করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার উক্তিব মধ্যে যে কত ভুল আছে তাহার কয়েকটি মাত্র নমুনা গত ৬ই জুলাইয়ের ‘যুগান্তরে’ গ্রাশনাল লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার মৌলিক মিথ্যাব স্বরূপটা একটু উদাহরণ সহযোগে দেখাইতেছি। ফাদার ফালোঁ তাঁহার ‘যুগান্তরে’র প্রতিবাদে লিখিয়াছেন :

“বেতার-জগৎ” পত্রিকায় রবীন্দ্রজগৎবাসিকী সংখ্যায় ‘রবীন্দ্ররচনায় পার্শ্বাভাব’ নামে শ্রীবুদ্ধদেব বসু নিজে তাঁর পূর্বপ্রকাশিত (‘টু সিটিজ’-এ) ইংরেজী প্রবন্ধ অল্পবাদ করেই প্রকাশ কবেছেন। এই বাংলা বেতার-বাণী ও প্রবন্ধেব প্রচারে কোনও প্রতিবাদ বা বিক্ষুব্ধ সমালোচনা কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

প্রকাশিত হয় নি তাহার কারণ, ‘বেতার-জগৎ’র বাংলা প্রবন্ধ ও ‘টু সিটিজ’র ইংরেজী প্রবন্ধ এক নয়, যৌগিক ও শযতানে যতখানি ফারাক, দুটি প্রবন্ধের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য ততখানিই। এইখানেই ফাদার ফালোর জুডাস-মনোবৃত্তি প্রকট হইয়াছে, প্রবন্ধ দুইটিকে না মিলাইয়া পড়িয়াই তিনি ‘মুগবাণী’কে ধরাইয়া দিতে গিয়া নিজে ধরা পড়িয়াছেন। তথ্যানিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ সাধু ইংবেজী ও বাংলা প্রবন্ধ না মিলাইয়াই “ভিত্তিহীন ও অসত্য জানি বলে” ইত্যাদি আশ্বালন করিয়াছেন। ‘মুগবাণী’ মূল প্রবন্ধের অনেক মূল্যবান অংশ বাদ দিয়াছেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব কি কবিয়াছেন? ইংবেজী প্রবন্ধের আবস্তাংশ ‘টু সিটিজ’ পৃ. ৩০ নীচে ছাপিয়া দিলাম, ‘বেতার-জগৎ’ এই অংশের চিহ্নমাত্র নাই :

“Rabindranath's works are European literature written in the Bengali language, and they are the first of their kind.” This remark, made by a Bengali poet of today, is of course an exaggeration, but it is exaggerations of this sort that reveal the truth in a flash and make us cogitate on its implications. Orthodox Tagorites may be offended by this, and so may the generation of *beatniks* who regard the West as an arid area where all things worth doing have been done before and there's nothing left but to enliven poetry with acrobatics. And then, Tagore's vogue in Europe was as an oriental sage : the opponent of Western turmoil and the devotee of *shanti*—“the peace that passeth understanding”—of Truth and Beauty and Good. And Tagore himself, we must admit, contributed to this idea of himself, both before and after he was

acclaimed in the West. Nevertheless, any perceptive reader of Bengali poetry must acknowledge that he was very much of a European.”

“Direct borrowing”-এর অল্পবাদ যে “সাদৃশ্য” মাত্র নয় অ-ইংরেজ ও অবাঙালী পাঠক তাহা না জানিতে পারেন, কিন্তু তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যক্ষপদে আকৃষ্টনি করিবার স্পর্ধা যাহার তাঁহাব নিশ্চয়ই জানা উচিত ছিল।

সাদৃশ্যমণি তাঁহাব ‘সুসমাচারে’ (২৭।৫) জুডাসের পরিণাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এবং সে বৌপ্যথগুগুলি মন্দির মধ্যে ছড়াইয়া দিল এবং চলিয়া গেল, এবং নিজেকে ফাঁসিতে লটকাইয়া দিল।”

আমরা এতটা করিতে বলি না, তবে বুদ্ধ-প্রভাব দূর্ব-করিবার জন্ত এই খ্রীষ্টভক্তকে একটা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলি।

দি ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীডম

‘টু সিটিজ’ হইতে বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃতিতে যে “আধুনিক বঙ্গকবি”র উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি স্বর্গীয় স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত। মৃত্যুর অব্যবহিত-পূর্বে যে বচনায় তিনি বিকারের ঘোরে রবীন্দ্র-চরিত্রকে মনীলিপ্ত করিয়াছেন সেই প্রবন্ধেই আছে :

“...in the hands of the latter [Rabindranath] Bengali literature turned occidental in all but speech.”

এই প্রলাপ-প্রবন্ধটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রচার করিয়াছেন “দি ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীডম”। ‘কোয়েস্ট’ পত্রিকাটি ইহাদেরই আওতায় (স্পন্সর্ড বাই) প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ যে ‘টু সিটিজ’ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে সেটির গায়েও ছাপমারা বহিয়াছে, “office for Asian Affairs Congress for Cultural freedom”। ইহা এই কমিটিরই প্যারিস ও দিল্লী শাখার নাম। যে ‘ধট’ পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধটি পুনঃপ্রচারিত হইয়াছে সেটিও এই “সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা”র ধুরন্ধরদের কীর্তি। ইহারা ভারতের বাহিরে এবং ভারতের ভিতরে বসিয়া ভারতবর্ষকে হেয় করিবার জন্ত এই সকল কুৎসিত প্রবন্ধ বহু অর্থব্যয়ে প্রচার করিতেছে। এই টাকার যোগাইতেছে কে?

ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথকে “ইউরোপীয়ান” ও “অক্সিডেন্টাল” প্রমাণ করিবার জন্য ভারতীয় মিরজাফরদের নিয়োগ করিতেছে কাহারো? ইহাদের স্বরূপ অচিবাৎ উদ্ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারেব দৃষ্টি আমরা ইহাদের দিকে আকৃষ্ট করিতেছি।

“সংস্কৃত সাহিত্যে নব দিগন্ত”

বেদকে বিলুপ্তি হইতে রক্ষার জন্য স্বয়ং ভগবানকে বারবার অবতার-জন্ম গ্রহণ কবিত্তে হইয়াছে—আমাদের পূর্বাণে এইরূপ উক্ত আছে। মহাভারতের আমলে স্বয়ং বেদব্যাস এবং ঐতিহাসিক কালে শঙ্করাচার্য নানা উপায়ে বেদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে বাংলাদেশে বেদান্ত-ব্রাহ্মণ-উপনিষদের পুনরুজ্জীবন রামমোহন রায়ের খ্যাতির মূলে।

অথর্ববেদেব প্রধান শাখা পৈঙ্গলাদ শাখা পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। ১৮৭৩ সনে জার্মান পণ্ডিত রুডল্ফ রোঠের প্রেরণায় এবং ভারতে ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় কান্স্টাবে পৈঙ্গলাদ শাখার এক খণ্ডিত বিকৃত পুথির আবিষ্কারে এই শাখা সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবীর পণ্ডিতমহল সচকিত হইয়া উঠেন। সেই দুর্বোধ্য অপাঠ্য পুথি ফোটোটাট কবিয়া মুদ্রিত করিয়া রক্ষিত হইয়াছিল বটে কিন্তু পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীহুগোমোহন ভট্টাচার্যের দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা ও দুর্দমনীয় অধ্যবসায়ের ফলে উড়িষ্যা হইতে এই শাখার সম্পূর্ণ স্তূপ পাঠসম্বলিত পুথি আবিষ্কৃত হইয়া “সংস্কৃত সাহিত্যে নব দিগন্ত” উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহায্যে তাঁহার মূল্যবান আবিষ্কারের কথা সমগ্র পৃথিবীতে ঘোষণা করিয়াছেন এবং বর্তমান সংখ্যা ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’য় (৬৬ বর্ষ ২য় সংখ্যা) প্রবন্ধাকারে তাঁহার আবিষ্কারের বিস্তৃত তথ্য মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে “ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সমাজের ইতিহাসে পৈঙ্গলাদ শাখার গুরুত্ব অনেক।...প্রকাশিত হলে প্রাচীন বিজ্ঞানক্ষেত্রে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে উঠবে।” তাঁহার আবিষ্কার প্রকাশের দায়িত্ব তাঁহারই। সমগ্র

পৃথিবী এই বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বহু সহস্র বৎসর বঞ্চিত হইয়া আছে। যুরি গাগারিন ও অ্যালেন সেকার্ডের কীর্তির মতই ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই কীর্তি পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সমাজকে পুলকিত করিবে।

‘শেষের কবিতা’র বেতার-নাট্যরূপ

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্রের সরকারী মুখপত্র ‘বেতার জগৎ’-এর রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক সংখ্যায় (২২ এপ্রিল ১৯৬১) এই কেন্দ্রের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, অধুনা পূর্বাচল চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের কর্মকর্তা শ্রীঅশোককুমার সেন “আকাশবাণীর সংস্পর্শে রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধে বেতাবেব প্রসার ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে একটি সরকারী ডকুমেন্টারি প্রবন্ধও বলা চলে। তথ্যের দিক দিয়া এইরূপ প্রবন্ধে ভুল বা অসম্পূর্ণতা থাকা বাহ্যনীয় নয়, কাজেই একটি অসম্পূর্ণতা ও ভুলের কথা একান্ত ব্যক্তিগত কথা বলিয়াই সসঙ্কোচে নির্বেদন করিতেছি। ৩২৮ পৃষ্ঠায় শ্রী সেন লিখিয়াছেন :

“কলকাতা কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাট্যাভিনয় প্রচারিত হলেও তিনি তাঁব কোনো উপস্থাসেব বেতার নাট্যরূপ প্রচারে সম্মতি দেন নি। আমার অল্পরোধে কবি একবার ‘শেষের কবিতা’র বেতার নাট্যরূপ কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারে সম্মতি দেন। কবির শরীর তখন স্তূহ ছিল না। অস্তূহ অবস্থাতেই তিনি ‘শেষের কবিতা’র অভিনয় বেতারে শুনেছিলেন। প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা, স্তূপ্রভা মুখোপাধ্যায় সে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অভিনয় শুনে কবি খুব খুশী হয়ে আমাকে একখানা চিঠি লিখে তা জানিয়েছিলেন।”

‘শেষের কবিতা’র এই বেতার-নাট্যরূপ যে শ্রীসজ্জনীকান্ত দাসের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল সেন মহাশয় তাহা লিখিতে ভুলিয়াছেন। আসল তথ্য এই যে শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস এই নাট্যরূপ রচনা করিবেন জানিয়াই রবীন্দ্রনাথ বেতারে ইহা অভিনীত হইবার অল্পমতি দিয়াছিলেন এবং সে অল্পমতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তদানীন্তন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅশোক-কুমার সেন কলিকাতা কেন্দ্রে পুনরভিনয় মাত্র করাইয়াছিলেন।

লেখা ও লেখকের ব্যক্তিত্ব

অচ্যুত গোস্বামী

এতোক মানুষের জীবনেই দু-একটি, পরম বিশ্বাসের মুহূর্ত আসে।

আপনার কথাই ধরুন না। হয়তো আপনি একদিন সারাদিনের কাজের শেষে কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটিছেন। হঠাৎ আপনার সামনে একটি বকবকে স্বদৃশ্ গাড়ি থেকে এক ব্যক্তি নামল। শোভন অভিজাত পরিচ্ছদে ভূষিত এই লোকটিব মুখের দিকে তাকিয়ে আপনি চমকে গেছেন। অত্যন্ত চেনা চেনা মুখানা, অথচ চিনি বলে ভাববাব মত সাহসও আপনি লক্ষ্য করতে পারছেন না।

আপনাকে আরও বেশী চমকে ওঠবার সুযোগ দেবে লোকটি যখন সে অনায়াসে আপনাব কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করবে, কি রে যোগেশ, চিনতে পারছিস না? আমি যে পরেশ।

বুঝুন ব্যাপারখানা। এ আপনার সেই স্কুল-জীবনের বন্ধু পরশ। ইস্কুলে পড়ার সময় প্রথমে সে ছিল আপনার সিনিয়র; তারপর কিছুদিনেব জ্যে আপনাব সহপাঠী হয়েছিল; তারপর যথানিয়মে একদিন সে আপনার জুনিয়র হয়ে কখন যে হঠাৎ লেখাপড়ার মাঠ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল আজ আর আপনাব তা মনেও নেই।

নিয়ম-মাফিক বিশ্বাসের প্রকাশ ও কুশল প্রশ্নাদির বিনিময়ের পর আপনি নিশ্চয়ই এই পৃথিবীব অষ্টম আশ্চর্য পুরুষটিকে জিজ্ঞেস করবেন, তারপর পরেশ, আজকাল কী করছ?

অর্থাৎ আপনি তার আশ্চর্য সৌভাগ্যের কারণটা জানতে চাইবেন।

পরেশ যা উত্তর দেবে তা একরকম না শুনেই বলে দেওয়া যায়। সোজাসুজি সে কিছুই বলবে না। হৈয়ালিটাকে পুবোপুরি বজায় রেখে হয়তো বলবে, এমন কী আব আমি করতে পারি ভাই। তোদের মত তো আর আমি পড়াশুনোয় ভাল ছেলে ছিলাম না। আর আমার বাবাও এমন কিছু একটা মোটা পুঁজি রেখে যেতে পারেন নি। তবে তোদের পাঁচজনের আশীর্বাদে কোন রকমে কিছু কবে খাচ্ছি।

কোন বকমে 'কবে খাওয়া'র মানে হচ্ছে সে সম্প্রতি কলকাতাব কোন এক সম্ভ্রান্ত পাডায় লাখখানেক টাকা দিয়ে একটি তিনতলা বাড়ি ভুলেছে। আর তাব গাড়িখানা তো আপনার সামনেই রয়েছে। সেটা হিন্দুস্থান কোম্পানির গাড়ি নয় মোটেই। দস্তর মত ইম্পোর্ট করা ডলার-কারেন্সি অঞ্চলের গাড়ি।

কাজেই এ যুগে এই করে খাওয়া ব্যাপারটি মোটেই অবহেলা করার মত জিনিস নয়। সত্যি কথা বলতে কি, দেশ স্বাধীন হাওয়ার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক বাজারগুলিব উঠতি অবস্থা হয়েছে কিনা বলতে পারছি না; তবে এই 'কবে খাওয়া'র বাজারের যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তাব কিছু কিছু প্রমাণ চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি।

কবে খাওয়ার বাজারের সংখ্যা এখন অনেক। অবশ্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি হচ্ছে বৃহত্তম বাজার।

অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপার বলেই, এবং আমার এই আলোচনা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রদের নিষে বলেই, আমি এগুলি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে চাইছি না।

ছোটখাটো বাজারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—উদাস্ত-পুনর্বাসনের বাজার, ইলেকশান এবং বাজনীতির বাজার, এবং সর্বশেষে সাহিত্যের বাজার।

কিছু লোক আছে যারা উদাস্তও নয়, উদাস্ত-আগিসের কর্মচারীও নয়; অথচ যারা এই উভয়ের উপর 'বাণিজ্য কবে' বেশ বহাল তব্বিতেই জীবন যাপন করেছে। কজন প্রকৃত উদাস্তকে যে ভিক্ষুকে পবিত্র না করে প্রকৃত পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তা সমাজতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক না হলেও এ কথা বলতে পারি যে উদাস্তরা বেশ কিছু লোককে করে খাওয়াব অবাধ সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রত্যেক পাড়াতেই কিছু সংখ্যক মুখ্য বেকার লোক থাকে যারা রকে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করাটাকে সময়ের দারুণ অপব্যয় বলে মনে করে। কিন্তু বছরের মধ্যে কয়েকটা সময়ে এই লোকগুলো দারুণ কাজের লোক হয়ে ওঠে—বড় পূজোর সময়, রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় এবং ইলেকশানের সময়। এদের কথা সবাই জানেন, কাজেই বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

স্বাধীন দেশে রাজনীতি যে করে খাওয়াব এক বৃহৎ বাজারে পরিণত হবে, এ তো সহজেই অহুমান করা যায়। রাজনীতি আবার এমন জিনিস যে এখানে শুধু মানুষের অর্থাকাজ্জাই কেবল পরিতৃপ্ত হতে পারে তাই নয়, সেই সঙ্গে মানুষের ক্ষমতার আকাজ্জা চরিতার্থতারও সুযোগ ঘটে। কাজেই অর্থ আর ক্ষমতা—মানুষের মনের এই দুই লোভকে বেসাতি করে বহু লোক বহু লোকের উপর বাণিজ্য করছে। হয় ঠকছে, না হয় ঠকাচ্ছে।

তেমনি সাহিত্যের বাজারেও প্রাপ্তিযোগ ছুটো—অর্থ এবং বশ। অত্যাশ্রয় বাজারের সঙ্গে এক নিখাসে সাহিত্যের বাজারের কথা উল্লেখ করায় অনেকে হয়তো বিস্মিত হবেন। কেউ কেউ হয়তো মনে মনে আহতও হবেন। কিন্তু অত্যাশ্রয় বাজারে যে নিয়মগুলো কার্যকরী হচ্ছে, যেখানে দেখছি সাহিত্যও সে নিয়মগুলোর উদ্ভেদে নয়, সেখানে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকার করি

কী করে? এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সাহিত্য আজ আর হীন লোভ চরিতার্থতার মনোবৃত্তির উদ্ভেদে নয়।

বাংলাদেশের সাহিত্যের বাজার আজও খুব সঙ্কীর্ণ। বৃহৎ লোভকে স্থান দেওয়ার মত পরিসরের আজও সেখানে অভাব আছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে ক্ষুদ্র লোভ যখন কদম্বতাযুক্ত হয় তখন তা আরও বেশী মনুষ্যত্বের অবমাননাকর বলে বোধ হয়।

মানুষ কামনারহিত হোক এ উপদেশ দেওয়ার জ্ঞান বুদ্ধদেবের মত মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। আমরা সাধারণ লোক বরং এইটাই দেখতে পাই, স্বাভাবিক কামনা-বাসনাই মানুষকে জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখে, মানুষকে কর্মে নিয়োজিত রাখে। কাজেই সাহিত্যিকরা লোভশূন্য হবেন এ কথা বলা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়। অর্থ এবং বশের আকাজ্জামুক্ত হয়ে সাহিত্যিকরা বিস্তৃত সৌন্দর্যচর্চা হিসাবে সাহিত্যচর্চা করবেন এ কথা আদর্শবাদীর কথা, বাস্তববাদীর কথা নয়। কিন্তু অর্থ এবং বশের উপবে সৌন্দর্যের ধ্যান যার মনে প্রাধান্য পাচ্ছে না, তার পক্ষে সাহিত্যচর্চা করা বিড়ম্বনা, এ কথাও আমি না বলে পারছি না।

এই মনোভাবটারই অভাব দেখা যাচ্ছে আজকের দিনের সাহিত্যের বাজারে। জীবনের অত্যাশ্রয় ক্ষেত্রে যেমন আজ লোভ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আজ সেই মাত্রাছাড়া লোভ প্রাধান্য অর্জন করছে। নিজের স্বাভাবিক যোগ্যতা অহুযায়ী যেটুকু প্রাপ্য, মানুষ যখন তাব চেয়ে বেশী পাওয়ার জ্ঞান হাত বাড়ায়, তখন সেই লোভই মারাত্মক হয়ে ওঠে। মানুষ তখন লোভের বশবর্তী হয়ে সত্যতা আন্তরিকতা এবং মনুষ্যত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অগ্রসর হয়।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখি। যোগ্যতা বলতে আমি সমাজ-কল্যাণমূলক কাজ কবার যোগ্যতার কথা বলছি। বর্তমানকালে যোগ্যতার অভাবসত্ত্বেও যারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁদের যে কোন রকমের যোগ্যতাই নেই তা নয়। আলোচনার শুরুতে শিক্ষা এবং পৈতৃক বিত্তের অভাব সত্ত্বেও গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছে এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছি। সে লোকটিরও নিশ্চয়ই কিছু যোগ্যতা ছিল। সে যোগ্যতা হল সমাজের

ক্ষমতা-স্বন্দের মধ্যে উপযুক্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে মিত্র হিসাবে পাওয়ার যোগ্যতা। এ যোগ্যতার বাড়াবাড়ি ঘটলে সমাজের ঋণ্যবোধ—sense of justice—ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের লাভ হয়।

এতদিন পর্যন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিশেষ যোগ্যতাটি ব্যবহার করার বিশেষ সুযোগ ছিল না। সম্প্রতি সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ কথা সকলেই জানেন, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বাজারে কিছু কিছু লেখকের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-প্রতিভা ছিল। অবশ্য তাঁদের কারও মধ্যেই এমন প্রতিভা ছিল না, যার বলে তাঁরা শীর্ষতমের স্থান অধিকার করতে পারেন। আজকে তাঁরা শীর্ষতমদের অন্ততম বলে স্বীকৃতি-লাভ করেছেন। তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রতিভার অধিকারী অন্ততঃ দুজন সাহিত্যিক অনেক কম স্বীকৃতি-লাভ কবে কিছুটা দাবিদ্র্যের মধ্যেই দেহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এটাও সাম্প্রতিক কালেবই একটি ঘটনা। বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে এই যে ভাগ্যের বিভিন্নতা, তার কাণ্ড আর কিছুই নয়—এক শ্রেণীর লেখক একটি বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী, অপর শ্রেণী তা নয়।

এঁরা প্রাপ্য অতিরিক্ত সম্মান লাভ করেছেন কিনা সেটা আমার আলোচনার বিষয় নয়। সম্মান-লাভ নিশ্চয়ই এঁদের প্রাপ্য ছিল, এবং এঁরা তা লাভ করেছেন বলে বাঙালী হিসাবে আমরা সবাই সেজ্ঞা-গর্বিত। কিন্তু দুঃখ হয় যখন এঁদের মধ্যে মানবিক মহত্ব ও উদারতার অভাব দেখি। যখন দেখি নিজেদের প্রাপ্য সম্মানকে একচেটিয়া অধিকার হিসাবে ভোগ করার জ্ঞান এঁরা অপর লেখককে সম্মান-লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন, অথবা প্রকৃত সম্মানিত ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন কবতে চেষ্টা করেন।

এ সব ঘটনা সাহিত্যের বাজারে ‘কবে খাওয়া’র নমুনা। এ-সবের পিছনে নিছক ঈর্ষা-প্রবণতা কাজ করছে—এ কথা মনে কবা ভুল। অপরকে সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে পারলে ও অতীতে যারা সম্মান পেয়েছেন তাঁদের সম্মানকে লাঘব কবতে পারলে নিজের সম্মানের আসনটা স্থায়ী হয়, সচেতন বা অচেতনভাবে এই হিসাব-বোধটাও বোধ হয় এসব প্রচেষ্টার পিছনে থাকে।

যাদের কথা বলছি এঁরা সবাই মহৎ ব্যক্তি। কথায় আছে—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। কাজেই এঁদের অমূল্যত পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে আমবাও বরণীয় হতে পারি। বস্তুতঃ সাহিত্যে যারা ‘করে খেতে’ চান তাঁদের কী করতে হবে সেইটে শিক্ষা দেওয়ার জ্ঞানই আমার এই আলোচনার অবতারণা।

ধরা যাক, আপনি একজন সাহিত্যিক, এবং বাজারে আপনি ইতিমধ্যেই কিছু সম্মান-প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। আপনাব এখন চিন্তা, কী করে আপনার এই সম্মানটাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। আপনি আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু প্রতি বছরই যদি একজন করে বাঙালী আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন তবে আপনাকে আরও অনেকব সঙ্গে সম্মান ভাগ করে নিতে হয়। এ ব্যবস্থাটা আপনাব কাছে প্রীতিপ্রদ নয়। এক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে বলছি। সোজা চলে যান দিল্লীতে। আপনি যখন আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন তখন ধরে নিতে পারি কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার দহরম-মহরম আছে; কারণ তা ছাড়া এ দেশে কেউ পুরস্কার পায় না। কর্তাব্যক্তিদের কাছে আপনি প্রচার করে দিন যে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে পুরস্কার পাওয়ার মত কোন বই লেখা হয় নি। হাল আমলের কোন বাংলা বই অবশ্য আপনার পড়া নেই—পড়াব সময় কোথায় আপনার—কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না। কর্তৃপক্ষীয় মহল নানাবকম রাজনৈতিক কারণে বাংলা দেশকে কোণঠাসা করতে চান। আপনার কথাটাকে তাঁরা বিশেষজ্ঞের উক্তি বলে সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবেন।

অথবা ধরুন, স্বদেশে আপনি যথেষ্ট খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ কবেছেন। স্বদেশে খ্যাতি বৃদ্ধির আর আপনার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। আপনি এখন চাইছেন আন্তর্জাতিক সম্মান। তারও উপায় আছে। আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করতে হলে আপনাব প্রথম কাজ হবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দুঃখের বিষয় বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আপনি সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে! আপনাকে যা করতে হবে তা হল, কোন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির উপর ‘বাণিজ্য করা’। এমন মানুষ তো আমাদের চোখের সামনেই

রয়েছেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই রয়েছেন। আর তাঁর শতবর্ষ-পূর্তি বছরে সকলেই তাঁর কথা শোনার জন্য উদগ্রীব। জ্ঞানেন নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথের উপর ‘বাণিজ্য’ করেন নি এমন লোক এদেশে বিরল। তাঁর সম্পর্কে যে কথা ইতিপূর্বেই অগ্রে বলে গিয়েছেন তারই পুনরাবৃত্তি করে অনেকেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন বা করছেন। আপনিও নিশ্চয়ই সে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আপনি হয়তো লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নেই এ কথা কী কবে বিশ্বাস করি? তবে আমি কী করে বেঁচে রয়েছি, নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি? আপনি হয়তো এও বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিতে নয়, তাঁর সৃষ্টির সমগ্রতায়। এই ভাবে তাঁকে আকাশে তুলে দিয়ে আপনি সেদিন দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একটু ভিন্ন রাস্তা গ্রহণ কবতে হবে। সেখানেও যদি স্তুতি করেন, তবে তা নিছক অপবের কথার পুনরাবৃত্তি হবে, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। আপনি নিন্দাবাদেব পথ ধরুন। সাহেব-স্ববাদের দেশে গিয়ে আপনি যদি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু লেখেন তবে তা এদেশের কাকপক্ষীতেও জানতে পারবে না। কিন্তু সেই দূর বিদেশে নিছক আপনার সাহসের ভুল্লাই আপনার জয়জয়কার পড়ে যাবে। সাবধান! রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে যাবেন না। তাতে আবার আপনার বিতর্কিত ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। আপনি শুধু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির মত আপ্তবাকী উচ্চারণ করার মত করে বলুন যে রবীন্দ্রনাথ আসলে কবিতা কাকে বলে তাই জানতেন না। বাংলাদেশে আসলে সাহিত্য বলতে কিছু ছিল না; রবীন্দ্রনাথ খালি মাঠ পেয়ে মনের স্বখে চিংকার কবেছেন, এবং সকলে তাই শুনে বাহবা দিয়েছে।

পৃথিবীতে কোন মানুষই সমালোচনার উদ্দেশ্যে নয়। স্বয়ং সেক্সপীয়রকেও অনেক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেক্সপীয়রের সমালোচকদের মধ্যে তলস্তয়ের নাম জগদ্বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা করে আপনিও বাতারাতি ভারতীয় তলস্তয় এই আখ্যা পেয়ে যেতে পারেন। তলস্তয়ের অবস্থা একট

বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, এবং তারই নিরিখে তিনি সেক্সপীয়রের সমালোচনা করেছিলেন। আপনার অবস্থা তেমন কোন দৃষ্টিভঙ্গী নেই। নেই বলেই তো আপনার স্ববিধে।

সাহিত্যের বাজারে ‘করে খাওয়া’ব যে সব পদ্ধতির কথা বলছি, এগুলো যে আমি নিছক বানিয়ে বানিয়ে বলছি তা নয়। এগুলোর কার্যকাবিতা বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আপনি নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হতে পাবেন।

কিন্তু, আপনি হয়তো ইতিমধ্যে ভাবতে শুরু করেছেন, সাহিত্যের বাজারে যাবা মহারথী তাঁরাই যদি এ ধরনের ব্যাপার চালিয়ে যেতে থাকেন, তবে এ দেশের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কী? আমিও সেই কথাই ভাবছি।

জাতীয় সাহিত্য নদীর নিরবচ্ছিন্ন স্রোতোধারার মত। যুগে যুগে বংশপরম্পরায় একদল মানুষ মরে যাচ্ছে, এবং তাদের জায়গা গ্রহণ করছে নতুন আব একদল মানুষ, এই পরিবর্তনশীল সমাজজীবনে সাহিত্যেব স্রোত যেন একটি স্রোতো—অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানকে একসূত্রে বেঁধে তা বর্তমান মানুষের অবস্থানবিন্দুকে সূনির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। কোন ব্যক্তি-সাহিত্যিকের এ কথা কখনও তুলে যাওয়া উচিত নয় যে নিজের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত সন্মান বা প্রভাব-প্রতিপত্তি যত মূল্যবানই হোক, জাতীয় সাহিত্যের ধারার মধ্যে তিনি একটি স্বল্পকাল-স্থায়ী বুদ্ধদ মাত্র। সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্য থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বলেই যেমন তাঁর অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছে, তেমনি তাঁরও কর্তব্য এই ঐতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত রেখে ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দেওয়া।

বর্তমান বলে চিহ্নিত কালে যে লেখকেরা ‘অভিভাব-কষের স্থান গ্রহণ কবছেন তাঁদের সামনে দায়িত্ব আছে। প্রথমতঃ, তাঁদের কর্তব্য হল তাঁদের কালের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে অতীত ঐতিহ্যেব নব-মূল্যায়ন করা, তাকে নতুন ভাবে স্বীকার করা, এবং সেই মূল্যায়নকে ভবিষ্যৎকালের মানুষদের জন্য সঞ্চয় করে রাখা। তাঁদের দ্বিতীয় দায়িত্ব হল, সমসাময়িক তরুণতব লেখকদের মধ্যে কোথাও প্রতিভার স্ফূরণ দেখলে তাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি এবং

অভিনন্দন জানানো, তেমনি তাঁদের মধ্যে উন্নয়নগামিতা লক্ষ্য করলে সমন্বিত সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করা।

হুঃখের বিষয়, আধুনিক কালে যারা বড় আসন লাভ করেছেন তাঁরা এই দুটির একটি দায়িত্বও যথাযথ-ভাবে পালন কবছেন না। অতীতের লেখকদের মর্যাদা দেওয়া দুবে থাকুক, সমসাময়িকদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ জ্যেষ্ঠের দায়িত্ব পালন করা দূরে থাকুক, তাঁরা সব সময়ই স্বযোগ পেলে উভয়ের মর্যাদাকে লাঘব করতে সচেষ্ট। যেন অপরের মর্যাদা লাঘব হলেই তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এই মনোভাবটি যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে তার নাম দেওয়া চলে—আত্মার দীনতা—poverty of the soul.

এই poverty of the soul বোধ করি এ যুগের যুগ-বৈশিষ্ট্য। শুধু সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও ওই একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে। আজ যারা সর্বভারতীয় নেতা বলে পবিচিত, তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হবে এমন কোন দ্বিতীয় স্তরের নেতৃমণ্ডলী বর্তমানে সম্পূর্ণ অস্থগত। নেহরুর পরে ভাবতমাতার কর্ণ ধারণ করবেন কে এ নিয়ে সংবাদপত্রগুলি বেশ উৎকণ্ঠিত। কিন্তু পরবর্তী নেতৃগোষ্ঠীর অভাবের জন্তু তো দায়ী নেহরুরাই। নেতা তো ভুঁইফোড় গজায় না; প্রবীণ নেতাদেরই কর্তব্য হল প্রতিভাশালী তরুণদের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাঁদের নেতৃত্বের আসনে ওঠাব স্বযোগ দেওয়া। নেহরুরা সে দায়িত্ব পালন করেন নি, পাছে তরুণের দল তাঁদের নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তায় ভাগ বসায়।

বর্তমানের সর্বভারতীয় নেতাদের জনসাধারণ এখনও ঠিক দলীয় নেতা হিসাবে দেখে না, জাতীয় নেতা হিসাবে দেখে। তাঁরা কিন্তু দলীয় মনোভাবের উর্ধ্বে উঠে বিরুদ্ধ দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মূল্য ভুলক্রমেও স্বীকার করেন না। বরং প্রাসঙ্গিকভাবে বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিরুদ্ধ দলগুলিকে হয়ে প্রতিপন্ন করতে পারলে তাঁরা যথেষ্ট সন্তুষ্টি লাভ করে থাকেন। অথচ ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র; এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধির প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন একাধিক রাজনৈতিক পার্টির অস্তিত্ব। ভারতবর্ষে এই অবস্থাটি

বর্তমান নেই বলে এ দেশ নামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও কার্যতঃ একদল শাসিত রাষ্ট্রের সঙ্গে এর বিশেষ কোন তফাত নেই।

কাজেই রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই একই চারিত্রিক বিশেষত্ব কাজ করছে—poverty of the soul। বস্তুতঃ এ যুগে এ জিনিসটাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করলে ভুল হবে। বর্তমানের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এর কারণ নিহিত রয়েছে। এ সমাজে ব্যক্তি-মাছুষ—বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মাছুষ—নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ বলে মনে করতে বাধ্য হয়। সে মনে করে যে জীবনে তার ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোন সঙ্গী নেই তার। স্বভাবতঃই সমস্ত সামাজিক কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকেই সে সর্বাধিক মনোযোগ দেয়। এই অবস্থার যা স্বাভাবিক ফল তারই প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে। কিন্তু কথা হচ্ছে, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করা তো মহুশ্য নয়, তাকে অতিক্রম করতে পারার মধ্যেই মহুশ্য।

আমরা যদি অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি তা হলে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য চোখে পড়বে। বর্তমানের যারা সর্বভারতীয় নেতা, তাঁদের হাতে কবে গড়ে তুলেছিলেন পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দ—গান্ধীজী, মতিলাল, দেশবন্ধু প্রভৃতি। তাঁরা জানতেন যে এই তরুণতর নেতার দল আসছেন নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে—তাঁরা, হয়তো কার্যক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবেন। তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি দায়িত্ববোধ তাঁরা কখনও বিস্মৃত হন নি।

বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রের ইতিহাসও কম উজ্জ্বল নয়। বঙ্কিমের কার্যাবলীর আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, নিজে সাহিত্যিক হিসাবে সুনাম অর্জন কববেন এই চিন্তা তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা যোগায় নি। বরং তখনকার দিনের অবজ্ঞাত বাংলা ভাষায় জাতীয় সাহিত্যের বনিয়াদ রচিত হবে এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁর জীবনের মূল প্রেরণা। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে তিনি নিজে যেমন সাহিত্য-

সাধনায় মগ্ন হয়েছেন, তেমনি তাঁর চারপাশে একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক-গোষ্ঠী তৈরি করার দিকে সমান নজর দিয়েছেন। প্রেরণা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, ভৎসনা করে তিনি তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের সাহিত্যের একটি উচ্চ মান স্থাপন করার আদর্শে ত্রুটি করিয়েছিলেন। আজ দূর থেকে আমরা হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য-বিচারে ত্রুটি ঘটেছিল এ কথা বলতে পারি। কিন্তু ত্রুটি যদি কোথাও ঘটে থাকে তবে তাব কারণ ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা। তিনি যে সর্বদাই অত্যন্ত সততার সঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা সম্পর্কে গায়বিচার করতে চেষ্টা করেছেন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহে অবকাশ নেই। এ কথা কোনক্রমেই ভুলতে পারি না যে রবীন্দ্রনাথকে যখন কেউ চিনত না সেই নিতান্ত তরুণ অপ্রাপ্তবয়স্ক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা বহুদিনই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

বঙ্কিমের এই উজ্জল উদাহরণকে রবীন্দ্রনাথ পুঁজোপুরি অনুসরণ করেছিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভাকে তিনি উজ্জল ভাষায় স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সমসাময়িক লেখকদের রচনাকে তিনি পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টি দিয়ে সহানুভূতিব সঙ্গে বিচার করতে কার্পণ্য করেন নি। সর্বোপরি সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতি রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী নব্য-লেখকদের মধ্যে কোথাও শক্তির পরিচয় দেখলেই তিনি যে তৎক্ষণাৎ অকুণ্ঠিতভাবে তাকে স্বীকার করতে পেরেছিলেন এইটাই তাঁর মহত্ব ও দায়িত্বশীলতার অবিস্মরণীয় প্রমাণ।

শরৎ-সাহিত্যে আলোচনামূলক নিবন্ধ খুব বেশী নেই। যেটুকু আছে তাতে পূর্ববর্তীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত যেমন তিনি অকুণ্ঠভাবে উল্লেখ করেছেন, তেমনি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটি পবিচিত কাহিনী এই যে, কোন পাঠক তাঁর কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে অভিযোগ এনেছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি লেখেন সকলের জ্ঞান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লেখেন তাঁর মত সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের জ্ঞান। এ কাহিনীর মধ্যে প্রমাণ মেলে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন।

এক কথায় বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরীরা আত্মার দীনতা থেকে মুক্ত ছিলেন। আব তাবই ফলে একটি অধঃপতিত পরাধীন দেশের সাহিত্য এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে পেরেছিল। অবশ্য এ কথা আমি বলতে চাইছি না যে আমাদের পূর্বগামীদের মধ্যে সবাই রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ-হৃদয় ছিলেন। এমন সাহিত্যিক ছিলেন বইকি যারা সমকালীনদের প্রতি ঈর্ষাবোধের দ্বারা চালিত হয়েছেন। অনেক সময় দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতাব সঙ্গে মনের অগোচরে ঈর্ষাবোধ জড়িত ছিল বলেই বিরূপতা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছে। কিন্তু আগের যুগের লেখকদের একটা মহৎ গুণ এই ছিল যে তাঁরা তাঁদের মনোভাব প্রকাশে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন, তাতে সাহিত্যের আগরে দারুণ বাদানুবাদ সৃষ্টি হত বটে, কিন্তু বাদানুবাদের ভিতর দিয়ে অন্তরের মালিগা কেটে যেত। তাঁরা বিরুদ্ধ-পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্ত রাজধানীতে গিয়ে গোপন চক্রান্ত করতেন না, অথবা দেশে মুখ খোলার সাহস নেই বলে বৈদেশিক পত্রিকায সম্মানভাজন জাতীয় মর্য়াদাসম্পন্ন লেখকেব বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করতেন না।

এই বিষয়ে একটি কথা উল্লেখ করা আমি খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি। সমাজে যারা দর্শন বা বিজ্ঞান বা কোন কারিগরি বিচার চর্চা করেন, কার্যক্ষেত্রে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির অহুশীলনটাই বেশী হয়। কাজেই এ সব কাজের সঙ্গে তাঁদের সমগ্র ব্যক্তিত্বের কোন সম্পর্ক থাকে না। সেইজন্তই একজন অত্যন্ত প্রতিভা-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি-সম্পন্ন হতে পারেন; এবং তা সত্ত্বেও তাঁর বিজ্ঞানসাধনা কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক তা হয় না। সাহিত্য প্রধানতঃ অহুভূতি-রাজ্যের কারবার, এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে যতখানি পরিমাণে আপন ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে অহুশীলন করা যায়, অহুভূতিকে তা যায় না। বিশেষ করে স্বজনী-কল্পনার উৎস থাকে সম্ভাব গভীরে, সেখানে সচেতন মনের ধ্বংস চলছে না। সেইজন্তই কোন লেখকের সাহিত্য-কর্ম পড়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে অহুমান ও অহুভব করা যায়। সমস্ত রকম সাহিত্যিকের মধ্যে নাটকের ক্ষেত্রে লেখক

নিজেকে সবচেয়ে বেশী প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেন। তথাপি লেখকপীয়রের নাটকসমূহ পড়ে তাঁর মানস-লোক কেমন ছিল তা অনুমান করা যায়, এবং সমালোচকেরা সে চেষ্টা করেছেন।

কাজেই প্রকৃত কল্যাণধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি কবার জন্য উন্নত ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়। ভাষার উপর কিছু দখল থাকলেই বা পর্যবেক্ষণেব ব্যাপারে একটু তির্যক ভঙ্গীর অধিকারী হলেই, চমকপ্রদ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি কবতে হলে লেখককে মহৎ ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হবে। আজগঠনের দিকে নজর দিলে সেটা হয়তো অসম্ভব প্রয়াস নয়।

লেখকের মন এক বিচিত্র ক্ষেত্র। সাধারণ মানুষের মন বাস্তবের অধিকাংশ ঘটনার প্রতিই নিষ্ক্রিয় থাকে, এই নিষ্ক্রিয়তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর আত্মরক্ষার বর্ম। কিন্তু লেখকের মন অনেক বেশী সংবেদনশীল বলে বাস্তবের বহু ঘটনা তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার ফলে লেখকের মনে ভাল মন্দ নানারকম প্রবণতার জন্ম হয়, এবং সেইজন্যই তিনি অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে নানা জাতিতে চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন। এই যে বহুবিচিত্র এবং অনেক সময় পরস্পর-বিপরীত প্রবণতার জন্ম হয় লেখক-মানসে, তার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করা, বহুত্বের মধ্যে একত্ব সম্পাদন করা, সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব গঠন করাও জ্ঞান-আবশ্যক। যিনি নিজের ব্যক্তিত্বে এই সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছেন, যার মন অনেক ব্যক্তিত্বের সমষ্টি নয়, একটি সামগ্রিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে, সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁরই অধিকার সর্বাধিক।

আমাদের দেশে পূর্ববর্তী যুগসমূহে ব্যক্তিত্বে এই সামগ্রিকতা অর্জনের একটা স্বাভাবিক প্রয়াস ছিল। তার ফলে সেকালের অনেক লেখকের বচনাতেই আমরা

হয়তো দুর্বল উৎকর্ষের পবিচয় পাই না, কিন্তু এক কল্যাণধর্মী প্রদর্শন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। তা'র মধ্যে সাহিত্যগুণের স্বল্পতা থাকলেও এক পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য আমাদের মনকে তৃপ্তি দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক বা কালিদাস রায়ের নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁরা আজও জীবিত আছেন; কিন্তু তাঁরা একালের লোক নয়। যে কোন মানুষ তাঁদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাতে একটুও ইতস্ততঃ বোধ কববেন না। পক্ষান্তরে একালের লেখকদের মধ্যে যারা ধুবন্ধর, তাঁদের কারও কারও রচনায় শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু জীবন সম্পর্কে তাঁদের কোন সামগ্রিক পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয় নি। তাঁদের রচনায় সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সৌন্দর্য খণ্ডিত। আমরা অনুভব করি যে এ প্রতিভা খণ্ডিত, এ লেখকের ব্যক্তিত্বে উচ্চতর এবং নিম্নতর প্রবণতাগুলির মধ্যে higher synthesis সংঘটিত হয় নি।

তার কারণ আধুনিক লেখকদের মন বহির্জগতের দিকে প্রসারিত, আপন অন্তরের দিকে নয়। কিন্তু বহির্জগৎ আমাদের কাছে যত গুরুত্বপূর্ণ হোক, সেই জগৎকে কল্যাণের দৃষ্টিতে দেখার জন্য যে মন দবকার, সেই মনকে স্থগিত করার প্রয়োজনীয়তাকে কি অস্বীকার করা যায়?

কিন্তু আমি বোধ করি এ সব নিতান্তই অবাস্তব কথা বলছি। এই আলোচনায় আমাব ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যের বাজারে কী করে 'করে খাওয়া' যায় সে সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ সাহিত্যিকদের কিছু বাস্তব পরামর্শ দেওয়া। সে উদ্দেশ্য থেকে আমি অনেক দূরে সরে এসেছি, এত দূর সরে এসেছি যে এখন আর সে আলোচনায় ফিরে যাওয়া যায় না। তার চেয়ে অক্ষমতার জটিল স্বীকার করে মানে মানে বিদায় নেওয়াই ভাল।

সুনয়না

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনয়না মেয়ে দেখেছিল চেয়ে আমার পানে—কবে কে জানে ?
সে কি এ জীবনে ? সে কি জীবনের ওপারে ?
কোথা দেখেছিল নাহি মনে অপকৃপাবে ;
শুধু মনে পড়ে শুচি হৃদয় তাব সোহাগস্নানে—নিশাবদানে ।
মনে নাহি মুখ, মনে নাহি দেহ, শুধু আছে মনে কি অতল স্নেহ
টেনেছিল মোরে অতুল আঁখির আকুল টানে—অকুল পানে ।

মাষাময়ী মেয়ে স্নানমুখে চেয়ে গিয়াছে সরি—হৃদয় হবি ।
কি আশা লয়ে সে এসেছিল কাছে জানি নি,
কি ব্যথা পেয়ে যে গেল চলি অভিমানিনী ।
শুধু মমতার মধুবিষে মম মনোগাগবি—গেছে সে ভবি ।
না বুঝিয়া যাবে দিই নাই মান আজি তারি তরে কাদিছে পরাণ,
অহুশোচনায় আঁখিজল তাই পড়িছে ঝরি—তাহাবে স্মরি ।

প্রেমস্রী আগাব স্বপনে এসেছে, গিয়াছে চলি—কথা না বলি ।
কবে বুঝি কোন্ সজল আঁধার-দিবসে
এসেছিল সাজি সাজে নবঘন-নিভ সে,
স্বপ্নে তাহার স্মরিছে আলোর কমলকলি—তিমির দলি ।
কণ্টকবনে ঘিরি চারিধাব, আজি কোথা রাজে কেতকী আমার ?
লক্ষ্মীশায়িত কোন্ সে পাথারতল উজলি—কে দিবে বলি ?

দিনশেষে যবে পল্লিছব দূর পথের শেষে—অজানা দেশে,
অবশ-শরীর এ পথিকজন লাগিয়া
নিভৃত কুটরে সে কি রবে সেথা জাগিয়া ?
আঁখিতে আমার রাখি আঁখি হাত ধরিবে এসে,—মধুর হেসে ?
সেখা দীপালোকে নিশীথ আধারে নামাইয়া বোঝা তার গৃহদ্বারে
জুড়াব কি হিয়া বৃকে লয়ে তারে ? বধুর বেশে—ধরা দিবে সে ?

কবিদ্বন্দ্বী

জগদীশ
ভট্টাচার্য

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

২ ॥ “সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত” ॥

বীজ-কাব্যগ্রন্থে ‘বীথিকা’র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ হল ‘পত্রপুট’। বচনাকাল ১৩৪২-৪৩ সাল, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩ সালের পঁচিশে বৈশাখ। ‘পত্রপুট’ নামকরণের তাৎপর্য তেবো-সংখ্যক কবিতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবি বলেছেন, “হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে আমার চারদিকে চিবকাল ধরে।” “আমি-বনস্পতিব এরা কিরণ-পিপাসু পল্লব-সুতক।” “এরা মাধুকরী ত্রতীব দল।” “আমি-বনস্পতি” কপকল্পটি স্বভাবতঃই ‘পূববী’র “বনস্পতি” কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেবে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “বিজয়া” প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা করা হয়েছে। ‘পত্রপুটে’ বনস্পতি-চেতনাকে বিশ্লেষণ করে কবি বলেছেন, তাঁর হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট প্রতিদিন আকাশ থেকে ভরে নিয়েছে আলোকের তেজোবস, জীবনের গুণেতম মঞ্জার মধ্যে তাকে কবেছে সঞ্চালিত।

হৃদয়ের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা

ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে

প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,

আত্মনিবেদনের অশ্রুগদগদ আকৃতি থেকে

মাধুর্যের কত স্মৃতিরূপ কত বিশ্বতরূপ

দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ

আমার নাড়ীতে নাড়ীতে।

এবং নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে
প্রাণলীলাব প্রথম ইন্দ্রজাল আদিষুগেব,
অনন্ত পুণ্যতনের আত্মবিল্লাস

নব নব যুগলের মায়ারূপেব মধ্যে।

কবিতাটির উপসংহারে কবি বলেছেন, তাঁর এই পত্রদূত-গুলির সংবাহিত দিনরাত্রির অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয় সঞ্চয় জীবনের অনক্ষ্য গভীরে অথগু ঐক্যে মিলে গিয়েছে তাঁর আত্মরূপে, সে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে। সেই অদ্বিতীয় আত্মরূপের কথাই ‘পত্রপুটে’র কবিতাগুলিতে গুচ্ছন্দে গ্রথিত হয়েছে।

সমগ্রভাবে এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে যে কথা সত্য তাই বিশেষভাবে সত্যত্ব হয়ে উঠেছে পনোবো-সংখ্যক কবিতায়। ‘পত্রপুটে’র এই কবিতাটি [ওরা অন্ত্যজ, ওরা মস্তবর্জিত] কবির অন্তরঙ্গতম আত্মপরিচয়মূলক কবিতাবলীর অন্ততম। এই কবিতায়ই কবি বলেছেন, তাঁর গানেব মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে “সৃষ্টির প্রথম বহস্য,—আলোকের প্রকাশ, আব সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।” এই কবিতায়ই কবি নিজেকে ‘ব্রাত্য’ ও ‘মন্ত্রহীন’ বলে পরিচয় দিয়ে বলেছেন, সকল মন্দিরের বাহিরে তাঁর পূজা সমাপ্ত হল ‘দেবলোক থেকে মানবলোকে, আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে আব মনেব মাছুষে আমার অন্তবতম আনন্দে।’ এই কবিতার প্রথমাংশে বিশ্লেষিত কবির ধর্মচেতনা, অর্থাৎ “আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষ” সম্পর্কে কবির উপলব্ধি, এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। কবিতার শেষাংশে কবি মনেব মাছুষে তাঁর অন্তবতম আনন্দের যে লীলাবহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর

প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবব। কবি বলছেন :

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারী আমাব বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।

এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমাব ছন্দে,
সুখা দিতে আমার স্বপ্নে।

* * *

ভালোবেসেছি তাকে।

সেই ভালোবাসার একটা ধারা

ঘিবেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে

গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।

অল্পবেগের সেই প্রবাহ

বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অম্লচ তটচ্ছায়ায়।

* * *

তুচ্ছতার আবরণে অল্পজ্বল

অতি সাধারণ জ্বী-স্বরূপকে

কখনো কবেছে লালন, কখনো কবেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো বা।

কবিচিত্তে ভালোবাসাব এই রূপ, কবি যাকে বলেছেন
অল্পবেগের প্রবাহ; গ্রামেব চিবপবিচিত অগভীর নদীটুকু
য়ার উপমান, তাব কথা আমরা দশম অধ্যায়ে কবিজ্ঞায়া
প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। প্লেটোর পরিভাষায় তাকে
বলা যাবে কবিজীবনে জৈব এরসের লীলা। এবার কবি-
কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যাবে তাঁর জীবনে দৈব এরসের
লীলারহস্তের স্বরূপ-কথা। কবি বলছেন :

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা

মহাসমুদ্রের বিবর্ত ইঙ্গিতবাহিনী।

মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে

তারি অতল থেকে।

সে এসেছে অপরিমীম ধ্যানরূপে

আমার সর্বদেহে-মনে,

পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।

জ্যেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে

চিরবিবহের প্রদীপশিখা।

অর্থাৎ, ভালোবাসাব এই ধারা মহাসমুদ্রের বিবর্ত ইঙ্গিত-
বাহিনী। অতি-সাধারণ জ্বী-স্বরূপ নয়, মহীয়সী নারী

সমুদ্রসমুদ্রতা লক্ষ্মীর মতই কবিমানসে উদ্ভিত হয়েছে। সে
এসেছে অপরিমীম ধ্যানরূপে, কবির সর্বদেহে-মনে। পূর্ণতর
করেছে কবিকে, কবির বাণীকে। সে প্রেম নিত্যবিরহ-
রূপেই কবিমানসে বর্তমান। কবিচেতনার নিভৃত গভীরে
সে জ্যেলে বেখেছে চিরবিবহের প্রদীপশিখা। নয়নে
চিববিরহের সেই অমৃতবতির আলোকে জিভুবন তন্ময় হয়ে
উঠেছে। কবি বলছেন :

সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,

দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্রাবনে,

সিন্ধুগাছের কাঁপনলাগা পাভাগুলিব থেকে

ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা

তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতবাংকুত সুর।

দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে

নানা রঙেব ওড়না-বদল-করা তার নাচ

ছায়ায় আলোয়।

এ স্তবকে সৌন্দর্যলক্ষ্মীরূপেই কবিমানসীর আবির্ভাব।
বিশ্বসৌন্দর্যেব মধ্যে—অসীম শ্রীলোকে—বিচিত্ররূপিণী
মানসলক্ষ্মীকেই কবি প্রত্যক্ষ কবেছেন। কিন্তু এখানেই
তাঁর বিবর্তন শেষ হয়ে যায় নি। তৃতীয় স্তবে তাঁর
প্রকাশ জীবনদেবতারই রূপ নিয়ে। কবি বলছেন :

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে

ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে,

দেখেছি স্তম্ভের যখন অবমানিত

কদর্য কঠোবের অশুচি স্পর্শে

তখন সেই রুদ্রাঙ্গীর তৃতীয় নেত্র থেকে

বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,

ধ্বংস করেছে মহামারীব গোপন আশ্রয়।

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে বিধাতার বামপাশে ষাঁর স্থান
তিনি আনন্দস্বরূপেরই হ্লাদিনী শক্তি। প্রলয়ের দিনে
তাঁর রূপান্তর হয় মহেশ্বরের মহাশক্তি রূপে। তখন সেই
রুদ্রাঙ্গীর তৃতীয় নেত্র থেকে বিচ্ছুরিত হয় প্রলয়-অগ্নি।
বলাই বাহুল্য, এই শেষ পর্বায়ে কবিচেতনা চণ্ডীদাসেরই
প্রেমচেতনার সহোদর। বৈষ্ণব কবিসাধক তাঁব সাধন-
সঙ্গিনীকে ডেকে বলেছিলেন, “তুমি বেদবাদিনী, হরের
ঘরগী, তুমি সে নয়নের তারা।” রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষের
বিশ্লেষণে বলেছেন, “হোক সে নয়নের তাবা তবুও যে নারী

বেদ-বাদিনী, হরের ঘরগী, সে আছে বিরহলোকে ।
সেখানে তাব সঙ্গ নেই, তাব আছে ।”

আলোচ্য কবিতাটি কবিমানসের একটি অপূর্ব সংকেত ।
কবিচিত্তে প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা এবং জীবনদেবতা-
চেতনা যে একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত, এই সত্যই
আমাদের উদ্ধৃত তিনটি শব্দকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু
তার পুঞ্জীভূত আলোচনা কবিমানসীর কাব্যভাষ্য খণ্ডের
অপেক্ষায় থাকবে । এখানে তার দিগ্‌দর্শনীমাত্র ।

২

‘পত্রপুটে’র পাঁচ এবং বারো-সংখ্যক কবিতায়ও
কবিমানসী-কথাই রূপ পেয়েছে । পাঁচ-সংখ্যক কবিতাটি
১৯৩৫ সনের ২৫ অক্টোবর তারিখে লেখা, সাময়িকপত্রে
প্রকাশের সময় নাম ছিল “হাটে” [প্রবাসী, পৌষ
১৩৪২] । একটি “বসন্তবাজের বিহ্বলতা”র কবিচিত্তে
কবিমানসীর আবির্ভাব ঘটেছে । সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অন্তসমুদ্রে সত্য জ্ঞান করে । কবির মনে হল, স্বপ্নের
ধূপ উঠছে নক্ষত্রলোকের দিকে । মায়ারিষ্ট নিবিড়
সেই শুক্লক্ষেপে কবি লাভ কবলেন একটি অভিজ্ঞতা । কবি
বলছেন, “তার নাম করব না, সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে
আসমানি রঙের শাড়ি, খোলা ছাদে গান গাইছে একা ।
আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম পিছনে, ও হয়তো জানে না,
কিংবা হয়তো জানে ।” সিদ্ধু কাকির স্বরে গাওয়া
গানের ভাষা হল :

চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে

ডাকব না ফিবে ডাকব না,

ডাকিনে তো সকালবেলার শুকতারাকে ।—

গান শুনতে শুনতে কবির চোখ থেকে সরে গেল সংসারের
ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা । যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে
ফুটে বেবোল অগোচরের অপক্লপ প্রকাশ । তার লঘু
গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে । অপ্রাপ্তবয়স্ক সে দীর্ঘশ্বাস,
দুরূহ হ্রাশার সে অল্পচারিত ভাষা । কবির মন ডুবে
গেল তাঁব আত্মমানসের অতল গভীরতায় । তিনি বলছেন,
একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র তুলে ধরেছিল বিধেব আবরণ,
বলেছিল,—পৃথিবীর ধূলি মধুময় । সেই মৃত্যু, সেই মধুময়
মৃত্যুই তাঁকে নিয়ে চলল লোকান্তরে গানের পাখায় ।
কবিচেতনা হয়ে উঠল অতীতচারী । তিনি বলছেন :

আমি ওকে দেখলেম,

যেন নিকষবরণ ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে

অরুণবরণ পা-ছুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অঙ্গুরী,

অকূল সরোবরে স্বরের ঢেউ উঠেছে মুহুমুহু,

আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া

ওকে স্পর্শ করছে ঘিরে ঘিরে

আমি ওকে দেখলেম,

যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধু,

আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায়

দেহের সমস্ত শিরা স্পন্দিত ।

আকাশে ধ্রুবতাবার অনিমেষ দৃষ্টি,

বাতাসে সাহানা রাগিণী বক্রণা ।

আমি ওকে দেখলেম,

ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে

চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায় ।

সে যুগের পালালো বাণী ধরবে বলে

ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,

স্বরের ছোঁয়া দিয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরছে

হারানো পরিচয়কে ।

এখানে কবির চোখে চির-অভূতপূর্বই ব্যঞ্জনা । তাই
উৎপ্রেক্ষার মালা গঁথে তিনি তাকে দেখছেন, যেন
নিকষবরণ ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে অরুণবরণ পা-ছুখানি
ডুবিয়ে বসে আছে অঙ্গুরী, যেন সে আলো-নেবা বাসরঘরে
নববধু, যেন সে ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে চেনা-অচেনার
অস্পষ্টতায় । উৎপ্রেক্ষার এই বিভ্রান্তির ফলেই কবিচিত্তেও
অতীত-বর্তমানের ভেদরেখা মুছে গেল । কিন্তু স্বপ্নের
সঙ্গে বাস্তবের ঘটল অমিল । মধুময়ের উপর পডল
ধূলায় আবরণ । পরদিন ছিল হাটবাস । দিনের রৌদ্রের
স্পষ্ট আলোয় বিগত বসন্তবাজের বিহ্বলতা গেছে হারিয়ে ।
কবি তাঁর জানলায় বসে দেখলেন হাটের পাশে অশখ-
তলায় বসে অন্ধ বৈরাগী হাঁড়ি বাজিয়ে গান গাইছে :

কাল আসব বলে চলে গেল,

আমি যে সেই কালের নিকে তাকিয়ে আছি ।

কবির মনে হল হাটের কেনাবেচাব বিচিত্র গোলমালের
জমিনে ওই স্বরের শিল্পে বুনে উঠছে যেন সমস্ত বিশ্বের

একটা উৎকর্ষার মন্তব্য—“তাকিয়ে আছি।” কবি তারই স্বরে ফিবে পেলেন তাঁর বেদমন্তের ছন্দকে, তাঁর মন বললে, মধুময় এই পার্থিব ধূলি। হাটের ভিড়ে তাঁর চোখে পড়ল একজন একেলে বাউলকে। তালি-দেওয়া আলখাল্লার উপরে কোমবে-বাঁধা একটা বাঁয়া। লোক জমেছে চারিদিকে। কবি দেখলেন অদ্ভুতবশু সঙ্গতি আছে এইখানে, এও এসেছে হাটের ছবি ভয়তি কবতে। কবি ওকে ডেকে নিলেন তাঁর জানলার কাছে। ও গাইতে লাগল :

হাট কবতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,

সবাই ধরে টানে আমায় এই যে গো এইখানে।

বলাই বাহুল্য, তিনটি গানের তিনটি কলি দিয়ে কবি এই কবিতার মূল সুরটি ফুটিয়ে তুলেছেন। “হাটে” নামকরণের তাৎপর্যটি তাব মধ্যেই ধরা পড়েছে। ‘বলাকা’র “সাজাহান” কবিতায় কবি হাটের রূপকল্প ব্যবহার করেই বলেছিলেন, এক হাটে বোঝা নিয়ে অজ্ঞ হাটে তা শৃঙ্খ করে হৃদয়ের সঙ্কমকে পথপ্রান্তে ফেলে দিয়েই সংসার থেকে মানুষকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। বাউলের গানে বলছে, অধরার সন্ধানেই সে এসেছে হাট করতে, কিন্তু এইখানে সবাই ধরে তাকে টানে। ১৩৪২ সালের পঁচিশে বৈশাখে কবি তাঁর আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে ‘শেষ সপ্তকে’ব তেতাল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় বলেছিলেন, তাঁর তরুণ যৌবনের বাউল একতার্রাতে সুর বেঁধে নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে অনির্দেশ্য বেদনায় খেপা স্ববে ডেকে বেড়িয়েছে। সেই শুনে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল, তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কোনো কোনো দূতীকে পলাশবনের রংমাতাল ছায়াপথে কাজ-ভোলানো সকাল ঝিকালে। একেলে বাউলের গানে কবিচেতনার সেই উপলব্ধিই ভাষা পেল নূতন গানের ছন্দে।

৩

‘পত্রপুটে’র বাবো-সংখ্যক কবিভাটি ১৩৪৩ সালের প্রয়া বৈশাখ তারিখে লেখা। সাময়িকপত্রে প্রকাশকালে প্রথম পংক্তি অসুসাবেই এর নামকরণ হয়েছিল “বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে।” এই কবিতাব পূর্বাংশে হাটের রূপকল্পটি ব্যবহার করে কবি বলছেন :

কতদিন যখন মূল্য ছিল হাতে

হাট জমেনি তখনো,

বোঝাই নৌকো লাগল যখন ডাঙায়

তখন ঘণ্টা গিয়েছে বেজে,

ফুরিয়েছে বেচাকেনার গ্রহর।

অন্তবে অচরিতার্থতার এই ক্ষোভ নিয়ে জীবনের অপরাহ্নে পাবের খেয়াঘাটের শেষধাপের কাছটাতে বসে কবি স্রবণ করছেন তাঁর প্রভাতলগ্নকে। বলছেন : •

অকালবসন্তে জেগেছিল ভোরের কোকিল,

সেদিন তাব চড়িয়েছি সেতাবে,

গানে বসিয়েছি সুর।

যাকে শোনাব তার চুল যখন হল বাঁধা,

বুকে উঠল জাফরানি রঙের আঁচল

তখন ঝিকিমিকি বেলা,

করণ ক্রান্তি লেগেছে মূলতানে।

ক্রমে ধূসর আলোর উপরে কালো মরচে পড়ে এল।

খেমে-বাওয়া গানখানি নিভে-বাওয়া প্রদীপের

ভেলাব মতো

ডুবল বুঝি কোন্ একজনের মনের তলায়,

উঠল বুঝি তার দীর্ঘনিশ্বাস,

কিন্তু জ্বালানো হল না আলো।

কবি বলছেন, এ নিয়ে আজ কোনো নালিশ নেই তাঁর মনে। বিবহেব কালোগুহা ক্ষুধিত গহবর থেকে ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত স্রবেব ঝবনা রাজিদিন। তারই ফলে :

সাত রঙের ছটা খেলেছে তার নাচের উড়নিতে

সারাদিনের স্বর্ষালোকে,

নিশীথরাজের জপমন্ত্র ছন্দ পেয়েছে

তার তিমিরপুঞ্জ কলোচ্ছল ধারায়।

আমার তপ্ত মধ্যাহ্নের শূন্যতা থেকে উচ্ছ্বসিত

গৌড়-সাবণের আলাপ।

এই প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই কবির বঞ্চিত জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে। কবি বলছেন, নিঃশেষ হয়ে এল তার দুঃখের সঞ্চয় মৃত্যুর অর্য্যপাত্রে। কিন্তু তার দক্ষিণা বয়ে গেল কালের বেদিপ্রান্তে।

৪

‘পত্রপুটে’র পরবর্তী গ্রন্থ ‘শ্রামলী’। গ্রন্থাকারে ১৩৪৩ সালের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত। কবিতাগুলি লেখা ১৯৩৬ সনের ২৩ মে থেকে ৬ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ ১৩৪৩

সালেব জৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণে। ‘শ্রামলী’র প্রথম কবিতা “তুমি”র মধ্যে প্রেমের তুমি-আমি চেতনাই ভাষা পেয়েছে। কবি বলছেন, আমি তোমার কারিগরের দোসব। একদিন আপন সহজ নিবালয় তুমি ছিলে অথরা, ছিলে তুমি একলা বিধাতার, একের মধ্যে একঘরে। আমি বেঁধেছি তোমাকে দুইয়েব গ্রন্থিতে। তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আমাতে, তোমার বেদনায় আর আমাব বেদনায়। এখানে কবির প্রেমচেতনায় তাঁর যে দোসর “তুমি”-রূপে দেখা দিয়েছে তাব মূলে যে ব্যক্তি-রূপই থাক না কেন, নিবিশেষ নৈব্যক্তিকতার স্তরে তাঁর ব্যক্তিপবিচ্ছেদ হয়েছে বিগলিত। কিন্তু ‘শ্রামলী’র “বিদায়-বরণ” এবং “মিলভাঙা” কবিতা দুটিতে নতুন বোঁঠানের প্রকাশ স্পষ্ট।

“বিদায়-বরণ” কবিতাটি লেখা তেমনা জুন, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের তৃতীয় সপ্তাহের শেষদিকে। আগের দিন সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, বর্ষা-প্রকৃতি হয়েছে বিরহ-চেতনার যোগ্য উদ্ভাপক। চাবপহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভাবি হাওয়ায় থমকে আছে সকালবেলাটা। রাতজাগাব ভারে যেন মুদে এসেছে মলিন আকাশেব চোখের পাতা। বাদলার পিছল পথে পা টিপে চলেছে প্রহরগুলো। কবির মনের আকাশেও যত-সব ভাবনার আবছায়া ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে হালকা বেদনার বঙ মেলে দিয়ে। কবি বলছেন :

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
ষত-কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে হয়ে যাওয়া গন্ধ,
কথা হারিয়ে যাওয়া গান,
তাপহাবা স্মৃতি-বিশ্মৃতির ধূপছায়া—
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপবা অভিমানিনী।

শেষেব চিত্রটিতে ভাবনার আবছায়া একটি স্পষ্ট রূপ নিয়ে ভেসে উঠেছে। একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি—যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী। কবির মন বলে উঠল, “ডাকো ডাকো, ঐ ভেসে-যাওয়া পারের খেয়াব আবোহিবী, ওকে একবাব ডাকো ফিরে। দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধবো ওর মুখেব দিকে ; কবো ওকে বিদায়-বরণ।”

কবিতাটির শিরোনামার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে—“বিদায়-বরণ”। ওর মধ্যে বাঙালী জীবনচর্চাব যে ভাবানুশঙ্গগুলি জড়িয়ে আছে তাব বিচিত্র ব্যঞ্জনা ওই নামকবণটিতে পুঞ্জীভূত। আর বরণের ভাষাটিও যেন কবিকণ্ঠে স্বগতোচ্চারিত মন্ত্র। ঘোমটাপরা অভিমানিনীর মুখের দিকে দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরে অল্পবক্ত কবি বলেছেন :

তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেডায়
বসন্তের ফুলফোটা আব ফুলঝরার ফাঁকে।
তোমাব ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনার
রক্তের বাঙা বঙে।

তুমি সত্য, তুমি মধুর—এ চেতনা নতন নয়, এ স্বকৃতি কবিকণ্ঠ থেকে বারবার উচ্চারিত হয়েছে ; বসন্তেব ফুলফোটা আর ফুলঝরার ফাঁকে তোমারই বেদনা লুকিয়ে বেডায়, এ কথাও পুনঃপুনঃ উচ্চারিত। কিন্তু শেষ বাক্যটিতে কবির উপলব্ধি নতন স্তরে উপনীত হল : “তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি সবখানেই, নীলে সবুজে সোনার, রক্তের বাঙা বঙে।” ‘বলাকা’র “ছবি” কবিতায় কবি বলেছিলেন, “নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই, আজি তাই শ্রামলে শ্রামল তুমি নীলিয়ায় নীল, আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।” এখানে কবি বললেন নীলে সবুজে সোনার বিশ্বভূবনের সর্বত্রই তোমার লিপিখানি, কিন্তু শুধু বহির্ভূবনেই নয়, আমার বস্তুর বাঙা বঙেও রয়েছে তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের ওই লিপিখানি। এই বাণীচিত্র চিত্রশিল্পী ববীন্দ্রনাথের উপলব্ধির এক অভিনব শিল্পরূপ !

৫

‘শ্রামলী’র “মিলভাঙা” কবিতাটিতে কবিচিত্তের অন্তরঙ্গ কথাটি যেমন কুঠাঠান তেমনি বেদনামধুর। ‘শেষ সপ্তকে’র তেতাল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় কবিব যে আত্মপরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, ‘শ্রামলী’র “মিলভাঙা” যেন তাবই পুনশ্চ-ভাষণ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি প্ল্যাফেট-যোগে কবি তাঁর নতুন বোঁঠানের সঙ্গে যেন মুখোমুখি বসে কথা বলছেন। “মিলভাঙা” কবিতাটিতেও দুজনে মুখোমুখি বসে কথা বলাব ভঙ্গিটি অনুসৃত হয়েছে। কবি বলছেন, “এসেছিলে কাঁচা জীবনের পেলব রূপটি নিয়ে। এনেছিলে আমার হৃদয়ের প্রথম বিশ্বাস, বক্তে প্রথম কোটালেব বান। মনেব মধ্যে তখনও অসংশয় হয় নি পাখির কাকলি, বনের মর্মব একবাব জাগে, একবার যায় মিলিয়ে।” অক্ষুট অল্পবাক্যের সেই প্রথম অনতিব্যক্ত রূপটিকে একটি অনবচ্ছ উপমানের সাহায্যে প্রকাশ করে কবি বলছেন :

আধোচেনার ভালোবাসার মাধুরী
ছিল যেন ভোরবেলাকার
কালো ঘোমটায় স্বপ্ন সোনার কাজ—
গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ।

আধোচেনার ভালোবাসার মাধুরী অত কোনো উপমায়

সার্থকতাব ভাবে উপমিত হতে পারত না, এ যেন গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ! তারপর নিযত উপচায়মান অহুরাগের কাহিনী বর্ণনা করে কবি বলছেন, “বহুলোকের সংসারের মাঝখানে চুপিচুপি তৈরি হতে লাগল আমাদের দুজনের নিভৃত জগৎ। পাখি যেমন প্রতিদিন খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য, চলতি মুহূর্তের ধসে-পড়া উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা। তার মূল্য তার বস্তুতে ছিল না, ছিল তার রচনায়।”

তাবপব কবিজীবনের প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে একদিন এল তাঁর বিদায় নেবার মুহূর্ত। নৌকো-বাওয়ার বারবার-ব্যবহৃত উপমানের সাহায্যে কবি বললেন, “শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে কখন একলা গেছ খেমে। আমি ভেসে চলেছি শ্রোতে, তুমি বসে রইলে ওপারের ডাঙায়। মিলল না আর আমার হাতে তোমার হাতে, কাজে কিংবা খেলায়। জোড় ভেঙে ভাঙল আমাদের জীবনের গাঁথনি।” জীবনের সেই স্মৃতি শ্রামল দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে কবি ‘শেষ সপ্তকে’ বলেছিলেন :

সে-কয়দিনের জন্মদিন

একটা ঘোপ,

কিছুকাল ছিল আলোতে,

কালসমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে। ৪৩ ॥

সেই রূপকল্পটিকেই পূর্ণতর করে এখানে বলছেন :

যে-ঘোপের শ্রামল ছবিখানি সত্তা আঁকা পড়েছে

সমুদ্রের লীলাচঞ্চল তরঙ্গপটে

তাকে যেমন দেয় মুছে

এক জোড়াবের তুমুল তুফানে,

তেমনি মিলিয়ে গেল আমাদের কাঁচা জগৎ

স্বপ্নদুঃখের নতুন-অজু-মেল।

শ্রামল রূপ নিয়ে।

কবি বলছেন, “তারপরে অনেক দিন গেছে কেটে। আষাঢ়ের আগস্রবর্ষণ সন্ধ্যায় যখন তোমাকে দেখি মনে মনে, দেখতে পাই তুমি আছ সেদিনকাল কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।...সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়, প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।”

কিন্তু কবির জীবনধারা তো কোথাও খেমে বইল না। দুর্গমের মধ্যে, গভীরের মধ্যে, মন্দভালোর দন্দবিবোধে, চিন্তায় সাধনায় আকাজ্জক্য কবি চলে এসেছেন তাঁর অর্ধাৎ নতুন বোঁঠানের জ্ঞান সীমার বহুদূর বাইরে। সেখানে তাঁর কাছে তিনি ‘বিদেশী’। কবি তাই বলছেন, “সেই তুমি আজ এই মেঘ-ডাকা সন্ধ্যায় যদি এসে বস আমার সামনে, দেখতে পাবে আমার চোখে দিক্‌হারানো

চাহনি অজানা আকাশের সমুদ্রপারে নীল অরণ্যের পথে।”

কবির চোখে এই দিক্‌হারানো চাহনি কার সন্ধানে অজানা আকাশের সমুদ্রপারে নীল অরণ্যের পথে যুরে বেড়াচ্ছে? তিনি বলছেন, “তুমি কি পাশে বসে শোনাতে সেদিনকাল কানে কানে কথার উদ্ভৃতি?” সেই কানে কানে কথার উদ্ভৃতি নতুন করে শোনাবার জন্তে কবির এই ব্যাকুলতা তাঁর অন্তরের স্থিতিভূত বাসনাবই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। শুধু তাই নয়, সেদিনকাল সেই অল্পভূতির মধ্যেই যে জীবনের পবন সার্থকতা লুকিয়ে আছে! কবির কুণ্ঠাহীন ভাষাতেই অভিব্যক্ত হয়েছে তার অকপট স্বীকৃতি। তিনি বলছেন :

সেদিন আমার সব মন

মিলেছিল তোমার সব মনে,

তাই প্রকাশ পেয়েছে নতুন গান

প্রথম সৃষ্টির আনন্দে।

মনে হয়েছে,

বহুগুণের আশা মিটল তোমাতে আমাতে।

সেদিন প্রতিদিনই বয়ে এনেছে

নতুন আলোর আগমনী

আদিকালে সত্তা-চোখ-মেলা তাবার মতো।

কিন্তু কবিজীবনের সেই দিনগুলিকে অবশেষে একদিন বিদায় দিতে হল। সেদিনকার কবিকিশোর যে-একতারায় স্থব সেধেছিলেন একে একে তাতে চড়িয়ে দিতে হল তারের পব নতুন তার। জীবনের বহুদূর পথ দিয়ে তরঙ্গমস্তিত জনসমুদ্রতীরে পৌঁছে তাঁর সহস্রতন্ত্রী সেতার-যন্ত্রে বেজে উঠল বিচিত্র বিশ্বজীবনের মহাসংগীত। কিন্তু কবির মন আজও ডুবে আছে তাঁর হৃদয়ের প্রথম বিশ্বয়-সৃষ্টি-করা তরুণ অহুরাগের আধোচেনা মাধুরীর স্বপ্নে। তাই তিনি বলছেন :

তবু জল আসে চোখে।

এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের

প্রথম দরদ,

এর মধ্যে আছে তার জাহ্ন।

এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে

কিশোর-বয়সেব শ্রামল পাবের থেকে,

এর মধ্যে আছে তার বেগ।

আজ মাঝনদীতে সারিগান বাঁধব যখন

তোমার নাম পড়বে বাঁধা

তার হঠাৎ তানে।

[ক্রমশঃ]

জুয়াড়ী

অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

কানীমিস্তিরের ঘাট। শ্রশান। দিনরাত শবের আনা-গোনা—শিশু বৃদ্ধ স্ত্রী। নানান জাতের নানান বয়সের। ইহলোকেব কাজ শেষ করে পরপারে যাবার প্রথম প্রয়াস। পাশে গঙ্গা, কলুষহবা। চূপ করে বসেছিলাম গঙ্গাব পারে—ভাবছিলাম মাহুয়ের পরিণতির কথা—ইহলোক পরলোকেব কথা। নিমন্তলা বনেদী—এখানে তাই ভিড কম। তবু যেন বিবাম নেই শবের। একটার পর একটা আসছেই। হঠাৎ একটা শোরগোলে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। একটা শবদেহ আসছিল ঘাটের দিকে। দূর থেকে শোনা গেল তার অশ্রুট আওয়াজ—বল হবি হবিবোল। একটা লোক চিৎকার করে চোঁচাতে লাগল—জনানা! আউর মর্দানা!

জনানা!

পাঁচ রূপয়া!

দশ রূপয়া!

কথাগুলো আশ্চর্য লাগল, অদ্ভুতও বটে, কী ব্যাপার? একসঙ্গে অনেকগুলো লোক বসে নরক গুলজার করছে। অদ্ভুত তাদের বেশবাস—ঘমরাজের গ্রহরী যেন সব। মনে হল সবগুলোই যেন শ্রশানের লোক। শবদাহের কাজ কবে এবা।

শবদেহটাকে নামানো হল ঘাটের কাছে। স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। রোগা পাণ্ডুর চেহারা, চণ্ডা লালপাড় শাড়ি, কয়েকটা চুল কপালে আটকে বয়েছে। পায়ে চণ্ডা কবে আলতা, সীমস্তে সিন্দূর রেখা।

কে একজন বলে উঠল, সতীলক্ষ্মী।

আর একজন বলল, ছোড দে তেবা সতীলক্ষ্মী।

অত দেখাব অবসর নেই যেন লোকগুলোর। একজন

লানন্দে তালি বাজাতে লাগল, আউরত, দে মেরা রূপয়া, মেরা জিত।

ব্যাপারটা আগাগোড়াই হৈয়ালি লাগছিল আমার কাছে। একটু এগিয়ে গেলাম। দলের লোকগুলোর মধ্যে তার দিকে তাকাতেই আতকে উঠলাম, চোখ দুটো জল জল কবছে তার। আগুনের ভাটার মত লাল। চুলগুলো তেলচিটে পড়ে গেছে। অনেকদিন তেলজল পড়ে নি। পরনে একটা ছেঁড়া শার্ট আর ধুতি, রঙ ঠাহর করা মুশকিল।

মুখ থেকে বেরিয়ে এল, হিমাজি!

লোকটা আমাকে ইশারায় চূপ কবতে বলল, তাবপর উঠে এল। আমার মুখের চাবদিকে ওর চোখ দুটো বারকয়েক ঘোরাল, বলল, তুমি স্রশান্ত?

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এখানে কিং করছ হিমাজি ওই লোকগুলোব সঙ্গে?

দেখলেই তো ভায়া কী করছি, আবার প্রশ্ন করছ কেন? কিন্তু তার আগে বল পুলিশ-টুলিস দেখলে নাকি কাছেপিঠে?

না।

যাক, শুনে খুশী ছলাম। মড়ার ওপর বাজি খেলছি ভায়া, মডাকে নিয়ে বাজি লড়ছি। ভোজবাজি নয়—জুয়া। হরিবোল গুঁনেই বলতে হবে পুরুষ না নারী। অদ্ভুত খেলা, না? এই দেখ না সকাল থেকে মাত্র সাত টাকা হয়েছে—এতে কি একটা লোকেব চলে?

তুমি রেস খেলতে এই জানতাম। কিন্তু এই পাশবিক বীভৎসতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে বেখেছ তা তো ভাবতে পারি নি।

আমি কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম হিমাদ্রি রাস্তাকে না মরেই আসতে হবে এই শ্মশানঘাটে? দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, স্মৃশাস্ত! কিন্তু ভাই, বেশ আছি। রেস ছিল ঘোড়ার খেলা। ওতে আনন্দ নেই। এ হল মানুষকে নিয়ে খেলা—মরা মানুষের খেলা, এর জকি স্বয়ং ভগবান—দি অলমাইটি। আর হরিবোল-টরিবোল অনেকদিন সহ্য হয়ে গেছে—ওগুলো এখন ট্রেনেব হুইসিলের মত লাগে। ছেলেবেলায় সাপ খেলাতায় মনে আছে? ভয় শুধু আমার অ্যান্ড মানুষকে। যাক, একটা সিগারেট খাওয়াতে পাব? অনেকদিন ওসব খাই নি। এখানকার লোকগুলোর সঙ্গে মিশতে মিশতে একেবারে এদের মত হয়ে গেছি।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হিমাদ্রি বলল, আত্ম কি করছে?

এম. এ. পাস করে স্কুল-মিসট্রেস হয়েছে।

বউদি, মাসিমা?

ভাল আছে।

সিগারেটটা প্রায় দু টানে শেষ কবল হিমাদ্রি। চোখ দুটো আবার জলজল করে উঠল। বলল, জান স্মৃশাস্ত, এখানে কাপালিকের মত বসে আছি কেন জান? কপালকুণ্ডলাব জন্তে। আমার জীবনেব ওপর সে বাজি ধরেছিল, আমি তার মৃতদেহেব ওপর বাজি ধরব। জানি, সে কিছুদিনের মধ্যেই এখানে আসবে, তারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। আচ্ছা, গুডবাই। এখন কলেরা এপিডেমিক, মহামারী। অত্যা ত্যা আছেই। আমার সময় কোথায় বল! অনেক মড়া আসবে আজ, অনেক বাজি ধরব, বহুত রূপয়া—মানি, সুইটার তান হানি!

পৈশাচিক হাসি হেসে চলে গেল হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি! হিমু! অনেকদিনের কথা—যেন অনেক কালের কথা! মেদিনীপুর কলেজে একসঙ্গে পড়তাম দুজনে। আজ কতদিনের কথা সব। ঝোড়ো হাওয়ার মত দিনগুলো চলে গেছে। ছোটবোন আত্মরই তো বয়স তখন লাগে কি আট। হিমু বাবা ছিলেন নামকরা টেরিস্ট। বাবা কাকা দুজনেই মেদিনীপুর বার্ডহত্যার মামলায় ধরা পড়েছিল। বাবা ছাড়া পেল, কাকাকে

পাঠানো হল বকসারে। বকসার পর্বত আর যেতে হয় নি কাকাকে, মাঝপথেই লাশ পাওয়া গেল। বরে পড়ল একটা হাঙ্গাহানা মুখ তুলে চাইবার আগেই। সেই বংশের ছেলে হিমু। বনে জঙ্গলে কাটিয়েছে অনেক রাত। নাগ-বাঘ যাদের নিত্য সঙ্গী ছিল।

একদিন একটা গোথরো সাপের মুখ হাত দ্বিগুণ চেপে ধরে আত্মকে ভয় দেখিয়েছিল। মা চিংকাব কবে উঠেছিলেন, ছেড়ে দে হিমু, এ যে ভয়ঙ্কর সাপ।

হিমুর জন্ম নেই, বলল, কাল রাতে শালবনীর জঙ্গলে ধরেছি এটাকে। কামড়াতো এসেছিল, ব্যাটা জানে না, আমিও টেরিস্টের বাচ্চা। সাপটাকে ফেলে দিয়ে এসে ঘরের দাওয়ায় ধপাস করে বসে পড়েছিল হিমু: শীগগির কিছু খেতে দিন মাসিমা। হুদিন কিছু খাই নি। বাড়িতে তো যাবাব উপায় নেই। পুলিশে হাট বসিয়েছে।

এই সেই হিমাদ্রি! হিমু। মা ওকে ভালবাসতেন খুব। বাবা সাহস পেতেন না ওকে যবে ঠাই দিতে। বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার। ছাপোষা কেবানী। কখন কী হয়ে যাবে বলা যায় না। বৃটিশেব আমল। পুলিশের কড়া নজর চারদিকে।

হিমু ঠিকই বলত মানুষের জীবনটাই হল জুয়াখেলা। কার ভাগ্যে কী আছে কে বলতে পাবে! কেন বলত হিমু এসব কথা জানি না, তবে হিমুর জীবনেই যে কথাগুলো ফলে যাবে কে জানত! অনেকদিন হিমুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমিও কলেজ ছেড়ে চাকরিতে চুকেছি।

একদিন হিমুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নিউ মার্কেটের সামনে। পাশে একটি সুন্দরী যুবতী। হিমু পরিচয় করিয়ে দিল—রীতা, ওর বাবা আমার বিজনেস পার্টনার। মেয়েটি আমার সঙ্গে আলাপ করতে তেমন গরজ দেখাল না। তবে তাব বেশবাসের উগ্রতাটা ভাল লাগল না। যুদ্ধের সময় একজাতের মেয়েরা নিজেদের যথাসর্ব্ব খুইয়ে আমেরিকানদের সঙ্গে গাড়িতে গাড়িতে ঘুরত, তাদের এ বকম উগ্র বেশবাস কবতে দেখেছিলাম। হিমু চলে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল—মনে হল হিমু সঙ্গে দেখা না হলেই যেন ছিল ভাল। হিমু যেন কাজটা ভাল করছে না। হিমুর বাবার

যথেষ্ট টাকা-পয়সা ছিল। বাবা মারা যাবার পর হিমু তাঁর সম্পত্তির একক অধিকারী হয়েছে। কিন্তু এ ভাবে ও টাকা নষ্ট করবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। কে শুকে এ পথ বাতলে দিল।

পরে জানতে পেরেছিলাম।' যখন জানতে পারলাম সমস্ত ব্যাপারটা তখন হিমু যথাসর্বস্ব খুইয়েছে বেসের মাঠে।

রীতার বাবা হেমন বোস যুদ্ধের ভাগিদে বেশ কিছু টাকা হাত করেছিলেন। তাই দিয়ে একটা বিজনেসও দাঁড় করিয়েছিলেন। টাকাটা অজ্ঞায়ের পথে এসেছিল, চলে যাচ্ছিল অজ্ঞায়ের পথ-ধরেই। পার্টনার বাও দিনরাত শাসাতেন বোসকে। এ ভাবে ক্ষুতিবাজী কবে রেসের মাঠে টাকা ওড়ালে যে বিজনেস চালাতো যায় না রাও সে কথা অনেকবার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন বোসকে। কিন্তু বোসের হুঁশ হয় নি, নেশাটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। দুজনের মধ্যে সংঘর্ষটাও বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল দিন দিন।

বাওয়ের একটা দুর্বলতা ছিল—সে রীতা। হেমনবাবু সেটা জানতেন। বাও পাকা ব্যবসায়ী। ব্যবসা কবতেই বেশ থেকে ছুটে এসেছেন এতদূরে, তবু এটা বুঝতে পেরেছিলেন সমস্ত ব্যবসায়ী কৌশল দিয়ে রীতাকে কোনদিনই ধরা যাবে না। তবু রাও আশা ছাড়েন নি, তাই হেমনবাবুকে অল্প পথে জব্দ কবতে চেয়ে-ছিলেন। সমস্ত ব্যবসারটা নিজের করে নিতে এগুলােন রাও।

হিমু সঙ্গ সেই সময় হেমনবাবুর আলাপ। একদা কি কবিতা মিলন হল দৌছে জানি না, তবে ব্যবসা আর রীতার লোভ দেখিয়ে হিমুর কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছিলেন হেমনবাবু সেটা জানি। বন্ধুত্বটা খুব জমে উঠেছিল দুজনের মধ্যে। হিমু স্থান পেল হেমনবাবুব বাড়িতে। রীতার সঙ্গ তাব ভাল লাগত, বীতার উগ্রতাটা ভাল লাগত না। পছন্দ করত না হিমু, তবু যেন একটা তেজী উত্তেজক নেশার মত তাকে অবশ করে দিতে চাইত, শিথিল হয়ে পড়ত হিমুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নারীর শক্তি অপরিণীম, বীতার শক্তি আরও অপরিণীম, অলজ্জা। পারল না হিমু নিজেকে মুক্ত করতে, ছাড়াতে

পারল না নিজেকে সেই অক্টোপাসেব মোহবন্ধনী থেকে। হিমুর সর্বস্বকে যেন গ্রাস করল বীতা।

হেমনবাবু তখন সর্বস্ব খুইয়েছেন বেসের মাঠে, হিমুকেও সে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। হিমু একদিন আমাকে বলেছিল, সেদিনটা ছিল ১৮ই মার্চ। আমার জীবনের রেড লেটাব ডে। সেদিন যদি হেমনবাবুব সঙ্গে রেসের মাঠে না যেতাম তবে হয়তো ভোঁদের হিমাত্রি মরত না।

হেমনবাবু তাকে বেসের নেশা ধরিয়েছিলেন। রেসের দিনে চঞ্চল হয়ে উঠত হিমুব মন—মবা জ্যোৎস্নায় তাজা হয়ে ওঠে যেমন ডাকাতের বক্ত। বীতা হিমুব মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। হিমু বুঝল রীতা না হলে তাব চলবে না, চলতে পারে না। রীতা! রীতা! হিমু যেন পাগল হয়ে গেল। একদিন সোজা হুজি বলেই ফেলল হিমু, বাড়িতে তো আব ফিবে যাবার উপায় নেই, যা সুনাম ছাড়িয়েছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবই তো তোমার কল্যাণে খুইয়েছি, কদিন আর এ ভাবে সাপ খেলাবে বল? এনগেজমেন্টের দিনটা ঠিক কবে ফেল। বিয়ে করলে লোকেব মুখ কিছুটা অন্ততঃ বন্ধ হবে তো।

তুমি কি ভেবেছ তোমাকে ফাঁকি দেব?

না, তবে—

তবে কি?

আর কতকাল রহিব তোমার পথ চাহি?

এত অবিশ্বাস কর কেন? বাবাকে একটু দাঁড়াতে দাও। দেখছ না রাও কেমন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। চোখ থাকলে দেখতে পেতে বাও আমাদের বাড়িটাও কিনেছে।

চোখ ঠিকই ছিল হিমাত্রির। হেমনবাবু যে আর দাঁড়াতে পারবেন না কোনদিন, রাও যে গাড়িবাড়ি সব কিনে ফেলবে সবই বুঝত হিমু। কিন্তু সবচেয়ে বড় ভয়, সেই সঙ্গে রীতাকেও না কিনে নেয়।

ঠিকই বুঝেছিল হিমাত্রি। রীতা বশ কবতে চাইছে রাওকে—যে কৌশলে সে বশ করেছিল হিমাত্রিকে এক-দিন। প্রথমে বাবার পরামর্শেই গিয়েছিল নিজেদের অংশটা ছাড়িয়ে আনতে। কিন্তু পারল না রীতা। ব্যবসায়ী লোক রাও, আটঘাট বেঁধে কাজ কবাই ওদের স্বভাব।

হিমু সব জানতে পারল। রাও, সে, রীতা—তিনজন ভ্রমী। অনন্তকালের সংগ্রাম। একজনকে হারতে হবেই। কে জিতবে এই জীবন-জুয়াই। দুই পুরুষ এক নারী। এক পুরুষ দুই নারী। অনন্তকালের এই সংগ্রামের আজও মীমাংসা হয় নি। হিমুকে জিততে হবেই। টেরটিস্টেব ছেলে সে। গোথরা সাপটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। বুঁদ হয়ে পড়েছিল সিংহটা আফিমের নেশায়। হঠাৎ যেন জাগল সে। মহারোষে ফেটে পড়ল। জানাতে চাইল তার তেজকে, বিক্রমকে। হিমু বলেছিল বীতাকে সে ভালবাসে। রীতা তাকে ভালবাসে—কিন্তু রীতার ভালবাসার মেঘে নয়। সেটা বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল হিমু। কিন্তু এর আগে একটা ষাটাই করে নেওয়া উচিত। অন্ধকারের মেঘটা সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।

রাওয়ের সঙ্গে সব সময় তোমার কি দ্বন্দ্বকার ?

রেসের মাঠে পড়ে থাকলে কি করে জানবে সব ?

চড়াং করে বক্তৃতা মাধ্যম উঠে গেল হিমু : কী জানাতে চাও তুমি ?

বাড়িটা ঝাঁপা পড়ে আছে রাওয়ের কাছে। সেটা ছাড়াতে হবে।

যিথ্যে কথা। তুমি আজকাল বারে যাচ্ছ। রাতেও মাঝে মাঝে ফের না। কেন এসব কবছ, উত্তর দাও ?

রাতে ঘুমনো ছাড়া আমি ছু ঘণ্টার বেশী বাড়ি থাকি না জান ?

জানি, কিন্তু থাকতে হবে।

কেন ?

তুমি আমার কথা শুনে বাধ্য, আমাকে যখন বিয়ে কববে কথা দিয়েছ।

বিয়ে ? মিনি বেড়াল বানাতে চাও দেখছি ?

এটা কি জান ?

জানি, চাবুক। কয়েকটা কালসিতে দাগ পড়বে মাত্র। কিন্তু রাও কি তোমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছ ?

অনেকটা এগিয়ে গেছে দেখছি।

হ্যাঁ। রাও আমাকে দেশে নিয়ে যেতে চায়।

কী করে সহ্য করবে হিমু এসব। ছেলেবেলায় গোথরা সাপকে মূঠোতে চেপে বাঁধত, আজ একটা সামান্য রাওকে শায়েস্তা কবতে পারবে না। গুলিগোলা নিয়ে কাজ করত বাবা কাকা। হিমু তাদেরই উত্তরাধিকারী। রাওয়েব মত একটা লোককে সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ ? সেই বাতেই বিদায় নিয়েছিল বাও পৃথিবী থেকে। পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করেছিল ব্যাপারটাকে নিয়ে। বীতাকে সন্দেহ করেছিল।

বীতা বলেছিল, না না, জানি না। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কবো না তোমরা, কারও সম্বন্ধে কিছু জানি না।

পুলিসের লোক হিমাত্তির নাম জানতে পারল অনেক পবে। হিমাত্তি তখন ফেরারী আসামী।

কাকা বাবা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বনে-জঙ্গলে কাটিয়েছিলেন অনেকদিন। হিমুকেও তাই করতে হল। এর জন্তে হিমুর দুঃখ নেই, অসুবিধেও নেই। নিজের ভবিষ্যৎ স্নেহেই সে এ কাজ করেছিল।

কিন্তু বনে জঙ্গলে নয়—হিমু থাকবে এই কলকাতারই বুকে। স্বচক্ষে দেখবে রীতার পরিণাম। হিমাত্তি খবর পেয়েছে বোবাজারের একটা ছোট বাড়িতে রীতা আছে। সে আর বাঁচবে না। যত্না হয়েছে তার। ধীরে ধীরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে সে।

রীতা আসবে এই কানীমিত্তিরের ঘাটে। রীতার বাবা-মাকে দাহ করা হয়েছিল এই শ্মশানেই। রীতাকেও দাহ করা হবে এই ঘাটে। পুঞ্জীভূত পাপ আব ক্ষয় রোগের বিভীষিকা কতকগুলো কাঠ আব আগুনের মাঝে পড়ে নিমেষে মিলিয়ে যাবে পঞ্চভূতে। শীর্ণ বিবর্ণ একটি নারীদেহ—তাব পরনে থাকবে না চণ্ডা লালপেড়ে শাড়ি, লীমস্তে একে দেবে না কেউ সিঁদুরের টিপ, সযত্নে পা দুটিতে পরিয়ে দেবে না কেউ অলঙ্কারখা। নিমেষে দেহটা ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে ? ঘাটে আসবার আগে দূর-বহুদূর থেকে হরিবোল শুনেই হিমু বীভৎস চিংকাবে আকাশবাতাস মাতিয়ে তুলবে আর সঙ্গীদের একসঙ্গে ডেকে বলবে, জনানা—জনানা—জরুর আউরত মেরা বাজীমাং—দে মেরা রূপেশা—দশ রূপেশা—

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

থি. মাস্কেটিয়ার্স [দুই]

“My father is a river. Anyone can foul a river.”

—Dumas fils

দুঃসহ আবেগে উন্মথিত, দুর্বীর বেগে অগ্রসর
আলেকজান্দার দুমা বর্ধাবিস্ফারিত দুকূলপ্রাবী
সেই সিন্ধুগামী দ্রুত মহানদী যার দুর্নিবাব বিদ্যুৎগতি
নির্ধারণ অথবা নিবারণ করা নদী থেকে নিরাপদ
দূরে তীবে বসে অসম্ভব। দুমার জীবনকাব্য এবং
তার কাব্যজীবনের গভীরত্বের আন্দাজ ঝাঁঝই পুষ্টিগত
পাণ্ডিত্যের আর গতানুগতিক সমালোচনার প্রচলিত
মাপকাঠির সাহায্যে করতে গেছেন তাঁরাই এর ভাল খুঁজে
পান নি। না পেয়ে সেই অজানা উৎস যেখান থেকে
এই বহুধরার চেয়েও বিপুল, কালের চেয়েও নিববধি,
আকাশের চেয়েও অনেকরঙা বেশী বিচিত্রচিত্র এবং
বিচিত্রতর চবিত্র উৎসারিত হয়েছে তাকেই ঈর্ষায় মদীবর্ণ
আক্রমণে আঘাত কবতে চেয়েছেন। তাঁরা যতবার
হল ফুটিয়েছেন ততবার ফুল ফুটিয়েছেন দুমা—“থি.
মাস্কেটিয়ার্স” আর “কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো”। অসংখ্য
কোটি হলের উত্তরে সেই দুটি আশ্চর্য অনবদ্য অপরূপ
ফুল নিরন্তর করেছে সব সমালোচককে, সমস্ত নিন্দুককে
চিরকালের জন্তে। যে জনপদ কুলপ্রাবিনী নদীর অতলে
জলেব আত্মানে হয়েছে নিশ্চিহ্ন তার দৃষ্টিতে নিন্দিত,
আর নতুন যে চর উঠে এসেছে জলের অতল থেকে
অসীম আকাশের আকুল আত্মানে তাব বাণীতে নন্দিত
নদী দাঁড়ায় নি কারুব কথাতাই। কালের উৎস থেকে
কবে তার যাত্রা আবস্ত কে জানে? কোন্ অনাদিকালের

উদ্দেশ্যে তার এই দ্রুত বেগে এই দুঃসহ আবেগে নিরন্তর
বয়ে যাওয়া কে বলবে?

আলেকজান্দার দুমা সেই নিত্যবহমান মহানদী যার
সম্পর্কে কোনও কটুক্তি তাঁর পুত্রের কানে পৌঁছলেই
তিনি বলতেন ওই উপরে উক্ত: “My father is
a river. Anyone can foul a river!” দুমার
জীবনীকাব ক্রেগ বেল বলছেন: “The metaphor is
expressive, and true. Dumas is a river
which academicians, critics and literary
snobs have been fouling for half a century.
But they have passed, and the river
remains.” [Alexander Dumas: A Biograp-
hy and Study by A. Craig Bell]

দুমার উপস্থিতিতে অবশ্য এই কটুক্তিগুলি উচ্চারিত
হয় নি প্রায়ই। তাঁর অবর্তমানে ছাড়া তাঁর সম্পর্কে
সত্য মিথ্যা কিছু বলবাবই সাহস কেউ কখনও করে নি।
না। একবার করেছিলেন একজন। তাঁর নাম বালজাক।
দুমার নাট্যরচনার খ্যাতি এবং অর্থপ্রাপ্তি দুই-ই গীড়া
দিচ্ছিল বালজাককে যখন অনেকদিন ধরে তখন একদিন
সাহস করেছিলেন বালজাক; দুমার উপস্থিতিতেই দুমাকে
খোঁচাবার দুঃসাহস করেছিলেন তিনি। দুমার সামনা-
সামনি দুমাকে আক্রমণ কববার দুঃসাহস ওই একবার
ছাড়া বালজাকও কখনও করেন নি। কারণ তিনিও
Henley-র মতোই জানতেন যে “He [Dumas]
talked still better than he wrote” ফরাসী
সাহিত্যিকদের কুরুক্ষেত্র Literary Salon-এ কখনও
দুমা আব বালজাকের দেখা হয়ে গেলে হঠাৎ, দুজনেই
দুজনকে এড়িয়ে চলতেন সচেতনভাবেই। কিন্তু একবার
এমনই একটি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারে বালজাক

ছম করে বলে বসলেন দুমার উপস্থিতিতেই; দুমার নাট্যখ্যাতির উজ্জীন ভানাকে একটু ছোট্টে দিতে মস্তব্য করবার দুঃসাহস করলেন এই বলে যে : “When I’m used up I’ll write plays.”, চলে যাচ্ছিলেন দুমা, কথাটা কানে যেতেই ঘুরে দাঁড়ালেন : “Better start now, then.”

অনেকদিন ধরে শ্রাকরার ঠুকঠাকের উত্তরে কামারের এই এক ঘায়ে নীরব বালজাক দুমাকে সামান্যামনি ঘাঁটাঝাট বোকামি আর কখনও করেন নি।

বুদ্ধিমান বালজাক করেন নি বটে কিন্তু দুমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে ছাড়ে নি যারা তারা কেউ, দুমার ব্যক্তিত্বের চন্দ্রালোকে নিশ্চিন্ত নক্ষত্র, অথবা কেউ খত্বোত্ত মাত্র। দুমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের সবচেয়ে সহজ বাস্তব ছিল দুমার শিবায় বহমান নিগ্রো রক্তকে স্মরণ করানোর সকলের সামনে। প্রশংসায় ‘shrug’ করা, নিন্দায় ‘মুহুহাসি’ হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ছিল দুমার স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু সব সময় নয়। কখনও আক্রমণ তার শোভনতার সীমা ছাড়ালে উত্তমতম হতে জানতেন ‘কথা’-শিল্পী আলেকজান্ডার দুমা। একবার, নয়, এরকম ঘটনা দুমার জীবনে; এবং দুমাকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিজেই রক্তাক্ত হবার দুর্ঘটনা যে দুমার খ্যাতি-অখ্যাতি সমসাময়িকদের জীবনে কতবার ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। এমনই একজন, নিজের পূর্বপুরুষের গোঁব-সম্বল এক অখ্যাতি অভিজাতবংশীয় নিজের বংশপরিচয় দিতে গিয়ে, ‘জাম নাহিড়ী বনগ্রামের কি ঘেন হয় গঙ্গাবামের’ কায়দায় আবোলতাবোল বকবার পর্ব, দুমাকে তাঁর নিগ্রো রক্তের কথা স্মরণ করিয়ে সকলের সামনে ছোট্ট করবার কারণে নিরীহ কৌতুহলের ছদ্মবেশ ধবে বলে : “Tell me now about your ‘ancestors.’” “My father” দুমা জবাব দেন তৎক্ষণাৎ, “was a creole, my grandfather was a Negro, and my great-grandfather was a monkey. My family, it seems, began where yours leaves off.”

পূর্বপুরুষের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনবার পর দুমার প্রতিপক্ষের অবস্থা কি হয়েছিল ইতিহাস সে বিষয়ে আজও নীরব; কথা-শিল্পের কুক্লেজে, দুমা জানতেন, তাঁর প্রতিপক্ষরা তাঁর তুলনায় কিছুই নন। সংখ্যায় অক্ষৌহিণী,

আক্রমণে উত্তম সেই প্রতিপক্ষকে মুহূর্তে নিরস্ত করার পক্ষে দুমার এক ভূগীরেই ছিল অসংখ্য বাণ। তাই-বাধ্য না হলে তাঁদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতেন না দুমা শিখণ্ডী সঙ্গে অঙ্গনিষ্ক্ষেপ করে। বেশীর ভাগ সময়েই তাঁর কথাবার্তা ছিল শুধুই মজার, নিছক মজানো ছাড়া তার উদ্দেশ্য ছিল না আর কিছু। বিদ্যেবিবর্ণ ব্যক্তির চেয়ে বর্ণাঢ্য বক্তার প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল অনেক বেশী। এবং তার সবচেয়ে উজ্জল উদাহরণ ওল্ড স্কুলের লেখক Soumet-এর একটি নাটক দেখতে দেখতে দুমার একটি উক্তি। দর্শকসনে নিমিত্ত একজনের দিকে Soumet-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুমা বলেন : “You see Soumet, the effect your plays have !” Soumet সেদিন কিছু বলেন না বটে, কিন্তু পনের দিন দুমার নাটকের অভিনয়রাত্রেও একজনকে ঘুমোতে দেখে উত্তরের ভাষা খুঁজে পান তিনি : “You see, my dear Dumas, one can be put to sleep by your plays too.” চৌটের হাসি Soumet-এর চৌটে মিলিয়ে যাবার আগে আসত দুমার বিখ্যাত সেই প্রত্যুত্তর : “Why, that’s the man who was asleep yesterday and hasn’t wakened up yet !”

এবং আরেকবার। তাঁর নিজের একটি নাটকের প্রথম রজনীর সাফল্যে, আনন্দ গোপনে অনভ্যস্ত, বিনয় প্রকাশে পরাধুত দুমা উচ্ছ্বসিত হাসিতে স্বয়ং অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন মুহূর্তে নিজেকে [“enjoying his success in his usual naïve way, laughing boisterously, rubbing his hands and generally demonstrating his pleasure.”]। না দুমাকে, না তাঁর নাটককে পছন্দ করেন এমন কয়েকজন ছিলেন দুমার বন্ধে। প্রথম রজনীর প্রায় স্থনিশ্চিত সাফল্যে এমনিতেই তাঁদের গৌরবর্ণকে বেগনে করে তুলেছিল ক্রমশঃ। তার ওপর দুমার উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত হাসি তাঁদের ঈর্ষার কাটা ঘায়ে ছিটোচ্ছিল হুন। নিজের স্থিতির অনবত্তায় অন্ধ দুমার চোখ ফোটাণোর চেষ্টায় জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকা বিদ্ধ করেন তাঁদেরই একজন শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে; হাসির কি কারণ জানতে চান তিনি [“...asked him sourly why he was laughing.”]।

দুয়ার নাটকের সাফল্যই যে তাদের দম ফেটে গেলেও হাসতে বাধা দিচ্ছে তা বোঝা মাত্র জলে ওঠে দুয়ার প্রত্যুত্তরেব দীপশিখা বিগুণতর দীপ্তিতে: "Eh, pardieu!" came the retort, "can't you see I am laughing for you."

আজ পর্যন্ত, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে, 'কথা'-শিল্পী দুয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র দুজন; দুজনেই দুয়ার অনেককাল পরের। দুজনের মধ্যে একজন, অস্কার-ওয়াইল্ড; আরেকজন, জর্জ বার্নার্ড শ।

কিন্তু কেবল কি বাইরের লোকের জগ্গেই দুয়ার সুবিখ্যাত bon mot? না। ঘরের লোকের সঙ্গেও সেই এক মটো, সেই আঠারশো চল্লিশ পঞ্চাশ সালেই বিশ্বখ্যাত বাপেব সঙ্গে সেকালে পারীখ্যাত পুত্রের কথার লড়াই সমান মজার, সমান মজানোর। পিতাপুত্র যখন একবার এক সঙ্গে এক যাত্রায় বহির্গত হয়ে বাড়ি-নিবাসে উঠে বাস্তবপ্যাটবা খুলতে গিয়ে দেখেন চাবি ফেলে এসেছেন বাড়িতে তখন দুয়ার উক্তি: "What a couple of fools we are!" শুনে জুনিয়র দুয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মুক্ত কববার অপচেষ্টা: "There's no need to bring us both into it, father" ... এবং সিনিয়র দুয়ার বিরক্তি না করে সংশোধন: "All right then—what a fool you are!"

'প্রি মাস্কটিয়ার্নে'র স্রষ্টা হিসেবে জগদ্বিখ্যাত পিতার সঙ্গে পারীখ্যাত Camille-এর রচয়িতা পুত্রের সম্বন্ধ প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীর মত হয়ে দাঁড়ালেও, একজনের সম্পর্কে অপরজনের মত কেবল ঈর্ষাপ্রসূত ছিল না। পরস্পরকে অতিক্রম করবার দ্বন্দ্ব থেকে জাত এই কথাব লড়াই ছিল পরস্পরের প্রতি তুলনামূলক প্রীতিসম্বন্ধ। দুজনের নামই আলেকজান্ডার হওয়ায় পিতার পরিচয় হয়েছিল Alexander Dumas 'pere বলে; এবং পুত্রের পরিচিতি: Alexander Dumas 'fils। অর্থাৎ সিনিয়র এবং জুনিয়র দুয়া, যথাক্রমে এই দুই ছিল তাঁদের দুজনেরই অদ্বিতীয় পরিচয়। পুত্র সম্পর্কে পিতার উক্তি: "I have raised a child, who has turned out to be a serpent."—এই ঈষৎ উফতার উত্তরে পিতা সম্পর্কে পুত্রের বক্তব্য: "And I have raised

a father who has turned out to be a child." —রাগের নয় অহুরাগের রঙে রঙীন।

কালের বিচার পাণ্টে ষাষ যুগে যুগান্তরে। যে লেখা একদিন জগৎ জয় করে, সে লেখাই পরবর্তীকালের কষ্টিপাথরেই স্বীকার করে পরাজয়। কিন্তু জীবনের লেখায়, পুত্রের কাছে পিতার হার কোনও কালেই পরাজয় নয়; চিরকালের বিচারেই তার চেয়ে বড় জয় আর অসম্ভব!

সূর্যের রঙ সাদা,—সে কেবল আমাদের চর্মচক্ষেই। জ্ঞানচক্ষে তার রঙ সাত। চর্মচক্ষে দুয়ার পরিচয়ও, —দুয়া কথায় ও কলমে সমান তীরন্দাজ, এই কারণে সব্যসাচী, এই মাত্র। কিন্তু মর্মচক্ষে তাঁর পরিচয় কেবল মাত্র তাই নয়, কিছুতেই নয়। অনেক রঙ, সূর্যের সাত রঙের চেয়েও অনেক বেশী রঙ দিয়ে আঁকতে হবে আলেকজান্ডার দুয়ার জীবনবন্ধ। কিন্তু আঁকা যাবে না তবুও। আঁকা যাবে তাঁর মস্তিষ্ক যার চারপাশে জ্যোতি বিকিরণ করছে বুদ্ধির ছটা; সেই ছবিতে দুয়ার হাতে তুলে দেওয়া যাবে ধারাল এক ঐতিহাসিক লেখনী যার ধার তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ, যে অত্যন্ত হালকা বস্তুটি বহন করেছে পৃথিবীর আর মাছুষের বঞ্চনা ও বেদনার সব গুরুভার। তবুও সেই চিত্রে অল্পপস্থিত থাকবে মাছুষের বিচিত্র এক নখর অভিজ্ঞতা যাব অবিনশ্বর নাম আলেকজান্ডার দুয়া। অল্পপস্থিত থাকবেন যে তবুও তার কারণ কোনও রঙ দিয়েই উপস্থিত করা যাবে না দুয়ার রঙীন হৃদয়। মাছুষের তুলিতে রঙের নীমা আছে, কিন্তু দুয়াব হৃদয়ের রঙ যে অসীম।

সেই হৃদয় দুয়ার। সমস্ত বহুধ্বনি দিয়ে যা ধরা যায় না; সমুদ্রের চেয়ে যে অতল; অরণ্যের চেয়ে গভীর গহন। আকাশের চেয়েও যে অসীম সেই হৃদয়ের অধীশ্বর দুয়া। পুরাণের সেই চরিত্র যে সব দান করে, দান কবে দেবার কারণে শব্দাহক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের লজ্জায় মাথা নীচু করে নয়, ভুবনেশ্বর হওয়া সত্ত্বেও দানধর্মের দায়ে যে চণ্ডালের ক্রীতদাস, একমাত্র মৃতদেহ কোড়ে তার বাগীকে চিনতে না পারার জগ্গে শ্মশানেশ্বরের প্রাপ্য দাবি করার মুহূর্তেও সে মাথা উচু করে দাঁড়ায়,—দুয়া সেই পুরাণ-চরিত্র।

আলেকজান্দার দুমার জীবন,—পুরাণ যে কখনও পুরানো হয় না তারই জীবন্ত প্রমাণ।

যখন অফুরন্ত, অজস্র অগুস্তি অর্থ এসেছে দুমার কাছে কেবল তখনই নয়। বিত্তবান যখন তিনি, শুধু তখনই যে চিত্তবান দুমা, তা নয়। বিত্তহীন যখন, যখন নিঃস্ব তখনও হৃদয়বান তিনি। সেই মুহূর্তেও নয় কেবল, সেই মুহূর্তেই আরও বেশী। সেই মুহূর্তেই বিশেষ করে এই চরম নিঃস্বের পবিত্রায় বিশ্বের সবাই। হৃদয়ের বাতায়ন যেমন মুক্ত, বাড়ির দরজাও তেমনই অবাবিত, তেমনই উন্মুক্ত। পবিচিত-অপরিচিত, আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র, স্ত্রী-পুত্র সকলেব জন্তে সব সময় যিনি উন্মুক্ত-দ্বাৰ, যিনি মুক্তহস্ত—তিনিই দুমা। কাব্যজীবনে এবং জীবনকাব্যে এমন উজাড় করে দেবাব ইতিহাস দ্বিতীয় দৃষ্টান্তবহিত। অদ্বিতীয়।

খ্যাতিব স্বর্ণ সূর্য যখন মধ্যগগনে দীপ্তিমান তখন দুমাব দরজায় যারা এসে দাঁড়িয়েছে তারা সবাই খ্যাতিমান নয়, কিন্তু খ্যাত এবং অখ্যাত, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতব মধ্যে দুমাব দরজায় রবিবাসরীয় ভোজে যোগ দেবার জন্তে পার্থক্য ঘটানো অসম্ভব ছিল। কারণ সপ্তাহের অশ্রু ছ দিনেব থেকে দুমা রবিবারকে একটি দল ছাড়া দিনের সম্মান দিতেন। সপ্তাহেব ছ দিন নিমজ্জিত হয়ে আসত তারা দুমাব বাজকীয় ভোজসভায়, রবিবারে আসত তারা নিমজ্জিত ছাড়াই [“Just to vary the custom of the other six days when the friends invited themselves.”]। সেই পরিচিত-অপরিচিতের যজ্ঞশালায় একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্তে যখন কেউ বলত: “Would you be good enough to introduce me to So-and-so?”—তখন বিড়ম্বিত হলেও উত্তর দিতে বিলম্বিত হতেন না দুমা: “Impossible, my dear fellow. I don’t know him myself.” এই ছিল দুমার প্রায় অবধারিত উত্তর এ বকম ক্ষেত্রে।

এ হল দুমা যখন অর্থ ও সামর্থ্যেব শিখরদেশে। দুমা যখন নিজেই প্রায় নিঃস্ব তখনও তফাত নেই একচুল। এবং এ রকম অবস্থায় আলেকজান্দার দুমার চরিত্র জলে উঠেছে মুহূর্তেব মধ্যে, একটি ঘটনায় উজ্জল হয়ে আছে আজও! একজন দুমার কাছে এক সন্তোমৃত বন্ধুর

শেষকৃত্য করবার জন্তে সাহায্য চায় কিছু। ‘কত?’ জিজ্ঞেস করেন দুমা। পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিতে পারলে ভাল হয়, জানায় সেই প্রার্থী। এবং আরও সবিস্তারে জানায় কি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে মবে পড়ে আছে তার বন্ধু—কোর্টের দরিত্র এক পেয়াদা। পেয়াদা শুনেই চমকে ওঠেন দুমা। পেয়াদার স্মৃতি তাঁর জীবনে স্থখকর নয়। ধারে-দেবায় মাথাব চুল বিকোনো মুহূর্ত দুমার জীবনে কম নয় এবং পেয়াদার আক্রমণও সেসব দুঃসময়ে দুমাকে পীড়িত করার কারণে সংখ্যায় বেশীই। ড্রয়ার থেকে দুটি পাঁচ ফ্রাঙ্কের নোট বার কবে বিশ্ববিজয়ী প্রায়-নিঃস্ব তখন বলেন: “Five Francs to bury a bailiff! Here are ten francs Go and bury two.”

এবং মাল্লুষেব বেলাষও নয় কেবল। মল্লুষের প্রতিও এই বিচিত্র মাল্লুষটিব সহানুভূতি সীমাহীন। অসংখ্য পশুপক্ষী পরিবৃত হয়ে প্রাসাদে বাস করছেন তখন দুমা। তখন দুমা এবং তাঁর পশুপক্ষীর তত্ত্বাবধায়ক মিচেলের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা থেকে বোঝা যাবে আলেকজান্দার দুমা মাল্লুষ হিসেবে কি এবং কে?

‘Does monsieur know how many dogs we have here?’

‘No Michel.’

‘Monsieur there are thirteen’...

...‘It is not the animals that will be the ruin of me, Michel; only, for their sake, see that there are not thirteen of them.’

‘Monsieur, I will put one out, then there will be only twelve.’

‘No, Michel, on the contrary, bring another in, then there will be fourteen.’

এই হচ্ছেন দুমা। প্রভুভক্ত কুকুরদেব পৃথিবীতে কুকুরভক্ত এক প্রভু!

যাদের পাণ্ডনা ছিল না দুমার কাছে কাণাকড়িও তাদের হাতে যেমন শেষ ফুটো পয়সাটি পর্যন্ত তুলে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি দুমা, তেমনই যাদের প্রাপ্য ছিল অনেক, দুমা তাদের আশা চূর্ণবিচূর্ণ কবেছেন প্রত্যেকবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নতুন নতুন তামাশায়। এবং দুমার সম্পর্কে এখন যে গল্পটি বলা যাচ্ছে সে একমাত্র আলেকজান্দার দুমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরফ আনতে

গিয়ে এক ভদ্রলোকের ভৃত্য শূন্যহাতে ফিরে এসে জানাল যে বরফওলা জানিয়েছে সব বরফ দুয়ার দ্বারা সংরক্ষিত। ভদ্রলোক তাঁর ভৃত্যকে পবামর্শ দিলেন যে পরের বাব বরফ আনবার সময় সে যেন নিজেকে দুমাব ভৃত্য বলে পরিচয় দেয়। ভৃত্য সেইমত বরফওলাকে বলে এবং ষথারীতি বরফ পায়। বরফ দিয়ে সে দাম কত জিজ্ঞেস করে। এবং তৎক্ষণাৎ বরফওলা কেড়ে নেয় বরফ : “You’re lying. You don’t come from M. Dumasse....M. Dumasse never pays.” [—A. Craig Bell]

ঋণের দায়ে মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে দেওয়া সর্বকালের অধমর্ণদের সর্বত্র যে ছববস্থা তাঁর চেয়ে কম অধম অবস্থা হয় নি দুমাবও; এবং একই কারণে। মূচি এসেছে জুতোর বহুদিন বাকি দামের প্রত্যাশায়। দুমাব তাকে আসল কথা তুলতে দেবাব সময় না দিয়ে আবার বলেন : “You have come just at the right moment, my dear fellow. I want three more pairs of boots.”। তাবপরেও ষখন ভবি ভোলেন না, মূচি জিজ্ঞেস করে : “And my account ?”

দুমাব তৎক্ষণাৎ তাকে নিরস্ত কবেন এই বলে যে : “Of course. We will talk it over after lunch”। লাঞ্চার পর কি হয় দুমাব জীবনীকাবাব ভাষায় তার অনবত্ত চিত্র হচ্ছে এই :

“After lunch, Dumas would give him some flowers to take back to his wife, and some fruit for his children, and invariably slip 20 francs into his hand with the remark : ‘For the railway fare’. There was never any question of settling the account. After several such visits the shoemaker had been paid his bill ten times over, and Dumas still remained his debtor.” [Alexander Dumas : A Biography and Study : A. Craig Bell.]

কিন্তু দেবাব দায়ে দুমাব জড়িয়ে পড়ার, ঋণগ্রস্ত হবার, এর চেয়ে অনেক অনেক রমণীয় কাবণ ছিল। নিজের স্ত্রীকে ভালবাসার শক্তি বিবাহের পব আর কতটুকু অবশিষ্ট ছিল নব নব উত্তেজনাষ্টির বীর্থে বলবান

চিববালক আলেকজান্দার দুমাব, বলা শক্ত। কিন্তু পবস্ত্রীর উপব আসক্ত ছিলেন তিনি ববাবর; অনেক বেশী আসক্ত ছিলেন দুমাব আজীবন। দুমাব জীবনে যাদেব অন্তরঙ্গ অবস্থান সেই সব রমণীবা হলেন : “Adele Dalvin, Catherine Lebay, Melanie Waldor, Bell Krebsamer, Ida. Ferrier : the first his earliest love, the second the mother of Dumas Fils, the third the inspiration of Antony, the fourth the mother of his daughter, the fifth his wife.”। কিন্তু দুমাব জীবনে রমণীব তালিকা এত অল্পে শেষ হবার নয়। আরও অসংখ্য নামগোত্রপরিচয়হীন তরুণী, মহিলা এবং বৃদ্ধার মিজিল দুমাব সমস্ত জীবন জুড়ে এসেছে, গেছে, এবং আবার এসেছে। বারবার গেছে আর এসেছে। তাঁর জীবনচবিতকার স্পষ্টতঃই বলছেন : “The simple fact was that his amoral instincts asserted themselves more and more strongly as he aged He took a mistress ; She was his wife in all but name.....This would go on until there was a quarrel. Perhaps it blew over, perhaps not. In either case the end came just as certainly, late if not soon, since there were no moral ties, no issues at stake to keep them together. It was simply free love. The final quarrel reached, the Queen of the home and heart would disappear, taking all her belongings—generally the greater part of the furniture and knick-knacks—with her.” [A. Craig Bell]

এবং তখন অনেকতব অনাস্টির পর, বিশ্বের বিশ্বয়কর সৃষ্টিব নতুন খেলায় উন্নত দুমাব গলায় শোনা যাবে হ্যত : “Take everything, take everything ! Only leave me my genius !”

আরব্যোপন্যাসের আর এক চরিত্র। অলৌকিক নয়; কিন্তু অলৌকিক।

আরব্যোপন্যাসের এই ‘অলৌকিক নয় কিন্তু অলৌকিক’ চরিত্রের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি লেখার রেখায় রূপ দিতে গিয়ে Tony Johannot একটি অপরূপ অনবত্ত উক্তি করেছেন। “No one will ever make a good

portrait of you,' he declared. 'How hope to draw a likeness of a man who is never like himself two minutes together?'" একথা অতিশয়োক্তি নয় যে তাব প্রমাণ Villemessant-এর Memoires d'un Journaliste : "Never before had we Parisians seen and, I will say, never shall we see for sometime to come, a man who threw such a spell on all around him."

তুমাকে দার্শনিক বলেছে তাঁর সমকালীনরা। মধ্যাহ্ন-সূর্যের দীপ্তিতে যদি সূর্যেব দন্ত, গন্ধে যদি গোলাপের, নৃত্যে যদি ময়ূরব, রামধনুতে যদি আকাশের বজ্রী দন্ত স্থচিত হয় তা হলে তুমি দার্শনিক একথা মিথ্যে নয়।

ভিক্টর হুগোর 'colossal self-conceit' নয়; নয় বালজাকের মজাদোষ, "by every letter and word that he should be taken for a genius." দুরন্ত দন্ত ছিল তুমার তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সে দন্ত, তরঙ্গগর্জন যেমন সমুদ্রকে, সূর্যাস্ত যেমন নগাধিরাজের তুষাবশৃঙ্খকে, বজ্রালোক যেমন ঝড়ের বাতের অভিসারকে, গাণ্ডীব যেমন অর্জুনকে, দাতার আখ্যা যেমন কার্যকে, অমৃত-অস্বীকারী বিষপান যেমন নীলকণ্ঠকে, জাহ্নবী নাম যেমন গঙ্গাকে মানাব তেমনই শুধু তুমিতেই শাজে। তুমার দন্ত ছিল আশাতীত সাফল্যের আনন্দ গোপনে অক্ষম বিস্ময়বিষ্ফারিত বালকের মত : "...a naive revelling in his own powers, a disarming frankness, a belief that all the world was interested in his sayings and doings."

কুইন ভিক্টোঁবিয়া তখন পারীতে। তুমার নাটক দেখেছেন তিনি পারীতে পা দিয়েই, কিন্তু তুমাকে দেখেন নি। তুমি কেন 'কুইন'-এর সঙ্গে 'সাক্ষাৎকার' চান নি জিজ্ঞেস করলে বলেছেন : "Well certainly, that would have been a sight worth seeing—the greatest woman and the greatest man of the epoch together!" এই তুমাই নিজেকে ignorant বলতেন। সেদিনকার বিখ্যাত বাসায়নিক, জে. বি. তুমার পরিচয় ছিল "Dumas the savant"; তুমি তাই বলতেন, "Then I am Dumas the ignorant।"

তুমি নন। তুমাকে যারা বুঝতে পারেন নি তাঁরাই ignorant। বোঝবার কথাও নয় তাঁদের, কারণ আলেকজান্ডার তুমি হচ্ছেন সেই, "force of nature" which broke down all barriers, laughed at all rules, knew no precedent, and created almost by instinct."

প্রজ্ঞাপতিকে কবে বুঝতে পেরেছে রূপণ মোমাছি? সিন্ধুর উদ্দেশে দুর্বীর বেগে অগ্রসর দুরন্ত বর্ষায় বেগবান নদীকে বুঝেছে কবে তরঙ্গশূন্য পুরুবিগী বন্ধ বারি? 'মৃত্যুহীন প্রাণ'-কে স্পর্শ কবতে পেরেছে কবে 'সাবধানী পথিক'?

আর দন্ত বলব কাকে? Amedee Achard তাঁর Belle Rose পড়তে দিয়ে তুমাকে কয়েক দিন পরে জিজ্ঞেস করেছেন, "Well, and did you enjoy my book?" তুমি উত্তর দিয়েছেন : "Rather! it amused me as much as if it were one of my own।"

Rouen-এ তুমার নাটকের ব্যর্থবজ্রনীর শেষে ঈর্ষাকাতর সমালোচক তুমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে লজ্জা দেবার লোভ সংবরণ কবতে পারেন নি। "So they hissed your play at Rouen, it appears" কিন্তু লজ্জা পাবে কে তাতে? তুমি? অসম্ভব! তুমি তৈরীই ছিলেন যেন জবাব দেবার জন্তে : "Why not? Didn't they burn Joan of Arc there?"

এ যদি দন্ত হয়, তা হলে এ দন্তের যথেষ্ট দাম দেওয়া শক্ত। এ অহঙ্কার নয়, অলঙ্কার।

তুমাকে যারা বুঝতে চেয়েছিলেন, বুঝতে পারেন নি, তাঁরা মন্তব্য কবেছিলেন : "You write about events that you have never studied", তুমি জবাব দিয়েছিলেন, "If I had studied events, when should I have found time to write?"

যারা জানে অনেক তারা প্রায়ই লিখতে জানে না; তুমি জানতেন না প্রায় কিছুই, কেবল লিখতে জানতেন আলেকজান্ডার তুমি।

তুমাকে যিনি বুঝতে চান নি কিন্তু ধরতে পেরেছিলেন, সেই Michelet-ই শুধু তুমি সম্বন্ধে বলতে পেরেছেন শেষ কথা একটি চিঠির কয়েকটি অশেষ কথায় : "I love you and I admire you, for you are one of the forces of nature."

কাব্যজীবনে তুমার হৃদয় দোশর ছিলেন—একজন বালজাক, আর একজন হুগো। অবিস্মরণীয়, Pere Goriot, The Three Musketeers, Les Misérables-এর স্ববর্ণীয় স্রষ্টা স্বাধিক্রমে বালজাক, তুমি এবং হুগো কেবল ফরাসী নয়, বিশ্বসাহিত্যের 'তু থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'; কিন্তু জীবনকাব্যে তুমার জুড়ি নেই আজও। বিশ্বসাহিত্যের দুই বিস্ময়, বালজাক এবং হুগো, যুগের মশাল; তুমি শুধু যুগের মশাল নন, আলেকজান্ডার তুমি তাঁর চেয়ে অনেক বেশী। আলেকজান্ডার তুমি হচ্ছেন, চিরযুগের রংমশাল।

[ক্রমশঃ]

বন্দ্যাবী বীক্ষা

মধ্যভারত পর্ব ॥ শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ॥

ছাঙ্কিণ

স্বাধীনতার যুদ্ধে লক্ষ্মীবাদী প্রাণ দিয়েছিলেন। ভারত তার একশো বছর পরে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু কী পেয়েছে এই স্বাধীন ভারতের মানুষ! জনগণ কি আজও কাঁদছে না! কেন কাঁদছে। কিসের অভাব? শূণ্যতাই বা কিসের? আমার পেটের সমস্যা নেই। তবু আমার মন কাঁদে। একা মানুষ বলেই বোধ হয় অভাব নেই। কিন্তু সবাই তো একা নয়। আমিও আর একা থাকতে চাই না।

স্বাতির সঙ্গে মহালক্ষ্মীর মন্দিরের দিকে যেতে যেতে আমি নিজের কথা ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিল, একলা চলার অস্ত্র মানুষের জন্ম হয় নি, কোব প্রাণীয়েই হয় নি, কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। অর্থের প্রয়োজন মানুষকে নিঃসঙ্গ থাকতে প্রবৃত্ত করছে। কিন্তু পৃথিবীর প্রথম মানুষও সেদিন নিঃসঙ্গ থাকতে চাষ নি। নিঃসঙ্গ-জীবন তো বিধাতার অভিশাপ। আজকেব মানুষ এই অভিশাপ নিচ্ছে মাথা পেতে।

প্রভাতের প্রথম রোদ পায়ের নীচে চিক চিক কবছে। বাতাস বইছে অল্প অল্প। দেহ হালকা লাগছে, আর মনের পাখা মুক্ত হয়েছে অনেকক্ষণ। স্বাতি বলল: চলতে চলতেও ভাবছ মনে হচ্ছে।

কিছু ভাবব না, এই কথাই সারাদিন ভাবি।

চমৎকার কথা।

বল, ভাববার কথা।

বেশ বলেছ।

বল, ভাবতে বলছ।

আমি ভাবতে পারব না।

তা হলে তোমায় তপস্বী বলব। স্বাতির তপস্বী।

সে আবার কী?

বললুম: একটা হৈয়ালির কথা।

হৈয়ালি আমি বুঝি নে।

বুঝিয়ে বললেই বুঝবে। আর বুঝতে পারলেই সে আর হৈয়ালি রইল না।

সত্যিই তোমার কথাগুলো আজ হৈয়ালি মনে হচ্ছে। বুদ্ধি দিয়ে যাব নাগাল পাওয়া যায় না, সেই তো হৈয়ালি। সব মহাপুরুষের কথাই আমাদের কাছে হৈয়ালি।

তুমি কি আজকাল নিজেকেও মহাপুরুষ ভাবছ?

ইচ্ছে ছিল কিন্তু পারছি না।

কেন?

পিছনে টান আছে।

তোমার আবার কিসের টান?

নশ্বজের।

খিলখিল করে স্বাতি হেসে উঠল, বলল: বস তা হলে, চলতে চলতে টানাটানি ভাল নয়।

মহালক্ষ্মীর মন্দির?

চল, ওই চৌপাঠাতে বসে বালির মন্দির গড়ি।

বালির মন্দিরের নামে আমার বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল। কিন্তু এই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ যে স্বাতি শুনতে পাবে, সে আশঙ্কা করি নি। প্রশ্ন করল: কী হয়?

আমি সত্যি কথাই বললুম : বালির মন্দির আর কতকাল তৈরি করব ?

স্বাতি হেসে বলল : সমুদ্রের তীরে শুধু বালি আছে, পাথর আছে পাহাডেব ওপরে। এর পরে আমরা পাহাড়ে যাব। হিমালয়ে। হিমালয়ের মন্দির কোনদিন ভাঙে না। মালাবার হিলটা বুঝি পাহাড় নয় ?

পাহাড় হলে সেদিন পালিয়ে আসবে কেন !—বলে স্বাতি হাসতে লাগল।

তা হলে এস, এই বালির ওপরেই বসি।

আমরা চৌপাঠী পৌছে গিয়েছিলুম। আমাদের মত আরও অনেকে এই সুন্দর সকালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করতে বসেছে। বালির উপরে শুয়ে পড়েছে কেউ, কেউ বা ঘনিয়ে বসে গল্প করেছে। কারও মুখে কৌতুকেব হাসি, কারও মুখ থমথম করছে আষাঢ়ের মেঘের মত। আমাদের কি কেউ লক্ষ্য করেছে না।

একটু নিরিবিলা দেখে আমরাও গিয়ে বসে পড়লুম।

বালির মন্দিরের কথা স্বাতি ভুলে যায় নি। লম্বা আঙুল দিয়ে বালি টেনে টেনে এক জায়গায় জড়ো করতে লাগল। আমি তার আঙুলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। মনে পড়ল, দিল্লীতে একদিন সে এই আঙুলে আমাকে সেতার বাজিয়ে শুনিয়েছিল। দূর থেকে শুনেছিলুম।

দিল্লীতে তাদের সরকারী বাড়িতে একখানা সেতার টাঙানো দেখেছিলুম। স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম : কে বাজায় এটা ?

জবাব না দিয়ে স্বাতি একটুখানি হেসেছিল।

বলেছিলুম : তোমারই সম্পত্তি বুঝি ? কিন্তু জানতুম না তো !

সব কথাই যে জানতে হবে, তাব কী মানে আছে !

একসঙ্গে থেকেও জানি না, এইটুকুই আপত্তির বিষয়।

দিনকয়েক একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, সেই কি একসঙ্গে থাকা হল !

বলেছিলুম : তর্ক থাক্, কিছু বাজিয়ে শোনাও।

স্বাতি প্রাণ করেছিল : সঙ্গত করতে পারবে ?

আমার দিক থেকে তার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার বাজনা শুনে চাই।

সঙ্গীত সম্বন্ধে যে তুমি কিছুই জান না, তারই প্রমাণ দিচ্ছ।

তা হয়তো দিচ্ছি। কিন্তু আমার রসবোধ আছে। সেই বোধ সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত না হলেও তা ভেজাল নয়। তোমাব স্বরও তেমনি খাঁটি হলে ঠিক জায়গাতেই আঘাত কববে।

এর উত্তরে স্বাতি বলেছিল : এখন বিকেল, এ সময়েব কোন রাগিণী আমার জানা নেই।

বলেছিলুম : সূর্যাস্তের সময় এসেছে, তার জন্তে অনেক রাগিণী আছে।

ত্রিরাগ আমার ভাল লাগে না।

তবে বসন্তের কোন রাগিণী বাজাও। চৈত্র এখনও শেষ হয় নি।

আমার বসন্ত আজ শেষ হয়ে গেছে। তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না।

এ কথার উত্তর আমি দিতে পারি নি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবে স্বাতি বলেছিল : রাত গভীর হোক, তোমাকে বেহাগ বাজিয়ে শোনাও। সেই আমার মনের স্বর হবে।

রাতে আমি বাইরে গিয়েছিলুম, আর স্বাতি বাজিয়েছিল ঘরের ভিতরে বসে। তারি মিষ্টি হাত, মীড় টেনে টেনে আলাপ করে যাচ্ছিল আপন মনে। কিন্তু বড় করুণ বড় উদাস সেই স্বরটি। এক সময় মনে হয়েছিল, স্বাতি আমার মনের স্বরটি যেন ধরতে পেরেছে। এক মুঠো কাশফুলের মত সেই স্বর ভেসে বেড়াচ্ছিল ছুরন্ত বাতাসে। তার গতিব প্রবাহ ছিল না, স্থিতিও ছিল না, লক্ষ্যহীনভাবে জুটলা পাকাচ্ছিল। একটা শ্রান্ত ওদাস্তে আমাব সারা মন ভরে গিয়েছিল।

স্বাতিকে সেদিন আমি চিনতে পারি নি। তার মনের কথাটি আমার অজানা ছিল। সে চেয়েছিল, মিত্রার অহংকার আমি ভেঙে দিই। কিন্তু তাব পরিণামটুকু কি ভেবে দেখেছিল ! গায়ের জোরে তো অহংকার ভাঙে না। যে জোরে ভাঙে, তাব ক্ষমতা আণবিক। সে প্রেম। যুগে যুগে এই অঙ্গে নারী পুরুষকে জয় করেছে, আর নারীকে পুরুষ। শশঙ্গ মাহুযকে জয় করেছে নিরঙ্গ মাহুয। কোটি কোটি পাণীকে জয় করেছেন এক একজন মহাপুরুষ।

না না, স্বাতি নিশ্চয়ই এ কথা বলে নি। এ কথা সে বলতে পারে না। সে যা বলতে চেয়েছে, তা সে প্রকাশ করতে পারে নি। তার মুখের কথাকে সত্য বলে মেনে নিলে তাকে ভুল বোঝা হবে। সে ভুল বোঝার দিন আমি পেরিয়ে এসেছি।

তান শেষ করে স্বাতি তখন ঝালা ধরেছিল। অত্যন্ত দ্রুত উঠছিল ঝড়ার। মনে হচ্ছিল, নিজেকে আমি যেন হারিয়ে ফেলেছি। আমার চেতনা যেন অবশ হয়ে আসছে। ভুলে গিয়েছিলুম আমার উত্তরপাড়ার ঘর, ভুলে গিয়েছিলুম এলাহাবাদের ঐশ্বর্য আর দিল্লীর দরবার। মিত্রা হারিয়ে গিয়েছিল। জগৎটাকেই যেন আর দেখতে পাচ্ছিলুম না। স্বাতি সেতার বাজাচ্ছিল। আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

সকালবেলায় স্বাতি বলেছিল : কাল বাজনা শুনেছিলে আমার ? বেহাগ বাজিয়েছিলাম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।
বলল : আবার কিছু ভাবছ ?

বললুম : তোমার ওই আঙুলের দিকে তাকিয়ে আমার একটা পুরনো কথা মনে পড়ছে।

কি কথা ?

তোমার সেতার বাজাবার কথা।

স্বাতি যেন চমকে উঠল : সে কথা তোমার মনে আছে ?

আছে বইকি। তুমি সেদিন বেহাগ শুনিয়েছিলে। বসন্তের কোন রাগিণী শোনাতে চাও নি।

স্বাতি ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করল : কেন ?

তুমি ভুলে গেছ ?

স্বাতি বলল না, ভুলে গেছি। মনে আছে, তাও বলল না। শুধু তার নির্বাক দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে ধরল।

বললুম : বলেছিলে, তোমার বসন্ত গেছে শেষ হয়ে, তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

স্বাতির মুখ বুঝি আরক্ত হল, বলল : তুমি অনেক বাজে কথা মনে রাখ।

আমি জানতুম, ও একটা বাজে কথা। বসন্ত এসেছে ধারে। তাকে তুমি গ্রহণ করতে পারছ না।

আঙুল দিয়ে বালির পাহাড়টা স্বাতি সহসা ভেঙে দিল। বলল : দেখলে তো, বসন্তের বাতাসে আমার মন্দিরটা ভেঙে গেল।—বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

স্বাতিকে আজ বড় প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। বলল : সারাদিন আজ আমি এইখানে শুয়ে থাকব।

খিদে পেলে ?

উঠব না।

বালি ভেতে উঠলে ?

উঠব না।

পরক্ষণেই সে উঠে বসল। বলল, একটা কথা জানতে চাইলে তুমি রাগ করবে না ?

খুশী হব।

তোমার ছেলেবেলার কথা বল।

স্বাতি যে এমন একটা প্রশ্ন করে বসবে, এ কথা ভাবতে পারি নি। এর জবাব দেবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সমস্ত প্রশ্নের জবাব যারা তৈরি হয়ে দেন, আমি তাঁদের দলে নই। আমি আমার মানসিক প্রস্তুতির কথা ভাবছি। আমার শৈশবের কথা কোনদিন কেউ জানতে চায় নি, স্বপ্নেও ভাবি নি যে কেউ কোনদিন জানতে চাইবে। সহসা নিজেকে বড় অসহায় মনে হল।

স্বাতি বলল : তুমি তো খুশী হবে বলেছিলে।

খুশী। হ্যাঁ, খুশী হয়েছি বইকি। যে কথা কেউ কোনদিন জানতে চায় নি, সেই কথা আজ তুমি জানতে চাইলে। আমার তো খুশী হবারই কথা।

স্বাতির চোখে আমি একরকমের অদ্ভুত তৃপ্তি দেখলুম। মনে হল আমিও এমনি একটি মুহূর্তের অপেক্ষা করেছি অনেকদিন ধরে, চেয়েছি এমনি একটি মানুষ যে আমার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বেঁধে দেবে স্নেহে ও প্রাণে। জীবনকে আনন্দময় করবে।

স্বাতি বলল : বল।

বললুম : বলব। শৈশবের কথা আমার মনে আছে। মা কোনদিন সে কথা ভুলতে দেন নি। প্রথম যখন কথা কইতে শিখলুম, সেই আধো-আধো গলায় স্নেহ মিলিয়ে স্তোত্র পাঠ করতুম বাবার সঙ্গে। মানে বুঝি নি, কিন্তু মনে গাঁথা হয়ে গেছে। পরে সেই সব স্তোত্রের মানে বুঝলুম রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' পড়ে। রবীন্দ্রনাথ পড়ে যে

উপনিষদে হাতে খড়ি হয়, সে শিক্ষা আমি তাঁর কাছেই পেয়েছিলুম।

তারপর হাতের লেখা লিখতে শুরু করলুম। এক্য বাক্য মাণিক্য নয়, লিখলুম জল পড়ে পাতা নড়ে। লিখলুম, সকালে উঠিমা আমি মনে মনে বলি। লিখলুম, মনে কর বেন বিশেষ ঘুরে। কটা বছর যেতে না যেতেই লিখলুম, এ পাখাব বাণী মিল আনি...পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ। আমার অন্তরেও এল আবেগ। ওড়বার নয়, পড়বার। আমি প্রাণভরে পড়লুম। রবীন্দ্রনাথ শেষ করে মনে হল, আমার সব পড়া হয়ে গেছে। বাবাকে সেই কথা বলতেই তিনি হেসে বললেন, সব মনে রাখতে পারলেই সব পড়া হবে। তাঁর সেই হাসিটি আমার আজও মনে আছে।

বাবা বলতেন রবীন্দ্রনাথ সেই জাতের লেখক, ঠাক পড়লে ছনিয়ার অনেক লেখাপড়া হয়ে যায়। তবু আমি ছনিয়ার অনেক লেখকের লেখা পড়তে চেষ্টা করেছি। কিছু বুঝছি, কিছু বুঝি নি। কিছুই আলোঁ যায় না তাতে। বাবা বলতেন, বুদ্ধির পেছনে আছে একটা ঘুমন্ত মন। আজ বা বোঝা গেল না, একদিন সেই না-বোঝা কথা নিজের কথা হয়ে বেরিয়ে আসবে। উপস্তা তো শরীরের কসরত নয়, বুদ্ধির বিকাশ। বতটুকু জানা আছে, তার পরেব কথা জানবার জন্তে সাধনা।

নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছিলেন আমার বাবা। তাঁর ধ্যান জ্ঞান পরম ভূপ ছিল ছাত্র। বিদ্যালয়ের বাইরে যে জগৎ, সেখানে তাঁর ভয় তাঁব সফোচ প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে অস্থির করেছে। নিজের গৃহকেও তাই বিদ্যালয়ে পবিশত করেছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই নিয়েই বিদ্যালয়টা বছর বেঁচেছিলেন। যেবারে ম্যাট্রিকুলেশন দেব, সেইবারে তিনি মারা গেলেন।

একজন শিক্ষকের গল্প পড়েছিলুম একখানা ইংরেজী বইয়ে। কবি ম্যাথু আর্নল্ডের শিভা ডক্টর টমাস আর্নল্ডের কথা। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত্ত বখন বনিয়ে এল, তখনও তাঁর ছাত্রদের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। চোখ বন্ধ করে বলেছিলেন, ওরে, সন্ধ্যা যে হয়ে এল, এবার তোরা ঘরে যা। সে-ই তাঁর শেষ কথা। বাবার মৃত্যুর কণটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। 'মাই বয়েজ' বলে তিনি তাঁর

ছাত্রদের ডাকেন নি সত্য, কিন্তু নির্বাক চোখে খুঁজে-ছিলেন অনেককে, শুধু আমাকে দেখেই তৃপ্ত হন নি। তাঁব বয়স বিদ্যালয় না হয়ে বাবটি হলে হয়তো 'মাই বয়েজ' বলেই ছাত্রদের ডাকতেন।

এর পরে অনেকক্ষণ আমি কথা কইতে পারলুম না। আতিও কোন প্রশ্ন করে আমাকে বিরত করল না।

ম্যাথু আর্নল্ড আমি কোনদিন হতে পারব না, কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস আমার বাঁচিয়ে রেখেছে।

বললুম : পৈতৃক ভিটে আর সামান্য কিছু জমিজমা ছাড়া আব কিছুই বাবা বেখে যান নি। দরকারও হয় নি। ম্যাট্রিকের ফল দেখে কলকাতার অনেকগুলো কলেজ আমাকে ডেকে পাঠাল। কলেজের ফী লাগল না। হস্টেলের খরচা নিতে হল না, বৃত্তির টাকা পাঠাতুম মায়ের কাছে। একবেলা ছাত্র পড়িয়ে আরও কিছু টাকা পেতুম। এতে মার গভীর আপত্তি ছিল। তাঁর আপত্তির কারণ আমি জানতুম। আই. এ. পরীক্ষার ফল খারাপ হলে আমার বৃত্তি বন্ধ হবে, তাহলে আর পড়া হবে না। কিন্তু আমার জীবনেব ওপর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ ছিল কারণ। সব-কটা পরীক্ষাই আমি সনমানে পাল হয়ে গেলুম।

মায়ের মৃত্যু হল এই সময়ে। তিনি বেঁচে থাকলে আমার জীবন অন্য রকম হত। অন্ততঃ অন্য রকম করবার চেষ্টা করতে হত। তাঁর ছেলে জন্ম হবে, কিংবা ম্যাট্রিক্সেই এই বকসের আশা ছিল তাঁর মনে। অনেকবার তাঁর মুখে এ কথা শুনেছি। বলতেন, গোপাল, মিল্লিতে গিয়ে তোকে পরীক্ষা নিতে হবে। ওপর থেকে তোর বাবা তোকে আশীর্বাদ করবেন।

কেন আমি তাঁর ইচ্ছা পূরণ কববার চেষ্টা করলুম না, সে কথা ভাল করে ভেবে দেখি নি। পরীক্ষার ভয় ছিল না তা জানি। খরচও জুটিয়ে নিতে পারতুম। তবু কেন গেলুম না। একদিন মনে হয়েছিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যে আনন্দ, সে আমার নয়। আমার অন্য পথ। কিন্তু সেই পথ কি আজও খুঁজে পেয়েছি।

এই ভাবটি যে বাবার কাছে থেকে পেয়েছিলুম, তাতে আজ আমার সন্দেহ নেই। তিনি অহংকারী ছিলেন না, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল। সেইটেই লোকে অহংকাব বলে ভুল করত। মামাবাবুও তাঁকে ভুল

করেছিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর কোন রেবারেবির কথা মায়ের কাছে শুনি নি। তবে মৃত্যুর পূর্বে বাবা যে অল্পবোধ কবে গিয়েছিলেন, পবে তা জানতে পেরেছিলুম। বলেছিলেন, জীবনে দুর্ভোগ আসে অনেক, কিন্তু ওপরে ভগবান আছেন। দযাব জন্তে মাছুষের দ্বারস্থ যেন আমরা না হই। বাবার এই অল্পবোধ মা আদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং মামাবাবুর সমস্ত সাহায্য তিনি কঠিন ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এসব আমি জানতুম না। কিছুদিন আগে মামাবাবুই একদিন এ কথা বলেছিলেন। তবু যে তাঁর স্নেহ আমি হাবাই নি, এ কথা ভাবতে ভাল লাগছে।

আন্তে আন্তে স্বাতি বলল : বাবার কাছে এ কথা আমিও শুনেছি। তোমার মা ছিলেন বাবার পাতানো বোন। নিজের বোন হলে নিশ্চয়ই এমন করতেন না।

থাক্ সে কথা। এস, আজ অল্প কথা বলি।

কিন্তু নতুন কথা কিছুই মনে এল না। স্বাতিবও না। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমবা নীরবে বসে বইলুম, আর তার গান শুনতে লাগলুম দু কান ভবে।

অকস্মাৎ জো বায়ের কণ্ঠস্বরে আমাদের ধ্যানভঙ্গ হল। পিছন থেকে ভদ্রলোক চেষ্টায়ে উঠলেন : আপনাবা এখানে। আমি সমস্ত বোম্বাই শহর আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমরা দুজনেই চমকে উঠেছিলুম। জো বায় আমাব হাত ধরে টানলেন। আব স্বাতিকে বললেন, উঠুন উঠুন।

কথা না বলে আমবা জো বায়ের গাড়িতে এসে বসলুম। এ সেই ছোট গাড়ি নয়, বেশ বড় একখানা নতুন গাড়ি। বলল : এক বন্ধুর সঙ্গে বদল করেছি কয়েকটা দিনেব জন্তে।

ভাল করেছেন।

কঠিন দৃষ্টিতে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

গাড়ি চালাতে বসে জো বায় বলল : অ্যামবাগাডবে আজ আমরা লাঞ্চ খাব।

অ্যামবাগাডবে নিশ্চয়ই ভাঙ্গমহলের মত বড় হোটেল। কিন্তু স্বাতির দিকে তাকিয়ে সে কথা বলবার সাহস আমার হল না।

সাভাগ

ঝাঁসি স্টেশনে আমবা ওয়েটিং রমে উঠেছিলুম। সকাল আটটার পরে গাড়ি পৌছল। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে বেরতে আমাদের বেশী সময় লাগল না।

শিবপুরীর সেই ভদ্রলোকের নাম আমার জানা হয় নি। নামবার সময় সৌজন্য বিনিময়টাও ঠিক আন্তবিক হয় নি। সচরাচর আমাব এমন হয় না। নিজের কথা ভাবতে ভাবতেই কেমন অশ্রমস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। ঝাঁসি পৌছে গেছি শুনেই তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়েছিলুম। এখন টাঙ্গায় বসে আমার এই কথা মনে পড়ল।

বিরূপাক্ষ বললেন : দুর্গ দেখতে হলে শুনছি অশ্রমতির দরকার। কোন্ এক স্টেশন-স্টাফ-অফিসাব অশ্রমতি দেবেন।

বললুম : রানীর প্রাসাদ হয়েছে শহরের কোতোয়ালি। সেখানেই বোধ হয় অশ্রমতি পাওয়া যাবে।

মিনতি বললেন : কী দরকার ভেতরে যাবার ? দুর্গ আমাদের অনেক দেখা আছে।

সাবাস সাবাস ! আপনি কী বলেন ?

বলে বিরূপাক্ষ আমাব দিকে তাকালেন।

বললুম : এ কদিনে যথেষ্ট বোবাঘুরি হয়েছে, বিশ্রাম সে পবিমাণে হয় নি। টাঙ্গায় বসেই শহর পরিক্রমা ভাল লাগবে।

যা বলেছেন।—বিরূপাক্ষ আমাকে সর্বতোভাবে সমর্থন কবলেন।

কাজেই আমবা আর টাঙ্গা থেকে নামলুম না। বসে বসেই শহরটা দেখলুম। দেখবাব আর কীই বা আছে। একদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাহাড়ের ওপর পাথরের দুর্গ। অল্পদিকে পরিচ্ছন্ন শহর এলাকা। বড় বড় দোকানপাট। শহর সমুদ্রে মোটামুটি একটু ধারণা কবে আমরা আবার স্টেশনে ফিরে এলুম।

মিনতি বললেন : আজ একটা ভুল ভাঙল।

কী ভুল ?

এতদিন ভাবতাম, ঝাঁসিতে অনেক কিছু দেখবার আছে।

বললুম : এ আমাদের সকলেরই ধারণা।

বিরূপাক্ষ বললেন : কেন এমন ধারণা হল বলতে পারেন ?

ঝাঁসির বানীর জন্তে। ঝাঁসিব কোন রাজাব নাম আমরা জানি নে। ইতিহাসে শুধু একটি নামই আছে— ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই। লক্ষ্মীবাই না জন্মালে ঝাঁসির কথা কেউ জানত না।

এত বড় একটা দুর্গ।

এমন দুর্গ এ দেশে অসংখ্য আছে।

অভিমত জিজ্ঞাসা করল : দুর্গেব ভেতরে কী থাকে মা ? ঘর-বাড়ি, সৈন্ত-সামন্ত—

বললুম : মাগুর দুর্গ আমরা দেখেছি।

সে তো একটা শহর।

চিতোয়ের দুর্গও অমনি একটা শহরের মত, দুর্গের মধ্যেই রাজার রাজধানী।

মিনতি বললেন : ঝাঁসিব দুর্গ সেতকম মনে হল না।

এই রকম দুর্গই বেশী। যুদ্ধের সময় এখানে বাজা থাকেন সৈন্তসামন্ত নিয়ে। প্রজারা পালিয়ে যায়।

ওয়েটিং রুমের এক কোণে এক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসেছেন। তাঁর আড়ালে এক মহিলা। বয়সে দুজনেই তরুণ। বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী। স্বামীর কোন কাজে স্ত্রী বাধা দিচ্ছেন বলে মনে হল। কোঁতুল হল। বাথরুমে যাবার ছল করে আমি তাঁদের দেখে এলুম। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর পায়ে ওরিয়েন্টাল বাম মালিশ করে দিচ্ছেন। স্ত্রী বাধা দিচ্ছেন না, আস্তে আস্তে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন।

মিনতি আমাব মতলব যে বুঝতে পেরেছিলেন, তা তাঁর চোখের দিকে চেয়েই টের পেলুম। নিজের জায়গায় ফিরে আসতেই চোখ নামিয়ে তাঁব প্রস্থ জানালেন।

চেয়াব টেনে আমি তাঁর কাছে সরে এলুম। তারপর ফিসফিস করে বললুম : দম্পতি।

তা তো বুঝতেই পারছি।

মনে হচ্ছে, নতুন বিয়ে হয়েছে।

তাও সন্দেহ করেছি। কিন্তু কী করছে দেখলেন ?

স্ত্রীর পদসেবা।

বিরূপাক্ষ শুনতে পান নি। মিনতি চোখ কপালে তুলে বললেন : সত্যি !

যদি মিথ্যে মনে হয়, উঠে দেখে আসুন। কোলের উপর একখানা পা তুলে নিয়ে বলছেন, দেখি পদপদ্ম-মুদারম।

মিনতি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলটা সামলে নিষেই বাথরুমের দিকে চললেন। চোখ দুটো এখনও বাথরুমের দরজার দিকে স্থির থাকলেও আমি জানি যে ঠিক সময়মতো আড়চোখে ব্যাপারটা দেখে নেবেন।

সিগারেট ধরিয়ে বিরূপাক্ষ কী ভাবছিলেন তিনিই জানেন। কিন্তু কিছু যে সন্দেহ করেছিলেন, তা তাঁর প্রশ্ন শুনেই বুঝতে পারলুম। বললেন : ব্যাপার কী ?

আমি ঠোটের উপর তর্জনী চেপে তাঁকে থামতে বললুম।

মিনতি পাশ দিয়ে যাবার পরেই আমি বউটিকে নড়ে-চড়ে বসতে দেখলুম। মনে হল, নিজের পা তিনি স্বামীর চেয়ার থেকে নামিয়ে নিলেন।

মিনতি ইচ্ছে করে দেরি করে ফিরলেন। দুজনে তখন সোজা হয়ে বসেছেন। বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে আমরা তাঁদের লক্ষ্য করছি।

মিনতি বললেন : দেখলে তো !

বিরূপাক্ষ বললেন : কী ?

স্ত্রীকে যত্ন করতে শেখ।

ওমর খৈয়াম পড়বার বয়স যে পেরিয়ে গেছে।

সে বয়স কি কোনদিন ছিল না ?

তখন স্বামী-সেবার রীতি ছিল।

মিনতি এবারে আমাকে বললেন : শুনছেন তো, উনি যেন সত্যযুগের ঋষি।

মিনতির বয়স এমন কিছু বেশী নয়। ওই কোণের বউটির চেয়ে কয়েক বছরের বড়। সঙ্গে ছেলে আছে বলেই একটু ভারি স্নিগ্ধ দেখায়। হেসে বললুম : তা আপনার কিছু দাবি আছে বইকি।

ওইরকম পদসেবা নেবাব ?

নিলে দোষের কী আছে ! অনেক ঘোরাঘুরি করে হয়তো পায়ে ব্যথা হয়েছে। মাথাব্যথার ওষুধটা পায়েই একটু ঘষে নিচ্ছেন।

মিনতি বললেন : ছি ছি, আমার পায়ে কেউ হাত দিলে আমি লইতে পারব না।

অভ্যাস হলেই পারবেন।

মিনতি ঠোঁট উলটে বললেন : আমার দরকাব নেই।

এবারে দেখলুম, ওঁরাই আমাদের লক্ষ্য করছেন।

আমরা খুবই সাবধানে কথা বলছি। তবু মনে হল, আমাদের কথাবার্তা বোধ হয় শুনতে পেয়েছেন। একটু জোরে জোরে জিজ্ঞাসা করলুম : আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন ?

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে বললেন : আমাদের বলছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপাততঃ জব্বলপুর থেকে।

মিনতি সোজা হয়ে বসলেন, বললেন : জব্বলপুর আমরা দেখব না, তাই না ?

বিক্রপাক্ষ বললেন : পরস্পর খরচ করলে দেখা যায়।

মিনতির সে কথা মনে পড়েছে। তাঁরা রেলের পাশে যাচ্ছেন। তাতে একেবৈকে যাবার অধিকার নেই। সরল সোজা পথে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে হবে।

আমি বললুম : বেশ হয়েছে। জব্বলপুরের গল্লটা তা হলে আপনার কাছেই শোনা যাক। কদিন ছিলেন সেখানে ?

ছদিন।

ছদিনেই সব দেখে নিলেন ?

রয়ে বসে দেখতে গেলেই তো খরচ।

আর তাড়াতাড়ি করলেই মালিশ।

ভদ্রলোক লজ্জা পেলেন, বললেন : তা যা বলেছেন। একটা চলবে দাদা ?

বলে পকেট থেকে সিগারেট বার করে আমার দিকে উঠে এলেন।

কথার ভঙ্গিটি আমার খুব চেনা লাগল। ভদ্রলোকও আমাদের চিনে ফেললেন ; আর, দাদা যে—বলে কী করবেন, ভেবে পেলেন না।

দত্তকে আমিও তখন চিনে ফেলেছি। নাগপুরের টিকিট কালেক্টার দত্তবাবু। ইণ্ডোসিলোন এক্সপ্রেসের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দেখা হয়েছিল। আমি উঠেছিলুম চিঙ্গলপুট স্টেশনে। এই দত্ত-পরিবার নাগপুর থেকে কোডাইকানাল যাচ্ছিলেন। ভেলুপুৰমে নেমেছিলেন পণ্ডিচেরী যাবার জন্তে। সেবারেও আমাকে

সিগারেট এগিয়ে দিয়েছিলেন। অভ্যস্ত নই বলে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলুম। এবারেও তাই করলুম।

সেবারে তিনি গোটাকয়েক দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট করে সিগারেট ধরিয়েছিলেন। একমুখ ধোঁয়া নিয়ে খানিকটা কেশে বলেছিলেন, আমিও আগে খেতুম না। সম্প্রতি খাওয়া ধরেছি।

তারপর গলাটা আবণ্ড একটু নামিয়ে বলেছিলেন : সিগারেটের গন্ধটা বউয়েব ভাল লাগে কিনা, তাই ধরতে হল। কড়া সিগারেট এখনও টানতে পারি নে। তাই এই ছোট সিগারেট খাই। বজুরা বলে, এ নাকি লেডিজ স্মোক।

এবারে আর সেই মেপোল দেখলুম না, দেখলুম চারমিনার। একটা কাঠি জ্বলেই ধরিয়ে ফেললেন। খুব দীর্ঘ একটা টান মেয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া বাব করলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম : আপনার ছোট সিগারেট কী হল ? শুতে আর শানায় না। বড়নাহেবদের দেখে এই ফোর কাসলস ধবেছি। বুঝতে পারলেন না তো ?

বলে খানিকক্ষণ হাসলেন হাঁহা করে। তারপরে বললেন : বড়নাহেবদের দেওয়া নাম। থি কাসলস খাবার পরস্পর নেই বলে এই ফোর কাসলস খাওয়া বুঝলেন না, বিডি টানতে যে তাঁদের লজ্জা করে।

এই কথাটি আর কার কাছে শুনেছি, মনে করতে পারলুম না। বললুম : বসুন।

বসবার আর জায়গা ছিল না। দত্ত বললেন : আসুন না দাদা আমার বউয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

সেবারে তাঁর বউয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন নি। ভদ্রমহিলা একখানা শতবস্ত্রের ওপর শুয়ে ছিলেন, আর দত্ত প্রগল্ভতায় দৃষ্টি দিয়ে ভৎসনা করেছিলেন। বললুম : থাক না, ওঁকে আবার কেন কষ্ট দিচ্ছেন ?

কষ্ট কিসের ! আলাপ করতেও কি কষ্ট হয় নাকি ! আসুন।

বলে আমায় একরকম টেনেই নিয়ে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন : দেখেছ, দাদা এখানে লুকিয়ে বসেছিলেন।

ভদ্রমহিলা নিষ্পৃহভাবে বললেন : দাদা !

আমাব নমস্কারের উত্তর দিলেন হাতজোড় করে।
কিন্তু দস্ত খুবই বিপদে পড়লেন। বললেন : মনে নেই,
সেবারে—

আমার পরিচয় তাঁর জানা নেই। তাঁকে রক্ষা
কবাব জুগেই বললুম : আমাব নাম গোপাল, আপনাদের
মতই একজন যাত্রী।

দস্ত তাড়াতাড়ি বললেন : তুমি এত ভুলে যাও। নিন,
যত্ন।

বলে একখানা চেয়ার টেনে আমাকে বসতে বললেন।
নিজেও বসলেন।

বললুম : এবারে কোন্ পাহাড়ে যাচ্ছেন ?

দস্ত হা হা করে হাসলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন :
দাদা, পাহাড়ে আর যাই নে।

কেন ?

হাত দিয়ে দস্ত তাঁর জ্বর পা দেখালেন, বললেন : ওঁর
এখন পাখা ভারি। জ্বরলপূর শহরে একটা পাহাড় আছে,
তাতে উঠতে পারলেন না। নীচে থেকেই মদনমহল
দেখলুম।

ভদ্রমহিলার শরীরও কিছু ভারি হয়েছে দেখলুম।
কিন্তু দস্ত ঠিক সেইরকমই আছেন।

এবারে খাজুরাহো দেখতে বেবিয়েছিলুম। তারপর
জ্বর দিকে একবার আড়চোখে দেখে আমার কানের কাছে
মুখ এনে বললেন : ওইসব মূর্তি দেখতে। বুঝলেন তো ?
বুঝেছি।

আপনারা দেখবেন না ?

হেসে বললুম : ওসব না দেখে কি ফেরা যায়।

তা যা বলেছেন।—হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন : ওঁরা
কে ?

বললুম : আপনাদের মতই বেড়াতে বেরিয়েছেন।
খাজুরাহো দেখে দেশে ফিরবেন।

আপনার সঙ্গে ?

আপনাদের মত বন্ধুত্ব। বলুন এবাব জ্বরলপূরের
গল্প।

জ্বরলপূরের গল্প আর কী বলব। একদিন ঘুরেছি
বাজারে আর একদিন গিয়েছিলুম ভেরাঘাট।

মার্বল রক্‌স দেখেন নি ?

তারই নাম ভেরাঘাট। স্টেশন থেকে মাইল তের
দূরে। বাস যাতায়াত করে, সকাল সাড়ে দশটায় স্টেশন
থেকে ছেড়ে সবকিছু দেখিয়ে আবার ঘুবিয়ে আনে
বোধ হয় সাড়ে এগাবটায়। একখানা ট্যাক্সি আছে, আর
নস্রাতি দিল্লীর মত তিন চাকার মোটর এসেছে খান-
কয়েক। টাঙ্গা বিকশাও বোধ হয় যায়। কাজেই দূরত্ব
গুনে জ্বরলপূরে না নেমে ভেরাঘাট স্টেশনে গিয়ে যেন
নামবেন না। তা হলেই অল্পবিধেয় পড়বেন। তিন
মাইল পথ আপনাকে হাঁটতে হবে। নাগপুর থেকে
জ্বরলপূর আমি কিন্তু ট্রেনে এসেছি। সেওনি হয়ে বাসে
আসতে পাবতুম, কিন্তু রেল চাকরি করে বাসে কেন
পয়সা গুনি বলুন।

খাঁটি কথা। আমার জাহাজে চাকরি হলে আমি
জাহাজেই আসতুম।

সেকি দাদা, এখানে সমুদ্র কোথায় যে জাহাজে
আসবেন।

উডো জাহাজ ?

হ্যাঁ, উডো জাহাজ আছে।

তারপরে আপনাব ভেরাঘাটের গল্প বলুন।

জ্বরলপূরে শুধু ওই একটিই দেবতার জিনিস। সাড়ে
চার মাইল এগিয়ে একটি পাহাড় দেখবেন, তার ওপরে
গৌদ রাজাদের দুর্গ, নাম মদনমহল। কেঁদে কবিয়ে
কোনরকমে সেখানে উঠলে জ্বরলপূরের দৃশ্য নাকি অগ্নি
দেখা যায়। আমাদের ভাগ্যে তা ঘটে নি। খানিকটা
উঠেই আমাদের নেমে আসতে হয়েছে।

জীব চোখের দিকে তাকিয়েই ভদ্রলোক বললেন :
আপনাবা সোজা চলে যাবেন ধূঁয়াধার। নর্মদার জল-
প্রপাতের নাম ধূঁয়াধার—মানে ধোঁয়াব আধার। নর্মদা
বয়ে আসতে আসতে হঠাৎ তিরিশ ফুট নীচে গড়িয়ে
পড়েছে, ধোঁয়ায় মত ফেনায় ও জলকণায় সেই স্থানটা
আচ্ছন্ন হয়ে আছে। গাড়ি আপনাকে নদীর কাছাকাছি
নিয়ে যাবে। বালিব উপর দিয়ে আপনি নদীর তীরে
আসবেন। রাস্তার ধারে কয়েকটা ছোট ছোট কুড়ে
দেখতে পাবেন, তার নীচে পাথরের জিনিস বিক্রি হচ্ছে।
এই পাথর ওঠে মাটির নীচে থেকে। কয়লার খনির মত

খুঁড়ে খুঁড়ে বার কবে বাস্তার ধারে টাল করা হচ্ছে।
লরিতে করে চালান যাবে। কুলিরা বলে, গুঁড়ো করে
পাউডার হবে। কী কাজে লাগবে, তা বলতে পারে না।

সেখান থেকে ফিরে এসে পঞ্চবটীতে নামবেন। বাস
এই পর্যন্ত আসে। কাছেই আছে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির।
একশো সাতটা সিঁড়ি ভেঙে এই মন্দিরে উঠতে হয়।
একশিটা দেবদেবীর মূর্তি। দশম শতাব্দীর মূর্তি বলে
লোকের বিশ্বাস। কিন্তু এই মন্দির দেখতে মাহুশ এখানে
আসে না। একশো পঁয়ত্রিশটা ধাপ ভেঙে তারা নরনার
তীবে যায়। সেখানে সবকাবী নৌকো আছে, মোটর লঞ্চ
আর হাতে-বাওয়া নৌকো ছইই। সেই নৌকোয় চড়ে
মার্বল রক্‌স্ দেখতে যাবেন। পারেন তো পুর্ণিমার রাতেই
যাবেন। একটা অভিজ্ঞতা হবে।

ভিমরুলের উৎপাত আছে শুনেছি। সিগারেট
ধরালেই নাকি ছেকে ধরে।

এবাবে কিছু দেখলুম না। ববং কুমীর একটা
দেখেছিলুম। ছদিকে পাহাড়। আমরা মার্বল পাথর
বলি, কিন্তু আসলে ম্যাগনেসিয়ান লাইম স্টোন।
আলোয় একেবারে ঝকঝক করছে। একদিকে ছদিকের
পাহাড় প্রায় সমান উঁচু। এই জায়গাটাকে মাক্সিস লীপ
বলে। জল এখানে দেড়শো ফিট গভীর। ফটিকের মত
স্বচ্ছ জল, তাব ওপর পাহাড়ের প্রতিবিম্ব। আরও এগিয়ে
ছুটি পাথর, একটির নাম এলিফ্যান্টস ফিট, আর একটির
নাম হরসেস ফিট। তারপরেই ধুঁয়াধার জলপ্রপাত।
পাথরের বড় শুধু মাদা নয়, গোলাপী হলদে ও নীলের
ছোঁয়াও আছে। বর্ণনা করে এব রূপ বোঝাতে পারি,
এমন বিচ্ছে আমার পেটে নেই।

যথেষ্ট বুঝিয়েছেন। আপনার বর্ণনা শুনে আমার
যেতে ইচ্ছে করছে।

দত্ত তাঁব জ্বর দিকে চেয়ে যেন কৃতিত্বের দাবি
জানালেন। তারপব বললেন : নদীর মধ্যে রানী অহল্যা
বান্ধিয়ের শিবমন্দির আছে। আব এক জায়গায় আছে
দত্তাত্রেয় মূর্তির গুহা। তীর্থযাত্রীব জন্তে নিকটে
ধর্গশালাও আছে।

বাইরে হঠাৎ কলরব শোনা গেল। জনতা
এক্সপ্রেস আসছে। ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর

প্রতি একটি কর্টাক্স নিক্ষেপ করলেন। দত্ত বিদ্রোহবৎসে
বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দরজায় কুলিকে দেখে আবার
ফিরে এলেন। বললেন : জলদি উঠাও।

আমার দিকে চেয়ে বললেন : চললুম দাদা। নটায়
ইটার্সি পৌছতে পারলে রাতেব গাড়িটা ধরা যাবে।
সকালে আবার ডিউটি আছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। এগিয়েও দিলুম।

যাবার সময় বলে গেলেন : নাগপুরে গেলে দাদা
আমাব কাছেই উঠবেন। দত্তবাবু নাম বললে যে কেউ
আপনাকে পৌছে দেবে।

ট্রেন আসতে দেরি নেই। উত্তবেব অপেক্ষা তিনি
কবলেন না। পিছনে দু চোখে আছে ভদ্রমনার তাড়া।

আটাশ

আমাদের হবপালপুরের গাড়ি ছাড়ল আরও ঘণ্টা
দুয়েক পরে, প্রায় পৌনে ছটার সময়। এইটুকু সময়
আমরা চোখ বুজে কাটিয়ে দিয়েছিলুম। আজ বড়
নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছে। রাত আটটায এই গাড়ি
হরপালপুরে পৌছবে, ওয়েটিং রুমে আমবা ঘুমতে পারব।
খাজুরাহোর বাস ধবব ভোরবেলায়। গত বাত্রির ক্লান্তি
আমাদের দূর হবে। এই আশায় মনটা প্রফুল্ল আছে।

খাজুরাহো যাবার পথের সম্বন্ধে নানা কথা শুনে
পেলুম। পথ নাকি তিনটে আছে, এক একজন এক এক
পথ ভাল বলছেন, আর সব পথ নাকি ভারি কষ্টের।
মাহুশ ছবকমের আছে। একজন যে পথে গেছেন, সেই
পথকে ভাল বলেন, অল্প সব দুর্গম পথ। আর একজন
যে পথে গেছেন, সেই পথকেই দুর্গম বলেন, অল্প পথ সবই
ভাল। জানবাব চেষ্টা করলুম, খাজুরাহো কেউ গেছেন
কিনা—এ প্রশ্নের উত্তর সবাই সম্বন্ধে এড়িয়ে গেলেন।

খাজুরাহো যাবার এতগুলো পথ কেন হল ?

একদিক থেকে তো তিনটে পথ নয়, তিন দিক থেকে
তিনটে পথ। একটা পথ ঝাঁসি থেকে হলে যেন বেশী
স্ববিধে হত। এলাহাবাদ থেকে ঝাঁরা বোধে যাচ্ছেন, তাঁরা
সাতনায় নামবেন। সাতনা থেকে খাজুরাহো বাহান্তর
মাইল, পান্না হয়ে বাস চলে। এই লাইনেই সাতনা
পৌছবার আগে মানিকপুর জংশন। ঝাঁসি স্টেশন দিল্লী-

বোম্বে লাইনে। কাসি-মানিকপুর একটা শাখা লাইন আছে। সেই লাইনে আমরা এখন যাচ্ছি। হরপালপুর স্টেশন তিন্ময় মাইল পূর্বে, সেখানে নেমে আমরা খাজুরাহো যাব। পথ তেষটি মাইল, ছাতারপুৰ হয়ে এই পথ গেছে। এই লাইনে মাহোবাতেও আমবা নামতে পারি, সে মানিকপুরের কাছাকাছি। সেখান থেকে খাজুরাহো মাত্র চল্লিশ মাইল।

ছাতারপুৰ পান্না এসব দেশীয় রাজ্য। রেল লাইন নেই, আছে প্রশস্ত পথ আর প্রচুর বাস। এলাহাবাদ থেকে বাসেই সরাসরি আসা যায়। আর রাজারা নিজেন্দের স্ববিধে মত কাছের রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ভাল রাস্তা নির্মাণ করে নিয়েছেন। পরে আমার এই পথের একটা মোটামুটি ধাবণা হয়েছিল। হরপালপুর থেকে নগগঙ্গ ছাতাবপুৰ হয়ে যে পথ গেছে, সেই পথ পান্না হয়ে সাতনা পৌছবে। মাহোবার পথ খাজুরাহোর উপর দিয়ে গিয়ে এই পথে মিলিত হয়েছে। এই জিবেণীর নাম বামিথা। সমস্ত বাস বামিথার থানার সামনে দাঁড়ায়। নেমে দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। পূর্বের পথ পান্না হয়ে সাতনা গেছে, পশ্চিমে ছাতারপুৰ নগগঙ্গ হরপালপুর। উত্তরে খাজুরাহো মাহোবা। খাজুরাহোব দূরত্ব মাত্র সাত মাইল। সঙ্গে একথানা রোড-ম্যাপ থাকলে এ মূলুকটা ভাল করে জেনে নেওয়া যেত। মধ্যপ্রদেশ হবাব আগে এ জাষণাব নাম ছিল বিদ্যাপ্রদেশ।

খাজুরাহোয় যাত্রী আকর্ষণের জন্ত কিছুদিন থেকে সবকারী প্রচারকার্য পুরোদমে শুরু হয়েছে। চলচ্চিত্রে খাজুরাহোর ছবি দেখানো হচ্ছে। বন্ধুদেব কাছে শুনেছি যে দীর্ঘ দিনেব অনাদৃত মন্দিরগুলোর সংস্কার হচ্ছে। যে জায়গায় এই মন্দিরগুলো ছড়িয়ে আছে, সেই জায়গায় উত্থান রচনার চেষ্টা চলছে। রেস্টহাউস হয়েছে। এবং বিদেশী যাত্রীর স্ববিধার জন্ত প্রতি রবিবার দিল্লী থেকে পান্নায় উড়োজাহাজ আসছে। পান্না থেকে খাজুরাহো যাতায়াত হয় সুন্দর মোটর বাসে। এই সঙ্গেই সাধাবণ যাত্রীর অস্ববিধার কথা কাগজে পড়েছি। হরপালপুর মাহোবা বা সাতনা কোন স্টেশনে রিটায়ারিং রুম নেই। অথচ রাজিবাস এখানে অপরিহার্য। তিন জায়গা থেকেই বাস অতি প্রভূষে ছাড়ে, স্টেশনে ট্রেন

আসে বাতে কিংবা বিকেলে। শহরে নাকি ভাল হোটেলও নেই। কাজেই যাত্রীদের ওয়েটিং রুম ছাড়া গতি নেই। একথা মানি যে ভাল হোটেল চালানো দুষ্কর। যা দরকার তা সরকারী ডাকবাংলো, বা রেস্ট-হাউস। খাজুরাহোয় রাজিবাস এডানো যায়, কিন্তু কোন না কোন স্টেশনে এক রাজি কাটাতেই হবে। *

বিরূপাক্ষ আমার কাছেই ছিলেন, বললেন : গোপালবাবুকে আজ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে।

বললুম : তার কারণ আছে।

সত্যি নাকি।

ভাড়া দিয়ে দিয়ে পকেটের পয়সা এসেছে ফুরিয়ে, দেশে ফিরে খাব কী, তাই ভাবছি।

এখানে খাবার পয়সা আছে তো ?

তা আছে।

মিনতি বললেন : দেশে ফিরলে আর আপনার ভাবনা কী ?

আমার জমিদারী নেই, সেইজন্তে ভাবনা।

জমিদারী তো আমাদেরও নেই, মাস গেলে মজুরি আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম : আমার ববখাস্তের নোটিশ তৈরি হয়ে আছে।

কেন ?

গত বছর পূজোর ছুটিতে বেরিয়ে দেরি করে ফিরেছিলুম। কর্তৃপক্ষ ক্ষমা কবেছিলেন। বসন্তকালে পালিয়ে গিয়েছিলুম, তাঁরা সতর্ক করে দিয়েছেন। এ পূজোয় আবার গোলমাল হল।

ব্যস্তভাবে মিনতি বললেন : আমাদের জন্তেই কি হল ?

হেসে বললুম : আমার নিজের জন্তে। অর্থাৎ একটানা অনেকদিন অফিস করতে পারি নে।

মিনতি আশ্বস্ত হয়ে বললেন : তবু ভাল।

ভাল মানে, চাকরিটা যাক বলছেন !

না না তা কেন। আমরা দাবী হলে আরও খারাপ লাগত।

বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করলেন : সংসারে কি ভায়ার কোন টান নেই ?

সংসার থাকলে তো সংসারের টান।

কেউ কোথাও নেই ?

এখনও তো কাউকে খুঁজে পাই নি।

আহা, হিংসে করতে ইচ্ছে করছে।

মিনতি ধমকেব হুবে বললেন : তা তো করবেই।
নিজে কোন দায়িত্ব নিতে চাও না তো। পরের দুঃখ
তুমি কী বুঝবে।

বিরূপাক্ষ বললেন : নিজের দুঃখই কি বুঝতে পারি ?

মিনরাত রেলের লাইন দেখে দেখে মন ওই রকম
কঠিন হয়েছে।

বিরূপাক্ষ হেসে বললেন : শুনছেন তো, সংসার থাকলে
রাগরাগিণীও শুনতে হত। এইজন্তে বলছিলুম, আপনি
বেশ আছেন।

শুধু কি রাগরাগিণীই শুনতে হয় ?

উত্তর না দিয়ে বিরূপাক্ষ সিগারেট বার করলেন।
কিন্তু মিনতি থামলেন না : বিছানায় একদিন শুয়ে থাকলে
তো চোখে অন্ধকাব দেখ। তখন কেন একা থাকার
স্বপ্নের কথা মনে হয় না ?

তখন যে রুগীর সেবা করতে হয়, আর ছেলের
ঝামেলা।

ছেলে আমার একার কিনা।

আমি হাসছিলুম। স্বামী-স্ত্রীর এই কলহে তিক্ততা
নেই এতটুকু। প্রয়োজন যে পারস্পরিক এঁবা তারই
প্রমাণ করছেন। কিন্তু এই ভাবে ঘেঁষাধর অগ্রসর
হলেই তিক্ততা এসে পড়ে। একজন যখন আর একজনের
অক্ষমতার কথা টেনে আনেন, তখনই ছন্দপতন হয়।
পরিমিত উপার্জনই পুরুষের সবচেয়ে বড় অক্ষমতা।
স্ত্রী যখন সেই অক্ষমতার খোঁটা দেন, স্বামী তখন মরিয়া
হয়ে আক্রমণ করেন। নিঃশব্দে থাকলেও সে খোঁটা
হজম হয় না। ভেতরে ভেতরে একটা হিংস্র বস্তুতা
ক্রমে ক্রমে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সংসারের ভারসাম্য অস্থি-
ব হয়, স্বামী-স্ত্রীর মধুব সম্পর্ক দোলে ছোট নৌকোর মত,
একটা হাওয়ার ঝাপটাতোই অভলে তলিয়ে যাবার ভয়।

কিন্তু কেন এমন হয় ? বই পড়ে আমি একটা মনগড়া
কারণ নির্ণয় করেছি। উপার্জনের অক্ষমতার কোন
প্রতিবিধান নেই। মানুষ ইচ্ছে করে কম রোজগার
করে না। রোজগার বাড়াবার জন্তে প্রত্যেকটি লোকেরই

চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু কটা লোক সফল হয়। যারা
ব্যর্থ হয়েছে আর ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিদিন, তাদের রাষ্ট্র-
ব্যবস্থার ওপর আর সমাজ-সংস্থার ওপর অসীম আক্রোশ।
নিজেকে তারা দায়ী করে কোন ব্যক্তিগত অক্ষমতার
জন্ত। কেউ করলে হিংস্র হয়ে ওঠে।

আমার অন্তরাআয় এই আতঙ্ক আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে।
নিজের প্রয়োজনকে স্বীকার না করলে অভাবমুক্ত হওয়া
যায়। কিন্তু অপরের প্রয়োজন যেটাতে না পারলে
আছে বেদনাবোধ। অপর যত আপন হয়, এই বেদনা
তত তীব্র। যে মানুষ অভাব-সচেতন বেদনা-কাতর ও
কর্মনিষ্ঠ, সে মানুষ হিংস্র। একটু খোঁচাতেই বস্তু হয়ে
ওঠে। এসবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাব নেই, কিন্তু
মনে মনে আমি এক ভয়ের জগৎ রচনা করে বসে আছি।

আমি বোধ হয় অগ্রমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। মিনতি
আমায় জাগিয়ে দিলেন, বললেন : কী ভাবছেন
বলুন তো ?

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম : আপনাদের কথা।

সে কি।

আপনাদের কথা শুনে বুঝতে পারছি না, সংসার
করাটা ভাল না মন্দ।

বিরূপাক্ষ হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন : ও, সেই
পুরনো কথা ভায়ার—দিল্লীর লাড্ডুর কথা। খেলে বিপদ,
না খেলে অশান্তি।

বিপদের চেয়ে অশান্তি ভাল।

সারাজীবন অশান্তিও তো বিপদের কথা।

মিনতি হাসছিলেন।

বললুম : হাসছেন যে ?

এসব শাস্ত্রকথা কি এখন আর ভাল লাগবে ভাই।

বিরূপাক্ষ বললেন : এই তো শাস্ত্রালোচনার বয়স।

তোমার চোখ নেই, তুমি এর মধ্যে কথা বলতে
এস না।

বল কি গো, তুমি আবার কী দেখতে পেলেন ?

এখানে আর কী দেখব, দেখেছি যখন দেখবার দরকার
ছিল।

বিরূপাক্ষ সোজা হয়ে বসলেন।

আমি বললুম : সবটুকু দেখতে পান নি।

তা হয়তো পাই নি। কিন্তু যতটুকু দেখেছি, তাতে সবটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় নি।

বিরূপাক্ষ বলে উঠলেন : কথাগুলো বড়ই হৈয়ালি ধরনের হচ্ছে। ~ একটু সর্বসাধারণেব বোঝার উপযোগী হোক।

তা হলে সাহিত্য হবে কী করে ?

বিরূপাক্ষ আবণ্ড বিব্রত হলেন।

বললুম : সর্বসাধারণ যদি সব বুঝেই ফেলে তা হলে ধরনের কাগজকে আমরা সাহিত্য বলতে পারি। যত ছর্বোধ্য, ততই তো উচু মরের সাহিত্য।

সর্বনাশ ! আপনারা কি সাহিত্য আলোচনা করছেন ?

আজ্ঞে না, আমরা জীবনের আলোচনা করছি। জীবনে জীবন যোগ করা মানেই তো সাহিত্য।

মিনতি হাসছিলেন।

বিরূপাক্ষ বললেন : হাসছ যে ?

নিজের প্রসঙ্গটা কেমন কায়দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখ। যেতে দিচ্ছি কিনা।

বলে বিরূপাক্ষ আমাকে ধবলেন : বলুন এবারে, সাদা সরল কথায় বলুন।

কী বলব ?

মিনতি যা দেখেছে, সেই কথা বলুন।

তিনি আমার মামা-মামীকে দেখেছেন, আর দেখেছেন তাঁদের কথাকে।

মিনতি বলে উঠলেন : সম্বন্ধটা যে পাতানো, সে কথাটাও বলুন।

সত্যি কথা। কিন্তু যার সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে হবে, তাকে দেখেন নি।

মিনতি যেন আতকে উঠলেন।

বললুম : আমি চলে যাচ্ছি জানলে জো রায় নিশ্চয়ই স্টেশনে আসতেন। তিনি আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন না। বরং দু হাত ধরে আর একবার তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করতেন।

কী সাহায্য ?

তাঁদের বিয়েটা যেন তাড়াতাড়ি হয়।

মনে হল, মিনতি একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোলেন। অনেকক্ষণ পরন্তু ছুজনে কোন কথা কইলেন না।

দিনের আলো নিবে গিয়ে তখন অন্ধকার বনিযেছে। দু ধারেব শূন্য-প্রান্তরে প্রাণেব সঙ্কেত নেই। চলতি ট্রেনের কামরায় বিদ্যুতের আলোর নীচে আমরা ক্রান্ত পৃথিবীকে জাগিয়ে রেখেছি। মায়ের কোলে মাথা রেখে অভিমুখ্য ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনতিও চোখ বুজে আছেন। জানলার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ সিগারেট টানছেন। আমি এক সহযাত্রী ভদ্রলোককে কিছুক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি। তিনি তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে নানা গল্প করছেন। বলছিলেন : এ লাইনে এখন খাজুরাহোর যাত্রী বেশী। কিন্তু কিছুদিন আগে আমরা অত্র রকম দেখেছি।

কী রকম ?

দু ধার থেকে মানুষ চিত্রকূট দেখতে আসত। চিত্রকূট জান ? রামায়ণ পড়েছ ? তা পড়বে কেন ! নবল নাটক পড়ে আর সময় পাও না। তা তোমাব দোষ নেই ভাই, কারও দোষ নেই। রামায়ণ পড়ে আর কী করবে ! তার চেয়ে ক্রিষ্টি পড়, গার্ডিনার পড়, সময় ভাল কাটবে।

ভদ্রলোক বয়সে নবীন নন, প্রাচীনও নন। কিন্তু কথার ধবনে তাঁকে প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে। বললেন : রামায়ণে এই চিত্রকূটের নাম পাবে।

স্বয়ম্যামাসাত্ত তু চিত্রকূটং

নদীং চ তাং মাল্যবতীং স্ত্রীর্থাম্।

ননন্দ স্বষ্টৌ যুগপক্ষিজুষ্টাং

জহৌ চ দুঃখং পুণবিপ্রবাসাং॥

মানে বুঝলে না তো ? বুঝবে না তা জানি। সংস্কৃতের চর্চা তো দেশ থেকে উঠেই গেছে। একটা স্বযোগ এসেছিল, সরকার তাও নিলেন না। ভারতবর্ষের সর্বত্র উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে—এই ভাষার পঠন-পাঠন ছিল। সরকারের একটা হুকুমে এই সংস্কৃতই দেশের রাষ্ট্রভাষা হতে পারত। কিন্তু তা না করে হিন্দীকে গ্রহণ করা হল। তার জন্তে বিক্ষোভ তো দেখতেই পাচ্ছ। কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে জলে বাস কবা যায় না, তাই লোকে মেনে নিচ্ছে। দেখা যাক।

সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন : আপনার শ্লোকের মানেটা কী হল ?

শ্লোক আমার নয়, বাস্তবিক রামায়ণের অধোধ্য।

কাণ্ডেব শ্লোক এটি। এমন শোভিত পবিত্র নদীর কাছে এসে শ্রীবামচন্দ্র এই স্থানের চিত্রকূট পর্বতে বিশ্রাম নিলেন। মুগপক্ষীপূর্ণ এই স্থানে তাঁর এমন আনন্দ হল যে তিনি অযোধ্যা থেকে নির্বাসনেব কথা ভুলে গেলেন। বামচন্দ্র এখানে কী করে এলেন, সে কথা নিশ্চয়ই জান না। অযোধ্যা পরিত্যাগ করে তিনি গঙ্গা পার হয়ে শূঙ্গবেরপূর এলেন, এইখানে তাঁর গুহের সঙ্গে মিলন। তারপর এলেন ভরদ্বাজের আশ্রমে। ভরদ্বাজই তাঁকে চিত্রকূটে বাবার পরামর্শ দিলেন যমুনার তীরে তীরে, নৌকোয় অংশুমতী নদী পার হয়ে, বটবৃক্ষের এক ক্রোশ দূরে নীলকাননের পথে। চিত্রকূটে ছিল বায়ীকির আশ্রম। রামচন্দ্র এখানে কুটার নির্মাণ করলেন।

চিত্রকূট অক্ষয় হয়ে আছে রামচন্দ্রের অমর সঙ্কল্পের জ্ঞা। দশরথের মৃত্যুর পর ভবত বেরিয়েছিলেন রামচন্দ্রকে ফেরাবার জ্ঞা। তাঁর সঙ্গে অযোধ্যার সেনাদল। ভরত এসে ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌঁছলেন। মুনি বললেন, তোমার মায়েদের কথা বল। অপূর্ব ভরতের বর্ণনা। পরম শ্রদ্ধা বললেন কৌশল্যা ও স্মিত্রার কথা। কিন্তু নিজের মায়েব কথা বলতে তাঁর কণ্ঠ রোধ হল। বললেন, দেখতে আর্ষের মত, কিন্তু স্বভাবঅনার্থ আমার মা। দাস্তিক নির্বোধ রাণী স্নেহান্বিত রানী, তাঁরই জ্ঞা আমার পিতার মৃত্যু হল, আর বিচ্ছেদ হল ভ্রাতাদের সঙ্গে। ভরত কাঁদতে লাগলেন। ঋষি বললেন, দুঃখ করো না। রামের এই নির্বাসনে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ হবে।

ভরত চিত্রকূটের দিকে এগোলেন। সঙ্গে সেনাদল। ভয়ে বনের পশুপক্ষী বামেব আশ্রমের দিকে জুটল। লক্ষণ এক গাছে আরোহণ করে ভরতের সেনাদল দেখতে পেলেন। নেমে এসে বললেন, দাদা, ভরতের নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে, তাকে সায়েস্তা করবার অহুমতি দাও। রাম বললেন, না ভাই, তা হয় না।

যদু বিনা ভবতঃ স্রাং চ শক্রস্রং বাহপি মানদ।

ভবেয়ম স্থখং কিঞ্চিদ্ ভস্ম তৎকুরুতাং শিখী ॥

তোমাকে বা ভরত শত্রুকে বাদ দিয়ে যদি আমি কোন স্থখ চাই তো সে স্থখ আমার আশ্রমের শিখায় ভস্ম হোক।

রাম বললেন, তুমি জান না লক্ষণ, আমি আদেশ

কবলে ভরত তোমায় সমস্ত রাজ্য দান করবে। লক্ষণ শাস্ত হলেন।

তারপর এলেন ভবত। ‘আর্ঘ্য’ বলে রামের চরণে আছড়ে পড়লেন। আর কোন কথা কুইতে পারলেন না। উচ্চকণ্ঠে শক্রস্র উঠলেন কঁদে। বাম ভরতকে তুলে ধরলেন, জড়িয়ে চুমু খেলেন, শাস্ত হতে বললেন। ভরত পিতার মৃত্যুসংবাদ দিলেন, বললেন, পিতার স্থান এখন রামকে নিতে হবে। রাম বললেন, রাজ্যের ভার এবারে তুমি নাও। বশিষ্ঠ ও জাবালা মুনিও ভরতের মত রামকে রাজ্যভার গ্রহণেব জ্ঞা অহুরোধ জানাতে লাগলেন। রাম বললেন:

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রানপেয়াদ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজ্যেৎ।

অতীয়াং সাংগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞাং অহং পিতুঃ ॥

চন্দ্র তাঁর রূপ পরিহার করতে পারেন, হিমালয় পারে তুষার ত্যাগ করতে, সমুদ্র পারে বেলাভূমিতে গড়াতে, কিন্তু পিতৃসত্য আমি পালন করবই। আবও বললেন, তোমার মা যা করেছেন, সে তোমারই ভালর জ্ঞে। সেসব কথা তুমি ভুলে যাও, মাকে আবার ভক্তি কর, ভালবাস। তোমার কাছে সীতার ও আমার এই প্রার্থনা।

রামচন্দ্রের পাছুকা নিষে ভরত ফিরে গেলেন। রাম এগিয়ে গেলেন অত্রি অনশ্রয়ার আশ্রমে। সতী অনশ্রয়া গঙ্গাকে তাঁর আশ্রমের পাশ দিয়ে প্রবাহিত করেছিলেন। গঙ্গার নাম এখানে মন্দাকিনী। এই চিত্রকূটকে লোকে পিতৃতীর্থও বলে। কিন্তু কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বলেছেন রামগিরি।

সদী ভদ্রলোকটি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: এখন সেখানে দেখবার কী আছে?

কোটি তীর্থ, দেবাদ্বন, হুমান ধাবা, স্ফটিক শিলা, গুপ্ত গোদাবরী, ভবতকূপ, অনশ্রয়া। পাহাড়ের ধারে কোটি তীর্থ একটি পবিত্র কুণ্ড। অসংখ্য ঋষি এখানে ভপশ্রা করেছেন। হুমান ধাবায় একটি বিরাট হুমানের মূর্তি, তার এক হাতে একটি জলের ধারা পড়ছে। একটি বড় পাথরের উপর আছে পদচিহ্ন, তার নাম স্ফটিক শিলা। লোকে বলে, ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত কাকের রূপ নিয়ে এখানে সীতার পায়ে ঠুকরেছিল। রেবার মহারাজা নির্মাণ

কবেছেন লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। অত্রি অনসুয়ার
আশ্রমের নিকটে শুণ্ড গোদাবরী। আর সীতা কুণ্ড।
ভরতকুণ্ডের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। ভরতের
রাজ্যাভিষেকের জন্ত রাম অনেক তীর্থের জল সংগ্রহ
করেছিলেন। ভরত রাজী না হওয়ায় সেই জল যে কুণ্ডে
নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন, এখন তারই নাম ভরতকুণ্ড।

আর একটি জায়গার নাম না করলে চিত্রকূটের গল্প
অসমাপ্ত থাকবে। তুলসীদাসজী সেখানে বসে একখানা
পাথবে চন্দন ঘষতেন। আব রামচন্দ্রের কপালে তা লেপন
করতেন। এই ভক্তকে রাম দেখা দিয়েছিলেন।

চিত্রকূট কে ঘাট পৈ ভই সন্তন কী ভীর।

তুলসীদাস চন্দন ঘসে তিলক দেত রঘুবীর ॥

তুলসীদাসের জীবনের সঙ্গে কালিদাসের একটা মিল
আছে। জনশ্রুতি যদি সত্য হয় তো দুজনই কবি
হয়েছিলেন জ্বর কাছে থাকার খেয়ে। তুলসীদাস
জন্মেছিলেন ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বাবাব নাম ছিল
আত্মারাম ছবে, আর মায়ের নাম ছিল সী। চিত্রকূট থেকে
কুড়ি মাইল দূরে রাজপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। অপয়া মূল-
নক্ষত্রে জন্ম বলে পিতা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন।
নরহরীদাসজী তাঁকে মাহুয কবেন, তিনিই তাঁর গুরু।
গুরু তাঁকে বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে রামানন্দী মঠে নিয়ে
যান। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় শেষ সনাতনজী নামে
এক পণ্ডিতের সঙ্গে।

তুলসীদাসজী দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীকে
বিবাহ করে তাঁরই মোহে মত্ত হয়েছিলেন। সেই মহিলা
একদিন তাঁকে বিক্রপ করে বললেন :

অস্থিচরমময় দেহ মম তামে জৈসী প্রীতি।

তৈসী জো প্রীরাম মে হোতি ন তো ভবভীতি ॥

আমার অস্থিচর্যে তোমার প্রীতিক্ষয় না করে প্রীরামচন্দ্রে
মনোনিবেশ করলে তোমার পুনর্জন্মের ভয় দূর হত।

এই বিক্রপ তুলসীদাসজীর জীবনে পরিবর্তন আনল।
গৃহত্যাগ করে তিনি বিশ বৎসর তীর্থে তীর্থে ঘুরে
বেড়ালেন। অধোধ্যায় তিনি তাঁর বিখ্যাত রাম-
চরিতমানস রচনা শুরু করেন ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ
মঙ্গলবার।

তিনি যে বামচন্দ্রের শাফাৎ পেয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে
একটি অলৌকিক গল্প আছে। তুলসীদাসজী একটি
আমগাছের গোড়ায় জলসেচন কবতেন। সেই গাছে
এক ভূত থাকে। একদিন খুশী হয়ে ভূত বলল, তুমি বর
মাও। তুলসীদাসজী বললেন, রামের দর্শন চাই। ভূত
বলল, বেশ, ওই মন্দিরে রামায়ণ গান শুনতে রোজ
হুমান আসেন, তাঁকে ধর। হুমানকে ধরে তুলসীদাসজী
রামচন্দ্রকে দেখলেন।

এই সময়ে আর একজন কবি ছিলেন ভারত-বিখ্যাত।
তাঁর নাম হরদাস। হরদাসের বন্ধু হয়েছিল
তুলসীদাসজীব সঙ্গে। তুলসীদাস বলতেন :

সরসে বসিয়ে সরসে রসিয়ে

সরসে লিজিয়ে নাম।

হাঁ-জী হাঁ-জী করতে রহিয়ে

বৈঠে আপন ঠাম।

এর চেয়ে বড় উপদেশ আর কী হতে পারে।

[ক্রমশঃ]



আবতর্ন

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নিঃসঙ্গ নিভূতে বসি অবেলায় প্রতিটি নিমেষে,
লক্ষ্য করে গেছ আমি অলৌকতা বেদনা-বিধুর।
যন্ত্রণা-কুঞ্চিত চিত্ত পরিভূত নৈরাশ্রিতে এসে,
হারিয়েছি পথের সন্ধান। আনন্দ-ভৈরবীস্বর
বাজে নাকো অন্তর-বীণায়, পদে পদে পরিভব,
অপস্নাত ক্ষণে মোব কানে আসে কত জনবব!

জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলি আঁখিজলে মোর
স্নাত হয়ে চলে গেছে, ফুলে ফলে আর তৃণদলে
পরশ বুলায়ে। নিশিদিন কত কামনার ঘোব
মরমের স্তরে ছিল ব্যাপ্ত হয়ে। সকলি বিফলে
গেছে হুরাশার স্বপ্নজাল বুনে প্রাণের প্রচ্ছদে,
প্রাচীন অরণ্যসম আত্মা মোর জাগে জনপদে।

অনন্তকালের পথে বায়ে বাবে বিশ্ব-বিপর্ষয়
প্রকৃতিব রক্ত কোপানলে। কত মহাদেশ ডুবে
গেছে নীল সিন্ধুতলে, কে দিবে তাহার পবিচয়?
অন্ধার শিলার স্তূপে কঁাদে হীরকেরা চূপে চূপে।
শিলীভূত দীর্ঘখাম সকরণ ভূমিগর্ভতলে,
কালের দিগন্তপটে সাক্ষ্য হয়ে জ্যোতিষ্কেরা জলে।

সাম্প্রতিক কালান্তরে অবনীর নব রূপায়ণ,
অগ্রযাত্রা পরম বিশ্বাসে আণবিক পদক্ষেপে
জড়তার বাহু ভেদ করি। সভ্যতাব আবর্তন
নাহি স্বর্ণ অতীতের আদর্শেরে কেন্দ্র কবি এবে।
সত্য হতে সত্যান্তরে চলিযাছে বিজ্ঞানের দিন,
বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তি যুক্তিবাদে হবে কি বিলীন?

ইউক্যালিপটাসের ছায়া

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

রথের মেলার থেকে ছোট চাবা কিনে এনে কবে
পুঁতেছি উঠোন কোণে। আজ থেকে কত দিন হবে?
বছর তিনেক? কিংবা তাবো চেয়ে কম,
এতটুকু ছোট দেহ, বিশীর্ণ অক্ষম
বাঁচবে এমন আশা করি নি তখন।
বৃষ্টিশেষে দুর্বাঘাসে ভবেছে উঠোন,
মেলা থেকে কিনে আনা সেই ছোট চাবা
মুক্তিকার রস থেকে তবু সে পেয়েছে এক
উদ্ধত ইশারা।

তারপর কেটে গেছে কয়েক বছর
গ্রীষ্মের দহন-তপ্ত কত আলো বোদ বৃষ্টি ঝড়
কত অন্ধকার রাত উঠোনের ছোট ইতিহাসে
লিখেছে দিনের নাম সে চাবাব পাতাব নিঃশ্বাসে।

আজকে যখন রোদে ভরে গেছে আমার উঠোন
এতটুকু ছায়া নাই ধুধু-করা মরুর মতন
সুতীত্র দহন-দগ্ধ বৈশাখের নিষ্ঠুর বিকালে
ইউক্যালিপটাস-চাবা কখন যে নীববে বিছালে
নিবিড় ছায়াব তৃপ্তি প্রসারিত ঘাসের সংগীতে,
তার কোলে বসে আছি অপাংখব শান্তির অমৃতে।

মেলা থেকে কিনে আনা সেই চারা কখন কী করে
আজ এত বড় হল, বিছাল সে মরুব প্রান্তরে
আমার ছায়ার শান্তি, বিষ্রামের স্তূপ্ত সঞ্চয়।
এই এক ইতিহাস জন্ম থেকে যৌবন সময়,
যৌবনের প্রান্ত থেকে মৌন-নীল মৃত্যুর উৎসবে,
সমস্ত প্রাণের যাত্রা শেষবার উত্তরিত হবে।

ইউক্যালিপটাস-চারা ছায়া দিয়ে কী সংকেত আনে?
আমার মৃত্যুর দিন সে কি বলে, এসেছে এখানে!

যক্ষকত্ৰা

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[পূর্বাহ্নস্মৃতি]

তখন রাত কত খেয়াল নেই।
এ কদিন মাথার মধ্যে যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল আজ
যেন তা অনেক কম।

ক্লান্তি ছাড়া শরীরের মধ্যে আব কোনরকম কষ্ট
নেই। স্বরজিৎ আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বসল।
এ যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠা। মনে করতে পাবল
না কতদিন সে এভাবে বিছানায় গুয়ে আছে। ঋষী
থিয়েটার থেকে ফিরে এসে তার জ্বর হয়েছিল, ডাক্তারও
এসেছিল মনে পড়ছে, কিন্তু তারপব কী যে হল, ভাববার
চেষ্টা করতেই নিজেকে বড় দুর্বল মনে হল।

পাশ ফিরে দেখল ক্যাম্পখাটে মাধবী গুয়ে আছে।
বুঝতে বাকি রইল না শরীর তাব যথেষ্ট খারাপ হয়েছিল,
তা না হলে রাত্রে তাকে পাহারা দেবার জন্তে মাধবী এ
ঘরে গুতে আসবে কেন?

অনেক দূর থেকে ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে, ঘড়িতে
বোধ হয় চারটে বাজল। কিন্তু কোথাকার ঘড়ি! তারপব
মনে পড়ল জ্যাঠামশাইয়ের বৈঠকখানার পুরনো আমলের
বড় ঘড়িটার কথা। কিন্তু আশ্চর্য, এত দূর থেকে ওই ঘড়ির
আওয়াজ এত স্পষ্ট শোনা যায় এ ধারণা স্বরজিতের ছিল
না। সারাদিনের ব্যস্ততার কোলাহলেব মধ্যে যে
শব্দগুলো হারিয়ে যায়, নিশ্চয় পৃথিবীর বুকে তা কত স্পষ্ট
হয়ে ওঠে।

শুধু কি শব্দ, আমাদের মনের চিন্তাগুলোও এই
নির্জনতার মধ্যে যেন আরও বেশী করে দানা বেঁধে ওঠে।
তাদের যেন আমরা চিনতে পারি, বুঝতে পারি।

দাদা, তুই উঠে পড়েছিস?—মাধবীর ঘুম-জড়ানো
গলায় ব্যস্ততার স্বর।

এই মাত্র উঠেছি। তুই ঘুমো, এখনও সকাল হয় নি।
মাধবী কিন্তু স্বরজিতের কথা শুনল না, উঠে এল
স্বরজিতের খাটের কাছে। জিজ্ঞেস করল, আজ কিরকম
লাগছে?

খুব ভাল। আমার কী হয়েছিল বল তো?

একটু অবাক হল মাধবী : কেন, তোমার মনে নেই?
খুব পরিষ্কার নয়।

হু। তবে তুগিয়েছে খুব। রোজই তো প্রায়
একশো চার-পাঁচ জ্বর উঠছিল।

স্বরজিৎ নিজের হাত দুটো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে
দেখতে বলে, কতদিন বিছানায় গুয়ে আছি বে?

প্রায় পনের দিন।

স্বরজিৎ হাসল : তোদের খুব জ্বালাতন করেছি বল?
দাদাকে হাসতে দেখে মাধবীও খুশী হল : জ্বালাতন
আর করলি কোথায়, চুপচাপ তো গুয়ে থাকতিস।—একটু
থেমে জিজ্ঞেস করে, খিদে পেয়েছে, কিছু খাবি?

স্বরজিৎ শুধু বলল, তেঁটা পাচ্ছে।

বার্লি এনে দেব?

দে।

মাধবীর হাত থেকে গেলান নিয়ে খানিকটা বার্লি
পান কবল স্বরজিৎ। প্রশ্ন করল, আপিসে থবর দিয়েছিস?
হ্যা। অলকদা নিজে গিয়ে বলে এসেছে।

হঁ। ঋষী থিয়েটারেব কোন থবর আছে?

মাধবী স্বরজিতের খাটের ওপর বসে পড়ে বলল,

রমেন চৌধুরী এসেছিল থিয়েটার থেকে, তোমাব সঙ্গে দেখা করতে।

কেন, কিছু বলে গেল?

না। তবে দু-একদিনের মধ্যে আবার আসবে বোধ হয়, মনে হল বিশেষ কোন দরকার আছে।

স্বরজিৎ মুহু হাসল : আমাদের আর ওদের কী দরকার?

মাধবী অল্প কথা ভাবছিল, হঠাৎ বলল, জানিস দাদা, অলকদার সঙ্গে আর একজন ভক্তলোক এসেছিল তোর সঙ্গে দেখা করতে। আমি আগে কখনও দেখি নি ওকে, বড় অদ্ভুত কথা বলে।

কি নাম?

মাধবী চিন্তা করার চেষ্টা করে : নামটাই যে মনে পড়ছে না।

কিরকম চেহারা?

মাধবীর বর্ণনা শুনে স্বরজিতের বুঝতে বাকি রইল না, সে লোকটি স্ববোধ হাজরা ছাড়া কেউ নয়। যার কপালে সবুজ রঙের শিরা দুটো সব সময় ফুলে থাকে, চোখের কোণে কালশিরা। কালো চশমা, পবনে গেরুয়া রঙের খন্ডরের পাঞ্জাবি। কাঁধে ঝোলানো শাস্ত্রিনিকেতনী ব্যাগ।

স্বরজিৎ বলল, স্ববোধ হাজরা তো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, সে আবার কিরে এল কোথেকে?

তা আমি জানি না। তবে অলকদা বলছিল ওই স্ববোধ হাজরা নাকি নামাবকম প্র্যাম করছে। যার জন্তে তোমাকে ওর বিশেষ দরকার।

স্বরজিৎ সম্মুখে মাধবীর কাঁধে ওপর হাত রাখল। হেসে বলল, বলিস কি রে, আমি যে দেখছি এই কদিন অস্ব্থেব মধ্যে বেশ দরকারী লোক হয়ে পড়েছি। রুবী থিয়েটার থেকে লোক আসছে, স্ববোধ হাজরা খুঁজছে—

মাধবী আরও যোগ করে দেয়, বলতে ভুলে গেছি, তোমার নাটকেব খোঁজে একজন প্রকাশকও এসেছিল।

সবে তখন ভোর হচ্ছে, অন্ধকার সরে গিয়ে ভোরের মিষ্টি আলো মৃদু-ফোটা ফুলের মত ছড়িয়ে পড়ছে আকাশের বুকে। সেই দিকে তাকিয়ে স্বরজিৎ বলল, আহা, কি

সুন্দর দেখাচ্ছে বল তো। ভাগ্যিস আজ ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

মাধবী উঠে গিয়ে জানলাব কাছে দাঁড়াল : সত্যি, প্রকৃতির রাজ্যে কোনরকম একঘেষে মনেই। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আসে, অথচ মনে হয় প্রত্যেকটা দিন যেন আলাদা, প্রত্যেকটা রাত স্বতন্ত্র।

স্বরজিৎ সায় দিয়ে বলল, আমার আরও কী মনে হয় জানিস মাধু, প্রকৃতিব সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পাবলে চিন্তার প্রশ্রয়তা বেড়ে যায় অনেক। নিত্য-নতুন দিগন্ত আমরা খুঁজে পাই চিন্তা আর বাস্তবের মাঝখানে।

এই পর্যন্ত বলেই স্বরজিৎ থেমে গেল, কিরকম যেন অগ্ৰমনস্ত হয়ে গেল সে।

মাধবী অবাক হয়, জিজ্ঞেস করে, কি হল?

স্বরজিৎ কোন উত্তর দিল না।

কি ভাবছিস রে দাদা?

স্বরজিৎ একদৃষ্টে মাধবীর দিকে তাকিয়ে বলে, আমি যে নতুন নাটকটা লিখেছি তার নাম খুঁজে পেলাম— এখুনি, এই মাত্র।

কি নাম?

নতুন দিগন্ত। কি, ভাল নয়?

মাধবীর চোখ দুটো খুলীতে উজ্জল হয়ে ওঠে : বড় চমৎকার নাম।

স্বরজিৎ স্থির গলায় বলে, আমাব মনে হচ্ছে মাধু, এ নাটক সত্যিই মঞ্চরাজ্যে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে।

কথা হয়তো আরও চলত, পদ্মাবতী এসে পড়ায় তা থেমে গেল। এতক্ষণ তিনি পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন। ছেলেমেয়ের গলার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এসেছেন।

মাকে দেখে মাধবী সোচ্ছাশে বলল, দেখ মামণি, দাদার জর ছেড়ে গেছে। আর ভাবনা নেই।

পদ্মাবতী স্বরজিতের কপালে হাত দিলেন।

কথা বলল স্বরজিৎ, কদিন তোমাদের খুব জ্বালাতন করেছি, তাই না? যদিও আমাব কোন হুঁশ ছিল না।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন, সে যাই হোক, এখন ভাল লাগছে তো ?

স্বরজিৎ মায়ের হাত দুটি সজ্জেহে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলে, খুব ভাল লাগছে। মামণি, কদিন বিশ্রাম নেওয়া গেল, এবার আবার তেড়েফুড়ে কাজে লাগা যাবে।

পদ্মাবতী ব্যস্ত স্বরে বলেন, না বাবা, আগের মত দিনরাত অত খাটতে হবে না; শরীর ভেঙে যাবে। এবার আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

সেই দিনই সকালের দিকে রুখী থিয়েটারের ম্যানেজার রমেন চৌধুরী এল স্বরজিতের সঙ্গে দেখা কবতে। দাদার নির্দেশে মাধবী তাকে নিয়ে এল স্বরজিতের শোবার ঘরে।

বমেন চৌধুরী চেয়ারে বসতে বসতে সবিনয়ে বলে, অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন শুনে আপনাকে বিরক্ত করতে নাহসী হলাম।

স্বরজিৎ স্নান হাসল : ই্যা, আজ অনেকটা ভাল।

আমি আগেও আর একদিন এসেছিলাম।

শুনেছি। কি ব্যাপার বলুন তো ?

বমেন চৌধুরী মুকুটী চালে মাথা নাড়ে : হবীবাবু এবার নাটক বদলাচ্ছেন কিনা, তাই খবর দিতে এলাম।

কেন, সেল ড্রপ করেছে বুঝি ?

সুচরিতা চলে যাবার পর থেকেই। শুধু রবিবার বিকেলের শোটা টানছে। আর অগ্নদিন বিশেষ বিক্রি নেই।

স্বরজিৎ একটু বিরক্ত হয়েই বলে, অথচ সুচরিতাকে রাখবার জন্তে এতটুকু চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না হবীবাবু।

ওই তো ঠিক গৌ। কারুব কথা যদি শোনেন।—রমেন চৌধুরী গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলে, আবে মশাই, আমি আছি বলে আজও রুখী থিয়েটারে সময়মত পর্দা ওঠে। এক মাস যদি আমি না যাই, দেখবেন, থিয়েটারের মাথায় লালবাতি জলছে।

তা হলে আপনারাই বা কেন সুচরিতা দেবীকে ফিরিয়ে আনলেন না ?

রমেন চৌধুরী এক চোখ দিয়ে মিটি মিটি হাসে :

দোষ সুচরিতারও আছে। আরে মশাই, নাচতে নামলে কি আর ঘোমটা দিলে চলে ?

তার মানে ?

থিয়েটারে পার্ট করতে গেলে একেবারে সতী সাবিন্দী হলে চলবে কেন ? মালিকের সঙ্গে অন্ততঃ একটু ভাবসাব রাখতে হয় বইকি।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে কবল না স্বরজিতের। প্রশ্ন করল, আমার কি করবার আছে বলুন ?

নতুন নাটক দিতে হবে। প্রথম বইটা যখন আপনার লেগেছে পবেব বইটাও আমবা লাগাব। হবীবাবুর মুখে শুনলাম বেশ কিছুদিন থেকেই কোন নাটক নিয়ে আপনি খাটছেন।

স্বরজিৎ অগ্নদিকে তাকিয়ে বলল, ই্যা, নাটক একটা লিখেছি বটে, তবে জানি না, আপনাদের পছন্দ হবে কি না।

কি নাম ?

‘নতুন দিগন্ত’।

রমেন চৌধুরী উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে : দিব্যি নাম হয়েছে, ‘নতুন যুগের ভোরের’ পরেই ‘নতুন দিগন্ত’। আহা, নতুনের কি সমারোহ ! কিন্তু এখন আর নাট্যকার নতুন নয়। স্বনামধন্য স্বরজিৎ সেনগুপ্ত।

স্বরজিৎ তাড়াতাড়ি বলে, নাটক আমি দিতে পারি, তবে একটা শর্তে।

বলুন, শুনি কি শর্ত আপনার, মালিককে জানাতে হবে তো।

স্বরজিৎ দৃঢ়স্বরে বলে, নাটক আমি আপনাদের পড়ে শোনাব, যদি পছন্দ হয় নেবেন, কিন্তু তাবপর আর কোন রকম ভাবে আমি রুখী থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই না—অর্থাৎ পরিচালনা, শিল্পী-নির্বাচন এসবের কোন দায়িত্ব আমি নেব না, সে আপনি যতই বিপদে পড়ুন না কেন।

রমেন চৌধুরী হেসে বলে, সে সব পরের কথা পরে হবে। আগে বলুন, নাটক শোনাবার জন্তে হবীবাবুদের কবে নিয়ে আসব ?

স্বরজিৎ সামনের ক্যালেন্ডারটা দেখে নিশ্চয় বলল, শনি
কি রবিবার।

তা হলে আমি এখন উঠি।

নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে
রমেন চৌধুরী ফিরে দাঁড়াল : শুভ্রা আপনাকে একটা কথা
জানাতে বলেছে।

স্বরজিৎ মুখ তুলে তাকায়।

শুভ্রা থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে।

শরীরটা ধারাপ বুঝি ?

হ্যাঁ, রমেন চৌধুরী মুচকে হাসল : জানেন তো সবই।
মেয়েটাকে তখন কত সাবধান করেছিলাম, শুনল না।

বাহুদেবের পাঞ্জায় পড়ে একেবারে গোল্লায় গেল।

স্বরজিৎ হঠাৎ প্রশ্ন করে, বাহুদেবের কোন খবর
পেয়েছেন ?

আপনিও যেমন! এখন কিছুদিন সে বেশ গা-ঢাকা
দিয়ে বেড়াবে। ওসব ছেলেকে আপনি চেনেন না। এক
একটি চিঙ্গ, কলকাতায় পুঁতলে এরা বোম্বাইতে গাছ হয়ে
বেরয়। আচ্ছা, আজ চলি।

রমেন চৌধুরী চলে গেলেও কথাগুলো স্বরজিতের
কানে বাজতে লাগল। শুভ্রার জন্তে তার দুঃখ হল অথচ
কীই বা করবার আছে।

তখনও কফিহাউসে বিশেষ কেউ আসে নি, সকালের
ভিড়টা চলে গেছে। দুপুরের ভিড় আসবে একটার পর—
অফিসে যখন টিফিনেব ছুটি হয়। এই মাঝখানের
সময়টায় তারাই আসে কফিহাউসে, যারা একটু নির্জনে
বলে কথা বলতে চায়।

বা দিকের দেওয়াল-ঘেঁষা কোণের টেবিলটায় কয়েকটি
ছেলে গভীর মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছিল স্ববোধ
হাজরার। স্ববোধ হাজরাকে এখন দেখলে মনে হয়
আগের চেয়ে তার চেহারার উন্নতি হয়েছে অনেক,
চোখেমুখে ক্লাস্তির অবসাদ আর নেই। পরনে যদিও
তার মার্কাযারা গেক্সা পাঞ্জাবি আর পায়জামা, তবে
হুটোই ধোপহরস্ত। হাতের সিগারেটটায় একটা জোরে

টান দিয়ে বলল, আমার সঙ্গে কাজ করার একটা বিপদ
আছে, তা আগে থেকে জানিয়ে রাখছি। আমি বড় বেশী
নিয়ম মেনে চলি, তোমাদেরও নিয়ম মানতে হবে।

ছেলেরা প্রায় সম্বরে বলল, আমরা আপনার জন্তে
জান লড়িয়ে দেব স্ববোধদা।

স্ববোধ হাজরার বুক গর্বে ফুলে উঠল : প্রগতিমঞ্চ
আমার নিজের হাতে গড়া, অথচ যেদিন সেখান থেকে
চলে এলাম, তোমরা সবাই রমাদির দিকে হাত তুলেছিলে।
আজ বুঝতে পেরেছ—

আমরা ভুল করেছিলাম স্ববোধদা, এই নাক-কান
মলছি, আর কখনও এরকম বোকামি করব না।

কুস্তল ভেবেছিল স্ববোধ হাজরাকে বাদ দিয়ে সে
প্রগতিমঞ্চ চালাবে। এখন কি রকম—বসে বসে বুড়ো
আঙুল চুষতে হচ্ছে না ?

একটি ছেলে প্রশ্ন করল, কবে থেকে আমরা কাজ শুরু
করব স্ববোধদা ?

স্ববোধ হাজরা সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে বলে,
খুব বেশী হলে আর একটা মাস। এবার শুধু ক্লাব নয়।
একেবারে থিয়েটার গড়ব। আব ছেলেখেলা নয়,
সত্যিকারের কাজ।

সকলের কণ্ঠে বিস্ময় : সত্যি বলছেন !

স্ববোধ হাজরা চোখ দুটো ছোট করে বলে, আমি যে
কাজে হাত দিই একেবারে পাকা কাজ। আজ এই
টেবিলে বসে তোমাদের বলে রাখছি, দুটো-বছর আমাকে
সময় দাও, আবার আমি মৃতপ্রায় নাট্য-আন্দোলনকে
জাগিয়ে তুলব।

বোধ হয় স্ববোধ হাজরার আরও কিছু বক্তৃতা দেবার
ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অলক ঘোষ এসে পড়ায় থামতে বাধ্য
হল। অলক ভেবেছিল স্ববোধ হাজরাকে একাই দেখতে
পাবে কফিহাউসে—যে-রকম দেখেছে আগেও। বিশেষ
করে আজ যখন টেলিফোন করে স্ববোধ তাকে ডেকে
পাঠিয়েছে কোন কথা বলাব জন্তে। অথচ বারী স্ববোধকে
ঘিরে বসে আছে তাদের মধ্যে বেশীভাগই অলকের
পরিচিত ছেলে, প্রগতিমঞ্চের সভ্য।

অলক ঘোষ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, মীটিং নাকি ?

স্ববোধ হাজরা আগের মত মগর্বে মন্তব্য করল, মীটিং নয়, কন্ফারেন্স।

ওর কথার ধরনে কৌতুক বোধ কবলেও অলক ঘোষ তা প্রকাশ কবল না। শুধু চোখ দুটো বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, কিসের ?

নাট্য-আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার।—এবার স্ববোধ হাজরা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা যেতে পার। অলকের সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে। তবে মনে রেখ, প্রতিদিন এই সময় আমাকে কফিহাউসে পাবে। ইচ্ছে করলে দেখা করতে পার। আর অন্য ছেলেবাও যদি দেখা করতে চায় এখানে পাঠিয়ে দিও।

সবাই চলে গেলে অনেক দিন পরে আবার দুই বন্ধুতে কফির পেয়ালা নিয়ে বসল। অলক ঘোষ তাবিফ করে বলে, না, তোর বাহাদুরি আছে। এরই মধ্যে এতগুলো ছেলে জুটিয়ে ফেলেছিস ?

স্ববোধ হাজরা আডচোখে অলকের দিকে তাকিয়ে বলে, এ তো কিছুই নয়, দেখবি আরও কত ছেলে আসে। শুধু তো প্রগতিমঞ্চ নয়, সব দল থেকেই আসতে চাইছে। এবার যা দল গড়ব, তাক লাগিয়ে দেব সবাইকে।

অলক ঘোষ কিন্তু কোন কথা বলল না। চামচ দিয়ে কফির তলাকার চিনিটা নাড়তে লাগল।

স্ববোধ হাজরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার প্র্যানেস কথা বলে গেল। কি ভাবে সে দল গড়বে, কি তাদের আদর্শ, কি ধরনের নাটক তারা প্রযোজনা করবে সব কিছুর ফিরিস্তি দিতে গিয়ে বুঝতে পারল অলক খুব মন দিয়ে তার কথাগুলো শুনছে না।

স্ববোধ হাজরা একটু চটেই প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার ? কথাগুলো কানে চুকছে না কি ?

অলক নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, শুনলাম।

শুধু শুনলে, মনে ধরল না ?

অলক ঘোষ একটা সিগারেট ধরাল : তা নয়, ভাবছি,

মানুষ যখন দল গড়ে, কত তার উৎসাহ, কী নিষ্ঠার সঙ্গে খাটে; কিন্তু যখন সেই দল ভাঙে, এক মিনিটেরও বেশী বোধ হয় সময় লাগে না। সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তবে যেন সে স্বস্তি পায়।

স্ববোধ হাজরা কথাগুলো ভালভাবে নিতে পাবে না, বলে, তার মানে, তুমি কি বলতে চাও আমিই প্রগতিমঞ্চ ভেঙে দিয়েছি ?

অলক হাসল : আমি তোমার কথা মোটেই বলি নি স্ববোধ। ব্যক্তিগতভাবে কারুর বিরুদ্ধেই আমার নালিশ নেই। শুধু দুঃখ হয় এই ভেবে, একের পর এক নাট্যাগোষ্ঠীগুলো ভেঙে যাচ্ছে। একটা দল ভেঙে তিনটে দল হচ্ছে। কতটুকু শক্তি তাদের। যেখানে একটা বিরাট নাট্য-আন্দোলনের দরকার সেখানে তারা কী করতে পাববে। আমি আলোব কাজ করি, ক্রটির জন্তে সব দলেই আমার ঘুরতে হয়। কারুর সঙ্গে আমার বগড়া নেই, সকলের সঙ্গেই আমার ভাব। কিন্তু যখন দলাদলির গল্প শুনি, হিংসে আর নোংরামির পরিচয় পাই তখন মনটা বিরক্তিতে ভরে যায়।

অলক ঘোষকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে স্ববোধ হাজরা টিপনি কাটে : তুই যে একদিনের মধ্যেই দার্শনিক হয়ে পড়েছিস দেখছি।

হয়তো হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এই সব বিভিন্ন দলের মধ্যে মনের সঙ্গীর্ণতা দেখে এক-একসময় মনে হয় এ কাজ ছেড়ে দিয়ে আর কিছুতে চলে যাই। অন্ততঃ মনে খানিকটা শান্তি পাব।

নাঃ, তুই একটা মেয়েছেলেব অধম। আমাকে দেখ দিকি। প্রগতিমঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ভেবেছিলাম আর থিয়েটারের লাইনে যাব না। কিন্তু পারলাম থাকতে ? আবার দল গড়ছি, আবার জান লড়িয়ে কাজ করব।

অলক স্ববোধ হাজরার উজ্জল মুখখানার দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করেই মনের কথা চেপে গেল। বলল, সত্যিই তোরা নম্র লোক। এক কথায় তুলনাহীন।

এইবার কাজের কথা পাড়ল স্ববোধ হাজরা : স্বরজিৎ কেমন আছে ?

জর নেই, পথ্যি করেছে। আমি তোর কথা বলে রেখেছি।

তা হলে তো ওর সঙ্গে এখুনি একবার দেখা করা দরকার।

কবে যাবি বল?

স্ববোধ হাজরা পকেট থেকে ডায়ারি বার কবে অনেক-গুলো পাতা উলটেপালটে দেখে বলে, দিনকয়েক বাদে তোকে জানাব। আগে জমিব ব্যাপারটা পাকা হয়ে থাক।

অলক ঘোষ কিন্তু এবার হাসি চাপতে পাবল না, বলল, জমিব কথা এখনও ভুলিস নি দেখছি।

স্ববোধ হাজরা চোখমুখ পাকিয়ে টেবিলের ওপর এক চাপড় মারে: ভুলব মানে, তুই ভাবছিস আমি পাগলামি করছি? ওই জমিটা আমার চাই, তার ওপরে টিনের চাল তুলে আমি বাড়ী করব, থিয়েটার করব, যা খুশি তাই করব। আমি এতদিনে বুঝতে পেয়েছি আসলে দরকার একটা জায়গা, একটা কেন্দ্র। যেটা না হলে কোন দল বাঁচতে পারে না। কোন আন্দোলনকে রূপ দেওয়া যায় না।

অলক ঘোষের আর এক জায়গায় ধাবাব কথা থাকায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আজ আমি উঠি রে স্ববোধ, দরকার আছে।

স্ববোধ হাজরা বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা করে না। বলে, বুঝতে পারছি, আমার প্ল্যানটা তার মন:পুত হয় নি। তবে স্ববজ্রিকে মনে হয় আমি ঠিক বোঝাতে পারব। ও ছোকরার কিছু বুদ্ধি আছে।

অলক হাসতে হাসতে বলল, বেশ তো, একদিন যাওয়া যাবে ওর বাড়ি। তুই আমায় আগে থেকে জানিয়ে দিস।

চলে গেল অলক ঘোষ। সেদিকে তাকিয়ে অভ্যেস মত মুখ বঁকাল স্ববোধ হাজরা। মনে মনে বলল, অলকটা এখনও একটা ভেড়ার মতই আছে। কুস্তল আর রমাদিকে ও বাঘের মত ভয় পায়।

স্বরজিৎ এখন সম্পূর্ণ স্বস্থ। ইতিমধ্যে দুদিন সে অফিসও করে এসেছে, তবে সাহেবের অমুমতি নিয়ে বিকেলের দিকে একটু সকাল-সকাল বাড়ি চলে আসে।

অবসর সময়ে বসে বসে 'নতুন দিগন্তে'র পাণ্ডুলিপিতে অদল-বদল করে। কদিন বাদেই দ্বীবা-বুঝা স্তম্ভে আসবেন, এ নাটক তাঁদের পছন্দ হবে কিনা বলা শক্ত, তবে যদি হয় এবং তাঁরা রুবী থিয়েটারে নাটক মঞ্চস্থ কবেন স্বরজিৎ এক দিক থেকে খুশী হবে। এ খুশী হওয়া নাট্যকাব হিসেবে। নাট্যকার নাটক লিখে আনন্দ পান, প্রীত হন ছাপাব অক্ষরে দেখলে, কিন্তু খুশী হন বোধ হয় তার অভিনয় দেখলে মঞ্চের ওপর। রুবী থিয়েটার কেন, যে-কোন থিয়েটার এ নাটক নিলে স্বরজিৎ সানন্দে তাদের অমুমতি দিত অভিনয় করবার।

সন্ধ্যাব দিকে অবশ্য প্রতিদিন অলক আসে, কখনও বসে তাসের আড্ডায়, কখনও বা শুধু গল্পগুস্তাব। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে রাত্রিবেলা সে চলে যায়। অলক আর মাধবীর বিয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে কথা গুঠে, স্বরজিৎ সব সময় বলে, আর কটা মাস যেতে দাও মামণি। শীতটা পড়ুক, সেই সময় বিয়ে দেবার প্রশস্ত সময়।

পদ্মাবতী হয়তো বলেছেন, সে তোরা যা ভাল বুঝবি কব। তবে আমার মনে হয় বিয়ে-খার কথা যখন ঠিক হয়ে গেছে তখন বেশীদিন ফেলে না রাখাই ভাল।

সে নিয়ে তুমি ভয় পেয়ো না মা। অলক বড চমৎকার ছেলে। কথার নড়চড় ওর দিক থেকে হবে না। তবে আমিও ওকে একটু সময় দিতে চাই, ততদিনে ও নিজেকে একটু গুছিয়ে নেবে।

কথাটা মিথ্যে নয়, এই বিষয় নিয়ে স্বরজিতের সঙ্গে অলকের যখনই কথা হয়েছে, অলক সব সময় বলেছে, আমি একটা জিনিস বুঝি দাদা, কতখানি পর্যন্ত আমার সাধ্য, আব কোনটা আমার সাধ্যের বাইরে।

স্বরজিৎ বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করেছে, হঠাৎ এ কথা কেন?

মাধবী এ বাড়িতে যে ভাবে মানুষ হয়েছে সেই ভাবেই তো আমাকে রাখতে হবে। প্রেম আবেগ সবেরই দাম আছে। কিন্তু সেইটাই তো সব নয়। বিয়ের পর গাছতলায় শুয়ে আকাশের চাঁদ দেখতে কোন দম্পতিই বোধ হয় রাজী হবে না।

তা হলে বক্তব্যটা কি?

অলকের মুখে স্তনিশ্চিত হাসি: আর কটা মাস সময়

চাই। সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের কাছে তিন কামরার সুন্দর একটা ফ্ল্যাট দেখেছি। আমারই এক বন্ধু থাকে, ট্রান্সফার হয়ে চলে যাচ্ছে কলকাতার বাইরে। ফ্ল্যাটটা আমায় দিয়ে যাবে। এখন থেকেই মাধবীকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে নানারকম ফার্নিচার দেখে রাখছি। প্র্যান মত চলতে পারলে কয়েক মাসের মধ্যে সংসার গুছিয়ে বসতে পারব।

স্বরজিৎ হাসতে হাসতে বলে, সত্যিই তুমি সংসারী লোক অলক। আমাব মাথায় এত ঢোকে না।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব মাধবীকে স্থায়ী করতে।

অলকের গলার আবেগটুকু স্বরজিৎকে স্পর্শ করল। তার পিঠেব ওপর হাত রেখে স্বরজিৎ বলে, সে বিষয়ে আমাব মনে কোন সন্দেহ নেই অলক।

এ ছাড়াও অলকের সঙ্গে আলাপ হয় তার নানা বিষয় নিয়ে—বিশেষ করে থিয়েটারের কথা। স্ববোধ হাজরার প্রসঙ্গ উঠলে অলক বলে, আমার মনে হয় দাদা, স্ববোধের মাথাটা এই খারাপ হয়ে গেছে।

কেন বল তো?

তা না হলে কেউ প্রগতিমঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে আবার দল গড়ার চেষ্টা করে! শুধু দল নয়, সেই সঙ্গে থিয়েটার!

স্বরজিৎ প্রশ্ন করে, টাকাকড়ি ষোগাড় করেছে নাকি?

অলক না হেসে পারে না : তুমিও যেমন, কোনরকমে খাওয়া-পরা চলে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন দেখা। একটা গরুর গোয়ালে সে টিনের চাল দিয়ে থিয়েটার করবে বলছে। কে দেখতে আসবে বল তো?

স্ববোধ যে বলেছিল আমার কাছে আসবে।

সে আর বলতে হবে না, ঠিক এসে পড়বে একদিন। ওর বকর-বকর শোনার ভয়ে আমি তো কফিহাউসে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি।

স্বরজিৎ হেসে প্রশ্ন কবল, ও আজকাল বোজ কফি-হাউসে যাচ্ছে বুঝি?

অলক চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, শুধু যাচ্ছে নয়, বড় বেশী যাচ্ছে। সকাল দুপুর বিকেল একপাল চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে বসে থাকে। সবাই কফি খায় আর

মাঝে মাঝে কোরাসে ট্রিমোলো দিয়ে স্ববোধদা স্ববোধদা বলে চৈচিয়ে ওঠে।

স্বরজিৎ ভয় দেখিয়ে বলে, দাঁড়াও, স্ববোধ হাজরার আশ্রুক, তুমি যা বলছ ওকে বলে দেব।

সর্বনাশ হয়ে যাবে দাদা, তা হলে আমায় কলকাতা-ছাড়া করবে।

কিছুক্ষণ পরে অলক নিজেই প্রশ্ন করে, কই, 'নতুন দিগন্ত' আমাকে পড়ে শোনালে না?

শোনাও একদিন। এখনও কয়েকদান করছি।

হুসীবাবুরা কবে নাটক শুনতে আসছেন?

সামনের বিবিবাব, সকালবেলা।

আমি সে সময় থাকলে আপত্তি আছে?

মোটাই নয়, নিশ্চয় এস।

রবিবার দিন সকালবেলা নির্ধারিত সময়ে হুসীবাবুর বড় গাড়িখানা এসে দাঁড়াল স্বরজিৎের বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে শুধু হুসীবাব নামলেন না, তাঁর সঙ্গে ছিলেন ম্যানেজার রমেন চৌধুরী, পরিচালক রতীন ঘোষাল আব মন্দিরা গুহ। মন্দিরাকে দেখেই মনে মনে বিরক্ত হল স্বরজিৎ। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করে সকলকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে বসাল ড্রইংরুমে। অলক আগে থেকেই এসেছিল, ভেতর থেকে পান সিগারেট এনে সাজিয়ে দিল টেবিলের ওপর।

হুসীবাবুর চিরাচরিত সাজ। কালো নরুন পাড় ধুতিব উপব গিলে-করা পাঞ্জাবি, তাতে হীরের বোতাম, মুখে এক গাল পান। অমায়িক হেসে বললেন, আপনার শরীর খাবাপ, বিবস্ত্র করার ইচ্ছে ছিল না, যদি না হঠাৎ এ বকম নাটকেব দরকার পড়ত।

রতীন ঘোষাল টেনে টেনে হাসলেন : স্বরজিৎ ভায়া, এখন তোমারই সময়, পর পর খানকয়েক জোয়ালো নাটক যদি বাজাবে ছাড়তে পার তা হলে আর দেখতে হবে না।

তাড়া মারল রমেন চৌধুরী : তবে আর দেরি কেন, নাটক শোনা যাক।

বাধা দিয়ে স্বরজিৎ বলল, চা-টা দ্বিধে যাক, তারপরই পড়তে শুরু করা যাবে।

হুসীয়াবু হাত নেড়ে বাধা দিলেন, সেজ্ঞে ব্যস্ত হবেন না, চা একসময় খেলেই হবে।

অগত্যা স্বরজিৎ নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। বলে, আমি যদি খাটে বসে পড়ি, আশা করি, আপনাদের আপত্তি হবে না। প্রযোজনবোধে বালিশে টেন দিতে পারব।

সকলেই সমর্থন করে বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি ভাল করে বসুন।

স্বরজিতের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মন্দিরাও উঠে দাঁড়াল। খাটের কাছে রাখা বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, আমি ওইখানে বসব, শোনবার সুবিধে হবে।

স্বরজিৎ খাটের ওপর গুছিয়ে বসে প্রথম অঙ্কের পাতা বার করল, মন্দিরা একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। নীচু গলায় বলল, আমি যে আজ এসে পড়ব আপনি নিশ্চয় আশা করেন নি ?

স্বরজিৎ ব্যবহারিক গলায় ছোট্ট উত্তর দিল, এসেছেন বলে আশ্চর্যও হই নি।

যখনই শুনলাম আজ আপনি নিজে নাটক পড়ে শোনাবেন, কিছুতেই থাকতে পারলাম না। চলে এলাম একরকম অনাহুতের মত। কিন্তু কি করব বলুন, আপনার নাটক আমার বড় ভাল লাগে।

স্বরজিৎ হাসল : দেখুন, এ নাটক পছন্দ হয় কিনা।

মন্দিরা জোব দিয়ে বলে, হবেই—এ আমি জানি।

নাটক পড়তে শুরু করল স্বরজিৎ। সকলে একাধ্র মনে শুনছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। কেউ এতটুকু নড়েচড়ে বসে না। প্রথম অঙ্ক পড়া শেষ হতে অলক চা মিষ্টি এনে নিঃশব্দে পরিবেশন কবল সকলকে। সকলেই তা গ্রহণ করল, কিন্তু পাছে নাটকের পরিবেশটুকু নষ্ট হয়ে যায় তাই ‘হ্যাঁ’ ‘না’ ছাড়া বিশেষ কথা কেউ বলল না। নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে খুব যে একটা চমক-লাগানো নতুনকিছু আছে তা নয়, কিন্তু শাসন-নীতির দৌর্বল্যে সমাজ-ব্যবস্থায় যখন পচ-ধবে, তারই একটা বাস্তব আলোখ্য চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কবেছে স্বরজিৎ। যা স্তম্ভ রোখার মাধ্যমে উজ্জল হয়ে উঠেছে। এতখানি বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়ে নাটক লিখতে সাহস করে না বেশীর ভাগ লোক। এইখানেই স্বরজিতের বাহাদুরি।

সব স্বার্থ-সংঘর্ষের অন্তবালে নাটকে যে একটি মহৎ আদর্শের উচ্চারণ আছে সেইটেই অন্ধকূপের বাইরে নতুন দিগন্তের ইশারা।

তার চেয়েও বড় কথা প্রত্যেকটি চরিত্র এ নাটকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, উদ্বেগহীন সংলাপ নেই বললেই চলে। মাহুঘের প্রতি নাট্যকারের গভীর মমতাবোধ প্রত্যেকটি দৃশ্যে উজ্জলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ নাটক নাট্যিক-প্রধান। স্বরজিৎ অলকার যে ছবি এঁকেছে তা একদিকে যেমন হৃদয়কে স্পর্শ করবে, আর একদিকে তেমনি তাব বিদ্রোহী মনোভাব দর্শককে ভাবিয়ে তুলবে। অলকা খাটি বাংলাদেশের মেয়ে। তার কথাবার্তায় চালচলনে শহবেব গ্রামামিণী একেবারে নেই, অথচ মনের দিক থেকে সে সংস্কারমুক্ত। আধুনিক জীবনের সবটুকু ভালকেই সে গ্রহণ করেছে হাসিমুখে। অলকা এমন একটি মেয়ে যাকে ভাল না বেসে পারা যায় না, অথচ যাকে সমীহ করতে ইচ্ছে করে সকলের।

নাটক পড়া শেষ হয়ে গেলেও সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। প্রথম কথা বলল মন্দিরা, অপূর্ব নাটক। অলকার ট্রাজেডির কথা ভেবে এখনও আমার চোখে জল আসছে।

সত্যিই চোখ মুছল মন্দিরা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা কবল অন্তরাও।

হুসীয়াবু কানে পালক দিতে দিতে বললেন, বয়েমবাবু, আর কিছু ভাববাব নেই। কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, রবী থিয়েটারের পববর্তী আকর্ষণ ‘নতুন দিগন্ত’।

রতীন ঘোষাল ঘন ঘন নশ্তি নিচ্ছিলেন, বললেন, দেখতে হবে না হুসীয়াবু, এ একেবারে হিট নাটক। মন্দিরার-জন্মেই যেন পার্ট লেখা হয়েছে, অলকার চরিত্র অভিনয় করে মন্দিরা ফাটিয়ে দেবে।

এ ধরনের আলোচনা চলল অনেকক্ষণ ধবে। অনেকে হয়তো অনেক রকম কথা বলবেন কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই একমত—তা হল নাটকেব কাঠামো, যে ভাবেই মধ্যে নামানো হোক না, এর সাফল্যের বিষয়ে কারুর মনে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ রইল না।

ঠিক হয়ে গেল সামনের সপ্তাহে স্বরজিৎ নাটকের একটি কপি দিয়ে আসবে হুসীয়াবুর কাছে। দিন মশেকের

দ্বিমধ্যে রিহার্সাল শুরু হয়ে যাবে। 'নতুন দিগন্তে'র শুভ-উদ্বোধন হবে ইংরেজী মাসের ১লা থেকে; অতএব হাতে এখনও পাঁচ সপ্তাহ সময়।

গাড়িতে ওঠবার আগে মন্দিরা স্বরজ্জিৎকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, আপনি আমার কথা রেখেছেন দেখছি।

স্বরজ্জিৎ না বুঝতে পেবে প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার?

বলেছিলাম, আম্রাব জীবন নিয়ে একটা নাটক লিখুন, দেখছেন তো সকলে কি রকম ভাল বলছে।

আপনার জীবন।

মন্দিরা গ্লান হাসল : অলকা যে কাকে দেখে লিখেছেন, তা কি আমি বুঝতে পারছি না। ভয় নেই, আমি কাউকে বলব না, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, ফুটিয়েছেন চমৎকার। আপনি যখন অলকার কথাগুলো পড়ছিলেন, মনে হচ্ছিল ঠিক যেন আমি নিজের কথা বলছি।

কথাগুলো শেষ করে মন্দিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর কিছু বলবার সুযোগ পেল না স্বরজ্জিৎ। হঠাৎবা আগে থেকেই ব্যস্ত হচ্ছিলেন বাবাব জগ্গে, মন্দিরাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে প্রস্থান কবলেন।

অলক আর স্বরজ্জিৎ ঘরের মধ্যে ফিরে এল। এতক্ষণ অলক নাটক লম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করে নি। খাটের কাছে গিয়ে পাড়ুলিপি বপাভা ওলটাতে ওলটাতে বলল, এতদিনে একটা মনের মত নাটক গুললাম।

তোমার ভাল লেগেছে অলক।

শুধু ভাল নয়, বড় ভাল। কাব্যের কথা আমি বলছি না, সে নিয়ে হয়তো কারও কারও মতাস্তর থাকতে পারে। কিন্তু নাটক লেখার শৈলী তুমি থুরোপুরি আয়ত্ত্ব করেছ এ কথা মানতে সকলে বাধ্য হবে। সংঘর্ষ উত্তেজনা উদ্বেগ সারা নাটকের মধ্যে এমন করে ছড়ানো যে, এক মিনিটের জগ্গে আমাদের অন্য কথা ভাবতে দেয় নি।

এই সময় মাধবী এসেছিল ট্রে নিয়ে খালি কাপ-ডিসগুলো ভেতরে নিয়ে যেতে, তাকে উদ্দেশ্য করে অলক বলল, নাটকটা তোমার শোনা উচিত ছিল মাধবী।

মাধবী কাজ করতে করতে ছোট্ট উত্তর দিল, আমি আগেই শুনেছি। আমাকে আর মাকে দাদা দিনকয়েক আগে পড়ে শুনিয়েছে।

অলক গুনে আশ্চর্য হল : কই, আমাকে তো সে কথা একবারও বল নি।

দাদা বারণ করেছিল বলতে।

বোনকে সমর্থন করল স্বরজ্জিৎ, বলল, সত্যিই আমি ওদের বারণ করেছিলাম। অলক, কারণ একবার গল্পটা জানা হয়ে গেলে তখন নাটক ভাল কি মন্দ সে মতামত দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

মাধবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসছিল।

স্বরজ্জিৎ প্রশ্ন করল, হাসছিস কেন?

আমি ভাবছি তোমাদের মন্দিরা গুহর কথা। কি বলে এই সকালবেলা ঘোর গোলাপী রঙের শাড়িটা পরে এসেছিল। ওই তো - আবলুশ কাঠের মত গায়ের রঙ।

অলক থামিয়ে দিয়ে বলে, মন্দিরা গুহ সঙ্ঘে ওভাবে কথা বলো না মাধবী, 'নতুন দিগন্তে'র উনিই হিবোইন।

মাধবী গালে হাত দিয়ে শিউরে উঠল : লেকি রে দাদা, মন্দিরা গুহ অলকার পার্ট করবে। তা হলেই হয়েছে। ও বই আর কেউ দেখবে না।

দাদাকে বলে কোন লাভ নেই, উনি কবী থিয়েটারকে নাটক দিয়ে দিয়েছেন।

মাধবী মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, এটা কিন্তু ভোর উচিত হয় নি। একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল।

স্বরজ্জিৎ হেসে বলল, আমি নাট্যকার, নাটক লেখা পর্যন্ত আমার দায়িত্ব। তারপর কে কিভাবে মঞ্চস্থ করবে তা নিয়ে আমার কি বলার আছে?

এত ভাল নাটকটা নষ্ট না করে ফেলে।—নিজের মনেই প্রায় বিড় বিড় করে বলল মাধবী।

স্বরজ্জিৎ আর কোন উত্তর না দিয়ে আমাদের ঘরের দিকে চলে গেল।

[স্থানাভাব হেতু এই সংখ্যায় শেষাংশ সম্পূর্ণ দেওয়া গেল না।]

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে বিদ্যাসাগর

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

দুর্ভিক্ষ মনস্তর মহামারী ইত্যাদি বাংলাদেশের পক্ষে এমন কিছু নতুন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মনস্তর এবং পঞ্চাশের মনস্তরের মত দু-দুটো সর্বনাশা মনস্তরের অভিজ্ঞতা হয়েছে বাঙালীর। ১১৭৬ আব ১৩৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়েও অনেকগুলি ছোটখাটো দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়েছিল বাংলাদেশে, এ কথা আমরা জানি। দৃষ্টান্তরূপ বাংলা ১২৭২-৭৩, ১২৮০-৮৩, ১২৯১-৯২, ১২৯৮-৯৯, ও ১৩০৪-০৭ সালে দুর্ভিক্ষের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে পারি। উপবি-উক্ত দুর্ভিক্ষে বহুরগুলির মধ্যে বাংলা ১২৭২-৭৩ অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৬৬-৬৭ সনের দুর্ভিক্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুখ্যাত ছিয়াত্তরে মনস্তর এবং পঞ্চাশের মনস্তরের মধ্যবর্তী সময়ে এইটাই উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষে বহুব বাংলায়। অবশ্য এই ১২৭২-৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার হুগলি মেদিনীপুর অঞ্চল অপেক্ষা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উড়িষ্যা প্রদেশই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মোট কথা, বড় বড় মনস্তর মহামারী ছাড়াও এই ধরনের ছোটখাটো দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা বাঙালীর জীবনে গা-সওয়া ব্যাপারের সামিল। তা ছাড়া, এই রকম ছোটখাটো দুর্ভিক্ষগুলি স্জলা স্ফলা শস্ত্রশামলা এই বাংলাদেশের অবশিষ্ট গর্বটুকুকে যেন বারেবারে ভুলুপ্তিত করতে চেয়েছে। কিন্তু বাংলার প্রাণশক্তি অপরিমেয়। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় সগর্বে বলতে পারি— ‘মনস্তবে মরি নি আমরা, মারী নিষে ঘর করি’।

উপবি-উক্ত ১২৭২-৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে পীড়িত জনগণের সেবায় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর কিভাবে নিজের স্বাধীনতা নিয়োগ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রয়াসের কথা তাঁর চবিত্তকারেরা যা বিবৃত কবে গেছেন, তা ছাড়াও [ইতিপূর্বে অনালোচিত] একখানি বাংলা নাটকের সাক্ষ্যই আলোচ্য প্রবন্ধের উপজীব্য। ওই নাটকখানিতে বিদ্যাসাগরের দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ-প্রয়াসের

কথা সপ্রমাণভাবে লিপিত আছে। তাই, ইতিহাসের বিচারে, ওই নাটকখানিতে সংকলিত নাট্যকারের বিবৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য হিসাবে সম্মানিত হবার যোগ্য।

ওই নাটকখানি থেকে ১২৭২-৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত উপাদান আহরণ করবার আগে, বিদ্যাসাগর-চবিত্তকারদের সংকলিত তথ্যগুলিও এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তা হলেই আলোচ্য নাটকখানির তথ্য অনুধাবনে যথেষ্ট সুবিধা হবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

বিদ্যাসাগর-চরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, সুরেন্দ্র মিত্র, এবং শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতির রচনায়, দুর্ভিক্ষ মনস্তর ইত্যাদিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত নর-নারায়ণের সেবায় বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা আমরা জানতে পাবি। উক্ত চরিতকারেরা প্রত্যেকেই ইংরেজী ১৮৬৬ সনে বাংলার তৎকালীন হুগলির জাহানাবাদ মহকুমায় অন্তর্গত ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোনা, প্রভৃতি গ্রামে দুর্ভিক্ষ-প্রকোপে কথ্য, এবং ওই দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগর সাহায্যে কথ্য স্রুতস্রুতিতে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গেছেন। এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর অকুণ্ঠ ও তাঁর অগ্রতম চবিত্তকার শম্ভুচন্দ্রই ছিলেন বিদ্যাসাগর-অকুণ্ঠিত এ হেন মহৎ কর্মের অগ্রতম সহকারী ও সঙ্গী। এবং তাই তিনি এ কাজের একজন অগ্রতম প্রধান সাক্ষী, অতএব নিঃসন্দেহে আমরা বিদ্যাসাগরের চরিতকার হিসাবেও শম্ভুচন্দ্রের সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বর্তমান প্রবন্ধের সপক্ষে গ্রহণ করতে পারি।

ইংরেজি ১৮৬৬ সনের এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে বিদ্যাসাগরের অগ্রতম সঙ্গী হিসাবে আপন ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্র তাঁর ‘বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত’ের ‘উপক্রমণিকা’ অংশে লিখেছেন : “আমি বাল্যকাল হইতেই অগ্রজ মহাশয়ের নিতান্ত অনুগত ছিলাম।...সন ১২৭২।৭৩ সালের বিষয় দুর্ভিক্ষসময়ে প্রত্যহ সহস্রাধিক দরিদ্র লোকের প্রাণরক্ষা দিবার আমার তদ্ব্যবধানে ছিল।”

এ কথা আমাদের আলোচ্য নাটকেও যে যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়েছে, তা ক্রমশঃ আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত করা যাচ্ছে।

২

যে নাটকখানিতে ১২৭২-৭৩ সালের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে বিভাগাগবেব এই প্রয়াসেব কাহিনী বিবৃত হয়েছে, সেই নাটকখানির নাম ‘দুর্ভিক্ষ দমন নাটক’। নাট্যকাবঃ যত্ননাথ তর্কবত্ত, প্রকাশকালঃ ইংবেজি ১৮৬৬—অর্থাৎ ওই দুর্ভিক্ষেব বছবেই। নাটকখানির বিষয়বস্তু নির্বাচনে নাট্যকার যে যুগসচেতনতার পবিচয় দিয়েছিলেন, ঠিক সেই কারণেই নাট্যকারকে তৎকালে যথেষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য কবতে হয়েছিল। বঙ্গভাষার প্রতি অতি-দরদী রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন জর্নৈক সমালোচক যত্ননাথ তর্কবত্ত প্রণীত ‘দুর্ভিক্ষদমন নাটক’ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তা অত্যন্ত কোতূহলোদ্দীপক। ওই সমালোচনাটি আলোচ্য প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তৎকালীন ‘রহস্য সন্দর্ভ’ পত্রিকায় (অনুমান কবি, সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং) এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়।—

“দুর্ভিক্ষ-দমন-নাটক [যত্ননাথ তর্কবত্ত প্রণীত] নগবে নিত্য নূতন রঙ্গ। এক সময়ে মুজ্রাযন্ত্রের গর্জনেব বিশ্রাম ছিল না, এবং তনিঃসৃত ‘গোলাপকান্ত’ ‘নলিনীকান্ত’, ‘কামিনীবিলাস’, ‘দুতীবিলাস’ প্রভৃতি কাব্যকরকাভিঘাতে বাগদেবীর অস্থি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে সহৃদয় বঙ্গভাষাহুরাগী মাঝেই ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কবির মাইকেল যথুস্মদন দত্ত সে বিপদ হইতে বঙ্গভাষাকে বক্ষা করেন। এক্ষণে পুনঃ নাটকের শিলাবুষ্টিতে প্রায় সেইরূপ আপদ উপস্থিত; প্রায় প্রত্যেক গলিতে নাটকাতিনয় আবিস্ত হওয়াতে নিষ্কর্য লোক মাঝেই নাটক লিখিবার জন্ত একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা অনাখিনী বঙ্গভাষাকে যথেষ্টমাত্র অঙ্গভঙ্গ করিয়া জনসমাজে উপনীত করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিতেছে না। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার করিতেছেন, এবং এমত লোকও বর্তমান হইয়াছে যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ ধলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় ইহার পর

জব-বিকার ওলাউঠা প্রভৃতিব নাটকও অসম্ভব হইবে না।”—[‘রহস্য-সন্দর্ভ’, ১২২৩ সংবৎ, ৪৬ খণ্ড, পৃ. ১৫২। ‘বঙ্গীয় নাট্যশালা’—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৭।]

আমরা নাটকের ভাল-মন্দ বিষয়ে মন্তব্য কবতে চাই না। কারণ তা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তবে এইটুকু অন্ততঃ সমালোচকের উদ্দেশ্যে বলব—আমরা তাঁর সঙ্গে একমত নই। সমালোচক যেমন বিরূপ সমালোচনা করে তৎকালীন একশ্রেণীর সমালোচকদের মনোভাবের পরিচয় তথা যুগোপযোগী মতামত ব্যক্ত কবেছেন, নাট্যকাবও তেমনি নতুন বিষয়কে নাটকের উপজীব্য কবে যুগসচেতনতার ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এর বেশী কিছু এই প্রসঙ্গে বলতে আমরা নিবস্ত হলাম। তবে এটুকুও যে বলা গেল, তা নেহাত আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধেব নতুন উপকরণেব আধার-স্বরূপ এই নাটকখানিব খাতিবে। আশা করি, তাতে নিশ্চয়ই নতুন উপকরণের আধার হিসাবে এই নাটকখানিকে সব দিক থেকে মোটামুটি বাজিয়ে নেবার প্রয়াসের ক্রটি রইল না।

৩

আলোচ্য ‘দুর্ভিক্ষদমন নাটক’খানির অতি অল্প অংশ, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ প্রতিবোধকল্পে দেশের সমসাময়িক সদাশয় ব্যক্তিবর্গেব গৃহীত ভূমিকার দীর্ঘ তালিকাটি ব্যতীত, প্রায় সমগ্র নাটকখানিই রূপক ও সমালোক্তির মাধ্যমেই প্রকাশিত। যেমন, দুর্ভিক্ষপীড়িতের সেবায় নিযুক্ত সদাশয় ব্যক্তিবর্গের প্রতীক চরিত্র—‘পূর্ণানন্দ’, ‘দাতা’, ‘শান্তি’, ‘বৈজ্ঞ’ প্রভৃতি; দুর্ভিক্ষের রাজা ‘দুর্ভিক্ষ মহারাজ’, তাব সেনাপতি ‘হাছাকার’, ‘অনটন’, ‘অনশন’, ‘রোগ’, ‘শোক’, ‘দুর্গতি’ প্রভৃতি, এবং দেশেব জনসাধারণের প্রধান এবং অগ্রতম শত্রু ‘মাগ্‌গীরাম’, তাব প্রত্নয়দাতা হিসাবে চিত্রিত তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার্থে আয়োজিত অন্নসত্রের নাম ‘দুর্গ’ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ মহাবাজ ও তাব সুর্যোগ্য সেনাপতিদের বিবন্ধে সংগ্রামের জন্তে প্রস্তুত ‘যুদ্ধ ঘাঁটি’। এই ‘ঘাঁটি’তেই সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষপীড়িতকে অন্ন বস্ত্র অর্থ ও আশ্রয় ইত্যাদি প্রদান করে সাহায্য করা হয়েছিল। এই রকম একাধিক রূপক বর্ণনা আলোচ্য নাটকে পাওয়া

যায়। ভীষণ দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সদাশয় ব্যক্তির কিতাবে
- প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, নাট্যকারের বর্ণনায় তা
আমরা জানতে পারি। দুর্ভিক্ষের সেনাপতি হাহাকার,
অনটন, অনশন, রোগ, শোক, দুর্গতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে
দেশবাসীর দুর্জয় সংগ্রামের বর্ণনাটির অংশবিশেষ এখানে
উদ্ধৃত করা গেল।—

“খরশাণ বস্ত্রবাণ, তাই করিয়ে সন্ধান,
নাশে দুর্ভিক্ষের সেনা-কত।
ক্ষুধার অন্নবাণে, মরিল বিপক্ষগণে,
হইয়ে অতীব হতাহত ॥
অদ্ভুত তৈজস-বাণ, প্রাণ লয়ে ধরে টান,
চণকে টনক যায় উড়ে।
মুদ্রাবাণ অল্পম, তেজে স্বদর্শন সম,
দেখিয়ে বিপক্ষ কত পড়ে ॥
এক যে আশ্রয়দান, সেইত বিষম বাণ,
তার কাছে কে দাঁড়াতে পারে।
তাহার দারুণ বায়, প্রাণ বুঝি বাহিরায়,
পড়ে সবে আপনা পাসরে ॥”

[দুর্ভিক্ষদমন নাটক, পৃ. ৮৭]।

দুর্ভিক্ষের সেনাপতিদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত খরশাণ—‘বস্ত্রবাণ’,
‘অন্নবাণ’, ‘তৈজসবাণ’, ‘মুদ্রাবাণ’, ‘আশ্রয়বাণ’ প্রভৃতি অল্প
রীতিমত সাংঘাতিক বলতে হবে। আলোচ্য নাটকের
উপসংহারে বলা হয়েছে যে, ‘দেশীয় সন্তানগণের’ এই
সংগ্রামে তুষ্ট হয়ে ‘লক্ষ্মী’ বর প্রদান করলেন। দেশীয়
সন্তানগণ লক্ষ্মীর কাছে বর প্রার্থনা করলেন—

“রাজা প্রজা হিতে রত, রাজা প্রজা অল্পগত,
হয়ে যেন রয় চিরকাল।
জননি গো আর যেন, ঘটনা না হয় হেন,
নাম যেন না থাকে আকাল ॥”

[দুর্ভিক্ষদমন নাটক, পৃ. ৮৭]

উপবি-উক্ত ‘দেশীয় সন্তানগণের’ অন্ততম বিভাগাগর
দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ
করেছিলেন সেই কথাই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।
দুর্ভিক্ষের হাহাকারে দেশ যে আচ্ছন্ন, এ কথা
বলাই বাহুল্য। বাংলার বিভিন্ন প্রদেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষের
আতঙ্কের কথা নাট্যকার, দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ-প্রয়াসী

দেশবাসীর প্রতীক ‘শান্তি’ ‘দাতা’ ‘পূর্ণানন্দ’ ‘বৈভ’ প্রভৃতি
চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ কবেছেন। একটি চরিত্রের মুখে
নাট্যকার বলেছেন,—

“...যেখানে দুর্ভিক্ষ একেবারে সকলকে গ্রাস কবিয়া
বসিয়াছে, মনে করুন জাহানাবাদ মহকুমায় ক্ষীরপাই,
রাধানগর, চন্দ্রকোণা, বামজীবনপুর, হাজৌপুর, ফুলুই,
শ্রামবাজার, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, মানভূম, বাঁকুড়া,
নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, রংপুর, পাবনা, বাজসাহী,
ভাগলপুর, ত্রিহত, পুরী, কটক, বালেশ্বর, মেদিনীপুর,
গড়বেতা ও আর আর প্রদেশ সকলের গতি কি হইবে?”

[দুর্ভিক্ষদমন নাটক, পৃ. ৭৬]।

উপবিউক্ত আশঙ্কার জবাবে নাট্যকার আর একটি
চরিত্রের মাধ্যমে যে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন, কেবলমাত্র
সেই অংশটুকুই বিভাগাগর প্রসঙ্গে মূল্যবান ঐতিহাসিক
দলিল হিসাবে গণ্য হবে। জাহানাবাদ মহকুমা ঈশ্বরচন্দ্র
বিভাগাগরের জন্মভূমি। অতএব দযাবাগর বিভাগাগর
যে অনিবার্যভাবেই ওই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা
যথাসম্ভব প্রতীকারার্থে আত্মনিয়োগ করবেন একথা
একরকম স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ
কর্মাক্ষেত্রে আর যারা সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের কথাও
নিম্নলিখিত বর্ণনায় পাওয়া যাবে। এই বর্ণনায়
বিভাগাগরের তৃতীয় মহোদর এবং মধ্যম মহোদরের কথাও
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভাগাগরের তৃতীয়
মহোদর গভুচন্দ্র বিভাগারের উপবেই যে এই জাহানাবাদ
জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবার ভার বিভাগাগর কর্তৃক
অপিত হয়েছিল, একথা আলোচ্য প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই
শত্ৰুচন্দ্রের বিবৃতি থেকে উল্লেখ করেছি। এখন দেখা যাক,
আলোচ্য ‘দুর্ভিক্ষ-দমন নাটক’ের নাট্যকার যত্নাথ
তর্করত্ন কি বলেছেন। একটি চরিত্রের মুখে নাট্যকার
দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মধ্যেও আশ্বাসবাণী
শুনিয়েছেন। এইরকম আশ্বাসবাণীর প্রয়োজন এহেন
দুর্দিনে যথেষ্ট, তা অনস্বীকার্য—যাতে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে
সংগ্রামরত দেশবাসী বৈধ ও মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে।
নাট্যকার জানাচ্ছেন:—

“...জাহানাবাদ মহকুমায় জন্ম আপনারা ভাবিত
হইবেন না। উহা হৃদয়হীনামা দয়ারমাগর শ্রীযুক্ত

ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের জন্মভূমি, তিনি তাহার রক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান আছেন, নিজগ্রাম বীরসিংহে হুভিক্ষ দলনার্থে দুর্গ স্থাপন করিয়াছেন, তদীয় কার্যনির্বাহের ভার তাহার তৃতীয় সহোদর শ্রীযুত শঙ্কুচন্দ্র বিজ্ঞান মহাশয়কে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণপণ করিয়া সমরকার্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহার যত্নে ও চাঁৎকার-ধ্বনিতে তথাকার রাজকর্মচারীদিগের নিজাভঙ্গ হইয়াছে, তদীয় মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু জায়রত্ন মহাশয়ও দেশরক্ষা বিষয়ে অসাধারণ উত্তেজিত, ...তাঁহার যত্নে ও জাড়ানিবাসী রায় মহাশয়দিগের চেষ্টায় এবং জ্বৈনক রাজকর্মচারীর পরিশ্রমে ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর ও শ্রামবাজারে একটি দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছে, দীনবন্ধু শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু জায়রত্ন মহাশয় ক্ষীরপাইর, শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়, চন্দ্রকোণার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় রামজীবনপুরের ও শ্রীযুত বাবু শঙ্কুচন্দ্র রায় মহাশয় শ্রামবাজারের দুর্গ রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ...ভীষ্মপরাক্রমে সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছেন। ...অসংখ্য লোক নিদারুণ হুভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া উক্ত মহাত্মাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ধন্যবাদ করিতেছে।— [হুভিক্ষদমন পৃ. ৭৬-৭৮]।

এই বর্ণনায় বিজ্ঞানাগরের সমসাময়িক আরও অনেক ব্যক্তির এই প্রশংসনীয় কাজে অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। বাহুল্যভয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ-তালিকাটি দেওয়া গেল না, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা থেকে ১৮৬৬-৬৭ বা বাংলা ১২৭২-৭৩ সালের এই হুভিক্ষের ভয়াবহতার অনুমান করা কঠিন হবে না। বাংলায় এই হুভিক্ষ যত না ক্ষতি করেছিল, তার বহুগুণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল উড়িষ্যা রাজ্য। আলোচ্য ‘হুভিক্ষদমন নাটক’খানিতেও সেকথা বিভিন্নভাবে তথ্য সহযোগে বর্ণিত হয়েছে। উড়িষ্যাবাসী সাধারণ মানুষ ও কাঙালীদের হুমুঠো অম্লের প্রত্যাশায় দলে দলে কলকাতা আগমনের বর্ণনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য নাটকে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম-গর্ভাঙ্কে ‘রঘুদাস, ভগ্নীরাথ খণ্ডাব, গোবিন্দ পাটনাই, সদানন্দ মাহতি উড়েদিগের করুণ-বিলাপ’ দৃশ্যটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এখানে সেই প্রসঙ্গটি অপেক্ষা আমাদের কাছে অধিকতর প্রয়োজন অথ একটি বর্ণনার।

এই বর্ণনায় নাট্যকার একটি চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—উড়িষ্যা এবং তৎসম্বন্ধিত মেদিনীপুর জেলার হুভিক্ষের ব্যাপকতার কথা।

এই হুভিক্ষের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে শঙ্কুচন্দ্র আরো বলেন, যা চণ্ডীচরণ প্রভৃতি বিজ্ঞানাগর-চরিতকারদের বিবৃতিতেও সমর্থন রয়েছে, শঙ্কুচন্দ্র লিখেছেন— “শত শত ব্যক্তি সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় কবিতা পেটের জালায় কলিকাতায় প্রস্থান করে, ও তথায় পথে পথে ভিক্ষা করিয়া উদরপূতি কবিত। ৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে এ প্রদেশের অর্ধাংশ জাহানাবাদ মহকুমার প্রায় অশীতিসহস্র লোক জাহানাবাদ কলিকাতায় যাইয়া, তথাকার অন্নসত্ত্রে ভোজন করিত। তৎকালে কেহ জাতির বিচার করে নাই। জননী সন্তানকে পথে ফেলিয়া দিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করেন। অনেক কুলকামিনী, জাত্যাভিমানের জলাঞ্জলি দিয়া, জাত্যাস্থিরতা হয়। চতুর্দিকেই হাহাকার শব্দ, কেহ কাহারও প্রতি দয়া করে নাই, সকলেই অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিল।”—

উপরিউক্ত ‘কলিকাতার অন্নসত্ত্রের’ কথা আলোচ্য ‘হুভিক্ষদমন নাটকে’র একটি প্রধান অংশ।

৪

যাই হোক, বিজ্ঞানাগরের জন্মভূমি মেদিনীপুরের (তৎকালীন হুগলি জেলার অন্তর্গত) জাহানাবাদ ও বীরসিংহ গ্রামে হুভিক্ষের প্রকোপ ও তৎনিবারণ প্রসঙ্গে শঙ্কুচন্দ্র ‘বিজ্ঞানাগর জীবনচরিতের’ (পৃ. ১৮৬-৮৭) একস্থানে এইভাবে বর্ণনা করেছেন : বীরসিংহবাসী হুভিক্ষপীড়িতেরা দলে দলে বিজ্ঞানাগরের গৃহের দ্বারে ধনী দিত ক্ষুদ্রবৃত্তির আশায়। বিজ্ঞানাগর-পরিবারের কেহই এই হুভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা না করে অর্থাৎ তাদের অভুক্ত রেখে নিজেরা আহার করতেন না। ওই সময়ে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহে কোন কোনদিন সত্তর-আশি জন হুভিক্ষপীড়িতের লাইন পড়ে যেত।

এই সংবাদ যখন কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্রের কর্ণগোচর হয়, বিজ্ঞানাগর তাঁর নির্দেশ পাঠান তৃতীয় সহোদর শঙ্কুচন্দ্রের কাছে। ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন—“স্বগ্রাম বীরসিংহ ও উহার সম্বন্ধিত পাঁচ-ছয়টি গ্রামের দরিদ্রগণকে প্রত্যহ

ভোজন করাইতে পারিব। অন্নাভ্য গ্রামের লোককে কেমন করিয়া খাওয়াইতে পারি। যেহেতু আমি ধনশালী নহি। অপরাপর গ্রামেব দরিদ্রদিগকে প্রত্যহ ভোজন করাইতে হইলে, অনেক ব্যয় হইবে। এমনস্থলে জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে আমার নাম করিয়া বলিবে যে, তিনি জাহানাবাদ মহকুমার দুর্ভিক্ষের কথা গভর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিলে, আমি এখানে লেফটেনেন্ট গবর্ণর সিসিল বীডনকে বলিয়া সাহায্য করাইতে পারিব।” [বিভাগসাগর জীবনচরিত—শত্ৰুচন্দ্র, পৃ. ১৮৭]

চণ্ডীচরণের বিবৃতিতে (‘বিভাগসাগর’, ৭ম সং, পৃ. ৪৯০) জানা যায়, এই দুর্ভিক্ষে বিভাগসাগর যে অন্নসত্ত্ব খুলেছিলেন, তাতে বারোজন পাচক দিবারাত্রি রন্ধনকর্মে এবং দুর্ভিক্ষ লোক অবিশ্রান্ত পরিবেশনের ফলে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে নতুন নতুন লোক নিয়োগ করা হত, এই বিরাট অন্নসত্ত্বের কাজ অব্যাহত রাখবার জন্তে। যাই হোক, ঈশ্বরচন্দ্রের পত্নী অম্মায়া জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে এ কথা জানানেন শত্ৰুচন্দ্র। তিনি তখন বিভাগসাগরের মধ্যম সহোদর “দীনবন্ধু ঠায়রঙ্গ সহ বাঁটাল, ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর প্রভৃতি গ্রাম সকল ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ করিয়া, প্রজাগণের দুঃখবিস্মার বৃত্তান্ত রিপোর্ট করেন”। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এই রিপোর্ট অম্মায়া বিভাগসাগর মহাশয় কলিকাতায় বিভিন সাহেব ও অন্নাভ্য সাহেবদেব কাছে বিশেষ অম্মায়া জানান। ফলে তাঁরা মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অন্নসত্ত্ব স্থাপনের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ ডেপুটি ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে পালন করেছিলেন।—“কার্যদক্ষ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয়, অন্নসত্ত্ব ও অন্নভ্য হইয়া, এ প্রদেশের সম্ভ্রান্ত লোকেব দ্বারে দ্বারে ভ্রমণপূর্বক যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিয়া, উক্ত অন্নসত্ত্বের সাহায্যার্থ প্রেরণ কবেন, এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ওই অন্নসত্ত্বের তত্ত্বাবধায়ক করেন। প্রত্যহ উক্ত অন্নসত্ত্বসকলে, স্থানীয় অভুক্ত দরিদ্রসমূহ ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল।”—এই ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ডেপুটির চেষ্টা ও যত্নে ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, জামবাজার, জাহানাবাদ, খানাহুল প্রভৃতি কয়েকটি

বিখ্যাত ও বহুজনাকীর্ণ গ্রামে গবর্ণমেন্টের অন্নসত্ত্ব স্থাপিত হয়। [বিভাগসাগর জীবনচরিত—শত্ৰুচন্দ্র, পৃ. ১৮৭]

১২৭২-৭৩ সালের এই দুর্ভিক্ষে ডেপুটি ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের এইরকম আন্তরিকতার মূলে যে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগসাগরের প্রেরণাই বোল আনা কাজ করেছিল, এ কথা বলা বাহুল্য। বিভাগসাগরের এই কৃতিত্ব তথা সহানুভূতিপ্রবণ ও পরদুঃখ-কাতর মনের প্রতি অকুণ্ঠ প্রশংসাপন করেছিলেন তৎকালীন বাংলা সরকার। বিভাগসাগরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাংলা সরকার যে পত্রখানি লেখেন তা এইরকম—

“To

Pundit Isvarachandra Vidyasagar,
Beersingha.

Sir, I have been instructed by the Secretary to the Government of Bengal, under order of the 20th. instant, to express to you the warm acknowledgement of Government for your generous exertions in relieving the poor during the recent scarcity in the Hooghly District. —I have the honour to be, Sir, your most obedient servant, (sd) C. T. Montrisor, Commissioner, Burdwan Division,” —[‘Isvarachandra Vidyasagar’ —Subalchandra Mitra, 1907, p. 489]

অর্থাৎ বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখের আদেশমত সি. টি. মন্ট্রিসর বর্তমান বিভাগের কমিশনার জানাচ্ছেন : “বিগত [১৮৬৬] মন্বন্তরের সময়ে হুগলী জেলার দরিদ্র লোকদিগেব অভাব মোচনে নানাপ্রকার সাহায্যের জন্ত গবর্ণমেন্ট আপনায় [বিভাগসাগরের] নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।”—[‘বিভাগসাগর’—চণ্ডীচরণ, পৃ. ৪৯২-৯৩]।

উপরিসৃত বর্ণনায় বিভাগসাগরের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ঠায়রঙ্গের দুর্ভিক্ষনিবারণ-প্রচেষ্টার কথা আলোচ্য ‘দুর্ভিক্ষদমন নাটকে’ও আলোচিত হয়েছে, একথা বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত নাটকের উদ্ধৃতি সহযোগে দেখানো গেল। জানা গেল, দীনবন্ধু ঠায়রঙ্গ মহাশয় ক্ষীরপাই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপ্রতিরোধ প্রচেষ্টার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। স্মরণীয় দেখা যাচ্ছে, এই ১৮৬৬-৬৭ বা ১২৭২-৭৩ সালের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে স্বয়ং বিভাগসাগর এবং বিভাগসাগর-পরিবারের

একটা বিশেষ দান রয়েছে। অবস্থা, বলা বাহুল্য, বিতাসাগর-পরিবারের এই দানের মূলে, বিতাসাগরের প্রেরণাই প্রত্যক্ষভাবে কাজ কবেছিল। আর বিতাসাগর স্বয়ং তাঁর জননীর দ্বারা এই মহৎ কর্মে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, একথা, আলোচনা প্রসঙ্গেই ক্রমশঃ বলা হচ্ছে।

৫

আলোচ্য ‘ভূভিক্ষদমন নাটকে’ ১২৭২-৭৩ সালের এই ভূভিক্ষের পূর্বাভাস হিসাবে যা বর্ণিত হয়েছে, এখানে তা উদ্ধৃত করা হচ্ছে। নাটকে স্বত্বধারের মুখে নাট্যকার বলেছেন,—

“একাত্তরে আখিনে মহতী বাত্যা যায়।

প্রবাহিত হলো দেশ যায় যায় যায় ॥

গতবর্ষ আখিনে না হল বিন্দুপাত।

সেই দিন জানি পাপ ঘটালে উৎপাত ॥”

এখানে “একাত্তরে আখিনে” বলতে বাংলা ১২৭১ সালকেই বোঝানো হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য। কেননা, আলোচ্য নাটকের প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৬৬ অর্থাৎ বাংলা ১২৭২-৭৩, এছাড়া স্পষ্টই বলা হয়েছে—“গত বর্ষ

আখিনে মহতী বাত্যা যায়”। এই সময়কার দেশের অবস্থা তথা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্রিমূল্য এবং সাধারণ মানুষের উপর তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার কথা নাট্যকার বাস্তবিকভাবে সজেই বর্ণনা করেছেন। নাট্যকার বলেছেন স্বত্বধারের মুখে—

“চাল ডাল ক্রমেই হতেছে অগ্রিমূল।

ছোট বড় সব ঘরে হল অপ্রতুল ॥

কত লোক ঘর ছাড়ি কত দিকে ধায়।

নাহি মানে জাতি পোড়া পেটের জালায় ॥

জননী মমতাহীন সন্তানে বেচিছে।

জঠর জালায় কত অনর্থ করিছে ॥”

‘পোড়া পেটেব জালায়’ জাতি-কুলনাশ ইত্যাদি তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল ভূভিক্ষপীড়িতদের কাছে। নাট্যকারের উপরিউক্ত এই বর্ণনার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের অল্পজ শব্দচন্দ্রের বিবৃতির বিলক্ষণ সাদৃশ্য রয়েছে। শব্দচন্দ্রের বিবৃতি আগেই উদ্ধৃত করেছি। তুলনার সুবিধার জগ্রে এখানে তার অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার করা গেল। শব্দচন্দ্রের বিবৃতি—“তৎকালে কেহ জাতির বিচার করে নাই।



আজ নতুন মেঘের দূর লেগেছে..

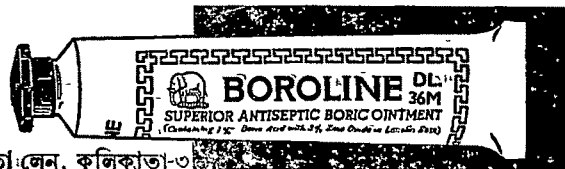
বর্ষার দিনে ভিজে হাওয়ায়
স্নান হয়ে যায় মুখের লাবণ্য।
বীজাণুনাশক বোরোলীন ফেস-
ক্রীম ব্যবহার করে আপনি দিল্লি
দিনগুলিতে মুখখানি অস্নান রাখুন।
মন-মাতানো এবং স্বগন্ধ।

PRESS ENT/GO B-2

বোরোলীন

ভেষজ-গুণ-
সম্পন্ন
পরম প্রসাধন

বোরোলীন প্রস্তুতকারক-এবং নতুন ফাউণ্ডেশন ক্রীম,
লোমনাশক ও এ্যান্টিবিন্কেল ক্রীম শীগগিরই বাজারে পাবেন



জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

জননী, সন্তানকে পথে ফেলিয়া দিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করেন। অনেক কুলকামিনী, জাত্যাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া জাত্যন্তরিতা হয়। চতুর্দিকেই হাহাকার শব্দ, কেহ কাহাবও প্রতি দয়া করে নাই, সকলেই অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিল।” শুধু শত্ৰুচন্দ্রের বিবৃতি কেন, সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই চরম দুদিনের সাক্ষ্য যত্রতত্র ছড়ানো রয়েছে।

৬

শত্ৰুচন্দ্রের বিবৃতিতে [বিজ্ঞানাগর চরিত, পৃ ২৪৩] আমরা জানতে পারি, এই ১২৭২-৭৩ সালের দুর্ভিক্ষপীড়িত কাঙালীরাই বিজ্ঞানাগরকে ‘দয়াব সাগর’ উপাধিতে অলংকৃত করে। ঈশ্বরচন্দ্র নরনারায়ণপ্রদত্ত সেই অলংকারে ভূষিত হয়ে আজও দেশবাসীর হৃদয়পটে সমুজ্জলরূপে চিহ্নিত রয়েছেন চিরকালের ‘দয়াবসাগর বিজ্ঞানাগর’রূপে। এই সময়ের অর্থাৎ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকালীন একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ না কবে পাবা যায় না। ঘটনাটি লিপিবদ্ধ কবে গেছেন অত্রতম বিজ্ঞানাগর-চরিতকাব চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্ভিক্ষের হাহাকারে যখন স্থানীয় আকাশ-বাতাস মুখরিত, বিজ্ঞানাগর তখন শত্ৰুচন্দ্রকে নির্দেশ পাঠালেন— “যত টাকা ব্যয় হয় হউক, কেহ যেন অভুক্ত না থাকে। সকলেই যেন খাইতে পায়।” অত্রাজের নির্দেশমত শত্ৰুচন্দ্র সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করলেন। বিজ্ঞানাগর স্বয়ং সেই ব্যবস্থা দর্শনে দেশে গিয়েছেন। দেখলেন আয়োজন ঠিকমতই চলছে। ইতিমধ্যে “অন্নার্থী লোকেরা তাঁহাকে এই বলিয়া ধরিল যে খেচরায় খাইতে খাইতে আহাবে অকুচি জন্মিতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একদিন চারিটি সাদা ভাত হইলে ভাল হয়।” অভুক্তদের এই মনোবাসনা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই দয়াবসাগর বিজ্ঞানাগর সেই মত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন শত্ৰুচন্দ্রকে। ফলে, মগ্নাহে একদিন কাঙালীর অতিপ্রিয়, বিশেষ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বহু-আকাজিকত অন্নব্যঞ্জনসহ সাদা ভাতের ব্যবস্থা হল। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার প্রথম দিনেই সেই ঘটনাটি ঘটে, চণ্ডীচরণের ভাষায় “একটি নিতান্ত হৃদয়বিহারী দৃষ্টান্ত”। দৃষ্টান্তটির বিবরণ চণ্ডীচরণের ভাষায় এই রকম—

“অন্নব্যঞ্জনের আয়োজনে এক ব্যক্তি দৃষ্ট মনে ভাত খাইতে গিয়া তরকারির জন্ত অপেক্ষা অদৃষ্ট হওয়াতে, সেই শুদ্ধ অন্ন মুখে দিয়া দম আটকাইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। এই দৃষ্টান্ত, আনন্দকব ব্যাপার সহসা নিরানন্দে পরিণত হইল। বিজ্ঞানাগর মহাশয় সেই মৃতব্যক্তিকে ক্রোড়ে লইয়া অনেকক্ষণ রোদন করেন।” —[‘বিজ্ঞানাগর’ পৃ. ৪২১] বিজ্ঞানাগর অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এই ঘটনায়। “আনন্দকব ব্যাপার সহসা নিরানন্দে পরিণত” হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়— তার একমাত্র কারণ, “তাহাব [মৃত, লোকটি] ভাত খাওয়া হইল না, অনাহারে মৃত্যুর দিনে, আহার করিতে গিয়া বেচারার মরিয়া গেল, এই দুঃখ চিবদিন শক্তিশেলের দ্বায় তাঁহাব হৃদয়ে বিদ্ধ ছিল।”

উক্ত ঘটনাটিকে ঘটনা বা দৃষ্টান্তে স্মৃতি নামেই অভিহিত করা, যাক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। কেবলমাত্র এই ঘটনা থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় আমাদের কাছে বিজ্ঞানাগর-চরিত্রের কোমলতা। কর্তব্যে কঠোর অথচ পবিত্র কাতর মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরের এই পরিচয় পেয়েছিলেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে, বোধ হয় মাইকেল! তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন বিজ্ঞানাগরের হৃদয়ের এই কোমলতা। তাই তিনি বিজ্ঞানাগর সম্পর্কে অমন উক্তি উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন :

“...the man [বিজ্ঞানাগর] ...has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.”

কাঙালী জনমীর হৃদয় বিজ্ঞানাগরের মধ্যে ষোল আনা ছিল বলেই দুর্ভিক্ষপীড়িত ওই লোকটির মৃত্যুতে তিনি অমন শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত সন্তানদের জন্তে বিজ্ঞানাগরের হৃদয় অভুক্ত সন্তানের জনমীর মতই ব্যাকুল ও দিশেহারা হয়ে উঠেছিল। তাবই পরিচয় আমরা পাই বিভিন্ন ভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় বিজ্ঞানাগরকে প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করতে দেখে।

৭

কিন্তু অল্প অনেক ঘটনার মত দুর্ভিক্ষপীড়িতের সেবায় বিতাসাগরের এই প্রচেষ্টায় ঈশ্বর-জননী ভগবতী দেবীর প্রেবণাই সমধিক দায়ী। ১২৭২-৭৩ সালের এই দুর্ভিক্ষের পর নিরাশ্রয় ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের যারা কোনবকসে বেঁচে ছিল তারা বর্তমানে কিভাবে দিনযাপন করছে, এ সংবাদ রাখতে ঈশ্বরচন্দ্রের মনে ঐশ্বর্য জাগে। সংবাদ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অনেকেই বর্তমানে প্রায় অনশনে বা অর্ধাশনে, কেউ বা ‘অতিকষ্টে একসন্ধ্যা ভোজন’ করে দিনযাপন করছে। দয়ার সাগর বিতাসাগর এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়া মাত্র অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর আরাধ্যা জননী ভগবতী দেবীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলেন। একদিন বিতাসাগর তাঁর জননীকে বললেন—“বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয়-সাত শত টাকা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ওই টাকা অবস্থানস্বারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভাল?” বিতাসাগর-জননী ভগবতী দেবী দেশের এই দারুণ দুর্দিনে পূজাচর্চা-প্রসঙ্গে অযথা ব্যয় সম্ভবত আন্তরিকভাবে পছন্দ করতেন না। তা ছাড়া পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রেরও এই রকম মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন—“গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা কবিবার আবশ্যিকতা নাই। তুমি গ্রামবাসীদিগকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিলে আমি পরম আনন্দিত হইব।” [‘বিতাসাগর চরিত’, পৃ. ২০৫]

ঈশ্বরচন্দ্র জননীর কাছে এই বকম আকাজক্ষিত জবাব পেয়ে ষৎপরোনাস্তি উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারই ফলে তিনি গ্রামের প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, এবং তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন—“তোমরা সকলে ঐক্য হইয়া গ্রামের কোন্ কোন্ ব্যক্তির অত্যন্ত অন্নকষ্ট ও কোন্ কোন্ ব্যক্তি নিরাশ্রয়, তাহাদের নাম লিখিয়া দাও, আমি মাসে উহাদের কিছু কিছু সাহায্য করিব।”—[‘বিতাসাগর চরিত’, পৃ. ২০৬] এবং বলা বাহুল্য, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি পালনের কাজে, ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয় সহোদর শঙ্কুচন্দ্র ও মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু বিশেষ সহায়তা করেন। এরাই নিয়মিতভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের দেখাশোনা করতেন বিতাসাগরের নির্দেশমত।

এমনিতেই বিতাসাগর মহাশয় ঈশ্বর বা পরলোক প্রসঙ্গে নীরব থাকতেন। তারপর এই পূজাহুষ্ঠান বর্জন

এবং উৎসব-অহুষ্ঠানে অযথা হৈ-চৈ এবং ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদি বন্ধ করার ঘটনাটিকে কে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবেন জানি না। কিন্তু জানি, পূজার উৎসব-অহুষ্ঠানে অযথা ব্যয়বাহুল্য মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে নিশ্চয়ই বিসদৃশ ঠেকেছিল। তিনি মর্মে মর্মে অহুতব করেছিলেন, এই মর্তবাসী নবরূপ নারায়ণকে অভুক্ত রেখে ঈশ্বর-বিলাসে অযথা মাতামাতি কোনোক্রমেই সমীচীন নয়। কিন্তু মুখ ফুটে তিনি ঈশ্বরবিরোধী কিছুই বলতেন না, এক্ষেত্রেও বলেন নি—পাছে দেশবাসী বা মাতা-পিতা ও পরিজন-বর্গেরা অসন্তুষ্ট হন বা তাঁদের বিশ্বাসে আঘাত পান। অপব. কারোর বিশ্বাসে নিতান্ত অন্তোপায় না হলে তিনি আঘাত করতেন না। বিতাসাগর নিজেই অগ্রবর্তী হয়ে ওই পূজাহুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারতেন। তবু তা না করে তিনি জননীর মত নিষেহছিলেন। এই কাজের মধ্যেই বিতাসাগর-চরিত্রের আসল রূপটিই ফুটে উঠেছে। আমাদের দেশে জনক-জননীকেই বৈকুণ্ঠবাসী দেবতাদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসাবেই গ্রহণ করা হয়। মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই দেবতাকে তুষ্ট করার একমাত্র উপায়, এই বিশ্বাস ভারতবাসীর বহু দিনের। এবং এমন কি আজকের দিনেও এ বিশ্বাস একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। মাতা ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’, এবং পিতা তুষ্ট হলেই যে ‘প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা’—একথা বিতাসাগর ভাল করেই জানতেন। বিতাসাগরের জীবনে এমন ঘটনা কিছু আকস্মিক নয়। বিধবা-বিবাহের আয়োজন প্রসঙ্গেও এমন ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যে বিতাসাগর বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ এ কথা দেশবাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, তবুও কার্যক্ষেত্রে সেই অহুষ্ঠান অর্থাৎ বিধবার বিবাহ দেওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর মাতা-পিতার মতামত নিয়েছিলেন, তাঁদের সমর্থন আদায় করেছিলেন, পাছে তাঁরা তাঁদের আজন্মসঞ্চিত বিশ্বাসে আঘাত পান।

তাই দেখা যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষপ্রতিরোধকল্পে বিতাসাগরের যে প্রচেষ্টা, তারও পশ্চাতে রয়েছে বিতাসাগর-জননীর অপরিণীত প্রভাব। এই প্রভাবই ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছিল। তাই পবিশেষে বলি, বিতাসাগরের এই নবনারায়ণ-সেবার কথা, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মুখে হাসি ফোটানোর কথা—বিতাসাগর-চরিত্রকারদের সাক্ষ্য-বিরূতিতে, এবং বিশেষ করে আলোচ্য ‘দুর্ভিক্ষদমন নাটকে’ (১৮৬৬) নাট্যকার যদুনাথ তর্করত্ন কর্তৃক রূপায়িত হওয়ায়, এই কাহিনীগুলি মানবতার ইতিহাসে স্বর্ণস্থলে গাঁথা হয়ে আছে।

জিহ্বা

জগদীশ মোদক

পাঁচ

গল্প লেখার সেই পুরনো নেশাটা যে হঠাৎ কোন্ মন্তবলে এমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, ধীরা নিজেই তা বুঝতে পারল না।

সেদিন কনকেন্দুর কাছ থেকে উৎসাহ পাবার পর সে কি ভেবে নিজের পুরনো লেখাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কদিন ধরে এমনি নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ যেন সেই আগের পুরনো মনটিকে সে ফিরে পেল। একটি পুরনো গল্পকে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজাবার জন্তে মনের ভেতর একটা দারুণ চাকলা অতুতব করতে লাগল এবং দীর্ঘ পাঁচ-ছ বছর পরে সেই ছপুবেই সে কাগজ-কলম নিয়ে বসল।

লিখতে বসে প্রথমটায় কেমন যেন একটা আড়ষ্টতা বোধ করছিল। গল্পের শুরুটা কিছুতেই মনোমত হয়ে উঠছিল না। কতবার যে কেটেছে আর কতবার যে লিখেছে তাব ঠিক নেই। অনেক কাটাছুটির পর একটা ঠিকমত বিষয়বস্তু যখন পেয়ে গেল তখন আব বেনী বেগ পেতে হল না। পরস্পরায় কথাগুলো যেন আপনা থেকেই কলমেব মুখে আসতে লাগল। ধীবা অনেক পরিশ্রমের পর গল্পটি শেষ করল।

গল্পটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর একদিন সন্ধ্যার সময় লেখাটি নিয়ে কনকেন্দুর ঘরে এল ধীরা।

কনকেন্দু ঘবে বসে একটা বই পড়ছিল। পাবের শব্দে মুখ তুলে চেয়ে হেসে অভ্যর্থনা জানাল।

একটা মোড়ার ওপর বসতে বসতে ধীবা বলল, বড় অভাবনীয় একটা ব্যাপার করে ফেলেছি।

কি?—কনকেন্দুর চোখেমুখে কৌতূহল উপচে পড়ল।

ওর কৌতূহল দেখে ধীরা ঐীবা হেলিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বলল, কি বলুন তো?

কি করে জানব।—ধীরার ভদ্রী এবং ভনিভা দেখে কনকেন্দু হেসে ফেলল।

বলুনই না, আপনাব অসুমানের পরীক্ষা নেওয়া যাক।—ধীরার চোখেমুখে কৌতূকেব ছটা নাচতে লাগল।

কী করে জানব যে আপনার জীবনে কী অভাবনীয় ব্যাপার ঘটেছে! ববং—

একটু থেমে কনকেন্দু আবার বলল, আমার তো মনে হচ্ছে যা কিছু অভাবনীয় তা আমার জীবনেই ঘটছে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাচ্ছি।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কৃত্রিম ধমক দিতে গিয়ে ধীরার গলা লজ্জায় জড়িয়ে গেল।

কনকেন্দু ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। একটু থেমে ধীবা বলল, বলতে পারলেন না তো। তা হলে এবাব চোখ দুটো বন্ধ করে সামনে হাত পাতুন।

কি আশ্চর্য!—বলে কনকেন্দু সত্যিই চোখ বৃজে সামনে হাত বাড়াল। ধীবা আঁচলের আড়াল থেকে গল্পের পাণ্ডুলিপিটা বার করে ওর হাতেব ওপব বাঁধল।

এ কি!

একটা গল্প, আজই শেষ করলুম।—ধীরা লাজুক ভদ্রীতে কথাটা বলল।

সত্যি নাকি! কি আশ্চর্য ব্যাপার। এই যে সেদিন বললেন গল্প লেখা আপনি ছেড়ে দিয়েছেন?

ছেড়ে তো দিয়েছিলুম, কিন্তু সেদিন আপনাব উৎসাহ এবং আশ্বাসভরা কথাগুলো শুনে কী যে মনে হল, সেই থেকে আবার লেখাব জন্তে মনটা ছটফট করতে লাগল।

বলেন কি!—কনকেন্দু উৎফুল্ল গলায় বলল, তা হলে তো এর ক্রেডিটটা আমারও কিছু প্রাপ্য।

নিশ্চয়ই। আবার যদি আমি লিখতে পাবি, লেখার

মনোজন্মী মায়ের সংসারে সদা সেবা জিনিষই চাই...

পরিবারের জন্য মায়ের পছন্দ

ডালডা

ভালবাসার সংসার মায়ের। মা তাঁর সন্তানকে ভালবাসেন। এদের নিষে কত স্বপ্ন দেখেন, এরা বড় হবে, সুখী হবে। মাতৃজীবনের একমাত্র কামনা। মায়ের স্নেহভরা প্রাণ কেবলই চায় সবার হাতে একটু বেশী ভাল জিনিষ, আরও বেশী খাঁটি জিনিষ তুলে দিতে। সদা সেবা জিনিষই তাঁর পছন্দ। তাইতো বাম্বার বেলাতেও মায়ের কেবল ডালডা-ই চাই! ডালডাম বাঁধা ডাল-ঝোল খেয়ে সবার তৃপ্তি। .. তাঁর কাবনও আছে। সবচেয়ে সেবা ভেজাজ তেল থেকে ডালডা তৈরী বাম্বার খাঁটি সেবা স্নেহপদার্থ। দৈহিক পুষ্টি-সাধনের প্রয়োজনীয় উপাদান ভিটামিনও এতে রয়েছে। তাই মায়ের হাতের মিষ্টি বাম্বার ডালডা খাবারকে আরও সুস্বাদু করে তোলে। বেঁধে তুষ্টি, খেয়ে আনন্দ—আপনার বাড়িতেও আজ থেকে ডালডা-ই চাই।



ডালডা বন্যপতি—বাম্বার খাঁটি, সেবা স্নেহপদার্থ

ব্যাপারে মনটা যদি একটা স্ট্যাণ্ডিং পজিশনে আসে, তবে আপনার কাছেই আমি ওবলাইজড থাকিব।

থামুন থামুন, অত কথা বলবেন না, আমার মনটা আবার যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।—কনকেন্দু হাসতে হাসতে বলল।

এ বকু করলে কিন্তু এ-ঘরে আসা আমায় বন্ধ করতে হবে।—বলে ধীরা কৃত্রিম বাগে সত্যি সত্যিই উঠে দাঁড়াল।

কনকেন্দু ব্যস্ত গলায় বলে উঠল, আপনি যে সত্যিই চলে যাচ্ছেন!

ধীরাব যাওয়া আর হল না। ইতিমধ্যে থোকন এসে ঘবে ঢুকছিল। কনকেন্দুর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে আধো আধো গলায় বলল, কাকু, আমায় দিলে না তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার জন্তে এনেছি।—বলে থোকনের নবম চূলে একবাব হাত বুলিয়ে কনকেন্দু চেযাব ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর র্যাক থেকে একটা প্লিং-দেওয়া মোটরগাড়ি পেড়ে দম দিয়ে মেঝের ওপব ছেড়ে দিল। গাড়িটা চলতে শুরু করল।

আচ্ছা, এসব কি শুরু কবেছেন বলুন তো?—ধীরা অল্পযোগভরা গলায় কনকেন্দুকে বলে উঠল।

ধীরার অল্পযোগে কনকেন্দু শুধু তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

আপনি আবাব হাসছেন।—ধীরাব গলায় মুহু ধমক ঝংকৃত হল, না না, সত্যি, এ আপনাব ভারী অস্থায়। ভবিষ্যতে ওর জন্তে যদি মিছিমিছি এভাবে পরসাদা নষ্ট করেন তো আমি খুব অসন্তুষ্ট হব।

নীহাবকণা ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা, কী এমন করেছে। সামান্য একটা খেলনা কিনে দিয়েছে, তাব জন্তে এত বাগাবাগি করার কি আছে।

ধীরা বলল, আছে মাসীমা, আপনি জানেন না ও ভাবী ছুটু, এমন করে যদি ওকে প্রাণ্য দিতে থাকেন তো এব পর ওর আবদার সামলানো আপনাদের পক্ষেই দায় হয়ে উঠবে।

বেশ তো, দায়টা যদি আমাদের ঘাড় পড়ে তো আমরাই বুঝব।—নীহারকণা হাসতে হাসতে বললেন।

কনকেন্দু তখন থোকনকে নিয়ে মেতে উঠেছে।

তাকে বুকব ভেতর জাপটে ধবে কনকেন্দু বলল, সামনেব রোববারে আমরা কোথায় বেড়াতে যাচ্ছি বলে দাও তো থোকন।

চিড়িয়াখানায।—থোকন ধীরাব দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল।

যা ভাল বোঝেন করুন আপনারা, আমি কিছু জানি না।—গলায় মুহু ঝংকার তুলে ঘব থেকে বেরিয়ে গেল ধীরা।

পেছন থেকে কনকেন্দু জিজ্ঞেস করল, অনিমেঘবাবু বাড়িতে আছেন নাকি?

যেতে যেতে ধীরা ধমকে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, না।

কি ব্যাপাব বলুন তো! আজকাল ওঁকে কোমদিন বিকেলে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। অফিস থেকে বাড়ি না ফিরে বোজ কোথায় যান ভদ্রলোক?

একটু ইতস্ততঃ করে ধীরা জবাব দিল, অফিস থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা নামক মহৎ কর্মটি সেবে তারপর বাড়ি ফেরেন।

বলে ধীরা আর সেখানে দাঁড়াল না।

অফিস থেকে বাড়ি না ফিরে কোথায় যায় ও! রোজ ফিরতে রাত্তির নটা-দশটা হয়ে যায়। কথটা ভাবতে ভাবতে অনিমেঘের ঘরের মধ্যেই ঢুকল ধীরা।

আজকাল প্রায় সে এ ঘরে আসে না—এমন কি অনিমেঘ কাজে বেরিয়ে গেলেও নয়। ঘরটার ওপর এখন আব কোম আকর্ষণ নেই, মনে কোম মায়া জাগায় না—যেন তীব্র কশাঘাতই করে।

আজ অনেকদিন পরে এ ঘরে ঢুকে ধীরা ঘরের জিনিসপত্র আসবাবগুলো দেখতে লাগল। ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিরূপ দেখল। পছন্দ করে সে নিজেই এই ড্রেসিং টেবিলটা কিনেছিল। অথচ কতদিন সে এটাকে ব্যবহার করতে পারছে না। ওঘরেব দেওয়ালে টাঙানো ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে এখন তাকে প্রসাধন করতে হয়।

ধীরা ভাবল, কালই লোক ডেকে ড্রেসিং টেবিলটাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অনিমেঘের আবাব এসবের কী দবকার।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ঘুরে-ফিরে নিজের চেহারাটা দেখল ধীরা। হাত দিয়ে চেপে চেপে খোঁপাটা ঠিক-করল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ওপর বাঁধা স্নগন্ধী মসলার কোটোটা চোখে পড়ায় একটু মসলা খাওয়ার লোভে সেটি খুলতে গিয়ে দেখে সেটা খালি। ধীরা কোটোটা বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিল। এবার সে বইয়ের সেলফের কাছে এসে দাঁড়াল। বুক-সেলফের মাথায় দাঁড় করানো জোড়া ফোটা-ফ্রেমে তাদের ছব্বনের দুটি প্রতিরূতি। ছবি দুটো এমন কায়দায় তোলা এবং এমনভাবে রাখা যাতে দেখলে মনে হয় ওবা যেন পরস্পরের দিকে অল্পরাগভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুহু মুহু হাসছে। ফোটা দুটো এখনও এই ভাবে আছে দেখে ধীরার মনে জালা ধরে গেল। ফ্রেম থেকে নিজের ফোটাটি খুলে নিয়ে সেটিকে আবার যথাস্থানে বেধে দিল। তারপর বুক-সেলফ থেকে একটা বই বার করে অনিমেষেব বিছানায় বসে পড়তে লাগল।

পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা ওর খেয়াল ছিল না। ঘুম থেকে উঠে দেখে অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। অনিমেষ ফিরেছে। তার খাওয়াদাওয়াও বোধ হয় অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। কিন্তু ধীরাকে স্তব্ধতা বিছানায় নিমিত্ত অবস্থায় দেখে অনিমেষ শেষ পর্যন্ত ঈজিচেয়ারটার ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

চোখ খুলে অনিমেষকে ওইভাবে দেখে ধীরা ভাড়াভাডি বিছানার ওপর উঠে বসল। দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে চেয়ে ধীরা চমকে উঠল। এগারোটা বেজে গেছে।

প্রথমে নিজের এই অশতর্ক ঘুমের জন্তে ধীরা নিজেকে খানিক ধিকার দিল। তারপর রতনের মার ওপর মনে মনে রাগ করতে লাগল; অনিমেষ যখন এল তখন ও তো ধীরাকে ডাকতে পাবত। এটা নিশ্চয় ওর ইচ্ছাকৃত। ও তো প্রায় সবই জানে।

কিন্তু এখন কি করা যায়? ও তো নিঃশাড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। ওকে যদি ডেকে না তুলি তো সাবরাতে ওই চেয়ারের ওপরেই শুয়ে থাকবে।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে ধীরা ভাবল, আমি আর কী করতে পারি। এই ভেবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

পাশের ঘরে এসে হাতমুখ ধুয়ে নিজের বিছানায় নরম লেপের ভেতর শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিল।

আজ শীতটাও পড়েছে অসম্ভব। ধীরা লেপের ভেতর থেকে ভাবতে লাগল, না, ওকে ডেকে তোলাই উচিত। নইলে এই শীতে সারাবাত বড় কষ্ট পাবে।

এই ভেবে দেহটাকে লেপের ভেতর থেকে বার করল। বারান্দা দিয়ে পা টিপে টিপে জানলার কাছে এসে দেখল, অনিমেষ তখনও তেমনই নিঃশাড়ে পড়ে আছে ঈজিচেয়ারটার ওপর।

কি করবে, কি ভাবে ওকে জাগাবে—ধীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবল। যার সঙ্গে চার-পাঁচ মাস কোমণ কথা বলে নি তাকে ডাকতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল। আবণ্ড কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে অবশেষে ধীরা ঈজিচেয়ারটার কাছে এসে মুহুঘরে ডাকল, এই, শুনছ—

অনিমেষ কোনও সাড়া দিল না। শুধু মাথাটাকে অল্প দিকে একবার কাত কবল। ধীরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে চেয়ারটাকে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল।

একটা অব্যয়সূচক ধ্বনি তুলে অনিমেষ ধড়মড় করে উঠে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসল। ঘুমচোখে ধীরার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ধীরা বলল, যাও, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়।

বলে ধীরা আর সেখানে দাঁড়াল না। ভাড়াভাডি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এ-ঘরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল ধীরা। কিন্তু সহজে ভাব চোখে ঘুম এল না। লেপের তলায় শুয়ে সে ভাবতে লাগল, আচ্ছা, অনিমেষ তো আজ অতি সহজে তাকে চরমভাবে লাঞ্ছনা করতে পারত। অত রাত্রে তাকে ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে নিজের কামনা চরিতার্থ করার চরম স্বযোগ পেয়েছিল সে। তবু সে এমন স্বযোগ হাতছাড়া কবল কেন তা ধীরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

এমন একটা বিস্ত্রী বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে সে মনে মনে খুশী হওয়া সত্ত্বেও, কেন জানি না, এই ভয়াবহ ব্যাপারটাকে নিয়েই মনে মনে অনেকক্ষণ ধবে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ভাবনাটা যেন একটা নেশার মত তার মনে অনেকক্ষণ ছেয়ে রইল।

ছয়

ধীরা বীতিমত অবাক হয়ে গেল।

কনকেন্দুর হাতে লেখাটা নিয়ে আসার পর একটা রবিবার বাণ দিয়ে দ্বিতীয় রবিবারের কাগজে তার গল্পটার সচিত্র প্রকাশ দেখে সে রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

গল্পটা ছাপা হবে কিনা সে সম্পর্কে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কনকেন্দুও এতদিন এ সম্পর্কে তাকে কিছু জানায় নি এবং ধীরাও কী এক সঙ্কোচে তাকে জিজ্ঞেস কবতে পারে নি। তাই ব্যাপারটা তার কাছে বড়ই আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক বলে মনে হল।

সকালে কনকেন্দুই এসে তার সামনে কাগজের পৃষ্ঠাটা মেলে ধরল। ধীরা কিছুক্ষণ ভাব দিকে খুশী আব কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, সত্যি, কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব।

উহঁ, শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিছু ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আপাততঃ একটু চা পেলেই খুশী হব।

আমি ব্যবস্থা কবছি, আপনি বসুন।—কৃতজ্ঞতায় ধীরার গলাব স্বর গদগদ শোনাল।

কনকেন্দু জিজ্ঞেস করল, কই, অনিমেঘবাবুকে তো দেখছি না। উনি নিশ্চয় এখনও ঘুমোচ্ছেন?

কনকেন্দু ঘরে ঢুকে হাঁকডাক করে অনিমেঘকে বলে উঠল, বলি, আমরা কি ছুটি ভোগ করি না? আরে উঠুন উঠুন, উঠে দেখুন কী ব্যাপার হয়ে গেছে।

কি?—অনিমেঘ লেপের ভেতর থেকে মুখ বার কবল।

দেখুন, আপনার মিসেসেব ব্যাপারখানা একবার দেখুন।—কনকেন্দু অনিমেঘের চোখের সামনে কাগজেব সেই পৃষ্ঠাটি মেলে ধরল।

অনিমেঘ ঘুমচোখে গল্পের শিরোনামা এবং শিরোনামার ছবিটার শুধু একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তার ভাবভঙ্গীতে কোনও উৎসাহ বা আনন্দ প্রকাশ পেল না।

কনকেন্দু আবার তাড়া দিল : উঠুন, আর কতক্ষণ ঘুমোবেন? চা খেতে খেতে বেশ জুত করে গল্পটা পড়া যাবে। ছুটির দিনের সকালটা বেশ কাটবে।

অনিমেঘ লেপের ভেতর থেকে বেবিঘে গায়ে পুল-

ওভারটা চাপাল। তারপর টুথব্রাশে একটু পেস্ট লাগিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

খানিক পরে ওরা একসঙ্গে বসল। ধীরা প্রথমে একটু আপত্তি কবেছিল, কিন্তু কনকেন্দুর উৎসাহের স্রোতে তার আপত্তি ভেসে গেল।

চা খাওয়ার পব কে গল্পটা পড়বে তাই নিয়ে কিছুক্ষণ অহুবোধ-উপরোধ চলল। ধীরা কনকেন্দুকে অহুবোধ কবল, আপনি পড়ুন।

আপনার লেখা আপনি নিজের যত আকর্ষণ নিয়ে পড়তে পারবেন আমার দ্বারা কি তা হবে?

তবে থাক্, পড়ে কাজ নেই।—ধীরা সাফ জবাব দিয়ে দিল।

কনকেন্দু এবার অনিমেঘের দিকে চেয়ে বলল, তা হলে আপনিই পড়ুন মশায়, নিজের স্ত্রীর লেখা আপনি যত দরদ দিয়ে পড়তে পারবেন তা কি আব কেউ পারবে।

অনিমেঘ বলল, আমার শরীরটা আজ ঠিক নেই, টেচিয়ে পড়লে ট্রাবলটা আবও বাড়তে পারে।

অগত্যা কনকেন্দুকেই পড়তে হল।

পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনিমেঘ চোখ বুজে সিগারেট টানতে লাগল। আর ধীরা একপাশে মাথা নীচু করে বসে রইল। সে কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ করছিল। গল্পটা একটু চটুল ধরনের। কলেজে-পড়া ছুটি উচ্ছল ছেলেমেয়ের পূর্বরাগ সম্পর্কিত কাহিনী।

ভাব মনের এই চাপল্য ওরা কিভাবে গ্রহণ করছে জানার জগ্গে মাঝে মাঝে অনিমেঘ আর কনকেন্দুর দিকে আড়চোখে তাকাতো লাগল।

কনকেন্দু বেশ সরস গলায় লেখাটা পড়ছে আর ওর চোখেমুখে বেশ একটা খুশী খুশী ভাব ছড়িয়ে আছে। তাই ওর মনের ভাবটা বুঝতে ধীরার বিশেষ অস্ববিধে হয় না। কিন্তু অনিমেঘের ভাবভঙ্গীতে কোথাও এতটুকু কিছু বোঝবার উপায় নেই। একপাশে বসে চোখ বুজে চুপচাপ সিগারেটই টেনে চলেছে। মুখের রেখায় না নির্লিপ্ততা, না নিবিষ্টতা।

গল্পটা শুনতে শুনতে ধীরার মনে কিছু মাঝে মাঝে কেমন একটু খটকা লাগছে, মনে হচ্ছে কোনও কোনও জায়গায় যেন ভাষা এবং ভাবের অল্পবিস্তর পরিবর্তন



লাইফবুয় যেখানে, স্বাস্থ্যও সেখানে !

আনন্দ লাইফবুয়ে ! লাইফবুয় সাবান মেখে মান করলে শরীরটা
কত স্বাচ্ছন্দ্য লাগে, মনেও এক সজীবতা আনে ! ঘবে বাইবে ধুলো ময়লা আপনাব
লাগবেই। লাইফবুয়ে প্রচুর কার্যকারী ফেনা ধূলা ময়লাব রোগ বীজাণু ধুখে দেয়।
পরিবাবে সবাব স্বাস্থ্যেব যত্ন নিতে লাইফবুয় মাথুন ।

ঘটেছে। শুনতে শুনতে ধীবা ভাবতে লাগল, কার সম্বন্ধ পরিমার্জনায় গল্পটি এমন রূপ নিল। এ নিশ্চয়ই কনকেন্দুর কাছ। কিন্তু কই, কনকেন্দু তো তাকে কিছু জানায় নি।

অবশ্য তাতে খারাপ কিছু হয় নি। বরং রচনাটি আগের থেকে অনেক স্বথশ্রাব্য হয়েছে। কিন্তু তাকে একবার জানালেই তো পারত। কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল।

অনিমেঘের সামনে কনকেন্দুকে তখনই সে কিছু বলতে পারল না। ওর লেখা আর একজনের হাতে পরিমার্জিত হয়ে ছাপা হয়েছে, এই দুর্বলতার কথা অনিমেঘকে জানিয়ে সে তার কাছে নিজের শিল্পপ্রতিভাকে খাটো করতে চায় না।

ধীবা ভাবল, বরং অনিমেঘ জাম্বুক, বুরুক, উপলদ্ধি করুক যে সে একটা সাধারণ মেয়ে নয়। বহু শক্তি ও বহু গুণের অধিকারিণী সে। শুধু অনিমেঘের সংসারের ক্ষুদ্র গত্তীর ভেতরেই তার সব শক্তি সব সামর্থ্য আবদ্ধ নয়। ইচ্ছে কবলে সে আবও বড় হতে পারে। নিজের শক্তিতে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে। তার এই শক্তি উপলদ্ধি করে অনিমেঘের মনে দুর্বলতা এবং আকর্ষণবোধ জাগুক।

গল্পটি শেষ কবে কনকেন্দু অনিমেঘের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি মশায়, ঘুমিয়ে পড়লেন যে দেখছি। মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন তো?

অনিমেঘ হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ, শুনলুম তো।

কেমন লাগল?—কনকেন্দু আবার জিজ্ঞেস কবল।

এই তো মুশকিলে ফেললেন।—অনিমেঘ হাসতে হাসতে বলল, আমার সমালোচনা কি আর যথাযথ সমালোচনা হবে?

কনকেন্দু হাসতে হাসতে বলল, তা ঠিকই বলেছেন, আপনার সমালোচনা নিবপেক্ষ হবে না। কেন না, এক্ষেত্রে আপনার শিল্পদৃষ্টির থেকে মমত্ববোধটাই বেশী সজাগ থাকা স্বাভাবিক।

না, তা আমি বলছি না।—অনিমেঘ লজ্জিতভাবে হেসে জবাব দিল, আসলে আপনাদের ওই সাহিত্যের রীতিনীতি আমি ঠিক বুঝি না। আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করে লজ্জায় ফেলবেন না।

কনকেন্দু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পেল, খোকন হঠাৎ বাইরে থেকে ছুটতে ছুটতে এসে কনকেন্দুর কাঁধের ওপব বাঁপিষে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, কাকু, কবে যাবে বল না?

কোথায় যাওয়ার কথা বলছে?—অনিমেঘ কৌতূহল-বশতঃ কনকেন্দুকে জিজ্ঞেস করল।

জু-পার্ভেনে। আর বলবেন না, গত রবিবার নিয়ে যাব বলেছিলুম। নানা কাজের ঝামেলায় যেতে পারি নি।

একটু থেমে কনকেন্দু আবার বলল, চলুন না, আজ দুপুরে সবাই মিলে একটু ঘুরে আসি। শীতের দুপুরটা মন্দ কাটবে না। কি বলুন, মিসেস মজুমদার?

ধীরা হেসে সম্মতি জানাল।

আপনাব কি অভিযত?—অনিমেঘের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কনকেন্দু।

অনিমেঘ বলল, আপনারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। আমি বরং অল্পদিন আপনাদের সঙ্গদানের চেষ্টা করব।

অনিমেঘের কথা শুনে ধীরার মনের মধ্যে যেন একটু জালা ধরে গেল। কথাটা এমন ভাবে পেঁচিয়ে বলল যার মানে হচ্ছে কনকেন্দু এবং ধীরার যুগ্মজীবনের মান্ব্যধানে সে-ই যেন একজন অবাস্থিত ব্যক্তি—ওদের একটু সঙ্গদান কবে আনন্দ দিতে চায়।

তাহলে কি করা যাবে?—ধীরার দিকে তাকিয়ে কনকেন্দু প্রশ্ন করল।

কি আবার কবব, আমবাই যাব।—ধীরা যেন রাগের মাথায জবাবটা দিল।

বেশ, তাহলে দুপুরে খাওয়াদাওয়াব পবই যাওয়া যাবে।

দুপুরে বেকবাব সময় হঠাৎ অনিমেঘের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ধীরা যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল নিজের বেশবাস এবং প্রসাধনব জজ্ঞে।

অনিমেঘ আহবাস্তে বাবান্দার বোদুবে খবরের কাগজ পড়ছিল। ধীরার বেকবার সময় একবার চোখ তুলে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। কিন্তু ধীরার মনে হল, অনিমেঘের ওই পলকের দৃষ্টিতেই যেন একটা শানিত বিজ্ঞপ খেলে গেল।

শাড়িতে যেন ধীরার পা জড়িয়ে যেতে লাগল।

দরজা পর্যন্ত এমনই জড়িত পায়ের সঙ্গে তারপর প্রায় ছুটেই কনকেন্দুর ঘরে গিয়ে ঢুকল। কনকেন্দুর ঘরে এসেও তাকে সেই একই অবস্থায় পড়তে হল; তার মাজমজ্জা এবং বেশবাসেব দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কনকেন্দু যার ফলে ধীরাকে রীতিমত লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিতে হল।

ধীরার দিকে একইভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবাব পর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কনকেন্দু বলল, চলুন।—তার গলার স্বর কেমন যেন একটু বিহ্বল শোনাল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে তারা তাদের গন্তব্যস্থলেব দিকে রওনা হল। অনেকক্ষণ ট্যাক্সিতে তাদের হুজনের ভেতর কোন কথা হয় নি। সেই বাড়ি থেকে বেরুনা অবধি ধীরার মনে কেমন যেন একটা লজ্জা জড়িয়ে আছে। কিন্তু লজ্জায় অস্বস্তি নয়, মনে বড় সুন্দর এক আবেশ ছড়িয়ে আছে। এমনই একটা লজ্জায় মনটা আবিষ্ট হয়ে থাকাব দরুন ধীরা কোন কথা বলতে পারছিল না।

এতক্ষণ জানলা দিয়ে দৃষ্টিটাকে বাইবে নিবন্ধ বেধে এই চুপচাপ বসে থাকার অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলোকে এড়ানোর উপায় ছিল। কিন্তু এখন পাশে বসে মুখ বুজে থাকাটা খুবই অজ্ঞ দোষ। ধীরাকে তাই কথার সূত্র খুঁজতে হল।

একসময় সে বলল, লেখাটা যে ছাপা হবে এবং আপনি যে তার ওপব কলম চালিয়েছেন, কই, সেসব কথা তো আমরা কিছু জানান নি।

কনকেন্দু হাসতে হাসতে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, আমার বোধ হয় একটু অত্যাচার হয়ে গেছে মিসেস মজুমদার। আমি অবশ্য খুব সময়দার নই, এবং কোন-দিন গল্প লেখারও চেষ্টা করি নি। তবু কেন জানি না, আপনার গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে মনে হল, জায়গায় জায়গায় ভাষা এবং ভাবের একটু পরিবর্তন করতে পারলে হয়তো আরও আপিলিং হয়ে উঠবে। গল্পটির বিষয়বস্তু খুবই ভাল এবং ভাল লেগেছিল বলেই কেন জানি না, গল্পটিকে নিজের মনেব মত করে মাজাবাব বড় লোভ হয়েছিল। কিন্তু পাছে আপনি কিছু মনে করেন এই ভেবে আপনাকে কিছু

জানাতে চাই নি। হয়তো আপনি আমাব এই দৃষ্টতাকে ক্ষমা করতে পারছেন না।

কনকেন্দুর এই বিনীত ভঙ্গীতে ধীরা বড় লজ্জা অস্থব করল। বলল, না না, আমি কিছুই মনে করি নি। বরং খুব খুশী হয়েছি। আপনার অ্যাডিশন অন্টারেশনে গল্পটি ভালই হয়েছে। আমি শুধু বললুম, কথাত্ম আপনি গোপন রেখেছিলেন বলেই।

গল্পটি কিন্তু আমাদের ম্যাগাজিন সেকমানের এডিটরের খুব ভাল লেগেছে। উনি আমার কাছে আপনার গল্পটির খুব প্রশংসা করছিলেন।

প্রশংসাটা যে আমার কতখানি প্রাপ্য সে ব্যাপারে কিন্তু আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।—কোর্ডুক-কটাক্ষে কনকেন্দুর দিকে তাকিয়ে ধীরা হাসতে হাসতে বলল, আমার তো মনে হয় নেপথ্য থেকে যিনি লেখাটিকে এমন রূপ দিয়েছেন সব প্রশংসা সব কৃতিত্ব তাঁবই প্রাপ্য। আমার এ প্রশংসা নিতে কেমন যেন সংকোচ হচ্ছে।

কনকেন্দু বলল, না না, এসব কী বলছেন। আমার তো শুধু রিটাচমেন্ট, মৌলিক যা কিছু তা তো আপনারই।

ধীরা হাসতে হাসতে বলল, আর কত বিনয় দেখাবেন কনকেন্দু। বিনয় প্রকাশের বাড়াবাড়িটা আবার অপমান করারই প্রকাবাস্তব কিনা, তাই আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

চিন্তা তো আমারও কম নয়। আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাড়াবাড়িটা যে আমাব পক্ষেও অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে।

ট্যাক্সিতে সারাটা পথ এমনই হাসি ঠাট্টা এবং অন্তরঙ্গ আলাপে মুখব হয়ে ওবা জু-গার্ডেনের গেটের সামনে এসে নামল। তারপর ঘণ্টা দুই ধবে ঘুরে ঘুরে থোকনকে সবকিছু দেখিয়ে যখন আবার বাইরে বেরুল তখন শীতের রোদুর বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

কনকেন্দু একটা ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছিল। ধীরা তাকে বাধা দিয়ে বলল, চলুন, একটু হাঁটা যাক। কিছুক্ষণ বেড়িয়ে তারপর ফেরা যাবে।

কনকেন্দু সামনে ধীরার প্রস্তাবে সায় দিল। ময়দানের দিকে যে রাস্তাটা গেছে, সেই দিক দিয়ে তারা হাঁটতে লাগল।

বিকেলের আলোয় ময়দানের নয়ম ঘাসের ওপর বসে গল্প করতে করতে কনকেন্দু একসময় বলল, বড় খিদে পেয়েছে, আমি কিছু আব খাকতে পারছি না। চলুন, এবার একটা দোকানে ঢুকে কিছু খাওয়া যাক।

কনকেন্দু একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে ডেকে থামাল। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপটাও আশে আশে বেড়ে চলেছিল। ধীরা এতক্ষণ ওভারকোটটা হাতে ঝুলিয়ে বেখেছিল, এবার সেটাকে গায়ে চাপিয়ে খোকনকে নিয়ে গাড়িতে এসে বসল।

আহারান্তে বেস্টবেস্ট থেকে বেরিয়ে কনকেন্দু বলল, অনেক সময় আছে, চলুন, একটা ছবি দেখা যাক।

বাড়ি ফিরতে তো প্রায় সাড়ে নটা বেজে যাবে। বাড়ির লোকে নানা হুশিস্তায় পড়বে।

না না, কী আর এমন দেরি হবে যে তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়বেন। ঝাঁকের মাথায় যদি ছবিটা দেখে ফেলতে না পারি তো আমাব দেখাই হবে না।—বলে কনকেন্দু সত্যিই সিনেমা হলের দিকে এগুতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে টিকিট কিনে ফিরে এলে ধীরা বলল, সত্যি এ আপনার ভারী অস্থায়। বাড়িতে যা কিছু কৈফিয়ত দেওয়ার তা আপনি দেবেন।

ধীরার রাগ-থমথমে গলা। তাব মুখের দিকে তাকিয়ে কনকেন্দু বলল, আপনি যে সত্যিই রেগে গেছেন দেখছি! থাক্, তবে টিকিট দুটো ফেবত দিয়ে আসি।

কনকেন্দু সত্যিই আবার কাউন্টারের দিকে যেতে উত্তত হতেই ধীরা ব্যস্ত হয়ে তাব হাতটা টেনে ধরল। তার মুখে দিকে তাকিয়ে চোঁট টিপে হাসতে হাসতে বলল, অত মনোকষ্ট কি আর সহ হবে।

কনকেন্দু চোপে মুখে খুশীর ইশারা।

ছবিটা কিন্তু ধীরার বেশ ভালই লাগল। যতক্ষণ হলে বসেছিল ততক্ষণ অভিভূত হয়ে ছবির মধ্যেই ডুবে ছিল। কিন্তু শেষ হবার পব তার মনের ওপর যেন একটা হুশিস্তার পাথর চেপে বসল।

শীতের রাত্রি। এরই মধ্যে নগরীর ব্যস্ততা যেন কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে গুটিস্থটি মেরে ঝিমুচ্ছে। রাস্তার

এই থমথমে আবহাওয়া ধীরার মনের ভারটাকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলল।

কি জানি অনিমেয কি ভাবছে। সিনেমা আজ না গেলেই হত। অনিমেয নিশ্চয় মনে মনে তার ওপর খুব ক্ষুব্ধ হয়েছে। হয়তো বাগেব মাথায় আজ কিছু বলেই বসতে পারে। না হয় কথাই বন্ধ হয়েছে, তাই বলে স্বামিত্বের অধিকাবে তো কর্তব্যকর্মে আব অবহেলা করবে না। সম্পর্ক যতই শিথিল হোক না কেন, স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীর বড় কর্তব্যসচেতন।

গলিতে ঢুকে কনকেন্দু নেবুলালেব দোকানে এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্তে দাঁড়াল। ধীরা খোকনকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় মুছ করামাত করল।

অনিমেয বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরার কেমন যেন ভয়-ভয় কবতে লাগল। জোবে জোরে আবও কয়েকবার কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল।

অনিমেয ঘুমচোখে ধীরাকে একবার দেখল। তাব দৃষ্টির সামনে ধীরা কেমন যেন একটা স্কোচ বোধ করল। তার মনে হল, অনিমেয যেন দুপুরের সেই দৃষ্টিতেই তাকে দেখছে।

এত দেরি হওয়ার জন্তে ধীরা নিজে থেকেই একটা কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে একটা কথাও উচ্চারণ কবতে পারল না। অপরাধবোধে মাথাটা নীচু করে নিঃশব্দে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অন্ধকাবে ভাবতে লাগল, মিছিমিছি ভয় আর লজ্জায় আমি এমন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছি কেন। আমি তো কোনও অপবাধ করি নি। তবে?

তা ছাড়া অনিমেয আমায় কী বলতে পারে? বলার মত কি ওর কিছু আছে? নিজের চবিত্র ঠিক থাকলে তবেই না অপরের চবিত্র সম্পর্কে সতর্ক করার সৎসাহস থাকে। তা হলে মিছিমিছি ওকে অত ভয় করে চলি কেন।

সাত

গল্পটি ছাপা হওয়ার পর ধীরা যেন আবাব নতুন করে লেখার প্রেরণা পেয়েছে। উৎসাহে মাদ তিনেকের

আধুনিক পরিবারে আভিনব সার্ফ



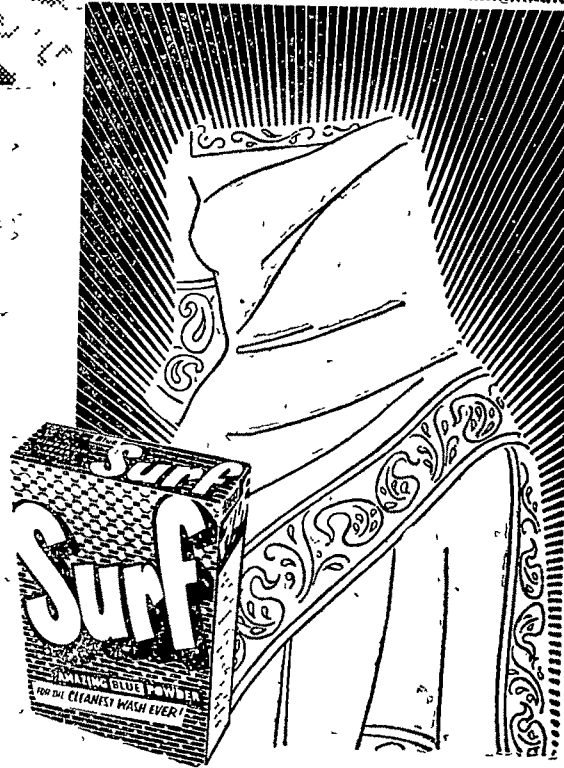
‘আমাদের আজকের জীবনে...’

বোধের গৃহিণী প্রেমা সন্দ্বজী বলেন

‘আমাদের আধুনিক এই জীবন যাত্রায় মনে হয় বোঝাই নতুন জিনিষ চাই, আর কালকের চেয়ে আব ও ভাল জিনিষ চাই’—বোধের ওবালকেশব বোডের শ্রীমতী প্রেমা জি. হৃন্দরজীব অভিমত। তিনি বলেন, ‘আজ এ ধরনের বহু আধুনিক, উন্নত জিনিষ বাজারে পাওয়াও যাচ্ছে। এই ধরন সার্ফ ব্যবহার করে সত্যিই আনন্দ হয়। কাপড় সার্ফে র কাপড় কাচার গুণ অতুলনীয়!’

‘সার্ফে র দেদার ফেনা মথলা কাপড় চুবিষে তুলে নিন, দেখবেন সাদা কাপড়জামা কেমন ধবধবে ফবসা হয়েছে!’ তাই হৃন্দরজীবের বাড়ীর কাপড়চোপড়—সার্ট, প্যাট রাউজ, শাড়ী, তোয়ালে চাদর, ওখাড খাডন সবই বাড়ীর গৃহিণী সার্ফে করেন।

আপনি সার্ফ ব্যবহার করছেনতো? সার্ফ আপনার কাপড় কাচার স্বামেলা অর্ধেক কমিয়ে দেবে—অথচ সার্ফে কাটা কাপড় আগে থেকে অনেক ভালো, অনেক বেশী ফবসা হবে। তাইতো যবে যবে আজ সার্ফে র বদল। আপনিও এবার সার্ফে কাচতে শুরু করুন!



সার্ফে কাপড়জামা সবচেয়ে ফবসা করে কাচে

হিন্দুস্তান লিভাবেব তৈরী

SU. 18-X32 BG

ভেতর পরপর কয়েকটি গল্প লিখেছে। লিখে এখন আব কনকেন্দুর হাতে দিয়ে চলে আসে না। সামনে বসে তাকে লেখাগুলো পড়ে শোনায়। কোথায় কি পরিবর্তন এবং পরিমার্জনা করা দরকার তা নিয়ে আলোচনা করে। কনকেন্দুর শিল্পবোধের ওপর তার যেন কেমন একটা আস্থা জন্মে গেছে। সে যেমন নির্দেশ দেয় ধীর ঠিক সেইভাবেই লেখাগুলো পরিমার্জনা করে। লেখার ব্যাপারে কনকেন্দুর সহযোগিতাটা খুবই আন্তরিক। সে গত তিন মাসে ধীরার আরও তিনটি গল্প ছেপে দিয়েছে ওদের দৈনিকের পৃষ্ঠায়। এই সব কারণে কনকেন্দুর প্রতি ধীরার কৃতজ্ঞতাটা দিন দিন বেড়েই গেছে। এবং এই অবাধ মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনার ফলে, গড়ে উঠেছে একটা সৌহার্দ্যব সম্পর্ক। এই সৌহার্দ্য এখন শুধু ঘরে বসে সাহিত্যালোচনার ভেতবেই আবদ্ধ থাকতে চায় না, বাইবেব নানা আনন্দের ভেতর পরিতৃপ্ত হতে চায়। আজকাল প্রায়ই তারা সিনেমা যায়, যায় উৎসব অস্থানে, না হয় এমনই একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসে।

প্রথম প্রথম কনকেন্দুর কাছ থেকেই প্রস্তাবগুলো আসত। ইচ্ছা থাকলেও ধীরার মনে সঙ্কোচ জাগত। ভাবত, কি জানি, অনিমেঘ হয়তো ক্ষুদ্র হবে, নীহারকণা হয়তো কিছু ভাববেন।

কিন্তু কেউ কোনদিন কোন কথা বলে নি। ওরাও দিনে দিনে তাই অবাধ হয়ে উঠেছে।

প্রথম প্রথম কনকেন্দু নেহাত সৌজন্য বজায় রাখার জন্তে অনিমেঘকে অল্পরোধ উপরোধ করত তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্তে, কিন্তু অনিমেঘকে কখনও রাজী করাতে পারে নি। নানা অজুহাতে অনিমেঘ ওদের এড়িয়ে গেছে। তবু এখনও মাঝে মাঝে অল্পরোধ আসে। যেমন আজই কনকেন্দু অল্পরোধ করেছিল, চলুন অনিমেঘবার, নিউ এম্পায়ারে একটা ডাল-ডামা হচ্ছে, দেখে আসি।

একটু ইতস্ততঃ করে অনিমেঘ বলেছিল, আমার যে একটু কাজ আছে।

কাজ তো আপনার রোজই থাকে; চলুন, আজ সবাই মিলে আমরা একটু আনন্দ উপভোগ করে আসি। আপনার মিসেস আজ লেখার টাকা পেয়েছেন; তাই উনিই

আজ সমস্ত আনন্দের ব্যয়ভার বহন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু আমার কাজটা যে খুবই দরকারী। আপনাদের সঙ্গে যেতে পাবলাম না বলে খুবই দুঃখিত। আর তা ছাড়া—

কী যেন একটা বলতে গিয়ে অনিমেঘ থেমে গিয়েছিল। কনকেন্দু জিজ্ঞেস করেছিল, তা ছাড়া কি?

ধীর বাবান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। অনিমেঘ তার দিকে একবার তাকিয়ে হাসতে হাসতে কনকেন্দুকে বলেছিল, এই টাকার ওপর স্বত্বটা আপনাদের দুজনের। আমার ভাগ বসানোটা উটকো লোকের দখলদারীর মত হয়ে দাঁড়াবে।

না না, এসব কি বলছেন! টাকাটার ওপর আমার আবার কিসের স্বত্ব?

আছে বইকি।—হাসতে হাসতে 'অনিমেঘ' জবাব দিয়েছিল, ও লিখেছে, 'আর' সেটা আপনি ইন্টারেস্ট নিয়ে ছাপাবার ব্যবস্থা করেছেন। স্বত্বরূপ আপনার ভূমিকাটা মোটেই গৌণ নয়। কিন্তু আমার তো কোনও ভূমিকা নেই—এমন কি গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবেও নয়। তাই আপনাদের আনন্দে যোগ দিতে আমার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।

কথাটা শুনে ধীর একবার অনিমেঘের দিকে কটাক্ষে তাকিয়েছিল। কনকেন্দু খুব লঘুচিত্তে কথাটা গ্রহণ করেছিল। সে হাসতে হাসতে বলেছিল, আসলে আপনার যাওয়ার ইচ্ছে নেই, তাই এই সব কথা বলছেন।

এর পর কনকেন্দু আর কোনও কথা বলে নি। কিন্তু ধীরার মনে একটা জালা ধরে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, 'অনিমেঘের' কথায় যেন একটা তীব্র প্লেথের ইঙ্গিত রয়েছে।

কিন্তু তার জন্তে যাওয়া সে স্থগিত রাখে নি। বরং মনে কেমন যেন একটা জ্বল চেপে গিয়েছিল। এবং এই জ্বলের বশেই সে দুপুরে উগ্র সাজসজ্জা করে নানা অছিলায় অনিমেঘকে সেই সাজসজ্জা দেখিয়ে তারপর বাড়ি থেকে বেরুল।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর অনিমেঘ সারাটা দিন শুয়ে-বসে একটা বই পড়ে কাটাল। অনেকদিন পর

বেহালাটা নিয়ে বসল। কিন্তু বেলা একটু পড়ে এলে বাইবে বেরুনোর জগ্রে মনে কেমন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করতে লাগল। বিকেলের বাতাসে বসন্তের মৃদু আমেজ। অনিমেঘ ভাবল, এই ঝিবঝিরে বিকেলটা কোনও নির্জন জায়গায় বসে কাটাবে। এই ভেবে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বালিগঞ্জগামী একটা বাসে চেপে বসল।

প্রথমে ভেবেছিল সন্ধ্যাটা লেকেব ধারে বসে কাটাবে। কিন্তু কি মনে করে মাঝপথে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে নেমে পড়ল। তারপব রাস্তাটা পেরিয়ে ময়দানের ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নির্জনে ঘাসের ওপর এসে বসল।

কিন্তু এখানে এসে এমন আকস্মিকভাবে যে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তা অনিমেঘ করনা কবে নি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ উচ্চকিত হাসিতে পিছন ফিবে ওদের দুজনকে দেখতে পেল। ওরা হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছিল। গল্পে এবং হাসিতে এমন মেতে ছিল যে এতক্ষণ তারা অনিমেঘকে লক্ষ্যই করে নি। অনিমেঘ ফিরে তাকানো মাত্র ওরাও যেন হঠাৎ সচকিত হয়ে তাকে লক্ষ্য করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের উচ্ছ্বাসের মুখে যেন পাথর চাপা পড়ল। ধীরে বড় অপ্রস্তুত বোধ কবল। এতক্ষণ ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। এবার একটু পিছিয়ে গিয়ে কনকেন্দু সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখল।

কনকেন্দু কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠে অনিমেঘের কাছে এসে জিজ্ঞেস কবল, এ কি, আপনি এখানে যে।

এমনি, একটু সান্ধ্যভ্রমণে।

একটু নীরব থেকে কনকেন্দু যেন কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজনেই বলল, আমরাও এইমাত্র হল থেকে বেরুলাম, বেরিয়ে এখনও বেলা আছে দেখে একটু ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে হল, তাই—

কনকেন্দু কথাটা আর শেষ করল না। অনিমেঘের দিকে তাকিয়ে নির্বোধের মত একটু হাসল—যেন সেই হাসি দিয়েই বাকি কথাটা পূরণ কবল।

একটু ইতস্ততঃ কবে কনকেন্দু অনিমেঘের সামনে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। ধীবা কিন্তু অত্নদিকে ফিরে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। অপ্রস্তুতের ভাবটা তখনও

সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কনকেন্দুই একসময় তাকে বলল, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিসেস মজুমদার? বসুন না।

অগত্যা ধীরাকেন্দু বসতে হল। বসল বেশ একটু দূরত্ব বজায় রেখে। কিছুক্ষণ নীরবতাব পর কনকেন্দু একসময় অনিমেঘকে জিজ্ঞেস কবল, আপনাব না কোথায় যাওয়ার কথা ছিল অনিমেঘবাবু?

সকালে একটা মিথো অজুহাত দিয়েছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে বেমালুম মিথো কথাটা বলতে অনিমেঘের কেমন যেন বাধা বাধা ঠেকল। বলল, না, শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হল কই। আজকের সমস্ত কাজেব প্রোগ্রামটা কেমন যেন আপসেট হয়ে গেল। অনেকদিন পরে আজ বেহালাটা নিয়ে বসেছিলুম, সেটা বাজাতে বাজাতে টাইমটা এক্সপায়ার করে গেল, যাওয়া আর হল না।

কনকেন্দু হাসতে হাসতে অহুযোগ করল, আচ্ছা মাহুষ মশায় আপনি। এইভাবে সময়গুলো মিছিমিছি নষ্ট করলেন তবু আমাদের সঙ্গে এলেন না। অথচ এমন একটা ফাংশনে না গিয়ে আপনি কী যে মিস করেছেন তা আপনি জানেন না।

অনিমেঘ বলল, জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তো আমরা কিছু না কিছু মিস এবং গেন কবছি। তার সব হিসেব কি আমরা রাখি, না, আমাদের পক্ষে তা রাখা সম্ভব। স্বতরাং মিছিমিছি তার জগ্রে হা-হতাশ করে আর লাভ কি?

এই আপনার দার্শনিকতা শুরু হল।—কনকেন্দু হাসতে হাসতে হাত জোড় করে বলল, দোহাই মশায়, সব সময় অত সিরিয়াস হবেন না। তা হলে আমাদের পক্ষে টেকা দায় হয়ে উঠবে।

তাহলে শুরু-করুন আপনার 'আন-সিরিয়াস অ্যাণ্ড আন-ল-ফুল টক' কি আছে।—বলে অনিমেঘ হাসতে হাসতে সিগারেটের প্যাকেটটা কনকেন্দুর সামনে মেলে ধরল।

সিগারেট ধরিয়ে কনকেন্দু বলল, অনিমেঘবাবু, আসুন না, এবার আমরা একটা ভাল প্রোগ্রাম সেট্ করি, একদিন বেশ দূরে কোথাও গিয়ে ঘুরে আসা যাক।

আপনি আপনার বেহালাটা নেবেন। মুনলাইটে কোনও পল্লীপ্রকৃতির মাঝে বসে আপনার বেহালা শোনা যাবে।

বেশ তো, আপনারা একটা দিন স্থির করুন, যাওয়া যাবে।—অনিমেঘ জবাব দিল।

কনকেন্দু একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবতে লাগল। আব অনিমেঘ এই ফাঁকে ধীরাকৈ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, দেখতে লাগল তার চুল ধাঁধার ছাঁদ, মুখের প্রসাধন, রাউজের ডিজাইন, শাড়ির রঙ, শাড়ি পরার ধবন। সাজসজ্জা এবং বেশবাস কবার অদ্ভুত দক্ষতায় ধীবা নিজেকে যেন আজ স্থলে-পড়া কিশোরী মেয়ের মত সাজিয়েছে।

অনিমেঘ লক্ষ্য করল, এই ক মাসে তার চেহারারও যেন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চোখমুখের ঢলঢল লাবণ্য যেন আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। অনিমেঘ জানে, মনে অল্পবাবের রঙ লাগলে মেয়েদের মুখেচোখে নাকি এমনি সৌন্দর্যের আভাই ফুটে ওঠে। তা হলে ধীরার মনে সত্যিই কি আবার নতুন করে ভালবাসার বঙ লেগেছে!

কথাটা ভাবতেও অনিমেঘের কেমন যেন ভাল লাগল। মনের মধ্যে যেন একটা কোঁতুক অল্পভব করতে লাগল।

যতই মনোমালিঙ্গ হোক না কেন, এবং যত দীর্ঘদিনই তাদের পরস্পরের ভেতর শিথিল সম্বন্ধ থাকুক না কেন, তবু ধীরার ওপব অনিমেঘের বিশ্বাসটা আজও পুরোমাত্রায় অবিচল রয়েছে। ধীবাঁকে সে ভাল ভাবে চেনে। ধীরার নিষ্ঠা নির্ভরতা এবং দুর্বলতার কথা তাব অজানা নয়। তার মনেব খবর খুব ভালভাবে জানে বলেই বোধ হয় সে ধীরার সম্পর্কে এতটুকু বিচলিত হতে পারছে না। বরং মনে একটা কোঁতুকবোধ জাগছে।

কনকেন্দু বলল, তা হলে সামনেব দোলপূর্ণিমার দিন আমাদের গ্রামে চলুন। প্রতি বছর সেখানে, বিবটি উৎসব হয়। উৎসবও দেখা যাবে এবং আমাদের রিক্রিয়েশানও হবে।

অনিমেঘ অগ্রমনস্কভাবে জবাব দিল, আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

দেখা যাবে নয়, যেতেই হবে।—কনকেন্দু জোর দিয়ে বলল।

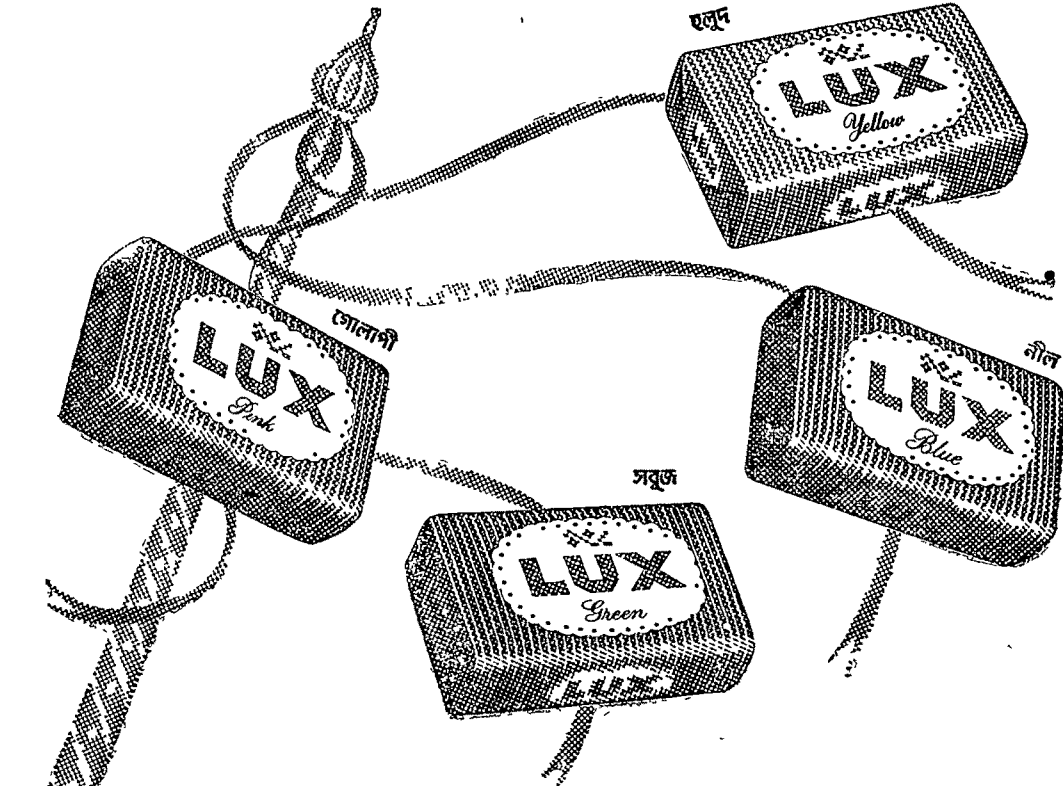
কনকেন্দুর কথায় অনিমেঘের এতক্ষণের আনমনা ভাবটা কেটে গেল। সে এবার জিজ্ঞেস করল, সে কোন্ মুহুর্তে?

বেশী দূর নয়, এই তো কাছেই—বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে।

অনিমেঘ আবার ধীরার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ আগের সেই কোঁতুকাবহ চিন্তার মধ্যে ফিবে যেতে চাইল। কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

ধীরার চুলগুলো আজ কেমন একটু কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেখাচ্ছে। বোধ হয় তেল দেয় নি, কিংবা আঁস্পু করেছে। বিকেলের উচ্ছল বাতাসে দু-একটি বাঁধনমুক্ত চুল তার কপালের ওপর এসে পড়ছে। হালকা হাতে সেই চুলগুলো মাঝে মাঝে পরিপাটি করে গুছিয়ে তুলছে ধীরা। শিকনের হালকা শাড়ির আঁচলটা বাতাসে উড়ছে, ফিসফিস শব্দ ছড়াচ্ছে। অনিমেঘের দৃষ্টি ধীরার স্ত্রুজৌল গ্রীবার ওপর, চিবুকের ওপর, মস্তণ গালের কালো তিলটির ওপর, কখনও বা মন্দির বিশ্বল চোখের ওপব ঘোরাফেরা করতে লাগল।

ধীরার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেঘের একসময় মনে হল, ধীরার চেহারায় বেশ একটা সপ্রতিভতা এবং প্রথম ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। তার প্রতি ধীরার যখন অন্ধ নিষ্ঠা ছিল, যখন তাকে পরম নির্ভরতায় আঁকড়ে থাকত তখন সে ধীরার ভেতব এই জিনিসটার যেন একান্ত অভাব দেখত। এক এক সময় তার মনে হত ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝি ধীরার কিছু নেই, নেই বিচার বুদ্ধি বিশ্লেষণ। মা-বাবা যে পুরুষটির হাতে তাকে তুলে দিয়েছে সেই-ই তার জীবনের প্রথম এবং একমাত্র পুরুষ। পরম নিয়তিজ্ঞানে এবং হয়তো অন্ধ নংস্কারবোধে তাকেই সে ভালবাসতে শিখেছে। স্বামিত্বের লেবেল আঁটা আছে বলেই সে তাকে ভালবাসে। যদি অনিমেঘ না হয়ে যত মধু কিংবা শ্রাম এই লেবেলটি এঁটে তার জীবনে আসত তবে তাকেও সে এমনি ভালবাসত। তাই এক এক সময় অনিমেঘ ভাবে, এ ভালবাসার মূল্য কী? এ পাওয়া তার কি চারিত্রিক কৃতিত্ব আছে? কিছুই তো নেই। এ তো পুরুষমাত্রই জীব কাছে পেয়ে থাকে। যার অগ্র কোন পুরুষের সঙ্গে য়েলামেশা করাব স্রযোগ হয় নি বা নেই তার পক্ষে একনিষ্ঠ থাকা তো খুবই স্বাভাবিক।



বিশুদ্ধ, কোমল লাক্স এবার ৪টি রামধনু-রঙে

আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!

দেখুন! লাক্স এবার চমৎকার কত সব নতুন বঙে ধবা দিয়েছে—
সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—যেকোনো
যত্ন নিতে যে সাবান আপনি চিবদিনই চেয়েছেন।



মঞ্জুলা ব্যানার্জী বলেন
'আমার প্রিয় লাক্সে যেন
রঙের মেলা লেগেছে,
এ এক অভিনব রচনা!'



চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান

XS B4-XS2 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

জীবনে একটিমাত্র পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার স্বযোগে যে একনিষ্ঠতার জন্ম, তাকে অনিমেষ মূল্য দিতে কেমন যেন কুণ্ঠিত হত। অনিমেষের মনে হত ধীবাণ এই নিষ্ঠার ভেতর স্বপ্ন বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণের কোন বালাই নেই। তাকে এক এক সময় বড় স্থূল, বড় সাধারণ বলে মনে হত। ওর একনিষ্ঠতায় তখন বড় আশ্বাদ অনুভব করত।

অনিমেষ ভাবত, একনিষ্ঠতার সঙ্গী গভী ছাড়িয়ে মনটাকে পরিব্যাপ্ত করতে না পাবলে মেয়েদের প্রেমিক সত্তার পূর্ণবিকাশ কখনই সম্ভব হয় না। এব জন্মে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখার, দশজনের সঙ্গে মেলামেশাব একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। অনিমেষ তাই এক একসময় ভাবত, দশজনের সঙ্গে না হোক, অন্ততঃ অল্প কোন একটি পুরুষের সঙ্গে যদি ধীরার বন্ধুত্ব থাকত, তার প্রতি ওব নিষ্ঠায় যদি একটু শৈথিল্য থাকত, তা হলে হয়তো ও ভালবাসার ভালমন্দ যাচাই করার স্বপ্ন মনটিকে অর্জন কবতে পাবত, এবং অনিমেষও তখন মনকে প্রবোধ দিতে পারত যে ধীবা ওর মনের ব্যাপ্তি দিয়ে তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারছে। ওব একনিষ্ঠতায় তখন এমন অবসাদ আসত না। ববং ওব জন্মে মনে একটু ব্যাকুলতা থাকত, একটু বা উদ্বেগ।

অনিমেষ ভাবত, এমনি দ্বন্দ্ব ব্যাকুলতার ধীরাকে পেলে তার ভালবাসার জীবনটা আরও মোহময় হয়ে উঠত। এবং সেও যেন একটা কুতিত্ব অর্জনেব গৌরব অনুভব করতে পারত।

খাদ না মিশলে যেমন সোনার উজ্জলতা বাড়ে না, মজবুত হয় না, ভালবাসাও বৃদ্ধি সেইরকম—একটু অস্থিরতা না জাগলে তাব আকর্ষণ বাড়ে না, উত্তাপ থাকে না, বন্ধনও দৃঢ় হয় না।

ধীবার একনিষ্ঠতায় অবসাদ অনুভব করে অনিমেষ তখন এইসব কথা ভাবত। তাই আজ কনকেন্দুর সঙ্গে ধীরার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব দেখে এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না।

বিকেলের আলোটা স্নান হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল। কাছে ঘোড়ানিমের গাছটায় পাখিদের কলববও একসময় থেমে গেল। এই ছায়াধর্মথমে সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণ সবাই যেন কেমন নির্বাক হয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

একসময় নীববতা ভঙ্গ করে অনিমেষ হঠাৎ বলল, আপনাবা বন্ধন, আমায় এখনই একটু ভবানীপুর যেতে হবে।

ধীবা বিশ্বাসে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বইল। অনিমেষের এই আচরণ তাব কাছে যেন খুবই বিশ্বয়জনক মনে হচ্ছে। নির্জন মাঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের দুজনকে এভাবে ফেলে চলে যাওয়ার ভেতর অনিমেষেব মনেব কী বিশ্রী অভিসন্ধিই না প্রকাশ পাচ্ছে। কী কুৎসিত কী জঘন্য ওর মনটা।

অনিমেষের এভাবে হঠাৎ উঠে চলে যাওয়াটা কনকেন্দুর মনেও বিশ্বয় জাগিয়েছিল। একসময় সে ধীরাকে বলল, মিসেস মজুমদার, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনাদের দুজনের ভেতর কী হয়েছে বলুন তো? আমি আপনাদের আচার-আচরণ কিছু বুঝতে পাবি না। অথচ মনে হয় আপনাদের ভেতর ভীষণ একটা ফিক্সান চলেছে।

ধীরা কোনও জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসেই রইল। কনকেন্দুও আর তাকে বিরক্ত কবল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, উঠুন এবার, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

ধীরা নিঃশব্দে হাঁটিতে লাগল। চোরদ্বীতে এসে তারা একটা বাসে উঠল। কনকেন্দুর পাশে বসে সারাটা পথ সে একটুও কথা বলল না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে অনিমেষেব আচরণের কথাই ভাবতে লাগল।

তার মনে হল অনিমেষ যেন গোড়া থেকেই কনকেন্দুর সঙ্গে তাকে গভীরভাবে মেলামেশাব একটা স্বযোগ দিয়ে যাচ্ছে। এব আগেও বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে ধীরা এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে, এবং আজও তাদের সঙ্গে ফাংশনে না আসা ও ময়দানের অন্ধকারে তাদের ফেলে চলে যাওয়ার মূলে অনিমেষের এই মনোভাবটাই রয়েছে।

অনিমেষ কি তাকে বিপদে ফেলতে চায়, না তাকে পরীক্ষা কবতে চায়, না তার প্রতি কোনও আকর্ষণ নেই, বলেই এই ঔদাসীন্য? কিংবা পরোক্ষ অপমান কবারও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু অপমান করার এ কি অদ্ভুত ধবন!—

দোলপূর্ণিমার উৎসবে কনকেন্দুর দেশের বাড়িতে যাওয়াটা একরকম স্থির হয়েই ছিল। তবু ধীরার মনে প্রথম থেকে কেমন যেন একটু আশঙ্কা ছিল, এবং সে যা ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল, অনিমেষ ওদের সঙ্গে যেতে রাজী হল না। একটা মিথ্যে অজুহাতে যাওয়াটা এড়িয়ে গেল। অনেক অহুরোধ করল কনকেন্দু, নীহারকণাও অনেক করে তাকে বললেন, কিন্তু কিছুতেই তাকে বাজী কবানো গেল না।

ধীরা বুঝল, এসব আব কিছু নয়, এও অনিমেষের একটা চাল, ধীরার কাছে নিজের ঔদাসীন্য দেখানো। উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে মনের দৃঢ়তা জাহিবেবের চেষ্টা। অনিমেষ ভাবে কি? এই উপেক্ষা দেখিয়ে ও কি তাকে বিচলিত করতে চায়?

না, অত সহজে সে বিচলিত হবে না। কিন্তু একটা অপমানের জালা যেন সে বোধ করল। তার মনে হল, সেদিন সন্ধ্যায় জনবিলল মাঠের অন্ধকারে তাকে আর কনকেন্দুকে ফেলে চলে গিয়ে অনিমেষ যেভাবে অপমান করেছিল, আজও যেন সেইভাবেই অপমান করেছে।

ধীরার মনে দারুণ জালা ধরে গেল। মনের মধ্যে যেন প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠল।

আট

নীহারকণা এবং কনকেন্দুর সঙ্গে ওদের দেশের বাড়িতে গিয়ে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে এসে ধীরা তার মনের সেই প্রতিশোধস্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে লাগল। সে আগের চেয়ে আরও নির্দয় হওয়ার চেষ্টা করল। চালচলনে আরও বেরোয়া হয়ে উঠল। এবং এর ফলে কনকেন্দুর সঙ্গে তাব মেলামেশাটা আরও ঘনিষ্ঠ রূপ নিল। কিন্তু ছলনাব আশ্রয় নিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যে সত্যিই এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াবে তা ধীরা বুঝতে পারে নি। বুঝল যখন তখন তাকে প্রতিরোধ করার মত মনের অবস্থা আর রইল না। মনের দিক দিয়ে ধীরা নিজেও বড় দুর্বল হয়ে পড়ল। কনকেন্দুর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য তার মনে যেন নতুন অহুভূতির স্বাদ সঞ্চারিত করতে লাগল।

বস্তুত: জীবনে এই প্রথম সে প্রেমের স্বাদ উপলব্ধি করল। নিজের ভেতর যে এমন একটা

প্রেমিকার সত্তা আছে তা এই প্রথম সে অহুভব করল। অনিমেষের সঙ্গে চার বছর কাটিয়েও ধীরা যেন এই সত্তাটিব কোনদিন পবিচয় পায় নি। আজ তাব মনে হচ্ছে, সেখানে যেন একটা কর্তব্যবোধ ছিল, একটা বাঁধাধরা নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়ে অনিমেষকে সে ভালবেসেছে—অনিমেষের প্রেমে পড়ে নয়। অনিমেষ তার জীবনে এমন মৃদু পদসঞ্চাবে আসে নি। যেন একটা অধিকারের সনদ নিয়ে এসেছে, আর ধীরাও সে অধিকারের আলিঙ্গনে উপায়হীনতার মত বশ্বতা স্বীকার করেছে এবং ভালও বেসেছে। কিন্তু সে ভালবাসার অগ্র স্বাদ, অগ্র অহুভূতি। আব এই প্রেমের অহুভূতি, এর রোমাঞ্চ আলাদা। লজ্জা গোপনতা উৎকর্ষা ভীকতা—সবকিছু মিলে সব সময় যেন ধীরার বুকখানিকে ছুঁ ছুঁ কাঁপায়।

হ্যাঁ, একটা ভীকতাও ইদানীং তাকে পেয়ে বসেছে। নিজের এই ভীকতায় এক একসময় সে নিজেই বড় অবাক হয়ে যায়। ছলনার আশ্রয় নিতে গিয়ে একদিন যখন কনকেন্দুর সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল তখন তার মনে যে বেরোয়া ভাব ছিল আজ আব সে ভাব নেই। প্রকৃত প্রেমে পড়ে মনে কেমন যেন একটা ভীকতা এসে বাসা বেঁধেছে।

তবু ধীরা নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে না। কনকেন্দুর মিষ্টি ব্যবহার এবং চোখের মোহময়তা তাব সামনে হৃদয়কে মেলে ধরতে ভাল লাগে। মধুর আবেশে সমস্ত হৃদয় ভরে যায়। আর একে নিষ্কৃতি দিতে পারে না বলে এক এক সময় তাকে বড় লজ্জাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

একদিন যেমন কলেজ স্ট্রিটেব একটা রেন্টুবেণ্ট থেকে বেরতে গিয়ে একেবারে অনিমেষের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল তাবা। আর একদিনও ঠিক ওইরকম হয়েছিল। সন্ধ্যাব আবছায়ায় গোলদীঘির পাড়ে বেড়াবার সময় অনিমেষকে একটি বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে ধীরা লজ্জা এবং অপ্রস্তুতে জড়সড় হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিন এভাবে পারে নি। কেন না, সামান্যসামনি দেখা হয়ে যাওয়ায় কনকেন্দুকে অনিমেষের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল, এবং একই সঙ্গে তারা বাড়ি ফিরেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের ব্যাপারটা একটু অগ্র রকমের। সেদিন

কনকেন্দু অনিমেষকে দেখতে না পাওয়ায় ধীরার পক্ষেও পরিস্থিতিটা অতিক্রম করা সহজ হয়েছিল। কনকেন্দুকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে গোলদীঘি থেকে চলে এসেছিল। দুদিনের ঘটনাই তাকে ভয় এবং অপরাধবোধে সঙ্কুচিত করে রেখেছিল। আশঙ্কা করেছিল অনিমেষের দিক থেকে হয়তো একটা বিক্ষোভ প্রকাশ পাবে। কিন্তু কিছুই হজ না দেখে সে বড় অবাক হয়ে গেল।

অথচ গুদেব দুজনের ব্যাপাব নিয়ে ক্ল্যাটের সমস্ত প্রতিবেশীর ভেতর যেন একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে, এবং সে গুঞ্জন অনিমেষের কানেও যে পৌঁছয় নি তা নয়। তবুও সে এতটুকু বিচলিত হয় নি।

বিচলিত হয়ে পড়েছেন নীহারকণা। কিন্তু বিপত্নীক এবং পুনর্বিবাহে নাবাজ ছেলের প্রতি কেমন একটা দুর্বলতা থাকার মরুম কনকেন্দুকে কিছু বলতে না পেরে ধীরাকেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছেন।

নীহারকণা বলার আগেই লোকলজ্জার ভয়ে সে নিজেই যেন একটু ভীতসঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। সেই থেকে সে একটু সংযত হয়ে চলাফেরার চেষ্টা কবতে লাগল। দুদিন আর কনকেন্দুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করল না। কিন্তু তৃতীয় দিনে খোকনের মাবফত কনকেন্দুর একটা চিঠি পেয়ে তার মন আবার যেন একটু উদ্বেলিত হয়ে পড়ল। কনকেন্দু লিখেছে : °

সুচরিতাসু,

আজ দুদিন যাবৎ আপনি আমাদের ক্ল্যাটে একবারও আসেন নি। কেন যে আসছেন না তার কাবণ জানতে বাকি নেই, অগ্নাগ্র ক্ল্যাটের বাসিন্দাদের কানাঘুসো আমার কানেও কিছু পৌঁছেছে। কিন্তু তাব জন্তে আমি এতটুকু ভয় পাই নে। হুঃখ হয় শুধু আপনাকে লোকলজ্জার ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে দেখে। আপনার মনোবল যে এত ক্ষীণ তা আমার জানা ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল জীবনের নানা সংঘাত এবং অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যে সত্যকে আপনি অস্তব দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, বাইরের কোনও ঝড়ঝাপটাতে তার মূলোচ্ছেদ হবে না। কিন্তু সামান্য একটু লোকলজ্জার ভয়ে আপনি এত বিচলিত হয়ে পড়বেন তা কল্পনাই করতে পারি নি।

যাই হোক, আজ বিকেল চারটের সময় গোলদীঘির

পশ্চিমদিকের ফুটপাতে আমি আপনার অপেক্ষায় থাকব। আপনি অবশ্যই আসবেন। অনেক কথা আছে। তা ছাড়া আজ একটু বেড়াবারও ইচ্ছে আছে। আপনি না একদিন আউটরাম ঘাটে বসে একটা বিকেল কাটানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন? চলুন না, আজই সেখানে বসে বিকেলটা কাটানো যাবে। সাক্ষাতে বসে কথার বৃষ্টিতে দুদিনের পুঞ্জীভূত মেঘকে হালকা করার জন্তে ব্যাকুল হয়ে আছি। আপনি অবশ্যই আসবেন। না এলে কিন্তু খুব ক্ষুণ্ণ হব এবং জানব যে আপনার এতটুকু মনোবল নেই। আমার আন্তরিকতা নেবেন। ইতি—

কনকেন্দু

খোকন যখন চিঠিটা এনে দিল ধীরা তখন একটা মাসিকপত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল। সচকিতে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে খোকনের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ভাঁজ খুলে দ্রুতদ্রুত বক্ষে বারকয়েক চিঠিটা পড়ল। তারপর একসময় চিঠিটা ভাঁজ করে একটা পত্রিকাব ভেতব রেখে দিল।

কিন্তু এই অসাবধানতার জন্তে যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবে তা সে বুঝতে পাবে নি। দুপুরে একসময় অনিমেষ সেই পত্রিকাটা তার ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছিল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে তার নজরে পড়েছিল চিঠিখানা। খোকনের হাত দিয়ে অনিমেষ চিঠিখানা ধীরার কাছে পাঠিয়ে দিল। ধীরা প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। নীলচে বগেব কাগজটা দেখেই তার বুকটা হঠাৎ কঁপে উঠল।

এতক্ষণে ধীরা টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখল, পত্রিকাটা সেখানে নেই; নিজের অসাবধানতার জন্তে নিজেকে ধিক্কাব দিতে লাগল।

স্থানুব মত বসেই রইল ধীরা। লজ্জা আর অপরাধবোধে তার মনটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

সে ভাবল চিঠিটা অনিমেষ নিশ্চয় পড়েছে। না জানি কি ভাবছে। তাতে তো অনেক কথাই লেখা আছে। এতদিন তাদের সম্পর্কে ধারণাটা যদিও বা কিছু অস্পষ্ট ছিল, চিঠিটা পড়াব পর অনিমেষের মনে নিশ্চয়ই আর কোন অস্পষ্টতা নেই। কি জানি ও কী ভাবছে। তার সম্পর্কে মনে না জানি কী একটা বিশ্রী ধারণা পোষণ করছে।

‘যদি ভাবেন ঠকে খুশী করা সহজ...’



‘.. তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল করবেন’—বোম্বের শ্রমিকী আব. আব প্রভু বলেন। ‘কাপড় জামাব বেলাতেও কি উনি কম খুঁতখুঁতে...!’
‘এখন অবশ্য আমি ঔঁব জামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—
প্রচুর ফেনা হয় বলে এতে কাচাও সহজ আব কাপড়ও ধবধবে
ফবসা হয়।... উনিও খুশী!’
‘কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধবধবে আব ঝালমলে ফবসা—
সানলাইট ছাড়া অন্য কোন সাবানই আমাব চাই না’

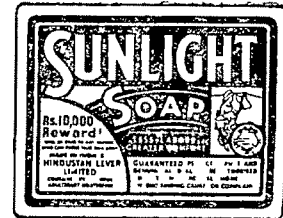
গৃহিণীদের অভিজ্ঞতায় খাঁটি, বোমল
সানলাইটের মতো কাপড়ের এত
ভাল যত্ন আব কোন সাবানেই নিতে
পারে না। আপনিও তা-ই বলবেন।

সানলাইট

কাপড় জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

৬. ৩০-X52 BG



ধীরা আজ চারটের আগেই বাড়ি থেকে বেরুবে বলে সংকল্প করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা অনিমেঘের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় লজ্জায় এবং অপরাধবোধে সে সংকল্পের কথা মনে আর উদয় হল না। দারুণ একটা গ্লানি এবং আড়ষ্টতায় সারাটা বিকেল সে ঘরের ভেতর চুপ করে বসে রইল।

অনিমেঘ সারা দুপুর খোকনের সঙ্গে গল্পে গল্পে কাটিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল। সে যে এতটুকু বিচলিত হয়েছে তা ওর হাবভাব দেখে মোটেই বোঝা গেল না। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে রতনের মাথের দেওয়া এক কাপ চা খেয়ে খোকনকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। সামান্য একটু কৌতূহলবশে একবার চেয়েও দেখল না যে, ধীরা বেরিয়ে গেছে, না, বাড়িতেই আছে।

অনিমেঘের আচরণ ধীরার মনে যেমন বিস্ময় জাগল, তেমনি আবার সে চিন্তিতও হয়ে পড়ল। ভাবল, জানি না অনিমেঘের মনে কি দুর্ভিত্তি আছে।

কিসের একটা উৎকর্ষ তার গ্রহর কাটতে লাগল।

খোকনকে নিয়ে অনিমেঘ কোথায় গেছে কে জানে। এখনও ফিরছে না দেখে ধীরারও মনের উৎকর্ষ কেমন যেন বেড়ে চলেছে। রতনের মা কাজকর্ম শেষ করে অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। নির্জন নিশ্চল বাড়িতে ধীরা কেমন যেন একটা নিঃসঙ্গতা বোধ করতে লাগল। এই অসহায় একাকী তার মনটাকে যেন বড় দুর্বল করে দিতে লাগল। ভয় উৎকর্ষ নিশ্চলতা একাকী—সবকিছু মিলে গ্রহবল্লো বড় দুঃসহ হয়ে উঠল। এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে হুঁচিয়ার গ্রহরগুলো কাটানো ছাড়া ধীরার আর কোন উপায় রইল না।

বাঁকি প্রায় দশটার সময় অনিমেঘ ফিরল। ধীরা উদ্গ্রীব হয়েই ছিল। দরজায় শব্দ হওয়ামাত্র সে এসে দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল। অনিমেঘের দিকে মুখ তুলে তাকাতে তার কেমন যেন সাহস হল না। চোখ নাড়িয়েই রাখল।

ধীরার এই মৌনতা দেখেই বুঝি একটু অবাক অথবা সন্দিগ্ধ হবে অনিমেঘ তার মুখের দিকে তাকাল। তার অসম্ভব বেষণাস এবং চোখেমুখে কেমন যেন একটা

ক্লিষ্টতার ছাপ দেখে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বলল, তোমার কি শরীর খারাপ?

ধীরে ধীরে চোখ তুলে ধীরা কেমন যেন ভীত গলায় জবাব দিল, না।

অনিমেঘ আর কোন কথা না বলে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ধীরাও নিশ্চিন্তমনে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

অনিমেঘের কথাটা তখনও যেন তার কানে বাজছে। তার মনে হল, কত দিন কত যুগ যেন সে এমন উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনে নি। তার বড় ভাল লাগল।

মন থেকে ভয় হুঁচিয়ার দূর হয়ে যাবার পর কনকেন্দ্র চিন্তায় তার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল। কদিন ধরে সেই চিঠির কথাগুলোই কেবল ভাবতে লাগল সে। ভাবল, কনকেন্দ্র নিশ্চয়ই সেদিন গোলদীঘিবা সামনে তার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে চলে গেছে, তাব ওপর ভীষণ রাগ করেছে এবং তার সম্পর্কে হয়তো বিক্রী একটা ধারণাও মনে পোষণ করেছে।

কী ভাবছে কে জানে! হয়তো ভাবছে, ধীরার কোনও মনোবল নেই, লোকলজ্জার ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছে, যে সত্যকে অস্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছে তাকে নিজের কাছেও স্বাকৃতি দেওয়ার চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। কিংবা তার সম্পর্কে কনকেন্দ্র মনে নানারকম সন্দেহেরও অবকাশ হতে পারে।

ধীরা ভাবল, না, ওর মনের সব সন্দেহ সব ধারণা দূর কবা দরকার। এই ভেবে এক বিকেলে, কনকেন্দ্র ছুটি হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে, সে তার অফিসে এসে হাজির হল।

সুইংডোর একটু ফাঁক করে ধীরা ঘরের ভেতরটা একবার দেখল। দেখল, ভেতরে আরও একজন কে রয়েছেন। কনকেন্দ্র বসে বসে প্রফ দেখছে।

একটু ইতস্ততঃ করে ধীরা বলল, আসতে পারি?

ধীরার কণ্ঠস্বরে কনকেন্দ্র চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল। বিস্মিত এবং বিহ্বল গলায় বলল, আপনি! আশ্বন আশ্বন, ভেতরে আশ্বন।

ধীরা সামনের একটা চেয়ারে বসল। ঘরের ভেতর

অল্প একজন যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি আড়চোখে ধীরাকে একবার দেখে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। কিন্তু কনকেন্দুর দৃষ্টি তার মুখের ওপব থেকে সরল না। সে ধীরাব দিকে অপলকে তাকিয়েই রইল। সে দৃষ্টির সামনে ধীরা কেমন যেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। দৃষ্টি মত করল। কনকেন্দু একসময় বলল, তারপব, হঠাৎ কী মনে করে ?

ধীরা চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি খুব দেরি হবে ?

কনকেন্দু ব্যস্তগলায় বলল, একটু বসুন, এই কাজটা সেরেই আমি উঠব।

কাজ শেষ করে কনকেন্দু ধীরাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে তারা ট্রাম-রাস্তার দিকে এগুতে লাগল। রাস্তায় বড় একটা কেউ কথা বলল না। কনকেন্দু শুধু একবার বলল, চলুন, কোন বেস্টুরেণ্টে ঢুকে আগে কিছু খেয়ে নেওয়া থাক।

একটা পরিচ্ছন্ন রেস্টুরেণ্ট দেখে ধীরাকে নিয়ে কনকেন্দু সেখানে ঢুকল। এখানেও তারা বিশেষ কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া শেষ করে বাইরে এসে কনকেন্দু একটা ট্যাক্সি ডাকল। ধীরার কোন সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে ধীরাও তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করল না। বাধ্য য়েযের মত চূপচাপ গাড়িতে উঠে বসল।

ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থানের নির্দেশ দিয়ে কনকেন্দু একটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ চূপচাপ থাকার পর একসময় সে বলল, সেদিন এলেন না কেন ?

ধীরা কোন জবাব দিল না।

জানেন, সেদিন আমি আপনার জন্তে ওখানে দুটি ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলুম ?

সত্যি আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত।—ধীরা অর্ধস্মৃতি উচ্চারণে কথাগুলো বলল।

তা তো বুঝলুম, কিন্তু ব্যাপারটা কী হয়েছিল তাই বলুন ?

ধীরা আবার চূপ করে রইল।

জবাবের আশায় কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে কনকেন্দু

জিজ্ঞেস করল, কোনরকম পারিবারিক অশান্তি হয়েছে নাকি ?

না।

তবে ?

ধীরা আশ্বে আশ্বে বলল, চিঠিটা সেদিন ঠর হাতে গিয়ে পড়েছিল। উনি সবকিছুই জানতে পেরেছেন।

কথাটা শুনে কনকেন্দু কিছুক্ষণ চূপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, এজন্তে আপনাকে বোধ হয় বেশ অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে ?

না, অশান্তি উনি কিছু করেন নি, চিঠিটা পেয়েই উনি আমার কাছে ফেবত পাঠিয়েছেন। কিছু বলেন নি। অশান্তি যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা আমার নিজের মনেই। নিজের মনগড়া অশান্তিতেই আমি দুঃখ পেয়েছি, কদিন লজ্জা ভয় ভাবনায় আড়ষ্ট হয়ে থাকেছি।

চূপ করে কনকেন্দু সিগারেট খেতে খেতে কি যেন ভাবতে লাগল। ধীরাও আর কোন কথা বলল না। বাইবেব দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে বইল।

অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করে কনকেন্দু যেন স্বগতোক্তি করল, অদ্ভুত ব্যাপার।

কি ?—ধীরা ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

চমকে উঠে কনকেন্দু বলল, না, মানে আমি অনিমেসবাবুর কথা ভাবছি, পরদিন সকালেই তো উনি আমাদের ঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে বেশ সহজ এবং অন্তবদ্ স্বরে কথা বললেন। বসে চা খেলেন। কই, তাঁর কথাবার্তা বা আচার-আচরণে তো এতটুকুও ব্যতিক্রম দেখলুম না। ভদ্রলোক কোনরকম বিচলিত হয়েছেন বলে তো মনে হল না।

তা হন নি। আর হন নি বলেই তো ব্যাপারটা আমার কাছে যেন বড় ভয়ের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসব আপনি কী ভাবছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে সাত-আট মাস মিশে ওঁকে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে তো মনে হয় না ওঁর দিক থেকে আপনার ভয়ের কোনরকম আশঙ্কা আছে।

মনের দিক দিয়ে সেইখানেই তো আমার দারুণ পরাজয় কনকবাবু। আমি কেন ওঁর মত অত উদার

হতে পারলুম না। তা হলে তো আজ আমার জীবনে
এত জটিল সমস্যার উদ্ভব হত না।

কনকেন্দু অবাক হয়ে বলল, কিসের ঔদার্য, কিসের
পবাক্ষয়? আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ধীরা আর কোন কথা বলল না। বলতে পারল না।
হঠাৎ যেন একটা গভীর চিন্তা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে
রাখল। সেই ভাবনার মধ্যেই সে ডুবে রইল।

গন্ধার ধারে আউটরাম ঘাটের সামনে এসে গাড়ি
থামল। কনকেন্দু ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিবে গাড়ি
থেকে নেমে পড়ল।

বিকেলের নদীর দিকে মুখ করে নরম ঘাসেব
বিছানায় পাশাপাশি বসল ওবা দুজন। ধীরাব মনে
এখনও সেই আচ্ছন্নতা। কেউ কোন কথা বলল না।

অনেকক্ষণ পবে কনকেন্দু জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ এমন
চুপচাপ কেন?

বড় ব্যাকুল গলায় হঠাৎ ধীরা বলে উঠল, আজ
আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমি বড় অসুস্থ বোধ
করছি। চলুন, ফেরা যাক।

কনকেন্দুর গলায় উদ্বেগ প্রকাশ পেল: আপনার কি
হয়েছে আমাব খুলে বলুন মিসেস মজুমদার, আমি যদি
আপনার এতটুকু উপকারে লাগতে পারি তো নিজেকে
ধন্য মনে করব।

কনকবাবু, প্রীজ—

ধীরা কিছুই বলতে পারল না, কেমন যেন একটা
কান্নার আকৃতিতে তার গলাব স্বব জড়িয়ে গেল।

ফিরতে সঙ্কো হয়ে গেল। বাড়ি ঢুকেই ধীরা
অনিমেষের ঘরের ভেতর দেখল অনিমেষ ঈজিচেয়ারেব
ওপর গা এলিয়ে দিয়ে কি একটা বই পড়ছে। পাশে
খোকন দাঁড়িয়ে। পড়তে পড়তে আদর করে সে
খোকনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দৃষ্টিটা বড় ভাল
লাগল ধীরার চোখে।

আস্তে আস্তে সে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। ড্রেসিং
টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বড় আয়নাটার নিজের চেহারা
একবার দেখে নিয়ে যেই বেশবাস পালটাতে যাবে অমনি
খোকন এসে বলল, মা, বাপী তোমায় ডাকছে।

কথাটা শুনে ধীরা চমকে উঠল। কেমন যেন
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। নানাবকম ভাব আশঙ্কা এসে তার
মনে বাসা বাঁধল, কি জন্মে আজ হঠাৎ এমন ডাক
পড়ল সে বুঝে উঠতে পারল না। গত সাত-আট মাসের
মধ্যে অনিমেষ তো কোনও দিন তাকে এমন করে ডেকে
পাঠায় নি! আজ হঠাৎ কী এমন দবকার পড়ল!

ভয়ে আশঙ্কায় ধীরা কেমন যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে
ঘরের ভেতর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক-
সময় মনে সাহস সঞ্চয় করে সে ভীত পায়ে অনিমেষের
ঘরের দিকে এগুতে লাগল। ঘরের ভেতর এসে কুণ্ঠিত
ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল।

তার পায়ের শব্দে চোখ তুলে সহজ স্বাভাবিক গলায়
অনিমেষ বলল, বস, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

ধীরাব মনের উদ্বেগ ক্রমে বেড়েই চলল। একবার
এদিক ওদিক তাকাল সে। ঘরে আর কোনও চেয়ার
না থাকায় অগত্যা সে অনিমেষের খাটের একপাশে
সংকুচিতভাবে বসল।

ঈজিচেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে অনিমেষ বলল,
আমি এখানকার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। একটা বেটার
চাক পেয়ে জবলপুরে যাচ্ছি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, এই কথাটা
জানাবার জন্মেই তোমায় ডেকেছিলুম।

অনিমেষ কথার ছন্দ টেনে দেওয়া সম্বোধন ধীরা আরও
যেন কিছু শোনার অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে কিছুক্ষণ
বসে রইল। তারপর একসময় উঠে আস্তে আস্তে ঘর
থেকে বেবিয়ে এল। সমস্ত ব্যাপারটা ধীরার কাছে যেন
অস্পষ্টই রয়ে গেল।

বাত্রে বিছানায় শুয়ে সে খোকনকে জিজ্ঞেস করল,
তোার বাপী আমাদের যাওয়ার কথা কিছু বলেছে?

খোকন কাছে সরে এসে ধীরার গলা জড়িয়ে ধবে
আবও অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে বলল, বাপী বলেছে,
আমরা এখানেই থাকব।

ধীরা আর তাকে বিরক্ত করল না। তার গায়ে-
মাথায় মুহূ পরশ বুলিয়ে দিতে লাগল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই খোকন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু
ধীরার চোখে ঘুম এল না। নানা ভাবনা এসে তাব মগজে

ঘরে ঘরে এর সমাদর



ব্রুক বন্ড

চা

তাজা এবং সেরা



ব্রুক বন্ড ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

TBB 362D B

জট পাকাতে লাগল। সে ভাবতে লাগল, অনিমেঘ কি তার সংসর্গ এড়াবার জ্ঞেই বাইরে চাকরি নিয়ে এভাবে চলে যাচ্ছে? তা না হলে চার-পাঁচ বছরের পুর্বনো চাকরি ছেড়ে এভাবে দূর দেশে যাওয়ার তো কোনও মানে হয় না। অবশ্য বলছে, সেখানে বেটার চাল পাবে। কিন্তু কই, এতদিন তো তার বেশী টাকা উপার্জন করার দিকে কোনও ঝোঁক ছিল না! অল্প কোথাও চাকরি খোঁজাব ব্যাপারে কোনও তৎপত্তা ছিল না! আজ হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন! অনেক রাত্রি পর্যন্ত এইসব ভেবে সে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের ঘোরেও যেন এইসব দৃশ্চিন্তার বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন তাকে মাঝে মাঝে জাগিয়ে তুলছিল।

নয়

মাসের প্রথম তারিখে মাইনে পেয়ে সেদিন রাত্রেই অনিমেঘ এখান থেকে বণ্ডনা হবে ঠিক করেছিল। কিন্তু ষাবার দিন সকালে একটা বিল্ডাট ঘটে গেল, যার জ্ঞে সেদিন আর যাওয়া হল না। যাওয়া হল না কনকেন্দুর অবস্থা দেখে।

তিন দিন ধরে কনকেন্দু জরে ভুগছিল। নীহারকণা ভেবেছিলেন সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা। পাডাব নতুন ডাক্তারও রোগটা ঠিক ধরতে পারেন নি। চতুর্থ দিনে রুগীর অবস্থা দেখে নীহারকণা বড় বিচলিত হয়ে অনিমেঘের কাছে এসে বললেন, তুমি একজন অল্প ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস। রোগের লক্ষণ খুব ভাল বলে আমার মনে হচ্ছে না। জরের ঘোরে বেহাশ হয়ে সারারাত শুধু প্রলাপ বকেছে।

নীহারকণার কথা শুনে অনিমেঘ তখনই কনকেন্দুকে দেখতে এল। ঘুমোচ্ছে কনকেন্দু। অনিমেঘ তার কপালে হাত রেখে উদ্ভাপ পরীক্ষা কবল।

খুব ঘুৎ অথচ ব্যাকুল গলায় নীহারকণা বললেন, কাল সারারাত কষ্ট পেয়ে এই কিছুক্ষণ আগে মাত্র ঘুমিয়েছে।

ওকে এখন ঘুমোতে দিন। আমি এখনই একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আনছি।

সারাদিন তার খুব ব্যস্ততাব ভেতব কাটল। রুগীরও বিশেষ কোন খারাপ লক্ষণ দেখা গেল না।

কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে জ্বর আঁব মাথাধার ঘনগায় ছটকট করতে লাগল কনকেন্দু। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকতে শুরু করল। সে প্রলাপ শুনে অনিমেঘের সামনে নীহারকণা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি এক-সময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনিমেঘ একা রুগীর কাছে বসে রইল। জ্বরের বিকারে কনকেন্দু বারবার বলতে লাগল, ধীরা, তুমি একবার কাছে এস। আমার গায়ে তোমার ঠাণ্ডা হাতের একটু স্পর্শ দাও।

হঠাৎ একসময় কনকেন্দু বিছানার ওপব সোজা হয়ে উঠে বসল।

কোথায যাচ্ছেন!—বলে অনিমেঘ তাকে চেপে ধরল।

কে, কে আপনি?—ধমক দিয়ে কনকেন্দু কেমন যেন ঘোলাটে চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

অনিমেঘ নরম গলায় বলল, আমি অনিমেঘ, আমার চিনতে পারছেন না?

অনিমেঘ। সেই ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কনকেন্দু বলল, বুঝছি। তুমি সেই অনিমেঘ, আমার শত্রু, আমার কাছ থেকে তুমি ধীরাকে আগলে বাঁধতে চাও। ছাড়, ছেড়ে দাও আমায়।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইল কনকেন্দু। রুগী শরীরে সে হঠাৎ এমন গায়ের জোর পেল কোথা থেকে, অনিমেঘ বুঝতে পারল না। তারপর দু হাতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কনকেন্দুকে বিছানার ওপব শুইয়ে দিয়ে চেপে ধরে রাখল।

আরও কয়েকবার ওঠার চেষ্টা করল কনকেন্দু। তাবপর হতাশ আঁব ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল। কাতর গলায় প্রার্থনা জানাল, অনিমেঘবাবু, আপনি আমার একটু ধীরার কাছে যেতে দিন। তার সঙ্গে আমার অনেক বোঝাপড়া আছে।

অনিমেঘ তাকে চেপে ধরে দৃঢ় অথচ কোমল স্বরে বলল, আপনি এখন চুপ করে একটু ঘুমোন।

ক্লান্ত গলায় কনকেন্দু বলল, অনিমেঘবাবু, আপনি দয়া করে ধীরাকে একবার ডেকে দিন।

অনিমেঘ একবার এদিক ওদিক তাকাল। দেখল, দরজাব বাইরে নীহারকণা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বোধ হয় এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কনকেন্দুর সব প্রলাপোক্তি

শুনছিলেন। তাঁর চোখে চোখ পড়তে তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। অনিমেঘ বুঝতে পারল, ব্যাপারটার জন্তে তিনি খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছেন।

এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া দূর করার জন্তে অনিমেঘ নীহারকণাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, আপনার ভয় পাওয়াব কোন কারণ নেই মাসীমা। টাইফয়েড রুগী সাধারণতঃ এই বকম ভুল বকে। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় নীহারকণা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার না আজ জ্বরলপূর যাওয়াব কথা?

কিন্তু আপনার এভাবে ফেলে যাই কি করে! ভাবছি কাল একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেব যে দু-চারদিন পরে আমি জয়েন করব। মনে হয় তাতে ওরা কোনরকম আপত্তি করবে না।

বলে অনিমেঘ নিজের ফ্ল্যাটে চলে এল। ধীরা ঘরের ভেতর চূপ করে বসেছিল। তার শান্ত চোখ দুটির ওপর চোখ রেখে অনিমেঘ বলল, আজ আমার জ্বরলপূর যাওয়ার কথা, কিন্তু এই অবস্থায় ওঁদের ফেলে যাই কি করে। মাসীমা একা মাহুষ, বড চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

কিছুক্ষণ পরেই কনকেন্দ্র ঘরে এসে অনিমেঘ দেখল, শান্ত হয়ে যুঁমোচ্ছে কনকেন্দ্র। নীহারকণা তার মাথার কাছে চূপ করে বসে আছেন। অনিমেঘকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে তিনি বললেন, তুমি একটু বিশ্রাম নাও গে বাবা। সারাদিন তো তোমার কম থকল গেল না।

অনিমেঘ হেসে বলল, বিশ্রাম নেওয়াটা আপনার যতখানি দরকার আমার ততখানি নয়। আপনি বরং গিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন।

নীহারকণাকে এক রকম জোর করেই কনকেন্দ্র কাছ থেকে তুলে দিল অনিমেঘ।

নীহারকণা চলে যাওয়ার সময় অনিমেঘকেও তাঁর সঙ্গে একটু বাইরে আসতে বললেন। তিনি অনিমেঘের ছুটি হাত চেপে ধরে অল্পময়ভরা গলায় বললেন, অনিমেঘ, তুমি ওর কথায় কিছু মনে কর না। কথাগুলোকে রুগীর প্রলাপ ছাড়া আর কিছু ভেব না।

হাসতে হাসতে অনিমেঘ বলল, মাসীমা, আমাকে কি আপনি একেবারেই ছেলেমাহুষ ভেবেছেন। এসব কথা বোঝবার মত কি আমার জ্ঞানবুদ্ধি নেই? আমি কিছু

মনে করতে পারি, এই কথা ভেবে আপনি মিহিমি কেন এত কষ্ট পাচ্ছেন?

নীহারকণা কোনও কথা বলতে পারলেন না। অনিমেঘের প্রতি কৃতজ্ঞতায় এবং মুগ্ধতায় তাঁর চোখ ছলছল করতে লাগল।

যদিও অনিমেঘ মুখে স্বীকার করল না, কিন্তু প কনকেন্দ্র শিয়বে বসে মনে মনে ভাবল, সত্যিই কথাগুলো রুগমম্বেব প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়? কথা অনিমেঘ যেন মন থেকে সায় দিতে পাবল না। তার ম হল, রোগশয্যায় অর্ধচেতন মনের আচ্ছন্নতার কনকে অস্তরের প্রকৃত আকৃতিটাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

আরও দুদিন কনকেন্দ্র এই বকম অবস্থায় কাটা আর এই দুদিন সে জরের ঘোবে ধীবার নাম করে য় তখন প্রলাপ বকতে শুরু করল। ফলে একটা লজ্জাব আবহাওয়া যেন সমস্ত বাড়িটার বাতাসে ছড়িয়ে পড় সবচেয়ে বিশ্রী অবস্থা হয়েছে যেন ধীবার। তার পক্ষে য় বাইরে বেরনোই সংকট হয়ে উঠেছে। ফ্ল্যাটের বাই তো কদিন ধরে মোটেই বেরুচ্ছে না, এমন কি বাড়িবে অনিমেঘের সামনে বেরতে সে লজ্জা অনুভব করছে।

অনিমেঘের কিন্তু কোনদিকে যেন জ্ঞাপ নেই নেই দুঃখ অনুতাপ লোকলজ্জার ভয়।

এমনি দুর্গোণের ভেতর কদিন কাটবার পর রু অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যেতে লাগল। ডাক্তার আশ্বাস দিলেন কোনও ভয় নেই বলে।

ডাক্তারের কাছে আশ্বাস পেয়ে অনিমেঘ একা নীহারকণাকে বলল, মাসীমা, আর তো কোনও নেই। এবার আমি যেতে পাবি। আর বেশীদিন দে করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

তোমায় আর থাকতে বলি কি করে। এই কা তো আমাদের জন্তে তোমায় অনেক ক্ষতি হল।

হাসতে হাসতে অনিমেঘ বলল, ক্ষতি আর কিছুই না।

নীহারকণা বললেন, ওখানে তুমি একাই যাচ্ছ? বউমাও যাবে?

একটু ইতস্ততঃ করে অনিমেঘ বলল, বিদেশ-বিভূ নানারকম অস্ববিধে আছে বলেই আপাততঃ ওদের রে

বেতে হচ্ছে।—অনিমেঘ প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল।

একটু চুপ করে থেকে নীহারকণা প্রশ্ন করলেন, কবে যাচ্ছ?

কাল যাব ভাবছি।

এরপর আর কোনও কথাবার্তা হল না। অনিমেঘ নিজের ক্ল্যাটে চলে এল। বড় ক্লান্তি লাগছিল। ঘরে এসে বিছানার ওপর দেহটা এলিয়ে দিল।

অনিমেঘ ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে যখন উঠল তখন রাত্রির অন্ধকার সমস্ত ঘরটারি ছেঁয়ে ছিল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল অনিমেঘ। টেবিলের ওপর টাইমপিস্টায় সময় দেখল। দেখল, টিপের ওপর রতনের মা রাতের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। অনিমেঘের খিদে ছিল না, অসম্ভব জল-পিপাসা পেয়েছিল। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে সে পিপাসা মেটাল।

খোকন ও-ঘরে স্নেহে ছিল। অনিমেঘের ঘরে আলো জলে উঠতেই সে এ-ঘরে ছুটে এল। অনিমেঘ লক্ষ্য করল, তার চোখমুখে কেমন যেন একটা ভয়জনক ভাব।

অনিমেঘের সন্দেহটা একেবারে অমূলক নয়। খোকন ঘরে ঢুকে অনিমেঘের কাছে এসে ভয় ভয় গলায় বলল, বাপী, মা কান্দছে।

কান্দছে।—অনিমেঘ অবাকদৃষ্টিতে খোকনের মুখের দিকে তাকাল।

খোকনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনিমেঘ ধানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর একসময় ঘরের বাইরে এল।

ধীরার ঘরে নীল রঙের যুড় আলোটা জ্বলছিল। অনিমেঘ বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, ধীরা তখনও কান্দছে। উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে তার মাথা দেহটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। তার খোঁপাটা খুলে গিয়ে একরাশ চুল শিঠ আর কাঁধের পাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

অনিমেঘ বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর ঘরে ঢুকে আন্তে আন্তে ধীরাব মাথার কাছটিতে এসে

বসল। তার গিঠের ওপর ছড়িয়ে-পড়া ঘন চুলের অরণ্যে যুড় অঙ্গুলি-সঞ্চালন করতে করতে অনিমেঘ স্নেহার্জ গলায় জিজ্ঞেস করল, ধীরা, কি হয়েছে? কান্দছ কেন?

অনিমেঘের স্পর্শে ধীরার কান্নাব উচ্ছ্বাস যেন বেড়েই গেল।

আন্তে আন্তে অনিমেঘ ধীরাব মাথাটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিল। গালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কোমল গলায় বলল, কি হয়েছে—আমায় খুলে বল।

অনেকক্ষণ পরে কান্নাজড়ানো গলায় ধীরা বলল, আমি এখানে থাকব না, তোমার সঙ্গে যাব।

ধীরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনিমেঘ শান্ত-কোমল গলায় বলল, যাবে বইকি, নিশ্চয় যাবে। তবে এখন নয়। কনকবাবুর এই রকম অবস্থায় আমরা সবাই মিলে যদি চলে যাই, সেটা বড় বিপ্লী দেখাবে। আর তোমার পক্ষেও কি এখন যাওয়াটা উচিত হবে?

আর কত তুমি আমায় অপমান করবে। অপমানের হাত থেকে এবাব আমি রেহাই দাও।—বলতে বলতে ধীরার গলার স্বর কান্নায় বিকৃত হয়ে গেল।

অপমানের কথা নয় ধীরা, বন্ধুত্ব মনুষ্যত্ব এবং ভালবাসার কথা ভেবেই আমি তোমায় এই কথা বলছি। প্রেমকে আমি কোনদিন অপমান বা ঘৃণা করতে শিখি নি। ভালবাসায় মানুষের চারিত্রিক পূর্ন হয় এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। জায়ে-অজায়ে, পাপপুণ্য যা কিছু তা মনে প্রেমকে গ্রহণ করার তারতম্যতায়; তুমি যদি উদারচিত্তে একে স্বীকৃতি দাও তা হলেই জীবনের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে, আর যদি কুণ্ঠিত হও, অজায়ে বলে ভাবতে শেখ, তা হলেই মনে মানি ঢুকবে, জীবনে অশান্তি ছাড়া শান্তি পাবে না।

ধীরা অবাক হয়ে গেল অনিমেঘের কথা শুনে। ভাবল, অনিমেঘ কি অন্তর থেকে এই সব কথা বলছে! এতখানি উদার, মনেই এই ব্যাপ্তি ও পেল কোথা থেকে!

অনিমেঘের কোলে মাথা রেখে ধীরার মন যেন স্থখ স্বস্তি আর পবিত্রতার মাধুর্যে ভরে উঠল। তার মাথার ওপর রাখা অনিমেঘের হাতটা যেন গভীর এক মাথার আকর্ষণে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল ধীরা।

বাতাবরণ : অসিতকুমার ভট্টাচার্য। কবিতা পরিষদ, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। আড়াই টাকা।

শ্রীমান্ অসিতকুমার যখন প্রথম আমার নিকট আসেন তখন তিনি কিশোর, প্রবেশিকাব দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া সবে কলেজে প্রবেশ করিয়াছেন। অসাধারণ মেধাবী, যখন একটায় পব একটা স্ববচিত্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়া বাইতে লাগিলেন, বিষয় বোধ করিলাম, মনে হইল প্রভিজি, মনে হইল প্রিকোশাস। শিশুর মত সবল অথচ আত্মসচেতনতায় উদ্ভত, বালক মধুসূদন দত্তকে মনে পড়িল। অনেক প্রত্যাশা লইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম ও অচিরাত্ 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহার কবিতা পত্রস্থ করিলাম। সেই প্রত্যাশা এক যুগেরও অধিককাল পবে এই 'বাতাবরণে' পূর্ণ হইল দেখিয়া আমিই সর্বাধিক আনন্দবোধ করিতেছি।

অসিতকুমারের কবিতার বিশেষত্ব, ইহা কণ্টেক্ট-এ তথাকথিত অতিআধুনিকদের কবিতাব চাইতেও আধুনিক, এবং ফর্মে দুর্বোধ্য ও অনাবশ্যক শব্দমেদভার-প্রপীড়িত অষ্টাবক্রের মত ছন্দহীন নয়। অসিতকুমারের যুগ-চিন্তায় শাস্ত কবিতার স্বাক্ষর আছে।

মধুসূদনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ক্যাপটিভ লেডি' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কাব্য 'কবি-কাহিনী' অপোগণ্ডতাব জন্ত অনাদৃত হইয়াছিল। বুদ্ধিমান অসিতকুমার আটঘাট বাঁধিয়া কাটছাঁট করিয়া একেবারে পাকা দলিল হাতে বাংলা কবিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'বাতাবরণ' সেই পাকা দলিলের সঙ্কলন। এই উক্তি উদাহরণের অপেক্ষা রাখে। স্থানান্তাবে তিনটি মাত্র নমুনা দিয়াই তৃপ্ত থাকিতে হইতেছে—

কেন

'প্রকৃতির প্রয়োজনে' বলেছেন শোপেনহাওয়ার,
'দেওয়া নেওয়া খেলা চলে, তুমি আমি কিছু নই তাতে'।
তবুও যখন মন ছোঁয়া পায় দখিন হাওয়ার—
কেন জানি ভবে ওঠে অবাঁক অবুঝ বেদনাতে।

ইতিহাসে, দর্শনে, আমবা তো সংখ্যার ফাঁকি।
কাগজে কাগজে জানি আমাদের কথা কিছু নয়।

সব কথা শেষ হলে, একটি কথাই থাকে বাকি—
আমাদের মনে মনে—কেন এত, এত বিষয়।

বাড়ি : গ্রামে

শুভ্র আঙনে, চড়ুই তিত্তির কাঠবেরালি—

যুবছে খালি।

ভিত ভেঙে ভেঙে দেয়ালে দাঁড়ায় পুরনো ঝোপ,
কত ডোরাদার সাপের খোপ—

শান ফেটে ফেটে হাওয়ায় ছলছে হাক্কা ঘাস,
বড় সুন্দর হয়ে এল আজ চোখের 'পর—
সর্বনাশ!

প্রথমে নীরব অন্ধকারেতে শব্দ হয়,
ও কিছু নয়!

আলোয় হাওয়ায় ঘন হয় শুধু অপরিচয়,
কিছু-ই নয়!

ভাল-ই হয়েছে হাওয়ায় উড়ছে আলগা ধুলো,
হা-হা করে হাসে শূন্য ঘরের কবাটগুলো,
ভাল-ই হয়েছে; তবু কেন ভাঙা ঘাটের গায়,
ছেলেবেলাকার পেয়ারাগাছটা দাঁড়িয়ে ঠায়।

ভালই হয়েছে আঙনে ছলছে সবুজ ঘাস,
বড় সুন্দর হয়ে এল আজ চোখের 'পর—
সর্বনাশ!

আঁহক, আঁহক, হাওয়ারা আঁহক, নামুক জল,
সব-ই ভদ্র, যত্নই শুধু অচঞ্চল।

আপন খেয়ালে জালায় নেভায় তুচ্ছ প্রাণ...
ধ্বংস একক, অনির্বাণ;—

সকালে আলোয় বয়ে বয়ে পড়ে
হাক্কা বালি—

নাচছে তিত্তির, দেখছে অবাঁক
কাঠবেরালি।

বিয়্যাত্রিচে

এই শহরের পথে আমি তাকে একবার, একবার
দেখিয়াছিলাম।
বহমান সময়ের স্রোতে সেই একবার হৃদয়ের বড়
কাছাকাছি—

কোনও এক অল্পভব ভরেছিল মহাকাশ। আমি তার
জানি না'ক নাম।

মনে হয়েছিল শুধু, একাকী সময় নেই—এ মাটিতে আছি,
আমি আছি।...

আকাশেব, পৃথিবীর সব রূপ, রেখা-রং, মাহুঘের,
তারকার নাম

জেনে জেনে হ'ল ভোর। মনে মনে জানি, আব কিছু
আর নেই জানিবার...

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে সব পথ হ'ল পার, সব কথা হয়ে,
যাবে শেষ,

জীবনের সব তট, সব তীব পৃথিবীর, চেতনার সব দিক-দেশ
—জেনে জেনে হবে ভোর। শুধু সেই অল্পভব—আমি

তার জানিব না নাম...

এই শহরের পথে আমি তাঁকে একবার, একবার
দেখিয়াছিলাম।

গতির যুগে কেঁজো মাহুঘের অবিরাম কর্মচাকল্যের
“বিরিট নদী”-স্রোতে কবিতার পাতার ভেলা অনাদরে

উপেক্ষায় “অদৃশ্য নিঃশব্দ”তলে সহজেই তলাইয়া যায়।
অসিতকুমারের “বাতাবরণের” সেই দুর্গতি ঘটলে বাংলা-

কাব্যসাহিত্যেরই ক্ষতি, ইহাই আমার বক্তব্য।

শূন্তে পাড়ি :- দেবব্রত রৈজ। চিনকো, ১৬৭ এন,
রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

ইহা একটি অর্পূর্ণ বিজ্ঞান-গ্রন্থ, মহাকাশ-বিজ্ঞান।
জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বোস গ্রন্থকারকে ইহা বলিয়া

তারিফ করিয়াছেন, “শূন্তে পাড়ি পড়ে খুব ভাল লেগেছে।
যেভাবে বিজ্ঞানের কথা বললে নবীন মনে সাড়া দেবে,

তার ছন্দ তুমি ধরে ফেলেছ।... রূপ ভাষা যে শিখেছ এ
বই তার একটা সাক্ষ্য স্বফল। তোমাকে অভিনন্দন

জানাই।”

তারতবর্ষে এই প্রসঙ্গে কথা বলিবার সর্বাধিক অধিকার
বাহার তাঁহার স্বাক্ষরে আশ্রয় হইয়া আমরা একটু উদ্ধৃতি

দিয়া লেখকের বলিবার উদ্ভিগ্ন ও বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতমাত্র
দিতেছি :

“যেমন সাগরে ডুবুরি নামিয়ে দেওয়া হয় অতলে কী
আছে জানতে, তেমনি আমরাও ডুবুরি নামিয়েছি

মহাশূন্তে। যন্ত্রের ডুবুরি। কত জ্ঞানের মণিমুক্তো
আনবে কুড়িয়ে।

—যন্ত্র তো আছে, কিন্তু চালায় কে? প্রশ্ন করে অমর।
বরেন হেসে বলে, আপনিই চলে। যন্ত্র যন্ত্রকেই

চালায়। কতকগুলো যন্ত্র আছে যাদের কাজ চালিত
হওয়া, আর কতকগুলো যন্ত্র আছে যাদের কাজ চালনা

করা।

ঠাকুরা আপন মনে বলেন, কী আশ্চর্য! মাহুঘের
মাথা আব ধড় যেমন।

—হ্যাঁ মা, মাহুঘই তৈরি কবছে আরো এমনি যন্ত্র।
যন্ত্রের মস্তিষ্ক আর যন্ত্রেই স্নায়ুতন্ত্র।”

সহজ ভাষায় গল্পের ভঙ্গিতে এই যন্ত্রের মস্তিষ্ক ও
স্নায়ুতন্ত্রের এবং মহাকাশে তাহাদের কাজের খবর এই

বইটিতে দেওয়া হইয়াছে। বাঙালী ছেলেমেয়ের অবজ্ঞাপাঠ্য।
রাজমোটক :- আশা দেবী। সাহিত্য, ৯ স্ট্রামাচরণ

দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

‘রাজমোটক’ নামে শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবীর একটি মনোবয়
গল্পের বই আছে, তাই নামে আপত্তি জানাইতেছি

কিন্তু বইটি পড়িয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি এই নামই
সার্থক; ব্যঙ্গ-হাসির সঙ্গে স্বপ্নের দরদের এমন বাজমোটক

আর হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যে পুরুষ-ঘাটে
মেয়ে-মজলিসের কাহিনী জন্মিত। এ যুগে কলিকাতা

শহরে বড় বড় বাড়ির ফ্ল্যাট বা এক-কামরা এক-কল
বাসিন্দাদের বেয়াল, কোকিল, কলের জল ও কাপড়

শুকাইবার স্থান লইয়া বেলা দশটা পর্যন্ত কলহ-কোন্দল
এবং অপরাহ্নে তাহাদেরই শ্রীতি-সৌহারদের ঘবোবা চিত্রও

যে উপভোগ্য সাহিত্য হইতে পারে শ্রীমতী আশা দেবী
তাহা প্রমাণ কবিলেন। সংক্ষেপ-পবিনবের মধ্যে বিভিন্ন

টাইপের গৃহিণীর, “সার্বজনীন” পিসীমার এবং অতিশয়
অকিঞ্চিৎকর বিষয় ও চরিত্রের যে অপরূপ কথাচিত্র

লেখিকা অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে বিষয় ও আনন্দবোধ
করিয়াছি। রেখায় আঁকা ছবিগুলিও ভাল।

শেখ কিছু :- পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বইয়ের নাম ঠিকানা কিছুই দেওয়া নাই। বিবিধ
শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে ছড়াগুলি চমৎকার, ছেলেমেয়েদের

বিশেষ উপযোগী। ছড়াগুলি সচিত্র হওয়াতে অধিকতর
চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

—শ্রীমঙ্গলীকান্ত দাস

দুঃস্বপ্ন নদী : দেবব্রত ভৌমিক। শ্রীশঙ্কর লাইব্রেরী,
২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

মননশীল প্রবন্ধ গল্প এবং নিপুণ স্টাটার-লেখক হিসাবে তরুণ সাহিত্যিক দেবব্রত ভৌমিক ইতিমধ্যেই সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সেই শক্তির পরিচয় আলোচ্য উপন্যাসটিতেও বর্তমান। এ উপন্যাসেব নায়ক পবিত্র বিংশ শতকের প্রতিনিধিমূলক এক আত্মকেন্দ্রিক নাগরিক চরিত্র,—জীবন যার এক দুঃস্বপ্ন নদীর তুল্য। তাঁর মনোবৃত্তে দুটি বিন্দু—মায়ের প্রতি অপবিসীম ভালবাসা এবং সাহিত্যসৃষ্টির অদম্য পিপাসা। গরীব মায়ের দুঃখদহন তাকে যেমন নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে, তেমনি স্বজনের আকৃতিতে সে জ্বলতে থাকে আগুনের মত। কিন্তু দুটি বিন্দুর কোনটাই সার্থক হল না, এনে দিতে পারল না সিন্দুর স্বাদ ও তৃপ্তি। উপন্যাস সে লিখল, কিন্তু আলোর মুখ দেখল না; অকস্মাৎ মাকে হারাল নিদ্রাক্রম দুঃখরাতে। পালারদলের এই বাড়িরদ্বার দিয়ে পবিত্র দেখা পেল উম্মিলার, তাঁর সহপাঠিনী। এতদিন মেয়েদের সে দেখেছে দূর থেকে, মায়ের চেয়ে বড়, এমন কি মায়ের মত বলেও কাউকে মনে হয় নি। উম্মিলার মুখে ও শরীরে, মনে ও স্বভাবে সে বুজে পেল দূর-থাকা হারিয়ে যাওয়া মাকে। মাকে হারিয়ে পেল প্রেমসীকে। জ্ঞানকটা নিশ্চিত হয়েই নিজেকে ছেড়ে দিল এই স্নমতাময়ী নারীর হাতে। তারপর এক দুর্ঘটনা পেরিয়ে দুঃস্বপ্নের বিয়ে হল। পবিত্র উম্মিলার কাছে মায়ের গল্প বহু রার কবেছে নানাভাবে। কিন্তু ব্যর্থ সাহিত্যসৃষ্টির উল্লেখ-মাত্র করে নি। দুঃস্বপ্নের উপার্জিত অর্থ সংসারে নেমে এল স্বপ্ন ও শাস্তি। কিন্তু ক্ষণকালের জন্তে। উম্মিলা মা হল, চাকরি ছেড়ে দিল। সংসার যখন আয়তনে বেশ বড়, পবিত্রও হঠাৎ একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি চলে এল; অত্যায়ের সঙ্গে ওর স্বগত শিল্পীসভা আপোস করতে পারল না। সেই দিনই ঘটে গেল চরমতম বিপর্যয়। বাইরের জগতে এতদিন পবিত্র যত বেশী বঞ্চিত হয়েছে, ব্যাথাকে গোপনে লালন করেছে নিজের মধ্যে, ততই সমস্ত ক্ষোভ-জালা ঘুরে এসে মেটাতে চেয়েছে স্বীর কাছে—মনে নয়, দেহের পরিজ্ঞান

তটে। এমনি করে আঘাতে-সংঘাতে পবিত্র ক্রমেই গুটিয়ে এসেছে নিজের মধ্যে। মুক্তি পেতে চেয়েছে দেহের সীমানায়, আর ধীরে ধীরে নেমে গেছে ভালবাসার স্বরভিত মিনার থেকে। পবিত্র নিজের জানতে পারে নি, উম্মিলাও না। তাই চরমতম বিপর্যয়ের দিনে উম্মিলা ওকে পশু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারল না। ও বুঝতে পারল আত্মঘাতী পতনের গতিক। ঘর ছাড়ল। সেই উপলব্ধি থেকেই পবিত্র আবার ফিরে আসতে চাইল ভালবাসার কাছে। মৃত মনের পুনরুজ্জীবনের কামনাতেই গল্পের সমাপ্তি, যেখানে দুঃস্বপ্ন নদীতে জেগে উঠল জীবনের তৃষ্ণায় সীমাহীন প্রাণ।

‘দুঃস্বপ্ন নদী’ পড়তে পড়তে স্বতঃই মনে ভেসে ওঠে লরেন্সের ‘সনসু অ্যাণ্ড লার্ভার’ বইটির কথা। কিন্তু লেখক কেবলমাত্র মাতৃমুখী কামনার মধ্যেই তাঁর বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তাঁর সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের আধুনিকতম স্নোবিগ্নয়ণকেও নিঃসঙ্কোচে বিশ্লেষণ করেছেন। আসলে এই অসুস্থ ব্যক্তিত্বের পবিত্রের স্নায়ু আচরণের কেন্দ্রভূমি। এবং ভূমির আগেও যে ভূমিকা অর্থাৎ মন ও মননের পেছনে যে সামাজিক-ঐর্থনীতিক কার্যকারণ, তাঁর কথাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

দেবব্রতবাবু সমাজসমন্বয়-চিন্তাশীল। তাঁর এই উপন্যাসেও আমরা পেয়েছি সমাজের প্রচারিত পটভূমিকে, জীবনের প্রাণান্তকর লড়াই আর তাঁর স্পন্দনকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি এতটা সংক্ষিপ্ত না হয়েই হয়তো ভাল করতেন। তা ছাড়া নায়ক-নায়িকার প্রেমের পাঠও অসম্পূর্ণ। তাই সাহিত্যপ্রিয়ান সম্পর্কে স্বীর কাছে পবিত্রের সঙ্কচিত গোপনতা আমাদের বিস্মিত করে। হয়তো এই আত্মরতি, ভালবাসার এই খণ্ডরূপ দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। বর্তমানের এই অসুস্থ সমাজের কুশীলবের জীবনে প্রেমও যে তাঁর পূর্ণ মহিমায় রিকশিত হতে পারে না, হয়তো এ কথাই লেখক পরোক্ষ বোঝাতে চেয়েছেন। লেখককে খাগত জানাব বাবুলা কণা-সাহিত্যের জ্ঞাসরে। আশা করব, পরবর্তী গ্রন্থে আত্মকের সমাজ-সমস্যা এবং জীবনরহস্যের আরও অন্তরের ছবি তুলে জারবেন তিনি।

—গুরুদাস ভট্টাচার্য

সাহিত্যের হাতে

রবীন্দ্র লেখকের প্রতি

তুমি রবীন্দ্র লেখক, তোমার তুল্য জগতে আর কে আছে। তুমি বাহা রচনা কর, তাহাই সং-সাহিত্য, তাহাই আকাদেমি পুরস্কারের উপযুক্ত। বাহা কিছুতেই ঘটনার নয়, তুমি অবলীলাক্রমে তাহা ঘটাইয়া দাও। তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে তুমি প্রতিভাবান,—কেন-না প্রতিভা ব্যতীত অঘটনঘটনপটিনী সার কে আছে। উদ্যোগ শিঙি তুমি অনায়াসে বুধের ঘোড়ে চাপাও, স্রোতের মুখে স্রোতের কাছে জোড়ো, মধুর পত্নীকে মধুর সহিত মধুর সম্পর্কে লাগাইয়া দাও। তোমার বাহা শূনি তুমি তাহাই কর,—এবং তাহারই নাম দাও সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জায় তুমিও চতুর্মুখ। আপন প্রশংসা এবং মুকম্বীর স্তুতির সময়ে তাহার প্রমাণ মিলে। মহেশ্বরের জায় তোমারও কপালে কেবল অগ্নি। স্বস্ত্যংগুরে আপন সর্বাঙ্গিনীর কণ্ঠে উঠিতে-রসিতে তাহার সাক্ষ্য পাইয়া থাক। রিফুর জায় তোমারও অনেক স্রবতার, অনেক রূপ। বৃষ্টিংহ স্রবতারে তুমি বিজ্ঞানকে শিক্ষকতা কর, বরাহ স্রবতারে মিটিংয়ে বক্তৃতা দাও, কুর্স অবতারে কৌশিলের মেঘর-সাজো। তোমার অনেক রূপ, অনেক লীলা। পাঠকের নিকট তুমি অফিসে সময় কাটাইবার উপায়, পাঠিকার নিকট তুমি দিবানিদ্দার সুহৌরথ, পাড়ার যুবকদের নিকট তুমি সভাপতি, সম্পাদকের নিকট ভাঁড়ু দস্ত, অফিসের রডবাবুর নিকট কিঞ্চলুক এবং গৃহিণীর নিকট কেবল মুখপোড়া সিন্ধে।

তুমি রবীন্দ্র লেখক, তুমি অতুলনীয়। তোমার রিভার তুলনা নাই—কেন-না তুমি স্রোতের জ্ঞানের প্রাকর দেশীয় সংবাদপত্র ভিন্ন কিছুই কদাচি পাঠ কর না। তোমার বুকের তুলনা নাই—কেন-না তুমি রয়্যালটির নিখুঁত হিন্দাব কব্বিতে পার। তোমার যত্নকে রিভদ্ব সাধিক গোময় ব্যতীত সস্ত কিছুই নাই। স্নান, নিষ্ঠা? নিষ্ঠায়

তুমি কাঞ্চনপাশ-পল্লীস্থ সতীদিগকেও হার মানাইয়াছ। কাঞ্চাই, সর্বদিক হইতেই জগতে তোমার তুলনা মেলা ভার। তুমি অতুলনীয়।

তুমি রবীন্দ্র লেখক, তোমার কোন গুণে ঘাট নাই। জন্ম হইতেই তুমি সর্বশাস্ত্রপারদর। তুমি না জান কি? না, বোধ কি? না, পার কি? মাতৃগর্ভ হইতেই তুমি সর্ববিভার আকর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। ভূমিষ্ট হইবার স্রোতস্রোতই সহজাত কবচকুণ্ডলের জায় বড়ল শিল্পে নিপুণতা তোমার করায়ত্ত হয়। সেই কারণে তোমার কিছুই শিথিলার প্রয়োজন হয় না, কিছুই পড়িবার প্রয়োজন হয় না, কিছুই দেখিবার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় কেবল কাগজ এবং কালির। রিগুদ কবিকল্পনা এবং বকজ-রক্তের তেজে তুমি কালি লইয়া কাগজের বুকে সাহা ইচ্ছা আঁচড় কাট না কেন, তাহাই বঙ্গসাহিত্যে অভিনব অবদান বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহাই সং সাহিত্য বলিয়া বাজারে চলিয়া যায়।

তুমি রবীন্দ্র লেখক, তোমার দোষের অংশের কল্যাণ সাধিত হইতেছে। তুমি গাদাগাদা লিখিতেছ বলিয়াই দেশীয় কাগজকলসমূহ চালু রহিয়াছে। উহাতে কত লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। তুমি রাশিরাশি লিখিতেছ বলিয়াই যত্নক্লান্ত পত্রিকাসমূহ রাহির হইতেছে। উহাতেও দেশবাসীর প্রভূত মঙ্গল হইতেছে। বেকার যুবকগণের সময় কাটিতেছে, বেকার গৃহিণীদের দিবানিদ্দার অমোঘ অহপান জুটিতেছে, রেকার ত্রিখোশনরীদের কোরকর্মের ঝাঁধাই-করা স্বচাক বন্দোবস্ত হইতেছে। তোমার রচনা যে ত্রিখোশনরীদের কোরকর্মের সহায়তা করিতেছে, ত্রিখোশনরীস যে উহাতে সাবান মুছিতেছেন, ইহা তোমার ক্রমগৌরবের কথা নহে। যে রবীন্দ্র লেখক, ইহাতেই তোমার রচনার পার্শ্বকৃতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে। যে পত্রিকার পাতা

তোমার অল্পম রচনারাজি বক্ষে ধারণ করিতেছে, তাহা দিয়াই মুদি মসলা বাধিতেছে, মুড়িওয়াল ঠোঙা বানাইতেছে, বালক নৌকা গড়িতেছে, জননী খোকার দুধ জাল দিতেছেন এবং ঝি মল পরিষ্কার করিতেছে। হে বঙ্গীয় লেখক, তোমার অসাধারণ প্রতিভাপ্রসূত অসামান্য রচনারাজি এইরূপে দেশবাসীর জীবনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই, হে শিল্পীকুলতিলক, মহীতলে একমাত্র তুমিই ধন্য।

আজিকালি অনেক দুই ব্যক্তি বলিতেছেন যে বঙ্গসাহিত্য ক্রমেই জাহারমে যাইতেছে। রচনা ক্রমেই নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইতেছে। লেখকের সকলেরই লক্ষ্য কেবল রয়্যালটি, বাঙ্গীয় পুরস্কার, সিনেমা এবং স্থলত জনপ্রিয়তার প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। কাজেই, গ্রন্থ বিনা প্রয়োজনে ক্রমেই ক্ষীণ হইতে হইতে থান ইটে পরিণত হইতেছে, কাহিনীতে ক্রমেই সিনারিওর উপাদান প্রধান হইয়া উঠিতেছে, এবং রচনা অপেক্ষা মুকুর্বাঁদের ঘারে ঘারে ঘুরাতেই লেখকের অধিক সময় যাইতেছে। ইহার পরিবর্তন না ঘটিলে সাহিত্যের কোন উন্নতিই হইবে না। কাজেই, লেখককে এক্ষণে অর্থ খ্যাতি এবং পুরস্কারের প্রতি লোলুপ নেত্রে তাকাইয়া না থাকিয়া আপনার ক্ষেত্রে আপনার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অর্থের লালসাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, মিথ্যা খ্যাতির কামনাকে অতল জলে ডুবাইতে হইবে, বৃথা অহমিকাকে পরম শত্রুজ্ঞানে বর্জন করিতে হইবে।

কিন্তু এই পরামর্শে ত্রিখোশনবীসেব বিশেষণায় নাই। আমার মতে ইহা কেবল দুইটির উক্তি; ইহা পালন করিলে আমরা বঙ্গসন্তানের স্ববিখ্যাত স্বপ্রাচীন ঐতিহ্য হইতে ভ্রষ্ট হইব। যাহা সোজা পথে সহজ উপায়ে করা যায়, যাহাতে ফাকির কোন স্বযোগ নাই, তাহার কৃতকার্যতার বুদ্ধিমানের গোঁরব কোথায়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান স্বচতুর বঙ্গসন্তান ওইরূপ কর্ম কখনোই করে না। সহজ উপায়ে পরিশ্রম করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার কোন কালেই স্পৃহা নাই। কাজেই, এই পরামর্শ গ্রহণ করা চলিবে না। উহাতে আমাদের বদজ-চরিত্র কলুষিত হইবে, আমাদের ক্ষুরধার বুদ্ধির অখ্যাতি রটিবে। ওইরূপ করিতে আমি স্বদেশবাসীকে কখনই উপদেশ

দিব না। আমি বরং বলিব, আপনারা যাহা করিতেছেন তাহাই করুন। দল পাকান, পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে শিরোয়ুগি কবিষা গোষ্ঠী রচনা করুন, এবং দলস্থ সকলের পৃষ্ঠদেশে কণ্ঠস্বর করিয়া করিয়া পিঠে যা করিয়া দিন। কোন গ্রন্থ কখনোই খুলিবেন না; সংবাদপত্র ভিন্ন অন্য গ্রন্থ যে পাঠ করে সে নিতান্তই মূর্খ, তাহার বদজ-জন্মে দিক। আপনারা কেবল আড্ডা দিবেন, এবং যাহা খুশি তাহা লিখিবেন। যাহা লিখিবেন তাহাই সাহিত্য হইবে। যে-এই ধ্রুব সত্য মানিতে অস্বীকার কবিবে, তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইউক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন: যা লিখিবে সত্য হবে তাই না কাজেই, ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই, কাহারো সমালোচনার দৃকপাত করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। লিখিয়া যান—যাহা মাথায় আসে তাহাই লিখুন, যাহা খুশি হয় তাহাই লিখুন। রামায় নহিত রামায় প্রণয়কাহিনী লইয়া ফেনাইয়া-ফেনাইয়া ফুলাইয়া-ফুলাইয়া গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করুন। কেবল একটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন—দেখিবেন গ্রন্থে যেন যথেষ্ট সিনেমার উপকরণ থাকে। উহা থাকিলেই আপনার গ্রন্থ সদগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আবার পুরস্কার পক্ষে জগত ভাবিবেন না—পুরস্কার কিংপে বাগাইতে হয় তাহা তো আপনারদের জানাই আছে। ভাল করিয়া তদবিব করুন। বিচারদলের ঘাবে ঘারে গলবস্ত্র হইয়া যুঁকুন। নানা প্রকারে বামহস্তের খেলা দেখাইয়া তাহাদের বশীভূত করিয়া রাখুন। আর, সাময়িক-পক্ষে গৃহপালিত সমালোচক দ্বারা আপন গ্রন্থের কর্ণপটহিঁস্রকারী টঙ্কানিদের বাহার দিন।

আমিন্দ লৌকে অবশ্য অনেক মন্দ কথা বলিবে। কিন্তু উহাতে কিছুই যায়-আসে না। উহাতে কদাপি কর্ণপাত করিবেন না। শুনিতে হইলে কেবল আপন গৃহিণীর কান্তাসম্মিত মশারি-বক্তৃতা শুনিবেন। তাহা হইলেই আপনার লেখনী ধন্য হইবে, আপনার প্রতিভা ধন্য হইবে, আপনার বদজ-জন্ম ধন্য হইবে।

বিচিত্র সাহিত্যে কয়েক দিন পূর্বে হঠাৎ 'বিচিত্র সাহিত্য' [প্রথম খণ্ড] নামক একখানি প্রবন্ধের বহি হাতে পড়িল।

লেখক—শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন, এম. এ. পি.-এইচ.-ডি, এফ.-এ-এস; ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক মহাশয়ের নাম শুনা ছিল। শুনিয়াছিলাম, তিনি ভারতীয় ভাষা-তত্ত্বের ডাকলাইটে পণ্ডিত। বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের নষ্টকোণী উদ্ধারে তাঁহার তুল্য পারদর্শিতা নাকি বঙ্গদেশে আর কাহারও নাই, কাজেই, বহিখানি সম্পূর্ণে কোতুলন অনুভব করিলাম। ভাবিলাম, উলটাইয়া দেখা যাউক উহাতে কি বিচিত্র তত্ত্ব এবং তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে।

বহিখানি খুলিতেই প্রথমে ভূমিকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। দেখিলাম, উহা বিচিত্র বটে। অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন, “তবে পাশ্চাত্য [“পাশ্চাত্য” নয়] পদ্ধতিতে দোষ কি।”

অধ্যাপক মহাশয় যখন বিশেষ করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন [“পাশ্চাত্য” নয়], তখন কোতুলন হইয়া জানিতে চাহিলাম, কেন নয়। অভিধান খুলিলাম। দেখিলাম, চলন্তিকা বলিতেছে: “পাশ্চাত্য—(পাশ্চাত্য অন্তর্গত)।” উহাতে বিশ্বাস হইল না। কাজেই, সংস্কৃত-বাঙ্গালার অগ্রতম প্রামাণিক অভিধান গিরিশচন্দ্র-বিহারী-সঙ্কলিত ‘শব্দসার’ উলটাইলাম। দেখিলাম, ‘শব্দসার’ বলিতেছে: “পাশ্চাত্য, ত্রি. (পশ্চাৎ-ত্যাণ্) পশ্চিমদেশীয়।”

৬রামকমল বিদ্যালঙ্কার তাঁহার ‘সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধানে’ বলিতেছেন যে উভয়ই হইতে পারে—“পশ্চাৎ + য (যা)—ভবার্থে” পাশ্চাত্যও হয়।

কাজেই, বুঝিলাম না, [“পাশ্চাত্য” নয়]—কেন। তবে যদি শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন এম. এ., পি.-এইচ. ডি., এফ. এ. এস, ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনি-বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন বলিয়াই না হয়—তাহা হইলে কিছুই বলিবার নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলই হইতেছে এবং সকলই হইতে পারে। এখানে কিছুই বিচিত্র নয়।

বিচিত্র যে নয়, তাহার প্রমাণ পাইলাম কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ‘অপর-একখানি বহি’ দেখিয়া। আছে তাহা—বলিব না কেবল বলিব, ধৃত কলিকাতা

বহিখানির নাম: “বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য (১৮৫০-১৯০০)।” লেখিকা: শ্রীপ্রভাসময়ী দেবী এম. এ., ডি. ফিল। বহিখানি লেখিকার ডি. ফিল. ডিগ্রীর থিসিস।

লেখিকার এই রিসার্চেও উপদেষ্টা ছিলেন শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন। বহিখানির মুখবন্ধও তিনিই রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন: “বাংলা সাহিত্যের যারা ‘উচকপালে’ পাঠক-সমজদার তাঁদের কথা ধরি না, তবে যারা নিতান্তই ‘সাধারণ’ পাঠক তাঁরা নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট ‘হর্বেন’ বইটি পড়ে। আগেকার দিনে রোজারা ক্রিয়াকর্ম শুরু করবার আগে অপদেবতার দৃষ্টি নিরাকরণের উদ্দেশ্যে ‘মুখবন্ধ’ মন্ত্র পড়ত। আমি রোজা নই এবং এই মুখবন্ধ দিয়ে সমালোচকের মুখ বন্ধ করতে অবশ্যই চাই না।”

প্রথমে বুঝি নাই—“উচকপালে” বলিতে অধ্যাপক মহাশয় কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। পরে বুঝিলাম, তিনি উন্নাসিক- (highbrow) অর্থে “উচকপালে” প্রয়োগ করিয়াছেন। এতকাল “উচকপালে” বলিতে উচ্চ-কপাল-বিশিষ্ট, অর্থাৎ তুল্যগম্য—বলিয়াই জানিতাম। ৬হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৬জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানেও তাহাই বলিতেছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তাহা নহে;—শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন মহাশয় ইহার অল্প অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

কিন্তু কেন? ‘অপদেবতা’ ‘উচকপালে’ সমালোচকের প্রতি এই উদ্ভার হেতু কি? কেন এই মুখবন্ধ?

বহিখানির পাতা উলটাইতে কারণ বুঝিলাম। বুঝিলাম, অধ্যাপক মহাশয় যদিও বলিয়াছেন যে সমালোচকের মুখ বন্ধ করিতে তিনি চাহেন না, তবুও মনে মনে তিনি যে তাহাই প্রবলভাবে চাহিয়াছেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ-কাজে যাওয়া কেন? বাহাতে এইরূপ পদ-বদ বোধ হারাইয়া মুখবন্ধ রচনা করিতে হয়, তাহাতে না যাওয়াই ভাল নয় কি?

আমাদের লোকাচারে অবলা নারীর প্রতি শরনিক্ষেপ

নিষিদ্ধ। কাজেই, ৪৩৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থমধ্যে কী বস্তু

বিশ্ববিদ্যালয়, যত্ন তাহার বাংলা বিভাগ এবং যত্ন শ্রীযুক্ত
স্বকুমার সেন, এম. এ., পি-এইচ-ডি, এফ-এ-এস, ভারতীয়
ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞানের ধর্মরা অধ্যাপক।

* * *

নরাণাৎ স্বস্তুরক্রমঃ

আমাদের দেশে চিরকাল প্রবাদ ছিল যে নরাণাৎ
মাতুলক্রমঃ। কিন্তু এক্ষণে দিন বদলাইয়াছে, এক্ষণে
মাতুলের ক্রম কেহ আর অহমরণ করে না—অহমরণ করে
স্বস্তুরের পদার্থ। পশ্চিম জার্মানির কলিকাতাস্থ কনসালের
ইলাকে হাউস-এ রবীন্দ্রজয়ন্তবর্ষপুঁতি উপলক্ষে যে
কেলেকারি ঘটয়াছে, তাহাতে উহাই প্রমাণিত হইতেছে।
স্বস্তুর প্যারিসে যে বেলেলাপনা করিয়াছেন, উপযুক্ত
জামাতা কলিকাতায় তাহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন।
উহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। চ্যাংড়া বখাটে
ছোকরা দেশে বহু আছে। উহাদের কে কোথায় কি
বলিল, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার মত প্রচুর অবসর
এবং উৎসাহ আমাদের নাই। কিন্তু বিস্মিত হইয়াছি
সহযোগী 'স্বাধীনতা'-র কাণ্ড দেখিয়া। যাহাকে চাঁটি
মারিয়া বসাইয়া দেওয়া উচিত, তাহারই উক্তি লইয়া
ইহারা দিনের পর দিন গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছেন।
ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কোন
পক্ষই কম-যান না।

* * *

বুঝি মাঝে মাঝে জানি সন্ধান

অনেক কবি-বন্ধু একটি হৈয়ালি ছড়া পাঠাইয়াছেন।
আমি উহার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিলাম না। পাঠকদের
নিকট উহা হাজির করিতেছি। মাধুব্যক্তি বুঝিয়া
দেখুন কিছু অর্থোদ্ধার করিতে পারেন কিনা।

শিলচরেতে শিল পড়েছে,
কলকাতাতে জল ভরি।
বীরদাপে তাই বিশ্ব কাঁপে
বলেন সব ডাক ছাড়ি :
কেরি যদি হয় করব না মাক,
মাক করিলাম এইবারই।
চ্যাং ভেঙেছিল বেশ করেছিল,
মাথায় বাড়ি মারি মেথি।
মেথি তবে, করব গোলা,
হবই হব ঘরমুখী।
দোহাই প্রভু রাগ করো না
কান দিও না পাঁচলাতে;
পথ হারিয়ে শেষ কালেতে
বসবে কি হারি ফুটপাথে।

ত্রিখোশনবীস জুনিয়র

শ নি বা ঝে র

চি চি



৩৩শ বর্ষ,
১০ম সংখ্যা, প্রাবণ ১৩৬৮

সং বা দ - সা হি ত্য

“মাটি ও ইট, মানুষ ও ডিগ্রিধারী মানুষ”

গোপালদা লিখিয়াছেন, “ভায়া হে, মহাসমুদ্রবিধৌত মহাবলীপূবমের অনন্তশায়ীবিষ্ণুমন্দিরে বসিয়া ফেনশীর্ষ উত্তালতরঙ্গলীলা দেখিতে দেখিতে ও স্বার্থ-অহমিকা-অন্ধ, পথভ্রান্ত জনতার কোলাহলমুখরিত তোমাদের সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত আত্মগোপনপ্রয়াসী হইয়া চূপ করিয়া ছিলাম। হঠাৎ পশ্চিম-দক্ষিণ ভারতে প্রকৃতির ভীম প্রহারে মানুষের চরম দুর্গতি ও লাঞ্ছনাব সংবাদ পাইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। বজ্রাতের দেবায় পুনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানেই তোমার আঘাত সংখ্যাব “সংবাদ-সাহিত্যে” “হরির লুটও দিব” পড়িলাম। প্রকৃতির ক্রুর হাতে বিজ্ঞান-গবিত মানুষের পবাজয়ের ভয়াবহ কাহিনী সমগ্র পৃথিবীতে বচিত হইতেছে লিখিয়াছ। আমি এখানে তাহাব প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্র দেখিলাম। যে মাটি মানুষকে অন্নবস্ত্র—যাবতীয় একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভার দান করে, পোড়াইয়া ইট করিয়া সেই প্রাণদ মাটিকে নিষ্প্রাণ করিয়া মানুষই প্রতিদিন মাটি করিতেছে, শতসম্ভাবনাপূর্ণ মাটিকে ইটভাঙা খোয়া ও পাথরকুচি দিয়া ঢাকিয়া বালি-সিমেন্টের সাহায্যে কংক্রিট করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। অট্টালিকার উপব অট্টালিকা, প্রাসাদেব উপব প্রাসাদ, বাধের উপর বাধ নির্মাণ করিয়া নিজেকে নিবাপদ করিবার দুর্ভাগ্য সাধনায় মানুষ নিজেকে নিরন্ন করিবার বড়দুঃখ করিতেছে—এই ভীষণ সত্যটা আমি উপলব্ধি

কবিলাম। শ্রবণ হইতেছে অন্ধবিদ্ আইনস্টাইনের কঠিন সতর্কবাণী—‘মাটিকে ট্র্যাক্টর দিয়া গভীর করিয়া ঘাঁটা হইবে না, তাহাতে আপাত সফল ফলিবে বটে কিন্তু মাটি অভ্যন্তরকাল মধ্যে বক্ষা হইয়া যাইবে।’ ইহাব অবশুভাবী পরিণতি খাত্তাব এবং বাজ্ঞাতাবের আশঙ্কায় বিজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞাপুরুষ মানুষকে বক্ষা ও নিফল কবিবাব ব্যাপক অভিযান।

ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ থাক্, আমাব এখন পরমহংসদেবের অবস্থা। তিনি ‘মাটি-টাকা, টাকা-মাটি’ বলিতে বলিতে অর্থকে অর্থহীন কবিত্তে পারিয়াছিলেন। আমি ‘মাটি ইট, ইট-মাটি’ বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইতেছি। এই ভাবের বোঝার উপর শাকের আটির মত তোমাদের বিশ্ববিভাগলয়গুলিতে ছাত্রভর্তির গুরু সমস্তা আসিয়া জুটিয়াছে। মানুষকে ডিগ্রিধারী মানুষ কবিবাব জন্ত বোকা মানুষই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে রসাতলগামী এই সভ্যতাব টানে। মাটিকে ফর্মায় ফেলিয়া ভাটার পোড়াইয়া ইট হয়, সে ইটে স্থলব স্তুদৃশ মনোহব প্রাসাদ নির্মিত হয়। মানুষকে বিশ্ববিভাগলয়ের ফর্মায় ফেলিয়া ও পরীক্ষার ভাটায় পোড়াইয়া ডিগ্রিধারী মানুষ করা হয় এবং সে মানুষ দিয়া সবকারী মহাকরণিক ও অত্যাশ্চর্য্য নানা করণিক ভবন এবং বেসরকারী সওদাগরী আপিস গাঁথা হয়। ধানইট ছুঁড়িয়া তবু বুকুর বেরাল মানুষ হত্যা করা যায় কিন্তু ডিগ্রিধারী মানুষকে দিয়া মাছি-মারা ছাড়া আর কোনও মহত্তর কাজ সাধিত হয় না এই স্ফুলা স্ফুলা

মলয়জ্ঞশীতলা সোনার বাংলায়। তবু সেই পোড়া ডিগ্রির জন্ত গুরুমন্ত্রে সঞ্জীবিত পঞ্চনদী বীরের বীরদের মত এই যে ‘আগে কেবা প্রাণ কবিরেক দান তার লাগি কাড়াকাড়ি’ চলিতেছে তাহাব কারণ আর কিছুই নয়— শুধু পে-মাস্টার, দালাল আব কমট্রাক্টারদের মুখ-শৌকান্তিকির ফল মাত্র। মাটি পুড়িয়া ইট হইতেছে, বারো-বাই-এক বালি-সিমেন্টের মসলায় পাশাপাশি ও উপযুপবি বসিয়া সেই ইট ইমারত গড়িতেছে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নামে যত্নতত্ত্ব ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারে পাকা গাঁথুনির (ছয় বাই চার) স্বাইজ্যাপার তুলিবার সহায় হইতেছে—কাছেই মাটি-পোড়া ইটের কেরামতি বড় কম নয়। কিন্তু ডিগ্রি-পোড়া মালুমের এসব কোন ক্ষমতাই নাই। এই কথাটা বুঝিয়াছিলেন বাংলাদেশের সর্বোত্তম দেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মস্তিষ্কগবিত বাঙালী ১৯০৯ সনে তাঁহার সতর্কবাণী সত্ত্বেও সেই মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতে করিতে অধঃপতনে বধাধাপে নামিয়া বর্তমানে কোন্ পঙ্কশয্যা আশ্রয় করিয়াছে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রতিদিন তাহা প্রকট হইতেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আর একবার “অন্নসম্রাট ও বাঙালীর পবাজয়” প্রবন্ধে বাঙালীর দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন। ভায়া হে, তোমার হয়তো স্মরণ নাই কিন্তু তোমার সম্পাদিত ‘বঙ্গপ্রী’ মাসিকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দেব পূজা-সংখ্যায় ওই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি কি বলিয়াছিলেন তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি :

‘আমি আজ যে সকল কথা বলিতে বলিয়াছি তাহা নূতন নয়, স্বথপ্রাব্যও নয়। ১৯০৯ সালে ‘বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার’ সম্বন্ধে প্রথম দুর্ভাগ্য বাঙালীকে মনের দুঃখে কিঞ্চিৎ রুচ সত্যকথা শুনাইয়াছিলাম, সেদিন হইতে প্রায় নিকি শতাব্দী অতীত হইয়াছে, আমার দুঃখ আজিও ঘুচিল না। বাঙালী আজিও সচেতন হইল না। বার বাব একই কথা বলিতে বলিতে আমার জিহ্বায় জড়তা আসিল, দুঃখ-দুর্দশার একই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল, আমার যৌবনের শক্তি বার্কিক্যের জড়তায় বিলীন হইতে বলিল—বাঙালী কিন্তু জাগিল না। আমার মুখে একঘেয়ে নিন্দাবাক্য শুনিতে

শুনিতে লোকে আমার প্রতি বীতরাগ হইয়াছে, বাঙালী-নিন্দুক বলিয়া আমার অধ্যাত্তি রটিয়াছে, নানা জনে নানা উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি সঙ্কীর্ণমনা এমন কথাও যে দুই একজন না বলিয়াছে তাহা নয় তবু আমি দুশ্মুখের মত কথা বলিতে ছাড়ি নাই। সে কি বাঙালীকে ঘৃণা করি বলিয়া? আমি বাঙালী, ‘স্বজ্ঞান স্বফল’ বাঙলাদেশকে আমি ভালবাসি। বাঙালী সবল হউক, স্বস্থ হউক, আপনাব পায়ে আপনি নির্ভর কবিয়া দাঁড়াক, ইহাই আমি নিরন্তর কামনা করি। আমার এই আন্তরিক কামনাই আমাকে কটুভাষী করিয়াছে। ১৯০৯ সালে যাহা বলিয়াছিলাম, ১৯৩৩ সালে তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি—হয়তো আবেগের বশে দুই একটা শব্দ কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। সেই সকল কথা আমি বিদ্রোহের বশে লিপি নাই, জাতীয় দারুণ দুঃবস্থাজনিত দুঃখই আমাকে এরূপ বলাইয়াছে।

আমি যাহা বলি, তাহা মোটেই নূতন নয়, অত্যন্ত পুরাতন, অত্যন্ত সাধারণ কথা, বাব বাব শুনিতে শুনিতে যদি চৈতন্য হয়, সেই জন্তই বলি। আমি নিবাশ হই নাই, হইলে মুক হইয়া থাকিতাম। আমি জানি এই হতভাগ্য জাতিই একদিন আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবে, আপনাকে জানিবে। চিরঅমঙ্গলভাষী আমি, সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছি। মৃত্যু উকি দিতেছে, তাহার শুভাগমনের পূর্বে কি আমার আশা পূর্ণ হইবে না?

একটা কথা, আমি জানি বিদেশী ও স্বদেশী ডিগ্রীধারী বাঙালীরা আমার প্রতি অপ্রসন্ন, আমি ডিগ্রীবিরোধী বলিয়া। আমি ইহা সত্য মতাই বিশ্বাস কবি, বাঙালীর পক্ষে ডিগ্রীব কোনই সার্থকতা নাই। চাকুরীতেই যাহার পরিসমাপ্তি, ডিগ্রী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে জ্ঞান-চর্চা অগন্ত্যবাত্তা কবে, সহজ বুদ্ধিতে সে ডিগ্রীর প্রশংসা আমি করিতে পারি না। এই ডিগ্রীব মোহ বাঙালীব ক্ষতি করিয়াছে এবং সে মোহ আজিও কাটে নাই।

১৯৩৩-হইতে ১৯৬১—আরও আটশ বৎসর কাল-প্রবাহে বিলীন হইয়াছে, বাঙালী বধির, বাঙালী আত্মহত্যায় রুতসঙ্কল বলিয়া শহর ও গ্রাম জোড়া ক্ষুদ্র বৃহৎ ধাবতীয় ব্যবসায়ের লাভ-লোকমানের দায়

অবাঙালীদের হাতে সঁপিয়া দিয়া ডিগ্রির ফাঁস গলায়
জড়াইয়া নিশ্চিত অপঘাত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে।
এই গডলিকাগ্রবাহকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে পারিব
এমন আশা করি না, কিন্তু যে মাটি ইট হয় নাই, যে
মাহুষ গ্রাজুয়েট হয় নাই তাহাদেবই সচেতন করিবার জ্ঞ
আমার মনের গভীর খেদ আচার্য বায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ
করিয়া নিবেদন করিতেছি। দীর্ঘ আঠারো বছর আগে
মাটির বন্দনা করিয়াছিলাম আজ সেইটিই তোমাকে
সুনাইয়া বিদায় লইতেছি :

ওগো মাটি, তুমি ক্ষুধিত ধরার মাটি,
চির পুরাতন অথচ চির নূতন,
পবিত্র ভব আধারে দুয়ার আঁটি
গুঁচ সাধনায় জড়েরে কর চেতন।
চেতন কবিতা আলোকে ঠেলিয়া দাও,
যতনে শিকড় হৃদয়ে ধরিয়া রাখো,
ফুলপাতা মেলি নভে যে হবে উধাও—
তার আশ্রয় তুমি চিরদিন থাকো।
কী বেদনা তব বুকেব মাঝারে জানি—
মুক্তিকামীবে চিরবন্ধনে বাঁধা,
স্থানান্তরে জড়েরে করিয়া প্রাণী,
জড়তার ভারে নিজে চিরদিন কাঁদা।

ওগো মাটি, তুমি ক্ষুধিত ধরার মাটি,
তোমারি বক্ষে সঞ্চিত সব স্নেহ,
মাঠে মাঠে ধান বাঁধা হয় আঁটি আঁটি,
ফাটলে ফাটলে লেলিহান তব ক্ষুধা।
অম্লের বীজ হে ক্ষুধিত কর গ্রাস—
তৃপ্ত হইয়া শতগুণ দাও ফিরে,
মাটির বুকেতে মাহুষেরা করে চাম
মাটি স্নেহরস দেয় বলে বুক চিরে।
তোমারি সলিলে সঞ্চিত হও তুমি,
মোরা দিন গণি শত করিয়া দাবি,
সবুজে সোনার শোভে ধুধু মরুভূমি—
খামারে গোলায় আমরা লাগাই চাবি।

ওগো মাটি, ওগো ক্ষুধিত ধরার মাটি,
শস্ত্রশীর্ষে শিহরে তোমার প্রাণ,
আমরা সফল সে প্রাণ-ফসল কাটি
ঘুগ ঘুগ ধরি অফুরান তব দান।
তোমারি এ লীলা জানি জানি মৃন্ময়ী,
বুকেব রক্তে রাখিতেছ সংসার।
মাটি-আশ্রয়ে তৃণেরাও চিরজয়ী—
জগদ্ধাত্রী, ধর মাহুষের ভার।
তোমার করুণা সীমানা কোথায় তার
চৈতী আউস আমনে হয় না শেষ,
মোরা ভুলে থাকি তাই কবি হাহাকাব—
বৃথা ক্রন্দনে ভরে তুলি সারা দেশ।

ওগো মাটি, ওগো ক্ষুধিত ধরার মাটি,
তুমি আমাদের একান্ত আশ্রয় ;
কোন বেদনায় বৈশাখে পড় ফাটি,
আমরা অবোধ না জানি সে পরিচয়।
স্নেহভরা বুক মেলে আছি চিরদিন,
আমরা বিমুখ তবু ক্ষবে স্নেহধারা,
মাহুষ তখনি বুঝিবে মাটির ঋণ
হবে সে যেদিন মাটি-আশ্রয়-হার।
সে চরমদিন এসেছে ধরণীতলে,
মাহুষের কাছে হে মাটি, হয়েছ মাটি,
ফসল না যদি ফলে নয়নের জলে
রক্তধাবায় ফলিবে তা পরিপাটি ॥

ভাষা হে, বিশ্বাস কর, এ আটাত্তিজমের ওকালতি
নয়। আমি মাহুষের ক্রমবর্ধমান সভ্যতা ও প্রগতির
বিবোধী নই, তবে ইট-সভ্যতায় ও গ্রাজুয়েট-সভ্যতায়
আমি আতঙ্কিত। ইটকে ফিরাইয়া মাটি করিবার কোনও
উপায় নাই, গ্রাজুয়েট কখনও আবার মাহুষ হয় না।
হইলে হাজার হাজার বেকার গ্রাজুয়েটের নাকের উপর
দিয়া পানওয়ালা বিডিওয়ালা চানার্চুর-বাদামতাজাওয়ালা
ছুচকা-ডালপুরিওয়ালা বাংলাদেশেরই পোস্টাশিস
মারফত পাঁচ কোটিটাকা বছরে বছবে বঙ্গভাষা ও বাঙালী-

বিরোধী দেশে পাঠাইতে পারিত না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দেহবন্ধা করিয়া বাঁচিয়াছেন, আজ পাগলা মেহেরআলীও মত আমার একটিমাত্র বুলি, হে মাটি ইট হইও না, হে মাছুষ প্রাজুবেট হইও না। ভাটা হইতে তফাতে থাকো, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তফাত যাও। সব যে বুট হ্যায ইহা আমি বুঝিয়াছি তাই চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাব এই প্রলাপ ছাপিতে যদি ভয় পাও, ছাপিও না, আমি দুঃখিত হইব না।”

মহাপাতকনাশনম্

আমরা যে বৎসরের কোনও নির্দিষ্ট দিনে অথবা পিতৃপক্ষে মহালয়ার দিন পূর্বপুরুষদেব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাহাতে আমাদেরই কল্যাণ হয়, সংসারের জটিল পথে চলিতে চলিতে যে কলুষ-কর্দম, যে পাপ আমাদেরকে নিত্য মাড়াইয়া চলিতে হয় এবং যাহা প্রতিদিন সঞ্চিত হইয়া মহাপাতক হইয়া উঠে শাস্ত্রকাবরা বলেন এই শ্রদ্ধাস্মরণে সেই মহাপাতক নাশ হয়। বার্ষিক যোগস্নান যেমন দ্বাদশ বর্ষে বা বিশেষ গ্রহসংস্থানে পূর্ণকুন্তমোগের মহিমা অর্জন করে এই বার্ষিক স্মরণও শতবর্ষ অন্তর জাতির পক্ষে পিতৃতর্পণেব মহাযোগ ঘটায়। ইংরেজী এই ১৯৩১ সন পাপপঙ্কে নিমগ্ন দুর্ভাগা বাঙালী জাতিকে শতবার্ষিক শ্রাদ্ধ-স্মরণের দ্বারা মহাপাতকনাশনের অনেকগুলি সুযোগ দিয়াছে। তারিখওয়ারী সেগুলি এই :

- ১। ১১ ফেব্রুয়ারি—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় জন্ম, তিরোভাব
২৭ অক্টোবর ১৯০৭
- ২। ১ মার্চ —অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জন্ম, তিরোভাব
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০
- ৩। ৭ মে —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম, তিরোভাব
৭ আগস্ট ১৯৪১
- ৪। ৯ জুন —কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ জন্ম,
তিরোভাব ৪ জুলাই ১৯০৭
- ৫। ২ আগস্ট —প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্ম, তিরোভাব
১৬ জুন ১৯৪৪

৬। ১৭ আগস্ট—উইলিয়ম কেরী জন্ম, তিরোভাব
(১৭৬১) ৯ জুন ১৮৩৪

৭। ১ অক্টোবর —নীলবতন সরকার জন্ম, তিরোভাব
১৮ মে ১৯৪৩

বাংলা গল্প-সাহিত্যেব ভিত্তিপত্তনে • ব্যাকবণ-অভিধানের বৈজ্ঞানিক বন্ধনে ভাষাকে বাঁধিয়া এবং প্রাথমিক গল্পগ্রন্থ বচনা করিয়া ও রচনা করাইয়া উইলিয়ম কেরী বাঙালী জাতির চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি নিজেকে বাঙালী এবং বাংলাকে তাঁহার মাতৃভাষা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই এই বৈদেশিক মহাপুরুষকে এই তালিকায স্থান দিলাম।

১। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বাংলাদেশের এক মহা-সঙ্কটকালে আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে আত্মস্থ করিতে ব্যক্তিগত ধর্মসাধন ও ধর্মচর্চা ছাড়িয়া “হিন্দুকে হিন্দু এবং বাঙালীকে বাঙালী” করিবার জন্ত ‘সন্ধ্যা’-অর্চনায় ও ‘স্বরাজ’-সাধনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাবতবর্ষকে ফিরিঙ্গির কবল হইতে উদ্ধার করিবার বাসনা তিনি যে শুধু আবালায় হৃদয়ে পোষণ করিতেন তাহা নয়, সেই বাসনা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত একাধিকবার কর্মক্ষেত্রে বাঁপাইয়াও পড়িয়াছিলেন, তাঁহার ‘আমার ভারত-উদ্ধারে’ সে ইতিহাস লিখিত আছে। নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া এই সত্যটি তিনি বাঙালী জাতির মর্মে মর্যাস্তিক ভাবে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন যে, “আমরা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, আমাদের হৃদয়ে এক পুরাতন স্বর যুগযুগান্তর ধবিয়া বাজিতেছে” [‘সন্ধ্যা’র “প্রস্তাবনা”]। সেই স্বরের পুনর্জাগরণ ঘটাইয়া ব্রহ্মবান্ধব চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ‘বাংলার পালপার্বণ’ ‘সমাজ-চিন্তা’ ফিরিঙ্গিভাবাপন্ন বাঙালীকে লজ্জিত করিয়াছিল। ‘সন্ধ্যা’ ও ‘স্বরাজ’ বাঙালীকে উদ্ধৃক করিয়াছিল স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাব মহামন্ত্রে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—“সেই সময়ে [স্বদেশী-আন্দোলনের কালে] দেশবাসী চিন্তামথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একমিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী বাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের কবলেন ‘সন্ধ্যা’ কাগজ [১৬

ডিসেম্বর ১৯০৪, ১লা পৌষ ১৩১১], তীব্র ভাষায় যে মন্দির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিআলা বইয়ে দিলে।” ব্রহ্মবান্ধবের সমস্ত বিত্তা বুদ্ধি জ্ঞান ইহার পর হইতে ক্যাশেল হাসপাতালে মৃত্যু পর্যন্ত জাতির এই পুনর্জাগরণের সাধনায় নিয়োজিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপন্থী এই বৈদান্তিক সম্যাসীর পাণ্ডিত্য যে কত প্রথমে ও বহুমুখী ছিল পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় তাহার সাক্ষ্য এইভাবে দিয়াছেন :

“উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যখন স্বীয় ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রাণবন্ত দেখিয়া আমি অনেক সময় বিস্মিত হইতাম। তিনি অসাধারণ পণ্ডিতও ছিলেন। সে পাণ্ডিত্য তিনি ঢাকিয়া বাধিতে জানিতেন। কখনও তাঁহাকে পাণ্ডিত্যজনিত মাৎসর্য প্রকাশ করিতে দেখি নাই। যে ব্যক্তি সংস্কৃত, লাতিন, ইংরেজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দু, সিন্ধী, মারহাট্টা প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি কখনই স্বীয় বিত্তার পবিচয় দিবার অবসর খুঁজিতেন না।”

বাংলা সাহিত্য ও ভাষার উন্নতিকল্পে ব্রহ্মবান্ধবের দান সচরাচর উল্লিখিত ও স্বীকৃত হয় না কিন্তু সে দানের পরিমাণ বড় কম নয়। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এই সংবাদ যে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁহার তিন মাসের অন্তর্জ রবীন্দ্রনাথকে “বাংলার বিশ্বকবি” (“The World-Poet of Bengal”) বলিয়া জগতে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তৎসম্পাদিত ইংরেজী মাস্টাহিক ‘সোফিয়া’র (‘Sophia’) ১৯০০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তিনি “The World-Poet of Bengal” শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন—
“If ever the Bengali language is studied by foriegners it will be for the sake of Rabindra. He is a world-poet”. বাংলা গল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে উপাধ্যায়ের দান ভুলিবার নহে। এই দান ‘সন্ধ্যা’র সম্পাদকীয় রচনার দ্বারা আসিয়াছিল। চলিতবুলি, প্রবাদবাক্য ও সাধুজনধিকৃত শ্লোগার সাহায্যে বাংলা সংবাদপত্রের ভাষায় তিনি যে প্রাণসঞ্চার

করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যক্ষ দলিল এতাবৎকাল ফিরিঙ্গি শাসনেব আমলে পুলিশের কঠোর শাসন-নিপীড়নে একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল অথবা গুপ্ত অবস্থায় ছিল। এমন কি স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই. বি ও সি. আই ডি. বিভাগ স্বদেশী আমল ও স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নিদর্শনবৎ যে প্রদর্শনী কুবিয়াছিলেন তাহাতেও ‘সন্ধ্যা’র একটি পাতাও প্রদর্শিত হয় নাই। সম্প্রতি ‘সন্ধ্যা’র অনেক সংখ্যা ও অনেক সংখ্যাব কতিপয় অংশ আমরা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। সেইগুলি প্রকাশের দ্বারাই বাংলা গল্পসাহিত্যে ব্রহ্মবান্ধবের স্থান যে কত উচুতে তাহা আমরা প্রমাণ করিতে পারিব।

২। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কত বড় ঐতিহাসিক ছিলেন ঐতিহাসিকেবা তাহার বিচার করিবেন কিন্তু আমরা চিরদিন তাঁহাব জয়গান করিব তাঁহার ইতিহাসকে তিনি বাংলা সাহিত্য কবিতাে পাবিয়াছেন বলিয়া। তাঁহার ‘সিরাজদ্দৌলা’, ১৮৮৩, ‘সীতারামরায়’, ১৮৯৮, ‘মীরকাসিম’, ১৯০৬, ‘ফিরিঙ্গি বণিক’ ১৯২২, শুধু অপূর্ব ভাষার গুণে ঐতিহাসিক বাঙালীকে ইতিহাস-সচেতন করিয়াছে। তিনি স্বয়ং কেন স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধারে যত্নবান হইয়াছেন তৎসম্পাদিত ‘ঐতিহাসিক চিত্র’ ত্রৈমাসিক পত্রের “সূচনা”য় তাহা এই ভাবে নিবেদন করিয়াছেন :

“ইতিহাসের উপকরণ এখনও সংকলিত হয় নাই, তদর্থে যথাযোগ্য আয়োজনও আরম্ভ হয় নাই;—অথচ শিশুপাঠ্য ইতিহাস রচনার বিবাম নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহাতে এক শ্রেণীর গ্রন্থ-বিশেষের ছায়ামাত্রই পুনঃ পুনঃ অঙ্কিত হইতেছে। তাহাতে কত ঐতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদ অস্বদেশের বালক-বালিকার রক্তে রক্তে প্রবেশ লাভ করিতেছে। তাহারা বাহা বহু যত্নে বহু ক্লেশে কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করিতেছে, তাহার চরম ফল—আত্মাবমাননা! বাঙ্গলার ইতিহাসেই ইহা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইতেছে।

এই দুর্দশা লক্ষ্য করিয়া ‘বঙ্গদর্শন’র সুযোগ্য সম্পাদক

স্বর্গীয় রায় বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এক সময়ে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—“সাহেবরা যদি পাণ্ডী মারীতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীকলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গোড় তাম্রলিপি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।”

অধিক উদাহরণের উল্লেখ না করিয়া বলা যাইতে পারে,—যে দেশের শিল্পগৌরবে গ্রীস, রোম, মিশর, কার্থেজ বিশ্ব্যাপন্ন হইত, বাহাদের বাণিজ্যপোত ঘোঁপে উপঘোঁপে নিকটে এবং স্বদূরে আর্য্যগৌরব প্রতিষ্ঠিত কবিত; বাহাদের বাহুবল এক সময়ে কাশী-কান্ধকুজে, উৎকলে সমুদ্র-সৈকতে বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল, বাহাদের সহিত বহু বৎসর বণশ্রমে গলদ্বর্ষ হইয়াও বাহুবলোন্মত্ত পাঠানসেনা সমগ্র দেশ পদানত করিতে পারে নাই, বরং স্বযোগ পাইবামাত্র কংস রাজা মোসলমানের সিংহাসনে আরোহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, বাহারা অতাপি জ্ঞানগৌরবে কাহারও নিকট হীন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না, তাহাদের ইতিহাস নাই, ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর লজ্জার কথা আর কোথায়?”

এই লজ্জা দূব করিবার জন্তই তিনি কাব্যসরস্বতীব সেবা ছাড়িয়া ইতিহাস-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সে ইতিহাস ইংরেজের হইয়া লিখিত নহে, স্বদেশের গৌরব সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে অবহিত করিবার জন্ত। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রণীত ইতিহাস-সাধনার জয় ঘোষণা করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের ‘ভারতী’তে লিখিয়া-
ছিলেন :

“হোক বা না হোক আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গকে লেখকব্রজ সাহেবের

চিঠি মধ্য হইতে বাহির করিয়া ইতিহাসের উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিব; এখানে তাঁহারা নিজের চেষ্টায় সত্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভ্রমও সংগ্রহ করেন সেও আমাদের পক্ষে পরলিখিত পরীক্ষাপুস্তকের মুখস্থবিভাগ অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেয়। কারণ, সেই স্বাধীন চেষ্টার উত্তম আর একমুহুর্ত সেই ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিবে। কিন্তু পরদত্ত চোখের ঠুলি চিরদিন বাঁধা রাস্তায় ঘুরিবার যতই উপযোগী হউক, পরীক্ষার বানীবুদ্ধির তৈলনিষ্কাশন-কল্পে যতই প্রয়োজনীয় হোক, নূতন সত্য অর্জন ও পুরাতন ভ্রমবিবর্জনের উদ্দেশ্যে অব্যবহার্য্য।

‘ঐতিহাসিক চিত্র’ ভারত ইতিহাসের বন্ধন মোচন জন্ত ধর্ম্মযুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত। আশা করি ধর্ম্ম তাহার সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবেন।”

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সাধনা এই উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিয়াছিল শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সেই কথাটাই আমাদের স্মরণীয়।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সকল চাকল্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও প্রাচীন ভাবতবর্ষের উপনিষদের তপশ্চার আলো তাঁহার অন্তরে অনির্বাপ ছিল। পুরাতন ও নবীন ভারতের সমন্বয়ে উনিশ শতকের বাংলা যে প্রতিভার জন্ম দিয়াছিল সেই প্রতিভা বিংশ শতাব্দীর শুধু বাংলাকেই সৃষ্টি কবে নাই, বিংশ শতকের ভাবতকেও সৃষ্টি করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীকে চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। পৃথিবীব্যাপী তাঁহার শতবার্ষিক জন্মজয়ন্তীতে এই সত্যটিই ধীরে ধীরে প্রকট হইতেছে।

৪। কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবির “রাহু”-রূপে ‘মিঠে কড়া’র ‘কড়ি ও কোমলে’ আঘাত হানিয়াছিলেন বলিয়াই আজ যদিও স্মরণীয় কিন্তু সাংবাদিকতায়, ‘বিভাগপতি’-সম্পাদনে ও স্বদেশী-সূদীতে তাঁহার কীর্ত্তি কম স্মরণীয় নয়। সাংবাদিকতায় নির্ভীক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

৫। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—মস্তিষ্কসর্বস্ব রাঙালীর ডিগ্রীর

মোহ ঘুচাইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহিত করিয়া জাতিকে রক্ষা করিবার একান্ত প্রয়াস করিয়াছিলেন সেই-জন্ত জাতির এই ঘোর দুদিনে তাঁহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করা প্রয়োজন হইয়াছে। বসায়ন-বিজ্ঞানে তাঁহার গবেষণা ও জ্ঞান, ভারতীয় বসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় তাঁহার উত্তম, বিশ্বখ্যাত বাঙালী বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠী গড়িয়া তোলায় তাঁহার কৃতিত্ব আজ সর্বজনবিদিত। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনাদান এবং সেই উদ্দেশ্যে রসায়নের পরিভাষা সৃষ্টি বাঙালী জাতি কৃতজ্ঞ হইলে নিশ্চয়ই স্মরণে রাখিবে। জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব দেশকে যতই গৌরবান্বিত করুক বসাতলগামী বাঙালীকে রক্ষা করিবার প্রাণপণ প্রয়াস তাঁহাকে বাঙালীর কাছে প্রিয় করিয়াছে। এই মহৎ মাহুযটি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা আজ সকল সাময়িকপত্রে এবং বাংলাদেশে সর্বত্র হইতেছে। ইহা স্মরণ। ১৯৩৬ সনে আমরা তাঁহাকে তাঁহার বাল্যে ও কৈশোরে ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনে কোন্ কোন্ বিষয় ও বচনা প্রভাবিত করিয়াছিল এই প্রশ্ন করাতে তিনি স্বহস্তে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

“বাল্যকালে আমার পিতার পুস্তকাগারে প্রপিতামহের আমলের সুপীকৃত সমাচার দর্পণ দেখিতাম। সময় সময় কোঁতুলবশতঃ তাহার পাতা উল্টাইতাম। একদিন বেজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে কি প্রকারে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ভিজা সূতার দ্বারা পৃথিবীতে আনয়ন করিলেন তাহা পড়িয়া অবাক হইলাম। অবশ্য সেই তরুণ বয়সে এই ঘটনাব কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সর্বাপেক্ষা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ এবং সোমপ্রকাশ (দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ সম্পাদিত) পত্রিকার নিকট আমি অপরিশোধ্য-রূপে জড়িত। এই সাময়িক পত্রিকাগুলি গোড়া হইতে আমার পিতা সময়ে বাধাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি এগুলির পাতা তন্ন তন্ন করিয়া উল্টাইতাম ও ষাণ্মাস্য লেখাগুলির ভাব গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইতাম। ফলে, কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা-শুনিবার

বহু পূর্বেই আমি ব্রহ্মসমাজের দিকে অতর্কিতভাবে আকৃষ্ট হই।

তত্ত্ববোধিনী ও বিবিধার্থ-সংগ্রহে পদার্থবিজ্ঞা, জন্তবিজ্ঞা ও ভূ-বিজ্ঞা বিষয়ক প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া বিজ্ঞানের বীজ আমার হৃদয়ে উদ্ভূত হয়। ইহার কিছুকাল পরে যখন বঙ্গদর্শন প্রচারিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে এক নব যুগের অবতারণা করিল তখনও আমি—পুস্তক-কীটের স্তায় ইহাব প্রত্যেক পৃষ্ঠা, এমন কি, প্রতি ছত্র পড়িয়া হজম করিতে লাগিলাম। রামদাস সেনের কালিদাস ও বৈষ্ণব-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ (যাহা শেষে ঐতিহাসিক রহস্য নামে স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে) পড়িয়া আমি প্রভুত্বের দিকে আকৃষ্ট হই। ভবিষ্যতে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস লিখিয়া এই অন্তর্নিহিত বলবতী তৃষ্ণা নিবারণের পথ মুক্ত হয়।”

৮-৯-৩৩

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তাঁহার খ্যাতনামা শিল্পেরা তাঁহার স্বগ্রাম খুলনা জেলার রাড়ুলীতে গ্রামবাসীব সহিত একযোগে আচার্যের সম্বর্ধনা করেন, সভাপতিত্ব করেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা। সম্বর্ধনাব উত্তরে প্রফুল্লচন্দ্র যাহা বলেন তাহাই তাঁহার জীবনের শেষ ঘোষণা। তিনি বলেন :

“আজ আমি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়াছি। পৃথিবীর বন্ধন ও মমতা, হাসি ও গান সব কিছুই আমার কাছে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার হৃদীয় জীবনে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, আমি এই ধরণীকে ভালবাসিয়াছি— ভালবাসিয়াছি আমার দেশ ও জাতিকে, ভালবাসিয়াছি আমার প্রিয় জন্মভূমিকে। ...তোমাদের সুখদুঃখের সহিত আমি হৃদীয় দিন জড়িত আছি, তোমাদের ব্যথা ও বেদনা আমার বিগত কর্মবহুল জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অশান্তি আনিয়াছে, তোমাদের উৎসব ও আনন্দ আমাকে আশাবিত্ত করিয়াছে। জানি এই বন্ধন একদিন ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং সেদিন আব বেশি দূরে নয়।”

১৯৬১ সন প্রমাণ করিতেছে যে আচার্যদেব বাংলা দেশের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই, বাঙালী তাঁহাকে ভোলে নাই।

৬। উইলিয়ম কেরীর দ্বিশতবার্ষিক জন্মোৎসব বাংলাদেশ-বিশেষ, করিয়া শ্রীবামপুর সমারোহের সহিত পালন করিয়া পিতৃশ্রদ্ধা কথঞ্চিৎ শোধ কবিয়াছে। এই কর্মযোগীকে অপভাষার আক্রমণ হইতে বঙ্গভাষাকে বক্ষার জন্ত উৎসর্গিত-প্রাণ দধীচিকে বাঙালী যে ভোলে নাই ও ভুলিবে না তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা একাধিক গ্রন্থে তাঁহার জীবন ও কীর্তিকথা, বিশেষ করিয়া বাংলা গল্পের সৃষ্টিকর্মে তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কথা বলিয়াছি। এখানে সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে দুইটি অনুল্লিখিত উক্তি উদ্ধৃত কবিয়া তাঁহার প্রতি দ্বিশত-বার্ষিক নতি নিবেদন করিতেছি। উদ্ধৃতি দুইটি ১১ জুন ও ২৮ জুনের (১৮৬৪) 'সমাচার দর্পণ' হইতে—ওই সনের ২২ জুন তারিখে তিনি দেহান্তরিত হইয়াছিলেন।

এক : “ভারতবর্ষীয় লোকেবদেব তাঁহার কার্যের দ্বারা কি পর্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করিতে হয় তাহা অতাপি তাঁহার সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার পরে জ্ঞাত হইবেন এবং উত্তরকালীন লোকেরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবেন।”

এই উক্তি সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের।

দুই : “তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা সর্বাপেক্ষায় চমৎকারিণী। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অধিক বয়ঃসময়ে আরম্ভ করিয়াও অল্পদিনে অতি সূক্ষ্মতর সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। অত্র অত্র লোকের বাল্যকালে আরম্ভ করিয়াও এত শীঘ্র সংস্কৃত বিদ্যা হওয়া দুর্ঘট। তিনি কিছুকাল এতদঙ্গীয় জটিল পণ্ডিত সন্নিধানে রাখিয়া কোন সংস্কৃত রচনা করিতেন কিন্তু ইদানীং তিনি পরাপেক্ষা না করিয়াই ইঙ্গরেজী হইতে সংস্কৃত, অমুবাদ অর্থাৎ তর্জমা করিতেন এবং সংস্কৃত হইতে ইঙ্গরেজী অথবা বঙ্গভাষা অমুবাদ করিতেন, ইহাতে তাঁহার বিন্দুবিসর্গেরও ব্যত্যয় হইত না। অপর, তিনি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অমুমতিতে সংস্কৃত বাঙ্গালীকি রামায়ণের কতক অংশ আপনি ইঙ্গরেজীতে অমুবাদ করিয়া উভয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাস্থিত করিয়াছেন।”

এই উক্তি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের।

৭। নীলরতন সরকার উইলিয়ম কেরীর 'মতই' দরিদ্রের সম্ভান এবং বাল্য ও কৈশোবে নিতান্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎ মহৎ জীবনের জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মশতবার্ষিক জয়ন্তীর দিন সমাগত হইতে এখনো মাসাধিক বিলম্ব আছে। যিনি শুধু চিকিৎসা-বিদ্যার দ্বারা নহে, বহুমুখী প্রতিভা ও চিত্তেব ওদারের দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত মৃতপ্রায় জাতিকে সর্বভাবে নিরাময় করিতে চাহিয়াছিলেন, আমাদের বিশ্বাস, এই জয়ন্তীতে বাংলাদেশ তাঁহার প্রতি সম্মুখিত প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিবে।

নাম-মাহাত্ম্য

পরের উঠানের আবর্জনা নিজের শয়নকক্ষে টানিয়া আনিয়া তাহার উপর “কেহ ঘাঁটাইতে পারিবে না,” অমুশাসন আঁটিয়া ‘দেশের’ অশোক যে ‘ধন্যবোধ’ ও ‘সজ্ঞা’প্রীতি দেখাইয়াছেন, শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইতেন না যদি এ ‘দেশে’ নাম-মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ রাখিতেন।

কায়স্থ-কাস্তের কুঠারায়ণ

রবীন্দ্রনাথরূপ মৃত খর্জুরবৃক্ষে যে কয়টি কুঠার জন্মশতবর্ষে নিপতিত হইয়াছে তাহার সবগুলিই বৃক্ষটি সজীব থাক। কালে কাস্তে ছিল এবং সময়ে ও-বিধিমতে খর্জুবগাত্র ছুলিয়া রসনিষ্কাশন করিত। লক্ষণীয় এই যে একটি মাত্র ব্যতিক্রম হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বাদ দিলে বাকি সবগুলিই কায়স্থ-কুঠার। জনশ্রুতি আছে রবীন্দ্রনাথের যৌবনে কলিকাতার দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় কায়স্থ সমাজ তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিল। এই বৎসরে কলিকাতার কায়স্থদের সহিত বঙ্গেরাও হাত মিলাইয়াছে। কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইলে রবীন্দ্রনাথ জায়দেয়ার বংশধর কিনা ঐতিহাসিকেরা তাহা নির্ণয় করুন। তাজ্জবের কথা এই যে, দুই দত্তলোন্ডব কুঠারের বাঁটও দত্ত—আয়ুব দত্ত ও অলান দত্ত।

পনেরই আগস্ট : বিলীয়মান বিশ্বাস

নাবায়ণ দাশশর্মা

ভূমিকা

ইংরেজী ক্যালেন্ডারেব অষ্টম মাস আগস্ট শব্দটির একটি আভিধানিক অর্থ আছে, ভারতের চল্লিশ কোটি নবনাবী সকলে যদি একদিন ইংবেজী অভিধান বিস্মৃতির সমুদ্রে বিসর্জন দেয়, তবুও আগস্ট শব্দটির সেই বিস্মৃত অর্থ পবম সার্থকতায় উজ্জ্বল থাকবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। আমাদের স্ববর্ণীয় মাস আগস্ট মাস, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেবা তাব অনেকানেক অবিস্মরণীয় তারিখ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও শ্রীঅববিন্দেব আবির্ভাব আগস্টের শ্রাবণ-স্নিগ্ধ ছুটি পবম মুহূর্তে। জানি না সকল স্বর্ণজন্মার সকল জন্মদিনেব সর্বাগ্রগণ্য জন্মাষ্টমীর প্রথম পদক্ষেপও কি সৌর-আগস্টেরই কোন বিদ্যুৎ-চমকিত মধ্যরজনীতে?

কিন্তু আগস্ট তো কেবল আবির্ভাবেব পুণ্যমাস নয়, আগস্টই তো আমাদের বৃহত্তম মৃত্যুগুলিব বার্তাও স্মরণ করিয়ে দেয়। স্ববর্ণ কবির্ষে দেয় সাতই আগস্ট, বাইশে শ্রাবণকে। আর ব্রিটিশ কংসেব নিশ্চিহ্ন কাবাগারে শৃঙ্খলিত ভাবতেব অচির মুক্তির আশ্বাস শব্দরবে ঘোষিত হয়েছিল যে নয়ই আগস্টের আশ্চর্য আবির্ভাবে, তাবই

মৃত্যুবান কি আবাব লুকিয়ে ছিল না চাব বছর পবেব আগস্ট মাসেরই ঘোলই তাবিধে?

আগস্ট মাসেব স্মরণ মন্থন করতে বসে আমি তাই উৎসবে উন্নত হতে পাবি না, এব দিনগুলি আমাব যে-স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এবং যে-স্মৃতি দিয়ে ঘেবা তা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেব নয়, বেদনাবও।

আব পনেবই আগস্ট আগাব চিন্তে একযোগে সেই স্বপ্ন, সেই স্মৃতি, সেই আনন্দ ও সেই বেদনার বিচিত্র জোযাব বয়ে নিয়ে আসে আজও। এই দিনটি আমার কাছে সম্পূর্ণ আগস্ট মাসেব সার্থক প্রতীক।

বস্তুতঃ আমাদের কাছে পনেরই আগস্ট দিনটিব যত কিছু ভাষাতীত তাৎপর্য তা সম্ভবতঃ আমাদের সন্তানদের কাছে, আমরা যাবা এখনও যৌবন অতিক্রান্ত হই নি তাদের পরবর্তী প্রজিনীব কাছে, কোনদিনই স্পষ্ট হয়ে উঠবে না।

আমরা যাবা ইংবেজ রাজত্বে বাস কবেছি, বেঁচে থাকবার নিরুপায় তাগিদে পবাধীনতােব বিযাক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিষেছি অনন্তোপায় হয়ে, স্বাধীনতা শব্দের কী অর্থ—স্বাধীনতা যে কী পবমার্থ আমবাই তা জানি। জানি কিন্তু বলতে পাবি না, বুঝি কিন্তু বোঝাতে পারি না,

উনিশ শো সাতচল্লিশেব পনেরই আগস্ট আমবা কোন স্বপ্ন-লোকের চাবি খুঁজে পেয়েছিলাম।

ব্রিটিশ-শাসনের এক হিংস্রতম যুগে—জালিয়ান-ওয়ালাবাগের কুটিল দস্ত যখন বক্তাপ্লুত—আমাব শৈশব কেটেছিল; আমার জ্ঞান-উন্মেষের উষার প্রথম জ্ঞানের সঙ্গে মিশে আছে আমার বাবা ইংরেজের জেলে এই সহজাত সংবাদেব কঠিন অভিজ্ঞতা, আইন-অমাগ্ন আন্দোলনেব প্রত্যাঘাতে আমাব পরিবার দারিদ্র্যেব যে অন্ধকূপে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়েছিল তাবই ঋণ তো আজও আমাকে শুধতে হয় প্রত্যক্ষে কিংবা পর্বোক্ষে, কেরোসিনের ধূমাস্তিত শিখাব মোহময়আলো-আধাবিতে আমাব শৈশব-সন্ধ্যায় বেরূপকথাব গল্পগুলি স্বপ্ন এনেছিল—তাবই মাহুস-থেকে বাফসের লাল-নীল বিভীষিকা তো আমি দেখেছিলাম যুনিয়ন জ্যাক এবং যুনিবর্ণের মূর্তিতে, মাটির নীচে চাপা-পড়া অঙ্কুব আমরা স্বাধীনতা-স্বর্ষেব সবুজ স্বপ্ন দেখেছিলাম আমাদের না-আলো না-বাতাস না-ভ্রমব পবাধীনতার পাতালে।

আমরা পনেরই আগস্টকে স্বপ্নে দেখেছিলাম।

আর তাই তো সেই প্রতিশ্রুতির পরিপূর্তিব নগ্নে আমাদের এক চোখে অশ্রু অশ্রু চোখে উল্লাস নিয়ে আমরা বরণ করেছিলাম পনেরই আগস্টকে। সেই স্বপ্ন সত্য হল তাই উল্লাস, স্বপ্ন এবং সত্য এত পৃথক তাই অশ্রু।

তবু যাবাব বেলা এই কথা তো জানিয়ে যেতে পারব, যা পেয়েছি তার তুলনা নেই। যা চেয়েছিলাম এ তা নয়, তবু এ অনন্ত। ইংরেজ-শাসনের প্রতিটি খণ্ড খণ্ড দুঃখের প্রত্যেকটি যদি আজও উপস্থিত থাকত, যদি থাকত বেকারী ও তার উপবাস, আইন ও তার অবিচার, মিথ্যা ও তার প্রবঞ্চনা, অস্বাস্থ্য ও তাব মৃত্যু, অশিক্ষা ও তার অন্ধকার, স্বপ্ন ও তার মৈরাগ্ন, তবু শুধু একটি মাত্র বৃহৎ পরিবর্তনের জন্ত আমি পনেরই আগস্টকে ধন্য-ধরনি দেব মাথায় সর্বনাশ বহন করে। সে পরিবর্তন অন্তহীন ইংরেজস্বর্ষেব অন্তগমন।

সে পরিবর্তন যে কী, পবাধীনতার ফলাফলের প্রশ্ন না তুলেও শুধু পবাধীনতা যে কী, স্বাধীনতার উজ্জল সম্ভাবনার কথা না ভেবেও শুধু স্বাধীনতা যে কী, এ কথাগুলি বলাব নয়, উপলব্ধি।

আর সেই উপলব্ধি, আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে স্পষ্ট সেই অবাঙমানসগোচর অভিজ্ঞতা, আমাদের মৃত্যুর সঙ্গেই কালের ধূলায় বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের সম্ভাবনা পনেরই আগস্টকে চিনবে না হৃদয়েব ভাবাতীত অহরণে।

সেইজন্ত আজকের নতুন কিশোরের মুখে যদি শুনি, এ আজাদী বুটা হ্যাঁ, আমি প্রতিবাদ কবতে ইচ্ছা: কবি। পবাধীন ভাবত তাব সম্ভাবন অভিজ্ঞতায় নেই, স্বাধীনতার নাম মাত্র তার রোমাঞ্চ আনয়ন করবে কেন? স্বাধীনতার মূল্য সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পূরক করে নিতে চাইবেই তো, স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার নিবিধে। শুধু নামকে সে প্রণাম জানাবে না, যেমন জানাব আমি।

কিন্তু সেই বুটা হ্যাঁয় শ্লোগান যখন শোনা যায় আমাব কণ্ঠে, আপনাব কণ্ঠে, আমাব অনীতিপর প্রতিবেশীর দীর্ঘনিঃশ্বাস-নিঃসৃত আক্ষেপোক্তিতে যখন স্তনতে পাই ‘এর চেয়ে ইংবেজ আমল ভাল ছিল’, তখন আমাব বুকেব মধ্যে তোলপাড় করে একটা প্রবল কামার বোবা আক্রমণ আমাকে গীড়িত করে তোলে—ঠিক যেমন তুলেছিল পনেরই আগস্টেব প্রথম আবির্ভাবের মধ্যবজ্রনোস্তকতায়। সেদিনকার কামার কাবণ ছিল দেশবিভাগ: আমার জন্মস্থানে মাতৃভূমি পূর্ব-বাংলাব জন্ত সে-ক্রন্দন। আর আজকেব কামা কিসেব জন্ত? পাকিস্তানের বেদনা যখন কালের নিপুণ চিকিৎসায় অভ্যাসের মরফিয়া-সেবনে বিদূরিত, তখন আবাব কিসেব ব্যথা আমার পনেরই আগস্টেব উজ্জল আনন্দকে স্তান করে দেয়? এ বেদনা ফাঁকিস্থানেব দুঃখে, শাসকগোষ্ঠীর ফাঁকি, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বৃহত্তর ফাঁকি, সরকারের ফাঁকি নাগরিকদের প্রতি, নাগরিকদের ফাঁকি দেশের প্রতি, আমি ফাঁকি দিয়েছি আপনাকে, আপনি আমাকে, আমরা প্রত্যেকে মিলে আত্মপ্রতারণাব স্তপাকীর্ণ মূঢ়তায় যে ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে বসেছি, শিব গডার ছলনায় যে বানর গডছি চল্লিশ কোটি স্বাধীন নরনারীর উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতায়, তাতে মহাভাবতের শূন্য বেদীতে অচিরে আমরা বসাব এক ফাঁকিস্থানকে, এই আশঙ্কায় আমি প্রকম্পিত।

আজও আমি অখণ্ড ভারতেব স্বপ্ন দেখি। আয়ুব খাঁ ভীত হবার প্রয়োজন নেই, আমার আজকের স্বপ্ন যে অখণ্ড ভারতেব, তা পাকিস্তানকে স্বীকার করেই, পাকিস্তান তো দেশের মাটিকে খণ্ডিত করেছে মাত্র—আর ফাঁকিস্থান আজ খণ্ডিত করেছে, খণ্ড খণ্ড করতে বসেছে, আমাদের মুনকে। বাংলা আর আসাম, উত্তর আর দক্ষিণ, হিন্দু আব শিখ, কলহের পব কলহ, ক্ষুদ্রতাব পর ক্ষুদ্রতা, ঘণার পর ঘণা, পুঞ্জীভূত হতে চলেছে দেশের চেয়ে বড় যে মানুষ সেই মানুষেব অন্তরে। এই বিদ্বেষেব বিষ থেকে দেশকে বাঁচাবে কে? কে স্থাপন করবে অখণ্ড ভারতের ভিত্তিপ্ৰস্তর? সে কি ১৫ই আগস্ট ১৯৬১?

তার উত্তর নির্ভর করছে অত্র এক প্রশ্নের উত্তরেব উপরে: পনেরই আগস্টেব মথার্থ পূর্বসূরী কে—মথই আগস্ট, না, ষোলই আগস্ট?

এক

আজ ১৫ই আগস্ট ১৯৬১। ভারতেব স্বাধীনতা দিবস।

সাংবাদিকতার রীতি অল্পযায়ী এ দিনে আমরা গত এক বৎসরের ঘটনাপঞ্জী উল্লেখে সালতামামি করতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমাদের ঝুটি নেই। স্বাধীনতার স্ববর্ণবার্ষিকী শুধু নয়, স্বাধীনতাই এ দেশে ক্রমশঃ একটা শুষ্ক রীতিমাত্রে পর্যবসিত হতে চলেছে, এ রীতিমত আশঙ্কার কথা।

তা ছাড়া সালতামামি উপযুক্ত লগ্ন নববর্ষ কিংবা বর্ষশেষ। স্বাধীনতালাভ একটি বর্ষেব ঘটনা নয়, তা একটি যুগেব পরিপূর্তি, বর্ষে বর্ষে আমরা যখন স্বাধীনতা-উৎসব পালন করি তখন সত্ত্ব-অতীত একটি বর্ষকে মাত্র স্ববর্ণ করব কেন, তখন তো স্মরণ করব সেই সমগ্র যুগকে, উপলব্ধি করার চেষ্টা কবব সেই একটি দিনেব মধ্যে মূর্ত কয়েক শতাব্দীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের ব্যর্থতা-চরিতার্থতাকে।

তবুও সাম্প্রতিক কতগুলি ঘটনার উল্লেখ এই প্রবন্ধে অনিবার্য, সেগুলি সাম্প্রতিক বলে নয়, স্বাধীনতা-দিবসের মধ্যে মূর্ত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে সেই ঘটনা-

সমূহ অঙ্গাঙ্গিজড়িত বলে, পনেরই আগস্টেব ব্যর্থতা-সার্থকতার প্রশ্নে তাদের আলোচনা অনস্বীকার্য বলে।

১৯৪৭-এব স্বাধীনতালাভের পর চৌদ্দ বছর কেটে গিয়েছে। এই চতুর্দশ বর্ষে আমরা একখানি সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করেছি; অতঃপর সে সংবিধানের অসংখ্য সংশোধন করেছি, বাজন্ত-আধিপত্যেব নামস্ত-রাজ্য-গুলিকে ভারতেব সঙ্গে একীভূত করেছি, দুটি সাধাবণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান কবে আবার তৃতীয় নির্বাচনেব দাবিদেবে দাঁড়িয়েছি, দুটি পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা সম্পূর্ণ কবে তৃতীয়ের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছি, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন কবে কেউ কেউ জনাস্তিকে তাব জন্ত অনুশোচনা কবছি, এবং আরও অনেক বৃহৎ-ক্ষুদ্র ভাল-মন্দ সামান্য-অসামান্য কর্তব্য গ্রহণ কবেছি, পালন কবেছি, কখনও সার্থকাম কখনও বা ব্যর্থ হয়েছি। এইসব ঘটনাস্তুপেব মধ্য দিয়ে কী করে আমরা খুঁজে বার করব স্বাধীন ভারত চৌদ্দ বছরে অগ্রগতির কত ধাপ পদক্ষেপ করেছে?

সংখ্যাতথ্য দিয়ে? জাতীয় আয় শতকরা কতভাগ বাড়ল, ইম্পাত-উৎপাদন কতলক্ষ টনের কোঠায় পৌছল, মাথাপিছু শিক্ষাখাতে কত টাকা বাজেট ববান্দ করা হল, সেই সব গাণিতিক জাজুবিজ্ঞার অবতারণায় আমরা অভিরুচি নেই। কেন না মানুষেব সার্থকতা, মানুষের পরিতৃপ্তি, মানুষেব মনুষ্যত্বলাভে ক্রমিক অগ্রগতি—এগুলো গণিতের সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এবং স্বাধীনতার প্রয়োজন, স্বাধীনতােব লক্ষ্য তো সেই সংখ্যায় অপ্রকাশ্য মানবীয় সার্থকতাবোধ। তাই পবিসংখ্যানের অবতারণা আমরা কবব না।

অথচ গণতন্ত্রে সংখ্যার চেয়ে বড় কী আছে? সংখ্যাগুরুব আধিপত্য, সংখ্যালঘুব রক্ষাকবচ, এই তো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাব মূলনীতি, গণতন্ত্র নম সংখ্যা-তন্ত্র। সংখ্যাব মধ্যে অসংখ্য হৃদয়কে বিধৃত করার প্রয়াস।

এক এক সময়ে আমরা মনে হয় গণতন্ত্রেব এই সংখ্যা-তান্ত্রিক রূপ বড় স্থূল, বড় কদর্ঘ, বড় মনুষ্যত্ববিবোধী। মবরুলে, জনতােব মনস্তত্ত্বে, যে স্থূলতা, জন-গণতন্ত্রে যেন তাবই বৃহত্ত্ব প্রকাশ। হয়তো এ সিনিক মনোবৃত্তি,

তবু এ চিন্তাকে আমি অন্তর থেকে নির্বাসিত করতে পারি না।

বেলা দশটাব ডালহৌসি স্কোয়ারগামী বাসে যেদিন আমাকে উঠতে হয়, সেদিন প্রায়শঃ আমাব একটি দৃশ্য চোখে পড়ে : একটি গ্রাম্য মানুষ, একটি অবাঙালী মহিলা কিংবা একটি অশক্ত বৃদ্ধ বাস থেকে পথিমধ্যে নামতে চাইছেন আমহার্ট স্ট্রীটে অথবা বউবাজারে, ঠাসাঠাসি অফিসযাত্রীদের ভিড় ঠেলে তাঁর পক্ষে বাসেব দবজা পর্যন্ত এগনো অসম্ভব যদি না সহযাত্রীবা ওবই মধ্যে একটু পথ কবে দেন, অবতরণেচ্ছুক কাতর অতুলনয় উপহাসেব অট্টহাস্তে ডুবিয়ে দিয়ে যাত্রীরা বাসেব ঘণ্টা বাজাতে থাকেন নিববচ্ছিন্ন দ্রুতছন্দে, এবং বাস ছুটে চলে অফিস পাড়ার উপকণ্ঠে না পৌছনো পর্যন্ত অবিশ্রাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই সর্বসম্মতিক্রমে বিবতিহীন বাসেব ঠাসাঠাসি ভিডেব মধ্যে একদিন আমার দুর্ঘটি হয়েছিল সহযাত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবাব। সেদিনও আমি সিনিক বলে উপেক্ষিত ও উপহসিত হয়েছিলাম। এবং বুঝেছিলাম জনতাব মনস্তত্ত্ব আর গণতন্ত্রের মূলনীতি একই : সংখ্যাব আধিপত্য।

আমাব সেই সকল সহযাত্রী পৃথক পৃথক মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই স্বাভাবিক, সহজ, মানবীয় অল্পভূতিতে সংবেদনশীল। কিন্তু তারাই যখন জনতাব মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছে তখন অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক, স্থূল। এবং তাদের মপক্ষে কতকগুলি যুক্তিও প্রস্তুত আছে— অযৌক্তিকতাব পক্ষে যুক্তি। যথা : এক, অফিস টাইম বাদ দিয়ে বাসে ওঠে না কেন এ লোকগুলো? দুই, এইটুকু বাস্তব পায়ে হেঁটে এলেই তো ভাল হত। তিন, একদিন উচিত শিক্ষা না পেলে এদের জ্ঞানোদয় হবে না। চার, গভর্ণমেন্ট বাস এত কম কবেছে কেন, ভিড় কমানোব ব্যবস্থা কবলেই তো গোল চুকে যায়। পাঁচ, অফিসেব বাস এত বার কবে থামলে চলবে কী কবে? ইত্যাদি।

যে লোকটি, সংখ্যালঘু একটি মাত্র ব্যক্তি, এদের এতগুলি শানিত যুক্তিবে লক্ষ্যস্থল, তাব পক্ষে হয়তো বা এক-আধটি বক্তব্য থাকতেও পারে, কিন্তু দ্রুতধাবমান বাসে সে কথ্য শোনাবাব বা ভাববার মত অবসর থাকে না কারও।

আমাম রাজ্যে সম্প্রতি গণতন্ত্রের যে আকৃতি আমাে চোখে পড়েছে তার সঙ্গে উপবিউক্ত উদাহরণের ি অত্যন্ত স্পষ্ট। অসমীযাদেব মপক্ষে সেখানে অনেকগু যুক্তি ছিল। বাংলা ভাষাভাষীদের তারা একদিন উর্ শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানোদয় কবাতে চেয়েছিল, অসমী ভাষাব প্রাথমিক জ্ঞান অন্ততঃ। গভর্ণমেন্ট এত চাকবির ব্যবস্থা রেখেছে কেন, বেকাবী কমানোব উপ কবলেই তো গোল চুকে যায়, এ যুক্তিও আসামে ধর্ হয়েছিল। আসামের চাকবিতে এত বেশী বাঙা থাকলে চলবে কী করে, এই অকাট্য স্লোগান ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে জনতাব উন্নততা ঘণ্টা বাজাতে বাজা ছুটেছিল নিববচ্ছিন্ন দ্রুতছন্দে। এবং বাষ্ট্রযানের চালক বউবাজারে যেমন—তেমনই আদামে—সংখ্যাগুরুর ও ঐকতান উপেক্ষা কবে সাহসী হয় নি কঠিন পায়ে রে চেপে ধবার।

আর বাংলাদেশের ক্ষীণ প্রতিবাদ সারা ভাবে পাণবিক অট্টহাস্তে উপেক্ষিত উপহসিত হয়েছিল— ি আমার প্রতিবাদেব মত। বাঙালীও সিনিক আং বিভূষিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে, জাং পার্লামেন্টের বিতর্কে।

পনেবই আগস্টের সঙ্গে কলঙ্কিত ওই পবিচ্ছেদ সম্পর্ক কী, সমুদ্রত এই প্রশ্ন আমি প্রত্যাশা কং পাঠকের কাছে, আজকেব পুণ্যতিথিতে সেই প প্রশ্নেব পুনরুল্লেখ কেন?

আমাবও সেই প্রশ্ন। পনেবই আগস্টের সঙ্গে আস গণতন্ত্রেব কুটিল মুখব্যাদানেব সম্পর্ক কি শুধু আকস্মিক না, ভাবতের স্বাধীনতালাভেব মধ্যেই লুকনো ছিল বিষবৃক্ষের অণুপ্রমান উর্বর বীজ?

দুই

স্বাধীনতা কাব জন্ম, এ প্রশ্নেব উত্তরে মতভেদে অবকাশ নেই, স্বাধীনতা মানুষের জন্ম।

কিন্তু কোন্ মানুষেব জন্ম? Of the people, the people, for the people—কিন্তু people-

সঠিক তাৎপর্য কী? ব্যক্তি, না, জনতা? ব্যক্তি চিহ্নে স্বীকার করতেই হবে—people অর্থ আব যা-ই হোক, ব্যক্তি নয়, ব্যক্তিব সামূহিক রূপ। আমাব, আপনাব, তাঁব, প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তিব গ সা.ও হচ্ছে people নামক আইডিয়াটি। সেইজন্যই people-এব মধ্যে আমি আছি অথচ সম্পূর্ণ নেই, আছে আমার public প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ যে-পরিচয়ে আপনাব সঙ্গে আমাব, আমার সঙ্গে তাঁব, প্রকাবভেদ নেই—সেই পবিচয়টুকু। সে পবিচয়ে মনীষী ও তস্কব সমান, মুড়ি-মিছবি একদর। জওহরলাল নেহরু এবং জহব গান্ধুলী দুয়েবই মূল্য গণতন্ত্রেব বাজাবে অভিন্ন, পাঁচ বছরে একটি ভোট।

মবরুলে এক প্রকার people প্রকট, উন্নত জনতায অংশগ্রহণকাবী মানুষগুলিব যে সাধারণ পবিচয় প্রকাশিত, সে-পবিচয়ে মানুষের মনেব অন্ধকাব অবণ্যবাসী পাশবিকতার সাধারণ্য। সেই মানুষদের অধিকাংশেবই হয়তো পশুদের চাইতে মনুষ্যত্বেব ভাগ বেশি, তবুও—যেহেতু পশুত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্ব জটিল—তাদের পাবম্পরিক চিত্তবৃত্তিব গ সা.ও সেখানে পশুদের, তাদের মনুষ্যত্ব, পৃথক পৃথক বর্ণবৈচিত্র্যশীল পৃথক ধবনের মানবীয় চিত্তবৃত্তি, সেখানে সাধারণ কোন পটভূমি খুঁজে পায় নি।

আমি বলছি না যে ব্যক্তিব সামূহিক পরিচয় সর্বদা মবরুলের জনতা হবে। মবরুলেব people যেমন পাশবিকতাব সাধারণ ভিত্তিব উপব ঐক্যবদ্ধ, তেমনি আরও অজস্র বিভিন্ন প্রকারের people-এর রূপ দৃশ্যমান, সৈন্তদল যুযুৎসার সাধারণ ভিত্তিতে, বেলা দশটাব বাস-যাত্রীকুল কেরানীবৃত্তিব সাধারণ ভিত্তিতে, ১৯৬০-৬১-ব অসমীয়া জাতি হীনমন্ত্রতা কমপ্লেক্সেব সাধারণ ভিত্তিতে। এগুলি সাধারণ্যের এক দিক।

অপবদিকে উচ্চতব বৃত্তিব সামান্য-ভিত্তিব উদাহরণও বিরল নয়। দেশপ্রেম, আদর্শবাদ, ধর্মপ্রাণতা, এই সকল চিত্তবৃত্তিব পটভূমিতে অগণিত মানুষেব ঐক্য গড়ে উঠতে পাবে, সৃষ্টি হতে পাবে মহত্তব প্রকৃতির people, হতে পাবে নয়, হয়ে থাকে।

পনেরই আগস্ট তারিখে আমবা যে স্বাধীনতার বার্ষিকী উদ্‌যাপন কবছি, সে-স্বাধীনতা কোন people-এর

জন্ত, সেই people-এব সাধারণ ভিত্তি কী, এই প্রশ্নের উত্তব দিতে আমাদেব তাই প্রস্তুত হতে হবে। পনেরই আগস্টের তাৎপর্য বোঝাবাব জন্ত সে প্রস্তুতি।

স্বাধীনতার জন্ত আমবা অর্ধশতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম কবেছি। নিববচ্ছিন্ন সেই সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তিব সাধ্যাত্ত ছিল না। সে সংগ্রাম কবেছিল একটি সংহত people, অথবা সেই সংগ্রামের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল সংগ্রামী মানুষেব সামূহিক রূপটি যার নাম ভারতীয় জাতি—Indian People স্বাধীনতা সংগ্রামেব একটিব পব একটি অন্ধ অভিনীত হয়েছে, আর নাটমঞ্চে জনতাব আযতন হয়েছে ক্ষীত থেকে ক্ষীততব, প্রথম অঙ্কের নীবব দর্শক দ্বিতীয় অঙ্কে উত্তেজিত হয়েছে, উদ্বোধিত হয়েছে, অভিনেতা জনতাব কণ্ঠনির্গত মূল সুরেব সঙ্গে তার হৃদয় এক সুরে অল্পবণিত হয়ে উঠেছে, তার চিত্তবৃত্তিব ঐক্যবোধে সংগ্রাম-নাট্য তাব কাছে আরও স্পষ্ট, আরও তাৎপর্যময়, আবও সত্য, আবও অনতিক্রম্য অমোঘ মনে হয়েছে, তৃতীয় অঙ্কে তাব বিবর্তন ঘটেছে, প্রেক্ষাগৃহ থেকে নাটমঞ্চে।

বন্দেমাতবম্-মন্ত্রমুখব ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন কার্জনেব সেটল্ড ফ্যাক্টকে আনুসেটল্ড কবল। ১৯২০-র খিলাফত আন্দোলন ও অংহিস অসহযোগ এক নূতন সেনাপতি, এক নূতন অস্ত্র, স্বাধীনতায়ুদ্ধের এক অশ্রুতপূর্ব ষ্ট্র্যাটেজি আবিষ্কার কবল : গান্ধী, অংহিসা, অসহযোগ। সেই সেনাপতি, অস্ত্র ও ষ্ট্র্যাটেজি স্বাধীনতা সংগ্রামের নবদিগন্ত খুলে দিল ১৯৩০-এব আইন-অমান্য আন্দোলনে। যাত্রা কবো যাত্রা কবো যাত্রীদল, এসেছে আদেশ, বন্দরের কাল হোল শেষ।

নূতন উষার স্বর্ণদাব খুলিতে বিলম্ব কত আর? অর্ধশত অথচ সংহত ভাবত আন্দোলনের তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত। এমনি কবে একদিন প্রবল শঙ্খনির্ঘোষে ফেনশীর্ষ ভীমতরঙ্গ নিয়ে ১৯৪২ এসে দাঁড়াল আমাদেব সামনে—তাব বক্তব্যে জটিলতা নেই, ইজমের কূটতর্কের কোন অবকাশ নেই সে মহাভৈরবের, শুধু একটি তাব সঙ্কল্প—কবেঙ্গে ইয়া মরেন্দে। শুধু একটি তাব দাবি—কুইট ইণ্ডিয়া, ইংরেজ ভাবত ছাডো।

অহিংসা, না, সশস্ত্র অভ্যুত্থান? গণতন্ত্র, না, সমাজবাদ? কমনওয়েলথ, না, রিপাবলিক? তুচ্ছ, তুচ্ছ, একান্ত অকিঞ্চিৎকর সে সব প্রশ্ন, কোটি কঠেব ক্রুদ্ধ ক্ষুদ্র অটল ভয়ঙ্কর একটি শুধু ঘোষণা—করেছে ইয়া মবেদে। হিমালয় থেকে কচ্ছাকুমারী, কোয়েটা থেকে ডিগবয় সেই এক মঙ্গলকণ্ঠে একাকার হয়ে গেল—কুইট ইণ্ডিয়া, ইংরেজ ভারত ছাডো।

আইন-অমান্য, অসহযোগ, সশস্ত্রবিপ্লব, সকল মত ও সকল পথ এক হয়ে মিশে গেল সেই এক মহা-আন্দোলনে, নয়ই আগস্ট যার আশ্চর্য বিস্ফোবণ। সেই প্রথম সমগ্র ভারতের মানুষ মহৎ একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি খুঁজে পেল, যার উপরে দাঁড়িয়ে আমরা সকলে মুক্তার অমৃত আশ্বাদন করার মহাভাগ্যে কৃতার্থ বোধ করলাম। 'ইণ্ডিয়ান পীপল'-এর মহত্তম প্রকাশ আগস্ট-আন্দোলনের অবিস্মরণীয় অধ্যায়ে।

সেদিন আমরা সকলে স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। স্বাধীনতার অর্থ কী, কেন স্বাধীনতা, কেমন স্বাধীনতা—এ সব প্রশ্নের মীমাংসা কি হয়ে গিয়েছিল আমাদের? না, তা হয় নি, কিন্তু আশ্চর্য, সে প্রশ্ন ওঠেই নি আমাদের মনে। যেমন ওঙ্কার-ধ্বনি অর্থনিবপেক্ষ, অর্থাতীত এক গভীরতা নিয়ে আসে হিন্দুর অন্তরে, তেমনি আমরা আগস্ট আন্দোলনের মঘদানে একত্র হয়েছিলাম 'স্বাধীনতা'-নামক একটি সংজ্ঞাতীত আকাজক্ষার গভীর ক্ষুধায়, স্বাধীনতার অর্থ দিয়ে কী হবে, স্বাধীনতাব পরমার্থ যে আমাদের চিত্তকে সম্মোহিত কবেছে, সঙ্কল্পকে করেছে অটল, হৃদয়কে মহৎ।

মহৎ। হ্যাঁ, ক্ষুদ্র আমরা, সাধারণ আমরা, খণ্ড খণ্ড স্বার্থের বেড়া দিয়ে যেবা নিতান্তই সঙ্কীর্ণ আমরা সেদিন মহদেব আবির্ভাব অনুভব করেছিলাম প্রত্যেকের নীরব অন্তরে। মহত্বের সাধাবণ ভিড় উপবে চল্লিশ কোটির জনতা হয়ে উঠেছিল মহৎ ভারতীয় জাতি।

কিন্তু আমাদের নীচতাকে, মূঢ় স্বার্থবোধকে, ক্ষুদ্রতাকে, হিংস্রতাকে, পশুত্বকে আমরা কি সম্পূর্ণ জয় করেছিলাম সেই মহত্বের মহদত্তে? আমাদের জাতিকে যে বিরাটত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে

প্রত্যেকটি খণ্ড অন্তরকেও কি সেই মহত্বত্বের ভুদে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম সকলে? সখেদে বলতে হবে, না।

মবন্ধনের জনতা যেমন সামূহিকরূপে পাশবিক, অথচ সে-জনতার সদৃশ মানুষদেব ব্যক্তিগত পরিচয়ে যেমন মানবিকতা তবুও 'সমুপস্থিত', স্বাধীনতা-আন্দোলনের জনতাতেও তেমনি সামগ্রিক পরিচয় মহৎ মহত্বত্বের, কিন্তু ব্যক্তিগত অন্তরের হীনতা তথাপি নয় অল্পপস্থিত।

না হলে ৪২-এর নয়ই আগস্ট যে জাতিকে দেখলাম মৃত্যুভীর্ণ, তার পরও যে জাতির স্বধন্য ঋতিতে ভেসে এল নেতাজীর অমৃতবার্তা, আজাদহিন্দের বীরগাথা; পুণ্যতাল্লিশে আবার যে-জাতির মৃত্তিকা বীর তরুণের পুণ্য শোণিতে অভিষিক্ত হল, সেখানে, সেই জাতির জাগ্রত চোখেব সামনে, কী করে আসতে পারল ১৯৪৬-এর যোলই আগস্ট।

বালিয়া-সাতারা-আজমগড়-মেদিনীপুরের পট-পরিবর্তন হল কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারে। নয়ই আগস্টের উদ্ভবসুখী যোলই আগস্ট। বিশ্বকর্মার পুত্র ছুছুন্দর নয়, শিবের অল্পচব ভূতপ্রেত। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক, অপ্ৰত্যাশিত, ব্যতিক্রম মনে হলেও মূলতঃ অস্বাভাবিক নয়, আশ্চর্য, তবু যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, জনতা জনতা-ই; মানুষ নয়।

ভিন্ন

অতঃপর ইংরেজ সতাই ভারত ছেড়েছিল। ১৯৪৭ সনের পনেরই আগস্ট সূর্য উঠেছিল এক নতুন ভারতবর্ষে, স্বাধীন ভারতবর্ষে।

সে সূর্যোদয় শুধু হয়েছিল সামান্য কয়েক মুহূর্ত বিলম্বে, সেদিন ভারতবর্ষে সূর্যাস্ত হয়েছিল পূর্ব দিনের চাইতে কয়েক মিনিট আগে। কাবণ চোদ্দই আগস্টেব ভাবত আব পনেরই আগস্টের ভাবত এক নয়, সূর্যদেব সেদিন উদয়াচলে দাঁড়িয়ে প্রথম রশ্মিপাত করলেন যে ভূখণ্ডে তাব নাম ভাবত নয়, পাকিস্তান, অস্তাচলে গিয়েও যে ভূমি স্পর্শ করলেন তাও পাকিস্তান, ভারত নয়। কিন্তু সে কথা থাক, আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা!

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রত্যুষে জনতাই উল্লাসধ্বনি করল। স্বাধীন ভারতের জনতা। নয়ই আগস্টের কুশীলব যে জনতা, যোলই আগস্টও সেই জনতাই, এবং পনেরই আগস্টও জনতারই উৎসবলগ্ন।

এখনই গল্পের মত মনে হয় সে কাহিনী। কলকাতার পথে পথে যে জনতা আগের দিনও পশুর চেয়ে হিংস্র ছিল, পনেরই আগস্ট তারাই ত্রিবর্ণ পতাকাব নয়নাভিব্যাস স্নিগ্ধতায় চোখকে স্নান কবাল, জয় হিন্দ মন্ত্রে শুচি করল অস্তবকে, ভাই বলে আলিঙ্গন করল তাকে যাব কণ্ঠে অজ্ঞাঘাত কবা তার জীবনের ব্রত বলে জেনেছিল একদিন আগেও।

সেদিন বুঝতে পারি নি, অতীতের দিকে তাকিয়ে আজ না ভেবে পারছি না, জনতার এই হৃদয় পরিবর্তন যতখানি আশার কথা, ততখানিই আশঙ্ক্যবও। ছুরি ফেলে মালা হাতে তুলতে যার একদিন লাগে না, মালা ফেলে আবার ছুরি হাতে তুলতে তার কদিন লাগবে?

নয়ই আগস্টের জনতা বা তাব কোন এক ভগ্নাংশও যদি যোলই আগস্টের জনতায় পরিণত হতে পাবে, তবে পনেরই আগস্টের জনতা বা তার একটি অংশ কেনই বা গোরেখবে যোলই আগস্টের পুনরভিনয় কবতে পাবে না চোঠা, পাঁচই, ছয়ই জুলাই উনিশশো ষাটে?

কী হুবহু পুনরভিনয়! সেই পুরাতন দৃশ্যপট, সেই পুরাতন ভূমিকা, সেই পুরাতন হত্যা, অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, শুধু কুশীলবের তালিকায় অবসরগ্রস্ত অভিনেতার বদলে নতুন অভিনেতার নাম, স্ববাবদীর বদলে চালিহা কিংবা ফখরুদ্দিন, দোহার বদলে বন্দিয়াব সার্কল ইন্সপেক্টার, কামরূপের ডি এস পি, তমালপুরের দারোগা, যাদের নাম মেহবোজ কমিশনের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে, কলঙ্কিত যে নামগুলির উল্লেখ আমি আপনাদের পীড়িত করব না। আর কলকাতার জনতার বদলে গোরেখরের জনতা, কামরূপের জনতা।

চার

কিন্তু কেন, কেন, কেন?

সেদিন ধর্মের নামে, এদিন ভাষার নামে, আবার আগামীকাল হয়তো জাত, সম্প্রদায়, পরিধেয় বা গাজবর্ণের

হাস্যকব কোন ব্যাপদেশে বেদনাকর এই একই নাটকের অভিনয়-পুনরভিনয় যদি চিরকাল চলতেই থাকে, তবে বছরের বাকী তিনশো চৌষটি দিনের সঙ্গে পনেরই আগস্টের প্রভেদ কিসের? যোলই আগস্ট থেকে পনেরই আগস্টের পবিত্রতনের গভীরতা তবে কতটুকু?

তবু আমরা সে পরিবর্তন অমূল্য করেছিলাম ১৯৪৭-এ প্রথম ১৫ই আগস্ট। স্বাধীনতার ভাষাতীত তাৎপর্য, অর্থাতীত পরমার্থ আমরা উপলব্ধি করেছিলাম অন্ততঃ কয়েকদিন, অন্ততঃ একদিন। কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজিনী, যারা ১৯০৫ দেখে নি, ১৯২০ দেখে নি, জানে নি ১৯৩০ ও ১৯৪২-কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব অবিশ্মরণীয় সম্মোহনে, এমন কি ১৯৪৭-এর পরম লগ্ন যারা স্পর্শ করে নি হৃদয় দিয়ে—পাখি যেমন করে প্রত্যুষকে স্পর্শ করে বেদমন্ত্রের মত উদাত্ত কাকলিতে—তাবা? তারা জনতার কোন্‌ মূর্তি ব সঙ্গে পরিচিত হবে? শুধুই জব্বলপুরের জনতা, গোরেখবের জনতা, শিলচর-হাইলাকান্দির জনতা, জনতার এই পশুমূর্তিই তো তারা চিনবে। পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মাবাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ নিয়ে যে বিদ্যা-হিমাচল-যমুনা-গঙ্গা-উচ্ছল-জলধি-তরঙ্গা ভারতবর্ষ তার প্রাণহীন শুষ্ক মন্ত্র উচ্চারণে স্বীকৃত, তাব ধ্যানমূর্তি তো জাগবে না তার নিরাদর্শ অন্তরে, পঞ্জাব বলতেই পঞ্জাবী স্রবা ও মাষ্টার তারা সিংকে বুঝবে সে, ভগৎ সিংকে নয়, দ্রাবিড় বলতে তার মনে পড়বে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা-কাটাগমের নাইকারকে, বঙ্গ বলতে ছন্নছাড়া এক নতুন ইছদী ভবঘুরে জাতিকে—পূব বাংলায় একবার, আসামে পুনবার যে পরাস্ত-বিতাড়িত-মৃত।

আর জনতার উপর যদি সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তবে কিসের আশাস খুঁজবে সে বছরের পর বছর পনেরই আগস্টের রীতিমাত্রে পর্যবসিত গুপ্তধারায়? কোন্‌ প্রতিশ্রুতির কলধ্বনি সে শুনতে পাবে গণতন্ত্রের অগ্রগতির পদশব্দে? গণতন্ত্র যে মানুষের জন্ত নয়, সে যে জনতার জন্ত।

পাঁচ

বোগ-জরা-মৃত্যু-দর্শনে ব্যথিতচিত্ত সিদ্ধার্থ একদিন পরম সত্যের অন্বেষণে পথে নেমেছিলেন। সৌম্য এক

সন্ন্যাসীর শাস্ত্র অবয়বে তিনি আসলে যার দর্শন লাভ করেছিলেন, তা হল বিশ্বাস।

বিশ্বাস মানুষের শেষ অবলম্বন। যত কিছু বৃহৎ ক্ষতি আমি কল্পনা করতে পারি, রোগ-শোক-ব্যর্থতা-মৃত্যু, বিশ্বাসের অবক্ষয়ের সঙ্গে তারা কেউ তুলনীয় নয়। বিশ্বাসের মৃত্যুই তো ঈশ্বরের মৃত্যু।

সেই বিশ্বাসের অবক্ষয় ভারতবর্ষের জনচিত্তে আজ স্ফুটিত দেখছি। আজকের পনেরই আগস্ট যদি সে অবক্ষয়ের সূচনা বোধ কবতে পাবে তবেই সে সার্থক। নতুবা ব্যর্থ এই উৎসব, আলোক, পতাকার সমাবোধ।

একদিন বিশ্বাসের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। স্বপ্নশ্রুত সেই বন্দব অভিমুখে আমরা যাত্রা কবেছিলাম তরঙ্গসঙ্কুল "আন্দোলন-সমুদ্রে, মৃত্যুরে না কবি শঙ্কা। আজকে সে যাত্রা ইতিহাস হয়ে গেছে, আজ প্রয়োজন নতন বন্দব, নতন লক্ষ্য, নতন বিশ্বাসের।

নতন ঈশ্বরের আবিষ্কার চাই আজ।

স্বপ্নদ্রষ্টা নেতৃবর্গ, আমাদের সৌভাগ্য, অনেকেই আজও আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্ভুদ্ধ মহৎ জনতাব সৃষ্টিতে তাঁদের কৃতিত্ব ছিল। স্বপ্ন-দ্রষ্টা নন, স্বপ্নদর্শয়িতা তাঁরা,—আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, লক্ষ্য দেখিয়েছিলেন, দেখিয়েছিলেন বিশ্বাসের উজ্জ্বল দিগন্ত।

কিন্তু অনেকেই তাঁরা আজ বিজ্ঞাস্ত। আমাদেরই মত তাঁদেরও অনেকের স্বপ্ন ভেঙে গেছে, লক্ষ্য গিয়েছে নিশ্চিহ্ন হয়ে, ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের বিলীময়মান বিশ্বাস-স্বর্গে। জনতার সামনে কী কবে বিশ্বাসের ধ্বজা তুলে ধরবেন তাঁরা?

অপব কয়েকজন আছেন, এখনও আছেন, যাঁরা এখনও দেহে-মনে জীবন্ত, কর্মঠ। তাঁদের বিশ্বাস-স্বর্গ এখনও অনধিকৃত, অনাগত। তাঁরা এখনও স্বপ্ন দেখেন নতুন ভারতের, মহাভারতের। হয়তো, হয়তো এখনও তাঁরা পারেন স্বপ্ন দেখাতে, নতুন বন্দব অভিমুখে আবাব অভিযান আরম্ভ করার তর্কাতীত আদেশ দিতে।

কিন্তু কোথায় সে আদেশ? কোথায় সেই আকাশবাণী : যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রীদল। 'নতন সৃষ্টি' উপকূলে নতন বিজয়-ধ্বজা তুলে নতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি। কোথায় সে কাণ্ডাবী; যে বলতে পাবে, বন্দবের কাল হল শেষ।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে অর্থনীতির জটিল গুচ্ছত্ব আছে প্রচুর। তাব সমাপ্তিতে প্রতিশ্রুতি আছে, সে প্রতিশ্রুতি স্বাধীনতাব চেয়ে স্পষ্টতর, বিশদতর। বস্তুতঃ আমাদের কৈশোরে যে-বিশ্বাস আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদাত্ত কণ্ঠেব অমোঘ আহ্বান জানিয়েছিল, তাব চেয়ে এই পঞ্চবার্ষিকী যোজনাসমূহ ও সেই যোজনার লক্ষ্যস্থলের উপব বিশ্বাস সম্ভবতঃ বেশী যুক্তিসিদ্ধ, অধিক প্রমাণসাধ্য।

এ সবই সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে নিষ্ঠুর এই সত্যকে কে অস্বীকার করবে যে আজকের লক্ষ্যস্থল আজকের কিশোরকে কবতে পারে নি প্রতিজ্ঞায উন্মাদ, আবেগে কম্পমান, যেমন কবেছিল আমাদের স্বাধীনতার উন্মাদনা আমাদের কৈশোরে?

আমাব স্বজলা-শ্রামলা মাযের চেয়ে মা পূব বাংলাকে হাবানোর বেদনা আমি ভুলে যেতে পাবতাম ওই ত্রিবর্ণ-বঞ্জিত পতাকার দিকে তাকিয়ে, উন্মুখর আনন্দে নামতে পাবতাম জন-গণ-মন-সঙ্গীতমন্ত্রিত উৎসব-ভূমিতে, যদি আমি আমাব বিলীময়মান বিশ্বাসকে আবিষ্কার কবতে পারতাম আজকের কিশোবেব শ্রামল চক্ষে বিদ্যুৎ-দীপ্ত নতন গণত্বের উজ্জ্বল্যে। আমাব নিহত ঈশ্বরকে যদি খুঁজে পেতাম কোথাও, জবলপুবে গোবেশবে হাইলাকান্দিতে আমি যাকে হত্যা করেছি অবিশ্বাসের ছবিকাষাতে।

হয়তো পাব একদিন। বিশ্বাস গিয়েছে, আশা তো রয়েছে জীবিত। সেই-ই হয়তো আবাব উজ্জীবিত করবে বিশ্বাসকে। মহাভারতের স্বপ্নকে।

আব যদি তা না হয়, যতদিন তা না হয়, জনতায় আমি আস্থাবান হব না। মহৎ বিশ্বাসের ভিত্তি না হলে পনেরই আগস্টেব তীর্থযাত্রী জনতাও তো ষোলই আগস্টের জনতাবই পবিত্রিত রূপ মাত্র।

প্রাণপাত্রে

শ্রীদেবত্রয় রোজ

প্রথম পর্ব

বসন্তবিভ্রম

শীতকাল। বেলা দুপুরের পর। দক্ষিণ কলকাতার একটি নির্জন গলিপথে গীচের ওপর চৌকো একফালি বোদ ঝকঝক কবছে, আর সেই রৌদ্রথণ্ডে একঝাঁক চড়ুই নেচেছুঁড়ে বেড়াচ্ছে।

এখান থেকে অনেক কোণ দূরে গ্রামের মাঠে, চৌকো কোনও সরষেব ক্ষেতে, পডন্ত এই সূর্যেব আলো গায়ে বাসন্তী রঙ মেখে বসন্তেব ধ্যানে বসেছে, আর সেই আলোয় একঝাঁক উদ্ভাস্ত ফড়িং সঁতার কাটছে।

পথেব গীচের ওপর চৌকো চোখে পিচ্ছিল হাসির মত হলুদ রঙেব এই বাসন্তী-ইঙ্গিত মারা পরিবেশের সাধাবণ অর্ধটাকে দিয়েছে বদলে। এই হাসিটা একটা তিনতলা বিরাট অট্টালিকার গায়ে অল্পাষ্ট প্রতিবিম্বের ঠিকরে পড়েছে।

এই প্রাণদটোর নীচের তলায় গ্যারেজে একটা ডাক্তারখানা। তার চৌকো মুখ পথের দিকে হাঁ করে আছে। মুখের তলাটা একটা চতুষ্কোণ মেঝে। গ্রাস করে আছে একটা মাঝারি আকারের চৌকো টেবিল, তার একপাশে একটা অবলুঙ আলমারিতে ওষুধপত্র আর একধারে আর একটা ছোট আলমারিতে কয়েকখানা বাধানো বই, চিকিৎসাব কিছু সরঞ্জাম। ওষুধের

আলমারিব গা ঘেঁষে একপ্রস্থ ঘন বেগুনি রঙের পর্দা। পর্দাব পিছনে আর একটা গছের। এই গছবটায় ডিস্পেনসিং রুম, ওষুধ তৈরির ঘর।

সমীর-ডাক্তার এই গ্যারেজ-ডিস্পেনসারিতে মাত্র কয়েক মাস হল বসেছেন। পাস করেছেন দীর্ঘ আট বছর আগে। পাস করার পর খেয়ালের বশে আর্টস্কুলে ভবতি হয়েছিলেন ছবি আঁকা শিখতে। খেয়ালের আর এক ধাক্কা তেমনই ছবি আঁকতে আঁকতে গান শিখতে গিয়েছিলেন। গান শিখতে শিখতে সাহিত্যের প্রেমে পড়েছিলেন। এমনই ভাবে খুশীর ভেলায় ভাসতে ভাসতে ঠেকলেন এই গ্যারেজ-ডাক্তারখানায়। এই বিরাট তিমি-অট্টালিকার গ্রামে।

গাট বেগুনি বঙের পর্দার ওদিকে যে একটুকবো স্থানে বসে সমীর-ডাক্তার ওষুধ তৈরি করেন সেই শূণ্যটা মূল বাড়ির ওপরে ওঠাব সিঁড়ির নীচেই। এখানে একটা উঁচু টুলে বসে সমীর-ডাক্তার যখন ওষুধ তৈরি করেন তখন তাঁব কান তাঁর নিজের অজান্তসারে মাথার ওপব সিঁড়িব পথে চলমান পদশব্দগুলির ছন্দেব হিসেব করে। কয়েকজনের পাবেব শব্দ তিনি এমনভাবে চিনেছেন যে ডাক্তারখানার মাঝখানে টেবিলে বসে বসেও বলে দিতে পাবেন কখন কে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল আর কখন কেই-বা নামল।

শেষ ঘোবনের কান, সে কী প্রখর!

আজ বিকেলে সময়েই এই ছোট্টকুতে সিঁড়ি বেয়ে কোন ওঠানামা নেই। রোগীপত্তরও নেই। তাই ডাক্তার হাতে একখানা বই আলগোছে ধক্কর, গভীর অভিনিবেশে পথের ওই চতুষ্কোণ রৌদ্রখণ্ডেব ওপব চডুইদের নাচ দেখছেন।

আপাততঃ মনেব কোন কাজ না থাকায় তাঁর ভাবনাব স্রোত নিজেব খেয়ালখুশিতে সঙ্গতি-অসঙ্গতিব চড়াই-উতবাই উপেক্ষা করে বয়ে চলেছে। কখনও সঙ্গতি ডিঙিয়ে চলেছে, আবাব কখনও অসঙ্গতির খাদে জল-প্রপাতের মত পড়ে বিচিত্র ভাবেব ইন্দ্রধনু বচনা কবছে।

চিন্তা চলেছে রোগীপত্তরের অভাবপ্রসঙ্গ থেকে দেশজোড়া পয়সার ছুভিক্ষের প্রসঙ্গে, পয়সার প্রসঙ্গ থেকে প্রোটিনেব প্রসঙ্গে। পয়সা ও প্রোটিন এ দুটো কথা তাঁব চিন্তায় সব সময় জট পাকিয়ে থাকে। তাব কারণও আছে।

ডাক্তার ভাবছেন চডুইগুলো জান্তব প্রোটিনের এক একটা ছোট্ট কাবখানা।...

কয়েক বছব পূর্বেকার কথা। ফাইনাল ডাক্তারী পরীক্ষার পূর্বে একসঙ্গে অনেকগুলো টাকার দরকার হল। দেশ থেকে মা বিষয় বিক্রি কবে যে টাকা পাঠিয়েছিলেন তাতে সম্পূর্ণ প্রয়োজন মিটল না। তখন তিনি প্রতি সপ্তাহে নিজের রক্ত বেচে অর্থসংগ্রহ করতে আরম্ভ করে দিলেন। কয়েক সপ্তাহ নিজের দেহকে বক্ত তৈবির ফ্যাক্টরিতে পরিণত করতে হয়েছিল। বক্ত দেওয়াব পূর্বে প্রচুর পরিমাণে মাংস খেতে হত। মাংস খাটি প্রোটিন বলে দেহ তার প্রায় সবটাই আত্মসাৎ কবতে পারে। যে পয়সা খরচ হত মাংসের জন্তু তার চেয়ে বেশী বোজগার হত রক্ত বেচে। সেই থেকে পয়সা আব প্রোটিন এ দুটো কথা তাঁর চিন্তায় জট পাকিয়ে আছে। আর এই জটটার চতুর্দিকে কী একটা অপরাধবোধের দ্বন্দ্ব আভাস একধরনের অস্বস্তির মণ্ডল তৈরি করে আছে। নিজের দেহ নিয়ে এ এক অদ্ভুত এক্সপেরিমেণ্ট।

দেহটা কি কৃষিক্ষেত্রের মত? তাই যদি হয় তো দেহের কৃষিক্ষেত্রে মনরূপ বিভ্রম কেন? নিজের ভেতরে স্মৃতির মণ্ডল থেকে চোখ দুটোকে বাইরে ঘুরিয়ে চেয়ে দেখলেন, চডুইগুলো কখন উড়ে গেছে! আলোর ক্ষেত্রটা

পথ থেকে সবে ওপাশের একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ঘুমুচ্ছিল। উঠে দাঁড়িয়েছে। চলে যাবাব সময় হয়েছে কি না।

সিঁড়িব ওপর অতিপরিচিত একজোড়া চটিব শব্দ শোনা গেল। বছদিন ওষুধ তৈরি করতে কবতে ওই পা-জোড়াব আওয়াজে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন।

চডুইয়ের মত চঞ্চল পা দুটো। কিংবা প্রথম বসন্তের আলোয় বিভ্রান্ত ফড়িংয়েব মত। পায়েব শব্দেও কথা বলে, এই পা দুটির অধিকারীকে তিনি তাঁব স্মৃতিেব পথ বেয়ে যেতে-আসতে দেখেছেন। কিন্তু ওই বাঙাময় পা দুটি কোনদিন তাঁর এই ডিসপেনসারিব চতুরঙ্গের কানা ডিঙিয়ে ভেতবে আসে নি।

বুঝি, তাঁব নিজের চেহাবায় কোন মানা দেখে থাকবে। বয়স তো অনেক হল। দিনরাত দহনক্রিয়া চলেছে এই দেহরূপ প্রোটিনেব ফ্যাক্টরিতে, মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটছে এর। ঘোবন থেকে জরাব দিকে। পথের ওপর কিশৌবীদের দেখলে বুকের ভেতবে টনটন করে ওঠে। বোধ হয় এমনই টনটন করে ওঠে নদীর চরার বুক মূল স্রোতেব ওপর নৌকোর দিকে চেয়ে। কিন্তু কৌই বা কববেন।

লোকমুখে শুনেছেন এই তরুণী তাঁরই মত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তাঁর মাথার ওপব সিঁড়ি বেয়ে এতদিন এতাবাব যাতায়াত করেছে তরুণী, কিন্তু কোনদিনই তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি কখনও।

তবু তার পদশব্দ বুঝি ডাক্তাবেব শিরাব মধ্যে রক্তে প্রতিধ্বনিত হয়। এ বুঝি শেষ ঘোবনের বসন্তবিভ্রম। ডাক্তারেব রক্ত বুঝি একটু বেশী তরল। বারবার নিকাশ কবে দেওয়ার জন্তুই বুঝি তাঁর রক্তের ঘনত্ব গেছে কমে। তাই ওই পদশব্দের আঘাতে ছোট ছোট টেউ ওঠে তাঁর রক্তে।

প্রোটিনেব কী অদ্ভুত ব্যবহার! ভাবেন ডাক্তার। ডাক্তার শুনলেন সিঁড়ি দিয়ে তরুণী খুব দ্রুত নেমে আসছে।

যদি হঠাৎ পড়ে যেত! আঘাত পেত! তা হলে আমি ছুটে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ওকে সুস্থ কবে তুলতাম! চডুইয়ের মত চঞ্চল কী সব যা-তা লঘুচিন্তা!

তরুণী দ্রুতপদে প্রায় টলতে টলতে ডাক্তারখানায় ঢুকে, ডাক্তারের স্বমুখের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। ডাক্তারের বিস্ময়বিমূঢ় চোখ তরুণীর সারা অবয়বের ওপর ভেসে গেল।

বাইবে গাট ধোঁয়াব মত নেমেছে সন্ধ্যা। যন্ত্রচালিতের মত বাঁ হাতে চেয়ারের পিছনে স্থিচটা টিপে একটা প্রথর আলো জ্বলে দিলেন। ডাক্তার প্রথর আলো ভালবাসেন।

সিঁথিব ওপর চুলগুলোর আগা গুঁড়িয়ে গেছে। তেলের বদলে অতৃপ্তি দিয়ে মেজে মেজে মসৃণ হয়েছে ওর চুল।

চুলগুলোও তো একপ্রকার প্রোটিন! ডাক্তার হাসেন।

তরুণী সোজা হয়ে বসে ক্রুদ্ধভঙ্গীতে বলে, হাসছেন? রোগী দেখে হাসতে হয়?

নিজের অজ্ঞাতে ডাক্তারের ঠোঁট থেকে পিছলে বেবিয়ে গেল : আপনার মনের রোগ।

তরুণী শিরদাঁড়া সোজা করে শব্দচূড় শাপের মত মাথাটা তুলে সোজা ডাক্তারের চোখের দিকে চেয়ে বিজ্ঞপের ভঙ্গীতে বলল, মনের রোগ?

ডাক্তার এবার স্পষ্ট দেখলেন, কপালের ওপর সূক্ষ্ম বেখার জাল—সূক্ষ্ম বাজনার তারের মত। ঠোঁট ছোটো পাতলা, পরস্পরে দৃঢ়বদ্ধ। মুখটা যেন বন্ধ কোটো। সোনার মরচের মত চোখের কোলে নীলাভ বলয়। সুন্দর। তবে কোথায় কিছুর অভাব রয়েছে যেন। কোন গ্যাঙের সিক্রিশন কমে গেছে নাকি? শৈশবে পুষ্টির অভাব? সৌন্দর্য কি কোনকিছুর অভাব? তরুণীর চাউনিরও কোন লক্ষ্য নেই যেন।

ডাক্তার নিমেষের জগু তাঁর নিজের লক্ষ্যও হারিয়ে ফেললেন।

সহসা তাঁর মনে হল, তরুণীর চোখের স্বমুখে তাঁর নিজের খুলিটাও যেন স্বচ্ছ! তাব ওধাবে দেওয়ালটাও স্বচ্ছ। তাবও ওধারে সাদার্ন অ্যাভিভ্যু পেরিয়ে লেক, তার পর ষোণজঙ্গল এঁদোপুকুর পেরিয়ে সম্ভবত তেপান্তরের রুক্ষ রুক্ষ মাঠ। সেখানে ব্যঙ্গব্যঙ্গময়ী পাখি!

ডাক্তার আবার হাসেন।

আগেব মতই চেয়ে থাকে তরুণী।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন পদার্থ পরমাণু দিয়ে গড়া একটা ত্রিভল জাল মাত্র—যেন একটুকবো আকাশ ছাতি-কণিকায় পূর্ণ। আকাশের মতই তিনি স্বচ্ছ নাকি?

এবার হেসে ডাক্তার নিজেব ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন। মনটা তাঁর অদ্ভুত চালে চলে—অসংলগ্ন পদক্ষেপে। সমীচীন থেকে অসমীচীনে। গোছাল চিন্তা থেকে হ-ষ-ব-ব-ল-ব বাজ্যে। বুঝি, মনেব ভাঙন! অগ্ন সময় নিজেব চিন্তার চাল দেখে নিজেই কোঁতুক অহুভব করতেন। আজ এই মুহূর্তে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন নিজের ওপর। গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ, আপনার রোগ মানসিক।

কিছু না শুনেই বোঁগ চিনে ফেললেন?

শোনার দরকার হবে না, দেখেই বুঝেছি। রোগ নিশ্চয়ই, তা না হলে আজ অকস্মাৎ তুমি আমার কাছে আসবে কেন? তোমার মনের কোথাও আঘাত বেজেছে, তাই না সেই আঘাতকারীর ওপর রাগ কবে তুমি এসেছ আমার কাছে? আমি কি মন বুঝি না মনে কর? কলহীন ডাক্তার যে দিব্যরাত্রি অহুক্ষণ নিজের মনটাকে উলটেপালটে দেখছে।

প্রকাশ্যে আর একবার বললেন, দেখেই বুঝেছি।

তরুণী বিস্মিত হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আশ্চর্য। এত কাছের এই স্বপুরুষ মানুষটার আজ পর্যন্ত কিছুই জানে নি সে! বয়স বোধ হয় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। তাপসেবই মত। মাঝারি দৈর্ঘ্য, নীলভঙ্গের মত। টানাটানা চোখ, তার নিজেরই মত। সুচলো নাক, বরেনের মত। মাথার স্বমুখে টাক, কারও মত নয়। তবু, মনে হল এই মানুষটি তারই জগতের।

মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বলে, আমার বুকের বাঁ ধারটা যেন অসাড় হয়ে গেছে। আমি বাঁ চোখে দেখছি না। যা দেখছি তাবই বাঁ দিকের বেডটা মনে হচ্ছে বাঁকা বাঁকা। বাঁ পায়ে ভব দিয়ে দাঁড়াতে পারছি নে আমি।

ওকে আঘাত দেবার জন্তেই যেন ডাক্তারের মনটা বিজ্ঞপপ্রবণ হয়ে উঠল। ভেসে উঠল একটা কথা ঠোঁটের কিনারায়। বলল, বামারোগ।

এবার তরুণী ক্রোধের বেগে চেয়াব ছেড়ে সরল হয়ে উঠে দাঁড়াল : এই বিত্তে নিয়ে ডাক্তারী কবেন আপনি ?

বলে দ্রুত বেবিয় গেল। সিঁড়ির ওপর ক্রোধভাঙিত পায়ে শব্দ শোনা গেল।

ডাক্তারের মনে হল তাঁর মনের মধ্যে কী একটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

রক্তের মধ্যে বোধ হয় একটা ছোট্ট টেউ উঠেছিল। সেই টেউটা বৃকের মধ্যে কোথাও ঘা খেয়ে ফিরে এসে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে শারী দেহেব শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ল। প্রোটিনেব বাঁধেব ওপর প্রোটিনের টেউ পড়ল আছড়ে।

ডাক্তার নিজের অজান্তসারে মূহু হাসলেন।

ডিসপেন্সারিবে দেওয়ালে বড় ঘড়িটায় পাঁচটা বাজল। বাইরে চেয়ে দেখেন রাস্তাব সব আলো জলে গেছে।

নিজের হাতের বইটা খুলে একখানা চিত্রের দিকে চেয়ে দেখলেন। ছবিটা মোনালিশার। বইখানা ইতালীয় চিত্রকর ডাভিকির।

* * *

এমন নিবীহ বিকেলটাকে বিজ্ঞপ করে যে সন্ধ্যায় বাদল নামবে তা কেউ অহুমান করতে পাবে নি।

বাদলপোকা বর্ষাকালেরই, কিন্তু আজ এই শীতের সন্ধ্যায় তাদেরই গোটাকয়েক কোনো গোপন গর্ত থেকে বেরিয়ে শীলভদ্রবাবুর তেতলার ঘরের লেখার টেবিলে অবগুষ্ঠিত আলোর নীচে পাখা ঝাপটে পাখা খসিয়ে দেবার আনন্দে মেতে উঠল।

এই বাড়ির নীচে গ্যারেজ-ডাক্তারখানাতেও তাদেরই একদল ডানা ঝেড়ে ফেলে ডাক্তারের টেবিলের ওপর চলে বেড়াচ্ছিল।

ডাক্তার দেখছিলেন পাখা ঝাপটাত্তে ঝাপটাত্তে একটার ডানা গেল খসে। পতঙ্গ পরিণত হল কীটে। ডানা ছুটোর কল্যাণে তার যে অবাধ ওড়ার অধিকার আর সেই ওড়ার সঙ্গে অনির্দিষ্ট কোন গন্তব্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ছিল তা শেষ হয়ে গেল। বৃষ্টি পাখার সঙ্গে এই পোকাগুলোর কোন শিরার যোগাযোগ ছিল না।

তীব্র মনশ্চক্ষের সম্মুখে একটা স্বপ্ন অমনি পাখা ঝাপটাত্তে ঝাপটাত্তে একটা নিভাস্ত মামুলী ধারণায় পরিণত হল। রক্তে দোলা লাগানো তরুণী স্থান্ধিতা

উপহাসের পাত্র একটি নিউরসিসের রোগীতে পর্যবসিত হল তাঁর বিচারে। অমনি চোখ পড়ল ঘড়িতে। রাত্রি প্রায় আটটা। তখন বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। বৃষ্টির ধারার ওপর পড়ছে বিজলীর আলো। যেন সূক্ষ্ম সোনার চিরুণী দিয়ে রাত্রি বর্ষার ছড়ানো চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। ডাক্তার তাড়াতাড়ি গোছগাছ সেরে সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন। দু ধাবে ভাঁজ করা লোহার পাতে বোনা দবজাব পাল্লা দুটো টেনে ছড়িয়ে দিয়ে বন্ধ করে ভাল দিবে চাবিটা পকেটে ফেলে ভিজতে ভিজতে ঝিকিঝিকি ভিজ্জে পীচেব ওপর দিয়ে নিজের বাড়িব দিকে চলে গেলেন। মনটা বুঝি তাঁর পড়ে রইল লোহার জালের ওধারে বন্দীর মত।

* * *

পোকাগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শীলভদ্র লিখে চলেছেন। সেই ঘরের আব একটা টেবিলে গোলাপী অবগুষ্ঠনে ঢাকা আর একটা আলোব সম্মুখে স্থান্ধিতা একটা ঘুরন্ত চেয়াবে বসে এদিক-ওদিক ঈষৎ ঘুরে ঘুরে একখানা বই পড়াব চেষ্টা করছে।

চেষ্টা করছে বৃথাই। বারবার লিখনরত মাহুঘটির ওপর দিয়ে দৃষ্টি ভেসে যাচ্ছে।

বয়স পঞ্চাশ পেবিযে গেছে। গত আশ্বিনে পড়েছেন একান্নয়। তাঁর সেই জন্মদিনে একান্ন বকম ফুল দিয়ে মালা তৈরি কবে দিয়েছিল স্থান্ধিতা। মুখটা অনেকটা স্থান্ধিতার বাবাব মুখের মত গোল। পুষ্ট নাকটা অহুন্নত, মাংসল। চিবুকটা চওড়া। স্থান্ধিতার বাবার মুখেব থেকে তাঁর মুখেব ডফাতটা শুধু ঠোঁটের গঠনে।

তাঁর ঠোঁট দুটো মাংসল, পুরু, উপরেরটা মুখের ভিতরদিকে ঈষৎ দোমড়ানো, নীচেরটা বাইরের দিকে ওলটানো। দেহের অত্যাগ্ন অংশের চেয়ে অর্থময় তাঁর হাত দুটো। ওঁব হাতেব পিঠের ওপর ভাঙ্গা ইঞ্জিতটা স্থান্ধিতার কোনদিনই ভাল লাগে না। বেঁটে বেঁটে মাংসল আঙুল-বসানো হাত দুটো বিশ্রী।

লেখা শেষ কবে শীলভদ্র কলমটা নামিয়ে রাখলেন। আলোর নীচে নিজের আরক্তিম হাতটার দিকে তাঁর নিজেরও দৃষ্টি পড়ল।

স্থান্ধিতাব মনে হল এ হাত ছিনিয়ে নেওয়ার হাত, রুট

হাত, নিষ্ঠুর হাত, খাসরুদ্ধ করে দেওয়ার হাত! কিন্তু শীলভদ্র সদাচারী, সন্মার্গ-গামী। ঠুর জীবনসাধনার সঙ্গে ঠুর হাতেব চেহারার মিল নেই। কিংবা হয়তো স্থস্থিতারই ভুল।

না, ভুল কেন হবে? উনি কাছে থাকলে মনে হয় আবহাওয়াটা কেমন যেন ভারী হয়ে ওঠে, যেন খাসকষ্ট হয়। অনেকবার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেছে স্থস্থিতা, একখানা বিশাল লোমশ হাত আকাশ ফুঁড়ে নেমে এসে তাকে ধরতে আসছে। শুধু একখানা বিচ্ছিন্ন নিষ্ঠুর হাত! যেন এঁরই একখানা হাত, বিশেষ কোন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে একশোণ্ড বড় আকাবে দেখা। অথচ শীলভদ্রের সঙ্গে স্থস্থিতার সম্পর্ক প্রায় পিতাপুত্রীর সম্পর্ক!

শীলভদ্র স্থস্থিতাকে লক্ষ্য করে বললেন, কী লিখলাম, শুনবে স্থস্থিতা?

পড়ুন, শুনছি।—বলে স্থস্থিতা হাতের বইখানা টেবিলে রেখে দিল।

* * *

পথ চলতে চলতে সমীচ-ডাক্তার ভিজ়ে গেছেন। হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি লেগেছে। দাঁতে দাঁত টিপে এই কাঁপুনিটাকে দমন করতে পারছেন না। হঠাৎ কল্লমাব রাশ ছেড়ে দিলেন। মনে ভাবলেন, একদল বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কুমেরু অভিযানে বেবিয়েছেন। সেখানকার অন্ধকারও যেন হিমে কাতর হয়ে মুছিত হয়ে পড়ে রয়েছে জমাট সমুদ্রের ওপর। মুছিত অন্ধকার হিমে পাণ্ডুর হয়ে গেছে। অথচ জানে না তার ঠিক নীচেই বিপুল মহাদেশের গর্ভে কত সোনা, কত মহামূল্য ধাতু। অন্ধকার মুছিত কিন্তু মানুষ সেই সোনা আর মহামূল্য ধাতুর সন্ধানে বেরিয়েছে। তিনিও বেরিয়েছেন তাদের সঙ্গে। হিমকাতর হলে চলবে কেন? তাঁর পায়ে তলায় পৃথিবীর বাজরাজেশ্বরীর ঐশ্বর্য। সহসা চেয়ে দেখেন একটি গেটের ওপব লতা-টাকা আঁচের মাথায একটি আলো। আর তার নীচে একরাশ ঘোর লাল রঙের ফুল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কাগজের ফুল। কিন্তু না, কাগজের নয়। এত বৃষ্টির মধ্যেও হয়ে পড়ে নি, ছিঁড়ে যায় নি। লাল পাপড়ির ওপর বৃষ্টির বিন্দু আনন্দাশ্রুর মত টলমল করছে। ইঁা, পায়ের তলায়

মাটির ভেতর সোনার খনিই রয়েছে! একটু মনোযোগ দিয়ে চেয়ে দেখলেন এটা একটা ফিল্ম স্টুডিওর গেট। আবার চলতে শুরু করলেন। বাড়ির পথে যেতে যেতে অগ্রমনস্কতায বিপথে এসে গেছেন। মন হয়তো অজ্ঞাতসাবে তাঁকে বাড়ি ফিরতে দিচ্ছে না। পথে পথে ঘুরিয়ে মারছে। কিন্তু এত জায়গা থাকতে তাঁদের স্টুডিওর সম্মুখে এনে ফেলল কেন?

* * *

স্থস্থিতা কিছুই শোনে নি শীলভদ্রের লেখার। অগ্রমনস্ক হয়ে ভাবছিল ডাক্তারের কথা। তাব নিজের রোগের কথা।

ভাবতে ভাবতে দেখছিল শীলভদ্রের দক্ষিণ হাতের তর্জনী যেন কথাপ্রবাহের তাল নির্দেশ করতে করতে উঠছে নামছে। অগ্রমনস্ক হয়ে চেয়েছিল সেই তর্জনীটার দিকে। সহসা মনে হল শীলভদ্রের ওই তর্জনীটা তাঁর দেহ থেকে পৃথক ও স্বাধীন। তাব আগায় যে ঝকঝকে নখটা সেটা তার মাথা! ছোট ছোট ছোটো হাত, আর, আরও ছোট ছোট ছোটো পা থাকলেই হত! দেখল, পাখা-খসে-মাওয়া একটা বাদলাপোকা শীলভদ্রের ওই তর্জনীটাব ওপর উঠে পড়েছে। তর্জনীটা নিজেকে স্প্রিংয়ের মত একবার গুটিয়ে নিয়ে একঝটকায় আবার সোজা হয়ে গেল। পোকাটা ছিটকে পড়ে গেল। স্থস্থিতাব মনে হল পোকাটা বুঝি তাব গায়েই পড়েছে। অক্ষুট চিংকাব করে গায়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

স্থস্থিতার এই আপাতকারণহীন ব্যবহারে বিভ্রান্ত হয়ে শীলভদ্র তাব দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এই একমুহূর্তের অবসরে একরাশ চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে একটা ঘূর্ণির মত বয়ে গেল।

যে-লেখাটা তিনি স্থস্থিতাকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন তার বিষয়বস্তু—আদর্শ বিবাহ। কোন্ পুরুষ কোন্ নারীর আর কোন্ নারী কোন্ পুরুষের যোগ্য এবং কেন যোগ্য তাব একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যান। এই শুনেই কি স্থস্থিতার দেহে মনে এমন জুগুপ্সা জাগল? তিনি মনে মনে স্থস্থিতার জঘ্র বর ঠিক করেছেন। কে সে তা আভাসে জেনেওছেন। তবে কি স্থস্থিতা তাপসকে চায় না?

কাকে চায়? হয়তো কাউকেই চায় না তাঁব স্নেহের পরিমণ্ডলটা ছেড়ে।

সিঁড়ি থেকে কার উচ্চকণ্ঠেব হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

শীলভদ্র মনের চিন্তার প্রবাহকে মনের একপাশে ঠেলে রেখে ঠোঁটে মুছুহাসি ছুটিয়ে দিয়ে বললেন, তাপস এসেছে, ওকে সঙ্গে করে এই ঘবে নিয়ে এস স্থস্থিতা।

স্থস্থিতা আচ্ছন্ন মত বেরিয়ে গেল।

শীলভদ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে গায়ের ওপর পুরু চারদরটার মধ্যে হাত দুটোকে ঢেকে ধীরপদে ঘরের মেঝেয় পায়চারি আরম্ভ করলেন। তাপস ঢোকান আগে বোধ হয় একটা পোজ নেবার চেষ্টা কবলেন। স্থস্থিতা আজকাল থেকে থেকে প্রায়ই চমকে ওঠে, তাঁর কোন একটা কথায় কিংবা তাঁর কোন একটা সামান্য শারীরিক প্রচেষ্টায়। এ রকম ঘটছে তাঁর জন্মদিনেব সেই ক্ষণটি থেকে যখন একদম ফুলের মালাটা তিনি নিজের গলা থেকে খুলে স্থস্থিতাকে পরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁব মনের মধ্যে জ্ঞাতসারে এই ব্যবহারের কোন কারণই ছিল না। সভাসমিতিতে এ বকম মালা পেলেই তিনি ফিরিয়ে দেন। যে মালা দেয় তার গলাতেই ফিরিয়ে দেন।

ঘন বেগুনি বড়ের ভারী পর্দাটা ঠেলে স্থস্থিতাব পিছু পিছু আরও তিনজন ঘরে প্রবেশ করল। দুজন তরুণ আর একজন কিশোরী।

প্রথমজন তাপস। পোশাকে নিখুঁত ইউরোপীয়—পদক্ষেপেও। আত্মপ্রত্যয় যে তাব চরিত্রের মৌলিক ধর্ম সেটা পাছে কাবও বুঝতে ভুল হয় সেইজন্তেই বুঝি সে তার পদক্ষেপেও বিশেষভাবে সেধেছে। গায়ের রঙ কালো হলেও সম্বন্ধে মাজিত। দেহের স্বাস্থ্য সাধারণ বাঙালী যুবকের তুলনায় অনেক অস্পষ্ট। ছোট ছোট ছাঁটা চুল। চোখের ওপর একটা সদাশাপিত ভাব। বাকী যে দুজন ঢুকল তারা যেন তাপসের অতিস্পষ্টতায় অস্পষ্ট রয়ে গেল।

তাপস ঘরে ঢুকে রেনকোটটা খুলে সরিয়ে বাথার জন্তে কাব হাতে দেবে ভাবছে এমন সময় স্থস্থিতা তাব হাত থেকে সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। রেনকোটের ভারমূল্য

হয়ে উদ্ধত দেহটা ঈষৎ একটু বাঁকিয়ে শীলভদ্রকে লক্ষ্য করে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলল, দুটি আনকোরা নতুন ট্যালেন্ট আমি আবিষ্কার করেছি জ্যাঠামশাই।

বলেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। হাসিটাকে ধীবে ধীবে নিম্নগ্রামে নামিয়ে এনে সঙ্গী দুজনকে লক্ষ্য কবে বলল, বস বস, তোমরা বস, ওই ডিভানটায় বস। তোমরা দুজনেই দেখছি সমান লাজুক। লজ্জা না হয় আভার ভূষণ হতে পাবে কিন্তু তা তোমার পক্ষে যে শুধু লজ্জাই আমেদ।

স্থস্থিতা ঘরে ফিরে এসে তাপসের দিকে লক্ষ্য করে স্বাদহীন স্বরে বলল, বেনকোটটা শুকনোই ছিল।

তাপস মুহূর্তে বলল, ওহো, আমি যে গাড়িতে এসেছি। এখানে রাখলেই হত। তোমাকে আবার বইতে হল।

স্থস্থিতা কিছু না বলে চেয়ে রইল মুহূর্তের জন্তে তাপসের মুখের দিকে। নিজের ওপর ঘৃণা হল এই ভেবে যে সে যন্ত্রচালিতের মত ওর হাত থেকে ভ্রাতৃত্বের মত রেনকোটটা সবিয়ে নিয়ে গেছে। এটা তার নিজের শ্রেণীর ধর্ম। সে নিয়মধ্যবিশ্লেষ মেয়ে আর তাপস উচ্চবিত্তের উত্তরাধিকারী। ও আদেশ করতে না করতেই, ওব আদেশ বাঙম্ব হবার আগেই, ওব নীচের শ্রেণীর লোক সেই অহুচ্চাবিত আদেশ পালন করবে যন্ত্রচালিতের মত। নিজের ওপর ঘৃণা হল স্থস্থিতাব।

স্থস্থিতার নজর পড়ল তাপসের সঙ্গী দুজনেব দিকে। একঝলক দৃষ্টিতেই বুঝল ওরা তার নিজের শ্রেণীরই। তবু ওদের দেখে তার মন প্রসন্ন হল না। একজন আটত্রিশ বছরের তরুণ আর একজন সতরো-আঠারো বছরের কিশোরী। তাপস পবিচয় কবিয়ে দিল : আমেদ আর আভা। আমার নতুন ফিল্মেব স্ববকাব আর নাযিকা।

স্থস্থিতা দেখল আমেদ সাধারণ বাঙালী তরুণের মত। স্বাস্থ্য ভঙ্গীতে সাধারণ বাঙালী তরুণের মত অধঃঅস্পষ্ট। একমাত্র স্পষ্ট তার চোখ। দীঘির ওপর কুয়াশার কথা মনে কবিয়ে দেয়। আভাও অস্পষ্ট। স্পষ্ট শুধু তার নবোন্মেষিত ঘোঁবন। দেহের কিনারে কিনারে সজ-ছুটে-ওঠা ঘোঁবনের ছাপটা স্পষ্ট। স্থস্থিতা

ভাবল এই ভৌলটা থাকবে না। তবু কিরকম একটা মিষ্টি মিষ্টি চেহারা। হযতো সুন্দরী হতে পারত। কিন্তু দেহটা নানা স্থানে অস্পষ্ট। শীলভদ্র ঈশ্বর মাথা হুইয়ে সহাস্ত্রে নতুন আগন্তুককে স্বাগতম জানালেন। সকলকে বসতে বললেন ইঙ্গিতে।

* * *

সমীর-ভাতার ঘুরতে ঘুরতে নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেলেন। বাইরের দরজায় পাশেই একটা ল্যাম্পপোস্ট। যদিও রুটি থেমেছে তবু এখনও এই ল্যাম্পপোস্টেব গা বেয়ে জল ঝবছে—ফোঁটা ফোঁটা অশ্রব মত। তার মাথায় ওপর আলোটা অবসেসন নিউরটিকের মাথায় বিদ্ধ একমাত্র ধারণার মত জলজল করছে। জনশূন্য পথ। সমীর-ভাতাবের মনে পড়ে গেল, তাঁব ঘবটাও শূন্য। পিছনে শূন্য, সামনে শূন্য। তবু তালাটা খুলে ঘরে ঢুকতে হল। ঘরের শূন্যটা তবু ভাল। এটা একটা সীমিত শূন্য। এখানে জীবন না থাকে অজীব বস্তুও আছে গোটােকয়েক। আছে টেবিলল্যাম্প, আছে শয্যাটা, আছে এক-আলমারি বই, একটা ঘড়িও আছে। ঘরে ঢুকেই তাঁব টিকটিক শব্দটা কানে এল। ঘড়িটা অন্ততঃ জেগে আছে তাঁর জন্তে। সকালে দম দিতে ভুলে গিয়েছিলেন তবু সেটা জেগে আছে। মনের ভারটার এই ভাবনায যেন কিছুটা লাঘব হল।

* * *

শীলভদ্র তাপসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নতুন ফিল্মেব বিষয়বস্তু কী?

তাপস আমতা আমতা করে বলতে আরম্ভ করল, গ্রামের—

হ্যাঁ, গ্রামের।—আমের উত্তরটা জুগিয়ে দেয়, মাহুষেব মানসিক আস্থের জন্তে তাকে থাকতে হবে প্রকৃতির কাছে কাছে; প্রকৃতির থেকে দূবে সরে গেলেই তার মনে ঘৃণ ধরবে। ঝাড়েব বাঁশে ঘৃণ ধরে না। ঘৃণ ধরে মাচার বাঁশে।

তাপস সোজাসে বলে ওঠে, ঠিক ওটাই আমার ফিল্মের বাণী।

স্বস্তিতা এতক্ষণ তাপসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। হঠাৎ বলে ওঠে, এ আমি বিশ্বাস কবি না।

সকলেই বিস্মিত হয়ে স্বস্তিতার দিকে চেয়ে দেখে। যেন এ কথা কেউই ওর কাছ থেকে আশা করে নি। সবচেয়ে বিস্মিত হলেন শীলভদ্র। স্বস্তিতা দিনে দিনে রুক্ষ থেকে রুক্ষতর হয়ে উঠছে। যেন অদৃশ্য কোনকিছুর সঙ্গে লড়াই করছে ভেতবে ভেতরে। কী সেই অদৃশ্য তা শীলভদ্র কিছুতেই বুঝে উঠতে পাবছেন না। কিংবা বুঝেও বুঝছেন না।

তাপস জিজ্ঞাসা করে, বিশ্বাস কর না কেন?

স্বস্তিতা উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেয়, মাছ যতটা জলের বশ, গাছ যতটা হাওয়ায় বশ, মাহুষ প্রকৃতির ততটা বশ নয়।

উদ্ভিগতিতে তাপসের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে শ্লেষ : তোমাব এই কথা কাব কথার প্রতিধ্বনি বলে মনে হচ্ছে।

শীলভদ্র মুহূর্তে অসুভব করলেন তর্কের পাখায় ভর করে দুজনের বিদ্বেষের দুটো বাজপাখি শূন্যে এখনি পরস্পরকে আক্রমণ করবে।

প্রকাশ্যে বললেন, স্বস্তিতা সত্য দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাস করেছে। শেখা মতগুলো এখনও আত্মস্থ করার সময় যায় নি।—একমুহূর্ত থেমে মৃদু হেসে মিষ্টি করে বললেন, চৈত্রের বাবা পাতারা ততক্ষণ ওড়াওড়ি করে যতক্ষণ না বর্ষণ নামে। ওর জীবনে যখন বর্ষণ নামবে—

স্বস্তিতাব স্মরণে এল ঠিক এই কথাটাই সে সেদিন কোথাও পড়েছে। তার মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে সেই স্মৃতিটার পিছু ধাওয়া করল। স্বস্তিতা হঠাৎ চূপ করে গেল। জীবনে যখন বর্ষণ নামবে—এই কয়েকটা কথা বর্ষারাজে কোন একটা গাছের মাথার কালো স্তূপের মধ্যে জোনাকির মত ঝিকঝিক করতে লাগল। চিনতে পারছে না কোথায় কোন্ গাছ এটা।

আমের এই দুর্বোধ্য কলহের পরিসমাপ্তির সূত্র পেয়ে স্নান হেসে বলল, আমার কথাগুলো বেসুর হয়ে স্বস্তিতা দেবীব কানে বেজেছিল। এব জন্তে আমি দুঃখিত। আমি তো ভাষার কারুশিল্পী নই। স্বর নিয়ে আমাব কাববার। স্বর ছাড়া অশ্রুকিছুর মধ্যে আমি সঙ্গতি খুঁজে পাই নে।

শীলভদ্র এই বিদ্যুৎদস্ত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে পড়ার

স্বযোগ পেয়ে আশ্বস্ত হযে স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন, ঠিক, ঠিক আমেদ, আজ সন্ধ্যাটা তোমার স্বপ্ন শুনেই কাটুক। এমন বাদলসন্ধ্যায় ওই দেখ, ওই কোণে পিয়ানো।

তাপসও যেন হাঁফ ছেড়ে বলল, ও পিয়ানোটারও একটা ইতিহাস আছে, না জ্যাঠামশাই?

শীলভদ্র বললেন, হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে উদ্ধাস্ত এক ইহুদী এই কলকাতায় কোথাও এতে বাজনা শেখাত। কোথায় পেয়েছিল কে জানে! সে একদিন এটা আমাকে অতি সামান্য মূল্যে বিক্রি করে কোথায় উধাও হয়ে যায়। এসব জিনিসের মূল্য আমি আগে জানতেন না। যখন পরে জানলেম এম মূল্য অনেক তখন সেই বুড়ো ইহুদীকে খুঁজে বের করে সমস্ত দাম মিটিয়ে দেব ভেবেছিলেম। কিন্তু আর তাকে খুঁজে পাই নি।

আমেদ পিয়ানোর কাছে গিয়ে শুভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। এটা তারই গুরুব যন্ত্র। এই যন্ত্রেই সে ইউরোপীয় সংগীত শিখেছে। সংগীতের গুরু সংগীতের মতই নৈশবন্ধের বাজ্যে মিলিয়ে গেছেন। তাকে পিয়ানোর কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাপস বলল, কী হল আমেদ? যন্ত্রটা বাজে, না, ভাঙা?

আমেদ ক্রমশঃ চোখ মুছে বলল, না, বাজাবার আগে মনে মনে প্রণাম করে নিচ্ছি। এ যন্ত্রটার মধ্যে ঐশ্বরিক স্বর আছে।

তাপস হো হো করে হেসে উঠে বলল, ও, তাই বল।

আমেদ যন্ত্রচালিতের মত যন্ত্রের নামনে টুলটার ওপর বসল।

আভা ভিভানেব ওপর সোজা হয়ে বসল।

সুস্মিতা আভার অলক্ষ্যে তার পাশে বসে কাঁধে হাত রেখে বলল, খুব স্বর ভালবাস না?

হ্যাঁ, কেন, আপনি ভালবাসেন না?

যে স্বর মানুষকে পৃথিবী থেকে আলাদা করে দেয় সেই স্বরকে আমি ভয় করি। যেমন সমুদ্রে নামতে ভয় পাই।

আভা সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেলে, সমুদ্র দেখলে আমি তাকে খুব ভালবাসতাম। খুব ভালবাসতাম।

আমেদ যে যন্ত্রটার অবতারণা করল সেই স্বরটাকে

সে একদিন হঠাৎ সূর্যাস্তের সময় তার গ্রামের নদীতীরের শ্রমজীবীর নৈশবন্ধের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

মুমুর গ্রাম। অর্ধেকের ওপর ভিটে পড়ো-ভিটে। বেলা দুপুর থেকে রাত্রি দুপুর পর্যন্ত যেন একই রকম নৈশবন্ধ।

বাজারে বাজারে আমেদ থমকে গেল। তাপস যেন শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা কবল, কী হল?

না, কিছু নয়।—বলে অদৃশ্য চাবুকুর ঘায়ে আমেদ আঙুলগুলোকে চালিয়ে দিল। আমেদের চিন্তায় সুরের নাক্তিক চিহ্নগুলো বইল বেঁচে আব বাকী জগৎটা বিলীন হয়ে গেল।

শীলভদ্র পাশ্চাত্যি করতে করতে শুরু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সুস্মিতার কল্পনা নিজের অজ্ঞাতে ছবি দিয়ে সুরের ভাস্কর্য রচনা করে চলেছে।

ধুঁকছে জনপ্রাণীহীন মাঠ, ছাই উডছে, সেই ছাই দিয়ে তৈরি হচ্ছে মূর্তি, আবার পবের নিমেষে সেই সব মূর্তি বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তারপব অজস্র মূর্তির ছায়া মিলে একখানা দিগন্তব্যাপী মেঘ ওই প্রান্তরটাকে ছেয়ে দিল। শেষে একটা তীব্র ঝড়ে মেঘ কেটে গেল। পবিচ্ছন্ন নীল আকাশে উঠল চাঁদ। গোটা কাস্তাবটা স্বপ্নে ডুবে গেল। স্বপ্নে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

স্বর মিলিয়ে যেতেই আভা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কপালেব ঘায় মুছে আমেদ পিয়ানো থেকে সরে আভার কাছে এসে দাঁড়াল।

শীলভদ্র আবার ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যি শুরু করলেন।

হঠাৎ বলে উঠলেন, যেন গান্ধীজীর ডাঙী অভিযান।

আমেদ চমকে উঠল। কিছুই বলল না।

সুস্মিতা জিজ্ঞাসা করে, আপনার এই কম্পোজিশনটার কী নাম?

স্বপ্নালুর মত উত্তর দেয় আমেদ, ইউরিসিস বা উর্বশী সন্ধ্যা।

* * *

সুন্দের ঘোরে, স্বপ্নে, সমীর-ডাক্তার বিবর্ত একটা নফটিক-চত্বরে কী একটা ছায়ায় পিছু পিছু ছুটে চলেছে।

বার বার ভাঙাচোবা প্রস্তরমূর্তি তাকে ঘিরে ধরছে।
দু হাতে সেগুলোকে ঠেলে ফেলে কোনটাকে ডিঙিয়ে,
কোনটার বুকের উপর দিয়ে সে ছুটে চলেছে।

* * *

স্বস্তিতা আচ্ছন্নব মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাপস কিছুক্ষণ আবোলতাবোল নানাপ্রসঙ্গ নিয়ে
কথা বলে গেল। বাজনা শেষ হবার পর আমেদ আর
আভা সেই যে শুরু হয়ে বসে ছিল তাব ব্যতিক্রম দেখা
গেল না।

বাইরে অন্ধকার বিসর্পিত বিন্দুতে মাঝে মাঝে
ছিন্নভিন্ন হয়ে আবার জুড়ে যাচ্ছিল। পয়ঃপ্রণালী থেকে
সত্ত-পতিত জলের প্রগল্ভ কলধ্বনি ভেসে আসছিল।
হঠাৎ একটা নিশাচর পাখি বাইরে থেকে একটা
ভেটিলেটারে আশ্রয় নেবাব ব্যর্থ চেষ্টার পব তীক্ষ্ণ চিংকার
করে উড়ে গেল। আমেদ আভা উঠে দাঁড়াল।
শীলভদ্রকে লক্ষ্য করে আমেদ বলল, এবার বুষ্টি খেমেছে,
আজ আসি।

আভা সঙ্কুচিত হয়ে বলল, আমিও।

শীলভদ্র ইতস্ততঃ করে বললেন, কী সাংঘাতিক
বিদ্যুৎ হানিছে, এ সময়ে যাবে কী হবে?

আমেদ হেসে বলল, ঠিক যেতে পারব, আপনি কিছু
ভাববেন না।

নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। তাপসকেও নমস্কার
করল। তাপসও যন্ত্রচালিতের মত প্রতিনমস্কার করল।
নিজেকে নিয়ে নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত ছিল তাই মুখ থেকে
কোন কথা সরল না।

আভাও আমেদের পিছু পিছু বেবিষে গেল। সিঁড়ি
দিয়ে নেমে দুজনে গ্যারেজ-ডাক্তারখানার সম্মুখে এক-
নিমেষের জগু দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ একটা বিদ্যুৎছটায়
চোখ ধাঁধিয়ে দিবেছিল তাদের। আকাশে অন্ধকার
আবার নিশ্চিহ্ন হতেই আমেদ বলল, এটা অভিসারের
রাত। কী বল আভা?

আভা উত্তর না দিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

আমেদ একমুহূর্তের জগু চুপ করে দাঁড়িয়ে বইল।
তারপর দ্রুতপদে এগিয়ে আভাব সঙ্গ নিল।

আভা বলল, আমি একাই যেতে পাবব।

আমেদ বলল, একা ছেড়ে দিতে সাহস হচ্ছে না যে!

আভা বিদ্রূপ করে বলল, কলকাতা একটা শহর,
জঙ্গল নয়!

আমেদ আহতকণ্ঠে বলল, মানুষের অরণ্যও বিপদ
পদে পদে।

আভা উত্তর না দিয়ে বড় রাস্তা থেকে বেকে দ্রুতপদে
একটা গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

শীলভদ্রের পড়বার ঘরে তখন তাঁর আর তাপসের
মধ্যে আলোচনা চলেছে।

শীলভদ্র বলে চলেছেন, ভালরকম চিনি না তবে
শুনেছি ভদ্রলোক অতিআধুনিক মতবাদের ধারক।
আমি তাঁর লেখাও মাঝে মাঝে এক-আধটা পড়েছি।
অধ্যাপক আমাকে একবার আক্রমণও করেছিলেন
ভূদানধ্বজের ওপর লেখা আমাব এক প্রবন্ধকে উপলক্ষ্য
করে।

তাপস বলল, আমিও এক-আধটা পড়েছি। সেদিন
একটা ছোট কাগজে তাঁর একটা লেখা পড়লাম। লেখাটার
বিষয়বস্তু ভালবাসা। লিখেছে—মানুষের ভালবাসাবও
ঐতিহাসিক বিবর্তন আছে। চণ্ডীদাস রামীর ভালবাসা
আর আজকের ভালবাসা নাকি জাতে ও গুণে আলাদা।...
আমায় ক্ষমা করবেন জ্যাঠামশাই, এসব প্রসঙ্গ আপনার
কাছে আলোচনা করা অসুচিত।

শীলভদ্র আগ্রহভরে শুনছিলেন, হঠাৎ বাধা পেয়ে
বিরক্ত হলেন। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সেই বিরক্তির
দ্রাক্ষনকে অগ্ররকম ভাষা দিয়ে মুছ-হেসে বললেন,
বল তুমি, আমি মন দিয়েই শুনছি, কথাগুলো ভাববার
মত।

তাপস বলল, সব আলোচনাটা মনে নেই। শুধু
একটা লাইন স্পষ্ট মনে আছে। মানুষের চেতনার বদলের
সঙ্গে তাব প্রেমও বদলাচ্ছে। অদ্ভুত থিওরি!—মুহূর্ত
খেমে তিজকণ্ঠে বলল, কিন্তু এই অদ্ভুতই স্বস্তিতাকে
আকৃষ্ট করেছে। ভালবাসা আর বুদ্ধিকে যে কী করে
এক করা যায় তা আমার বুদ্ধিব অগম্য। একটা
বিপজ্জনক হামবাগ। মূর্তিমান সামাজিক বিপদ ওই
ববেন।

আকাশে একঝলক বিদ্যুতের মত তাপসের দুই চক্ষে একঝলক বিদ্যে জ্বল উঠল।

শীলভদ্র মুহূর্তের জন্ত অত্মমনস্ক হয়ে গেলেন। তার পর সম্মুখে চেয়ে দেখলেন বন্ধ জানলার শারির বাইরের গা বেয়ে বিন্দু বিন্দু জলের ধারা নামছে ধীরে ধীরে। তাদের কোম-কোনটার গায়ে পথের আলোর দু-একটা উদ্ভাস্ত কিরণ এসে লাগছে। দেখে মনে হচ্ছে পাতলা সোনার পাতে মোড়া। এত পাতলা যে প্রায় স্বচ্ছ।

বিদ্যে এমনই জিনিস যে তা ক্ষুদ্র ধূস্রশিখার মত সম্মুখের বস্তুর—বিদ্যেয়ের পায়েব ছায়াকে অভ্যন্ত দীর্ঘায়িত করে দেয়। তাপস যেন আপন মনে বলল, আমার আরও মনে হয়—

শীলভদ্র তাপসের মস্তুর কথার স্রোতকে ক্ষুভিত করতে চেয়েই যেন জিজ্ঞাসা কবলেন : কী মনে হয় ?

শীলভদ্রের অধৈর্যের এই আভাসটুকু তাপসের লক্ষ্য এড়িয়ে গেল না।

আজ এই প্রৌঢ় ও তরুণ দুটি চিন্তে যে বস্তু চকমকির মত স্কুলিক ফুটিয়ে তুলছে তা একই অল্পভবের দুটি ভিন্ন রূপ। একজনের চেতন মনে অপরজনের অবচেতনে।

কী মনে হয় তোমার ?

শীলভদ্রের অধৈর্যের এই দীর্ঘ প্রকাশ ট্রিগারে টানের মত তাপসের বিদ্যেয়ের আগ্নেয়াস্ত্রটিকে সক্রিয় করে দিল।

তাপস ছম করে বলল, ও বিদ্যেশের চর।

শীলভদ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, উনি বৈজ্ঞানিক, চর হবেন কী করে ?

তাপস নিয়ন্ত্রণে ফিলফিস করে বলতে শুরু কবল, সামরিক গবেষণাগারে কাজ করে, সেখান থেকে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করে।

শীলভদ্র সন্দ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন, এ কাজে প্রচুর অর্থ। কিন্তু থাকেন তো নিতান্ত মধ্যবিত্তের মত !

তাপস যেন শীলভদ্রের সন্দেহকে নিরস্ত করার জন্তেই বলে, এটা ওর ভান জ্যাঠামশাই।

ভরুণের বহুধা-পল্লবিত বিদ্যে প্রৌঢ়ের মনে ছায়া ফেললেও তাঁর মনকে অন্ধকার কবতে পাবল না। এই ছায়াব মধ্যেও একটা বশ্মি ঝিলমিল কবছিল তখনও।

জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলেন আকাশে মেঘ

নেই। গাঢ় কোমল নালাজন মাখা আকাশ। তাব কপালে গোল চাঁদ। চিত্তেব নিঃসঙ্গ নীলে একাকী একটা আকাজ্জার মত। আমেদেব বাজনার একটা বংকার এল মনে।

শীলভদ্র আত্মগতভাবে বললেন, চমৎকার কথা বলেছেন বরেন। ভালবাসারও বিবর্তন ঘটছে।

মনের মধ্যে কী একটা অস্পষ্ট অল্পভূতি ঘুমন্ত শাপদের মত পাশ ফিরে গুল। ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলেন।

আত্মসংবরণ করে প্রকাশে বললেন, ঠর চিন্তার ধারাটা আমি ধরতে পারি নে।

ধাপ্পা ধাপ্পা—একেবারেই ধাপ্পা জ্যাঠামশাই। ও আমাদের জাতির শত্রু।

আত্মগতের মত ক্রুর কণ্ঠে বলল, ওকে সবিয়ে—হ্যাঁ, সবিয়ে দিতে হবে জ্যাঠামশাই, জেলে—পুলিসে ধরিয়ে দিয়ে।

হঠাৎ ঘরের টেলিফোনটা বনবন করে বেজে উঠল। শীলভদ্র দাক্ষণ ভাবে চমকে উঠলেন। এতক্ষণের ঘোরটা চুরমার হয়ে গেল। শীলভদ্র ক্ষিপ্ৰহাতে টেলিফোনটা তুলে কানে বেধে বললেন, তোমাকে কে ডাকছে-তাপস !

তাপস ফোন ধবে কথা বলতে শুরু করল। একটা কথাও শীলভদ্রের কানে গেল না।

দূব থেকে কোন মেলার কোলাহলের মত অস্পষ্ট কোলাহল শুনতে পাচ্ছিলেন যেন মনে। যেন শত শত বাগনার কোলাহল উঠে আসছিল চিত্তেব গভীর থেকে—বহুদূর থেকে।

তাপস ফোনেব কাজ সেরে উদ্ভ্যক্তভাবে বলল, আজ আমি চলি জ্যাঠামশাই। ফিল্ম-সেলরবোর্ড আমার একখানা ছবির খুঁত ধরেছে। কাল সকালেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। আমার কিছু টাকার প্রাদ। যত সব রাবিশ।

রেনকোটটা না নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তাপস।

ধাবার আগে শীলভদ্রকে আলগোছে একটা প্রণাম করে গেল মেহটাকে সামান্য ছমড়ে। শীলভদ্র দেখলেন একটা বৃহৎ কাঠের পুতুল যেন পুতুলমঞ্চে অভিনয় সেয়ে ঠকঠক করে কাঠের পাঠকতে ঠকতে বেরিয়ে গেল।

শীলভদ্র ঘরে পায়চারি করতে করতে বইয়ের আলমারির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। বইগুলো কবন্ধের মত বুকের ওপর ছাপা মুখ নিয়ে চোখ নিয়ে চেয়ে রয়েছে। চোখে পড়ল নীটশেব বই “অধ জরথুষ্ট্র উবাচ”। বইখানা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন।

একটা জায়গায় চোখ ঝামল। লেখা রয়েছে নারীর সান্নিধ্যে যাবার সময় তোমাব চাবুকটা নিতে ভুলো না।

কাকে শাসন কবাব চাবুক? নাবীকে, না নিজেকে? নিজেকে শাসন করার চাবুক। ষড়রিপুকে শাসন করার চাবুকটা হাতে নিয়ে। আশ্চর্য, এই রিপুবাই টেনে নিয়ে চলে জীবনের রথকে। কিন্তু সময়মত ক্ষেত্রমত শাসন না করলে এরা বথটাকে দিগ্বিদিকে যথেষ্ট টেনে নিয়ে গিয়ে একদিন চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। যুদ্ধে পরাজয় তো হয়ই, নিশানে কলঙ্ক অঙ্কিত থাকে চিরদিনেব জ্ঞান।

কম্পিত আঙুলে আর এক জায়গায় খুলে পড়লেন।

“মানুষের চেতনার বিবর্তন ঘটছে

তিনটে পর্যায়ে...

প্রথম পর্যায়ে সে ভারবাহী উট

দ্বিতীয়ে মরুচর সিংহ

তৃতীয়ে শিশু।”

শিশু কথাটা প্রত্যুখে পাখির ডাকের মত শারা অন্তঃকরণটাকে গলিবে তরল করে দিল। মনে পড়ল নিজের মায়ের কথা।

চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়।

বেরিয়ে দেখলেন রেলিঙে ভর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্থমিতা।

নীল কাঁচের মত একটা ঢাকনা দিয়ে জগৎটাকে ঢেকে ফেলেছে জ্যোৎস্না।

শীলভদ্র স্থমিতাব কাছে গিয়ে গাঢ়স্বরে ডাকলেন, মিতা।

স্থমিতা রেলিঙের ওপর ভাঁজ-করা দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে কষেক মুহূর্তের জ্ঞান ছুঁপিয়ে কেঁদে নিল। তার পর মুখ ভুলে বলল, তাপসকে আমি বিয়ে করতে পারব না জ্যাঠামশাই। আমাদের দুজনের প্রকৃতি বিপরীতমুখী।

শীলভদ্র কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, কিন্তু ও তোমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে মিতা।

ওটা ওর তান জ্যাঠামশাই। ও নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না। ভালবাসতে পারবেও না। তা ছাড়া, আমার জীবনে ওব কোন কাজ নেই, ওর জীবনেও আমার কোন কাজ নেই।

বেশ তো, তুমি যদি অল্প কাউকে—

না জ্যাঠামশাই, তাপসের মধ্যে সন্দেহ। বয়েনবাবুর জীবনেও আমার কোন কাজ নেই। তা ছাড়া উনি আমার কাছে রহস্য।

এই বলে স্থমিতা জ্ঞত চলে গেল নিজের ঘরে।

সহসা নদীতীরের কাশবনে যেমন জ্যোৎস্না নামে তেমনি শীলভদ্রের মনে একটা অনির্বচনীয় স্বস্তি নেমে এল।

প্রেম মাত্রই রহস্য—দেহগত হোক, আত্মগত হোক। দূরবাস্ত্রিণী বলাকার মত—বসন্তে বসন্তে দেহে নামে, মনে নামে। বসন্তশেষে উড়ে যায়। পরিত্যক্ত দেহে, পরিত্যক্ত মনে মাঝে মাঝে তার প্রতিবিম্ব পড়ে—যেমন আকাশযাত্রী বলাকার প্রতিবিম্ব পড়ে নীচের সরোবরে। প্রেম একটা রহস্যের প্রতিবিম্ব—দেহে বা মনে।

[জন্মঃ]

জন্মান্তর

অশোক বসু

স্মৃতিচরিতাম্,

এখন অনেক রাত। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। আর কী অন্ধকার! আমার টেবিলের সামনেকাব জানলাটা বন্ধ। জানলাটা খুলে বাইরে তাকালে কিছুই দেখা যাবে না। মনে হবে পৃথিবীর সব দীপ নিভে গেছে, সব রঙ মুছে গেছে, চারদিকে শুধু স্তবকে স্তবকে জমাট অন্ধকার ধমধম করছে। ধমধম কবছে পৌষের একটা ভাবাহীন বর্ণহীন শীতাত্ত নিয়ুতি রাত।

ঠিক এমনি একটি রাতে ডুয়ার্গের আনন্দপুর চাবাগানে আমার ছোট্ট কোয়ার্টার্সে তোমাকে চিঠি লিখতে বসে আমার মনে পড়ল সাত বছর আগেও এমনি একটি বাতে কলকাতার কোন এক অঞ্চলে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম। সেদিনও ছিল এমনি নিরুত্তম রাত। সেদিনও সমস্ত অল্পভূতিগুলোকে চিঠির অক্ষরে উজাড় করে দেবার জন্তে এমনি করেই ব্যাকুলিত হয়ে উঠেছিল মন। অথচ এ ছোট্ট রাতে কত তফাত। সেদিন যে আবেগাকুল হৃদয়ের উত্তাপে প্রত্যাশার প্রদীপ জলে উঠেছিল, আজ সেই হৃদয়ের বিক্ষুব্ধ ব্যথার হতাশায় সে প্রদীপের অস্তিম শিখা বিঘাদের অন্ধকারে কাঁপছে। সেদিন চিঠি লিখতে বসেছিলাম এস. আর. দাশ রোডের বীণা সেনের ঠিকানায়, আজ লিখছি ভুবন সরকার সেনের বীণাপাণি দাশকে। তোমার চিঠির নীচে ওই নামেই তুমি স্বাক্ষর করেছ। যাক সে কথা। শুধু একটা ব্যতাহত স্মৃতি ছাড়া সেদিনের কিছুই আব অবশিষ্ট নেই যখন, তখন সেদিনের কথা তুলে কি লাভ বল।

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছি। সকালে পেয়েছি আর এখন গভীর রাত—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ দশবার তোমার চিঠিটা পড়েছি। পড়েছি আর

অনুভব করবার চেষ্টা করেছি সংসারের নির্মম নিয়মটাকে। যতবার পড়েছি ততবারই যুক্তি দিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করেছি সেই নিয়মটাকে যে নিয়মের শাসনে জীবনটা একটা নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। মনের সঙ্গে মানিয়ে নেবাব চেষ্টা করেছি সেই তোমাকে, যে তুমি এখন হয়তো স্বদূর কলকাতার ভুবন সরকার সেনের দশ-হাতী ঘরে সংসারের নানান কাজ নানান স্বামেলা চুকিয়ে দিয়ে কোলের ছেলেটাকে আঁকড়ে ধরে নিরুদ্বেগে অবসরে ঘুমিয়ে পড়েছ, যে তোমাকে ডুয়ার্গের চাবাগানে এক নিরুত্তম রাজে চিঠি লিখতে বসে আমি বারবার অন্তমনস্ক হয়ে যাচ্ছি।

তুমি যে চিঠিটা লিখেছ, ঠিক এই রকম একটা চিঠি পেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু এই রকম একটা চিঠির খুবই প্রয়োজন ছিল আমার। এই রকম চিঠিই জীবনকে দেখবার ও জানবাব ভঙ্গী বদলায়, জানিয়ে দেয় যন্ত্রজয়ী প্রকৃতি-জয়ী বিশ শতকের মানুষের একটি করুণ ব্যর্থতার কথা। তা না হলে তোমার দেহস্থমার ভিতরের খটখটে বিক্ৰী কঙ্কালটাকে এমনি করে চোখে লাগত না, আমার টেবিলের ওপরের ফোটোস্ট্যাণ্ডে তোমার সাত বছর আগেকার মুখখানা কখনও একটি মৃত ব্যক্তির মুখের মত মনে হত না।

তোমাকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছিলাম সাতদিন আগে, তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে আমার মনে আছে। আর মনেই বা থাকবে না কেন। চিঠিটা লেখাব মধ্যে তুমি ছিলে উপলক্ষমাত্র, আসলে ওটা আমার আত্মদর্শন। সত্যকে যাচাই করে নেবার একটা বিশিষ্ট অভিব্যক্তি।

কী লিখেছিলাম? লিখেছিলাম, ত্রিশটা টাকা পাঠালাম। ওটা তোমার ছেলেমেয়েদের জন্তে। ওদের

বলো ওদের সেই মামা মিষ্টি খাওয়ানোব জন্তে পাঠিয়েছে। অর্থাৎ, কে পাঠাল, কেন পাঠাল তারও একটা সূস্থ সামঞ্জস্যের দরকার। এক্ষেত্রে মামা সোধোনটাই অধিকতর নিবাপদ এবং প্রযোজ্য বলে মনে হল। কেন না তোমার স্বামীর সামনে আমি যখন তোমাব কোন এক দূরসম্পর্কের ভাই হিসেবে পরিচিত হয়েছিলাম, তখন মামা সোধোনটাই নিশ্চয়ই নীতিসঙ্গত।

আরও লিখেছিলাম, সেদিন তোমার বাড়ি থেকে ফিরেছিলাম মনের গহনে এক উদ্দাম ঝড়ের আলোড়ন নিয়ে। সেই ঝড়ে আমার বিশ্বাসের পৃথিবীটা উথাল-পাথাল হয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। মনের এই অস্থির অবস্থায় তোমাকে চিঠি লিখছি। ঈশ্বর জানেন, অত্যন্ত গাম্ভীর্য ভাষায় একটা সাদামাঠা চিঠিই তোমাকে লিখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে অজ্ঞানতে সেই বিফ্রুক ঝড়টাকেই যেন চিঠির ভাষায় কঠিন ছন্দে বেঁধে দিলাম। সেদিন কিছু দিয়ে আসতে না পারায় মনটা খাবাপ হয়ে ছিল। আশা করি ত্রিশটা টাকা সানন্দে গ্রহণ করে আমার নবলব্ধ প্রতীতিকে মূল্য দেবে।

লিখে তো ছিলাম, কিন্তু তারপব সে কী দুঃসহ অস্বস্তি। চিঠিটা লিখে ভাকবাক্সে ফেলার পর থেকে কেবলই আমার মনে হয়েছে এ হয়তো ঠিক হল না। টাকা দিয়ে পরিমাপ করলাম তোমার দারিদ্র্যের গভীরতাকে, হয়তো বা ব্যঙ্গ করে বসলাম তোমার বেঁচে থাকবার তাৎপর্যকে। সারারাত ঘুমতে পারি নি। বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছি, আর ভেবেছি, তোমাকে চিনতে হয়তো ভুল হয়ে গেছে আমার। ভয়ের ভিতরের যে অগ্নিকণা আমি দেখতে পাই নি, সেই অগ্নিকণা হয়তো লেলিহান শিখায় দাঁউ দাঁউ করে জলে উঠবে আমার স্পর্শ, আমার ত্রিশটা টাকা পাঠানোর অপমানে। ই্যা, তুমি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে ধিকার দেবে। ডুমার্সের অবধ্য আর চা-বাগানের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি নিয়ে যে মানুষটি আধুনিক কলকাতাব নাগরিক জীবনের একটি প্রাত্যহিক সমস্যাকে অন্তরকম অর্থে ভুল বুঝল, তোমাব ক্ষমাহীন ভাষায় সে বারবার নিন্দিত হবে। আমি যাকে ভেবেছি মৃত্যু সে হয়তো তোমার-জীবন-ধারণের বিশিষ্ট একটি ভঙ্গিমা। যাকে আমি একটি

নিপ্পাণ জৈবিক প্রয়োজন মনে করে অপমান করলাম, তার উদ্বেলিত প্রাণবন্তায় আমার ঔদ্ধত্যের অতল সমাধি হবে।

কিন্তু আমার সমস্ত ভয় সমস্ত সঙ্কোচ দূর হল তোমার উত্তব পেয়ে। আমার প্রেরিত ত্রিশটা টাকা সাদরে স্বীকার করে নিয়ে তুমি নিভুল করে নিজেকে প্রকাশ কবলে, তোমাব জীবনের কঠিন সত্য দিয়ে আমার অভিজ্ঞতার আবর্জনা পুঞ্জীভূত করে তুললে। বুঝলাম, আমার ভুল হয় নি।

প্রচুর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে আমার প্রেরিত টাকা কটার প্রাপ্তিসংবাদ জানিয়ে তুমি প্রশ্ন করেছ, কিন্তু এতে ভাববার কী আছে। মামা টাকা পাঠিয়েছে, তাব জন্তে ছায়-অছায়েব কথা তুলে চিন্তিত হচ্ছে কেন। আর একটা কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তুমি আবার কাব্য করে লিখেছ, সেদিন আমার বাড়ি থেকে ফেরবার পর থেকে তোমার মনে নাকি ঝড়টড কি সব হচ্ছিল। অতশত বুঝি নে বাপু। বড় বড় কথার হেঁয়ালি ছেড়ে সহজ ভাষায় স্পষ্ট করে লিখবে। আমার তরফ থেকে কোনরকম ত্রুটি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। তবু কথাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আশা করি পরবর্তী চিঠিতে সব জানতে পারব।

তোমাব চিঠিটা অবাক করে নি আমাকে। আমি জানতাম আমার চিঠির ভাষা তুমি বুঝবে না। কেন না অন্তরের সঙ্গে অন্তরের মিলন না হলে এই সঙ্করণ ব্যাকুলতা বোঝা যায় না। আমার মনের উদ্দাম ঝড় তোমার কাছে বড় বড় ভাষার দুর্বোধ্য হেঁয়ালি মনে হবে, এতে আশ্চর্য কি।

অথচ সাত বছর আগেকার তোমাব একটি চিঠি ছিল এর চেয়ে অনেক বেশী অর্থালঙ্কারের কমপ্লেক্সিটিতে ভরা। সেটা ছিল মন দেওয়া-নেওয়ার মধুর লগ্নের প্রথম পত্র। একটি কালজয়ী নিবিড় প্রেমের প্রতিশ্রুতিতে সে চিঠি স্বাক্ষরিত করে তুমি প্রাণের আবেগে ভরিয়ে তুলেছিলে তার প্রগাঢ় ভাষা। অথচ সেই তুমি আজ—

কিন্তু এ সমস্ত কথা এখন ভেবে কি হবে। বীণা সেনের নামটাই যখন একদিন স্মৃতিব অক্ষকারে হাবিয়ে গেছে, তখন বীণাপাণি দাশের কাছে সেই পুরনো প্রসঙ্গের অবতারণা করা অবাস্তব। তবু বলব; প্রকারান্তরে যে

স্বগভীর মনোভাব প্রকাশ করেছি, সেখানে এই অতি-সাধারণ ভাষাটাও যদি না থাকত, তবে সেটা হত একটা গ্রাম্য ভালগারিটি, তোমাব আমার মধ্যে একটা ইত্তর আলাপ। কাব্যি করে তো আমি কিছুই বলি নি, যা বলেছি তা একটা সাধারণ শিষ্টাচারের ভিতর দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি। নির্লজ্জ বক্তব্যটাকে শালীনতার একটা হালকা আবরণে ঢেকে দিয়েছি মাত্র।

যাক। অলমতি বিস্তরেণ। গানের চেয়ে আলাপ বেশী হয়ে যাচ্ছে। এবার যা বলতে চাইছি তাই বলি।

হ্যাঁ, তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেব আমি। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায়, একটুও বড় বড় কথায় হেঁয়ালি না করে। আব তার জন্তে আবুপূর্বিক সমস্ত কথাই লেখা দরকার। সেদিন তোমার বাড়িতে যাওয়া এবং সেখান থেকে এখানে ফিরে আসা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার অবিকল চিত্রটাই আমি তোমাব সামনে তুলে ধরছি। এর মধ্যেই তুমি খুঁজে পাবে তোমার সব প্রশ্নের জবাব। অর্থাৎ, আমার এই চিঠিটা হবে এমন একটা আয়না, যে আয়নায় তোমার আশপাশের চেনা জগৎটার ছায়া পড়বে। তোমার সামনে এবং তোমার নৈপথে যা যা ঘটেছিল, সবই অবিকৃত অবস্থায় প্রতিবিম্বিত হবে চিঠিব আয়নায। আর সেই হবে তোমার প্রশ্নের জবাব।

হয়তো সবকিছু না লিখলেও চলত। সংসারের অনেক নিষ্ঠুর সত্যকেই তো আমরা সারাজীবন মিথ্যের মাধুর্যে মধুব করে রাখি। একটু ছলনার আশ্রয় নিলে হয়তো অপলাপ হত, কিন্তু এই পত্রাঘাতের রুচতা থাকত না তাতে।

কিন্তু সব কথা লিখতে বসে এ চিত্তবিকার কেন। আজ যে তোমাকে আমার সব কথা বলতেই হবে। সেই মধ্য-পোষের এক আশাহীন প্রেমহীন বিষণ্ণ সন্ধ্যায় তোমার একান্ত সন্মিলকে দাঁড়িয়ে যে মহাপৃথিবী আমি আবিষ্কার কবেছিলাম, তা মিথ্যের অন্ধকার দিয়ে তোমার কাছে আড়াল করে রাখতে পারব না। আক্ষরিক অর্থে এ চিঠিটা তোমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা, কিন্তু আজ যদি তুমি রীণা সেনের হৃদয়াবেগ দিয়ে চিঠিটা গ্রহণ করতে, তা হলে এই চিঠির মধ্যে কালির আঁচড়ে যে রক্তাক্ত হৃদয়ের আত্মনাদ শুনতে পেতে তা তোমার নয়, আমার।

তাই বলছি চিঠিটা পড়ে আমাকে অমায়ুষ ভাবলে ভুল কববে। ধৃষ্টতার জন্তে ক্ষমা চেয়ে কিংবা দোষক্ষালনের জন্তে এ কথা বলছি না। রূপকথার সেই অজগরের গল্প মনে আছে? সেই যে মণি হারানোর বিক্ষুব্ধ বেদনায় নিঃফল আক্রোশে শাপিত তরোয়ালের ওপর ছোঁবল মেরে নিজেই ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। আমারও সেই অবস্থা।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—

ট্রেনটা চলছিল মাঠঘাট শহর জনপদ পেরিয়ে। চলছিল কলকাতার দিকে। হৃদীয় সাত বছর পরে কলকাতায় যাচ্ছি। জীবনের কত কর্মমুখর দিনরাত্রির আলো-অন্ধকারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই কলকাতা। এই কলকাতার বাতাসে কত আশার আনন্দে নিঃশ্বাস নিয়েছি, কত ব্যর্থতায় বিষাদের দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে গেছে। ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরের বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা অভিভূত হয়ে এল।

রাস্তার শেষ মাথায় ছিল কেশবদার চায়ের দোকান, শ্রীনাথ কেবিন। সারাদিনে কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না, অবসর পেনেই হাজির হতাম কেশবদার দোকানে। একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পডতাম বাস্তাব দিকে মুখ করে।

বলতাম, এক কাপ চা।

চা স্বতক্ষণ না আসত, একটা সিগারেট ধরিয়ে ততক্ষণ রাস্তার ওপাশের সাদা রঙের দোতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেই সাদা বাড়িটার দোকানের মুখোমুখি জানলাটায় ঝুলত নীল রঙের পর্দা। মাঝে মাঝে হঠাৎ হাওয়ার ধাক্কায় সরে যেত পর্দাটা। সেই খোলা জানলায় কতদিন তোমাকে দেখেছি।

দোকানের ছোকবাটা এসে বলত, বাবু, চা এনেছি।

মুহূর্তের জন্তে খেয়াল কবতে পারতাম নিজেকে। তারপর সেই চা খেতাম আধঘণ্টা ধরে। খেতাম আর তাকিয়ে থাকতাম সেই জানলার দিকে। যেখানে নীলচে পর্দাটা হালকা হাওয়াব ধাক্কায় সরে গেলেও সরে যেতে পারে, তোমাকে দেখা গেলেও দেখা যেতে পারে।

মাঝে মাঝে বন্ধুরা এলে সতর্ক হয়ে থাকতাম। ভূমি তো জান, বরাবরই আমি একটু লাজুক প্রকৃতির।

বন্ধুদের কাছেও সব কথা বলতে পারি নি। কেমন যেন লজ্জা লাগত।

তবুও একজনের কাছে ধরা পড়ে গেলাম একদিন। টেরও পাই নি সে কখন নিঃশব্দে আমার পাশে বসে লক্ষ্য করছে।

আমি তখন তোমাকে দেখছিলাম। ভাগ্য হুগ্ৰসন্ন, জানবার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি তখন কী যেন করছিলে।

হঠাৎ শুনলাম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলছে, জনম অবধি হয় রূপ নেহারছ নয়ন না তিরপিত ভেল।

চকিতে ফিরে তাকালাম তার দিকে। সে বলল, কি হে ব্রাদার, সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ?

বললাম, মানে ?

সে বলল, বাতায়ন কাব্য।

আমি বললাম, দূর।

সে বলল, কিন্তু তুই একটা আস্ত গবেট। নইলে বীণা সেনকে চুবি কবে দেখতে হয়।

এ সব কথা আমিও ভেবেছি অনেকদিন। তোমার সঙ্গে আমার কথা বলবার সুযোগ ছিল প্রচুর। আমবা ছিলাম তোমাদের ভাড়াটে। তা ছাড়া তুমি সেবাব যে কলেজে ভর্তি হলে, দাদা ছিলেন সে কলেজের প্রফেসর। দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার ফলে বাড়িওলা ও ভাড়াটের মধ্যে একটা হৃদয়তার সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। সেইজন্মে কতকগুলো সামাজিক প্রয়োজনে দুটো বাড়ির মধ্যে যাওয়া-আসা ছিল। তুমি কখনও আসতে মার সঙ্গে, কখনও একা। কতদিন মুখোমুখি পড়ে গেছি। কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারি নি। একরাশ লজ্জা এসে আমার কণ্ঠরোধ করেছে, শুধু দুটো পিপাসার্ত চোখ কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে তোমাকে দেখেছে। তুমি তাড়াতাড়ি সরে গেছ। সামনে থেকে সরে এসে আমি আবার পিছন থেকে তোমাকে দেখেছি, চায়ের দোকানে বসে চুরি করে দেখেছি। তুমি—বীণা সেন—যায় বাবা অনাদি সেন দুটো বাড়ি ভাড়া দিয়ে আর কতকগুলো টুকটাক ব্যবসায় বেশ কিছু টাকা কবেছিলেন, সেই তুমি ছিলে এ অঞ্চলের সবচেয়ে স্কন্দরী আর আধুনিক মেয়ে। তোমার নামে গুঞ্জন উঠত পুরুষমহলে, মেয়েমহলে উঠত

ঈর্ষার মিন্দা। আর আমি? আমি শুধু মূর্খের মত তোমাকে ভালবাসতাম।

হায় ভীক প্রেম।

অবশেষে একদিন মরিয়া হয়ে মনের কথা তোমাকে জানালাম। সেদিন তুমি চমকে উঠলে না, হেসে উঠলে না, শুধু সরমাহত চোখ দুটো নামিয়ে নিলে মাটিতে। আমি আপন প্রাণের অসহ্য শিহবণে থরথর করে কঁপে উঠলাম। তারপর আমাদের আলাপ পরিণত হল বিপ্রজ্ঞালাপে, সম্পর্ক হল নিবিড়তর। গন্ধার ধারে, কিংবা সিনেমায় কিংবা ময়দানের নির্জন নিভূতে দুজনে পাশাপাশি বসেছি, একসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছি একটি মধুময় জীবনেব।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল। এমন সময় ডুয়ার্সের চা-বাগানে একটা ভাল চাকরি পেয়ে আমাদের চলে যেতে হল। যাবার সময় তুমি কঁদেছিলে, আমি শীগগির ফিরে এসে তোমাকে দাদার ভ্রাতৃবধূ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এখানে এসে তিন-চার মাস পত্রালাপের মাধ্যমে আমরা হাসতাম, কাদতাম। তারপর তোমার চিঠি আসা কমতে লাগল। কমতে কমতে এমন এক সময় এল যখন পর পর তোমাকে অনেকগুলো চিঠি দিয়ে একটিরও উত্তর পেলাম না। ঠিক এই সময় আমি কলকাতায় যাবার উদ্যোগ করছি, হঠাৎ বউদির একটা চিঠি পেয়ে যাওয়া হল না। বউদির চিঠিতে জানলাম তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। বউদি জানিয়েছিলেন, যে লোকটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে সেই লোকটি তোমাদের বাড়ির সামনের মেসটিতে থাকত। কাজ করে কি একটা সওদাগরি অফিসে। ইদানীং তোমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তারপর তোমাদের দুজনকেই হঠাৎ একদিন দেখা গেল না। পরে তুমি তোমার বাবার কাছে চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে ক্ষমা চেয়েছিলে। কিন্তু তোমার বাবা তখন দারুণ অসুখে শয্যাশায়ী। এর মাসখানেকের মধ্যে তিনি মারা যান। বাড়ির অত্যাগত সকলে তোমার বিয়েটা একটা অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা বলে মনে করে নিয়েছিল বলে ও-বাড়ির সঙ্গে তোমার আর কোনও বকম সম্পর্কই রইল না। আর তুমিও...

শিয়ালদা—কলকাতা—

রাজীদের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা গেল। এক্সপ্রেসটা এসে
ধামল শিয়ালদা স্টেশনে।

সাত বছর পরে কলকাতায় এসেছি, দাদা বউদি
ভাইপো ভাইবিরিরা মহা খুশী।

দাদা বললেন, ই্যা রে হতভাগা, অ্যাদিন পরে
আমাদের মনে পড়ল ?

বউদি বললেন, তুমি কিম্বার পুত্র দিয়ে সিঙাড়া খেতে
ভালবাসতে ঠাকুরপো ! আজ সারাদিন বসে বসে তোমার
জন্তে সিঙাড়া ভেজেছি।

আমি বললাম, তাই নাও শীগগির। একটু বাইরে
বেড়িয়ে আসি।

বউদি বললেন, সে কি কথা ! কতদিন পরে কত পথ
জানি করে এলে, এফুনি বেরবে ? তোমার বাইবের মন
কি কোনদিনই ঘরের ভেতরে আসবে না ঠাকুরপো ?

বউদির কথায় একটা ব্যথিত অভিযোগ ছিল। আজ
দীর্ঘদিন ধরে দাদা বউদি আমার বিয়ের অনেক চেষ্টা করে
বিফল হয়েছেন।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, না বউদি, ভাঙা
হাটে আবার নতুন কবে বোলাতি নাই বা বললাম।

বউদি গম্ভীর গলায় বললেন, কি জানি। ভেবেছিলাম
ভুলেই গেছ হস্ততো। এতদিন বাদে তবু যা হোক মনে
পড়েছে এই যথেষ্ট।

সন্ধ্যাবেলায় এদিক ওদিক একটু বেড়িয়ে এলাম।
পুরনো বজুবাক্স কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করলাম,
কেশবদার শ্রীনাথ কেবিনে বসে কি মনে করে এক কাপ
চাও খেলাম। দাম দিতে যাচ্ছিলাম, কেশবদা বললেন, দাম
তো অনেকদিনই দিয়েছ ভাই, আজ না হয় একটু ঋণই
রাখলে আমার কাছে।

রাত্রে খেতে বসেছিলাম, কথায় কথায় তোমার কথা
উঠল। বউদি বললেন, এই তো সেদিন বাস্তব দেখা।
কী বিশী চেহারা হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছিল—
আমাকে দেখে হাসল। বলল, ভালই আছে। ওইতো
হেডমাস্টার কাছে থাকে—ভুবন সরকার লেনে।

আমি মনে মনে তোমার ঠিকানাটা আওড়ে নিলাম।

পরদিন বিকেলে বাজারে গেলাম। বাজার থেকে
যখন ভুবন সরকার লেনে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

মনে আমার ব্যথা ছিল, অভিযোগ ছিল, অভিমান
ছিল, কিন্তু তবুও তোমার ওখানে গেলাম। কেন না
একদিন সত্যিই তোমাকে ভালবেসেছিলাম। বাইরের
মন বলছিল তোমার ঘরকন্না দেখবার নিষ্ঠুর কৌতুক করতে
যাচ্ছি, কিন্তু ভিতরের মন বলছিল সুদীর্ঘ সাত বছর
তোমাকে দেখি নি।

অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলিটায় পৌষের শীত-শীত সন্ধ্যার
অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে। নখর মিলিয়ে তোমার
বাড়িটা বেব করলাম।

খবর পেয়ে তুমি হস্তদস্ত হয়ে বেরিয়ে এলে। আমাকে
দেখেই খতমত খেয়ে মাথায এক হাত বোমটা টেনে দিয়ে
মুহূর্তে বললে, উনি এখনও আগিস থেকে ফেরেন নি।

হেসে বললাম, ওঁকে আমার দরকার নেই, আমি
তোমার কাছেই এসেছি।

মুহূর্তে তুমি তীব্র আঁকুটি করে এক ঝটকায় মুখটা
সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকালে। কিন্তু কী বলতে
গিয়ে সহসা থেমে গেল। একমূহূর্তে স্মৃতির অন্ধকার
হাতড়ে নিলে। তোমার চোখের তাবায় ঝলসে গেল
বিশ্ময়ের বিদ্যুৎ। বললে, তু—তুমি ?

বললাম, গতকাল কলকাতায় এসেছি একটা কাজে।
ভাবলাম একবার দেখে আসি তোমাকে। ঠিকানাটা
পেলাম বউদির কাছে।

তুমি বেশ হঠাৎ এক মহা সমস্তায় পড়ে গেল।
আমাব সন্ধ্যা তোমার কি কি করণীয় থাকতে পারে,
মনে হল সেই কথাই একবার ভেবে নিলে। তারপর
বললে, এস, ভেতরে বসবে এস সুশান্তদা।

সুশান্তদা ! আমি চমকে উঠলাম। সম্বোধনটা অশ্রুত
এবং নতুন। আমি যতদূর জানি, তুমি বরাবর আমাকে
শুধু নাম ধরে সুশান্ত বলেই ডাকতে। কিন্তু ভেবে
দেখলাম পরিবর্তনই কালের ধর্ম। সেদিনের সবকিছুই
যখন আজ পরিবর্তন ঘটেছে, তখন সেদিনের সেই
সুশান্ত আজ সুশান্তদা হওয়াতেই বা আশ্চর্যের কি আছে !

কই, এস।—ঘরে ঢুকে তুমি বললে।

তোমার পিছন পিছন একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকলাম।
তুমি আলোটা জালিয়ে দিলে। সেই স্নান পাণ্ডুর
আলোতে আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। ঘরটা

অত্যন্ত স্নাতস্নেহে, অপ্রশস্ত এবং অপরিষ্কার। পাশাপাশি দুটো তক্তাপোশ, একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার, একটা টেবিল, দুটো টিনের তোরঙ্গ আর কয়েকটা পারিবারিক জীবনের অপরিহার্য জিনিস। চারদিকে দেখতে দেখতে আমার মনে হল এই ঘরে কোনদিন আলো-টোকে নি, বাতাস খেলে নি, এই অস্বপ্নপূর্ণ ঘর চাবদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। দেখলাম তোমাকে। ইশ, কী চেহারা হয়েছে সেই তোমার। গাল ভেঙে গেছে, গলার কণ্ঠা দুটো বেরিয়ে এসেছে, রঙ ময়লা হয়ে গেছে। পরনে একটা ময়লা জীর্ণ আটপোরে শাড়ি। রান্না কবার সময় কখনও কখনও হযতো শাড়িতেই হাত মোছ, এখানে ওখানে তারই দাগ লেগে রয়েছে। দেখলাম তোমাব ছেলেমেয়েদেব। পৌষের এই শীত-শীত সন্ধ্যায়ও তাদের গায়ে কোনও গরম জামা নেই। তোমার চারপাশ ঘিরে তারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি বসেছিলাম বিছানার একপাশে। গায়ে জড়িয়ে এসেছিলাম দামী কান্স্ট্রাক্ট শালটা। কেমন একটু সঙ্কোচ একটু অস্বস্তি বোধ করলাম।

তোমাব ছেলেমেয়েদের তুমি যেন কি বললে, হঠাৎ তারা এগিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করতে শুরু করল। আমি শশব্যস্তে পা দুটো টেনে নিলাম।

কেবল তোমার ছোট মেয়েটাই এল না। সে-ছিল তোমাব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। তুমি বললে, ইশ, এইটুকু মেয়ের ঠাকুর দেখলে গা জলে যায়! শীগগির যা, তোর মামা হয়না?

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ও বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে আমার কাছে আসতে। কোনদিন দেখে নি তো।

ঠিক তখনই ঘোল-সতেরো বছরেক একটা ছেলে ঘরে ঢুকল। আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসু চোখে তোমার দিকে তাকাল।

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ওর ভাই বীরেন। তা তুমি এদিকে একটু শোনো তো ঠাকুরপো।

তোমার পিছন পিছন ছেলেটি বেরিয়ে গেল।

আমার ভারী অস্বস্তি লাগছিল। আমি এসেছিলাম

অনেকদিন আগেকার কয়েকটি মুহূর্তের সঞ্চয় নিয়ে। কিন্তু এসে দেখলাম তোমার সংসারের অজস্র কর্মের কোলাহলে সেদিনের সেই মিষ্টি স্বরের রেশটুকু হারিয়ে গেছে। আমি এসেছিলাম সহৃদয় তোমাব কাছে, এসে দেখলাম স্বামী-পুত্র-কন্যার সংসারে তুমি নিজেকে বিলীন করে দিয়েছ।

নেপথ্যে তোমাদের ফিসফিস শুনলাম। মনে হল তুমি বীরেনকে মিষ্টি কানে আনতে পাঠালে।

একটু পরেই তুমি ঘবে এসে ঢুকলে। বললে, চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে এলাম। একটু চা খেতে হবে কিন্তু।

এদিকে আবার ঘরের মধ্যে তোমার ছেলেমেয়েরা বিছানার ওপর উঠে, খাটের নীচে লুকিয়ে মহানন্দে লুকোচুরি খেলতে শুরু করে দিয়েছিল। তোমার কথার উত্তর দেওয়া হল না, তার আগেই তুমি ওদের দিকে তাকিয়ে থেকিয়ে উঠলে, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি? বিছানার ওপর উঠে কি করছিল শুনি?

সহসা ওরা থেমে গেল, থেমে গেল শুনেব কোলাহল। তোমার বড় মেয়েটা আমার সামনে বোধ হয় লজ্জা পেয়েই হঠাৎ ঘব থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘটনাটা এতই বিস্ময়কর যে আমার চুপ করে থাকটাই আবণ্ড বিস্ময় বলে মনে হল। হাসবার চেষ্টা করে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, আহা, বকবার কি হল? ওরা খেলছিল।

খেলছিল না আর কিছু। এক-একটা ক্ষুদ্র শযতান।—বিছানাটা ঠিক করে নিতে নিতে তুমি বললে।

আমি হেসে বললাম, খুব তো সংসারী হয়ে উঠেছ তুমি?

তুমি খুশী হয়ে হাসলে। তাবপর বললে, তোমাকে দেখলে কিন্তু চেনা যায় না স্বশাস্ত্রদা! এবই মধ্যে বুড়িয়ে গেছ।

আর তুমি?

আমার কথা আর বল কেন? বিষের পর মেয়েদের যা হয় তাই হয়েছে।

প্রসঙ্গটা পালটে নিলাম।

বললাম, বেশ শীত পড়ে গেছে, তাই না ?

হ্যাঁ। অন্ততঃ তোমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।
আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে যে রকম জ্বুথু হুয়ে বসে
রয়েছ !

দুজনেই একসঙ্গে লঘুছন্দে হেসে উঠলাম। এতক্ষণ
পরে পরিবেশটা একটু হালকা হল।

ফুলপ্যাণ্ট পরলে তোমাকে কিন্তু বেশ স্মার্ট লাগত
সুশাস্তদা।

ঠিক তেমনি নীল শাড়ি পরলে তোমাকে বেশ সফট
লাগত বীণা।

তুমি একটু হেসে চুপ করে রইলে। তারপর বললে,
এখন কিন্তু রঙিন শাড়ি পবলে লোকে হাসবে।

আমি হেসে বললাম, আমি কিন্তু শুধু হাসব না।
আমি হাসিমুখে হু চোখ ভরে হাংলার মত তোমাকে
দেখব।

কিন্তু সে কথা তোমার কানেই গেল না যেন। তুমি
বলেই চললে, রঙিন শাড়িটাড়িগুলো আমি এখন
বাক্সবন্দী করে রেখেছি। এই তো পূজোর সময় উনি
একখানা নীল ডুয়ে কিনে এনেছিলেন। শখ করে দেওয়া
জিনিস, তাই দু-একদিন পরেছিলাম। তারপব তুলে
রেখেছি বাস্কে। হাজার হোক এখন চোখের সামনে
ছেলেমেয়ে রয়েছে, পাঁচজনেব সংসার—তুমিই বল
সুশাস্তদা, এখন কি খুকি সেজে থাকবার ব্যেস আছে ?
উনি মাঝে মাঝে আমার জন্ত শাড়িটাড়ি কিনে আনবার
কথা বলেন। কিন্তু আমি বারণ করি। বলি যে শাড়ি
আমার যথেষ্ট আছে। আর ও সাধ নেই। তার চেয়ে
ওই টাকারটা থাকলে ছেলেমেয়েগুলো দুটো ভালমন্দ খেতে
পরতে পারবে, সংসারে একটু শান্তি হবে। ঠিক কিনা ?

আমি নিঃশব্দে হাসলাম শুধু। আর বুঝলাম, একটি
প্রসঙ্গ মুহূর্তের প্রবেশায় যে ভাষাহীন কথাগুলো মুখবিত
হয়ে ওঠবার প্রবল ইচ্ছায় মনেব সঙ্কোপনে ব্যাকুল হয়ে
উঠেছিল, সে কথাগুলো মিথ্যে হয়ে হারিয়ে গেল।

অথচ ভেবে দেখলাম, ভুল করেছি আমিই। আসলে
আমার সাত বছর আগেকার পুরনো মনটাই এখনও রয়ে

গেছে। তাই দীর্ঘদিনের অনেক পরিবর্তনের পরেও আমি
সেই পুরনো পরিধির মধ্যেই নীমাবদ্ধ হয়ে আছি। কিন্তু
তুমি তোমার জীবনের অনেক ঘটনার একটি ঘটনার মতই
সাত বছর আগেকার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হয়েছ।
আজ তোমার কোন এক কর্মক্ষান্ত স্মৃতিবিহ্বল অলস
বেলায় উন্নয়ন হয়ে ওঠবার বিলাসিতার চেয়ে পাঁচজনের
সংসারের ভালমন্দের জন্ত অবকাশ অতিবাহন করার
প্রয়োজন অনেক বেশী। তাই যদি আমি সেদিনের মন
দিয়ে তোমাকে বিচার করতে গিয়ে বিফল হই, আর তুমি
যদি নিজেকে একজন মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও বেশবিশ্বাসের
প্রয়োজনকে অস্বীকার কবে আমার আন্তরিক ইচ্ছা আর
পছন্দকে সার্থক করে তুলতে অপারগ হও, তবে সে
তোমার দোষ নয়, আমারই দূরদর্শিতার অভাব।

সাত বছর আগে যে রঙ আর যে শাড়ি তোমার প্রিয়
ছিল, আজও যদি তাই থাকল, তবে আমিই বা আজ
সুশাস্তদা হব কেন, বীণা সেনই বা বীণাপাণি দাঁশ হবে
কেন ?

যাক। তারপর কি হল তাই বলি।

দরজার পাশ থেকে বীরেন ডাকল, বউদি—

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, একটু বস সুশাস্তদা,
আমি এখুনি আসছি।—বলেই তুমি বেরিয়ে গেলে।

একটু পরেই যখন ঘবে এসে ঢুকলে তখন তোমার
এক হাতে মিষ্টির প্লেট, অল্প হাতে জলেব গ্লাস।

টেবিলটা আমার সামনে টেনে দিয়ে বললে, জান তো,
গেরস্তের সংসারে অতিথি এলে একটু মিষ্টিমুখ না করালে
অকল্যাণ হয়।

বলেছিলে চটুলকণ্ঠে হাসতে হাসতে। কিন্তু সে
হাসিব গমকে গমকে জড়িয়ে গেল আমার নিঃসঙ্গ জীবনেব
করণ কান্না। আজ তোমার সংসারে আমি ক্ষণকালের
অতিথি মাত্র। অথচ সাত বছর আগে যেদিন তোমার
প্রতিশ্রুতিভঙ্গের খবব পেয়েছিলাম, বউদির চিঠিতে
জানতে পেরেছিলাম আমার সব স্বপ্নকে নিরর্থক করে
দিয়ে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, সেদিন ব্যর্থতায় ঝেঁপুনা
নিজেকে ধরে রাখতে পারি নি। পুরুষকে কোনদিন

অবুঝ ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখেছ ?
কিন্তু সে সমস্ত সাত বছর আগেকার কথা ।

বললাম, বেশ, তাই হোক । তোমার সংসারের
কল্যাণই হোক ।—বলে একটুকরো মিষ্টি ভেঙে নিয়ে মুখে
দিলাম ।

তুমি লঘুকণ্ঠে হেসে উঠলে । তোমার মুখে দেখলাম
পরিভূক্তির আনন্দ । আজ এত কথা লেখবার পর এ কথা
লিখতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হব না, সেদিন আমার জন্তে খুব
একটা বেশী রকমের ব্যবস্থা করা হয় নি । একটা প্রেটে
সাজানো ছিল তিন চারটে জিলিপি, একটা কবে ছোট
সন্দেশ আর রসগোল্লা, একটা সিঙাড়া । সামান্য আয়োজন ।
কিন্তু তুমি আমাকে হাতে করে দিতে পারার আনন্দে
গদগদ হয়ে এই সামান্য কটা খাবারকেই অসামান্য কবে
তুললে । ভাবের আতিশয্যে অতিথির চেয়ে আতিথেয়তার
আয়োজনকে বেশী করে ভাবলে ।

বললে, সবগুলো কিন্তু খাবে । আমি বাই, চা নিয়ে
আসি ।

তোমার ছেলেমেয়েগুলো ছিল আমার চারপাশ ঘিরে
দাঁড়িয়ে । তাদের ক্ষুধার্ত চোখগুলো আটকে ছিল মিষ্টির
প্রেটে । তুমি চলে যেতেই মনে হল তারা যেন অসহিষ্ণু
হয়ে উঠেছে । দেখলাম আমার মিষ্টি খাওয়ার প্রতিটি
ভাবভঙ্গী তারা লোলুপ আগ্রহে লক্ষ্য করছে । কতই বা
বয়েস হয়েছে, কিন্তু এবই মধ্যে জঠরাগ্নির প্রয়োজনকে কী
ভীষণভাবে জানতে পেরেছে তারা ।

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকেই তুমি তাদের ধমকে
উঠলে : আর তোমাকেও বলছি স্বশাস্তদা, একটুকরোও
ওদের হাতে দেবে না । এত খায়, কিন্তু খাই খাই স্বভাব
কি ওদের কিছুতেই মিটতে নেই ।

কাঠিহেসে মিষ্টির প্রেটটা একপাশে সরিয়ে রেখে আমি
চায়ের কাপটা টেনে নিলাম ।

তুমি বললে, ওয়া, সে কি ! কেবল সন্দেশটাই খেলে
দেখছি ! না না, এ হয় না স্বশাস্তদা ।

বললাম, বিশ্বাস কর, এতেই তোমার সংসারের মজল
হবে ।

কিন্তু দোকান থেকে কিনে আনা খাবারগুলো—

আমি হাসবার চেষ্টা করে বললাম, আজ না হয় জেনে
যাব, তুমি হতভাগ্য আমার জন্তে কয়েকটা খাবারের ক্ষতি
অন্ততঃ স্বীকার করতে পেরেছ ।

অন্ততঃ আর একটা মিষ্টি ?

না বীণা, বাড়ি থেকে একবাশ খেয়েই বেবিয়েছি ।
একটা মিষ্টি খেলাম, নইলে সামাজিকভাবে সৌজন্য রক্ষা
হয় না ।

তুমি রাগ করার ভান কবে বললে, তোমার সব
কথাতেই ভণিতা ।

এই বলে তুমি মিষ্টির প্রেটটা হাতে তুলে নিয়ে ভিতরে
চলে গেলে । আর অমনি তোমার ছেলেমেয়েরা তোমার
পিছনে পিছনে হুড়মুড় করে ছুটে গেল । পরক্ষণেই মনে
হল দেয়ালের ওপাশে একটা চাপা হলুদুল কাণ্ড হচ্ছে ।
ছেলেমেয়েগুলো বুঝি তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার
অভুত খাবারগুলো ছিনিয়ে নিতে চাইছে । তুমি বোধ
হয় খাবারগুলো ওদের ভাগ করে দিলে । ওরা চুপ
করল ।

কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েদের একজন এতই
ছেলেমানুষ যে আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, সে হঠাৎ
বলে উঠল, বা রে, মা, তুমি গোটা রসগোল্লাটাই—

আর শোনা গেল না, তুমিই ওর মুখ চেপে ধরলে ।

আমার কী যে হল, এ ঘরে একলা থাকতে থাকতে
সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল । সহসা আমার মনে
হল এই ঘরেব একটা রহস্যময় আত্মা আছে । তাকে
ইঙ্গিত দিয়ে অহুভব করা যায় ।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বুঝলাম, এটিই শেষ চুমুক ।
স্বাদে গন্ধে স্বকীয়তা হারিয়ে চা-টা এমন অবস্থায়
পৌঁছেছিল, সেটা সম্ভব হয় বহুক্ষণ আগে তৈরি কবে রাখা
চা আবার গরম করলে । স্বতবাং চায়ের কাপটা নামিয়ে
রাখতে হল ।

নামিয়ে রেখে মুখ তুলেই যাকে ঘবেব মধ্যে দেখলাম,
প্রথম দেখলেও আমার চিনতে ভুল হল না তিনিই
তোমার স্বামী ধীরেনবাবু । আমি হাত তুলে তাঁকে

নমস্কার জানালাম, তিনিও যেন কতকটা নিয়ম-মাফিকই প্রতিনমস্কার জানালেন। কিন্তু তাঁর জুটে য়েখানে বজ্র হয়ে এসে মিশেছে, তার কুঞ্জন-রেখায় দেখলাম কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

এমন সময় তুমি ঘরে এসে ঢুকলে। স্বামীকে দেখেই নিমেষের জন্তে একটা আলোছায়ার বন্দ ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল তোমার মুখে। তাবপর স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে তুমি আমার যে পরিচয় দিলে, তাতে আমি অবাক হয়ে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বললে, গিলিমার জায়ের ছেলে স্মৃশাস্তদা গো! সেই যে বাবা মারা যাবার পর ও-বাড়িতে সেবার থাকে দেখেছিলে?

বলা বাহুল্য, তোমার বাবা যখন মারা যান আমি তখন কলকাতা থেকে চারশো মাইল দূরে। এ কথা তুমিও জানতে, আমিও জানতাম, এবং আমরা আজও জানি। এবং এ কথাও তুমি বেশ ভাল করেই জানতে ছ বছর আগে তোমার বাবা মারা যাবার সময় তোমাদের এস. আর. দাশ রোডের বাড়িতে অনেক লোকের ভিড়ে একটি বিশেষ লোককে মনে কবে রাখা তোমার স্বামীর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কী স্মৃনিপুণ আর স্মন্দর তোমার মিথ্যাচার।

কিন্তু এহেন বিশিষ্ট কুটুবেব শুভাগমনে তোমার স্বামী বিশেষ পুলকিত হলেন বলে মনে হল না। বিশেষ করে যে ব্যক্তিব বয়স তেত্রিশও হয় নি, যে কিনা-স্ববেশ-শৌখিন। তাঁর দৃষ্টিটা ছিল আমার দিকে। মনে হল তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি যেন নিরুপণ করতে চাইলেন তোমার বক্তব্যের সত্যতা।

তখনই তুমি আবার বললে, তা তোমার হয়তো ঠিক মনে নেই। স্মৃশাস্তদা কাজ করেন গিয়ে সেই জলপাইগুড়ির কি একটা চা-বাগানে। কালই এসেছেন কলকাতায়।

কথাটা বললে অনেকটা যেন কৈফিয়তের স্বরে। কেন না কলকাতায় থাকি না বলেই এতদিন পরে হঠাৎ তোমার খোঁজখবর নিতে এসেছি, স্বামীর সংশয় নিবন

করতে গিয়ে খুব সম্ভব এই কথাই 'তুমি' ভেবে থাকবে। অন্ততঃ আমার তাই মনে হল।

এতক্ষণ পরে এবার ধীরেনবাবু হাসলেন। অনেকটা যেন ভদ্রতা বক্ষার্থেই একটু সহজ হলেন। বললেন, অতদূরে থাকা হয়। নইলে এতদিনে আলাপ করবার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই হয়ে যেত—কি বলেন; অ্যা?

বলেই তিনি হেসে উঠলেন। যদিও খুব ভদ্রভাবেই হাসলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, নইলে সেই হাসিটা আমার কাছে দ্ব্যর্থক বলে মনে হবে কেন?

ঠিক তখনই ধীরেনবাবু ভিতরে চলে যেতেই আমি উঠে দাঁড়লাম।

বাই বীণা।

তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে।

যাবেই?

মান হেসে বললাম, থাকলে তো আর কিছুক্ষণই থাকতাম। তা ছাড়া অনেকটা পথ যেতে হবে।

বিদায়ের বেলা এসেছে। এখনই চলে যাব। অনেকটা পথ, চারশো মাইল। সেই চা-বাগানের দীর্ঘ-বিলম্বিত মস্তুর দিনরাত্রিগুলোর কথা মনে পড়ল। সেই স্বস্তিহীন আশাহীন বকুহীন নিঃসঙ্গ জীবন। এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না।

অস্পষ্ট ছায়ার মত দরজার পাশে এসে দাড়িয়ে দাঁড়লাম। আমি চলে যাব, তুমি থাকবে।

মুহূর্তের জন্তে আজকের এই বিমর্ষ সন্ধ্যাব সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলে গেলাম। আসন্ন বিদায়ের ভাবনায় ভারী হয়ে এল কণ্ঠস্বর।

বীণা!

বল।

যাবার আগে একটি কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যাব, কই, আমি কেমন আছি। সে কথা তো তুমি একটু-বারও জিজ্ঞাসা করলে না?

তুমি অত্যন্ত সহজভাবে হেসে উঠলে: কেমন আবার থাকবে, ভালই আছি। চা-বাগানে অনেক টাকাই তো পাও।

একটা বিষয়, শূণ্য স্থান হাসি দিয়ে তোমার অকুণ্ঠিত নির্বিকার উত্তরটা গ্রহণ করতে হল। নিজেকে কোনদিন বিশ্লেষণ করে দেখি নি, কিন্তু তবু একবার তোমার কথার উত্তরে বলতে ইচ্ছে করল, সাত বছর আগে একদিন অপ্রত্যাশিত আশাভঙ্গের বেদনায় আমি যে কৈদে ফেলেছিলাম, তোমার অবিস্মরণীয় স্মৃতিকে কেন্দ্র করে যে কামার পরিক্রমা আজও শেষ হয় নি, আমার জীবনেব সঙ্গীহীনতার নৈবাঞ্ছিত আর প্রাত্যহিক অবসাদের দীর্ঘশ্বাসে যার অল্পরূপন আজও আমি গুনতে পাই, চোখ দিয়ে তুমি দেখতে পেলো না, কিন্তু কান দিয়ে কি সত্যিই গুনতে পাও নি তাকে?

বললাম, আব একটা কথা, আমি বিয়ে করেছি কিনা জানতে চাইলে না তো?

তুমি তেমনি হাসিমুখে বললে, না, কর নি। কবলে তোমার এই ভাবপ্রবণতা থাকত না।

বিদ্যায় ঝলসে ওঠে মনের অন্ধকারে। সেই আলোতে দেখতে পাই তোমাকে, আঞ্জের সন্ধ্যার রহস্যময়ী বিচিত্ররূপিণী তোমাকে। আমিই ভুল করেছিলাম। সব শেষ হয়ে গেছে—আব একটাও কথা নয়, একটি মুহূর্ত নয়, আমি যেন ছিটকে রাস্তায় নেমে গেলাম।

মাতালের মত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললাম আমি। কলকাতায় এত লোক, এত লোকের কলরব, কিন্তু আমার মনে হল আমি যেন এক জনহীন শব্দহীন ধূসর মরুভূমির রুক্ষ বালুতে পা ফেলে অনন্ত পথ হেঁটে চলেছি। আমার এতদিনের চেনা পৃথিবীটা অচেনার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা। কিন্তু এই কয়েকটি ঘণ্টা যেন যুগান্তরের ব্যর্থতার মধ্যে রয়ে গেল। আজ এগারোই পৌষের সন্ধ্যায় প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিমানভরা অহুযোগ নিয়ে এই পথে এসেছি, ফিবে চলেছি দুঃসহ অভিজ্ঞতার ক্লাস্তি নিয়ে।

ঠিকই বলেছিলে। আমি হতভাগ্য, মূঢ়, সেক্টিমেণ্টাল ফুল। আমি চলিষ্ণু জীবনের অনিবার্য বিবর্তনের কথা জানতাম না, আমি পথের মিছিল থেকে সরে দাঁড়িয়ে-ছিলাম।

দেবনাথ তখন দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ করছিল, এমন সময় আমি হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আলোয়ানটা সরিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক বের করে দেবনাথের হাতে দিয়ে বললাম, শাড়িটা লাগবে না রে ভাই!

দেবনাথ একটু অবাক হল : পছন্দ হল না? কিন্তু শাড়িটা তো বাজারে খুবই চলছে এখন। ঠিক আছে, জুতা শাড়ি দেখাচ্ছি।

আমি বললাম, না ভাই, পছন্দ-অপছন্দের কথা নয়, আসলে শাড়িটা লাগবেই না।

দেবনাথ আমার বাল্যবন্ধু। সে কিছু একটা অহুমান করে মুচকি হেসে শাড়িটার দাম, অর্থাৎ ত্রিশটা টাকা আমাকে ফিরিয়ে দিল।

পরের দিনই এখানে চলে এলাম।

আসবার সময় দাদা বউদি আবও কয়েকটি দিন থেকে যাবার জন্তে অনেক করে বলেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁদের সমস্ত অলুরোধ-সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছি।

এখানে এসেই শাড়িব দামটা তোমাকে পাঠিয়ে দিলাম আর লিখে পাঠালাম একটা চিঠি।

তারপরের সব ঘটনাই তো তুমি জান এবং আমিও লিখলাম। সব কথা লিখতে বসে অনেক কথাই হয়তো লেখা হয়ে ওঠে নি। তার জন্তে কোনও ক্ষতিও হবে না। যা লিখলাম সবই সত্যি। সবই সহজ সরলভাবেই লেখবার চেষ্টা করেছি। ‘আমি আপন মনের মাপুরী মিশায়’ আর বড় বড় ভাষার হেঁয়ালি করে তাকে ছর্ব্বোধ্য করে তোলবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি নি। এর মধ্যেই তুমি তোমার সব প্রশ্নের জবাব পাবে।

একই কথা বারবার উল্লেখ করবার ইচ্ছে আমারও ছিল না, তবু শেষবারের মত বলি, তোমাকে আশ্বাত করবার ইচ্ছে নিয়ে আমি কিছু বলি নি। আমি আজও সেদিনকার মতই তোমাকে ভালবাসি। তোমার স্মৃতিই আমার স্বপ্ন। নিজের ব্যর্থতার জালায় আমার সাইফার মনটাকে জঁধার গরলে ভরিয়ে দিয়ে সংসারের ভালমন্দের

জন্তে তোমার স্বার্থত্যাগের বিচার করতে বলি নি আমি। আমাকে ভুল বুঝ না। আমি দেখলাম আর একটা দিক। যেখানে অসত্য সন্দেহ আর কুকচির পঙ্কিল অন্ধকারে অনেক কিছু তোমার দৃষ্টির বাইরে। তারই প্রতিবিম্ব পড়ল এই চিঠিতে। এই চিঠিকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির জন্মান্তর বলতে পার।

এইখানেই আমি থামতাম। কিন্তু আর একটা কথা। গতরাত্রে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। পরিশেষে সেই স্বপ্নের কথা বিবৃত করছি।

স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন অনেকদিন পরে ঠিক সেই দিনটিতেই, সেই এগারোই পৌষ আবার তোমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

তুমি হাসিমুখে আমার কাছে এসে দাঁড়ালে। স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলে : ইনি হচ্ছেন সুশান্ত গুপ্ত। ঐর সঙ্গে এক পাড়ায় পাশাপাশি স্নেহভ্রূক্ষে অনেকদিন কাটিয়ে এসেছি।

ধীরেনবাবু আর আমি হাসিমুখে নমস্কার বিনিময় করলাম।

তুমি বললে, আজ এগারোই পৌষ সুশান্ত।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আজ তোমার জন্মদিন। ঠিক

এই দিনটিতে তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারার জন্তে আমি এত পথ ছুটে এসেছি। আমার এই ক্ষুদ্র উপহারটুকু—

এই বলে পকেট থেকে কাগজে মোড়া একখানা আসমানী নীল শাড়ি তোমার হাতে তুলে দিলাম।

তুমি বললে, কি আছে এতে? শাড়ি?

বললাম, না, আমার মনেব গোপন অমুভূতি।

তুমি সহাস্রমুখে মোড়কটা খুলে শাড়িটা দেখলে।

আমি বললাম, নীল শাড়ি পরলে তোমায় বেশ লাগত।

একটু পবে শাড়িখানা পরে এসে তুমি ঘরে ঢুকলে। আমি হাসলাম, ধীরেনবাবু হাসলেন, তুমি হাসলে—সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম। কোথা থেকে ছুটে এল তোমার ছেলেমেয়েরা। আমাদের হাসির হোঁথায় তাদের ছোট্ট মুখগুলোও হাসিখুশীতে ভরে উঠল।

আমার মনে হল এই ঘরে বিশাল আকাশখানা নেমে এসেছে অফুরন্ত আলো নিয়ে, দূরের সমুদ্র নিয়ে এসেছে মৌজুমী হাওয়ার উত্তরোল। আনন্দ, আনন্দ আব আনন্দ।

অধীর আনন্দে আমরা হেসেই চললাম। ইতি—



কবিমানসী

জগদীশ
ভট্টাচার্য

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

॥ “সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত” ॥

৬

‘শ্যামলী’র পরবর্তী দুখানি কাব্যগ্রন্থ ‘খাপছাড়া’ [মার্চ ১৩৪৩] এবং ‘ছড়ার ছবি’ [আশ্বিন ১৩৪৪] রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত। ‘ছড়ার ছবি’তে ‘স্মৃতি দিয়ে আঁকা’ ব্যক্তিজীবনের চিত্রশিল্প রচিত হয়েছে “কাঠের সিঁড়ি”, “প্রবাসে”, “পদ্মায়”, “বালক”, “আতার বিচি” প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায়। কিন্তু ‘শ্যামলী’র পরে কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলন হল ‘প্রাস্তিক’। প্রকাশ-কাল পৌষ ১৩৪৪।

‘প্রাস্তিক’ কবিজীবনের এক অভিনব অভিজ্ঞতার কাব্য। ১৩৪৪ সালের পঁচিশে ভাদ্র শান্তিনিকেতনে উত্তীর্ণ-সঙ্কায় কবি অকস্মাৎ অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। সেই মগ্নচেতন অবস্থায় দুদিন অভিবাহিত হল। কবির অসুস্থতার কথা চারদিকে তড়িৎবার্তায় প্রচারিত হয়েছিল। কলকাতা থেকে প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার শান্তিনিকেতন পৌঁছে রোগ নির্ণয় করলেন এবং তাঁর চিকিৎসায় কবি পুনরায় চেতনা ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে, চেতনার প্রান্তসীমানায় পৌঁছে, কবিমানসের যে অভিজ্ঞতা তারই ছন্দিত বাণীরূপ ‘প্রাস্তিক’। ‘অন্ধতামসগহ্বর’ হতে সূর্যালোকে প্রত্যাবর্তন করে কবি পরম বিশ্বাসে নূতন চোখে আপনার পানে তাকিয়েছেন। অসুস্থ হবার এক-পক্ষকাল কেটে যাবার পর ‘প্রাস্তিকে’র প্রথম কবিতা

লিখিত হল ২৫শে সেপ্টেম্বর। বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে চুপে চুপে মৃত্যুদূতের আবির্ভাব এবং পুনশ্চেতনপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কবি বলছেন :

কোন ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নবনাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা। শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল একপ্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে,
আলোকের থরহর শিহরণ চমকি চমকি
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে অসীম তজ্জার স্তূপে স্তূপে,
দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে। ১॥

গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত নদীপথে অকস্মাৎ প্রাবনের দুঃস্বপ্ন ধারায়
বহুর প্রথম নৃত্য যেভাবে শাখায় শাখায় বিনশিত
গতিবেগে প্রবাহিত হয়, তেমনি চেতনাব নবজাগরণ শূন্য
আধারের গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে অন্তঃশীলা জ্যোতির্ধারা
প্রবাহিত করে দিল। অচেতন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে
চেতনলোকে পৌঁছবার সেই অমূল্যভূতিকে ভাষা দিয়ে কবি
বলছেন :

আলোকে আধারে মিলি

চিত্তাকাশে অর্ধক্ষুণ্ট অম্পষ্টের রচিল বিভ্রম।
অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন লম্বোহর
স্থূল কারাপ্রাচীর-বেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যাব-অভ্যুদয়ে। ১॥

“স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যাব-অভ্যুদয়ে” যে নূতন
প্রাণের সৃষ্টি হল তার নিগূঢ় পবিচয় কবিমানসের
বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে,
২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবরের মধ্যে লেখা ‘প্রাস্তিকে’র

প্রথম কবিতাগুলোর আটটি কবিতায় কবিমানসে
আকাশের নির্মলতম মুক্তি থেকে মর্তের মধুরতম আসক্তির
লীলা মনভাবে বিলসিত হয়ে উঠেছে। উপলব্ধির প্রথম
দিকে মুক্তিচেতনাই মুখ্য, কিন্তু ধীরে ধীরে মর্তের মধুর
আসক্তিতে কবিমানস পুনরায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছে।
প্রথম কবিতাটি রচনার চাবদিন পরে তৃতীয় কবিতায়
কবি বলছেন :

এ সন্দের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিছ সন্মুখে
অজ্ঞাত স্বদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসন্দের দেশে।
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।

* * *
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিতহস্তে মোবে বিরচিত হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।
হুদিন পরে পয়লা অক্টোবরে লেখা চতুর্থ কবিতায় কবি
আবার বলছেন :

আদিম সৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে-আনন্দ রূপা নিল আমার সত্যায়
আজঃ ধূলিমগ্ন তাহা, নিজ্রাহারা রূপ বুদ্ধফার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিকে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতে সেই আদিনিবার তলায়।

এই কবিতার তিনদিন পরে লেখা পঞ্চম কবিতায়
আসক্তি-মুক্তির দৃষ্টি-প্রথম-পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই
কবিতাটি একটি অমিত্রা চতুর্দশী। তার ষষ্ঠকবন্ধে
আসক্তির সুরটি স্পষ্টোচ্চারিত :

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়াসুত্রি প্রেতভূমি হতে
নিয়ছে আমার সঙ্গ, গিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অক্ষুট মেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনীরনে।

কবির “পশ্চাতের নিত্যসহচর”, তাঁর “অকৃতার্থ অতীতের”
“অতৃপ্ত তৃষ্ণা” যে পুনরায় তাঁর সঙ্গ নিয়েছে, অষ্টকবন্ধের
এই অংশে কবি তা স্বীকারনা করে পারেননি। কিন্তু
ষট্‌কবন্ধে আসক্তি থেকে মুক্তির সুরই প্রবলতর :

পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন ;
বেথেছ হরণ করি মরণের অধিকাং হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুবে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূর-চাওয়া আকাশেতে তারমুক্ত চিরপথিকের
বাশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারই হব অঙ্গগামী।
তারমুক্ত চিরপথিকের বংশীধ্বনি শুনে তারই অঙ্গগামী
হবার আকাজক্ষা এই কবিতায় উচ্চারিত হলেও, বিশ্বাসের
সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে, ওই একই দিনে লেখা ষষ্ঠ
কবিতায় কবিচিন্তে নূতন সুর বেজে উঠেছে। সে সুর
আসক্তির, নবাহরণের। কবি বলছেন :

সন্মাসীর গৈরিক বসন লুকায়েছে তুণতলে
সর্ব-আবর্জনাগ্রাসী বিরাট ধূলায়, জপমন্ত্র
মিলে গেছে পতঙ্গগুঞ্জে।

* * *
যেথায় রোমহরত ধেমু
আলস্ত্রে শিথিল-অঙ্গ, তৃপ্তিবসনভোগ তাদের
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত স্তম্ভার গভীরে।
দলে দলে প্রজাপতি রৌদ্র হতে নিতেছে কাঁপায়ে
নীরব আকাশবাণী শেফালির কানে কানে বলা,
তাহারি বীজন আজি শিরায় শিরায় রক্তে য়োর
মুহু স্পর্শে শিহরিত তুলিছে হিলোল।
এই কবিতাবই শেষাংশে অভিব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্র-মানসে
অভিলষিত মর্ত-আসক্তির অবিস্মরণীয় বাসনা :

হে সংসার,
আমারে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন করো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষকের মতো।
এই সঙ্কল্প কাঙালপনা বলিষ্ঠ প্রেমের রূপ নিয়ে দেখা
দিয়েছে পবনবর্তী কবিতায়। শুধু মর্তপ্রেম নয়, তার মর্মমূলে
নিত্যবিরাজমান মাননী-প্রেমের অকৃত জয়ধ্বনিই সেখানে
বিঘোষিত। মুমুক্ষাকে কবি বলেছেন, “অকৃতজ্ঞতার
বৈরাগ্য-প্রলাপ”, “বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে
চাওয়া আপনার আবেষ্টন হতে।” এই বৈরাগ্যপ্রলাপকে
ধিকার দিয়ে কবি বলছেন, প্রভাতে প্রথমজাগা পাখি
যে সুরে আপনাতে আপনার আনন্দ ঘোষণা করে তিনি
সেই সুরেই গাইবেন : “ধস্ত এ জীবন মোর”। জীবনে

দুঃখ দেখা দিয়েছিল, ব্যথাব বাঁশির স্বরে তিনি দুঃখ-
বাগিনীকে খেলিয়েছেন। অন্তরের নানা বেদনায় নানা
রক্তে প্রাণের ফোয়ারা উৎসারিত হয়েছে—

এঁকেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বারবার
ক্ষণিকের পটে, মুছে গেছে রাজির শিশির জলে,
মুছে গেছে আপনার আগ্রহ স্পর্শনে—তবু আজো
আছে তাবা সূক্ষ্মরেখা স্বপনের চিত্রশালা জুড়ে,
আছে তাবা অভীতেব গুহ্যমালাগন্ধে বিজড়িত।
কালের অঞ্জলি হতে ভ্রষ্ট কত অব্যক্ত মাধুরী খরে থবে
মনের বাতাসকে বসে পূর্ণ করে রেখেছে। তাব মধ্যে
সবচেয়ে স্মরণীয় জীবনেব যে দান তার প্রসঙ্গে কবি বলছেন :

অনভিজ্ঞ নবকৈশোরের

কম্পমান হাত হতে স্থলিত প্রথম বরমালা
কণ্ঠে ওঠে নাই, তাই আজিও অক্লিষ্ট অমলিন
আছে তার অক্ষুট কলিকা। সমস্ত জীবন মোর
তাই দিয়ে পুষ্পমুকুটিত। পেয়েছি যা অযাচিত
প্রেমের অমৃতরস, পাইনি যা বহু সাধনায়
দুই মিশেছিল মোর পীড়িত যৌবনে।

আত্মমানসেব নিগূঢ় রহস্যলীলা সম্পর্কে কবির এই অকপট
স্বীকৃতিই এই কবিতাংশের কাব্যজীবিত। অনভিজ্ঞ
নবকৈশোরের কম্পমান হাত হতে স্থলিত জীবনেব প্রথম
বরমাল্য কণ্ঠে ওঠে নি বলেই তার অক্ষুট কলিকা কবি-
জীবনের অন্তিমলগ্নেও অক্লিষ্ট অমলিন বয়েছে। শুধু
তাই নয়, কবি বলছেন, তাঁর সমস্ত জীবন “তাই দিয়ে
পুষ্পমুকুটিত”। যে প্রেমের অমৃতবস বহু সাধনা কবেও
তিনি পান নি, অথচ অযাচিতভাবেই যা অগ্নি পাত্রে তাঁর
ওষ্ঠাধরলগ্ন হয়েছে, বিবহমিলনের দ্বিধাবিভক্ত প্রেমের
সেই দুই ধারা মিশেছিল তাঁর পীড়িত যৌবনে।
আজ “মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর জীবনযাত্রায়” কবি
প্রেমেব সেই যুগল প্রবাহকেই পবন স্বীকৃতি দান
করলেন। ববীন্দ্রমানসলোকে কবিমানসীর প্রেম কোন্
আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কতটুকু স্থান অধিকার করে
আছে তার গুরুত্ব নির্ণয়ে প্রান্তিকের এই কবিতা-সপ্তক
অস্ফুট উপকরণ রূপেই গ্রহণযোগ্য।

৭

‘প্রান্তিকে’র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ হল ‘সেঁজুতি’। প্রকাশ
ভাঙ্গ ১৩৪৫। সেঁজুতি অর্ধসাঁঝের বাতি। কবি বলছেন,
‘সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ওর মানেটা ভালো।’
“উৎসর্গ” কবিতায় কবি লিখেছেন :

মর্তেব প্রাণরত্নভূমিতে

যে চেতনা সারারাত্তি

স্বপ্নদুঃখের নাট্যলীলায়

জ্বলে রেখেছিল বাতি

সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়

অচিহ্নিতেব পাবে,

নবপ্রভাতের উদয়সীমায়

অরুণলোকেব দ্বারে।

প্রাণরত্নভূমির স্বপ্নদুঃখের নাট্যলীলায় যে চেতনার বাতি
সারারাত্তি প্রোজ্জ্বল হয়ে ছিল জীবনের সন্ধ্যালগ্নে তাই
হয়েছে সাঁঝের বাতি। এই সময়কার কবির মনোভাব
১৩৪৪-এর ৭ই মাঘ তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা
একখানি পত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি লিখেছেন, “আজ
আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ
হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের
জগ্গে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিষে দেবে দৌড়। সেই
মাতালটা বডো হাটের জগ্গে ফসল-ফলানো কেয়ার করে
না।”

‘সেঁজুতি’র প্রথম কবিতা “জন্মদিনে”র উপাস্ত স্তবকে
সাঁঝের বাতিব তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
১৩৪৫-এর “পঁচিশে বৈশাখ” কবিতাটি কালিম্পঙ থেকে
আকাশবাণীর উদ্যোগে কবিকণ্ঠে সর্বত্র প্রচারিত হয়।
“জন্মদিন” ‘প্রান্তিকে’র প্রথম-গুচ্ছের কবিতাবলীর দোসব।
কবি বলছেন, তাঁর এবারকার জন্মদিনটি “বিলুপ্তিব
অন্ধকার হতে মরণের ছাড়পত্র নিয়ে” “প্রাণের প্রান্তপথে”
ডুব দিয়ে উঠেছে। জন্মদিন মৃত্যুদিন একসময়ে বসে কবি-
চেতনায় নূতন উপলব্ধি বচনা করেছে। মর্ত থেকে বিদায়
নেবার জগ্গে প্রস্তুত হয়ে পৃথিবীকে সন্মোদন করে কবি
বলছেন :

তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষ গ্রহবের ঘণ্টা ; সঙ্গে সঙ্গে ক্রান্ত বক্ষোমাবো
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ যে অদূরে
ধ্বনিভেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর স্তবে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যাবা জ্যোতি
সেই কটি বাতি দিয়ে বচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সম্পূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে ; দিনান্তেব শেষ পলে
রবে মোব যোন বীণা মুছিয়া তোমাব পদতলে।
জীবনের স্মৃতিদীপে যে-কটি বাতি জ্বলছে তাই দিয়েই
কবি তাঁর 'সৈজুতি' রচনা করেছেন। "জন্মদিন" কবিতাটিতে
এই যুগেব কবিমানসের মর্মবাণী নির্ধারিত হয়েছে।
আসক্তি ও মুক্তির নীলে আব হলুমে মিলে কাব্যের যে
ময়ূরকণী রঙ ওর মধ্যে ফুটে উঠেছে তার তুলনা খুঁজে
পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানেও, মুক্তিব আনন্দ
নয়, বিদায়ের মর্মস্তব বেদনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিতাটির
অন্তিম চতুষ্ক সেই বেদনারই অবিস্মরণীয় বাণীরূপ :

আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা

ফুল যাব ধরে নাই, আর রবে খেয়াতবীহারী

এপারের ভালোবাসা—বিবহস্মৃতির অভিমানে

ক্রান্ত হয়ে বাজিশেষে ফিববে সে পশ্চাতেব পানে।

"নাগকেশরের চারা—ফুল যাব ধরে নাই", আর
"খেয়াতবীহারী এপারের ভালোবাসা"—কবিমানসের
অতুরাগরঞ্জিত চেতনার এই দুটি প্রতীক রবীন্দ্রকাব্য-
প্রবাহেও স্ফূর্তত।

'সৈজুতি' ১৩৪৩ থেকে ১৩৪৫ সালের মধ্যে লেখা
ইতস্ততঃ-বিশিষ্ট কবিতার সংকলন। নানা রঙের দিনগুলি
ওতে ধরা দিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও মূল স্মৃতি চিনে
নিতে পারা যায়। "যাবার মুখে" [২২ মার্চ, ১৩৪৩]
কবিতায় তারই আভাস পাওয়া যাবে। মুক্তবন্ধ ধনিপ্রধান
ছন্দে কবি ঘোষণা করছেন, "যাক এ জীবন পুঞ্জিত তাব
জঞ্জাল নিয়ে যাক।" কিন্তু জীবনের যত কিছু পুঞ্জিত
জঞ্জাল, যত কিছু ফাঁকি, সব যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে
তখনও এমন সম্পদ থাকবে যা অমূল্য, অনির্বচনীয়। সেই
বিশ্বাসেই কবি বলছেন :

নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু ফাঁকি

তবুও যা রয় বাকি—

জগতেব সেই

সকল কিছুর অবশেষেতেই

কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়,

মন-ভোলাবাব অকারণ গানে কাজ-ভোলাবার খেলায়।

সেখানে যাহাবা এসেছিল মোর পাশে

তারা কেহ নয় তারা কিছু নয় মাছুষেব ইতিহাসে।

শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আখির কোণে,

অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।

দখিন হাওয়ার পথ দিয়ে তারা উকি মেঝে গেছে দ্বাবে,

কোনো কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারি নি কারে।

"মন-ভোলাবাব অকারণ গানে, কাজ-ভোলাবাব খেলায়"

কবিজীবনে যারা যোগ দিয়েছিল, কবিব মানসালোকে

যাবা অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে, দখিন-

হাওয়ার পথ দিয়ে যাদের আনাগোনা, তাদের যাওয়া-

আসার মধ্যেই কবি পেয়েছেন "নিভোব পরিচয়"। তাদের

স্পর্শেই কবির "অসীম আমি" তাঁর সংগীতে ধরা দিয়েছে।—

"প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।"

সেই আমার রহস্য সবচেয়ে যাব চোখের আলোয়
অনাবৃত হয়েছিল তাব সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় দিনের আলোয়
নয়, সন্ধ্যাব অন্ধকাবেই সম্ভব। 'সন্ধ্যা'র কাছে তাই
কবির প্রার্থনা :

দিনেব আলো সবার আলো

লাগিয়েছিল ধাঁধা,—

অনেক সেধায় নিবিড় হয়ে

অনেক দিল বাধা।

নানান-কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে

হারানো আর পাওয়ায়

নানান দিকে ধাওয়ায়।

সন্ধ্যা ওগো কাছের তুমি,

ঘনিয়ে এসো প্রাণে,—

আমার মধ্যে তারে জাগাও

কেউ যারে না জানে।

ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি
একলারই দীপখানি,
মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ,
কাছাকাছি বসার,
অতি-দেখার আবারণটি ধরাব।
[“সন্ধ্যা”, ‘সেঁজুতি’]

৮

‘সেঁজুতি’র পরবর্তী ‘আকাশপ্রদীপে’র নামকরণের তাৎপর্য ওই “সন্ধ্যা” কবিতাটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। সন্ধ্যাকে কবি বলছেন, “ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি একলারই দীপখানি; মুখোমুখি চাওয়াব সে দীপ, কাছাকাছি বসার।” এখানে উল্লেখযোগ্য ‘সেঁজুতি’ আর ‘আকাশপ্রদীপে’র মাঝখানে ‘প্রহাসিনী’ নামে হাস্যরসাত্মক একখানি প্রক্ষিপ্ত কাব্যগ্রন্থ আছে; আমাদের আলোচনায় তার স্থান নেই।

‘আকাশপ্রদীপে’র নাম-কবিতায় আকাশপ্রদীপ নামকরণের অর্থ ও তাৎপর্য পরিস্ফুট। কবি বলছেন, গোধূলিতে আধাব নেমেছে, ফুরিয়ে এসেছে বেলা। “ঘরের মাঝে সাদ হল চেনা মুখের মেলা।”

দূরে তাকায় লক্ষ্যহার
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।

‘সেঁজুতি’র সঙ্গে ‘আকাশপ্রদীপে’র এখানেই পার্থক্য। “জীবনেব স্মৃতিদীপে” যে-কটি বাতি জ্বলছিল সেগুলির সাহায্যেই কবি সপ্তমির দৃষ্টির সম্মুখে সন্ধ্যারতির ‘সেঁজুতি’ জালিয়েছিলেন। কিন্তু ধীবে ধীবে সেই বাতিগুলিও একটি একটি নির্বাপিত হয়ে ঘরের মাঝে চেনা মুখের মেলা যখন সাদ হল তখনই দেখা দিল ‘আকাশপ্রদীপে’র “একলারই দীপখানি।” “মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ, কাছাকাছি বসার।” কবি বলছেন:

মিলন রাতে সাক্ষী ছিল যারা
আজো জলে আকাশে সেই তারা।

পাণ্ডু-আধার বিদায়রাতের শেষে
যে তাকাত শিশির-সজল শূন্যতা-উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অন্তলোকের প্রাস্তবাসের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বলাই আকাশ-পানে—
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

[‘আকাশপ্রদীপ’]

কবিমানসের আকাশে উদ্ভাসিত সেই একটি তারা তাঁর জীবনসন্ধ্যার সেই শেষ তারারিবি উদ্দেশেই কবি তাঁর আকাশপ্রদীপ জালিয়েছেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন, “এই কবিতাটি পূর্ববীর ‘তারা’ কবিতাটির স্মরণ করাইয়া দেয়—“ওই কি আমার হবে আপন তারা।” আজ জীবনের সন্ধ্যায় আসিনা প্রথম জীবনপ্রত্যুষের ধ্রুবতারার কথা কি মনে হইতেছে।”

কিন্তু এখানে সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসার কোন অবকাশই নেই। কবির জীবনসন্ধ্যার ‘আকাশপ্রদীপে’র সঙ্গে জীবনপ্রভাতের ‘সন্ধ্যাসংগীতে’র “উপহার” কবিতাটি মিলিয়ে পড়লেই তাঁর মানস-আকাশের এই তারারিবি অদ্ভান্ত পবিচয় পাওয়া যাবে। ‘সন্ধ্যাসংগীতে’র “উপহার” কবিতায় কবি বলছেন:

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মুরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি।

বলাই বাহুল্য, কবিতাটি নতুন বোঁঠানকে উৎসর্জিত। তাঁরই স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি তরুণ কবির মানস-আকাশে তারা হয়ে ফুটে উঠেছিল। সেই তারাই তাঁর জীবনসন্ধ্যার শেষ তারা রূপে দেখা দিয়েছে।

‘আকাশপ্রদীপে’র তাৎপর্য ‘শ্রামলী’র “বিদায়-বরণ” কবিতাটিতেও স্পষ্ট। দেখানে কবি বলছেন:

মন বলছে, ডাকো ডাকো,
 ঐ ভেসে-ধাওয়া পারের খেয়াব আরোহিণী,
 ওকে একবার ডাকো ফিরে ;
 দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো
 ওর মুখের দিকে ,
 করো ওকে বিদায়-বরণ ।

‘আকাশপ্রদীপে’র বেশির ভাগ কবিতাই ‘স্মৃতিবে আকাব
 দিয়ে আকা।’^{৩০} আর সেই স্মৃতির কেন্দ্রভূমিতে আছেন
 নতুন-বোঁঠান। প্রত্যক্ষভাবে তাঁরই স্মৃতি নিয়ে তিনটি
 কবিতা রচিত :—“শ্রামা”, “জানা-অজানা” এবং “কাঁচা
 আম”। “জানা-অজানা” কবিতায় একটি সংকেত
 সংগৃহ্য হয়ে আছে। সেই সংকেতের সাহায্যেই কবি-
 চেতনার উৎস সন্ধান করতে হবে। সারাজীবনে
 রবীন্দ্রনাথ একবারই মাত্র এই সংকেতটি ব্যবহার
 করেছেন।

টেবিলে হেলানো ক্যালেন্ডার,
 হঠাৎ ঠাহর হল আটাই তারিখ।

এই “আটই তারিখ” রবীন্দ্রজীবনে সবচেয়ে মর্যাস্তিক স্মৃতি-
 বিজড়িত দিন। ১২৯১ সালের আটই বৈশাখ নতুন-
 বোঁঠানের মৃত্যু হয়েছিল। কবি তাঁর স্মৃতিচেতনাকে “স্পষ্ট
 আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠামা” ঘরের সঙ্গে তুলনা করে
 বলছেন :

এই ঘরে আগে পাছে
 বোবা কালা বস্ত্র যত আছে
 দলবঁধা এখানে সেখানে

কিছু চোখে পড়ে, কিছু পড়ে না মনের অবধানে।

শুধু স্মৃতিলোকেই যে “জানা-অজানা”র ভিড় জমেছে, তাই
 নয়, অতীত-বর্তমানেও গরমিল দেখা দিয়েছে।

আগেকার দিন আর আজিকার দিন
 পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন।

কিন্তু তবু বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে, বর্তমান থেকে
 অতীতে, জানা থেকে অজানায় যাতায়াতের জন্তে আছে
 “সরু এক চৈতন্যের সাঁকো”।—

জানা-অজানাব মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো,
 ক্ষণে ক্ষণে অস্ত্রমনা
 তাবি ’পবে চলে আনাগোনা।
 আয়না-ফ্রেমেব তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
 কে বেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তাব ছাপ।
 পাশাপাশি ছায়া আর ছবি।

মনে ভাবি, আমি সেই রবি,
 স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠামা
 ঘরের মতন : ঝাপসা পুরানো ছেঁড়া-ভাষা
 আসবাবগুলো যেন আছে অস্ত্রমনে।

* * *

ছায়া তারা

নৃতনের মাঝে পথহারা ,
 যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
 সে কেহ পড়িতে নাহি জানে।

এখানে আর একটি সংকেত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—“আমি
 সেই রবি।” এই স্নেহের ডাক-নামটি যে-কণ্ঠে উচ্চারিত
 হত, এই ধ্বনিরূপের মধ্যে কবি যেন সেই প্রিয়কণ্ঠের
 ডাকটি শুনতে পেলেন।

৯

‘আকাশপ্রদীপে’র দুটি অতুলনীয় কবিতা “শ্রামা”
 ও “কাঁচা আম”। এই কবিতাযুগলে কবি শিল্পীর তুলিতে
 নতুন-বোঁঠানের দুখানি অনবত্ত কিশোরী-চিত্র রচনা
 করেছেন। নতুন-বোঁঠান সম্পর্কে ‘জীবনস্মৃতি’র পাঠক-
 সমাজে যে অতৃপ্তি ছিল তা অনেকখানি পূর্ণ হয়েছে
 ‘ছেলেবেলা’য়। কিন্তু “শ্রামা” ও “কাঁচা আমে” কাব্যের
 ভাষায় তাঁর প্রাকৃত-স্মৃতি যে-ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে
 সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যেও তার তুলনা নেই।

তা ছাড়া এই দুটি কবিতায় কবির নিজের বাল্য-
 কৈশোরের নবরূপরাগরঞ্জিত স্মৃতিটিও নয়নাভিরাম।
 এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ‘পশ্চিমবঙ্গীর ডায়ারি’ থেকে
 ১৯২৪ সনের ৫ই অক্টোবর তারিখে লেখা কবির দিনপঞ্জীর
 যে অংশ আমরা উদ্ধার করেছি তাও এই গ্রন্থে বিশেষ

ভাবে স্মরণযোগ্য। সেদিনকাল ডায়ারিতে কবি লিখেছিলেন, “এমন সময় যাতে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সাইনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে ষা-খুশি করে বেড়াচ্ছে।

* * * কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অমনি কবেই মগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়ে-ছিলাম। * * * ঐ গা-খোলা ছেলেটা দিনের শেষ

প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ওই ভোলা-মন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে। * * * আজ মনে হচ্ছে ওই ছেলেটার কথা আমাবই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেককাল তার দিকে চোখ পড়ে নি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইজুল-পালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাভীরেব নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। * * * মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্বহীন খেলা।”

এই ডায়ারি লেখার পব চোদ্দ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই চোদ্দ বছর ধবে কবি তাঁর কৈশোরের নানা রঙের দিনগুলির স্মরণে সববে আবিষ্ট হয়ে আছেন। কিন্তু আকাশের আলিঙ্গনে বাঁধা বারো বছরের সেই ভোলামন ছেলেটাকে তিনিও এর আগে এমন দিব্যকাস্তিতে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। “তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে ছিল বালগোপালের লীলা।” “শ্রামা” ও “কাঁচা আম” কবিতায় সেই গা-খোলা ছেলের জগতেই কবির শেষ ছেলেখেলা। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে কবিতা দুটি থেকে পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি সংকলন করেছি। কিন্তু এখানে পুনরায় তার রস-বিশ্লেষণ না করলে আমাদের আলোচনা অঙ্গহীন হয়ে পড়বে।

“শ্রামা” কবিতায় কবি সত্য সত্যই তাঁর বারো বছর বয়সের স্মৃতিকে কল্পনায় ধ্যান করেছেন। কবিতায় আছে :

অসংকোচে ছিল চেয়ে

নবকৈশোরের মেয়ে,

ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।

পাণ্ডুলিপির আদি-পাঠে বয়সীমা আরো নির্দিষ্ট। সেখানে আছে :

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে,

বারো ছিল বয়স আমার।*

নতুন-বোঁঠানের নবীনা কিশোরী-মূর্তির বর্ণনায় কবি বলেছেন, “উজ্জল শ্রামল বর্ণ”, “বড়ো বড়ো কাজল নয়ান”। আবরণ-আভরণের দিক নিতান্তই তুচ্ছ :

একখানি শাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,

কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে।

আভরণের মধ্যে “ছুখানি সোনার চুড়ি নিটোল হু হাতে”, আব “গলায় পলার হাবখানি”। কবি অকূঠ কণ্ঠে স্বীকার করছেন, “ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে ওই মূতিখানি ছিল।” এই নবীনা কিশোরী বালকচিত্তকে মাঝে মাঝে ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছে সেখানে, যেখানে বিধিব খেয়াল নানাবিধ সাজে নাগালের পারে মবীচিকালোক বচনা করে। সে মবীচিকালোক “বালকের স্বপ্নের কিনাবে”। কবি তাঁর স্বপনচাবিগী কিশোরীকে বলেছেন—“স্বপ্নস্পর্শময়ী”।

দেহ ধরি মায়া

আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ ছায়া

স্বপ্নস্পর্শময়ী।

বালকচিত্তে তখনও অল্পরাগ-প্রকাশের ভাষা ফুটে ওঠে নি, [“সাহস হল না কথা কই”], শুধু হৃদয়ে কি এক অজানা বেদনা গুঞ্জনিত হয়ে উঠল। তার কারণ বিশ্লেষণ কবে কবি বলেছেন :

ও যে দূরে, ও যে বহু দূরে,

যত দূরে শিবীষেব উর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধারে

ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীবে।

স্মরণিত স্বপ্নস্পর্শের অনবদ্য উপমাটি লক্ষণীয়।

অল্পরাগের কয়েকটি উদ্দীপনচিত্র এব পবে কবিতায় পব পব সজ্জিত হয়েছে। একদিন এল কিশোরীর খেলাঘর থেকে পুতুলের বিয়েব নিমন্ত্রণ। “কলরব করেছিল হেসে খেলে নিমজ্জিত দল।” কবি চিরদিনই আবেগপ্রকাশে অহুচ্ছল। “আমি মুখচোরা ছেলে একপাশে সংকোচে

পীড়িত।” সন্ধ্যা বুঝি বুখাই কাটল। পরিবেশনের ভাগে
কি পেয়েছিলেন তাও মনে নেই। কিন্তু সেই নিমন্ত্রণশালা
থেকে বালক যে দুর্লভ কিছু সম্পদ হুড়িয়ে এনেছিল তাতেও
সন্দেহ নেই—

দেখেছিছ, দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,

কালো পাড নাচে তাবে বিবে।

কটাক্ষে দেখেছি, তার কঁকনে নিরেট বোদ

হুহাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অহরোধ উপরোধ

শুনেছিছ তার স্নিগ্ধ স্বরে।

সেই দ্রুতগতি দুখানি পা-কে ঘিরে কালো পাড়ের নাচ,
সেই কঁকনে বাঁধা-পড়া নিরেট বোদ, সেই স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর
বালকচিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখল অর্ধেক রজনী—

ঘিরে এসে ঘরে

মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি

অর্ধেক রজনী।

তারপর একদিন জানাশোনা বাধাহীন হল। ডাকনাম
ধরে ডাকবার সাহস এল কণ্ঠে। ভয় গেল ঘুচে। পরিহাসে
পরিহাসে শুরু হল কথা-বিনিময়। কখনও গড়ে-তোলা
দোষ, ছল-করা বোম্বের সৃষ্টি করেছে। কখনও
কৌতুকময়ীর শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক দিয়েছে হৃৎ।
ওরই মধ্যে মনোময়ী রত্নির একটি সূক্ষ্ম বাসনার সূক্ষ্মাব
অঙ্কুরও উদগত হল :

কখনো দেখেছি তার অশ্রুর সাজ—

রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত পাশ নাই লাজ।

অসংবৃত্তাঙ্গা কিশোরীর নবোদ্ভিন্ন রূপের প্রতি বাসনার
এই সলজ্জ কৌতুহল বালকচিত্তে কৈশোর-আবির্ভাবেরই
চ্যোতক। বাল্য-কৈশোরের বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আর এক
দিনের একটি স্পর্শধাময় অভিজ্ঞতা দিয়েই উদ্দীপন-
চিত্তগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে। হাত দেখার চলনা করে
হাতখানি হাতে তুলে নেওয়ার গোপন বাসনাব মধুক্ষরা
অল্পভূতিই ওতে প্রকাশিত।—

একদিন বলেছিল, “জানি হাত দেখা।”

হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গমনেছিল রেখা—

বলেছিল, “তোমার স্বভাব

প্রেমের লক্ষণে দান।” দিই নাই কোনোই জবাব।

পরশের সত্য পুরস্কার

খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

এখানে পরশের পুরস্কার ‘সত্য’ হয়েছে বলেই নিন্দা
হয়েছে, ‘মিথ্যা’। কিন্তু “তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে
দান”—এই উক্তিটির মধ্যে একটি সূক্ষ্মতর ব্যঙ্গনা লুকিয়ে
আছে। উক্তিটি আসলে ঘুম-ভাঙানিয়া গান। অহুরাগ-
কুতুহলা কিশোরীকর্তৃক কিশোরচিত্তের ঘুম ভাঙাবার
তিব্বক প্রয়াস ওর মধ্যে নিহিত আছে। তা ছাড়া
কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনের গডন সম্পর্কে এই উক্তিটি যে
অভ্রান্ত তার পরিচয় আনা তরখড় এবং ইংলণ্ড-প্রবাসে
স্টুট-হুহিতা প্রসঙ্গে কবির পরিণত বয়সের আত্মবিশ্লেষণেও
ধরা পড়েছে।

কৌতুকময়ী কিশোরীটি কিন্তু কবিচিত্তে চিরদিনই
রহস্যময়ী হয়ে রইল। কবি “শ্রামা”র উপাস্ত স্ববকে
বলেছেন, “তবু ঘুচিল না অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।”
পরিণত মন নিয়ে কবি তার হেতু বিশ্লেষণ করেছেন :

স্বন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,

কাছে পেয়ে না-পাওয়ার দেয় অক্ষুণ্ণ পবিচয়।

সীমার মধ্যে সীমাহীনতাই সৌন্দর্যের ধর্ম। প্রেমাত্মভূতি
যেখানে সৌন্দর্যাত্মভূতির সহোদর সেখানে প্রিয়বস্তু
চিরদিনই নাগালের বাইরে। এমন কি কাছে পেয়েও
তাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। নতুন-বোঁঠান সম্পর্কে
রবীন্দ্রনাথের অহুরাগেব স্বরূপটি এই লক্ষণ দিয়েই চিনতে
হবে। আমরা অশ্রুত তরুণ কবির অহুরাগকে ক্রবাতুর
প্রেমেব সঙ্গে, দাস্তে ও পেত্রাকার প্রেমের সঙ্গে তুলনা
করেছি। কিন্তু সেখানেও তুলনা সর্বদীর্ণ নয়।
ক্রবাতুরদের মানস-স্বন্দরী চিরদিনই তাঁদের কাছে
অপ্রাপনীয়। সে নাগালেব পবপারে মায়া-মরীচিকা মাত্র।
দাস্তের জীবনেও যেমাজিচে এবং পেত্রাকার জীবনেও লরা
চিরদিনই নাগালের বাইরে ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের
জীবনে নতুন-বোঁঠান সতেরো বছর ধরে কবিকিশোরকে
দিয়েছেন সঙ্গ ও সান্নিধ্য। বাল্যে, তাঁর অরূপণ সেবায়

পেয়েছেন কবি। কৈশোর-লগ্নে আদরও পেয়েছেন।

‘পূরবী’র “কিশোর প্রেমে” আছে তার স্বীকৃতি :

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।

সেই প্রদোষের অন্ধকারে

এল আমার অধর-পারে

ক্রান্ত ভীক পাখিব মত কম্পিত চুধন।

‘পূরবী’র “কৃতজ্ঞ” কবিতায় রয়েছে তার পুনরুজ্জ্বল।
‘পূরবী’র “ক্ষণিকা” কবিতায় একটি অকৃতার্থ পরমলগ্নেবও
ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু সঙ্গ সামিধ্য ও আদর লাভের এই
উপচায়মান বাসনা প্রতিদিনের অগ্নিপরীক্ষায় বিস্মৃতভূত
হয়ে পরিণত হয়েছে নিকষিত হেমে। ‘সরস্বতী-
কণ্ঠভবণ’ ও ‘অলংকার-কৌশলভে’ বর্ণিত প্রীতিরূপা
রতি, ‘সিম্পোসিয়ামে’ প্লেটো-বর্ণিত দিব্য-এরসের
মহৎ-সুন্দর লীলা কিশোর-মানসে যে নিত্য-নবীন রূপ
লাভ করেছে তাকে চেনারই অভিজ্ঞান রয়েছে “শ্রামা”
কবিতায় :

ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,

যতদূরে শিরীষেব উর্ধ্বশাখা ষেখা হতে ধীরে

ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

কাছে পেয়েও যে চিরদিনের না-পাওয়া, সেই অপ্রাপ্তীয়
সুদূরবর্তিনীর প্রতি চিরবিরহী-চিন্তের, নিত্যনবায়মান
অনুবাগই রবীন্দ্রচিন্তে মানসী-প্রেমেব-স্বরূপ। সেই
অনুরাগের স্বপ্নে বোঝাই ভবীতে চলেছে কবির শেষযাত্রা।
“শ্রামা”র অন্তিম স্তবকে আছে তারই ধ্বনিমণ্ডিত
কাব্যরূপ :

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পবে দিন

পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।

চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাভণ্য ঘনাল,

আশ্বিনেব আলো

বাজাল সোনার ধানে ছুটির মানাই।

চলেছে মস্তুর তরী নিরুদ্ধশে স্বপ্নেতে বোঝাই।

১০

আলংকারিক পরিভাষায় “শ্রামা” কবিতা যদি প্রীতিময়ী
রতির ‘স্বথভোগানুকূল্যকারী’ গুণের উদাহরণ হয়
তা হলে “কাঁচা আম” হচ্ছে ‘প্রিয়কারিতা’র নিদর্শন।
চৈত্রমাসের সকালে যুহু রোদুয়ে গাছতলায় পড়ে-
থাক। তিনটে কাঁচা আম এ কবিতার উদ্দীপনবিভাব।
গাছতলায় ওই তিনটে কাঁচা আম পড়ে থাকতে দেখে
কবির মন চলে গেছে স্থতির উজ্জান বেয়ে একেবারে
‘বালগোপালের ব্রজধামে’। তখনকার দিনে দৈবে পাওয়া
দুটি-একটি কাঁচা আম ছিল বালকেব সোনার চাবি।
খুলে দিত সমস্ত দিনের খুলীর গোপন কুঠুরি।

সেদিনকার কথা কবি একেবারে গোঁড়া থেকে শুরু
করেছেন। তাঁর শৈশবে যেদিন প্রথম বাড়িতে বউ
এল পরের ঘব থেকে, সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা
নৌকোর মত তাকে বান ডেকে দিলে একেবারে
তোলপাড় করে। “জীবনের বাঁধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
এল অদৃষ্টেব বদান্ততা। পুরোনো ছেঁড়া আর্টপোর্টে-
দিনবাজিগুলো খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে। * * *
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল—জগতে এমন
কিছু থাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।”

বাণী ধামল, বাণী ধামল না—

আমাদের বধু বইল

বিশ্বয়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে যেবা।

তার ডূরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত। কিন্তু তার
ভাব, তার আড়ি, তার খেলাধুলো ননদের সঙ্গে। সেখানে
বালকের প্রবেশাধিকাব নেই। অথচ মন একান্তই চাইত,
ওকে কিছু একটা দিয়ে সঁকো বানিয়ে নিতে।

অবশেষে বহু সাধনায় জানতে পারা গেল, প্রসাদ-
লাভের একটি ছোট্ট দবজা খোলা আছে।—

ও ভালোবাসে কাঁচা আম খেতে

গুল্লো শাক আর লংকা দিয়ে মিশিয়ে।

গাছে চড়তে ছিল কড়া নিষেধ। হাওয়া দিলেই বালক
ছুটে যেত বাঁগানে। দৈবে যদি পাওয়া যেত একটি মাত্র

ফল তা হলে তার আনন্দের সীমা থাকত না। দেখত, লীলার স্মৃতিচারণ শেষ করে চলে গেছে কৈশোর-লগ্নে।
“সে কী শ্রামল, কী নিটোল, কী সুন্দর।” তিনি বলছেন :

একদিন শিল্পটির মধ্যে আম বুড়িয়ে এনেছিলুম ,

ও বলল, “কে বলেছে তোমাকে আনতে।”

আমি বললুম, “কেউ না।”

বুড়িহুঁহু মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।

আর-একদিন মৌমাছিতে আমাকে মিলে কামড়ে ,

সে বললে, “এমন করে ফল আনতে হবে না।”

চুপ করে বইলুম।

অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু বালকের অহুরাগে রঞ্জিত হয়ে কাব্যলোকে অসামান্য লাভাণ্য লাভ করেছে। কবি বলছেন,
“এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে গাছের তলায়,
বছরের পর বছর। ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।”
এই দীর্ঘনিঃশ্বাসিত বেদনা দিয়েই কবিতাটির উপসংহার রচিত হয়েছে। কবিতার উপাস্ত পর্বে কবির মন বাল্য-

বয়স বেড়ে গেল।

একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ,

তাতে অরুণীষ কিছু লেখাও ছিল।

স্মান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গাব জলে—

খুঁজে পাইনি।

গঙ্গার জলে হারিয়ে-যাওয়া এই সোনার আংটির কথা
একদিন মংপুতে কবি বলেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীকে।—

“একবার মাত্র জীবনে গয়না পরেছিলুম, আংটি। নতুন

বোঁঠান দিয়েছিলেন, গাজিপুরে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে

জলে পড়ে গেল, খুব দুঃখ হয়েছিল।”^৮ কবিতায় কবি

বলছেন, “তাতে অরুণীষ কিছু লেখাও ছিল।” আংটিতে

অরুণীষ এমন আর কিই বা লেখা থাকতে পারে। কিন্তু

চিরস্মরণের পথে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে স্বর্ণাঙ্গুরীস্নেহ

সেই অনাবিকৃত অভিজ্ঞানটি।

[আগামী সংখ্যায় প্রথম খণ্ড সমাপ্য

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ শ্রী রবীন্দ্র-জীবনী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪।

২ তদেব। পৃ. ১৪৫।

৩ ভূমিকা, আকাশপ্রদীপ।

৪ যাত্রী, পৃ. ৭৪-৭৭।

৫ ফাঁক, পুনশ্চ। রচনাবলী-১৬, পৃ. ২৪।

৬ দ্রষ্টব্য : রচনাবলী-১৬, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৫৪০।

৭ দ্রষ্টব্য : সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ।

পৃ. ২১১-২১২।

৮ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২০৫।

ব্যস্ততা অবশ্য ছিল না কিছু। ধীরেস্থে গেলেনই চলত। আসাম মেল এসে দাঁড়াবে বেলা চারটেব পৰ। লোকজনের ভিড় থাকবে। কুস্তলাব স্বভাব জানা আছে অল্পমের। ভিডেব মধ্যে ও মিশবে না। এক এক কবে যখন সবাই স্টেশন থেকে বেবিয়ে যাবে, তখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবে সে।

কার্সিয়াঙ থেকে একাই ফিরছে কুস্তলা। কেমন দেখতে হয়েছে এতদিনে কে জানে! অল্পম যখন কার্সিয়াঙ স্তানাটোরিয়ামে রেখে এসেছিল কুস্তলাকে, তখন কেমন ঘন অসহায় দেখাচ্ছিল। কিছু বলে নি অবশ্য, কিন্তু বড় বড় চোখে বিষন্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল সে অল্পমের দিকে। চোখ ছলছল কবছিল কুস্তলার। একটা অহেতুক বেদনাবোধে অল্পমও মুখে পড়েছিল। সেই কথাটাই বেশী করে মনে পড়েছে এখন।

অল্পম সান্ত্বনাব স্ববে বলেছিল, ছি ছি, তুমি যদি এমন কব, তা হলে আমার কথাটা একবার ভাব দেখি!

তুমি কাছে নেই, কলকাতার বাড়িতে আমি একা—

কথাটা শেষ করে নি অল্পম। কুস্তলা রোগপাতুর ঠোঁটে একটু ক্লান্ত হাসির রেশ টেনে বলেছিল, আমার জন্তে ভেব না। আমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে কলকাতায় ফিরে যাব। দেখে নিও।

শীগগির অবশ্য নয়, পুরো দু বছর পরে ফিরছে কুস্তলা। স্মার্টকেসটা কুলির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে পিছনে পিছনে আসছে। দূর থেকেই দেখতে পেল অল্পম। বোম্বে প্রিন্টের একটা শাড়ি পৰা ওব নিজস্ব ভঙ্গীতে। আর তাই অবাক হয়ে দেখছে অল্পম। অবাক হয়েই দেখার মত চেহারা নিয়ে এসেছে কুস্তলা। চিনতে কষ্ট হচ্ছে। দু বছর আগের চেহারার সঙ্গে এই মুহূর্তে কোন মিল

থুঁজে পাচ্ছে না অল্পম। যদি না অল্পমকে দেখে আগের মত গ্রীবা বেকিয়ে হেসে ঘোমটা টানত কুস্তলা। এটা ওর চিরদিনের অভ্যাস। হাসতে গিয়ে নিটোল টোল পড়ল কুস্তলার ভবন্ত গালে। মুখশ্রীতে আগের মতই লাগণ্য টলমল কবল। কী এক আশ্চর্য কোশলে যৌবনটাকে কয়েক ধাপ পিছিয়ে নিয়ে ফিরে এল সে। বিস্মিত হল অল্পম। খুশী হল এবং আনন্দও পেল।

কুস্তলা কাছে এল। চাপা স্বরে কৌতুক কবে হাসল একটু। বলল, একহাট লোকের মধ্যে এমন হাঁ করে তাকিয়ে থেক না। বাড়ি গিয়ে গিলে খেয়ো। চল।

কুস্তলাই ট্যাক্সি ডাকল একটা। কুলিকে পয়সা দিয়ে বিনাশ কবল। তারপর অল্পমের গা ঘেঁষে বসে অনর্গল কথা। কার্সিয়াঙ স্তানাটোরিয়াম, ডাক্তার বাবের অমায়িকতা, এমন কি নেপালী নার্সগুলোর অদ্ভুত সেবার কথা একটানা বলে চলল সে—অল্পম শুধু বা না শুধু। অল্পম দেখছিল কুস্তলাকে। কুস্তলার আশ্চর্য দেহলাবণ্যের দীপ্তি দেখে কেবলই অবাক হচ্ছিল সে। এমনই গায়েব রঙ ফরসা, তারপর পার্বত্য আবহাওয়ার স্বাস্থ্যের দাক্ষিণ্য ফরসা রঙের উপর চোখে-লাগা বক্তিমাতা ধরিয়ে দিয়েছে। শুধু খুশী নয়, একটা নিশ্চিত আশ্বাস বোধ করে অল্পম।

সেই অনর্গল কথার ফুলঝুরি ছড়িয়েই বাড়িতে ঢুকল কুস্তলা। পুবনো বাড়ি। ভাল-লাগা একটা আসক্তি জড়িয়ে রয়েছে তাব এই ছোট বাসটুকুতে। তাব নিজের হাতে গড়ে তোলা নিশ্চিত আশ্রয়। ঢুকেই ধমকে দাঁড়াতে হল। অনর্গল কথার জোয়ারে ছেদ পড়ল এক-মুহূর্তে। শেষ পর্যন্ত বলল, কী যে লোক তুমি! কী করে রেখেছ ঘরটা দেখ তো। এ ঘরে মানুষ থাকে নাকি!

সত্যিই বড় অগোছাল অল্পম। সারা ঘরে পোড়া সিগারেট আর ভাঙা দেশলাইয়ের ছড়াছড়ি। একইটু ধুলো জমে উঠেছে ঘরখানায়। মশারির এক কোণের দড়ি ছিঁড়ে বুলছে। তোশক ছিঁড়ে তুলো ছড়িয়ে গেছে ঘরময়। এসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল কুস্তলা। অল্পমোগ করল যতখানি, মমতা বোধ করল তার চেয়ে অনেক বেশী।

মনে মনে ভাবে, আহা, পুরুষমানুষ বই তো নয়। এসব করেছে কোনদিন, না, করবাব প্রয়োজন হয়েছে। তার নিজের এই রাজরোগ ধরল বলেই তো—

ট্রেনের কাপড় ছাড়া হল না। পরনের কাপড়ের প্রান্তটাই কোমরে জড়িয়ে সে ঘর পরিষ্কার করতে বসল।

অল্পম বাধা দিল। বলল, বাড়ি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, না হয় একটু জিরিয়ে নিয়েই পবিত্র করবতে।

কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল কুস্তলা। কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ ভয়ঙ্কর রকম ভয়-পাওয়া আর্ত চোখে তাকাল সে অল্পমের দিকে। ঝাঁট দিতে দিতে সে ঘরের কোণটায় গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। ঝাঁটটি পড়ে গেল হাত থেকে।

ঘরের কোণের বড় আলমারিটা নেই। জায়গাটা শূন্য। এতক্ষণে সমস্ত ঘরখানাই খালি খালি মনে হচ্ছে কুস্তলার। বাড়িতে এসে এত সব লক্ষ্য করে নি কুস্তলা। আলমারিটা নেই, কিন্তু আলমারির চারটে পাখাব দাগ মিলিয়ে যায় নি এখনও ঘর থেকে।

আরোগ্য হওয়া একটা দূষিত ক্ষতিহ্রের মত দারুণ কুশ্রীতায় ভরে, তুলল কুস্তলার মন। অথচ আলমারির কথা জিজ্ঞাসা করতে পারছে না সে অল্পমকে। একটা অহেতুক ভয়ে হাত পা অবশ হয়ে আসছে তার। কিংবা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনই নেই কুস্তলার।

এখন মনে পড়ছে কাসিয়াঙ স্ত্রীনাটোরিয়ামের কথা। প্রায় এক বছর আগেই অল্পম চিঠি লিখেছিল, তাব ব্যাঙ্কেব চাকরিটা চলে গেছে। অবস্থা ভাল চলছিল না। ব্যাঙ্ক তুলে দেওয়াব আগে বোর্ড অব ডিরেক্টর্স টিকিয়ে রাখাব শেষ চেষ্টাব ছাঁটাই নোটিশ দিল।

অথচ কাসিয়াঙ স্ত্রীনাটোরিয়ামের মাসিক খরচে ঘাটতি ফেলে নি অল্পম। যথানিয়মে কুস্তলা টাকা পেয়েছে ডাকঘোণে। আর যেদিন চিঠিটা পেল কুস্তলা সেদিন কাসিয়াঙ স্ত্রীনাটোরিয়ামে নিজের বেডে অলস ভঙ্গীতে পড়ে ছিল। কাচের শারি দিয়ে তাকিয়েছিল বাইরে। শ্রাবণের বর্ষা নেমেছে অঝোর ধারায়। মেঘ আর বর্ষাতে ঝাপসা দেখাচ্ছিল ডাউহিলেব সারিবদ্ধ পাইনের বন। এমনি সময়ে এল অল্পমের চিঠি— চাকরি নেই।

চিঠিখানা পড়েছিল সে ঝাপসা চোখে। এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় ছমড়ে মুচড়ে এলোমেলো ভঙ্গীতে শুয়ে ছিল সে। খোলা চিঠিখানা পড়ে ছিল বুকব উপর।

বাইরে শ্রাবণের ধারাবর্ষণ। সারা আকাশ জুড়ে একটা ধূসর কান্নার সমারোহ। আর কুস্তলার বুকের মধ্যেও তখন একটা কান্নার পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছিল।

গেই চিঠিখানার কথা এখন মনে পড়ছে কুস্তলার। আর বুঝতে পারছে, চাকরি গেলেও তার মাসিক খরচে ঘাটতি ফেলে নি কেন অল্পম। অল্পম কথা বলে নি। কিন্তু বুঝতে পেরেছে কুস্তলাব অকারণ উচ্ছাস আর অনর্গল কথার গুঞ্জে বিরতির কথা। অথচ কুস্তলা আলমারিটার কথা জিজ্ঞাসা করে নি। খোলা জানলার মাথা রেখে দাঁড়িয়েছিল সে। দারুণ ইচ্ছা আর আশঙ্কি দিয়ে গড়া এই সংসারটাব কথাই সে ভাবছিল এতক্ষণ। তেতলার ছাদে টবে বসানো তুলনীতলায় রোজ সন্ধ্যায় প্রণাম কবতে গিয়ে যে প্রার্থনাটুকু উচ্চারণ করত সে মনে মনে, সে প্রার্থনার মঞ্চে খুব বেশী আকাজক্ষা ছিল না। একটু নিরাপদ আশ্রয়, গ্রাসাচ্ছাদনের একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা। এর বেশী আর কী কামনা থাকতে পাবে মানুষের।

কুস্তলা এটাও জানে, এই বিপুল পৃথিবীর কাছে এটা খুব বেশী দাবি নয় তার। অর্থোক্তিক তো নয়ই।

আমি জানি, তুমি আলমারিটার কথা ভাবছ।—একটা সিগারেট ধরানোব উত্তোগ করে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলল অল্পম।

এতক্ষণ পরে মুখ তুলল কুস্তলা। নতুন স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জল মুখশ্রী জমানো কান্নায় থমথম করছে। অথচ আশ্চর্য, কুস্তলা হাসল। হেসে অল্পমের কাছে সরে এল। ঠিক বৃকের কাছটিতে এসে মাথা হুইয়ে বলল, আলমারিটার কথাই ভাবছি। ভাবছি ওটা আবার কতদিনে ফিরিয়ে আনতে পারব।

পারবে তুমি?—হাতের সিগারেটটা পড়ে যাচ্ছিল অল্পমের। কুস্তলার দিকে সে পুরোপুরি ফিরে দাঁড়াল।

পারতেই হবে।—খুব মিহি স্বরে কথাটা উচ্চারণ করল কুস্তলা। কণ্ঠস্বরে কোন উত্তাপ নেই। এবং বলতে বলতে বাঁটা তুলে নিয়ে আবার মশকে ঘর পরিষ্কার করতে আরম্ভ করল। দু বছরের অবহেলিত বিছানাটা টেনে টেনে ছাদে নিয়ে এল। নিজের পরিচ্ছন্ন বিছানা খুলে নতুন করে পাতল। অল্পম অবাক হয়ে দেখেছিল এসব।

কুস্তলা এতবড় একটা ঘটনাকে সহজভাবে কী করে নিতে পাবল, ভেবে কুল-কিনারা পায় না অল্পম।

প্রায় বিয়ের পব থেকেই কুস্তলার আলমারির শখ।

প্রথম প্রথম হেসেই উড়িয়ে দিত অল্পম।

বলত, একটা আলমারির দাম কত জান, এবং আমার মাইনে?

কুস্তলা বলত, একটা আলমারির দাম আন্দাজ করতে পারি এবং তোমার মাইনেও আমাব অজানা নয়। আব ওই টাকাতাই আমি আলমারি করব দেখে নিয়ো।

সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছিল কুস্তলা। সিনেমা দেখে নি সে, প্রসাধনের জন্ত অল্লবোধ করে নি। এমন কি পূজোর সময় একখানা ভাল শাড়ি কিনতে দেয় নি সে অল্পমকে। কোন শনিবারে যদি অল্পম দুখানা থিয়েটারের টিকিট কিনে নিয়ে আসত তা হলেও অল্লযোগেব অন্ত থাকত না।

একটা পৌরাণিক নাটকের বিশেষ দৃশ্যেও কুস্তলা খুঁতখুঁত করেছে।

কুরুপাণ্ডবের পাশাখেলার দৃশ্য—সর্বশ্ব হারিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রেখে শেষবারের মত খেলা শুরু করেছে।

অল্পম বলেছিল, তোমার আলমারির জন্তে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকেও পণ রাখতে পাব দেখছি।

খোঁচাটা নীচবে সহ করেছিল কুস্তলা, জবাব দেয় নি।

মাবে মাবে অল্পম ঠাট্টা করত।

তোমার সমুদ্রবন্ধনের আব দেরি কত?

সময় হলেই জানতে পারবে, হেসে জবাব দিত কুস্তলা।

সময়টা এসেছিল। অল্পমকে অবাক কবে দিবেই একদিন সময় হল কুস্তলার। এক রবিবারের দুপুরে অল্পমের দিবানিত্রাটা তখনও জমে নি—ঠেলে তুলল কুস্তলা তাকে।

ওঠ, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।

এক জায়গায় মানে বউবাজারের এক ফানিচারের দোকানে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিয়েছিল অল্পম। আগে থেকে কিছু বলে নি কুস্তলা। শুধু অল্পমের বিস্মিত দৃষ্টিটাকেই দীর্ঘস্থায়ী করে বেখেছিল একটা মিষ্টি হাসির রহস্যকে ঠোঁটে জড়িয়ে রেখে। অল্পমের বিস্মিত দৃষ্টিব সামনেই নিজের ছোট ব্যাগটা খুলে একগাদা নোট তুলে দিয়েছিল সে ফানিচারের দোকানে। ক্যারিং থরচ সহ একটা পুরোপুরি আলমারির দাম।

আলমারির তাকগুলো নিজের হাতে মাজিয়ে তুলত কুস্তলা। একগাদা কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, প্যারিস প্রান্টারের কতকগুলো বাস্ট মূর্তি, বিয়েতে পাওয়া চায়ের সেট, ফুলদানি, শোখীম কাচের পাত্র এবং সর্বশেষ তাকে কাপড় জামা, শাড়ি ব্লাউস। মাজানো আলমারিটা ঘুরে-ফিরে দেখত কুস্তলা। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেলে, আলমারির গ্লাসে নিজেকেও দেখত সে। আলমারিটা শুধু তার শখ নয়, স্বখও।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে কুস্তলা বলল, একটা কথা ভাবছি। অমত করবে না তো? আমি নিজেকে একটা চাকরির চেষ্টা করি।

তুমি!

অন্ধকারে ঠিক দেখা যায় না, তবে গলার স্বরে কুস্তলা বুকল অল্পমের চোখে অপরিদ্রা়ম বিস্ময়। বলল, তা হোক।

এটা স্বাভাবিক। এতে দোষের কি আছে? যখন অপ্রয়োজন বুঝব, তখন না হয় ছেড়েই দেব। আর চাকরি কি কখনও অপ্রয়োজন হয়!

খানিকটা সময় কেটে গেল। খাসপ্রশাসনের ভারী শব্দ। টিকটিকি ডাকল একটা।

যুম্লে? কিছু বললে না তো?

কি আব বলব। খুঁজে দেখতে পার। তবে পাবে কি?

এটা অল্পপমের নৈরাশ্রের কথা। আত্মপ্রাণের দীর্ঘশ্বাস। পুরো একটি বছর কলকাতা শহর চষে বেড়িয়েছে সে যে কোন একটা চাকরির জন্তে। হাতের শেষ চুড়ি কটা পুঁজি বেধে চাকরি খুঁজতে বেরলো কুস্তলা। আব আশ্চর্য, আশ্চর্যই বলতে হবে, কুস্তলাই আগে চাকরি পেল। একটু সময় লাগল যদিও, তবু কুস্তলার ইন্টারভিউয়ের একটা চিঠি এল আগে। নতুন কোম্পানি। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই কারবার। কলকাতা অফিসের জন্ত একজন লোক দরকার। কুস্তলাই পেল চাকরিটা। অফিসের হেড-ক্লার্ক পাড়ার বাসিন্দা। ভদ্রলোকের মেয়ে সেলাই শিখতে আসত কুস্তলার কাছে—সেই স্ত্রী পরিচয়। হেডক্লার্ক ভদ্রলোকও কখনও-সময়ও এসে বসতেন, গল্প কবতেন। চাকরি করে খাওয়াত কুস্তলা। তিনিই খবর দিয়েছিলেন চাকরিটার। স্বভাবের তাঁরই তদ্বিরে হল।

খানিকটা সচ্ছলতা ফিরে এল আবার।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে কুস্তলা বলে, তোমার ঘড়িটা কিনে ফেল এবার।

না, আগে তোমার চুড়ি।—অল্পপমের অনুরোধ।

এই সামান্য বিষয় নিয়ে মান-অভিমানের পালা এবং তার মধুর পরিণতি। ঘড়ি বা চুড়ি কিছুই কেনা না হলেও কুস্তলার একখানা শাড়ি কেনা হয়ে যায় এবং অল্পপমের একজোড়া জুতোও।

অল্পপম চাকরি খোঁজে।

কুস্তলা ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফেরে। স্নান সেবে এসে চা খায়। গল্প করে দুজনে। বাড়ির টুকটাকি কাজে হাত লাগায়। ঝি মানদাকে পরের দিনের কাজের

ফিরিস্তি দেয়। কিন্তু অল্পপমের এসব ভাল লাগে না। কোথায় যেন একটা অমিল রয়েছে।

মাবো মাবো অনুরোধ করে কুস্তলা, তোমার কি হয়েছে বল তো?

কিছু হয়েছে কি?—পালটা প্রশ্ন কবে অল্পপম।

ভাল করে কথা বল না—যেন এড়িয়ে চলতে চাও আমাকে।

অল্পপম হাসে। নিরুত্তাপ হাসি। অর্থাৎ প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে যাওয়ার করুণ প্রচেষ্টা। কুস্তলা কিছু বুঝল না। ভাল লাগল না তার। ভাল লাগার কথাও নয়।

সেদিন ফিরতে রাত হল কুস্তলার। অল্পপম আগেই ফিরেছে। আলো জ্বালে নি। মড়ার মত পড়ে আছে বিছানায়। সুইচটা টিপে দিয়ে চমকে উঠল কুস্তলা : ওমা, তুমি! এমন করে শুবে রয়েছে যে? অন্তর্বিবিশ্ব কবে নি তো? কখন ফিরলে?

অল্পপম বিছানার উপর উঠে বলতে বসতে বলল, অন্ততঃ তোমার আগে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি।

অহেতুক রুঢ় অল্পপমের কণ্ঠস্বর। কাঁপড় ছাড়া হল না। অপ্রত্যাশিত একটা দাক্ষিণ্যে থমকে দাঁড়াল। দিন দিন অল্পপমের এই পরিবর্তন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

তোমার এত দেরি যে?—অল্পপমের কথায় আগের মতই গ্লেশ।

কাজ ছিল।—সংক্ষেপে জবাব দিল কুস্তলা।

তোমাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে ময়দানে হাওয়া খাওয়া যদি অফিসের কাজ হয়, তবে অবশ্যই বলব তোমার কাজ ছিল।

কাঁপড় ছাড়তে ছাড়তে একটা শোভন ভদ্রীতে যুবে দাঁড়াল কুস্তলা। বলল, আমাদের যদি দেখেইছিলে, তবে সংসাহস নিয়ে সামনে গিয়ে পরিচয়টা দিলে ময়দানে বেড়ানোর উদ্দেশ্যটা সফল হত আমার। অন্ততঃ কাঁজটা খানিক এগিয়ে থাকত।

তার মানে?

মানে আমার জানা নেই।

কুস্তলা বেগেছে। কৃতকর্মের জন্ত অল্পপমেরও

অহুশোচনা নেই। দুজনের মাঝখানে শক্ত ভিত্তিতে যে প্রাচীর গড়ে উঠেছে, এক ধাক্কাতেই সেটা ফেলে দেওয়াব চেষ্টা বুধা।

সে রাত্রে খেল না কুস্তলা। আর খাওয়ার জগ্জে অহুরোধও কবল না অহুপম। অহুপমের মানসিক পরিবর্তনগুলোর একটা সরলার্থ করতে পেরে দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে গেল কুস্তলার মন।

আর একদিন সকালের ঘটনা।

অফিসের বেলা হয়েছে তবু যেন তাড়া নেই কুস্তলার।

ছোট আয়নাটা সামনে রেখে দাড়ি কামাচ্ছে অহুপম। আয়নার মধ্যে কুস্তলার ছায়া পড়তেই অহুপম একটা আলগা প্রশ্ন করল, তোমার অফিস নেই?

আছে।—চুলের বিহুনি খুলতে খুলতে বলল কুস্তলা, ভাবছি চাকরিটা ছেড়েই দেব।

চমকে উঠল অহুপম। বিপজ্জনকভাবে ধরে রাখা ব্লেডটাকে সামলে নিল। ভয়-পাওয়া বস্তুজন্তুর মত তাকাল সে কুস্তলার দিকে।

চাকরি ছাড়বে কেন?—চুপসে যাওয়া কঠিন।

কুস্তলা এসব লক্ষ্য করে নি। চুলের পরিচর্যা কবতে করতে জবাব দিয়েছে, তোমার সন্দেহটাই সত্যি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চালচলন ঠিক স্বাভাবিক নয়। আর এমন হলে কোম মেয়েছেলেই সেখানে সম্মান বাঁচিয়ে চাকরি কবতে পারে না।

সামান্য ঘটনা। মনে বাখবার মত নয়। মনে রাখে নি কুস্তলা। যথানিয়মে খেয়ে অফিসে চলে গেছে। দশটা থেকে চারটে অবধি বিভিন্ন ফাইলসে উপর নোট দিয়েছে, ব্রাঞ্চেব চিঠির জবাব লিখেছে। ঠিক অফিস ছুটি হওয়ার আগে ঢুকতে যাচ্ছিল সে হেডক্লার্কের ঘরে।

একটা জরুরী কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে। কিন্তু দরজার এপাশেই থামতে হল। ভেজানো দরজাব সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে অহুপম কথা বলছে হেডক্লার্কের সঙ্গে। এবং বলছে কুস্তলাকে নিয়েই।

অহুপম বলছে, দেখুন, আপনি বলতে গেলে ঘরের লোক, অভিভাবক স্থানীয়। তাই বলছি, এমন হট করে চাকরি ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে কুস্তলার। চাকরি করতে গেলেই মেয়েদের এসব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।

অহুপম থামল। হেডক্লার্ক নীচু স্বরে কিছু বললেন শুনতে পেল না কুস্তলা। তবে অহুপমের কথাগুলো কানে আসছিল।

এ ধরনের মেলামেশা সব অফিসের ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টররা করতে চায়। করেও থাকে। অবশ্য সং উদ্দেশ্য নিয়ে তা বলব না। তবে আমি এতে দোষের কিছু দেখি না। আর মেয়েরাও এসব মানিয়ে নিয়েই চাকরি কবে। আপনি এই কথাই বুঝিয়ে বলবেন কুস্তলাকে।

আব শুনতে পাবছিল না কুস্তলা। মাথা ঘুরছিল তার। একটা অহেতুক ভয়ে হাত পা অবশ হয়ে আসছিল। আর ঠিক এই মুহূর্তে যদিও কোন যোগসূত্র নেই তবু অহুপমের সঙ্গে দেখা একটা পৌরাণিক নাটকের অভিনয়বাংশ তার মনে পড়ছিল।

পরাস্ত বিপর্যস্ত যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হারিয়ে কেমন অসহায় ভাবে তাকাচ্ছিল চারিদিকে। রাজ্য সম্পদ সব গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই দুঃস্বপ্ন পাশা খেলায় দ্রৌপদীকেই পণ রেখে জয়ের আশা করেছিল।

যুধিষ্ঠিরের সেই অসহায় চেহারার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল অহুপমেব। ঈষদুন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে অহুপমের এই বিপর্যস্ত চেহারাটাই দেখতে পেল কুস্তলা।

[ধনঞ্জয় বৈবাগী রচিত ‘মঞ্চকন্ঠা’র শেষাংশ
আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।]

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার

সাহিত্য

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

বি. মাস্কেটিয়ার্স [ভিন]

'Ask a plum tree how it produces plums'

ফুলন্ত গাছের দিকে তাকিয়ে মানুষ বিস্মিত হয় না, অনেক সময় মানুষ তাকিয়েও দেখে না। অফুরন্ত ফুল ফোটা আর ফুল ঝরার অজস্র রঙবাহাব মানুষের চোখে বণ্ড ধরায় না, তার কারণ ফুল ফোটা আর ফুল ঝরার এই খেলা দেখে, দেখে তার চোখ বিস্মিত হবাব সেই দৃষ্টিই হারিয়েছে। শুধু ফুল নয়। আকাশে 'নীলের' মেলা, সিঁদুরের মেখলা, মুঠো মুঠো সাদার সমারোহ, এখানে ওখানে কাশফুলের মত নীল জল থেকে মাথা তুলে রাখা, মর্ত্যের মন ভোলায় আর খুব কম। প্রজাপতির পাখায় প্রকৃতির নিজের, হাতের কাঁজ—তাও বুঝি আর চোখের পলক কাড়ে না। কিংবা বর্ষাব নবীন মেঘের সুব-লাগা ময়ূরের নেচে ওঠা পেখমেব সঙ্গে হৃদয় আজ নৃত্য কবে কই?

কিন্তু ফুলন্ত গাছের সঙ্গেই যাব তুলনা চলে শুধু তুলনা-হীন রচনা-বৈচিত্র্যের কারণে, সেই জীবন্ত মানবমহীকহ আলোকজান্দাব, ছুমার চলে যাবাব সুদীর্ঘকাল পরেও আজও তাঁর বিশ্বাসেব অযোগ্য সংখ্যায় সৃষ্টিব সমারোহের দিকে তাকিয়ে আমাদের বিশ্বাসের শেষ নেই। নেই, তার কাবণ, পারিব গলায় গানের মত, গাছেব মুখে ফুলের মত, আকাশের বৃকে নীলের মত, মানুষের হাতে কলম তার বিধাতা দিয়ে পাঠান নি। কলম ধরতে, তুলি ধরতে ভরোয়াল ধরতে যেমন তেমনই তাকে শিখতে হয়েছে। তীক্ষ্ণধার ভরবারির চেয়েও অনেক ধারালো এই লেখনী ধারণ করতে অনেক বেশী সাধনা আব ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষায় হতে হয়েছে নিশ্চিত উত্তীর্ণ। অভিজ্ঞতার অনেক তিক্ত অশ্রুজলে সিক্ত বেদনার পদকে জীবন-দেবতার পায়ে উৎসর্গ করতে হয়েছে আনন্দ কমল করে।

লেখকের পথ কুসুমচ্ছন্ন নয়, কষ্টকাঙ্ক্ষী। যে লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়, সেই অনবদ্য আশ্চর্য কথাগুলো কেউ বলে গেছে অদৃষ্ট অন্তর্লোক থেকে, আর কাকুর কলম কেবল নকল করে গেছে ক্রতলিখনে সে লেখা রক্তের অক্ষরে রচিত। শুষ্ক কালো অর্থহীন কালি দিয়ে কেউ জীবনের লেখাকে জীবন্ত করতে পারে না।

রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত নিজেকে নিংড়ে নিংড়ে ভবেই অক্ষরেব কুঁড়িতে কথার ফুল ফোটে। 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে'—একথা ঠিক। যে পারে না সে কিছুতেই পারে না, সে কেবল মিথ্যে আঘাত করে বোটাতে—এ কথা ঠিক নয়, অসত্য। তবু এই আপনি যে পারে তার দিকে তাকিয়ে আমাদের বিশ্বাস-বিমুগ্ধ চোখ পলকহীন দৃষ্টি ফেরাতে পাবে না কিছুতেই। পারে না তার কারণ, পাখি যেমন করে আপনি পারে গান করতে, কথাশিল্পী তেমন করে আপনি পারে না শব্দের আলো জেলে নিঃশব্দেব আরতি করতে। কারণ, এ আলো, এত আলো নিস্প্রাণ অক্ষরের অহল্যায় নেই। নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে যে অঙ্গার এই আলো জ্বালে, শুধু সেই জানে শিল্পীর যন্ত্রণা কী? প্রতিভার পদার্পণেই শেষ পর্যন্ত অক্ষরেব অহল্যা প্রাণ পাষ এ কথা স্বীকার না করবে কে? কিন্তু প্রতিভার পুত পবিত্র পুণ্য প্রাণদাকে অবাঙমানসগোচরের জটা থেকে মুক্ত করে আনে যে ছুশর জ্যোতির্ময় জীবনতপস্বী, তার মৃত্যুহীন সাধনাকে, অন্তবিহীন আরাধনাকে অস্বীকার কববে কে?

জীবনেব ঘাটে ঘাটে ঘুবে ঘুবে প্রভাত-সন্ধ্যার সমস্ত সঞ্চয়কে নিঃশেষে তুলে দেয যে সোনার তরীতে সেই মানুষের কাছেই কেবল, আর কাকুর কাছে নয়, বিধাতা-গুরুষের কিছু ঋণ আছে। মানুষের বিধাতা মানুষের কাছে ঋণী; কিন্তু সেই মানুষ আবার যার কাছে চিরঋণী সে কখনও সঙ্ক্রেতিস, কখনও সেক্সপীয়ার, কখনও নিউটন, কখনও বিতোফেন; কখনও রেমব্রাণ্ট, কখনও রবীন্দ্রনাথ।

যার কাছে একটি বিশেষ দেশের বিশেষ কয়েকটি লোকের ঋণ, তার নাম কখনও নেপোলিও, কখনও সীজাব, কখনও আলেকজান্দার। কিন্তু যাব কাছে সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের ঋণ কোনও দিন শোধ হবার নয় তাঁর নামই আলেকজান্দার দুমা।

রোদের আগুনে পুড়ে পুড়ে যে ছায়া দেয় পথিককে, বৃষ্টির জল নিজের মাথায নিয়ে আশ্রয় দেয় অপরকে— সেই-ই বট, আর নিজে ছাই হয়ে অন্ধকে আলো দেয় যে বাতি, নিজেকে নিঃশেষ করে নীল নিশীথরাত্রির অনিলকে যে মধুগন্ধ করে সেই ধূপ অথবা মরুভূমির মধ্যাহ্নে যতদূর চোখ যায়—যেখানে ধূপ করছে রোদ্দুর আর বোদ্দুর সেখানে যারা মুমূর্ষুকে প্রাণদান করে জলদান করে সেই ওয়েসিসের সঙ্গেই কেবল তুলনা চলে অতুলনীয় শিল্পী দুমার। সব স্মরণীয় শিল্পীর মতই দুমাও ‘ডুয়েল পার্সোনালিটি’। দুমার মধ্যে যে দুজনের বাস পাশাপাশি, তাদের মধ্যে একজন মানুষের আনন্দে উজ্জলানন, মানুষের দুখে মূহমান, সভ্যতার সংকটে লেখনী ত্যাগ কবে তববারি ধারণ করতে উত্তত, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীববে নিভুতে কান্দে যখন তখন কলমের মুখে সেই একজনের ফুল নয়, প্রতিবাদের হল হলুদুল আনে রাজপ্রতাপকে অস্বীকার করে, মানুষের সংগ্রাম পৃথিবীতে যতবার জয়যুক্ত হয়েছে ততবার যাদের স্মরণীয় নাম অবগুস্তারী যুক্ত হয়েছে সেই অবিস্মরণীয় কীর্তির সঙ্গে দুমার মধ্যে যে দুজনের পাশাপাশি অবস্থান, দুজনের সেই একজন তাঁদেরই একজন।

আর এই দুজনের ‘অজ্ঞান’ যে সে দুখে নিরুদ্দিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ। বীতবাগভয়ক্রোধ সে শিল্পী।

উপনিষদ একটি নিকপমা উপমা ‘জীবন’-শিল্পীর এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

‘স্বপ্না সখ্যা সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে’;

তয়োরন্তঃ পিপ্ললং স্বাদন্ত্যনয়ন্যতোহভিচাক্ষীতি ॥

‘ইহারা দুটি পাখি, ডানায় ডানায় সংযুক্ত হইয়া আছে; ইহারা সখা, ইহারা এক বৃক্ষেই পরিষক্ত, ইহাব মধ্যে একজন ভোক্তা, আর একজন সাক্ষী—একজন চঞ্চল, আর এক জন স্তব্ধ।’ [ভারতবর্ষ : মন্দিব : ববীন্দ্রনাথ]

সব শিল্পীর মধ্যেই, দুমার মধ্যেও এই দুজনের

পাশাপাশি স্থান। একই দেহবক্ষে দুজনের অবস্থান। দুমার মধ্যে এই দুজনকে পূর্ণভাবে না জানলে সেই ‘একজন’ সম্পূর্ণ অজানা থেকে যাবেন, যিনি ‘থি. মাস্কেটিয়ার্স’ নামে অবিস্মরণীয় এক রচনার স্মরণীয় স্রষ্টা।

যৌবনের সোনার জলে নাম লেখা জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলোয় নয় কেবল, শেষ সন্ধ্যাতেও অশেষ উত্তেজনায় অস্থির, দুঃস্বপ্নবেগে বয়ে যাওয়া বর্ষার প্রোতস্বতীভ চেষ্টেও দুর্বাব দুমা তখনও সৃষ্টির নেশায় আচ্ছন্ন :

‘His mercurial energy was forever straining to be translated into action. He could never rest.’

তখন দুমার বয়স তেঁষটি। ইটালী থেকে ‘রিভলুশ্যনারি’ উন্নততার অবদানে দুমা ফিরেছেন পারীতে। রাত দশটা। স্টেশন থেকে বাপকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিল দুমার ছেলে। বাপকে সে বলে : ‘You must be pretty tired after your exertions, father Let me take you home.’

গর্জে উঠলেন, ক্রান্ত কথাটিতে আহত, সিনিয়ার দুমা : ‘No, I want to see Gautier before I go to bed.’ কর্মকান্ত দিনের অবদানে নিশীথনিদ্রায় নিস্তব্ধ গতিয়ের-গৃহ জেগে ওঠে দুঃস্বপ্ন গোলমালে :

“ ‘Who’s there?’

‘Dumas the father and Dumas the son.’

‘But we’re all in bed.’

‘What, in bed at this early hour? Come on, you lazybones, get up, everybody!’ ”

গতিয়ের-গৃহ থেকে যখন বিদায় নেন পিতা-পুত্র, তখন ভোর চারটে।

কিন্তু তখনও অক্লান্ত আলেকজান্দার দুমা। ছেলেকে বলেন : ‘And now, Alexandre, I want you to get me a lamp.’

‘What for?’

‘I’ve got work to do.’

ছেলে ঘুমোতে চলে গেল; বাপ বসে গেলেন লেখার টেবিলে। ভোরের সূর্য প্রভাতের প্রাঙ্গণে পা দেবারও অনেকক্ষণ পরে নিদ্রাভঙ্গ হয় দুমা জুনিয়ারের। উঠে দেখে ছেলে বাপ আয়নার সামনে শিশ দিচ্ছে, গান

গাইছে, দাড়ি কামাচ্ছে। ডেকের ওপর তৈরি হয়ে রয়েছে তিনটি সম্পূর্ণ রচনা—ছাপাখানার জন্তে পাঁচাড়াতেই শুধু যা সময়।

‘How do you feel, father?’

‘Fresh as a daisy, son. We youngsters, you see, don’t tire as easily as you old men.’
[Living Biographies of Famous Novelists.]

মৌমাছির পাখায় প্রয়োজনের ছন্দ; তাই তার পরিশ্রমে যতি আছে। প্রজাপতির পাখায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত আনন্দ; তার বৈচিত্র্যের জ্যোতি আছে, বিবাম নেই।

যে দুমাব রচনাসংখ্যা ‘বিশ্বযে’ব, বিশ্বসাহিত্যেও বালজ্যাক ছাড়া আজও পর্যন্ত যার জুড়ি নেই, যাব প্রতিভাব অপরিপুষ্ট ফসল উত্তরকালে কবেছে বিশ্বয়ের উদ্রেক সেই দুমাব বিশ্বয়কব এই সৃষ্টিক্ষমতা কিন্তু তাঁর সমকালে করেছিল কেবল ঈর্ষাব উদ্রেক। তাঁর রচনা-বৈপুল্যের বহবে ঈর্ষাকাতব লোকের জিহ্বা রটনা কবেছিল যে দুমাব এই অফুরন্ত গল্পভাণ্ডারের অনেকপানিই অল্প লোকের কাছ থেকে আহরণ করা। Bourgen-Bresse এ যখন দুমা তাঁর উপন্যাসেব জন্তে লোকাল কালার সংগ্রহে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস কবেছিলেন :

‘So you are really going to write a novel yourself?’

দুমা জবাব দিবেছিলেন তৎক্ষণাৎ :

‘Yes, really. I had the last one written by my valet, but as it had a great success the fellow demanded such an outrageous wage that to my great regret I had to dismiss him.’

দুমা নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদেব আঙুল জালাবার ইচ্ছা জুগিয়েছিলেন। এই কুৎসায় কালো কিংবদন্তীর প্রতিকৃতিব আবরণ উন্মোচনের আগে দুমাব রচনা-পরিমাণের একটা সংখ্যাতত্ত্ব পাঠককে জানানো প্রয়োজন। দুমাব অন্ততম জীবনীকার এ ক্রেগ বেল সেই প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের সরববাহ করেছেন। সাত বছরে—১৮৪৪ থেকে ১৮৫১ সনের মধ্যে দুমাব রচনাবলীতে রয়েছে তেইশটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, আটটি

গল্প, দুটি নাটক; দুটি ভ্রমণবিচিত্রা, সাতটি ঐতিহাসিক উপাখ্যান, একটি জীবনী, সমকালীন নাটকের ওপর আলোচনা-সম্বলিত পত্রগুচ্ছ, দুটি স্মৃতিচারণ, ইটালিয়ান ও ফ্রেমিশ মাস্টারদের ওপর চৌত্রিশটি স্টাডির একটি সংকলন। এহ বাহ! এ ছাড়া তাঁর সম্পাদিত কর্ম-তালিকায় আরও রয়েছে এগারটি দুমা-উপন্যাসের দুমা-নাট্যরূপ। এবং এই সময়ে তিনি স্পেন এবং আলজিরিয়া ঘুরেছেন, নিজের জন্তে তৈরি করেছেন একটি Chateau, একটি রঙ্গমঞ্চের নিষেছেন সম্পূর্ণ পবিচালন-ভার, একটি পত্রিকার সম্পাদনা রচনা এবং প্রকাশনার ভার নিয়েছেন একেবারে একা। তাই দুমাব দিকে তাকিয়ে Michelet-এব এই উক্তি : ‘A man? No, an element!’—অত্যাুক্তি নয়।

বহুপ্রসবিনী দুমা-প্রতিভাব সঙ্গে জর্জ স্যাণ্ডের তুলনা কবতে চেয়েছেন কেউ কেউ। দুমাব জীবনচবিতকার সেই তুলনাকে স্বীকার করেন নি। করেন নি তার কারণ দুমাব এই বিশ্বয়কব প্রতিভা—প্রতিভা, সংখ্যার বিচারে নয় শুধু গুণের গোঁববেও বটে। জর্জ স্যাণ্ড ক্লবেয়ারকে লেখা একটি চিঠিতে নিজেই নিজের ক্রটি স্বীকার করেছেন :

‘For myself I believe that in fifty years’ time I shall be quite forgotten and perhaps harshly misunderstood. Such is the law of second-rate productions, for I have never pretended to believe myself a first-rate writer.’

দুমা এবং বালজ্যাক দুজনের প্রতিভাই এব বিপরীত।

পত্রেপুস্পেপল্লেবে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে দুমাব সৃজনীশক্তি যখন তখনও বর্ণগন্ধেবৈভবে তাকে ভরে দিতে ভোলেন নি তিনি। বরং প্রথম আঘাতের নববর্ধার বিবামবিহীন রচনার ধারাজলের দিনেই তাঁর প্রতিভা ক্ষমতার শিখবদেশ স্পর্শ করেছে যে তার প্রমাণ :

‘From his room he poured out volume after volume, novel after novel, play after play, at lightning speed, as fast as Maquet could bring rough material and ideas. The Siecle, Presse, Constitutionnel, every journal of note, snapped them up as soon as Dumas announced he had started on a new work. Two and even three were running at the same time; others overlapped. Sweeping

on the course of *Les Trois Mousquetaires* and *Monte-Cristo*, he threw off the two short stories: *Histoire d'un Mort* and *Une Ame a naitre*, indifferent stuff, and written to fill the last volume of *Les Trois Mousquetaires* when published later in the year, following these with *Les Freres Corsees*, *Une Fille du Regent*, *La Guerre des Femmes*, and *Herminie*, and somehow finding time to pick a quarrel with Buloz, the arrogant successor to Baron Taylor as *Commissaire Royal* of the *Theatre Francais*, and to hurt at him through the *Democratie Pacifique* the stinging *Simplees Lettres sur l'Art dramatique*. And all the while *Monte-Cristo* and *Louis XIV et son Siecle* were under way. Five novels, three tales, a history, a pamphlet and a series of articles on the theatre in one year?—What biographer would not tear his hair? [Alexandre Dumas: A Biography and Study: A. Craig Bell]

এই উদ্ধৃতির মধ্যে Maquet বলে যে একজনের নাম উচ্চারিত, দুয়ার সৃষ্টিসংখ্যার পেছনে অলৌকিক কারণ তাঁর স্বজনপ্রতিভা হয় যদি, তা হলে তার লৌকিক কারণ ওই Maquet-এর 'Collaboration'। এবং এই Collaborationই একসময় দুয়ার দুর্নামেরও কাণে হয়ে দাঁড়ায়। দুয়ার নামে অপরের লেখা চলছে; এই দুর্নামের যিনি অসহ্যবহার কবে সে সময়ে সাংঘাতিক আলোড়ন এনেছিলেন তিনি হলেন জনৈক M. Jacquot। এই অজ্ঞাত পরিচয়ের রাগের কারণ ছিল দুয়ার ওপর; লেখা ছাপবার জন্তে পত্রিকার দ্বারস্থ হয়ে Jacquot শুনেছিলেন: 'Get that signed "Dumas" and I'll pay you one franc fifty centimes the line...' Jacquot-এর অভিযোগ সম্পর্কে ক্রেগ বেল বলেছেন:

'Jacquot accused Dumas of hiring collaborators to do work which he merely signed, declared Maquet to have written *Les Trois Mousquetaires* and *Fiorentino Monte-Cristo*...

দুয়ার কোনও বন্ধু, এমন কি তাঁর 'collaborator' পর্যন্ত এ কথায় কান দেন নি। ব্যতিক্রম শুধু বালজাক:

'I have seen the pamphlet *Maison Dumas et Compagnie*. It is immeasurably stupid but sadly true;...this will not harm Dumas much.'

বালজাকের দুটি মন্তব্যই ভ্রান্ত এবং দীর্ঘাশ্রিত। দুয়ার বিরুদ্ধে এই জেহাদে দুয়ার ক্ষতি হয়েছিল—এই হচ্ছে এক আর দুই হচ্ছে—দুয়ার সম্পর্কে এই Jacquot-কুৎসা অসৎ এবং অসত্য।

এতদূর ক্ষতি করেছিল যে বিচলিত দুয়া শেষ পর্যন্ত একটি দীর্ঘ চিঠি লিখতে বাধ্য হন, 'Societe des Gens de Lettres'-এর কলমে; এই পত্রের শেষে দুয়া লেখেন:

'If, finally, I have acted within the right of every writer to produce works either alone or in collaboration, have I not the right to appeal to those who have the authority to guard my interests and my honour when my honour and my interests are attacked?'

এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে দুয়ার মধ্যে যে দুজনের বাস তার একজনকেই মাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই "একজন" 'থি মাস্কেটিয়ার্সের' স্বত্বাধিকারী মাত্র, স্রষ্টা নয়।

Jacquot না জেনে ঠিকই বলেছিলেন যে 'থি মাস্কেটিয়ার্স' আর একজনের লেখা। আব একজনের নয়—আর এক দুয়ার। দুমাকে তাঁর অজ্ঞত অফুরান রচনার পরেও অক্লান্তকর্মা দেখে যখন লোকে প্রশ্ন করেছিল, ...'how he managed to feel so fresh after his daily grind,'—তখন দুয়া উত্তর দিয়েছিলেন:

'I don't produce my stories. The stories produce themselves within me.'

'But how?'

'I don't know. Ask a plum tree how it produces plums.'

যে দুয়া সমকালকে সকল কালের শিল্পীর হয়ে চিরকালের এই উত্তর দিয়েছিলেন, দুয়ার সেই আর এক দুমাই 'থি মাস্কেটিয়ার্সের' স্বত্বাধিকারী নন—স্রষ্টা।

[ক্রমশঃ]

হারামণি

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটে ফুল কিংগকে বকুলে ।	ওরে, তোরা ছেড়ে মোরে যা নবে ।
গোপাল এল কি ফিরে গোকুলে ।	পাগলিনী রাধা প্রেম-আসবে ।
রাধা-নামে-সাধা বাঁশি পুন কি বাজাবে আসি-?	সে যে 'প্রিয়া' ডেকেছিল, বৃকে বৃক বেখেছিল,
কুলবতী কুল নাশি ভাসিবে কি অকূলে ?	পদ্মরেণু মেখেছিল শিখি পাখা-চূড়াতে ।
কালো-সোনা এলো ফিবে গোকুলে ?	সে মধু চায় না মনে ফুবাতে ।
অসহ হয়েছে ঘরকরনা ;	মধুনিশি এল মনোহরা সে ।
চাঁদে বাবে বিরহের বরনা ।	হিয়া মোব কাঁপে স্বপ্ন-তরাসে ।
ছদ্মিদের খেলা খেলে প্রিয়হৃদি বিঁধি শেলে	হয়তো এমন ক্ষণে সে মোরে স্মরিছে মনে,
যে গিয়েছে গিছে ফেলে সব স্নেহ পাসরি	অবহেলি বাজাসনে রাধাপ্রেম সরিতে
পুন কি শুনিব তার বাঁশরী ?	চাহিছে গাহন পুন করিতে ।
নদীতটে মাধবীর কুঞ্জে	কে যেন আসিছে বাঁশি বাজায় ?
আবার ভ্রমব' কেন গুঞ্জে ?	ওবে, তোরা দে স্বরা দে সাজায়ে ।
আজও যে স্বদূর হতে আমার মরম মথে—	ভুবনমোহন হাসি ক্ষমা সে চাহিবে আসি
তারি কথা বনপথে এ জোছনা-আলোকে	বৃকে নেব ভালবাসি, রব জাগি পাহারায়,—
আলোচনা করে গোপবালকে ।	হারামণি আব যেন না হারায় !

ঘুম দাও

সন্তোষকুমার অধিকারী

আলোকিত প্রহরের শেষে	দাও ঘুম, ঘুম দাও প্রাণে ;
অপরাক্ষ ছায়ার স্নানতা ।	প্রত্যহের আশার বঞ্চনা
প্রখর সূর্যের দীপ্তি এসে ।	মুছে যাক্ সন্মুখের গানে ।
ঢেকেছে রাত্রির নীরবতা ;	জীবনের নিরন্তর যন্ত্রণা
অথচ সে স্তব্ধ অপেক্ষাতে—	ডুবে যাক সেই অন্ধকারে—
সেই ব্যাপ্ত বিপুল আধার ;	মগ্ন মহাচেতনার পারে ॥
ষতবার জেনেছি প্রভাতে	
দিনান্তে রাত্রিকে ততবার ।	

অতঃপর

শ্রীপদ সেনগুপ্ত

সমস্ত তর্কের শেষে তবু এক গভীর যন্ত্রণা
বিশ্বায়ের পারাবারে অন্তহীন সেই সন্তরণ,
দিকচক্রে কিছুকাল বৌদ্ধনৌলে বিচিত্র বচনা
হঠাৎ সমুদ্রঝড়ে করে নেয় সমস্ত হরণ।

বিজয়কেতন ওড়ে কবে কার স্বদীর্ঘ সময়
ব্যভিচার, আশ্ফালন, কীর্তি কিংবা দৃষ্ট মতবাদ
এই ওঠে—বিচ্ছুরিত চতুর্দিক, এই লুপ্ত হয়
অদৃশ্যে এ ঘেন কারও খেলা করে জাহ্নবীর হাত।

সমস্তই ইতিহাস, জাহ্নবীরে অপার বিশ্বয়
শিল্পকলা, দর্শনের অন্তরালে দ্রুতগতি তার,
পর্বতে আয়ুর চিহ্ন, পৃথিবীর পলিতে নিশ্চয়
কেবলই প্রসব-লগ্ন, আয়ুস্মতী গভিণী মাতার।

তবু রক্ত, তবু যুদ্ধ, শৌর্য বীর্য পরাক্রম তবু
কি আশ্চর্য গান শুনি বাউলের কণ্ঠে অতঃপর।

এ হৃদয়

শ্রীকরণাময় বসু

এ হৃদয় হতে চায় শরতের সোনারঝরা, মায়াভরা মেঘ,
এ জীবনে পাল তুলে এলো এক আশ্চর্য আবেগ;
হাওয়ায় পাতায় বাজে রিনিবিনি দিন,
সেই স্বরে গান গায় বুরুবুরু ফুলঝরা
চঞ্চল আশ্বিন।

এ হৃদয় হতে চায় থিরথির আশ্বিনের নদী,
মনে হয় কেউ এসে কাছে বসে মুখ মেখে যদি।
ভিজ়ে ঘাসে উড়ে আসে চুনীপায়ী বঙ আঁকা
কটি প্রজাপতি;
আকাশের সিঁড়ি বেয়ে গান গেয়ে
নেমে আসে মুক্তাঝরা শিশির সকাল;
এ হৃদয় বসে থাকে চূপ করে,
যদি আসে লালচেলি পরা এক নির্জন বিকাল।

কথা : সময়

সনতকুমার মিত্র

যেখানে কথার স্রোত, সেখানে সময় হয় নদী;
অথচ কথার ঢেউ দু হাতে সরিয়ে আমি যদি
মনের বনের মাঝে হারিয়ে সমস্ত কোলাহল—
একান্তে ডুবুরী হই খুঁজে পেতে মনের অভল,
সেখানে দেখতে পাই হয়তো বা দিগন্ত অবধি।

কেন যে তবুও মন কথা বলে, কথার ফেনাতে
নিজেকে আবৃত করে, চায় না সে নিজেকে চেনাতে?

না কি সে নিজেব মুখ একা আয়নায় দেখে দেখে
ভয় পায়, তাই তার নির্জনতা যত্নে দূরে রেখে
কথার সমুদ্র গড়ে সময়কে হত্যা করে তাতে?

কথা তবু মুছে যায়, সময়ের স্লেট সব শেষে
খড়ির ধূসর এক চাদর জড়িয়ে তার গায়
জেগে থাকে, সব কথা ধুলো হয়ে ধুলোতে গড়ায়;
সময় সন্ধ্যাট হয়ে বিজয়ীর দৃষ্টি মেলে হাসে।

বিশ শতকের ঐতিহাসিকের সমস্যা

শংকর দত্ত

নিভাবপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক জিওফ্রে ব্যারাকলো (Geoffrey Barraclough) অক্সফোর্ড থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর এক প্রখ্যাত গ্রন্থের 'সূচনায়' লিখেছেন: "One of the pressing needs of to-day is a new vision of the course of modern history. Ever since the end of the war we have laboured under a sense of the inadequacy of our inherited view of the past.... We are beset by a sense of uncertainty because we feel ourselves on the threshold of a new age, to which previous experience offers no sure guide"—অধ্যাপক ব্যারাকলোর এই উক্তি সন্দেহাতীতভাবে সমর্থনযোগ্য। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় পরিবর্তিত অথবা পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ এবং দায়িত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং ব্যাপক। পরিবর্তনের এই দ্রুততা এবং ব্যাপকতা আজ ঐতিহাসিকের পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ ও দায়িত্বের সমস্যাগত প্রশ্নটিকে প্রথম পর্দায়ে উন্নীত করেছে এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত স্থাপনের বিনীত প্রচেষ্টাই এই আলোচনার উপজীব্য।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত পটভূমিকায় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ নির্দিষ্টকরণ প্রসঙ্গে প্রথমই পরিবর্তিত পটভূমিকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বহুমুখী পরিবর্তনের মধ্যে ত্রিবিধ ধারা অথবা বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিকতাবাদের ব্যাপ্তি; দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের পরিবর্তনশীল সংজ্ঞা, তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা।

উক্ত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের

ব্যাপ্তি যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রথম উল্লেখের দাবি বাধে। আধুনিক আন্তর্জাতিকতাবাদের মাতৃভূমি ইউরোপ। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'নেপোলিয়নিক' যুদ্ধান্তে এর প্রথম প্রতিফলন প্রখ্যাত 'ইউরোপীয়ান কনসার্টের' (The Concert of Europe) মাধ্যমে। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের 'হোলী অ্যালায়েন্সের' (The Holy Alliance) কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আভ্যন্তরীণ স্বার্থসংঘাতের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে প্রথমটির এবং বাস্তব-বিবর্জিত আদর্শবাদের আধিক্যের জন্ম দ্বিতীয়টির পতন হলো আন্তর্জাতিকতাবাদের উত্থানের ইতিহাসে এদের আসন স্থানিষ্টি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস চুক্তি, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্লিন চুক্তির মধ্যেও কয়েকটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির আগ্রহ দৃষ্ট হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের হেগ সম্মেলনদ্বয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবাদ শৈশব অতিক্রম করে প্রথম যৌবনে উপনীত হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধান্তে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ দফা প্রস্তাব-আশ্রিত জাতিসংঘের (The League of Nations) রূপকে বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে জার্মান ও ইটালীয়ান ফ্যাসিবাদের চক্রান্তে জাতিসংঘের শোচনীয় অপমৃত্যু হলো মানবমনে আন্তর্জাতিকতাবাদের অপরিণীম আবেদন অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর অন্তর্বর্তী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী আঙ্গিক, ধ্বংসের প্রচণ্ডতা এবং বিভীষিকার ব্যাপ্তি, এই আবেদনের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের অবিভাজ্য বেষ্টনী, নতুন নতুন যুদ্ধান্তের আবিষ্কার, জলপথ এবং আকাশমার্গে ওপর মানুষের কর্তৃত্বের প্রসার, পৃথিবীকে সংক্ষেপিত একটি সামগ্রিক বেষ্টনীতে মধ্যে আনীত করে। সংক্ষেপিত এই সামগ্রিক বেষ্টনী আন্তর্জাতিকতাবাদের ইতিহাসে নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনাকে ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাই জাতিসংঘের চিতাভস্মের ওপর রাষ্ট্র-

সংঘের (United Nations) ভিত্তি স্থাপিত হয়। জাতিসংঘের সংকীর্ণ বেটনকে অতিক্রম কবে বাহুসংঘ অপেক্ষাকৃত সার্বিক আঙ্গিকে আশ্রয় করে আন্তর্জাতিকতাবাদের ইতিহাসে অপর একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিকতা এক অব্যাহত এবং সুস্পষ্ট ব্যাপ্তির পথ ধরেছে এবং একাধিক ক্রটি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও যুদ্ধাহত বিশ্বমানবের সামনে বিশ্বশান্তির একক এবং অবিভাজ্য রক্ষাকবচ হিসাবে আজও স্বীকৃতি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের ব্যাপ্তি যদি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত পটভূমিকার প্রথম পরিচায়ক হয়, দ্বিতীয় পরিচায়ক হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের পরিবর্তিত সংজ্ঞার কথা। আন্তর্জাতিকতার ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞায় একটি পরিবর্তনও বিশ শতকের সূচনা থেকেই প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের সনাতন ব্যাখ্যা আজ অবাস্তব এবং অসম্পূর্ণ বলে উপেক্ষিত। অথও বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা যে যুগে বাস্তব রূপায়ণের বিষয়বস্তু, সে যুগে রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, ভৌগোলিক সীমানা, শাসনতান্ত্রিক সংগঠন ও সার্বভৌমত্বের বেটনের মধ্যে সীমিত করার অর্থ রাষ্ট্রের ভগ্নাংশকে আবিষ্কার করা মাত্র। অধিকন্তু, যে “সার্বভৌমত্ব” রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপকবণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান এবং অপরিহার্য বলে স্বীকৃত, সেই সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞাও বিশ শতকের দ্রুত-পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে সমতালে পরিবর্তনশীল এক পথ ধরেছে। বিশ শতকের বাস্তব পরিস্থিতির পটভূমিকায় কোন রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ এবং পোক্ষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এক সুনির্দিষ্ট বিতর্কবিহীন আসন দাবি করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই আজকের পরিবর্তনশীল পৃথিবীর অন্ততম একটি প্রধান কথা। প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদের ভাষায়: “In a creative civilisation what is important is not the historical accident of separate states, but the scientific fact of

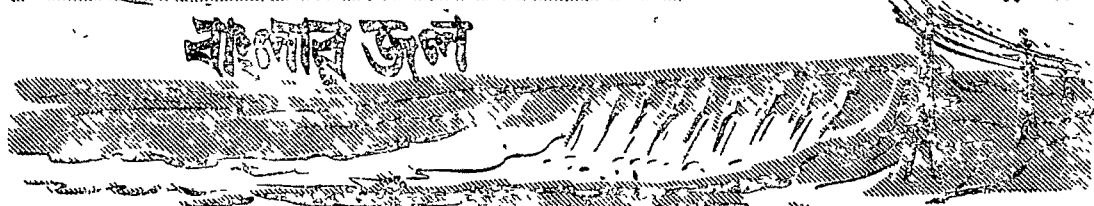
world-interdependence. The real unit of allegiance is the world. The real obligation of obedience is the total interest of our fellow-men....There are problems of which the impact upon humanity is too vital for any state to be left to determine by itself what solution it will adopt.... Once we realise that the well being of the world is, in all large issues, one and indivisible, the co-ordinate determination of them is the primary condition of social peace.”

প্রকৃত প্রস্তাবে, রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে উক্ত ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে বিশ শতকের পরিবর্তনশীল পটভূমিকার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আজ সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত। অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা এবং অর্থনীতিতে একক স্বার্থ সংরক্ষণের সনাতন তথ্যাদি আজকের পৃথিবীর বহুমুখী পরিবর্তনের উৎসমুখে স্তিমিত হয়েছে। “শান্তি ও যুদ্ধ আজকের পৃথিবীতে অবিভাজ্য”—বিশ শতকের রাষ্ট্রনীতির এই নতুন স্বীকৃতি বিশ্বরাজনীতিকেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এক পরিণত বেটনের মধ্যে এনেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনও এই নির্ভরশীলতার বেটনী থেকে আজ মুক্ত নয়। মানবতার মূলগত ভিত্তিকে আশ্রয় কবে বিশ্বের সমাজ ও সংস্কৃতির এক সার্বিক উন্নয়নেব কার্যসূচীতে আজ অধিকাংশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। বিশ শতকের পৃথিবী তাই আজ রাষ্ট্রগত অথবা জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণ বেটনের মধ্যে সীমিত নয়, জাতি এবং রাষ্ট্রমত্তার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিকতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরত।

এই পরিবর্তিত আঙ্গিক এবং আদর্শের পটভূমিকা আজকের ঐতিহাসিকের দায়িত্ব ও দৃষ্টিকোণের প্রশ্নটিকে সজীব করে তুলেছে এবং আধুনিক ঐতিহাসিকের সামনে আংশিকভাবে কয়েকটি সমস্যার সূচনা কবেছে। একটি মূলগত প্রশ্ন উত্থাপন করে আমরা এই সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণের সূচনা করতে পারি। প্রশ্নটি হল, উদীয়মান আন্তর্জাতিকতার এই যুগে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ এবং দায়িত্বকে জাতীয় অথবা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রচনার মধ্যে



বাংলার উল



বাংলার বাস



বাংলার খাল



পূর্ণা হউক

পূর্ণা হউক

পূর্ণা হউক



গান্ধীজী সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সীমারক্ষ করে রাখা কি সম্ভব? যদি সম্ভব না হয়, তা হলে আন্তর্জাতিকতার বৃহত্তর পটভূমিকায় ঐতিহাসিকের জাতিগত অথবা রাষ্ট্রগত দায়িত্বের স্বরূপ কী?

আলোচ্য মূলগত প্রশ্নের উত্তরে আজকেব চিন্তাশীলোবাপাতদৃষ্টিতে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন। এঁদের একাংশের মতে উদীয়মান আন্তর্জাতিকতার এই যুগে জাতীয় অথবা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনা একান্তভাবেই নিরর্থক। যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন প্রয়োজন। অতীত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক— অর্থাৎ, বর্তমান দিকের বিশ্লেষণ ক্রটিপূর্ণ হতে বাধ্য। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল জাতীয় অথবা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর স্বর্ণযুগ। সে যুগের ঐতিহাসিককে স্বাভাবতই ইতিহাসের আত্মানুসন্ধান করতে হয়েছিল জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনা থেকে আন্তর্জাতিকতার ক্রমবর্ধমান চেতনা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের প্রয়োজনের পূর্বাভাস বহন করেছে। বিশ শতকের বিগত কয়েক দশকের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা যে পরিণত আঙ্গিকের মধ্যে এসে পড়েছে তাকে সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃতি না দিলে আধুনিক ঐতিহাসিক বাস্তব-বিবজিত ইতিহাস রচনার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পাবেন। সংক্ষেপে এঁদের বক্তব্য হচ্ছে, আজকেব ঐতিহাসিককে রাষ্ট্রগত অথবা জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনার সনাতন পদ্ধতিকে বর্জন করে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণের উন্নয়ন ছত্রতলে এসে দাঁড়াতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে আজকের পরিবর্তিত পটভূমিকায় ইতিহাসের নতুন আঙ্গিকে।

আধুনিক চিন্তাশীলদের অপর একটি অংশ কিন্তু পূর্বানুচ্ছেদ-অন্তে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তটি সমর্থন করতে পারেন নি। এঁদের মতে আন্তর্জাতিকতা আজকেব ইতিহাসেব একটি বর্ধিত বৈশিষ্ট্য হলেও, এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণকে একটি সুস্পষ্ট আঙ্গিকের মধ্যে সীমিত করার সময় এখনও আসে নি। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ নির্ধারণের ভিত্তি স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণে সে স্বচ্ছতা এখনও প্রাপ্তি বিষয়বস্তু। আজকের ঐতিহাসিক যদি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস

রচনা করতী হন তা হলে তাঁকে একটা গুরুতর অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হবে। এই অন্তরায় হচ্ছে, ইতিহাসেব বিবর্তনের যোগসূত্রাদি নির্দিষ্ট করা প্রসঙ্গে। ইতিহাসেব জাতিগত এবং রাষ্ট্রগত ভিত্তি পৃথিবীর একাধিক অঞ্চলে এখনও সূদৃঢ় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের সাধারণ আঙ্গিককে নির্দিষ্ট কবলে পৃথিবীর সেই সব অংশবিশেষেব প্রকৃত ইতিহাস উপেক্ষিত হবে। অর্থাৎ, ইতিহাসের ভগ্নাংশ আশ্রয় করে ঐতিহাসিককে যোগসূত্রের সন্ধান করতে হবে এবং ভগ্নাংশ-আশ্রিত যোগসূত্র অনিশ্চয়তাবেই বাস্তব-বিবজিত হবে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সহজেই অভিযুক্ত হবেন ইতিহাসকে অতি-সংক্ষেপিত করা অভিযোগে, ইতিহাসকে বিকৃত করা অভিযোগে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের ভাষায়: “Our knowledge can never extend so far, it is impossible to attain the necessary degree of accuracy, and if we attempt to write history on this scale, we shall only mislead.” সংক্ষেপে এঁদের বক্তব্য হল, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা আজকের পটভূমিকায় একটা উচ্চাশা—এবং উচ্চাশার কথা এবং এই উচ্চাশা বা উচ্চাশাকে আশ্রয় করে ইতিহাসের বিশ্লেষণ বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিকূল তথা ক্রটিপূর্ণ বিশ্লেষণ হতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনার প্রশ্ন তাই আজকের ঐতিহাসিকের প্রশ্ন নয়, অনাগত ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের প্রশ্ন।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আজকের পটভূমিকায় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ সম্প্রাকৃত চিন্তাশীলদের এই দ্বন্দ্বের মধ্যে মূলগত কোন বিরোধের স্থান নেই। এঁদের আপাতবিবোধী মতামতের মধ্যে অন্তর্মিহিত একটা এক্য এবং সামঞ্জস্যের সূত্র আশ্রিত রয়েছে। জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ এরা পরস্পরাশ্রিত। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ভাষায়: “It is impossible for one to be internationalist without being a nationalist. It is not nationalism that is an evil, it is the narrow-

ness, selfishness, exclusiveness which is the bane of modern nations which is an evil.” যথার্থই, জাতীয় অথবা রাষ্ট্রগত দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ পরিণতি আন্তর্জাতিকতার মধ্যে এবং আন্তর্জাতিকতাব বলিষ্ঠ স্বীকৃতি জাতি ও রাষ্ট্রগত সত্তাকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করার মধ্যে। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাব তাই কোন মূলগত বিরোধ অথবা সংঘাত নেই, সংঘাতের অথবা বিরোধের সম্ভাবনা তখনই প্রথর হয়ে ওঠে যখন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে সংকীর্ণ বেটনীর মধ্যে সীমিত করার অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা হয়। এই মূল সত্যটিকে স্মরণ রেখে আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, বিশ শতকের পরিবর্তিত পটভূমিকায় ঐতিহাসিককে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাস রচনা করতে হবে। অধ্যাপক ব্যারাকলোর ভাষায়: “In a constantly narrowing world, the whole concerns us as much as the parts. Hence as I believe, the time has come for a return to universal history, which has so long been out of vogue. No one will underestimate the difficulties; but no one should underestimate the need.”^১ দ্বিতীয়তঃ, জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে যে ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করবেন, জাতির

ইতিহাস ব্যাখ্যায় আন্তর্জাতিকতার প্রতি দায়িত্ব তাঁকে অবগণ রাখতে হবে। অপরপক্ষে, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করবেন তাঁকে পৃথিবীর প্রতিটি জাতির জাতিগত এবং রাষ্ট্রগত সত্তার প্রতি একটা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিকতার এই উদার যুগে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণকে ব্যাপক করতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে। সত্য সন্ধানে সব দিক দেখার চোখ সক্রিয় রাখতে হয়, সব দিক স্বীকার কবাব ওদার রাখতে হয়, বিশ্লেষণে নিরপেক্ষতা এবং উপস্থাপনে বলিষ্ঠতা রাখতে হয়—এই একাধিক প্রস্তাবে আজকের প্রকৃত ঐতিহাসিকের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আমবা যুক্তিসংগতভাবেই প্রত্যাশা কবি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক G. P. Gooch যথার্থই বলেছেন: “Give me liberty to know and to utter above all other liberties—The ringing words of Areopagitica should be inscribed in golden letters in every library and lecture room in the land. For the historian needs light and air if he is to fulfil his duty of recovering and interpreting the past.”^২ স্বাধীন চিন্তার মুক্ত অঙ্গনতলই বিশ শতকের ঐতিহাসিকের আত্মসাধনার প্রকৃত ক্ষেত্র হোক।

উল্লেখপঞ্জী

১. “History in a changing world.”
২. H. J. Laski : A Grammar of politics. p. 64-65.

৩. Geoffrey Barraclough : History in a changing world p. 18-19.
৪. G. P. Gooch : History and Historians in the Nineteenth Century. p. xxxvi.

বম্যাবি বীক্ষা

মধ্যভারত পর্ব ॥ শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ॥

উনত্রিংশ

জো বাঘ আমাদের হোটেলে টেনে আনলেন।
বেরবার জন্তে তৈরি হয়ে মামা মামী লাউঞ্জে
অপেক্ষা কবছিলেন। আমাদের দুজনকে দুদিকে নিয়ে
বীরের মত মঞ্চে এলেন, বললেন : দেখলেন তো।

গভীর মনোযোগে মামা পাইপ টানছিলেন, বললেন :
দেখলুম বইকি।

প্রশংসা করলেন, না উপহাস, তা বোঝা গেল না।
জো বাঘ খুশী হলেন, বললেন : জো রায়ের চোথকে
ফাঁকি দিতে পারে এমন জায়গা বোঝাই শহবে নেই।

আমি হেসে বললুম : কোথাও আছে কি ?

হেঁ হেঁ, তা যা বলেছেন।

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তার চোখে
বিরক্তি উঠেছে ফুটে। তাই আর কথা বলবার সাহস
পেলুম না।

মামী বললেন : চল, তা হলে বেরিয়ে পড়ি।

মামা বললেন : না বেরলে চলে না ?

সে কি কথা, সকাল থেকে বেরবার জন্তেই তো তৈরি
হয়ে আছি।

বেরবার জন্তে তো তৈরি হয়ে থাকবার দরকার নেই।

স্বাতি গিয়ে বাপের পাশে বসে পড়ল। বড় সোফায়
অনেক জায়গা। স্বাতি বেশ এলিয়ে বসল, মামী রাগ
করলেন : এ কী ছেলেমানুষি হচ্ছে ?

মামা আস্তে আস্তে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু
খেয়েছিস তোরা ?

হ্যাঁ।

মামী বললেন : ছাই খেয়েছিস।

দবজার পাশে হোটেলের বেয়ারা অপেক্ষা করছিল।

মামা বললেন : যাও, কিছু খেয়ে এস।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, না না, সত্যি আমরা খেয়েছি।
কিন্তু স্বাতির চোখেব দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার সাহস
হল না। স্বাতি বলল : এস গোপালদা।

মামী যে অসন্তুষ্ট হলেন তাতে আমার সন্দেহ নেই,
কিন্তু স্বাতি আজ সে সব কথা ভাবল না। তার সাহস
দেখে বিষয় আমাব ক্রমেই বাড়ছে।

ঘর থেকে বেবিয়ে যাবার সময় জো রায়ের দিকে আমি
একবার তাকিয়েছিলুম। ভদ্রলোক কী করবেন ভেবে
পাচ্ছিলেন না। স্বাতি তাঁকে ডাকে নি, নিজে থেকে নড়
নেওয়ার লজ্জা আছে। মাও মেয়েকে ভয় পাচ্ছেন,
চোখের আড়ালে হয়তো বেগাড়া কিছু বলে বসবে।
টেনের সেই অপমানের কথা জো রায় ভুলেছেন, কিন্তু
মামী ভোলেন নি। শেষ পর্যন্ত মামীই সবদিক রক্ষা
করলেন। বললেন, চল, আমরাও কিছু খেয়ে আসি।

থাক না, আমি তো খেয়েই এসেছি।

তাতে কী হয়েছে ?—জো রায় উঠে দাঁড়িয়ে আমার
দিকে তাকালেন।

মামা বললেন : তোমরা যাও।

জো রায় যেন এই অভ্যুত্থানের অপেক্ষাতেই ছিলেন।
আর কালবিলম্ব করলেন না। বড় বড় পা ফেলে স্বাতির
পাশে এসে পৌঁছে গেলেন। আমি পিছিয়ে এলুম মামী
কাছে। মামী বললেন : তোমরা এমন করে বেরিয়ে
গেলে—



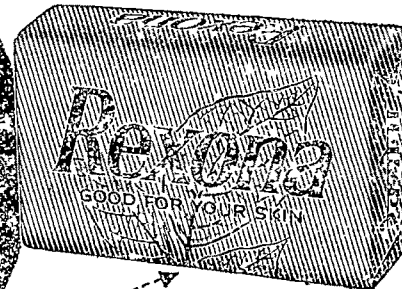
দিনে দিনে

ত্বকে নবীন লাভ্য আসে



নতুন বেক্সোনার পরশে

যতবাবই মাথুন বেক্সোনা'র অবাক
পবশ যেন প্রতিবাবই আপনাব
ত্বকে নবীনতা এনে দেষ। ফেনিল
বেক্সোনা'র ক্যাডল আছে, বিশেষ
ধবনেব এই সৌন্দর্য বর্দ্ধক তেলটি
ত্বকেব প্রতি বন্ধে বন্ধে যায আব
ত্বকে কোমল ও মৃগ্ন কবে
তোলে, চেহাবাব আপনাব লাভ্য
আনে। মিষ্টি গন্ধ ভবা বেক্সোনা
প্রতিদিন স্নানেব পক্ষে আদর্শ
সাবান। একবাব মাথলে আপনি
এব গন্ধ অনেকক্ষণ ধবে পাবেব।



নতুন বেক্সোনা'র নতুন মোড়ক,
নতুন আকা'র আব নবীন সবুজ
রঙ আপনাব নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

নতুন বেক্সোনা-ত্বকের সেরা যত্নের সহায়ক

বললুম : খুবই অন্ডায় হয়েছে।

নতুন দেশ, নতুন মানুষ তোমরা।

বললুম না যে নতুনকে আমরা ভয় পাই নে, পাই পুরাতনকে।

জো রায় স্বাতিকে বলছিলেন : আপনি বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস।

স্বাতি বলল : গোপালদার মত নই।

তাই নাকি।

আজ্ঞা এখানে, কাল শুনবেন খাজুরাহোর ভাঙা মন্দিরে গুয়ে ঘুমচ্ছেন।

বলেন কী।

তাই না গোপালদা ?

বলে আমার দিকে স্বাতি ফিরে তাকাল।

আমার মনে হল, স্বাতি আমাকে ফিরে যেতে বলছে। একটু আগে আমারও এই কথা মনে হয়েছে। আমি চলে গেলে মামী নিশ্চিন্ত হতেন। খুশী হবেন জো রায়। স্বাতির মনের কথাটি জানি নে বলেই এ প্রস্তাব করতে সাহস পাই নি। এবারে বলে দেখলুম : ভাবছি—

স্বাতি বলল : আজই ফিরবে ?

আমি চমকে উঠেছিলুম। বৃকের ভিতরটা বুঝি মুচড়ে উঠেছিল। কেন এমন হল, সে কথা ভেবে দেখবার সময় পেলুম না। বললুম : আজই।

জো রায় আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু মামী কথা কইলেন শান্তভাবে : তোমার ছুটি বুঝি ফুরল ?

ছুটি আমার অনেকদিন আগেই ফুরিয়েছে। ছুটির কথা কোনদিন আমি ভাবি নি। আজও সে কথা মনে হয় নি। তবু বললুম : আর দেরি করলে চাকরিটা যাবে।

জো রায় বললেন : চাকরির আর চিন্তা কী। আমার চাকরি রোজ যাচ্ছে, বোজ হচ্ছে।

মামী বললেন : কী রকম ?

এই ধরন না সেবারের কথা। কয়েকদিন ডুব মেরেছিলুম, তারপর জয়েন করতে গিয়ে লুকুম পেলুম, এক গুদাম পাহারা দিতে হবে। নতুন পোস্ট। একটা দরওয়ানের বদলে একজন সিনিয়ার কভেনেন্টেড অফিসার। বলুন এ অপমান সহ্য কবা যায়! চাকরি ছেড়ে দিলুম তখুনি।

মামী বললেন : কী সর্বনাশ !

সর্বনাশ কিছুই নয়, দু-চারদিনের চেষ্টাতেই এই নতুন চাকরিটা পেয়ে গেলুম।

স্বাতি বলল : তোমার চাকরিটা এবারে যাবে তো গোপালদা ?

বোধ হয় না।

কেন ?

এত কম মাইনের লোক পাওয়া মুশকিল।

প্রবলকণ্ঠে জো রায় হেসে উঠলেন। হাসি সামলে বললেন : ও চাকরি তবে ছেড়ে দেন না কেন ?

আর একটা জুটবে না বলে ভয় পাই।

হু পক্ষই তা হলে দু পক্ষকে ভয় পান।

ভয় জীবজগতের ধর্ম। নিজের বৃকের ভিতর হাতড়ে দেখুন, সেখানেও একটা ভয় আছে। যাকে ভয়, সেও আপনাকে ভয় পায়।

চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম। দেখেছিলুম অনেক কিছু। কিন্তু সমস্ত দেখা কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। মনে হয়েছে, কোন কড়া নেশায় বুদ্ধি আমার বৃদ্ধ হয়ে আছে। দেখেও যেন দেখছি না, শুনেই যেন ভুলে যাচ্ছি।

পিছন থেকে স্বাতি বলল : গোপালদা কি ঘুমচ্ছ ?

গাড়ি চালাতে চালাতে জো রায় বলে উঠলেন : আমারও তাই মনে হচ্ছে।

মামী বললেন : গোপাল আজ চলে যাচ্ছে। অনেকদিন আমবা একসঙ্গে ছিলুম।

মামী কোন কথা কইলেন না, শুধু বললেন : হুঁ।

দিল্লীর রানা ব্যানার্জির মত জো রায় আমাদের সব দেখাছিলেন। মহালক্ষ্মীতে পার্সিদের টাওয়ার অব সাইলেন্স। পার্সিদের মৃতদেহ সেখানে সংকার হয়। দর্শকের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। রাজত্ববনের কাছে বাবুলনাথ মন্দির নতুন তৈরি হয়েছে। মালাবার থেকে নীচে নেমে মহালক্ষ্মীব মন্দির যাজ্ঞীদের আনাগোনার সারাক্ষণ মুখর হয়ে আছে। আরও খানিকটা এগিয়ে মহালক্ষ্মী রেসকোর্স। শীতের সময় এখানে মত্ততার সীমা নেই। বামদিকের একটা বাস্তা দেখিয়ে জো রায়

বলেছিলেন এই হর্ণবি ভেলার্ডের উপর পাঁচশো বছরের পুরনো একটা মসজিদ আছে সমুদ্রঘেরা পাহাড়ের উপর।

অল্প সময় হলে স্বাতি বলত, চলুন না, একবার দেখে যাই।

মামী সভয়ে বারণ করতেন, থাক থাক।

আর মামী বলতেন, সব তোমার এঁটো হয়ে যাবে।

কিন্তু আজ আর কেউ কোন কথা কইলেন না। অন্তরীক্ষে একটা বেহুরো গান বাজছে। সে গানে কোন কথা নেই, শুধু একটা বেদনা গুমে গুমে হৃদয়কে ভারাকাত্ত করছে।

শহরের ঠিক মাঝখানে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনস। জো রায় বললেন, প্রায় একশো বছরের পুরনো বাগান। এই বাগানের ভিতর বোম্বের চিড়িয়াখানা আর জাহ্নঘর। একটা নয়, দুটো। ভিক্টোরিয়া আব অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, দ্রষ্টব্য বেশীর ভাগই শিল্প ও কৃষিবিষয়ের। একটা বিরাট পাথরের হাতি আছে—এলিফেণ্টা কেভ থেকে আনা। আর ছেলেমেয়েরা মহানন্দে উটের পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছে।

ক্রফোর্ড মার্কেটে আমরা নামি নি। জো রায় বলছিলেন, এতবড় বাজার এ দেশে আর নেই। বাজারের নামে মামী উতলা হন। কিন্তু আজ কোন কথা বললেন না। কেনার প্রধান জিনিস তো শাড়ি, আর তা স্বাতির জন্তই। মামী জানেন যে স্বাতির জন্ত আজ কিছু কিনতে গেলে সে অনর্থ বাধাবে। একদিন বলেছিলেন, বোম্বের গয়নাও নাকি সুন্দর। মামী তা নিশ্চয়ই দেখবেন। অল্প সময় দেখবেন।

ক্লোরা ফাউন্টেনের দিকে যেতে যেতে জো রায় আমাদের ছুখানা বাড়ি দেখালেন। বাম হাতের বাড়িখানা ভিক্টোরিয়া টামিনাস বলে চিনতে পেরেছিলুম। জো রায় বললেন : সাধারণ লোক বলে বড়ি বন্দর। দক্ষিণ হাতে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন।

ক্লোরা ফাউন্টেন ঘাবার ছুটো রাস্তা। আমরা যে পথে গেলুম তার উপর জেনারেল পোস্টঅফিস, অনেকগুলো ডক, ব্যালার্ড এস্টেট ঘুরে গভর্নমেন্ট মিল্ট, লামনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। টাউন হল খানিকটা তফাতে। এই বাড়ির ভিতরেই রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি। জায়গাটাকে বলে এলফিলস্টোন মার্কেট।

সোসাইটির ভিতরে একটা জাহ্নঘর আছে, আর বিখ্যাত ইংবেজ স্থপতি চ্যান্ট্রির তৈরি কতকগুলো মূর্তি। বাইরে আছে সোপানের শ্রেণী, মাতীর দৃষ্টি তা আকর্ষণ করবেই।

বোম্বের প্রাণকেন্দ্রে ক্লোরা ফাউন্টেন। তিনটি বড় রাস্তা এসে এখানে মিলেছে—মহাত্মা গান্ধী রোড, হর্ণবি রোড আর চার্চগেট স্ট্রীট। বোম্বের সেক্রেটারিয়েট হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় সবই কাছাকাছি। এদিকের সৌখণ্ডলি একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই যেমন হাইকোর্ট, তার মাথায় জাটিন ও মাদির ছুটি স্ট্যাচু। ভিনিসিয়ান গথিক শৈলীতে তৈরি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সেক্রেটারিয়েট বাড়ি ঠিক একই শৈলীতে তৈরি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে গথিক শৈলীর সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর ফরাসী শৈলী কিছু মিলেছে। প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়াম ইণ্ডো সেরাসিমিক শৈলীতে তৈরি। তার মাথার উপরে যে বিরাট গম্বুজ, সেটি একটি পঞ্চদশ শতাব্দীর পশ্চিম-ভারতীয় শৈলীর নমুনা। গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া একজন ইংবেজ-স্থপতি তৈরি করেছেন ষোড়শ শতাব্দীর গুজরাতি শৈলী অবলম্বনে।

প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামের শিল্প প্রাকৃতিক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগগুলি নাকি সত্যই দেখবার মত। তারই পাশে সম্প্রতি নির্মিত জাহাজীর আর্ট গ্যালারি। কিন্তু নেমে দেখবার উৎসাহ কারও হল না। কোলাবা বজুয়ে ধরে আমরা আফগান চার্চের দিকে এগিয়ে গেলুম। এর শেষ মাথাটি সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। তার নাম কোলাবা পয়েন্ট। সেখানে একটি মানমন্দির, লাইটহাউস আর সেন্ট জনস চার্চ। এরই নাম আফগান গির্জা। এ নাম কেন হল জো রায় বলতে পারলেন না। সিঙ্কু ও আফগানিস্তান যুদ্ধে নিহত ইংবেজ সৈন্তের স্মৃতির জন্ত বোধ হয় এই নাম হয়েছে।

ফেরার পথে আমরা ব্রোবোর্গ স্টেডিয়াম দেখলুম বাইর থেকে। এটি চার্চ গেট এলাকায়। অসংখ্য রেস্টুরেন্টও দেখলুম এখানে। জো রায় বললেন : বাকি রেস্টুরেন্টগুলো নিশ্চয়ই অ্যাপোলো বন্দবে দেখেছেন।

সে আবার কোথায় ?

কেন, গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া দেখলেন না, সেই জায়গারই নাম তো অ্যাপোলো বন্দর।

বোধেতে আরও অনেক এমনি নাম আছে। ট্রেড নামে একটি খেলা খুলে বসলেই সে সব নাম জানা যাবে। জো রায়ও যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির জগত। কিন্তু নাচের ভাল কেটেছে অনেক আগেই। পিছন থেকে কোন সাড়া না পেয়ে জো রায় আমাদের বললেন : আপনি চলে যাচ্ছেন গোপালবাবু, থাকলে ভাল হত।

কেন ?

বোধের আশেপাশে কয়েকদিন ঘোবা যেত। জুহু বীচ পোয়াই আর টানসা লেক, বেসিন। বেসিন একটি প্রাচীন স্থান, আপনার ভাল লাগত।

তাবপরে বললেন : কঙ্কন কোর্স্ট দেখবার ইচ্ছা আমার অনেকদিনের। স্ত্রীমারে চুম্বল্লিগ ঘণ্টা সময় লাগে। আপনাদেব মত সঙ্গী পেলে—

বলে পিছনের দিকে চেয়েছিলেন। কার চোখের দিকে চেয়ে কথাটা শেষ কবতে পারলেন না, দেখতে পাই নি। আমি সাহস করে বললুম : তার জন্তে ভাবনা কী ! সবাই তো রইলেন।

জো রায় খুব ভবসা পেলেন না। ভরসা পাবাব কথাও নয়। তাঁর সঙ্গে স্বাতির ব্যবহার তো আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার যেটুকু অপমানবোধ আছে সেইটুকু নিয়েই আমি পিছিয়ে যেতুম, এমন নির্লজ্জের মত বাবাবাব এগিয়ে আসতুম না। জো বায়ের দুর্বলতা স্বাতি যে জেনে ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। জো রায় কেন বুঝছেন না ? বললেন : তা বটে।

পরক্ষণেই আমার মনে পড়ল, স্বাতি আমাদেরও তাড়িয়ে দিচ্ছে। সোমনাথ বাবার পথে জো রায়কে যেমন করে নেমে যেতে বলেছিল, কতকটা তেমনি কবেই আজ আমাকে ফিরে যেতে বলেছে। জো রায় বুঝতে না পেয়ে গাড়ি থেকে নামতে দেরি করেছিল, আমি তার ইঙ্গিতটাই ধরতে পেয়ে নিজেই ফিরে যাবার প্রস্তাব কবতে পেরেছি। মামা মামীর কাছে আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু স্বাতির কাছে ?

স্বাতি আমাদের মূর্থ ভাববার অবকাশ পায় নি। কিন্তু বুদ্ধিমান ভাবতেও পেরেছে কি ? এই মুহূর্তে আমার মনে হল যে পুরুষের অহংকার করবার যদি কিছু থাকে তো সে তার বুদ্ধি। অর্থ নয় সামর্থ্য নয় চরিত্রবলও

বুঝি নয়। বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত লুকনো যায়। কিন্তু বুদ্ধির অভাব লুকনো যায় না কিছু দিয়ে। পুরুষের বুদ্ধিই তার শক্তি। পশুর শক্তি দেহে। পৃথিবী আজ যে শক্তির বড়াই করছে সে পাশবিক, এর সঙ্গে বুদ্ধির যোগ না হলে সে ধ্বংস হবে।

আজ জো রায় একটা হোটেলে আমাদের খাওয়ানেন। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই সেখানে নিয়ে এলেন। আমরা যদি জাদুঘর দেখতে নামতুম, কিংবা দেখতুম মেরিন ড্রাইভের অ্যাকোয়েবিয়ামে নানা জাতের মাছ, তা হলে এখানে আগে পৌঁছতুম না। মামীকে নিয়ে জো বায় এগিয়ে গেলেন। স্বাতি তাঁদের অনুসরণ করল। মামা পথের উপরে তাঁব পাইপটা বেড়ে নিলেন। আমি তাঁব পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

পাইপটা পকেটে পুরে মামা আমাকে বললেন : কিছু বলবে ?

আজ্ঞে না।

তবে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

বলুন।

আর দুটো দিন কি থাকা চলে না ?

বুকের ভিতর আমি একটা যন্ত্রণা বোধ করলুম। দুদিন কেন, আমি চিবদিন থাকতে পারি, কিন্তু স্বাতি যে আমায় চলে যেতে বলেছে। কোন সাহসে আমি তার আদেশ অমান্য করি ! বেদনার্ত কণ্ঠে বললুম : আমাকে ক্ষমা ককন।

একটা দিন ?

অলুবোধে আমার স্বর সিক্ত হয়েছে। কিন্তু আমি হয়েছি নিষ্ঠুর। আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মামা বললেন : কাল আমরাও তোমার সঙ্গে ফিরতে পারি।

আজ ?

তোমার মামীর কিছু কেনাকাটা ছিল।

আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বাতি ফিরে এসেছিল। বলল : এস।

মামা আমার উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। আমার অন্তর তখন কাঁদছে।



আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ

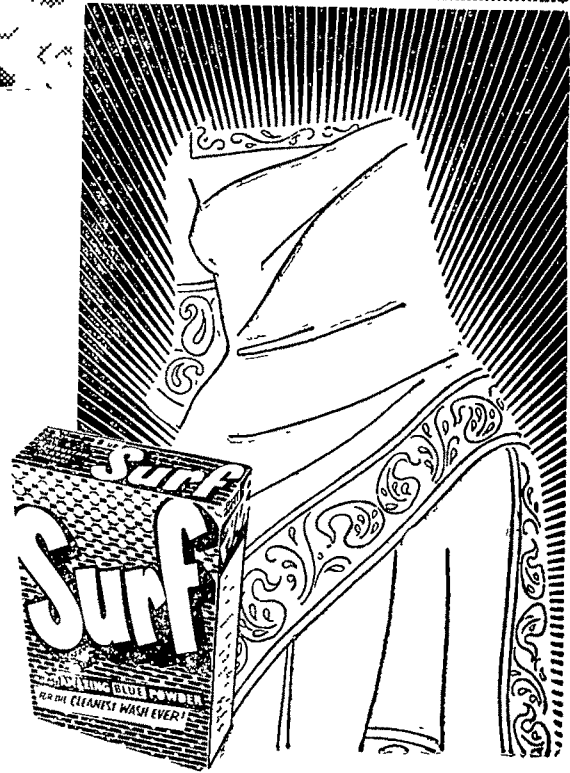
‘আমাদের আজকের জীবনে...’

বোম্বেব গৃহিণী প্রেমা হুন্দবজী বলেন

‘আমাদের আধুনিক এই জীবন যাত্রায় মনে হয় বোম্বেই নতুন জিনিষ চাই, আর কালকের চেয়ে আরও ভাল জিনিষ চাই’—বোম্বেব ওয়ালকের বোম্বেব শ্রীমতী প্রেমা জি. হুন্দবজী অভিমত। তিনি বলেন, ‘আজ এ ধরনের বহু আধুনিক, উন্নত জিনিষ বাজারে পাওয়াও যাচ্ছে। এই ধরনের সার্ফ ব্যবহার করে সত্যিই আনন্দ হয়। কারণ সার্ফের কাপড় কাচা গুণ অতুলনীয়!’

‘সার্ফের দেড়ার ফেনা ময়লা কাপড় চুবিয়ে তুলে নিন, দেখবেন সাদা কাপড়জামা যেমন ধবধবে ফরসা হয়েছে!’ তাই হুন্দবজীদের বাড়ির কাপড়চোপড়—সাঁট, প্যাট ব্লাউজ, শাড়ী, তোয়ালে চাদর, ওয়াদ স্বাডন সবই বাড়ির গৃহিণী সার্ফে কাটেন।

আপনি সার্ফ ব্যবহার করছেন তো? সার্ফ আপনার কাপড় কাচার স্বামেলি অক্লান্ত কমিয়ে দেবে—অথচ সার্ফে কাটা কাপড় আগের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বেশী ফরসা হবে। তাইতো ঘরে ঘরে আজ সার্ফের কদব। আপনিও এবার সার্ফে কাটতে শুরু করুন।



সার্ফে কাপড়জামা সবচেয়ে ফরসা করে কাচে

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী

5U, 18-KJ2 BG

ত্রিশ

হরপালপুর স্টেশনের ওয়েটিংরুমে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলুম। বাবা আবাম চান, তাঁদের অভিযোগেব অস্ত ছিল না। 'মেঝের চাদর বিছিয়ে ঘুমতে সবাই অভ্যস্ত নন। বাঁদেব হোল্ডঅল আছে, তাঁবাও মেঝেতে শুতে ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু উপায় নেই। স্টেশনে রিটার্নিং রুম নেই, কাছে কোন হোটেল বা ডাকবাংলো নেই। মাহোবা ও সাতনা স্টেশনেরও নাকি এই অবস্থা। খবরের কাগজেও এ নিয়ে অনেক চিঠিপত্র বেরিয়েছে। রেলকোম্পানি কিছু করে নি, গভর্নমেন্টও বধির হয়ে আছে। অথচ গত কয়েক বছর ধবে খাজুরাহোকে জনপ্রিয় করবার সবরকম চেষ্টা চলছে।

শুনলুম, মার্কিট হাউস আছে ছাতারপুর নওগঙ্গ ও পান্নায়। ছাতারপুরে ডাকবাংলোও আছে। খাজুরাহে রেন্টহাউস ও হোটেল দুইই আছে। কিন্তু যাত্রীদের স্থবিধা তাতে হয় নি। বাঁসির দিক থেকে বাবা আসেন, হরপালপুরে তাঁদের রাত কাটাতে হয়। বাবা আপন এলাহাবাদের দিক থেকে, তাঁরা শেষরাতে পৌঁছন। যারা সাতনায় নামেন, তাঁরা চেষ্টা করলে পান্নায় বাত কাটাতে পারেন। তাতে অল্প সময়ের উদ্ভব হবে। পান্না থেকে খাজুরাহের বাস নেই। রবিবার ধে বাসখানি ছাড়ে, তা বিদেশী টুরিস্টদের জন্য—যারা উড়োজাহাজে দিল্লী থেকে পান্নায় এসে নামেন। অল্পদিন পান্নার যাত্রীদের সাতনায় বাসেই উঠতে হবে, জায়গা না পেলে কেলেঙ্কারি। আবও একটু অস্থবিধা আছে। এইসব বাসে সীট রিজার্ভ হয় না। রাতে গিয়ে টিকিট কিনে রাখবারও ব্যবস্থা নেই। ভোরবেলা, মানে শেষরাতে এসে ভাগ্য পবীক্ষা কবতে হয়। এ অস্থবিধা শুধু খাজুরাহে নয়। এ প্রায় ভারতের সর্বত্রই। হাতে বাবা নির্দিষ্ট সময় নিয়ে বেরোন, আর পরিমিত পয়সা, তাঁদের হুঁতাবনাব অস্ত নেই। রাগ করে বিরূপাঙ্ক টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টকে দায়ী করলেন : ওরা শুধু ছবি আব বই ছেপেই খালাস। যাত্রীদের স্থথস্থবিধা কারও দায়িত্ব নয়।

এ সব ব্যবস্থা যদি সহজ ব্যাপার হত, তা হলে স্বকর করতেন।

কঠিন কেন ?

ধনী যারা তাঁরা মোটর হাঁকিয়ে আসছেন। চমৎকার বাঁধানো রাস্তা। হরপালপুর মাহোবা বা সাতনার কথা তাঁদেব ভাবতে হয় না। আমার মত দরিদ্র যারা, তাঁদের জন্য বিনি পয়সায় ওয়েটিংরুমই ভাল।

সমাজে মধ্যবিত্ত বলে আব একটা জাত আছে, যারা দুটো পয়সাব বদলে খানিকটা আরাম চায়।

তাঁদেব সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কাজেই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁদের আবামের অধিকার নেই।

খাজুরাহোব বাসগুলো খারাপ নয়। শেষরাতে উঠে কোনরকমে মুখ হাত ধুয়ে আমবা বাস ধরেছি। অন্ধকার থাকতেই বাস ছেড়েছে। শোনা যাচ্ছে নওগঙ্গ ছাতারপুর প্রভৃতি কয়েকটি জায়গায় বাস দাঁড়াবে। যাত্রীরা চা জলখাবার খাবে, বিশ্রাম করবে। এতেও নাকি অনেক সময় নষ্ট হয়।

অভিমত্যাগে নিয়ে মিনতি সামনে বসেছেন। আমি বিরূপাঙ্কেব পাশে বসেছি। বিরূপাঙ্ক চটে উঠলেন : এ গভীর অত্যাচারের কথা। সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত।

হেসে বললুম : আজকের পৃথিবী তো এই প্রেমেরই উত্তর খুঁজছে।

মানে ?

মানে, মানুষের অধিকার নিয়ে দুটো বড় দল হয়েছে। একদল সাধারণ মানুষকে সভ্যতার পিলস্কজ বলছেন। তাঁদেব মাথায় বাতি জ্বলছে, আর গা বেয়ে গরম তেল পড়ছে গড়িয়ে। আর একদল এই ব্যবস্থাকে অত্যাচার বলে ঘোষণা করছেন। এ বাজনীতির কথা, এতে আমার রুচি নেই।

কোন মতামতও নেই ?

মতামতের দাম যদি হয়, তবেই ভেবে দেখব।

বিরূপাঙ্ক আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : এখন মাথা খারাপ করে লাভ কী, কেউ তো আমার কথা শুনবে না।

বিরূপাঙ্ক এ কথার উত্তর দিলেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

বাস্তার দু ধারে আম আর নিমের গাছ। তারপর শস্তের ক্ষেত। অন্ধকার দূর হয়ে প্রভাতের আলো ফুটে

উঠছে। পাঁচ ঘণ্টা ধরে এই ভেষট্রি মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। নওগঙ্গা আঠাবো মাইল দূরে। সেখানে আমরা চা খাব। আমার মনে হল, বিরূপাক্ষর মন এই চায়ের জন্ত চঞ্চল হয়েছে। আর এই অভূতপূর্ব জন্তই অনেক এলোমেলো কথা মনে হচ্ছে।

মিনতি পিছন ফিরে বললেন : একদিনেই কি সব দেখা সম্ভব হবে ?

বিরূপাক্ষ বললেন : চার পাঁচ ঘণ্টা যথেষ্ট সময়।

সব মন্দির তো আর এক জায়গায় নয়।

নাই বা হল, জায়গা তো একটাই। একটা গোটা শহর দেখবার পক্ষেও যথেষ্ট সময়।

মিনতি এ কথা মেনে নিলেন কিনা জানি নে, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অভিমন্যু বলে উঠল : আমি একদিনেই দেখতে পাবব।

হেসে বললুম : তুমি যে বীর পুরুষ।

দু-একজন যাত্রী খাজুরাহে রাত কাটাবার বিষয় আলোচনা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ভাল ক্যামেরা আছে। বলছিলেন, দুপুর রোদে ছবি খুব ভাল হবে না। ছবির জন্তই তাঁদের রাতে থাকতে হবে। আর একজন বললেন, দুপুর রোদে দেখাও ভাল হয় না। ভাল জিনিসও দেখতে খারাপ লাগে।

খাজুরাহোর ইতিহাস নিয়েও তাঁদের আলোচনা। আমি তা মন দিয়ে শুনলুম। নবম থেকে ত্রয়োদশ এই চার শো বছর ধরে এই অঞ্চলের উপর রাজত্ব করেছিলেন চান্দেলা রাজারা। চন্দ্রবংশীয় রাজপুত তাঁরা। আর এই চান্দেল খণ্ডের নাম তখন জেজাকভুক্তি ছিল। প্রথম কয়েক পুরুষের পরিচয় এখন আর পাওয়া যায় না। দশম শতাব্দীতে হর্ষ ও তাঁর পুত্র যশোবর্মণের নাম ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যে প্রতিহার বাজা দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্রের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন, তাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে হর্ষ বিখ্যাত হয়েছিলেন। খাজুরাহোর একটা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে যশোবর্মণই সেখানে প্রথম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন—বিস্ময় মন্দির। কানিংহাম সাহেব মনে করেন যে এই মন্দির হল লক্ষ্মণের মন্দির।

যশোবর্মণের পুত্রের নাম ধ্বজ। মাউএর একটা

শিলালিপি পড়ে জানা যায় যে তিনি কনৌজের রাজাকে পরাজিত করে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এর সময়ে যে অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। একটা শিলালিপিতে আছে যে তিনি একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ধ্বজের পৌত্র বিভাধর একজন ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমে মহম্মদ গজনবী তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। অজৈব কালিঙ্গব দুর্গে থেকে বিভাধর যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এই যুদ্ধের পব থেকেই খাজুরাহোর গৌরব শেষ হয়ে গেল। রাজা বুঝলেন যে সমতলের এই রাজধানী রক্ষা করা সহজ কাজ নয়। তাই মাহোবা অজয়গড় ও কালিঙ্গর দুর্গে অবস্থান করে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করাই শ্রেয় ভাবলেন।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখে একটি জিনিস স্পষ্ট হবে যে চান্দেলা বাজারা সমস্ত ধর্মকেই সম্মান করেছেন। নিজেরা প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন, পরে শৈব হয়েছিলেন। জৈনধর্মেরও প্রতিপত্তি ছিল খাজুরাহে। বৌদ্ধধর্মেরও যে প্রভাব ছিল তাবও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বুদ্ধের একটি বিরাট মূর্তি ছিল। এখন সেটি জাহ্নবীর রক্ষিত হচ্ছে।

বাস এসে নওগঙ্গার বাজারের ভিতর দাঁড়াল। অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়ে চায়ের দোকানে গিয়ে ভিড করল। চেয়ার-টেবিলে বসে ছোট্ট হাজরি বা ব্রেকফাস্ট খাবার মত রেস্টুরেন্ট দেখতে পেলুম না। কিন্তু দেশি ব্যবস্থা ভালই আছে। যে যেখানে পারল ঢুকে পড়ে বসে দাঁড়িয়ে চারিধার স্রবণ করে তুলল। মিনতি বললেন : গরম পকোড়ি খাব।

অভিমন্যু বলল : জিলিপি।

গরম জিলিপিও ভাজছে। আমরা দুইই খেলুম। তারপর চা, ভোরের হাওয়ায় তখনও নিরসিরে শীত আছে। এই গরম জলযোগ মন্দ লাগল না।

একজন বললেন : এখানকার ধুবেলা প্যালেসে একটা জুন্দের জাহ্নবীর আছে। সময় থাকলে দেখে নেওয়া যেত।

আর একজন বললেন : সকাল সাড়ে দশটার আগে খোলে না।

আরও কয়েক মাইল এগিয়ে একটা পাহাড় দেখবার জন্ত কয়েকজন যাত্রী ঝুঁকে পড়েছিলেন। শুনলুম, এই পাহাড়ের উপরে মহারাজা ছত্রাসলের একটা ভাঙা দুর্গ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই রাজা নাকি যমুনা থেকে নর্মদা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

এই রাস্তাটা পাহাড় ঘুরে গেছে। ডানদিকে একটা অসম্পূর্ণ স্মৃতিসৌধ দেখতে পেলুম। মহারাজারই স্মৃতিসৌধ। পুত্রদের মধ্যে বিবাদের জন্ত এই সৌধ সম্পূর্ণ হয় নি, বিশাল রাজ্যটাও সেদিন ভেঙে গিয়েছিল।

যাত্রীদের মধ্যে একজন ছাতাবপুরের লোক ছিলেন। একাদিকবাব তিনি খাজুরাহো দেখেছেন। তিনিই নানারকম গল্প শোনাচ্ছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি নেমে যাবেন বলে পাশের যাত্রীরা আবণ্ড ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। ভদ্রলোক নেমে যাবার আগেই সব কথা ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। একজন প্রশ্ন করলেন : খাজুরাহো খাবার মেলে তো ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : মেলে বইকি।

কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত উত্তরে কারও সন্তুষ্টি হয় না। তা লক্ষ্য করে বললেন : বাস যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে, সেখানে নেমেই আপনাদের খাজুরাহো দেখা হয়ে যাবে। ডানদিকে পাশাপাশি অনেকগুলো খাবারের দোকান, বাইবে টেবিল চেয়ার বিছানো। গাছেব ছায়াও আছে। ভাত-ডাল-রুটি-পুরী-তবকারি নানারকমের মিষ্টি। মাছ মাংস খাবার ঠাছা হলে কাছেই একটা হোটেলো যাবেন। নেমেই যদি অর্ডার দেন, ইচ্ছামত খাবার পাবেন। রাত্রে যদি থাকতে চান রেস্টহাউস আছে, হোটেল আছে। রেস্টহাউসে বিলিতি ব্যবস্থা, সাহেববাণ্ড থাকে। হোটেলো মিশি কারবার, চলনগই ব্যাপার। হোটেলো থাকবার জন্ত তো যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন দেখতে। একটা রাত না থাকলে দেখে স্থখ পাবেন না। দুপুর রোদে আর যাই সম্ভব হোক, মৌন্দর্ঘ উপভোগ পুরোপুরি হয় না।

এই কথায় আমার অজস্তা ইলোরার কথা মনে পড়ল। এইসব অপরূপ স্থানও আমরা দুপূবে দেখেছি। না দেখে উপাষ ছিল না। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ইলোরা হয়তো প্রভাতে দেখতে পারা যেত, কিন্তু পথে দৌলতাবাদ দেখতে দেরি হয়ে যায়। অজস্তা তো দূরের পালা। সেখানে

পৌছতে দেবি হবেই। এই জন্তেই বোধ হয় কাছে রেস্টহাউস তৈরি হয়েছে। শৌখীন মাল্লুষেরা এই রেস্টহাউসে এসে থাকবেন, আর মৌন্দর্ঘ দেখবেন প্রত্যুষে ও প্রদোষে, জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলোতেও দেখবেন। এসবের জন্ত সময়ের দরকার, প্রয়োজন পয়সারও। আমাদের সে সৌভাগ্য নয়।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন : আজকের রাতটা তা হলে সেখানেই থাকতে বলছেন।

আর একজন বলে উঠলেন : জিনিসপত্র যে স্টেশনে জমা করে এলুম।

ভদ্রলোক হেসে বললেন : আমি কিছুই বলছি না। আপনাদের যা সুবিধা হয়, তাই করবেন।

খানিকটা দূর থেকে এক ভদ্রলোক বললেন : কতগুলো মন্দির আবণ্ড ঘুরে ঘুরে দেখতে হলে কতটা সময় লাগবে, তার একটু আভাস দিন।

মন্দির এখন আর বেশী নেই। পঁচাশিটার মধ্যে এখন কুড়িটা মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। বয়স তো কম হয় নি, এক হাজার বছর পুরো হয়েছে। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি এসবের নির্মাণ শুরু হয়েছিল, একশো বছর ধরে এই মন্দিরগুলো গড়ে উঠেছিল। তিন জায়গায় এরা ছড়িয়ে আছে। যেখানে আপনাদের বাস থামবে তার বাঁ হাতে বাস্তার পশ্চিমে দেখবেন সমস্ত বিখ্যাত মন্দির। সরকার সম্প্রতি এই মন্দিরগুলো সংস্কারে মন দিয়েছেন, ফুলের বাগান করছেন, সিনেমার ছবি তুলে ভারতের সর্বত্র দেখাবারও ব্যবস্থা করেছেন।

কতগুলো মন্দির আছে এই গপে ?

সেরেছেন। শুনে তো কোনদিন দেখি নি।

মোটমোট কুড়িটা মন্দির বললেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

প্রায় সব কটাই বলতে পারেন। দাঁড়ান, একটু হিসেব করে বলি। ইস্টার্ন গুপে তিনটে হিন্দু আর তিনটে জৈন মন্দির, সাদার্ব গুপে দুটো হিন্দু মন্দির, মোট হল আটটি। তা হলে প্রায় বারোটি মন্দির ধরে নিতে পারেন। প্রায় বলছি এই কারণে যে মন্দিরের সংখ্যা আমি শুনে দেখি নি, সবাই কুড়িটা বলে, আমিও তাই বলছি। ওয়েস্টার্ন গপে দু শারিতে গোটা বারো মন্দির নিশ্চয়ই হবে।



আহা কি মজা! লাইফবুয় মেখে স্নান,
সে এক অদ্ভুত আনন্দ! স্নানের পব শরীষটা কত
স্ববন্ধবে লাগে, মনেও সজীবতা আনে!
যবে বাইবে ধুলো ময়লা আপনাব লাগছেই, আব লাইফবুয় সাবানেব
কার্য্যাকাবী ফেনায ধুলো ময়লাব বোগবীজাণু ধুয়ে যায়। পবিবাবেব সবায়
স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে নিষমিত লাইফবুয় মেখে স্নান ককন।

**লাইফবুয় মেখানে,
স্বাস্থ্যও সেখানে!**

হরপালপুর থেকে ছাতারপুরেব দূরত্ব মাত্র চৌত্রিশ মাইল। পথের উপর প্রভাতের রোজ তীব্র হয়েছে। বাতাসও উত্তপ্ত হচ্ছে। ছাতারপুর পৌঁছতে বৃষ্টি আর শেরি নেই। এ ভদ্রলোক নেমে গেলে খাজুরাহোর খবর আর পাওয়া যাবে না। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠছে। একজন বললেন : কুড়িটা মন্দির ভাল করে দেখা তো সম্ভব নয়, কোন্ কোন্ মন্দির মন দিবে দেখব একটু বলে দিন।

আব একজন বললেন : খুব ভাল প্রশ্ন।

ছাতারপুরের ভদ্রলোক হেসে বললেন : কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরটি ভাল করে দেখলেই সব মন্দির দেখার কাজ হবে। উড়িয়ার মন্দিরের মত সকল মন্দিরের গঠন-রীতিই একরকম। শুধু কারুকার্যে কিছু প্রভেদ আছে। তাও এত সূক্ষ্ম প্রভেদ যে বারবার দেখবাব পরেও আমি মনে রাখতে পারি নে। যাবা ছবি তোলেন, তাঁদের হৃদশা দেখে আমার কষ্ট হয়।

কেন ?

জিজ্ঞেস করেন, স্বরসুন্দরীর সূর্য্য পরার মূর্তিটি কোথায় ? তিনি কোন ছবির বইয়ে দেখেছেন, অথচ সে মূর্তি কোন মন্দিরের গায়ে আছে, তা কে বলে দেবে !

অনেকে তাঁর কথা শুনছিলেন মনোযোগ দিয়ে। ভদ্রলোক বললেন : একবার পুরীর জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে কতকগুলো নাম শিখেছিলাম, এখানে আপনারাও কতকগুলো নাম শুনবেন।

কী নাম ?

মন্দিরের বিভিন্ন অংশের নাম। উড়িয়ার মন্দিরে শুনেছি দেউল জগমোহন ভোগমণ্ডপ নাটমন্দির। এখানে শুনবেন গর্ভগৃহ অন্তরালমণ্ডপ অর্ধমণ্ডপ। কোন কোন মন্দিরে মহামণ্ডপ ও প্রদক্ষিণপথও আছে। উড়িয়ার কলসের মত এখানেও কলস আছে, শিখর আমলক স্তূপিকা। আরও যে সব নাম আছে, তা শুনলে ঘাবড়ে যাবেন।

একজন বললেন : একটু যদি বুঝিয়ে দেন।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন : নিজেই বুঝতে পাবেন। খুব উঁচু ভিত্তির উপর মন্দিরগুলো তৈরি হয়েছে। অন্য দেশের মত দেওয়াল নেই চাষিধারে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান, প্রথমে পাবেন অর্ধমণ্ডপ, তারপর মণ্ডপ,

অন্তরাল পেরিয়ে দেবতার গর্ভগৃহ। বড় মন্দিরে একটা মহামণ্ডপ ও প্রদক্ষিণপথও পাবেন। এ ছুটি মন্দিরেরই অংশ, আলাদা কিছু নয়।

ভেবেছেন উপরে উঠেই মন্দিরের দরজা পাবেন, তা নয়। উঁচু ভিত্তিটা একেবারে সমতল। তার উপর থেকে মন্দির গাঁথা শুরু হয়েছে। মন্দিরগাত্রে কারুকার্য দেখতে হলে উপরে উঠে প্রদক্ষিণ করতে হবে। দু-তিনটি সমান্তরাল সারিতে কত অদ্ভুত কারুকার্য। নীচে থেকে উপর পর্যন্ত চলে গেছে। পর পর চারটি শিখর নীচু থেকে উঁচু হয়ে গেছে। সবচেয়ে ছোটটি অর্ধমণ্ডপের উপর, আর গর্ভগৃহের উপর সবচেয়ে বড়টি। এই শিখরে কলস স্তূপিকা ও আমলকা। শিখরের গায়েও কত সূক্ষ্ম কারুকার্য। উরুশৃঙ্গে কণ্টকিত মূলমঞ্জবি।

উঁচু উঁচু ধাপ ভেঙে মন্দিরের দ্বারে পৌঁছতে হয়। সুন্দর তোরণটি দাঁড়িয়ে দেখবেন। তারপর ভিতরটা। কোন বই দরকার হবে না, গাইডও না, নিজেই সব বুঝতে পারবেন। মণ্ডপ থেকে গর্ভগৃহে যাবার পথের নাম অন্তরাল। সেখানে একটি চন্দ্রশিলার বড় ধাপ আছে, সেটিও দেখবেন। আর দেখবেন ভিতরে আলো আসবার ব্যবস্থা। পার্সি ব্রাউন সাহেব বলেছেন যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হতে পারত না। আধো আলো আধো আঁধারে গর্ভগৃহের মধ্যে এক অদ্ভুত গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা চূপ করে শুনছিলাম। ভদ্রলোক বললেন : মন্দিরের কারুকার্যের সম্বন্ধে আরও দুয়েকটি নতুন শব্দ আপনাদের শুনিয়ে দিই। মন্দিরের বাইরেরটার নাম অন্তরভিত্তি, তার দেওয়াল ঢেউ-খেলানো। উঁচু জায়গার নাম রথ আর নীচুটা সলিলাস্তর। এরই উপর দু-তিন সারি মূর্তি। দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও আছে অষ্টদিকপাল অঙ্গরা স্বরসুন্দরী নাগ বিতাদর ও শাহুর্লের মূর্তি। তরুশাখা হাতে নারীমূর্তির নাম শালভঞ্জিকা। তাদের পায়ের নীচে বামন গণমূর্তি। সবার উপর মিথুন মূর্তি। কত অপরূপ, কত বিচিত্র, কত নগ্ন।

এই বন্ধকাম মিথুন মূর্তি নিয়ে অনেক আলোচনা পড়েছি। উড়িয়ার মত এখানেও নাকি অনেকের বিশ্বাস যে মন্দিরগাত্রে এই সব মূর্তি বজ্রপাত থেকে মন্দিরকে রক্ষা করে। কেউ ধর্মের কথা বলেন, কেউ তিব্বতী

তাত্ত্বিকদের কথাও টেনে আনেন। কেউ বলেন নরনারীর মিলন দিয়ে আত্মার সঙ্গে দেবতার মিলন দেখানো হয়েছে, কেউ বলেন লালসাব চিত্র দেখিয়ে যাত্রীর ভক্তি পরীক্ষা হচ্ছে। কেউ আবার শিল্পীর স্বাধীন সৌন্দর্য বিলাসের কথা উল্লেখ করে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করেছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখে রবীন্দ্রনাথও কিছু বলেছেন। সে কথা এখানে থাক্।

প্রান্তর পেরিয়ে এবারে লোকালয় দেখা দিয়েছে। আমরা বোধ হয় ছাতারপুর পৌঁছেছি, ব্যাকুলভাবে একজন বললেন : আপনি কি এখানেই নামবেন ?

এখানে নয়, সামনে।

ওই হল, কিন্তু কিছু তো জানা হল না।

আবার কী জানবেন! আপনারা দেখতে যাচ্ছেন, প্রাণ ভরে দেখবেন। একমিনে প্রাণ না ভরে, ফিরবেন না।

তা কী করে হয়।

কেন হয় না! এ তো গান নয় যে শুনে প্রাণ ভরবে। তা যদি ভরত তা হলে তীর্থে আর যাত্রী হত না, খাজুরাহোতেও না।

না না, আমি রাত্রিবাসের কথা বলছি। সঙ্গে যে আমাদের শয্যা নেই।

ভ্রলোক হেসে বললেন : বাস থেকে নেমে চৌষট্টি ঘোগিনীর মন্দিরে ঢুকবেন। সেখান থেকে চলে আসবেন কাণ্ডারিয় মহাদেব জগদ্ধাত্রী মন্দির। একে একে সব মন্দির দেখে হোটলে কিছু খেয়ে নেবেন। ভাল কথা, এখানে প্রবেশের জন্ত বোধ হয় দশ নয়া পয়সার টিকিট লাগবে।

খাওয়ার পরে কোথায় যাব ?

খাবার দোকানের সামনে গাছের ছায়ায় একখানা টাক্সা পাবেন। যদি ক্লাস্ত না হন, তা হলে হেঁটেই যাবেন। পুষের মন্দিরগুলো দশ মিনিটের পথ। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ক্ষেতের মাঝখান দিয়েই চলে যাবেন। জৈনমন্দিরগুলো আপনাদের ভাল লাগবে। যদি দক্ষিণের দিকে যেতে না পারেন, তা হলে দুঃখ করবেন না।

কিন্তু দুঃখ হচ্ছে আপনি থেমে যাচ্ছেন বলে।

ভ্রলোক হাসলেন। হেসে বললেন : পথের দুঃখ বেশীক্ষণ মনে থাকে না।

ছাতারপুরে ভ্রলোক নেমে গেলেন। আমরাও নামলুম। চা খেলুম। খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আবার বাসে চেপে যাত্রা শুরু করলুম। প্রযোজনের চেয়ে বাস বেশীক্ষণ দাঁড়াচ্ছে বলে যাত্রীদের মধ্যে বেশ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিরক্ত হবারই কথা। যখন এখন খাজুরাহে পৌঁছে গেছে। কিন্তু বাস পৌঁছয় নি। যেন ইচ্ছে করেই দেরি কবছে। বাতাস গরম হয়েছে, আকাশের বোদে মাটি উঠছে ভেতে। তবু এদের তাড়া নেই। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে এরা চাইছে না। এখনও অনেক পথ বাকি।

ড্রাইভারের পাশে যিনি বসেছিলেন, তিনি বললেন : আর কতদূর।

অর্ধেকের বেশী পথ আমরা পেবিরে এসেছি।

উত্তরটা কে দিলেন, দেখতে পেলুম না।

মিনতিতে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এবারে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন। অভিযন্তাও মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমচ্ছে। চলার একটা নেশা আছে। চলবার সময় আমাদের ঘুম পায়। আমরা মোটরে ঘুমই, ট্রেনে ঘুমই, উড়োজাহাজের চেয়ারগুলো ঘুমের সবচেয়ে উপযোগী। আমারও ঘুম পাচ্ছিল। এ ঘুম শ্রান্তির নয়, শেষ রাতে ঠাবাব জ্বলও নয়। এ ঘুম চলার নেশার। নেশাখোরের ঝিমুনির মত।

বাস কবার দাঁড়াল, আর কতক্ষণ দাঁড়াল, সে হিসেব আর রাখি নি। কলরবে যখন সমস্ত যাত্রী জেগে উঠল, তখন আমিও জাগলুম। বাস এসে খাজুরাহে দাঁড়ায় নি, দাঁড়িয়েছে বামিঠা নামে একটা পুলিশের থানার সামনে। খাজুরাহো এখান থেকে মাত্র সাত মাইল।

শুনলুম, সাতনা থেকে যে বাস আসে পান্না হয়ে, সেও এখানে দাঁড়ায়। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। যাত্রীরা এখানে অর্ধেক হয়ে পড়ে। যত গরম তত আগ্রহ। বাসড্রাইভাররাও নির্দিষ্ট সময়ের অজুহাতে সময় নষ্ট করে না। খাজুরাহে পৌঁছে তারও ছুটি। আমরা যখন ঘুবে ঘুবে মন্দির দেখব, সে তখন ছায়ায় বাস রেখে আরামে শুয়ে ঘুমবে। বিকেলে আবার তাব যাত্রা। আবার

পাঁচ ঘণ্টা চাকরি। একটা সিগারেট খেয়েই ড্রাইভার চালাতে বসল।

সাত মাইল পথ কোথা দিয়ে পেরিয়ে এলুম মনে নেই। নদীৰ উপর নতুন পুলের গল্প শুনলুম। আব শুনলুম পাণ্ডব ফলদের গল্প। সাতনা ষাবার পথে সেই সুন্দর জায়গাটি। বাস এক ঘণ্টা দাঁড়ায়। যাত্রীবা নেমে গিয়ে দেখে আসে। আমরা খাজুরাহে এসে নামলুম।

একত্রিশ

মিনতি যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন আমরা বুঝতে পারি নি। আঁচল টেনে নীচে নেমেই বিরূপাক্ষকে কিছু বললেন। বিরূপাক্ষ চিন্তিতভাবে তাকালেন চারিদিকে।

একবারে মন্দিরের সামনে এসে বাস দাঁড়িয়েছিল। যাত্রীরা নেমেই একটা তাঁবুর দিকে ছুটলেন। সেখানে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। টিকিট কেটে বিরাট এক প্রাস্তরে ঢুকতে হবে। তার ভিতর ফুলের বাগান আব অনেক মন্দির। মিনতি আমার দিকে চেয়ে বললেন : আপনি এগোন ভাই, আমরা আসছি।

অভিমত আমার কাছে ছিল, এবারে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

বিরূপাক্ষ তাঁদের জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়েছিলেন, বললেন : হোটেল একটা ঘর দেখি।

আমার জিনিস আমি বাস থেকে নামাই নি। ড্রাইভার দায়িত্ব নিতে বাজী ছিল না। বললুম : নিও না। ও হারালে আমার দুঃখ হবে না।

ভান হাতে যে খাবারের দোকানগুলো দেখতে পাচ্ছিলুম, তার পিছনেই নাকি একটি হোটেল আছে। বিরূপাক্ষরা সেইদিকে এগিয়ে গেলেন। আমাদের ডাকলেন না বলে আমি মন্দিরের দিকেই পা বাড়িয়ে দিলুম। টিকিট কাটলুম, তারপর মিশে গেলুম অল্প যাত্রীদের সঙ্গে।

এখানে গাইড দেখছি নে। মন্দিরের পরিচয় তাব সামনেই লেখা আছে। কোনটো কী মন্দির তা জানবাব জ্ঞান কাউকে জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন নেই। তবে তার জ্ঞান কাছে যেতে হয়। আমি ছাতারপুরের সেই ভদ্রলোকের পরামর্শ মত চৌঘট যোগিনী মন্দির থেকেই

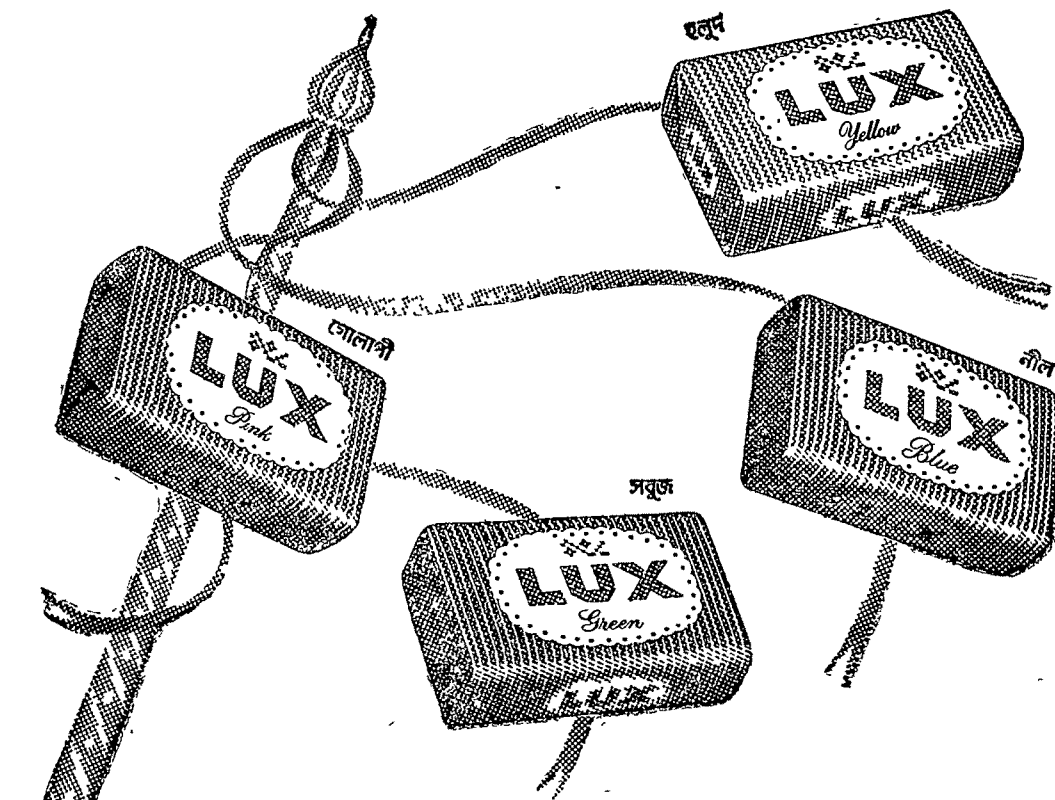
পরিক্রমা শুরু করলুম। এই মন্দিরটির হৃদয় নেবার জ্ঞান আমাদের একজনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। সবোবরের নামটিও তাঁবই কাছে জেনেছিলুম। শিবসাগর হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চৌঘট যোগিনী মন্দির। আমার মনে হল, মন্দিরটি পুরোপুরি গ্রানাইট পাথরে তৈরি। দূর থেকে অত্যন্ত মন্দির দেখে মনে হয়েছে যে সেগুলো হলদেটে বালিপাথরে তৈরি।

কানিংহাম সাহেব মনে করতেন, এটি কালী বা শিব মন্দির। মাঝখানেই মূল মন্দিরটি এখন নেই। ছোট ছোট চৌঘটটি ঘরে একসময় যোগিনীর সংখ্যা ছিল চৌঘটি। এখন মাত্র তিনটি যোগিনীমূর্তি আছে। এইটাই সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির বলে সকলের বিশ্বাস।

খানিকটা দূরে একটি ছোট শিবের মন্দির আছে। কিন্তু সেখানে আমি গেলুম না। একই রকমের এত মন্দির দেখতে পাচ্ছি যে সব দেখার লোভ হচ্ছে না। যাত্রীবা যেখানে ভিড় করে আছে, সেই কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরে চলে এলুম। বাদিকে আরও কয়েকটি মন্দির আছে, তা পরে দেখব।

বিরাট একটি জায়গা জুড়ে এই মন্দিরগুলো ছড়িয়ে আছে। লাল কাঁকরের পথ। স্থানে স্থানে ফুলের গাছ লাগানো হচ্ছে। একসারি গোলাপ, কিংবা নানা রঙের বোগেন ভিলা। মালিরা গাছের পরিচর্যা করছে। খাকী উর্দিপরা কিছু লোক বোধ হয় মন্দিরের পাহারায় নিযুক্ত। রাস্তার ধারের একটা বড় গাছের নীচে থেকে এক ভদ্রলোক ছবি নেবার জ্ঞান চেষ্টা কবছিলেন। এক মহিলা বাস্তায় দাঁড়িয়ে বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছিলেন বিলম্বের জ্ঞান।

কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরটি এখানে সবচেয়ে বৃহৎ। দৈর্ঘ্যে ও উচ্চতায় একশো ফুটের বেশী। প্রস্থে ছেষটি ফুট। পিছনের দিকটায় বাঁশ বেঁধে সংস্কারের কাজ পুরোদমে হচ্ছে। ভিত্তিটা এত বড় যে নীচে দাঁড়িয়ে মন্দিরের কিছুই দেখা যায় না। এই রকমের ভিত্তি শুধু এ মন্দিরে নয়, এখানকার সমস্ত মন্দিরেই আছে। অত্যন্ত এমন দেখি নি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে মন্দিরের দ্বার, সেই তোয়গের উপর নানা দেবদেবীর মূর্তি, গায়ক বাদক কীতিমুখ মকর মিথুন। অর্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপের ভিতবের ছাদও অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত। গর্ভগৃহে তপস্কারত সন্ন্যাসীর



বিশুদ্ধ, কোমল লাক্স এবার ৪টি রামধনু-রঙে

আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!

দেখুন! লাক্স এবার চমৎকার কত সব নতুন বণ্ডে ধরা দিয়েছে—
সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—যেকুর
যত্ন নিতে যে সাবান আপনি চিবদিনই চেয়েছেন।



মঞ্জুলা ব্যানার্জী বলেন-

'আমার প্রিয় লাক্সে যেন
রঙের মেলা লেগেছে,
এ এক অভিনব রচনা!'



চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য-সাবান

চিহ্ন, মকরাসীন গঙ্গা ও কূর্মাঙ্গীন যমুনা। মাঝখানে শিবের মর্মর লিঙ্গ।

মন্দিরের বহির্গাজেও মূর্তির শেষ নেই। সারির পরে সারি। কোনখানে অষ্ট দিকপালের মূর্তি, কোনখানে দেবদেবী নাগ-নাগিনী অঙ্গরা স্বরস্বন্দরী মিথুন ও শাহুর্ল। মহামণ্ডপের ত্র্যাক্ষেটের উপর নারীমূর্তিগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যীয়। যেমন ছন্দোময় দেহ, তেমনি ভাবময় মুখ। কারুকার্য নেই এমন একটি জায়গা আনেকক্ষণ ধরে খুঁজে আমি নিরাশ হলাম।

কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরের পাশে জগদম্বী দেবীর মন্দির। এ দুয়ের মাঝে একটি ঐতিহাসিক শাহুর্ল আছে। মহাদেবের একটি মন্দির নাকি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শুধু একটি মণ্ডপের নীচে এই শাহুর্ল। পিছনের পায়ে বসে সামনের পা দিয়ে একটি নারীর হু হাত ধবেছে। সেই রূপবতী নারীও বসে তার হু হাত শাহুর্লের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। হুজনে মুখোমুখি। শাহুর্লের মুখে হিংসা নেই, নারীর মুখেও নেই ভয়। জগতের সমস্ত পুরুষ বুঝি এই শাহুর্লমূর্তিতে নারীকে অধিকার করতে চায়।

জগদম্বী দেবীর মন্দিরটি একদা বিষ্ণুর মন্দির ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকের বিশ্বাস। তার প্রমাণ নাকি গর্তগৃহে প্রবেশের দরজায় অগ্নি মূর্তি। মন্দিরে এখন মকরবাহন গঙ্গা। তাতে কালি লেপে এখন কালী বলে পূজা করা হচ্ছে। এটি পঞ্চায়তন মন্দির ছিল, কিন্তু চারিদিকের ছোট মন্দিরগুলো ভেঙে পড়ে গেছে। কারুকার্য কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরের মতই। তবে যারা ছবি তুলবেন, তাঁরা অষ্ট দিকপালের মধ্যে দক্ষিণের দেওয়ালের যমের, আর পশ্চিমে ত্রিমুখ ও অষ্টমুখ শিবের ছবি নিতে পারেন। যারা একবেলার জন্তু আনেন তাঁদের ছবি নেবাব কষ্ট দেখে দুঃখ হয়। সূর্যের সঙ্গে যেন তাঁদের শত্রুতা। কোন দিকে সূর্য থেকে মূর্তির ছায়া ফেলেছে মূর্তির উপর, কোন দিকে সূর্য না থেকে অন্ধকারে রেখেছে ভাল কোন মূর্তি।

একে একে অনেকগুলো মন্দির দেখলুম। একটির সঙ্গে আর একটির মিল যত, অমিল তত নয়। অনেক-গুলিই পূর্বমুখী। ভাল করে খুঁটিয়ে না দেখলে নতুন কিছু চোখে পড়ে না। চিত্রগুপ্তের মন্দিরকে ভরতজীর

মন্দিরও বলে। কিন্তু মন্দিরের দেবতা হলেন সূর্য। পাঁচ ফুট লম্বা দেবতা পায়ে বৃট পবে লাভ ঘোড়ার রথে যাত্রা করেছেন। মন্দিরের বাইরের চিত্রে কিছু বৈচিত্র্য আছে। একদল মানুষ পাথর বইছে, হাতীর যুদ্ধ, শোভাযাত্রা, শিকাব ও নৃত্যের দৃশ্য। মন্দিরের একাংশে বিষ্ণুর একটি মূর্তি, তাব একাদশ মুখ, মাঝেরটি বিষ্ণুর আর দশটি দশ অবতারের।

দুশো গজ দূরে একটি চতুষ্কোণ সরোবর। তার নাম চোপরা ট্যাক। এ নাম কেন হল সে সম্বন্ধে কোন কারণ খুঁজে পেলুম না। যাত্রীরাও কেউ জানেন না। শুনলুম গাইড বইয়েও কিছু লেখা নেই। এই সরোবরের মাঝে কয়েকটি স্তম্ভের উপর একটি গৃহ আছে। একসময় হয় তো এটি চারতলা মন্দির ছিল, এখন ভেঙে পড়েছে। কোন্ দেবতার মন্দির ছিল, তাও আজ জানবাব উপায় নেই।

উত্তরে আরও খানিকটা হাঁটলে বিশ্বনাথ ও নন্দীর মন্দির। এর পরে আর কোন মন্দির নেই। দক্ষিণেব সিঁড়ির দু পাশে দুটো হাতি দেখতে পেলুম। উপরে উঠে দেখলুম, উত্তর থেকেও এমনি সিঁড়ি উঠেছে, তার দু পাশে দুটো সিংহ। মন্দিরও দুটো, বিশ্বনাথ ও নন্দীর মন্দির একেবারে মুখোমুখি।

বিশ্বনাথের মন্দির আমি প্রথমে দেখলুম। কাণ্ডারিয় মহাদেব মন্দিরের সঙ্গে প্রভেদ শুধু আকারে। অনেক ছোট মন্দির। কিন্তু দেখতে প্রায় একই রকম। মন্দির-গাজের মূর্তিগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার উৎসাহ ফুরিয়ে গেছে। কয়েকজন বিদেশী নরনারী বেপরোয়াভাবে ছবি নিচ্ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য করে আমি কয়েকটি সুন্দর মূর্তি দেখলুম। দক্ষিণের দেওয়ালে একটি নারী শিশুকে আদর করছে, উত্তরের দেওয়ালে একটি মারী বাঁশী বাজাচ্ছে, আর একজন ডান হাতে এক খোকা ফল ধরে আছে। আর তার বাম হাতের কজিতে একটি টিয়ে পাখি। দেই হাতটি রেখেছে নিজের কোমরে।

নন্দীর মন্দিরে একটি বিরাট নন্দীর মূর্তি, ছ ফুট উঁচু, লম্বায় আরও বড় হবে। তার মস্তক দেহ আলোয় ঝকঝক করছে।

এখান থেকে নেমে খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে যে মন্দিরে

এসে উঠলুম, তার নাম পার্বতী মন্দির। কিন্তু পার্বতীর কোন মূর্তি নেই। এক জায়গায় বিষ্ণুর একটি মূর্তি দেখে অনেকে এটিকে বৈষ্ণব মন্দির বলেই মনে করেন। কিন্তু এখন মকরবাহন গঙ্গাদেবীরই পূজা হচ্ছে। এই মন্দিরকে পার্বতীর মন্দির কেন বলা হয়, তাব কোন যুক্তিই খুঁজে পেলুম না।

লক্ষ্মণের মন্দিরকে কেউ রামচন্দ্রের মন্দির, কেউ চতুর্ভুজ মন্দির বলেন, কেউ বা দেবীমন্দির বলেন। আসলে এটি বিষ্ণুর মন্দির ছিল। পঞ্চায়তন মন্দির। চারিদিকে চারটি ছোট মন্দির, পঞ্চমটি ছিল গুরুডেব। এখন আর সেটি নেই।

মাথার উপরে সূর্য তখন অগ্নি বর্ষণ করছেন। জঠবে ক্ষুধা। যত্ন করে মন্দির দেখাব বাসনা ক্রমেই ফুটিয়ে আসছে। একদমেরে ভিতরটা দেখে বেবিয়ে এলুম। দেওয়ালে লক্ষ্মীর মূর্তি দেখলুম শিব ও ব্রহ্মার মাঝখানে। তার উপরে নবগ্রহ। দ্বজায় সমুদ্র মন্তনের দৃশ্য। গর্ভগৃহে ত্রিমুখ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তি। মাঝখানের মুখ মাঝবের মত, বাকি দুটি নরসিংহ ও ববাহেব।

বাইবে একটি নতুন ধরনের চিত্র দেখলুম। ছোট একটি মন্দিরের গায়ে একজন গুরু শিষ্যদের বিদ্যাদানে বসেছেন। মূল মন্দিরে হাতি ও ঘোড়ার শোভাযাত্রা, যুদ্ধের দৃশ্য, নানা শাস্ত্র সজ্জিত সেনা। এ ছাড়াও আছে সূর্যপুত্র রেবন্ত অখারোহণে শূকর শিকার কবছেন। একজন পরিচাবক তাঁর মাথায় ছত্র ধারণ করে আছে। শাহুর্ল ও নারীমূর্তি তো আছেই।

এর খুব কাছেই মতঙ্গেশ্বর মন্দির। উল্লেখযোগ্য কথা দেখতে কিছুই পাই নি, কিন্তু জানতে পেরেছি। খাজুরাহোব সমস্ত মন্দিরের ভিতর এইটিই নাকি সবচেয়ে পবিত্র মন্দির। এরই সামনে বরাহেব খোলা মন্দির। যাত্রীরা যারা এইখানে পরিক্রমা শেষ কবছেন, তাঁরা কেউ সিঁড়ি ভেঙে বরাহের মূর্তি দেখতে উঠছেন না। ক্রান্তিতে তাঁদের উৎসাহ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কাণ্ডারিদ মহাদেবের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আমার বিশ্বাসের অবধি রইল না। মেরায়তের জন্ত যে সিঁড়ি বাঁধা হয়েছে, মনে হল এক বিদেশী ভদ্রলোক সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছেন। দূর থেকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। আমি

তাড়াতাড়ি অনেকটা এগিয়ে গেলুম। আরও আশ্চর্য হলুম ভদ্রলোকের বয়স অস্বাভাবিক। মাথার চুল তাঁর গোলাপী নয়, একেবারে সাদা। যে মহিলাটি নীচে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে কিছু দেখাচ্ছিলেন, তিনিও যথার্থ বৃদ্ধা। শুধু দেহে নয়, চরিত্রেও ঋণিকতা এসেছে। কিন্তু মন আছে শিশুর মত সজীব। তা না হলে কয়েকখানা ছবির জন্ত এমন দুঃসাহসের কাজ করতে পারতেন না।

কী ভাবছেন?

এ কি, আপনি!

পিছনে কঠোর শব্দে আমি ফিরে দেখলুম, মিনতি হাসছেন। আমার চমকানি দেখে বললেন : ভয় পেলেন নাকি?

না না, ভয় নয়। ভেবেছিলুম ছোট্টে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা কবব।

হাসতে হাসতেই মিনতি বললেন : তাও ভাল, হাসপাতালে দেখতে আসবেন বলেন নি।

অভিযন্ত্র কোথায়?

বাগের সঙ্গে মন্দির দেখছে।

আপনি বুঝি আজ দেখবেন না ভেবেছিলেন।

শুয়ে থাকতেও পারলাম না।

মিনতির শরীর সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করতে আমার সঙ্কোচ হল। বললুম : ওদের কাণ্ড দেখেছেন?

ওই বড়ো সাহেবের কথা বলছেন?

না, তাঁর মেমসাহেবের কথা।

মেমসাহেব আবার কী করলেন?

আমাদের মেমসাহেবরা কি স্বামীকে এমন দুঃসাহসের কাজ করতে দিতেন। মাটিতে মাথা বুটে এতক্ষণ তাঁকে নামিয়ে আনতেন না।

মিনতি একরকমের অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমাব কোঁতুক তিনি হালকাভাবে নিতে পারলেন না, বললেন : আপনি ঠিকই বলেছেন। স্বামীদের আমবা এগিয়ে দিতে পারি নে, আমরা টেনে রাখি। এদেশের মায়েবা শুধু ছেলেদেব নয়, স্ত্রীবাও তাদের স্বামীদের আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

না না, আমি তা বলি নি।

আমি তাই বলছি। এ সত্য কথা, একে গোপন করে লাভ কী।

জীবনের এ একটা অন্ধকার দিক। এ নিয়ে আলোচনা ভাল লাগে না। তাই বললুম : আনন্দ, একটা মন্দির দেখি।

মন্দির দেখা তো আপনার শেষ হয়ে গেছে। তাব চেয়ে খাবার দোকানে চলুন। ওঁরাও এখুনি এসে পড়বেন।

সত্যি কথা। পায়ের নীচে এতক্ষণ ছায়া ছিল না, এবাবে খানিকটা ছায়া দেখছি। মধ্যাহ্নের সূর্য হেলেছে পশ্চিমের আকাশে। তাড়াতাড়ি ফিরে বললুম : অভিমতের নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

মিনতি হেসে বললেন : সর্বাবই।

এই মুহূর্তে আমার মনে হল, মিনতি এইজন্তেই হোটেল থেকে বেরিয়েছেন। স্বামীপুত্রের ক্ষুধার সময় বুঝি ঘরের ভিতর শুয়ে থাকি। ওই বুড়ি মেমসাহেবও কি তাঁর সন্তান ও স্বামীব কথা এমন করে ভাবেন।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পর মিনতি বললেন : আপনি ঠিকই বলেছেন। ভারতবর্ষ যদি কোনদিন স্পুটনিক তৈরি করে, আব একজন মানুষের দরকার হয় মহাশূন্তে পাঠাবার জন্তে, তা হলে লোক পাওয়া কঠিন হবে। যাব বাপ-মা নেই, ভাইবোন নেই, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-পরিজন কেউ কোথাও নেই, তেমনি একজন মানুষ খুঁজে বার করতে হবে।

আমার বুকেব ভিতবটা একরকমের অদ্ভুত বেদনায় মুচড়ে উঠল। আমারই তো বাপ-মা নেই, ভাইবোন নেই, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়পরিজন কেউ কোথাও নেই। গভীরভাবে বললুম : বেশী খুঁজতে হবে না।

কেন ?

আমি এগিয়ে যাব।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আমি চেপে গোপন করলুম। কিন্তু মিনতি শুরু হয়ে গেলেন। একেবারে নিঃশব্দে এলেন খাবারের দোকান পর্যন্ত, তাবপব বললেন : আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

আমি হাসবার চেষ্টা কবে বললুম : আপনার অপবাব কী ?

না বুঝে আমি আপনাকে ভ্রুংখ দিয়েছি।

এই কথা।

হাসি আমার কান্নার মত দেখাল কিনা জানি নে, অভিমত ছুটে এসে আমাকে রক্ষা করল। মায়ের হাত ধবে বলল : সেই থেকে তোমাকে আমবা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মিনতি তাকে জড়িয়ে ধবলেন।

গাছের নীচে খানকয়েক টেবিল পাতা। টেবিলের চারিধারে কাঠেব চেযাব। নানাজনে নানাবকমের খাবার খাচ্ছে। বিরূপাক্ষ যে টেবিলে বসেছিলেন সেখানেও কয়েকজন চা খাচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেযে তারা উঠে গিয়ে একখানা দড়ির খাটিয়ায বসল। আমবা তাদের জায়গায় জাঁকিয়ে বসলুম।

ভাত ডাল পাওয়া যায়, পুরি তরকারিও। ডালডার নয, ঘিয়েব পুরি। শুধু মাছ-মাংস নেই। তাব জন্ত কাছে একটা হোটেল আছে। ভাতেব বদলে আমার পুরি খেলুম, দই বা রাবডিব বদলে পেলুম খানিকটা মালাই। একেবারে সাদানিধে খাওয়া, কিন্তু তৃপ্তি হল।

একটু তফাতে একখানা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটা ঘন ঘন মাটিতে পা ঘষছে। বোধ হয় অনেকক্ষণ দৌড়য় নি। টাঙ্গাওয়ালাকেও তার গদিতে দেখলুম না। বিরূপাক্ষ বললেন : ছাতারপুরের সেই টাঙ্গা।

মিনতি হেসে উঠলেন।

হাসলে যে ?

ছাতারপুরের টাঙ্গা নয, ছাতারপুরের ভদ্রলোক যে টাঙ্গাব কথা বলেছিলেন—

ওই হল, অতক্ষণ ধরে বলতে গেলে সিগনালে ট্রেন আটকে যাবে।

বিরূপাক্ষব চাকরিব কথা মনে পড়ল। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগে তিনিই আবার বললেন : মিথ্যে বলছি না। ট্রেন পাসিঙের আইনকাহ্ন সব মানতে হলে ট্রেন আর চলবে না। সব দাঁড়িয়ে থাকবে।

আইনকাহ্ন না মানাব জন্তেই নাকি দুর্ঘটনা ঘটছে। মানলেও ঘটত। আইন না মানলে মুখোমুখি ঠোকাঠুকি হয়, কিন্তু সে আর কটা হচ্ছে। কিন্তু বেশীব ভাগই তো দেখছেন চলতে চলতে গাড়ি গড়িয়ে পড়ছে।

তা ঠিক।

আমাদের অপ্রাসঙ্গিক কথা আর বেশীদূর এগোল না। টাঙ্গাওয়ালা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল : টাঙ্গা চাই বাবু ?

‘যদি ভাবেন ঠুঁকে খুশী করা সহজ...’



‘...তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল কববেন’—বোম্বেব প্রীমতী আব. আর প্রভু বলেন। ‘কাপড় জামাব বেলাতেও কি উঁনি কম খুঁতখুঁতে...!’
 ‘এখন অবশ্য আমি ঔঁব জামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—
 প্রচুব ফেনা হুঁষ বলে এতে কাচাও সহজ আব কাপড়ও ধবধবে
 ফবসা হয়।...উঁনিও খুশী!’
 ‘কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধবধবে আব বালমলে ফবসা—
 সানলাইট ছাড়া অন্য কোন সাবানই আমাব চাই না’

গৃহিণীদের অভিজ্ঞতায় খাঁট, কোমল
 সানলাইটের মতো কাপড়ের এত
 ভাল যত্ন আব কোন সাবানেই নিতে
 পাবে না। আপনিও তা-ই বলবেন।

সানলাইট

কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী



বিরূপাক্ষ মিনতির দিকে তাকিয়ে বললেন : টাঙ্গা ?

না না টাঙ্গা চাই নে। এবেলা আমরা বিশ্রাম করব।

মিনতি বললেন : গোপালবাবু তো দেখবেন।

বিরূপাক্ষ বললেন : এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে গোপালবাবু, একটা রাত থেকেই যান।

হেসে বললুম : যাত্রা এক হলে থাকতেই হত।

মিনতি বললেন : এক যাত্রাতেও যে পৃথক ফল হয়ে গেছে।

মিনতি যে স্বাতিদেব কথা বলছেন, তা বুঝতে কষ্ট হল না। বললুম : সেখানেও এক যাত্রা নয়। চলুন, আপনাদের হোটেলের পৌছে দিখে ওখারটা আমি দেখে আসি।

ওখার মানে ঈশ্টার্ন গ্রুপ। পাকা সড়ক ধরে না গিয়ে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে যাত্রীরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের অনুসরণ করে এগিয়ে গেলুম।

ছোট একখানি গ্রাম। এই গ্রামেরই নাম খাজুরাহো। একদা হয়তো অনেক খেজুর গাছ এই গ্রামে ছিল, তাই তাব নাম হয়েছিল খাজুরাহো। খেজুর গাছ আজও আছে, যেমন আর দশটা গ্রামে। আবার খেজুরের সঙ্গে খাজুরাহোর কোন মিল না থাকতেও পারে।

এই দিকে তিনটি হিন্দু ও তিনটি জৈন মন্দির। একদিকে ব্রহ্মা বামন ও জবারি, খানিকটা দূরে ঘণ্টাই আদিনাথ ও পার্শ্বনাথ। যাত্রীদের অনেকে একটা হুমানের বিরাট মূর্তি দেখেছেন। তাই নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। একটা শিলালিপিতে নাকি ৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখ পাওয়া যায়। তা হর্ষের যুগ। কাজেই খাজুরাহোর সেইটেই সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপি।

খাজুরাহো সাগরের তীরে ব্রহ্মার মন্দির। মন্দিরে কিন্তু ব্রহ্মার মূর্তি নয়, শিবের চতুর্মুখ লিঙ্গ। বামনের মন্দিরে অবশ্য বিষ্ণুর বামন অবতারের মূর্তি। মন্দিরটি দেখতে জগদম্বী ও চিত্রগুপ্তের মন্দিরের মত, কিছু বড়। ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধের একটি মূর্তি দেখলুম। আর দেখলুম মজ্জীক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আর হরপার্বতীর, বিবাহ। জবারির মন্দিরে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্তি।

জৈন মন্দিরের সঙ্গে হিন্দু মন্দিরের বিশেষ পার্থক্য নেই। যা আছে তা নিজে লক্ষ্য করা যায় না, কোন

বিশেষজ্ঞকে ডেকে বুঝে নেবার দরকার। মন্দিরের গায়েও হিন্দু দেবদেবীর চিত্র।

একটি মন্দিরের নাম ঘণ্টাই কেন হল, তা বুঝতে দেরি হল না। স্তম্ভগুলির গায়ে শিকল বাঁধা ঘণ্টার নকশা। কানিংহাম সাহেব এটিকে প্রথমে বৌদ্ধ মন্দির মনে কবেছিলেন। বাইরে একটা বিরাট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। সেটি এখন এখানকার জাদুঘরে আছে। তারপরে যখন মন্দিরের ভিতরে অনেক দিগম্বর মূর্তি তখন এটিকে জৈন মন্দির বলে স্বীকার করতে তাঁর বিধি হল না।

এরই দক্ষিণে নতুন ও পুরাতনে মেলা অনেকগুলি জৈনমন্দির। উত্তাপে ও শ্রান্তিতে দেখবার বাসনা তখন ফুরিয়ে এসেছে। তবু কোনবকমে ঘুরে ঘুরে কিছু দেখলুম। আদিনাথ ও শান্তিনাথের মন্দিরে উল্লেখযোগ্য কিছু না দেখলেও পার্শ্বনাথের মন্দিরটি উপেক্ষা করবার উপায় নেই। মনে হয় জৈনমন্দিরের এইটিই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরগাঙ্গে অঙ্গরার মূর্তিগুলি সত্যিই অপূর্ব। দক্ষিণের দেওয়ালে কয়েকটি নারীর মূর্তি আছে, প্রসাধনরত নারী, নারীর পত্রলিখন, হেঁটে হয়ে কাঁটা তুলছে, আদর করছে শিশুকে। বইয়ে এসমস্ত ছবি দেখেছি।

দক্ষিণ গুপের মন্দির দেখবার উৎসাহ আর ছিল না। শুনলাম, সেখানে দুলাদেও শিবের মন্দির, আর চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মন্দির। বিষ্ণুর মূর্তি নাকি ন ফুট উঁচু। আরও অনেক যাত্রীর সঙ্গে আমরা জাদুঘরের কাছে ফিরে এলুম।

কোন গৃহের ভিতর এ জাদুঘর নয়। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা খোলা জায়গায় অপূর্ব কারুকার্য করা প্রবেশের দ্বার, গাছের ছায়া সেখানে মায়া ঘনিষে রেখেছে। কোন টিকিট কেটে এই জাদুঘরে ঢুকতে হয় না, দক্ষিণা দিতে হয় ভিতরেব ছবি তোলবার জ্ঞা। একজন গ্রহরী ঘাবের পাশে বসে ছাপা ছবি আঁব বই বিক্রি কবছে। অলসভাবে যাত্রীবা যাতায়াত করছে দ্বার দিয়ে।

ভিতরে ঢুকে দেখলুম, সেখানে সারি সারি পাথরের মূর্তি। এই মূল্যে যা কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, সব এখানে যত্র করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বুদ্ধের সেই বিরাট কালো মূর্তিও দেখলুম। মাথাব উপরে সূর্য যদি আগুন বর্ষণ না কবতেন, তা হলে হয়তো মনোযোগ দিয়ে দেখতে ইচ্ছে হত। এখন ইচ্ছে হল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার। বাইরের ছায়ার বুঝি অনেক বেশী আকর্ষণ।

কিন্তু ঘরের সামনে এসে চমকে উঠলুম। গাছের ছায়ায় কে আঁচল ছলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাতি নাকি। না, স্বাতি নয়, মিনতিও নয়। এ আর কোন মেয়ে। ওধারের মন্দির থেকে বেরিয়ে আগে এখানে পৌঁছেছে। সঙ্গীরা এখনও এসে পৌঁছয় নি। নিঃসঙ্গ স্বাতি।

কিন্তু স্বাতির কথা আমার কেন মনে এল! বোঝেতে স্বাতি কি সঙ্গী অপরোক্ষা এমন করে দাঁড়িয়ে আছে। না না, তা কেন থাকবে। জো রায় তো সারাদিন সবাইকে সঙ্গ দেবেন। তবে কি আমি স্বাতিকে কোনদিন এমনি করে অপরোক্ষা করতে দেখেছি। মনে পড়ছে না।

আমার বাস ছাড়তে এখনও দেরি আছে। কোন গাছের ছায়ায় আমাকে অপরোক্ষা করতে হবে। মিনতিদেব হোটলে গিয়ে তাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে আমি চাই নে। আবার গিয়ে আমি মন্দিরের এলাকায় ঢুকলুম। একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লুম সবুজ ঘাসের উপর। ঘুম এল না, কিন্তু জেগে জেগে অনেক স্বপ্ন দেখলুম। এই তো গত পূজোর আমরা দক্ষিণ-ভারত দেখতে বেরিয়েছিলুম। একদিকে সমুদ্র দেখেছি, মন্দির দেখেছি। অজস্তাব গুহা দেখেছি। মন ভরেছে, মন ভবিষ্যে নিয়েছে স্বাতি। স্বপ্নভরা ঐশ্বর্য নিয়ে আমি দেশে ফিরেছি।

কন্ঠাকুমারীও সাগরবেলায় নয়, সোমনাথেব সমুদ্র-তীরেও নয়, এমনি এক উদ্ভূত মধ্যাহ্নে আমবা অজস্তা গুহাব নীচে একটা বরনার ধারে বসেছিলুম। একটুখানি ছায়ায় একটা বড় পাথরের উপর স্বাতি বসেছিল। তারপর ডেকেছিল আমাকে। সঙ্গীর্ণ স্থান। তবু নিমন্ত্রণ অন্তরঙ্গ। আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে নিজের হাতটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর দ্বিধা চলে না। আমি এসে ঘেঁষে বসেছিলুম।

সেদিনের সব কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। দু-একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছিল কাছে ও দূরে। কে লক্ষ্য করছে, আর কে করছে না, তা আমরা দেখলুম না। পৃথিবীতে আমাদের একটা অধিকার আছে, সে অধিকার থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করব।

নদীর উপর দিয়ে গাছের নীচে দিয়ে পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় হাওয়া বইছিল। এখানকার মত রৌদ্রের উত্তাপ

নেই এতটুকু, আছে একটু নেশার মত শিরশিরে শীত। স্বাতি তার শাড়ির আঁচল এক হাতে চেপে রেখেছে, ছেড়ে দিলে বোধ হয় ছোঁয়াছুঁয় হবে।

স্বাতি চুপ করে ছিল, আমি ভাবছিলুম কী ভাবব। ভাববার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। হিউএন সাঙের কথা ভাবব। ফা হিয়েন। ভাবতবর্ষের কোথায় তাঁরা যান নি। দুঃসাহসী তাঁদের ভ্রমণের পথ।

কি আশ্চর্য। এই কথাটি যেন কোথায় আমি পড়েছিলুম। দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে। কোথায় পড়েছি, সহসা মনে পড়ছিল না।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করল : কী ভাবছ ?

একটি কবিতার লাইন মনে পড়েছে। ভাবছি, কোথায় পড়েছি।

বল।

দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে—

স্বাতি হেসে বলেছিল : এই কবিতা তোমার এখানে কেন মনে এল ?

তা তো জানি না।

স্বাতি বলল :

তুলে নিল দ্রুতরথে

দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে।

মনে পড়েছে। এ যে শেষের কবিতা। পরের লাইনটি সে বলে নি। অকস্মাৎ থেমে গিয়েছিল। এত কাছাকাছি বসে বুঝি বলা যায় না। তোমা হতে বহু দূরে।

এই মুহূর্তে আমার মন একটা স্বপ্নময় অতীতের পরিচয় করে এল। মনঃহল ধমধমে, যেন নেশা ধরেছে। বলতে ইচ্ছা হয়েছিল—

আমাব শূন্যতা-তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।

কিন্তু এই আমিটা কে! গরিব বাংলার একটা ভাবঘুরে বাউঙুলে ছেলে বই তো আব কিছু নয়! আমার সমাজ কী, আমার পরিচয় কী! কিসের আমার মর্যাদা! কত দেশ তো ঘুরে ঘুরে দেখলুম; কত কীর্তি, কত নরনারী। এ সব আমার দেশের ভেবে বুক হয়তো ভরে উঠেছে, কিন্তু আমাকে নিয়ে-বুক ভরেছে কার! আমার মূল্য যে মাপা হয়েছে টাড়ির টাকায়, চাঁদের জ্যোৎস্নায়

নয়। এত সহজে আমার নেশা হলে চলবে কেন।
নিজেকে আমি সামলে নিয়েছিলুম।

স্বাতি হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল : তোমার
নিজের সহজে কোম প্রশ্ন নেই ? কোন কৌতুহল ?

কী আশ্চর্য। স্বাতিও কি আজ আমারই মত
ভাবছে। বললুম : ভুলে থাকি। প্রয়োজন হয় না
বলেই বোধ হয় মনে পড়ে না।

ভারতের অর্ধেকটা আমরা দেখে নিলাম, কিন্তু
জীবনের কিছুটাও কি দেখতে পেয়েছি ?

জীবনটা যদি জগতের মত খোলায়েলা হত, নিশ্চয়ই
দেখতে পেতুম। সেটা সঙ্গীর্ণ বলেই এত অন্ধকার।

আমি কেন সঙ্গীর্ণ ভাবতে পারি নে। কেন আমি
আলোহাওয়ার মত জীবনকেও ছড়িয়ে দিতে চাই। এত
দেখেও কি আমাদের মুক্তি হবে না ?

আমি তাকে চেতনার জগতে ফিরিয়ে আনতে
পারলুম না।

স্বাতি বলল : সত্যি বল তো, আমরাও কি বেরোতে
পারি না দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে ? যেমন—

কথাটা সে শেষ করতে পারে নি। তার কি সেই
অন্ধকার গুহার প্রাণবন্ত মানুষ দুটির কথা মনে পড়েছে।
সেই ঘনিষ্ঠ অন্তবদ্বন্দ্ব নরনারীর কথা। এখানেও যে
আমরা বড় কাছাকাছি বসে আছি। শুধু তো সৌরভ
নয়, কবোফ উত্তাপও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাদের মত
দুঃসাহস আমাদের কোথায়।

দূরে সেই দুঃসাহসীদের দেখতে পেয়েছিলুম। তারাও
এই দিকে নেমে আসছিল। কিন্তু এত ভাড়াভাড়ি তাদের
দেখা হয়ে গেল। না, আমরাই এখানে অনেকক্ষণ বসে
আছি। দেখতে আব কতটুকু সময় লাগে। সময় লাগে
তো জানতে। মানুষকে জানতেই সবচেয়ে বেশী সময়
দরকার। একদিনে জানা যায় না। এক জীবনেও
হয়তো বাকি থেকে যায়। মানুষের জীবন যে অনেক
সঙ্কোচ দিয়ে, অনেক সংস্কার দিয়ে, অনেক অসত্য দিয়ে
ঢাকা। তাইতেই বুঝি হাত বাড়িয়ে স্বাতির উত্তর দিতে
পারলুম না : চল।

সে বড় নাটকীয় হত। বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষিত
মানুষের মত সভ্য হত না। তাই আমি কবিতায় তার
উত্তর দিয়েছিলুম : আমি তো গরিব যাবাবর।

তোমারে যা দিয়েছিলুম সে তোমারি দান ;

গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

স্বাতির ঋণ আমরা আজও শোধ হয় নি।

এ কি, ঘুমচ্ছেন নাকি ?

মিনতির কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠে বসলুম।

শুধু মিনতি নয়, অভিযন্তাকে নিয়ে বিরূপাঙ্কও এসেছেন।
বললেন : আপনাব বাস যে ছেড়ে যাচ্ছে।

তাই নাকি।

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। তাই দেখে বিরূপাঙ্ক
বললেন : ভেবেছিলুম আপনাকে জাগাব না। কিন্তু
মিনতি মানল না।

তাদের সঙ্গে মোটর-বাসের দিকে আসতে আসতে
মনে হল, বিদ্যায়ের কথা মেয়েরাই মনে করিয়ে দেয়।
মিলনের কথা কে শোনায জানি নে।

বাসে ওঠবার সময় অভিযন্তা বলল : মামা আমাদের
ছেড়ে যাবে মা ?

মিনতি বললেন : আবার কবে দেখা হবে তাই ?

বিরূপাঙ্ক বললেন : পথের পরিচয় পথেই যেন শেষ
হয় না ভায়া।

কণ্ঠ আমার বাষ্পে ভরে গেল। আমি কোন উত্তর
দিতে পারলুম না। শুধু মাথা নেড়ে তাদের স্নেহের
আদেশ আমি মেনে নিলুম। বাস ছেড়ে দিল।

বোম্বেতে স্বাতিও আমায় এমনি করে বিদায়
দিয়েছিল। মিনতির যেমন ডেকে আমাকে সঙ্গী করেছে,
স্বাতিবাও তেমনি আমায় কলকাতা থেকে ডেকে
এনেছিল। একসঙ্গে ফিরলেও কোন ক্ষতি ছিল না।
তবু তারা আমায় বিদায় দিল। জীবনের নিঃসঙ্গতা এবা
বারে বারে আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনের জনবহুল প্রাটফর্মে
মামা-মামী দাঁড়িয়েছিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্তে
আমি তাদের প্রণাম কবলুম। স্বাতি আমার পাশে পাশে
এগিয়ে এসে গাডিতে তুলে দিল। তারপর প্রণাম করল
পাশে হাত দিয়ে। সঙ্কোচে আমি সরে দাঁড়িয়েছিলুম।
মুখ তুলে স্বাতি একটু হাসল। এমন সুন্দর হাসি আমি
অনেক দিন দেখি নি। কিন্তু আনন্দের বহলে মন আমার
বেদনায ভরে গেল। বড় অসহায় বড় দরিদ্র মনে হল
নিজেকে।

ট্রেনের শেষ ঘণ্টা পড়ল চং চং করে, গার্ডের বাঁশি
বাজল। সেই সঙ্গে স্বাতির কথাও শুনতে পেলুম :
নিজের ঐখব্বের পরিমাণ তুমি জান না, তাই এমন ভয়
পাও। তুমি তো আমায় কিনে নিয়েছ।

গাডি ছেড়ে দিবেছিল, স্বাতিও সরে দাঁড়িয়েছে।
বিস্ময়ে আমার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেছে। অতীত আর
বর্তমানে একটা কঠিন জট পাকিয়ে ভবিষ্যৎকে চেপে
ধবতে চাইল। স্বাতির কথা আমি নিশ্চয়ই ভুল শুনি নি।

এখন আর আমার কোন ভয় নেই। জো রাবেয়
সঙ্গে সে যথেষ্ট ঘুরে বেড়াক, তার মন আছে আমার
মনে বাঁধা। জগতের সেবা সম্পদ আমি সঙ্গে নিয়ে
যাচ্ছি। হোক কথা, হোক কল্পনা, জীবনের চেয়ে স্বপ্নে
যে স্থখ বেশী। সে স্থখ আমি পেয়েছি। প্রসন্ন হাসি
দিয়ে স্বাতির উত্তর আমি দিয়ে এসেছি।

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

রম্যানি বীক্ষ্য



শ্রীশ্রীবোধকুমার চক্রবর্তী

‘রম্যানি বীক্ষ্য’ দক্ষিণ-ভারতের স্ববিস্তৃত ভ্রমণ-কাহিনী। দক্ষিণ-ভারতের ভাষা সাহিত্য, ধর্ম দর্শন, শিল্প স্থাপত্য, সঙ্গীত নৃত্য—সবই এ গ্রন্থে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সাদা দিয়েছে দক্ষিণের মাহু। ‘রম্যানি বীক্ষ্য’ ভ্রমণের সরসতার সঙ্গে

ইতিহাসের তথ্যকথাব অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। দক্ষিণ-ভারতের মর্মকথা মূর্ত হয়ে উঠেছে ‘রম্যানি বীক্ষ্য’র প্রতিটি পৃষ্ঠায়। ত্রিবর্ণ একবর্ণ বহু চিত্র সম্বলিত। বেঙ্গলি বোধাই, মনোবম রঙিন জ্যাকেট। ভ্রমণ-সাহিত্যে চিরস্থায়ী সংযোজন : সাত টাকা।

জীবনের জটিলতম সমস্যা সমাধানে
চিন্তাশীল লেখক দেবী খানাব
বুদ্ধিদীপ্ত বচনা।

শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত
চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

উল্লেখ্য রাজ্য

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

রাজন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা - ৩৭

বিহারেব মফস্বল শহর। মেয়েদের হাইস্কুল।
কয়েকজন শিক্ষিকা। বাঙালী ও বিহারী ছই-ই।
বেশ মিলেমিশেই আছেন সকলে।

এখানকাব লেডি-প্রিন্সিপাল স্ত্রীলা বসু এম এ. বি.টি.
ডিপ-ইন-এড। সকলেই বলে আদর্শ লেডি প্রিন্সিপাল
মিস্ বাসু। অঙ্কের ক্লাস নেন তিনি। বড় বড় অঙ্ক চোখের
নিমেষে করে দিয়ে সকলকে চমৎকৃত কবে দেন। তাঁর
পড়ানোর প্রশংসা প্রত্যেক ছাত্রীর মুখে।

বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। স্কুল গৌরবর্ণ দেহ। অল্প
বয়সে পিতৃমাতৃহীন। অতএব আত্মীয়দের দ্বারা সুবিধে-
মত ভাবে পবিত্র্যুক্ত। নিজের চেষ্টায়, লেখাপড়া
শিখেছেন। নিজের চেষ্টায় উদরায়ের সংস্থান কবে
নিচ্ছেন। নিজের ধীশক্তির বলে আজ লেডি প্রিন্সিপাল।
কঠিন প্রকৃতি তাঁর। তাঁব সামনে পান থেকে চুনটি
খসবাব উপায় নেই। ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মে স্কুল
চলছে তাঁব নেতৃত্বে। ছাত্রীরা তাঁকে রীতিমত ভয় কবে।
কিন্তু পর্বতেও নাকি নিব্বরিণী থাকে।

স্কুলের এক্স-অফিসিও প্রেসিডেন্ট কালেক্টর সাহেব।
এখন একজন বাঙালীই। শ্রী এ. বি. ঘোষ, আই-এ-এস।
দেখতে স্ত্রী। সর্বদাই হাসিখুশী। মাজাঘসা রঙ।
সরকারী মহলে ভাল অফিসার বলে খুবই সুনাম।
চালাক-চতুর, অতিরিক্ত কর্মক্ষম। শীগগিরই কমিশনার
হয়ে যাবেন এইরকম জোর-গুজব লোকের মুখে
মুখে।

প্রেসিডেন্ট ও লেডি প্রিন্সিপালকে প্রায়ই একত্র হতে
হয়। স্কুলের কাজ ছাড়াও সাংস্কৃতিক কাজ আছে
নানারকম। ১৫ই আগস্ট থেকে ২৬শে জ্যৈষ্ঠারি পর্যন্ত।
নৃত্য গীত অভিনয় ইত্যাদি সবরকম ব্যবস্থাই করতে হয়।
মন্ত্রীরা দর্শক থাকেন। আব এখন শুধু পুলিশ স্টেট
নয় তো? ওয়েলফেয়ার স্টেটও যে। শান্তি ও শৃঙ্খলা

বজায় রাখলেই শুধু চলবে না—জাতিগঠনও করতে হবে
তো। অতএব দেখা তাঁদের হয়ই।

সহসা প্রেসিডেন্ট সাহেব বিপত্নীক হলেন। সকলেই
ছুঃখ জানিয়ে বললেন আহা।

অতঃপব স্ত্রীলার কেমন মনে হতে লাগল, কিছুদিন
থেকে কালেক্টর সাহেব তাকে যেন, বিশেষ স্নেহের চক্ষে
দেখতে আরম্ভ কবেছেন। সেও তাঁর কন্ঠার সঙ্গে আলাপ
করতে প্রায়ই তাঁর বাড়ি যেতে লাগল। এত ঘন ঘন
যে মেয়ে ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। টিচার
জাতটাব ওপবই সে চটে গেল। তাঁর বাবাকে এরা
ছিনিয়ে নিতে চায়। ডাইনি এরা। তাঁব মাতৃশোক
উথলে উথলে ওঠে। তাঁর বাবা স্ত্রীলার সঙ্গে কথা
বললে সে মুখভাব করে থাকে। একটু হাস্যালাপ হলে
সে উঠে চলে যায়।

বিহারেব ছোট শহরে বাংলা ফিল্ম ভাল চলে না তবু
কালেক্টর সাহেবের কথাতেই স্থানীয় সিনেমা কোম্পানি
একটা নামজাদা বাংলা ছবি অনেক কষ্ট করে আনাল।
খোলবার দিনে সম্মানে কালেক্টর সাহেবকে নিমন্ত্রণও
করে এল। লাইসেন্স ইত্যাদি দেবার মালিক তিনিই
তো। আবার এনটারটেনমেন্ট ট্যাক্স দিতে দেরি হলে
তাঁরই দ্বারস্থ হতে হয়! কাজেই তাঁকে প্রশংসা রাখতেই
হয়।

স্ত্রীলা সে সময় কালেক্টর সাহেবের ড্রিংরুমে বসে
মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। কালেক্টর সাহেব কন্ঠাকে
খবরটা দিতে অফিস-ঘর থেকে উঠে এলেন। ফিল্মের
নাম শুনে কন্ঠাও উৎসাহিত হয়ে উঠল। স্ত্রীলাও আগ্রহ
দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সেও যেতে পারে কি না। সাহেব
বললেন, বেশ তো। ভালই তো। আসবেন।

ভাবলেন, মেয়ে সঙ্গে থাকবে, ক্ষতি কি।

সন্ধ্যা হল। সাহেব প্রস্তুত। অকাবণে একটু বেশী
খুশীই যেন। কিন্তু ঠিক যাবার সময়ে মেয়ে হঠাৎ বেঁকে

বসল। কিছুতেই যাবে না। বাবাব শত অনুবোধেও না। তার শরীর ভাল নয়। সে কি করবে। এদিকে সজ্জিতা স্নানীও এসে উপস্থিত।

কালেক্টর সাহেব বিপদে পড়লেন। কিন্তু অনেক ট্রেনিং পেতে হয়েছে তাঁদের। জীবনে কত কঠিন কর্তব্যই তাঁদের করতে হয়। তিনিও কবলেন। মেয়ের ওপব রাগ করে একাই স্নানীলার সঙ্গে গাড়ি করে সিনেমা-হাউসে এসে উপস্থিত হলেন।

ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটার দ্বারদেশেই অপেক্ষা করছিলেন। প্রচুর অত্যাধিকার করে তাঁদের ওপবে নিয়ে যাওয়া হল। সবচেয়ে সম্মানেব আসনটাই কালেক্টর সাহেবের জন্তে নির্ধারিত। স্নানীলা তাঁব সঙ্গে সঙ্গে এসে সেই আসনটির পাশেই বসে পড়ল।

কালেক্টর সাহেব তখনই বসলেন না। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে নানা বিষয়ে ভাবারক করে বেড়াতে লাগলেন।

হাতে একটা বেটন। পরনে বুশ-সার্ট। অপারেটিং রুম থেকে ব্যালকনীর ধাব পর্যন্ত দেখে বেড়ালেন।

আনিটবী কণ্ঠশন থেকে ফায়ার-অ্যাকসিডেন্ট-এর সেফটি প্রিকশান পর্যন্ত পুজাছুপুজুরূপে পর্যবেক্ষণ করলেন। এ না হলে অফিসার কি।

খানিক পরে দূরে একটা খালি চেয়ার দেখে সেইখানেই বসে পড়লেন। কেউ জিজ্ঞেস না করলেও বললেন, ওখানটায় বেজায় গরম।

স্নানীলাব দু পাশেব কয়েকখানা চেয়ার অতঃপর খালিই রয়ে গেল। কেউ সেখানে বসল না। স্নানীলা একা কাঠ হয়ে সর্বোৎকৃষ্ট চেয়ারে বসে বইল।

ছবি শুরু হল। স্নানীলা নামজাদা ছবিব কিছু দেখল কিনা সেই জানে কিন্তু ইণ্টারভিউবের সময় তাব খোঁজ নিতে এসে কালেক্টর সাহেব দেখেন চেয়ার শূন্য। গেটকোপারকে জিজ্ঞেস করে জানলেন সে চলে গেছে।

এব পর থেকে স্নানীলা দেবীকে আর কালেক্টর সাহেবেব বাড়িতে ঘন ঘন যেতে কেউ দেখে নি, যদিও কর্মোপলক্ষ্যে বা মীটিংয়ে অ্যাটেণ্ড করতে তাঁর বাড়ি তাকে যেতে হয়েছে বহুবার।



আজ নতুন মোড়ের দূর লেজোছি..

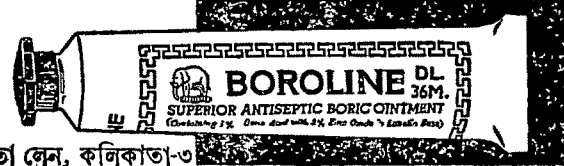
বর্ষাব দিনে ভিজে হাওয়ায়
মান হয়ে যায় মুখের লাবণ্য।
বীজাণুনাশক বোরোলীন ফেস
ক্রীম ব্যবহার কবে আপনি সিন্ত
দিনগুলিতে মুখশ্রী অমান রাখুন।
মন-মাতানো এর স্বগন্ধ।

প্রেস এন্ট্রান্স ২-৩

বোরোলীন

ভেষজ-গুণ-
সম্পন্ন
পরম প্রসাধন

বোরোলীন প্রস্তুতকারক-এর নতুন ফাউণ্ডেশন ক্রীম,
লোমনাশক ও এ্যান্টিবিন্কেল ক্রীম শীগিরই বাজারে পাবেন



জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ ১১/১, নিবেদিতা পেন, কলিকাতা-৩

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা। আট টাকা।

বেশ কিছুকাল পূর্বে শ্রীমান অরুণকুমার সঙ্কলিত 'উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সঙ্কলন' গ্রন্থের পরিচয় দিবার সময় এই 'সঙ্কলন-আশ্রিত তাঁহার' খবরটির উল্লেখ কবিতাগুলি। সেই খবরটি উক্ত 'অব ফিলজফি উপাধি'ব জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অমূল্যমূল্যে হইয়া আলোচ্য গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 'সঙ্কলন' ও তৎ (খবর) দুইয়ে মিলিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতাব একটি প্রামাণ্য পরিচয় বহন করিতেছে। যাহা দুস্তাপ্য নানা গ্রন্থে ও মাসিক পত্রাদিতে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পাঠকসাধারণের কাছে লুপ্ত ও বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিল, তৎই মুখোপাধ্যায় প্রথমে সেগুলি সকলের আয়ত্তে আনিয়া পরে অভ্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহিত্যবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সেগুলির মূল্য নিরূপণ করিয়া গীতিকাব্যরসিক বাঙালীর মহত্বপূর্ণ সাধন করিলেন। তাঁহাকে লুপ্ত-রত্নোদ্ধারক বলিব না, লুপ্তপ্রায় বস্তুর রক্ষক বলিব।

তৎপ্রদেয় নয়টি অধ্যায়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বাংলা গীতিকবিতাব সূত্রপাত হইতে উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত যে সকল গীতিকবির অত্যাশ্রিত হইয়াছে তাঁহাদের কাব্যসাধনাব পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিককাল পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং রূচি ও রীতি পরিবর্তনের দ্বারা এই কাব্যপ্রবাহের ঝাঁকে ঝাঁকে মোড় ফিরিবার কাহিনী দৃষ্টান্ত সহযোগে বিবৃত করিয়াছেন। প্রেম, দেশপ্রেম, গার্হস্থ্যজীবন, প্রকৃতি, বিদ্যা ও তত্ত্ব—গীতিকবিতার এই ছয়টি বিষয়-বিভাগে বাংলায় সমগ্র গীতিকবিতার মর্মকথা পরিষ্কৃতভাবে হইয়াছে। এই দুইটি পরস্পর-পরিপূরক গ্রন্থ একাধারে ছাত্রসমাজ, কাব্যরসিক-

সমাজ ও সাধারণ পাঠক-সমাজের প্রয়োজন সাধন করিবে।

পথের টানে : বিভা সরকার। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২। মাড়ে তিন টাকা।

কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীমতী বিভা সরকার যখন তাঁহার এই বিচিত্র ভ্রমণ-কাহিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া আমার কাছে আসিয়াছিলেন তখন বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে তাঁহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছিলাম এবং আগ্রহেব সহিত 'শনিবারের চিঠি'তে ইহার "বন্দাবন"-অংশ প্রকাশ করি। এখন গ্রন্থাকারে সমগ্র বইটি হাতে পাইয়া লেখিকার দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তি, ইতিহাসবোধ ও লিপিকুশলতার একত্র সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম এবং অকুণ্ঠচিত্তে 'বাংলায় রসিক পাঠক-সমাজের কাছে এই গ্রন্থ পাঠের ও উপভোগের আবেদন জানাইলাম। ইহাতে ভ্রমণ-কাহিনী তো আছেই, অধিকন্তু স্থানমাহাত্ম্য, ইতিহাস ও কয়েকটি স্ববর্ণিত চরিত্রচিত্রণও আছে।

পঁচিশজন সাম্প্রতিক কবি : দিনেশ দাস সম্পাদিত। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক হিসাবে নয়, একজন পূর্বগামী কবি হিসাবে অল্প পঁচিশজন কবির কবিতার সঙ্কলিত আভাস পাইয়া বিস্ময় ও কৌতুকবোধ করিতেছি। স্বীকার করিতেছি আমাদের কাল পর্যন্ত ছন্দে হিমালয়প্রমাণ কথা বলার পয়ও স্বচ্ছন্দে অনেক কথা বলিবার আছে এবং বলিবার সকল ভঙ্গিও এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। মনে হইতেছে এই

পঁচিশজনকেও বিস্মিত হইবাব জ্ঞান পরবর্তী “কবির লাগি কান পাতি”য়া থাকিতে হইবে।

সম্বন্ধীয় মার্গ : সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২। মাড়ে চার টাকা।

গ্রন্থকার চার শতাব্দিক পৃষ্ঠায় ধর্মসম্বন্ধের অপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। বাংলাদেশে কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীরা ধর্মের সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। গ্রন্থকার শতাব্দিক বৎসবে এই প্রচেষ্টাকে তাঁহার এই স্মৃতিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া বর্তমান যুগের পাঠককে ধর্মসম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ কবিত্তে পারিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্তাশীল পাঠক এই গ্রন্থে বহু চিন্তার খোরাক পাইবেন। ধর্ম যে বিরোধের বস্তু নহে এবং সকল ধর্মই যে মহান সত্যের আকব, এই সত্যের উপলব্ধি সকলকে আনন্দ দিবে।

প্রণিকল্প ও উদ্ভাবিকা : শ্রীমতী মুণালিনী সেন। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

শ্রীমতী মুণালিনী সেন ১৮৭৯, ৩রা আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যন্ত অল্প বয়সেই তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হন। পরপর চারখানি কাব্যগ্রন্থ (প্রতিধ্বনি) ১৩০১, নির্বাণী (১৩০২), কল্লোলিনী (১৩০৩) ও মনোবীণা (১৩০৬) প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যরথীদের প্রশংসা অর্জন করেন। এই বুদ্ধ বয়সেও তিনি কাব্য রচনায় বিরত হন নাই। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁহার প্রথম চারটি পুস্তকের অন্তর্গত কবিতা পরবর্তীকালে রচিত কবিতার সংকলন। শ্রীযুক্ত সেন উনবিংশ শতকে শেষ যুগের খ্যাতিমানা মহিলা কবি। বর্তমান সংকলনটি কাব্যপ্রিয় আধুনিক পাঠককে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাব এক নারী-কবির কাব্যসাধনার পরিচয় দিয়া আনন্দিত করিবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উত্তর সাগরের তীরে : বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। সরস্বতী গ্রন্থালয়। আট টাকা।

সাধারণ্যেব অন্তরালে মানুষের চেতনার বিবর্তন ঘটছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যেবও বিবর্তন ঘটছে একটা বিশেষ ধারায। এই ধারার সৃষ্টিতে গভীর অল্পভব বুদ্ধির হাত ধরে চলেছে জীবন-সন্ধানে। মানুষের বুদ্ধিতে আর অল্পভবে যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটছে অপরূপ রূপ সৃষ্টিতে—মননেব সঙ্গে অল্পভবের সাধারণ মিশ্রণে (mechanical mixture) নয় মননের সঙ্গে অল্পভবের একাত্মতায়। চেতনার যে স্তর থেকে শিল্প উদ্ভূত হয় সেই স্তরের নতুন রূপান্তর ঘটছে। অতি উর্ধ্বে যেখানে বিজ্ঞান ও শিল্প এক লোকে পৌঁছেছে সেই লোক থেকে নতুন যুগের জীবন-সন্ধান আবিস্কৃত হয়েছে।

আমাদের সাহিত্যে অল্পভব রসেব ক্ষেত্রে মননের অল্পপ্রবেশ ঘটেছে অনেকবার কিন্তু মননকে বার বার প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। অশিক্ষিতপটুত্বের প্রভাব ও মোহ এখনও অব্যাহত আমাদের সাহিত্যে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে আমাদের সাহিত্য একদিন বিশ্বসাহিত্য বিবর্তনের ধারাপথ ধরবে, যুগধর্মের সঙ্গে তার যোগাযোগ সাধিত ও স্বীকৃত হবে।

শিল্পচেতনার এই নতুন রূপ কী তা বিশ্লেষণেব অতীত তবু তাকে চিত্র দিয়ে স্পর্শ করা যায়।

‘উত্তর সাগরের তীরে’ পড়ে এই নতুন শিল্পচেতনার দুবাগত একটা স্পর্শ পেলাম।

লেখক এই বচনাকে বলেছেন ভ্রমণোপন্যাস। ভ্রমণ ও উপন্যাস একত্রে।

যে কোনও ভ্রমণ আখ্যায়িকার আবিস্কৃত দেশকালের একটা বিশেষ বিন্দু থেকে আর তার সমাপ্তি আব একটা ভিন্ন বিন্দুতে। এই দুটো বিন্দুর মধ্যে তার একটা রৈখিক বিস্তার—তা সরলই হোক বা বক্রই হোক। ভ্রমণবৃত্তান্ত তখনই কাহিনী হয়ে ওঠে যখন এই বেখাটাকে ঘিরে বহুতল বিশিষ্ট একটা মানবিক চেতনা রূপ পবিগ্রহ করে। অর্থাৎ কোনও একটা পক্ষস্থল বা কালস্থল ধরে লেখকের মনন অল্পভব সব মিলে একটা অপকণ পুষ্পমাল্যের মত

অথও সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই কাহিনী তখনই শিল্প হয়ে ওঠে যখন এক অদৃশ্য জীবনদেবতা এই নানান রস-পুষ্পের মালিকা কণ্ঠে ধারণ করে অনির্বচনীয় রূপে সম্মুখে আবির্ভূত হন। 'উত্তর সাগরের তীরে' এর নানান আলেখ্যেব অপরূপ মাল্যটি যে দেবতার গলায় ঝুলছে তিনি বৈরাগ্যের দেবতা, বাসনাবিজয়ের পব যার সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার ঘটেছে চেতনাব স্ফটিক মন্দিরে।

শুধু ভ্রমণালেখ্য নয়, 'উত্তর সাগরের তীরে' উপন্যাসও। জীবন-উপলব্ধি যখন একটা বিশেষ পরিণতিব ধাবায় চরিত্রেব মধ্যে শিল্পকায় ধাবণ কবে তখনই উপন্যাস উপন্যাস হিসাবে সার্থক হয়। যে কোন উপন্যাস একটা বিশেষ জীবনদর্শনের চিত্ররূপ। এই চিত্র চরিত্রে আর চারিত্রে। এই উপন্যাসেব নাযক জ্যাক জীবনসন্ধানে বেরিয়ে বাসনার অগ্নিপবীক্ষাব মধ্য দিয়ে বাসনার অতীত এক প্রেমে উপনীত হয়েছে। এই জ্যাক যেন প্রতীচ্যেব আত্মা। বাসনার দিগ্ভ্রাস্তি থেকে, কামনার কুয়াশা থেকে প্রেমের উজ্জল প্রশান্ত আকাশকে সন্ধান করেছে। পেয়েছেও শেষে।

জ্যাকের জীবনসন্ধান এই উপন্যাসের প্রধান স্রব। এটাই প্রধান আলাপ। এরই বিস্তার ঘটেছে অগ্ন্যাত্ত পার্শ্বচরিত্রে। সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে মাহুয়ের দলিত-মথিত চিত্ত নিরাময় সন্ধান করেছে। কেউ বা প্রেমে কেউ বা কামনার বহিতে। যে যে দিকেই যাক এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এক আত্মা অপর আত্মাকে চেয়েছে। মাহুয়ের জন্তে মাহুয়ের আকুলতা কোথাও পাপের পথে কোথাও পুণ্যের পথে প্রকাশ পেয়েছে। বুদ্ধকেও বোধিতে পৌছতে হয়েছে মারের প্রলোভনের নবকটি পেরিয়ে। জ্যাককেও তার বোধিতে পৌছতে হয়েছে বাসনার নরকের চত্বরটা পেরিয়ে। সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে প্রতীচ্যের মাহুয়ের আত্মার অসহায় হাহাকার যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

এই প্রতীচ্যে প্রাচ্যের আত্মা শুদ্ধবৃত্ত গিয়েছেন সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে। তার অন্তর্দাহেব উপর প্রলেপের মত। উপন্যাসে অসংখ্য পার্শ্বচরিত্র আছে।

এরা বেশীর ভাগ নারী। ভ্রষ্টা নারী, কুলটা নারী, জন্মী নারী, সতীসাক্ষী নারী, আত্মার সহধর্মিণী নারী। যারা পুরুষকে আকর্ষণ করেছে, সেবা করেছে, ধ্বংস করেছে আবার নিজেরাও ধ্বংস হয়েছে। 'জ্যাক' ভীনার মত ভ্রষ্টা থেকে অনীভা বহুব মত মহিয়সী পর্যন্ত শক্তির বিচিত্র বহুরূপের সাহচর্যের পথ বেয়ে আত্মার প্রশান্তিতে পৌছবে। এই উপন্যাসে যাবা দুঃখবিজ্ঞা, ভ্রষ্টা, মেহপসারিণী, তারাও কী ভীষণ অসহায়। তারাও যেন মাহুয়ের ঝড়গার দিকে নিজেদের অজ্ঞাতসারে হাত বাড়িয়ে, আত্মাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। উপন্যাসেব আরও একটা বিশেষ দিক আছে। পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের মনের রাখীবন্ধন হয়েছে মানবিক অন্তর্ভবে, প্রেমে-প্রীতিতে মিলিত হাসিকান্নায়। বহিরঙ্গে বহিরঙ্গে নয়, অন্তর্ভবে অন্তর্ভবে। East is East and West is West মিথ্যা বাচালতা মাত্র। মানবাত্মার দেশ নেই কাল নেই। দেশকালের ঊর্ধ্বে সে আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল।

উপন্যাসের গঠনকৌশলটিও সুন্দর। লেখক বচনার বাইরের অথওতা সৃষ্টি করেছেন একটি সুন্দর পদ্ধতিতে। রচনার ষা মৌলিক ঐক্য তা লেখকের জীবনদর্শনের ঐক্য, জীবনসন্ধানের বিশেষ ধারার ঐক্য, তাঁব মন যে ভাবে ঘটনাচরিত্র উপাখ্যান বেছে নিয়েছেন সেই নির্বাচন প্রবণতার ঐক্য। এ ছাড়া বাইরের একটা ঐক্য আছে। ষা formal unity রচনার বাইরের অবয়বের সৃচিস্তিত সংস্থানের ঐক্য। লেখক রাজগীর পাহাড়ে এক সন্ধ্যার ভ্রমণের ফ্রেমে তাঁর এই কাহিনীকে বেঁধেছেন। ফ্রেমটা সুন্দর ও সৃচিস্তিত কিন্তু ফ্রেমটা সযত্নে রচিত হয় নি। ফাঁক থেকে গেছে।

রাজগীরে এক সন্ধ্যায় ভ্রমণের অবসরে জ্যাকের সঙ্গে সহর্দা সাক্ষাতে যে স্মৃতিব সন্নি উন্মুক্ত হয়ে গেছে সেই সন্নি ধরে স্মৃতিচারণ করেছেন। স্মৃতির মধ্যে যে নিহিত শৃঙ্খলা Laws of association—সেই শৃঙ্খলার সমগ্র আখ্যায়িকাকে বাঁধতে চেয়েছেন। কিন্তু এই শৃঙ্খলা টুটেছে কোথাও কোথাও। টুটে গিয়ে নষ্ট করেছে গঠনকে।

'Laws of mental' association কে ভিত্তি করে ভ্রমণ-কাহিনী রচনার আইডিয়া খুব ফলপ্রসূ। এর ফলে শুধু যে একটা অদৃশ্য ঐক্য গড়ে ওঠে তা নয় এর ফলে লেখকের চবিত্তের তথ্য চিত্তধর্মের সঙ্গে কাহিনীর একটা সুন্দর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে লেখকের জীবনসন্ধান ও জীবনদর্শন অলক্ষ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই নতুন গঠন-কৌশলের জন্ম লেখককে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু তিনি এই গঠনপদ্ধতির পরিপূর্ণ শিল্পসত্তাবনাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে যত্ন নেন নি। তবু রচনায় একাংশটির মূল ভাগিদটা তিনি যে উপলব্ধি করেছেন তা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্মৃতির নিয়ম দিয়ে কাহিনীকেই যে শুধু বেঁধেছেন তা নয়, এদেশের সঙ্গে ওদেশকে বেঁধেছেন, স্থানের সঙ্গে স্থানের ভৌগোলিক দৃবন্ধকে যুটিয়ে দিয়েছেন আর সবচেয়ে যে বড় লক্ষ্য তাকে সহজে সাধিত করেছেন। অর্থাৎ নিজেকে কাহিনীর মঞ্চ থেকে একটা বিশেষ দূরত্বে দাঁড় কবিয়েছেন, দর্শকের ভূমিকায়।

সাধারণ ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে লেখকের Ego বা অহং প্রায়ই নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তার সব ভ্রমণ-কাহিনী শিল্পলোকে উত্তীর্ণ হয় না। শিল্পকর্মের বড় বাধা অহং-এব প্রকাশ। শিল্প Ego-ব বাইরের সত্তা। দ্রষ্টা ও স্রষ্টা যেখানে এক হয়ে উপস্থিত সেখানেই শিল্প আবির্ভূত হয়।

'উত্তর সাগরের তীরে'কে প্রধানতঃ শিল্পকর্মের দিক থেকে বিচার করলাম। কিন্তু তাব উপযোগিতার দিক-গুলোও তুচ্ছ নয়। এই ভ্রমণ-কাহিনীতে স্ববম্যা স্কটল্যান্ড, তার ভূপ্রকৃতি, সমাজ, ইতিহাস, পশুপক্ষী, আবহাওয়া, সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি সব নিয়ে চোখের

ওপর দাঁড়িয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীর মননে যে পাঠকেরা অন্যান্ত তাঁদের কাছে এই কাহিনীর মূল্য এইখানে।

লেখকের প্রকৃতি বর্ণনায় বৈশিষ্ট্য আছে। তার প্রকৃতির প্রতি প্রেম বিসংবাদেব উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ তিনি কিন্তু প্রকৃতির মিষ্টরূপ মধুররূপ দেখেছেন। সমুদ্রবাদের দিনগুলির বর্ণনায় সত্য আছে। কিন্তু প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ তাঁর তুলিতে ধরা পড়ে নি তেমন করে। লেখক মধুর বসের সাধক। হয়তো তন্ত্রের প্রতিও কোনও গূঢ় আসক্তি থেকে থাকবে। কিন্তু উদ্দেশ্য উজ্জল প্রশান্ত প্রেম—প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে মধুর রসের ধাবায আত্মবিস্তার।

লেখকের অল্পভূতি আছে। কিন্তু ভাষায় আছে ক্রটি। এদিকে তাঁর আবণ্ড সজাগ হওয়াব প্রয়োজনীয়তা আছে। সাহিত্য শিল্পের উপকরণ কথা। বাক্য। এই উপকরণে ক্রটি থাকলে চলবে কেন?

মহৎ সাহিত্যের কথা অনির্বচনীয়ের স্বাদ বহন করে। মনের মধ্যে যে অনির্বচনীয় সমুদ্র সেখান থেকে সৃষ্টির মন্বনে উদ্ভিত উর্বশীবাক্য গভীর চেতনার অনির্বচনীয় রসে সিক্ত থাকে। এই রসে মহৎ সাহিত্যের সমস্ত কথার কোষ থাকে পরিপূর্ণ। লেখককে নিজেব চেতনার গভীরতর স্তর থেকে বাক্যকে উদ্ধার কবতে হবে। অরূপরতন তুলতে গেলে অনেক—অনেক গভীরে ডুব দিতে হয়। লেখক যে এই গভীর দেশের যাত্রী তা বোঝা যায়। তাঁর যাত্রা সফল হোক।

শেষে একটা কথা না বললে ক্রটি থেকে যায় এই রচনার বিচারে। 'উত্তর সাগরের তীরে' এক মধুব বিচিত্র মানসভোজ। এই ভোজে পাঠকসাধারণকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি অসঙ্কোচে।

শ্রীদেবব্রত রেজ

—০—

সাহিত্যের হাতে

বঙ্গসাহিত্যের সমালোচক

বঙ্গদেশে সকলেই সমালোচক, এবং সমালোচকমাত্রেই সুপ্রবীণ, সুপণ্ডিত ও সুবসিক। কেবল মনুষ্যদুল্লভ বঙ্গ-জন্মেব গুণেই এই-সকল অসাধারণ গুণপনা হস্তামলকবৎ আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়া থাকে। ইহার জ্ঞান কোন কষ্ট কবিত্তে হয় না, কোন চেষ্টা কবিত্তে হয় না, কোন সাধনা করিতে হয় না। মধ্যে মধ্যে কেবল বাজার-চলতি দুই-চাবিখানি নবল এবং মণ্ডুক-ছত্রাক মাসিকেব-পাতা উলটাইলেই চলে। এইজন্যই, যিনি আজীবন কেবল ছ-পেনি সিবিলেজ ইংরেজী ডিটেকটিভ নবল ভিন্ন অন্য গ্রন্থ কখনও স্পর্শ করিয়া দেখেন না, তিনি এদেশে শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া পরিগণিত হন। এইজন্যই, যিনি আজীবন কেবল লোহার কারবার করিয়া আসিয়াছেন, তিনি এদেশে সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলিয়া চলিয়া যান। এইজন্যই, যিনি আজীবন ভাষাব নাড়ী টিপিয়াছেন, তিনি এদেশে কেবল আপন গৃহীণীর সার্টিফিকেটের উপর ভরসা করিয়া অন্তত লেখকের কিস্তৃত গ্রন্থ সম্পর্কে দিস্তা দিস্তা প্রশংসা-পত্র লিখেন।

বঙ্গীয় সমালোচকেব অনেক গুণ। তন্মধ্যে প্রধান গুণ প্রবীণতা। এদেশে কোন সমালোচক সম্পর্কে কিছু বলিতে হইলে তৎপূর্বে প্রবীণ বিশেষণটি সর্বত্রই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বঙ্গীয় সমালোচকের এই প্রবীণতাই একমাত্র ভরসা। যিনি যত প্রবীণ, তিনি তত বড় সমালোচক। অর্থাৎ, সুপ্রবীণতাবশতঃ যিনি চোখেও দেখেন না, কানেও শুনে ন—তিনিই সমালোচক-শ্রেষ্ঠ। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখনির্গত বাণীই এদেশে বেদবাক্য বলিয়া পরিগণিত। তিনি যাহা বলেন, তাহাই ক্রিটিসিজম্। তিনি যাহা লিখেন, তাহাই সার্টিফিকেট। বঙ্গীয় নবলের বিজ্ঞাপনে তাহার বড় দাম। সাহিত্যের সভায় তাঁহার পতিত্বের বড় গৌরব।

কাজেই, পাঠক, বঙ্গসাহিত্যের সমালোচক হইতে হইলে তোমাকে প্রথমেই প্রবীণ হইতে হইবে। কিন্তু

যথেষ্ট কি করিয়া প্রবীণ হওয়া যায়? প্রবীণ হইবার উপায় কি? উপায় শ্রীখোশনবীসের পরামর্শ গ্রহণ। প্রবীণ হইবার নানাবিধ উপায় আমি বলিয়া দিতে পারি।

অতএব, যিনি বঙ্গসাহিত্যের সমালোচক হইতে চাহেন, তিনি শ্রীখোশনবীসের নিকট আগমন করুন। উহাতে খরচ বেশী লাগিবে না—কেবল মৌতাত্তেব ব্যয় যোগাইলেই চলিবে।

প্রবীণ হইবার প্রধান উপায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করা। যাহার বয়ঃক্রম বর্তমানে তিরিশ, তাহাকে আরও অন্ততঃ তিরিশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। যাহার বয়স তাহা অপেক্ষা অধিক, তাহার অপেক্ষাকৃত অল্পদিন ধৈর্য ধরিলেই চলিবে। এবং যাহার বয়স তিরিশের কম, তাহাকে অধিক দিবস স্থির থাকিতে হইবে। এইরূপ ধৈর্য ধরিয়া আয়ুক্ষয় করাই প্রবীণ হইবার সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত পন্থা। এ বিষয়ে আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি। কেহ যদি প্রবীণতা লাভের মৎ-প্রদর্শিত এই পন্থায় ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক অগ্রসর হইয়াও ব্যর্থ হইলেন, তবে আজীবন মৌতাত্তের জ্ঞান শ্রীখোশনবীস তাহাকে কালাচাঁদ জুটাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিবে।

কেহ যদি ধৈর্য ধারণ করিতে অপারগ হইলেন, তবে তাহাকে বলিব, ধৈর্য ব্যতীত জগতে কোন মহৎ কর্মই সুসম্পন্ন হয় না। স্বয়ং ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়া গিয়াছেন : “কেন পাস্থ ক্ষান্ত হও হেবি দীর্ঘ পথ?” ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে এইরূপ ধৈর্যাবলম্বনই ভারতবর্ষের ট্যাডিশন্। আপনি যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষায় শিক্ষিত সুদীক্ষন হইলেন, তবে অবশ্যই ঐতিহ্য-মূলক এইরূপ ঋষিবাক্যে আপনার অপরিণীম প্রদ্বা থাকিবে। আর, যদি আপনার যাদবপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থাকে, তবে আপনার প্রদ্বা উদ্ভেকেব জ্ঞান ল্যাংল্যাণ্ডের মহাকবি রামবৃদ্ধ এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত কবিত্তে পারিব। কাজেই, মৎ-প্রদর্শিত পন্থায় প্রবীণতালভে কাহারও আপত্তির কোন হেতু দেখি না।

তাহা ছাড়া, এই বিশেষ পদ্ধতিতে বঙ্গজগণের আকর্ষণের অত্র কাবণও রহিয়াছে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে কাহারও কোনরূপ কষ্ট করিতে হইবে না, চেষ্টা করিতে হইবে না—ফল আপনা হইতেই আসিতে আসিবে। আপনি বঙ্গজ-জগণের অবশ্যকর্তব্য পরচর্চা, আত্মনির্মাণ, কাব্যরচনা, আড্ডা, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি মহৎ কর্মে কালাতিপাত করিয়াও যথাসময়ে যথাবিধি প্রবীণতালাভ করিতে পাবিবেন। যিনি ইহাতেও প্রলুব্ধ না হইবেন, তাহার বঙ্গজ-জগণে দিক্।

অবশ্য, যিনি কিছুতেই অপেক্ষা করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহাকে সম্বর প্রবীণতালাভে সহায়তা করিতেও আমার আপত্তি নাই। উহার জন্ত আমার নিকট একদিনের জন্ত আলিয়ে চলিবে। এক দিবসের মধ্যেই আমি আপনাকে প্রবীণ বানাইয়া দিব। ইহাতে আপনার কোনরূপ খরচও লাগিবে না। আসিবার সময়ে কেবল একটি হাতুড়ি এবং একটি সাঁড়াশি কিনিয়া আনিবেন। তাহার পর যাহা করিবার আমিই কবিব—আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না। প্রথমে আমি আপনাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া ফেলিয়া আপনার বক্ষোপরি চাপিয়া বসিব। তারপর হাতুড়ি দ্বারা অতি যত্নে ঠুকিয়া ঠুকিয়া একটি করিয়া আপনার দুই পাটি দস্ত ভাঙিয়া দিব। সাঁড়াশি দ্বারা খুঁচাইয়া আপনার কমলনয়নদ্বয়কে কোটর হইতে বাহির করিয়া ফেলিব। আপনার উভয় কর্ণে উত্তমরূপে তুলা গুঁজিয়া গবম গলিত মোম ঢালিয়া দিব। সাঁড়াশি দ্বারা টানিয়া টানিয়া উপড়াইয়া উপড়াইয়া আপনার মস্তক কেশশূন্য করিয়া ফেলিব, এবং উহাতে স্বচ্ছ ঘোল ঢালিয়া লাল পিপড়ার পাল ছাড়িয়া দিব, যাহাতে স্বল্প ভবিষ্যতেও পুনর্বার কেশোদ্গমেব কোন সম্ভাবনাই আব না থাকে।

এইরূপ প্রক্রিয়ায় চিকিৎসিত হইবার পব মুহূর্ত হইতেই আপনি যথোপযুক্ত প্রবীণ বলিয়া গণ্য হইবেন। কেননা, এদেশে যাহার ইন্দ্রলুপ্তিমটিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে, দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, বোধশক্তি রহিত হইয়াছে, একমাত্র তিনিই প্রবীণ। সর্বক্ষেত্রে সমালোচনায় একমাত্র তাঁহারই অধিকাং। কেবল গলিতনখদন্ত ছানিআচ্ছাদিতচক্ষু হইলেই হইল। বুদ্ধি আছে কি গেছে, তাহার বিচারের কোন প্রয়োজনই নাই।

যাহা হউক, কোন প্রকারে একবার প্রবীণতা আয়ত্ত করিতে পাবিলেই আপনার সমালোচনার অধিকাং জন্মিবে তখন আপনি যাহাব সম্বন্ধে যাহা লিখিবেন, তাহাই উত্তম ক্রিয়েটিভ সমালোচনা হইবে।

কিন্তু সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে বাজার গরম করিতে হইলে আপনাকে আরও কিছু কিছু কর্ম করিতে হইবে। তাহাই এক্ষণে একে একে বলিতেছি।

প্রথমতঃ আপনাকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হইতে হইবে। যিনি অধ্যাপক নহেন, এদেশে তাঁহার সমালোচনার তাদৃশ গৌরব নাই। নামের পূর্বে 'প্রোফেসর' না থাকিলে কেহ এদেশে বিদ্বান বলিয়া স্বীকৃতই হয় না। অত্যাচ্ছ দেশে যিনি বিভাগীয় প্রধান কেবল তিনিই 'প্রোফেসর' শব্দটি ব্যবহার কবিত্তা থাকেন। কিন্তু এদেশে সকলেবই গৌরব অধিক। ধাপধাড়া গোবিন্দপুর কলেজের যিনি জুনিয়র লেকচারার, এদেশে তিনিও নামের পূর্বে প্রোফেসর না লিখিলে অতি রুষ্ট হন। কোন-এক অধ্যাপক মহাশয়ের বন্ধুদের নিকট শুনিবাছি, তিনি আপন গৃহিণীর নিকট পত্র লিখিবাব সময়েও প্রোফেসর অমুকচন্দ্র অমুক বলিয়া নামসহি করিয়া থাকেন, এবং গৃহিণীকেও সেইরূপ পাঠ লিখিতে হয়; নতুবা দাম্পত্য-কলহ প্রবল হইয়া উঠে।

যাহা হউক, সমালোচকের গৌরব 'প্রোফেসর' লাঙ্গুলে, এবং প্রোফেসরের গৌরব 'ডক্টরেট'র বেড়িতে। অধ্যাপকের নামের সহিত অন্ততঃ একটি ডি. ফিল. না জুড়িতে পারিলে এক্ষণে বঙ্গদেশে কাহারও মনোবাঞ্ছা ফুলফিল (fulfil) হয় না। অগণিত বঙ্গজ বালখিল্য অধ্যাপককুলের এই মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্ত অনেকদিন হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন আলো করিয়া জনাকয়ক বিখ্যাত বাজ্ঞাকল্পতরু বলিয়া আছেন। তৈলাক্ত হস্তে তাঁহাদের ঠিকমত পাকড়াইতে পারিলেই হইল। ডি. ফিল. মার্কের কে।

আর, একবার ডি ফিল. হইতে পারিলে, লজ্জাসরম্ব কিছুই আর ফীল (feel) করিবার প্রয়োজন থাকে না। তখন যাহা খুশি তাহাই লিখা যাইতে পারে। তবে বাজ্ঞাবের দিকে চাহিয়া সে বিষয়েও কিঞ্চিৎ বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রথমেই খোঁজ লইতে হয়

যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কি কি বহি পাঠ্য আছে, এবং উহা হইতে কয়েক বছর ধরিয়া কি কি প্রশ্ন পড়িয়াছে। সেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া সেই-সকল পুস্তক সম্বন্ধে ভাবী ভাবী গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেই সমালোচক হিসাবে বড় সুখ্যাতি রটে। অবশ্য, গ্রন্থমধ্যে ভূরি ভূরি কোটেশন দিতে হয়; এবং সহজ কথাকে ঘুরাইয়া বাঁকাইয়া জটিল করিয়া তুলিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতে হয়। যিনি ইহা যত অধিক করিতে পারেন, বাজারে তাঁহার নামে তত জয়জয়কার পড়িয়া যায়।

এইভাবে যাহারা সমালোচনায় সিদ্ধ হন, তাঁহারা সকলেই সৃষ্টিশীল সমালোচনা কবিরা থাকেন। কোন গ্রন্থই তাঁহাদের পড়িয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না—কেবল লেখক এবং প্রকাশকের নাম জানিয়া লইলেই চলে। গ্রন্থমধ্যস্থ বাদবাক্য সবকিছুই তাঁহারা আপন সৃষ্টিশীল কল্পনার বলে আপনাব মনে মনেই তৈয়ারি করিয়া লইতে পারেন। এবং যেহেতু তাঁহাদের মন অপরিণীম সৌন্দর্য মাধুর্য এবং মহত্তে পরিপূর্ণ, সেইহেতু তাঁহাদের সমালোচনাতেও সকলের সকল গ্রন্থই স্তম্ভব মধুর এবং মহৎ হইয়া উঠে। তাঁহাদের নিকট সকল গ্রন্থই বঙ্গ-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং লেখকের মহৎ অবদান।

যে-সকল ছুট পরছিন্নাঘেঁষী ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে এই-সকল সমালোচক কেবল পবিত্রিত লেখক ও প্রকাশকের ধামাধরামাজ, তাঁহারা নিতান্তই মিথ্যাবাদী। তাঁহাদের ওই উক্তি যে সত্য নহে, তাহার প্রমাণ আমি প্রায় সর্বত্রই পাইয়াছি। দেখিয়াছি, সমালোচকেরা কেবল লেখক এবং প্রকাশকের ধামাই ধরেন না—সম্পাদক, পাঠক, প্রেসওয়ালা, প্রকবীভার, দপ্তরি, প্রচ্ছদ-শিল্পী ইত্যাদি অন্ত-সকলের ধামাও ধরিয়া থাকেন। এ বিষয়ে উহাদের কোনরূপ পক্ষপাতিত্বের অপরাধ কেহই দিতে পারিবেন না। যিনি দেন, তিনি কেবল আপনাব ছুট অন্তরের পবিচয় দেন মাত্র। উহাদের কথায় কর্ণপাত করিবার কোন প্রয়োজনই নাই।

কাজেই, আমি বলি কি, সমালোচকগণ যেক্রপ অনবত্ত সৃষ্টিশীল সমালোচনা লিখিতেছেন, তাহাই লিখুন। তবে মধ্যে মধ্যে নিতান্ত অপরিচিত লেখকের গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু ডেট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম লিখিলেও কোন ক্ষতি নাই। বরং একদিক হইতে লাভই আছে। ইহাতে সমালোচকের সম্যক খ্যাতিবুদ্ধি বস্তুবনাই প্রবল।

খ্যাতিবুদ্ধি জগৎ সমালোচকগণ আরও-একটি কাজ করিতে পারেন। কৌশলটি বহুকাল পূর্ব হইতেই বাজারে চলিতে শুরু করিয়াছে, এবং ইদানীং ইহার ব্যবহার বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৌশলটি হইল

রবীন্দ্র-দূষণ। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যথেষ্ট গালিগালাজ কবিত্তে হইবে, এবং পবে বাজারে যথেষ্ট হৈচৈ শুরু হইলে ধীরে ধীরে আপনাব রূপ পালটাইয়া ফেলিতে হইবে। ঠিকমত প্রতিভাবানের জায় ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার এবং মার্কিনী সমাদর জুটিতে বিলম্ব হইবে না।

অতএব, হে বঙ্গজ সমালোচক অজিত রথীন্দ্রবন্দ, অরুণ-আলোকে প্রতিভাবানের পস্থা অবলম্বন কর।

* * *

জর্নৈক উপেক্ষিত লেখক

এক্ষণে বঙ্গদেশে দল না হইলে সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। যাহাব দল আছে, যাহার চাকে কাটি দিবাৎ অনেক লোক আছে, বঙ্গ-সাহিত্য তাহার উল্লেখযোগ্য অবদানে পরিপূর্ণ, বাজারে তাহার বড় জয়জয়কাব। ইহার ব্যতিক্রম বড় বেশী দেখি না।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনের যদিও দল আছে, কিন্তু সে সেবকসমিতি অপরেরই সেবা করিয়াছে—তাঁদৃশ আত্মসেবা করে নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে রমেশচন্দ্র জাতিতে এবং পাতিতে নিতান্তই সেবক বৈজ্ঞ—অপরের সেবাই যাহাব কর্ম। ব্যক্তিগত সাহিত্যসেবার ক্ষেত্রেও তাই তাঁহার আপনাব ঘরে লাভের অক বিশেষ জন্ম নাই। বঙ্গসরস্বতীর ভাঙারে তাঁহার অপেক্ষা বহুতর নিকট মাল জমা দিয়া অনেকেই লক্ষ্মীর আঁপি হইতে মোহর লুটিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য রমেশচন্দ্র যাহা দিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত নগদ মূল্যও পান নাই। সেইজন্যই এক্ষণে সাহিত্য-পাঠকদিগকে আমি তাঁহার জাঘ্য পাওনা চুকাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

সম্প্রতি, 'রমেশচন্দ্র সেনের শ্রেষ্ঠ গল্প'-নামক ছোট-গল্পের সংকলনখানি হাতে আসিয়াছে। বহিখানিতে এমন অনেক গল্প আছে, যাহা আপন গুণেই বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠগল্পের পাশাপাশি বসিবার যোগ্য। 'ভোমের চিতা' গল্পটিব কথাই ধরা যাউক। এই সংকলন-গ্রন্থখানিতে এইটিই শ্রেষ্ঠ গল্প। ধূ ধূ প্রকাণ্ড-বিলের মাঝে শুষ্ক প্রাণহীন মাদারের ভিটার শ্মশান। অধিবাসী কেবল দুইটি প্রোট ভোম—হারু ও বদন। "কাঠ বেচিয়া, মাছ ধরিয়া, মৃতের উদ্দেশে প্রদত্ত চাল, ডাল, ফল-ফলারি সিদ্ধ করিয়া তাবা উদরার সন্তান করে। প্রায়ই উদান ধরাইতে হয় না। চিতার উপর হাঁড়ি চড়াইয়া দেয়, বা রুটি সেকিয়া লয়। তপ্ত অদ্য হাতে তুলিয়া কলিকায় তামাক সাজে। মাদারের ভিটার একটি কুঁড়ে বাঁধিয়া তারি থাকে। সমাজ সংসার সবই তাদের পরস্পরকে লইয়া। বাহিরের জগৎ এই ভোম দুটির কাছে অর্থহীন। জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মৃতদেহই বেশ প্রাণবন্ত।

তাবাই তাদের জীবিকা। পরস্পরের সঙ্গেও তারা বড় একটা কথা বলে না; হাসে আরও কম। কোন মৃতদেহ কিরূপে পুড়িল, কোনটার হাড় কতখানি শক্ত—এইই তাদের আলোচ্য বিষয়। মৃতদেহের অস্বাভাবিকতা মধ্যে মধ্যে তাদের হাসির উদ্রেক করে বটে কিন্তু সে হাসি হিংস্র জানোয়ারের ক্রুদ্ধ গর্জনের মত বিকট।”

এই দুইটির একজন, হারু, যখন সাপের কামড়ে মরিল, তখন—গল্পের শেষাংশ :

“হারুর চিত্তাষ বদনের-চাল চড়িল। বদন একদৃষ্টে হাঁড়িব দিকে চাহিয়া রহিল। হাঁড়িব ভিতর চালের সঙ্গেই গোটা দুই মাছ নিষ্ক হইতেছিল। ফুটন্ত ভাতের টগবগানি, চিত্তার চড়-চড়ৎ—চড় শব্দ—তা ছাড়া সবই নিস্তব্ধ।

“উদ্ভের অনন্ত নীল আকাশ, চারিধারে সীমাহীন জলরাশি—তার মধ্যে বাতাসের তালে তালে ঘাসের পাগল নৃত্য, উচ্ছল-জলের সাবলীল ভঙ্গী।

“দূরে আকাশের বৃকে বকের পাতি উড়িতেছে। বৈকাল-সূর্য চিত্তার উপর ফাগের গোলা ঢালিয়া দিয়াছে। চিত্তার আশ্রম ও সূর্যের আলোষ মাদামের ভিটা একটা লাল আভা-ধারণ করিল। চিত্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের-চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।”

পড়িতে পড়িতে যে নিলিপ্ত নির্মম জীবনবহুস্তব গভীরে তলাইয়া যাইতে হয়, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা অধিক দেখি না। জীবিত লেখকগণের মধ্যে একমাত্র তারাস্বব ভিন্ন একুপ গল্প লিখিবার শক্তি অপর কাহারো কল্পিতে আছে বলিয়া মনে হয় না।

‘তাবা তিনজন’ গল্পটিও এই জাতের। কিন্তু উহার গভীরতা এবং ব্যঙ্গনা একেবারে অনীমেব মধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেয় না—আবার সীমার প্রান্তে বুদ্ধির গোচরে ফিরাইয়া লইয়া আসে। সেইজন্য আমার মনে হইয়াছে, গল্পটির সমাপ্তি একটু অন্তরকমভাবে ঘটাইতে পারিলে ইহাও একেবারে প্রথম শ্রেণীর গল্প হইয়া উঠিতে পারিত।

ইহা ব্যতীত, ‘সাদা বোড়া’, ‘ধেবন’, ‘একফালি জমি’, ‘কৈলাস’, ‘রাজা’ ইত্যাদি গল্পগুলিও ছোটগল্প হিসাবে

মার্ক রচনা। বঙ্গসাহিত্যে যে-কোন লেখকই এই-সকল গল্পের রচয়িতা হিসাবে গর্ব করিতে ‘পাবেন’ বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

রমেশচন্দ্রের ভাষায় আধুনিক সূক্ষ্ম বাণিজ্য নাই বটে, কিন্তু এমন একটি হৃদয় বলিষ্ঠ বিশ্বাসের স্বব আছে, যাহা এই জাতীয় রচনাব পক্ষে একেবারেই অপরিহার্য। যে-সকল মানুষের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই বাস মাটির কাছাকাছি। তাহাদের ধূলকাদামাধা অঙ্গে যেমন সূক্ষ্ম মসলিন মানায় না, তেমনি তাহাদের হৃদয়ের ভাষাও কালকর্ষময় নাগরিক রচনারীতিতে বলা যায় না। এইদিক হইতে বলা যাইতে পারে যে রমেশচন্দ্রের রচনায় ভাবে ও ভাষায় কোন বিরোধ উপস্থিত হয় নাই।

আলোচ্য গ্রন্থটি আমার সাহিত্যরসপিপাসু চিত্তকে তৃপ্ত করিয়াছে বলিয়াই এত কথা বলিতে হইল। অশী করি, ইহাকে কেহ পেশাদার সমালোচকের পেশাগত বাতুলোক্তি বলিয়া মনে করিবেন না।*

* রমেশচন্দ্র সেনের শ্রেষ্ঠগল্প—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন কত-কথা, ১১১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা-২। পাঁচ টাকা।

* * *

শ্রীখোশনবীস-পুরস্কার

সাহিত্যের বাজারে আজিকারি পুরস্কারের বড় দাম। আকাদেমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, শরৎচন্দ্র পুরস্কার, নরসিং দাস আগরওয়াল পুরস্কার, অনিন্দ পুরস্কার, শিশি বোষ পুরস্কার, মোচাক পুরস্কার, উন্টোরথ পুরস্কার ইত্যাদি পুরস্কারেব বড় কোলাহল। যে লেখক কোন পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহার বড় বাজার গরম। আর যাহারা পান নাই, তাহাদের বড় পাইবার লালসা। কাজেই, আমি স্থির করিয়াছি, আমিও একটি পুরস্কার দিব। উহা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল তথ্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব। সাহিত্যিকেরা ধৈর্য ধরিয়া থাকুন।

শ্রীখোশনবীস জুনিয়র



শ নি বা রে র

চি চি



৩৩শ বর্ষ,
১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৮

সং বা দ - সা হি ত্য

‘স্পিরিট অব দি ইন্সট’

ইং

লণ্ডেন অশীতিপর (৮২) বৃদ্ধ দার্শনিক-মনস্বী
বার্ট্রান্ড রাসেল লণ্ডেন প্রকাশস্থলে সময়েত
জনতার কাছে পরমাণবিক বোয়ার পবীক্ষা ও প্রয়োগের
তীব্র নিন্দা কবিতা কারাবরণ কবিতাছেন, এই সংবাদে
সমগ্র বিশ্ব বিস্মিত ও বিচলিত হইয়াছে। সংবাদপাঠে
রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি আমাদের মনে পড়িতেছিল।
তিনি বলিয়াছিলেন, সম্মিলিত গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের
বণিকস্থলত স্বার্থবুদ্ধি ও আত্মবুদ্ধিক সাম্রাজ্য-লোলুপতা
পৃথিবীতে বহু অশ্রায়া ঘটাইয়াছে সত্য। কিন্তু এই
অশ্রায়েব প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করিতে উক্ত দেশের
উদারচেতা মনীষীবাই বরাবর আন্তরিক প্রয়াস কবিতা
বহিঃপৃথিবীতে, ব্রিটিশ ও আইরিশ জাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ
রাখিয়াছেন। মনে আছে, তিনি এই প্রসঙ্গে এডমাণ্ড
বার্ক হইতে চার্লস অ্যাণ্ড্রুজ পর্যন্ত বহু-বিশ্ববন্ধু ব্রিটিশ-
আইরিশের প্রতি প্রজ্ঞা নিবেদন কবিতাছিলেন। বর্তমান
কালেও বৈজ্ঞানিক জে. বি. এস. হলডেন ব্রিটিশ
পার্লিমেণ্টের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রিটেনের
নাগরিকত্ব ত্যাগ করিয়া ভাবতের নাগরিক হইয়াছেন।

জর্জ বার্নার্ড শ বার বাব স্বরাষ্ট্র-বিরোধী উক্তি করিতে
দ্বিধা করেন নাই। বার্ট্রান্ড রাসেল সম্প্রতি উক্ত
উদাবৈতিক দলের পুনোদ্যমরূপ বিশ্বকল্যাণকে স্বদেশ-
প্রেমের-পুণ্ডোভাগে রাখিয়া রাজ-লাঞ্ছনা বরণ কবিতা সমগ্র
বিশ্বে সম্মানিত হইলেন। গত ১৭ই সেপ্টেম্বরের দিল্লীর
সংবাদে প্রকাশ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পরমাণবিক অস্ত্র
নিষিদ্ধকবার ব্যাপারে লালিত হইবার স্বযোগ পান নাই
বলিয়া, আর্ল রাসেলের প্রতি দীর্ঘ প্রকাশ করিয়াছেন—
“I admire very much Bertrand Russell's
attitude to nuclear tests, I envy him.”
ভাবপ্রবণ জুওহরলালের এই উদাব উচ্ছ্বাস সাম্রাজ্যবাদী
ব্রিটিশের যেমন পুত্ৰ হয় নাই তাহার প্রমাণ কলিকাতাতেই
মিলিয়াছে। লণ্ডনের লর্ড মেয়র স্যার বার্নার্ড ওয়ালি-
কোহেন একদিনের সফরে আসিয়া কালেক্টা ক্লাবের
এক ভোজসভায় (গত ১৮ই সেপ্টেম্বর) লণ্ডন শহরের
নাগরিকত্বপ্রাপ্ত জুওহরলালের এই উক্তিকে অশোভন
অনধিকার-চর্চা বলিয়া বিব্রক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।
অর্থাৎ রাসেলের মধ্যে বার্ক যেমন বাঁচিয়া আছেন ওয়ালি-
কোহেনের মধ্যে ক্লাইব-হেষ্টিংস বাও তেমন বর্তমান।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর উদ্ভাব স্বরূপটা বুঝিবার চেষ্টা পাইতেছি, হঠাৎ পুণা হইতে গোপালদাব চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন :

“ভাষা হে, ওয়েস্ট জার্মানী, শোম্বের, কেনেডি-ক্রুশেভ, ফরমোজা-জাপানে টাইফুন, মাস্টার তাবা সিং—সকল সংবাদকে ছাপাইয়া পবমাণবিক বোমার প্রতি উন্নবতিবর্ষ দার্শনিকের বিদ্রূপ রাশিয়া-আমেবিকাব মহাকাশ-বিজয়কেও তুচ্ছ করিয়াছে। বিজ্ঞান অঘটন ঘটাইতে পারে সত্য, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বকে বিজ্ঞান যদি ক্ষুণ্ণ করে, সে বিজ্ঞান শযতানেরই মত পবিত্রাজ্য।”

যে জন্ত তোমাকে আজ পত্র লিখিতেছি তাহার মূলে এক আশ্চর্য আবিষ্কার—‘স্পিরিট অব দি ড্রস্ট’ ‘প্রাচ্যেব আত্মা’ আবিষ্কার। পুরাতন বইয়ের প্রতি আমাব নিদারুণ আকর্ষণেব কথা তুমি জানো। সে অমোঘ নেশা চরম বৈরাগ্যের মধ্যেও অবিতানন্দের নেশার মত আমাকে আজও আবিষ্ট করে। বহুত্যাগেব অবসরে এখানকার একটি পুরাতন লাইব্রেরি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার কবিয়াছি—‘স্পিরিট অব দি ড্রস্ট’। একটি চটি নাটক, ইংরেজী ছন্দোবন্ধে বচিত—“a lyrical drama”। লেখক ‘A Bengal Civilian’ বেনামের অন্তবালে আত্মগোপন কবিয়া আছেন। “Calcutta : Ostell and Lepage British Library” কর্তৃক “Bishop’s College Press” হইতে ১৮৪৪ সনে মুদ্রিত-প্রকাশিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৩। বইটির আর একটু ইতিহাস এই যে ইহা স্বয়ং গ্রন্থকার নাম প্রকাশ না করিয়া “Govin Chunder Dutt” গোবিন্দচন্দ্র দত্তকে উপহার দিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র রামবাগান পরিবারের সন্তান, প্রসিদ্ধ ইংরেজী লেখক। ইনি রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য এবং সুবিখ্যাত তরু ও অরু দত্তের পিতা।

এই ক্ষুদ্র গীতিনাটো আজ হইতে ঠিক একশো আঠার বছর আগে একজন ইংরেজ (স্কটল্যাণ্ড বা আয়ারল্যাণ্ড-বাসীও হইতে পাবেন) ভাবতবর্ষেব যে ভবিষ্যৎ-ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। সমগ্র বইখানি

পুনর্মুদ্রিত হইলে এই বেঙ্গল মিডিলিয়ানের দূরদৃষ্টিমূলক এই রচনা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি কবিবে। উত্তাপ (Heat), মাটি (Earth), নোংবামি (Nuisance), ভোজন (Eating), মত্তপান (Drinking), আলস্য (Laziness), পশ্চিমী হাওয়া (West wind) প্রভৃতির স্পিরিট বা আত্মা চরিত্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব নেটিব কলেক্টরবা কাকের আত্মারূপে এবং ভূতপূর্ব বাজন্তবর্গ মশার আত্মারূপে (Spirits in a state of Transmigration) নাটকেব প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত বেঙ্গবা গাহিয়া চলিয়াছে, ফলে ইংবেঙ্গেব আত্মা বিবন্ধ বিচলিত। পান-ভোজন-আলস্যের মধ্যে কাক-মশকেব জন্ত ইংরেজ আত্মার স্বস্তি নাই। শেষ অঙ্কেব শেষ দৃশ্যটুকু মাত্র তোমাকে স্তনাইতেছি, ইহা হইতেই বুঝিবে, সহৃদয় ইংরেজ ও স্বাধীনচেতা ভারতীয়েবা যে স্বপ্ন পববর্তীকালে দেখিয়াছিলেন এবং আধুনিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায যে স্বপ্ন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এই অজ্ঞাতনামা বেঙ্গল মিডিলিয়ান ১৪পাহী বিদ্রোহের পনের বছর পূর্বেই তাহাব আভাস পাইয়াছিলেন। পবদেশগ্রাসীবি বিজয়-বাসনা, স্পিরিট অব কঙ্কোয়েস্ট ক্লাস্ত হইয়াছে এবং আত্মকণ্ঠে বলিতেছে :

I’m the Spirit of Conquest,
But feel weary now,
I want some rest
So from off my brow,
My laurels I’ll tear
And give them to wear
To the Spirit of Peace,
Who the arts shall increase.
But if there is need
Of my aid, I’ll come
On the wings of speed,
To the East, or the West ;
But now I want rest,
And so I’m off to my home

পূজা
সংখ্যা

শ নি বা রে র চি টি

আশ্বিন
১৩৬৮

‘শনিবারের চিটি’র আশ্বিন ১৩৬৮ সংখ্যা বর্ধিত পৃষ্ঠাসংখ্যায় পূজা সংখ্যারূপে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হইবে। ‘শনিবারের চিটি’র পূর্ববর্তী বিশেষ সংখ্যাগুলিব মত এবারের সংখ্যাটিও লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং চিন্তাশীল লেখকদের নানা রচনাসম্মানে সমৃদ্ধ হইয়া পাঠকদের তৃপ্ত করিবে। এই সংখ্যায় ক্রমশঃপ্রকাশ্য এবং বিভাগীয় কোনও রচনা প্রকাশিত হইবে না। পূজা সংখ্যার বিষয়সূচী :

কয়েকজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের কয়েকটি উপন্যাসোপম

বড় গল্প

নবীন কথাসিল্পীদের বিভিন্ন বসেব কয়েকটি

ছোট গল্প

চিন্তাশীল বিচক্ষণ প্রাবন্ধিকের মূল্যবান

সাহিত্যপ্রবন্ধ

প্রখ্যাত নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত একটি

নাটক

লঘু বচনায় সিদ্ধহস্ত কয়েকজন সুবসিক লেখকের কয়েকটি

লঘু প্রবন্ধ

নবীন ও প্রবীণ কবিদের সুনির্বাচিত

কবিতা



পূজা সংখ্যার দাম : দু টাকা। রেজিস্ট্রি ভাকে আড়াই টাকা

শনিবারের চিটি

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড : কলিকাতা-৩৭

ক্ষুদ্র ভারতবর্ষের চিত্র তখন শান্ত হইল। তাহার
অন্তরাঙ্গা হইতে তখন এই শাস্তির বাণী উথিত হইল :

The Spirit of Peace am I,
The glance of my eye,
Will rouse up a nation,
Give sound education;
Build schools and a college,
Spread science and knowledge,
And civilization,
Improve and increase
The state of Police,
Commerce far spread,
By means of new ways,
That would astonish the dead,
Canals and railways
And now I'm awake,
These measures I'll take,
For I have slept very long,
And grown very strong,
And I long

These improvements to make.

সর্বশেষে কোরাসে অমৈক্যের মধ্যে ঐক্যের বাণী দিয়া
নাটকের স্বনিকাপাত হইয়াছে এই ভাবে :

Victory ! the day is won,
Our foes are fled but our task is begun,
To scatter our treasures,
New plans and new measures,
Wherever our leader shall order,
Then let us now haste,
O'er each burning waste,
E'en to India's furthest border

এই বাণী ১৯৬১ সনে স্বাধীন ভারতবর্ষের বাণী।
আমাদের নেতা "Our leader" নূতন পরিকল্পনায় ও
এতদ্ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের ধনভাণ্ডার আজ যে ছড়াইয়া

চলিয়াছেন একশো আঠার বছর আগের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে
তাহার সমর্থন পাইয়া নিশ্চয়ই আনন্দবোধ কবিবেন।
ভাষা হে, এই স্পিরিট অব পীস আজ বুদ্ধ রাসেলকেও
উদ্ধুদ্ধ করিয়াছে। ধ্বংসের পথ অতি সিধা, সেই সহজ
পথে এতাবৎ অনেক বীরই গিয়াছেন এবং অপঘাত
মৃত্যুর মধ্যে দানব-খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, মাল্লু
তাহাদের আতঙ্কের সঙ্গে স্মরণ কবে। কিন্তু বুদ্ধ যীশু শ্রদ্ধা
ও ভালবাসার সঙ্গে স্মরণীয় হইয়া আছেন সম্পূর্ণ বিপবীত
কারণে। রাসেল সেই পথ ধরিয়াছেন, জওহরলাল ইচ্ছা
খাঙ্কিলেও সেই পথে চলিতে না পারিয়া দুঃখবোধ
করিতেছেন। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর ভাগ্যান্বিতা
যে দুই মহামানব, তাহারা এই পথের পথিক না হইলে
পৃথিবীর সমুহ সর্বনাশ। স্পিরিট অব দি গ্রেট—বুদ্ধ
জরথুষ্ট্র লাওৎসে-কনফুসিয়াস, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, গান্ধী
আম্মার বাণী এই দুই জনকে প্রভাবিত করুক তোমাদের
গোপালদার ইহাই প্রার্থনা :

আজিকৈ আবার দেখি ধরণিতে জেগেছে বিষের ঝড়,
যাহা ছোঁষ তাই জলে পুড়ে হয় থাক—
বিধের দীপটে অমৃত হত্যা করিবে ভাবিছে যাবা,
মাছুষে বন্দী কবিবে ভাবিছে পাষণ-শাসনতলে,
লোহা-পাথরের রূপ নিয়ে যারা আকাশ ছুঁতে চায়,
শ্রামজনপদে বজ্র আঁগুনে শ্মশান করিতে চায়—
আমরা দেখি যে ক্ষমতামত্ত গর্বিত বীরদল
চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে আছে লোহা পাথরের দেশে—
পাথরের দেশে পাথরমূর্তি ধরি।
মাটির আধারে মোরা বেঁচে আছি দন্ধ ধানের ক্ষেতে
অমৃত-পরশে আবার আমরা হুলি সবুজ চেউয়ে।
বাংলা সাহিত্যের অবমাননা

১৯৬০ সনে বাংলা সাহিত্যের কোনও গ্রন্থ
অ্যাকাডেমি পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই ইহা
একটি নির্জলা সত্য এবং এই সত্যের অর্থ বাংলা সাহিত্যকে
তুলনামূলক ভাবে ঘোবতব অপমান। কে বা কাহারো
এই অগ্রাঘের জন্ত দায়ী তাহা একমাত্র অ্যাকাডেমি
কর্তৃপক্ষই পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা কবিতো পারেন, কিন্তু

তাহারা তাহা কবেন নাই। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির একাধিক বক্তৃতায় নানা ভাবে সাফাই গাহিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তিনি দায়ী নন। উত্তম। কিন্তু বাংলাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় রাজনৈতিক মানুষ স্বতরাং তাহাব মতামত সাহিত্য-বিচারে গ্রাহ্য নয় এমন অশ্রদ্ধেয় উক্তিও তিনি করিয়াছেন। এমন রসিকতা করিবার আশ্পর্শও তিনি দেখাইয়াছেন, যে বাংলাভাষায় ১৯৬০ সনে এত বেশি ভাল বই লেখা হইয়াছে যে কোন্টিকে পুস্তকাব দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। বহু খুনের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে বিচারকেবা কোন্ খুনের জন্ত ফাঁসি দিবেন নির্ধারণ করিতে না পারিয়া যদি খালাস দেন তাহা হইলে অল্পরূপ রসিকতাই করা হইবে। ডক্টর বায় রাজনৈতিক, জনাব হুমায়ুন কবির কী? পদাধিকারে তিনি যেমন সাহিত্যিক, পদাধিকারে বিধানচন্দ্র তাহা অপেক্ষা সাহিত্য-বিচারে কম পারগ নন। কিন্তু এই সমস্ত ওজুহাত ও ধানাই-পানাই ফাঁজলামি মাত্র, বাহু, ছেঁদো কথা। আমল কথাটা এই ভাবে এড়ানো যায় না এবং তাহা এই যে ১৯৬০ সনে বচিত কোনও বাংলা বই অ্যাকাডেমি পুস্তকাবের ঘোণ্য বিবেচিত হয় নাই। এই বিচারপ্রহসনে ধাঁহাবাই সংশ্লিষ্ট তাহারাই জননী-লাঞ্ছনার অপরাধে অপরাধী—খবরের কাগজে চিঠি লিখিয়া অপরাধে ঈর্ষানুভূতি বলিয়া গালি দিলেই এ অপরাধ ক্ষালন হয় না।

বাংলা ভাষার লাঞ্ছনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নূতন করিয়া পরিভাষাসংসদ গঠন করিয়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল সংজ্ঞাবাচক ইংরেজী শব্দ অপরিহার্য ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহার বাংলা পরিভাষা নির্মাণ করিয়া মাতৃভাষাতে সমস্ত বিভাগীয় কার্য পরিচালনার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। ইংরেজী শব্দ কী পরিমাণ থাকিবে তাহা লইয়া বিতর্ক ও আলোচনা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে সংসদের অন্যতম সভ্য বেদবিদ ও ভাষাবিদ পণ্ডিত ভূর্গাশোহন ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই :

“বিজয়ী নর্য্যাম জাতির ভাষা হইতে বহু শব্দ আশ্রয় কবিয়া আকৃশনের ইংরেজী ভাষায় শক্তি সঞ্চাব করিয়াছিল, একথা সত্য। প্রয়োজনমত আমরাও বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিব। যে সকল বস্তু পূর্বে এ দেশে ছিল না এবং বিদেশী নামেই পরিচিত আছে, তাহাদের বিদেশী নাম অবশ্যই বাংলা ভাষায় স্থান পাইবে। সংজ্ঞা বা বস্তুবাচক বিদেশী শব্দ কোন ভাষায়ই অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। এরূপ অনেক শব্দ প্রাচীন সংস্কৃতও প্রবেশ করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাত্ত্বিক দ্বেভাষায় একাধিক “অপশব্দ”ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক শব্দবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় পাঁচ শতের অধিক বিজাতীয় শব্দের সন্ধান পাইয়াছেন। অশ্বা, অলক, কন্দ, কুঠার, খটুণ, গুচ্ছ, মুণ, চাপ, পিক, পটহ, বক, মণ্ড, শঙ্গ, শিবীষ—এই বর্ণচোরা শব্দগুলি কোনটিই মূলে সংস্কৃত নয়। প্রাচীনকালের মত বর্তমান কালেও আমাদের ভাষায় জাতি, সংজ্ঞা বা বস্তুবোধক বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ শব্দ সম্পর্কেও বিচারের প্রয়োজন আছে। গেঞ্জি, জার্সি, পিন্নানো, হারমোনিয়াম বাংলায় স্বাধীনতা গ্রাহ্য; কিন্তু এরোপ্লেন, অ্যাভিঅ্যাভি সর্বথা ত্যাজ্য। কারণ, “বিমান” আব “উড়োজাহাজ” এরোপ্লেনের কাজ চালাইবে, পক্ষিখালা আর শকুন্তপালিকা অ্যাভিঅ্যাভি পরিবর্তে বলিবে। বস্তু বা সংজ্ঞাবাচক শব্দের এই ব্যবস্থা। বর্ণনাত্মক অথবা গুণক্রিয়াবাচক শব্দের কথা অন্তরূপ। সেকপ ইংরেজী শব্দের স্থলে নূতন নূতন বাংলা প্রতিশব্দ চয়ন বা গঠন কবিয়া লইতে হইবে। নতুবা বিজাতীয় শব্দের অবাধ প্রাবনে আমাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য এককালে লোপ পাইবে। নূতন শব্দসংকলনে উদার সংস্কৃত ভাষাই হইবে প্রধান উপজীব্য।”

এই প্রসঙ্গে বাংলা গল্পের আদি প্রবর্তক-উইলিয়ম কেরীর কথা স্মরণীয়। কেরী ষোল্লশ শতাব্দীর শেষে এবং উমবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলা দেশে বিজাতীয় হিন্দুস্থানী প্রবল প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাহাব অভিধানের ও ব্যাকরণের ভূমিকায়

লিখিয়াছিলেন, “বাংলাভাষা ভাবতবর্ষেব সর্বোত্তম ভাষা এবং ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহেব অগ্রতম। সংস্কৃত ভাষা ইহার সাক্ষাৎ জননী। বাংলা কোষের গঠনকরা ৮৫টি শব্দ তৎসম অথবা তৎভব। পরিভাষার জন্ত বাংলাকে কোনও বিদেশী ভাষার সাহায্য লইতে হইবে না, সংস্কৃত ধাতু হইতেই সমৃদ্ধ শব্দ গঠন সম্ভব।” বস্তুতঃ প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় শতাব্দী পাদের মধ্যে বাংলা ভাষা হিন্দুস্থানীর অবাস্তিত ও অহিতকর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া সঞ্জীবিত হইয়াছিল।

১৮৬৫ সনেব ১৪ই এপ্রিল তারিখেব ‘সংবাদ প্রভাকরে’ সম্পাদক লেখেন, “বাঙ্গালা ভাষা সম্পন্ন না দরিদ্রা? এই প্রশ্নের উত্তর দান আজকাল অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে এই কাঠিষ্ঠ উৎপাদন কবিলেন? বিদেশীষেরা না বাঙ্গালীবা? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তাদৃশ কঠিন নহে, বস্তুতঃ অতিশয় সহজ। বাঙ্গালীবা আপনারাই আপনাদিগেব ভাষাকে অসম্পন্ন দেখিতেছেন এবং আপনারাই তদ্বা বা কোন প্রকার অভীষ্ট লাভ করা দুরূহ ভাবিয়া কাতব হইতেছেন। কিন্তু রত্নাকর সদৃশ সংস্কৃত ভাষা যাহার জননী, তাহাব প্রতি এক্রপ দোষারোপ করা অসম্ভব শোচনীয় সন্দেহ নাই।”

প্রায় একশো বছর আগেকাব ‘সংবাদ-প্রভাকরে’র উক্তি—“বাঙ্গালীবা আপনারাই আপনাদিগের ভাষাকে অসম্পন্ন দেখিতেছেন” তাহা যে আজিও শোচনীয় ভাবে অকাট্য সত্য হইয়া আছে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পবিষদের সাম্প্রতিক বিবরণী (‘Assembly Proceedings Official Report Twentieth Session’) হইতে তাহাব হাজারো প্রমাণ দেওয়া যায়। দুটি একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) এঁরা শনিবার অফিস ডিউটি বলে মাঠে ডিউটি দিচ্ছেন, আব রেসকোর্সে টিকিট সেলার হিসাবে অর্থ উপার্জন করছেন। এঁদের সঙ্গে হাইর্যাঙ্কিং পুলিশ অফিসারদেব যোগাযোগ আছে, বিলেশন আছে।

(২) ১৯৫৭ সালে কলিকাতার বৃকের উপর যে কয়েকটি বড় বড় ক্রাইম সংগঠিত (৭) হয়েছে তার একটাও আনডিটেবল নেই।

(৩) আর, আমার ৮১ নম্বর কাটি যোশাম আপনি ডিসএলাউ করেছেন সেটা আমি ল্যাণ্ড রেভিনিউ হেড এ দিয়েছিলাম।

(৪) এনং কোয়েস্টেনের লাস্টে ছিল ..

(৫) আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই। উনি বলবেন আমাদের টোটাল কন্ট্রোল নাই বলে পারছি না কিছু করতে। আমি কতকগুলি সাজেসসন দিচ্ছি।

এতদব্যতীত ইংরেজী ইন্ডিয়মের বাংলা রূপ ভাষাকে কী পরিমাণ জাহান্নমে পাঠাইতেছে বাঙালীর আত্মসম্মান বোধ থাকিলে তাঁহাদেরই নির্বাচিত এই সকল প্রতিনিধির জন্ত জাতিগত ভাবে লজ্জিত হইতেন। তাঁহারা “ঘামের দর” Price of sweat, ঝোলাব মধ্য হইতে বিড়াল বাহির, এই চার দেয়ালের মধ্যে এসে পৌঁছান প্রভৃতি নিরঙ্কুশ ভাবে ব্যবহার কবিতেন। ভারত ভ্রমণে আসিয়া কোনও একটি দেশী সভায় যোগ দিয়া প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অলডাস হাক্সলির যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তিনি তাঁহার ‘জ্যেষ্টিং পাইলেট’ গ্রন্থের প্রায় গোড়াতেই এইভাবে তাহা বর্ণনা কবিয়াছেন :

“I amused myself listening for the occasional English words with which incomprehensibility was powdered. Gibber gibber gibber it was thus that I should have reported a typical speech of the evening. It was thus I reflected, that our saxon fathers borrowed from the invader’s speech the words for which they could find no equivalents in their own debased post-Conquest English ”

ঋাহাদের আত্মসম্মানবোধ আছে তাঁহারা মাতৃভাষার এই লাঞ্ছনা বরাবর কবিতেন করিতে যাহাতে দু কান কাটা না হইয়া পড়েন তজ্জন্ত এই পরিভাষা-সংসদ যদি গঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলেই অচিরকাল মধ্যে আত্মবিস্মৃত বাঙালী আত্মস্থ হইতে পারিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিক জয়ন্তী

বরীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসবেব দামামাধ্বনি মন্দীভূত হইতে না হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী বেরী-তুরীর আওয়াজ উঠিতেছে। স্বামীজীর তিবোভাবেব বৎসবারিককাল পবেই ১৯০৪ সনের ৯ই জাহুয়াবি বেলুডমঠে তাঁহার জন্মতিথি পালন করা হয়। ১০ই জাহুয়াবি মধ্যাহ্নে সিস্টার নিবেদিতা স্বামীজী সম্পর্কে তাঁহার তিবোধানাস্তিক প্রথম ভাষণে বলেন, “আমরা এখানে কেবল উৎসবেব আনন্দে স্বণিক উন্নত হইতে সমবেত হই নাই। ষাহাতে স্বামীজীব শিক্ষা প্রাণপণে কার্যে পবিণত কবিতে পারি, তাহার শক্তি লাভেব জন্তই এই উৎসবেব আয়োজন। তাঁহার কি শিক্ষা ছিল? তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার নাম লোকে গান করুক? না, আমরা জানি, তিনি নাম যশ প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম চতুর্দিকে প্রচারিত হউক? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না। তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার বিশেষ উপদেশ বা কার্যপ্রণালী সকলে অনুসরণ করুক? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না। তবে তিনি চাহিতেন কি? তিনি চাহিতেন, সকলে নিজের পায়ে নিজে দাঁডাক, মাহুয হউক।”

বর্তমানে বাংলাদেশে এই আত্মনির্ভরশীল মাহুযের বড অভাব হইয়াছে। গডলিকাপ্রবাহে পডিয়া দেশেব মাহুয এই সঙ্কটকালে পথভ্রষ্ট না হয় স্বামীজীর শিষ্যপ্রশিষ্যেরা সে বিষয়ে অবহিত থাকিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে স্বামীজীর নিজের নির্দেশ আবও কঠোর :

“Keep off from all insincere claimants to supernatural illumination, not that such illumination is impossible, but, my friends, in this world of ours ‘lust, or gold, or fame’ is the hidden motive behind ninety percent of all such claims, and of the remaining ten percent, nine percent are cases which require

more the tender care of physicians than the attention of metaphysicians”

The first great thing to accomplish is to establish a character, to obtain, as we say, the প্রতিষ্ঠিতা প্রজ্ঞা (established Wisdom) This applies equally to individuals and to organised bodies of individuals”

বীব বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র কবিয়া ভাবপ্রবণ এবং নৃত্যনাট্যসঙ্গীত-শিথিল বাঙালী জাতিব চবিত্র সংঘমে ও দৃঢ়তায় স্তগঠিত হউক। এই দাযিত্ব স্বামীজী-প্রবর্তিত সন্ন্যাসীসম্প্রদায় গ্রহণ করুন। যে দেশে গৃহীরা চরিত্রভ্রষ্ট হয় সে দেশে সন্ন্যাসধর্মও থণ্ডিত হয়।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমরা সবে ম্যাট্রিকুলেশন পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইন্টারমিডিয়েট বিজ্ঞানের পাঠ শুরু করিয়াছি, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ. প্রণীত ‘নব্য-বিজ্ঞান’ বইখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দের আর্ট আনা গ্রন্থমালায় ২৭নং গ্রন্থরূপে হাতে পাইলাম, ১৯১৮ সনের জুন মাসে। সহজ সরল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানেব ক্রমোন্নতির ইতিহাস পডিতে পাইয়া অদ্ভুত রকমের ভাল লাগিল। সেই প্রথম প্রত্যয় জন্মিল যে :

“বিজ্ঞান-বলে মানব আজ মাটি ছাড়িয়া বাতাসে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে, জলের মধ্যে নিজের আধিপত্য স্থাপন কবিতেছে, একস্থানে দাঁড়াইয়া তারে এবং বিনা তারে সমস্ত পৃথিবীটাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতেছে, তাহার আবাসস্থল হইতে রোগ জরা মারী দূরীকরণেব জন্ত বন্ধপরিকর হইয়াছে।”

চার বছর পরে বিজ্ঞানের ডিগ্রি লইয়া স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ঢুকিয়া যখন পদার্থবিজ্ঞানের মাস্টার হইতে চলিলাম তখন রেডিওঅ্যাক্টিভিটি পডিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের ক্লাসে যাইতে হইল। মিষ্ট

স্বভাবের জন্ত অধ্যাপক প্রথম সাক্ষাতেই ছাত্রের মনোহরণ কবিলেন। ঠিক চল্লিশ বৎসর পূর্বের এই পবিত্র শেষ পর্যন্ত গভীর স্নেহের সম্পর্কে দাঁড়াইয়াছিল। ‘বেপরোয়া’র পরিচালক শিক্ষক ‘শনিবারের চিঠি’র পবিচালক ছাত্রের আরও ঘনিষ্ঠ হইলেন বেপরোয়া-মার্কী লেখা ছাপিতে দিয়া। শ্রীমদভগবদ্গীতাকে ব্যঙ্গ করিয়া, শিক্ষকের প্রবন্ধ ছাত্রের অনেক হাদ্যমাব কাষণ হইল। সনাতনধর্মী এক প্রসিদ্ধ লেখক ছাত্রের মৃত্যুকামনা করিয়া পত্র দিলেন। ফলে ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হইল। বিশ্বভারতীর কাজে তাঁহাকে আরও কাছে পাইলাম। মাতৃভাষা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সাধনায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের এবং সর্বশেষ আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় বিজ্ঞান পরিষদ মাবক্ষত মাস্টার মশাই অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন বলিতে পারি।

চারুচন্দ্র সুপক ফলের মত পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য এবং হয়তো সুখ লইয়া বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার এবং শেষ জীবনের লেখায় তিনি বুঝাইতে চাহিতেন, জ্ঞানই সব এবং জ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান। কিন্তু

এহ বাহ। তাঁহার অন্তরের কথা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন :

“বিজ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া মানব এই পৃথিবীকে সুন্দর বর্মণীয় করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল; এই কল্পিত নন্দনকাননে তাহাব ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ব্যাধি-জরা-বিমুক্ত হইয়া বিনা পরিশ্রমে সৌন্দর্যের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, জয়ের ভিতর দিয়াই অনেক জাতির পতন হইয়াছে। মানবও যদি সফলতার মোহকে অতিক্রম কবিতে না পাবিয়া বিলাসী, আরামপ্রিয়, পবিত্রমকাতর ও নব নব উদ্ভাবনায় পরাভূত হইয়া পড়ে তো তাহাবও পতন অবশ্যস্তাবী। কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়াও যদি মানব আত্মজয় করিতে পারে—বাহিরের ঐশ্বর্য-সম্পদের মধ্যেও যদি অন্তরের দীনতা আত্মত্যাগ বজায় রাখিয়া তাহার উপনিষদ-বেদান্তের বাণী বিশ্বস্ত না হয়—তাহাব বুদ্ধ, তাহাব বীণা, তাহাব মহিম্বদের প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট না হয়, তবে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সূর্য্য নিকরীপিত হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু এই মহত্ত্বজাতি ব্রহ্মাণ্ড হইতে লুপ্ত হইবে না।”

এই চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে প্রণাম নিবেদন করি।

[শাবদীয়া সংখ্যায় মনস্বী বাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি অপ্রকাশিত চিঠি

তাঁহার স্বহস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইবে।]

কবিমানসী : দ্বিতীয় খণ্ড

॥ কাব্যভাষ্য ॥

আগামী কার্তিক মাস থেকে শনিবারের চিঠিতে

স্বাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

ষাট দশকে

পবিত্রকুমার ঘোষ

যুগেব ইঙ্গিত বোঝবার বাতীক আমাব নেই। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লেখা আমাব পেশা নয়, নেশাও নয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের কুশাশা থেকে আমি অনেক দূবে। অতএব আমি যা হাজির করছি, শুক্লতেই জানিয়ে রাখা ভাল, তা কয়েকটি তথ্য, অবশ্যই মন্তব্য সহযোগে। পঞ্চাশের দশকে যে সব সমস্তা বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভাস্ত কবেছিল এবং তাঁবা যে ভাবে সাড়া দিযেছিলেন তার মূল্যায়ন আগেই পেশ করেছি। এই আলোচনায় ষাটের দশক নিয়ে ব্যস্ত থাকব আমরা, তার এপাবে বা ওপারে যাবার চেষ্টা কবব না। এই দশকের বয়স হল সব দেড় বছর, অতএব আজ এই দশকের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকা অলীক হবে, আর এই দশকের মূল্যায়নের প্রক্সই ওঠে না। যে সামান্য কিছু তথ্য জমে উঠেছে এই দেড় বছরে, তার মধ্যে যে অংশ বুদ্ধিজীবীদের মানসকে অভিঘাতে চঞ্চল করে তুলেছে তাই-ই আমি উপস্থিত কবব, আর সেই সব তথ্য কি ভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে তাই হবে আলোচনার বিষয়।

এক

টেলিভিশনের প্রচলন এখনও আমাদের দেশে হয় নি। ষাট দশকে তা হবে এমন কথা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-রচয়িতারা বলছেন না। জনসাধারণের কাছে পৌছবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিজীবীরা অন্ত্যাত্ম যে সব আধুনিক মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে থাকেন সেগুলি এখন এদেশের

বুদ্ধিজীবীদেরও প্রায় করায়ত্ত। এমন ঘটে নি যে একটি মাধ্যম আসার ফলে আর একটি মাধ্যম বাতিল হয়ে গেছে। সিনেমার পাশাপাশি স্টেজ যথেষ্ট লীলাচঞ্চল হয়ে বেঁচে আছে। সংবাদপত্রের পাঠক বাডাব সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পাঠক কমে নি। রেডিওর প্রসার জলসা অকুষ্ঠানগুলিকে নিপ্তা করে নি। বরং উলটোটা এই এসবের ক্ষেত্রে সত্য হয়ে দেখা দিল। আরও কথা এই যে আমবা যতই জোব গলায় বলছি যে আজকাল তরল আনন্দ পবিত্রকুমারের ফলে জনসাধারণের রুচি ও গ্রহণ-ক্ষমতা বান ক্রমেই নীচে নেমে যাচ্ছে তবু অনস্বীকার্য যে চিত্রপ্রদর্শনীর সংখ্যাও বাড়ছে, প্রদর্শনীতে দর্শক-সংখ্যাও বাড়ছে। আধুনিক কবিতার জনপ্রিয়তা পঞ্চাশের দশকেব গোড়ায় যা ছিল এখন তাব চেয়ে অনেক বেশি। বরং যে জিনিস থেকে লোকে মুখ ফিবিযে নিয়েছে সে হল রাজনীতি। রাজনৈতিক সচেতনতা জনসাধারণের মধ্যে বাড়ছে কি কমছে আমি জানি না, তবে রাজনৈতিক আন্দোলন নামে যে মিথ্যাচার ও গুণ্ডামিতন্ত্র প্রত্যা পেয়ে আসছিল, আজকের বুদ্ধিজীবীবা তাতে আর তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। জনসভায় জনগণের যোগদান প্রায় শূন্য এসে ঠেকেছে, বক্তৃতামঞ্চ তার প্রভাব সম্পূর্ণ হারিয়েছে। তাব কাবণ এই নয় যে আর কোন বিকল্প মাধ্যম সে স্থান দখল করেছে। তার কাবণ সম্ভবতঃ এই যে চরিত্র ও মস্তিষ্ক এ ছুটি জিনিসই ও অঞ্চল ছেড়ে চলে এসেছে। পঞ্চাশের দশকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, কিন্তু সে সময়ে বাহ্যতঃ রাজনৈতিক উত্তেজনা আন্দোলন সভা

মিছিল এসব যেন ক্ষীতই হয়ে উঠেছিল। যাই-হোক, আজকের অবস্থা-বিবেচনায় বাজনীতি প্রসঙ্গ এই আলোচনা থেকে আমি বাদ দেব এই কাবণে যে বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাজনীতি এখন আর একটা সজীব সমস্যা নয়। বাজনীতি এখন সত্যিই একদল অবিবেকী আত্মপব স্বযোগসন্ধানীর ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, বুদ্ধিজীবীরা সেখানে সোয়াস্তি পান না।

রাজনৈতিক দল ও মঞ্চ ছাড়া বুদ্ধিজীবীদের অবলম্বন অত্যাশ্রয় সব মাধ্যমগুলিই জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সঙ্গে সামাজিক সম্মানও, কেন না অর্থকরী সম্ভাবনাও তাদের বাড়ছে। অতএব বুদ্ধিজীবীদের এটা সুসময়। অস্তুতঃ সুসময়ের আভাস যেন দেখা যাচ্ছে। আরও সুসংবাদ এই যে, এমন একটা সময় যেন প্রায় এল যখন বাংলা দেশের ও বাংলা ভাষার আঙিনায় কোটা ফুলের জগন্ধ নিতে বিশ্ব সমুৎসুক হয়ে উঠবে, মাতৃভাষার চর্চা কবে জগতেব স্বীকৃতি লাভ করা বিন যেন আর দূবে নয়। মাতৃষেরা নানা দেশে থেকেও চেতনায় পবম্পরেব কাছাকাছি চলে আসছে বলেই হোক অথবা রাষ্ট্রিক প্রযোজনেই হোক ভাব ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ক্রমঃ কৃত্রিম আয়োজনের বাইবে সহজ সত্য হয়ে উঠছে এবং বুদ্ধিজীবীবাও যে নিজেদের মাল বাইরে বপ্তানি করে করেন একচেঞ্জ উপার্জনে সক্ষম, ভারত সবকারকেও অবশেষে সে কথা মানতে হয়েছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে যে মূল প্রশ্ন অহুসরণ করে আমি আমার তথ্যগুলিকে সাজাতে চাই, আশা করি তা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করছেন কি ভাবে? কোন্ লক্ষ্যকেই বা সামনে রেখে? ষাট দশকে কোন নতুন বাক নিতে তাঁরা চাইছেন কি? চাইলে, কোন্ দিকে?

দুই

ধরা যাক আমি আমার প্রশ্নগুলিকে আব একটু স্থল ভাবে উপস্থাপিত কবতে পারি। ষাট দশকে বুদ্ধিজীবীবা তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে কী ভাবছেন? কর্তব্য পালনেই বা তাঁরা কতদূর অগ্রসব?

জর্নৈক তরুণ চিত্রীব কাছে প্রশ্ন কবে শোনা গেল যে প্রত্যেক বছর সবকারী আর্ট স্কুল থেকে যেসব ছাত্র পাস করে বেবোয় তাদের অনেকেই স্কুলে ড্রইং-শিক্ষকের পদে চাকবি নেয, কেউ কেউ কমার্সিয়াল কাজ করে জীবিকা অর্জনের ত্রত পালন কবে, কেউ কেউ এটা-ওটা-সেটা কবে। অনেকে আবার চিত্রসংস্পর্শহীন সাবেকী জীবনে ফিরে যায়। এরা সবাই শুধু এই গল্প করেই জীবনটা কাটিয়ে দেয যে, যদি স্বযোগ পেতাম তবে একজন মস্ত শিল্পী হতাম। বস্তুতঃ কলকাতায়, চিত্রের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ও প্রকৃত স্থষ্টির সাধনায় নিজেকে নিষ্কিপ্ত কবে এমন শিল্পীর সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায় - দু-চার জন। আর বাকীরা, যারা চিত্রের সঙ্গে ববাবব যুক্ত থাকে, তাবাও প্রচলিতেব সঙ্গে, প্রাপ্তেব সঙ্গে, চলতি কুচি ও চাহিদার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়াকেই কর্তব্য বলে বিবেচনা করে। চিত্র কেন, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সেই এক হাল। বাংলা সিনেমায় সত্যজিतीय বিপ্লব পঞ্চাশ দশকের ঘটনা, ষাট দশকে সেই বিপ্লব স্থষ্টির হয়ে গেছে। আরও দু-একজন উৎকৃষ্ট ব্যক্তি চলচ্চিত্রে তাঁদের চিত্ত সংযুক্ত কবেছিলেন কিন্তু তাঁবা কোনও নতুন ধারা বা বাকের দিকে লোকেব অভিনিবেশ টেনে আনতে পাবেন নি, অতএব আপাততঃ ব্যর্থ ই হয়েছেন। তাঁদের কথা বাদ দিতে হবে। ষাটের দশকে চলচ্চিত্রের আদর্শ নতুন কবে স্থির করার দায়িত্ব আর সত্যজিতে বর্তাবে না। সে কাজ অস্তের। সেই অস্ত্র ব্যক্তিটি এখনও দেখা দেন নি।

উপরে চিত্র ও চলচ্চিত্রের প্রশঙ্গ এই কারণে তুলেছি যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবক্ষেত্রেই যে ছুটি ভাগ আছে তা আমি দেখাতে চাই। তাঁদের অধিকাংশই, শতকবা নিবানকুই অংশ, তাঁদের স্থষ্টিকর্মে আস্থাহীন, কোনও রকম পরীক্ষা বা নতুনের সন্ধান তাঁদের কাছে ভযাবহ, প্রচলিতের সঙ্গে গা মিশিয়ে গা ভাসিয়ে বাস্তব সাফল্য অর্জনই তাঁদের একতম লক্ষ্য। আর এক দল আছেন, সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য। তাঁরা নতুন কথা, নতুন বক্তব্য, নতুন উপলব্ধি নতুন আঙ্গিকের সাহায্যে প্রকাশ করতে যত্নপব, বাস্তব সাফল্যেব চেয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ এমন কি সাধনা করতে করতে জীবনকে নিঃশেষিত করে

দেওয়াও শ্রেয়তর মনে করেন। কিন্তু আবার এই শেখোক্ত দলের লোকদেব মধ্যেও একটি প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায়। প্রথম সাধনায়-নেমে প্রচলিতের বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ করেন ঠিকই, নতুনের নেশায় বহু ছুঃখকষ্টের মূল্যেও পূর্বনো শাসন অস্বীকার করেন সত্যিই, কিন্তু তাঁদের বিদ্রোহ যখন অভিনন্দিত হয়, যখন সাফল্য আসে, তখন তাঁরাও নিজেদের সাফল্যকেই আবর্তন করে ফেবন, নিজেদেরই পূর্বনো মূর্তিকে চিবস্বাধী করে পূজা কবতে থাকেন, প্রচলিতকে আবার আঘাত করতে পারেন না; বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে, আসে, সবকিছু মেনে নেবার দিকেই তখন ঝোঁক দেখা যায়।

বুদ্ধিজীবীদের গর্ব এই যে তাঁরা জনসাধারণ থেকে একটু-ওপরে, অর্থাৎ তাঁরা গুডস-ডেলিভার করেন। অথচ তাঁদের মধ্যেও প্রচলিতকে, জনসাধারণের রুচি ও চাহিদাকে, চলতি মূল্যবোধকে মেনে নেবার এই যে সর্বব্যাপী আকাজক্ষা—এ কেন? বিদ্রোহীরাও যে অবশেষে পোষমানা হয়ে পড়েন—হেতু কী? শুধুই কি সাফল্যের লোভ বা মোহ? মানুষের, বিশেষতঃ নগরবাসী বুদ্ধিজীবীদের মনস্তত্ত্ব সরল নয়, বড় জটিল, অতএব একটি মাত্র কারণ দেখিয়ে এতবড় ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা অসুচিত হবে। কারণ হয়তো আরও গভীরে।

প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীকেই প্রথম যৌবনকালেই এই একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় : ভালগাবিটি কী? কুশ্রীতাকে বাদ দিয়ে নয়, কুশ্রীতার ওপরে; নিজ নিজ জীবনকে নয়, স্থষ্টিকে উত্তীর্ণ কবাই সব বুদ্ধিজীবীর লক্ষ্য। টলস্টয়কে এবং হয়তো ববীন্দ্রনাথকে অল্পসবণ কবে অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলা সাহিত্যে প্লোগান এনেছিলেন শিল্পই স্বন্দর হলে চলবে না, শিল্পীর জীবনও হতে হবে স্বন্দর, শিল্প নয়, জীবনশিল্পই নাকি শিল্পীর ধ্যান হওয়া উচিত। এই মতবাদ বস্তুশূন্য নীবস শিল্পের নামে অশিল্প প্রজনন করেছে। বস্তুতঃ টলস্টয় যখন সং-সাহিত্য স্থষ্টি করেছেন তখন তাঁর জীবন অনেকখানি অপরিচ্ছন্ন অমার্জিত ছিল, অসুতপ্ত হয়ে বেঁধিন তিনি জীবনকে মার্জিত করে স্বন্দর করতে চাইলেন ও সেই কাজে উঠে পড়ে লাগলেন সেদিন থেকে তাঁর কলম আর সাহিত্য রচনা করল না, রচনা কবল শুধু উপদেশায়ত। ববীন্দ্রনাথ

জীবনে স্বন্দর ছিলেন, অশাস্ত্রীন কুশ্রীতা তাঁর কাছে কদাচ প্রশ্রয় পায়নি, অন্ধকার, হীনতা ও পাপের আক্রমণ থেকে মুক্ত বেথেছিলেন তিনি নিজে। কিন্তু সেই কাবণেই শেক্সপীয়কে যেমন জীবন অনাবৃত কবতে পেয়েছে তাঁর নিজের স্বরূপ, ববীন্দ্রনাথের তা পারে নি। জীবনের বহুক্ষেত্রে আলোর চেয়ে অন্ধকারের খেলা কম নয়, বরং বেশি; আর এই আলো-অন্ধকারের টানা-পোড়নেই রচিত হয় সত্য যাব আর এক নাম জীবন। এই জীবনের পূর্বো রূপ শেক্সপীয়ের আছে বলেই তিনি অমিতকীর্তি শিল্পী, কিন্তু শেক্সপীয়ের ব্যক্তিগত জীবন কিঃসুচিকণ নথব ও সাজানো ছিল? ডস্টয়েভস্কির জীবন প্রশংসাযোগ্য ছিল না, কিন্তু পাপের মর্মকোষ পর্যন্ত পৌছেছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাই তাঁর সাহিত্য সত্যের উদ্ভাসনে সার্থক হতে পেরেছিল। নিরন্তর শক্তির নিবারণ হয়ে আছে তাঁর কোনো কোনো লেখা। আজকাল কেউ কেউ ববীন্দ্র-সমালোচনার ভ্রত নিয়ে ববীন্দ্রনাথকে মসীলিষ্ট করতে চাইছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটা যে বিশেষ ভাল ছিল না বরং পাপক্লিষ্ট ছিল, তিনি যে বাইরে একটা ঋষি ও মহাপুরুষের মেক-আপ নিয়ে থাকতেন কিন্তু অন্তরে বিধাব বন্দেব ও বীভৎস ইচ্ছাব দ্বাবা নিরন্তর পীড়িত হতেন এ কথা তাঁরা বলছেন। তাঁর জীবনের কোন ঘটনা এ মতের অস্বকুল নয় বলে কোন কোন ঘটনাকে বিকৃত করেও পরিবেশন করা হয়েছে। কিন্তু সমালোচনা এদিক দিয়ে অগ্রসব না হয়ে আবার এক দিক থেকে এগোলে সঙ্গত হত। বলা যেতে পারত যে ববীন্দ্রনাথের বচনায় সৌন্দর্য আছে, তত্ত্বের আক্রমণ সঙ্গেও বসস্মৃতিও বহু বচনায় ঘটেছে কিন্তু সত্যের পবিচয় খণ্ডিত ববীন্দ্র-রচনারলীতে। ববীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকে একখানি সর্দাঙ্গহুই কাব্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। অন্তবে যদি তাঁর খলনায়ক থেকেও থাকে কোথাও তার প্রকাশ ঘটতে তিনি দেন নি তাঁর অপবিসীম সংঘম শালীনতা আদর্শ ও সৌন্দর্যবোধের দ্রবন। সেই কারণে তাঁর জীবন-কাব্যও অসম্পূর্ণ বলে গেছে, কেন না তাঁর বাহ্যিক ছাড়া আস্তব সংগ্রামের সংবাদ আমরা সেই কাব্যে আদৌ পাই না। দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম আস্তব ক্ষত ও রক্তক্ষরণের বার্তা যে কাব্যে নেই শিল্প-হিসাবে সে কাব্যের মূল্য বিচারের বিষয়।

বস্তুতঃ, এই শ্লোগানের বশে চালিত হবার ফলেই হয়তো অন্নদাশঙ্কর রায় নিজে আজও পর্যন্ত একজন অসার্থক শিল্পী রয়ে গেছেন।

যাই হোক, কুশীতা, পাপ, হীনতার স্বরূপ কী—এই প্রশ্নের মুখোমুখি প্রথম যৌবনেই সব বুদ্ধিজীবীকে হতে হয়। এক একজনের কাছে অবস্থা সেই স্বরূপ এক এক ভাবে ধরা পড়ে। হৃদয়ের কুশীতা, মানসিকতার কুশীতা, রুচির কুশীতা, আচার-ব্যবহারের কুশীতা সমাজ-ব্যবস্থা বা যুগের কুশীতা এক একজনের কাছে এক একটি জিনিস বিশেষভাবে ধরা পড়ে। এ ছাড়াও আছে সেই কুশীতা যা ব্যক্তির সত্তার মর্মকোষ থেকে উঠে আসে, তাই-ই হল আত্মাব কুশীতা।

কুশীতা সেখানেই আছে যেখানে আছে সঙ্কীর্ণতা। একে একে দৃষ্টান্ত দিখে যাচ্ছি। দিনেব'পর দিন একসঙ্গে বাস করে চলেছে, পবস্পর পবস্পরকে জড়িয়ে নিয়ে বেঁচে আছে এমন যে স্বামী-স্ত্রী, হয়তো দেখবেন তাদের একের হৃদয়ে অগ্নিব'স্থান নেই, যান্ত্রিক ও জৈবিক সম্পর্কের বেনী তাদের সম্পর্ক এগোয় নি, আত্মপবতা হয়তো এ দুজনের সম্পর্কের মধ্যেও দুর্ঘর হয়ে বেঁচে আছে। সংসারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কি এ কথা সত্য নয়? এই জিনিসটাকেই আরও স্মৃতি করে দেখা যেতে পারে। শহীদ স্বাবাবদী মুসলিম-সমাজের মঙ্গল চান নি, চেয়েছিলেন উচ্চপদ, সম্মান, ক্ষমতা, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি। কলকাতায় ব্যাপক নবহত্যার উলকানি ও ব্যবস্থা করতে তিনি দ্বিধা করেন নি, কেন না তিনি ভেবেছিলেন তাঁব আকাঙ্ক্ষাপূর্তিব জন্তু তা দবকাব। দাঙ্গাব ফলে পাকিস্তান হবে ও পাকিস্তানে তিনি উচ্চপদ ও ক্ষমতা লাভ কববেন। তাঁর হৃদয় ছিল এত অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ যে বহু লোকের মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রশ্ন, নবহত্যার প্রশ্ন তাঁকে বিব্রত করতে পারে নি। দু বছর আগে পূজোর সময় কলকাতার বামপন্থী নেতৃবন্দ এক ধাত্ত-আন্দোলনের আয়োজন করেছিলেন। তাতে প্রায় আশিটি নববলির তাঁবা ব্যবস্থা করেছিলেন, আর সেই নিহত মানুষগুলিব একজনও কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিল না। তারা ছিল অজ্ঞ সাধারণ মানুষ, মবতে হবে জেনে তারা আসে নি, তাদের আনা হয়েছে বলে তাঁবা এসেছে। রাজনৈতিক

টেনশন বজায় না থাকলে বামপন্থী দলগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে বলে এই যে দায়িত্বহীনভাবে নিষ্ঠুরভাবে কতকগুলি মানুষকে তাদের অজ্ঞতার স্বযোগ নিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া গেল—এ কিসের জন্তু সম্ভব? হৃদয়ে মানুষের জন্তু যদি মমতা থাকত, ভালবাসা থাকত, ঠিক এভাবে এ জিনিস হত না। কিন্তু এ রকম ঘটনা আকছাবই ঘটছে, রাজনীতি ও অরাজনীতি সবক্ষেত্রেই।

মানসিকতাব সঙ্কীর্ণতাও কম ভাববহ নয়, বরং হয়তো বেশী। আমার ধাবণা ও মত, আমার চিন্তা ও কল্পনাব ছকের বাইবে যা-কিছু তাকেই আমার কাছে বিদেশী বলে বোধ হয়, এবং তার সত্যতা থাকতে পাবে বলে আমার বিশ্বাসই হয় না। এই রোগ জগতে সর্বত্র। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে বিজ্ঞানী কবি বা শিল্পী তাঁদের জীবৎকালে সম্মান বা স্বীকৃতি পান নি, কিন্তু উত্তরকালে, পেয়েছেন। তার কাবণ তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন সত্যেব যে উদ্ভাস সমকালীন মানুষ তা স্বীকার করে নিতে পারে নি—নিজেদের মানসিক সঙ্কীর্ণতাব দরুন। এব' দৃষ্টান্ত অজস্র। হাল আমলেব অত্র একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। গত দশকে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন এমন কষেকজন সংবাদপত্রসেবী সাহিত্যিক মানুষেব মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনে ব্রতী, সাহিত্যের বিষয় হিসাবে মনস্তত্ত্ব মহৎ বিষয়। আধুনিক নাগরিক মানুষেব মনস্তত্ত্ব সরল নয়—জটিল, বহু লুতাতস্তুর বুননে সেই মনস্তত্ত্ব গড়া। কিন্তু উপরোক্ত সাহিত্যিকেরা মনে কবেন, নর, বিশেষ করে নারীর মনস্তত্ত্বের উপাদান মাত্র একটিই : বিকৃত যৌন-কামনা। মানুষেব মনের অতলে পাপের জন্ম ও বিস্তার সম্পর্কে অবহিত হওয়া দবকাব। কিন্তু পাপ জগতে মাত্র এক-রকমই হতে পারে, যৌনঅস্বস্তিঘটিত আলোডন ব্যতীত আর কোন আলোডন চিন্তে দেখা যায় না, এ কথা সত্য নয়। মানুষেব মনের গহনতা আবও বহু উপাদানে সমৃদ্ধ, বহুতর আলোডনে বিক্ষুব্ধ। যে কারণে উপরোক্ত সাহিত্যিকরা তা মানতে পাবেন না তা হল তাঁদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা, দৃষ্টিব সঙ্কীর্ণতা, চিন্তাধারার অপবিণতি।

রুচির কুশীতা সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। আসলের চেয়ে বুটোব দিকে এক অপ্রতিরোধ্য ঝোঁক

ইদানীং যেন আমাদের পেয়ে বসেছে—স্বধর্মচ্যুতি তাব
অন্ততম ফল। এই ষাটের দশকে সেই ষোঁকটি
উত্তবোত্তব বেড়েই যাবে এবং ক্রমে তা সর্বব্যাপক হয়ে
ছড়িয়ে পড়বে। কবিতা বাজারে বিকোঁষ না কিন্তু
উপন্যাস বিকোঁষ, অতএব স্বাভাবিক কবি উপন্যাস লিখতে
শুরু করেছেন আজকাল। সাহিত্য-সাধনায় সাফল্য
আসতে দেবি হয় বলে তরুণ লেখকেরা সংবাদপত্রেব
ববিবাসরীয় ও বার্তা-সম্পাদকের টেবিলে হুমডি খেয়ে
পড়েছেন টুকবোঁ কোনও লেখা বা ফিচার ছাপিয়ে
সামান্য কিছু দক্ষিণা লাভেব আশায়। সাংবাদিকদের
পরিণতি হয়েছে আরও ভয়াবহ। সাংবাদিকের যা
প্রথম দায়িত্ব সত্য সংবাদ পরিবেশন, সেই দায়িত্ব প্রথমেই
জবাই করতে হয় আজকেব সাংবাদিককে। অতিরঞ্জিত
বিকৃত অথবা কলিত সংবাদ কবিতাব ভাষায় আপত্তিকব
ভঙ্গীতে পরিবেশন করতে পাবে, হেড-লাইনেব নৃত্য
দেখিয়ে কাগজের প্রথম পাতা ভবাতে পারে এমন লোকই
আজ সংবাদপত্রে উন্নতি করছে, অতএব কবি সাজার
ভান আজ যথার্থ সাংবাদিকদেরও পেয়ে বসেছে। একেই
বলে কচির বিকৃতি। যাবা সাধারণ হিন্দী সিনেমা দেখে
তৃপ্তি পায় তাদের আমরা রুচিহীন বলি, কিন্তু তাদের
মানসিক পরিণতি এব বেশী যায় নি বলেই তারা এ বস্তুতে
আনন্দ পাচ্ছে। আব যারা দর্শনের মাথা ও প্রবণতা
দিয়ে জন্মে টেকনিক্যাল বিত্তা আয়ত্ত করতে ছুটছে ও
কবেই জীবন শেষ কবছে, যে সব দীপ্ত তরুণ
ছাত্রাবনেই প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাব পরিচয় দিয়ে
অবশেষে 'ভাল চাকরি ও শ্রমকুলের প্রাণসা পেয়েই তৃপ্ত
হয়ে যাচ্ছে, যারা জীবিকানির্বাহেব সদব বাস্তা ত্যাগ
করেছে শিল্প বা সাহিত্যসাধনাব প্রেরণায় কিন্তু জীবন
কটিয়ে দিচ্ছে অর্ডারি ছবি একে বা লেখা লিখে,
সাংবাদিকতা বেছে নিয়ে যারা পত্র লিখতে লিখতেই
খুশী হয়ে যাচ্ছে—রুচির কুশ্রীতা কথাটি তাদের সম্পর্কেই
বেশী প্রযোজ্য।

ব্যবহারের কুশ্রীতাও কি এই ষাট দশকে বাড়ছে না?
এবং বুদ্ধিজীবীরাই বুদ্ধিজীবীদের মারছে সেখানে।
কলকাতার সাহিত্যপাডায় আজ কান পাতা দায়।
আত্মতৃপ্ত লেখকেরা একে অন্যের অসাক্ষাতে পরস্পরের

ভুল ক্রটি ব্যক্তিগত জীবনের কেছা নিয়ে বাতাস ভারি
করে তুলছে, আবাব পরস্পরকে পিঠও চাপডাচ্ছে। জর্নেক
প্রতিভাবান সাহিত্যিক নিজের জামাতাকে চিঠি লিখেছেন
বিদেশ থেকে, খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেই চিঠি
অন্তেব পত্রিকা'ও নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন এই
কাবণে যে তাতে জামাতার, সাহিত্য-প্রাভা বিষয়ে
প্রচারের সুযোগ হবে। সেই জামাতা ষাট দশকের একজন
নবীন লেখক, শ্রমরমণায়ের লেখা ব্যক্তিগত চিঠি ছাপতে
দিয়েছেন সোৎসাহে আত্মপ্রচারের বাসনায। অথচ তিনি
দাবি করেন সমালোচনার দৃষ্টি নিয়েই তিনি জন্মেছেন।

সমাজ-ব্যবস্থা বা যুগের কুশ্রীতা সম্পর্কে কমিউনিষ্ট
লেখকেবা যথেষ্ট লিখেছেন। আমাদের সমাজ একদিকে
যেমন সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ ইত্যাদি
কুশ্রীতার দরুন পীড়িত, অত্রদিকে তেমনি এই সমাজের
কাঠামো ধনতান্ত্রিক শোষণের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে।
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পাবলিক সেক্টর, সমাজতান্ত্রিক
ধাঁচ ইত্যাদি সব সত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো
ধনতান্ত্রিক শোষণ ও কেন্দ্রীকরণেব বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত।
গণতন্ত্র এসেছে কিন্তু সর্বস্তরে নয়, সর্বোপরি মানুষের
স্বাধীনতা আদৌ বাড়ে নি। দারিদ্র্য বেকার-সমস্তা
ইত্যাদি প্রসঙ্গ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এহ বাছ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে আত্মার
কুশ্রীতা, আর সে জিনিস ইদানীং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।
মানুষ আত্মতৃপ্ত ও স্বাভাবিক থাকতে বড় বেশী
ভালবাসছে। নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর তার অগাধ
বিশ্বাস, অথচ সেই বিচার-বুদ্ধিব সামর্থ্য কতটুকু তা সে
ভাবতে বাজী নয়। রোজ কলকাতায় কয়েক লক্ষ ডেলি-
প্যাসেঞ্জাব ট্রেনে করে আসেন ও যান। ট্রেনেব কামরায়
একটু কান পাতবেন। পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নেই
যাব সম্পর্কে সেখানে মতামত প্রকাশ করা হয় না।
বার্লিন, বের্লিনাডি, মুক্লিয়ার টেস্ট, কলকাতার মেট্রো-
পলিটান স্কীম, নবনাট্য আন্দোলন, শিক্ষাসংস্কার-সমস্তা,
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সাঁজা পার্স—সমস্তই
সেখানে এক নিঃশ্বাসে আলোচিত হয়ে থাকে। ট্রেনের
কামরা ছেড়ে কফিহাউস, কফিহাউস ছেড়ে কলেজের
অধ্যাপকদের কমনরুম এবং সব বিশেষ স্থান ছেড়ে

সোজা মানুষের ঘরে ঘরে যান—এই এক বীতি সর্বত্র প্রসারিত দেখতে পাবেন। বিচার করে ফেলাব বৌক সর্বদাই সমান প্রবল। অরুণবারু লোকটি আমাদের সামান্য পরিচিত, কিন্তু তাঁর স্বরূপ কি তা নির্ণয় করতে আমাদের পাঁচ মিনিটও ভাববার দরকার হয় না। জীবনের যে কোন প্রশ্ন, যে কোন বহুস্ত যেন আমরা ইতিপূর্বেই জেনে ফেলেছি, জানতে আর কিছু বাকী নেই, অতএব মতামত প্রকাশে আমরা অকুণ্ঠিত। গত বছর অর্থাৎ ষাট দশকের প্রথম বৎসবেই কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ঘোষণা করেছেন এই কটি কথা যে আমবা এ যুগে সবই জেনে গেছি, নতুন করে জানবার বা ভাববার আর কিছু নেই, এখন শুধু নিজেকেই পাশ থেকে পিছন থেকে বা সামনে থেকে দেখা যেতে পারে আব সেই দেখাটুকুই সাহিত্যের লক্ষ্য ইদানীং কালে। আত্মরতিই তা হলে সর্বশেষ জ্ঞান?

আকাশে গাংগাবিন তিতভেবা উড়েছেন, বহু তাঙ্কব যন্ত্র বেরিয়েছে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত। মহৎ বিজ্ঞানীবা যদিও বলেন যে জগতে ও জীবনে রহস্যের শেষ নেই, সবকিছুই জানা হয়ে যায় নি ও হবেও না কোনদিন, কোন কিছুই বিচার এক কথায় শেষ করে দেওয়া যায় না, কোন বস্তু বা ব্যক্তিবই স্বরূপ চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবু আত্মসন্তুষ্ট মানুষদের সমাজের নিরানন্দই ভাগ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাবা সবই জানে, সবকিছু সম্পর্কেই বিচারে সমর্থ। তাদের বায়ই চূড়ান্ত।

একটা চায়ের কাপ, বোজই যার কিনারায চুমুক দিচ্ছি, সেই কাপটি তার সম্পূর্ণ রহস্য কি অনাবৃত কবে আমাদের কাছে? তাব রঙ ও ওজন নির্ণয় করতে পাবি, তার আকার কল্পনা কবতে পারি, কিন্তু একই সময়ে একই সঙ্গে সেই কাপের সমস্ত অংশ আমি দেখতে পারি না। এক একটা অংশ এক এক সময় আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে হয়। কাপ তার সামগ্রিকতা নিয়ে আমার কাছে ধরা দেয় না।

পারি না একটা কাপকে জানতে অথচ তাকে ব্যবহার কবি, তার ব্যবহারিক মূল্যই ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে আসে। তখন আবাকাপ নয়, তার ব্যবহারিক মূল্যই প্রধান ও

শেষে একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়ঃ কাপ বলতে বুঝি চা-পানের পেয়ালা। তাব অন্য পরিচয় হয়ে যায় অবলুপ্ত।

মানুষের বেলাও এই বকম। একটা গোটা বাস্তব মানুষকে আমরা কদাচিৎ চিনি, আমাদের সম্পর্ক বা প্রয়োজনের লেবেল-আঁটা না করে কোনও মানুষকে আমরা কাছে লোক বলে ভাবতেই পাবি না। অফিসের কেরানীবা বুকে জানি, ঘরে স্ত্রীকে জানি, পত্রিকা-অফিসের সম্পাদককে চিনি। আমার কাছে এঁদের বা ব্যবহারিক মূল্য সেই মূল্যই আমি আবোপ কবি এঁদের ব্যক্তিসত্তার ওপব, আর ঠিক ততটুকুই চিনি আমি এঁদের। এমন একটি ট্রাজেডি যদি ঘটে জীবনে—এবং কখনও কখনও তা ঘটে থাকে—যখন স্ত্রী হঠাৎ একদিন তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে চায় তাব সত্তার মধ্যে তীব্র কোনও উপলব্ধির আলোড়ন এসে পৌছেছে বলে, স্বামী তা হলে অবাক হয়ে যাবে এবং ভাববেঃ এ কে! একে কি আমি চিনি। এ কি পরিচিতির আবরণ ছিন্ন কবে বেরিয়ে আসে নি নতুন এক মানুষ। যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ তার সম্পর্কেই যখন এ রকম হতে পারে তখন অল্পদেব কথা বলাই বাহল্য। কাপের বেলা ব্যবহারিক মূল্য যথেষ্ট হতে পারে, কাবণ কাপ চিরদিনই যন্ত্র বা 'টুল' হিসাবে ব্যবহৃত হবে। জড় পদার্থগুলি মানুষের একান্ত অধীন ও মানুষের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারে বলে মানুষের হাতে তাদের ব্যবহারের ওপব তাদের নির্ভর কবে। কিন্তু মানুষ যন্ত্র বা 'টুল'রূপে ব্যবহৃত সময় ব্যবহৃত হলেও সে একটি নির্জন্ম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী বলে তাকে নিছক 'টুল'রূপে ব্যবহার করেই ক্ষিয়ে দেওয়া যায় না, কিছু বাকি থাকে। অতএব ব্যবহারিক মূল্যকে অতিক্রম করে আপন সত্তার বৈশিষ্ট্যের মূল্য দাবি করে বসতে পারে মানুষ। সেক্ষেত্রে, একটা কাপকেই সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় না যখন, তখন একটা গোটা মানুষকে তাডাতাড়ি বিচার করে ফেলা যায় কী করে?

বিশেষতঃ যাকে আমরা বলি চবিত্র তা যখন কোনও মানুষবা ক্ষেত্রেই পূর্ব-নির্ধারিত নয় তখন, এ রকম বিচার অসঙ্গত ও অবমাননাকর। মানুষ জন্মায় মানুষের অদ-

প্রত্যদ ও ক্ষমতা নিয়ে, কিন্তু জন্মায় আবার তার সম্ভাব মধ্যে এক বিপুল নাস্তি বা নাথিংনেস নিয়ে। এই নাস্তি বা শূন্যতা ক্রমশঃই সে ভরে তোলে স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা। ইচ্ছাটিও আমরা জানতে পারি না, শূন্যতার স্বরূপও জানি না, আমরা দেখি শুধু লোকটিকে আর তাব বাইরের কর্মকে। তা দেখে আমরা অবশ্য অল্পমান কবতে পারি লোকটির ভিতরের শূন্যতা বা নাস্তি ভবে উঠছে কোন এসেসের সাহায্যে, অথবা কোন এসেন্স গড়ে উঠছে তার ভিতরে। কিন্তু অল্পমান জ্ঞান নয়। আর দ্বিতীয়ত, কৃতকর্মের বিচার করে এসেসের আভাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু নতুন কী এসেন্স গড়ে উঠবে, লোকটি কোন্ দিকে বাক নেবে তা কিছুই পূর্ব-নির্ধারিত নয়। অতএব একটা মানুষকে জানা সম্ভব নয়। কেন না এক দিকে সে যেমন সমগ্র আবে এক দিকে সে তেমনি নবনতুন, ছুজ্জের। আমরা বৎ বুদ্ধির পরিচয় দেব যদি এটুকু জানতে পারি যে মানুষকে ঘিরে আছে এক পরম রহস্য, জগৎ ও জীবন রহস্যময়, যা জানি তার চেয়ে যা জানি না তার অংশ অনেক ব্যাপক, বিপুল। টপ করে বিচার-কার্যটি কোনও মানুষের বেলোতেই না সেবে ফেলা সত্যতর মনোভাবের চোতক।

কিন্তু সচরাচর যা ঘটে—এবং যাট দশকে সেই প্রবণতা আরও বেড়ে চলেছে—তা হচ্ছে, মানুষকে জগৎকে জীবনকে এককথায় বুঝে ফেলাব অভ্যাস। যুক্তি ও বিজ্ঞানের দোহাই পেতে বলা হয় যে আমরা সবই জানি, বা নিশ্চয়ই জানতে পারব, রহস্য বলে কিছু নেই কোথাও। যে অনন্ত অপার বহুস্তরের সমুদ্রে আমরা ডুবে আছি তাকে এক বাক্যে উড়িয়ে দেওয়ার এই প্রবণতাকেই বলি আত্মাব অবমাননা, কুশ্রীতা।

ভিন

বুদ্ধিজীবীরা সত্যের সন্ধান ও সত্যের প্রচার করে থাকেন। সনাতন কাল থেকে সেটাই তাঁদের মূল কর্তব্য। এবং তা করতে গেলে ভালব দিক, আলোর দিক, সৌন্দর্যের দিক যেমন জানতে হয়, কুশ্রীতার দিকও তেমনি সমস্ত অভিনিবেশ দাবি করে। সত্য ভাল মন্দ দুই-ই নিয়ে।

কিন্তু ভালর উদ্ঘাটন সকলের পক্ষে প্রীতিকর হলেও মন্দেব উদ্ঘাটন তা হয় না। সৌন্দর্য রুচিকর কিন্তু কুৎসিত গীড়া দেয়। বিশেষ কবে কুৎসিতের সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত তারা কখনই চায় না যে সে কুৎসিত কেউ প্রকাশ করুক। স্বার্থে টান পড়ার ভয়, অসম্মানের ভয়—সবরকম ভয় আছে। আগেই বলেছি জীবনের নোংরামি ও কুশ্রীতা এক এক ভাবে এক একজনকে গ্রাস করে—কুশ্রীতার দ্বারা সমাজেব সকলেই আক্রান্ত। যে সব প্রতিষ্ঠান ও অস্থান, প্রথা ও বীতি, আচাৰ ও বিধি না থাকলে সমাজ টেকে না, তারা সবাই কুশ্রীতা হীনতা ও পাপেব বসে নিমজ্জিত, অথচ তা যথার্থভাবে প্রকাশ কবতে গেলে সমস্তই ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। এসব ভেঙে পড়লে সমাজই ভেঙে পড়বে। আমরা যদি মন্দ ও পাপকে অমান্য করাই কর্তব্য মনে কবি তা হলে সেই অমান্য কবাব মনোভাব বা বিদ্রোহী মনোভাব সমাজের ও জীবনের সর্বস্তবে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। বিদ্রোহ বা বিপ্লবের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি চিরস্থায়ী বিদ্রোহ বা পার্মানেন্ট রেভলিউশান। তাতে সকল স্বৈর্য বিনষ্ট হয়, সমাজ ও জীবন বিপ্লিষ্ট হয়ে যেতে যেতে ধ্বংস হয়ে যায়। পাপের শেষ কোথায়? কোথায় মিলবে না কুশ্রীতার সাক্ষাৎ? অমান্য করতে হলে চিবকাল অমান্য কবার ব্রতই উদ্ঘাপন করে যেতে হবে। তা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। অথচ যে সমাজ আমাদের পালন ও পোষণ করে, যা আমাদের একমাত্র আশ্রয়, তার ধ্বংস আমরা চাই না, চিবস্থায়ী সামাজিক অস্থিৰতাও কেউ চাইতে পাবে না, সবাই চায় এক সুস্থিৰ সুস্থিত সমাজ এবং বেশ সাজানো ও নিবন্দ জীবনেব প্যাটার্ন।

সবাই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, সব সমাজই নিজের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে যত্নপর। প্রেমের পর প্রেম, বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ দেখা দিলে আয়ু বিপন্ন হয়, ভিত্তিমূল নড়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য কী? সত্যের স্বার্থে প্রেম ও বিদ্রোহপরায়ণতা বাড়িয়ে দেওয়া, নতুন সত্যের আভাস দেওয়া, না, স্থিতিবস্থা বজায় রাখা, সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা?

মানিয়ে নেওয়া, না, বিদ্রোহ? মানিয়ে নেওয়া যদি কর্তব্য হয় তবে কার সঙ্গে কিসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে

হবে? পুরনো সব মূল্য বিদায় নিচ্ছে, নতুন নতুন মূল্য গড়ে উঠছে, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মানুষের চেতনায় নতুন মূল্যের আকাজক্ষা দেখা দিচ্ছে—এ সবই আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এই জঙ্গম জগতে মানিয়ে নেব নিজেদের কোন্ সনাতনের সঙ্গে? জাতিভেদপ্রথা বা অস্পৃশ্যতা আজ আর কেউ মেনে নেবাব কথা ভাবতে পাবেন কি? বরং প্রতি যুগে যে সব নতুন মূল্যের প্রচলন হয়, যে সব প্রতিষ্ঠান অস্থায়ী প্রথা বীতি গড়ে ওঠে, সে সবের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে হয় মানুষকে, পুরনো সনাতনকে আঁকড়ে পড়ে থাকলে মুক্তি নেই। নতুনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া নিজেকে—এই হচ্ছে তা হলে কর্তব্য। কিন্তু নতুনের প্রতিষ্ঠার আগে প্রশ্ন বিদ্রোহ অস্বীকৃতি ইত্যাদি দ্বারা পূর্বনোকে ছিন্নভিন্ন করা দরকার হয়, নতুনের আবির্ভাব নতুবা সম্ভবে না।

এই মানা ও না-মানা দুটি জিনিসই কি ভাবে একসঙ্গে মিশে আছে সে কথাই বলেছেন জন ওয়েন সম্প্রতি এক প্রবন্ধে: Both assent and dissent become merged in inquiry. For if we assent to the principle of intellectual freedom, we commit ourselves to fearless questioning. If we assent to the principle of the sacredness of the individual, we commit ourselves to the personal judgment. If we throw away the authority of the intellectual policeman on the corner, and substitute the right of appeal to the community of reasonable beings, we commit ourselves to respect for other people [John Wain Dilemma of Youth The Saturday Evening Post, June 17, 1961]

বুদ্ধিজীবীরা অতএব বিদ্রোহের ওপর জোর দেবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতেই থেমে যেতে পারেন না তাঁরা, অভিনবকে প্রতিষ্ঠা করতেও তাঁরা চাইবেন স্বাভাবতঃই।

চার

এই দশকের প্রথম দেড় বছরে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ঘোঁক দেখতে পাচ্ছি উপরের বাক্যটির প্রথমার্শের চেয়ে

দ্বিতীয়ার্শের ওপরেই বেশী। গত মহাযুদ্ধ স্বাধীনতা ও দেশ-বিভাগের পর বাঙালী সমাজ আমূল নড়ে গিয়েছিল। পবিত্রতার আকস্মিকতা ও ভয়াবহতায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। পঞ্চাশের দশকে বিমূঢ় ভাবটি কিছু কমে এলে এক ব্যাপক অস্থিরতা, সর্বতোমুখী প্রশ্ন, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। মনে হয়েছিল বারবার, ভাঙনটাই বৃদ্ধি সত্য ও চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপী ভাঙনের ফলে বাঙালী সমাজই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এখন এই ষাট দশকের প্রথমে সেই ভাবটি আর প্রায় নেই, আমরা অনেকখানি স্থিতি হয়েছি ইদানীং। তার একটি প্রমাণ এই যে আসামে বাঙালী-নিপীড়নের সংবাদ যখন বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছিল গত বৎসর তখন প্রবল উত্তেজনা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে উত্তেজনা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। গেল-গেল ভাবটি তুলে ধারা আসার জমাতে চেয়েছিলেন তাঁরা বিফল-মনোরথ হয়েছেন। সর্বনাশের আতঙ্ক ও সদা-অস্থিরতা ভাবটি কমে এসেছে।

সেই কারণেই সম্ভবতঃ পঞ্চাশ দশকে আবির্ভূত জনপ্রিয় লেখকদের প্রভাবও এসেছে কমে। মানুষের মন যখন অস্থির ছিল, সর্বনাশ-চেতনায় আচ্ছন্ন ছিল, তখন মানুষের মনের একটামাত্র সর্বনাশী প্রবৃত্তিকে ক্ষীণ কবে দেখিয়ে এঁরা সহজেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বিশেষ কবে এঁদের কেউ কেউ আঁবাব কতকগুলি স্থচিরাগত সামাজিক প্রতিষ্ঠান অস্থায়ী আচাৰ রীতি প্রথা সংস্কারের সম্পর্কে প্রশ্নও তুলেছিলেন, পুনর্মূল্যায়নের দাবি করেছিলেন, এবং শুধু সমাজ নয় মানুষের মনের মধ্যে যে মন, মনেব যে গহনলোক তাকেও যাচাই কবে বাজিয়ে নিতে বলেছিলেন। এই প্রশ্নশীলতা, বাস্তবের মূল্যায়ন আবার মনেব গভীরের দিকে ইঙ্গিত, এবং সর্বোপরি সর্বনাশচেতনাকেই সাহিত্যেব মূল বিষয় করে তোলায় এঁদের পক্ষে পঞ্চাশ দশকে জনপ্রিয়তা সহজেই সম্ভব হয়েছিল।

আজ এই ষাটের দশকে দিক-পরিবর্তন অবশ্যই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উপরোক্ত লেখকেরা এখন পূর্বনো বলে পবিত্যক্ত হয়েছেন। যে মনোভাব নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন সেই মনোভাব এই দশকের তরুণ লেখকদের নেই, বা আস্তে আস্তে কমে যাবে।

গত দশকে আর একটি প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। সেও ওই ভাঙন-চেতনাব ব্যাপ্তিরই ফল। বাঙালীর পুরনো ঐতিহ্য ও মহত্ত্ব, পুরনো ইতিহাসের চর্চা ইত্যাদি বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশকে আকৃষ্ট করেছে। উনিশ শতক বাংলার স্বর্ণযুগ নামে খ্যাত। উনিশ শতক নিয়ে বিপুল একটি উন্নাদনা তাই লক্ষ্য করা গেছে, কেন না গৌরব-গর্বকে আশ্রয় করতে না পাবলে একটি জাতি সঙ্কটকালে বাঁচে কী করে? উনিশ শতকের আলোচনা, তাই নিয়ে উপন্যাস, গল্প, জীবনী, চলচ্চিত্র সমস্তই পঞ্চাশ দশকে ব্যাপক আকারে হয়েছে।

ষাট দশকে বুদ্ধিজীবীদের কাজটি অত সরল নয়। জীবনে কুশীলব যত দিক আছে, যত দুর্মর পাপ আছে, সমস্ত জটিলতাসহ তাদের অল্পশীলন দরকার। প্রচলিত সংস্কার, বিশ্বাস, ধারণা, মূল্যবোধ, জীবনের ছক, প্রতিষ্ঠান অল্পাধিক প্রথা রীতি সব সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলতে হবে, মেনে নিয়ে বসে থাকলেই চলবে না, এবং সবচেয়ে বড় কথা, একটি বা দুটি সরল উপাদান বেছে নিয়ে তাবই চর্চিত চর্চণ কবলে অক্ষমণীয় অপবাধ হবে। বুদ্ধিজীবীরা এখন মনে কবছেন জীবন ও জগৎ পরম বহুস্তময়, পূর্ব-নির্ধারিত মতবাদ বা ধারণার ছকে তাকে ফেলা যায় না, তাকে নিত্য নতুন কবে জানতে হয়। বুঝছেন মানুষের মনোলোকে যেমন আছে একটিমাত্র আদিম রিপু নয়, বহু বহু রিপু, তেমনি আছে তার মধ্যে বিপুল শক্তি, স্বাধীনতার দুর্বার বাসনা, সৃষ্টির বিকাশের নিরন্তর তাগিদ। প্রেম ও সৌন্দর্য, আলো ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা আছে তার।

গত দেড় বছরে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা অনেকখানি এদিকে বাক নিয়েছে। এমন কি মার্ক্সবাদী তরুণ লেখকদের বচনাতেও সে আভাস পাওয়া যায়। এক দশক আগেও মানুষ, জীবন, সাহিত্য সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের যে সহজ সবল যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা তরুণ মার্ক্সবাদীরা এখন প্রায় অতিক্রম করে এসেছেন। জীবনকে যিবে ও জীবনের মাঝখানে যে অপাব রহস্য নিত্য খেলা করছে তা যে এক কথায় একটি ভদ্রে বা একটি উপাদানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায় না

অন্ততঃ এই বোধটুকু বুদ্ধিজীবীদের চেতনার দারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

আব এইখানেই বুদ্ধিজীবীদের বিপদ এই ষাট দশকে। জনসাধারণ—পাঠক, শ্রোতা, দর্শক—বুদ্ধিজীবীর গৃষ্ঠপোষক এই মহাশযেবা ঠিক উল্টো ভঙ্গী নিয়ে চলেছেন। আজকাল তাঁদের হাতে, সময় নেই যেমন নানারকম কাজের তাড়নায়, তেমনই আব একদিকে অবকাশ তাঁরা পছন্দও কবেন না। গতি চাষ আজ সবাই, ধীরে শান্তিতে একটু এদিক-ওদিক আশ-পাশ দেখে যে জীবনের স্বাদ নিতে চাইবে তেমন প্রবৃত্তি নেই আজকের জনতার। তারপর তারা নিজেদের অল্প শিক্ষা, অল্প জ্ঞান, অধৌক্তিক সব ধারণা বিশ্বাস সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে আত্মসন্তুষ্ট, তারা তাদের স্বভাব পালটাবাব প্রয়োজন বোধ কবে না। তাদের গৃষ্ঠপোষকতা লাভে ষাট দশকের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের কিছু কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হয়তো নিঃসঙ্গতা ও জনসাধারণের চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার যে সব বাস্তব ক্ষতি তা তাদের ভোগ করতে হবে, সে সম্ভাবনাই প্রবল। এবং সে ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন চিন্তামুক্ত বুদ্ধিজীবীদের বাস্তব সমৃদ্ধি ঘটাই স্বাভাবিক। পলিটসিয়ান বা কারিগরী বিভাধারীদের অর্থ প্রতিপত্তি সম্মানলাভের সময় এটা। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছাড়া সংবুদ্ধিজীবীদের হাতে আপাততঃ কোনও অস্ত্র নেই।

কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের দুর্বলতাও যথেষ্ট থেকে যাচ্ছে। তাঁদের প্রশ্নশীলতা সজীব নয়। গ্রহণক্ষমতাও অপরিপুষ্ট। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে। যুরোপে ইদানীংকালে অস্তিরাদের প্রসাব ঘটেছে ব্যাপক আকারে। কাবণ এই দর্শন শুধু বর্তমানকালের মানুষের মনের শূন্যতা ও গুরুত্বাবোধ দূর করে নতুন আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার করেছে তাই নয়, যুরোপের মনোভূমিতে নতুন সৃষ্টির বীজ এনেছে, দায়িত্ব কর্তব্য সংগ্রাম স্বাধীনতা ত্রায সব সম্পর্কেই নতুন দৃষ্টিবোধ ও নতুন মূল্য প্রচলন কবতেও তা উত্তম। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সমকালীন এই ফলপ্রসূ দর্শন সম্পর্কে অনবহিত থাকা সম্ভব নয়, পাশ কাটিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। বিশেষ করে আমি আগেই বলেছি, ষাট দশকের বাংলার তরুণ বুদ্ধিজীবীদের প্রবণতাই হচ্ছে পুরনোকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে

নতুনকে গড়ে তোলা, প্রচলিতকে অমান্য কবাব সঙ্গে সঙ্গে নতুন মূল্য সৃষ্টি করার দিকে। সাম্প্রতিক বাংলার সামাজিক পটভূমিতে সেটাই স্বাভাবিক। অতএব অস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, যা কোনও কিছুই নির্দিষ্ট বা বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে উৎসাহ দেয় না, আবার সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলের দায়িত্বভার চাপিয়ে দেয় প্রতিটি ব্যক্তির ওপর— এই দশকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীর কাছে অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। সার্তর ও কামু, কির্কেগার্ড হাইডেগার ও জ্যাসপার্স এঁদের নিয়ে আলোচনা, অস্তিবাদ সম্পর্কে ঔৎসুক্য— এখানে ব্যাপক আকার নিয়েছে। তরুণ কথাসিদ্ধীদের গল্পে ও উপন্যাসেও এই অস্তিবাদ এসে উপস্থিত হয়েছে। চিত্রে ও চলচ্চিত্রেও তার পদধ্বনি অশ্রুত নয়। এঁদের কেউ কেউ সচেতন ভাবে, কেউ বা অনিচ্ছুক ভাবে অস্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু অস্তিবাদ সম্পর্কে এঁদের ধারণা স্পষ্ট নয়, খানিকটা ভাষা-ভাষা পরিচয় মাত্র এঁদের মন, এবং তাই এঁদের লেখায় যান্ত্রিকভাবে অস্তিবাদের আমদানি কবা হয়েছে। এঁদের দোষ ক্ষমার শূন্য এই কারণে যে কিছু অধ্যাপক শ্রেণীর লোক প্রবন্ধ বচনার দ্বারা অস্তিবাদের আলোচনায় নেমেছেন ইদানীং। তাঁদের রচনা পাঠককে বিভ্রান্ত কবেছে। কয়েকটি পত্রিকা এই বিভ্রান্তি প্রচারের বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোঁজ কবলে সহজ ইংবেজিতে সংক্ষেপে অস্তিবাদ সম্পর্কে কিছু বই পাওয়া যায়। সেগুলি পড়লে অস্তিবাদ সম্পর্কে সামান্যই জানা যায় বা কিছুই জানা যায় না। এই সব পত্রিকায় প্রকাশিত অস্তিবাদ-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি আমি পড়েছি এবং অধিকাংশই যে সস্তা দামের ইংবেজি বই থেকে অস্তিবাদ কবে দেওয়া তা অনেক সময়ই বাংলা প্রবন্ধ ও

ইংবেজি বই মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছি গ্রাশতাল লাইব্রেরিতে। এও দেখেছি যে ইংবেজি লেখা ভাল কবে বোঝার চেষ্টা হয় নি অস্তিবাদের সময়। কিন্তু সবচেয়ে আপত্তিকর, অস্তিবাদী দার্শনিকদের নিজেদের লেখার সঙ্গে পবিচয় নেই অথবা আংশিক আছে এমন সব লোক দস্তভরে বাংলা ভাষায় অস্তিবাদ নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করছেন। অনেকক্ষেত্রে এও দেখেছি যে জনৈক মার্ক্সবাদীর লেখা একটি ছোট বই— যাতে অস্তিবাদী দার্শনিকদের লেখার বিকৃত ব্যাখ্যা করে অগ্রা্য আক্রমণ চালানো হয়েছে, সেই বইটি পাতাব পব পাতা বাংলায় অস্তিবাদ করে কোনও কোনও ব্যক্তি স্বনামে অস্তিবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধ নাম দিয়ে চালিয়েছেন। এগুলি ঘোবতব অগ্রা্য ও বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মানসিক অপরিণতির সাক্ষ্য দেয়। অস্তিবাদ কি মানবতাবাদ নামে সার্তরের নিজেব একখানি সংক্ষিপ্ত বই বাজাবে কিনতে পাওয়া যায় অল্পমূল্যে, অনেকেবই অস্তিবাদের জ্ঞান এই বইটির দৌলতে। কিন্তু এই বইটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও অতিশয় সরল বলে অস্তিবাদ সম্পর্কে সামান্যই কথা বলা সম্ভব হয়েছে সার্তরের পক্ষে। বিভ্রান্তি-প্রচারে অল্পজ্ঞানের ভূমিকাই বেশী থাকে—সেইহেতু এ বইটি প্রচার কবে সার্তর কিছুটা ক্ষতিই করেছেন বলব।

যাই হোক, বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মানসিক অপরিণতি, চারিত্রিক শিথিলতা, অল্পজ্ঞানে তৃপ্ত থাকা এবং চিন্তাবিমুখতা ইত্যাদি অক্ষালনীয় অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার ওপর তাঁদের ও এ-দেশের চিন্তা-আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর কবেছে। সে বিষয়ে আমাব কিছু বলার নেই। ষাট দশকে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের যে সব মানসিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে আমি শুধু সেটুকুই লক্ষ্য করছি।

কবিমানসী

জগদীশ
ভট্টাচার্য

॥ ষোড়শ অধ্যায় ॥

॥ শেষ অভিসার ॥

‘কবিমানসী’র প্রতি রবীন্দ্রনাথের অম্লরাগের পূর্ণাহুতি হয়েছে ‘সানাই’ গ্রন্থে। কবির চৌষটি বৎসর থেকে আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত যে কালপরিধিকে আমরা বলেছি কবিজীবনের দ্বিতীয় কৈশোর, তার আদিত্যে আছে ‘পূর্ববী’ আর শেষ প্রান্তে ‘সানাই’। কাব্যগ্রন্থ হিসাবে ‘সানাই’য়ের প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৪৭। ‘আকাশ-প্রদীপ’ প্রকাশের পর যে কবিতাগুলি সঞ্চিত হয়েছিল তাদের দু’ ভাগে ভাগ করে প্রকাশ করা হল ‘নবজাতক’ [প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৪৭] আর ‘সানাই’ গ্রন্থে। কাব্যগ্রন্থের ভার পড়েছিল অমিয় চক্রবর্তীর উপর। তিনি ‘নবজাতকে’ সেই কবিতাগুলিকে স্থান দিলেন যারা কবির ভাবনায় “বসন্তের ফুল নয়” “প্রৌঢ় স্বপ্নের ফসল”, “বাইরে থেকে মন ভোলাবাব দিকে এদের ওদাসীত্ব”, “ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা” থেকেই এরা উদ্ভূত। ‘সানাই’য়ের কবিতাগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। সেগুলিকে বলা যেতে পারে কবির, “শেষ বসন্তের ফসল। এই সংকলনের প্রথম কবিতা “দূরের গানে” কবি বলেছেন, বাসহারা তাঁর মন “তারাব আলোতে কোন্ অধরাকে কবে অব্ধেষণ, পথে পথে দূরেব জগতে।” সেই দূর্বাসীর উদ্দেশ্যে শেষবারের মত কবিকণ্ঠে “চিবপ্রবাসের বাঁশি” বেজে উঠেছে ‘সানাই’ গ্রন্থে। কবি বলেছেন :

দিগন্তের নীলিমার স্পর্শ দিয়ে যেবা

গোধূলিলগ্নের ঘাত্রী মোর স্বপ্নেবা।

নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্ৰান্ত হতে

নিষেয়ায় চিত্ত মোর অকুলেব অবাবিত স্রোতে,

চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতয়ারে

অজানার অতিদূর পারে।

[দূরের গান।

মূলত ‘সানাই’ প্রেমকাব্য। কিন্তু ‘মহয়া’-যে অর্থে প্রেম-কাব্য সে অর্থে নয়। ‘মহয়া’য় নিখিল নবনাবীর চির-পুরাতন বিরহ-মিলন-কথাই কবিকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে। ব্যক্তি-পরিচ্ছেদ-বিগলিত সাধারণীকৃত মানবপ্রেমই ‘মহয়া’র উপজীব্য। কিন্তু ‘সানাই’য়ের আটত্রিশটি কবিতা ও বাইশটি গানের অধিকাংশই কবির উত্তমপুরুষের অন্তরঙ্গ অম্লরাগের কাব্যরূপ। সারাজীবন কবিমানসে যে প্রেম সংগুপ্ত স্মৃতিসিদ্ধি মনন করে তারই অমৃত শেষ বাবের মত পবিবেষিত হল এই গ্রন্থে। এই দিক দিয়ে রবীন্দ্র-কাব্যলোকে ‘সানাই’ অদ্বিতীয় অতুলনীয়।

‘সানাই’য়ের মানসো-প্রেমকে আমরা বলেছি স্মৃতি-সিদ্ধি মননসজাত অমৃত। কবিজীবনের উত্তরার্ধে তাঁর প্রথম যৌবনের সেই অম্লরাগ স্মরণ-সরণিতেই কবিমানসে বিলসিত হয়েছে। কিন্তু সেই স্মৃতি শুধু অতীতের পুনরুজ্জীবকই নয়, সে নবরূপের স্রষ্টাও বটে। রবীন্দ্র-জীবনীকাব্য একটি অপূর্ব-সুন্দর উদ্ধৃতির সাহায্যে এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন :—“Symbolic, memory is the process by which man not only repeats

his past experience but also reconstructs this experience. Imagination becomes a necessary element of true recollection”

কবি নিজেও বত্রিশ বৎসর বয়সে ইন্দিবা দেবীকে লেখা একখানি চিঠিতে [৩০ এপ্রিল ১৮৯৩] স্মৃতির এই জাহ্নমজের কথা বলেছেন। কবি তখন জোড়াসাঁকোয় ছিলেন। ৩০ এপ্রিল মানে বৈশাখের প্রথমার্ধ। আকাশে ছিল চতুর্দশীর চাঁদ। রাত দশটায় নির্জন ছাতে একলা পড়ে পড়ে কবি সমস্ত জীবনের কথা ভাবছিলেন। সেই তেতলার ছাত, সেই জ্যোৎস্না, সেই দক্ষিণের বাতাস স্বভাবতই কবিকে স্মৃতিচারী কবে তুলেছিল। অর্ধেক চোখ বুজে কবি তাঁর ছেলেবেলাকার মনের ভাব-গুলিকে মনে আনবার চেষ্টা কবছিলেন। সেই অল্পভূতিকে ভাষা দিয়ে তিনি লিখছেন, “পুরোনো স্মৃতিগুলো মদেব মতো—যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে। আমাদের এই স্মৃতির বোতলগুলি বুড়ো বয়সেব জন্তে ‘in deep-delved earth’ ঠাণ্ডা করে রেখে দেওয়া যাচ্ছে—তখন বোধ হয় ছাতের উপর জ্যোৎস্না-রাতে এক এক ফোঁটা করে আশ্বাদ কবতে বেশ লাগবে। * * * তখন জ্যোৎস্নাবাত্রে স্থিৎ জলাশয়ের মতো আমাদের অচঞ্চল মনে পূর্বস্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে পড়ে যে বর্তমান ব্যাপাবের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত।”

কবিমানসে এই ‘Symbolic memory’র সৃষ্টিক্রিয়া অতীত বর্তমানের প্রভেদ বিলুপ্ত করে দিয়েছে। কাল-প্রবাহ নিত্যবর্তমানের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

২

ববীন্দ্রনাথের এই শেষ প্রেমকাব্য, মানসীর উদ্দেশ্যে তাঁর এই শেষ ‘পুষ্পাঞ্জলি’র ‘সানাই’ নামকবণটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। কাদম্বরী-দেবীর মৃত্যুর পব থেকে কবিমানসে বাঁশি বা সানাই বা নহবতের আবেদন বাব-বাব বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসে বিবাহ-বাসর থেকে ভেসে-আসা সানাইয়ের স্বব কি ভাবে “উৎসবের দিন”, “গানের

সাজি”, “লীলাসজ্জিনী”, “শেষ অর্ঘ্য”, “বেঠিক পথের পথিক” ও “বকুল-বনের পাখি”—‘পূববী’র এই একগুচ্ছ কবিতার জন্ম দিবেছিল তার কথা বলা হয়েছে। “উৎসবের দিনে” সানাইয়ের স্বব শুনে কবির মনে হয়েছে :

অশ্রুর অশ্রুতধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস,
দূব বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে পুনশ্চ মনে পড়বে ‘লিপিকা’র “মেঘদূত” ও “বাঁশি”র কথা। সেখানে কবি বলেছেন :

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল।

সে বলেছিল, “সেই মানুষ আমার কাছে এল
যে মানুষ আমার দূরের।”

আর বাঁশি বলেছিল, “ধরলেও যাকে ধরা যায়
না তাকে ধবেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে
যায় তাকে পাওয়া গেল।”

[“মেঘদূত”, লিপিকা।

বাঁশিব বাগী চিরদিনেব বাগী—শিবের জটা
থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতিদিনের মাটিব বুকে বয়ে
চলেছে, অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্যের ধূলি
নিষে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

* * *

গানের স্বর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত
চেনা কথার পর্দা একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।
চিরদিনকার বব-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাং-
শুকব সলজ্জ অবগুষ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে
প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে
বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটিব দিকে
চেয়ে দেখলেম, তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে
ছগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের
পদ্মটির উপর দাঁড়িয়ে।

স্বরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ
বলে আঁব চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে
অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

[“বাঁশি”, লিপিকা।

উদ্ধৃত অংশে “শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা”, আর

“কান্নাব সরোবরে আনন্দের পদ্ম”—এই ছুটি রূপকল্প বংশীধ্বনি ও তাব আবেদনের নূতন ব্যঞ্জনা বহন কবে এনেছে।

‘ছিন্নপত্রাবলী’র -২১০ ও -২১১—এই দুখানি পত্রের স্মৃতির সঙ্গে বাঁশি বা নহবতের সুরের সম্পর্কের কথা কবি বলেছেন অন্তরঙ্গতর ভাষায়। এই পত্র দুখানি ১৮৯৫ সনের বৈশাখ মাসে জোড়াসাঁকো থেকে লেখা। দ্বিতীয় পত্রে লিখছেন, “আজ কোথা থেকে একটা নহবৎ শোনা যাচ্ছে। সকালবেলাকাল নহবতে মনটা বড়ই ব্যাকুল করে তোলে। *** সংগীত তাব নিজের ভিতরকার স্বন্দব সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী এক মোহমগ্নে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পারস্পেক্টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না—*** সৌন্দর্যমাত্রেরই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।”

২১০-সংখ্যক পত্রখানি কবিমানসে স্মৃতি ও সুরের যুগ্ম লীলাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে উন্মীলিত করেছে। কাদম্ববী দেবীর মৃত্যুদিনেব কাছাকাছি কোন একটা মুহূর্তের “অকাবণ চঞ্চলতা” এই পত্রে ধরা পড়েছে। সেদিন [১৮৯৫ সনের ২৪ এপ্রিল] সকালবেলা থেকে স্নগভীর আলস্রে কবিকে আক্রমণ কবেছে। জোড়াসাঁকোব দোতলার নির্জন সব এবং বারান্দায় তিনি অকর্মণ্যভাবে কেবলই ঘুবঘুর করে বেড়িয়েছেন। শরীরের সমস্ত সন্ধিগুলো যেন শিথিল হয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গুণ্ডু কবে মেঘ ডাকতে লাগল। মধ্যাহ্নটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে চারিদিকে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। কবির মনের ভিতরটা একটা অকারণ চঞ্চলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল—তার হাতে যে কাজই দেওয়া যায় সে সমস্তই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। কবি লিখছেন :

“মাসেব মধ্যে উনত্রিশ দিন সে ছোটোখাটো উপস্থিত কাজ নিয়ে বেশ চালিয়ে দেয়; কোনো গোল কবে না—হঠাৎ ত্রিশ দিনের দিন সে-সমস্ত কাজ সে পদাঘাত কবতে থাকে। বলে, ‘আমাকে এমন একটা কিছু দাও

যা খুব মস্ত—যাতে আমার সমস্ত দিনরাত্রি, সমস্ত ছোটো বড়ো, সমস্ত ভূত-ভবিষ্যৎ একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারে।’ *** মাহুষেব স্বার্থ স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে সেই একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে আপনাব সমস্ত জীবনকে এক্য বন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা। *** সেই জন্তেই প্রতিদিন সমাজের মধ্যে থেকে, এক-একদিন মনে হয়—

আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।”

ভাতুপুত্রীকে লেখা এই পত্রে আত্মমানসের গোপন বহন্তকে যতটা উন্মীলন করা সম্ভব কবি ততটা করেছেন। “একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে আপনার সমস্ত জীবনকে এক্যবন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা।”—এই বাক্যটি যেন কবিমানস সম্পর্কে একটি দিব্য নির্দেশ। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে উচ্চাবিত এই ইচ্ছাই তো কবির সারাজীবন-ব্যাপী স্বপ্ন ও সাধনাব মর্মবাণী। এই ডাককেই তো কবি বলেছেন বাঁশি ডাক।

‘সানাই’য়ের কেন্দ্রগত কবিতাগুলি রচনার মূলেও রয়েছে ওই বাঁশি ডাক। এই সংকলনের বহু কবিতা ও গান ১৯৪০ সনের জাম্বুয়ারি মাসে লেখা। রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনীর বিবাহ হয় ১৯৩৯ সনেব ৩০ ডিসেম্বর। নন্দিনী [ডাকনাম পুপে] পিতা চতুর্ভূজ ছিলেন কচ্ছদেশীয় জর্নৈক বণিক। তিনি কিছুদিন শাস্তিনিকেতনে সপবিবাবে বাস কবতে আসেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন উন্মাদ-রোগগ্রস্তা। রথীন্দ্রনাথের পত্নী প্রতিমা দেবী চতুর্ভূজের শিশুকন্যা পুপেকে নিজের কাছে নিয়ে নিজের মেয়ের মতই লালনপালন করেন। পুপেও ছেলেবেলা থেকে প্রতিমা দেবীকেই নিজের গর্ভধারিণী জননী বলে জানতেন। মীরা দেবীর মেয়ে নন্দিতা আর রথীন্দ্রনাথের এই পালিতা কন্যা নন্দিনী—কবির এই দুই নাতনী তাঁর শেষজীবনের অপরিসীম স্নেহের পাত্রী ছিলেন। নন্দিনীর বিবাহ হয় বম্বের অজিত সিং মোরারজি খাটাউষেব সঙ্গে। বিবাহোৎসবে বিপুল আড়ম্বর হয়েছিল। কবি তখন ছিলেন ‘উদীচী’ নামে নূতন বাড়িতে। বিবাহের উচ্ছলিত কলকোলাহলের মধ্যে ভেসে আসছিল আলিহোসেনের সানাইষেব সুর। এই সুরের জাহ্নুমন্ত্রই জন্ম দিল পাঁচদিন পবে, চৌঠো জাম্বুয়ারি তারিখে লেখা, ‘সানাই’য়ের নামকবিতার। সমস্ত ছন্দ-

ভাঙা অসংগতির মধ্যে সানাই লাগাল তাব সাবঙের তান।
এক নিবিড় ঐক্যমস্ত্রে সমস্ত বাঁধা পড়ল। কবি লিখেছেন :

অরুণেব মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি

উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।

সন্ধ্যাতাবা-জালা অন্ধকারে

অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর মাঝারে,

তেমনি স্বদ্বন্দ্ব স্বচ্ছ স্বব

গভীর মধুর

অমর্ত লোকের কোন বাক্যেব অতীত সত্যবাণী

অন্তমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।

নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা

বেদনাব মুছ'নায় হয় আত্মহারা।

কবিতার উপসংহারে কবির অন্তবদ্বন্দ্ব আত্মকথাটিও
নির্বাহিত হয়েছে। কবি বলছেন :

এই স্বর প্রত্যাহের অবরোধ-পরে

যতবার গভীর আঘাত করে

ততবার ধীবে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়,

ভাবী যুগ আবন্তের অজানা পর্বাণ।

নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই

সব ভুলে যাই,

মন যেন ফিবে

সেই অলক্ষ্যেব তীরে তীরে

যেখানকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে

পদ্মেব কোরকসম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

সানাইয়েব স্বব কবির মনকে নিয়ে গেছে সেই অলক্ষ্যের
তীরে তীরে যেখানকার রাত্রিদিন “দিনহারা রাতে পদ্মের
কোরকসম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।” ‘সানাই’য়ের
প্রেমের কবিতাগুলিতে রয়েছে কবির ‘আপনাতে প্রচ্ছন্ন’
‘দিনহারা রাতে’র পদ্মকোবকের উন্মীলন-লীলা।

৩

১৯৪০ সনের জাহ্নুয়ারি মাসে লেখা রচনাগুলি
এখানে পর পর সাজিয়ে দেওয়া গেল। ৪ জাহ্নুয়ারি—
‘সানাই’। ১০ জাহ্নুয়ারি—পূর্ণা, দেওয়া-নেওয়া, রূপকথায়,
আহ্বান। ১১ জাহ্নুয়ারি—শেষবেলা। ১২ জাহ্নুয়ারি—
শেষ দৃষ্টি। ১৩ জাহ্নুয়ারি—অনাবৃষ্টি, নতুন রঙ, গানের

খেয়া, অধবা, ব্যথিতা। ১৫ জাহ্নুয়ারি—জানানায়,
কর্ণিক, দ্বিধা, আধোজাগা। ২১ জাহ্নুয়ারি—বিপ্লব।
২৮ জাহ্নুয়ারি—রূপ-বিরূপ, কর্ণধার।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ১০, ১৩ ও ১৫ জাহ্নুয়ারি এই
তিন দিন কবি চার-পাঁচটা কবে কবিতা লিখেছেন।
জাহ্নুয়ারির এই দিনগুলিতে কাব্যবচনাব যেন জোয়ার
এসেছিল। ‘সানাই’ গ্রন্থের ছোট ছোট বচনাগুলিব একটা
বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। এইগুলি প্রায় গানের রূপ নিয়েই
জন্মগ্রহণ করেছে। ‘সানাই’য়ের এই বচনাগুলিকে নতুন
নামে বিশেষিত কবে বলা যেতে পারে—গীতিকল্প কবিতা।
বিশ্বযেব বিষয় এই যে, সর্বদা কবিতা থেকেই গানের
রূপান্তর হয় নি। কোথাও বা গান রচিত হয়েছে আগে,
কোথাও বা কবিতা। এই প্রসঙ্গে ‘সানাই’য়ের গীতিকল্প
কবিতাগুলিব সঙ্গে ‘গীতবিতানে’ব গানগুলির তুলনা করা
যেতে পারে :

১। “পূর্ণা” কবিতা :

তুমি গো পঞ্চদশী

শুক্রা নিগার অভিসার পথে

চরম তিথিব শশী।

গীতবিতানেব গীতিরূপ :

ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌছিলে পূর্ণিমাতে।

[প্রকৃতি ১১৫, গীতবিতান পৃ ৪৮১

২। “দেওয়া-নেওয়া” কবিতা :

বাদল দিনের প্রথম কদমফুল

আমাঘ করেছ দান,

আমি তো দিয়েছি ভবা আবেগের

মেঘমল্লার গান।

গীতবিতানেব রূপ :

বাদল দিনেব প্রথম কদমফুল কবেছ দান,

আমি দিতে এসেছি আবেগেব গান।

[প্রকৃতি ১০১, পৃ ৪৭৫।

৩। “রূপকথায়” কবিতা :

কোথাও আমার হারিয়ে যাবাব নেই মানা

মনে মনে।

মেলে দিলেম গানের স্বরের এই ডানা

মনে মনে।

গীতবিতানের রূপ :

অপবিবর্তিত :

[নাট্যগীতি—১০০, পৃ ৮০৩।

৪। “আহ্বান” কবিতা :

জেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ

বিজন ঘরের কোণে।

নামিল শ্রাবণ, কালো ছায়া তার

ঘনাইল বনে বনে।

গীতবিতানের রূপ :

এসো গো, জেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি

বিজন ঘরের কোণে, এসো গো।

[প্রকৃতি—১০৩, পৃ ৪৭৬।

৫। “অনারুষ্টি” কবিতা :

প্রাণেব সাধন কবে নিবেদন

করেছি চরণতলে,

অভিষেক তার হল না তোমার

করণ নয়নজলে।

গীতবিতানের রূপ :

মম হৃৎকের সাধন হবে করিছ নিবেদন

তব চরণতলে,

শুভলগন গেল চলে,

প্রেমের অভিষেক কেন হল না তব নয়নজলে ॥

[প্রেম—১২৮, পৃ ৩৬১।

৬। “নতুন রঙ” কবিতা :

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,

ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,

মুছে আসা সেই স্নান ছবিতে

রঙ দেয় গুঞ্জনগীতি।

গীতবিতানের দুটি রূপ :

(ক) ধূসর জীবনের গোধূলিতে

ক্লাস্ত আলোয় স্নান স্মৃতি।

সেই স্বরের কায়া মোর

সাথের সাধি,

স্বপ্নের সঙ্গিনী।

[প্রেম—২০২, পৃ ৩৬৫।

(খ) ধূসর জীবনের গোধূলিতে

ক্লাস্ত মলিন যেই স্মৃতি

মুছে-আসা সেই ছবিটিতে

রঙ একে দেয় মোর গীতি।

[প্রেম—২২৯, পৃ ৩৭৪।

৭। “গানের খেয়া” কবিতা :

যে গান আমি গাই

জানি নে সে

কাব উদ্দেশে।

গীতবিতানের রূপ—

আমি যে গান গাই

জানি নে সে কার উদ্দেশে।

[প্রেম—২০৪, পৃ ৩৬৩।

৮। “অধরা” কবিতা :

অধবা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে

এ মোর ছন্দ বন্ধনে।

বলাকাপাতিব পিছিয়ে পড়া ও পাখি,

বাসা স্বদূরেব বনেব প্রাঙ্গণে।

গীতবিতানের রূপ :

অধবা মাধুরী ধরেছি ছন্দবন্ধনে।

ও যে স্বদূর প্রাতেব পাখি

গাহে-স্বদূর রাতেব গান ॥

[প্রেম—২০৩, পৃ ৩৬৩।

৯। “ব্যথিতা” কবিতা :

জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না।

ও আজি মেনেছে হার

কুর বিধাতার কাছে।

সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে

অতলে জলাঞ্জলি।

গীতবিতানের রূপ :

ওরে জাগায়ো না,

ও যে বিরাম মাগে

নির্মম ভাগ্যের পায়ে

ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে

অতলে জলাঞ্জলি।

[প্রেম—২০৭, পৃ ৩৬৪।

১০। “রূপণা” কবিতা :

এসেছিল ঘরে ঘনবর্ষণ রাতে,

প্রদীপ নিভালে কেন অঞ্চলঘাতে।

গীতবিতানের রূপ :

এসেছিলু ঘারে তব শ্রাবণবাত,
প্রদীপ নিভালে কেন অঞ্চলঘাতে

[প্রকৃতি-১০২, পৃ. ৪৭৮।

১১। “দ্বিধা” কবিতা :

এসেছিলে তবু আস নাই, তাই
জানায়ে গেলে

সমুখের পথে পলাতকা

পদ-পতন ফেলে।

গীতবিতানের রূপ :

এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে।

[প্রকৃতি-১০৮, পৃ. ৪৭৮।

১২। “আধোজাগা” কবিতা :

রাত্রে কখন মনে হল যেন
যা দিলে আমার ঘারে,
জানি নাই আমি জানি নাই, তুমি
স্বপনের পারাবাবে।

গীতবিতানের রূপ :

স্বপ্নে আমার মনে হল
কখন যা দিলে আমার ঘারে, হয়।
আমি জাগি নাই, জাগি নাই গো,
তুমি মিলালে অন্ধকারে, হয়॥

[প্রকৃতি-১০৬, পৃ. ৪৭৭।

এই বারোটি গীতিকল্প কবিতা শুধু ১২৪০-এর জাহ্নুয়ারি মাসেই লেখা। তা ছাড়া ‘সানাই’য়ে ১২৩৮-৩৯-৪০ সনের মধ্যে লেখা অল্পরূপ যে সব রচনা আছে সেগুলি হল : “বিদায়” [গীতবিতানে—বসন্ত সে যাষ তো হেসে, যাবার কালে], “যাবার আগে”—[এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে], “ছায়া ছবি” [আমার প্রিয়ার ছায়া], “উদ্বৃত্ত” [যদি হয়, জীবন পূরণ নাই হল], “ভাঙন” [তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে স্বপ্নরাত্রে], “গানের জাল” [দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে], “মরিয়া” [আজি মেঘ কেটে গেছে সকাল বেলায়], “গান” [যে ছিল আমার স্বপনচারিণী], “বাগীহারী” [বাগী মোর নাহি], এবং “আত্মছলনা” [দোষী করিব না, করিব না তোমারে]।

এই গীতিকল্প কবিতাগুলির বিষয়ালম্বন প্রেম, আশ্রয় কবিমানসী। কবি একদিন তাঁর কণ্ঠের গানকে বলেছিলেন তাঁর ‘শেষ পাবানির কডি।’ বলেছিলেন :

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তাবে জানি।

প্রেমের লীলায় আরও অন্তবদ্ধ হবে গুনিয়েছিলেন :

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।

আমাব স্ববগুলি পাষ চরণ,

আমি পাইনে তোমারে ॥

বাতাস বহে মবি মরি,

আর বেঁধে রেখো না তরী,

এসো এসো পাব হয়ে মোব হৃদয়-মাঝারে ॥

কবি তাঁর জীবন-গোধূলিতে এই গানের সুরেই প্রেমের শেষপূজা সাজ কবলেন। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তরুণ কবিব হৃদয়বেদনা ভাষা পেয়েছিল ‘পুষ্পাঞ্জলি’তে। তাঁর প্রতি সাবাজীবনব্যাপী অল্পবাবের সর্বশেষ পর্যায়ে গানই হল তাঁর আত্মপ্রকাশের অন্তিম বাহন। কবি সারাজীবন যে প্রেমের সংগীত বচনা কবেছেন তাব মধ্যে কোথায় কি ভাবে তাঁর মানসলক্ষীর প্রতি হৃদয়ানুভবগত অল্পবাবিত হয়েছে তা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষায় বইল। কিন্তু ‘সানাই’য়ের এই বচনাগুলি প্রেমের মন্দিরে তত্ত্বপ্রেমিকের শেষ গীতি-পুষ্পাঞ্জলি।

‘সানাই’কে আমবা সাধাবণভাবে বলেছি কবির শেষ প্রেমকাব্য। কবিমানসের প্রেমের বিচিত্র লীলা ওর মধ্যে ধরা দিয়েছে। স্মৃতিচারণ থেকে আরম্ভ করে অতীত বর্তমানের বিভেদ লুপ্ত কবা নিত্যনবায়মান অল্পবাবের কত মধুর ভাবানুভব এই কবিতাগুলিকে মধুসাদী করে বেখেছে। প্রেম সম্পর্কে কবিব ভাবনা ও উপলব্ধি কখনও অন্তবদ্ধ আত্মকথা, কখনও নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিকতায়, কখনও উত্তমপুরুষের স্বগতোক্তিতে, কখনও কাহিনী-রূপের ঈষৎ-প্রগল্ভতায প্রসাধিত হয়েছে। এই কাব্য গ্রন্থেই কবি শেষবারের মত ধ্বনিপ্রধান ছন্দে গীতিকাব্য-

প্রানপাত্রে

শ্রীদেবত রেজ

৩

গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে শীলভদ্র ভাবছেন এক একটা মাতৃষ এক একটা রহস্য। শীলভদ্র নিজেই নিজেব কাছে একটা রহস্য। অতাবধি নিজের জীবনকে বিশ্লেষণ করেও এই রহস্যের সূত্র মেলে না।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম, পল্লীবা সামাজিক আধ্যাত্মিক পরিবেশ, বিগত জীবনের ছোটখাটো অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই সূত্রগুলো এত সাধারণ ও সামান্য যে এদেব দিয়ে তাঁর প্রকৃতিব এই বিষয়কে ব্যাখ্যা করা চলে না। শুধু তাঁর প্রকৃতিই যে একটা বিষয় তা নয়, তিনি জানেন প্রত্যেক প্রকৃতিই একটা বিষয়। তীর্থক্ষেত্রে কুণ্ডের পাশে যেমন বেড়া তেমনি এই স্থান-কাল-পাত্র, এবা এই পরম বিষয়ের চতুর্দিকে আবেষ্টনী মাত্র।

বর্ধমান জেলার অখ্যাত এক পল্লীগ্রামের কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা। যেমন অসাধারণ ভক্তিমতী তেমনি রূপসী।

শীলভদ্র ছিলেন মাতৃগতপ্রাণ। পৃথিবীব যা কিছু স্বন্দব, যা কিছু কাম্য সব একত্রিত-হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গোচর হয়েছিল এই মাতৃমূর্তিতে। এখন পর্যন্ত মায়ের রূপ, তাঁর সমগ্র মানসচবাচরের অধিষ্ঠাত্রী। মায়ের প্রভাব-মণ্ডল পেবিয়ে তাঁর কোন প্রবৃত্তিই যেন এখনও স্বাধীনতা পায় নি।

যৌবনে কোনও নারীতেই তাঁর মায়ের রূপেব এক কণিকাও তিনি দেখতে পান নি। হয়তো সারাজীবন অবিবাহিত থাকাব এটাই প্রধান কারণ।

শীলভদ্রের চিত্ত অবচেতন মনস্থলে অদৃশ্য মাতৃমূর্তির স্তম্ভে পুষ্টলাভ কবেছে সাবাজীবন ধবে। এখনও কোন-কোনদিন স্বপ্নে বালাকালে মায়েব কণ্ঠেব ডাক 'শীল' শুনে তাঁর মা বা অস্তরাত্মা আকুল হয়ে ওঠে। ঘুম ভেঙে দেখেন তিনি প্রৌচ শীলভদ্র। মা আছেন কালেব উজানে। এই উজান দেহ দিয়ে অনধিগম্য। অথচ মনে হয় এই সেদিন। কালটাকে মায়া মনে হয়। সেদিনেব সেই শিশুটাই প্রৌচস্বেব ছদ্মবেশ পরেছে মাত্র। সকলে বলবে শীলভদ্র পঞ্চাশোত্তব প্রৌচ। কিন্তু তিনি যেন অহুভব কবেন এই পঞ্চাশেব মধ্যে পনেরটি লুকিয়ে বয়েছে যেমন পনেরর মধ্যে পঞ্চাশ লুকিয়ে ছিল সেদিন।

শীলভদ্র তাঁর বাবার দেওয়া নাম। তাঁর বাবা শচীহুলাল এই শীলভদ্র নাম প্রথম পেয়েছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়েব কোনও পাঠ্যপুস্তকে। শচীহুলাল বলতেন ভারতের ষথার্থ মুক্তি আসবে আর এক নব নালন্দা স্থাপন করে। শিশু বা কিশোর শীলভদ্র তখন এই 'মুক্তি' কথাব পরিপূর্ণ ত্রোতনা বুঝতে পাবত না। আজ তাঁর মনে হয় এই 'মুক্তি'ব অর্থ শচীহুলালের জীবনব্যাপী অপূর্ণতা থেকে মুক্তি। লক্ষ্মীপ্রিয়াও একান্তভাবে তাঁর হয়ে উঠতে পারেন নি। লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁর চিত্তকে ঠাকুর দেবতা ও তাঁর পুত্র শীলভদ্রের মধ্যে এমনভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন যে শচীহুলালকে দেবার মত কিছু অবশিষ্ট ছিল না। হয়তো লক্ষ্মীপ্রিয়া আর তাঁর স্বামীর বয়সের ব্যবধানটা এত প্রশস্ত ছিল যে শুধু কর্তব্যেব সেতু দিয়ে সেটাকে লঙ্ঘন করা যায় নি।

তাঁর পুত্র ওই নব নালন্দাব প্রতিষ্ঠাতা হোক এই ছিল প্রৌচ শচীহুলালের কামনা। কী ভাবে, কোথায় এই

জ্ঞানপীঠ প্রতিষ্ঠিত হবে, কী অপূর্ব জ্ঞানরাশি বিতবিত হবে এখান থেকে, তা তিনি জানতেনও না, অনুমানও করতে পারতেন না। কতদিন সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোয় প্রাচীন তন্ত্রেব কোনও পুঁথি পড়তে পড়তে অন্তমনস্ক হয়ে এই ভাবী নালন্দার আকারটাকে কল্পনা করাব চেষ্টা করতেন। কল্পনায় কিছু একটা দেখতে পেতেন ভাবীকালের দুর্লভ্য বিস্তারের মধ্যে একটা অমোঘ ভবিষ্যৎের মত।

তারপর একদিন মৃত্যু তাঁকে তার স্বপ্নস্বপ্ন গ্রাস করল। শীলভদ্রেব বয়স বারো, লক্ষ্মীপ্রিয়ার বয়স তিরিশ।

এল জাতীয় আন্দোলন। তুণেব মত ছাত্র শীলভদ্র ভেসে গেল মায়েব ক্রোড থেকে। ভাসতে ভাসতে পৌঁছলেন জাতীয় বিদ্যালীতে। ডাক্তারী পড়লেন, সেবার্ধ্য শিখলেন। নিজের অজ্ঞাতে নিজের নালন্দার স্বপ্নেব পিছু পিছু ধেয়ে চলল তাঁব জীবনটা।

জাতীয় বিদ্যালয়ে ডিগ্রী নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন জাতীয় কোন নেতার চা-বাগানে চাকরি নিয়ে।

চাকরির প্রথম দিনটার স্মৃতি এখনও তাঁর মনের মধ্যে বেদনা দিয়ে বাঁধা একখানা আলোকচিত্রের মত স্পষ্ট হয়ে আছে।

* * *

গভীর রাত্রিতে ডাক পড়ল এক প্রস্থতির চিকিৎসাব। ম্যানেজারের স্ত্রী। মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে সত্য। প্রস্থতি অজ্ঞান হয়ে বয়েছেন। কী আশ্চর্য। মুখখানা তাঁর মায়েব মত। বয়সেও তাঁরই কাছাকাছি। সেই এক রূপ এক আদল। এই তাঁর প্রথম সন্তান।

মাঝে মাঝে ধরে প্রস্থতিব জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্তে অক্লান্ত চেষ্টা করলেন। কিন্তু জ্ঞান ফেরাতে পাবলেন না। ভোরবেলায় রোগিণীর হৃদস্পন্দন থেমে গেল।

* * *

বাড়ি ফিরে গ্রামে টেলিগ্রাম করলেন, যেখানে যত আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা তাঁর জানা ছিল সব জায়গায় টেলিগ্রাম কবলেন মায়েব সংবাদ নেবার জন্তে। মাত্র একখানা টেলিগ্রামের উত্তর এল। মা মাঝে গেছেন গঙ্গায় ডুবে। বিশ্বাস হল না।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলেন কলিকাতায়। কিছুদিন ধরে মায়েব সন্ধান কবলেন। কোথাও কোন সংবাদ পেলেন না। মাহুষ যে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে তা তিনি কোনদিন নিজেকে বোঝাতে পারেন নি। তবু মনে নিতে হল।

তার পরেব ইতিহাস তাঁব নিজের মনেই অস্পষ্ট। শুধু প্রথম যেদিন ব্যবসায়ে নামলেন সেই দিনটার কথা মনে আছে। 'লাভ' বস্তুটা কি তা যেদিন টেব পেলেন মাত্র সেই দিনটার কথা। এই 'লাভ' কী এবং কেন তা তিনি এখনও বুঝে উঠতে পাবেন নি।

ব্যবসায়ে এই 'লাভ' গুঞ্জীভূত হতে হতে তাঁকে ঠেলে সমাজের প্রায় উচ্চতম চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে আজ।

আজ তাঁর ব্যবসায় নানাদিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার কবে কবেক সহস্র মানুষকে তাঁর পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছে। তাঁব মনে হয় তাঁর এই ব্যবসায় মায়াবুদ্ধেব মত—আপনার বেগে সে বেড়ে উঠেছে। আপনার অন্তর্নিহিত বেগে সে শাখাপ্রশাখা বিস্তার কবেছে। লোকে বলে এটা তাঁর কীর্তি। কিন্তু তিনি জানেন এটা স্বয়ংসিদ্ধি। মাটির নিচে যেমন করে জড়পদার্থ ঘুটিং বেড়ে চলে তেমনি কবে এ বেড়ে উঠেছে। তাই তিনি শান্তি পান নি। মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি যেন জীবনসমূহে গুজিসন্ধান ডুব দিয়েছিলেন, গুজি উঠিয়ে আনতে পাবেন নি। পা দিয়ে তলদেশের লতাজাল তুলে এনেছেন।

এখন মুক্তি চাইছেন এই লতাজাল থেকে। যে 'চর' বস্তু নব নালন্দার স্বপ্ন লক্ষ্য করে পিতাব জীবনকে ঠেলে নিয়ে গেল মৃত্যুর দিকে, এ সেই 'চর' বস্তুবই ভিন্ন রূপ। এই 'চর' বস্তু তাঁকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কোথায় তা বুঝতে পারছেন না।

* * *

হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত উদ্বেগ জাগল। বিছানায় উঠে বসলেন শীলভদ্র।

চিত্তকে শান্ত করার জন্তে মনে মনে স্তোত্র পাঠ কবতে লাগলেন। মনে মনে স্তোত্র পাঠ করতে করতে চোখ মুছে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যুগের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন কোথাও খেয়া পাব
হচ্ছেন, সঙ্গে একটি নাবী—স্বপ্নিতা।

স্বপ্নিতার চোখেও ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে জানলা
দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। চাঁদ খেয়ায়
নেমেছে ঘাট থেকে। বানের ওপর খেয়া। সাদা মেঘ-
গুলো বানের জলের ওপর ফেনা। কিন্তু এ খেয়ার শেষ
নেই। ওপারের দিকে এতটুকুও এগোচ্ছে না খেয়া।
এ খেয়ায় হয়তো এপাব আছে, ওপাব নেই।

এই খেয়াব সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নিতাব মনও স্থতির স্রোতে
খেয়ায় নেমেছে। স্থিতি থেকে একখানা নেগেটিভ
আন্তববসে ডেভেলপড হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠে এল। গভ
বহব। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের একদিনের
অধিবেশনে স্বপ্নিতা শ্রোতা হয়ে গেছে। পরিপাটি করে
প্রসাধন করেছে। দামী একটা অপরিচিত স্বরভিঙ্গার
ছিটিয়ে দিয়েছে সাজসজ্জার ভাঁজে ভাঁজে। এই মুহূ
সৌভাগ্যের ভাঁজে—যেন ফুল তার স্বগন্ধেব ভিতরে—চূপ
করে বসে স্ববোধ শুনছিল স্বপ্নিতা।

বিশ্রামের সময় দেখল সামনের সাবিত্রে একটি যুগল
বসে বসেছে। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে তৃপ্তি হাসি
হাসছে। স্বপ্নিতা তাদের দুজনের মুখের পাশ দেখতে
পেল। কী অদ্ভুত মিল দুজনের মুখে! মনের মধ্যে
একটা স্বপ্ন দীর্ঘা সিরসিব কবে উঠল। প্রথর হয়ে উঠল
কান।

তরুণ বললেন, আমি একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য
করলাম মিত্র।

তরুণী জিজ্ঞাসা কবল, কী ব্যাপার?

ওই স্বপ্নটার সঙ্গে এই সৌভাগ্যের কী আশ্চর্য মিল।

কোন সৌভাগ্য?

আমাদের কাছাকাছি কারো গায়ে রয়েছে।

তরুণী এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। হঠাৎ স্বপ্নিতাব
সঙ্গে চোখাচোখি হল। স্বপ্নিতা চোখ নামিয়ে নিল।

তরুণ মুখ ফিবিযে তার দিকে চেয়ে বললেন, এই তো
এঁব গায়ে।

স্বপ্নিতা কথাটা শুনে প্রথমে ভাবল তরুণ ভদ্রলোক
তাকে অতিপ্রসাধনের জন্তে বিদ্রূপ করছেন। চোখ

তুলে তাঁব মুখের দিকে চেয়ে দেখল, সে মুখে বিদ্রূপের
কোন লেশমাত্র নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওদের সঙ্গে স্বপ্নিতার পবিচয়
হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বরেন আবাব বলেছিলেন, এই স্বপ্নের
আসরে এসে আপনার সৌরভটা সার্থক হল। ওটা যখন
শিশিবে মধ্যে বন্ধ হয়ে স্টেশনাবী দোকানে পড়ে ছিল তখন
জানা যায় নি যে এই রাগটার সঙ্গে ওব এমন মিল আছে,
তখন পর্যন্ত ওই স্বপ্নিকর আবিষ্কর্তা সার্থক হন নি। আজ
এই মুহূর্তে ওর আবিষ্কর্তা নতুন কবে জন্মালেন।

বরেন যেন একটা ভিন্ন জায়গাব ওপব দাঁড়িয়ে কথা
রলেন, সেই জায়গাটা যেন ঘরেব মেঝে নয়। তাপস যেমন
কথা বলে অদৃশ্য একটা মধ্যে দাঁড়িয়ে।

অধিবেশন শেষে চলে-যাবার সময় বরেন আবাব
আপন মনে বললেন, কী বিচিত্র এই জগৎ! এর একটা
পদার্থেব সঙ্গে অত্র পদার্থেব কোন না কোন সূত্রে মিল
আছে। কাবও রঙেব সঙ্গে কারও স্বপ্নের, কাবও স্বপ্নের
সঙ্গে কারও সৌরভের।

স্বপ্নিতা দর্শনেব ছাত্রী ছিল। জগতের অখণ্ডত্বের তত্ত্ব
সে বহবার বহ স্থানে পড়েছে কিন্তু সেই তত্ত্ব যে কোন
মাহুষের উপলব্ধিতে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে তা সে এর
আগে কল্পনা কবে নি। তাই বরেন তার চোখে একটা
বিশ্ময়কর আবির্ভাব। বরেন শুধু তাঁব চেতনার পরিসরেই
বিশ্ময়কর নন, বিশ্ময়কর তাঁর রূপেও। এমন রূপ স্বপ্নিতা
কোনদিন দেখে নি। এ রূপ শরীরেব রূপ নয়। এ রূপ
রূপকেব-গুঢ় অর্থের মত মুখের ওপব ছড়িয়ে থাকে।
কবিতাব কথার রহস্য যেমন কথাব অতীত, তেমনি এ রূপ
দেহেব বহস্য কিন্তু দেহাতীত।

এবপর বহবার স্বপ্নিতা বরেনের বাড়ি গেছে। বহদিন
শ্রদ্ধাসহকারে মৃণালের সঙ্গে একত্রে বরেনের 'কথকতা'
শুনেছে। হ্যাঁ, কথকতাই। মৃণালের ভাষায় বিংশ শতাব্দীর
কথকতা।

এই অবসরে কখন যে নিজের মনের মধ্যে কী ঘটেছে
জানতে পারে নি। প্রথম যেদিন শীলভদ্র তাপসের সঙ্গে
তার বিষের কথা পেড়েছেন সেদিন থেকে মনের মধ্যে কী
একটা কীটের মত অনবরত বিধছিল। আজ সে

সেই অস্পষ্ট বেদনার স্বপ্ন সূচীমুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল।

বরেনেব সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপন কল্পনা করতে পাবে না স্থগিত। কোথায যেন বাধে। অভ্যস্ত অসতর্ক মুহূর্তেও মনে মনে সে অতদূর এগোয় নি। যে কথা সে কোনদিন ভাবে নি, সেই কথা সে আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে আবিস্ত করল। ভাবতে চেষ্ঠা করল বরেন তাব পাশে শুয়ে রয়েছে...তাব ডান হাত যেন ঘূমেব ঘোবে স্থগিতাকে। স্থগিতাব অসহ্য হল। উঠে গিয়ে মাথাব কাছে জানলাটাব পর্দা তুলে দিল। এক বালক রুষ্টি-ধোওয়া জ্যোৎস্না পড়ল বিছানাব ওপব। খাটের কানায় বসে স্থগিতা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছে। এমন একটা মানসিক অবস্থায় রয়েছে যে অবস্থায় স্বপ্ন অবচেতনেব কূল ছাপিয়ে জাগ্রত অবস্থাব মধ্যে চলে আসে, আব জাগ্রত চেতনা অবচেতনেব সীমানা যায় পেবিষে। সমগ্র মনের এ একটা একাকার অবস্থা—প্রাণেব অবস্থাব মত।

* * *

বিছানাব ওপব জ্যোৎস্না ধোওয়া স্থানটিতে বরেন ঘুমোচ্ছেন। কপালটা চিক্‌চিক্‌ কবছে, যেন অত্রের ওপব খুব মুছ আলো পড়েছে। মুখটা যেন আসল মুখ নয়। মুখের একটা ত্রিতল ফোটোগ্রাফ।

এই কলকাতায় সে একবার ত্রিতল ছায়াছবি দেখেছিল একটা বিশেষ চশমা পরে। এখন এই জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় সে আবাব এক ত্রিতল ছায়াছবি দেখছে তার শয্যাব পর্দায়। গভীর বাজিতে। একাকী। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে বইল। বুঝতে পাচ্ছে না তার বুকেব মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য প্রজেক্টাব, চোখে বয়েছে গাঢ় মোহেব চশমা।

হঠাৎ কী মনে হল, স্থগিতা সেই মুখখানাব ওপর ঝুঁকে পড়ল। কপালে ঠোঁটে শীতের শয্যার শীতল স্পর্শ লাগল। বুকেব বাঁধ ভেঙে নামল কান্না। এই কান্না স্বপ্ন ও জাগরণকে আবাব নিজের নিজের স্থানে ঠেলে সরিয়ে দিল।

* * *

ঘূমেব ঘোরে স্বপ্নে সমীচ-ডাক্তার বিবাট একটা স্টিকচক্রে কী একটা ছায়ার পিছু পিছু ছুটে চলেছেন।

আজ সারারাত্রি ধরে এই স্বপ্নটা বারবার তাঁকে পেয়ে বসছে। ছুটতে, ছুটতে এগিয়ে এসে দেখলেন দুস্তব নদী। কিন্তু আশ্চর্য, নদীর ওপাবে সূর্য উঠছে! সহসা চোখ মেলে দেখলেন বাইরে সূর্য উঠেছে। একটা রাত্রিকে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ কবে সূর্য উঠেছে।

8

সূর্য উঠল। নিশীথের ফুলেব মত মনের গভীরে স্বপ্নেব ফুলেরা দল মুছে ঘুমিয়ে পড়ল। দিন হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল আহবণেব পালা, কাড়াকাড়ির পালা—গাছ থেকে শুরু কবে মানুষ পর্যন্ত সকলেবই জীবনে। সূর্য উঠল স্থগিতাব ঘরে।

কিন্তু স্থগিতা লক্ষ্যহীন। বিশ্ববিদ্যালয়েব পাঠক্রম শেষ হয়ে গেছে। সংসাবে কাজ নেই। এত সময় নিয়ে কী করবে ভেবে পায না। সময়টাকে এক গোছা তাসের মত হাতে নিয়ে বসে বয়েছে, মাঝে মাঝে আপন মনে গোছাটাকে 'ফেটে' নিচ্ছে, কিন্তু সেটাকে নিয়ে তাব খেলা করবারও স্বযোগ নেই। এই খেলার জগ্রেও আর-একটা যে মানুষ চাই। কিন্তু কোথায পাবে এমন মানুষ যে তার সঙ্গে এই সময়েব তাসেব গোছাটা নিয়ে খেলতে বসবে।

কিছুটা সময় কাটিয়ে দিল কাজের ভান করে। বাকি সময়টা কাটিয়ে দিল চোখ মেলে থেকে—বাইরে, অন্তরালকের জীবনযাত্রার দিকে। একবার রান্নাঘরে নেমে গিয়ে মসলার রঙিন জলে দামি শাড়ির কোণ ভিজিয়ে কাচতে বসে গেল, কাচতে কাচতে ঘেমে উঠল। সেই ঘাম শুকোবার জগ্রে শীতের দুপুরে বিদ্যুতের পাখা খুলে মিছিমিছি দুপুরেব বিদ্যুৎ-সববরাহেব লোভটা একতিল বাড়িয়ে দিল।

কখনও গেল পুরনো বই ঘাঁটতে। পরিত্যক্ত পাঠ্যপুস্তকেব পাশে পেনসিলেব নোট তুলতে বসল ইবেজার দিষে।

কখনও ববীন্দ্রনাথেব 'গীতবিতান'টা কোলে নিয়ে তাব রঙিন খদ্বেব মলাটের ওপর হাত বুলোতে থাকে।

কখনও দেখল পাশেব একতলা বাড়ির ছাদে একটা

বউ বালতিভর্তি কাপড় কেচে এনে নিঙড়ে নিঙড়ে ছাদের উপর টাঙানো তারে মেলে দিচ্ছে।

কখনও দেখল দূরে একটা নারকেল গাছের মাথায় একঝাঁক টিয়া উডছে— অদৃশ্য ঘূর্ণীর মধ্যে সবুজ কাপড়ের টুকরোর মত।

তবু কী যেন ভাবি হয়ে বসে রইল মনেব ওপর। এই বুঝি সময়ের ভাব মনের ওপব।

এমনি কবে দিনটা কেটে গেল। দিনটা কেটে যাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে মনের ভারটা হালকা হয়ে গেল।

হঠাৎ বিকেলে তাপস টেলিফোন কবে জিজ্ঞাসা করল সে কী করছে। জবাব দিল বেরুচ্ছে।

* * *

যে গাড়িখানা পরে ছিল বরেনের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনে সেই গাড়িখানা আবার পরল। সেই সন্ধ্যায় যে আতবটা মেখেছিল সেটাই আবার মাখল।

বেশবাস পরিপাটি করে যখন গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল তখন বেলা পড়ে গেছে। আজ গাড়ি চড়বে না। পায়েই পথ হাঁটবে।

পথে নেমে গ্যারেজ-ডাক্তারখানার দিকে চেয়ে দেখল বন্ধ। লোহাব দরজায় তালা বুলছে। মুহূর্তের জন্তে কী যেন ভাবল তারপর হাঁটতে শুরু করল। ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এল। দু-এক জায়গায় তখনও সোনালী আলোর টুকরো ছড়িয়ে পড়ে ছিল। দিনেব ড্রাগনটা চলে গেছে, তার গায়ের কয়েকটা আঁশ মাত্র পড়ে রয়েছে এদিক ওদিক।

ধীরে ধীরে এই আঁশগুলোও ধূসর হয়ে মিলিয়ে গেল। তখনও পথ চলছে স্মৃতি আচ্ছন্নের মত।

সহসা দেখে সে একটা সিনেমা হলব সামনে বিছাতেব লেখায় উজ্জ্বল একটা কংক্রিটের ছাতার নীচে এসে পড়েছে। দু-একটা লোক ঘোবাঘুবি কবছে তার নিচে। বাকি সবাই ভিতবে চলে গেছে। দেওয়ালে একটা ছবিব পোস্টার। পোস্টারের নিচে পরিচালক তাপসের নাম দেখে চমকে উঠল। মনে হল সে এতক্ষণ তাকে তাব অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করে এসে এখানে ধবে ফেলেছে। মনের মধ্যে একটা ভয়ানক অস্বস্তি জাগল।

প্রায় ছুটে গিয়ে একটা ট্রামে চড়ে বসল।

চলল উত্তরে।

যেতে-যেতে দেখল কয়েকটা দোতলা বাসের গায়ে বড় বড় অক্ষরে তাপসের নতুন ফিল্মটির প্রচাবচিত্র। ফিল্মটির নাম “একুল ওকুল”। এটার কথা সে আগেই শুনেছে। এখনও দেখে নি। হয়তো এখনও তৈবি হয় নি।

একটা জায়গায় ট্রাম থেকে নামল।

ট্রাম থেকে নেমে এপথ-ওপথ ঘুরে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সহসা তাব মুখখানা সাদা হয়ে গেল আশঙ্কায়।

এই বাড়ি তো! না, ঠিকানা ভুল করেছি!

স্মৃতি সসংকোচে দরজার কড়া ধবে নাড়ল।

* * *

সূর্য উঠল সন্ধ্যার-ডাক্তারের বিছানাব কোল ঘেঁষে। কিন্তু সন্ধ্যার-ডাক্তারের ঘুম ভাঙল না। বেলা গড়িয়ে গেল তবু ঘুম ভাঙল না।

আশেপাশের ফ্ল্যাটের লোকদেব কেউ না কেউ রোজ সকালে কোনও না কোনও আধিব্যাধি উপলক্ষ্যে ডাক্তারের পরামর্শ নিত। কেউ আসত এক কাপ গরম চা হাতে নিয়ে, কেউ বা আসত এক প্লেট কোনও খাবার নিয়ে। কেউ এমনি আসত গল্প করতে খববেব কাগজখানা হাতে নিয়ে। পুরুষবাও যেমন আসত তেমনি আসত বর্ষীয়সী মহিলাবা। ডাক্তারের শয়নকক্ষটা তাব ভোব-বেলাব চেয়ার। এখানে ডাক্তারের ফী লাগে না।

অন্যদিনের মত আজও প্রথমে কয়েকজন এসে দরজা বন্ধ দেখে ফিবে গেলেন। কিন্তু বেলা বেড়ে চলল। অফিসেব টাইম হয়ে এল। একজন অফিসের বাবু তাঁব ছোট মেয়েব অস্থখে বিরত হয়েছিলেন গত কয়েকদিন ধবে। আজ ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে অফিস যেতে উদ্বেগ বোধ করছিলেন। তাই অর্ধৈর্ষ হয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন। ভিতব থেকে সাদা পেলেন না কোন। একটু জোবে ধাক্কা দিতে দরজাটা খুলে গেল। ভিতব থেকে খিল দেওয়া ছিল না।

কয়েক মুহূর্তেব মধ্যে গোটা বাড়ির সবাই জানল ডাক্তারবাবু অসুস্থ অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে

রয়েছেন। সকলে মিলে তাঁকে কাছাকাছি বড হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর সারাদিনটা কেটে গেল। সমীর-ডাক্তারের চেষ্টানায় এই দিনটার কোন ছাপই বইল না।

অপবাহ্নে প্রথম চোখ মেলেই দেখলেন একখানা অপূর্ব স্নন্দর মুখের ওপর পড়ন্ত বেলায় কমলালেবু রঙের আলো পড়েছে। সহসা মনে হল সামনে এক মেজুব সূর্য উঠেছে। কিছুক্ষণ পবে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি কোন হাসপাতালের বেডে শুয়ে রয়েছেন। বেডের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নার্স।

মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লেন। এ তাঁর উচিত হয় নি। ডাক্তার হয়ে হাসপাতালে আসা। তা ছাড়া, তিনি তাঁর রোগের জন্য লজ্জিত হয়ে পড়লেন। এ রোগ তাঁর বংশে ছিল। এর আগে অনেকবার এই রোগের অস্পষ্ট আবির্ভাবও তিনি বুঝতে পেরেছেন নিজের দেহে মনে। অসুস্থতায় বললেন, আই অ্যাম সবি সিস্টার!

সিস্টার মুণাল দেবী একটু অবাক হয়ে বললেন, আমরাই ছুঃখিত ডক্টর বাব, আপনাকে আরও তাড়াতাড়ি সুস্থ করতে পারি নি।

সমীর সিস্টারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মনের মধ্যে কী একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হল। মনে হল গোটা সভ্যতা ওঁর দিকে যেন ঝুয়ে পড়েছে—যেমন শিকড় আলগা হয়ে এলে নদীর তীরের গাছ জলের দিকে ঝুয়ে পড়ে।

সিস্টার হয়তো বুঝতে পারলেন। গায়ে আলগোছে হাত বেখে বললেন, এবার রাত্রিটা এখানে বিশ্রাম করুন।

ডাক্তার বললেন, আমি তো জেনেছি আমার কী বোগ। এখন চলে গেলেও কিছু ক্ষতি নেই। মিছিমিছি আঁব-একটা রোগীও জায়গা দখল কবে পড়ে থাকব কেন?

তা ছাড়া, আমার রোগীবা—

না না, আজ ব্যক্তিগত আপনি যেতে পারেন না।

আমি কাল সকালে এসে একবার দেখে যাব। তার পর—

আপনি...কাল কখন?—এই কথাগুলোকে আশ্রয় করে মনেব একটা দুর্বোধ্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পেতে চাইল। সেই প্রকাশকে আটকাতে গিয়েই যেন

কথাগুলোকে সংযোগলেশহীন আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করল। যেন গুট অর্থটা আবছা থেকে যায়। হয়তো আবছা থাকল না।

কাল সকালেই আসব। কাল থেকে আমার সকালেই ডিউটি। আচ্ছা, আজ আসি।

নিজেব অজ্ঞাতসারে ডাক্তারের ডান হাতটা সিস্টারের দিকে এগিয়ে গেল। সিস্টার হাতটাব দিকে চেয়ে দেখতেই বিদ্যুৎবেগে সেটা সরিয়ে নিলেন ডাক্তার।

আচ্ছা আমি ডক্টর বাব, আমি নার্সদের বলে যাচ্ছি যাতে রাত্রে আপনার কোন অসুবিধে না হয়।—বলে মন্থবগতিতে বেরিয়ে গেলেন ওয়ার্ড ছেড়ে।

ডাক্তারের মনে হল অজ্ঞান অবস্থায় যেন একখানা মুখ তিনি দেখেছিলেন। সেই মুখের দিকে অতি অস্পষ্ট স্মৃতিব সন্ধে এই মুখখানা মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। মিলল কি মিলল না বুঝতে পারলেন না।

ওয়ার্ডের বাইরে সিস্টারের জুতোর খুটখুট আওয়াজ মিলিয়ে গেল। চেয়ে দেখলেন ওয়ার্ডে আলো জলে গেছে কখন। কাছের খোলা জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলেন বাইবে আবছা অন্ধকার।

ধীবে ধীবে বিছানা থেকে উঠে জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে বইলেন—আকাশের দিকে। মনে হল তাঁর মন ওই আকাশে স্নান করে নিয়েছে অজ্ঞান অবস্থায়। মনের মধ্যে একটা কথা গুঞ্জন করে উঠল, আমি কাল সকালবেলাতেই আসব।

ডাক্তারের মনে হল এই তো মাত্র সন্ধ্যা। সকাল তো অনেক দূর। তবু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সকালের জন্যই তো অপেক্ষা কবতে হবে।

৫

ববেন আব মুণালের ইতিহাস সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ইতিহাস থেকে একটু স্বতন্ত্র। ওঁদের বাবা মা জীবন নিয়ে যে পবীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা তাঁদের দিনে মধ্যবিত্ত বাঙালী নারীপুরুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না। ওঁদের বাবা দীপ্তিকুমার দিল্লি সেক্রেটারিয়েটে উচ্চপদে চাকরি কবতেন আর মা ললিতা দেবী, তাঁর বিবাহের পূর্বে, দিল্লির কোন মহিলা কলেজে অধ্যাপিকা

ছিলেন। ললিতা দেবীর বয়স যখন চল্লিশ তখন দীপ্তিকুমারের সঙ্গে তাঁর পুণিচয়। দীপ্তিকুমার ললিতা দেবীর চেয়ে বয়সে বছর পাঁচেকের ছোট ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভালবাসা বয়সের কোন হিসেব মেনে চলে নি।

দীপ্তিকুমার অবসর সময়ে রসায়ন চর্চা করতেন। বন্ধুবান্ধব প্রথম প্রথম তাঁর অদ্ভুত বিবাহ নিয়ে তামাশা করতেন। কিন্তু তিনি গায়ে মাখতেন না। একবার তাঁদের তামাশার উত্তরে পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন, আমি ভালবাসা নিয়ে একপেবিমেন্ট করছি—যুক্তি দিয়ে কষে, মনন দিয়ে মেপে। জবাবটা তামাশা কিনা তা সেদিন তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা বুঝতে পাবেন নি। ললিতা দেবী শুনে শুধু মুহু হেসেছিলেন।

এমন সর্বাঙ্গসুন্দর বিবাহ খুব কমই ঘটে থাকে। ছুটি পবিত্রত মনেব স্বেচ্ছাপরিণয়ে যে অগাধ স্থখ তা তাঁরা দুজনেই তাঁদের কয়েক বৎসর স্থায়ী দাম্পত্যজীবনে পরিপূর্ণভাবেই পেয়েছিলেন।

প্রথম সন্তান ববেনের জন্মের পবই ললিতা দেবীর স্বাস্থ্য গুরুতর ভাবে ভেঙে পড়ে। ডাক্তার পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিল জন্মশাসন ছাড়া তাঁর জীবন টিকবে না।

শুনে ললিতা দেবী আবার মুচকে হেসেছিলেন।

ববেনের জন্মের দু বছর পরে—মৃণালের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিকাগাবে তিনি জীবন শেষ করলেন।

যে পরিচিত ডাক্তার তাঁকে জন্মশাসনের উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় কাছেই ছিলেন।

ডাক্তারের মনে দানাবাঁধা যে বিরক্তি তাঁর জরুজনের মধ্যে প্রকাশ হয়ে গেল তাব জবাবে একটি নিঃশব্দ হাসি হেসে ললিতা দেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবলেন।

ললিতার মৃত্যুর পর দীপ্তিকুমার সংসার থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। এর পর যে দীর্ঘ পনের বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, সেই দীর্ঘ সময়ে তাঁর একমাত্র সাধনা ছিল জীবকোষের রসায়ন ব্যাখ্যা। হয়তো মৃত্যুর তত্বকে মানুষের বৈজ্ঞানিকবোধ-সীমার মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। তাঁর গবেষণার ফল যে-সব কাগজপত্রে আশ্রয় পেয়েছিল সেগুলো তাঁর চিতার সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এটা কব্দি হয় তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে।

ললিতা দেবীর মৃত্যুর পর দীপ্তিকুমার সংসারে নিজেকে এত অসহায় অনুভব করেছিলেন যে পুত্রকন্টার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করতে সাহস পান নি। বিধবা ভগিনীর কাছে কলকাতায় তাদের বেখে যান। বরেন ও মৃণাল কলকাতায় পিসীমার কাছেই মানুষ। পিসীমাও তাঁর সংসারে একাই ছিলেন। পিসীমা বরেন ও মৃণালকে যৌবন পর্যন্ত পৌছে দিয়ে জীবন থেকে ছুটি নিয়ে গেলেন। পিতার পরিত্যক্ত কিছু অর্থসামগ্রী নিয়ে ভাইবোন স্বাধীন জীবন শুরু করলেন। পবম্পর পবম্পরের সঙ্গী। চিন্তাভাবনার অংশীদার। বাড়িভাড়া করে ছুটিতে একটা সংসার পাতলেন। কিন্তু তা টিকল না। একই সঙ্গে পড়া শেষ করে মৃণাল ববেনের এক সহপাঠীকে বিয়ে করে দাদার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আরও পাঁচজনের মতই প্রেমে পড়ে বিয়ে করল সে। বরেন তখন সত্ত পদার্থবিজ্ঞান এম এস-সি পাস করেছে।

মৃণাল চলে যাবার পব ববেন বাড়ি ছেড়ে দিয়ে হোটেল চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা গবেষণাবৃত্তি পেয়ে গেলেন।

তাবপর কয়েকটা বছর কেটে গেল। বরেন কয়েকটা বছর কাটালেন ল্যাবরেটরিতে আর মৃণাল স্বামীর সংসারে।

মৃণাল সন্তানের মা হল কিন্তু সন্তানকে জন্ম দিয়েই সে তাকে হারাল। কিন্তু এই পাওয়া আন হারানো তাকে আন-একদিকে তীব্রভাবে সচেতন করে তুলল।

বিয়ের প্রথম দিন থেকেই সে বুঝেছিল যে তার স্বামী ও স্বামীর পরিবারের লোকেরা ভাবনাচিন্তা আদর্শের অগ্র একটা স্তরে বিচরণ করে, কিন্তু এই পার্থক্যবোধ তাকে পীড়িত কবে নি। তার কাবণ প্রকৃতির ঝড়ঝঞ্ঝা। প্রকৃতি মানুষকে বশ করে তাকে তার আইনে কাজ করিয়ে নিল। দেহ পল্লবিত হল সন্তানে।

এই সন্তান জীবিত থাকলে আরও কিছুদিন প্রকৃতির জৈবলীলার এই ঘোব থাকত মৃণালের চোখে। কিন্তু সন্তান যখন বইল না, তখন তাব ঘোবটা গেল কেটে। মৃণাল বুঝতে পারল যেক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃতিকে স্বাকুল করে আপন ইচ্ছানুসারে কাজ করিয়ে নেবার সাধনায় নেমেছে, তার সেই বৃহত্তর ক্ষেত্রটা নিষ্ফল রয়ে গেল।

প্রশান্তচিবুক এই মেয়েটি কিন্তু হাব মানল না। জীবন নিয়ে, নতুন করে পবীক্ষায় নামল। প্রথমে নার্সিংবে কাজ গ্রহণ কবল তারপব কিছু অর্থ সংগ্রহ কবে গুণগ্রাহী চিকিৎসকদের সহায়তায় উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে এল বিলেত থেকে। তাবপর থেকে কলকাতাব একটি বিখ্যাত হাসপাতালে স্টাফনার্সের কাজ করতে শুরু কবেছে।

ইতিমধ্যে বরেন সবকারের সামরিক গবেষণাগারে গবেষক হিসেবে নিযুক্ত হযেছেন। কয়েক বছর ভারত-বর্ষের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে কাজ কবে কিছুদিন পূর্বে কলকাতার উপকণ্ঠে কোর্থাও বদলি হয়ে এসেছেন।

তাইবোন আবাব একজ্র হয়েছে। নতুন কবে বাসা করেছে।

* * *

তাইবোন আবার তাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাবনাচিন্তা আদর্শের স্তবে বাঁচতে আবস্ত কবেছে। মৃণাল জীবন নিয়ে আবাব নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নেমেছে। শুধু বাঁচা নিয়ে তৃপ্তি নেই। বাঁচার রহস্ত নিয়ে তাদের অল্পসন্ধান শুরু হয়েছে। দিনে কাজ করে, কাজ শেষ কবে সন্ধ্যায় এই জীবন নিয়ে আলোচনা করতে বসে। দিনের অভিজ্ঞতাগুলোকে সন্ধ্যায় তত্ত্ব দিয়ে বিচার করতে বসে। এ একটা নতুন ধরনের জীবন যা তারা শুরু করেছে।

আজ মৃণালের ঘোঁষন প্রায় সমাপ্তির দিকে চলেছে। এই বয়সে, জীবনের হেমস্তের প্রারম্ভে যে হেমস্ত-ফসল কেটে ঘবে তোলার সময় সেই হেমস্তেব প্রারম্ভে আবার যে বীজ বুনবে জীবন-জমিনে যেন তাই খুঁজে ফিরছে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে অবধি বারবাব মৃণালের মনে পড়ছে সমীর-ভাত্তাবের অজ্ঞাতসারে প্রসারিত হাতখানা। হাতখানা সে গ্রহণ করতে পারত। হয়তো গ্রহণ কবাই উচিত ছিল। কিন্তু তুচ্ছ শালীনতার সংস্কার এসে বাধা দিল। আত্মা কিন্তু এই শালীনতাব ধার ধারে না।

আজ হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর প্রত্যেক মুহূর্তে সে যেন দেখতে পাচ্ছে একটি নিঃসঙ্গ আত্মা তাব দিকে নিজেবে বাড়িয়ে দিযেছে। শুধু যে ভাত্তাবেব প্রতি করুণা জন্মেছে মনে তা নয়, সে যেন তাঁর নিঃসঙ্গ আত্মাব মধ্যে কোন একটা কিছু অস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পেযেছে। কী দেখেছে তা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে না।

যা দেখেছে তা কি প্রতিভার ছায়া? জীবনের উচ্চ কোটিতে 'দুরতায়্যা নিশিতা' ক্ষুব্ধ ধারের মত পথে চলতে চলতে একজ্র অপবজনব দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সে হাত কিন্তু সে গ্রহণ কবতে পারল না।

আজ সন্ধ্যাব আলোচনায় তাই ভাত্তাবের এই ব্যাধিব আলোচনাটাই বড় হয়ে উঠেছে। মৃণাল জোব দিযে বলল, প্রতিভাও ব্যাধি।—ব্যাধির একটা নতুন সংজ্ঞা দিল সে। বলল, দেহ বলো, মন বলো, এরা যখন পাবিপাধিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলে তখন তাদের আমরা স্বাভাবিক দেহমন বলি। কিন্তু দাদা, এই স্বাভাবিক অবস্থাটা তো দাঁড়িয়ে থাকাব অবস্থা ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতিব বিধানে এই স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুতি প্রতিক্ষণেই ঘটছে—প্রকৃতি যেন তার নিজের ল্যাবরেটরিতে দেহমনেব পবিপোষক অবস্থাগুলোর মধ্যে অদলবদল করে এক্সপেরিমেন্ট কবেছে।

কয়েক মিনিট চুপ করে বইল। মৃণালের মনে হল সত্ত জ্ঞান-ফিরে-পাওয়া সমীরেব চোখে মুখে সে একটা অব্যক্তকে দেখেছে। সেই অব্যক্তটাকে কথায় ব্যক্ত কবার জন্তে তাব সমস্ত মন উবেল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ যেন কথা পেযে গেল। গভীর অহুত্ব নিয়ে বলল, আমার কি মনে হয় জ্ঞান দাদা, চেনা তিনটে তল ছাড়াও প্রত্যেক পদার্থের আরও তিনটে তল আছে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা ছাড়াও তার অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে। এই ধর আমি, আমার মধ্যে মানুষের অতীত, মানুষের বর্তমান, মানুষেব ভবিষ্যৎ—এই তিনটে অবস্থা একসঙ্গে অধিষ্ঠান কবেছে। সকলের ক্ষেত্রেই এই বকম। কারও মধ্যে অতীতটা বড়, কাবও মধ্যে বর্তমান, কারও মধ্যে ভবিষ্যৎ। ওই তোমার, যারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেযেছেন—কাব নাম করব? যেমন ধর, শীলভদ্রবাবু—

কে তিনি?

সে কি! নাম গোন নি? বিখ্যাত গান্ধীবাদী, শিল্পপতি আর দাঁতা! আমাদের হাসপাতালের প্রস্তুতি-সদনে কিছুদিন আগে নিজেব মাযের নামে পাঁচটা বেড দান করেছেন।

বরেন হেসে বললেন, ও, তা ষাক, তবুটা বল শুনি, উদাহরণের বিবরণে যেন তবুের খেইটা না হারায।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওই ষাখা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, পাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে আমি খুব প্রবল দেখেছি অতীতটাকে। আমাদের মনে হয় তাঁদের মনেব খাত সরাসরি মিথলজির কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই খাত বেয়ে সেই যুগের অল্পভূতি একালেব কুল পর্যন্ত বয়ে আসছে। তোমার মধ্যে ভবিষ্যৎটা বড়। আণবিক যুগেব ওপারে যে যুগ সেই যুগ পর্যন্ত তোমার মনন তোমাব চেতনা বিস্তৃত। আব বাকী সব—আমি, স্থানিতা, এবা সবাই বর্তমানে প্রকাশমান।

বরেন বললেন, আমি চেতনাকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চেয়েছি মিছ, কিন্তু পারি নি। মানবচেতনাব ভবিষ্যৎ রূপ যে কী তাও আমি বুঝতে পারছি নে।

কথাগুলো যুগালেব কানে গেল না। সে নিজের আবেগে বলে চলল, আমাদের কী মনে হয় জান মনেব মধ্যে অসতর্ক নির্বোধ ষাফা বা কয়েকছত্র আপাত-অর্থহীন কবিতার কথাব বঙ্কাব—এবা আমাদের অস্তিত্বের ভবিষ্যৎ মেরুটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবছে। এই ভবিষ্যৎ অকারণে আমাদের চোখে জল এনে দেয়, নিজের অজ্ঞাতমারে আমাদের উন্মনা কবে। আমি তাই জীবনের ব্যতিক্রমেব মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনকে খুঁজে বেড়াছি।

কয়েক মুহূর্ত থেমে গাঢ়স্ববে বলল, আমি তাই অস্থস্থদের মধ্যে এই ভবিষ্যৎকে খুঁজে বেড়াছি।

বরেন মুহূ হেসে বললেন, তথাকথিত স্থস্থ লোকেবা তোমাকে আঘাত দিয়েছে বলেই তুমি অস্থস্থদের মধ্যে গেছ। স্থস্থ লোকেবা তোমাকে তাদের জীবন উপভোগেব উপকবণে পবিণত করতে চাইবে। কিন্তু অস্থস্থবা চাইবে তোমার সেবা। তাই নয় কি?

যুগাল ছোব দিয়ে বলল, ঠিক তা নয়, অস্থস্থদের মধ্যে নানা ব্যতিক্রমেব মধ্যে নতুন ধরনেব অস্তিত্বের আভাস দেখেছি আমি। অস্থস্থ ডাক্তার সমীব বাঘের মুখেব দিকে চেয়ে এমন একটা কিছু দেখলাম যা আমি কখনও কারও মুখে দেখি নি। স্বর্গীয় ভাব কী তা আমি জানি না কিন্তু তাঁব মুখেব এই ভাবটা যে পাখিব নয় তা আমি জোর করে বলতে পায।

বরেন এবার স্পষ্ট হেসে বললেন, তুমি আবার কাউকে ভালবাসতে চাইছ মিছ। তোমাব ভিতরে একটা দীপ জলেছে সেই দীপেব আলো পডছে অস্থদের মুখে।

যুগাল অস্বীকার না কবে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

* * *

ভিতরে যুগাল দেবীব প্রাণখোলা হাসি শুনে বাইরেব চৌকাঠে দাঁড়ানো স্থস্থিতার মনটাও লঘু হয গেল। দরজা ঠেলে দেখল তা বন্ধ নেই, ভেজানো আছে মাত্র। ঠেলে সে বরেনের ঘরেব মধ্যে ঢুকল মুহূ হাসতে হাসতে।

বরেন বিস্মিত হযে স্থস্থিতাব দিকে চাইলেন। যুগাল আবার হেসে উঠল। উঠে স্থস্থিতাকে জড়িয়ে ধবে নিজের পাশে সোফায় বসিয়ে দাদাকে লক্ষ্য করে হেঁয়ালিব স্থবে বলল, এর এ হাসিটা হাসি নয় দাদা, এটা কান্না। কান্না হাসির ছদ্মবেশ পবেছে। এই হাসির ছদ্মবেশে এর প্রাণ ভবিষ্যতের জগ্রে কাঁদছে।

এই হেঁয়ালি বুঝতে চেষ্টা করতেই স্থস্থিতার মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। ওকে লক্ষ্য কবে যুগাল বলল, ভালই হয়েছে তুমি এসে পডেছ। আমি একা ওর সঙ্গে তর্কে পেরে উঠছিলাম না। এবার তুমি ওর সঙ্গে বাক্যুদ্ধে নাম। ততক্ষণ আমি তিন পেয়াল চা করে আনি।

বলে হাসতে হাসতে উঠে গেল।

বরেন হেসে বললেন, জানেন স্থস্থিতা দেবী, এতক্ষণ মিছই বকে ষাচ্ছিল, আর আমি শুনছিলাম।

যুগাল স্থস্থিতাব দিকে চেয়ে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বেরিয়ে গেল। -

এরপব কয়েক নিমেঘেব নিস্তব্ধতা।

স্থস্থিতা গুছিয়ে বসল সোফায়। তার শাড়িব আতরের গন্ধে গোটা ঘবটা মৌ মৌ কবে উঠল।

বরেন বললেন, আজ আপনার এই আসার মধ্যে কী যেন একটা বিশেষ অর্থ আছে।

কী করে জানলেন!—বিস্মিত হযে জিজ্ঞাসা করে স্থস্থিতা।

সেই সজ্জা সেই সৌরভ—ধীরে ধীরে বললেন বরেন।

আশ্চর্য হয স্থস্থিতা। কিন্তু কোন সজ্জা কোন সৌবভেব কথা বলছেন তা বুঝেও বুঝতে পাযে না।

বরেন বললেন, দেখুন, লোকে বলে বরেন সহজ কথা বলতে জানে না, বলে, বরেন সহজকে জটিল করে দেখে, সবলকে ধাঁধার মত দেখে।

সুস্মিতা জবাব দেয়, শুনেছি, যে যার নিজের মাপে অত্নকে বিচার করে। নিজের সৌভে সে নিজেরই আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

বরেন বলেন, আমি তা করতে চাই না। আমার নিজের মাপে আমি জগৎকে বিচার করতে চাই না। জগতেব সব কিছুবই তাদের নিজের নিজের মাপ আছে। প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজস্ব মাপে না দেখলে তাব ধারণায় ভুল থেকে যাবে। মানুষের মাপ আবণ্ড জটিল। মানুষেব মাপ কবতে গেলে জগতেব অত্ন সব মাপগুলো দিয়ে তাকে মাপতে হয়।

সুস্মিতা কিছুই বুঝল না। স্থিৎ হয়ে চেয়ে রইল বরেনের দিকে।

কিছুক্ষণ থেমে বরেন আবাব বললেন, আপনি যেই এই যবে ঢুকলেন অমনি আপনাব সৌরভটা আমাকে চিনিযে দিল যে আপনি এসেছেন। আমার মনে আপনি ও আপনাব সৌরভটা এক অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। আমার দৃঢ় ধারণা এই সৌরভটার সঙ্গে আপনার কোথাও একটা স্থায়ী যোগ আছে।

সুস্মিতা অবাক হয়ে চেয়ে রইল বরেনেব দিকে। এ ভাষা কিসের ভাষা? ভাল লাগাব ভাষা? অত্নবাগেব ভাষা? বুঝতে পারল না। এইটুকু মাত্র বুঝল যে বরেন তার নাবীত্নকে একটা সৌরভের সঙ্গে তুলনা কবল। সমস্ত চিত্ত আকুল হয়ে-উঠল ওর কথাটার অত্ননিহিত ইঙ্গিতটা ধবতে। আমাকে ওর ভাল লেগেছে। এই কথাটা আমি ওব কাছ থেকে স্পষ্ট শুনতে চাই। এটা স্পষ্ট কবে জানতে পারলে আমার একটা দারুণ সমস্তার সমাধান হয়ে যাবে—ভাবল সুস্মিতা।

প্রকাশে বলল, আপনি বৈজ্ঞানিক, আপনার দেখা সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন। কিন্তু আমাকে এমন একটা—কি বলি—এমন একটা বাস্পের ভেতর দিয়ে দেখলেন কেন?

বরেন অন্তরে অন্তরে ঈষৎ চমকে গেলেন। বললেন, ইচ্ছে করে দেখি না। আপনি একটা বিশেষ মণ্ডলে

নিজেকে জড়িয়ে প্রথম আবিভূত হয়েছিলেন আমার সামনে।

তবু আমি চাই, আপনি আমাকে এই মণ্ডলটা ছাড়াই দেখুন।

সুস্মিতাব এই কয়েকটা কথাব আশ্রয়ে যে একটা সূক্ষ্ম যাক্সাব ধ্বনি ছিল সেটা হয়তো বরেন মনেব কানে শুনতে পেলেন না।

মুহূ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থাৎ আপনার এই সাজসজ্জা, বেশবিজ্ঞাস, প্রসাধন—এসব বাদ দিয়ে?

হ্যাঁ।—দৃঢ়স্বরে বলল সুস্মিতা।

বরেনেব মনে হল সুস্মিতা দেবী অদৃশ্য কোনও এক মানুষ বা ভাবের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে লড়াই কবছেন। কিন্তু কে সে মানুষ, কোন্ সে ভাব, তা জানবেন কী কবে? ভিতরে ভিতরে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে গেলেন যখন বুঝলেন সুস্মিতা দেবী পরিচয়েব আঙিনাটা পেরিয়ে অন্তরঙ্গতাব চৌকাঠ পেবিযে হঠাৎ কাছে এসে গেছেন। যে মানুষকে আমরা পথেঘাটে দেখেছি বছবার সে যদি হঠাৎ আমাদের যবেব মধ্যে হাজির হয় তা হলে আমরা যেমন সহসা অবাক হয়ে পডি তেমনি অবাক হয়ে গেলেন বরেন। মনেব মধ্যে একটা চিন্তার প্রবাহ বয়ে গেল।

সুস্মিতাব দিকে চেয়ে দেখলেন—ও যেন তার মধ্যে কিছুকে সন্ধান কবে ফিবছে। যেন জলের মধ্যে হস্ত-স্থলিত কোনও অলঙ্কার খুঁজে ফিবছে।

এই মণ্ডলটা ছাড়াই আমাকে দেখুন। কী চাইছে-ও?

সুস্মিতাব যে ছবিটা তাঁব মনের মধ্যে প্রথম আঁকা হয়ে গেছে তা একটা মণ্ডল নিয়েই আঁকা হয়েছে। আচ্ছা, তাই দেখি। তোমাকে ঘনিষ্ঠভাবেই দেখি। ওই তো তুমি পঁচিশ-ছাবিশ বছরেব তরুণী। তোমার এই সাজসজ্জা ও কিসের সঙ্গে?

তুমি নিজের খুশিতে এমন সাজ সেজেছ, না, অত্নদের আকৃষ্ট কবতে?

অত্নকে আকৃষ্ট কবতে যাবে কেন তুমি? তোমার মধ্যে কিসের শূন্য যে অত্ন মানুষ দিয়ে সেই শূন্যটাকে পূরণ কববে তুমি?

সহসা বরেনেব মনে 'হল ওই চোখ দুটোর ওপারে একটা শূন্য। নির্জনতা। আর—

ববেন চোখ নামিয়ে নিলেন।

স্বস্তিতা চকিতে আত্মস্থ হয়ে বুঝতে পারল সে নিমেষের মধ্যে অসাবধান হয়ে গিয়েছিল আব বরেন নিমেষে যেন সাবধান হয়ে গেলেন।

স্বস্তিতা ধীবে ধীবে অশ্রুটস্বরে বলে, আপনি বড একা, না?

বরেন কী একটা বলতে গেলেন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কথা নিঃসৃত হবার আগেই স্বস্তিতা তার শেষ আক্রমণ শুরু করে দিল। এই আক্রমণ সে ইচ্ছায় করল না। তার ভিতর থেকে এই আক্রমণ নিজেব বেগে বেবিয়ে এল। স্বস্তিতাকে ভাববার সময় দিল না, সাবধান হবার সময় দিল না।

গডগড কবে বলতে শুরু কবল, পৃথিবীর দুঃখস্বথের বাইবেব মানুষ-আপনি। পৃথিবীর এই অসংখ্য দুঃখের রূপ আপনার চোখে ছায়াছবির মত। পৃথিবীর হাজার বকমের অসঙ্গতিময় এই জীবন আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে আপনার যে ভাবজগৎ সেখানে আমার মত আরও অনেকের মত মানুষের দৈনন্দিন 'পীড়া ক্রেশ' স্থান পায় না। মানুষের সমস্ত দুঃখদৈন্য দারিদ্র্যক্লেশ শোক রাগবিরাগ আপনার মনে শুধু তত্ত্বের রূপে প্রতিকলিত হয়। সমস্ত জগৎ হেঁকে আপনি 'তত্ত্ব'মাত্র গ্রহণ কবেন—যেমন জল থেকে ক্ষীর গ্রহণ কবে হাঁস। আপনার মধ্যে জালা নেই; আছে শুধু আলো। আপনি আমাদের মাঝখানে থেকেও অভ্যস্ত দূরে। পদার্থের চেয়ে পদার্থের তত্ত্বটা আপনার কাছে বেশি সত্য। মানুষের চেয়ে মানুষের তত্ত্ব। আপনি নিবপেক্ষ দ্রষ্টা...আপনার মধ্যে ভালবাসা নেই।

কথা শেষ করে স্বস্তিতা মুখ ঘুরিয়ে সোফার পিছনে মাথা বেঁখে দারুণ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল।

ববেন বিষয়ে স্তম্ভিত হয়ে বইলেন। এমনভাবে কেউ তাঁর চরিত্রের মৌলিক ভাবটাকে প্রকাশ কবতে পারবে তা তিনি এর আগে ভাবতে পাবেন নি। স্বস্তিতা যা বলল তা মিথ্যে নয়।

তাঁর নিজেব মনের এই বৈশিষ্ট্য বা ক্রটি সম্পর্কে তিনি নিজেও সজ্ঞান। এই তত্ত্বমুগ্ধতার ফলে তিনি কোনদিনই অপরের জীবনের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারেন নি।

অথচ সমস্ত মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করাও আকাজক্ষাও খুব প্রবল। মৃণাল বলেছে এ তোমার অহল্যার ব্যাধি। মৃণাল আরও বলেছে, তত্ত্ব দিয়ে হবে না—প্যাশন চাই; পুর্বোপুবি খাটিভাবে হবে না—খানিকটা বিকৃতি চাই। কিন্তু প্যাশন আসে না, আরেগ আসে না। যদি বা আসে—বর্ষণশেষে দূরদিগন্তে শব্দহীন বিদ্যুৎ-আভাসেব মত আসে। তার তীব্রতা নেই, গর্জন নেই। প্রবৃত্তি যে মবে গেছে তা নয়, প্রবৃত্তিকে তিনি শুদ্ধ বিচারবুদ্ধি দিয়ে বেঁধে দুর্বল করে রেখেছেন। ল্যাবরেটরির কাজের মধ্যে যে আবেগ উপচিত হয় তা মাঝে মাঝে দেহ পর্যন্ত সংক্রমিত হয়, স্নায়ুজালকে উত্তেজিত করে কিন্তু আবার ধীবে ধীবে দেহেমনে মিলিয়ে যায়। ভিতরে যে দুটো মন রয়েছে তার একটা অগ্নিটাব দিকে চেয়ে থাকে, তাকে পাহারা দেয়।

বরেন ধীরে ধীরে বললেন, আশ্চর্য!

স্বস্তিতা সেইভাবে মুখ লুকিয়ে চাপা বেদনায় বলল—আশ্চর্য এই মানুষের মন। আমি কিন্তু কারুর তত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্ব মিলিয়ে তাব সঙ্গে মিলতে পারি নে। আমি সোজাসুজি নিজেব দুঃখের আঙুনে গলে নবম হয়ে অস্ত্রের সঙ্গে মিলে যাই। আমি ভালবাসি কেন ভালবাসি জানি নে। না ভালবেসে আমার উপায় নেই।

বরেন হঠাৎ বলে বসে, দেখুন, ভালবাসাই যে ভালবাসার লক্ষ্য তা আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় ভালবাসাও একটা উপায়।

কিছুক্ষণের জন্তে স্বস্তিতা একটা দারুণ আঘাতের ঘায়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল। তাবপর সহসা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

মানুষের মন যখন সহসা অসম্ভব কোনও কিছুব সম্মুখীন হয়ে পড়ে তখন মানুষকে হাসিতে পায়। মানুষ যখন সম্ভাব্য কোনও পথেই মনেব ভাব প্রকাশ করতে পাবে না তখন সে হাসে।

স্বস্তিতার হাসি একবাণ বেলোয়ারী চুড়ির মত ঘবময় ভেঙে পড়ল। ঠিক এই মুহূর্তেই মৃণাল চা নিয়ে প্রবেশ করল।

বাঃ, দুজনে বেশ তো হাসির আসর জমিয়েছে!

বরেন স্বস্তিতার হাসিতে যোগ দিলেন না। এই

অদ্ভুত হাসিটার সামনে তাঁর মন সংকুচিত হয়ে গেল।
জ্ঞানমুখে মাথা হেঁট কবে বসে রইলেন।

মৃণাল ছদ্মকোপ দেখিয়ে বরেনকে লক্ষ্য কবে বলল,
ও, বোনকে দেখে বুঝি হাসি মিলিয়ে গেল?

স্বস্তিতাকে লক্ষ্য করে গম্ভীরভাবে মৃণাল বলল, তুমি
কোনদিন ওর বোন হয়ো না, বুঝলে স্বস্তিতা ভাই।

বলে নিজেও খিলখিল করে হেসে উঠল।

৬

মাসুকের জীবনে এমন এক একটা মুহূর্ত আসে যখন
একটামাত্র আপাততুচ্ছ ঘটনা তার জীবনের বা ভাবের
মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে।

শীলভদ্র অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এলেন সন্ধ্যার
আগে। তখন আলো জ্বালার সময় হয় নি। অতদিন
তাঁর এই ঘবে এই সময়েই আলো জ্বলে স্বস্তিতা
পিয়ানোর কাছে বসে হয় পড়ে, না হয় বোনে।

ঘবটায় ঢুকেই তিনি বুঝলেন আজ স্বস্তিতা এই ঘরে
নেই।

ঈষৎ অন্ধকার ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে
রইলেন।

ধীরে ধীরে পাতলা অন্ধকার চোখে সযে এল।

উত্তর দিকেব জানলা থেকে একটা পত্‌পত্‌
আওয়াজ আসছে। যেন কোন পাখি আশ্রয় চাইছে এই
ঘবে, ঢুকতে পারছে না। অত্মমনস্ক হয়ে জানলার দিকে
এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, পর্দার উপরের এক কোণ খুলে
গেছে ও আলগা কোণটা উত্তরের জোর হাওয়ায় পত্‌-
পত্‌ কবে উডছে। পর্দাটার কোণটাকে ঠিক কবে
লাগাবাব চেষ্টা কবলেন, পারলেন না। জানলাটার
শার্সী ছুটো বন্ধ করে দিলেন। অতদিন বোধ হয় এই
শার্সীগুলো বন্ধ থাকে।

কাচের এগাব থেকে শীলভদ্র বাইরে চেয়ে দেখলেন।
দূবে একটা প্রকাণ্ড নারকেল গাছের মাথায় এখনও এক
ঝলক আলো লেগে বসেছে। এ গাছটা এতদিন তাঁর
চোখেই পড়ে নি। একটা বিবট তুলিকে সোনার জলে
ডুবিয়ে ব্যবহারের পর কে যেন খাড়া কবে 'ওখানে পুঁতে
গেছে।

অত্মমনস্ক হয়ে বহুক্ষণ এই ভাবে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে
বইলেন। নারকেল গাছের মাথায় সোনার ছোপটা
পাবদের মত জ্ঞান হয়ে এল। যেন সামান্য একটু ক্ষীণ
আশা ভুবনজোড়া নিবাণাব মধ্যে হারিয়ে গেল।

যন্ত্রচালিতের মত পিয়ানোর কাছে পাতা স্বস্তিতার
ডিভানটা'ব কাছে সবে এসে তার কাঁধে হাত রেখে চুপ
কবে দাঁড়িয়ে বইলেন। সহসা একটা মুহূর্ত স্বগন্ধি সন্ধ্যা
গচেতন হয়ে উঠলেন। স্বস্তিতাব কেশবশের মুহূর্ত।
এই চেয়ারটা তাঁর উৎস। ধীরে ধীরে তাঁর মনে হল এই
সৌরভ সারা ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে। আশ্চর্য! এতদিন
তিনি এই সৌরভটা টেব পান নি।

পনের বছর আগে যেদিন তিনি স্বস্তিতাকে তাঁবই
এক ভাগ্যহত কর্মচারীর সংসার থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয়
দিয়েছিলেন সেই দিন থেকে স্বস্তিতা তাঁর এই ঘব-
সংসারের সঙ্গে অন্তবদ্ধভাবে মিশে গিয়েছিল। তাকে
পৃথক কবে দেখার অবকাশ হয় নি। স্বস্তিতাকে সাধ্যমত
মাছুষ কবেছেন। তা'ব শিক্ষাদীক্ষা, আবায় ও অবসর-
বিনোদনের জন্ত অকাতরে ব্যয় কবেছেন। এমনভাবে
তিনি স্বস্তিতাকে নিজের সংসারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত
করেছেন যে স্বস্তিতা নিজেকে কোনদিনই এ সংসারের
বাইরের লোক বলে মনে করার অবসর পায় নি।
শীলভদ্রের মনে তাঁব নিজের অজ্ঞাতে এই ধাবণা জন্মেছে
যে স্বস্তিতা তাঁব সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শীলভদ্র
স্বস্তিতার প্রতি এমন একটা ব্যবহারে নিজেকে অভিযুক্ত
কবেছিলেন যে বাইবেব লোক ভুলে গিয়েছে যে স্বস্তিতা
তাঁর সংসারের বাইরের কেউ।

স্বস্তিতা ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তা'ব প্রতি
শীলভদ্রের ব্যবহারেরও রূপান্তর হয়েছে। শীলভদ্র
স্বস্তিতাব ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিয়েছেন
তাঁর নিজের ব্যবহারকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করে।
এমনি কবে স্বস্তিতাব প্রতি তাঁব নিজের দৃষ্টিটাও বদলে
এসেছে তা'ব বিকাশের পর্যায়ে পর্যায়ে।

মাছুষ যখন ফুলগাছের ছোট্ট চাবাটি সস্তর্পণে নরম
মাটিতে বসায় তখন তা'ব প্রতি তা'ব এক ভাব। তারপ'ব
মাঝে মাঝে শিকড়ের মাটি বদলে দিয়ে, দিনরাত্রির সতর্ক
প্রহরায়, সযত্ন হিসেবী জলসেচে, রৌদ্রের প্রখরতা আর

বর্ষণের রুদ্ধধ্বাসবেগ থেকে বক্ষা করে কবে যখন তাকে বড় করে ফুল ফোটাঁব অপেক্ষায় থাকে তখন তার প্রতি আব-এক ভাব। কিন্তু যেদিন তার ফুল ফোটে, যেদিন সে তার সমগ্র সত্তাটাকে চবম বিকাশে তুলে ধরে, সেদিন তার প্রতি তার পালকের সম্পূর্ণ অগ্র ভাব। যতদিন ফুল না ফোটে ততদিন সে পালকের সৃষ্টি। তারপর যেদিন থেকে তার ফুল ফোটে, সেদিন থেকে সে পালকের সঙ্গে সমান—জীবনের একই বিশ্বয়ের অংশীদার। যে ছিল করুণার বস্তু, সে হয়ে ওঠে বহুস্ত।

আজ স্মৃতিতাও শীলভদ্রের কাছে রহস্ত হয়ে গেছে। শীলভদ্রের মন নিজের অজ্ঞাতসাবে এখন এই বহুস্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। বিরাট কোন দীঘির গভীর ঘন নীল জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় জল যেন সারা দেহকে টানছে। গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে নিচে চেয়ে থাকলে মনে হয় গহ্বরের আকর্ষণ করছে। যেখানে যত গভীরতা সেখানে তারা সব মাল্লষকে আকর্ষণ কবে, আকর্ষণ করে গ্রাস কবতে চায়। সবচেয়ে গভীর মাল্লষের রহস্ত। পুরুষের কাছে নারীর রহস্ত। দুর্নিবাব এই বহুস্তের আকর্ষণ।

শীলভদ্রের মাথাটা কেমন যেন ঢুলে উঠল। ঘবের মধ্যে অন্ধকাবটা তখন ঘন হয়ে গেছে। শীলভদ্রের ভিতবেও যেন অন্ধকাব গাট হয়ে গেছে। এই অন্ধকাবে শীলভদ্রের মাথাটা ঢুলে উঠল।

প্রাণপণ জোরে ডিভানটা ধরে বইলেন। হঠাৎ স্বপ্নের মত একটা ছবি ভেসে উঠল মনেব চোখের ওপব।

তার শৈশবে দেখা কোন যাত্রাগানের আসব। মাঝখানে সাদা ফরাশ পাঁতা। ফরাশের চাবদিকে নানা বাতশস্ত্র। সামিযানা থেকে জলন্ত বাতিগুলো ঝুলছে, ঝড়ে সাবা সামিযানাটা ছলছে। কোথাও কেউ নেই। যাত্রাব অভিনেতাবাও নেই। দর্শকরাও কেউ নেই। শূন্য আসর থা থা করছে।

ঝড়ের বেগ বেড়েছে। আসবের আলোগুলো ছলছে। সহসা আলোগুলো দড়ি ছিঁড়ে নিচে পড়ে ভেঙে গেল! শীলভদ্র চমকে চিংকাব কবে উঠলেন!

চেয়ে দেখলেন ঘবে আলো জ্বালা হয়েছে। পিয়ানোর ওপরে যে একটা বড় আলো ছিল সেটা নিচে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। আর দেখলেন, স্মৃতিতা।

স্মৃতিতা ভাঙা কাঁচগুলো মেঝে থেকে বুড়িয়ে নিচ্ছে। মাথা তুলে, তাব বহুর মত এলো চুলের বাশি বাঁ হাত দিয়ে ঘাডেব ওপব আলগোছে ছুঁড়ে স্মৃতিতা বললে, অন্ধকারে স্মৃচটা জ্বালতে গিয়ে আলোটা ভেঙে ফেলেছি আমি।

শীলভদ্র আবাব অস্থতব কবলেন সারা ঘব সেই অপূর্ব স্তগন্ধে মূট হয়ে গেছে।

দবজায় ঢুকেই বাঁ দিকে যে আব-একটা স্মৃচ আছে তা স্মৃতিতার মনে পড়ে নি।

আসল কথা স্মৃতিতা বরেনেব বাড়ি থেকে ফিরে যখন ঘবে ঢুকল তখনও তার মধ্যে কী একটা টলছিল।

ভাঙা কাঁচগুলো তুলে ওয়েস্টপেপার বাল্কেটে ফেলে দিল। তারপব নিজের চেয়াবটিতে ভেঙে পডল।

শীলভদ্র ইতিমধ্যে নিজের স্থানে সবে গেছেন।

শীলভদ্র দেখলেন স্মৃতিতার মুখের রক্ত কে যেন শুবে নিয়েছে। কাছে গিয়ে তার মাথায হাত রেখে রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলেন, স্মৃতিতা! বুকেব মধ্যে কালো ঢেউয়ের মত কী যেন একটা উছলে উঠল, উঠেই পরমুহূর্তে ভিতবে ভেঙে চুরমাব হয়ে গেল।

স্মৃতিতা তড়িৎপ্পৃষ্টেব মত উঠে দাঁডাল, একবাব আত্মহারার মত শীলভদ্রের দিকে চেয়ে যন্ত্রচালিতের মত কষেক পা পিছিয়ে গেল।

শীলভদ্রের মনে হল আসবাবস্বস্ত সমস্ত ঘবখানা ঢুলে উঠল—যেন মুখ খুবড়ে পড়ে যাবেন। একটা দুর্বীর বমনের বেগ আকণ্ঠ উঠে এল। প্রাণপণে উদ্গত বমনের বেগকে দমন কবে অসহায়ের মত ডেকে উঠলেন। মা!

স্মৃতিতা চকিতে আত্মসম্বরণ করে কাছে এসে পতনোন্মুখ শীলভদ্রকে ধবে ফেলল, কী হয়েছে আপনাব?

শীলভদ্র ভাঙা গলায় বললেন, আমি হঠাৎ বড় অস্থস্থ হয়ে পড়েছি—মিতা!

[ক্রমশঃ]

তবে কেন

ভূপেন্দ্রমোহন সবকার

এক

মেয়ে মঞ্জু শেষবারেব মত আঘনায় শরীরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। শাড়িটা এখানে ওখানে একটু টেনে ঠিক করে নিল। এবার খুশী হয়ে একটু হাসল। আঘনায় হাসিমুখ দেখে আরও খুশী হল। শেষে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু মা মমতাব তখনও শেষ হয় নি। তিনি তখন ভুরুতে কালি লাগাচ্ছিলেন। মঞ্জু এসে দাঁড়াল পেছনে। বলল, মার আর হয় না।

মমতা শেষ টান দিয়ে হেসে ঘুবে দাঁড়ালেন। বললেন, নে, চল। তোর জন্তেই তো দেবি। আমার আব কতক্ষণ লাগল।

মেয়ে মাকে দেখল, মা মেয়েকে দেখলেন। দেখে তিনিও খুশী হলেন। ডান দিককাব শাড়ির পাড়টা আর একটু ওপরে তুলে দিলেন। আবার বললেন, নে, চল।

কিন্তু বাধা পড়ল। যোগেনবাবু অফিস থেকে ফিবলেন। জ্বী আর মেয়েব দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশ্য পবক্ষণেই শুধু জ্বীর ওপর দৃষ্টি আটকে বেখে বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

মমতা বললেন, দোকানে যাব।

কেন, কি কিনবে?

মমতা ধমকেব স্নরে বললেন, সব কথাই তোমার শুনতে হবে নাকি?

যোগেনবাবু আবার মুখ ফিবিয়ে নিলেন। আমতা আমতা কবে বললেন, না, তাই জিজ্ঞেস কবছি। একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

কিন্তু ঘবে ঢোকবার আগে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, ও, একটা কথা শুনে যেযো তো। — বলেই ঘরে ঢুকলেন।

আবার কি কথা।—বলতে বলতে মমতাও ঘরে গেলেন।

যোগেনবাবু দাঁড়িয়েই ছিলেন। হেসে বললেন, একটা কথা অনেক দিন বলি বলি করেও বলা হয় নি। রাগ করো না, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে—উদ্দেশ্যটা কি?

ও মা, কিসের উদ্দেশ্য।—মমতা ভয়ানক অবাক হলেন।

এই যে, যে চেহারা তোমার নয়, নানা কৌশলে সেই চেহারা তৈরি করে কাকে ঠকাতে চাও? আমি যখন জানি সব, আমাকে তো নিশ্চয়ই নয়। তবে কাকে? না কি কাদেব বলব?

মমতা রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলে বলল, কি যে চণ্ডের সব কথা। পেছী সেজে বেবোলে তোমার মান বাড়বে খুব? আর এই কথার জন্তে এত ঘটী করে ডেকে নিয়ে এলে? মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আমি ভাবলাম কি বুঝি কোন কাজেব কথা বলবে।

হুমদাম কবে পা ফেলে বেবিষে গেলেন মমতা।

বকের ছেলেগুলো দূব থেকে দেখে ক্ষণকালেব জ্ঞাত শুদ্ধ হয়ে পড়ল। পবে দ্রুত ফিসফাস আলোচনা কবে নিল। কাছে আসতে একজন অত্ন দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আঃ, মাইবি।

পাব হয়ে যেতেই একজন বলল, যেন ডাকছে। সর্বাঙ্গে নিমন্ত্রণ।

অবশেষে কয়েকটা ইঞ্জিতময় কাশির দ্বারা যেন ওরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবল। মঞ্জু মায়েব অলক্ষ্যে মুচকি হাসল। মমতা জোর করে হাসি চেপে ক্রকুষ্টিত করে বললেন, কি অসভ্য ছেলেগুলো।

মঞ্জু গম্ভীর মুখে বলল, ভয়ানক অসভ্য।

মমতা জিজ্ঞেস করলেন, তুই চিনিস ওদের?

মঞ্জু একটু ইতস্ততঃ কবে বলল, ওই তো, ইয়ে— অমলদারা।

অমলদা আবার কে?

মঞ্জু জবাব দিল না।

মমতা আবার বললেন, কি কবে?

মঞ্জু তাক্ষিল্যের ভঙ্গীতে বলল, করবে আবার কি।
যা কবছে তা তো দেখলেই। শুনেছি এম. এ পাঁস কবে
বসে আছে।

সংক্ষিপ্ত একটা 'ও' বলে চুপ কবে গেলেন মমতা।

কিছুদূর যেতেই আবার বাধা পড়ল।

ভদ্রলোক একটু দূর থেকেই নাটকীয় ভঙ্গীতে থেমে
গেল। মুখে মুহূ হাসি, চোখের স্থির দৃষ্টি মমতার শবীরের
ওপর নিবদ্ধ।

একটা অব্যাখ্যাতক শব্দ কবে ভদ্রলোক অভ্যর্থনা
করল, আরে বাপ বে, একি। কিন্তু মহাদেব তো বাড়িতে
ধ্যানে রয়েছে বোধ করি। তবে যাচ্ছেন কোথা? -

মমতা খুশী হয়ে বলে উঠলেন, আমাদের ওখানে
যাচ্ছেন? যান, উনি এই তো ফিরলেন। আমি-যুরে
আসছি।

উহ, তা হবে না। আমার সঙ্গেই ফিরতে হবে
আপনাকে। গল্প কবব, চা খাব। অত সস্তায় কাকি দিলে
চলবে না।

মমতা হেসে মুহূ আপত্তিতে বললেন, একটু কাজে
যাচ্ছিলাম যে।

সে কাজ কালও করতে পারবেন। কিন্তু আমি
তো কাল আসতে পারব না।

মঞ্জু রক্ষা করল। মাকে বলল, তুমি মেসোমশায়ের
সঙ্গে ফিরে যাও।

মমতা বললেন, তুই একা যাবি? তা হলে তাড়াতাড়ি
আসিস।

মমতা ভদ্রলোকেব সঙ্গে ফিরলেন বাড়ির দিকে।

দূর থেকে অমলরা লক্ষ্য করল। আবাব দ্রুত
পরামর্শ শুরু হল ওদের। মমতাবা কাছাকাছি এলে
অমল বলে উঠল, দূর বোকা, এ ক্লোকটা-গীতার নয়।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেবে-আব একজন বলল, তা হলে
মহাভারতের।

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে অমল বলল, না, এটা
বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে।

বৃহদারণ্যক? না না, তুই ভুল করছিস।

মমতারা চলে গেল। আবাব পরামর্শ শুরু হল ওদের।

কয়েক মিনিট পরে দ্রুতপদে তব্বা মঞ্জুর অত্মসরণে
এগিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে দূর থেকে মঞ্জুকে যখন দেখা
গেল তখন দু'ভাগ হয়ে গেল ওবা। অমল একা দ্রুতপদে
মঞ্জুর অত্মসরণ কবে চলল। আব চারজন ট্রামেব জন্তে
দাঁড়াল।

তুই

অমলেব সঙ্গে ঘবে ঢুকেই একটু চমকে উঠল মঞ্জু।
একদৃষ্টিতেই বুঝতে পারল রাস্তায় যে দল দেখেছিল
তারাই। ফিরে তাকাল অমলেব দিকে।

অমলেব চার সঙ্গী ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে বসে ছিল।

অমল ওদের বলল, তোরা পাশেব ঘবে গিয়ে বস।
কথাবর্তা বলে নেওয়াই ভাল। আমি বলে নিচ্ছি।
পবে তোদেব ডাকব।

একটা অজানা আশঙ্কায় বুকের মধ্যে কাঁপন ধরল
মঞ্জুব। বিবর্ণমুখে তাকিয়ে বইল অমলের দিকে। কিন্তু
ওরা চারজন যখন উঠে চলে গেল পাশেব ঘবে, কিছুটা
আশস্ত হল তখন।

অমল গম্ভীর স্ববে বলল, বস।

মঞ্জু ওদেব পরিত্যক্ত তক্তাপোশটায় বসল। অমল
একটা চেয়ার একটু কাছে টেনে বসে বলল, ভূমিকার
বিশেষ কিছু নেই। তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।
আমরা সকলেই মুগ্ধ এবং কি বলে—জর্জরিত।

থেমে একটু সময় দিল অমল।

মঞ্জু কিছু বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে
বইল।

অমল বলল, সে কি—কিছু বুঝতে না পারার মত ভাব
কবছ যে!

কিছু বলতে চেষ্টা কবল মঞ্জু। কিন্তু প্রথমটায় গলায়
আঁওযাজ বেরুল না। কোনমতে জোব দিয়ে গলায়
জড়তা নষ্ট কবতে গিয়ে জোরেই বলে উঠল কিছুই বুঝতে
পারছি না। আমাব উদ্দেশ্যেব কথা কি বললেন?

অমল বলল, আবও স্পষ্ট কবে বলব?

ঘাড় নাড়ল মঞ্জু।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট কবে বলতে পারল না অমল।

মনের মধ্যে কথাগুলো গুছিয়ে নিতে হল। শেষে বলল, আমাদের—মানে ছেলের খেপিয়ে তোলাই তো তোমাব উদ্দেশ্য ছিল? সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। আমরা সকলেই উন্নত হয়েছি। এখন—

ভয়ের মধ্যেও হাসি পেয়েছিল মঞ্জুর। সঙ্গে সঙ্গে কিছু সাহসও পেল। মুখখানা একটু ঘুরিয়ে এনে বাধা দিয়ে বলে উঠল, কি বলছেন কিছু বুঝতে পাবছি না।

অমল বলল, তা আমি জানি। হাজার হোক স্ত্রীলোক তো, এই রকমই বলতে হয় তোমাদেব। সে যাক গে। এখন তা হলে—

চেয়াব ছেড়ে একটা ভয়ঙ্কর ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল অমল। জুপিঙ খেমে গেল মঞ্জুর। মুহূর্তকাল অজগবের সামনে হরিণের মত অবস্থাব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইল।

অমল ভীষণ বদমায়েশের কুটিল দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলেছিল চোখে। আত্মপাতিক কর্কশ একটা আওয়াজ তুলে বলল, আমরা পাঁচজন। পাঁচজনেই তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবোছ। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

মঞ্জু একবার ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু বাস্তব সম্ভাব্য দৃশ্যটা ওর আয়ুগুলো অসাড় করে দিল। শরীরটা পাষাণের মত স্থাপু হয়ে রইল।

কিন্তু অমল দরজা বন্ধ করতে যাওয়ার ভঙ্গী যতটা করল ততটা অগ্রসর হল না। একবার ভেতরের দরজার দিকে তাকাল। আবার মঞ্জুব দিকে তাকিয়ে দৃঢ় ভীতিপ্রদ একটা পদক্ষেপ কবল।

সময় পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চাপা কণ্ঠে মঞ্জু বলে উঠল, শুনুন।

খামল অমল।

মঞ্জু বলল, দরজা বন্ধ করতে গেলে আমি চিংকার কবব।

অমল অবাক হল যেন। বলল, কেন?

এমন অদ্ভুত প্রশ্নে এবার মঞ্জু অবাক হল। বলল, 'কেন' মানে কি?

অমল আবাব বসল চেয়ারটায। এবার শাস্ত কণ্ঠে বলল, এ রকম তো আমরা ভাবি নি। তোমার তা হলে আপত্তি আছে?

হু হাতে মুখ ঢাকল মঞ্জু।

অমল ক্ষণকাল তাকিয়ে দেখে আবাব বলল, এ রকমটা আমরা ভাবি নি। কিন্তু—

মঞ্জু কাঁদছিল। হাত নামিয়ে নিয়ে বলে উঠল, আপনাবা কি ভেবেছিলেন?

অমল এবাব কঠিন কণ্ঠে বলল, কিন্তু তা হলে—কেন? কি কেন?

ও রকম করে দেহটা সাজিয়ে নিয়ে আমাদের ভোলাতে চেয়েছিলে কেন?

চাবদিকে যতটা সম্ভব কাপড় টেনে দিয়ে আবার মুখ ঢাকল মঞ্জু। কান্না বন্ধ হয়ে গেল।

বল?

মুখ ঢেকেই আবাব কান্নাভরা কণ্ঠে মঞ্জু বলল, আপনাদেব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

একটু আহত বোধ করল অমল। বলে ফেলল, তবে কাদের কথা?

পবক্ষণে শুধবে নিয়ে বলল, তা হয়তো ঠিক—আমাদেব কথা আলাদা করে ভাব নি। গোটা পুরুষ-জাতটাকেই ভোলাতে চেয়েছ—অন্ততঃ যত লোককে দেখানো যায়। কিন্তু কেন? এত লোকের কামনা জাগাবে, মেটাবে না, কেন?

মঞ্জু অসহায় কণ্ঠে মবিয়া হয়ে বলে উঠল, কি কবেছি আমি? সকলেই তো এই বকম করে।

হ্যাঁ, অনেকেই করে। কিন্তু সকলকেই বলে দিয়ে এঁর পরে আমরা ছেলেরা ছাড়ব না। তোমার মাঝফত সমস্ত স্ত্রীজাতিকে আমরা সাবধান কবে দিচ্ছি। আমেরিকাব সেই লোকটার কথা মনে আছে? খববেব কাগজে খুব হৈট পড়েছিল। কি নাম—চেসম্যান, এখন বুঝতে পারছি তার দোষ ছিল না। আমরা এখন তাবই ব্রত নেব। তোমরা সাবধান।

কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে মঞ্জু আশস্ত কণ্ঠে বলল, তা হলে কি আমরা অপবিচ্ছন্ন অস্ত্রের হয়ে বেরলে ভাল হবে?

অমল জোর দিয়ে বলে উঠল, শুধু পরিচ্ছন্ন হলেই স্ত্রন্দব হবে। চৌটে রঙ লাগাও কেন? গালে রঙ মাখ কেন? ভুরুতে কালি লাগাও কেন?

অনিবার্য পরের বিষয়টা মনে কবে এবং অমলের দৃষ্টি অস্বপণ কবে বুকের কাপড় আবও টেনে দিল মঞ্জু।

অমল প্রয়োজনীয় শব্দ খুঁজছিল। না পেয়ে বলল,
আর—আর—কেন?

অমলের ভাষাব অস্ববিধায় মনে মনে হাসল মঞ্জু।

অমল আবার আরম্ভ করল, বাড়ি বাইবে রাস্তাঘাট
অফিস কলেজ এ সবই কি তোমাদের স্বয়ংস্ব-সভা মনে
কব নাকি? নাকি যাত্রাগানের আসব মনে কব?
তোমরা কি যাত্রাগানের রানী বাজকত্বে সখী সব?
না না, যাত্রা কেন—সিনেমা। সর্বক্ষণ সিনেমার নাটিকা
সেজে বেড়াবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

খামল অমল। বক্তব্য শেষ। ক্ষণকাল পবে গম্ভীর
মুহুর্তে বলল, এবার যেতে পার।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মঞ্জু। অমলও উঠে দাঁড়াল।
বলল, আর একটা কথা। দেখ, ছেলেবা আসলে
তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল। নইলে তোমার চিংকারে
ভয় পাবার কিছু ছিল না আমাদের।

মঞ্জুও মাথা নীচু করেই বলল, বিশ্বাস না করলে আপনি
কথা আছে বললেন আর অমনি আমি আপনাব সঙ্গে
চলে আসতাম না। কিন্তু এখন—

এবার আঁচল চোখে দিয়ে কেঁদে ফেলল মঞ্জু।

অমল বুঝল। বলল, কলঙ্কে ভয়? সে দায়িত্ব
আমি নিলাম।

পাশে ঘর থেকে এই সময় ওরা এসে ঢুকল। হাত
জোড় কবে চারজনই বলল, নমস্কার।

মঞ্জু মাথাটা আঁচল নাখাল।

অমল বলল, ওরা পবে যাবে। শুধু আমি তোমার
সঙ্গে যাচ্ছি। এ জায়গাটা কিছু খারাপ নয়, আমাব দুই
বন্ধু থাকে এখানে। আর ওদের সামনে বলছি, যদি
কিছু রটে বা যদি তোমার তেমন প্রয়োজনই হয় আমি
সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকব। তবে একটা শর্ত,
দেহসজ্জা কোন যান্ত্রিক কোঁশল চলবে না, কোন প্রদর্শনী
চলবে না, সিনেমার নাটিকার পার্ট বন্ধ। এবাব চল।

মঞ্জু ঘাড় হেঁট করে দরজাব দিকে যেতে যেতে বলল,
কোন দয়াপ্রদর্শনেরও দরকার হবে না।

অমল পেছনে চলল।

দলেব একজন বলে উঠল, শর্তটা মেনে নিল না এখন।
খুব ভাল হয় তা হলে।

মঞ্জু আঁচল ফিবে তাকাল না। রাস্তায় নিঃশব্দেই দুজন
হাঁটতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পবে অমল বলল, চুপচাপ
যাওয়াতেই বোধ করি বেশী খাবাপ হবে।

মঞ্জু জবাব দিল না। কিছুদূর গিয়ে অমল একটা
নিঃশাস চেপে বলল, কলঙ্ক কিছু রটেবে বলে মনে হচ্ছে না।
এবার জবাব দিল মঞ্জু: তাব জন্তু দুঃখ হচ্ছে নাকি?
অমল অমান বদনে জবাব দিল, ই্যা।

দুজনেই চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে অমল কক্ষণ
একটু হাসিব সঙ্গে বলল, আসলে আমরা পারি না
তোমাদের সঙ্গে।

মঞ্জু বলে উঠল, আপনারা আমাদের সঙ্গেই পারেন শুধু।
অমল হেসে বলল, ভুল কথা। তোমাদের সঙ্গেই
পারি না।

কিন্তু এখন সে কথা ভাবলেন কেন?

সোজাসজি সে কথার জবাব দিল না অমল। একটু
থেমে হঠাৎ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, একটা কথা বলব।

মঞ্জু চুপ করে রইল দেখে কিছু হতাশ কণ্ঠে আবার
বলল, কি কথা শুনতে চাইলে না তো?

মুখ ফিরিয়ে মঞ্জু হাসি চাপল, স্পষ্ট বুঝতে পারল
অমল। কিন্তু পরমুহূর্তে মঞ্জু গম্ভীর স্বরে জবাব দিল,
আপনার ইচ্ছে হলেই বলবেন। এব আগেকার কথাগুলো
কি আমি শুনতে চেয়েছিলাম?

অমল হেসে বলল, ঠিক কথা। আমাব যা বলবাব
তা বলতেই হবে। শোন। এখন তোমাব সঙ্গে
তোমাদের বাড়ি পর্যন্তই যাব আমি। আমার চেহাবা
তোমার বাবা মা যাব চোখে পড়ে দেখিয়ে আসব। সাত
দিন পরে মা যাবেন তোমাদের বাড়ি বিষের কথা বলতে।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল মঞ্জু, বাবা মার কথা জানি না।
চেহাবা দেখাবেন বলছেন, কি হয় দেখুন। তবে আমার
অমত হবে না। এই অপমানের প্রতিশোধ নেব আমি।

অমল হাসল। বলল, প্রতিশোধ সঙ্গে সঙ্গেই তো
নিয়েছ। আমি সম্পূর্ণ পবাজিত।

কাশ্মীরের চিঠি

শ্রীঅমিয়ময় বিশ্বাস

এই কি ভূস্বর্গ?

স্নেহেব থুকে,

“এবার কাশ্মীর চল না” কলেজের দীর্ঘ অবকাশের শ্রান্তিতে ভরা দুঃসহ গ্রীষ্মের দিনে এই ছিল তোমাদের আবদার। আমাবও বহুদিনের আকাজক্ষা কাশ্মীর যাবার। আব কাশ্মীরও ঘরের কাছে। পাঞ্জাব সীমান্তে, শিবালিক পর্বতের পাদদেশে—আমাদের বাড়ি থেকে কতই বা দূর। যাবার তাগিদে সরকারী ছাড়পত্রের সন্ধান করি। তোমাব মা গবম কাপডেব বোঝা গুছিয়ে গুছিয়ে সাজিয়ে রাখেন। ঘোঁগাড হয় আবও কত টুকিটাকি জিনিস। কিন্তু যাবার দিন আর স্থির হয় না। সূর্য এখন উত্তবায়ণে চলে পড়েছেন—দিন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতব হতে চলেছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিনেব সঙ্গে তাল বেখে আমার কাজের বোঝা হয়ে ওঠে আরও ভাবাক্রান্ত। আমার কর্মব্যস্ত দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে কেউ আব বলে না যাবাব কথা। নেমে আসে মেঘে-ঢাকা আকাশ থেকে ঘন বর্ষা। কাশ্মীর ভ্রমণের আশা হয়ে আসে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। ছুটির শেষে তোমাদের স্থল কলেজে ফিরে যাবাব ব্যস্ততা। কাশ্মীর যাওয়া আব হয়ে উঠল না। একটা বছর আশায় আশায় কেটে গেল। বর্ষার শেষে শবৎ তার স্নিগ্ধ শান্ত রূপ নিয়ে নীল আকাশে কোমল আলো ছড়িয়ে আসে। কিন্তু উত্তর প্রদেশে নেই মাতৃপূজার দীর্ঘ অবকাশ—বাংলাদেশের মত। কাশ্মীর যাবাব কথা আর ওঠে না। শীতের দিনে ববফেব ছোঁচাচ-লাগা কনুকেব বাতাস ভেসে আসে মুন্সুরী পাহাড় থেকে। দরজা জানলা বন্ধ কবে পড়ি কাশ্মীরেব তুষারপাত। সাপ্তাহিকে দেখি ববফে ঢাকা কাশ্মীরেব ছবি। মনোরাজ্যে ভেসে ওঠে অপক্লপ স্বপ্নপুরীর কল্পনা।

ঘুবে আসে এবার তোমাদের গ্রীষ্মের অবকাশ। নতুন করে তৈরি হয় পাবমিট, জামাকাপডও গোছানো শুরু হয়ে যায়। শেষে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার দিনগুলোকে আর একবার নিষ্ফল কবে পুনরাবৃত্তি করে চলে বিগত বৎসবেব বিফল দিনগুলো। তাই এবার যখন কাশ্মীর যাওয়া সত্যিসত্যিই ঘটে উঠল তখন তোমাদের এখানে না থাকাব ব্যথা বাজল সকলেব বুকে। হৃদয় কলকাতায় তুমি এমন নতুন স্নেহেব বন্ধনে যে কক্ষপথে পবিত্রমণ করছ সেখান থেকে তোমার আসা সম্ভব হল না। তোমাব না থাকায় সবাই স্রিয়মাণ আজ কাশ্মীরেব পথে।

কোন পথে কাশ্মীর। যুগ যুগ ধবে যে পথে সবাই কাশ্মীর গিয়েছেন ভাবত-বিভাগেব ফলে সে পথ আজ রুদ্ধ। যাবাব সোজা পথ বারামূলাব পাহাড়েব ফাটলেব ভিতর দিয়ে ঝিলমেব ধারে ধাবে সোপব হয়ে শ্রীনগর। বাঙলপিণ্ড থেকে বাস-সার্ভিস এ পথকে কবেছিল স্বর্ণম। এ ছাড়াও পথ আছে ঝিলম শহর থেকে পুঞ্চ হয়ে, পাঞ্জাবেব গুজবাত শহর থেকে ভীষর দববাব ভিতর দিয়ে আব এবটাবাদের পথে। এখন সবই পাকিস্তানের এলাকায়—আমাদের কপালে নিষিদ্ধ, আমাদের সঙ্গে কাশ্মীরেব সম্পর্ক আজ পাঠানকোট জাম্মু হয়ে বানিহাল টানেলেব ভিতর দিয়ে। যদিও এই টানেল তৈরি হয়েছে ১৯২০ সনে—ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরেব যোগাযোগ ছিল না কোনও দিন এ পথে। শীতের প্রারম্ভে আর শেষে কাশ্মীর সরকারেব শ্রীনগর থেকে জাম্মুতে যাওয়া-আসা চলত এই বাস্তব। তাবপর এল ভারত-বিভাগ। কাশ্মীরেব সঙ্গে ভারতের ভৌগোলিক সম্বন্ধ ছিল হয়ে গেল। র্যাডক্লিফ বোয়েদাদে এবার ক্ষীণ সম্পর্ক স্থাপিত হল ভারতেব পাঞ্জাবেব গুরুদাসপুর জেলাব সঙ্গে। এর মারফতেই সম্ভব হল মহারাজা হরি সিংয়ের সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর আর কাশ্মীরেব সঙ্গে ভারতের অঙ্গাদি সম্বন্ধ।

কাশ্মীর রক্ষার তাগিদে পাঠানকোট জাম্মু শ্রীনগরেব পথ আজ কাশ্মীরের সবচেয়ে ভাল রাস্তা। তবুও বিপদ শেষ হয় না। শীতের সময় বানিহাল টানেল থাকে বরফে ঢাকা। কাশ্মীর-উপত্যকার সঙ্গে ছুনিষাব কোনও সম্পর্ক থাকে না। তাই আজ তৈরি হচ্ছে জওহর টানেল দু হাজার ফুট নীচে।

পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর ১৬৬ মাইল। যাওয়া যায় বাসে, স্টেশন-ওয়াগনে, মোটর আর প্লেনে। কাশ্মীর-সরকারের সুন্দর ব্যবস্থা আছে পবিত্র-বিভাগে। রেল ও বাসেব ভাড়া একসঙ্গে জমা দিবে টিকিটও কেনা যায় শ্রীনগর পর্যন্ত। বাসে এই দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিতে সময় লাগে প্রায় দুদিন। সকাল নটাখ পাঠানকোট ছেড়ে বাতী নদীৰ ওপর দিয়ে এসে বাস থামে লক্ষণপুবে। সেখান থেকে জাম্মু। সন্ধ্যায় বাস এসে থামে কুদে—পাঁচ হাজার-ফুট উঁচুতে। বাজিবাস কবতে হয় এখানে। আবার সকাল সাতটায় যাত্রা। ন হাজার ফুট উঁচুতে বানিহাল টানেল। সেই স্বডঙ্গপথে পাহাড়কে অতিক্রম কবে চেনাবের পুল পাব হয়ে বাস নেমে আসে ঢালু উৎবাইয়ে ভীষণ বেগে। জাম্মুব ধূসর রুক্ষতার শেষে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ সবুজের কোমলতা। কাজিগুণ্ডেব পপলাব অ্যাভিনিউ পার হয়ে বাদামীবাগ ক্যান্টন-মেণ্টেব ভিতর দিয়ে বাস এসে থামে শ্রীনগরের টুর্বিষ্ট-কেন্দ্রে। অনেকে এই বাসেই কিছু বেশী পয়সা দিয়ে ভেরনাগে বিলম্বেব উৎস দেখে আসেন, না হলে পবে আর দেখাব সুযোগ হয় না।

বাসে যাওয়ার সময় নতুনত্বের নেশা আর অজানাকে আবিষ্কার কবাব উৎসাহে সময় যেন তাড়াতাড়ি কেটে যায়। গবম দেশের মানুষ জাম্মুব গবমকেও ভয় কবে না। কিন্তু ফেরার পথে বানিহালেব পর জাম্মুব দুর্দান্ত গরমে কষ্ট হয় অসহনীয়। স্বর্ঘতাপে ঝলসে যেতে হয় স্তূর্দীর্ঘ দিন। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন ফেরার পথে। পাঠানকোটে বাসে ফিবতি যাত্রীদের দুর্দশা দেখে এ কথা আবও বিশেষ ভাবে অনুভব কবেছিলাম।

“সময় যে নাই”—তাই উডোজাহাজের আশ্রয় নিতে হল। পাঠানকোট পৌছে গেলাম ভোরবেলা—জালন্ধর মুকেবিয়ানের নতুন পথে। এয়াব-

অফিসে মালপত্র রেখে আবার রেল-স্টেশনে ফিরে এলাম—জান করে কিছু খেয়ে ফিবব এই সঙ্কল্প নিয়ে। কিন্তু আমাদের ট্রেন ঠিক সময়ে না আসায় প্রাতবাণ খাবাব সময় পাওয়া গেল না। এটা যে ভুল হল তা পরে বুঝতে পেরেছি। উডোজাহাজেব দপ্তরের কার্যক্রম শেষ কবে বাস আমাদের নিয়ে এল এরোড্রোমে। এখানকাব ক্যান্টিনে খেতে বসে দেখি যে কিছুই পাওয়া যায় না। খানকয়েক বিস্কুট ও লেবুব সববত খেয়ে আর চতুর্গুণ দায় দিবে চলে আসতে হল। পাঠানকোট স্টেশনেই খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল। খুব সুন্দর ব্যবস্থা এই স্টেশনে। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা অতি সুন্দর। মেয়েদের জন্য আছে কয়েকটা ওয়েটিং রুম। বাথরুম প্রভৃতির ব্যবস্থা অতি আধুনিক ও সংখ্যায় যথেষ্ট। এসব ছাড়াও আছে একেবাবে আলাদা কামবা শুধু মেয়েদের বেষবিজ্ঞাসের জন্য—চারিদিক সুদৃশ্য গ্লাসে ও বেসিনে সুসজ্জিত।

পাঠানকোটে ভয়ানক গবম। এরোড্রোমে যাত্রীদের বিশ্রামাগাব আকাবে যেমন ছোট তেমনি সাজসজ্জায় বিকল্পপ্রায়। একটি মাত্র পাখা আছে পঁচিশজন যাত্রীকে আবাম দিতে। এতগুলো যাত্রীর ঠাসাঠাসিতে ঘর হয়ে উঠেছে আরও গরম। আমবা বাইবে বেবিয়ে এলাম।

“ডাকোটা” প্লেন। বাইরে দেখতে নতুন হলেও ভেতরটা বেশ পুরনো বলে মনে হল। পাঠানকোটেব বিমান-অবতরণক্ষেত্র সিমেন্ট কবা নয়। লড়াইয়ের হুজুগে ফুটো-কবা লোহাব পাত ফেলে তৈরি করা। তার ওপর দিয়ে ছুটল আমাদের প্লেন। একটু পবেই আমরা শূঁছে। পায়ের নীচে ধূসর জমি, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নদীনালাব উপব দিবে উড়ে আমরা মেঘের বাজ্যে এসে প্রবেশ কবলুম। দু পাশের পাহাডেব মাথায বরফ—তাবই গা ঘেঁষে ঘেঁষে উড়ে চলেছি। ক্যান্টেনের অল্পমতি নিয়ে তোমার মা গেলেন চালকেব সামনের কামবায। তিন দিক কাচে-ঘেবা বিমানের সামনে থেকে চারিদিকের দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর। বানিহাল গিবিবজ্ঞের উপব দিবে উড়ে যাচ্ছে আমাদের উডোজাহাজ—মনে হয় যেন পাহাডের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছি। ওপরে নীল আকাশে সাদা মেঘ, পায়ের নীচে উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণীৰ সর্বাঙ্গে শুভ্র বরফ, পাহাডের

গায়ে মরুপথ—এ দৃশ্যের বর্ণনা সম্ভব নয়। সমগ্র ভারতে নেই এর তুলনা। বানিহাল পাব হতেই তোমার মা ফিরে এসে বসলেন আমাদের পাশে।

প্লেন আস্তে আস্তে নামতে আরম্ভ করেছে। স্পষ্ট হয়ে আসছে নীচের গাছপালা, জলভরা নদী, ঘন সবুজ মাঠ, বাড়িঘর, দিগন্তে নীলাভ পর্বতের মেখলা। আমরা মেমে পড়লুম। বাইবে আসতেই স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। জুন মাসের প্রথম জ্যৈষ্ঠের দুঃসহ গরমেব কোথাও আভাস নেই এতটুকু। বোঁদ্রে নেই সেই তীব্র অগ্নিবর্ষা জালা। মন শান্তিতে ভরে গেল। অফিসের টুরিস্ট-খাতায় নাম লিখে অপেক্ষা কবতে হল বাসেব জন্তে। দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি প্লেন। এখান থেকে যাওয়া যায় পাঠানকোট জাম্বু ও অমৃতসর হয়ে দিল্লী। ছোট এরোড্রোমে নেই দমদমের কর্ম-কোলাহল। প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোলে সবই যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। যাত্রীদের প্রতীক্ষালয়টি খুব সুন্দর আর ব্যবস্থা অতি পরিপাটি—পাঠানকোটের তুলনা করা চলে না এব সঙ্গে। বাসে কবে শহরবে দিকে যাত্রা করলুম, রাস্তা চিত্তাকর্ষক নয়। ঝিলমের পুল পার হয়ে মস্ত চওড়া রাস্তা দিখে বাস এসে থামল টুরিস্ট-অভ্যর্থনাকেন্দ্রে। এটাই হচ্ছে পর্যটকদের নার্স সেন্টার বা স্নায়ুকেন্দ্র।

একটা মস্তবড় বাঁধানো চত্বরেব তিন দিক ঘিরে দোতলা বাড়ি। ছাদ বরফের দেশ বলে ঢালু। পেছনেব খোলা জায়গায় আছে মস্তবড় ঘাসে ঢাকা লন, তারপর ছোট একটা খাল। তাব ওপারে শঙ্করাচার্য পাহাড়, চূড়ায় মন্দির। সবুজ মাঠেব মাঝে মাঝে নানা জাতের মরসুমী ফুলের কেযাবী আর লনেব চাবিদিকে রয়েছে ফুলে ভরা লতানো গোলাপ ঢাকা লতাকুঞ্জেব সারি। পবিবেশ যেমন সুন্দর, বাড়িটিও তেমনি। বাবো লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছে তিন বছর আগে। নীচেব তলায় বিরাট হলে আছে পর্যটক-কেন্দ্রের অফিস—সেখানে বাস বেল হাউসবোট ভ্রমণ এমন কি অভিযোগ জানানাব পৃথক পৃথক বিভাগ। কর্মচারিগণ প্রায় সবাই কান্স্ট্রাক্টর বাব সবাই হাসিমুখে পর্যটকদের সাহায্য করছেন। এ-সব ছাড়াও এই দপ্তরেব মারফত চিঠিপত্র পাওয়াবও ব্যবস্থা আছে। বিরাট বেস্তোরা, পোর্ট-

অফিস, বইয়ের দোকান, হাওয়াই জাহাজেব দপ্তরও আছে এই বাড়িতে। মোজেক-করা মশণ মেঝে আব সুন্দর কারুকার্যখচিত কাঠেব ছাদে বাড়ির ভিতরটাও সুদৃশ্য। এই বাড়িরই ওপব তলায় আছে বড় বড় শোবার ঘর যেখানে বিনা ভাডায় বহু লোক রাত্রিবাস কবতে পাবে। মপবিবারে থাকাব জন্ত আছে ছোট ছোট সুসজ্জিত কামরা। জনপ্রতি একদিনেব ভাডা দু টাকা মাত্র। কাজেই হঠাৎ এসে পড়লেও কোনও অসুবিধা হয় না। এখানে একদিন থেকে নিজেদের থাকাব পৃথক ব্যবস্থা কবাই বুজিমানেব কাজ। আমবা তা কবি নি বলে কিছু অসুবিধেও হয়েছে।

খুবই পরিশ্রান্ত আমরা। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বাসস্থানেব সন্ধ্যা বেবনো গেল। বহুদিন থেকে ডাল হুদেব চিত্তাকর্ষক গল্প শুনেছি সকলের মুখে। মনোমুগ্ধকর ছবিও দেখেছি অনেক। পাহাডে ঘেরা বিস্তীর্ণ জলরাশি টলমল করছে, মাঝে মাঝে পদ্মফুলেব বন—মন তাই টানল ডালের দিকে। টুরিস্টকেন্দ্রের অফিস থেকে একটি প্রথম শ্রেণীব হাউসবোট ডাল হুদেব নেহরু পার্কের কাছেই ঠিক করে দিল। থাকা-খাওয়ার খবচ দৈনিক পয়তাল্লিশ টাকা আমাদের সাডে তিনজনের জন্তে। টাঙ্গা করে জিনিসপত্র নিয়ে হুদেব ধাবে এলাম। তাবপর একটি ছোট ডিঙি নোকো কবে এসে উঠলাম আমাদের প্রবাসের প্রথম আশ্রয় হাউসবোট নং ২০০।

ডাল হুদের তিন দিকেই পাহাড়। পূব দিকে শঙ্করাচার্য পাহাড়-চূড়ায় মন্দির। উত্তরে আর পশ্চিমে পাহাডেব কোলে আছে হাবওয়ান, শালিমার, নিশাত, চশমাশাহী—মোগলদের বিশ্ববিশ্রুত অপূর্ব উদ্যানরাজী। ডালের জল একেবাবে পাহাডের পা স্পর্শ কবে আছে। আব এই জলবাশিকে মালার মত ঘিবে আছে সুন্দর পিচালা চওড়া রাস্তা। বাজে সুদৃশ্য ডোমেব ভিতব বিজলীব আলো একে করে তুলেছে শোভাময়। বাস্তাব নাম কবমসিং বুলেভার্ড—বর্তমান সদর-ই-রিয়াসতের নামে। ডালেব যে জলটুকু পাহাডেব কোল ঘেঁষে তাই সত্যিকাব হুদ। তাব সামনেই আছে মহাবাজা হরি সিংয়ের প্রাসাদ—আজ যা উবেবষ হোটেল। আব আছে মহারাজার প্রমোদ-উদ্যানেব ধ্বংসাবশেষ। এখানে জল

গভীর ও পরিষ্কার বলে আছে এখানে ভাসমান স্নাইমিং ক্লাব। এখানে শৌখীন লোকেরা মোটরবোটে ভ্রমণ করেন, আর সার্ব বাইডিংয়ের কসবত দেখান। এদিকে কোনও হাউসবোট বাখতে দেওয়া হয় না। বোটগুলো ভিড় হচ্ছে নেহরু পার্কে পিছনে—তাব নাম গাগরীবাল ও আব একটা প্রায় একশো ফুট চওড়া খালের ধারে। এই খাল দিয়ে ডালের জল এসে পড়ছে চিনারবাগেব খাঁড়িতে, সেখান থেকে ঝিলমে। চিনারবাগেব জল নীচুতে তাই ডালের জলকে আটকে রাখা হয়েছে লকগেট দিয়ে।

এই চওড়া খালের এক পারে কবমসিং ব্লেভার্ড আর অন্য পাড়ে গাছের ছায়ায় হাউসবোটের সারি। রকমারী নাম তাদেব, সবই ইংবেজী ঘেঁষা। দেশী নাম একটাও দেখেছি বলে মনে হয় না। হাউসবোট-গুলো শ্রেণী অনুযায়ী আকাবপ্রকারে সাজসজ্জায় আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা কবে আছে। বাস্তাব ধাবে ধারে খালের জলে অনেক ছোট ছোট ডিঙি নৌকোব সমাবেশ। এরা বলে শিকারা—শিকাব ধববার আশায় বসে। এখানে যে ওবাই পারের কাণ্ডাবী। জল এদিকে তেমন গভীর নয়—চার-পাঁচ ফুট মাত্র হবে। নানা জলজ গাছপালাতে একেবাবে ভবে রয়েছে এব বুক। জলের রঙ কালো ও দুর্গন্ধময়। পবে দেখেছি হাউসবোটগুলোর ময়লা পরিষ্কার করা হয় এব জলে—যদিও আইনে নিষেধ। জায়গাটা নরক বলেই হয়। আমাদের এবং আর সব হাউসবোটের এ হেন স্থানে অবস্থিতি দেখে আমরা একেবাবে হতাশ ও হুঃখিত হয়ে পড়ি। তা ছাড়া যখন দেখলুম যে হাউসবোটের লোকেবা আমাদের খাবার জিনিসেও এর জল ব্যবহার করেছে তখন অবস্থা একেবাবে চরমে উঠল। এরা শুধু পানীয় জলই আনত বাস্তাব সরকারী জলেব কল থেকে। এই সব নোংরামিতে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা দুদিন পব ডালের বোট ছেড়ে দিয়ে ঝিলমে আসবার চেষ্টা কবি কিন্তু পর্যটক-দপ্তরে পাঁচদিনের চুক্তি অগ্রিম লিখে নিয়েছিল বলে সে কদিন আমাদের ওখানেই থাকতে হয়। আরও কষ্টকর হয়েছিল ওখানকার খাবারের ব্যবস্থা দেখে। একমাত্র প্রান্তবাশ ছাড়া আর কোনও খাবারই মুখে দেওয়া যেত না। রান্না অতি জঘন্য, সবই কেমন বিষাদ ও তেতো তেতো লাগত। ভোজ্য

বস্তুও খুব নীচু স্তরের। পরে জানতে পেরেছিলাম যে এরা রান্নাতে তেল বা ঘিয়ের পরিবর্তে চবি ব্যবহার করে।

শ্রীনগরে আছে জল আর পাহাড়। মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে খবশ্রোতা ঝিলম। তাই নৌকোই হচ্ছে সর্ব-সাধারণের যান—জান বাঁচাবার একমাত্র উপায়। অনেকে এই জলাকীর্ণ শ্রীনগরকে ভিনিসের সঙ্গে তুলনা করেন। নতুন শহর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুব চওড়া সুন্দর রাস্তা, বড় বড় দোকানপাট—যেমন বড় শহবে হয়ে থাকে। আর পুরনো শহর—যেমন গলিঘুঁচি তেমন অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধের গীঠস্থান। এখানে এখন শীত বেশী নয়। গরম কাপড় না হলেও চলে, তবে সোয়েটার একটা থাকা ভাল। বাতের শীতে কিন্তু লেপ না হলে চলে না। শহরের সবচেয়ে সুন্দর লাগল পপলাব আব চিনাব গাছের শোভা। রাস্তাব দু ধারে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্রকাণ্ড সবল ঋজু স্বল্প পত্রবহুল পপলাবের সাবি। রাস্তা যেন তুলি দিয়ে আঁকা—এতই সুন্দর। মাঝে মাঝে আছে বিশাল বিরাট ঘন সবুজ পাতায় ছাওয়া চিনাব গাছেব স্নিগ্ধ ছায়াব মাথা—পথপ্রমকে তুলিয়ে দেবার জন্য।

রাতে বোটের ছাদে বসে দেখলুম শ্রীনগরের নৈশ সৌন্দর্য। অন্ধকার আকাশে তারার চন্দ্রাতপ। দূরের পাহাড়গুলোকে দেখাচ্ছে কালো ছায়াব মত। ডালের জল অন্ধকার বাত্মিতেও চিক্‌চিক্‌ কবছে অসংখ্য হাউসবোটের আলোব দ্যুতিতে। শঙ্করাচার্য পাহাডেব চূড়ার মন্দিরকে স্পটলাইট ফেলে আলোকিত করা হয়েছে। ডালের কালো জলকে ঘিরে আছে করমসিং ব্লেভার্ডের আধুনিকতম সুদৃশ্য আলোর মালা।

বেশ শীত মনে হচ্ছে। নীচে নেমে এলাম।

নন্দনকাননে

কাশ্মীর প্রকৃতির লীলাভূমি। বরফ-ঢাকা পাহাড়ে, সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে, সুদৃশ্য বৃক্ষরাজিতে, নানা বিচিত্র বর্ণের বন্য ফুলেব সম্ভাবে, স্থির জলে ভরা প্রাকৃতিক জলাশয়ে, বরফ-গলা উদ্ভাস জলেব প্রবাহে কাশ্মীর যেন একটি পটে-আঁকা ছবি। হাজার হাজার বছর ধরে এখানে এসেছে নানা জাতি; আপন আপন ভাবের সংস্কৃতিকে বহন করে কেউ বা করেছে ধর্মপ্রচাষ, কেউ বা কবেছে

বাজত, কেউ করেছে এর স্বল্প ঐশ্বর্যকে লুপ্তন আব কেউ দেখেছে একে ক্রীড়াকৌতুকেব রঙ্গভূমির চোখে। একমাত্র মোগল বাদশাহবাই অভিজ্ঞত হয়ে পড়েছিলেন এব অফুবন্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে। সৌন্দর্যপ্রিয় বিলাসী মোগলেব মুগ্ধ মন কবতে চাইল মনোবমকে আরও মনোবম—সুন্দরকে সুন্দরতম। তাই তৈরি হল হাবওয়ান, শালিমাং, নিশাত, চশমাশাহী, ঝিলমেব উৎস ভেরনাগের, আছাবলেব, মনসাবলেব উত্থানবাজি—আরও কত।

সুন্দরী প্রকৃতিব গলায মাঝবেব হাতে গড়া রঙ্গহার। আকবব নিয়ে এলেন পাবস্তা থেকে চিনাব কিন্তু দিল্লীব সিংহাসনে বসে সমস্ত হিন্দুস্তানের শাসনভার হাতে নিয়ে তাঁর আর কাশ্মীরে আসা সম্ভব হত না। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের রাজত্বে তিনি এসেছেন মাত্র তিনবার। টোডবমল্লের রাজত্বের খাতায় এক লাখ টাকা কাশ্মীরেব আয় দেখেই তাঁকে কাশ্মীরের কোতূহল নিবৃত্ত কবতে হত। তাঁর হাতে-গড়া মোগল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তির সুযোগ নিলেন আকবর-পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর। কাশ্মীর তাঁব চোখের মণি। মেহেবউদ্দিনসাকে ছিনিয়ে আনা যত সহজ হযেছিল, তাব মন পাওয়া হয নি অত সহজ। তাই ভুবনমোহিনী নূরজাহানেব মন ভোলাবার প্রয়াসে সম্রাট জাহাঙ্গীরেব অভিযান এই ভূস্বর্গ কাশ্মীরে।

কাশ্মীরেব প্রেষ্ঠ আকর্ষণ শ্রীনগরেব বিখ্যাত মোগল উত্থানগুলি। প্রতি ববিবার উত্থানেব ফোয়ারাগুলো সব থুল দেওয়া হয তাই সেদিন হয প্রচুর লোকসমাগম অর্থাৎ শান্তিতে সৌন্দর্য উপভোগ কবাব সুযোগ মেলে না। পর্যটকদের উত্থানগুলো দেখিয়ে আনবার জন্ত সরকারী বাসেব ব্যবস্থা আছে। প্রতি আসন আড়াই টাকা। অনেকে শিকারা নিয়েও যান—একদিনের ভাড়া দশ টাকাব মত লাগে।

ডালেব পশ্চিম পারে পাহাডের গায়ে এই উত্থানগুলি। বছদিন পূর্বে ডালেব জল একেবারে বাগানগুলোর পাষেব কাছে লুটিয়ে পডত। এক নিশাত ছাড়া আব সব-গুলোই বেশ একটু দূরে। আমরা নিশাত শালিমাংকে পিছনে বেখে প্রথমে হাবওয়ান দেখতে যাই। বড বড চিনার গাছেব ছায়ায ঢাকা একটি কৃত্রিম হ্রদ। পিছনেব পাহাডেব শিখরদেশ শুভ বরফে সমাচ্ছন্ন। এই বরফ-গলা

জল এসে পডছে হাবওয়ানের জলাশয়ে। এব জলেব প্রাচুর্য দেখে মনে হয যে এ ছাড়াও হয়তো আবও জলেব উৎস কোথাও লুকিয়ে আছে। সমস্ত শ্রীনগরেব জল সরবরাহ হয এই জলাধার থেকে। বাড়তি জলটুকু মোগল বাদশাহরা নিয়ে গিয়েছেন ছোট্ট খাল কেটে শালিমাং আব নিশাতেব সৌন্দর্য বাডাতে। তাংদেব জলেব ধাবায় আব ফোয়াবায় ছড়িয়ে পডছে হাবওয়ানেব বরফ-গলা সুনির্মল শীতল জল।

নীচে থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয লোক দেখতে। জলাশয়টি এমন কিছু বড নয়। একটা বড পুকুরেব মত। পিছনেব পাহাডেব বরফেব সৌন্দর্যই আসল। আব সবই রক্ষ ধূসর। সামনেব বাঁধের ওপব কোনও সবুজের ছাপ নেই। বোঁগা বোঁগা শুকনো কষেকটা খোঁবানীর গাছ ছাড়া আব কিছুই চোখে পডল না। ছোট্ট একটা পাম্পিং স্টেশন আছে। আর আছে ট্রাউট মাছের চাষের উদ্যোগ। বাঁধের নীচে ঘন সবুজ বিবটি চিনারের ছায়ায দেখেছি অগণিত পিকনিক পার্টি। আমবা কিছুক্ষণ ঘুবে-ফিবে সব দেখে চলে এলাম শালিমাং।

বাগানের সেবা শালিমাং : Abode of love— প্রেম-নিকেতন। মোগলদেব উত্থানেব এই কল্পনা গত চার শো বছর ধবে প্রভাবিত করছে পৃথিবীব সমস্ত উত্থানকে। এব চেয়ে বেশী আর্টিষ্টিক উত্থানেব পবিকল্পনা আজ পর্যন্ত কাবও মাথায আসে নি। এর প্রায় সব প্রাংশাই সম্রাট জাহাঙ্গীরেব প্রাপ্য। একটি বহুমূল্য বস্তুকে বাঁধতে হলে তার পরিবেশকেও কবতে হয তেমনি সুন্দর। তাই জাহাঙ্গীরেব সবচেয়ে প্রিয় বস্তু নূরজাহানের জন্ত এই অপূর্ব সৃষ্টি শালিমাং। পিছনে বরফ-ঢাকা পাহাড, সামনে ডালেব দূরবিস্তৃত জলবাশি। মাঝখানে লোকালয় থেকে বহু দূবে নির্জন পাহাডেব কোলে এই মায়াকানন। উত্থানেব গঠনভঙ্গী অনেকটা তাজমহলের উত্থানেব মত। তবে এখানে গাছপালার সৌন্দর্য অনেক বেশী। সবই স্নিগ্ধ, শান্ত সবুজ। মধ্যমলের মতন নবম ঘন সবুজ ঘাসেব লনের কথা ভোলবার নয়। অথচ কেউ তো লনমোয়ার দিয়ে সুন্দর কবে ঘাস ছেঁটে বাখে নি। কোথাও কিছু বিলদৃশ নেই। চেনাব আছে তবে তাব বাহল্য নেই। বেশীর ভাগ ফুলের গাছ, নানা ঢঙের কেয়াবী

করে লাগানো। মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে জলের প্রবাহ। আর আছে ফোয়ারা। জলের স্রোতকে আর ফোয়ারা-গুলোর সূক্ষ্ম জলের ধাক্কে নানা বণ্ডে রাঙিয়ে তোলবার প্রয়াস আছে। দেওয়ালে দেওয়ালে অজস্র দীপাধার। সহস্র প্রদীপের আলোর খেলায় রাতের শালিমাৰ মণিদীপ্ত অমরাপুরী।

চাব শো বছর আগে কাশ্মীরে আসা সহজ ছিল না। বিশেষ করে বাদশাহব দীর্ঘদিন রাজধানী ছেড়ে থাকা আশঙ্কার কথা ছিল। তবুও বাজকার্ঘ্যেব সহস্র বন্ধনকে এড়িয়ে প্রিয়তমাকে নিবিড় করে পাওয়ার সাধনায় প্রেমিক জাহাঙ্গীরবেব এই স্বদূর্ব কাশ্মীরে পবিত্রমণ।

গাহীষপুকে রূপায়িত কবে ভূষর্গ কাশ্মীরে শালিমাৰ স্বর্গেব উত্থান। এই উত্থানের বাবাদবীতেই সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রথম উৎকীর্ণ করেছিলেন বিখ্যাত পাবসীক বয়েং

“আগর ফিবদোস ববঃ রুই জামিনস্ত

হামিনস্ত ও, হামিনস্ত ও, হামিনস্ত।”

যদি ভূতলে স্বর্গ থাকে তবে তা এইখানে, এইখানে, এইখানে।

ভূষর্গেব লেখা কবে মুছে গেছে কিন্তু সম্রাট সাজাহান এই বাণীকে অমর কবেছেন দিল্লীব দেওয়ানী-আমেব শুভকর্তিন মর্মরে অঙ্কিত করে। বাগানের মধ্যে আছে একটা খোলা হল। দবজা জানলাব কোন চিহ্ন নেই। তার চতুর্দিক ও নীচে দিঘে বয়ে যাচ্ছে শীতল জলস্রোত। আর আছে হাজার ফোয়ারা—ছড়িয়ে পড়ছে অজস্র সূক্ষ্ম জলকণা। সমস্ত জায়গাটাতে একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের আবেশ।

নিশাত : Garden of Pleasure—আসফ্ খাঁব প্রমোদ কানন। শালিমাৰকে টেকা দিয়ে তৈরি। মস্তবড়—যেমন লম্বা, তেমন চওড়া আর ততোধিক উঁচু। পাহাডেব গা কেটে বাবোটা ধাপে তৈরি। শেষ ধাপেব নীচেই ডালের জলবাশি। উত্থানেব মধ্যে বয়ে যাচ্ছে জলের স্রোত, ধাপে ধাপে নেমে আসছে জলপ্রপাতের মত, বেড়ে যাচ্ছে জলের গতিবেগ। এই স্রোতধাবার মাঝে আছে জলের ফোয়ারা। দু পাশেব প্রশান্ত অঙ্গনকে বড়িন করে রেখেছে বিভিন্ন জাতের মৌসুমী ফুলের কেয়ারী। তার দু পাশে

বয়েছে বিশাল চিনারবেব সারি, উপর থেকে নীচে পর্যন্ত তার দু পাশে আবার ফলের বাগান। কাশ্মীরে এমন ফল নেই যার-গাছ এখানে পাওয়া যাবে না। চেবী, খোবানী আখরোট, আপেল, বাদাম, ডালিম—আবও কত রকম ফলেব গাছ। আমগাছ একটাও দেখলাম না এখানে। চেরীফলগুলো দেখতে কি সুন্দর। লাল লাল চেরীর খোপা অজস্র বুলে আছে শীর্ণ ছোট ছোট গাছে। এই ফলেব বাগানেব দু পাশে আবও নীচুতে আছে অসংখ্য চিনারের ছায়ায় ঘেবা সবুজ ঘাসে ঢাকা শ্রামল প্রান্তর।

রাস্তা থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। সামনেই একটা দোতলা ঘর—নিশাতের গুরু এখান থেকেই। এখানে দাঁড়িয়ে বহুদূরবিস্তৃত ডালকে চমৎকাব দেখা যায়। পিছনেব পাহাডের বুক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছে লীলাচঞ্চল উজ্জল স্রোতধারা—ছড়িয়ে পড়ছে বিশাল সবুজ-ঘেবা বড়িন-ফুলের প্রাঙ্গণে। কিন্তু পাহাডের গায়ে নেই ববফের গুল্মশান্ত আভরণ। বিশাল উত্থানে আছে প্রাচুর্যের ছাপ। শালিমাৰের মন-ভোলানো স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। পেলাম অপ্রত্যাশিতভাবে সাহাবানপুবেব পৌবসভার কর্মসচিব শ্রীমাধোপ্রসাদজীকে। বিশাল চিনারবেব ছায়ায় শতরঞ্চি পেতে বসে আছেন বিবটি বপু নিয়ে তাঁব অর্ধাঙ্গিনী। দেখা হুতেই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-সন্তরণ। তার পরই স্নেহমধুব হস্তে খাবার পরিবেশন।—কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গস্থখ উপভোগ করে নিশাত ত্যাগ করলুম।

চশমাসাহী : Royal Spring—সম্রাট সাজাহানের স্মৃতিবিজড়িত। অনেকটা চড়াই ভেঙে আসতে হল এখানে। তারপরও আছে অসংখ্য সিঁড়ি। সামনেই ঘন সবুজ আঙুরবেব পাতায় ঢাকা দোতলা ঘর। এত নবম মস্তণ সুন্দর আঙুরবেব পাতা আর কোথাও দেখি নি। আবও সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম চশমাসাহীর ক্ষুদ্র বাগানটিতে। পিছনেই পাহাড় উঠে গেছে তির্যকভাবে। এই পাহাড়ের বুকুই লুকিয়ে আছে অফুবন্ত জলের ভাণ্ডার—পাহাড়ের ফাটলের পথে বেরিয়ে আসছে সেই জল চশমাসাহীতে। শাহী কাষদায় তাকে এখানে ধরে রাখা হয়েছে একটি ছোট ঘরে।

বাদশাহেব পানীয় জল এখন হয়েছে সর্বসাধারণেব। সবাই কাডাকাডি করে জল পান কবছেন। জলে সত্যি গুণ আছে। মাধোপ্রসাদজীর ঘৃতপক ভারী ভারী পুরিগুলোর আব কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

সূর্যদেব ঢলে পড়েছেন পশ্চিমে। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়া ঘনিয়ে আসছে। পাহাড় ডিঙিয়ে আসছে হিমশীতল বাতাস। আমরা এলিয়ে দিলাম সমস্ত দিনেব পবিত্রাঙ্গ শরীরকে চশমাশাহীর ঘন সবুজ ঘাসের মাঠে। মনে ভেসে এল বিগত দিনের নানা স্মৃতি : সম্রাট সাজাহানের জন্ম চশমাশাহী জল যাচ্ছে দিল্লীতে, অসংখ্য হাতী ঘোড়া লোকজন সৈন্তসামন্ত—বিব্রাট এক শোভাযাত্রা। এ শোভাযাত্রায় শোভা কবে যাচ্ছেন বাদশাহেব পানীয় জল। দিল্লীখবো বা জগদীশ্বর।

সন্ধ্যা কাটল ডালের জলে শিকাবাষ গা এলিয়ে। শিকারীগুলো ছোট ডিঙিনোকার মত। ভিতরে আছে কার্পেটে ঢাকা বসবার আসন। এত বড় যে শুয়েও থাকা যায়। পেছনে বসে মাঝি তাব ছোট দাঁড় দিয়ে আস্তে আস্তে বেঁধে নিয়ে চলে।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকাব বাজি, মিটমিট করছে তারা-গুলো আকাশের গায়ে। কালো জলকে মালার মত ঘিরে আছে করমসিং বুলেভার্ডেব আলোব সাবি। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বিচিত্র রঙিন আলোয় অন্ধকারকে আলোকিত করে প্রাণচঞ্চল নেহরু পার্ক। হ্রদের কোলের অন্ধকাবের শাস্ত আবেশকে ভেঙে দিচ্ছে মোটরবোটের আনন্দপিপাসু টুরিস্টদের অকাবণ কোলাহল। তার ঢেউয়ের দোলায় ছলতে ছলতে ভেসে চলেছে আমাদের ছোট্ট শিকাবা।

একদিন গেলুম নাগিন লেক দেখতে। ডাল আব নাগিন পাশাপাশি। মাঝেব স্বল্প ব্যবধানকে যুটিয়ে এখন দুটিকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাগিনেব পথে পড়ল অনেক ভাসমান উত্থান—ফুলের বাহার নেই, আছে ফল ও সবজির। মোগল-উত্থানের সৌন্দর্য এতে নেই কিন্তু আছে কাশ্মীরীদেব নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। জল আব পাহাড়ের

দুর্লভ্য প্রাকৃতিক বাধাকে অতিক্রম কবে প্রাণধারণের অবিরাম সংগ্রাম। এই উত্থানে ফলে আছে শশা লাউ টম্যাটো কুমড়া আবও অনেক কিছু। বেশ বড় বড় আব তাজা। জলের মধ্যে ভাসিয়ে রাখা গোল গোল শুকনো লতার ঘেরের ভিতর বিচি বুনে এই চাষ-আবাদ। আজ-কালকাব নতুন ছজুগ যুক্তিকাশু চাষেব আদিশুত্র। শুনে আশ্চর্য হলুম যে এই বাগানগুলো নাকি চুরি হয়ে যায়—বাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে। নিঃশব্দে একজনেব বাগান আর একজনেব এলাকায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যে একান্তই সহজ।

অনেকগুলো খাল পাব হয়ে ছোট একটা গুলের নীচে দিমে এসে পড়লুম নাগিনে। এই সব ছোট ছোট খালের ধারে ধাবে নৌকোতে দোকান সাজিয়ে বসে আছে কাশ্মীরী দোকানীরা। এই নৌকোতেই এদেব জন্ম, এদের মৃত্যু, আব এই নৌকোকেই ময়ল করে আছে জীবন-ধারণের বহু পুরাতন গতানুগতিক কোনও একটি পন্থা। এদেব জীবনতরী বয়ে যাচ্ছে মন্দাকিন্তা তালে। স্তম্ভব স্তম্ভর হুইপুষ্ট শিশুদেব দেখে মনে হয় বেশ সুখেই আছে শহরেব কলকোলাহল থেকে দূরে এই সব কাশ্মীরী পরিবার।

নাগিনেব পথে সন্ধ্যা নেমে এল। নাগিন লেক ডালেব চাইতে ছোট, কিন্তু জল খুব গভীর আর অনেক পবিত্র। বড় বড় হাউসবোটও আছে, তবে সংখ্যায় অল্প। শহর থেকে অনেকটা দূর বলে টুরিস্টবা এদিকে থাকতে চান না। এখানেও আছে সুইমিং ক্লাব, আর সব রকম আধুনিক জলকেলিব চূড়ান্ত ব্যবস্থা। ডালের ধাবে যেমন শঙ্করাচার্য পাহাড় তেমনি নাগিনেব বুকে হবি পর্বত। এব চূড়ায় আছে হুদুর্গ—পাঠানদের কীর্তি। আকবর বাদশাহ হকুমে একে করা হয়েছিল দুর্ভেদ্য। ভিতরে দেখবার জন্ম অল্পমতিপত্র নিতে হয়। বাত্রেব অন্ধকাব গাঢ় হয়ে আসছে। বাণাওয়ারীর খাল বেয়ে আমরা বোট ফিবে এলাম।

[ক্রমশঃ]

॥ কবিমানসী ॥

[৪৪৮ পৃষ্ঠাব পর]

সংগীতেব শেষসপ্তকে স্মরণশ্রুতি করলেন। কবিব বাণীসাধনা
যেখানে কাব্য-সংগীতের চরমোৎকর্ষকে স্পর্শ করেছে সেই
শ্রেণীর কয়েকটি অবিস্মরণীয় বচন। এই কাব্যগ্রন্থে
শেষবাবের মত সহৃদয় পাঠক খুঁজে পাবেন। ইতস্ততঃ
আহবণ-কবা দু-একটি উদাহরণ এখানে সংকলিত হল :

করুণ ধৈর্যে গনে না দিবস,
সহে না পলেক গোণ,
তাপসেব তপ করে না মান্ত,
ভাঙে সে মূনির মৌন।
মৃত্যুবে দেখ টিটকাবি তার হাশ্বে,
মঞ্জীবে বাজে যে-ছন্দ তাব লাশ্বে
নহে মন্দাকান্তা—

প্রদীপ লুকায় শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমলকান্তা।

[“অধীরা”]

ঘুমের ঘোরেরেতে পেয়েছি তাহার
রক্ষ চূলেব গন্ধ।
আধেক রাতে শুনি যেন তাব—
দ্বার-খোলা, দ্বার-বন্ধ।
নীপবন হতে সৌরভ আনে
ভাষাবিহীনার ভাস্ক।
জোনাকি আঁধারে ছড়াছড়ি করে
মণিহার-ছেঁড়া হাস্ক।

* * *

তারাব আলোকে ভরে সেই সাকী
মদিরোচ্ছল পাত্র,
নিবিড় রাতের মুগ্ধ মিলনে
নাই বিচ্ছেদ মাত্র।

[“মানসী”]

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিছ মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।

৭

শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূব হতে শুনি বারুণী নদীর তবল রব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।
এমনি বাত্রে কত বাব, মোর বাহতে মাথা,
শুনেছিল সে যে কবিব ছন্দে কাজরি-গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে-বাহিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণেব সে-বৈভব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

[“অসম্ভব”]

৫

গোধূলি লগ্নেব অভুলনীয় প্রেমকাব্য হিসাবে একাদিকে
যেমন ‘সানাইয়ে’র গুরুত্ব, অত্য়দিকে তেমনি কবিমানসী
সম্পর্কে কবিচেতনার বিচিত্র স্তরের কাব্য-রূপায়ণ হিসাবেও
তার মূল্য অপরিণীয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ‘চিত্রা’ কাব্যের
একদিকে “স্নেহস্বতি” [সেই চাঁপা, সেই বেলফুল],
“নববর্ষে”, “দুঃসময়”, “মৃত্যুর পরে” প্রভৃতি কবিতা এবং
অত্য়দিকে “অন্তর্ধামী”, জীবনদেবতা” প্রভৃতি কবিতার
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমরা বলেছিলাম, প্রথম স্তরের
কবিতাগুলি ব্যক্তিসীমার প্রাকৃত জগতে থেকে কবিব
নিঃসঙ্গ মুহূর্তের স্বগতোক্তির মতই উচ্চারিত। আর
দ্বিতীয় স্তরের কবিতাগুলি অসীমের কোটিতে উন্নীত হয়ে
মানসসুন্দরী অন্তর্ধামী জীবনদেবতার স্তবগান। কবি-
চেতনায় প্রেমতত্ত্ব ও জীবনদেবতাতত্ত্বের এই যুগ্মবেণীর
লীলাবিলসন প্রসঙ্গে প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি,
একপাত্রে পরিবেশিত হয়েছে প্রেম, অত্য়পাত্রে লীলারস।
একটি ব্যক্তিসীমার জগতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃত ভাষায় বথা,
আর একটি বিশ্বাত্মবোধে প্রবুদ্ধ হয়ে অসীমের দিকে
তাকিয়ে রসতত্ত্বের গান।

কবিচেতনার এই বিচিত্র স্তবকে ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থেব

নামকবিতার আলোকেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

সেখানে বিশ্বের দিকে তাকিয়ে কবি বলছেন :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

আর অন্তরের দিকে তাকিয়ে বলছেন :

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

এই কবিতার উপলব্ধি অনুসারে বলা যায় অন্তরলোকে ও বিশ্বলোকে কবিমানসীর ভিন্ন রূপ, ভিন্ন মূর্তি। 'চিত্রা'য় বিশ্বলোকের বিচিত্ররূপিণীকে ধ্যান কবে কবি বলেছিলেন :

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দু্যলোকে ভুলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী।

মুখব নুপুর বাজিছে হৃদয় আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।

'পত্রপুটে'র পনেরো-সংখ্যক কবিতায় এই বিশ্বময়ীকেই আবার দেখেছেন "ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে বিধাতার বামপাশে।" "স্বন্দর যখন অবমানিত কদম্ব কঠোবের অশুচি স্পর্শে তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি, ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।" 'সানাই'য়ের "বিপ্লব" এবং "শেষ অভিসার" কবিতা দুটিতে এই রুদ্রাণী-রূপেরই প্রকাশ। "বিপ্লব" রচনার তারিখ ২১ জানুয়ারি ১৯৪০, আর "শেষ অভিসার" লেখা হয় ২৩ এপ্রিল ১৯৪০। তখন পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের তাণ্ডব চলছে। "বিপ্লব"র অন্তিম যুগ্মকে কবি বলছেন :

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথ গগনে—

হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্থলিত কঙ্কে।

এই কবিতাব একটি সংক্ষিপ্ত পূর্বপাঠ পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে। তার নাম "নির্দয়া"।^{১৫} দুটি রচনার মধ্যে ব্যবধান এক সপ্তাহের। এই "নির্দয়া" "নর্তিনী"ই যে একদিন কবির রহঃসখী ছিলেন সে কথা কবিতায় অস্পষ্ট নেই। কবি বলছেন :

মাঝে মাঝে কটুস্বাদ দুখে

তীব্র বস দিতে ঢালি বজ্রনীর অনিদ্ৰ কৌতুকে

যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।

প্রেমেবি সে দানখানি, সে যেন কেতকী

বক্তবেথা একে গায়ে

রক্তশ্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।

আজ তব নিঃশব্দ নীরস হান্তবাণ

আমার ব্যথার কেন্দ্র কবিছে সন্ধান।

বিগত দিনের এই "রহঃসখী", আজকের এই "নির্দয়া" "নর্তিনী"ই যে কবির অন্তর্ধামী জীবনদেবতা তাব একটি অত্রান্ত সাক্ষ্য পাওয়া যাবে উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে "অন্তর্ধামী"র অন্তিম শব্দকাস্তের তুলনায়। সেখানে কবি বলেছিলেন :

এবারের মতো পুঁবিয়া পবাণ

তীব্র বেদনা করিয়াছি পান,

সে-সুবা তরল অগ্নিসমান

তুমি ঢালিতেছ বুঝি।

আবার এমনি বেদনার মাঝে

তোমাবে ফিবিব খুঁজি।

দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের বিশ্বজোড়া বেদনার মাঝেই কবি জীবন-গোধূলিতে আবার খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনদেবতাকেই।

"শেষ অভিসার" কবিতার মধ্যেও মসীপুঞ্জ মেঘপূর্ণ ঈশানকোণের দুর্বোণের ভূমিকায় তাঁরই আবির্ভাব। "শেষ অভিসারে"র সঙ্গে "শেষ বেলা" [বচনা ১১ জাহ্নবাবি ১৯৪০], "শেষ দৃষ্টি" [১২ জাহ্নবাবি ১৯৪০], এবং "শেষ কথা" [৪ এপ্রিল ১৯৪০]—এই তিনটি কবিতাও স্মরণীয়। এই কবিতাত্রয় সংকলিত হয়েছে 'নবজাতক' গ্রন্থে। কিন্তু এগুলির স্রবের মিল 'সানাই'য়েব সঙ্গেই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে "শেষ বেলা", "শেষ দৃষ্টি", "শেষ কথা", "শেষ অভিসার"—চাটকি কবিতায়ই "শেষ"র স্রব বেজে উঠেছে। কবিজীবনের এই শেষের কথাটি কী, তার নিঃশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে এই কবিতাচতুষ্টয়ে। "শেষ বেলায়" কবি বলছেন :

জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে

বাহিরে প্রকাশ তাঁর নহে।

অন্তরবিধাতার সৃষ্টিনিদেশে

যে অতীত পরিচিত সে নূতন বেশে।

সাজবদলের কাজে ভিতরে লুকালো—
বাহিরে নিবিদ দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো।

* * *

যত বেড়ে ওঠে রাতি
সত্য যা সেদিনের উজ্জল হয় তার ভাতি।
এই কথা ধ্রুব জেনে, নিভুতে লুকায়ে
সাঝা জীবনের ঋণ একে একে দিতেছি চুকায়ে।

“শেষ দৃষ্টি”তে কবি বলছেন :

একদা জীবনে সুখের শিহর
নিখিল কবেছে প্রিয়।
মরণপরশে আজি কুণ্ঠিত
অস্তরালে সে অবগুণ্ঠিত,
অদেখা আলোকে তাকে দেখা যায়
কী অনির্বচনীয়।

যা গিয়েছে তার অধরা রূপের
অলখ পবশখানি
যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর,
দিক্‌সীমানার পাবেব স্বদূর
কালের অতীত ভাষার অতীত
শুনায় দৈববাণী।

“শেষ কথা” কবিতায় পাই :

বিলম্ববিলীন দিনশেষে
ফিরিয়া দাঁড়াও এসে
যে ছিলে গোপনচর
জীবনের অন্তরতর।

* * *

জানি না বুঝিব কিনা প্রলয়েব সীমায় সীমায়
শুলে আর কালিমায
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হাবাবার লাগি এতখানি পাওয়া।

“শেষ অভিসারে” “গোপনচর জীবনেব অন্তরতর”কেই
সম্বোধন করে কবি বলছেন :

দুর্ধোগের ভূমিকায তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতেব বনগন্ধ মেলে।
জন্মেব আবস্তপ্রান্তে আর-একদিন
এসেছিলে অগ্নান নবীন

বসন্তের প্রথম দৃতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়েব প্রথম যুথিকা

অনির্বচনীয় তুমি।

মর্মতলে উঠিলে কুহুমি

অসীম-বিস্ময়-মারো, নাহি জানি এলে কোথা হতে

অদৃশ্য আলোক হতে দৃষ্টির আলোতে।

কবি বলছেন, “বসন্তেব প্রথম দৃতিকা” সেই তুমিই তেমনি
বহুপথে আজ এসেছ শেষ অভিসারে। যে পথ বেয়ে
তুমি আসছ সেদিনেব সেই চেনা পথেব রেখা আজ
কোথাও বা ক্ষীণ, “কোথাও চিহ্নের সূত্র লেশমাত্র নাহি
যায় দেখা।” ভালিতে যে স্বভ-বিস্মৃত ফুল এনেছ তার
কিছু পবিচিত, কিছু-বা অপবিচিত।

জীবনেব এই শেষ অভিসাবে লীলাসঙ্গিনীর কাছে
কবির কী প্রার্থনা? তিনি বলছেন :

হে দূতী, এনেছ আজ গন্ধে তব যে ঋতুর বাণী
নাম তাব নাহি জানি।

মৃত্যু-অঙ্ককারময়

পবিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।

তারি বরমান্যখানি পরাইয়া দাও মোর গলে

স্তিমিত নুক্ষত্র এই নীরবের সভান্নতলে,

এই তব শেষ অভিসারে

ধবণীর পারে

মিলন ঘটায়ে যাও অজ্ঞানার সাথে

অন্তহীন রাতে।

৬

“শেষ অভিসাবে”ব এই উপসংহারের বাসনার সঙ্গে
মিলিয়ে দেখলেই “কর্ণধার” কবিতার পূর্ণ তাৎপর্য পরিস্ফুট
হবে। ‘মানাই’য়েব এই কবিতাটির সৃষ্টিরহস্য বিশ্লেষণ
কবলে রবীন্দ্র-মানসেব এক অপূর্ব রহস্য-নিকেতনের দ্বার
উন্মোচিত হবে। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯৪০
সনেব জাছুয়াবি মাসে কবি যে কবিতাগুলো রচনা
কবেছিলেন তার আদিত্তে রয়েছে চোঠো জাছুয়াবি লেখা
“মানাই”, আর অন্তিমে আছে ২৮ জাছুয়াবি লেখা
“কর্ণধার”। অর্থাৎ এই কবিতাগুলো প্রকাশিত প্রেম-
চেতনার শেষ ও পূর্ণ পরিণতি কর্ণধারে। কবিতাটির

আদিক্রম কিস্তি সৃষ্ট হয়েছে মাস চারেক পূর্বে ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে। কবি তখন ছিলেন মংপুতে। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর ‘মংপুতে ববীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে এই কবিতার আদিসৃষ্টি থেকে আরম্ভ কবে ‘সানাই’য়ে প্রকাশিত শেষসৃষ্টি পর্যন্ত পাঁচটি নব নব রূপের কথা বলেছেন। [দ্রষ্টব্য, মংপুতে ববীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৭৭-১৭৯]। আসলে কিস্তি পাঁচটি নয়, সবশুদ্ধ সাতটি রূপ আছে কবিতাটির। প্রথম, “হে তরুণী তুমিই আমার ছুটিব কর্ণধার।” দ্বিতীয়, “কে অদৃশ্য ছুটিব কর্ণধার।” তৃতীয়, “কে অসীমের লীলার কর্ণধার।” চতুর্থ, “ছুটির কর্ণধার।” পঞ্চম, “ওগো কর্ণধার।” ষষ্ঠ, “সমুখে শান্তি-পাবাবার, ভাসাও তরুণী হে কর্ণধার।” এবং সপ্তম, “ওগো আমার প্রাণেব কর্ণধার।”

এই রূপসমূহের মধ্যে পঞ্চমটি ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ‘লীলা’ নামে প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ রূপটি কবিতা নয়, সর্বজনপরিচিত বিখ্যাত গান। এবং সপ্তম রূপটিই ‘সানাই’য়ের “কর্ণধার” কবিতা। প্রথম রূপটিব আলম্বন মৈত্রেয়ী দেবী। তাঁকে সম্বোধন করেই কবি লিখেছেন :

হে তরুণী তুমিই আমার ছুটিব কর্ণধার

অলস হাওয়ায় বাইছ স্বপনতরী

নিষে যাবে কর্মনদীর-পার।

মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন, “বিকেল বেলা যখন ফিরে এলুম, দেখি লেখাটা প্রায় সবই বদল হয়ে গেছে, এবং বিচিত্রিত-ভাবে আগেকাব লেখাটিকে কালিব আচ্ছাদনে মণ্ডিত করে আঁকা হয়েছে সুন্দর একটি ছবি, তার ফাঁকে ফাঁকে নূতন যে লেখাটা পড়া যাচ্ছে—

কে অদৃশ্য ছুটিব কর্ণধার

অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি

কর্মনদীর পার।

দিগন্তের কুঞ্জবনে

অশ্রুত কোন্ গুঞ্জরণে

বাতাসেতে জাল বুনে দেয়

মদিব তন্ত্রার।

নীল নয়নের মৌনখানি

সেই-সে-দূরেব আঁকাশবাণী

দিনগুলি মোর ওরই তাকে

ষায় ভেসে যায় বঁকে বঁকে

উদ্দেশ্যহীন অকর্মণ্যতাব।”

বলাই বাহুল্য, এখানে কর্ণধাররূপে কবিমানসীরই আবির্ভাব ঘটেছে। এই দুই রূপে সীমাব কোটিতেই কবিচেতনা বিলসিত। কিন্তু তৃতীয় রূপাংশে কবিচেতনা উন্নীত হয়েছে অসীমেব কোটিতে। তাই কর্ণধার হলেন “অসীমের লীলার কর্ণধার।” তৃতীয় থেকে সপ্তম পর্যায় কবিমানসীর জীবনদেবতা-রূপটিবই অভিব্যক্তি পরিলক্ষণীয়। “কর্ণধারে”ব ভাববিশ্লেষণ সহজসাধ্য হবে এর কাব্যরূপ থেকে নয়, গীতিরূপ থেকে। গানটি লেখা হয় শান্তিনিকেতনে ১৯৩৯-এব তেমনরা ডিসেম্বর। নিঃশেষ বিশ্লেষণের জন্য গানটি এখানে সমগ্ররূপে উদ্ধারযোগ্য :

সমুখে শান্তিপারাবাব,

ভাসাও তরুণী হে কর্ণধার।

তুমি হবে চিরসাথি,

লও লও হে জোড় পাতি,

অসীমেব পথে জলিবে

জ্যোতি প্রবতারকাব।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমাব দয়া

হবে চিবপাথেষ চিবযাত্রার।

হয় যেন মর্ত্যেব বন্ধন ক্ষয়,

বিবটি বিশ্ব বাহু মেলি লয়,

পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়

মহা-অজ্ঞানার।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য—কে এই কর্ণধার? এই প্রশ্নে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসবে একটি বহুপ্রচলিত গানের সুর—
“হবি, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পাব কর আমারে।”
কিন্তু বাঙালীর চেতনার অন্তঃপুর্বে অল্পবিষ্ট এই গানের কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। কেন না ববীন্দ্র-চেতনায় কর্ণধার বাববার যে রূপ নিষে আবির্ভূত হয়েছে তাব পরিচয় স্বতন্ত্র। ‘সোনার তরী’-‘চিত্রা’র যুগে কবির জীবনদেবতাই তাঁব কর্ণধার। ‘সোনার তরী’র “নিরুদ্দেশ যাত্রা”য় সুন্দরী “বিদেশিনী”ই তাঁব সোনার তরীর কর্ণধার। ১৩১১ সালে ‘জীবনদেবতা’-চেতনার

বিশ্লেষণ করে কবি বলেছিলেন, “যে আবির্ভাব অতীতেব মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালেব উপবে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীব নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবন-দেবতার কথা বলিলাম।”^১ এই বিশ্লেষণেও জীবনদেবতাই কবিজীবনের কর্ণধার।

স্বভাবতই এরাব জিজ্ঞাস্তা—কে এই জীবনদেবতা? যে প্রচলিত অর্থে আমরা ‘দেবতা’ কথাটি ব্যবহার করি সে অর্থে কিন্তু জীবনদেবতা দেবতা নন। জীবন এবং দেবতা এই দুটি উপাদান দিয়ে গড়া হলেও আসলে ওটি একটি যোগরূঢ় শব্দ। রবীন্দ্র-কাব্যলোকে বিশেষ অর্থেই কথাটি প্রযুক্ত। “অন্তর্ধামী” কবিতা থেকে একটি অংশ উদ্ধার করলেই আপাততঃ আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। অন্তর্ধামী জীবন-দেবতাকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন :

মোর প্রেমে দিয়ে তোমার বাগিনী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর স্বপ্ন।

হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ

তব রহস্যপুর?

জ্বলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবাব পূজা কোন্ দেবতার
রহস্যঘেবা অসীম আধার

মহা-মন্দিরতলে?

নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহিসমান

নাড়িতে নাড়িতে জ্বলে।

এই অংশের বিশেষভাবে “জ্বলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার করিবাব পূজা কোন্ দেবতার”—এই চরণ-যুগলের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা যাক। কবি এখানে তাঁর জীবনদেবতাকে জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কোন্ দেবতার পূজায় আমাকে প্রদীপরূপে জালিয়েছ? স্পষ্টই বুঝতে পাওয়া যাচ্ছে, জীবনদেবতাও এখানে স্বয়ং দেবতা নন, দেবতার পূজারিণী।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণীয় যে, কবি তরুণ বয়সে দাস্তের জীবনে বেয়াত্রিচের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন “বিয়াত্রীচেই তাঁহার [দাস্তের] সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রীচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রীচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবন-কাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রীচের স্তোত্র।”^২

“তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে”—এই বাক্যটিতে আছে দৈবে-পাওয়া একটি দিব্য সংকেত। “জীবনের দেবতা” কথা দুটি সমাসবদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হলেই হয় “জীবন-দেবতা”। কিন্তু বেয়াত্রীচে ঐষ্টভক্ত দাস্তের দেবতা ছিলেন না। তবু ত্রিভুবন পবিত্রমায় তিনিই ছিলেন দাস্তের কর্ণধার। রবীন্দ্র-জীবনের বেয়াত্রীচেও এই অর্থেই তাঁর জীবনদেবতা, এই অর্থেই তাঁর কর্ণধার।

এইবার গানটির বাচ্যার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। কবি তাঁর কর্ণধারকে বলছেন, শান্তি-পারাবারে তরঙ্গী ভাসাতে। আসলে গানটির মূলে রয়েছে একটি চিবস্তন যাত্রার পবিত্রত্ব। কবি “চিরযাত্রা” কথাটিই ব্যবহার করেছেন। সেই চিরযাত্রার পথ অসীম। কবির প্রার্থনা তাঁর কর্ণধার হবেন সেই অসীমের-পথে তাঁর “চিরসাথি”। সেই অসীমের পথ উজ্জ্বল হবে ধ্রুবতারকার জ্যোতিতে। স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে কবির সারাজীবনের ধ্রুবতারার ভাবানুসঙ্গ ভেসে আসবে। [তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারার, এ সমুদ্রে আর কভু হব না কো পথহার।] গানের দ্বিতীয় কলিতে কর্ণধার হয়েছেন “মুক্তিদাতা”। মুক্তিদাতার “ক্ষমা ও দয়া” হবে কবির চিরযাত্রার “চিরপাথের”। কোন্ মুক্তির কথা এখানে কবি বলেছেন? তৃতীয় কলিতে আছে তার উত্তর। “হয় যেন মর্ত্যেব বন্ধন ক্ষয়, বিরটি বিশ্ব বাহু মেলি লয়া।” অর্থাৎ, মুক্তির অর্থ মর্ত্যবন্ধন ক্ষয় হওয়া এবং বিবাট বিশ্বের বাহুতে বিলীন হওয়া। কর্ণধারের কাছে কবির শেষ প্রার্থনা হচ্ছে তিনি [কবি] যেন অন্তবে “মহা-অজানা”র নির্ভয় পরিচয় লাভ করেন। এই “মহা-অজানা”র মধ্যে কি কোনো দেবতার কল্পনা আছে? এই প্রসঙ্গে “শেষ অভিসারে”র শেষ বাক্যটি পুনরায় স্মরণীয় :

এই তব শেষ অভিসাবে

ধরণীর পারে

মিলন ঘটায় ষাও অজানার সাথে

অন্তহীন রাতে।

দুটি কবিতাকে একসঙ্গে চিন্তা করলে বলতেই হবে যে, “শেষ অভিসারে”র অভিসারিকাই হয়েছেন গানের কর্ণধার। অজানা কিংবা মহা-অজানা মানে মৃত্যুহীন মর্ত্যজীবনোত্তর অজ্ঞেয় মহাজীবন। রবীন্দ্র-কল্পনায় মাছুষ চির-পথিক। আলোচ্য গানটিতেও সেই পথিক-সত্তারই জয়ধ্বনি। ‘চিত্রা’র “সিন্ধুপারে” কবিতায় কবি মৃত্যুর পটভূমিতেই পেয়েছিলেন জীবনদেবতাব সাক্ষাৎ। ‘পূরণী’র “লীলাসঙ্গিনী” কবিতায় কবি বলেছিলেন, “তিমিবে তোমাব পরশলহবী দোলে হে রসতরঙ্গিনী।” আলোচ্য গানে কর্ণধার কবির চিরযাত্রাব চিবসাথি, তাঁর কাছ থেকেই কবি পাবেন সেই অসীম পথের চিরপাথেয়। তাঁরই সাহায্যে নির্ভয় পরিচয় ঘটবে মহা-অজানার সঙ্গে। জীবনদেবতা-চেতনার এখানেই পূর্ণাছতি। জীবনদেবতাই চিরপথিক-কবির চির-যাত্রার কর্ণধার।

৭

কিন্তু কবিমানসীর জীবনদেবতা-মূর্তি নয়, প্রেম-মূর্তিই কবিপ্রেমিকের সর্বশেষ ধ্যানের প্রতিমা। ‘মানাই’-য়ের পরে কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে তিনখানি কাব্য-গ্রন্থ—‘রোগশয্যা’, ‘আরোগ্য’ এবং ‘জন্মদিনে’। কবিতাগুলি ১৯৪০-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪১-এর মার্চের মধ্যে লেখা। ‘জন্মদিনে’ গ্রন্থে তার আগেরও কিছু কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে। আশি বৎসর বয়সে লেখা এই কাব্যত্রয়োতে রবীন্দ্রমানসের এক নূতন পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানে মহাকবির কবিসত্তা আর ঋষিসত্তা এক হয়ে মিলেছে। কবিতাগুলি যেন শাস্ত সমাহিত ঋষির কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্র। কবিব এই শেষ কাব্যত্রয়ী অঙ্গিরস হল শাস্তরস। আচার্য বাগ্‌ভট শাস্ত রসের লক্ষণ নির্ণয়ে বলেছেন, “সম্যগ্জ্ঞানসমুত্থানঃ শাস্তো নিস্পৃহনায়কঃ।” সম্যক্জ্ঞান অর্থাৎ “জগতের মিথ্যাত্বপ্রতীতিবশত পবমান্জ্ঞান” ধার জন্মেছে তিনিই এই শাস্তরসের নায়ক।” এই অর্থে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শাস্তরসের নায়ক নন। আমরা

যাকে বলেছি কবিচেতনায় ‘মর্ত্যেব মধুরতম আসক্তি’ এবং ‘আকাশেব নির্মলতম মুক্তি’—চেতনার এই বিপরীতমুখী প্রবাহ কবিজীবনের অন্তিমলগ্নে হয়েছে নিষ্পন্দ। মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার আগে কবি মর্ত্যজীবনকে চরম মূল্য দিতে কার্পণ্য কবেন নি। বলেছেন, “এ ছালোক মধুময়, মধুময় পৃথিবী বধূলি।” বলেছেন, “সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন।” বলেছেন, “এ জীবনে স্বন্দরের পেয়েছি মধুব আশীর্বাদ, মাছুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি স্বধার আশ্রাদ।” আবার বিবিক্ত চিত্তে মহাযাত্রাব স্বরও সমান তালে বেজে উঠেছে : “অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহাব পবিণাম। আজি এই জন্মদিনে, দূবের পথিক সেই, তাহারি শুনিছ পদক্ষেপ নির্জন সমুদ্র তীবে।” “বাব বাব মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম।” “হে সবিতা, তোমাব কল্যাণতম রূপ করো অপারূত, সেই দিয়া আবির্ভাবে হেবি আমি আপন আত্মারে মৃত্যুব অতীত।”

এই বিবিক্ত শাস্তরসনিষ্কাশিত কবিচিত্তে প্রেমচেতনা কি অপক্লপ রূপ পরিগ্রহ করেছে তা দেখবার কৌতূহল রসিকচিত্তে জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ‘রোগশয্যা’র তিন এবং ‘আরোগ্য’র তেরো-সংখ্যক কবিতা তাঁদের কৌতূহল চবিতার্থ করবে। ‘রোগশয্যা’র কবিতাটিতে কবি বলেছেন, যাত্রায়াতের পথের তীরে তিনি বসে আছেন একা। যারা ‘বিহান বেলায়’ প্রাণের ঘাটে গানের খেয়া বয়ে এনেছিল সাঁঝের বেলায় তারা ধীরে ধীরে যাচ্ছে মিলিয়ে। কবি বলেছেন :

আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে ;
স্বরহারা সব ব্যথা স্বত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীবব জপের মালার ধনি
অন্ধকারের শিবে শিরে।

কবিকণ্ঠের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে তাঁর জীবনেব ছোট বড় সমস্ত অল্পরাগই পবন মূল্য লাভ করল।

‘আরোগ্য’র ১৩-সংখ্যক কবিতাটি অনবত্ত। এর মধ্যে কবি তাঁর তরুণ বয়সের প্রেমের যে স্বপ্ন বিল্লেষণ করেছেন

তা দ্বিতীয়রহিত বলেই তার গুরুত্ব অসাধারণ। ১৯৪১ সনেব ৩০ জানুয়ারি লেখা এই কবিতাটির বিষয়ালম্বন হল কাদম্বরী দেবীর প্রতি তরুণ কবির ভালবাসা। তার স্বরূপ বর্ণনায় সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবিব কণ্ঠ যেমন কুণ্ঠাহীন তেমনি উদাত্ত-গম্ভীর। সমগ্রভাবে উদ্ভাব না করলে এই অনতিশরীচিত কবিতাটির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে না। কবি বলছেন :

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ব্যয়ের-প্রলাপকল্লোলে,
অজানা শিখর হতে
সহসা বিস্ময় বহি আনি
জ্জ্বলিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
লজ্জিয়া উচ্ছল পবিহাসে,
বাতাসেরে করি ধৈর্যহাবা,
পরিচয়ধারা-মাঝে তবঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্তের ভাষা,
চারিদিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত
তারি মধ্যে মুক্ত করি ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্নিধ্যব সুরভাষা
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।

চারিদিকে নিখিলেব বৃহৎ শাস্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,

তপস্বিনী বজ্রনীর তাবাব আলোয় তার আলো,

পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

“ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে।” সেই পবন আবির্ভাবকে একটি মহাকাব্যিক বাক্যে কবি অভিব্যক্ত করেছেন। কবিতার প্রথমার্ধ একটিমাত্র মহাকাব্য। লক্ষ্য কবলেই দেখা যাবে ‘নির্ব্যব’-রূপকল্প কবি এই শেষ-বারের মত ব্যবহার করলেন। ভালোবাসাব সেই আবির্ভাব (১) “নির্ব্যবের প্রলাপকল্লোলে।” প্রলাপ এবং কল্লোল

দুটি শব্দ এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাসবদ্ধ পদটিতে অর্থের নূতন ব্যঞ্জনা এনেছে। নির্ব্যব এসেছে (২) “অজানা শিখর” হতে “সহসা বিস্ময়” বহন করে, আর “জ্জ্বলিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ” “উচ্ছল পরিহাসে” লজ্জন করে। (৩) বাতাসকে সে করেছে ধৈর্যহারা। (৪) সে এসেছে “পরিচয়ধারা-মাঝে তবঙ্গিয়া অপরিচয়ের অভাবিত বহস্তের ভাষা।” (৫) চারিদিকে যা স্থির, যা পরিমিত, যা নিত্য-প্রত্যাশিত তার মধ্যে সে মুক্ত করে দিয়েছে “ধাবমান বিদ্রোহের ধাবা।” তরুণ বয়সেব প্রেমের সেই দুর্জয় নির্ব্যব-প্রবাহেব এর চেয়ে সত্যতব ও বলিষ্ঠতর বিশ্লেষণ কবির লেখনীমুখেও আব কোনদিন শোনা যায় নি। জ্জ্বলিত পাষাণেব নিশ্চল নির্দেশ লজ্জন-করা নির্ব্যবের ধাবমান বিদ্রোহেব ধারা : প্রেমের এই অলংকাবটি নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় অসামান্য।

কবিতার দ্বিতীয়ার্ধে আছে কবিকীবনে সেই প্রেমের সার্থক পবিণতি ও সর্বশেষ পর্যায়ে অসীম ত্রীলোকে তার বিশ্ব-রূপায়ণেব অপরূপ মাধুরীর প্রসাধিত লাভণ্য। কবি বলছেন, জীবনদিনান্তে সেই ভালোবাসা “রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।” “চারিদিকে নিখিলেব বৃহৎ শাস্তিতে মিলেছে সে সহজ মিলনে।” নিখিলের বৃহৎ শাস্তির মধ্যে তার সহজ-মিলনের দুটি রূপকল্প ব্যবহার কবেই কবিকণ্ঠ চিরদিনেব মত নীরব হয়ে গেছে :—

তপস্বিনী রজনীর তারাব আলোয় তার আলো,

পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

রজনী এবং অরণ্যের বিশেষণ দুটিতে এসেছে তপস্বিনীপূত স্তব্রতা ও পবিত্রতার ব্যঞ্জনা। প্রেমের মন্দিরে সাবাজীবন বিচিত্র স্তবের অনিশেষ সংগীত রচনা করে সর্বশেষে এই কবিতায় কবি যেন প্রেমের স্তবমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। মহাকবির ধ্যানসম্মত সেই মন্ত্রে মানসীর যে “প্রেম-মূর্তিখানি” উদ্ভাসিত হল তা চিবস্তন কালের নিত্য-বর্তমানের শাস্তী হ্লাদিনী প্রতিমা ॥

কবিমানসী : প্রথম খণ্ড—জীবনভাষ্য এখানেই সমাপ্ত হল।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ° ২১৭।

২ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ° ১৯২।

৩ তদেব, পৃ° ৪৪৮-৪৪৯।

৪ তদেব, পৃ° ৪৪৬-৪৪৭।

৫ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-২৪, পৃ° ৪৮১।

৬ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ১ম সং, পৃ° ১৭৮।

৭ আত্মপরিচয়, পৃ° ২০।

৮ দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সংকলিত উদ্ধৃতি।

৯ দ্রষ্টব্য, ত্রিশবাক্য শাস্ত্রী বাচস্পতি বিরচিত

‘কবি-রশ্মি’ গ্রন্থ, পৃ° ১২২।

পরিশিষ্ট-১

॥ আনা তরখড় সম্পর্কে নূতন তথ্য ॥

‘কবিমানসী’র পঞ্চম অধ্যায়ে রবীন্দ্র-জীবনে বঙ্গের আনা তরখড় প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এই সম্পর্কে সম্প্রতি নূতন আরও কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই এডিনবরা শহরে আনা তরখড়ের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত “বামাবোধিনী” পত্রিকার ১২৯৮ সালের আখিনে [অক্টোবর ১৮৯১], ৪র্থ কল্প ৫ম ভাগ ৩২১ সংখ্যা, ১৬২-১৬৩ পৃষ্ঠায় বিবরণিত হয়। ১৮৯১ সনের জুলাই মাসে বিজ্ঞানাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ “ভারতের অনেকগুলি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র” পতনের সঙ্গে আনার মৃত্যুর তুলনা করে বলা হয়েছে “আব একটি নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।” আত্মারাম পাণ্ডুরঙের বিদূষী কন্যা সেদিন বাঙালীর চোখে কিভাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে ‘বামাবোধিনী’র এই শোকজ্ঞাপক সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে। নিম্নে রচনাটি উদ্ধৃত হল :

আনা বাই (বিবী লিটেলডেল।)

বড় দুর্বৎসর, কি কক্ষে জুলাই মাস আসিয়াছিল। আমরা এই মাসে ভারতের অনেকগুলি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হারাইলাম। বঙ্কি, দেশহিতৈষী দয়ার সাগর বিজ্ঞানাগর, বৃহৎ অগ্রগণ্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় ও আমাদের বনপ্রস্থান বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়কে আমরা হাবাইয়াছি, বোম্বাইয়ে বঙ্গপ্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক আত্মারাম পাণ্ডুরঙের বিদূষী কন্যা গত ৫ই জুলাই তাবিখে এডিনবরা নগরে মানবলীলা-সংবরণ করেন—আর একটি নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। এই বিজ্ঞানবতী ও সদগুণসম্পন্ন বমণীর জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সুতরাং আমরা সংক্ষেপে ইহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে সকল ভারতমহিলা পাশ্চাত্য শিক্ষায় সর্বপ্রথমে সুশিক্ষিতা হন, আনাবাই তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার পিতা সদালাপী, উন্নতমনা, মার্জিতবুদ্ধি, জ্ঞানী ও পরম ধার্মিক। ইনি বালিকা কন্যাকে অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইহাতে ইনি সমাজের বিরাগভাজন হন। কিন্তু কিছুতেই ভয় পান নাই, জাতিভেদের বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বুদ্ধিমতী আনা অলৌকিকী শক্তির পরিচায়িকা। ষোড়শ বৎসরে তিনি যেরূপ গুণবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ডাক্তার আনন্দীবাই যে অসামান্য

মনস্বিতার পরিচয় দেন জীকবি বঙ্ক-মুখতী কুমারী তরু দত্ত যে কবিত্বের লালিত্যে অখিল সভ্যজগৎকে বিমুগ্ধ করেন; ইহারও সেই শক্তি ছিল, বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ হয় নাই। কলিকা প্রস্ফুটিত না হইতে হইতে কালের কঠিন কবাঘাতে বিদলিত হইল। গীতবাণে তিনি সুনিপুণা ছিলেন। মাতৃভাষা মহারাষ্ট্রীয় ব্যতীত তিনি ইংবাজী, ফরাসী, জর্মণ, ও পতুগীজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সকল ভাষায় কথোপকথন কবিতা পারিতেন। তিনি সংস্কৃতও কিছু কিছু জানিতেন। তাঁহার বীতিনীতি চালচলন এত ভাল ছিল, তিনি একরূপ সদালাপিনী ছিলেন, যে একবার যিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়গ্রাহিতার প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ডবলিন নগরে ববদা কলেজের অধ্যাপক লিটেলডেলের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎই প্রণয়েব মূল। এই প্রণয়ই পরিণামে পরিণয়ে পরিণত হয়। এই বিবাহে ভারতবাসীদিগের ও ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

আনাবাই “নলিনী” স্বাক্ষরিত বিবিধ প্রবন্ধ, ছোট ছোট গল্প ও পঞ্চ দেশীয় ও বিলাতী সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতেন। চিকালগোদা নামক স্থানে মনের মত একটি বাটা নির্মাণ করাইয়া তিনি তাহাতে বাস করিতেন।

ভুবনবিখ্যাত বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বালী হইতে প্রত্যাগমনকালে শকট হইতে পতনে উদরে বেদনা লাগে। এই বেদনাই তাঁহার সাংঘাতিক রোগের মুখ্য কারণ, আনাবাইয়েরও তদ্রূপ। একদা সেকন্দারবাদের একটি শকট দুর্ঘটনা হওয়াতে ইনি বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হন, ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। এই বিষম দুর্ঘটনা দুই বৎসর পূর্বে ঘটে, কিন্তু তদবধি ইহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। গীড়া নিবন্ধন ইনি গত এপ্রিল মাসে ইয়ুরোপ যাত্রা করেন, এবং সেখানেই পঞ্চপ্রাপ্ত হন।

আমরা পূর্বেই আভাস দিয়াছি যে, আনাবাই যে শ্রেণীর মহিলা, স্বর্গীয়া ডাক্তার আনন্দীবাই বা স্বর্গীয়া জীকবি তরুদত্ত সেই শ্রেণীর। ভারতবর্ষে এই সুশিক্ষিত শ্রেণীর অভ্যুদয় এক্ষণে দিন দিন উপলব্ধি হইতেছে। ইহাদিগের জীবন সমগ্র ভারত-মহিলার পক্ষে আদর্শ জীবন না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহাদিগের জীবন সাহাদিগের অমূল্যদ্রব্য, তাঁহারা যে ক্রমে ক্রমে জনসমাজে সম্মানিতা ও উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

দুই মণি

অচ্যুত গোস্বামী

একজন স্বদেশী সৈনিক তৎক্ষণাৎ দুই মণিকে ডেকে

আনতে গেল। কাজটা অবশ্য খুব সহজ ছিল না। সৈনিকটি যা আশঙ্কা কবেছিল দেখল তাই ঠিক। দুই মণি তাব আস্তানায় নেই। কিন্তু দু-চাব জনকে জিজ্ঞেস করতেই দুই মণির খোঁজ পাওয়া গেল। সে কাছাকাছি এক পাতানো মাসিব বাড়ি গিয়ে তাব তিন-চাবটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে দারুণ হট্টগোল বাধিয়ে তুলেছে। মণির জালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ছেলেমেয়েগুলো বেগে যাচ্ছে, বিবস্ত্র হচ্ছে। কিন্তু বেশী বেগে যাওয়ায় যদি কোনটা কেঁদে ফেলছে তবে মণি তাকে কোলে নিয়ে আদর করে চুমু খেয়ে শান্ত কবছে।

ডাকতে এসেছ শুনে দুই মণি তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। ছেলেমেয়েগুলো অবশ্য পিছন থেকে প্রবল চিৎকার করে আপত্তি জানাল; সকলেব ছোটটা তো তাবস্বরে কার্নাই জুড়ে দিল। কিন্তু মণি যে একটু অপেক্ষা কবে ওদের শান্ত কবে রেখে যাবে তার সময় ছিল না। সামরিক আদেশ, দেবি কবার তো উপায় নেই।

যে সময়ের কথা বলছি সেটা বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের সময়। ঘটনাটা ঘটেছে মেদিনীপুরের মুক্ত অঞ্চলে।

নির্দেশ অনুযায়ী মণি অধিনায়কদের মজ্ঞা-ঘরে ঢুকে সামরিক প্রথায শালুট করে দাঁড়াল। ঠিক পুরুষের মত থাকিব হাফপ্যান্ট আর সার্ট পবেছে মেয়েটি। মাথার চুল খুব ভাল ভাবে পাট করে কালো কাপড়ে জড়িয়ে রেখেছে। গায়ে মেদের লেশমাত্রও নেই বলে হঠাৎ একনজর দেখলে ওকে অনায়াসে পুরুষ বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু মুখখানাব দিকে ভাল করে দৃষ্টি দিলে ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। অমন দীঘল চোখ আব ঢলঢলে মুখ, মুখের অমন মস্তণ চামড়া কোন মেয়েব না হয়ে যায় না।

বীরুদা জিজ্ঞেস কবলেন, সতীশের বাড়ি চেন? সদরেই তার বাড়ি।

না চিনলেও চিনে নিতে পারব। যেতে হবে নাকি সতীশদাব কাছে?

হ্যাঁ। তাকে ডেকে আনতে হবে। বলবে এখন তাকে চলে আসতে হবে। যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায়।

আচ্ছা।

যদি সঙ্গে কবে না নিয়ে আসতে পার তা হলে কিন্তু তোমাকে শাস্তি পেতে হবে দুই মণি।

কিন্তু সতীশদা যদি জানতে চান কেন ডেকেছেন?

বলবে তা তুমি জান না। কিন্তু যদি সে আসতে না চায় তবে যে কোন উপায়ে হোক তাকে ভুলিয়ে আনতে হবে। দবকাব হলে মেয়েদেব প্রতি পুরুষদেব যে দুর্বলতা থাকে সেই দুর্বলতাব স্বযোগ নিতে হবে। বুঝেছ?

হ্যাঁ।

তা হলে এখনই বড়না হয়ে যাও।

সামরিক কাযদায় সেলাম জানিয়ে দুই মণি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একখানা সাইকেল যোগাড় কবে নিয়ে সে বৃষ্টি-ভেজা পথে অগ্রসর হল। অবলা বলে আকাশের দেবতা তার প্রতি একটুও মমতা দেখাল না। ববং ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টিব বেগটা আবও একটু ঘেন বাড়ল।

মেয়েটির নাম আসলে মোটেই দুই মণি নয়, শুধু মণি। কিন্তু দুই মণি কথটা যে তাব নামের সঙ্গে এমন কবে জড়িয়ে গিয়েছে তার অবশ্যই কিছু কাবণ আছে। বীরুদার কাছে সামরিক কাযদায় দাঁড়িয়ে সে যখন আদেশ নিচ্ছিল, তখন তাকে খুবই বাধ্য আব অস্বস্তি বলে বোধ হচ্ছিল। কিন্তু সেইটেই তাব সবটুকু পরিচয় নয়।

আড়াইশো পুরুষের মধ্যে সে একমাত্র মেয়ে। কিন্তু সেজন্ত তার এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ বা ভীতিব লক্ষণ নেই। যে কোন লোকের পিছনে যে কোন সময়ে সে লাগতে পারে। তাকে সে বুঝিয়ে ছাড়ে যে সে যেমন-তেমন মণ্ডি নয়—ছুটু মণ্ডি। কিন্তু তার পিছনে কেউ লাগবে এমন সাহস কাবও নেই।

তার যে বয়স এই বয়সে মেয়েদের দেহে মনে যৌবনের জোয়ার নামে। কিন্তু মণ্ডি'ব ছিপছিপে দেহে—যৌবনের স্পর্শ-আজ্ঞা লাগে নি। তেমনি যৌবন তাব মনের দরজার চৌকাঠ এখনও পার হতে পারে নি। দেহে-মনে প্রাণে সে যেন আজও কিশোরী। সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে-পড়া বড় ঢেউ সে নয়। সে যেন মাঝ-নদী'ব ঢেউ শিশু নৌকো'ব গায়ে লেগে ছলাং ছলাং শব্দ সৃষ্টি করে।

তার ছিপছিপে দেহে'ব ক্ষিপ্ৰতা এবং চাঞ্চল্য যেমন অসাধারণ, তেমনি বিচিত্র তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা। কত বকমে যে সে তরুণ সৈন্যদেব নাজেহাল করে ছাড়ে তার হিসাব দেওয়া অসম্ভব। কারও বিছানার তলায় সে হয়তো ইটের টুকরো রেখে দেবে। কাবও পথের উপর কলার খোসা ফেলে বেখে সে হয়তো আত্মন-জানা'ব, আমাকে ধরুন তো? সে হয়তো তাকে ধরবার জন্ত ছোট্টে, কিন্তু তাব হাত তার গায়ে না লেগে মাটিতে আশ্রয় নেয়। সন্ধ্যাবেলা ছুজন সৈনিককে ছায়াঘেরা গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে সে হয়তো পিছন থেকে গাছের উপরে বসে বিকট চিৎকার কবে গাছ কাঁপিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। বেচাবা সৈনিক দুজন হয়তো পিছন ফিবে তাকালে ভুতের মুখোমুখি হতে হবে এই ভয়ে পিছনে না তাকিয়েই ছুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু এতেও যে তাদের বিপদ কেটে যায় তা নয়, পণ্ডিত-ভোজনের সময় মণ্ডি তাদের বীরত্বের কাহিনী সালস্বারে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে।

সকালবেলায় সকলে'ব সঙ্গে মণ্ডিও প্যারেড কবতে যায়। কিন্তু মাঝপথে কখন যে সে পেয়ারাগাছে চড়ে কার গায়ে পেয়ারা ছুঁড়ে মারবে তা কেউ জানে না।

আড়াইশো তরুণ যুবক একা মণ্ডি'ব অত্যাচাবে বিপর্যস্ত। তার ওপর এতগুলো লোকের রাগের সীমা নেই। কিন্তু এমন মেয়ের উপর কি কখনও রাগ করতে পারা যায়।

এখান থেকে বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে মণ্ডিদের বাড়ি দুই ভাষে'ব পরে সে একমাত্র বোন—মা-বাবাব কনিষ্ঠ সন্তান। সকলে'ব ছোট বলে সকলের কাছেই যে তার কিছু আদব পাওনা আছে এটা সে ভালই জানত, এবং তার ষোল-আনা স্বেচ্ছা নিতে সে ছাড়ত না। ভাষে'ব ধুতি চুবি করে নিয়ে সে অনায়াসে তাতে পাড বসিয়ে নিয়ে পবত। ধবা পড়ে গেলে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে বলত, বড় বড় দাদাদেব ছোট বোনকে একখানা ধুতি দিতেও বুক ফেটে যায়। ভাল-মন্দ ারা হলে মা জানতেন তা'ব কিছু অংশ চোরে অবশ্যই চুবি করে নেবে।

মণ্ডি যে শুধু ভাষে'ব ওপবই অত্যাচাব করত তা নয়, পাডাব সমবয়সী ছেলেমেয়ে'বাব তা'ব কাছ থেকে বেছাই পেত না। কিন্তু তা হলে কি হবে, মণ্ডি যেদিন আসত না সেদিন তাদের খেলা'ব বাবাবাব স্ব'ব কেটে যেত, সেদিন জামরুলগুলো বড় পানু'বে বলে মনে হত।

অবশ্য এ কথা ঠিক, এখানে আড়াইশো সৈন্যের মধ্যে মণ্ডিকে শাসন কবাব কেউ নেই। কিন্তু বাড়িতে তা ছিল না। বাড়িতে সকলেই তার অভিভাবক। ছোডদা মাত্র তার চেয়ে দু'বছরের বড়, আব যে কেবল দু'বছরের বড় তাকে কি অনায়াসে দু'বছরের ছোট বলে গণ্য করা যায় না? সেই ছোডদা পর্যন্ত তাকে যখন-তখন কান মলে দিত। মণ্ডি'র তো ধারণা কানমলা খেয়ে খেয়েই তা'ব কানটা অমন লম্বা হয়ে গিয়েছে। আব সে এত চিমটি খেয়েছে যে চিমটির চোটে নাকি তার মাংসপেশীগুলো বাড়তে পারে নি। সেইজন্তই তো তা'ব এত বয়স হওয়াতেও একটুও মোটা হয় নি।

কিন্তু মণ্ডি যাই বলুক, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মণ্ডি'র মুখে'ব দিকে চোখ পড়তেই চিমটি কাটা'ব সময় অভিভাবকদের হাতের আঙুলগুলো শিথিল হয়ে আসত। যে মেয়ে সারা পাডার ঝিমিয়ে-পড়া জীবনে প্রাণ সঞ্চার কবে বেড়িয়েছে তাকে কি ভাল না বেসে পারা যায়।

একবকম পড়াশুনা না করেই মণ্ডি-আই.এ পাস করেছে। তা'বপর জীবনের পরবর্তী অধ্যায় এই স্বদেশী সেনাদেব দলভুক্ত হওয়া।

কেন সে এই বিপদসঙ্কুল সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ কবল? না, কোন স্থায়ী দেশা'ববোধের প্রেরণা নয়। তা'ব মন

এক চিরপ্রবহমান শ্রোতস্বিনী, কোন স্থায়ী আবেগ সেখানে ঠাঁই পায় না। যেমন কবে সে তাব জীবনের সব কাজই হঠাৎ থেখালে কবে, তেমনি এক হঠাৎ থেখালের দুঃসাহসিকতা তাকে এই অভাবিত পথে টেনে এনেছে।

এমন অব্যাহত মেয়েব অন্তবে কোথায় যে নিদারুণ বাধ্যতা লুকিয়ে ছিল তার সন্ধান কেউ জানত না। একমাত্র বীরুদা প্রথম তাব সন্ধান জানতে পেরেছিলেন। সংগ্রাম শুরু হওয়ার একেবারে গোড়ার দিকে বীরুদা মণিদের বাড়িতে একদিন ছিলেন। পূর্বো চব্বিশ ঘণ্টা। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই মণি আড়ে আড়ে লক্ষ্য করেছিল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের টানে দলে দলে ছেলেবা আসছে, সভা করছে, তারপর নির্দেশ পেয়ে মুখে গভীর প্রত্যয়েব হাসি নিয়ে চলে যাচ্ছে। চুষকের টানে লোহার টুকরোগুলো কেমন করে ছুটে যায় তা মণি দেখেছে। কিন্তু একটি ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মানুষ যে এমন করে ছুটে আসতে পারে এবং অনায়াসে বিপদসঙ্কুল কর্তব্যেব শপথ গ্রহণ করতে পারে মণি তা জীবনে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করল। সে অবাক হল, অভিভূত হল। তার নিজের জীবনের ক্ষুদ্রতা আপন ক্ষুদ্রত্বের লজ্জায় অধোবদন হল।

রাত এগারোটার পর বীরুদার ঘর একটু ফাঁকা হল। পা টিপে টিপে মণি ঘবে ঢুকল। বীরুদা চিন্তাবিত মুখে টেবিলের ধারে বসে কাগজের ওপর খসখস করে কী লিখে চলেছেন। বিস্ময়বিত অপলক চোখে মণি সেই লম্বা-চওড়া গৌবর্ণ মানুষটার চিন্তাবিত প্রতিভার উজ্জল মুখখানা দেখতে লাগল।

বীরুদা মুখ তুলে ভাল কবে তাকে দেখতে পেলেন।

কিছু দরকার আছে ?

প্রশ্ন শুনে মণি বিব্রত হয়ে পড়ল। এতক্ষণে তার মনে হল, কখন অল্পমনস্কভাবে সে নিষ্পদ অন্তরাল থেকে ঘবেব মধ্যে চলে এসেছে, আর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বীরুদার চোখের সামনে মেলে ধরেছে।

না। এমনি দেখছি।

বীরুদা হাসলেন : তোমার নাম কি ?

মণি।

কতদূর অবধি পড়েছ ?

আই এ. পাস কবেছি।

তুমি আমাদের স্বদেশী সেনাদলে যোগ দাও না কেন ? প্রস্তাবের আকস্মিকতায় মণি চমকে উঠল। তার মত সাধারণ মেয়েকে এমন অসাধারণ কর্মের আহ্বান যে কেউ জানাতে পারে এ যেন তার কল্পনাবও অতীত।

‘আমি। আমি নিতান্ত সামান্ত মেয়ে।

সামান্ত ছেলেমেয়েবাই তো যোগ দিচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেব ইতিহাসেব সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কেউ তো এর থেকে বাইরে থাকতে পারে না।

আপনি বলছেন যোগ দিতে ?

বলছি বইকি।

বেশ, আমাকে সঙ্গে নিন।

মণি নিজে যেন কথাগুলো বলল না। এক বিরাট ব্যক্তিত্ব জোর করে তাব মনকে চেপে ধবে তাকে দিয়ে যেন কথাগুলো বলিয়ে নিল। সেই বাত্রেই বাড়িতে একখানা চিঠি লিখে রেখে মণি পালিয়ে গিয়েছিল বীরুদার সঙ্গে। সেনাদলেব মধ্যে সে-যত-দুঃখ মিই করুক; যে কোন সামরিক নির্দেশ সে নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন করে।

সাইকেলে চড়ে মণি মাঠেব মধ্যে দিয়ে চলেছে। বৃষ্টিটা একটু জোরে চেপে এল। অগত্যা মণি যেসব চাষী ক্ষেতে চাষ করছিল তাদের কাছ থেকে একটা মাখালি চেয়ে নিল। চাষীদের বিস্মিত দৃষ্টি অল্পসরণ করে মণি একবার নিজের দিকে তাকাল। কিন্তু নিজের সবটুকু দেখতে পেল না। মনে মনে কল্পনা কবল, একটি ভদ্রঘরের শৌখিন মেয়ে থাকির প্যান্ট সার্ট পরে মাথায় মাখালি চাপিয়ে সাইকেল চড়ে যাচ্ছে এ নিশ্চয়ই অপরূপ দৃশ্য।

প্রায় মাইল দুয়েক আঁকাবাঁকা পথে চলে আসার পরে বেললাইন পাওয়া গেল। বিষন্ন পরিত্যক্ত রেললাইন একটা বিশাল সাপেব মত পড়ে আছে নিশ্চল হয়ে। লাইনগুলোতে মরচে ধরে গিয়েছে অব্যবহারে। কী অহঙ্কার ছিল রেলগাড়ির। মানুষ মবে গেলেও নাকি রেলগাড়ি বন্ধ হয় না। আর আজ প্রায় এক মাস ধবে এ লাইনের গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে স্বদেশী সেনাবা। শুধু রেলগাড়িই নয়, মোটরের বাস্তাতেও ব্যারিকেড বসিয়ে তারা মোটরগাড়ির পথ বন্ধ কবে

দিয়েছে। মুক্ত অঞ্চল আজ বহিঃপৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন।

আরও মাইলখানেক পথ অতিক্রম করার পব মন্টি সদবে পৌঁছলো। বেলা তখন আন্দাজ বারোটা হবে। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলা কত অনুমান করা ব উপায় নেই। বাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। বাড়িগুলো অসহায়ভাবে রুষ্টিতে ভিজছে। যেন সমস্ত শহরটা কোন সাংঘাতিক বিপদের আবির্ভাব সম্ভাবনায় ভয়ে বিবর্ণ হয়ে নীববে অপেক্ষা করছে। নির্জন শহরের রাস্তা, অপেক্ষাকৃত ভাল। মন্টি সাইকেলের গতি দ্রুততর করল।

সতীশদার বাবার নামটা জানা ছিল। সেই নাম ধরে পথের লোককে জিজ্ঞেস করে সতীশদার বাড়ি খুঁজে পেতে দেবি হল না তার।

মন্টিকে দেখে সতীশ অবাক হয়ে গেল। বলল, মন্টি! কী ব্যাপার মন্টি?

আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। বীরুদা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এফুনি যেতে হবে।

কেন ডেকে পাঠিয়েছেন?

তা আমি জানি না। হুকুম হয়েছে আপনাকে সঙ্গে কবে নিয়ে যেতে হবে। না নিয়ে যেতে পারলে শাস্তি পেতে হবে।

সতীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

অত কী ভাবছেন সতীশদা? বীরুদার সঙ্গে আপনার কিছু হয়েছে নাকি?

কী আবার হবে? একটু মতান্তর হয়েছে।

তা হলে হয়তো সেটাই মিটিয়ে ফেলার জন্তে বীরুদা ডেকেছেন।

তা অবশ্য হতে পারে।

কী নিয়ে আপনাদের মধ্যে মতান্তর হয়েছে সতীশদা?

একটা রিপোর্ট নিয়ে। কাল বাত্রে একটা বিপোর্ট এসেছিল বীরুদার কাছে। রিপোর্টে কী ছিল তা কেউ জানে না, শুধু আমি কাছে ছিলাম বলে জেনে ফেলেছি।

হঁ। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

আজ সামরিক কমিটির মীটিংয়ে আমি বলেছিলাম রিপোর্টটা আগে আলোচনা করা হোক। বীরুদা রাজী হলেন না।

এই নিয়ে বুঝি মতান্তর? রিপোর্টে কী ছিল?

সে কথা তোমার শুনতে নেই ছুঁ মন্টি।

তৎক্ষণাৎ মন্টিব মুখে অভিমানের ছায়া পড়ল: তা তো ঠিকই। আমি তো একটা সামান্য মেয়ে মাত্র।

সতীশ একটু হাসল: মন্টি, তুমি আমার কাছে সামান্যও নও, ছোটও নও। আমি তোমাকে ভালবাসি।

এ কথা শুনে মন্টি মুখ ঘুবিয়ে বিজ্রপস্ফুটক মুখভঙ্গি করল। তারপর বলল, ওটা আপনার নেহাত মুখের কথা।

মুখের কথা নয় মন্টি, সত্যিকথা। মিলিটারী সিক্রেট না হলে আমি নিশ্চয় বলতাম বিপোর্টে কী ছিল।

চাই না শুনতে। এখন চলুন তো।

সতীশ যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই ঘর থেকে সাইকেলখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওরা পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। একটা বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে একটি বধু তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে। ওদের দেখতে পেয়ে তার চোখ বড় হয়ে গেল, মুখখানা হাঁ হয়ে গেল।

সতীশ বলল, তুমি এসেছ বলেই যাচ্ছি মন্টি। আর কেউ এলে হয়তো যেতাম না। মনটা বড় 'কিন্তু কিন্তু' করছে।

কেন?

হয়তো সত্যিই আশঙ্ক্যব কোন কারণ নেই। কিন্তু মনটা তবু যাওয়ার ব্যাপারে সায় দিচ্ছে না।

তবে যাচ্ছেন কেন?

তবু তো এই পথটুকু তোমার সঙ্গে পাশাপাশি যাওয়া-যাবে। সেইটুকুই লাভ।

মন্টি আবার পাশের দিকে মুখ ফিবিয়ে ভেঙচি কাটল।

সতীশ আবার বলল, তুমি বোধ হয় জান না মন্টি আমি সেনাদল ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছেন।—মন্টির চোখে মুখে বিস্ময়।

হ্যাঁ। আর হয়তো কোনদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা নাও হতে পারে। সেইজন্তই কালকের রিপোর্টটা তোমাকে আমার শোনানো দরকার।

নাই বা বললেন। মিলিটারি সিক্রেট।

হোক মিলিটারি সিক্রেট। আমি বিশ্বাস করি এ কথা তুমি কাউকে বলবে না। কিন্তু তোমাকে যদি

সবটা না বলি তা হলে হয়তো সারাজীবন তুমি আমার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা পোষণ করবে। তা আমার সহ্য হবে না।

তা হলে বলুন সতীশদা।

অনেক দূবে একটা গাছের ডালে দুটো পাখী ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পরমানন্দে বৃষ্টিতে ভিজছে। মণির চোখ সেইদিকে।

সতীশ বলে চলল, বিপোর্টটাতে খুব খাবাপ খবর ছিল। আমাদের ধারণা যে ভাবতেব অনেকটা জায়গাই বুঝি আমাদের অঞ্চলটার মত মুক্তি অর্জন করেছে। সে কথা সত্যি নয়। বিপোর্টে জানিয়েছে, সর্বত্রই হাঙ্গামা হয়েছে, কিন্তু আর কোথাও ব্রিটিশ শাসনের বজুতে ফাটল ধরে নি। আবও জানিয়েছে আমাদের মেদিনীপুবে নাকি বিরাট এক সৈন্যবাহিনী ট্যাক্স সাজোয়াগাড়ি প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যেই তারা সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়বে।

রিপোর্ট শুনে মণির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল : বলছেন কি সতীশদা।

হব্ব হা হা রিপোর্টে ছিল তাই বলছি। সেইজন্মই আমি বীরুদাকে কাল বাত্রেই বলেছিলাম, এই অবস্থায় আর আমাদের সদর আক্রমণ করা ঠিক হবে না। সৈন্যদের উপস্থিতিতে যদি আক্রমণ হয় তা হলে তাদের সমস্ত আক্রোশটা পড়বে এই এলাকার ওপর। নিরীহ জনতাকে এমন কবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া কি সঙ্গত হবে?

বীরুদা কী বললেন?

আজ সকালে তিনি অবিলম্বে সদর আক্রমণের কথা বললেন। আমি রিপোর্টের কথা তুলতে চাইলাম। তিনি তুলতে দিলেন না। বাধ্য হয়ে আমাকে সেনাদল ছেড়ে চলে আসতে হল। যেখানে আমি নিশ্চিত জানছি সদর আক্রমণ করার অর্থ জনতাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া, সেখানে আমি কী কবে তাতে সাহায্য দিই?

মণি নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগল।

আচ্ছা মণি, নিজের বিবেকেব বিরুদ্ধে যাই নি বলে আমার কি অপরাধ হয়েছে? .

মণি ধীরে ধীরে বলল, জানি না। আমরা সৈনিক—বীরুদা যা বলেন, নায়করা যা বলেন, আমাদের কাজ

নিবিচাবে তাই পালন করা। তবে বলা তো যায় না, বীরুদা হয়তো তাঁর মত পরিবর্তন কবেছেন ইতিমধ্যে।

সৈন্যদের আস্তানার কাছাকাছি এসে সতীশ হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। অগত্যা মণিও নামল।

কী হল সতীশদা?

যদি আব কখনও তোমার সঙ্গে দেখা না হয় মণি। তাই আমার একটু স্পর্শ তোমাকে দিবে বাখি। হয়তো সেটুকু তোমার চিবদিন মনে থাকবে।—বলে মণিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তার ওষ্ঠেব ওপব একটি উষ্ণ স্পর্শ এঁকে দিল সতীশ।

মণি ভালমাস্থ্যের মত নোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল কী কবা যায়। আসবাব সময় বীরুদা যে কথাটা বলে দিয়েছিলেন তা তো অবহেলা কবা যায় না। মণি আড়ালে ক্রমাল দিবে ঠোঁটটা মুছে ফেলল।

ওযাব-কমিটির মন্ত্রণা-ঘরে প্রবেশ করার পথেই দুজন সঙ্গীনধারী বক্ষী সতীশের সঙ্গ নিল। পিছনে পিছনে মণিও ঘরে ঢুকে একপ্রাস্তে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। কমিটির সভ্যদের চোখমুখের দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল ব্যাপাবটা মোটেই সাধারণ নয়। আশ্চর্য, সতীশদাকে ডেকে আনার মধ্যে যে এতখানি জটিলতা আছে তা তো একমুহূর্তের জগত অহুমান করতে পারে নি সে।

বীরুদা বললেন, সতীশ, আমরা তোমাকে একটা শেষ স্ত্রযোগ দিচ্ছি। তুমি ইচ্ছে কবলে আমাদের দলের সঙ্গে থাকতে পার এবং কালকেব আক্রমণে যোগ দিতে পাব।

বীরুদার কণ্ঠস্বব যেন বজ্রগর্ভ মেঘগর্জন। সারা ঘর ঝন্ঝন্ করে উঠল সেই কণ্ঠস্ববে, স্বর মিলিয়ে যাওয়াব পরও যেন তাব রেশ ঘরের বাতাসে আনাগোনা কবতে লাগল।

উত্তব দিতে গিয়ে সতীশদার গলা কেঁপে গেল। ভয়ে নয়—উত্তেজনায। সতীশদা বলল, তা হয় না বীরুদা, আমি পরিকার বুঝতে পাবছি কালকেব আক্রমণের অর্থ হাজার হাজার দেশবাসীকে ব্রিটিশবাহিনীর নিষ্ঠুর উল্লাসের মুখে ঠেলে দেওয়া। আমি তা পারব না। কালকের ওই



‘এমন ছেলেকে
সামলাতে হলে...’

‘এমন ছেলেকে সামলাতে হলে আপনার কাজেব আব অন্ত নেই । বিশেষ কবে ছেলেমেয়েদের যদি ফিটফাট বাগতে চান, তা’হলে কাপড কাচাটাতো লেগেই আছে ।’
‘সানলাইটে কাচি, তাই বন্ধে ! শুধু পেকে উঠছি সানলাইটেব দেদার ফেনার কাচাটা খুবই সহজ বলে । কেবল এমন খাঁটি সাবানেই এত ভাল কাপড কাচা যায় আব তাও কোন কষ্ট না কবে ।’

৫৪ নং ফ্র্যাট, ভগতসিং মার্কেট, নয়া দিল্লী-১
শ্রীমতী গুয়াদওয়ানি রলেন,
‘কাপড কাচায় সানলাইটেব মতো এত ভাল সাবান আর হয় না ।’

সানলাইট

কাপড় জামার সঠিক যত্ন নেয় !

S. 31-X52 BG



হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

রিপোর্টের পবেও যদি আপনি আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তা হলে তা করুন। আমাদের এম মধ্যে টানবেন না।

ভাল করে ভেবে কথা বল। আমাদের কথা না শুনলে কিন্তু তুমি বিপদে পড়বে। আবাব জিজ্ঞেস করছি, এই কি তোমার শেষ কথা?

বীরুদা, নিজের বিপদের কথা ভেবে আমি নিজের বিবেককে বিক্রি করতে পারি না। এই আমার শেষ কথা।

বীরুদার সঙ্গে কমিটির অন্ত্যান্ত সভ্যদের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হল।

বেশ, তা হলে আমাদের এই কমিটি এখন সামরিক আদালতে রূপান্তরিত হল। আমবা তোমার বিচার করব।

সতীশদার কণ্ঠস্বরে বিজ্ঞপ্তি বালসিয়ে উঠল : 'বিচার নয়, বিচারের প্রহসন।' আমবা বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগটা কি জানতে পাবি?

আমবা তোমাকে বুটশেব'গুপ্ত দালাল বলে অভিযুক্ত করছি।

তাই নাকি! প্রমাণ পেয়েছেন কিছু?

অনেক। অনেক প্রমাণ পেয়েছি।

তু-একটা জানতে পারি কি? অন্ততঃ একটা?

তোমার ব্যবহারই যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা তোমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছি—এ কথাও বলতে পাবি। বেইমান, থানায় খবর দেবার জন্তে তুই কি ছলনা করে এখান থেকে পালিয়ে যাস নি?

কে—কে দেখেছে আমাকে পালিয়ে যেতে?

সাক্ষীর দরকাব নেই, আমরা জানি। কি বলছ গো তোমরা, আমরা জানি না?

সভাবা সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বি তুলে বলল, জানি, জানি।

সতীশ তেমনই বিজ্ঞপ্তি স্বরে বলল, খুব নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বটে।

বীরুদা গর্জন করে উঠলেন, চোপবাও বেয়াদব। গুপ্ত দালালের যে চবম দণ্ড হওয়া উচিত সেই দণ্ড আমি তোমাকে দিলাম। নিষে যাও সতীশকে।

বীরুদা সকলের মুখে দিকে আর একবার তাকালেন। বলা বাহুল্য, সকলের দৃষ্টিতেই পূর্ণ সমর্থন ছিল।

ছজন রক্ষী সতীশের দু হাত ধরে তাকে বাইবে টেনে নিয়ে গেল।

মণি যেন গাছ হয়ে গিয়েছে। তার পাখের তলা থেকে শিকড় বেবিষে মাটির গভীরে চলে গিয়েছে। এইজন্তেই তাকে পাঠানো হয়েছিল সতীশদাকে ডাকতে। একটি সাজানো পূর্বপরিকল্পিত অভিনয়ের জন্তে। সতীশদা ছিলেন এই সেনাদলের অন্ততম স্তম্ভ। তাঁর সততা আন্তরিকতা ও কর্মক্ষমতা সমস্ত সন্দেহের অতীত। কেন—কেন তাঁর অকলঙ্ক মুখের ওপর এমন করে রাশি-রাশি কালি ঢেলে দেওয়া হল!

নিজেকে ভুলে গিয়ে মণি চোঁচিয়ে বলে উঠল, বীরুদা, সতীশদাকে প্রাণে না মারলে কি চলত না? সতীশদা তো আর সত্যিই দালাল নন।

বীরুদার হিংস্র চোখ মণির উপর পড়ল : মণি, তুমি কেন এখানে? গোপন কোর্টমার্শালের মধ্যে?

আমাকে তো কেউ ঢুকতে নিষেধ করে নি।

বীরুদা দাঁত কড়মড় করে বললেন, যত অপদার্থের দল।

তাবপর অপেক্ষাকৃত কোমল গলায় আবাব বললেন, পাগলী মেয়ে! আমরা বিপ্লবী না? বিপ্লবের মধ্যে কোমলতার স্থান কোথায়?

কিন্তু সতীশদা তো সত্যি দালাল নন।

হয়তো নয়। কিন্তু হতে কতক্ষণ! সে যে এখান থেকে ফিরে গিয়ে থানায় থবব দিত না তার কি নিশ্চয়তা আছে? একটা লোকেব জন্তে আমাদের কালকের অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে, এতবড় বুঁকি কি আমরা নিতে পারি?

প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধ শক্তি থাকে মণির সারা দেহে হঠাৎ যেন সেই অন্ধ অবিবেচক শক্তি আত্ম-প্রকাশ করল। সে চিৎকার করে বলে উঠল, এ হতে পাবে না। এতবড় অন্ত্রায় আমি হতে দেব না। নিছক সন্দেহের বশে একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করা হবে। ওঃ, এ যে সাংঘাতিক অমানুষিক ঘটনা।

ক্ষিপ্তেব মত সাময়িক শৃঙ্খলাব নিয়ম ভুলে গিয়ে মণি দরজার দিকে ছুটে গেল। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষিপ্ত বীরুদা। মণি উদ্বেগে বুঝতে পেরে বিদ্রোহেগে তিনি গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়ালেন এবং মণির দু হাত

চেপে ধরলেন। সেই বজ্রমুষ্টিকে ছাড়িয়ে যাবে মষ্টিব সে শক্তি ছিল না। কিন্তু সেই দারুণ ধস্তাধস্তিতে অত বড় জোয়ান মানুষটাও বিপর্যস্ত হয়ে উঠলেন। একসময় টাল সাইলান্তে না পেরে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন মষ্টিকে নিয়ে। তবুও বজ্রমুষ্টিকে শিথিল হতে দিলেন না।

মষ্টির মুখে শুধু এক কথা : ছেড়ে দিন আমাকে বীরুদা। ছেড়ে দিন বলছি।

তার সারা মুখে যেন আবীরের প্রলেপ। তাব হাতেব নরম মাংসেব মধ্যে বীরুদাব শক্ত ব্যায়ামপুষ্টি হাতের আঙুলগুলো যেন বসে গিয়েছে। রক্তের গতি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাত ফুলে উঠেছে লাল হয়ে। নিঃশ্বাস বইছে জোবে জোরে আব মষ্টির সারা দেহ ফুলে ফুলে উঠছে। প্রতিটি রোমকূপ বেয়ে ঘাম ববছে অজস্র ধাবায়।

কোনক্রমেই না পেরে মষ্টি শেষটায় কামড়ে দিল বীরুদাব হাত। বাস্পরুদ্ধ গলায় বলল, 'আপনি পশু। পশুরও অধম। আপনি এক অমানুষিক অপদেবতা।

বীরুদাবও পরিশ্রম কম হয় নি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেই রক্তাক্ত হাতখানাব দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি এবার ধমক দিলেন দলপতিস্বলভ পরুষকণ্ঠে, মষ্টি, থাম বলছি। অনেক সহ্য কবেছি—আব সহ্য করব না। এটা তোমার বাড়ি নয়। আব বিপ্লবটা ছিঁচকাঁছনের জায়গা নয়।

সেই প্রচণ্ড ধমকে মষ্টি যেন একটু শান্ত হল।

ওরা সতীশকে পুরুষপাবের গাছপালার আড়ালে নিয়ে গিয়ে গুলি কবল। ভাদ্র মাসেব ভিজে বাতাস সেই গম্ভীর হাড়-কাঁপানো শব্দটাকে ছড়িয়ে দিল দূরে দূরান্তরে।

মষ্টিব সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল থবথব করে। ঠিক সেই মুহূর্তে তাব দেহে মনে আত্মায় অবহেলিত বিলম্বিত যৌবনের বান নামল। শবতেব মেঘের মত লঘু চপল বালিকাজীবন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। বিন্মিত হতচকিত মষ্টি অহুভব করল তার এ দেহ যে-কোন একটা দেহ নয়—নারী-দেহ। সে-দেহের কানায় কানায় সে জল-ভারানত উচ্ছল যৌবনের বিপুল চাপ অহুভব করল। তার শিরায় শিবায় সে শুনতে পেল উদ্দাম রক্তের প্রবল

দাপাদাপি, তাব অঙ্গে অঙ্গে বসন্তকালের প্রগল্ভ পাগলা বাতাস যেন শিহবণ জাগিয়ে দিয়ে গেল।

মষ্টির সমস্ত শরীর যেন অবসন্ন হয়ে এল উত্তেজনায়। সারা দেহে যেন যৌবন-দেবতাব প্রবল আলিঙ্গনের চাপে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। আর আশ্চর্য, এ কী করেছে সে! তার অবোধ যৌবনের প্রথম পুষ্পার্ধ্যকে সে নিবেদন কবেছে কি সেই মানুষটির পায়ে যার জীবনদীপ এইমাত্র নির্বাপিত হল?

নিজেব চোখের সামনে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল তার নতুন-জাগা যৌবনের ক্ষতবিক্ষত দেহখানা। অসহায় ভাবে পড়ে আছে মাটিতে। ব্যথায় মুক হয়ে গেল মষ্টি। শুধু তাব চোখ ফেটে উষ্ণ অশ্রুধারা নেমে এল।

তব পলকের জন্ম হলেও মষ্টি একবার না ভেবে পারল না যে বীরুদার দিক-থেকে হয়তো তিনি ঠিক কাজই কবেছেন। বিপ্লবী যে, সে হিমালয়ের মতই অটল, আর তেমনি নিষ্ঠুর। তাঁকে বিচার করার কী যোগ্যতা আছে সামান্য মেয়ে মষ্টির!

দুই

এই ঘটনাব পরেব দশ বছরের ইতিহাস ঝটিকা-বিস্কন্ধ। সেই দশ বছরের মধ্যে মষ্টি নিজেব মনের দিকে তাকানোর অবকাশ পায নি। নিজেব ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভাল-মন্দের বিচার কবাব স্বেযোগ পায নি। এক বৃহত্তর শক্তি তাকে নিরস্তব তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে বোবা জানোয়ারের মত।

পববর্তীকালে মনে হয়েছে সেই দশটা বছর যেন স্বপ্নের ঘোবে কেটে গিয়েছে। শুধু এইটুকু মনে আছে কোন এক সকালে একটা থানার উপর ব্যর্থ আক্রমণের পর পুলিশ এবং সৈন্যদলের প্রচণ্ড পালটা অভিযানে তাদের ক্ষুদ্র অশিক্ষিত স্বদেশী সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। প্রাণ দিয়েছিল অনেকে। আর যারা বেঁচেছিল প্রাণ রক্ষার জন্ম তাতেব সে কী ছুটোছুটি! কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। এবেলার আশ্রয়স্থল ছেড়ে দিয়ে ওবেলা অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করা।

পুলিসের চোখ এডানোব জন্ম কত বকম ভাবে চেষ্টা

করেছে মণি। পুরুষের পোশাক ছেড়ে নারীর পোশাক পরতে হয়েছে, কখনও সাদা খানকাপড় পবে বিধবা সেজেছে, কখনও কপালে মোটা সিঁদুরের টিপ পরে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি গায়ে জড়িয়েছে। কিন্তু এত করেও শেষ পর্যন্ত রেহাই পায় নি মণি। পুলিশের বজ্রমুষ্টির কাছে একদিন তাকে ধরা দিতেই হয়েছে।

তারপর জেলখানা। বছরের পর বছর নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধাধরা নিয়মে অপরের নির্দেশ পালন করে তাকে চলতে হয়েছে। ভুলে গিয়েছিল যে মুক্ত আকাশের নীচে যথেষ্ট বিচরণ করাটা মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। বরং মনে হয়েছিল মানুষ স্বাভাবিক নিয়মেই খোঁষাড়ে আবদ্ধ পশুমাত্র।

সেই বন্দী জীবনেরও একদিন অবশান ঘটল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। দেশের স্বাধীনতাব পিছনে তার ষৎসামান্য কিছু অবদান হয়তো ছিল, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখল দেশের কেউ সে কথা মনে করে বসে নেই। তাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্তে জেলখানার গেটে কেউ উপস্থিতও নেই।

দেশে ফিরে এসে দেখল খালি বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন বুঝা বিধবা মা একা। ছেলেবেলায় তার দুই বড় ভাই তাকে দায়িত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্তে অনেক চেষ্টা করেছিল। তারা দুজনই এখন দূর বিদেশে চাকরি করছে, মার দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা কারও মনে নেই। মাসান্তে অবশ্য তারা কিছু টাকা পাঠায়। কিন্তু তাবা একবারও ভাবে না যে সে টাকায় মায়েব পেটের খোরাক হয়তো মিটতে পারে, কিন্তু মনের শূন্যতা পূরণ হয় না।

মাকে সঙ্গে নিয়ে দুই মণি কলকাতার উপকণ্ঠে এক উপনগরীতে আশ্রয় নিল এবং একটা জুনিয়র হাই স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি যোগাড় করল। তার পরের তিন চার বছরের ইতিহাসও আমরা পাশ কাটিয়ে যাই। এই সময়টুকুর মধ্যে তার জীবনে অভাবনীয়, প্রায় কল্পনাতীত পরিবর্তন সাধিত হলেও তার চমকপ্রদ পশ্চাৎ-ইতিহাসটাও না হয় আপাততঃ অঙ্ককারেই ঢাকা থাক।

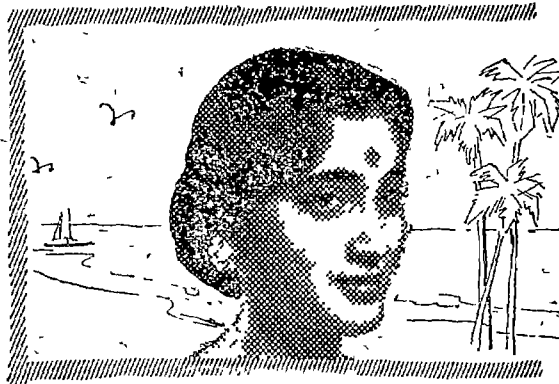
জুনিয়র হাই স্কুলে যখন সে প্রথম যাতায়াত শুরু

করেছিল তখন তার মনে হয়েছিল যে জেলখানাতেও হয়তো বা দুই মণির সামান্য কিছু বেঁচে ছিল, কিন্তু এবার তার বোল-আনা মৃত্যু হল। সে মেয়েটার কথা ভাবতেও এখন অবাক লাগে। থাকী পোশাক পরে সে একদিন সাইকেলের ষ্টিয়াবিং হ্যাণ্ডেল এক হাতে ধবে আর এক হাতে রাইফেল নিয়ে মেদিনীপুরের এবডো-খেবড়ো মেঠো পথ ধরে মাইলের পর মাইল চলে গিয়েছে। সে মেয়ে একদিন শহীদেব মৃত্যুর পর সেই মহৎ মৃত্যুর কাছে ভালবাসা নিবেদন করেছে। আর সেই একই মেয়ে— অস্তুতঃ চেহারা দেখলে যে কোন লোক তাই বলবে আর একদিন নিছক চাট্টি পেটের ভাতের জন্তে পৃথিবীর নিরীহতম পেশার মধ্যে নিজেকে বলিদান দিচ্ছে। এ কি ভাবতে পারা যায়!

কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন রইল না। মণি স্কুলের সেক্রেটারির স্ননজরে পড়ল। তাঁর আত্মকুল্যে সে অনার্স নিয়ে বি. এ পাস করল, বি-টি পাস কবল, এবং শেষে জুনিয়র হাই স্কুলের মধ্যে হাই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়ে বসল। স্বাধীন ভারতের প্রথম ইলেকশনের সময় সে সেক্রেটারির অম্মুরোধে নির্বাচনী প্রচাবে কিছুটা অংশ গ্রহণ করল। যে প্রার্থীর জন্তে সে প্রচাবে নামল তাঁর নাম শুনে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কৈশোরে যাকে সে প্রায় দেবতা বলে মনে করত সেই বীরুদাই নাকি এ অঞ্চলের প্রার্থী। অল্প সময়ের মধ্যে তার এতখানি উন্নতিব পিছনেও নাকি বীরুদাই অদৃশ্য হাত কাজ করেছে। নির্বাচনী প্রচারে সে নতুন উৎসাহ লাভ করল।

নির্বাচনের বিরাট বিজয়ের পর মণির সঙ্গে বীরুদাইর বিষে হয়ে গেল। বিয়ের পর মণি হিসেব করে দেখল তাব আসল ক্ষতি কিছু হয় নি। দুই মণি আজও বেঁচে আছে এবং সে জীবনের পথে ক্রমশঃ আরও এগিয়ে যাবে। এ কথা ঠিক সতীশদাকে একদিন সে ভালবেসেছিল; কিন্তু সেই মৃত ব্যক্তির স্মৃতির মধ্যে তার জীবন্ত মন তো চিরকাল আটকে থাকতে পারে না। তাব বদলে সে এমন একজনকে স্বামী হিসেবে পেয়েছে যে তাকে তার ঈপ্সিত পথে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যোগ্যতম ব্যক্তি।

কৈশোরে দুই মণির মধ্যে এক অন্ধ বেপরোয়া স্বাধীনতাব আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে আকাঙ্ক্ষা নিজের

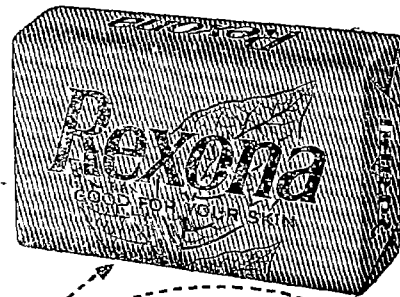


দিনে দিনে
তুকে নবীন লাভণ্য আসে

নতুন রেজোনাৰ পৰশে



যতবাবই মাথুন বেজোনাৰ অৰাক
পৰশ যেন প্ৰতিবাহাই আপনাৰ
তুকে নবীনতা এনে দৈৰ্ঘ্য। ফেনিল
বেজোনাৰ কাডল আছে, বিশেষ
ধৰণেৰ এই সৌন্দৰ্য্য বৰ্দ্ধক তেলটি
তুকেৰ প্ৰতি বন্ধে বন্ধে যায় আৰ
তুকে কোমল ও মসৃণ কৰে
তোলে, চেহাৰাৰ আপনাৰ লাভণ্য
আনে। যিটি গন্ধ ভবা বেজোনা
প্ৰতিদিন স্নানেৰ পক্ষে আদৰ্শ
সাবান। একবাৰ মাথলে আপনি
এৰ গন্ধ অনেকক্ষণ ধৰে পাবেন।



নতুন রেজোনাৰ নতুন মোডক,
নতুন আকাৰ আৰ নবীন সবুজ
বঙ আপনাৰ নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

নতুন রেজোনাৰ

তুকেৰ সেৱা যত্নেৰ সহায়ক

প্রকৃতি সম্পর্কেও নিজে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আজ পবিত্র বয়সের মণি নিজের প্রকৃতিকে চেনে, নিজের লক্ষ্যকে জানে। অল্পকাল পবিত্র পেয়ে আজ সে অনেক—অনেক দূর এগিয়ে যেতে পাবে।

বিয়ের কিছুদিন পরে মণির জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটল।

সেদিন সকালবেলা প্রাতরাশের পব লম্বা সোফাটার উপর বসে বীরুদা মণিকে নিজের বুকেব উষ্ণ সান্নিধ্যের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন, মণি, আমার একটা কাজ করে দেবে?

কী কাজ?

মণি নিখাস একটু জোরে জোরে বইছে, মুখ আরক্ত হয়েছে, পুরুষ-সান্নিধ্যের উত্তেজনা, আব পাছে কেউ ঘরে ঢুকে পড়ে এই ভয়ে।

আমি আমাদের অঞ্চলের আগস্ট-বিপ্লবের একটা ইতিহাস লিখেছি। লিখেছি বলা চলে না, খসড়া কবেছি। কিন্তু আমাব তো দেখছ, একটুও সময় নেই। আমি দেখেছি বাংলাটা তোমার হাতে বেশ ভালই আসে। যদি একটু ভাষা-টাষা দিয়ে লিখে দিতে পাব তা হলে একটা কাজের কাজ হয়। আমাব জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরবের কাহিনীটা লোকে অন্ততঃ জানতে পাবে।

মণির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাছবেষ্টনীর মধ্যেও কোনরকমে মুখখানাকে একটু ঘুরিয়ে-বীরুদার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, লিখেছেন নাকি। সবটা লেখা হয়ে গেছে? কই জানতে পারি নি তো। কবে লিখলেন?

লিখেছেন নয়, লিখেছি। লিখলেন নয়, লিখলে। হ্যাঁ, সবটাই লিখেছি। তোমার বিষয় হওয়াব অনেক আগে।

মণি লজ্জিত হল। কেমন খারাপ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—বীরুদার বদলে বীরু, আপনাব বদলে তুমি কিছুতেই মুখ দিয়ে আসতে চায় না।

এমন জিনিস লেখার ভার আমাকে দেবে? সে তো আমাব পরম সৌভাগ্য।

বীরুদা হাসলেন। ভাবখানা এই যে মণিকে সৌভাগ্যবতী করাই তো তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

খসড়া লেখাটা নিয়ে মণি তখনই পড়তে বসে গেল। পড়াটা খুব সহজ ছিল না। তাড়াতাড়িতে জড়িয়ে জড়িয়ে লেখা। অনেক কাটাকুটি ভিড়। আরো টেনে টেনে এক জায়গার লেখা আর এক জায়গার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভাষাব মধ্যে অজস্র ত্রুটি, জায়গায় জায়গায় কথা পড়ে গিয়েছে—বড় বড় নেতাদের লেখা সাধাবণতঃ যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু পাতার সংখ্যা নেহাত কম নয়।

কিন্তু যে ইতিহাসের সঙ্গে নিজের নাম জড়িত তার আকর্ষণ অনস্বীকার্য। বীরুদা দু-এক জায়গায় দুই মণির নাম উল্লেখও কবেছেন। তা ছাড়া আছে-আবও অনেকের নাম যাবা মণির পরিচিত। এক একটি নামের সঙ্গে মনেব সামনে ভেসে ওঠে এক একটি ছবি। সেই ছবির সঙ্গে জড়ানো রয়েছে কত স্মৃতি। এ-যেন নিজের আত্মাব-পূর্বজন্মের এক বিশ্বস্ত-প্রাণ বিবরণ নতুন করে স্মৃতিব গোচরে নিয়ে আসা।

পড়তে পড়তে মণির সারাদিন চলে গেল। অনেক বাত অবধি মণি পড়ল। পড়া যখন শেষ হল তখন সারা পৃথিবী স্তম্ভিময়। ডবল বেডের বিছানাটার একপাশে বীরুদার বিশাল দেহটা ঘুমে অচেতন। টেবিলের উপর টেবিলল্যাম্পটা এমন ভাবে জ্বলছে যাতে বীরুদাব গায়ে আলো না পড়ে। আলমারিতে অ্যালার্ম ঘড়িটা টিকটিকির মতই টিকটিক করছে—যেন এখনও সে জেগে আছে কোন দুষ্কৃতকারীকে সতর্ক করে দিতে।

মণি জানলার গবদা ধরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সপ্তমীর চাঁদ কখন অস্ত গিয়েছে। ছায়া ছায়া গাছগুলো অন্ধকারের আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কেউ যদি অত্যাচার কবে, কেউ যদি বাত্রির ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তবে গাছেরা তা লক্ষ্য করবে, তাদের নাম মনে কবে বাখবে। দূরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল গম্ভীর ভয়ঙ্কর শব্দে। কোন দুষ্কৃতকারীকে সাবধান করে দিলে হয়তো।

মণি চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ছে। রুদ্ধশ্বর কান্নাব আবেগে তাব চোখমুখ ফুলে উঠেছে।

কিন্তু এইভাবে বাকি রাতটুকু তো দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। আর

কয়েক ঘণ্টা পরে আব একটি সকাল আসবে নতুন দিনের কর্মসূচি সঙ্গে নিয়ে।

পরদিন সকালবেলায় বীরুদা বললেন, তোমাব মুখখানা ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে কেন মষ্টি? অনেক রাত অবধি পড়েছিলে বুঝি?

হ্যাঁ।

শেষ করেছ সবটা?

করেছি।

কেমন লাগল তোমার কাছে?

বেশ ভালই তো লাগল। ঘটনাগুলো তো বেশ বিস্তারিতভাবেই লিখেছি। যদিও জায়গায় জায়গায় একটু অতিবঞ্জন আছে।

একটু অতিবঞ্জন দবকার মষ্টি। ঘটনা যখন ঘটে, তখন ঘটনা নিজেই যথেষ্ট উত্তেজনা। কিন্তু পরে স্মৃতিতে সেই উত্তেজনা জাগিয়ে তুলতে হলে একটু কড়া রঙের প্রলেপ চাই।

কিন্তু—

কিন্তু কি মষ্টি?

বলছিলাম যে সতীশদার ঘটনাটাকে তুমি কেন অমন বিকৃত করে লিখেছ? আমার তো মনে হয় সতীশদার মত সংসাহসী তরুণ আমাদের দলেব মধ্যে আব একটিও ছিল না।

বীরুদা আকুঞ্চিত করলেন : সতীশ কে? ও—সতীশ দুবে? সেই বেনিগেডটার কথা বলছ? কেন, তাব সম্পর্কে তো যা লিখেছি সব ঠিকই লিখেছি।

লিখেছ তিনি যে স্পাই ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর কাছে পুলিশেব লেখা চিঠি এবং পুলিশেব কাছে লেখা রিপোর্ট ছিল। আবও লিখেছ যে তিনি ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পালাতে গিয়ে মারা যান। এ সব কি ঠিক কথা?

মষ্টির কথার ধবন দেখে বীরুদা বুঝলেন সে দারুণ চটেছে। মনে মনে হাসলেন একটু। মষ্টি নিতান্তই একটি মেয়ে—বাস্তববুদ্ধি তার এতটুকু নেই।

হেসেই বললেন, মষ্টি, তোমার দেখছি কিছুই বুদ্ধিগুণি হয় নি। জান না, মহতের মহত্বকে ভাল করে ফুটিয়ে তুলতে হলে পাশাপাশি কিছু বিপরীত চরিত্র দরকার?

মহাভারতের ছুটি চরিত্রগুলো না থাকলে মহাভারত কি কোনদিন লেখা হত, না, তা কেউ কোনদিন পড়ত?

কিন্তু তুমি তো সাহিত্য লিখছ না, ইতিহাস লিখছ।

আসলে ও দুটোই এক জিনিস। সাহিত্যও ইতিহাস, ইতিহাসও সাহিত্য।

তুমি যাই বল, যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার মুখে আমি এমন করে কালি লেপন কবতে পারব না।

বলতে গিয়ে মষ্টির গলাটা একটু কঁপে গেল। বীরুদাব কথার উপরে কথা বলা তার জীবনে এই প্রথম। অপ্রত্যাশিত প্রতিবাদে বীরুদার মুখখানাও আহত বিন্ময়ে হিংস্র হয়ে উঠল।

বললেন, মষ্টি, আমি যা লিখেছি তাকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর কবে লেখাব ভাব তোমাকে দিয়েছি। লেখার ভালমন্দ বিচার করার ভাব তোমাকে দিই নি।

সেইদিন থেকে মষ্টি ভাবতে লাগল। দিন নেই, বাত নেই, তাব অফুবন্ত ভাবনা কিছুতেই শেষ হয় না। রাত্রিবেলা ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে মাথাব মধ্যে দাপাদাপি করে, ঘুম হয় না ভাল। মষ্টির বিনিদ্র আঁখির তলায় পুরু হয়ে কালিমার বেধা পড়ল।

অবশেষে মষ্টি একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল। সে তো শুধু মষ্টি নয়, দুই মষ্টি। জীবনে প্রতি কাজে সে আপন খেয়ালমত চলেছে। কাবও কথা সে শোনে নি। বাবা মা দাদাবা তাকে শাসন কবতে গিয়ে হাব মেনেছেন। চিরকাল সে বেপবোয়া, দুর্দান্ত। মাহুষেব নিয়মে সে চলে না, তার নিয়ম তাব নিজেব মনের হঠাৎ-খুশির নিয়ম।

সতীশদাব ঘটনাটা ঠিক যেমন যেমন ঘটেছিল, অবিকল তাই সে লিখবে। জীবনের যে মহৎ পরিপূর্ণতা মাত্র একবার সে প্রত্যক্ষ কবেছিল সেই দুর্লভের মূল্যকে সে অস্বীকার কবতে পাববে না। মষ্টি জানে, ঘটনাটা অবিকৃতভাবে লিখলে তাতে বীরুদার চরিত্রে একটু দাগ লাগবে। তা লাগুক। অমান জ্যোতিতে সত্য বেঁচে থাকুক মাহুষেব চোখের সামনে।

বীরুদাকে সে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সতীশদা স্বচ্ছ হীবকথও—হ্যাতিময়। বীরুদা আর সতীশদাব মধ্যে কি কোন তুলনা হয়! সমাজেব চোখে বীরুদা তাব স্বামী হতে পারেন, কিন্তু তার অন্তবে সতীশদাই তার স্বামী।

সতীশদাকে যে নারী একদিন ভালবেসেছিল, সে কি আর কখনও অপর কোন পুরুষকে ভালবাসতে পারে!

আপাততঃ সে বীরুদাকে কিছু বলবে না। লেখা শেষ কবে ছাপা হয়ে গেলে, ছাপানো অক্ষবগুলো বীরুদার সামনে সে তুলে ধরবে। বীরুদার যা অভিরূচি হয় কবতে পারেন। কিন্তু তিনি এটুকু জানবেন, মণি আজও ছুষ্টু মণি। চিরকাল ছুষ্টু মণিই থাকবে।

প্রায় এক মাস লাগল মণির সমস্ত লেখাটা ঢেলে সাজাতে। সতীশদাব প্রসঙ্গটা ইচ্ছে কবেই সকলের শেষে লিখল। লেখার সময় তার ভাষা প্রায় কবিত্বময় হয়ে উঠল। শানিত ইন্সপাতের মত সেই প্রথমে তারুণ্য মণির ভাষার প্রসাদে যেন রোদ পড়ে বলসে উঠল। অন্তবেব গভীর প্রত্যয়ের জন্ম অনায়াসে আত্মত্যাগের কাহিনীটি মণি লেখনীতে তার সমস্ত অপরূপ মহত্ত্ব নিয়ে ফুটে উঠল। ক্লিষ্ট থিন্ন জোড়া-দেওয়া মানবিক অন্তিত্ব একটি মুহূর্তে যেন সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম কবে এক অপার্থিব সার্থকতায় উন্নীত হয়েছে।

কোন কথাই মণি বাদ দিল না। ছুষ্টু মণি প্রতি সতীশদার করুণ ভালবাসার কথাও মণি অকপটে বিবৃত করল। তরুণ ধান গাছে ভরা ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বর্ষণমুখব শ্রাবণ-আকাশের নীচে সতীশদা যে তাকে একটি চুষন—তার ভালবাসার একমাত্র স্বাক্ষর—উপহার দিয়েছিলেন, সে কথাও সে উল্লেখ করল, কথাগুলো লেখার সময় মনে পড়ল, চুষনের ক্লান্ত বোকাটুকু ছুষ্টু মণি ক্রমাল দিয়ে মুছে ফেলেছিল, আজ কিন্তু সেই দৃশ্যটি মানসপটে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে সারা দেহে স্পর্শাঙ্গুভূতির অপূর্ব পুলক অনুভব করল।

লেখা হয়ে গেলে মণি পড়ল নিজের লেখাটা। সাবা বইয়ের মধ্যে এত ভাল বোধ করি আর কোনও অংশ সেই লিখতে পাবে নি। আপন হৃদয় নিঙড়ে গভীর সত্যকে সে লিপিবদ্ধ করেছে। তার কি কোন তুলনা হয়! পড়তে পড়তে মণির চোখ দিয়ে জল বেবিয়ে এল।

কেন মাহুঘের এমন হয়? কেন প্রকৃত মহত্বের সঙ্গে জীবনের চিবকালের মনান্তর চলেছে? কেন?

উগুড হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে মণি কাদল। কাদতে কাদতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলল।

পরদিন আবার মণি লেখাটা নিয়ে বসল। আবার ফিবে লিখতে হবে লেখাটা। না, সে পারবে না। যা সে লিখেছিল—হৃদয়-মোচডানো সেই গভীর সত্যকে ছাপতে দিতে সে পাবে না। অন্তরেব সত্যের জন্ম সতীশদা অনায়াসে প্রাণত্যাগ কবেছিলেন। কিন্তু মণিকে যে বেঁচে থাকতে হবে। মিথ্যার সঙ্গে আপোস না কবে যে বেঁচে থাকা যায় না। ওই লেখা ছেপে বের করাও পব আব সে বীরুদার স্ত্রী হয়ে থাকতে পারবে না। হেডমিস্ট্রেসের পদ তাকে ছাড়তে হবে। জীবনের যেটুকু অর্থ এবং সম্মান সে লাভ করেছে, সমস্ত ত্যাগ কবে আবার তাকে ভিখাবিণী হয়ে ঘুরতে হবে বাস্তায় বাস্তায়। আর তার ওপর নির্ভর কবে রয়েছেন বৃদ্ধা অমহায়া মা। এ অবস্থা সে স্বীকার কবে নিতে পাবে না।

যত অর্থ আর সম্মান সে লাভ করেছে তা না হলেও হয়তো তাব চলত। কিন্তু একবার পাওয়ার পর আর তা হাবানো চলে না। অত ত্যাগ স্বীকার করার মত প্রাণেব জোর মণির নেই। ছুষ্টু মণি একদিন পেরেছিল—দেশেব আহ্বানে মাঘের নির্ভরতার নীড ত্যাগ করে বাড়ি ছেড়ে বেবিযে যেতে পেরেছিল। কিন্তু সেই অব্যাহা বেরোয়া প্রাণচঞ্চল মেয়েটি আজ হারিয়ে গিয়েছে।

লিখতে লিখতে বাববার লেখা আটকে যেতে লাগল। কলম যেন বিদ্রোহ কবতে চাইছে। তবু মণি লিখে চলল। লিখতে তাকে হবেই। বীরুদাব আদেশ তাকে পালন কবতেই হবে। বীরুদা তাব ইহজীবনের দেবতা।

ছুষ্টু মণি মরে গিয়েছে। মরে গিয়েছে তার সমস্ত অন্তব থেকে। আকাশে বাতাসে বা মাটির তলাব কবের নীচে—কোন জায়গাতেই ছুষ্টু মণি চিহ্নটুকুমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সমজাময়ী মায়ের সংসারে সदा সেরা জিনিষই চাই...

পরিবারের জন্য মায়ের পছন্দ **ডালডা**



দবদী মা' স্নেহ দিয়ে গড়া তাব সোনার স্বপন ভবা ছোট্ট সংসার।
সোহাগে, যত্ন ডালবাসায় এক সুখী পরিবার গড়ে তোলাব
সংকল্প মায়ের। এক কঠিন দায়িত্ব .. আব সে দায়িত্ব পালনে
সংসারের মজল কথা ভেবে তাঁকে সব ব্যাপারেই সেবা পথ
বেছে নিতে হয়। মায়ের দবদী প্রাণ সদাই চায় সবাব হাতে সেবা
জিনিষ তুলে দিতে। তাইতো বাম্বার বেলাতেও মায়ের পছন্দ
ডালডা। ডালডায় বাঁধা সুস্বাদু শাকসব্জী খেয়ে সবাব তৃপ্তি।... কাননও
আছে। সবচেয়ে সেরা ভেষজ তেল থেকে ডালডা তৈরী। দৈহিক
পুষ্টি সাধনের প্রয়োজনের উপাদান ভিটামিনও এতে রয়েছে।
মায়ের হাতের মিষ্টি বাম্বার ডালডা খাবারকে আবও সুস্বাদু
করে তোলে। বেঁধে তুষ্টি, খেয়ে আনন্দ—তাই আপনার
বাড়ীতেও আজ থেকে ডালডাই চাই।



ডালডা

বনস্পতি—রান্নার, খাঁচি সেরা স্নেহপদার্থ

মঞ্চ কথো

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[পূর্বাহ্নরাত]

রাত্রি খাওয়া-দাওয়া পর স্বর্জিৎ বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। রাত প্রায় এগাবোটা বাজে। হঠাৎ মনে হল বাইবে থেকে কে যেন তার নাম ধবে ডাকছে। ভাবল এত রাত্রি কে আসতে পারে।

স্বর্জিৎ উঠে গিয়ে দরজা খুলল। বাইরেটা অন্ধকার, ঘরের ভেতরকার যে আলোটুকু দরজার ভেতর দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়েছে তাতে আগন্তুককে স্পষ্ট দেখতে পেল না স্বর্জিৎ।

আলো-আঁধারির মধ্যে থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল :
অসময়ে বিরক্ত করলাম, মাপ করবেন।

গলা শুনে স্বর্জিৎ চিনতে পাবল স্ববোধ হাজরা। বলল, না না, অসময় মোটেই নয়। আমি বই পড়ছিলাম। এখনও শুই নি, ভেতরে আসুন।

স্ববোধ হাজরা-অসঙ্কোচে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তার চেহারা দেখে আশ্চর্য হল স্বর্জিৎ, এ যেন সেই আগের স্ববোধ-হাজরা নয়। শবীব সেবেছে, কপালে সবুজ দাগ থাকলেও শিরটা আর ফুলে নেই, চোখেমুখে উজ্জল হাসি। বলল, না এসে থাকতে পারলাম না তাই এলাম।

অলক আমাষ বলেছিল আপনি হয়তো আসবেন আমার সঙ্গে দেখা কবতে, তাই অপেক্ষা করছিলাম।

স্ববোধ হাজরা চেয়ারের উপর বসে পড়ে। বলে, এতদিন আসি নি, নিজেই তৈরি হতে পারি নি বলে। এখন অনেকগুলো যোগাযোগ করে ফেলেছি। মনে হচ্ছে আমার স্বপ্ন এতদিনে সফল হবে। আপনার কাছে এসেছি ভিক্ষা চাইতে।

স্ববোধ হাজরাকে এ রকম নরম গলায় কথা বলতে স্বর্জিৎ আগে কখনও শোনে নি।

হেসে বলল, বলুন, আমি কি করতে পারি।

এখন বলব না। কাল কোন্ সময় ফাঁকা আছেন বলুন, আপনাকে নিয়ে যাব গ্রামবাজারে। যেখানে আমি মাচা বেধে পাকাপাকি থিয়েটার করার ব্যবস্থা করছি।

স্বর্জিৎ একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, যদি নটার মধ্যে ছেড়ে দেন তা হলে সকাল সাতটার সময় যেখানে বলবেন দেখা করতে পারি।

নিশ্চয় ছেড়ে দেব। কাল সাতটার সময় আসুন পাঁচমাথার মোড়ে। আমি আপনার জন্তে অপেক্ষা কবব।

স্ববোধ হাজরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওর কথাই ভাবতে থাকে স্বর্জিৎ। স্ববোধ হাজরার সঙ্গে যে তার কখনও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা নয় ববং কফিহাউসে মাসুখটাকে ও এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। মনে হত বড় বেশী রুচভাষী, কিন্তু আজ তাব সঙ্গে কথা বলে স্বর্জিতের ভাল লাগল, আগের সে রুচভাষী নেই। নিশ্চয় সে কাজ করে আনন্দ পাচ্ছে, তা না হলে এতটা বদলাতে পাবত না।

পরের দিন সকালবেলা স্বর্জিৎ যথাসময়ে এসে হাজির হল নির্দিষ্ট জায়গায়। স্ববোধ হাজরা তার জন্তে আগে থেকে অপেক্ষা কবছিল। নিয়ে গেল যেখানে সে থিয়েটার কববে সেই জায়গায়। জায়গাটা গলির মধ্যে, তবে ট্রাম-

রাস্তা থেকে তিন মিনিটের পথ। আগে এটা গরুব গোয়াল ছিল, আর খানিকটা কাঠের গোলা। সব জায়গাটা পরিষ্কার করে স্থায়ী বঙ্গমঞ্চ তৈরির কাজে লেগে গেছে স্ববোধ হাজরা। উত্তর দিকে তৈরি হচ্ছে পাকা বঙ্গমঞ্চ, সাজঘর সমেত। মঞ্চের মাপ মাঝারি আকৃতির, যে কোন নাটক এখানে মঞ্চস্থ করা সম্ভব। সাজঘরের সংখ্যা বেশী না হলেও যাতে সব রকম সুব্যবস্থা থাকে তাব দিকে নজর রাখা হয়েছে। সাবা মাঠটায় টিনের শেড আগে থেকেই ছিল। এখন তাব তলায় একটা সিলিং লাগানো হচ্ছে। যাতে দেখতে ভাল হয়। সেখান থেকে ঝুলবে আলো আর পাখা। মাঠের চারদিকে আছে উঁচু পাঁচিল, বাইবে থেকে লোক উঁকি মারতে পাববে না। প্রেক্ষাগৃহে ভাল সীট লাগানো এখন সম্ভব হচ্ছে না পয়সার অভাবে। ভাড়া-করা কাঠের চেয়ার এনে কাজ চালাতে হবে। তবে কিছুদিন ঠিকমত থিয়েটার চললে নতুন করে ঘর সাজাতে কতক্ষণ। মঞ্চের আলোব ব্যবস্থাও এখন অস্থায়ীভাবে চলবে অর্থাৎ অলক তার নিজের সরঞ্জাম নিয়ে আলোকসম্পাতেব কাজ কববে। ক্রমে ক্রমে এ থিয়েটারেব নিজস্ব জিনিসপত্র কেনা হবে।

স্বরজিৎ জিজ্ঞেস করল, কত লোক একসঙ্গে দেখতে পারবে বলে মনে হয় ?

স্ববোধ হাজরা সর্গর্বে উত্তর দিল, চারশো।

জায়গাটা একটু বড় হলে ভাল হত।

আমার মনে হয় এই তো যথেষ্ট। প্রথমে চারশো লোকই আশ্চর্য না। যদি ভিড় বাড়তে শুরু করে, হাতে পয়সা আসে, পাকা দোতলা বাড়ি করে ফেলার অস্ববিধে কি ? জমি তো আমাদের বইল।

স্বরজিৎ জিজ্ঞেস না করে পাবল না, এসব করতে তো বেশ খরচা হয়েছে, টাকা কোথায় পেলেন ?

স্ববোধ হাজরা হাসতে হাসতে বলল, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে মশায়, এমনি এমনি কি আর হয়।

স্ববোধ হাজরা যে ভদ্রলোকের পোলট্রি ফার্মে চাকরি করছিল এ জায়গাটা তাঁরই, এখান থেকে গোয়াল তুলে নিয়ে গেছেন দমদমে। সেখানেই তাঁর চাষবাস। ঠিক করেছিলেন এখানে একটা বড় গুদাম তৈরি করে ভাড়া দেবেন। স্ববোধ হাজরার কৃতিত্ব তাঁকে রাজী করিয়ে

এখানে অস্থায়ী থিয়েটার তৈরি করিয়েছে। স্ববোধ হাজরাকে মাসে মাসে ভাড়া দিতে হবে এক হাজার টাকা, তা ছাড়া যদি থিয়েটার চালিয়ে লাভ হয় তার দু'আনা অংশ পাবেন বাড়িওয়াল। কিন্তু লোকমান হলে তাঁব কোন দায়িত্ব নেই।

সব কথা শুনে স্বরজিৎ বলল, ব্যবস্থা ভালই করেছেন, তবে অনেক টাকার দায়িত্বও নিতে হয়েছে আপনাকে।

স্ববোধ হাজরা স্বচ্ছন্দে জবাব দিল, কথাতাই তো বলে—নো রিস্ক নো গেন। যে কোন কাজ করতে গেলে খানিকটা ঝুঁকি নিতে হবে বইকি।

অবশ্য দর্শক যদি আসে ভাবনার কিছু নেই, দিবা চলে যাবে।

দর্শক আসবে না কেন ? আমরা যদি ভাল নাটক দিই, ভাল অভিনয় হয়, আমাদের সকলের নিষ্ঠা থাকে, বাঙালী দর্শক তা নেবেই। আমাব স্থির বিশ্বাস, যেখানেই হোক না কেন, ভাল নাটক দেখতে বাঙালী ভালবাসে। সেইজন্তেই মারা ভারতে মাত্র কলকাতায় চার পাঁচটি পেশাদার মঞ্চ রীতিমত চলছে। তবে সব সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, আমবা এখানে যা নামাব তা যেন প্রথম শ্রেণীর হয়।

একটু থেমে স্ববোধ হাজরা বলল, সেইজন্তেই তো কাল বলছিলাম আপনার কাছে একটি ভিক্ষা আছে।

বলুন আমি কি করতে পারি।

আপনার নাটক আমাদের দিতে হবে।

কোন নাটক ?

‘নতুন দিগন্ত’। সম্প্রতি যেটা লিখেছেন।

স্বরজিৎ বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু আমি যে ও নাটকটা রবী থিয়েটারকে দিয়ে ফেলেছি।

নাছোড়বান্দা স্ববোধ হাজরা বলল, সেইজন্তেই তো ভিক্ষে চাইছি। ওই নাটক না পেলে আমরা দাঁড়াতে পারব না। ‘নতুন দিগন্ত’ আমাদের দিতেই হবে। আমি জানি এ আমাদের অন্তায় আবদার। রবী থিয়েটার আপনাকে যথেষ্ট টাকা দেবে। আমরা হয়তো একটা পয়সাও দিতে পারব না, সামর্থ্য নেই বলেই পারব না। এ কথাও সত্যি, রবী থিয়েটার আপনার নাটকের যে

পাবলিসিটি দেবে আমরা তা করতে পারব না। তবু ওই নাটকটি আমাদের চাই।

স্ববোধ হাজরার কথার মধ্যে এমনই একটা আকৃতি ছিল যে স্বরজিৎ কিছুতেই তার মুখের ওপর না বলতে পারত না। বলল, আচ্ছা আমায় দু-একদিন সময় দিন, আমি একটু ভেবে দেখি।

স্ববোধ হাজরা আগের মতই জোর দিয়ে বলল, তাবুন আপনি যত খুশি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের এই নতুন থিয়েটারের এখন নাটক হবে স্বরজিৎ সেন-গুপ্তের 'নতুন দিগন্ত'।

মহা বিপদে পড়ল স্বরজিৎ, সে এখন নাটক কাকে দেবে। রুবী থিয়েটার না, স্ববোধ হাজরা। আগামী কাল হরীবাবুর কাছে নাটকের পাণ্ডুলিপি তার পৌছে দেবার কথা। আর আজই সকালবেলা, স্ববোধ হাজরা তাব কাছে ভিক্ষে চেয়ে বসল ওই নাটকখানাই। রুবী থিয়েটার শুধু যে টাকা দেবে কিংবা সেখানে অভিনয় হলে নাটকের প্রচার হবে তাই নয়, চলবেও দীর্ঘদিন ধবে। সুপ্রযোজিত না হলেও মঞ্চজগতে রুবী থিয়েটারেব নাম আছে, ভাল মন্দ যে নাটকই সেখানে হোক না কেন দর্শকের ভিড় হবেই। অপরপক্ষে স্ববোধ হাজরার থিয়েটার চলবে কি চলবে না কে বলতে পারে। হয়তো পরীক্ষামূলকভাবে কিছুদিন কাজ কবে দর্শক না পেলে থিয়েটার বন্ধ করে দেবে। বদনাম হবে স্বরজিৎকে নাটকেব। এখন কি যে তার কর্তব্য সারাদিন ভেবেও স্বরজিৎ ঠিক করতে পারল না।

তাতাভাডি অফিস থেকে বেরিয়ে পবামর্শ কবাব জল সোজা গেল অলকের কাছে। অলক বাড়িতে বসে নিজের জামা কাপড় ইঞ্জি করছিল। হঠাৎ স্বরজিৎকে আসতে দেখে খানিকটা অবাক হলেও মনে মনে খুশী হল সে। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার দাদা, একেবারে না বলে কয়ে?

স্বরজিৎ অলকের বিছানায় বসে পড়ে বলল, তোমার কাছ থেকে বুদ্ধি নিতে এলাম।

আপনার কথা শুনে নিজের উপর আস্থা বাড়ছে। আমার বুদ্ধিরও মূল্য আছে দেখছি।

স্বরজিৎ স্ববোধ হাজরার কথা সব খুলে বলল। কাল রাজিবেলা হঠাৎ তার বাড়িতে আসা এবং আজ সকালবেলা স্বরজিৎকে থিয়েটারের জায়গা দেখতে যাওয়া—সব কিছুই। কিন্তু সব শুনে অলক যে কিছু আশ্চর্য হল তা নয়, বলল, দাদা, স্ববোধ হাজরাকেই নাটকটি দিয়ে দিন। স্বরজিৎ ইতস্ততঃ করে বলে, কিন্তু নাটক যদি না চলে?

চলবে। আমরা সকলে মিলে যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় চলবে। তা ছাড়া এখানে আপনার নাটকের সুনাম হবেই। কিন্তু রুবী থিয়েটারে টাকা ছাড়া আর আপনার কোন লাভ হবে না। দেখবেন, শেষ পর্যন্ত রতীন ঘোষাল আর হরীবাবু নলচেখলচে বদলে আপনার নাটক যখন মঞ্চস্থ করবেন তখন আপনার নিজের নাটকই আপনি চিনতে পারবেন না।

অলকের কথাগুলো উড়িয়ে দেবার নয়। স্বরজিৎ চিন্তিত হয়ে বলল, সেটাও ভাববার কথা।

অলক ঘোষ ইঞ্জির প্রাগ খুলে দিয়ে স্বরজিৎকে কাছে এগিয়ে এসে বলে, আর একটা দিক ভাববার আছে। স্ববোধ হাজরা যেভাবে এ থিয়েটার চালাতে যাচ্ছে তার মধ্যে যথেষ্ট নতুনত্ব আছে। কলকাতার প্রথম কো-অপারেটিভ থিয়েটার হবে এটা, এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রী, নেপথ্য কর্মী, প্রথম দিকে কেউ টাকা নেবে না, যতদিন না এ থিয়েটার নিজের প্রায়ে দাঁড়ায়। আমার নিজের মনে হয় এ থিয়েটারের বড় হবার সম্ভাবনা খুব। আর যদি সত্যি সত্যিই বাংলার নাট্যজগতের ইতিহাসে এর নাম থেকে যায় তা হলে এ কথাটাও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে যে এখানকার প্রথম নাটক স্বরজিৎ সেন-গুপ্তের লেখা 'নতুন দিগন্ত'।

স্বরজিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অলককে জিজ্ঞেস করল, তার মানে তোমার ইচ্ছে নাটকটা আমি স্ববোধ হাজরাকেই দিই। কি বল?

অলক ঘোষ ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, আমাদের তো তাই ইচ্ছে।

কথাটা শুনে স্বরজিৎকে কেমন যেন সন্দেহ হয়। প্রশ্ন করে, আমাদের মানে?

স্ববোধ, আমি, মাধবী—সকলেই ভাবছিলাম।



লাইফবুয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে !

জাঃ! লাইফবুয়ে মান কবে কি আবাস! আর মানের পব শরীকটা কত স্বস্থরে লামে!
যবে বাইবে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবুয়েব কার্যকারী ফেনা সব ধুলো
ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার
পরিবারের সকলেই লাইফবুয়ে মান করুন।

L-16-X62 BG

বিন্দুমান মিডাক্সে ভেরী

ও, এখন বুঝতে পেরেছি। তলে তলে তোমরা সকলেই আছ। তাই বলি, স্ববোধ হাজার না পড়েই 'নতুন দিগন্ত'র জন্তে এত ঝোলাঝুলি করতে লেগে গেল কেন।

অলক ঘোষের মুখে চাপা হাসি। বলল, মাধবী ও আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না রবী থিয়েটার আপনার অমন স্মরণ নাটকটা নষ্ট করুক।

আরও পাঁচ বকম কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। অলক ইতিমধ্যে রেস্টুরাঁ থেকে চা আর মাংসের চপ আনিয়েছিল। স্বরজিৎকে ভাল করে না খাইয়ে ছাড়ল না। অলকের বাড়ি থেকে বেবিয়ে স্বরজিৎ বাস ধরেছিল বাড়ি ফিরবে বলে। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে সে মত পবিবর্তন কবল। বাসস্টপেজে না গিয়ে সোজা চলে গেল এস্প্রানেড, সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হল রবী থিয়েটারে।

হরীবাৰু নিজের ঘরে বসেছিলেন, স্বরজিৎ সেখানে গিয়ে দেখা করল। হরীবাৰু সহাস্তে অভ্যর্থনা জানালেন : আসুন স্বরজিৎবাৰু, আমার কি সৌভাগ্য ! একদিন আগেই এসে পড়েছেন, অবশ্য এতে আমাদের কাজের সুবিধেই হবে। পাণ্ডুলিপিটা সঙ্গে এনেছেন তো ?

কি ভাবে কথা শুরু করবে ভেবে না পেয়ে স্বরজিৎ বলল, না, নাটকটা নিয়ে আসি নি।

কাল কিন্তু নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন। বলেন তো রমেনকে পাঠিয়ে দিতে পারি আপনার বাড়ি। বোঝেনই তো, তিনখানা কপি করানো, তা ছাড়া স্টাণ্ডলো লেখা—বেশ সময় লেগে যাবে।

স্বরজিৎ ইতস্ততঃ করে জানায়, ওই ব্যাপারেই একটু কথা বলতে এসেছিলাম।

বেশ তো, বলুন। এত সঙ্কোচের কি আছে ?

স্বরজিৎ তা সন্তোষে কোনরকমে বলে, মানে, দেখুন, নাটকটা আমি আপনাদের দিতে পারছি না।

হরীবাৰু যেন আকাশ থেকে পড়লেন, স্বরজিৎ যে এ ধরনের কথা বলতে পারে তা তিনি কল্পনাও কবতে পারেন নি।

নানানভাবে তিনি স্বরজিৎকে কোবালেন। ইতিমধ্যে দু-চারটে কাগজে নাকি খবর দেওয়া হয়ে গেছে রবী থিয়েটারের পরেব নাটক 'নতুন দিগন্ত'। রতীনবাৰু

নাটকের চরিত্র অল্পযাযী শিল্পী বাছতে শুরু করে দিয়েছেন, দুটি নতুন মেয়েকে বুঝি কথাও দেওয়া হয়ে গেছে এই নাটকে নামানো হবে বলে। এখন যদি স্বরজিৎ নাটক না দেয় তা হলে হরীবাৰুকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু এত বলা সত্ত্বেও স্বরজিৎ যখন নাটক দেবার কোন প্রতিশ্রুতি দিল না, তখন হরীবাৰু পাকা ব্যবসায়ীর অব্যর্থ চাল চাললেন। সিগারেটের টিনটা স্বরজিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনাকে জানানো হয় নি, কিন্তু আমি ঠিক কবেই রেখেছি এবার থেকে আপনার নাটকের বয়্যালটি আমি বাড়িয়ে দেব। আর মাসে তিনশো টাকা নয় পুবোপুরি পাঁচশো টাকা আপনি পাবেন।

স্বরজিৎ শুকনো গলায় বলে, আমার কথা ভাবার জন্তে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এ নাটকটি আমি আপনাকে দিতে পারছি না। একটা অবৈতনিক দলকে এটা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এখন তারা আমায় চেপে ধরেছে। কি করি বলুন।

হরীবাৰু ঘরের মধ্যে বারকয়েক পাশচাৰি করলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, আপনার নাটক, ভাল মন্দ আপনি বুঝবেন। তবে এইটুকু বলে রাখছি মাসে পাঁচশো টাকা বয়্যালটি ছাড়া প্রত্যেকদিন কাগজে নাটকের নামের উপরে যাতে আপনার নাম ছাপা হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ হাজার পাঁচেক পোস্টাৰ মারব দেওয়ালে, তা ছাড়া হ্যাণ্ডবিল, সিনেমা স্লাইড সবতে আপনার নাম যাবে।

স্বরজিৎ আস্তে আস্তে বলে, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি বলতে এসেছিলাম—

হরীবাৰু থামিয়ে দিলেন : আমি আরও দুদিন আপনাকে সময় দিলাম, বেশ ভাল করে ভেবে নিয়ে যা স্থির করবেন আমাকে জানানো।

স্বরজিৎ হরীবাৰুকে নমস্কার জানিয়ে বাড়ি ফিরে এল। বাড়িতে পদ্মাবতী একা ছিলেন, মাধবী অলকের সঙ্গে কোথাগু বিবেয়েছে।

স্বরজিতের ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন, ফিরতে এত দেরি হল যে খোকা ? অলক বলছিল অফিস থেকে ওব বাড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সোজা এখানে আসবার কথা।

স্ববজিৎ অন্তঃমনস্কভাবে বলল, একটু কাজে গিয়েছিলাম।
 শবীর ঠিক আছে তো?
 একটু বেশী ঘোরা হয়েছে আর কি। তুমি খাবার
 ঠিক কব, আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব।
 পদ্মাবতী বললেন, আমি যে আজ অলককে খেতে
 বলেছি।

স্ববজিৎ জামা ছাড়তে ছাড়তে বলল, ওদের দুজনকে
 একসঙ্গে খাইও। আমার শবীঘটা ক্লান্ত লাগছে।

মা আব কোন কথা বললেন না, খাবার আনতে
 চলে গেলেন।

বাড়ের খাওয়া সেরে বিছানায় শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল
 স্ববজিৎ। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ
 মনে হল বাইরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন নটগুরু।
 আলোয় ভরে গেল ঘর। ঘুমন্ত স্ববজিতের মাথার কাছে
 এসে দাঁড়ালেন, মুখে স্থিত হাসি। স্ববজিৎ চোখ মেলে
 তাকিয়ে নটগুরুকে প্রণাম করার জন্তে ওঠবার চেষ্টা
 করতে তিনি ইঙ্গিতে বারণ কবলেন। স্ববজিতের কপালে
 হাত রেখে আশীর্বাদ কবলেন তোমার মনোবাস্তা পূর্ণ
 হবে।

স্ববজিৎ শুয়ে শুয়ে বলল, আমি আজ সারাক্ষণ
 আপনার কথাই ভাবছিলাম।

নটগুরু হেসে বললেন, সেইজন্তেই তো এসেছি।

আপনি বলে দিন এই নতুন নাটক আমি কাদের
 দেব। রুবী থিয়েটার, না, সুবোধ হাজরা।

এ কথাও কি বলে দিতে হবে? সোনার কোটোব
 মায়ায় তুমিও ভুলে যাবে তোমার আদর্শ? মনে নেই মঞ্চ-
 কতাব কান্না তুমি শুনেছ, তাকে যে উদ্ধার করতে হবে।

স্ববজিৎ নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে বইল নটগুরুর মুখের
 দিকে। তিনি বাববাব বলতে লাগলেন, তোমরা পারবে—
 তোমরা নিশ্চয় পারবে।

একটা আলোর বস্তা এসে নটগুরুকে উধাও করে
 নিয়ে চলে গেল।

ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল স্ববজিৎ।
 ঘর অন্ধকার, বাইরের দরজা বন্ধ, সে এতক্ষণ স্বপ্ন
 দেখছিল।

স্বপ্নই হোক আর সত্যই হোক, এই নির্জন ঘরে বসে
 স্ববজিৎ মনস্থির করে ফেলল ‘নতুন দিগন্তে’র পাণ্ডুলিপি
 সে সুবোধ হাজরাকেই দেবে। একবার সর্বান্তঃকরণে
 চেষ্টা করে দেখবে এই নবনাট্য আন্দোলনকে সার্থক করা
 যায় কি না।

তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, রাস্তায় আলো জলে উঠলেও
 প্রগতিমঞ্চের অফিস-ঘরে এখনও আলো জলে নি।
 দবজা খোলা, এক কোণে শতরঞ্চি পেতে তাব উপব
 চিত হয়ে শুয়ে আছে কুস্তল। ইচ্ছে করেই সে আলো
 জালায় নি, কি হবে আলো জালিয়ে রেখে। প্রগতিমঞ্চ
 ভেঙে গেছে, আজকাল বড় একটা কেউ আসে না।
 অনেক সভাই অতঃকাবে যোগ দিয়েছে। তাবা নাটক
 ভালবাসে। প্রগতিমঞ্চ থেকে যদি নাটক করাই না হয়
 তা হলে আর এখানে এসে ধবনা দিয়ে তাদের কি লাভ?
 যে কজন ছেলে-শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল, তারাও আজকাল
 আসে না। কুস্তল শুনেছে তারা এখন ঘোরাঘুরি কবছে
 সুবোধ হাজরার সঙ্গে, নতুন একটা দল খোলার জন্তে।

আজ ইংবিজী মাসের পঁচিশ তারিখ। আর পাঁচদিন
 বাদে এ ঘরখানাও ছেড়ে দিতে হবে। অনেক কথাই
 আজ কুস্তলের মনে পড়ছে—ফেলে-আসা দিনের কথা।
 সুবোধ হাজরাকে নিয়ে কত উৎসাহ করে এই ঘরে তারা
 প্রগতিমঞ্চের কাজ শুরু কবেছিল। প্রায় চার বছরের
 কর্মব্যস্ত ইতিহাস—প্রায় বারোখানা নাটক তারা সাকল্যের
 সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে। নামের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যদের সংখ্যাও
 তো প্রতিদিন বেড়ে চলছিল। তারপর হঠাৎ যেন সব
 কিরকম গোলমাল হয়ে গেল। সুবোধ হাজরাকে সরিয়ে
 দিয়ে সে মহা ভুল করেছে। সুবোধ হাজরা রুচভাষী।
 অনেক সময় হয়তো কাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছে সে কথা সত্যি,
 কিন্তু মানুষটা যে কুস্তলকে ভালবেসেছিল, প্রগতিমঞ্চকে
 দাঁড় করাবার জন্তে প্রাণপণ করে খেটেছিল এ কথাও
 অনস্বীকার্য। কুস্তলের অভিমান হল রমাদির ওপর,
 দুদিনেব শতের জন্তে ছেলেখেলা কবতে এসে ক্লাবটাকে
 ভেঙে দিয়ে চলে গেল। তার জন্তে এতটুকু সে অহুতপ্ত
 নয়। কদিন আগেও কুস্তল গিয়েছিল রমাদির সঙ্গে
 দেখা করতে। নির্লজ্জের মত ভদ্রমহিলা উপদেশ দিলেন,

কাজ-যখন হচ্ছে না, এ ক্লাবঘর ছেড়ে দেবার জগে, মিছিমিছি প্রতিমাসে ভাড়ার পয়সা গুনে কি লাভ? এই মাসের টাকা তিনি দিয়ে গিয়েছেন সেই সঙ্গে বাড়িওয়ালাকে নোটস।

কুস্তল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যাক, থিয়েটারের শখ মিটেছে, এখন চাকবিবাকরিব খোঁজ কবতে হবে।

বাইরেব দরজায় কে কড়া নাড়ল।

কুস্তল চৈচিয়ে বলল, দরজা খোলা, ভেতরে চলে এস।

যারা ঘরের মধ্যে ঢুকল তাদের দেখে চমকে উঠল কুস্তল। ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল শতরক্ষির উপর। একে একে ঘরে ঢুকল স্বরজিৎ অলক আর স্ববোধ হাজরা।

প্রথম কথা বলল অলক, কি ব্যাপার কুস্তল। ঘর অন্ধকার কেন?

কুস্তলের কণ্ঠে তখনও বিস্ময় : এমনি বসেছিলাম, আলোটা জ্বলে নাও না ভাই।

আলো জ্বালান স্ববোধ হাজরা। কুস্তলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে বলল, এলাম তোমার কাছে কুস্তল, একটা নতুন আরজি নিয়ে।

কুস্তল সহজ হবার চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াল। বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বস।

শতরক্ষির উপর তারা গোল হয়ে বসল।

আবাব কথা শুরু করল স্ববোধ হাজরা, তুমি নিশ্চয় শুনেছ কুস্তল, আমরা একটা থিয়েটার চালাবার চেষ্টা করছি।

কুস্তল গম্ভীর-গলায় উত্তর দিল, হ্যাঁ, শুনেছি।

শোন নি বোধ হয় প্রথম নাটকের নাম?

না।

‘নতুন দিগন্ত’। নাট্যকার ইনি—স্বনামধন্য স্বরজিৎ সেনগুপ্ত।

তারা দুজনেই নমস্কার বিনিময় করল।

স্ববোধ হাজরা আগেব স্বরেই বলে, শোন নি বোধ হয় পরিচালকের নাম?

না।

কুস্তল বিশ্বাস।

কুস্তল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। চৈচিয়ে উঠল, কি বলছ স্ববোধ?

উত্তর দিল স্বরজিৎ, আমরা আপনাকে চাই কুস্তলবাবু। আমাদের ঘটটুকু শক্তি আছে তা যদি সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ না করি তা হলে এ নাট্য-আন্দোলনকে আমরা সার্থক করতে পারব না। আজ আমরা যারা এখানে জড়ো হয়েছি তারা সকলেই—

পাদপুরণ করল স্ববোধ হাজরা : ঘরপোড়া গরু, আমবা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, একটার পব একটা দল ভেঙে আমরা নিজেদের শক্তির অপচয়ই শুধু করছি। কাজের কাজ কিছু হয় নি। তাই আমরা আবার মিলতে চাই। বল, তুমি আমাদের প্রস্তাবে রাজী আছ কিনা?

প্রথমটা কোন উত্তর দিতে পাবল না কুস্তল। তার টানা-টানা চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিল। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, স্ববোধ, তুমি যে আমাকে শুধু নতুন করে কাজ করার স্বযোগ দিলে তাই নয়, তুমি আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে মানুষ কত বড়। তার ভেতরকার মহত্ত্বের সত্যিই কোন তুলনা হয় না। আজ আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি নাট্য-আন্দোলনকে সার্থক করার জন্তে আমাকে যে কাজ করতে বলবে বিনা প্রতিবাদে যথাসাধ্য সে কাজ আমি করে যাব।

স্ববোধ হাজরা সানন্দে কুস্তলের হাত দুটো টেনে নিয়ে বলল, আমি থিয়েটারের নাম দেব ঠিক করেছি প্রগতি-মঞ্চ। আগেব মত এখানেই তার অফিস থাকবে। আমাদের এই চারজনকে নিয়ে গড়ে উঠবে কার্যপরিষদ। সেখানে তুমি হবে পরিচালক, স্বরজিৎ নাট্যকার, অলক মঞ্চাধ্যক্ষ, আর আমি থাকব ব্যবস্থাপনায। সকলের মনে দৃঢ় সংকল্প, চোখে উজ্জ্বল আশা।

এমনি করে প্রগতিমঞ্চের নতুন যাত্রা শুরু হল। ঘটাব পব ঘট। তারা চারজনে একসঙ্গে কাটাতে লাগল। কখনও অফিসে, কখনও কফিহাউসে কখনও বা স্বরজিতের বাড়িতে। বাববার করে পড়া হল নাটক, কবিতা হল শিল্পী নির্বাচন, কিন্তু বিপদ হল নায়িকার চরিত্র নিয়ে। অলকাকে ফুটিয়ে তোলার মত শিল্পী পাওয়া গেল না। চিন্তায় পড়ল সকলেই। অনেক ভেবে স্বরজিৎ



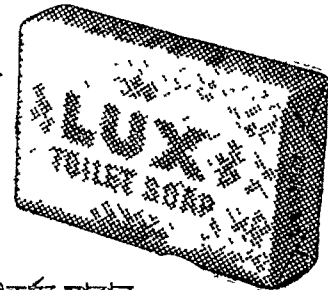
বিশুদ্ধ, কোমল লাক্স এবং ৪টি রামধনু-বগে

আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!

দেখুন! লাক্স এবাব চমৎকার কত সব নতুন বগে ধরা দিয়েছে—
সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—যেকোন
বছর নিতে যে সাবান আপনি চিবদিনই চেয়েছেন।



মঞ্জুলা ব্যানার্জী বলেন
'আমার প্রিয় লাক্সে যেন
রঙের মেলা লেগেছে,
এ এক অভিনব রচনা!'



চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান

MS-84-X32-80

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বলল, একজনকে আমি চিঠি লিখে দেখতে পারি, যদি তিনি রাজী হন।

কুন্তল প্রশ্ন করল, কে ?

আগে থেকে নাম বলে কী লাভ ?

চিঠি লিখছ কেন, উনি কি কলকাতায় থাকেন না ?

স্বরজিৎ নিজের মনে রলে, চিঠি লেখাই ভাল, সব কথা গুছিয়ে বলা যাবে।

ছুদিন বাদে প্রগতিমঞ্চের অফিসে ব্যস্তভাবে ঢুকল স্বরজিৎ। কুন্তল জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, নাট্যকারকে যেন বিশেষভাবে চঞ্চল মনে হচ্ছে।

স্বরজিৎ সহাস্ত্রে উত্তর দিল, তোমার নায়িকা-সমস্তার সমাধান প্রায় কবে ফেলেছি। এই নাও চিঠি।

বারবারে মেয়েলী হস্তাক্ষরে লেখা ছোট্ট চিঠি। কুন্তল জোরে জোরে পড়ল—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অপ্রত্যাশিত চিঠির জ্ঞাত্য অনেক ধন্যবাদ। আপনি যে আপনার নতুন দিগন্ত নাটকে নায়িকার চরিত্রে রূপ দেবাব জন্তে 'আমন্ত্রণ' জানিয়েছেন সেজ্ঞাত্য গর্বিত বোধ করছি। জানি না আপনাদের মনোমত রূপ দিতে পারব কি না। তবে সাধ্যমত চেষ্টা করব নিশ্চয়। যদি আপনাদের খুশী করতে পারি তা হলে যথেষ্ট আনন্দ পাব।

টাকার কথা লিখেছেন। সবিস্তারে অত কথা না লিখলেও বোধ হয় চলত। ভগবানের আশীর্বাদে চিত্রজগৎ থেকে মন্দ রোজগার হয় না। মঞ্চে না হয় শখের খাতিবেই কাজ করলাম। আমার জ্ঞাত্য মাসে মাসে যে সম্মান-দক্ষিণা দেবার কথা লিখেছেন তা আপনাদের প্রগতি-মঞ্চের উন্নতিকল্পে খরচ কবলেই বাধিত হব।

আপনার নাটক পড়ার জন্তে উদগ্রীব হয়ে আছি, তবে অত্যাশ্রয় লেখার মত এ নাটকটিও যে রসোত্তীর্ণ হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে কোনদিন টেলিফোনে সময় ঠিক করে পরিচালক মহাশয়কে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসুন না। চা-সহযোগে আলাপ করা যাবে। নমস্কারান্তে ইতি

চিঠি পড়ে উৎসাহে চোঁচিয়ে উঠল কুন্তল : বাস, কেজা মা'ব দিয়া। আর দেখতে হবে না, সূচরিতা বস্তুকে যখন পেয়েছি, এ নাটক আমি ফাটিয়ে দেব।

কথায় বলে হাওয়ার আগে বার্তা ছোট্টে। দেখতে দেখতে থিয়েটার-মহলের চারদিকে রটে গেল রীতিমত থিয়েটাররূপে প্রগতিমঞ্চের আত্মপ্রকাশের কথা। নব-নাট্য আন্দোলনের বখী-মহারথীরা সকলে মিলিত হয়ে এই থিয়েটারকে প্রাণবন্ত কবে তুলতে চায় এ কথা জেনে কোঁতুহলী হল অনেকে। বিশেষ করে কুন্তল স্বরজিৎ অলক ও সূচরিতাব নাম নাট্যমোদীদের মুখে মুখে ফিবতে লাগল। উৎসাহিত হয়ে উঠল নব্যপন্থীরা, কিন্তু পেশাদার মঞ্চরা একস্বরে প্রচাৰ করতে লাগল প্রগতিমঞ্চের কোন ভবিষ্যৎ নেই, এ পাগলামি বেশীদিন চলবে না।

রুবী থিয়েটারের ম্যানেজার একদিন এল স্বরজিৎকে সঙ্গে দেখা করতে। কোন রকম ভূমিকা না কবেই বলল, ভুল করলেন মশাই—মহা ভুল। অমন সুন্দর নাটকটা দিলেন কিনা ওই অর্বাচীনগুলোকে ! ক-রাত্রি চলে আমরা দেখব। গোঁঘালঘরে লোকে থিয়েটার দেখবে কাঠের চেয়ারে বসে। আশা দেখে আর বাঁচি না।

স্বরজিৎ হয়তো বলেছে, তবু আমাদের চেষ্টা করতে হবে। ভাল জিনিস দিলে লোকে কেন দেখবে না।

দেখবে যে না সে আমি আগে থেকেই বলে দিছি। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলে আমার আব কি বলবার আছে। রুবী থিয়েটার এইবার রঞ্জিত চৌধুরীর বই নিচ্ছে, ওই জায়গায় 'নতুন দিগন্ত' হলে আপনার নাম কি বকম ছড়িয়ে পড়ত ভাবুন দেখি।

যা হবার তা হয়ে গেছে, ও নিয়ে আর ভেবে কি হবে বলুন।

রমেন চৌধুরী তা'ব লাল মাছের মত চোখ দুটো চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে বড় কবে বলল, স্ববীবার মহা ক্ষেপে গেছেন। আপনার নাটক রুবী থিয়েটারে আর কখনও হতে দেবেন না। আমি বলছি আপনার নাটক লেখার ভাল হাত ছিল, বুধাই নষ্ট কবলেন।

প্রথম থেকেই স্বরজিৎ অস্বস্তি বোধ করছিল। বিরক্ত

ভবদীয়া

সূচরিতা বস্তু

হয়ে বলল, রুবী থিয়েটার চাইলেও আয়ি নাটক দেব না। প্রগতিমঞ্চ যদি দাঁড়ায় ভাল, নয়তো নাটক লেখা ছেড়ে দিয়ে উপভাস লিখব।

বমেন চৌধুরী বেশী কথা বলার স্বযোগ না পেয়ে আশ্তে আশ্তে উঠে যায়। ও কিন্তু একা নয়, থিয়েটার-জগতের অনেক শুভাঙ্ঘ্যায়ী স্ববজ্রিংকে অঘাচিত সতর্ক-বাণী শুনিতে গেছে, এমন কি বতীন ঘোষালও এসেছিলেন। ঘন ঘন নশ্ত্রি নিতে নিতে বললেন, স্বরজিৎ ভায়া একটু সামলে চল। থিয়েটারের লাইন বড খাবাপ। একবার যদি চাকার তলা থেকে বেল সরে যায় তা হলে আব দেখতে হবে না। নির্ধাত অ্যাকসিডেন্ট।

স্বরজিৎ তাঁকে স্পষ্ট জানিয়েছে, অনেক ভেবেচিন্তে তবে এই প্রগতিমঞ্চ নিয়ে খাটতে শুরু কবেছি। যদি হেবেই যাই, উপহাসের বস্ত্র হয়ে নাটকের পাণ্ডুলিপি বগলে করে পেশাদার মঞ্চের দরজায় গিয়ে যে ধবনা দেব না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পাবেন।

বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর, যাবার সময় রতীন ঘোষাল কিন্তু তাতে আশীর্বাদ করে গেছেন। বলেছেন, আমরা তো পারলাম না, দেখ বাবা তোমরা যদি পাব। এটা সত্যি, কিছু একটা হওয়া দরকার। দেখ, যদি এই অচলায়তনকে তোমরা নাড়া দিতে পার।

আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হচ্ছে স্বরজিৎকে। সকালবেলা ওবা জড়ো হয় শ্রামবাজারে, যেখানে প্রগতিমঞ্চের অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরি হচ্ছে। প্রতিদিন তদারক না করলে বোঝা মুশকিল কাজ ঠিকমত এগুচ্ছে কি না। সময়মত নাটক নামানো যাবে কি না। দুপুরবেলা স্বরজিৎকে যেতে হয় অফিস, লাঞ্চার ছুটিতে ছুটিতে আসে কফিহাউসে। স্ববোধ হাজরা, কুস্তল, অলক ওর জন্তে অপেক্ষা করে থাকে। সেখানে আলোচনা হয় পাবলিসিটি নিয়ে, তা ছাড়া টাকাকড়ি যোগাড়ের ব্যবস্থা। স্বরজিৎকে আবার ছুটিতে হয় অফিস। ছুটির পর সোজা যায় প্রগতিমঞ্চের ক্লাব-ঘরে, সেখানে চলে বিহার্মূল, বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। কাক্সের নেশা বেন এদের পেয়ে বসেছে। শুধু স্বরজিৎ কেন, কুস্তল স্ববোধ অলক তিনজনেই দিন নেই রাত নেই খাটছে। ওদের একটা স্ববিধে আছে বাঁধাধরা টাইম

অহুযায়ী অফিস করতে হয় না। মাধবীও আজকাল প্রগতিমঞ্চের যোগ দিয়েছে, প্রত্যেক দিন বিকেলের দিকে আসে, স্ববোধ হাজরা নির্দেশমত বিভিন্ন পত্রিকার জন্ত প্রগতিমঞ্চের খবরাখবর লিখে পাঠায়। স্বরজিৎ ফিরতে দেবি হলে মাধবী একাই বাড়ি ফিরে যায়। অলক ফাঁকা থাকলে অবশ্য সঙ্গে করে পৌছে দিয়ে আসে।

সেদিন স্বরজিৎ বেরতে দশটা বেজে গেল, তখনও কুস্তল বিহার্মূল নিচ্ছে। স্ববোধ হাজরা এক কোণে বসে টাকা-পয়সার হিসাব মেলাতে ব্যস্ত। মাধবী আর অলক আগে চলে গেছে। স্বরজিৎ প্রগতিমঞ্চের অফিস থেকে একা বেবিযে এল। অন্ধকার বাস্তা, সামনের গ্যাস-পোস্টের নীচে কেউ অপেক্ষা কবছিল। স্বরজিৎকে বেরতে দেখে কাছে এগিয়ে এল : স্বরজিৎবাবু, একটা কথা ছিল।

স্বরজিৎ চিনতে পারল, দুর্গাশঙ্কর। জিজ্ঞেস করল, এত রাতে আপনি এখানে ?

দুর্গাশঙ্কর ইতস্ততঃ করে বললেন, আপনাকে অহুরোধ জানাতে এসেছিলাম একবার যদি আমাদের বাড়িতে আসেন।

স্বরজিৎ বিস্মিত হয় : আপনাদের বাড়িতে কেন ?

‘দুর্গাশঙ্কর অত্যন্ত গভীর গলায় বলেন, মোনো অস্থঃ। বিছানায় শুয়ে আছে। প্রায়ই আপনার নাম করে। তাই আপনাকে অহুরোধ কবতে এসেছি।

স্বরজিৎ ইচ্ছে কবে এডিয়ে গেল : আমার এখন অনেক কাজ, বড সময়ের অভাব।

তা আমি জানি। তবু এসেছি এই আশা নিয়ে, আপনি এই বৃদ্ধ পিতাকে হতাশ করবেন না।

কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝলাম আপনার মেয়েব অস্থঃ, আমি গিয়ে কি করব ?

দুর্গাশঙ্কর উদাস স্বরে বললেন, কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে, মোনোর অস্থঃটা শারীরিক নয়, মানসিক। হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বললে অনেকখানি স্থস্থ হয়ে উঠবে। অবশ্য যদি আপনি না যান আমার জোর করার কোন অধিকার নেই।

দুর্গাশঙ্করের কথাগুলো কেন জানি না স্বরজিৎ

মনকে স্পর্শ করল। 'কিছুতেই সে বুদকে নিরাশ করতে পারল না। বলল, কাল সকালের দিকে যাব।

বুকের চোখমুখ খুলিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল : ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন বাবা।

বোধ হয় 'দুর্গাশঙ্করকে' যাচিয়ে দেখাব জন্তে স্ববজ্রিং পকেট থেকে দু টাকার নোট বার করে বলল, দরকার আছে নাকি ?

অতি হুঃখেও যেন দুর্গাশঙ্কর হাসলেন : থাইনা বললে মিথ্যা বলা হবে বাবা। মনটা ভাল নেই, মোনোর জন্তে বড চিন্তায় আছি। কালকে দেখা হলে সব বলব।

পবদিন সকালবেলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ববজ্রিং গেল মন্দিরা গৃহব বাড়ি। 'দুর্গাশঙ্কর তারই জন্তে বাইরেব রকে অপেক্ষা কবছিলেন। 'হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা কবলেন : এস বাবা, তুমি আসবে শুনে মোনো খুব খুশী হয়েছে। চল, ওব ঘরে নিয়ে যাই।

মেঝেতে বিছানার উপব শুয়ে ছিল মন্দিরা। 'রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, শরীরও যেন আগের চেয়ে রোগী হয়েছে। স্ববজ্রিংকে দেখে বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসল। হাত তুলে নমস্কার করে বলল, বাবা যদিও বলেছিলেন আপনি আসবেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পাবি নি।

দুর্গাশঙ্কর স্ববজ্রিতের দিকে তার মোড়া এগিয়ে দিয়েছিলেন। তাইতে বসে স্ববজ্রিং প্রশ্ন করল, শরীর খারাপ হল কেন ?

মন্দিরা উত্তর দিল, জর হয়েছে, ছাড়ছে না।

কদিন ?

প্রায় দিন পনের। শরীর ভাল থাকলে নিজেই গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম।

কেন, কি ব্যাপার।

মন্দিরা স্থির দৃষ্টিতে স্ববজ্রিতের দিকে তাকিয়ে-জিজ্ঞেস করল, কেন আপনি 'নতুন দিগন্ত' রুবী থিয়েটারকে দিলেন না ?

স্ববজ্রিং হাসবাব চেষ্টা কবল : ওসব পুরনো কথা ভেবে কিছু লাভ আছে ? ইচ্ছে হল না, তাই দিলাম না।

মন্দিরা নিজের মনেই কি যেন ভাবতে থাকে। বলে, জানেন, আপনার নাটকের নায়িকা অলকার চরিত্রে

রূপ দেব বলে আমি কতখানি পরিশ্রম কবেছি। নাটকটা পড়েই মনে হয়েছিল ওই চরিত্রটি যেন আমাকে দেখে লেখা। মনে মনে আপনার প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। ভেবেছি এইটেই হবে আমার অভিনয়-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাই যেদিন শুনলাম রুবী থিয়েটারকে আপনি নাটক দেবেন না সেদিন থেকেই কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলাম। ছুটি নিলাম রুবী থিয়েটার থেকে। কেন জানি না আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি যাদেরই ওই নাটক দিন না কেন, অলকার চরিত্রে অভিনয় করার জন্তে নিশ্চয় আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

স্ববজ্রিতের কোন কথা বলার ছিল না, চুপ করে শুনে গেল। মন্দিরা বলে চলল, কিন্তু যখন কানে এল, ওই পার্টের জন্ত আপনারা স্বেচছিতা বস্তুকে নিয়েছেন, আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। আপনাদের সঙ্গে অতদেব কি তফাত বলতে পারেন ? বক্স অফিসে যার নাম বেশী, তাবই পেছনে ছুটে বেড়ান। কে ভাল অভিনয় করতে পাবে তা একবারও যাচিয়ে দেখেন না।

স্ববজ্রিং আস্তে আস্তে বলল, এ কথাগুলো শোনার জন্তেই কি আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

আমি তো ডাকি নি।

সে কি। আপনার বাবা যে বললেন !

স্ববজ্রিং ফিরে দেখে দুর্গাশঙ্কর কখন ঘর থেকে বেবিয়ে গেছেন।

মন্দিরা সহজ ভাবে বলল, আমি ডাকি নি, তবে বাবা হয়তো ভেবেছেন আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা হলে আমি খুশী হব, তাই বোধ হয়।

স্ববজ্রিং উঠে দাঁড়ায় : আমি তা হলে এখন যেতে পারি ?

মন্দিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে : এসেছেনই যখন, আর একটু বসুন না। চা আনতে বলি।

স্ববজ্রিং বাধা দেয় : না থাক। অফিস আছে তো।

বলতে বলতে স্ববজ্রিং আবার বসল। মন্দিরা নিজের মনেই বলে, দোষ আমারই, মিথ্যে পাঁচজনকে বিরক্ত কবে মারি। 'এমনই বরাত, একখানা ভাল পার্ট পেলাম না। লোকে বলে মায়ের মত আমার নাম হল না কেন। কি করে হবে, মা ছিলেন নাটকের নায়িকা, আর আমাকে করতে হয় পার্শ্চরিত্র। ভগবান শুধু আমাকে চেহারাতেই

মারেন নি কপালটাও দিয়েছেন পুড়িয়ে।—একটু খেমে মন্দিরা স্ববজ্রিংকে জিজ্ঞেস করে, আপনার কি মনে হয় না অলকার পার্ট আমি ভাল কবতে পারতাম?

স্ববজ্রিং ছোট্ট উত্তর দেয়, নিশ্চয় পাবতেন।

তা হলে আমাকে নিলেন না কেন?

আমরা কি করে বুঝব যে রবী থিয়েটার ছেড়ে আপনি আসতে বাজী হবেন। তা ছাড়া টাকাকড়ি দেবারও আমাদের সামর্থ্য ছিল না।

মন্দিরা চোখ দুটো ছোট করে প্রশ্ন করে, ধরুন, এখনও যদি আমি অলকার পার্ট করতে চাই, আপনারা দেবেন?

স্ববজ্রিং শ্মিত হাসল : এখন তা কি করে সম্ভব। একজনকে যে কথা দেওয়া হয়ে গেছে।

মন্দিরা তীক্ষ্ণস্বরে বলে, আসল কথাটা পরিষ্কার করে খুলে বলুন না যে আমাকে আপনি নেবেন না।

স্ববজ্রিং চমকে উঠল, কেন নেব না?

নেবেন না কারণ আমি যে আপনার অনেক উপকার করেছি। আপনাকে প্রথম থিয়েটারেব লাইনে নিয়ে এসেছি, লিখতে উৎসাহিত করেছি, নিজের জীবন থেকে নাটকের উপাদান দিয়েছি। এত ভাবে উপকৃত হয়ে কেন আপনি আমার উপকার করবেন।

আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।

মন্দিরা বিক্রপ করে বলে, ভুল আমি কাউকে বুঝি নি। আমি থিয়েটারের মেয়ে, আমাকে আব মঞ্চরাজ্যের কথা বলতে আসবেন না। সবাই শুধু স্বযোগ খোঁজে কি ভাবে নিজে দাঁতাবে আর অত্মদের সর্বনাশ করবে। আপনি আর তার কি ব্যতিক্রম হবেন বলুন।

স্ববজ্রিং আব নিজেকে চেপে রাখতে পারে না। বাঁজের সঙ্গেই বলে, যে কথাটা বলব না তারছিলাম দেখছি সেটা আপনাকে খুলে বলতেই হবে।

বলুন, আমি তো গুনতে চাই।

আপনি আমাকে প্রথম রবী থিয়েটারে নিয়ে এসেছিলেন। তাতে আমার এইটুকুই লাভ হয়েছে নাট্যজগতের নোংরা দিকটাও স্বচক্ষে দেখতে পেরেছি। এখন যখন নিজেরাই থিয়েটার খুলতে যাচ্ছি তখন ওই নোংরা-মী-গুলোকে এড়িয়ে চলতে পারব। সেই জন্তে অস্তুতঃ আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

তার মানে কি বলতে চান আপনি?

আমাদের থিয়েটারে যারা কাজ করবে তারা আসবে সাধনা কবতে। যে-কোন জাতের সংস্কৃতির আয়না হচ্ছে বঙ্গমঞ্চ। ভাল নাটক লিখতে হবে, ভাল ভাবে অভিনয় করতে হবে, তার জন্তে চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা—যা আপনার নেই।

মন্দিরা রাগে জলে উঠল : কার আছে গুনি? ওই স্বন্দরী সূচরিতা বসুর?

স্ববজ্রিং ধীর স্বরে বলে, নিশ্চয় আছে, তা না হলে আমাদের আদর্শ মেনে নিয়ে ওই রকম নামকরা একজন চিত্রশিল্পী বিনা পয়সায় কাজ করতে আসতে চাইতো না। আমার বক্তব্য শুধু ফলটাকে ভাল দেখলেই হবে না, গাছটাও ভাল হওয়া চাই। গন্তব্যস্থলে পৌছলে চলবে না, পথটাও সহজ ও স্বন্দর হওয়া প্রয়োজন।

কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

আপনাদের থিয়েটার শুধু আনন্দ দেয়, শিক্ষা দিতে পারে না, আপনাদের থিয়েটারে আবহাওয়া জমিদার বাড়ির বাগান-বাড়ির মত। আমরা তা থেকে দূরে থাকতে চাই। আজ চলি, নমস্কার।

স্ববজ্রিং ঘব থেকে বেরিয়ে আসছিল, শুনতে পেল মন্দিরা কাঁদছে। ফিরে দাঁড়াল।

মন্দিরার চোখে জল, উদ্ভাস্ত দৃষ্টি। কিস ফিস করে বলল, আপনি বড় নিষ্ঠুর।

স্ববজ্রিং তেমনিভাবেই উত্তর দিল, নিষ্ঠুর হতে হয় মন্দিরা। জীবনে যখন নাট্য-আন্দোলনের ব্রত নিয়েছি, তখন তাকে সার্থক কবে তোলার জন্তে নীরবে কাজ করে যেতে হবে। কোন রকম ভাবাবেগকে প্রায়শ দিলে চলবে না।

মন্দিরা কান্নাভেজা গলায় জিজ্ঞেস করল, যদি ভবিষ্যতে কখনও আপনার নাটকে অভিনয় করতে চাই তার কি স্বযোগ পাব?

নিশ্চয় পাবেন। যেদিন বুঝতে পারবেন আমি কোন্ সাধনার কথা বলছি। স্বেচ্ছায় দীক্ষা নেবেন। মাহুষেব হিতের জন্ত শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে অভিনয় করতে প্রস্তুত হবেন তখন আমিই আপনাকে ডেকে নিয়ে আসব প্রগতিমঞ্চে কাজ করার জন্তে।

স্বরজিৎ আর কথা না বাড়িয়ে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসেও দুর্গাশঙ্করকে দেখতে পেল না। তিনি কোথায় চলে গেছেন, কে জানে।

এর পর কয়েকটা দিন কাটল প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। এখন শ্রামবাজারে প্রগতিমঞ্চকে দেখলে কে বলবে ক'মাস আগে পর্যন্ত এটা ছিল একটা গোয়ালঘর। টিনের চাল ঢেকে দেওয়া হয়েছে কাপড়ের শিলিং দিয়ে। রঙ্গমঞ্চ ও চাবদিকের দেওয়াল স্থানদর কবে রঙ করা হয়েছে, সিমেন্ট-বাঁধানো মেঝের পেছন থেকে সামনের দিকে প্রায় তিন ফুটের চাল, চেয়ারে বসলে ঘাতে দেখতে অস্বাভাবিক হয়। নাটকের সেট তৈরি, নানা ধরনের আলো লাগিয়েছে অলক। কয়েকটা রাত্রি পর পর বিহার্গাল করে দেখা হল। মনে তো হচ্ছে নাটক বেশ ভালই দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না সাধারণ দর্শক এসে রায় দিচ্ছে ততক্ষণ বোঝা মুশকিল জনসাধারণ এ নাটক গ্রহণ করবে কি না। শহরের চতুর্দিকে পোস্টার পড়েছে প্রগতিমঞ্চের, প্রতিদিন বিজ্ঞাপন বেরচ্ছে কাগজে, কারুর এতটুকু বিশ্বাস নেবার উপায় নেই। অফিস কামাই কবে কাজে লেগে গেছে সবাই। সারাদিনে প্রায় বোল ঘন্টা তারা কাটায় প্রগতিমঞ্চের নিজস্ব নাট্যশালায়।

আজ প্রগতিমঞ্চের শুভ উদ্বোধন। 'নতুন দিগন্ত'র প্রথম অভিনয়-বজ্রনী। স্বরজিৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল, ভাববেলা তাকে ডেকে তুললেন পদ্মাবতী। ঘুম-চোখে স্বরজিৎ জিজ্ঞেস করে, কি মা-মণি।

পদ্মাবতী বললেন, অঘোরে ঘুমুচ্ছিলি, ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম।

না না, ঠিক আছে বল।

আজ কাজের দিন। পরে সময় পাবি কি না জানি না। তাই বলছিলাম চল, এইবার একবার বেলুডে যাই, ঠাকুরকে প্রণাম করে আসি।

স্বরজিৎ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সামনে বলল, তুমি যাবে মা?

পদ্মাবতী হাসলেন : যাব বলেই তো তৈরি হয়ে রয়েছি। অলকও আসছে, মাধু তুই আমি চারজনে মিলে খুরে আসি চল।

স্বরজিৎ বরাবর লক্ষ্য করেছে পদ্মাবতী কোনদিনই লেখা বা থিয়েটার নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন না, আজ নিজে থেকে স্বেচ্ছায় তাদের নিয়ে বেলুডে যেতে চাইছেন দেখে স্বরজিতের চোখে জল এল। তা সে গোপন করার চেষ্টা করল না। মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, আশীর্বাদ কর মা, যেন পথভ্রষ্ট না হই।

পদ্মাবতী তাকে সম্বোধন করে আদর করলেন, আর প্রাণভরে করলেন আশীর্বাদ।

ছেলেবেলা থেকে স্বরজিৎ মায়ের সঙ্গে বেলুডের মন্দিরে এসেছে, ঠাকুরকে প্রণাম কবেছে, মাঝে মাঝে প্রসাদও পেয়েছে, কিন্তু আজ সপরিবারে মন্দিরে ঢুকতেই মনেব মধ্য এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হল। প্রায়দ্বাদশ বছর বিরাট মন্দিরের একপ্রান্তে আলোকোজ্জ্বল ঠাকুরের মূর্তি পদ্মাসনের উপর আসীন, মুখে মধুর হাসি, চোখে অপার করুণা। স্বরজিতের মনে হল তিনি যেন তাদেরই জন্তে অপেক্ষা করছিলেন। আজ না এলে তিনি ব্যথা পেতেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সে মনে মনে বলল, ঠাকুর, তুমি আমায় যে পথে চলতে বলছ, আমি যেন সেই পথে চলতে পারি। যে কাজ আমাকে দিয়ে করাতো চাপ্ত, মন প্রাণ দিয়ে সে কাজ যেন করতে পারি। হে করুণাময় তোমার করুণা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

ফেরবার পথে গাড়িতে স্বরজিৎ একটা কথাও বলল না। চুপ করে সে ভাবছিল নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কথা। ঠাকুরের রূপায় নাট্যজগতে কী অসাধ্য সাধন তিনি করেছেন। কী গভীর বিশ্বাস, কী অগাধ পাণ্ডিত্য, কী হুরন্ত প্রতিভা। শ্রদ্ধায় আপনা থেকে স্বরজিতের মাথা নত হয়ে এল।

গাড়িতে মাধবী বলছিল : মা, আমার মনে হচ্ছে আজ থিয়েটার-হাউসফুল যাবে। সবাই এসে ধন্য ধন্য করবে।

পদ্মাবতী তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, পাগলী মেয়ে, আগে থেকে অত কথা ভাবতে নেই। দেখ শেষ পর্যন্ত কী হয়।

অলক তাদের থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনার যখন আশীর্বাদ পেয়েছি মা, আমাদের জয় হবেই।



আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ

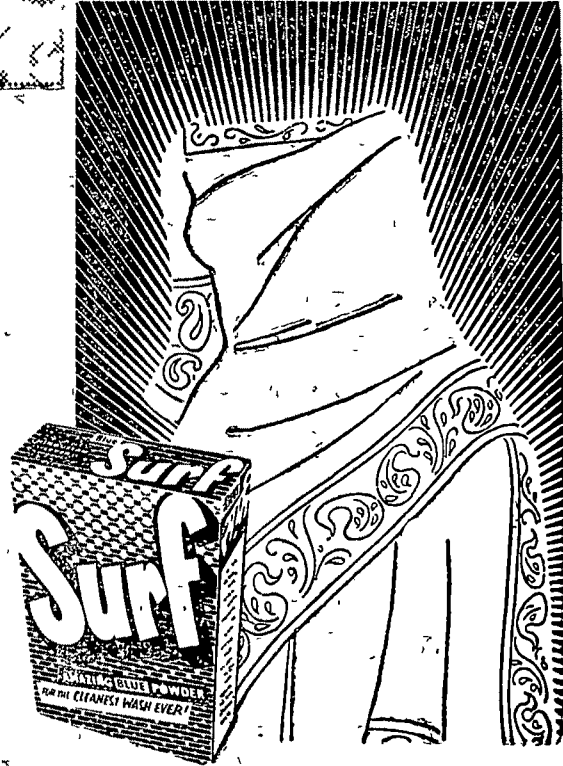
‘আমাদের আজকের জীবনে...’

বোম্বের গৃহিণী প্রেমা সন্দ্বজী বলেন

‘আমাদের আধুনিক এই জীবন যাত্রায় মনে হয় বোঝাই নতুন জিনিষ চাই, আর বালকের চেয়ে আঁব ও ভাল জিনিষ চাই—বোম্বের ওয়ালকেথর বোম্বের শ্রীমতী প্রেমা. জি. সন্দ্বজীও অভিমত। তিনি বলেন, ‘আজ এ ধরনের বহু আধুনিক, উন্নত জিনিষ বাজারে পাওয়াও যাচ্ছে। এই ধরন সার্ফ ব্যবহার করে সত্যিই আনন্দ হয়। কারণ সার্ফের কাপড় কাচার গুণ অতুলনীয়!’

‘সার্ফে বদোব ফেনায় ময়লা কাপড় চুবিয়ে তুলে নিল, দেখবেন সাদা কাপড়জামা কেমন ধুবধবে ফবসা হয়েছে!’ তাই সন্দ্বজীদেব বাড়ীর কাপড়চোপড়—সাট, প্যাণ্ট ব্লাউজ, শাড়ী, তোয়ালে চাদর, ওয়াড ঝাডন সবই বাড়ীর গৃহিণী সার্ফে কাচেন।

আপনি সার্ফ ব্যবহার করছেনতো? সার্ফ আপনার কাপড় কাচার ঝামেলা অর্ধেক কমিয়ে দেবে—অথচ সার্ফে কাটা কাপড় আগের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বেশী ফরসা হবে। তাইতো ঘবে ঘবে আজ সার্ফের কদর। আপনিও এবার সার্ফে কাটতে শুরু করুন!



সার্ফে কাপড়জামা সবচেয়ে ফরসা করে কাচে

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী

১৩, ১১-১১-১৩

কিন্তু আশ্চর্য, সে রাত্রে বেশী টিকিট বিক্রি হল না। মাথায় হাত দিয়ে বসল স্ববোধ হাজরা। লোক ভরাবাব জগ্রে তাড়াতাড়ি আমন্ত্রণ করে আনতে হল বেশ কয়েকজনকে, তবু হল ফাঁকাই রয়ে গেল।

নির্ধাবিত সময়ে অভিনয় শুরু হল। স্ববজিৎ গিয়ে বসল একেবারে পেছনেব সাবিত্রে, প্রাণপণ কবে শিল্পীবা অভিনয় কবছে। সুন্দর দৃশ্যসজ্জা, অনন্তসাধারণ আলোক-সম্পাত। একটা পর একটা অঙ্ক অভিনয় হয়ে চলেছে, অথচ দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ এতটুকু বাহবা দিচ্ছে না। প্রথম অঙ্কের পবে স্ববজিৎ যখন ভেতরে গেল দেখল মনমবা হয়ে বসে আছে কুন্তল অলক সূচবিভা— সমস্ত ছেলের দল।

কুন্তল স্ববজিৎকে একান্তে ডেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার বল তো, অভিনয় কি খাবাপ হচ্ছে? দর্শকদের ভাল লাগছে না?

স্ববজিৎ গম্ভীর মুখে বলল, কিছু বুঝতে পারছি না। আর একটু চলুক, দেখি।

কিন্তু দেখতে দেখতে নাটক শেষ হয়ে গেল, হাততালি দেওয়া তো দুবের কথা, দু-একজন শশব্দে নিদে করতে করতে উঠে গেল।

সকলে চলে যাওয়ার পব চার বন্ধুতে মুখ চুন করে বসে রইল মঞ্চের উপর। সামনে সার সার চেয়ার পড়ে রয়েছে, অনেকগুলো আলো নেভানোর ফলে জায়গায় জায়গায় অন্ধকাব। সকলেরই মনে এক চিন্তা ঘুরছে—এত পরিশ্রমের পরও বোধ হয় নাটক ধবল না।

স্ববজিৎ একা নেমে গেল প্রেক্ষাগৃহেব মধ্যে, বসল গিয়ে একটা অন্ধকার জায়গায়। যেখানে তাকে সহজে দেখা যায় না, কিন্তু সে দেখতে পায় আব সবাইকে। স্ববজিৎ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল মঞ্চের দিকে। ভাববার চেষ্টা করছিল কোথায় তাদের গলদ হয়েছে, কেন আজ লোকে নাটক দেখে খুশী হল না।

তবে কি সূচরিতার অভিনয় মনের মত হয় নি? ওর জায়গায় অলকার চরিত্র কি মন্দিরা গুহ আবও সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলত? মন্দিরার কথার ভাবতেই মনে হয় রসময়ের কথা। হাসির পাঁটে সে হয়তো কুন্তলের চেয়ে বেশী হাসাতে পারত। অবশ্য অভিনয়ের চেয়ে ভাড়া

করত বেশী। মনে পড়ছে প্রদীপ মুখার্জির কথা। চেহারাটা লম্বাচওড়া, যে পাঁটেই নামুক মানায় খাসা। আর একজনের চেহারাও সুন্দর ছিল, কিন্তু মনটা কী জঘন্য। ওই বাসুদেব মজুমদার। শুভ্রা মেয়েটাকে পথে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। হঠাৎ মনে হল, সেই অন্ধ বুড়ি অন্নদাব কথা। এ নাটক দেখলে সে কী খুশীই না হত।

চমক ভাঙল স্ববজিৎবেব। সে এতক্ষণ কোথায় ছিল! প্রগতিমঞ্চে, না, কবী থিয়েটারে। কত রাতে নির্জন কবী থিয়েটারেব সীটে বসেও তো সে এরকম আকাশপাতাল ভেবেছে। কিন্তু সে নির্জনতার সঙ্গে আজকের এ নিশ্চরতার কোথায় যেন একটা পার্থক্য আছে। অবশ্য কিসেব পার্থক্য প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারল না স্ববজিৎ।

পবে হঠাৎ খেয়াল হল, নির্জন কবী থিয়েটারে বসে সে বাববার শুনতে পেয়েছে একটি মেয়ের কক্ষণ কান্না। পরে যা বুঝতে পেরেছে মঞ্চকথার বিলাপ। কিন্তু আজ প্রগতিমঞ্চেব নিশ্চরতার মধ্যে সেই কান্না ধ্বনিত হচ্ছে না। মনোযোগ সহকারে কান পেতে শোমবার চেষ্টা করল স্ববজিৎ। তবু, কিছু শুনতে পেল না।

তবে কি মঞ্চকথা কান্না ধামিয়েছে! সে কি খুশী হয়েছে এই নাটক দেখে! এই প্রথম একটা ক্ষীণ আশাব আলো দেখতে পেল স্ববজিৎ। দর্শকরা খুশী নাই বা হল, মঞ্চকথার মুখে যদি তাবা হাসি ফোটাতে পেরে থাকে, তাদের শ্রম কি সার্থক হয় নি?

পরের দিন কোন অভিনয় ছিল না, কিন্তু আগে থেকেই স্থির ছিল সন্ধ্যার সময় শিল্পীবা সব জড়ো হবে প্রগতিমঞ্চে। আলোচনা হবে প্রথম রজনীর অভিনয় নিয়ে। কথামত সকলে জড়ো হয়েছে, কিন্তু কেউই বিশেষ কথা বলছে না। কুন্তল একদিকে মুখ গাঁজ করে বসে ছিল, বলল, প্রথম দিনের রিঅ্যাকশান খুব উৎসাহজনক নয়, এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এখন দেখা যাক পরে কি হয়।

স্ববোধ হাজরা বলল, আমার মনে হয় সকলের এখন চিন্তা করা উচিত কি করে এ নাটককে দাঁড় করানো যাবে। এ থিয়েটারের প্রথম নাটকই যদি না চলে তা হলে আমাদের পক্ষে দাঁড়ানো খুব কঠিন হয়ে পড়বে।

অলক ঘোষও চুপ করে থাকে নি। সে বলেছে,

প্রয়োজন হলে কোন একটা আলোর খেলা দেখাতে সে প্রস্তুত, যা দেখতে অন্ততঃ দর্শকরা বারবার আসবে।

একটি কথাও বলে নি শুধু স্বরজিৎ। সে কালকের মত আজও অঙ্ককার প্রেক্ষাগৃহে পাঁয়চারি কবছিল। হঠাৎ সেইখান থেকে টেচিয়ে উঠে বলল, ভয় নেই ভাই সব, ক্রমে এ নাটক ধরবে। কয়েকটা দিন সময় চাই।

মঞ্চের উপর থেকে কুন্তল প্রস্থ কবল, হঠাৎ এ কথা তোমাব মাথায় এল কেন?

সে যে কান্না খামিয়েছে।

কে?

মঞ্চকর্তা।

কি বলছ আর্বোল-তাবোল?

স্বরজিৎ জোরাল গলায় বলল, দেখছ না, কাল থেকে আমি অঙ্ককারেব মধ্যে পাঁয়চারি করছি। শোনবাব চেষ্টা করছি সেই করুণ কান্না। যা একদিন আমাকে পাগল কবে তুলেছিল। কই, সে তো কাঁদছে না। তোমরা শুনতে পাচ্ছ কারুণ কান্না?

স্বরজিৎের কথা বুঝতে না পেরে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

স্বরজিৎ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল, আব ভয় নেই, আমি বলছি তোমাদের 'নতুন দিগন্ত' চলবে, প্রগতিমঞ্চ দাঁড়াবে।

স্বরজিৎ দ্রুত পায়ে মেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

চুপ করে বসে রইল আর সকলে।

কিন্তু আশ্চর্য! পনের দিন কাগজে একজনের মতামত বেকল 'নতুন দিগন্ত' সম্বন্ধে। তিনি নাট্যসমালোচক নন; রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে টিপ্পনি লেখেন মাত্র। কিন্তু তাঁর কলমেব জোরকে শ্রদ্ধা করে অনেকে। তিনি লিখেছেন, 'নতুন দিগন্ত' নাটকের প্রথম বজনীতে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমি একজন। আমি নাট্যবসিক, সমালোচক নই। নিছক কৌতূহলেব বশে টিকিট কেটে দেখতে গিয়েছিলাম আগে যেখানে গোয়াল-ঘর ছিল সেখানে থিয়েটার করা সম্ভব কিনা। আমি কিন্তু নাটক দেখে অভিভূত হয়েছি। অভিনয় দৃষ্টদৃষ্টি আলোকসম্পাত এবং সর্বোপরি নাটক সত্যিই নাট্যজগতে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

আমি প্রগতিমঞ্চকে এমন একটি অনন্যসাধারণ নাটক আমাদের দেখবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আব অস্বরোধ করছি তাঁদের, যাবা নাট্যবসিক, এ নাটকটি দেখতে ভুলবেন না।

সামান্য কয়েকটি লাইন, কিন্তু তাতে আশ্চর্য ফল ফলল। সেইদিনই বিকেলেব শোতে যথেষ্ট লোক সমাগম হল প্রগতিমঞ্চ—নাটক দেখে যারা বলে গেল : 'মন্দ হয় নি'।

এব পব আর বেশী কষ্ট করতে হয় নি, কয়েকটা শো হতে না হতেই দেখা গেল প্রগতিমঞ্চের দরজায় টাঙানো থাকে 'হাউসফুল' বোর্ড।

দলে দলে আসতে লাগল লোক।

কিন্তু লোক আত্মক বা না আত্মক, হাউসফুল হোক বা না হোক, অভিনয় থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেকটি সম্মান্য স্বরজিৎ গেছে প্রগতিমঞ্চ, ঘুবে বেড়িয়েছে সাজঘরে মঞ্চে প্রেক্ষাগৃহে। একাগ্রমনে কান পেতে শোনবার চেষ্টা কবেছে কোন করুণ বিলাপ ভেসে আসছে কি না। শুনতে না পেয়ে বাড়ি ফিরেছে নিশ্চিন্তমনে সব শেষে, সকলেব অলক্ষ্যে।

এ নিয়ে হয়তো অনেকে স্বরজিৎকে ঠাট্টা কবেছে।

এমন কি মাধবীও জিজ্ঞেস কবেছিল, দাদা, তুই বোজ অত রাত করে থিয়েটার থেকে ফিরিস কেন বল তো?

স্বরজিৎ স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিয়েছে, সব সময় সতর্ক থাকি, পাছে না মঞ্চকর্তার চোখে আবাব জল আসে। তা হলেই যে আমাদের সাধনা ব্যর্থ হবে রে। সোনার কোটোর মায়ায় ভুলে যদি মঞ্চকর্তাকে কষ্ট দিই, আমরাতো যে নিজেকেব অজানতে দৈত্যকুলে নাম লেখাব।

স্বরজিৎ এ কথা চিন্তা করেই ভয়ে শিউরে-উঠল। মাধবীর কাঁধের উপর সম্মুখে একটি হাত রেখে বলল, তাই তো ঠাকুরের কাছে বোজ প্রার্থনা করি, এ ট্রাজেডি-য়েন আমাদের জীবনে না ঘটে। তা হলে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। মঞ্চকর্তার মুখের হাসিটুকু যেন চিরদিন অম্লান রাখতে পারি।

স্বরজিৎের আন্তরিক প্রার্থনা স্পর্শ করল মাধবীর হৃদয়। চোখে তার জল এল—আনন্দের অশ্রু, তা সে গোপন করার মিথ্যে চেষ্টা করল না।

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার

সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপস্থাপন ॥

থি. মাস্কেটিয়ার্স [চার]

"It is permissible to violate history, on condition that you have a child by her."
—আলেকজান্দার দুমা।

সকালবেলাব সূর্য কখন মধ্যদিনের দীর্ঘ ছুস্তর মরু-পথ, 'ধু-ধু করা রোদদুরেব অর্থে সমুদ্র' পাব হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সন্ধ্যাব চিতায়, আর মিলিয়ে যাবাব আগে শেষবাবের মত দ্বিগুণতর দীপ্তিতে জলে ওঠা দিবাকরের বন্দনায় মুখর সন্ধ্যাসংগীত কখন নীরব হয়েছে রাত্রি নিশীথ হলে, আবার বাত্রির তিমির-গর্ভ থেকে কখন ভূমিষ্ঠ হয়েছে আর একটি সূর্যোজ্জ্বল স্বর্ণ-বর্ণ সকাল তার খবর জানে না কে সেদিন সমস্ত পৃথিবীতে; শুধু পারীর সেই অন্ধকার একফালি একখানা ঘর ছাড়া? দিবালোক-বঞ্চিত যে ঘবে দীপালোকে রক্তের অক্ষরে জন্ম নিচ্ছে ইতিহাসের 'মাছুষ' থেকে মাছুষের 'ইতিহাস': থি. মাস্কেটিয়ার্স।

আলেকজান্দার দুমার জীবনে সে এক দিন। বিচিত্র-গামী জীবননদে এসেছে প্রতিভার প্লাবন। জনপ্রিয়তার দাবি মেটাতে জনপদের ডাকে আব সাড়া দেবে না এখন সিদ্ধগামী সেই নদ। নদীর কানে পৌঁছে গেছে সমুদ্রের ডাক। দুমা বুঝতে পেরেছেন তাঁর হাতে তাঁব শ্রুটার কলম তুলে দেবার কারণ; তিনি এতদিনে খুঁজে পেয়েছেন তাঁর লেখক-জীবনের লক্ষ্য। পাদপ্রদীপের আলোয় লক্ষ করতালির ক্ষণকালীন উদ্ভেজনায় অথবা প্রতিপক্ষের সব কথা এক কথায় বন্ধ কবে দেবার মত বুদ্ধির বিজলীচমকে আর আস্থা নেই কুথাশিল্পীর।

তাই ক্যাপা খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই পরণপাথর এখন, যার স্পর্শে অনেককাল আগের মৃত কাহিনী পাবে

চিরকাল ধরে বাঁচাব অমৃত। মৈত্রেরী খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর প্রার্থনার উত্তর, 'যেনাহং নামতা শ্যাম তেনাহং কিম্ কুর্ষাম'। বিশ্বত দিনের পাণ্ডুব পাণ্ডুলিপিকে ইতিহাসের কবর খুঁড়ে তুলে এনেছেন নতুন করে সেদিন Auguste Maquet, আর তাকে উজ্জীবিত করছেন জীবনের পাণ্ডুলিপিকাব আলেকজান্দার দুমা। ক্ষণ-কালের ক্যানভাসে জন্ম নিচ্ছে চিরকালের ছবি; বিগত যুগের ভাসে ফুটছে অনাগত যুগের ফুল; ইতিহাসের 'মাছুষ' থেকে রূপ নিচ্ছে মাছুষের অপরূপ 'ইতিহাস': 'থি. মাস্কেটিয়ার্স'।

আলেকজান্দার দুমার জীবনের সেই এক দিন:

"Tirelessly he worked at his novel—from seven in the morning until seven at night—."

তখন স্খাভূষণ বলে কিছু নেই। তখন রমণীয় আয়োদপ্রমোদ বলে কিছু নেই। নেই দিনরাত্রি বলে কিছু। অর্জুনের চোপ থেকে সরে গেছে বিশ্বচরাচর; জেগে আছে কেবল মাছের চোপ তীরবিদ্ধ হবার অপেক্ষায়। তখন দুমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে: "... he waved a greeting with his left hand and went on writing with the other."

লেখা নয়। অক্ষরের অক্ষোহিণীর সঙ্গে যেন গাঙীবীর রণ: "He worked always at high tension. But it was the tension of a man at play. He lived with his characters, he talked to them, he jested with them."

এ কথা যে কতদূর সত্য তাঁর একটি প্রমাণই পর্যাপ্ত:

"One day an English visitor heard an outburst of laughter issuing from Dumas' workroom 'I shall wait until your master is alone,' said the visitor to the servant."

'But my master is alone,' replied the servant. 'He is merely enjoying a bon mot that he has heard from one of his characters'."

'থি মাস্কেটিয়ার্স'র পাঠকের কাছে এ প্রমাণও বাহ্যিক, কারণ ওই বই যে পড়বে, যতবার পড়বে, 'থি মাস্কেটিয়ার্স' রচয়িতার এই ছবির সত্যতা ততবার তার হর্ষে বিষাদে উদ্গাদনায় আতঙ্কে কখনও, কখনও বিশ্বয়ে বিক্ষারিত চোখে অনিবার্য ধরা পড়বেই।

'থি মাস্কেটিয়ার্স'র কতটুকু কাহিনী, আব কতখানি কল্পনা, কতটুকু ইতিহাসের মৃত অধ্যায়েব ওপর কতখানি সৃষ্টির অমৃত-সিঞ্চন—কে বলবে? কারণ:

"As for himself, he cared little for the dead facts but he cared a great deal for the living truths of history." [Living Biographies of Famous Novelists]

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ, দুমার জীবনে লাল অক্ষরে চিহ্নিত বৎসর। যদিও দুমার সাহিত্যজীবনের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে এর পনেরো বছর আগেই তবুও এ বৎসরটি নানা কারণে অবিস্মরণীয় দুমার পক্ষেও সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বৎসর নিশ্চয়ই। যে দুটি বইয়ের জন্তে দুমার জগৎজোড়া জয়জয়কার আজও অব্যাহত, 'থি মাস্কেটিয়ার্স' এবং 'দ্য কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো', এক চিরবোম্বাষ্টিকের স্বপ্ন আর সাধনা দিয়ে গড়া সেই দুই চিবন্তন রোমান্সেব জন্মই ওই একই বৎসবে—১৮৪৪। তাঁর জীবনীকারও বলেছেন যে:

"It was not until 1844, after he had been famous for fifteen years, that Dumas became, by the production of two works, the international figure we know so well today. The works in question were Les Trois Mousquetaires and Le Comte de Monte-Cristo" [A. Craig Bell]

দুটি বই-ই একই সঙ্গে একই বছরে লেখা চললেও, 'থি মাস্কেটিয়ার্স' প্রকাশিত হয় আগে। 'থি মাস্কেটিয়ার্স'র খ্যাতি-বিস্লেষণের মধ্যেই পাওয়া যাবে এই রোমান্সের চিরন্তন মহিমা কোথায়—এই জিজ্ঞাসার জবাব। সে জবাব দেবার আগে এর জন্মের একটু

ইতিহাস এখানে বিবৃত করলে এই বই কেন সাহিত্যের বিষয় তা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। সে ইতিহাস এর ঐতিহাসিক খ্যাতির ইতিবৃত্তের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর হবে না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসেব স্রষ্টা আলেকজান্ডার দুমার সবচেয়ে প্রিয় পাঠ্য ছিল, ইতিহাস। অতীতের ভগ্নাবশেষের ওপর নতুন ইমাবত রচনার স্বপ্নে আবুল দুমা দু হাতে হাতড়ে ফিরতেন পুরাতন ইতিহাসেব পাতা। এমনই পাতা ওলটাতে ওলটাতে একদিন বেরিয়ে পড়ল, 'Memoires de d'Artagnan of Gatien de Courtiliz' এই বইতেই 'মাস্কেটিয়ার্স'দের নামের সঙ্গে দুমার প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

আলেকজান্ডার দুমার 'থি মাস্কেটিয়ার্স'র সংখ্যাভীত এবং 'Memoires de d'Artagnan'-এর পরিমিত পাঠকের প্রায় কারুরই বিদিত নেই এ তথ্য যে এই d'Artagnan একজন সত্যিই ছিলেন একদিন, রক্তমাংসে বেঁচেছিলেন একদা লুই ফোর্টিন্থ-এর কালে, এবং তিনি সত্যি সত্যি সংস্পর্শে এসেছিলেন থি মাস্কেটিয়ার্সের সঙ্গে ["...knew three veritable Musketeers called Athos, Porthos, and Aramis,..."]

Courtiliz-এব এই Memoires de d'Artagnan থেকেই আলেকজান্ডার দুমা গড়ে তুলেছেন তাঁর, Les Trois Mousquetaires। দুটির মধ্যে সেই ব্যবধান—যে দুস্তব ব্যবধান ট্যালেন্ট এবং জিনিয়াসের, আর্টিসান এবং আর্টিস্টের মধ্যে চিরদীপ্যমান।

তবুও Courtiliz-এর Memoires de d'Artagnan-এর কাছে যত নগ্নই হোক দুমার 'থি মাস্কেটিয়ার্স'র কিছু ঋণ আছেই। Courtiliz-এব বইয়ের থি মাস্কেটিয়ার্সের নাম তিনটি এবং Milady-অধ্যায়টুকু তাঁকে আকৃষ্ট করে। Courtiliz-এর বই এবং তাঁর নিজের বইয়ের প্রাথমিক খসড়া দুমা পাঠিয়ে দেন দুমার ঐতিহাসিক উপন্যাসের মালমসলার ভাণ্ডারী Maquet-এর কাছে। Maquet এ বইয়ের মধ্যে অসাধারণ কিছু সম্ভাবনা দেখতে পান নি। দুমা পেরেছিলেন যে সেকথা বলতে গিয়ে তাঁর জীবনীকার বলেছেন:

"But it was Dumas who welded them into the plot of his story, Dumas who ante-dated d'Artagnan's birth by sixteen years, Dumas who transformed Athos, Porthos and Aramis into three friends, not three brothers as in Courtilz, who drew the forceful portrait of Richelieu, who found in the vague, anonymous 'pretty landlady' of Courtilz, Constance Bonacieux, who created from pure imagination M Planchet, Grimaud, Mousqueton and Bazin, who to the vague outlines and dry bones of Courtilz's Athos, Porthos, Aramis and d'Artagnan gave a second life of such vitality that they have taken their place among the international figures of literature—Dumas, in a word, who was the soul and genius of the work" [Alexander Dumas—A Craig Bell]

প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাকেই সোনা কবে দেয় এ কথা নিছক শোনা কথা হয়েই থাকত জগতে যে কটি বিবল দৃষ্টান্ত ছাড়া দুমার 'তু থি মাস্কেটিয়ার্স' তাদের অতীত নিশ্চয়ই।

Courtilz ছাড়া যে আর একজনের কাছেও দুমার ঋণ শোধ হবার নয় তিনি হলেন Siecle-পত্রিকার সম্পাদক Desnoyers। দুমা তাঁর বিখ্যাত এই উপন্যাসের নাম দেন প্রথমে: Athos, Porthos et Aramis। Desnoyers একটি চিঠিতে দুমাকে জানান:

"I propose the less ambitious but much more promising title of 'Trois Mousquetaires'"

দুমা তাঁর উত্তরে তৎক্ষণাৎ লেখেন:

"I am all the more of your opinion to call the romance 'Trois Mousquetaires' since, there being four, the title will be absurd, which promises for the book the greatest succes!"

ক্রেগ বেলের মন্তব্যটিও এ প্রসঙ্গে মনে রাখবার মত: "It is strange to reflect that the now celebrated title was not Dumas's own, but the haphazard suggestion of a dubious editor."

গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাক সে তার যা দেবার

সেই স্বভাবই সমানই দেবে; তবুও, 'তু থি মাস্কেটিয়ার্স',— 'তু থি মাস্কেটিয়ার্স' নাম না নিয়ে অথ যে কোনও নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে তাঁ সাহিত্যের ইতিহাসে আর একটি নাম যুক্ত করত মাত্র, কিন্তু সে নাম ইতিহাস হয়ে উঠত কি?

Siecle-পত্রিকায় দুমার Les Trois Mousquetaires শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সাদা জাগাল পাবীর পৃথিবী জুড়ে। কাফে, থিয়েটার, সালোয় কান্নর সঙ্গে কান্নর সাক্ষাৎমাত্র সেই এক কথা: "Have you read the new serial in the Siecle?" বালজাক, দুমার সবচেয়ে সাজ্জাতিক সাহিত্যিক বৈবী, মাদাম হান্স্কাকে লেখা চিঠিতে স্বীকার করেছেন, "...that he had spent the whole day reading it" Mery-র মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য: "If there exists a modern Robinson Crusoe on some desert island to-day, wager for certain that at this moment he will be reading Les Trois Mousquetaires under the shade of his parasol of parrot's feathers"

দুমার নিজের কেমন লেগেছিল এই বই তা নিয়েও গল্প আছে যে মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তাঁর ছেলে তাঁর হাতে 'তু থি মাস্কেটিয়ার্স'র একটা কপি দেখে প্রশ্ন করে "How do you like it, father?" বৃদ্ধ দুমা তাব উত্তরে নাকি বলেছিলেন: "It'll do. It's good"

দুমার 'তু থি মাস্কেটিয়ার্স'র বয়স শতাব্দী অতিক্রম করে গেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে 'তু থি মাস্কেটিয়ার্স'কে অতিক্রম ক্রবতে পারে নি কেউ। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর থেকেই জানা যাবে সেই আর এক জিজ্ঞাসারও জবাব, 'তু থি মাস্কেটিয়ার্স' কোন গুণে বিশ্বসাহিত্যের বিপুল বিশ্বয়?

ক্রেগ বেল তাঁর 'আলেকজান্ডার দুমা'-গ্রন্থে সে প্রশ্ন স্বয়ং তুলেছেন: "The romance has lost no whit of its magic to-day, a hundred years have not aged by a fraction this Peter Pan of books. It is one of those novels that the world has taken to its heart. The Gascon Musketeer-to-be, riding on his lean horse

into 'Meung' that month of April of the year of grace 1625, rode into immortal literature 'at once and for ever Why?'"

এ জিজ্ঞাসা যার তিনিই বলছেন আবার : "There are many answers, if the question needs an answer."

তার 'উত্তর' বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে যে আভিভেকার হিসেবে এর জুড়ি নেই জগৎ জুড়ে ["Les Trois Mousquetaires is first of all, to take it at its least value, an unsurpassed tale of adventure."], দ্বিতীয়তঃ, "It struck a new note, formulated a new technique for the historical romance" কিন্তু প্রধানতঃ "The swashbuckling of the Musketeers, idolised by the bourgeois and feared by their husbands, their duels and escapades at all places and times on any pretext, their living on their mistresses, frequently women of high rank as was the mistress of Aramis, the open antagonism between the Musketeers and the guards, the secret rivalry of the king and the cardinal—all these features of that day are made to live before us in these enchanted pages."—এই কাবণে 'তু থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' 'immortal literature'।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'রামায়ণ' চিরদিনের চিত্র সে কি রাম-রাবণের যুদ্ধের কারণে? 'রামায়ণ' আমাদের মহৎ সম্পদ সে কি বীর হুম্মানের লঙ্কাকাণ্ডের কারণে? কখনই না। নিষ্ঠুর-পিতৃসত্য পালনের জন্তে বনবাসের পর নিষ্ঠবতর লোকসত্য পালনের কাবণে রীমের জীবনে একমাত্র সত্য যে নারী, মিথ্যা অগ্নিপরীক্ষার অসম্মানের লক্ষ্যবীন সেই সীতার জন্তে নিঃসঙ্গ রীমের চোখে বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া ফেলেছে বলেই রামায়ণ করেছে আমাদের হৃদয় হরণ।

হুম্মার সর্মালোচক নয়। হুম্মাকে যদি জিজ্ঞেস করা যেত 'তু থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' কেন "good" তা হলে হুম্মার উত্তর "ইত' যা, অবধারিত উত্তর, তা' তিনি জীবদ্দশাতেই দিয়ে গিয়েছিলেন তার সাহিত্যদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে : "What's any art worth that doesn't make people gay?" অর্থাৎ যে লেখা পড়ে আনন্দে অবধি থাকে না শুধু সেই সৃষ্টিই বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কালের এক কথাতিক; কিন্তু এহ বাহু।

অন্তহীন আনন্দের উৎস, অনন্ত বেদনার নিবারণ, আলোকজান্দার হুম্মার এই 'তু থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'। হুম্মার এই উপগ্রাস মহৎ, যে কারণে সেক্সপীয়ারের নাটক মহৎ। দুজনেই মূল উপাদানের জন্তে হাত বাড়িয়েছেন ইতিহাসের অন্ধকার ভূগর্ভলোকে। সেখান থেকে তুলে এনেছেন যা তা ইতিহাসের নীবস তথ্য নয়, জীবন্ত মাহুষ। দুজনেই জানতেন যে ইতিহাসকে মানবেতিহাসেব সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে তা ইতিহাসেরই সৃষ্টি হয়, কিন্তু সৃষ্টিব ইতিহাসে তার মূল্য কানাকড়িও হয় না।

ইতিহাসের মাহুষ থেকে মাহুষের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সেক্সপীয়ার 'জুলিয়াস সীজারে', হুম্মা 'তু থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'।

থ্রি মাস্কেটিয়ার্স সকল কালের মাহুষের মধ্যে যুমিয়ে আছে যে রূপকথার মাহুষ তারই প্রতীক। মাহুষ যা চায় থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের অভিযান তারই জন্তে। যা চায় মাহুষ তা পায না—এই কাবণেই যেমন মাহুষের জীবন-মহাকাব্য 'ট্রাজেডি' নয়, 'মাহুষের জীবন মহৎ ট্রাজেডি'—তার কাবণ যেমন কখনও কখনও যখন সে যা চায় তা পায এবং মুহূর্তে উপলব্ধি করে যা পাবার জন্তে তার এত দেওয়া তাব দাম এত বেশী নয়,—এই বেদনাই, হুম্মার থ্রি মাস্কেটিয়ার্স তেমনই অন্তহীন আনন্দের কমেডি নয় থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের দিগ্বিজয় সঙ্গেও, বরং অনন্ত বেদনার নিবারণ 'তু থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' দিগ্বিজয়ের মুহূর্তেই দিগ্বিজয়ের অন্তঃসারশূন্যতার স্বপ্নভঙ্গের সূচনা করে। এই কারণে বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ।

'হাসি'র চোখে জল হুম্মা বয়ে আনতে পেরেছেন বলেই এই বইয়ের শেষে পাঠকের অশ্রুসিক্ত হৃদয়াকাশ জুড়ে দেখা দেয় সাতরঙা হাসির রামধনু।

আলেকজান্দার হুম্মা জয় এবং তাঁর 'তু থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'ের দিগ্বিজয়ের কারণ একই। ভিত্তর হুগো সম্ভবতঃ সে কথা স্বরণে রেখেই বলেছিলেন :

"He is not France's, he is not Europe's ; he is the world's !"

এক প্রতিভার সম্পর্কে সমকালীন আব এক প্রতিভাবানের এই উক্তি এতটুকু অত্যাক্তি নয়।

[ক্রমশঃ]

গ্রন্থ - পরিচয়

নব-মেঘদূত : শ্রীশান্তি পাল। রঞ্জন পাবলিশিং
হাউস, ৫৭ ইল্ড বিল্ডিং, রোড; কলিকাতা-৩৭। দেড় টাকা।

‘নব-মেঘদূত’ সুপরিচিত কবি-শ্রীশান্তি পালের
সর্বাধুনিক কাব্যসংকলন। কাব্যগ্রন্থখানিতে বিচিত্র
স্বরব কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রথম সাতটি কবিতায়
কবির মনের স্বপ্নাভিসার ও রোমান্টিক উৎকর্ষের বর্ণনায়
অভিব্যক্তি ঘটেছে। ‘ধরিত্রীর স্মৃতি’ কবিতায় কবির
মর্ত্যপ্রীতির সক্রিয় পরিচয় পাওয়া যায় :

জীবন-দেবেরে যবে করিব বরণ;

এ-পারেব মায়া যেন হয় মোব প্রথম চরণ।

“তাবাব দীপা” “শান্তী” “অভিসারিকা” “স্বপ্নছায়া”
প্রভৃতি কবিতা প্রেম ও সৌন্দর্যমুগ্ধতাব, সার্থক লিরিক
শব্দধ্বনি ও বর্ণচৈতন্য এক-একটি অপরূপ ছবি এঁকেছে।
কবির এক একটি বিষময় রূপরচনা মৌলিকতায় ও শিল্প
কারুকার্যে ভাসব হয়ে উঠেছে। এমনই একখানি ছবির
উদাহরণ দেওয়া যাক :

বাজায় শাঁখ-কাঁকনগুলি,

প্রবাল-হাবে কাঁপন তুলি,

ভাগর চোখে-ঝিলুক-হাসি হেসে

মিলানে-গেল শেষে।

“শাঁখ-কাঁকন” “প্রবাল-হার” “ঝিলুক-হাসি” প্রভৃতি
শব্দের ভাস্কর্য্যে একটি তুলনামূলক শিল্পমূর্তি রচিত হয়েছে।
“আকাশ-সদ্বীত” কবিতাটিকে সংকলনটির শ্রেষ্ঠ কবিতা
বলা যায়। এই দীর্ঘ কবিতাটি বিচিত্র ভাবানুভূতি
লীলায়িত। শব্দধ্বনি, অলঙ্কৃত পদবিছার ও বর্ণের
প্রাবনে কবিমানসের কল্প-অভিসার সূচিত্রিত।

‘সপ্তপর্ণী’-অংশে; যোলাটি কবিতা স্থান পেয়েছে।

এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে
লিখিত হয়েছে। বাদ্যবিক কবিতাগুলি প্রধানতঃ পল্লী-
প্রকৃতির গাথা। এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় কবি শান্তি
পালের বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা সুবিদিত। ছন্দের চাতুর্য্য ও
শব্দধ্বনির উল্লাসে কবিতাগুলি বিশিষ্ট। ‘তিন ফসলের
গান’ পর্যায়ের কবিতাগুলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

কৃষিপ্রধান ভারতভূমির মর্মবাণী কবিতাগুলোর মধ্যে
ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কৃষকদের মুখের ভাষা ছড়ার ছন্দে
জীবন্ত হয়েছে। চলতি ভাষার শব্দধ্বনিতে গ্রাম্য লোক-
জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্য্যের
ও প্রসন্ন জীবনের এই প্রবীণ কবিকে অভিনন্দন জানাই।
প্রকাশক ও তাঁর সন্মান ও স্মৃতিতে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

রথীন্দ্রনাথ রায়

দশটা-পাঁচটা : শ্রীমধব রায়। প্রান্তিক পাবলিশার্স,

৬ বক্সিং চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

বাঙালী-মধ্যবিত্ত সমাজে যে অংশটি চাকুরিজীবী সেই
অংশের জীবনদর্শনে অল্পপ্রাণিত এই নাটকটি। দশটা-
থেকে পাঁচটা—এই সাত ঘণ্টা চাকুরিজীবীদের আশা-
আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, সফলতা ও নৈরাশ্য দ্বারা রঞ্জিত
থাকে। জীবনটাই যে নাটক তাহা অল্পভব করিবার
আসর প্রতিটি অক্ষি। এবং সে আসরের কুশীলব
কর্মচারীরা। মনুষ্যত্বের উত্থানপতন, স্বার্থের ঘাত-
প্রতিঘাত—এই সাতটি ঘণ্টায় যে রূপ পরিগ্রহ করে,
তাহারই একটি সার্থক চিত্র আঁকিয়াছেন তরুণ নাট্যকার
শ্রীমধব রায়-আলোচ্য এই নাটকটিতে। নাটকের ঘটনা,
দৈনন্দিন অক্ষি-জীবনের মধ্য দিয়েই স্তরে স্তরে বিকশিত
হইয়াছে। এই সব ঘটনা কাহারও অজানা নয়; কিন্তু
পরিবেশনের কুশলতায় সকলের জানা এই ঘটনাগুলিই
উৎকর্ষ ও কোতূহলের মধ্য দিয়া পাঠক ও দর্শককে
ভারাইয়া তোলে; চিন্তার খোবাক যোগায়। নাটকটির
সার্থকতা এইখানেই।

গ্রন্থটিতে আরও একটি নাটিকা রহিয়াছে; ‘প্রেম নয়’।
মিষ্টি একটি প্রেমের কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে ‘ভদ্রলোক
হওয়ার যেকোনো জালা’ তাহারই একটি রঙীন একাঙ্কিকা।
ইহা অভিনয়ে যে চিত্তাকর্ষক হইবে—তাহা নিঃসন্দেহে
বলা যায়। নাট্যকারের পবিত্র নাট্যবদানের জ্ঞান
উৎসুক রহিলাম।

মন্মথ রায়

সা হি তে র হা টে

ফকড়ভুল্লম্

ফকড় কাহাকে বলে তাহা আপনারা বোধ হয় যথার্থ জানেন না। পূর্বে আমিও জানিতাম না, ভাগ্যক্রমে হঠাৎ জানিয়াছি। ফকড় একজাতীয় ভূত। মামদো ভূত এবং গেছো ভূতের কিঞ্চিৎ উপরেই ইহাদের স্থান। ইহার অতিশয় নিরীহ, ভয় এবং পরোপকারী। ভূত-সমাজের ইহারাই শিরোমণি, ভৌতিক কালচারের ইহারাই ধারক-বাহক।

শ্রীখোশনবীস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার না হইয়াও একরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্ব কিরূপে অবগত হইলেন, এক্ষণে তাহাই বলিব।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আত্মবাদের পর রতিভর কালার্টার গলাধঃকরণ করিয়া সার্টিফিকেট-ধরা অবস্থার একখানি অদ্ভুত নবেল লইয়া শুইয়া ছিলাম। পড়িতে পড়িতে কখন নিজা আসিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ কাহাব যেন ডাকে তজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম, একে যেন ডাকিতেছে : শ্রীখোশনবীস, উঠ। দেখ, আমি আসিয়াছি।

চোখ মেলিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, সম্মুখে এক অতি অপরূপ মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। মূর্তির উচ্চতা আড়াই হস্তের অধিক হইবে না। মস্তকটি গর্দভের গ্রায়— দুইটি স্ববহু মনোবর্ম কর্ণশোভিত। চারিখানি হস্ত, জালার গ্রায় উদর, এবং অশ্বের গ্রায় দুইখানি বলিষ্ঠ পা। মূর্তির উভয় কর্ণের স্ববহু গহ্বরে প্রচুর পরিমাণ তুলা গুঁজিয়া উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; এবং পৃষ্ঠদেশ অতি মজবুত জোড়া-কুলার বর্ম দ্বারা স্বরক্ষিত।

বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া বহিলাম।

দেখিয়া রাসভ-কণ্ঠে মূর্তি বলিল, কি দেখিতেছ ?

উত্তর কবলাম, আপনাকে।

কেন, আমাতে দেখিবার কি আছে ? কি দেখিতেছ ?

সবিনয়ে বলিলাম, দেখিতেছি আপনার মনোহর কাস্তি।

শুনিয়া মূর্তি প্রফুল্ল হইল বোধ করিলাম। মূলানুগুন—

দস্তপাটি আকর্ণ বিকশিত করিয়া ঈষৎ হাস্ত করিল। বলিল, তা যথার্থ বলিয়াছ। আমার রূপ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়। কত রঙ্গললনা যে দেখিয়া মুহূর্ত গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

বলিলাম, তাহা সত্য। কিন্তু মহাশয়ের পরিচয় ?

তিনি বলিলেন, আমি ফকড়।

ফকড় !—আমি বিস্মিত হইলাম।

তিনি ততোধিক বিস্ময়ে বলিলেন, হ্যাঁ, ফকড়।

ফকড় চেন না ?

আমি বলিলাম, অবশ্যই চিনি। ফকড় না চিনিলে বঙ্গজন্মে আব চিনিব কি। তবে আমাদের পরিচিত ফকড়ের সহিত আপনার চেহারায় মিলিতেছে না বলিয়াই বিস্মিত হইতেছি।

তিনি বলিলেন, হইবারই কথা। তোমরা ফকড়ের যে-রূপ দেখে উহা তাহার নকল রূপ। আমিই আসল ফকড়, আমার এই রূপই আসল রূপ।

বলিলাম, তাহা কিরূপে হইবে ? বঙ্গদেশে এক্ষণে যে-সকল ফকড় দেখিতেছি, উহার একেবারেই আদি ও অকৃত্রিম, উহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ভেজাল নাই।

শুনিয়া ফকড় কেবল এক চোখ টিপিয়া নিগূঢ় রহস্তে একটু মুচকি হাসিলেন। তারপর বলিলেন, হে শয্যাশায়ী মহুয়া, ওইখানেই রহস্ত।

আমি। সে কিরূপ ? মহাশয়, দয়া করিয়া বিবৃত করুন।

ফকড়। তবে শুন। আমরা ফকড়—আমরা ভূত।

আমি। ভূত ! মহাশয় কী বলিতেছেন !

ফকড়। যথার্থই বলিতেছি, আমরা ভূত।

আমি। কিন্তু ভূত হিসাবে আপনার নাম তো কখনো শুনি নাই। মামদোভূত, গেছোভূত, মেছোভূত ইত্যাদি ভূতের কথাই এতাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। ফকড়-ভূতের নাম এই প্রথম শুনিলাম।

ফকড়। না শুনিবারই কথা। পূর্বে আমরা পৃথিবীতে

থাকিতাম না, আমাদের নিবাস ছিল মঙ্গলগ্রহে।

পৃথিবীতে আমরা অতি অল্পদিনই আসিয়াছি, এবং
এক্ষণে কেবল বঙ্গদেশেই বাস করিতেছি।

আমি। কিন্তু ভূতকুলতিলক, মঙ্গলগ্রহ ত্যাগ কবিয়া
আপনাদের পৃথিবীতে আগমনের হেতু কি?

ফকড়। হেতু অল্প-কিছু নয়, কেবল তোমাদিগেব
মঙ্গল। তোমাদিগের মঙ্গল করিবার জন্তই আমরা
পৃথিবীতে আসিয়াছি।

আমি। আপনাদিগেব অপাব করুণা। কিন্তু
আপনারা আমাদের কি মঙ্গল করিতেছেন তাহা তো
বুঝিতেছি না।

ফকড়। তুমি না সাহিত্য-ব্যবসায়ী?

আমি। আজ্ঞা, হাঁ।

ফকড়। তবুও বুঝিতেছ না?

আমি। আজ্ঞা, না।

ফকড়। এক্ষণে তোমাদিগেব বঙ্গদেশে শিল্প-সাহিত্য
সকল কাহার রচনা করিতেছে?

আমি। অল্পাল্প শিল্পের কথা সবিশেষ জানি না,
তবে সাহিত্য রচনা কবিতেছেন বহু ব্যক্তি। অবধূত,
জবাসন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিনী,
মনোজ বসু, প্রতিভা বসু, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রভাবতী
দেবী সরস্বতী হইতে শুরু করিয়া বিমল মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র,
বাণী বায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য পর্যন্ত সকলেই
লিখিতেছেন।

ফকড়। (ফিক্ কবিয়া হাসিয়া) হায় রে অবোধ,
তুমি এখনও স্বপ্নলোকে আছ।

আমি। কেন?

ফকড়। আসলে কেহই কিছু লিখিতেছেন না।
এক্ষণে বঙ্গদেশে যাহা-কিছু রচনা হইতেছে, তাহা সকলই
আমাদের কাজ।

আমি। উহা কিরূপে হইবে?

ফকড়। উহা হইয়াছে, উহা হইতেছে।

আমি। কিন্তু কিরূপে?

ফকড়। তবে শুন—সকল বহুস্ত তোমাকে খুলিয়া
বলি। আমরা ফকড়—ভূত-সমাজের আমবাই শিবোমণি,
ভৌতিক সংস্কৃতির আমরাই ধারক-বাহক। সকল সাহিত্য-
শিল্পেই আমাদের জন্মগত অধিকার। আমরা যাহা বচনা

কবি তাহাই কাব্য, তাহাই নবেল, তাহাই রম্যরচনা।

আমরা কাগজের বুকে কালি ঢালিলেই উচ্চস্তরের সাহিত্য
হয়, যুগান্তকাব্য অবদান হয়। আমরা যাহা রচনা করি
তাহা কেহ কখনও লিখে নাই, কেহ-কখনও লিখিবে না,
কেহ কখনও লিখিতে পারিবে না।

বলিয়া ফকড়মহাশয় একটু থামিলেন, একটু দম্
লইলেন। তারপর আবার বলিলেন, আমরা ভূত বটে,
কিন্তু আমরা বড় দয়ালু। আমাদের হৃদয় বড়ই কোমল,
বড়ই স্পর্শকাতব। অপরের দুঃখ দেখিলে আমরা কিছুতেই
স্থির হইয়া থাকিতে পারি না—তাহার মঙ্গলের জন্ত
আমরা প্রাণ পণ কবি। তোমাদিগেব জন্তও এক্ষণে
তাহাই কবিয়াছি।

আমি বলিলাম, কিরূপ?

ভূতমহাশয় বলিলেন, তাহাই বলিতেছি, শুন।
আমাদিগের যিনি প্রধান, অর্থাৎ রামফকড়, তিনি একদিন
আমাদের সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা সকলে
সমবেত হইলে তিনি বলিলেন, তাইসব, কিছুদিন পূর্বে
বেড়াইতে বেড়াইতে পৃথিবীতে গিয়া পড়িয়াছিলাম।
সেখানে দেখিলাম, বঙ্গ-নামক একটি দেশ আছে; এবং
সে দেশের অধিবাসীগণ আকৃতি-প্রকৃতিতে অনেকটা
আমাদিগের ন্যায়। কিন্তু উহার বড়ই পশ্চাৎপদ,—শিল্প-
সাহিত্যে আমাদিগের ন্যায় অগ্রসব হইতে পারে নাই।
উহার এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনকে
বড় লেখক বলিয়া মনে করে, উহার এখনও পর্যন্ত কাঁচা
খিস্তিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া মনে করিতে পারে না।
যদিও প্রতিভাবান ছ-একজন ফরাসীয় পানীয়ের ঝোঁকে
মাঝে মাঝে উল্টা স্বব গাহিয়াছেন, তবুও সাধারণভাবে
বঙ্গজগণের সাহিত্য বড়ই পশ্চাৎপদ। সেইজন্ত, আমি
ভাবিতেছি—আমাদের উচিত বঙ্গজগণকে সাহায্য করা।
বন্ধুগণ, আমরা সুসভ্য সংস্কৃতিশ্রেষ্ঠ ফকড়-বংশোদ্ভূত।
জগতের উদ্ধারের জন্তই আমাদিগেব জন্ম। [এই স্থানে
চটাপট করতালি ধ্বনি উঠিল, এবং সমবেত ফকড়গণের
সাধু সাধু রবে সভাস্থল পরিপূর্ণিত হইল।] বন্ধুগণ,
পশ্চাৎপদ বঙ্গজগণকে আমরা উদ্ধার না করিলে আর কে
করিবে।

এই পর্যন্ত বলিয়া ফকড় মহাশয় থামিলেন। বলিলেন,

এক গেলাস জল খাওয়াইতে পার ? বকিয়া বকিয়া গলা শুকাইয়া গিয়াছে।

বলিলাম, অবশ্যই।

টেবিলের উপর জল-ঢাকা ছিল। গেলাস আগাইয়া দিলাম।

নিঃশেষে জল পান করিয়া ভূত মহাশয় গেলাস বাথিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম। মহামতি বামফকডের এবং বিধ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের চক্ষে জল আসিল, নাসিকায় দীর্ঘনিশ্বাস আসিল। কিয়ৎকাল সভাস্থলে কেবল ফৌস ফৌস শব্দ হইতে লাগিল। অশ্রুজলে একটি স্ববৃহৎ দীঘির সৃষ্টি হইয়া গেল—তাহাতে পাঁচজন ফকড ডুবিয়া মরিল। যাহা হউক, আমরা সকলে স্থির করিলাম—বঙ্গজগণের কল্যাণ কবিত্তে হইবে। যদি তাহারা উহাতে আগ্রহশীল না হয়, যদি উন্নতিবিধানে বাধা দেয়, তবে উহাদের ঘাড়ে চাপিয়া জেব কবিয়া উন্নতি কবিয়া দিতে হইবে।

ফকড মহাশয় বলিয়া চলিলেন : এইরূপ স্থির কবিবার পর লিঙ্গশরীর ধারণ করিয়া আমরা দলে দলে ভূতলে

অবতীর্ণ হইলাম। উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া তাহাদের ঘাড়ে ভর কবিলাম, এবং তাহাদের দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি কবাইয়া লইতে লাগিলাম। তাহার ফল যাহা হইয়াছে, তাহা দেখিতেই পাইতেছি—বঙ্গসাহিত্য চারিদিক হইতে পূর্ণ হইয়া বর্ষাকালে পাইকপাড়ার পথপার্শ্বস্থ বিখ্যাত নর্দমার দ্বায টলটল কবিত্তেছে।

বলিলাম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ফকড মহাশয়, উহা যে আপনাদেবই কীর্তি, তাহা কিরূপে বুঝিব ?

ফকড বলিলেন, আমাব দিকে তাকাইয়া দেখ।

তাকাইলাম।

ফকড প্রশ্ন করিলেন, কি দেখিতেছ ?

বলিলাম, দেখিতেছি, আপনি লক্ষণ-প্রাণীশ্রেষ্ঠ অতিবুদ্ধি রাসভের দ্বায আপনার মস্তক।

ফকড। তবেই বুঝিতেছি, বঙ্গসাহিত্যের এক্ষণে যে-সকল অতুলনীয় সৃষ্টি হইতেছে, উহা আমাদিগেরই কর্ম। কেন-না, এইরূপ অসামান্য ধীশক্তি সাহায্য ব্যতীত এই-সকল মণি-মাণিক্যতুল্য সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টি সম্পূর্ণই অসম্ভব।

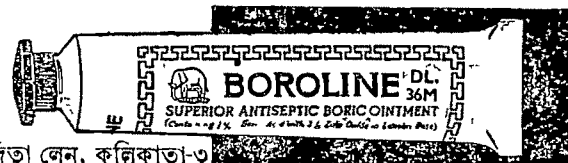


মরুত আমার কৈশল্য বনে...

উৎসবেব আগমনী জানাষ সোণালী
বোধ আব সাদা মেঘ। এই খুসী আমরণে
প্রাণ ভবে মেতে উঠতে হ'লে নিজেকেও
সাজিবে তুলুন বীজাণুনাশক বোরোলীন
ফেস ক্রীম মেখে। আপনাব মুখত্ৰী অগ্নান
ও ত্বকেব স্বাভাবিক লাবণ্য অটুট থাকবে।

বোরোলীন ভেষজ-গুণ-
সম্পন্ন
পরম প্রসাধন

বোরোলীন প্রস্তুতকারক এবং নতুন ফাউণ্ডেশন ক্রীম,
লোমনাশক ও এ্যান্টিবিন্কেল ক্রীম শীগ্গিবই রাজারে পাবেন



জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

বলিলাম; তাহা বটে।

ফকড়। আবাব তাকাও।

তাকাইলাম।

ফকড়। কি দেখিতেছ?

আমি। দেখিতেছি, আপনার হস্ত চাখিখানি।

ফকড়। তাহা হইলেই বুঝিতেছ, বঙ্গজ লেখকগণের

সকল রচনাই আমাদিগের কীর্তি। কেননা, বঙ্গীয়

লেখক সকলেই মাসে মাসে যে-হাবে নবল গ্রন্থ করেন,

উহা কোনমতেই দুইখানি হস্তের কর্ম নহে।

বলিলাম; তাহা যথার্থ।

ফকড়। পুনরায় চাহিয়া দেখ।

দেখিলাম।

ফকড়। কি দেখিতেছ?

আমি। দেখিতেছি, আপনি উদরদেশে ভূমাব সাধনা করিয়াছেন।

ফকড়। উহাতে আর কিছুই নাই, কেবল পচা

পাক। ওই পাক হইতে অবিরত যে বাষ্প উঠিতেছে,

উহা আমার মস্তকে উঠিয়া অবিরত সৃষ্টি-প্রতিভাকে

উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। এক্ষণে বঙ্গীয় লেখকগণের

রচনায় যে-এত পাকের গন্ধ পাওয়া যায় তাহার

মূল কারণ এইখানেই।

বলিলাম; ইহা সম্ভব বটে।

ফকড়। আবাব দেখ।

দেখিলাম।

ফকড়। কি দেখিলে?

আমি। দেখিলাম, আপনার পদযুগল অথের ত্রায় বলিষ্ঠ।

ফকড়। মুকুটবিগণের দ্বারে দ্বারে বঙ্গজ লেখক যে

দিব্বারাও এত শ্রুতিতে পাবে, উহার কারণ এই পদযুগল।

বলিলাম; যাহা বলিয়াছেন।

ফকড়। আচ্ছা; এবার দেখ।

বলিলাম; ভূত মাহাশয় আকর্ষণবিস্তৃত হই করিলেন।

দেখিলাম; উহার মধ্যে হস্তপরিমাণ দীর্ঘ রসনা লকলক করিতেছে।

ফকড়। দেখিলে?

আমি। দেখিলাম।

ফকড়। পুরস্কারের লোভে বঙ্গজ লেখকগণ দ্বারে দ্বারে কিস্তি লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা বুঝিতেছ?

আমি। অবশ্যই; অবশ্যই।

ফকড়। আব-একবার তাকাইয়া দেখ।

দেখিলাম।

ফকড়। কি দেখিতেছ?

আমি। দেখিতেছি, আপনার উভয় কর্ণকূহরে তুলা এবং পৃষ্ঠে ডবল-কুলা বাধা বহিয়াছে।

ফকড়। উদ্দেশ্য কিছু বুঝিতেছ?

আমি। মনে হইতেছে, কিছু কিছু বুঝিতেছি।

ফকড়। তবে কি তোমার আর কোন সন্দেহ আছে?

আমি। কিছুমাত্র না। নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছি

যে ফকড়গণই এক্ষণে বঙ্গসাহিত্য চালাইতেছেন; বঙ্গ-সাহিত্যে এক্ষণে কেবল ফকড়তন্ত্রই চলিতেছে।

ফকড়। তোমাব বুদ্ধি দেখিয়া খুশী হইলাম। যদি

তুমি বল, তবে তোমার স্বন্ধেও আমরা ভর করিতে পারি—উহাতে তুমি বাতারাতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইতে পারিবে।

আমি। আপাততঃ উহার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে জানাইব।

ফকড়। তথাস্ত।

*

*

*

কলিকানন্দ

কলিকানন্দের কলিকাতেই আনন্দ। তাহাও ছোট নহে—বড়। ফকড়প্রধান মহাপ্রাণ রামকৃষ্ণের ভূত

উহার স্বন্ধে ভর করিয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লেখক হইয়াছেন। বঙ্গদেশে এক্ষণে লেখক হইবার বড়

স্ববিধা—সাহিত্য-মশ বড় স্থলভ। কাগজের বুক কালি

ঢালিলেই মহৎ সৃষ্টি, উল্লেখযোগ্য অবদান। কাজেই

কলিকানন্দও লেখক হইলেন। আর স্ফুলাও পাখি হইল,

প্রকাশকও সাধু হইল, মাসিকও পাঠযোগ্য হইল।

কিন্তু রত্নটিকে চিনিতে বিলম্ব ঘটিল। কলিকানন্দকে

কাগজেব তাড়া বগলদাবা কবিষা দ্বারে দ্বারে অনেক

শ্রুতিতে হইল, খামে-পোস্টকার্ডে অনেক কাক্য প্রকৃতিতে

হইল। অবশেষে মিত্র-লাভ ঘটিল। রতনে রতন চিনিল।

কলিকানন্দও বাজারে হইলেন।

কলিকানন্দের বিজ্ঞাবুদ্ধির ঘরে শূন্য, ভাবনা-চিন্তারও বাল্যই নাই। একটি বাক্যও তিনি ভাল কবিতা লিখিতে পারেন না। তাঁহার একমাত্র ভরসা কলিকার দম এবং রামফক্কডের ভূত। এই উভয় ভরসাবলে কলিকানন্দ গাদাগাদা লিখিলেন। তন্ত্রে-মন্ত্রে তাঁহার জ্ঞান অষ্টরস্তা, উহাতে তাঁহার কোনরূপ বিশ্বাসও নাই। তবুও তাঁহাকে তান্ত্রিক সাজিতে হইল। নতুবা, বামাচারের আকর্ষণীয় উপচারাঙ্গি সোজাসজি বাজাবে চালানো দায়। অবশ্য, কলিকানন্দ ইহা গোপনও করেন নাই; তন্ত্রমন্ত্র লইয়া খেলার কথা বারংবার খোলাখুলি বলিয়াও দিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গজ পাঠকও কম সেয়ানা নহে। উহার ঐ-সকল কথা চোখ ঠারিয়া এড়াইয়া গিয়া সমস্তবে কলিকানন্দকে আদি ও অকৃত্রিম তান্ত্রিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে—নতুবা তাঁহার রচনার বসগ্রাহী হইয়া রুচি-হীনতার দ্বায়ে ধরা পড়িতে হয়।

কেহ কেহ অবশ্য বলেন যে কলিকানন্দের বচনা স্ত্রীলও নহে অস্ত্রীলও নহে, ভালও নহে মন্দও নহে, উহা কেবল বোরিং, আনইণ্টাচেষ্টিং, আনইগাজিনেটিভ। আসলে উহা সাহিত্যপদবাচ্যই নহে—উহাতে কোথাও সাহিত্য-গুণাবিত একটি বাক্যও নাই। কাজেই, কলিকানন্দের গ্রন্থের বহুল বিক্রয়ে আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহাকে সাহিত্যিক বলিলেই আপত্তি করিব।

এই কথা আমি ভাল বুঝি না। কলিকানন্দের রচনাকে 'অতি' উচ্চস্তরের সাহিত্য বলিয়াই আমাব মনে হয়, কেন-না, আমার ভাবী সহধর্মিণী উহাকে ভাল বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উহা এত কুৎসিত যে দেখিলেই লোভ হয়—শেষ না করিয়া নিশ্বাস ফেলা যায় না। আব, আমাব ভবিষ্যৎ উত্তমাদ্ধ যখন এইরূপ বলিয়াছেন, তখন উহা অবশ্যই যথার্থ,—কলিকানন্দ অবশ্যই মহৎ সাহিত্যিক।

কলিকানন্দেব জয় হউক।

* * *

সিংহের মূষিকপ্রসব

চট্টগ্রামের অরণ্য হইতে কলিকাতায় আসিয়াই বন্ধুবব সিংহ মহাশয়ের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে। তিনি ফক্কডতন্ত্রের

কবলিত হইয়াছেন, এবং ঘনঘন সিংহনাদ ছাড়িয়া দিগ্বিজয় কবিতা বেড়াইতে শুরু করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইয়াছে, বুঝি-বা তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত সিংহশাবক পাওয়া যাইবে। কিন্তু এতদিনে দেখিতেছি—বহ্নারম্ভে লঘুক্রিয়া—গুরুমেঘে লঘুবর্ষণ। অনেক তর্জন-গর্জনের পর সিংহমহাশয় এতদিনে একটি মূষিক প্রসব করিয়াছেন। বেলগাছিবাব বিখ্যাত নর্দমাষ একটি ক্ষুদ্র জলবিষ দেখা দিয়াছে। উহার মূল্য কিছুই নাই, এবং উহাব আয়ুও অতি ক্ষীণ। কাজেই, সে-সম্পর্কে অধিক বাক্যব্যয় অনর্থক। তবে সিংহমহাশয়ের মধ্যে প্রকৃত সিংহেব বীর্ষ কিছু আছে বলিয়াই বিশ্বাস। মুখেন-মাবিতং-জগতের স্বভাব ত্যাগ করিয়া ধৈর্যপূর্বক প্রকৃত সাধনায় বত হইলে কালক্রমে তিনি প্রকৃত সিংহশাবকেব জন্ম দিতে পারিবেন বলিয়াই ভবসা করি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১৩৬৬ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলাব সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণা ও পুনরুদ্ধারেব কাজই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আপনাব কাজ। প্রাচীনকে রক্ষাই উহার স্বধর্ম। পরিষদের এই স্বধর্মে পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীপুলিন-বিহারী সেন মহাশয়ের নিষ্ঠা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি বলি কি, মাত্র দুই বৎসর অতীতে না থাকিয়া আরও কিছুদিন পিছাইয়া যাওয়া যায় না কি? ভবিষ্যৎ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় কথটি ভাবিয়া দেখিবেন।

* * *

শ্রীখোশনবীস-পুরস্কার

পূর্বপ্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী শ্রীখোশনবীস-পুরস্কার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সকল তত্ত্ব অনিবার্য কারণবশতঃ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা যাইতেছে না। উহা আগামী দফায় দেওয়া যাইবে। কিন্তু পুরস্কার-লোলুপ লেখকদিগকে একটি কথা জানাইয়া রাখি—ইতিমধ্যেই আমার তৈলাভাব ঘুচিয়াছে, আর প্রয়োজন নাই। এই তেজালের দিনেও বিস্তৃত খাঁটি তৈলে আমার গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। তৈল-ব্যবসায়ী কেহ কিনিতে ইচ্ছুক হইলে দিতে পারি।

শ্রীখোশনবীস জুনিয়র

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইল্লি বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

ফিরিজিভয়-হারী ব্রহ্মবান্ধব

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সন্ধান-ভাগ্যের দিক দিয়া উনবিংশ শতকে ১৮৬১ বঙ্গমাতার সর্বাধিক ফলপ্রসূ বৎসর। ১৮৬৮ সনে হেমচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-কেশবচন্দ্র এবং ১৮৭২ সনে 'বঙ্গদর্শন' ও শ্রীঅরবিন্দ—কিন্তু ১৮৬১তে রবিশঙ্কর ছয় জ্যোতিষের উদয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই মণ্ডলীতে প্রত্যাষের শুকতারার-স্বরূপ ১লা ফাস্তন ১২৬৭ সোমবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের শুকতারারই মত বঙ্গবন্ধকে "বিশ্বকবি" ("World-poet") রূপে সর্বপ্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, ১লা সেপ্টেম্বর ইংরেজী সাপ্তাহিক 'সোফিস্টা' পত্রিকায়। তখন তিনি কট্টর-ইংরেজীবাদ, মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। যৌবনে ধর্মক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রকে এবং কুরুক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথকে বাচাই করিয়া তাঁহার পছন্দ হয় নাই। তিনি নববিধান ত্যাগ করিয়া প্রাচীনতর বিধান কাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে অজ্ঞমুখে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া হৃদয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ধর্মপ্রচারে ও মানব-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষে মাতৃভূমি বাংলার ক্রমক্ষেত্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তখন দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশে জয় করিয়া ভারতীয় বেদান্ত মতকে আমেরিকা ও ইয়োরোপে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। এই অবস্থায় এই ভাববিহীন কবি-মাতৃভূমিকে তিন মাসের অজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ কাব্যের হাতছানি দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কপুলপ্রতিভা জন্ম প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিল, রবীন্দ্রকাব্য সেই জন্মিতে মাতৃভাষা সেবার ইচ্ছা-বীজ উগ্ঠ করিয়া দিল। দুই ভাবুকের যোগে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হইল, বাঙালীর ছেলে বৈদেশিক ভাষার লেখনী ছাড়িয়া বঙ্গভারতীয় পুঞ্জামণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

এমন সময় ১৯০২ সনের ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব ঘটিল। পবনদিন এই জুলাই ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে হাবড়া স্টেশনে পা দিয়াই জাতির মহাশোকবার্তা শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণমাত্রে তাঁহার মধ্যে এক মহাপরিবর্তন সাধিত হইল। পড়িয়া বহিল 'সোফিস্টা'-'টোয়েন্টিয়েথ সেন্টুরি', পড়িয়া রহিল শান্তিনিকেতনের "ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়", পড়িয়া রহিল কলিকাতার "সারস্বত আয়তন"। ব্রহ্মবান্ধব অতঃপর কি করিলেন ও কি স্থির করিলেন তাঁহার নিজের ভাষাতেই তাহা বলিয়াছেন :

"দিন কয়েকের জন্ত আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইন্টিশানে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।—ওনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁচিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন—তাঁহার ত অনেক উপযুক্ত বিদ্বান্ গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার মতটুকু শক্তি আছে ততটুকু তুমি কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিজিভয়-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্ত্তেই স্থির করিলাম যে বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই যে বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইন্টিশানে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে। বাহার

প্রেরণাশক্তি মাদুশ হীনজনকে সুদূর সাগর পারে লইয়া যায়—সে বড় সোঁজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পবেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্ত কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্সপাব (Oxford) ও কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তেব ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেবা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত কবিয়া বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঐ অধ্যাপকেবা যে সকল চিঠি আমায় লিখিয়াছেন তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে বিলাতে বেদান্তেব প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এত বড় একটা কাজ হইয়া গেল—তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মত। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অষ্টন ঘটয়াছে—আমি মনে কবি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় হেঁদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন। এস—একবার কলিকাতা সহবে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানেব বোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো।—বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বলিল—ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না (তাহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পূর্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ কবিয়া কাজের একটা স্বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি—তাহারি জন্ত ব্যস্ত আছি—আমার অবসব নাই। সেই দিন তাহার সন্ধ্যা একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে লোকটার হৃদয় বেদনাময়—ব্যথায প্রপীড়িত। কাহাব জন্ত বেদনা কাহাব জন্ত ব্যথা। দেশের জন্ত বেদনা—দেশের জন্ত ব্যথা। আর্থ্যজ্ঞান আর্থ্যসভ্যতা বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর যাহা অনার্থ তাহাই সূক্ষ্মকে উদ্ভাবনকে আর্থ্যত্বকে পরাভূত করিতেছে—আর তোমার সাড়া নাই ব্যথা নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময়

সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে উহাতে মার্কিন ও যুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথাব কথা ভাবি—বেদনাব কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা কবি—বিবেকানন্দ কে। দেশের জন্ত ব্যথা কি কখন শরীবগী হয়। যদি হয় ত বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।”

ব্রহ্মবাক্তব বিবেকানন্দের প্রতিনিধিস্বরূপ বেদান্ত প্রচারে, ১৯০২ সনের ৫ই অক্টোবর বিদেশ যাত্রা কবিলেন। দীর্ঘজীব্য করিয়া যখন ফিবিয়া আসিলেন (জুলাই ১৯০৩) তখন তাহাব বন্ধু-বান্ধবেবা সকলেই ভাবিয়াছিল তিনি অতঃপর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার জয়গান করিবেন। ঠিক ইহার বিপরীত ঘটিল, বিলাতপ্রবাসী ব্রহ্মবাক্তব আরও বেশী স্বদেশী, আরও বেশী ভাবতীয় হইয়া আসিলেন।

পর্বত বহিমান ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লর্ড কার্জনের ভারতীয়দেব প্রতি মিথ্যাভাষণের অপবাদ এবং পর পর তাহাব রাজনৈতিক চালের ভুলে দেশের সর্বত্র ধুম দেখা দিল। তাহাব পর শুরু হইল অগ্ন্যুৎসব। এই অগ্ন্যুৎসবে সর্বাধিক ইন্ধন যোগাইতে ব্রহ্মবাক্তব উপাধ্যায় ইংরেজী স্টীলপেন বর্জন করিয়া বাংলা খাগের কলম তুলিয়া লইলেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবাস সন্ধ্যায় ব্রহ্মবাক্তব দৈনিক ‘সন্ধ্যা’ বাহির করিলেন, এবং অচ্ছান-পত্রে লিখিলেন :

সন্ধ্যার অন্ত্যস্তান পত্র

“দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে, এই তো কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রির কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখন অনেক বিলম্ব। কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বাবশত বৎসব ধরিয়া কলির এক একটি সন্ধ্যা। এরূপ চারিটি সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।

প্রথম সন্ধ্যায় ত্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভব-সাগরে জীব ডুবিয়া না মরে তাই তিনি গীতারূপ ভেলা প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা উহার আশ্রয় গ্রহণ কবে, তাহারা তুফান কাটাইয়া কূল পায; আর যাহারা উহাকে অগ্রাহ্য করে তাহারা হাবুডুু খায়।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বৌদ্ধবিভ্রাট ঘটয়াছিল। আশ্রমধর্ম

ভাদ্রিয়া যাওয়ায় সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

তৃতীয় সন্ধ্যায় শঙ্করাচার্যের অভ্যূদয়। তিনি বৌদ্ধ-দিগেব গর্ক খর্ক করিয়া হিন্দুধর্মের জয়পতাকা উড়াইয়া ছিলেন।

চতুর্থ সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাধিকার। এইবার ভাবতকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। অনাচার ও অত্যাচারে দেশ বাঁচিয়া থাকিবাও যেন মবিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম সন্ধ্যায় বোধ হয়, স্বদেশের পালা আসিতে পারে। কিন্তু পঞ্চমেরও দুইগত বৎসর চলিয়া গেল, তবু কোন স্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন উপায় কি? পুরাতন কথা ভাবিয়া দেখিলে উপায় কি, তাহা বোধ হয়, বুঝা যাইতে পারে। আমরা একটি লম্বা বসিতে বাঁধা আছি। যতদূরই যাই না কেন, যতই ঘূষপাক খাই না কেন, খোঁটা ছাড়িবার যো নাই। সেই বেদবেদান্ত, সেই ব্রাহ্মণ, সেই বর্ণধর্ম ছাড়া হিন্দুসন্তানের আর গতি নাই।

কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা সন্ধ্যা নামে যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ কবিবার মানস করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—কেবল এই একমাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝান। রাজা স্বেচ্ছ। উপ-জীবিকার জন্ত মানসম্মত জন্ত স্বেচ্ছ ভাষা স্বেচ্ছ বিভাগ শিখিতে হইবে, স্বেচ্ছ হাবভাব ধরিতে হইবে নইলে উপায় নাই। এতে আর কি খাটি ধর্ম থাকে! সমস্তা শক্ত বটে কিন্তু সিদ্ধান্তও আছে। রাজার সহিত সম্পর্ক বাখিতেই হইবে। রাজ্য প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা সন্ধ্যা পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্যকলাপ ও দেশ-বিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলাকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহাও মন্ত্রণা থাকিবে কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শেখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও বাঙ্গালী থাকিও। সখের জন্ত সাহেবি টং নকল করিলে আসল ভেসে যাবে। কিন্তু বিদেশী বিভাগ শিখিলে বা পেটের দায়ে ধর্মের ব্যাঘাত না কবিয়া বহিঃস্থ ব্যাপারের অল্পস্বল্প বদল করিলে ক্ষতি নাই। সকল

অবস্থায় কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের শিষ্ট হইয়া জাতিমর্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। আমরা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, আমাদের হৃদয়ে এক পুরাতন স্বয়ং যুগযুগান্তব ধবিয়া বাজিতেছে।

পূজা-পর্ক, শিল্পসাহিত্য, সমাজনীতি, গৃহস্থ লী ইত্যাদি সকল কথাই বলা হইবে কিন্তু সমুদয়ের ভিতরে ঐ এক সুরের খেলা থাকিবে—বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম। এলতলা বেলতলা সেই বুড়ির পায়ের তলা। আমরা যদি এই কথাটি বুঝিয়া একনিষ্ঠ হইতে পারি, নিশ্চয়ই ভগবানের রূপা হইবে—অন্ধকার ঘুচিবে। নাস্তি গতিরগুণা।

এই পত্রিকায় কোন নূতন কথা বলিবাব স্পর্ধা আমরা বাখিব না। আমাদের অগ্রজদিগেব নিকট বাহা শিখিয়াছি, তাহাই কেবল নূতন আকারে প্রকাশ কবিব। তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।”

ব্রহ্মবান্ধবের অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভা ও বিচিত্র জীবন এখন হইতে একমুখী—স্বদেশের স্বাধীনতা-অর্জনের তপশ্রায় একনিষ্ঠ হইল। যে বাধার কথা তিনি সর্বাগ্রে অনুভব করিলেন তাহা হইতেছে বাঙালীর স্বদেশবিমুখতা এবং অকারণ ব্রিটিশ শাসকদের ভীতি। এই দুই বাধা অপসারণ কবিয়া স্বদেশকে স্বাধীন করা তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইল। এবং এই ধ্যানজ্ঞান প্রকাশ্য রূপ লইল ‘সন্ধ্যা’র তাঁহার রচনাগুলিতে। আমাদের পাল-পার্বণ, আমাদের ব্রত-উপবাস, পূজা-অর্চনার মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় সংস্কৃতি কতখানি নিহিত আছে, সমগ্র দেশের অবিচ্ছিন্ন যোগসাধনে এগুলির অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে কতখানি কার্যকরী ব্রহ্মবান্ধব প্রাঞ্জল ও মর্মভেদী ভাষায় তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। এই গেল এক দিক, অগ্র দিকে ব্রিটিশ জুজুর ছায়া-ভয়চকিত মুত দেশবাসীকে তিনি সচেতন কবিত্তে চাহিলেন এই বলিয়া—যে ভয়টা তোমার মনগড়া, আসলে ফিরিঙ্গিবা মোটেই শ্রদ্ধার পাত্র, ভয়েব বস্ত্র নয়। তিনি এই ফিরিঙ্গিভয়-বিভাদনে এমনই সোরগোল তুলিলেন যে ১৯১৮ সনের বাউলাট বা সিডিশন কমিটির রিপোর্টে লিখিত হইল :

the ‘Sandhya’ proclaimed abroad, “We want complete independence. The country

cannot prosper so long as the veriest shred of the *Feringhi's* supremacy over it is left. *Swadeshi*, boycott, all are meaningless to us, if they are not the means of retrieving our whole and complete independence. Rights granted by the *Feringhis* as favour, we shall spit at and reject, and we shall work out our own salvation," (pp 16-17)

দৈনিক 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে সঙ্গেই ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ, ১৯০৭ হইতে ব্রহ্মবান্ধব একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্বরাজ' প্রকাশ করেন। বাবো সংখ্যা মাত্র বাহিব হইয়াছিল। 'স্বরাজ' তৎকালপ্রচলিত অন্য পাঁচখানা পত্রিকারই অনুরূপ ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে 'সন্ধ্যা'র স্থান অনন্তসাধারণ, তাহার লোকমজানো লোকমাতানো ভাষা, চলতি বুলি এবং প্রবাদের মত সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী শিবোনামাব জ্ঞত। কেশবচন্দ্রের 'স্বলভ সমাচার' প্যারীচাঁদ-রাধানাথের 'মাসিক পত্রিকা'র পরে যেমন একটা যুগান্তর, ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' তেমনি 'স্বলভ সমাচার'র পর যুগান্তর, অবশ্য ছতোম তাঁহার নকশাকে সাময়িকপত্ররূপেই প্রকাশ করিয়াছিলেন এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

'সন্ধ্যা'র এই আশ্চর্য ভাষার প্রভাব বাংলা সংবাদপত্রে নূতন প্রাণশক্তি, আশ্চর্য প্রকাশ-ক্ষমতা দান করিয়াছে বটে কিন্তু 'সন্ধ্যা'র ভাষা দুটি একটি নমুনা ছাড়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রবোধচন্দ্র সিংহ তাঁহার জীবনীতে, এবং কোন কোন দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়া এবং বঙ্গসরকারের গোপন রিপোর্টে ইংরাজী অনুবাদে 'সন্ধ্যা'র কিছু কিছু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ জীবিত আছে। উপযুক্ত পরিমাণ প্রমাণ দাখিল না করিলে কোন কিছুতে মাস্তুষের স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কাজেই বাংলা গল্প-সাহিত্যে ব্রহ্মবান্ধবের যথার্থ স্থান এতকাল নির্ণীত হয় নাই। জনশ্রুতি মাত্রই আছে। সম্প্রতি আমার হস্তে পরিমাণে অধিক 'সন্ধ্যা'র সম্পাদকীয় রচনা আসিয়া পড়িয়াছে, ওই সঙ্গে সম্পূর্ণ 'সন্ধ্যা'ও অনেকগুলি আছে। মৎপ্রাপ্ত বচনগুলি সমস্তই আমি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। 'সন্ধ্যা'র ফাইল সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরক্ষা-

বিভাগের সি. আই. ডি. ও আই. বি. শাখা কয়েক বৎসর পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় সরাসরি ইংবেজ বিতাড়নে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র ও বিপ্লবীদেব উত্তেজক সাহিত্য ও সংবাদপত্রের যে প্রদর্শনী করিয়াছিলেন তাহাতে 'যুগান্তর', 'আত্মশক্তি', 'ধর্ম' ও ইংরেজী 'বন্দেমাতরং' ও 'কর্মযোগিনী' প্রভৃতি প্রদর্শিত হইলেও 'সন্ধ্যা'র একটি ছেঁড়া পাতাও উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই।

এইবারে আমি ১৯০৬ সনের ২৩ নভেম্বরের 'সন্ধ্যা' হইতে ফিরিঙ্গি-বিরোধী দুইটি এবং অল্প দুইটি তারিখের 'সন্ধ্যা' হইতে একটি করিয়া নিবন্ধ ছাপিয়া শতবর্ষে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের তর্পণ করিতেছি। নীচে উদ্ধৃত রচনাগুলি পরপর মুদ্রিত হইল :—

ফিরিঙ্গি শব্দের ব্যুৎপত্তি (২৩-১১-০৬)

এম্পায়ার—বলিয়া একখানি নূতন ইংরেজি দৈনিক কাগজ বাহির হইয়াছে। ঐ কাগজে লেখা হইয়াছে যে 'সন্ধ্যা' পত্রিকাতে ইংরেজকে অবজ্ঞা করিয়া ফিরিঙ্গি বলা হয়। তাই আজ আমরা ফিরিঙ্গি-শব্দ-তত্ত্বের কথা কিছু বলিব।

আমাদের এক হিন্দুস্থানী বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে যে কথাব অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইত—তিনি সেই কথারই অক্ষব ধরিয়া একটি না একটি চমৎকার অর্থ করিয়া দিতেন। সেই জ্ঞত তাঁহাকে সকলে—ডিক্শনারী অর্থাৎ অভিধান—বলিয়া ডাকিত। এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—হিন্দু শব্দের অর্থ কি। তিনি অমনি বলিলেন—হি হীন—হু হুর্ভাগ্য—যাহারা হীন ও হুর্ভাগ্য তাহারাই হিন্দু। এই অর্থ তিনি নিন্দাচ্ছলে বলেন নাই—মনের দুঃখে বলিয়াছেন।

এখন ফিরিঙ্গি শব্দের অর্থ কি। প্রথমেই ফি—যাহারা সব কথায ফি (টাকা) চায়—তাহাবাই ফিবিঙ্গি। ওরা বাপকে খাওয়াইয়া বিল করে—ফি চায়—ওদের জীকে যদি কেহ ভ্রষ্টা কবে ত তাঁহাব নিকট ফি লইয়া ছাড়পত্র লিখিয়া দেয়। তাই গোড়াতেই ওদের নামে ফি শব্দ আছে। এখন ফি ছেড়ে ধর—ফিরি। এমন ফিরিওয়ালার জাত আর নাই। শুধু যে উহাবা সওদা ফিরি কবিয়া বেডায়—তাহা নহে। তোমার কাছে ফি লইবে আবার ফিরি করিবে। আর যদি ফি না দাও—আর

যদি সওদা না লও—ত তোমাকে যমেব উত্তর দক্ষিণ
দ্বারে ফেরাফেবি করাইবে। তারপর ধর—ফিঙ্গি। এমন
ফিঙ্গি বা ফিঙে ছুনিয়ায় নাই—ওরা সকলের পিছনে
লাগে।—কথায় কথায় ফি আদায় কবে—তোমার ঘরেব
ভিতরে গিয়া জোর করিয়া ফিরি করিয়া আসে—তাব
পবে ফিঙ্গি-ফিঙে হইয়া ধিঙ্গিব মত তোমার পিছনে
লাগিবে ও তোমাকে উত্তমফুস্তম করিয়া তুলিবে। তুমি
যেমন পঙ্খী হও না কেন—ফিরিঙ্গি-ফিঙে তোমায় যদি
তাড়া করে ত তোমার দম বাহির করিয়া ছাড়িবে।

আসল কথাটা হিন্দুস্থানীতে—ফিরিঙ্গি। ফি গেল—
ফিরি গেল—ফিঙ্গি গেল—এখন আছে বাকি—বঙ্গী।

প্রথমেই বঙটা ত ফ্যাক-ফেকে শাদা—রঙ নাই
বলিলেই হয়—যেন টব-চাপা ঘাস। তবে বঙ্গী কি করিয়া
হইল। বিচি-ভবা বেদানাকে লোকে কেন বে-দানা
অর্থাৎ দানাহীন বলে। সেই রকম রঙ নাই বলিয়াই
ওদের বঙ্গী বলে। আর একটা ওদের বঙ্গ আছে।
লোককে মেরে ধোরে উড়াইয়া দেয়—আর বলে—
আলোক বিস্তার করিতেছি। মাকিণের ও অষ্টেলিয়ার
আদিমবাসীরা ওদের আলো-ছড়ানো বঙের চোটে অনন্ত
জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছে। এমনি ওদের বঙ্গ।

আবাব জ্বীলোক নিষে ওবা বড়ই বঙ্গ করে—তাই
ওরা ফিবঙ্গী। ভয়ানক শীতেও ওদের জ্বীলোকেবা গলা
বুক ও হাত আছড় করিয়া সভায় যায় ও মেয়ে-পুরুষে
গল্প-গাছা গাওনা বাজনা কবে। সে বঙ্গ যে দেখেছে তাব
আক্কেল হয়েছে। ওরাই বঙ্গী বটে। ওরা নিজেব জ্বীর
ও পরের মেয়েব ও জ্বীব পা ধরিয়া গাডী থেকে নামায়—
কিন্তু পিসি মাসী ভাজ বোনকে খেতে দেয় না। এমন
বঙ্গ কি কেহ কখনও দেখেছে।

ওদের শেষ বঙ্গ দেখে কিন্তু হাসি চাপিয়া বাখা যায়
না। ওদের বিড়া ঐ ধুমো ধুমো কলকজা পর্যন্ত—কিন্তু
ওরা সুন্দরী আর্ধ্যজাতির গুরু সাজিয়া বসিয়াছে। এমন
উঁচা বঙ্গ আব কখনও হয় নাই। ফিবিঙ্গিব ভিতরে ফি
আছে—ফিরি আছে—ফিঙ্গি-ফিঙে আছে—আর শেষে
বঙ্গ আছে। ওরে ফিরিঙ্গি—তোর বালাই নিয়ে মরি।

বয়কটের মর্শ্ব (২৩।১১।০৬)

বারে বারে বলিয়াছি যে শুধু ছুন-চিনি-কাপডেব

স্বদেশী হইলে চলিবে না। বিলাতি-বর্জনের অর্থ—কেবল
ফিরিঙ্গিব মালপত্র বয়কট করা নহে—কিন্তু খাস ফিরিঙ্গিকে
বয়কট করা চাই। সে কি রকম।—ফিরিঙ্গি আমাদের
শাসন করে। ঐ শাসন-কার্যে আমরা যাচিয়া সহায়তা
করিব না। যেখানে পেটের দায় বা ইজ্জতের দায় সেখানে
করিতেই হইবে। দায়ে পড়িয়া যখন ফিরিঙ্গির সহায়তা
কবিত্তে হইবে—তখন যেন এই ভাবটি মনে থাকে—
পড়েছি মোগলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে। কিন্তু
কোনরকমেই সখ করিয়া গিয়া ফিরিঙ্গির শাসনচক্রে তৈল
ঢালিব না। লাটমজলিশে সখের নকিবি করিতে যাইব
না—অন্যাহাবী কাজীগিবি করিব না—ফিরিঙ্গি আমাকে
ঠেঙ্গাইল—আব-আমি ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা বন্ধ করিয়া
ফিবিঙ্গির আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিবাব পরামর্শ
আটিব না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—যদি ফিবিঙ্গিকেই বয়কট
করিতে হয় ত ফিরিঙ্গিব আইন পর্যন্ত মানা উচিত নয়।
এক জন আমাব নামে মিথ্যা মিথ্যা নালিশ কবিয়াছে ও
ফিরিঙ্গি আদালত হইতে শমন বাহিব হইয়াছে। আমি
নির্দোষী—তাব উপবে আবাব বয়কটকারী। আমাব ঐ
ফিবিঙ্গি আদালতের শমন অগ্রাহ করা উচিত।

একটু স্থির হইয়া ভাবিলে—মনকে চোখ না ঠারিয়া
সোজাসজি দেখিলে বুঝা যায়—যে বয়কট অর্থে আইনভঙ্গ
নহে। আমি নির্দোষী বা দোষী—তাহাতে কি আসে
যায়। যে নালিশ কবিয়াছে—সেও ভাবিতে পারে যে
সে নির্দোষী। আইনের সাহায্যে বিচার করিয়া ঐ
সমস্তার মীমাংসা কবিত্তে হইবে—দোষীকে দণ্ড দিতে
হইবে। যদি আমাদের রাজা দেশী হইতেন—তবুও
আমাকে ঐ আদালতের আইন মানিয়া লইতে হইত।
আইন বস্তুটিকে মানিতেই হইবে।

যাহা সাধারণ—সর্বজনসম্মত বিবিব্যবস্থা—ব্যবস্থাপক
দেশীই হউন বা বিদেশীই হউন—তাহা মানা চাই।
হইতে পারে যে কোন দোষের জন্ত বিদেশী আইনে কম
বা বেশী দণ্ড হয়—আর স্বদেশী আইনে সেই দোষেই
বেশী বা কম হয়—কিন্তু আইনেব বশত তা তোমাকে
সকল দেশে সব কালে স্বীকার করিতেই হইবে।
কিন্তু যদি সিপাহীবা শমন ধরাইতে আমাব মাথা

ফাটাইবার বন্দোবস্ত করে—বা আমি চলিয়া যাইতেছি আর আমার উপরে গুণ্ণামি করিয়া লাঠি চালায়—তাহা হইলে আমার লাঠিব বদলে লাঠি ধরিবার অধিকার আছে। ইহা বিধাতার দেওয়া অধিকার। যদি দেশীয় বাজাব অধীনে এইরূপ অত্যাচার হয়—তাহা হইলেও আমার ঐরূপ প্রতীক্য কবিবার অধিকার আছে—ফিরিঙ্গি-বাজাব অধীনে—কা কথা।

তাই যখন লাঠিব বদলে লাঠি বলা যায়—তখন ইহা বলা হয় না যে সব আইন ভাঙ্গিয়া ফেল। ইহাই বলা হয় যে যদি কেহ তোমাকে ঠেঙ্গাইতে আসে কিম্বা তোমাং বে-ইজ্জত করিতে আসে—তু সে ফিবিঙ্গি হউক বা তাহার চৌদ্ধপুত্র হউক তাহাকে ঠেঙ্গাব বদলে ঠেঙ্গা দেখাইবে। ইহা বিধাতাব নিয়ম—সকল নিয়মের চেয়ে বড়।

অবশ্য—ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে। ফিবিঙ্গি ঘরেব ভিতরে চুকিয়া কর্তামি জুড়িয়া দিয়াছে—তোমার প্রাণেব দায় মানেব দায় অর্থের দায় শিক্ষাদীক্ষার দায় সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছে—আর তুমি তার মুখেব পানে চাহিয়া হাতঘোড় করিয়া বসিয়া আছ। তাহাব ঐ কর্তামি ঘুচাইতে হইবে। তাহাকে অতিথি-অভ্যাগতরূপে বাড়ীব বাহিরে স্থান দিতে হইবে। এই পবকে ঘব হইতে বাহিব কবাকেই বয়কট বলে। ভাবের কথা ভাবে বুঝিয়া লও। আইন-ভাঙ্গাকে বয়কট বলে না—। যাহাতে সেই সনাতন-তন্ত্রের অধীনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাবি—এস—তাহারই সাধনা কবি—ফিরিঙ্গিকে বয়কট করি।

সোণার বাঙ্গলা ভাঙ্গে কে ?

পূর্ববঙ্গেব লাট দরবারে কেহ সদশ্রুপদ গ্রহণ না করেন, কলিকাতাব কর্তৃপক্ষীযেরা প্রাণপণে তার চেষ্ঠা কবিতেন। দেশেব বর্তমান অবস্থায় ইংবেজবাজের সঙ্গে দেশেব লোকে সকল রকমেব সম্পর্কই যথাসাধ্য বর্জন করুন, আমবা সর্বাস্তঃকরণে ইহা ইচ্ছা কবি। এই জন্ত পূর্ববঙ্গেব লাট দরবারে যদি কোনো দেশমাগ্ন ভঙ্গলোকে প্রবেশ না করেন, আমবা তাহাতে অত্যন্ত স্তুখী হইব। কিন্তু তাঁবা কেন যে এ স্বার্থত্যাগ করিতে উত্তত হইয়াছেন, এ কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়।

ইংরেজ জোর করিয়া বাঙ্গলা দেশেব বহু-কালাগত শাসনব্যবস্থাব মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটাইয়াছে—বাঙ্গলা দেশকে শাসন বিষয়ে দুই ভাগে বিভক্ত কবিয়াছে, ইংবেজের এ বিধান আমবা মানি না, আমবা মানিব না, সে ভাঙ্গুক আমবা আবার গডিযা তুলিব, সে কাটুক আমবা নিজের জোরে জোড়া লাগাইব, সে বিভক্ত করুক তাব কলমেব খোচায়, আমবা একত্র থাকিব। আমাদের বক্তের, আমাদের ইতিহাসের, আমাদের সমাজের, আমাদের শাস্ত্র সাহিত্যের, আমাদের সভ্যতা-সাধনার অকাট্য ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে,—এ সাধুসংকল্প আমবা কবিয়াছি, স্পর্ধাপূর্বক ইংবেজকে বর্জনের কথা আমবা বারম্বার জানাইয়াছি।

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি

এমন শক্তিমান ?

আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমাব হাতে

এমনি অভিমান ?

ইংরেজকে আমবা একথা শুনাইয়াছি। সুতরাং এই পণ রাখিবাব জন্ত এই সংকল্পের বলে যদি আমবা পূর্ববঙ্গেব লাটসভার সদশ্রু হইতে নাবাজ হই, তার সার্থকতা আছে। এ কারণটা বুঝা যায়। অধিকাবাব প্রভৃতি কি এই কাবণেই পূর্ববঙ্গেব লাটসভার সদশ্রু হইতে নাবাজ হইয়াছেন ? একথাটা এখনো ভাল কবিয়া বুঝিতেছি না।

বঙ্গভঙ্গেব প্রতিবাদস্বরূপ যদি পূর্ববঙ্গেব লাট সভায় কারো না যাওয়া উচিত হয়, তবে সেই কারণে পশ্চিম বঙ্গেব লাট সভাতে থাকা কর্তব্য নহে ? পশ্চিম বঙ্গে বাঙ্গলাটা পুরাই আছে, আর পূর্ববঙ্গ ভাঙ্গিয়া আধখানা হইয়াছে, এমন তো বলা যায় না ? তবে পদ্মার ওপারে যদি আধা বাংলার ব্যবস্থাপক সভাব সভ্য হওয়া অকর্তব্য হয়, এপারেও তাহা হইবে। কিন্তু অধিকা বাবু প্রভৃতি একথা বুঝেন কৈ ? ৩০এ আখিনের পবেই তাঁদেব লাট সভাব সভ্যপদ পবিত্যাগ কবা উচিত ছিল। তাঁরা দু-একবাব রোক কবিয়া বলিয়াছিলেন যে ও পদ আর রাখিবেন না। ভবানীপুবে, হরিশ্চন্দ্র উত্তানে, স্ববেঙ্গ বাবু প্রকাগ্ন সভায় আপনাব পকেটে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন, যোগেশ বাবু প্রভৃতিব সভ্যপদ পবিত্যাগপত্র তাঁর সঙ্গেই

ঐ পকেটের ভিতরেই আছে। তারপর ছয় মাসের অধিককাল চলিয়া গিয়াছে, এখনও সেগুলি তাঁব পকেটেই মজুত আছে। বরিশালের পাশব অত্যাচারের পরে আবার দেশের লোকে ঐ কথা তোলে। কলিকাতায় পশুপতি বাবুর বাড়ীতে সভা কবিতা কর্তাবা আপনাবা পাশ কাটিয়া সবিধা যান কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোকের পক্ষে পূর্ববঙ্গের বরিশালের অত্যাচারে সমগ্র বাংলাদেশকে আহত করিয়াছিল। আর সে অত্যাচারের জন্ত দায়ী এমার্সন নহে, ফুলার নহে,—কিন্তু ইংরেজ-রাজ। কলিকাতায় একরূপ অত্যাচার হইলে, পূর্ববঙ্গ কখনো বলিত না, তোমরা ফ্রেজার লাটের দববার ছাড়, আমরা ফুলার লাটের দববার ছাড়িব না। তাবা জানে শরীরের একাংশে আঘাত লাগিলে যদি সকল শবীষটা চিন্ চিন্ করিয়া না উঠে, তবে সে শবীষে সাড় নাই। পূর্ববঙ্গের লোকেরা লাট দরবাবে যাইবে না, কারণ—পূর্ববঙ্গের লাট লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছেন, পশ্চিম-বঙ্গের লোকেরা লাট দরবার ছাড়িবে না, কারণ এখানে সে অত্যাচার হয় নাই। ইহার অর্থ এই পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে সত্য সত্যই কাটা পড়িয়াছে।

মনে কর বাঙ্গলা যদি বিভক্ত না হইত, আর তখন যদি পূর্ববঙ্গে একরূপ অত্যাচার হইত, তবে তখন কি কলিকাতার কর্তাবা একথা বলিতে পারিতেন যে, ঢাকা, ফরিদপুর ও মৈমনসিংহের লোকেরা আর লাটদরবাবে যাইবে না, তাদের যাওয়া কর্তব্য নহে, কিন্তু কলিকাতা, বর্ধমান রাজসাহী প্রভৃতি লোকেরা যাইবে? তখন একরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা অসম্ভব হইত এজন্ত—যে তখন বাঙ্গলা দেশের অভেদ অস্বীকার করা সম্ভব হইত না। বাঙ্গলা ভাঙ্গিয়াছে ইংরেজ, আমাদের শত মৌখিক আশ্বাসন সত্ত্বেও ইহা সত্য যে আমরা সে ভাঙটা এখন মানিয়া লইয়াছি পূর্ববঙ্গ ইহা বুঝিয়াছে—আর বড় দেরি নাই। বাংলার রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র পশ্চিম বঙ্গ ও কলিকাতা হইতে অপহৃত হইয়া ঢাকা ও পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইংরেজ যাহা ইচ্ছা করিয়াছে সে নিজে তাহা করিতে পারিত না—কলিকাতার কর্তাবা তাহা করিতেছেন।

[২৮. ৬ ১৯০৬]

ফাঁকা আওয়াজ

সেদিনকার টাউনহলের সভায় অনেকেই ফাঁকা আওয়াজ করিয়া কেবল ফতে কবিতার চেষ্টা করিয়াছেন। সভাপতি রাজা প্যারীমোহন বলিয়াছেন যে যেখানে শাস্তি নাই, সেখানে শাস্তি, শাস্তি, বলিয়া চীংকার করা বুঝা। এ কথা শুনিয়া মনে হয় যেন আমরা একটা ঘোরতর লড়াই বাধাইয়া বসিয়াছি। এটা এক নম্বর ফাঁকা আওয়াজ।

দেশে অশান্তি কোথায়? কতকগুলো লোক পুলিশ গুল্মব গুল্মে খাইয়াছে সত্য, কতকগুলো লোক অকারণে জেলে যাইতেছে ইহাও সত্য,—কিন্তু এতে যে একটা সংগ্রামের অবস্থা বুঝা যায় তা জানি না। পুলিশ যখন বেআইনী ব্যবহার করে, আদালতে যখন অবিচার হয়, তখন দেশের লোকে যদি আপনারা আইনেব ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াই ও এ সকল অবৈধ ও অত্যাচার আচার প্রতিবাদ করে, তবে তাহাকে একরূপ সংগ্রামের অবস্থা বলাও যাইতে পারে। পড়িয়া মার খাওয়াতে বাহাদুরী থাকিতে পাবে, তাহা বুদ্ধিমানের কাজ, ইহাও না হয় মানিলাম, কিন্তু ইহা যে সংগ্রামের অবস্থা এ মিথ্যা কথা বলিব কেমন করিয়া?

ইংরেজ বলিতেছে, বঙ্গভঙ্গব্যবস্থায় দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, ইহা মিথ্যা কথা। তাহার রাজার বিধান মাথা পাতিয়া লইয়াছে। আমরা কি চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া এ কথা অস্বীকার করিতে পারি? মনে মনে অধিকাংশ লোকই যে এই ব্যবস্থাতে সায় দিতে পারিতেছে না, ইহা ঠিক। যদি সম্ভব হয়, তবে এ ভাঙ্গা বাংলা আবার জোড়া লাগুক, ইহাও সকলেই চায়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও কার্যতঃ প্রতিবাদ করে এমন লোক কয়জন আছে? কি ধনী কি নির্ধন, কি ছোট কি বড়, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কোন দলের মধ্যেই ত কার্যতঃ এ নূতন বন্দোবস্ত মানিতে চাহে না, এমন লোক দেখিতে পাই না।

৩০শে আশ্বিন আমরা একটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছিলাম। সে দিন এক নূতন প্রোক্রামেশান জারি করিয়া আমরা রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তিকে দাঁড় করাইতে উত্তত হইয়াছিলাম। সে দিন আমরা বলিয়াছিলাম যে সর্বপ্রথমে এই বঙ্গভঙ্গ নিবন্ধন যা কিছু

অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা নির্ধারণ করিব। আমরা ইহাও বলিয়াছিলাম যে,—তোমরা বাংলাকে দুই ভাগই কর, আব দশ ভাগই কর, আমরা ইহাকে এক করিয়া রাখিব। তা করিতে পারিয়াছি কি ?

করিবার মধ্যে তা এই কবিয়াছি যে ক দিন ফুলার লাটকে লাট বলিয়া না মানিয়া একেবারে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছি। যারা ফুলার লাটকে লাট বলিয়া মানেন নাই, তাঁকে অভিনন্দন-অভ্যর্থনা দিবার বাধা দিয়াছেন, তাঁরাই কি ফুলার লাটের অধীনে বে-সরকারী কাজ সব ছাড়িয়াছেন ? অভিনন্দন দিবার সময় তাঁরা বলিয়াছেন—তোমাকে লাট বলিয়া আমরা জানি না, কিন্তু তাঁদের অনেকেই তো মিউনিসিপাল সভ্য, লোক্যাল বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি বা সহকারী সভাপতি, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁহাদের কাজ করবার পূর্ববঙ্গ ও আসামের গবর্নমেন্টের সঙ্গে, তাঁরা এই সকল পদের জন্ত ফুলার লাটের অধীন হইয়া রহিয়াছেন। ফুলার লাটকে না মানিলে, তাঁহার অধীনস্থ এ সকল পদ ছাড়িতে হয়। কিন্তু সে স্বার্থভ্যাগটুকু নাই। তবে এ হঠকারিতা আবার কেন ? সস্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠা কবিত্তে যাইয়া, থামোকা আফালনে ফল কি ?

যদি দেখিতাম যে, বাঙ্গালী সকল দিকে ইংরাজের সংসর্গ ছাড়িয়াছে, যদি দেখিতাম যে ইংরেজ যখন আমাদের মতামত ও ভাব-ভক্তিকে পায়ে ঠেলিয়া বাংলা দেশকে দুই ভাগ করিয়া আপনার মজ্জিমত শাসন কবিত্তে চাইতেছে, এবং আমাদের দেশের মাথাওয়ালা যারা, তাঁরা একবাক্যে ও এক যোগে ইংরেজশাসনের সহায়তা করিতে অস্বীকার কবিয়া সকল প্রকারের অবৈতনিক কর্ত্ত পুরিত্যাগ করিয়াছেন, যদি দেখিতাম যে প্রত্যেক মাহুষের বিধাতৃ-দত্ত, আইনসম্মত যে সকল স্বত্বাধীনতা আছে,—আপনার শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার যে অধিকার অতি নিকট প্রজাতেও ইংরেজের দণ্ডবিধি দ্বারাই অর্পিত হইয়াছে,—পুলিস ওয়ার্ডার বেআইনী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গ তাহা সর্বত্র অকুতোভয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, যদি দেখিতাম যে লোকে আর পড়িয়া মাব খায় না, কিন্তু আইনমতে যার যতটুকু প্রতিবিধান আছে, অন্ততঃ সেটুকু কবিবার জন্ত কেহই পবাখুশ নহে, যদি আদালতে অবিচার দেখিয়া বাঙ্গালী আসামী হাকিমের মুখের উপরে,—“আমি তোমাদের আদালতে সত্য ও সত্য প্রতিষ্ঠা হইবে এ বিশ্বাস আর করি না,”—এই বলিয়া বিনা ওজরে বিনা প্রতিবাদে বিন্দু মাত্রও আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া, সাক্ষী সার্বদ দেওয়া বৃথা বলিয়া, কোন সাক্ষী-সাক্ষী না দিয়া, সকল দণ্ড অকুতোভয়ে গ্রহণ কবিত্তেছে, যদি দেখিতাম যে শাসনের কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে প্রজার আত্মশক্তি জাগিয়া উঠিতেছে, আর সর্বোপরি ইংরেজ

যেমন জোর করিয়া বাঙ্গালীর বিলাতী বর্জনের সঙ্কল্প ভাঙ্গিবার চেষ্টা কবিত্তেছে, বাঙ্গালী তেমনি করিয়া বর্জ-মুষ্টিতে সে পণ ধরিয়া রাখিতেছে,—তবে দেশে শান্তি নাই বুঝিতাম। এখন যা দেখিতেছি, তাহাতে দেশে অশান্তি কোথায় ? মনে অশান্তি আছে সত্য। প্রাণে প্রাণে অশান্তির ঝড় বহিতেছে মানি। কিন্তু তাহাতে ইংরেজের কি আসিয়া যায় ? সে মন দেখে না, কাজ দেখে। সে দেখিতেছে যে বাংলার ভাজের ঝড় আখিনের তুফান, স্বদেশীর উদ্দাম আফালন, আবাল-বৃদ্ধবণিতার সে প্রচণ্ড উৎসাহ, সে বন্দে মাতবং ধ্বনি সকলই থামিয়াছে, সকলই নিবিয়া যাইতেছে। রাজপুত্র আসিলেন, সকলে তাঁর অভ্যর্থনা কবিল, ক্ষুদ্রে লাট সফরে যাইতেছেন, সকলে তাঁর সম্বর্দনা করিতেছে। যারা বুক ঠুকিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁদের এক হাত ইংরেজের পায়ে আর এক হাত ইংরেজের গলায়, আর পায়ে হাত ক্রমে গলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ক্রমে তাঁরা দু হাতেই ইংরেজের গলা চাপিয়া ধরিবেন—বিধি-সম্মত রূপে, তাবাই যখন আবার গলা ছাড়িয়া দু হাতেই আনিয়া আবার ইংরেজের পদলগ্ন করিয়াছেন, তখন আর কেমন করিয়া বলিব দেশে শান্তি নাই। ফলতঃ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ শান্তি বিজয়ার শান্তি নহে, কিন্তু পরাজিতের অবসাদ, সত্য। ইংরেজও তাই চায়। সে দেশের অবসাদ ও অক্ষমতাতে আপনাকে অধিকতর নিরাপদ মনে করে। আমাদের ফাঁকা আওয়াজে সে আর ভয় পাইবে কেন ?

ঢাল তলোয়ার ছাড়িয়া বাহ্মাফোট করা যেমন, বয়কট ছাড়িয়া স্বদেশীপণকে চাপা দিয়া, বৃথা কনস্টিট্যুশনাল আন্দোলনের নামে লাকালারি করিয়া আপনাদের সাহসের ও বলবীর্যের স্পর্দা করাও সেই রূপ। এ সকল ফাঁকা আওয়াজে আব কুলায় না। পর্বতপ্রমাণ মিথ্যা অপেক্ষা সূচ্যপ্রমাণ সত্য ও শক্তি যদি পাই তাও ভাল। যদি সত্যভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা কবিত্তে না পার, তবে ধর্মের খাতিরে, দেশের খাতিরে, অন্ততঃ সাংঘাতিক মিথ্যা আফালন ও বাহ্মাফোট পরিত্যাগ কর। [? ফেব্রুয়ারি ১৯০৬]

ব্রহ্মবান্ধবের বিচিত্র জীবন ও অগ্নিগর্ভ রচনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবাব আছে। এতাবংকাল গ্রন্থাকারে তাঁহার যে চারখানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই :

১। প্রবোধচন্দ্র সিংহ—‘উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব’

২। B Animananda—‘Swami Upadhyaya Brahmbandhav’ Part I and II 1908

৩। B Animananda—‘The Blade’ 1949

৪। হরিন্দাস ও উমা মুখোপাধ্যায়—‘উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ’ ১৯৬১

তাঁহার বিচিত্র জীবনের ও বহুমুখী প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এগুলিতে নাই, বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দানের কথা আলোচিত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ উপকরণভাব। এখন পর্যন্ত তাঁহার চেহারা ও চবিত্তের যত বর্ণনা পাঠ কবিষাছি তাহাতে তাঁহাকে খুব সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই না, শুধু 'The Blade' এই নামের মধ্যে মাহুঘটিব পরিচয় পাই। মদীয় আচার্য স্বর্গত বিনয়কুমার সরকার তাঁহার 'বৈঠকে' উপাধ্যায়ের যে চিত্র অঙ্কিত কবিষাছেন তাহা পাঠে তাঁহাকে অনেকটা ধারণা করা যাইবে। তিনি বলিতেছেন :

“এঁকে আমি ডন সোসাইটিতে দেখি ১৯০৪ সনে। ..
এ প্রথম দেখলাম। গেরুয়া-পরা লোক। পায়ে ছিল
না জুতো। কাছাখোলা সাধুর চেহারা। গায়ে জামা
নাই,—গেরুয়া চাদর। এই মূর্তিতে আমি একটা নয়া
হুনিয়ার খবর পেলাম। তখনও আমি বিবেকানন্দী দলের
কোনো স্বামীজীকে দেখিনি। সতীশবাবু [‘ডন
সোসাইটির’ প্রাণস্বরূপ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] ফকীর
বটে, কিন্তু তাঁর কাপড়-চোপড়ে সাধুমানি ছিল না।
ব্রহ্মবান্ধবই আমার অভিজ্ঞতায় সর্বপ্রথম আধুনিক বাঙালী
সন্ন্যাসী। কাজেই আমি তাঁর হাবভাবে বিশেষ
প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল—ব্রহ্মবান্ধব
সতীশবাবুই পববর্তী ধাপ। অল্পকরণযোগ্যও বটে। তাঁর
চোখের আর হাঁটাব ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল যে, লোকটা
চবিশ ঘণ্টা হুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে। মাহুঘের মতন
মাহুঘ। এই বকম লোকই চাই।

ভাবছিলাম,—একটা দিগবিজয়ী বাঙালীর বাচ্চাকে
স্বচক্ষে দেখা গেল। বিবেকানন্দও দিগবিজয়ী বটে,
কিন্তু তাঁকে চোখে দেখি নি। ব্রহ্মবান্ধব বিলেতে গিয়ে
কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিয়েছেন। সেই বক্তৃতার
ফলে বিলাতী সমাজে একটা আন্দোলনও রুজু হয়েছে।
সতের বৎসরের এক ছোকরা আমি। এর চেয়ে বড়
ঘটনা বাঙালীর জীবনের পক্ষে ভাবতে পারি নি। বাপ্‌কা
বেটা ব্রহ্মবান্ধব সন্দেহ নেই।

ব্রহ্মবান্ধব একজন জবরদস্ত স্বার্থত্যাগী ও নির্ভীক
কর্মবীর। লোকটা ডানপিটে, তাদড় আব ভবঘুরে।
যতগুলো গুণ আমাব বিবেচনায় যুগপ্রবর্তকের লক্ষণ
সবগুলিই তাঁর ছিল। তাঁর সংস্পর্শে এসে যুবক-বাঙলার
অনেকে স্বদেশ-সেবার নানা কাজে মোতাবেন হতে
পেরেছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তাসম্পদে বাঙালী জাত
ঐশ্বর্যশালী হয়েছে। তাঁর জীবন-কথা স্বতন্ত্রভাবে বড়
আকারে আলোচিত হওয়া উচিত। ১৯০৫-এর পববর্তী
বঙ্গ-সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের বিরাট
ব্যক্তিত্ব জলজল করেছে।”

এই ব্রহ্মবান্ধব। যাহারা বিশ্বসংস্কৃতির মোহে ভারতীয়
ঐতিহ্য হইতে ক্রমাপসারিত হইতেছেন তাঁহারা প্রশ্ন
কবিতে পারেন ব্রহ্মবান্ধবের পুনরুজ্জীবনের কি প্রয়োজন
আছে? ভাবতবাসী হিন্দু যখন “সেতুলাব” হইবার সাধনা
কবিতেছে এবং বাঙালী যখন মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের
‘সমাজ’-‘সংসার’ বিস্মৃত হইয়া একান্তভাবে শহরে
আন্তর্জাতিকতায় গা ঢালিয়া দিয়াছে, যখন বাংলাদেশের
নগবে পল্লীতে ঘাটে মাঠে বাটে হাটে বাংলা ভাষায় ও
বুলিতে বাঙালীব কর্ণরুহর ভূপ্ত হইবার উপায় সন্ধান হইয়া
আসিতেছে, যখন বাঙালী মেয়েরা পালপার্বণ মোষা-নাড়ুর
সঙ্গে বাংলা ছড়া ও ব্রতকথা রূপকথা ভুলিতে বসিয়াছে
তখন যাহারা চণ্ডীদাস-কুন্ডিলাস-মুকুন্দরাম-কাশীরাম দাস-
রামপ্রসাদ-ভাবতচন্দ্র-মধুসূদন-বঙ্কিমব কাছে এখনও মনোব
খোরাক খুঁজিতেছেন তাঁহারা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে স্মরণ
করিবেন বইকি। যিনি নিজে বৈদেশিক ধর্মে ও বৈদেশিক
ভাষায় সম্পূর্ণ দীক্ষিত হইয়া বলিতে পারিয়াছিলেন :

“আমাদের হীনতা দূর করিবার এক প্রশস্ত উপায়
আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহং বিন্দুগুলিকে ভগবৎচরণবিনির্গত
জাতীয় জীবন-জাহ্নবীতে নিমজ্জিত কবিতে হইবে।
এসো—হিন্দুর সেই ঐতিহাসিক পাবস্পর্শকে অঙ্গীকার
করি। মূল ভ্রষ্ট হইলে বিনাশ অপরিহার্য। এসো,
আজ সমগ্র দেশের সহিত অতীতের স্মৃতিস্থ উত্থানপতনের
অল্পভূতির সহিত—স্বদেশাহরণের মত্ততার সহিত এক
বিবাট অভেদ প্রাণনৈবেদ্য উৎসর্গ করি। আমাদের ব্রত
উদ্ঘাপিত হইবে।”

একটি চতুর্দশপদী কবিতা দিয়া ব্রহ্মবান্ধবের শতবার্ষিক
পূজা উদ্ঘাপিত করিতেছি। অনেক কথা এখনও
বলিবার রহিল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১—১৯০৭)

ভবানীচরণ ছাঁড়ি তুমি হ'লে শ্রীব্রহ্মবান্ধব,
যীশুযজ্ঞে প্রাণাহুতি দিলে পূর্ব বৈদাস্তিক মতে
ভবাবহ অন্ধকারে বিঘোষিধা ‘সন্ধ্যা’-শঙ্কর
আবাব তুলিলে সাড়া মুচ স্তব্ধ মূর্তের জগতে।
অশান্ত সন্ন্যাসী, তুমি হেবিলে না ‘ভারত-উদ্ধার’
হেবিলে না যদি ফেবে পুরাতন সে ‘পাল-পার্বণ’
তবু তো তপস্বী তব ভেঙেছে ফিরিঙ্গী-কারাগার,
বিদেশের মোহ হ'তে ফিবায়েছে আমাদের মন।
নগ্নগাত্র উপবীত, কণ্ঠে তব বজ্রের নির্ঘোষ,
অস্ত্রায়ের অত্যাচার-প্রতিরোধী, সমুন্নত ভাল,
সর্বদুর্বলতাদ্বন্দ্বী বহিবর্ষী তব রক্ত রোষ
মরণ-নিশীথ ভেদি আনিয়াছে জীবন-সকাল।

তোমাবে প্রণাম করি বাংলাব হে ব্রহ্মবান্ধব,
তুমি ফিরে না আসিলে কে কবিলে নবায়-উৎসব ?

পুরাণ কাহিনীর রূপক ব্যাখ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র

ভূর্গামোহন ভট্টাচার্য

প্রাথমিক বৎসর পূর্বে প্রাচ্যবিজ্ঞান প্রখ্যাত পণ্ডিত তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের বরেন্দ্র পুরুষ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট কুমাবিল ভট্টের উক্তি উদ্ধৃত কবিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কুমারিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে তন্ত্রবাস্তবিক, শ্লোকবাস্তবিক ও টুপটীকা বচনা করিয়া মীমাংসাদর্শনে ভাট্টমতের প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁহার মীমাংসা-টীকা দুইটি প্রসিদ্ধ পুরাণকাহিনীর রূপকমুখী ব্যাখ্যা দিয়াছেন—একটি স্বকল্পাসক্ত প্রজাপতির কাহিনী, অপরটি অহল্যাজার ইন্দ্রের কাহিনী। রাজেন্দ্রলালের স্বহস্তলিখিত মূল পত্রের প্রতিলিপি অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণোদযবেলায়ামুসমুত্তমভ্যতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদুহিতুত্বেন ব্যপ-
দিশ্যতে। তস্মাৎ চারুণকিরণাথ্যবীজনিষ্কপাৎ স্ত্রীপুরুষ-
সংযোগবহুপাচ্যঃ। এবং সমস্ততেজাঃ পবনেশ্বব-
নিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিভৈবাহনি লীযমানতয়া
রাজেবহল্যাশব্দবাচ্যাসাঃ ক্ষয়াক্ষয়জরগহেতুত্বজ্যৈষ্ঠ-
তাস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজাব ইত্যাচ্যতে
ন পরস্ত্রীব্যভিচারায়।

মহাশয়,

মীমাংসাতন্ত্রে অথ দৈব[ক্রমে] উপরে উদ্ধৃত বাক্যটি পাইলাম। আপনি ইহার নিমিত্ত আমাকে কএকবার লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অজ্ঞ কা[র্যে] ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত ইহাব উদ্ধার করিতে পারি নাই।] মাসাতীত হইল আরণ্যকবিষয়ে একটা প্রশ্ন কবিয়া-
ছিলাম, কিন্তু অতাপি তাহার প্রত্যুত্তর পাই নাই। একবার সাক্ষাতেরও বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও ঘটনা উঠে নাই। ব্রাহ্মণসর্বস্বখানি প্রতিপ্রাপ্তির বাঞ্ছা করি ইতি—

১৮৯৭২।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র

বেদ-পুরাণাদিশাস্ত্রে বহুপ্রাকৃতিক ঘটনার রূপকাঙ্ক বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মা প্রজাপতি স্বীয় দুহিতায় আসক্ত ছিলেন—ইহা এইরূপ এক প্রাচীন বিবরণ (ঋগ্বেদ ১০, ৬১, ৫-৭)। ব্রহ্মা ও প্রজাপতি উভয়েই সূর্যের নাম (শাখপুরাণ ২৩, ২৩)—

এষ বিষ্ণু ববিনাম্না ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ।

সহস্ররশ্মিরেযোহত্র পবনাত্মা প্রজাপতিঃ ॥

প্রজাপতি-দুহিতা একমতে জ্যোঃ, অন্তমতে উষা— (প্রজাপতিবৈ স্বাং দুহিতবমভ্যধ্যাদিবমিত্যত্র আত্মরূপ-
সমিত্যন্তে—(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩, ৩৩, শতপথব্রাহ্মণ ১, ৭, ৭, ১)। মৎস্যপুরাণের আখ্যানে রূপকের একটু পরিবর্তন দেখা যায়। সেখানে বেদবাশি ব্রহ্মা, সাবিত্রী বা গায়ত্রী তাঁহার দুহিতা। বেদ ও সাবিত্রীর মিলনে দোষ হইতে পারে না।—

বেদবাশিঃ স্মৃতো ব্রহ্মা সাবিত্রী তদধিষ্ঠিতা।

তস্মান্ন কশ্চিদোষঃ স্ত্রাং সাবিত্রীগমনে বিভোঃ ॥

মিত্র মহাশয়ের উদ্ধৃত মীমাংসাবাক্যে উষাকে সূর্যের দুহিতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সূর্যের উদয়ে আলো-
আধারের মিশ্রণে উষার জন্ম হয়, সূর্যের সূর্য উষার জনক। সূর্য অগ্রসর হইলে উষাকে সরিয়া যাইতে হয়, তখন মনে হয় সূর্য যেন উষার পশ্চাদ্ভাবন করেন। এই দৈনন্দিন প্রাকৃতিক ঘটনা দর্শনে ‘প্রজাপতির দুহিতাগমন’ কাহিনীটির উৎপত্তি হইয়াছিল।

কুমাবিল ভট্টের মতে ইন্দ্র-অহল্যার বৃত্তান্তও রূপকে প্রাকৃতিক ঘটনার প্রকাশ। ‘অহল্যা’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বাজ্রি, কাবণ রাজি দিবসে লীন হইয়া যায়—অহনি লীয়তে। সেই অহল্যাকে যিনি জীর্ণ করিয়া দেন, তিনি ‘অহল্যাজাব’ অর্থাৎ সূর্য।

সেকালের স্মাহিত্যিক রাজরুক্ষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার “ভারত মহিমা” (বঙ্গদর্শন ৩য় খণ্ড, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৮৮১) নামে এক প্রবন্ধে কুমারিল-বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। উহা তাঁহার ‘নানা প্রবন্ধ’ গ্রন্থেও (১৮৮৫) স্থান পাইয়াছে।

উদ্ধৃত পত্রখানি রাজেন্দ্রলাল কাহাকে লিখিয়াছিলেন, পত্রে তাহার উল্লেখ নাই। বিনীত ভাষা দেখিয়া মনে হয়, পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি লেখকের সম্মানভাজন ছিলেন। একখানা পুরাতন বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে পত্রখানা পাইয়া-
ছিলাম। হয়তো বা এই গ্রন্থ এক সময়ে বেদাচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী ব্যবহার করিতেন। পত্রখানি তাঁহাকেই লিখিত হইয়াছিল কি?

আতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মানুষই তোমাকে গড়িয়েছে বলে
তুমি তো মানুষ গড় নি ?
ধবণীতে নেই মানুষও—রষেছে
তাহাদেরি মনে ধবণী ।
জগতের লোক তুষা ভোট দিয়ে—
ভুবনেশ্বর সাজিয়েছে কি হে ?
তরণী তো বোঝা বহেনাক শুনি
বোঝারাই বহে তরণী ।

২

তুমি কল্পনা তুমি জল্পনা—
নাহিক তোমাব কিছু নাই
শুনি আনন্দে হাততালি দিই
যুগা লজ্জায় মরে যাই ।
বুদুদ দিই সাগরে উডায়ে—
শূর্য বেড়ায় বশি ছডায়ে,
পদ্মনাভের মায়া এডাইয়া—
উর্গনাভের কাছে ধাই ।

তুমি কিছু নও—ঠেকিয়া শিখেছি
তুমি ছাড়া আর কিছু নাই ।
জলের জীবাপু এত ফেঁপে উঠি
মানিতে চাহি নে দরিয়াই ।
তোমাব ইচ্ছা বিনা—জানি খাটি
পডেনাক জল—ঝরে না পাতাটি ।
কি প্রবল প্রভু তুমি জগদীশ—
মহিমার নাহি সীমা পাই ।

বিস্ময়

বনফুল

বিস্ময়ের সীমা নাই ,
নিত্য তার চক্রবাল-বেথা
দূর হতে দূরে সবে যায় ।
ধাবমান বলীবর্দ-পুচ্ছে একদিন
সীমাবদ্ধ ছিল যে বিস্ময়,
আজ তাহা সীমা-হারা
বকেট-ভ্রমণে ।
মুখে, বুকে, কটিদেশে,
আনমিত পলাশ-নয়নে,
আত্মহারা যে বিস্ময়
পায় নাই কোন থই
যুক্তিব লগিতে,
আজ তাহা আরও থই-হারা
খবশান রসনার স্তম্ভীকর বাক্যে ।
স্বহৃদাস্ত দেশ-ভক্ত
একদিন যে বিস্ময়ে করেছিল অভিভূত,
সে বিস্ময় হল বিস্ফারিত
হেরিছে তাহারে যবে
কালো-বাজাবেতে ।
রনের ঘে-সাধকেরে
একদিন সবিস্ময়ে প্রণাম করিয়াছি
বিহ্বল পুলকে,
আজ তারে নমিলাম পুন
যশের কাঙাল হেরি' ।
বিস্ময়ের সীমা কোনও মানে না নিয়ম
তার সীমা সততই সীমা-রেখা করে অতিক্রম ।

গোধূলি

শ্রীকালিদাস রায়

পশ্চিম দিগন্তে রবি ডুবি ডুবি করি
এখনো ডুবে নি, অস্ত-সাগরের তরঙ্গ উপরি
উঠে নামে, যেন নাচে। মেঘের চিকুর
ঢাকে, পুন মুক্ত করে দিগন্ত-সীমন্তে সিঁহুর।
অন্তমনে দেখি তাই, ভুলে যাই দিবা-অবসান।
তুরন্ত ফিরিছে নীড়ে আকাশে উড্ডস্ত যত গান।
রাখালের বেণু তোলে গোষ্ঠ-পথে পূরবীর স্বব
উদাসী পিয়াসী কানে লাগে স্তম্ভুর।
ধেমুদল আসে ফিরে যেন হৃদগন্ধার তুফান
বধুরা ফিরিছে ঘরে তুলি ঘটে কাকনের তান।

হাঁসগুলি ফিরে ঘরে শ্রান্তপদে সস্তরণ ছাড়ি,
কৃষকেরা ফিরে ঘবে শুষ্কক্ষেতে জলসেচ সাবি।
আলোক ফিরিয়া যায় দৃষ্টিপথ হতে ধীরে ধীরে,
ফেবার সময় এটা আমারেও যেতে হবে ফিরে
কোথায় কে জানে ?
যেথা হতে আসিয়াছি হয়তো সেখানে।
বক্তচন্দনাক্ত ভাল পশ্চিম গগন,
এই তো সে গোধূলি লগন।
এ জীবনে স্মরণ্য গোধূলি,
আসন্ন যে মহাযাত্রা বারবার যাই তাহা তুলি।
ধরার বন্ধনজাল ছেদিবারে কিছু অবসর
দিতে বৃথা ডুবে নি কি দয়াময় দেব দিবাকর ?

বেদে

শ্রীকৃষ্ণদে

দড়ি-দড়া-ঝুড়ি-টিন-বাঁশ-তাঁবু-পেটরায,
ডুগ-ডুগি-খঞ্জনি-ঢোলকেব চেঁচুবায,
বন-মাছঘের হাড়, মরা শকুনের আঁত,
সাদা বাহুড়ের ডানা, শাঁখামুঠি-বিষদাঁত,
শ্মশানের পোড়ামাটি, শিকড়ের ঝুলি আর,—
পথে পথে চলে ওরা নিষে বেদে-সংসার,
দল বেঁধে থাকে সব, যেথা যায় প্রাণ চায়,
মেয়েগুলো ঘোরে ফেরে রঙদার ঘাঁঘরায,
দোলে বেণী লটপট ফিতে তাতে জরিদার,
ঝুটো মুস্তার ছল, কথা যেন ক্ষুব্ধার।
কাজলের রেখা-টানা চোখে ছুরি দেয় শান,
রাঙা ঠোঁটে মুহু হেসে বিড়ি ধরে দেয় টান,
চাপা-ফুলি আঙুলেতে ইশাবায ডাকে "আয়,"
আলুখালু ঘোঁবন টলোমলো পিপাসায়।

কুকুর ছাগল হাঁস মুরগীও সাথী তাই,
বাঁকে ঝোলে হাঁড়িকুঁড়ি, তাঁবু গাড়ে সব ঠাই,
ঝাড়ফুক তুকতাক জানে ভানুমতী-খেল,
আছে কুমীরের দাঁত, ধনাই পাখির তেল,
হাত দেখে বলে দেয়—কোণ্ডা বশ, অপবশ,—
মনের মাছ টানে শিকড়েতে করি বশ,

ঢায়া-চোখো বুড়ো বেদে, বাহু বুড়ী বউ তার,
মিটিমিটি হাসে শুধু, থুথুথু কাশে আর !

কোন ফুল হাতে নিলে মন্দও ভাল হয়,
কোন ফল খেতে দিলে সব কাজে হবে জয়,—
ঘরভাঙা, ঘরবাঁধা, মারণ ও উচাটন,
সবকিছু জানে ওরা যখন যা প্রয়োজন,
কুলহারা বউ আর বউ-ছাড়া পতিকে
মস্তুরে এনে দেবে ওরা কোনও গতিকে,
ওরা জানে কি ওষুধে দূর হবে লজ্জা,
আইবুড়ী ছুঁড়ি পাবে নব-ফুলশয্যা।

মেঘ-কালো আকাশের নীচে বসে গালে-হাত,
ঘুমহারা চোখে বুড়ো কি যে ভাবে সাবারাত,
কত গ্রাম দেখেছে সে, কত গিরি, নদীপথ,
কত বন, কত মরু, সাগরের সৈকত,
জানে না সে পথচলা কবে তার হবে শেষ,
মরণের শেষ-ঘুমে ডেকে নেবে কোন দেশ।
যে মাটিতে কিছুদিন ওবা এসে বাঁধে ঘর,
সে মাটির মায়া যেন ভরে থাকে অন্তর।
তবু ছেড়ে যেতে হবে,—যাযাবর ওরা, তাই—
চলাপথে দেখে নেবে পৃথিবীর শেষটাই !

ভোরের প্রসাদ

জগদীশ ভট্টাচার্য

একটি মিষ্টি স্বপ্নের আবেশে

ঘুম ভেঙে গেল ভোরবেলা ।

মহানগরীর গলিপথে

বৈষ্ণব বৈরাগী খঞ্জনি বাজিষে

ঘরে ঘরে বালগোপালের ঘুম ভাঙিয়ে চলেছে ।

দূর থেকে আসছে ভেসে

ভোবের পাখির অস্পষ্ট কাকলি ।

চোখ মেলে দেখলুম

আমার একতলাব ঘরটি

খেতপদ্মের লাবণ্যে উঠেছে ভরে ॥

কাল সন্ধ্যায় গিষেছিলুম

ববীন্দ্র-শতবর্ষের এক উৎসব-সভায় ।

একটি বালিকা তাব কচিকোমল হাতে

পরিষে দিয়েছিল গলায় রজনীগন্ধাব মালা ।

আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল

রবীন্দ্রনাথের প্রেম :

মহাকবির জীবনে দিব্য-‘এরসে’র অপূর্ব সারস্বত লীলা ।

বক্তৃতাব শেষে

সভাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠেছিল কবতালিতে,

ধন্বাদদাতার কণ্ঠে প্রশস্তিবাচন শুনে

হয়েছিলুম লজ্জিত ॥

রাত সাড়ে-মটায়

বেডরোড দিয়ে বাড়ি ফেরার পালা ।

ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি ।

বাতের বেলা তারাতবা আকাশের নীচে

গড়ের মাঠ দেখছে প্রেমের স্বপ্ন ।

শীতল হাওয়ার স্পর্শে

সেই স্বপ্ন ভেসে এল আমার মনে ।

মধ্যরাতের মাঠেব বাঁশি

উঠল বেজে আমার সভায় ॥

আসনের পাশেই পড়ে আছে

সভায় পাওয়া রজনীগন্ধাব মালা ।

মনে হল এ মালা তো চাই নি আমি ,

মুগ্ধ উচ্ছ্বাসেব কবতালিতে কি হবে আমার ?

রাতের অন্ধকাবে

মর্মকোষে উঠল ফুটে একটি বাসনার বক্তৃপদ্ম :

তোমার শঙ্খশুভ্র বাহুগলের মালা

পরিষে দিয়েছ আমার গলায়,

থরথর আবেগে বুকের স্পন্দন তুরুতুরু,

লাজনম্র মুখখানি ঈষৎ উন্নমিত,

নির্মীলিত চোখে আত্মনিবেদনের মধুব আবেশ,

অমৃতের পানপাত্র কানায় কানায় ভরা ॥

স্বপ্ন আমার স্বপ্নই রয়ে গেল ,

গাড়ি এসে পৌছল বাড়িব গেটে ।

কাল বাতের বেলা কি পাই নি

তাই নিয়ে ছিল মনের বিক্ষোভ ;

আজ ভোরের জাগরণে

পেলাম আমার দেবতার প্রসাদ ।

আকাশেব জ্বাকুসুমসংকাশ সুর্যোদয়

আড়াল পড়েছে আমার ঘবের দেয়ালে ।

তবু পুবেব খোলা জানলায়

গরাদের ফাঁক দিয়ে এসেছে

শঙ্খশুভ্র বজনীগন্ধার মালা ।

আমি পেয়েছি ॥

সেই আমি

শ্রীধীবেন্দ্রনাথায়ণ রায়

অনেক বাঁধন জড়ানো বয়েছে গায়ে,
অনেক তুচ্ছ মায়ায় অন্ধ আঁখি
তবু চলিতেছি তোমার আশিস-ছায়ে,
মাথায় তোমারি করুণা পরশ মাখি ।
প্রাণের মন্ত্রে রচিলাম জয়গান,
দেহের তন্ত্রে খুঁজি তব অবদান,
কতু অল্পরাগ কতু করি অভিমান
কতু সঙ্কোচে নিজেরে ঢাকিয়া বাখি ।
তবু এলে তুমি কখন অলখ পায়ে,
আনমনে যবে তোমারেই ভুলে থাকি ।

মনে হয় সেই ঠিকানায় চলে যাই,
যেথায় মোদেব অধিধ জ্ঞানাজানি
খণ্ডিত হয়ে তবু যেন খুঁজে পাই
আমার পরাণে তোমার ছন্দখানি ।
একদিন তুমি পাঠালে নির্বাসনে,
অ-ধবা স্বপ্নে ধবণীর প্রযোজনে,
বহুজন মাঝে, কখনো সংকোপনে
মর্মে পশে নী আলো-তরঙ্গ বাণী
ওরে ভয় নাই, কিছু তোর ভয় নাই
আধারে আসিবে আলোকের হাতছানি ।

সেদিন আমি কি ছিলাম যুমে অচেতন
অমাবস্তাব অন্ধ তিমির কোলে ?
সেদিন জগতে কিসেব সে আযোজন
রূপের লাগিয়া অশ্রুত কল্লোলে ?
কিছু জানি নাই, কেন এই ব্যাকুলতা,
বুঝি নাই কিছু, কী তার মরম কথা,
শুধু চাবিধার ঘিবিয়াছে নীরবতা,
কি জানি কোথায় ভ্রাস্তি-লহবী দোলে
আলোকের চির-বন্ধু যে অস্থূখন
জীবনের এই যবনিকা টেনে তোলে ।

স্মরণের পথে খুঁজিয়া হয়েছি সারা
জীবনের কূলে করি যে অন্বেষণ—
আমার আমি যে কোথায় হয়েছে হাবা
তোমাবে-খুঁজিতে করে না কঠিন পণ ।
তুমি নহ কি গো এ-আমির প্রিয়তম ?
ভুলেছি তোমারে ক্ষম হে আমাবে ক্ষম,
যে-তুমি আডালে, সে তুমিবে নমোনমঃ—
আত্মীয় আমি তোমারি আপনজন,—
বহুদিন পরে পেয়েছি তোমার সাড়া
আজি হুঁহ মাঝে মিলন-গুঞ্জবণ !

প্রাণের সাগরে উঠিছে তুফান ভারী
চঞ্চল মন কখনো রয় না স্থির
তোমাতে আমাতে হল তাই ছাড়াছাড়ি,
সে-আমি হারালো যেথায় অনেক ভিড় !
খুঁজিতে তোমারে সময় নাহিক মেলে,
উধাও পরাণ, ছুটে যায অবহেলে,
কিছু দেখি নাই যবে তুমি কাছে এলে,
বিরহ-সজল আঁখি দুটি স্বগভীর
সে-আমিরে আমি সহসা দেখিতে নারি
যেন কী কারণে হয়েছি ভেঁট-নীড় !

জানি, ভুলে থাকা আমারি সর্বনাশ—
একদা সবাই দেউলিয়া ক'বে যোরে ;
ভাগ্য রচিবে ভিখারীর ইতিহাস
ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে দোরে দোবে ।
যুগ যুগ ধরি তুমি কি আমার নও ?
কখনো বন্ধু, কখনো শত্রু হও ;
অনাদি কালের অনন্ত কথা কও—
তবু মাঝে মাঝে কী যেন নেশার ঘোরে
এ-আমি করিছে সে-আমিরে পরিহাস
দেহের দেউলে ছলনার মায়াডোরে ।

অনিমেব চোখে ছুনিয়া রয়েছে চেয়ে,
 আলোকে আধারে আমাদের পথপানে,
 তোমাতে আমার আমি কী গো রয় ছেয়ে
 কামনা-বিধুর মধুর আত্মদানে ?
 চিরন্তনের ছন্দে যদিও বাঁধা,
 তুমি আমি মাঝে জগতের হাসাকাঁদা,—
 তাই মিছে হয় জীবনের স্রব সাধা,
 ভীকু লজ্জায় লুকাই অত্থানে—
 সাধ্যা ছিল না, সাধনাব তবী বেয়ে
 চেনা-পথে চলি স্বজনেব সন্ধানে !

তবু মনে হয় আবার বাজিবে বাঁশী,
 প্রভাতের কূলে হবে সে নিমন্ত্রণ,
 ভুলের ফসলে কখন দিবে সে নাশি'
 মর্মের মাঝে দিব্য উত্তরণ !
 অমৃতের সেই আলোর শিশুরা সবে
 আকুল হইয়া মাতিবে মহোৎসবে,
 সেই শুভদিন, বল, সে আসিবে কবে;
 খুলে যাবে মোব কুণ্ঠিত বাতায়ন ?
 সে মহা-আমি যে আলোর ঝলকি আসি'
 কহিবে, ঘুচাও সীমিতের বন্ধন ।

নিরন্ত

অনির্বাণ

স পর্যগাৎ :
 আর সহসা তমিস্রার বন্ধমুষ্টি উন্মোচিত হল
 আকাশ জুড়ে আষতী উষার পদ্মরাগ নিঃশব্দ জোয়ারে ।
 ফুটল আনন্দ, জাগল ভুবন ,
 শাস্তবী দৃষ্টি-সৃষ্টির মুগ্ধ স্বীকৃতিতে
 চিত্রিত মৃণালে শিউবে উঠল আকৃতির কোমল মিড় ।

এই কি প্রেম—
 আমারই সত্তার বিশ্বষ্টিতে
 আমার চিত্তিব নন্দন বিভ্রম :
 মায়া—কিস্ত চিন্নায়ী,
 আমারই আত্মজা আমার নন্দিনী দযিতা ?

নিঃসঙ্গ অনিন্দীর কণিকায়
 কখনে যে বিদ্ধ হল জ্যোতির ঐষিজ,
 অপর্ণা চেতনায় জাগল কখন ক্ষণ আর বিন্দুর বিধুনন,
 কো অজ্ঞা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ ।
 নিরন্তর জিহ্বাঙ্গা—
 আর তারই 'পবে
 অজাতসংশয় শৈবদৃষ্টির শৈশবী কৌতুকচ্ছটা ।

উন্মেষের উপচে-পড়া ঐশ্বর্য
 বারবার মিলিয়ে যায় নিমেষের নিস্পন্দ রিক্ততায়,
 রূপে-অরূপে ঝিকিয়ে ওঠে নিরন্তর বিদ্যুৎ-বিনিময় :

কে জানে কোন নিম্ভল চেতনাব কীলকে
 নিশ্চ্যত রয়েছে এই হিন্দোলার ভোর ।

হে নচিকেতা,
 একধির ভাস্বতী ঋষ্টির ফলকে
 বৈবস্বতের হৃদয় হতে
 উদ্ভারিত করেছ কি তুমি তাব
 যুগ্মপক্ষ সংবিতের অত্মত্তরণ এই রহস্য :
 পৃষার নক্ষত্রহ্রাতির বৃত্তিতে কেন
 মৌবদীপ্তির সহস্ররশ্মি প্রচ্ছুরণ ?
 জীবনে-মরণে উন্মেষে-নিমেষে কেন
 অনবশান উষাসানন্তের থত্থোতকা
 কাল আর অকাল জুড়ে ?

রহস্যেব শেষ তো কোথাও নাই—
 আছে শুধু মহাপ্রতরণের তুর্ঘনাদ :
 হে প্রচেতা,
 রিক্ত কব, ব্যাপ্ত কর আপনাকে—
 মহাশূণ্ডের নীহারোত্তব নিঃসংজ্ঞার উজ্জান বেঘে
 ঢেউ খেলিয়ে সে চলে যাক
 নির্দাম নীরুপের অভিনাবে ,

আব অস্তিস্বেব নির্দীপ অজস্তায়
 এক ফোঁটা অশ্রুব মুক্তায় ঢলুক
 উমার প্রেম—
 গুহাহিত শৈবভাবনার প্রত্নোত্তী শৈল-নিঃশব্দের মত ।

রাষ্ট্রচিন্তায় টলস্টয়ের গান্ধী রবীন্দ্রনাথ

ত্রিশশিভূষণ দাশগুপ্ত

রাষ্ট্রচিন্তাতে টলস্টয়ের সহিত গান্ধীজীব গভীর মিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতেই গান্ধীজী টলস্টয়েব সকল বইয়েব মাবকতে টলস্টয়ের এই রাষ্ট্রচিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-লাভ কবিষাছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রচিন্তা কোন দিনই একটা প্রাধান্য লাভ কবিত্তে পারে নাই, রাষ্ট্রচিন্তা তাঁহার ভিতবে দেখা দিয়াছে সমাজচিন্তাব, আত্মবুদ্ধিকভাবে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে রাষ্ট্রচিন্তা আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, লক্ষ্য কবিলে দেখিতে পাইব, তাঁহার সহিত টলস্টয়-গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে অনেক মিল রহিয়াছে। আসলে রাষ্ট্র-চিন্তা এই তিন জনের কাহারও নিকটেই নিছক রাষ্ট্রচিন্তা হইয়া দেখা দেয় নাই, এ চিন্তাগুলি তাঁহাদের গভীর জীবনচিন্তারই অংশ, সেই জীবনচিন্তা হইতেই এগুলি নানাভাবে উৎসাবিত হইয়াছে। জীবনচিন্তার মধ্যে সত্যেব প্রতি অবিচ্ছিন্ন মিষ্টা বিশ্বমানবেব প্রতি শুভেচ্ছা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, বলিয়াই ইহাদের রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যেও মিল, সহজভাবেই দেখা দিয়াছে।

পঞ্চাশোৎ বয়স হইতে টলস্টয়েব ভিতরে, যে অধ্যাত্ম-চিন্তা প্রধান হইয়া উঠিতেছিল, পূর্বেই দেখিয়াছি, সে অধ্যাত্মচিন্তাব লক্ষ্য কখনই পরলোক ছিল না, তাহার লক্ষ্য ছিল ইহলোক। গান্ধীজী টলস্টয়ের যে বইখানির কথা বিবিধ প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল 'ভগবানের রাজ্য তোমার নিজেরই ভিতরে' এই বইখানি। বইখানির মূখবন্ধের উপরে স্পষ্টভাবে লিপিত বহিয়াছে, Christianity not as a mystical doctrine but as a new understanding of life;— অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম টলস্টয়ের নিকটে কোন-একটা অতীন্দ্রিয়-বাদ ছিল না, ইহা ছিল জীবনকেই নূতন করিয়া বুঝিবার একটা প্রয়াস। এই প্রসঙ্গে টলস্টয় লাইবেল হইতে যে বাক্য উদ্ধৃত কবিয়াছেন তাহাও অতি প্রণিধানযোগ্য; একটি হইল এই—Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. (John iii, 32)।

অর্থাৎ, 'তোমরা সত্যকে জানিবে, সেই সত্য তোমাদিগকে মুক্ত কবিবে'। অপর একটি বাক্য হইল,— Fear not them that kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell (Matt x 28)। 'যাহারা দেহ হত্যা কবে কিন্তু আত্মাকে হত্যা কবিত্তে পারে না তাহাদিগকে ভয় কবিও না, বরং ভয় কবিবে তাহাকে যে দেহ এবং আত্মা এই উভয়কেই হত্যা করিয়া নরকগামী করিতে পারে।' এই উদ্ধৃতি দুইটির ভিতর দিয়া টলস্টয় দুইটি জিনিসের উপরে জোর দিতে চাহিয়াছেন, প্রথমতঃ, আমাদের সকল সাধনা সত্যের সাধনা হইয়া উঠিবে তখনই যখন তাহা আমাদের দেহ মনে আত্মায় কোথায়ও বন্ধনগ্রস্ত করিবে না, শুধু মুক্তি দিবে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জীবনচর্যার লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু দেহের পোষণ এবং দেহকে রক্ষা নয়, জীবনচর্যার ভিতর দিয়া যদি আত্মাকে রক্ষা করিতে না পারিলাম তবে বৃহত্তর মৃত্যু ঘটিল।

চার্চর্মের সঙ্গে যে টলস্টয়ের অত্যন্ত বিরোধ ছিল তাহার মূখ্য-কাবণ, টলস্টয়ের বিশ্বাস, হিংসা দ্বারা পাপের প্রতিবোধ করা উচিত নয়, যিশুখ্রীষ্টের এই যে প্রধান বাণী—চার্চ এই বাণীকে অস্বীকার করিয়াছে। যেদিন হইতে চার্চ বাপ্তিস্ম-সহিত মিতালি করিয়া বাপ্তিস্মের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দিন হইতেই চার্চ যিশুখ্রীষ্টকে অবমাননা কবিয়াছে, অস্বীকার করিয়াছে তাঁহার ভূবনমঙ্গল বাণীকে। অহিংসা এবং প্রেমই হইল যিশুখ্রীষ্টের সমগ্র জীবনের মূল কথা, আর হিংসা এবং অপ্রেম হইল রাষ্ট্রসমূহের বনিয়াদ। রাষ্ট্রশক্তি আইনের পব কেবল আইন করে, মুখে সর্বদাই বলে, এ আইন করে রাষ্ট্রবাসিগণকে সর্বদা মুক্ত রাখিবার জন্ত, জগতের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, আইনে জনসাধারণেব উপবে কেন্দ্রল বন্ধন আসিয়াছে। দেহেব বন্ধনকে রাষ্ট্র

কোথাও যদি এতটুকু শিথিল করিয়া দিয়াও থাকে, আত্মা বন্ধনকে সে আরও দৃঢ় এবং ঘনীভূত কবিয়া তোলে। রাষ্ট্র বলে, জনগণের রক্ষা জন্ত আইন; ইতিহাস বলে, জনসাধারণকে সর্বভাবে উৎপীড়িত করিবার জন্তই যত আইন। আমরা যাহাকে একটি অতি সুগঠিত রাষ্ট্র বলি তাহার অধিবাসিগণের যদি মন বলিয়া কোন জিনিস থাকে তবে তাহারা ধীরে ধীরে বুঝিয়া ফেলে যে, এখন আব আমরা প্রত্যেকে এক একজন মানুষ নয়, আমরা ধীরে ধীরে একটি বিরাট স্বৈরাচারী বাস্তবজ্ঞের কুক্ষিগত হইয়া প্রত্যেকেই সেই বিরাট যন্ত্রের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় আমাদের স্বাধীনতা—কোথায় আমাদের মুক্তি,—প্রত্যেকে আমরা পদে পদে বন্দী—বন্দী দেহে মনে আত্মায়। রাষ্ট্রের জনমতেব নাম করিয়া রাষ্ট্রশক্তি সব লোককেই কতকগুলি কাজ করিতে বাধ্য করে; জনমতেব দোহাই পাড়া হয় বটে, কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে কোথাও ‘জন’কেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ‘মত’কেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং আবও মজা এই, জনমতেব নাম করিয়া অনেক সময় সকলকেই যাহা কবিতো বাধ্য করা হয়, ব্যক্তিগতভাবে সে কাজ কবিতো সম্ভবতঃ কেহই রাজি হইবে না।

টলস্টয়ের মনে একটা ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে আমাদের প্রচলিত বাস্তবাবস্থার একটি প্রাথমিক এবং প্রধান কাজ হইল মানুষের ভিতরে হিংসা বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়া লোকের মধ্যে সামরিক শক্তি ও প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা এবং তাহা কেন্দ্রীভূত এবং সুসংহত করিয়া সেই শক্তিকে অপর এক দল লোকের সর্ববিধ সর্বনাশের জন্ত প্রয়োগ করা। যাহারা এইরূপভাবে রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিতে পাবেন ইতিহাসে তাহাবাই বড় বড় বাস্তব-কণ্ঠার বলিয়া প্রখ্যাত। অপরোহ প্রাতি গভীর বিদ্বেষ জাগাইয়া না তুলিতে পাবিলে আমরা ভিতবকার হননেচ্ছা এবং সেই হননেচ্ছায় পশুবল-প্রয়োগেব প্রবৃত্তি তীব্র হইয়া উঠিবে কেন? রাষ্ট্র কেবলই তাই মানুষের হিংসাকে জাগ্রত ও সুগঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা কবে। ইহাকেই আমরা গালভবা নাম দিয়া থাকি সামরিক শক্তি গঠন করা।

এত সামরিক শক্তির আয়োজন কিসের জন্ত? স্পষ্ট

জবাব আসিবে, ধর্মের পরিপালনেব জন্ত এবং অধর্মের বিনাশের জন্ত, আর ইহাব ভিতর দিয়া আত্মরক্ষা ও বিশ্বব্যাপী মঙ্গলপ্রতিষ্ঠার জন্ত। কিন্তু এই মূল কথাটাকে অর্থাৎ হিংসা শক্তিদ্বারা ধর্মের পরিপালন এবং অধর্মের বিনাশ আদৌ সম্ভব এই কথাটাকে টলস্টয় কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। হিংসা স্বরূপে অধর্ম, হিংসার সহচর যে সামরিক শক্তি তাহাও স্বরূপে অধর্ম। অধর্ম কি করিয়া অধর্মকে নাশ কবিলে আর ধর্মকে রক্ষা কবিলে? মূলতঃ অধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবাবস্থা কি করিয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপন কবিতো পাবে? ‘ভগবানের রাজ্য তোমার নিজের ভিতরেই’ এই বইখানিও ভিতরে মানুষকে টলস্টয় তাই কেবল এই বোধেই উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রচলিত রাষ্ট্রবিধির ফাঁদে পড়িয়া নিজে দাস হইয়া পড়িও না—যন্ত্র হইয়া পড়িও না—তোমার নিজের স্বাধীন হৃদয়ে তুমি তোমার মনুষ্যবোধকে ঘনীভূত করিয়া তোল এবং তাহাব ভিতর দিয়াই নিজেব মধ্যে ভগবদ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর।

বাস্তবাবস্থার ভিতর দিয়া হিংসা ও বলপ্রয়োগে পাশব-বৃত্তিকেই বৈধ এবং সম্মানিত করিয়া তুলিবার যে অপচেষ্টা টলস্টয় তাহাব ‘আমাদের যুগের দাসত্ব’ *The slavery of our times* বইখানিও ভিতরেও নানা ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহারই তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। রাষ্ট্রপ্রণীত আইন সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন, “আইন-সমূহ হইল কতকগুলি বিধি, যে বিধিগুলিকে তৈয়াবী করিয়া লয় সেই সব লোকই যাহাবা সুগঠিত হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বাবাই শাসন কবে।”

রাষ্ট্রের পক্ষে বলা হইয়া থাকে, রাষ্ট্রের তরফ হইতে যদি এই বলপ্রয়োগ না করা হইত তবে কোন নাগরিকই যে কোন সময়ে নিরাপদ নহে, তাহার নিরাপত্তা বিধানের জন্তই এই বলপ্রয়োগের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া রাষ্ট্র ব্যতীত আমরা আমাদের সর্বসাধারণের মঙ্গলকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও পাইতে পাবিতাম না—যেমন শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্ত যত প্রতিষ্ঠান। টলস্টয় এ কথাও স্বীকার করিবেন না। সরকারী ব্যবস্থা ব্যতীত জনসাধারণ নিজেদের মধ্য হইতেই এই সব প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান কেন গড়িয়া তুলিতে পারিবে না? জনগণ কেন

নিজের কল্যাণ এবং অপরের কল্যাণ—সকলের কল্যাণের জন্তই নিজের সংগঠনশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারিবে না? জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এই সংগঠন ও বাস্তব সংগঠনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হইবে এই, এক ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন স্বাভাবিক মানুষ থাকিয়াই সংগঠন করিতেছে, অপর ক্ষেত্রে সে বাধ্য হইয়া, দাস হইয়া, যন্ত্র হইয়া কাজ করিতেছে। কথা হইবে, জনগণের মধ্যে এই স্বেচ্ছাপ্রণোদনা জাগিয়া ওঠে না বলিয়াই তো রাষ্ট্রের তবক্ষ হইতে বলপ্রয়োগের দ্বারা বাধ্য করাইবার প্রশ্ন আসে। টলস্টয় বলিবেন, ওইটিই হইল একেবারে ভুল পথ। জনগণকে বাধ্য করিয়া কখনও কল্যাণের আয়োজন সম্ভব নহে। জনগণের ভিতরকার মনুষ্যচেতনা তাহাদের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই হইল শক্তিশালী নেতৃবৃন্দের ও কর্মীবৃন্দের সবচেয়ে বড় কাজ। জনগণের মনুষ্যচেতনা জাগ্রত হইলেই তাহাদের মধ্যে দেখা দিবে মঙ্গল-কর্ম সম্বন্ধে স্বেচ্ছাপ্রণোদনা, তখন শুভ শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে জনগণের মধ্য হইতেই, শক্তিকে তখন আর রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতে হইবে না। এ বিষয়ে টলস্টয় তাহার ‘আমাদের যুগের দাসত্ব’ বইখানির একস্থানে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—

“অপব পক্ষে আমরা বরঞ্চ দেখিতে পাই, আমাদের যুগের প্রায় সমস্ত বিচিত্র ধরনের কাজের ব্যাপারে জনগণ নিজেদের জীবনের ব্যবস্থা নিজেবাই অনেক বেশী ভাল করিতে পারে, তাহাদের শাসকবর্গ তাহাদের জন্ত যে ব্যবস্থা করিতে পারে নিজেরা তাহা অপেক্ষা ঢের ঢের বেশী ভালভাবে করিতে পারে। শাসকবর্গের বিন্দুমাত্র সাহায্য না লইয়া—অনেক সময় শাসকবর্গের বাধা সত্ত্বেও জনগণ সর্বপ্রকারের সামাজিক দায়িত্বভার সুসম্পন্ন করিতেছে, যেমন শ্রমিকদের সঙ্ঘ, সমবায় সমিতি সমূহ, বেলঙয়ে কোম্পানী, কর্মসমিতি ও কর্মচারী সমিতি, অগ্নাত সঙ্ঘ (সিণ্ডিকেট) প্রভৃতি। জনসাধারণের কাজের জন্ত যদি অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হয় তবে এ কথা আমরা কেন ধরিয়া লইব যে বিবিধ প্রকারের কর ধার্য করা ছাড়া ইহা আর হইবার নহে? এই কর্মভারগুলি যদি প্রকৃত পক্ষেই প্রয়োজনীয় হয় তবে কেন স্বাধীন দেশবাসীগণই কোন প্রকার বলপ্রয়োগ ব্যতীত স্বেচ্ছায় প্রয়োজনীয় অর্থ

সংগ্রহ করিতে পারিবে না এবং কব আদায়ের দ্বারা যে সব কাজ করা হয় সেই সব কাজ নিজেবাই কবিতে পারিবে না? কেন মনে করিব যে বলপ্রয়োগ ব্যতীত কোনও সালিসীব সম্ভাবনা নাই? বিবাদকারী উভয় পক্ষেবই বিশ্বাসভাজন লোকের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা চিবকালই ছিল এবং চিরকালই থাকিবে, ইহার জন্ত কোনও বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নাই। দীর্ঘদিনের দাসত্ব-বন্ধনের দ্বারা আমবা এমন ভাবে হীন হইয়া গিয়াছি, আমবা এখন আর কল্পনাই কবিতে পারি না যে বলপ্রয়োগ ব্যতীত শাসনকার্য পরিচালনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু বলপ্রয়োগ ব্যতীত শাসন-পরিচালনা সম্ভব নয়, এ কথা সত্য নয়। রাশিয়ায় যে সব অধিবাসীর দল দূর দূর অঞ্চলে চলিয়া যাইতেছে সবকাব তাহাদের পবিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা বা সেখানে গিয়া নিজেদের কবের ব্যবস্থা করে, শাসন ব্যবস্থা কবে, বিচার ব্যবস্থা করে, পুলিশের ব্যবস্থা কবে, যে পর্যন্ত সরকার বাহাদুরের জোব-জববদস্তি গিয়া তাহাদের শাসনব্যবস্থা তছনছ করিয়া না তোলে সে পর্যন্ত তাহা বা বেশ সমৃদ্ধিই লাভ কবিতে থাকে। এই ভাবেই আমরা দেখিতে পাই, জনগণ তাহাদের সর্বসম্মতিব দ্বারা ব্যবহারের জন্ত জমি-বটনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে না এইরূপ ধরিয়া লইবারও কোথাও কোন যুক্তি নাই।”

সমাজে ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি কি কবিয়া রাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য ব্যতীত রক্ষিত হইবে সে সম্বন্ধেও টলস্টয়ের বিশ্বাস অতি স্পষ্ট এবং দৃঢ়। তিনি বলিয়াছেন, “যে সব জিনিস সত্য সত্যই একজন মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন, এবং যে সব জিনিস উৎপাদনকারী নিজেই প্রয়োজনব—সেগুলি সর্বদাই সমাজের রীতি-প্রথা দ্বারাই রক্ষিত হয়, জনমতের দ্বারাই রক্ষিত হয়, সমাজের জায়বোধের দ্বারা এবং পাবস্পবিকতার প্রীতিবন্ধনের দ্বারাই রক্ষিত হয়, এগুলিকে বলপ্রয়োগের দ্বারা রক্ষা কবিবার কোন প্রয়োজনই হয় না।”

কিন্তু সমস্তা এই, জনসাধারণের ঈপ্সিতই হোক আর অনীপ্সিতই হোক, এরূপ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছেই, প্রতিকারের উপায় কি? প্রতিকারের সহজতম এবং একমাত্র উপায় সকলেরই মনে হয়—বলপ্রয়োগের দ্বারা

এরূপ বাষ্ট্রকে ধ্বংস করা। টলস্টয় বলিবেন, আবার সেই গোড়াব ভুল। হিংসা যদি পাপ হয়, তবে হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার প্রয়োগ হইল পাপের বিরুদ্ধে পাপের প্রয়োগ। রাষ্ট্রকে পরাজিত করিতে হইলে রাষ্ট্র যতটা বলপ্রয়োগ করিবার শক্তি বাখে তাহা অপেক্ষা অনেক-খানি বেশি বলপ্রয়োগ তাহার বিরুদ্ধে করিতে হইবে। অর্থাৎ আমরা তাহা হইলে চাই, একটি বৃহত্তর-পাপের দ্বারা পূর্বকৃত একটি পাপের প্রতিরোধ কবিতো হইবে। রাষ্ট্র আমাদের দাস করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু বল-প্রয়োগের দ্বারা দাসত্ব রোধ কবিবার সকল চেষ্টাই হইল আগুনের দ্বারা আগুন নেভানোর চেষ্টা, জলের দ্বারা জল নিবাবণের চেষ্টা, একটা গর্ত খুঁড়িয়া আর একটা গর্ত বুজাইবার চেষ্টা।”

জনগণের ঘাড়ে অনভভাবে চাপিয়া-বসা এই-জাতীয় রাষ্ট্রকে টলস্টয় উপমা দিয়াছেন আববোপন্যাসে বর্ণিত একটি চতুর ‘বুড়ো’র সঙ্গে। বুড়ো চলিতে অসমর্থ হইয়া বসিয়া ছিল একটি শ্রোতস্বতীর এ-পারে, একটি কর্মঠ ভাল লোক দেখিয়া বলিল, আমাকে একটবার একটু ঘাড়ে করিয়া পাব করিয়া দাও। লোকটি সহজ বিশ্বাসে বুড়োকে ঘাড়ে লইল, কিন্তু বুড়ো ও-পারে গিয়া আর নামে না, বরং পু ছুখানি সরল লোকটির গলার চারিদিকে বেশ শক্ত করিয়া জড়াইয়া লইল, তাহার পরে লোকটিকে ইচ্ছা মতন দৌড় করাইতে লাগিল, ঘাড়ে বসিয়াই গাছের ফল ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল, লোকটিকে কিছুই দিল না—কেবল যদৃচ্ছা খাটাইতে লাগিল আব নিরন্তর কড়া ধমকানি দিতে লাগিল।

জনগণের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হইল এই রাষ্ট্রের ‘বুড়ো’কে একবার ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলা, একবার তাহার সকল শঠতা ও চাতুরী ধরিয়া ফেলা—ধরিয়া ফেলিয়া তাহার সব কথা বাহিবে একেবারে ফাঁস করিয়া দেওয়া। বহুকালের আচরিত এই চাতুরীকে একবার ফাঁস করিয়া দিতে পাবিলেই দাসত্বের বোঝা অধিকাংশ কমিয়া গেল। বাকিটুকু জন্ত যে চেষ্টা চাই তাহাকে টলস্টয় তিনটি মূখ্য কার্যক্রমেব মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, প্রথম হইল অসহযোগ, দ্বিতীয় হইল কর বন্ধের আন্দোলন, তৃতীয় হইল, বলের দ্বারা রক্ষা করিবার

জন্ত কোনও অবস্থাতেই রাষ্ট্রের নিকটে আবেদন না জানানো।

গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তাব সহিত ঠাহার সামান্য পবিচয়ও রহিয়াছে তিনিই জানেন, টলস্টয়ের এই রাষ্ট্রচিন্তার সহিত গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তার যে মিল তাহার যেমন মূলেব মিল—তেমনই আবার শাখা-প্রশাখা-পল্লবাদিবও মিল। টলস্টয়ের রাষ্ট্রচিন্তাব মূলে যেমন জাগ্রত হইয়া আছে অহিংসায় দৃঢ়নিষ্ঠা এবং পশুবলের প্রতি সহজাত অশ্রদ্ধা—গান্ধীজীব ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই তাহাই। প্রথমে গান্ধীজী তাহার রাষ্ট্রস্বকীয় চিন্তাসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ‘স্ববাজে’ব আদর্শের ভিতর দিয়া, তাহার ‘হিন্দু স্বরাজ্য’ বইখানির ভিতরেই গান্ধীজী তাহার এই স্ববাজেব আদর্শের আভাস প্রথম দিলেন। তাহার পবে যতদিন গিয়াছে, জীবনের সকল পবীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়া সত্যের সহিত আরও যত যতনব যোগ ঘটাইয়াছে, ‘স্ববাজে’ব আদর্শ তাহার মনে ততই ব্যাপক-সংজ্ঞা ও তাৎপর্য লাভ কবিয়াছে; জীবন-সাযাহে সেই স্ববাজেব আদর্শই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহার সর্বোদয়ের আদর্শের মধ্যে।

গান্ধীজীব স্ববাজ-চিন্তাব মূলেও রহিয়াছে প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ, তাহাকে যজ্ঞে পবিত্র হইতে না দিয়া অপর সকলের সঙ্গে যোগে কি কবিয়া তাহার মানুষ-জীবনেব সহজ বিকাশ ও পরিণতিব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে স্ববাজচিন্তার ইহাই গোড়াব কথা। জগতের প্রচলিত রাষ্ট্রবিধি সম্বন্ধে গান্ধীজীর মৌলিক বিরূপতাব কাবণও এই, রাষ্ট্রের লক্ষ্য কেবলই ক্ষমতা ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূতভাবে বাড়াইয়া তোলা, ইহা মূলতঃ হিংসা-প্রণোদিত অতএব অশ্রদ্ধেয়, দ্বিতীয়তঃ ইহা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নানা ফলি-ফিকিবে কেবলই পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে চায়, তাহাকে নিরবধি শোষণ করিতে চায়। ১৯৩৫ সনে ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায় গান্ধীজী একবার লিখিয়াছিলেন—

“রাষ্ট্রের ক্ষমতাবুদ্ধিকে আমি সর্বাধিক ভয়েবাবদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া থাকি; ইহাব কারণ এই,—যদিও রাষ্ট্র আপাতদৃষ্টিতে শোষণকে কমাইয়া দিয়া মানুষের মঙ্গল করে, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বকে মারিয়া ফেলিয়া রাষ্ট্র

মানুষ জাতিব সর্বাপেক্ষা সর্বনাশ করিয়া থাকে, -মানুষের এই ব্যক্তিত্বই যে মানুষের সকল উন্নতি-প্রগতিব মূল কারণ।

“বাষ্ট্র হইল ঘনীভূতভাবে এবং স্ফুটিতভাবে হিংসা ও বলের প্রয়োগ। ‘ব্যক্তি-মানুষের একটা আত্মা আছে, কিন্তু বাষ্ট্র একটি আত্মাবিহীন ধ্বংসাত্মক বলিয়া সহিংস বল-প্রয়োগ হইতে ইহাকে আর কিছুতেই টানিয়া দূবে সবাইয়া লওয়া যায় না, এই-সহিংস বল-প্রয়োগেই ইহার অস্তিত্ব।”

“আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই, বাষ্ট্র যদি বলের দ্বারা পুঁজিবাদকে দমিত করিয়া দিতে যায়, তবে হিংসাব জ্বরদস্তি বৃণ্ডলী ব মধ্যে ইহা আপনিই জড়াইয়া পড়িবে, ইহা অহিংসাকে আর কোনদিনই জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না।”

“যে জিনিসটি আমাব একেবারে অমনঃপূত তাহা হইল আত্মবিক বলের উপরে প্রথিত কোনও প্রতিষ্ঠান—আব বাষ্ট্র হইল ঠিক তাহাই। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠানই থাকা আবশ্যক।”

গান্ধীজী এই সব কারণে মনস্বী থোরোব (Thoreau) সেই স্ফুটনিক বাণীকেই সারাজীবন উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন যে সেই রাষ্ট্রই হইল শ্রেষ্ঠ বাষ্ট্র যাহা শাসন কবে সর্বাপেক্ষা কম। ইংরেজ সরকারের দ্বারা ভারতবর্ষে যে বাষ্ট্রতন্ত্র চালু রহিয়াছে তাহাকে গান্ধীজী বরাবরই কেন্দ্রীভূত এবং ‘মাধ্যম ভাবী’ রাষ্ট্রতন্ত্র বলিয়াছেন। একটা ‘অ্যাবসট্রাক্ট’ রাষ্ট্রের উন্নতি নয়, একটি দেশের বা সমাজের ভিতবকার প্রতিটি মানুষের উন্নতিই গান্ধীজীব কাম্য বলিয়া তিনি সব অবস্থাতেই ক্ষমতাকে বিবেচিত করিয়া যথাসম্ভব জনগণের নিজেদের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতাকে সমাজজীবনের একেবারে নিয়ন্ত্রণ হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে—এবং গড়িয়া তুলিতে হইবে সর্বোদয়ের ভিত্তিতে, তবে আব শক্তি হিংসাত্মক বলপ্রয়োগেরই সমার্থক হইয়া উঠিবে না।

গান্ধীজীব মতে সর্বপ্রকার ‘বাজ’কে পরিবর্তিত করিতে হইবে ‘স্বরাজে’, আর ‘স্বরাজ’কে স্ফুটিত এবং স্ফুটতিষ্ঠিত করিতে হইবে গ্রাম-স্বরাজেব ভিতব দিয়া। গ্রাম-

স্বরাজেব আদর্শটিকে যদি বাস্তবে পরিণত করা যায় তবে কেন্দ্র হইতে একটা প্রচণ্ড সহিংস শক্তিব পদে পদে মানুষেব বক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতিবিধানের জন্ত প্রয়োগের প্রয়োজন ও অবকাশ থাকে না। সাময়িক শক্তির জন্ত নিরন্তর তিলে তিলে রক্তদান করিয়া সমগ্র জাতিকে কেবলই নিরন্তর হইয়া পড়িবার প্রয়োজন করে না। গান্ধীজী এইজন্ত বলিয়াছেন, “স্বায়ত্ত-শাসনেব অর্থ হইল সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবাব জন্ত একটা নিরন্তর চেষ্টা—সে সরকার জাতীয় সরকারই হোক, আব বিদেশী সরকারই হোক। স্বরাজ-গণতন্ত্রেব তৈয়ারী করিয়া জনগণ কেবলই যদি জীবনেব প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়েব নিয়ন্ত্রণেব জন্ত সেই (কেন্দ্রীয়) সরকারেব দিকেই তাকায তবে ইহা অত্যন্ত একটা দুঃখের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।”

গ্রাম-স্বরাজের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সর্বোদয়ের আদর্শকে যে কোন হিংসাত্মক পন্থায় বাস্তবে রূপায়িত করা যায় সমগ্র জীবনই গান্ধীজী সেই কথাটাকে তাহার সর্বশক্তি-দ্বারা অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইয়া—একরকমের একটা স্বরাজ হয়তো সম্ভব বিদ্রোহের দ্বারাও সম্ভব করিয়া তোলা হইতে পারে, কিন্তু সে স্বরাজ অহিংস উপায়ে যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধবনেব স্বরাজ হইয়া উঠিবে। হিংসাত্মক পন্থায় লব্ধ স্বরাজও হিংসাত্মক স্বরাজ হইয়া উঠিবে (Violent Swaraj), তাহাব স্বাভাবিক গতি হইবে ‘সর্বোদয়ে’ব দিকে নয়, ‘সর্বলয়ে’ব দিকে। গান্ধীজী বলিয়াছেন, আমবা আজকাল সর্বক্ষেত্রেই যে গণতন্ত্রের কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি, এ গণতন্ত্র কখনও কোন জোর-জবরদস্তির পন্থায় মানুষেব ভিতবে আনিয়া দেওয়া সম্ভবই নহে, কারণ গণতন্ত্রের যে বোধ সে তো কখনও বাহির হইতে আসে না, বাহিব হইতে তাহাকে একদল মানুষেব উপরে চাপাইয়া দেওয়াও চলে না, গণতন্ত্রের ভাবটি ভিতর হইতে ফুটিয়া ওঠা দরকার। মানুষের দেহমনকে তৈয়ারী করিয়া দিয়া একটি মানুষ হিসাবে তাহাকে তাহার মনুষ্যচেতনায় সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া তবে তাহার মধ্যে এই গণতন্ত্রের ভাবটিকে জাগ্রত করিয়া দিতে হয়। সাময়িক শক্তির সাহায্যে ইহা কখনই

সম্ভব হয় না। - মানুষের নৈতিক শক্তি—তাহার আত্মিক শক্তি অগ্রহত না হইলে তাহার ভিতরে কল্যাণময় গণতন্ত্রের বোধ আগিয়াই উঠিতে পারে না।

ভারত-সবকারের সহিত বিভিন্ন সময়ে গান্ধীজীব
যে-সকল চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিয়াছে তাহার
ভিতবে একখানি পত্রে তিনি বলিয়াছেন, “আমি যখন
জেলে ছিলাম তখন আমি কার্লাইল-লিখিত ‘ফরাসী
বিপ্লবের ইতিহাস’ পাঠ করিয়াছি, পণ্ডিত জওহরলাল
নেহরুও আমাকে বাশিয়াব বিপ্লবের কথা কিছু কিছু
বলিয়াছেন। কিন্তু আমার এই বিশ্বাস, এই সংগ্রামগুলি
হিংসাব অঙ্গদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া এগুলি
ইহাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।
আমি যে গণতন্ত্রের পবিকল্পনা করিয়াছি—অহিংসা দ্বারা
যে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—সেখানে বিশ্বাসী
সকলেব জন্ত একই বকমের স্বাধীনতা থাকিবে, সেখানে
প্রত্যেক লোকই তাহার নিজের প্রভু।”

অহিংসাকে চাই নিজেদেব কোনও বিশেষ স্বযোগ
স্ববিধার জ্ঞান নয়, অহিংসা দ্বারা স্ববাক্য চাই নিখিল
মানবেব মঙ্গলের জ্ঞান। সত্যকারেব একটা বিশ্বসজ্জের
সৌধ গড়িয়া ওঠা সম্ভব শুধু অহিংসার ভিত্তিভূমিতেই।
জগতেব সকল ব্যাপাব হইতেই হিংসাকে আমরা দূর
করিয়া দিব, এইরূপ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প যদি আমাদের দেহ-
প্রাণ-মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া না বসে, তবে বিশ্বসজ্জ
মানুষের কোনও কল্যাণ সাধন কবিতে পারিবে না।
প্রত্যেকেই নিজের রাষ্ট্রেব নাম কবিয়া একখানি শাণিত
তরবারিকে আরও শানাইয়া লইব, তাহাকে কি কবিয়া
অপবের বক্ষে স্বযোগ পাইলেই আমূল বিদ্ধ কবিয়া দেওয়া
যায় তাহাব অন্ধি-সন্ধি পাতিয়া বসিয়া থাকিব—এদিকে
আবাব বিশ্বসজ্জের ভিতব দিয়া কি করিয়া বিশ্বকল্যাণ
সাধন কবিব এই চিন্তা—এই উভয়ই একসঙ্গে কখনও সম্ভব
হইতে পারে না।

অনভীপ্সিত শাসনব্যবস্থা দূরীভূত করিষা আদর্শ
স্বায়ত্ত-শাসনেব ব্যবস্থা চালু কবিবার জন্ত টলটল
অসহযোগ, করবন্ধ, সশস্ত্র সরকারী শক্তিব কোনক্রমেই
সাহায্য না লওয়া প্রভৃতি যে-সকল উপায়ের কথা
বলিয়াছেন, গান্ধীজীব সংগ্রামলিপ্ত জীবনে এগুলি যে কি

স্থান অধিকার কবিয়াছে সে-সম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত আলোচনা একান্ত বাহ্যিক বলিয়া মনে কবি।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাষ্ট্রচিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে কোন সময়েই একান্ত হইয়া দেখা দেয় নাই, সে চিন্তা দেখা দিয়াছে প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্বমানবের কল্যাণ চিন্তায়— অনেক সময় বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে ভারতবর্ষে চিন্তায়। বাষ্ট্রচিন্তাব ক্ষেত্রে অহিংসার বিশ্বাসকে টলস্ফয় এবং গান্ধী যেমন কবিয়া একেবাবে মৌলিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ সেইরকম করেন নাই। অহিংসার বাণীকে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা বরণ কবিয়া লইয়াছেন ব্যক্তি-জীবন তথা সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে একটি মহৎ আদর্শরূপে। বুদ্ধদেবের অহিংসার বাণীকে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিতই স্বাগত জানাইয়াছেন এই জন্য যে ইহাব ভিতরে নিত্যকালের মানুষের বিশ্বজনীন মানুষের পরস্পরের পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রী করুণায় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনার সহজ অথচ স্পষ্টতম ইঙ্গিত বহিয়াছে। হিংসাত্মক বলের আশ্রয় কোন ক্ষেত্রেই বাষ্ট্রের করা উচিত কি উচিত নয় ইহা লইয়া রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে কোথাও আলোচনা করিতে যান নাই, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যেদিন শুধু ভারতবর্ষের বাষ্ট্রক্ষেত্রে নয়, জগতের বাষ্ট্রক্ষেত্রে অহিংসার বাণী লইয়া আবির্ভূত হইলেন তখন তাঁহাকে অকুণ্ঠভাবে স্বাগত-সম্ভাষণকাবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে একজন অগ্রণী রূপে দেখা গেল। ইহার কারণ, নৈতিক শক্তি এবং আত্মিক শক্তির প্রতি শারীরিক শক্তি অপেক্ষা সহজাতভাবেই রবীন্দ্রনাথের অধিক শ্রদ্ধা। মহাত্মাজীব আহ্বানের মধ্যে এই নৈতিক শক্তি ও আত্মিক শক্তিই মানুষের চোখে সামনে অত্যন্তভাবে মহিমাম্বিত হইয়া উঠিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের এত শ্রদ্ধা।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ইউরোপের উপরে গভীর-
ভাবে প্রদ্বারিত ছিলেন, ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-
কলা-সংস্কৃতি, ইউরোপের লোক-চরিত্র, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি
সকলের উপরেই তিনি একটা প্রদ্বারিত ভাব পোষণ
করিতেন। ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে অনেকগুলি
জাতি যে পৃথিবীর অনাচে-কানাচে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া
নিজেদের অধিকার বিস্তারিত করিয়াছিল তাহার প্রতিও

রবীন্দ্রনাথের যেন একটা সহানুভূতি ছিল। ইহার কারণ কি? কাবণ হইল এই, রবীন্দ্রনাথের মন এ কথা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে নিতান্ত গায়েব জোবেই ইউরোপের এই জাতিগুলি এমন করিয়া পৃথিবীকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, এখানেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, বিজয় লাভ করিয়াছে মানুষের মানস-সম্পদ, মানুষের নৈতিক শক্তি—মানুষের আত্মিক শক্তি,—এই সকল দিক দিয়াই ইউরোপের অনেকগুলি জাতি ছিল উন্নত। ববীন্দ্রনাথ তাহার প্রসিদ্ধ ‘কালান্তর’ প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন, “একটা প্রবল উত্তরের বেগে যুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে—শুধু তাই নয়, সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেইখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে? সত্যাত্মসম্মানের সততায়।”

কিন্তু ইউরোপ সম্বন্ধে কবি এই মোহ অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙিয়া গেল। তিনি একটু একটু কবিতা বুঝিতে আবিস্ত কবিলেন, পশুশক্তির আফালন ও মত্ততায় পাইয়া বসিয়াছে ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রগুলিকে, দুর্বাব অপরিমিত লোভই কাজ কবিতোছে প্রচ্ছন্ন প্রেরকরূপে। সেই পশুশক্তির আফালনের বর্বরতাই চরম রূপ গ্রহণ করিয়াছে মহাযুদ্ধে। যুদ্ধের এই মশালের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে যে বিচিত্র আলো ইউরোপ সে আলোর অনেক শুভঙ্কর ব্যাখ্যা দিয়াছে, কিন্তু কবি পক্ষের বুঝিয়া লইতে কিছুই কষ্ট হইল না যে, আসলে ওই আলোর বর্ণবিচিত্র্য একটা প্রকাণ্ড শঠতার ছদ্মবেশ, নিরীহের ঘর জালাইবার মশালকেই বুদ্ধির জোরে সাজানো হইয়াছে বিচিত্র আলোক-বর্তিকা বলিয়া।

ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রতন্ত্রগুলির সকল চাকচিক্যের পশ্চাতে পশুশক্তির নিরলঙ্কার আফালনটা যেদিন হইতে রবীন্দ্রনাথের কাছে বড় হইয়া এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল সেইদিন হইতেই বড় বড় রাষ্ট্রগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের জাগিয়া উঠিতে লাগিল অপরিসীম ক্ষোভ ঘৃণা এবং অবিশ্বাস। সেইদিন হইতে রবীন্দ্রনাথও রাষ্ট্রশক্তির উপরে জোর না দিয়া ব্যক্তি-মানবের নৈতিক শক্তি ও আত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার দিকে সর্বাপেক্ষা বেশী ঝোঁক দিতে লাগিলেন। শেষ বয়সে ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া বড় বড় রাষ্ট্রশক্তির ক্রিয়া-কলাপ

দেখিয়া দেখিয়া কবি যখন একান্ত হতাশ হইয়া যাইতেন তখন আবাব আশাব আলো জালিয়া লইতে চাহিতেন একটি বিশ্বাসের দ্বারা, ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’। কোথায় মানুষের উপরে বিশ্বাস? বিশ্বাস মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপরে—বিশ্বাস মানুষের আত্মিক শক্তির উপরে, রাষ্ট্র আর যাহাই পাকক মানুষের এই অন্তর্লীন নৈতিক প্রকৃতিকে—তাহার আত্মিক শক্তিকে কোন দিন একেবারে পরাজিত করিয়া দিতে পারিবে না। রাষ্ট্র-সংঘাতের সকল পরাজয়ের ভিতর দিয়া মানুষ আবাব একদিন তাহার আপন অন্তর-ঐশ্বর্যে জাগিয়া উঠিবেই।

ভারতবর্ষকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ যত আলোচনা কবিতোছেন সে আলোচনাগুলি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তিকে তিনি কোনদিনই একটা বড় জিনিস বলিয়া আমল দেন নাই, ভাবতবর্ষের অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তির কথা যত প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ কবিতোছেন তত প্রসঙ্গেই তিনি ভারতবর্ষের সমাজশক্তির মহিমাকেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাবতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায় না, তাহা নানাখানা হইয়া ছড়াইয়া আছে কাহিনী-কিংবদন্তিতে, কিন্তু ইহা লইয়া কবি কখনই প্রকাণ্ড হা-ছতাশ করেন নাই, কারণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, প্রাচীন ভারতবর্ষকে যুগে যুগে ধাবণ করিয়া রাখিয়াছে তাহার বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রশক্তি নয়—ভারতবর্ষের সমাজ-শক্তি। এই সমাজ-শক্তির মধ্যেই নিহিত আছে ভাবতবর্ষের ধর্ম-কর্ম শিক্ষা-সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতি সবই। ভারতবর্ষের সমাজ-বন্ধন সুগঠিত এবং সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে মানবজীবনের কতকগুলি জীবন্ত সহজ সত্যের ভিতর দিয়া। ব্যক্তি-মানুষের নিরন্তর জাগরণেই এই সমাজ-শক্তি নিরতিশয় পবিপুষ্ট হয়, তাই মূলে চাই এই ব্যক্তি-মানুষের বিকাশ।

টলস্টয় বলিয়াছেন রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে একটা অন্তর্লীন শঠতা আছে, গান্ধীজীও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখেও সে শঠতা সহজেই ধরা পড়িয়াছে। অত্যন্ত একজন উগ্র রাজনীতিজ্ঞ না হইয়াও রবীন্দ্রনাথ তাহার ‘রাজাপ্রজা’ গ্রন্থের “ইংরেজ ও ভারতবাসী” প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাহাদেরই

রাজগোষ্ঠের চিবপালিত গোকটের মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পবিত্রতার রাখিতে এবং খোলবিচালি জোগাইতে কোন-আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি হাাহাতে বক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনও দৌরাভ্যা কবে সেজন্ত শিংছুটা ঘমিয়া দিতে ওদাসীত্ব নাই, এবং দুইবেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকাষ বংসপুলকে একেবারে বঞ্চিত কবে না।” বেশ বোঝা যায়, রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে টলস্টয় এবং গান্ধীজী যে-কথা বলিয়াছেন অত্যন্ত স্পষ্ট এবং স্পষ্ট করিয়া, কবি তাহার সবই এখানে বলিয়াছেন আভাসে-ইঙ্গিতে। চিন্তাব গতি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে একদিকেই। টলস্টয় বলিয়াছেন, এই জাতীয় রাষ্ট্রের হাত হইতে রাঁচিবার উপায় হইল এই ষষ্ঠতাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া ফেলা ও প্রকাশ করিয়া দেওয়া, তাহাব পরে আব বাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী না হইয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া আত্মশক্তিতে সংগঠিত হইয়া ওঠা। রাষ্ট্রশক্তি-নিরপেক্ষ হইয়া নিজেদের আত্ম-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সব কাজ কবিবার টলস্টয়ের এই আহ্বান যে রবীন্দ্রনাথের মনে কতখানি সাড়া জাগাইয়াছিল তাহা শিক্ষা-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের টলস্টয়েব লেখা হইতে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে তাহার মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। তাহার নিজের মতন করিয়াও এ কথা আমবা করিকে বলিতে দেখি তাহাব পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধটির ভিতরই, তিনি বলিয়াছেন, “অতএব, সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিবেচ্যভাবশ্রমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে, ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকটকর্তব্যসকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া।”

একটি বড় জাতি যখন বিদেশী একটি বাষ্ট্রশক্তি দ্বারা শোষিত এবং পীড়িত হয় তখন বুঝিতে হইবে দোষ জাতীয়-চরিত্রের মধ্যে—জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতায় ও অর্নৈক্যে। নিজেদের ভিতবকার এই দুর্বলতা দূর করিতে না পারিলে রাষ্ট্রগত এই জীবচারের প্রতিকার করিবার অত কোন উপায় নাই। ‘রাজাপ্রজার’ ভিতবকার “অপমানের প্রতিকার” প্রবন্ধে কবি তাই বলিয়াছেন, “ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজেদের স্বভাবের মধ্যে।” সেই স্বভাব না শোধরাইলে প্রতিকারের অত কোন পথই নাই।

নিছক রাষ্ট্রনীতিবিদেব ত্রায ক্রোথাও-কথা না বলিলেও জাতির একজুন চিন্তাশীল সেবকব্রুগে রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকভাবে যে-সব কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতব হইতে রাষ্ট্রনীতিব তাত্পর্যপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ‘রাজাপ্রজা’র ভিতরে “স্ববিচারের অধিকার” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “আমরা জানি যে, অত্যাচার বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে। তাহার হিতের জন্ত প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমবা তাহাব সহায়তা করিতে যাইব তাহাব নিকট হইতে সহায়তা পাইব না—কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, জ্বাইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসাবিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাধান করিয়া আমাদের প্রাণ করিতে আসিবে। কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ব এবং স্বাভাবিক ত্রায়গ্রন্যভাবশত আমাদের মধ্যে দুই-চারিজন লোকও যখন শেষ পর্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমবা ত্রায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।” উক্তিটি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলেই জাতীয়-জীবনে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যন্ত ভবমা ক্রোথায তাহা বোঝা যাইবে, ভ্রমসা অন্ততঃ দুই-চারিজন লোকের উপর—ভবমা তাহাদের অকৃত্রিম মহত্ব ও স্বাভাবিক ত্রায়গ্রন্যভাব উপর—ভবমা তাহাদের সর্বাস্বায় অটল হইয়া থাকিবার চারিত্রিক দাটের উপর।

ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা-আন্দোলনেব প্রাথমিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া আসিয়াছিল যখন তিনি আবিষ্কার করিলেন যে সমগ্র জাতি কেবল ক্রন্দনকে একমাত্র অস্ত্র করিয়া বিপক্ষ ভিক্ষার পথেই অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। কিন্তু স্বাধীনতা-আন্দোলনের সে-ভারটা শীঘ্রই কাটিয়া গেল; জাগিয়া উঠিল আত্মশক্তি-প্রয়োগেব স্পৃহা। কিন্তু সেখানেও রবীন্দ্রনাথ হতাশ হইলেন এই দেখিয়া যে, আত্মশক্তি-প্রয়োগের স্পৃহা যেটুকু জাগিয়াছে তাহার পশ্চাতে স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম ততখানি নাই, যতখানি রহিয়াছে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির

প্রতি বিদেষ। এই বিদেষের পথই হইল মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় ‘সহিংস বলপ্রয়োগ’ব পথ। এ পথ যে শেষ পর্যন্ত গিয়া কাহাবই কল্যাণের সহায়তা কবে না, ববীন্দ্রনাথও সে বিষয়ে ছিলেন একেবারে নিঃসংশয়। এই বিদেষবিষকে জাতীয়-জীবনের মধ্যে একবার সক্রিয় হইয়া উঠিতে দিলে একদিন ইহা জাতির আত্মহননেরই পরম কারণ হইয়া দেখা দিবে। শত্রুকে অবলম্বন কবিয়া প্রবল হিংসা-দেষ জাগ্রত করিলাম, শত্রু সরিয়া পড়িল, তখন বাকি রহিল হৃদযত্নরা হিংসা-দেষ, তাহা তখন প্রযুক্ত হয় নিজেদের উপরেই, তখনই জাগিয়া ওঠে আত্মহননের বীভৎসতা। হিংসার পথেই ইহাই হইল ভয়াবহতা। এই কথাই বলিয়াছেন ববীন্দ্রনাথ ‘রাজাপ্রজা’র “পথ ও পাথেয়” প্রবন্ধে, “...বিদেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে তখন কৃত্রিম ঐক্য-স্বত্বটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব। তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাস্ব বিদেষবুদ্ধি দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।” তথাকথিত ‘প্যাট্রিয়টিজম’ বা দেশপ্রেম এবং ‘গ্রাশনালিজম’ বা জাতীয়তাবাদ মাত্রের এই বিদেষভাব জাগাইয়া দিতে নানারূপে সাহায্য কবে, ববীন্দ্রনাথ তাই এই প্যাট্রিয়টিজম বা গ্রাশনালিজম-এর বেশী পক্ষপাতী-ছিলেন না, তিনি বলিয়াছেন, “আমরা যদি বাঁধি বোলে না ভুলি, যদি ‘প্যাট্রিয়ট’কেই সর্বোচ্চ বলিয়া মনে না করি, যদি সত্যকে ণায়কে ধর্মকে গ্রাশনালিজমের অপেক্ষাও বড় বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে।” (বিরোধমূলক আদর্শ, পরিশিষ্ট, রাজাপ্রজা)। ববীন্দ্রনাথ এই জ্ঞান প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মের আদর্শটাকেই খুব বড় কবিয়া ধরিয়াছিলেন। আজ আমরা আমাদের সামনে কেবলই বড় করিয়া ধরিতেছি স্বাধীনতার আদর্শকে, কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহাব সমাজ-জীবনের সম্মুখে যখনই বড় করিয়া ধরিয়াছে তখনই

বড় করিয়া ধরিয়াছে ‘ধর্ম’র আদর্শকে। এই ধর্ম রিলিজন্স নহে, এই ধর্ম হইল সর্বতোভাবে শাস্ত ণায়ে ও মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হইবার আদর্শ। এই ধর্মবোধে প্রতিষ্ঠা এক-জাতিকে যেমন বড় কবিয়া তোলে, তেমনি প্রত্যেক জাতিব সঙ্গে প্রত্যেক জাতিকে প্রেমবন্ধনে বিশ্বজনীন ঐক্য দান করে। রাষ্ট্রের উপরে জোর না দিয়া ভারতবর্ষ চিৎদিন তাই এই ধর্মবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজের উপরেই সবটা জোর দিয়াছে। এ বিষয়ে ববীন্দ্রনাথের মত অতিশয় স্পষ্ট হইয়া ওঠে যখন ‘ববীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত’ প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

“চিরদিন ভাবতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা কবে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিচার ব্যবস্থা করেছে, তুষিতকে জল দিবেছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, অন্ধকে শ্রদ্ধা, গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে বাজ্য-সাম্রাজ্যের পবিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী বাজ্য রাজ্য নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত-ফেবাকেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন কাড়াকাড়ি করতে লাগল, লুণ্ঠপাটু অত্যাচাৰও কম হল না, কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে, যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তাব অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি কবে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বৃদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান, সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের জ্ঞপতন, তাতেই সে মাঝা মাঝা গ্রীস বোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভাবত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই স্বদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্ম প্রসারিত।”

এক তিন বার্নিশ

[একাঙ্কিকা]

মন্মথ রায়

[একটি পার্ক। সবে সূর্য অস্ত গেল। পার্কের জনবিলল অংশে কুঞ্জবীথির অন্তরালে বসিবার জন্ত দুইটি বেঞ্চ। একটি বেঞ্চ খালি রহিয়াছে। অদূবে অপব বেঞ্চটির ধারে দুইজন পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল। এই পুরুষ দুইটির চেহারা এবং পোশাক দুই-ই অস্বাভাবিক, এবং অদ্ভুত। বলিয়া দেওয়াই ভাল, ইহারা শয়তানের অলুচর।]

১ম অলুচর। এ অঞ্চলে শয়তানের অলুচর তুমি ?

২য় অলুচর। মনে হচ্ছে শয়তানের সদব দপ্তরের লোক আপনি !

১ম অলুচর। তোমার অলুমান মিথ্যা নয়।

[প্রথম অলুচর একটি সোনালী পাঞ্জা দেখাইল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় অলুচর প্রথম অলুচরের সামনে নতজান্ন হইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

২য় অলুচর। এ অঞ্চলে শয়তানের দাসাঙ্গদাস আমিই ছজুর। এইবার আজ্ঞা করুন।

১ম অলুচর। সেই সাংঘাতিক চুরির কোনও কিনারা হল না আজও।

২য় অলুচর। কোন চুরিটা ছজুর ?

১ম অলুচর। কোনও খেয়ালই নেই দেখছি তোমাদের। যে চুরিটার জন্ত শয়তানের চোখে ঘুম নেই, যে চুরির কথা বছর বছর বার্ষিক সভায় জানিয়ে দেওয়া হয় তোমাদের, মারাত্মক সে চুরিটার কথা বেমালাম ভুলে গেছ তুমি ? অপদার্থ !

২য় অলুচর। আপনি কি বার্নিশের সেই টিনটার কথা বলছেন ?

১ম অলুচর। হ্যাঁ, বার্নিশের সেই টিন। এমনভাবে কথাটা বললে যেন একটা খোলামকুচি। কিন্তু জান কি, শয়তানের সিন্দুক থেকে সেই বার্নিশের টিনটা চুরি যাবার পর থেকে আমাদের প্রভুব আহার গেছে, নিদ্রা গেছে, মনে নেই এতটুকু শাস্তি—

২য় অলুচর। ওটা যে এতবড় একটা ব্যাপার, খেয়াল হয় নি আমার। দয়া কবে একটু বুঝিয়ে বলবেন, জিনিসটা সত্যি সত্যি কি ? ওর এতটা গুরুত্বই বা কেন ? তবেই তদন্তটা সহজ হবে না কি ?

১ম অলুচর। বার্নিশ দেখ নি কোনও দিন ? একটা তবল পদার্থ। তবে বেশ খানিকটা ঘন। কোন জিনিস বার্নিশ দিয়ে পালিশ করে দিলে তাব সব গলদ ঢাকা পড়ে। একটা নতুন চাকচিক্যে জিনিসটা রকমক করে।

২য় অলুচর। তা এ বার্নিশ তো আমবা হামেশাই দেখি। যে কোনও রঙের দোকানেই মেলে। দামও নয এমন কিছু। এই বার্নিশের একটা টিন—তা শয়তানের সিন্দুকেই বা ওঠে কেন, আর তা চুরি হলে এত সোরগোলই বা কেন—এ কিন্তু আমাব মাথায় ঢুকছে না ছজুর। দোকানে গিয়ে আর একটা টিন তুলে নিলেই হয় না কি ?

১ম অলুচর। শয়তানের চাকরি তুমি যে কি করে পেয়েছ, আমি বুঝি না। কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর চেলা হলেই তোমাব ছিল ভাল।

[বাতাসে শয়তানের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল]

শয়তান। দ্বিভুবনে শয়তানের অলুচর যে যেখানে আছে শোন।

২য় অলুচর। বড় ছজুরেব গলা।

১ম অলুচর। হ্যাঁ। মন দিয়ে শোন।

২য় অলুচর। কিন্তু সবাই শুনবে যে ?

১ম অলুচর। যাবা শয়তান শুনতে পায় শুধু তাঁরা।

শয়তান। শয়তানের সিন্দুক থেকে বার্নিশের টিন চুরি হয়েছে। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে উদ্ধার হল না সে টিন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফেরত চাই আমি সেই টিন। যেখান থেকে হোক যেমন কবে হোক। ওটা

আমি ফেরত না পেলে তোমাদের কারও চাকরি থাকবে না। আমিই থাকব কিনা সন্দেহ।

১ম অঙ্কচর। শুনলে?

২য় অঙ্কচর। শুনলাম। কিন্তু এই শয়তানী বার্নিশ কে চুবি করবে, কেন চুবি কববে এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না হজুর।

১ম অঙ্কচর। কিছুক্ষণ আমাব সঙ্গে থাক, তবেই বুঝবে। সন্ধ্যাবেলায় এই পার্কে অনেক রকমের লোক আসে। কেমন?

২য় অঙ্কচর। হ্যাঁ তা আসে। শয়তানী সলা-পরামর্শের একটা বড় আড্ডাই এই পার্ক। এইটেই আমাব সবচেয়ে বড় এলাকা হজুর।

১ম অঙ্কচর। ওই যে কাবা আসছে—

২য় অঙ্কচর। আসুন, আমরা সরে দাঁড়াই।

১ম অঙ্কচর। আঃ, কেন তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, লোকে আমাদের দেখতে পায় না—শুনতে পায় না আমাদের কথা।

২য় অঙ্কচর। ও হ্যাঁ, তাও তো বটে হজুর।

১ম অঙ্কচর। আমাদের দেখা পাও মনের কোণে কিংবা স্বপ্নে। আমাদের কাজকর্ম সবকিছু মনে মনে। তোমার এসব দেখছি কিছুই খেয়াল নেই। তোমার কদিনের চাকরি?

২য় অঙ্কচর। আজ্ঞে হজুর, এই বছর দুই।

১ম অঙ্কচর। আগের জন্মে তুমি কি ছিলে?

২য় অঙ্কচর। আজ্ঞে, ইস্কুল-মাস্টার।

১ম অঙ্কচর। এ লাইনে এসেছ কোন্ গুণে?

২য় অঙ্কচর। নিজে শিখেছিলাম, ছাত্রদেরও শেখাতাম সদা সত্যকথা বলিবে। চুরি করা মহাপাপ। কিন্তু দেখলাম আমার একটা ছাত্রও বড় হতে পারল না। সারাজীবন ছুঃখকষ্টেই কাটাল। আমার তো কাটলই। তাই আমি শিক্ষাটা বদলে দিলাম। চুপিচুপি শেখাতে লাগলাম সদা মিথ্যাকথা বলিবে। চুবি বিজ্ঞা বড় বিজ্ঞা যদি না পড়ে ধরা। আর এতে যা কাজ হল, সে যেন এক ম্যাজিক।

১ম অঙ্কচর। বুঝেছি, সেই পুণ্যেই পেয়েছ এই চাকরি। কিন্তু তোমার বোকা-বোকা ভাবটা রয়েই

গেছে দেখছি। যাবে, ওটা পরের জন্মে যাবে।—বাঃ, মেয়েটি তো বেশ!

২য় অঙ্কচর। কিন্তু হজুর চরিত্রটা বেশ নয়!

১ম অঙ্কচর। খুব সাজসজ্জা দেখছি।

২য় অঙ্কচর। ওই তো ওব অঙ্গ! বয়সটাকে কেমন ঢেকে রেখেছে দেখুন। আব সেইসঙ্গে রুখাবার্তার পাশিগটাও দেখছেন।

১ম অঙ্কচর। হ্যাঁ। বার্নিশের আর্টটা জানে মনে হচ্ছে। [অতি-আধুনিক সাজসজ্জায় ভূষিতা একটি তরুণী এবং একজন লালসা-জর্জরিত ধোপ-দুবস্ত পোঁটেব প্রবেশ]

তরুণী। (অভ্যস্ত ছলা-কলা সহযোগে) বিয়েলি!

প্রোঁট। (বমণীবগ্নন ভঙ্গীতে) হ্যাঁ।

তরুণী। কি চমৎকাব আজকের সন্ধ্যাটা। রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে পড়ছে।

প্রোঁট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাবও।

তরুণী। কোন্ কবিতাটা বলুন তো।

প্রোঁট। ওই যে সেইটা—ভদ্রলোক এত কবিতা লিখে গেছেন, বেছে নেওয়াও এক বিপদ!

তরুণী।—বিয়েলি, ভাবতে অবাক লাগে। কবির ফটোটিতে বজনীগন্ধার একটা মালা দিয়ে অপলক চোখে চেয়ে থাকি আব ভাবি—তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি—

প্রোঁট। ওয়াগারফুল! আমাবও মনে পড়েছে—‘সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি—’ এই যাঃ! তারপর ভুলে গেছি।

তরুণী। থাক, ওতেই হবে। তুমি যে স্বরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।

প্রোঁট। রিয়েলি! ওয়াগারফুল। তবে ওঠ—চল।

তরুণী। এই, জান, বাচ্চাটার বড় অস্থখ। কাল সকালে বড় ডাক্তার না আনলেই নয়। অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা আজই আমার চাই।

প্রোঁট। (তরুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া) ওঠ—চল। তুমি সব খোলাখুলি বল বলেই তোমাকে এত ভাল লাগে আমার। রবি ঠাকুর না কে যেন গেয়ে গেছেন—আদেশ করেন যা’ মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে—

তরুণী। - লার্ডলি! লাভলি! হাউ লাভলি!

[দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল]

২য় অঙ্কচব। আপনি হুজুর, এত মন দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন যে! মেয়েটির 'মেক-আপ' দেখছিলেন বুঝি? তবে শুনুন হুজুর, আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছে মেয়েটির লিপস্টিকটা—খুব ঘন মনে হচ্ছিল না কি?

১ম অঙ্কচব। তুমি একটি বুদ্ধ! দেখলে না, যা বলাব ছিল, খোলাখুলি বললে দুজনেই। এদের মনে কোন গলদ নেই যে, গলদ নেই। এরা যা চায় ঠিকই চায়। ভুল কবে চায় না। না। এবা না। ওই যে, আবাব কাবা এই দিকে আসছে।

২য় অঙ্কচব। ওরে বাবা! একজনকে চিনি— সাংঘাতিক ডাকাত। সন্দের লোকটিকে দেখছি এই প্রথম! সাবধানে থাকবেন হুজুর।

১ম অঙ্কচব। কেন বল তো?

২য় অঙ্কচব। ব্যাক লুঠ কবেছে ওই ডাকাতটা। জেল হয়েছিল—জেল ভেঙে পালিয়েছে। খুনও করবেছিল। ফাঁসি হতে হতে বেঁচে গেছে। এবার মরলে লোকটা আমাদের দলে ভিড়ে পড়বে দেখবেন। আপনি আপনার মনের মত লোক পাবেন একটি।

১ম অঙ্কচব। দেখা যাক, দেখা যাক।

[ডাকাত এবং ভদ্রলোকটির প্রবেশ। ডাকাতটি গম্ভীর।
ভদ্রলোকটিকে দেখিলেই বোঝা যায় ধূর্ত]

ভদ্রলোক। তা এতকাল পর হঠাৎ আমাকে তোমার মনে পড়ল যে।

ডাকাত। দেখলাম হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন আপনি।

ভদ্রলোক। হঠাৎ বল না—অনেক মাথার ঘাম পাশে ফেলতে হয়েছে। বছর পাঁচেক জেলে ছিলে তাই আমার জীবনসংগ্রামের কাহিনীটা তুমি জান না। কিন্তু আমি ভাবছি কি জান, জেল ভেঙে বেরিয়ে এসে তুমি এতদিনও ধরা পড় নি—আশ্চর্য তোমার ক্ষমতা! জেল ভেঙে বেরিয়ে আসাটাই তো একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

ডাকাত। কিন্তু তাঁর চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার মশাইয়ের আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া। খোজ-খবর নিয়ে জেনেছি ভেজালের বাজারের রাজা এখন মশাই!

ভদ্রলোক। লোকে ওসব বলে বটে। কিন্তু কেন বলে জান? শ্রেফ হিংসা।

ডাকাত। আপনার কাবখানার তেল-ঘি পরীক্ষা করে দেখা গেছে খাঁটি নয়—ভেজাল।

ভদ্রলোক। ওটা রটনা। তা যদি হত তা হলে সরকার-বাহাদুর আমাকে ছেড়ে দিতেন? নিকটতম ল্যাম্পপোস্টটাতে আমার মৃতদেহ ঝুলিয়ে ছাড়তেন তাঁরা। যখন বহাল তব্বিতেই বয়েছি, তখন এটা তোমার বোঝা উচিত কোন দোষে দুষ্ট নয় আমার তেল-ঘি। তবে হ্যাঁ, যদি কিছু ওতে মিশিয়েই থাকি, মিশিয়েছি ভাইটামিন। বাড়ি ফেরবার পথে আমার গদি থেকে দৈবধন তোমাকে স্লাম্পেল।

ডাকাত। ওসব যাদেব জন্তে তৈরি কবে বেথেছেন, তাদের দেবেন। আমি আপনার ইনস্পেক্টরও নই, গোয়েন্দাও নই। যে জন্ত মশাইকে ডেকে এনেছি, সেটা আমি খোলাখুলিই বলছি।

ভদ্রলোক। বল—বল ভাই, বল!

ডাকাত। আমাদের সময়টা এখন একটু খারাপ যাচ্ছে। কিছু টাকা এখনই দরকার।

ভদ্রলোক। কত?

ডাকাত। হাজার দশেক।

ভদ্রলোক। ওরে বাবা।

ডাকাত। টাকাটা চাই আমি—আসছে কাল সন্ধ্যাব মধ্যে। কি, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যে? কি ভাবছেন মশাই? চাঁচিয়ে পুলিশ ডাকবেন? (পকেট হুইতে একটি ছোরা বাহির করিয়া তাহা নাচাইতে নাচাইতে) তা ডাকুন।

ভদ্রলোক। না না, তোমাকেও আমি জানি, আমাকেও তুমি জান। আমি হচ্ছি শান্তিপ্রিয় লোক। টাকাটা কোথায় কাকে কখন দিতে হবে?

ডাকাত। সেটা কাল টেলিফোনে আপনাকে জানানো হবে। এটা জেনে রাখুন আমার সঙ্গে আপনার আব সকালে দেখা হচ্ছে না—যদি না আপনি আমাকে নিতান্ত বাধ্য কবেন দেখা কবতে। পুলিশকে খবর দিয়ে আপনি নিশ্চয়ই বিপদ ডেকে আনবেন না। আশা করি এটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা আপনার আছে!

ভদ্রলোক। না না, সে কি বলছ? পুলিশ থেকে আমি শতহস্ত দূরে থাকতেই অভ্যস্ত। বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা।

ডাকাত। আমি যেমন প্রাণ খুলে সব কথাবার্তা বললাম, আশা করি আপনিও তাই বলেছেন। মনে কারও কোনও গলদ রইল না, কেমন?

ভদ্রলোক। নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাদেব যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি। (বিষবাস্তবে গিয়া) কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছেন? কিন্তু ওই চাঁদেবও দিন যমিয়ে এসেছে (হাসিতে হাসিতে) গ্যাগারিং—টিটভ—

ডাকাত। মাছুষ যে কত বড় ডাকাত হতে পাবে, তবেই বুঝুন মশাই, বুঝুন!

[উচ্চ হাস্য কবিতা কবিতা উভয়ে ওখান হইতে চলিয়া গেল।]

২য় অঙ্কচর। কি বুঝলেন হজুর? বড় হজুরের বার্নিশটা কি...

১ম অঙ্কচর। না না, এবা সে লোক নয়। এদের কোন ঢাক-ঢাক গুড-গুড নেই। বড় হজুরের সর্বনাশ ঘাণা করেছে, তাদের কথাবার্তায় দেখবে আগাগোড়া বার্নিশ করা। আব সে বার্নিশের তুলনা নেই। কেন জানো?

২য় অঙ্কচর। বলুন হজুর।

১ম অঙ্কচর। সে বার্নিশকে বার্নিশ বলে চেনা যায় না, তাই।

২য় অঙ্কচর। তাজ্জব ব্যাপার। তা এ বার্নিশ বড় হজুরের কি কাজে লাগত, আমার মাথায় ঢুকছে না হজুর।

১ম অঙ্কচর। বলেছি তো, সেটা বুঝতে তোমার আব এক জন্ম ঘাবে। কত যুগ, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওই-রসায়নটি তৈরি করেছিলেন স্বয়ং বড় হজুর—সে জানি আমরা। সেই অমূল্য মাল যার হাতে গিয়ে পড়েছে, শয়তানিতে বড় হজুরকেও হাবিয়ে দেবে সে। বড় হজুরের সিংহাসনই দখল করে নেবে তারা।

২য় অঙ্কচর। সাংঘাতিক কথা। বেকার হতে হবে আমাদের?

১ম অঙ্কচর। শুধু আমরা কেন, বেকার হবেন বড় হজুরও।

২য় অঙ্কচর। তা হলে মৃত্যুবাণ চুরি গেছে বলুন হজুর।

১ম অঙ্কচর। এতক্ষণে সেটা তোমার খেয়াল হল?

২য় অঙ্কচর। বুঝি। তবে একটু দেরিতে বুঝি। নাঃ, আব একটা জন্ম লাগবেই দেখছি। আচ্ছা হজুর, এত বড় চুরিটা সম্ভব হল কি কবে?

১ম অঙ্কচর। বাবণের মৃত্যুবাণটা চুরি হয়েছিল কি করে?

২য় অঙ্কচর। মন্দোদরীর বোকামিতে।

১ম অঙ্কচর। শয়তানের মৃত্যুবাণও চুরি হয়েছে শয়তানীর শয়তানিতে। তোমাব শয়তানীটি কেমন?

২য় অঙ্কচর। আমার মেয়েমাছুষটির কথা বলছেন বুঝি?

১ম অঙ্কচর। তা নয় তো তোমাব ধর্মপত্নীর কথা বলব? নাঃ, আব এক জন্মেও তোমার হবে না দেখছি।

২য় অঙ্কচর। আঃ, মাস্টারী কবতাম বলেই না এই দুর্গতি। সদগতি হল না। যাক, আপনি জিজ্ঞেস কবছেন বলেই বলছি, আমার প্রেমসী আমাকে ছাড়া আব কিছু জানে না।

১ম অঙ্কচর। খুব খাবাপ লক্ষণ। সর্বদা জানবে, প্রদীপের নীচেই অঙ্ককারটা গভীর—বিশেষ শয়তান-বাজ্যে। লক্ষ্য রাখলে হয়তো দেখবে অরুচি এসে গেছে।

২য় অঙ্কচর। অভয় পেয়েছি বলেই বলছি হজুর, অরুচিটা এসেছে আমাব।

১ম অঙ্কচর। তোমার যখন এসেছে, তার এসেছে আরও আগে। বিশেষ ভূমি যখন এখনও এত বোকা। আব বোকা না হলেই বা কি, বড় হজুর তো বোকা নন। কিন্তু তিনিও একদিন চমকে উঠলেন, যখন দেখলেন, তাঁর সিঁদুকটি খুলে বার্নিশের টিনটি খুলতে যাচ্ছেন তাঁরই প্রেমসী।

২য় অঙ্কচর। বার্নিশের টিনে তার আবাব কি দরকার হল হজুর।

১ম অঙ্কচর। চোখে ধুলো দিতে দরকার হয় ওই বসায়ন। ঘষে মেজে পালিশ করে লাগাও ওই বার্নিশ, দেখবে গলদ নেই কোনখানে। গলদ ঢাকতে ওই বার্নিশের আর জুড়ি নেই।

২য় অম্বুচর। তাই বুঝি হুজুরাইন নিজের গলদ ঢাকতে ওই বানিশের টিনটা—

১ম অম্বুচর। হ্যাঁ। যাক, এটা দেখছি তুমি ধবতে পেরেছ।

২য় অম্বুচর। গলদ তাতে ঢাকা পড়ল ?

১ম অম্বুচর। তা যদি পড়ত, সে ববং ভাল ছিল। টিনটা ঘরেই থাকত। কিন্তু আমাদের বড হুজুব গেলেন চটে। প্রেয়সী ব হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন টিনটা। হল একটা ধস্তাধস্তি। টিনটা ছিটকে যে কোথায় গিয়ে পড়ল, আব, পাওয়া গেল না। কে যে সেটা চুবি কবল, তাও জানা গেল না আজ পর্যন্ত। (দুইজন আগন্তুককে দেখিয়া) এবা আবাব কারা ?

২য় অম্বুচর। এ দেশের প্রিয় নেতা আর তার এক প্রিয় সহচর।

[নেতা ও তাহার সহচরের প্রবেশ]

নেতা। এখানে এসে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম। ভাল লাগে না আব তোমাদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাতাস। এস, বস।

সহচর। কিন্তু আপনাব যা প্রোগ্রাম তাতে দশ মিনিটের বেশী এখানে বসা আপনার চলবে না সাব। আর এই দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের প্রচার সম্পর্কে আপনার গোপনীয় উপদেশ আমাকে নোট কবে নিতে হবে।

নেতা। ওহে, সেটা আমি জানি। সাক্ষোপাদ্দের এডাবাব জুটেই বায়ু সেবনের নাম করে তোমাকে নিয়ে চলে এসেছি এখানে। এখন বল, কি তোমাব সমস্তা ?

সহচর। (নোট নেবাব উদ্দেশে পকেট-বই খুলিয়া) প্রতিবেশী রাজ্যের উদগ্র লালসা। আমাদের বাজ্যে অনধিকার প্রবেশ।

নেতা। আলাপ-আলোচনাব মাধ্যমে মীমাংসাব বার্নিশটা লাগিয়ে দাও। তাবপর—

সহচর। দেশের খাত্তসমস্তা।

নেতা। আঃ! পাঁচশালা পরিকল্পনাব বার্নিশটা কি ফুবিয়ৈ গেছে ?

সহচর। ফুবিয়ৈ যায় নি, যাব যাব কবছে। আচ্ছা, সে না হয় হল, কিন্তু খাত্তব্রবের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি—এ সমস্তাটা ?

নেতা। ত্যাগ-স্বীকারের বার্নিশটা ?

সহচর। সেটা ফুবিয়ৈ এসেছে।

নেতা। তলানি পড়ে নেই কিছু ?

সহচর। তা হয়তো আছে।

নেতা। তাই দিবে দাও। নাও, এবার চল, উঠি।

সহচর। কিন্তু আবও কতকগুলো সমস্তা—যেমন, গৃহসংস্থান, পবিবহন, স্বলভ শিক্ষা, হাসপাতালে স্থানাভাব, সর্বোপবি বেকাব সমস্তা, এগুলো সম্পর্কে—

নেতা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সবই জাতীয় পবিকল্পনাব খাতে পড়ছে।

সহচর। খাদে পড়েছে! সে কি স্তার ?

নেতা। খাদে নয়—খাতে। উন্নয়নের বাণিশ লাগাও।

[চলিলেন]

সহচর। (পিছু নিয়া) আব সাব, সেই ভাষা-সমস্তাটা—

নেতা। ওটা আবাব সমস্তা নাকি হে? অহিংসাব সঙ্গে জাতীয় সংহতি মিশিয়ে পালিশ করে দাও।

সহচর। সাব, শুনুন।

নেতা। না হে, আর সময় নেই।

[উভয়ে চলিয়া গেল]

১ম অম্বুচর। (বড হুজুবের ব উদ্দেশে চিৎকার কবিয়া) বড হুজুর! বড হুজুব শুনছেন ?

[শযতানের কণ্ঠস্বব ভাসিয়া আসিতে লাগিল]

শযতান। শুনলাম। টিনটা উদ্ধাব কবতে পার ?

১ম অম্বুচর। যে হাতে ওটা গিয়ে পড়েছে, সে বড কঠিন ঠাঁই হুজুর।

শযতান। কেন হে? কত কি সব লণ্ডভণ্ড কবে দিষেছ তুমি, এখানে পিছপাও হচ্ছে কেন ?

১ম অম্বুচর। বার্নিশের শক্তিটা হুজুব ভুলে যাচ্ছেন। কোন অশান্তি করতে গেলেই আমাদের ঘবে মেজে বিশ্ব-শান্তিব বার্নিশ দিযে পালিশ কবে দেবে।

শযতান। তবে আর কি, সিংহাসনটা আমার গেল।

২য় অম্বুচর। ভালই হল। বড হুজুর আজ থেকে দেবতা হয়ে গেলেন। আব সেই সঙ্গে আমরাও।

শযতান। হ্যাঁ, এইটেই আমাব এখন একমাত্র সাধনা, একমাত্র সাধনা—একমাত্র সাধনা—

॥ স্ববনিকা ॥

ষাচাই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুব গাড়ি ঢুকল চাঁদপুর গ্রামেব মধ্যে। ননীবালা
ছেলেকে বললে, বাবা, চেয়ে দেখ।

যুঁই নি মা। চেয়ে আছি।

এই গাঁয়ের সীমানা। ওই গেল তুলে পাড়া।

ব্রাহ্মণ পাড়া কতদূর?

আরও আগে।

ননীবালার সারা দেহেমনে একটি অপূর্ব অম্লভূতির
শিহরণ।

মনে পড়ল আজ ত্রিশ বত্রিশ বছর পূর্বে একদিন এই
গ্রামে নববধূরূপে ঢুকবার সেই দিনটির কথা। তিনি
ছিলেন পাশে, আজ যেমন ছেলে স্ববেশ তার পাশে বসে
রয়েছে। তেমনি মুখচোখ, তেমনি চোখের দৃষ্টি,
বয়েসও তাই।

চাঁদপুর গ্রামে ঢুকবার কিছু পবেই কাককোকিল
ডেকে তোর হয়ে গেল।

স্ববেশ গাড়ি থেকে নেমে গাঁয়ের পথের ধুলো তুলে
মাথায় দিলে। মাকে বললে, তোমরা কতদিন গাঁ থেকে
গিয়েছিলে?

তোর বয়েস।

একুশ বছর।

হ্যাঁ। ওঁর ইঙ্কুলেব চাকরি গেল, আমরা এখানকার
মায়া কাটালুম।

বাবা দুঃখ কবেন নি?

আহা! মরবার আগেও প্রায়ই বলতেন, বড় বউ,
একবার যদি চাঁদপুর যেতে পারতাম ফিরে, তবে বোধ হয়
কিছুদিন আরও বাঁচতাম। ওখানে এখনও চৈত্র মাসেব
হুগুবে বুড়ীবা কুলচুর শুকুচ্ছে রোদরে। বাঁশরনে কত
কোকিল পাগিয়া ডাকছে, আমি গাঁয়ে যাব। শহরের

ছোট্ট বাসার মধ্যে উনি চিরকাল হাপিয়ে এসেছেন।
আব তেমনি গবম সেখানে।

আমি যদি তখন বড় হতাম, বাবাকে বাবার জন্মভূমিতে
ঠিক নিয়ে আসতাম বলে দিচ্ছি।

স্ববেশ ছিপছিপে চেহারার শক্ত হাতপাওয়ালা যুবক।
ফুটবল খেলে ভাল। দেশ স্বাধীন হবার পবে রাইফেল
ক্লাবে যোগ দিয়ে খুব রাইফেল ছোঁড়া অভ্যেস কবছে।
এইবার রেলের শিক্ষানবিসি শেষে করে ভাল চাকরি একটা
পাবে। শিক্ষানবিসি সময়ই ও খেলোয়াড় হিসেবে
রেলের উপনিবেশ শহরটির অনেক বড় বড় অফিসারের
দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। শিক্ষানবিসির ছাত্রও সে ভাল,
অঙ্ক বেশ ভাল জানে বলে অঙ্কের টুইশানিতে মাসে
আজকাল সত্তর আশি টাকা বোজগার করে।

আমী-মারা গিয়েছেন আজ দশ এগারো বছর। স্ববেশ
তখন দশ বছরের ছেলে, নিচের ক্লাসে পড়ে। কি
আঁখাস্তরেই ফেলে গিয়েছিলেন সেদিন! মনে হয় নি যে
আবার একদিন এ ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে।
রেল উপনিবেশের সকলেই খুব দয়া করলেন। একটা
বাসা দেখে দিলেন, কারণ রেলের কোয়ার্টার ছাড়তে
হল, ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারি রায় বাহাদুর হরিচরণ বসু
নিজে এসে দেখাশুনো করলেন স্ববেশেব লেখাপড়া যাতে
বন্ধ না হয়, যাতে এ গরীব অসহায় পরিবারটি অনাহারের
পথ থেকে রক্ষা পায়—এ সমস্ত ব্যবস্থাই ওখানকার বড়
বড় লোকেরা কবলে। সে সব দিনেব কথা ভাবলে জ্ঞান
থাকে না। এমন দিনও আসে মানুষের জীবনে!

আজ মনে হচ্ছে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এসে অদূবে এবার
কুলরেখা যেন দেখা দিয়েছে। ওরা সবাই বলে আমাদের
দেশ এখন স্বাধীন, আর সে যুগের মত কষ্ট করতে হবে

না। এখন ছেলেপিলেদের ভাল চাকবি হবে, চাকরিতে উন্নতি হবে, আগের মত অল্প মাইনেতে ঘসটিতে হবে না। না খেয়ে মরবে না কেউ এ স্বাধীন ভাবতেব মাটিতে। অনেক বড় বড় আশার কথা সে শুনেছে, ছেলে ছোকবাবা কত মীটিং করে, বক্তৃতা দেয়, গান্ধীজীব ছবিতে মালা দিয়ে গান করতে করতে শহর ঘুরে বেড়াল এই তো সেদিন। তাঁব মৃত্যুর পরে সেদিন এক বৎসর বুঝি ঘুবল। স্বরেশও চমৎকার গান গাইতে পাবে। আর একটা গান গায় স্বরেশ, গান্ধীজী নাকি বড় ভালবাসতেন। সবাই বলে, 'রামধুন' গান।

রঘুপতি রাঘব বাজাবাম

পতিতপাবনাসীতারাম।

ভোরের আলো বেশ ফুটেছে। সামনের পুরনো কেঠাবাড়িটা থেকে একজন বার হয়ে এসে পথের ওপর দাঁড়িয়ে ওদেব গরুর গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। ননীবালা চুপি-চুপি বললে, ও স্বরেশ, ওই বোধ-হয় তোর বিনোদ কাকা, ওর খুঁজুতো ভাই। আমি চিনেছি। তুই এগিয়ে যা। পরিচয় দিয়েই প্রণাম করবি। ওঁকেই চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

মিনিট পনেরো কেটে গেল উভয়ের কথাবার্তা। স্বরেশ আর তার বিনোদ কাকার।

তারপর বিনোদ কাকা এগিয়ে এসে ননীবালাকে আদর করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

বহুদিন পরে গ্রামের বউ গ্রামে ফিরে এসেছে। আজ কুড়ি একশ বছর পবে। গ্রামের বউ-বি দেখা কবতে এল এপাড়া ওপাড়া থেকে। অভয় নাপিতের বউ এসে বললে, ও বউ, কেমন আছ? খোঁকা কই? কত বড়টা হয়েছে দেখি? দাঁড়াও, একটু পায়ের ধুলো ত্যাও দিনি আগে।

তাঁবপর তুই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে সে সামনে বসল।

অভয়ের বউকে দেখে ননীবালা যেমন আশ্চর্য হয়ে গেল, তেমনি মনে মনে কেমন এক ধবনের হুঃখও হল। অভয়ের বউ তার চেয়ে অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ বছরের বড়, তার মার বয়সী, চুল অর্ধেক পেকে গিয়েছে—শুধু ধাত 'ভাল' আছে বলে অত বয়স বোঝা যায় না—কিন্তু অভয়ের বউ এখনও সধবা। পাকা চুলে সিঁদু ব পরছে। অভয়

নাপিত এখনও বেঁচে থাকবে সেটা ভেবে দেখলে এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়, বড় জোব সত্তর বাহান্তর না হয় তাঁব বয়স হয়েছে—কিন্তু—

এ 'কিন্তু'ব কোন সাহুনা ননীবালা মনের মধ্যে খুঁজে পেল না। ওঁব কি মরবার বয়স হয়েছিল? পরদিন সে দেখলে, শুধু অভয় নাপিতের বউ নয়, তাঁব চেয়ে অনেক বড় বড় বউ এখনও দিব্যি সিঁদু ব পরছে পাকা আধপাকা চুলে। কেন উনি চলে গেলেন অল্প বয়সে ওদেব বিদেশে ভাসিয়ে? গ্রামের মেয়েবা যখন দেখা কবতে আসে, তখন বাব বার ওই কথাটাই মনে হয় ওর।

ননীবালার শ্বশুরবাড়ি বিনোদ কাকার বাড়ির দক্ষিণ গায়ে। কুড়ি একশ বছর ধরে সে বাড়িতে কেউ না থাকায় উঠোনে একগলা নোনা; ভাঁট, সঁউতি লতাব জঙ্গল, জংলী ডুমুরের বড় গাছে ডুমুর ফলছে পাঁচিলের মাথাখ, জানালায় কাঁটালতা উঠে জানালার কবাট ঢেকে ফেলেছে।

স্বরেশ কেবলই বলছিল, মা, আমাদের নিজেব বাড়িতে চলা গিয়ে। গ্রামে এসে পবেব বাড়িতে থাকব কেন? আজ তিন চাব দিনে জঙ্গল কাটিয়ে উঠোন পবিকাব কবে তবে ননীবালা নিজেদের ভিটেতে ঢুকল।

মাত্র তিনখানি ঘর, দুটো বারাগু হুদিকে, ভাঁড়ার রান্নাঘর আলাদা। কতকাল পরে আবার এ বাড়ির মাটিতে সে পা দিল? দীর্ঘ একশ বছর। এতও তার জীবনে ঘটবাব ছিল।

স্ববেশ বলে, কই মা, আমার তো কিছু মনে নেই এ বাড়িতে থাকবার কথা?

ননীবালা বলে, দূর, তোর বয়স যখন না মাস, তখন এ বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাই যে।

এখন এখানে কিছুদিন থাক মা। আমার বড় ভাল লাগছে।

থাকতেই তো এলাম। এখন মা মঙ্গলচণ্ডী মা করেন।

ননীবালা সারাদিন ঘর বাডে পৌছে সাজায়। আজ একশ বছরের ধুলোর স্তর পড়েছে ঘবখানাব ওপর। কেবলই ওব মনে পড়েছে আজকাল ওদের বিবাহিত জীবনের সেই মধুমাখা দিনগুলি—নববধুর নতুন স্বপ্নমাখানো অপূর্ব রাত্রি ও দিনগুলি। উনি তখন একেবারে তরুণ, সে চোদ্দ বছরের কিশোরী।

ওই তো সেই কুসুদ্বিটা। ওটাতে উনি একদিন রসগোল্লা এনে ছুকিয়ে রেখে মজা কবেছিলেন। একটা বিলিতি ওষুধের কাগজের বাস্তের মধ্যে রসগোল্লা ছিল হুকোনো। উনি বলেছিলেন, কি বল তো ওতে?

প্রগল্ভা নুববধু বলেছিল, তোমাব জিনিস তুমিই জান। ও তো একটা বিলিতি ওষুধ।

বাজি ফেলবে?

অতশত আমি বুঝি নে। কি ওতে?

বসগোল্লা।

হাতী।

গা ছুঁয়ে বলছি। এই দেখ—কটা খাবে বল।

তাবপব দুজনে কাডাকাডি কবে সেই বসগোল্লা খেয়েছিল—ত্রিশ বছর আগের কথা। মনে হচ্ছে কাল ঘটেছে। এখানে এসে বড্ড বেশি করে স্বামীর কথা মনে পড়ছে ননীবালাব। সব ঘরে, সব বারান্দায়, প্রতি কোণে, ওই তক্তাপোশখানায়, ওই বান্নাঘরের খেতে বসবাব বড় কাঠাল কাঠেব পিঁড়িখানায় ওব নুববধুজীবনের স্মৃতি মাখানো। তরুণ স্বামী সেখানে ঘুবছেন এঘরে ওঘবে, ও নিজে সেখানে ব্রীডানত্র কুণ্ঠিতা কিশোবী বধু, নতুন প্রেমের স্পর্শে দুঃখদুঃখ বুক নিয়ে আলতা-পবা পায়ে এঘরে ওঘরে গৃহকাজ করে বেড়াচ্ছে নবীন উৎসাহ নিয়ে।

ননীবালার মনে হচ্ছে যেন ওঘরে গেলেই দেখবে তিনি বসে আছেন তক্তাপোশে আবাব ওঘরে থাকলে মনে হয় বুঝি এঘরে এলেই দেখা পাবে। আগেকাব দিনের মত লুকোচুরি খেলা এখনও কি চলছে?

একবাব উনি নতুন ধানের শিষ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, লক্ষ্মীব ঝাঁপিতে রেখে দাও। নতুন জমির নতুন ধান। শাঁখ বাজাও, তুমি ঘরের লক্ষ্মী, শাঁখ বাজিয়ে অভ্যর্থনা করা নিয়ম তোমাব।

ঠিক দুপুরের গমগম বোদে অলস নিমফুলেব গন্ধের মধ্যে কতকাল আগের তার কথাই মনে পড়ে। ননীবালা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাঁশঝাড়ের ঘন ডালের দিকে, কিন্তু মন তখন অতীত দিনেব কোন আবেশাতুর মুহূর্তটিতে স্থিরনিবদ্ধ। হয়তো সে সময় ছেলে স্নবেশ বলে ওঠে—মা, একটু খাবাব জল দাও না। ননীবালা চমকে ওঠে ধ্যান ভেঙে, লজ্জা পায় পাছে ছেলে কিছু না বুঝে ফেলে।

ছেলেকে জল দিয়ে হয়তো কাঁথা সেলাই কবতে বসে গেল, কিংবা নতুন-পাড়া তেঁতুলের রাশ বাঁটি পেতে কাটতে আরম্ভ করে দিলে।

অমনই মনে পড়ে যায় সেই সব দিনে এমন চৈত্রেব দুপুরে—

বাড়ির পেছনের গাছের তেঁতুলের বাশ এমনই কাটতে বসেছিল একদিন—

উনি পেছন থেকে এসে চুপিচুপি বললেন, তেঁতুল কাটা বাখ। ছুন দিয়ে নেবুপাতা দিয়ে তেঁতুল জড়াও দিকি বেশ করে।

চুপ। মা টের পাবেন। পালাও তুমি। তেঁতুল খেলে জব হয়।

ইস। উনি যেন আর খাবেন না, একলা আমি খাব কিনা। মা ঘুমুচ্ছে। তুমি তাড়াতাড়ি ওঠ তো লক্ষ্মীটি। জিভে জল আসছে না তেঁতুলেব নামে। সত্যি কথা বল।

ননীবালাকে উঠে যেতে হয় কাটা তেঁতুল নিয়ে বান্নাঘরের দিকে। উনি বলেন, দাঁড়াও, আমি নেবুপাতা নিয়ে আসছি। তেঁতুলগুলো একটু ধুয়ে নিও, বড্ড বালি কিচকিচ করবে নইলে—

ননীবালা ধমকেব স্বরে বলে—হ্যা গো হ্যা। সর্দাবি করতে হবে না। তেঁতুল ধুয়ে কেউ জঁরায় না। জিজ্ঞেস কব গিয়ে। পানসে হয়ে যায়।

দুজনে কাডাকাডি করে সেই একতাল জবানো তেঁতুল খেয়ে ফেলে। পবদিনই ওঁর সর্দি আর গলাব্যথা। ননীবালা আঙুল তুলে কোঁতকের স্বরে বলে—কেমন? বলেছিলাম না? কথা শোনা হল? আমার কথা শোনা হবে কেন। আমি কি আর কেউ?

মাকে যেন কোন কথা বল না—

ঠিক বলে দেব। চালাকি বার করে দেব দেখ। আব একটু তেঁতুল চলবে? নিয়ে আসব ছুন নেবুপাতা দিয়ে?

ননীবালার ছ চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে আঁচল দিয়ে, ছেলে পাছে টেব পায়। আজ যদি তিনি থাকতেন। মবাব বয়স হয় নি তো। অনায়াসেই থাকতে পারতেন। আজ কি স্নবেবই দিন তা হলে। খোকা এত বড় হয়েছে। যে দেখে সেই

ভাল বলে। দু দিন পরে মা মঙ্গলচণ্ডীর কুপায় রেল ভাল চাকরি কববে। উনি পায়েব ওপর পা দিয়ে বসে খান না কেন। আমরা তাঁকে কাজ কবতে দিতাম না। আবাম করে খান না ছেলেব বোজগাব। এই দুপুরে বসে বসে কত গল্প করতাম দুজনে। ছেলেব বউ সেবা কবত, তেঁতুল জরিয়ে নিয়ে আসত।

পৃথিবীর পথে সে যেন একা।

সঙ্গী চলে গিয়েছে তাকে ফেলে।

দীর্ঘ পথ সামনে দু'থেকে দূরে বিস্তৃত। কে জানে কতদিন চলতে হবে এই টানা পথ বেয়ে।

না না, তাব খোকা, তার সুরেশ আছে। বেঁচে থাক সে। তার ঘবকন্না গুছিয়ে দিতে হবে না? আজ বাদে কাল সুরেশের বিয়ে দিতেই হবে। ছেলেমাছুষ ওবা, সংসারের কি জানে। তাকেই গুছিয়ে দিতে হবে সব। সুরেশ এসে বলে, মা, একটু তেঁতুল জবাও না? ছন দিয়ে নেবুপাতা দিয়ে।

ননীবালা চমকে উঠে ছেলের তরুণ মুখের দিকে চেয়ে থাকে-অবাক হয়ে। অল্পদিকে মুখ ফিবিযে সে চোখের জল রোধ করলে।

ছেলে কি করে জানলে তাব বাবা অবিকল এমনি সুরে, এমনি টান দিয়ে কথা বলত!

গ্রামে ফিরে আসা পরিস্থিতির প্রতি পদক্ষেপ যেন সে শুনতে পায়। কি জানি কিছুই যেন ভাল লাগে না। সব যেন ফাঁকা, অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কোন কাজে আব উৎসাহ নেই।

একদিন ও-পাড়ার হবিদাস চক্কড়িব বাড়ি সত্য-নারায়ণের পুথি শোনা ও প্রসাদ খাওয়ার নিমন্ত্রণে সে পাড়ার ঝি-বউদের সঙ্গে গেল। সেকলে কোঠাবাড়ি, দালানে পূজার জায়গা হয়েছে, মাছর পেতে দেওয়া হয়েছে নিমন্ত্রিতা মেয়েদের জন্তে। পুরুষেবা বসেছে বাইরেব রোয়াকে। পূর্ণিমার রাত্রে উঠোনেব বড় নারকোল গাছগুলোর ছায়া পড়েছে বোয়াকে। সন্ধ্যা তোলা জুইফুলের স্বগন্ধে ভুরভুর কবছে পূজার বারান্দা।

হরিদাস চক্কড়ির বউ বললেন, এস এস ভাই। কতদিন গাঁয়ে আস নি, সেই একবার এসেছিলে অনন্ত-চতুর্দশীর ব্রত উদ্‌যাপনের সময়, মনে পড়ে?

ননীবালা বললে, খুব মনে পড়ে।

তখন তোমার নতুন দু-এক বছর বিয়ে হয়েছিল।

দু বছর হবে।

চেহাবা আগেব চেয়ে খাবাপ হয়ে গিয়েছে।

আব চেহাবা দিদি! কি দবকাব আমাদের চেহারায় বলুন। সে পাট তো যুচে গিয়েছে।

আহা হা, সে আর বল না ভাই। ঠাকুরপো তো ছেলেমাছুষ। আমাদের ওঁদের চেয়ে কত ছোট। তাব কি এখন যাবাব বয়স হয়েছিল? সবই অদেষ্ট! কি বলব বল।

ননীবালার দু চোখ-ততক্ষণ জলে ভরে-গিয়েছে। অল্পদিকে মুখ ফিবিযে রইল, নয়তো জল গড়িয়ে পড়বে গাল বেয়ে। সে একটা লজ্জার কথা এদের সামনে। তাব মনে যে কি অভাব, সে কথা এরা কেউ বুঝবে না। সে মধুব অল্পভূতির স্থিতি এদের জীবনে পুঁজি নেই, স্থূল জীবন-যাত্রা চালিয়ে যায় রান্নাবাড়া করে-খেয়ে খাইয়ে, ঘরকন্না গেবস্থালি করে। তার মনেব সে অল্পভূতির ধাবণাই নেই এদের। চোখের জল দেখে ভাববে ঢঙ করে কাঁদছে লোক-দেখানোর জন্তে।

পাশের কানাই গাঙুলিব পুত্রবধু এসে বসল ওর পাশে। ওব সঙ্গে আলাপ করে ফেললে। অল্পদিন বিয়ে হয়েছে, একটা মাত্র মেয়ে, ন মাস বয়েস। বাপেব বাড়ি শান্তিপুরের কাছে হবিবপুর। বেশ শহুরে টান কথাবার্তায়। ওকে বলল, কাকীমা, আমি আপনাব সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছি আজ কদিনই।

আমার কথা কে বললে তোমাব?

সবাই বলে। আমাব পিঙ্গাশুড়ি বলছিলেন, বড় ভাল বউ ছিল এ গাঁয়েব। গিয়ে দেখা কবে এস বউমা। আপনার নাম কি কাকীমা?

ননীবালা। তোমাব?

প্রীতিলতা।

বেশ নামটি। খুকির নাম কি?

এখনও কিছু রাখি নি। ডাকনাম টুলু। আপনার কাছে যাব এখন। একটা নাম ঠিক কবে দেবেন এখন আপনার নাতনীরা।

দেব না কেন বউমা, কালই যেয়ো। গান কব না ক?

গাই। সে তেমন কিছু না। আপনার মুখে শুনব।
এইমাত্র ওরা বলছিল আপনি ভাল গান জানেন।

আমি? আমার গানের পাঁচি তো চুকে গিয়েছে মা।
আবার—নাঃ—যখন তখন চোখে জল এসে বড় অপ্রতিভ
করে দেয় এইসব ছেলেমানুষ ঝি-বউয়ের সামনে। তার
কি এখন চোখ পানসে করে কাঁদবাব বয়েস? সে না
গিমিবাঁমি? ছেলের মা?

প্রীতিলতা বেশ দেখতে মেয়েটি, কত আর বয়েস হবে,
আঠারোর বেশী নয়। ননীবালা সামলে নিয়ে বললে, যেয়ো
বউমা। তোমাদেবই মুখেব দিকে চেয়ে তো আবার এ
গাঁয়ের মাটিতে পা দিলাম। যাবে বইকি।

সবই বেশ ভালভাবেই চলছিল, এমন সময় আর একটি
ওর সমবয়সী মেয়েব সঙ্গে দেখা হল, তাব নাম কনক,
এপাড়াব কোনও এক বাড়ির মেয়ে, বোধ হয় উপেন
ভট্টাচার্যের মেয়ে। কনক ছুটে এসে ওর হাত দুখানা চেপে
ধরে বললে, মনে পড়ে বউদি? মনে পড়ে?

একে খুবই মনে পড়ে। স্বামীব ঘরে প্রথম প্রথম
ষাবার সময় এই মেয়েটি আর রায় চৌধুরী পাড়ার
স্বাসিনী এই দুজনে কি অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবশায়েব
সঙ্গেই তাদের বৃদ্ধ দুয়ারের বাইরে আড়ি পেতে বসে
থাকত রাত দুপুর পর্যন্ত।

একদিন—না, সে সব কথা এখন মনেই চাপা থাক।

জুইফুলের গন্ধে ভবা দীর্ঘবিলসিত তাদের পুরনো
বাতাস কোন্ দিগন্তে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এসব পাড়ারগায়ের মেয়েদের জ্ঞানকাণ্ড বোধ হয়
একটু কম। নইলে সে সেটা প্রাণপণে চাপা দিতে
চাইছে, ওরা সেটা খুঁচিয়ে তুলতে চাইবে কেন? একটা
সাধারণ বুদ্ধিও তো আছে। কনক সামনে এলেই মনে
পড়ে সে সব মাধবী রাত্রির টাটকা জুই চাপার গন্ধ।
কেন এরা সামনে আসে? কেন এরা সামনে আসে?
ননীবালা মুখে অতি কষ্টে হাসি টেনে বলল, হ্যাঁ ভাই,
কনক ঠাকুরঝি। ভাল?

ভাল। তুমি?

দেখতেই পাচ্ছ।

তা তো দেখছি। আহা, মনে পড়লে বুক ফেটে
যায় সেদিনের কথা। সেই রাত্রে দাদা আমার মুখে

খড়িগোলা মাথিয়ে দিলে আড়ি পাতবার জন্তে, মনে
পড়ে?

না এদের যেন আর কোনও কথা নেই আজকার
দিনে। ননীবালা চুপ করে বইল দেখে কনক বোধ হয়
কিছু অপ্রতিভ হল। সেও চুপ করে গেল।

খুব লোকজনের ভিড়। দালানের মধ্যে মেয়েদের
প্রসাদ খাবার পাতা সাজিয়ে দেওয়া হল। ননীবালা এবং
অন্তান্ত মেয়েরা সেখানেই বসল। সত্যনারাণের পুঁথি
পড়া আরম্ভ হল।

খানিক পরে সেখানে একজন বৃদ্ধ লাঠিহাতে এসে
দাঁড়াল। বৃদ্ধের বাঁ হাতে একটা বাটি। বৃদ্ধ এসে বললে,
পূজো হয় নি?

হরিদাস চক্ৰবর্তির ছেলে বললে, না। আস্থন
জ্যাঠামশায়। বস্থন—

মেয়েদের মধ্যে আর বসব না। যাই বাইরে। কত
দেঁরি হবে?

বেশী দেঁরি হবে না জ্যাঠামশায়।

আবাব বাড়ি গিয়ে রুটি কবতে হবে, তবে খাব। বেশী
রাতির না হয়।

ননীবালা পাশেব কাউকে জিজ্ঞেস করলে, উনি কে
ভাই?

সে বললে, চাটুয্যে-বুড়ো। ছেলেরা মস্ত রোজগেরে।
কলকাতায় থাকে। বুড়ো বাবা এখানে পড়ে আছে,
খোঁজও নেব না।

বউ বেঁচে নেই বোধ হয়।

খুব-আছে। ছেলেদের কাছে কলকাতায় থাকে।

ইনি যান না কেন ছেলেদের কাছে?

তাকি জানি দিদি। তা বলতে পারি নে। এখানে
থাকে, তাই তো দেখি। আর তুমিও যেমন। নিজের
খবরই রাখতে পারি নে তাব আবার পরেব খবর নিতে
যাচ্ছি।

রাত অনেক হয়ে গেল পূজো ও পুঁথি-পড়া শেষ
হতে। ননীবালা যখন ছেলেব সঙ্গে বাড়ি যায়, তখন
দেখতে পেলে সেই বৃদ্ধ ওদের আগে আগে চলেছেন লাঠি
ঠকঠক কবতে করতে। ওদের দেখে বললেন, কে যায়?
তোমাদের তো বাবা চিনতে পারলাম না? স্বরেশের

পবিচয় পেয়ে বড় খুশী হলেন। তাকে কত আশীর্বাদ কবলেন। ননীবালাকে বললেন, তোমার বিয়েব পব একবার বউমা তোমাষ দেখেছিলাম—বিষেব বউভাতেব দিন। যেযো আমাদেব বাড়ি, কেমন? কালই য়েয়ো।

পরদিন বিকেলে ননীবালা চাটুয্যে বুড়োর বাড়ি গেল। সামনে বাবান্দাওয়াল। সেকেলে কোঠাবাড়ি, একদিকে ডুমুর গাছ অত্রদিকে একটা বাতাবিনেবু গাছ—উঠানের পূবদিকে একটা পেঁপে গাছে অনেকগুলো পেঁপে ধরেছে।

বুড়ো বললে, কি দেখছ বউমা, ও সব আমার নিজের হাতে করা। সবাইপুরের বিশেষদের বাড়ি থেকে বীজ আনিয়েছিলাম আজ ন বছব আগে। সেই গাছ। তখন ওবা সব এখানে ছিল।

ননীবালা বললে, ওবা কারা জ্যাঠামশাষ?

তোমাষ জেঠিমা।

আপনাকে এখানে রেঁধে দেয কে?

নিজেই। খুব ভাল রাঁধতে পারি। এই এখন বসে বসে পরটা করব।

জেঠিমা থাকেন না এখানে?

না মা। ওরা বড় ছেলেব কাছে থাকে কলকাতায়।

কয ছেলে আপনার?

তিনটি। তা নিজেব মুখে বলতে নেই, তিন ছেলে ভাল চাকরিই করে। শ্রামবাজারে তেতলা বাসা। ইলেক্ট্রিক লাইট, ফ্যান। বড় ছেলের মোটব গাড়ি। দশে মানে, দশে চেনে। চাটুয্যে সাযেব বললে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের একডাকে সকলে চেনে। চেহারাও একেবারে সাযেবি—নিজের ছেলে বলে বলছি তা ভেব না—

বুদ্ধেব মুখেচোখে গর্বেব ভাব অতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিজের মনে আপনা-আপনি হেসে উঠে বললেন, জন্মাবার পবে এতটুকু ছিল। ওর মা ফুলেনবলার পাঁচু ঠাকুরের দোর ধবে তবে ওই ছেলে বাঁচায়। ছ বছর বয়সে কাকডাবিছেব কামড়ে ছেলে নীলবর্ণ হয়ে মরে যাবার যোগাড় হয়েছিল। কাঁটানটেব শেকড বেটে খাইয়ে জলপড়া দিয়ে তেলপড়া দিয়ে সে যাত্রা অতিকটে রক্ষা হয়। তবে আজ আমাদেব নুপেন। তা এস, বস বউমা। এই পবটা কথানা ভাজি আব তোমার সঙ্গে গল্প করি।

একটা ক্ষুদ্র ভাঁড়, চঁচে মুছে ঘি বেরলো আধ ছটাক-খানেক।

বুদ্ধ ভাঁড় দেখিয়ে বললেন, দালদা। ভাল দালদা। আর তা ছাড়া পাচ্ছি কোথায়? শ্রীঘি আট টাকা সের। কেন, আপনাব ছেলে টাকা পাঠায় না?

বুদ্ধ তাডাতাড়ি বলে উঠলেন, নুপেন? তার অনেক খবচ। রোজগারও যেমনি, খরচও তেমনি। আমি আর তাকে বিবক্ত করি নে। আমাব বিষে তিনেক ধানেব জমি আছে, আব ধব লাউ কবি, কুমডো করি, টেঁডস, ডাঁটা—সবই তৈবি কবি নিজেব হাতে। বেশ চলে যাচ্ছে। নুপেন পূজোর সময় একখানা ভাল খান কাপড পাঠিয়ে দিয়েছে, ফাইন খান, তা বউমা সে আমি তুলে বেখে দিয়েছি। বারবাব দেখি, বলি, বড় খোকা আমায় দিয়েছে। ছোট ছেলেব বাসা আগে ছিল কলকাতায়, এখন মনিপুরে। সে একজোড়া চটিজুতো পাঠিয়ে দিয়েছিল পূজোর সময়।

ননীবালা ইতিমধ্যে পরটা কথানা বেলে দিয়ে বললে, আপনি ভেজে নেবেন, না, আমি দেব?

না মা, আমিই নিচ্ছি।

কেন কষ্ট কববেন? সক্ষন, আমি কবে দিচ্ছি।

ননীবালা খাবার তৈবি করে দুধ জাল দিয়ে পিঁড়ি পেতে বুদ্ধকে বস্তু করে খেতে বসিয়ে দিলে। চাটুয্যে বুড়োর মুখেব ভাব দেখে মনে হল অনেকদিন তাকে এমন যত্ন কবে কেউ খাবার করে খাওয়ায নি।

বুড়ো বললে, কি সুন্দর পবটা হয়েছে। মেয়েমানুষ না হলে কি খেয়ে তৃপ্তি। মেয়েদেব হাতের বাপ্লাই জ্বালাদা। বেঁচে থাক বউমা, বেঁচে থাক। মুখ বদলালাম অনেকদিন পবে।

আপনার ছেলেদের বউ কেউ এখানে থাকেন না কেন?

না না। পাগল! তাদের কি এই অজ পাডাগাঁয়ে থাকতে বলতে পারি? তুমি জান না, এ সব অশিক্ষিত স্থানে তাদের আমি আসতে বলতে পারি না, তাদের মন টেকে এখানে? গবীব ছিলাম নিজে বটে কিন্তু ছেলেদের মানুষ করে দিয়েছি কষ্ট দুঃখ করে। বিষেও দিয়েছি তেমনি ঘরে। বড় বউমার বাবা মতিহারিতে সিভিল

সংস্কৃত প্রজ্ঞাপারমিতা সাহিত্যের উৎপত্তি-স্থান

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত প্রজ্ঞাপারমিতা সাহিত্যের পঠন-পাঠন ভারতবর্ষ থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তদুপরি, এই সাহিত্য ভারতবর্ষের বাইরে এত বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে বিরাজ কবছে যে, বস্তুতঃ সমস্ত দেশবিদেশের সাহিত্য-পরিপূর্তির ইতিহাসেব সঙ্গে এ ইতিহাসও এমন জড়িয়ে আছে যে, প্রজ্ঞাপারমিতা বিষয়ে কোনও প্রকাব স্থিৰ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাও কষ্টসাধ্য। তা হলেও জাপান-চীন কোবিয়া-তিরত প্রভৃতি অঞ্চলে এ সাহিত্য যেভাবে পরিপূর্তি লাভ

সার্জন। মেজ বউমার বাবা নেই, মামাবা খিদিরপুরে বড কনট্রাকটব, রায় চৌধুরী কোম্পানীর নাম শুনেছ? সেই রায় চৌধুরী কোম্পানী। ছোট বউমার বাবা এখন বাঁকুড়োর সদর এস. ডি ও। বড বউমা ম্যাট্রিক পাস। ছোট বউমা বি. এ পর্যন্ত পড়েছিলেন, পরীক্ষা দেন নি। ইংরিজী বলেন কি? আডাল থেকে শুনেছি, যেন মেম-সাবেব! হু হু বউমা, এ সব গল্পকথা এখান থেকে শোনাবে। নিজের চোখে না দেখলে—

তাঁরা কখনও এখানে আসেন নি?

বড বউমা এসেছিলেন একবার পূজোর সময়, যেবার আমার বড নাতির ভাত হয়। প্রথম ছেলের ভাত এখান থেকেই হয়েছিল কি না? সে আজ বিশ বছর আগের কথা। সে নাতি এবাব ভাত্তারি পডছে মেডিকেল কলেজে। ওর পরে দুই মেয়ে, তারা ইস্কুলে পড়ে। এইবার ম্যাট্রিক দিয়েছে একটি। ছোট বউমাকে নিয়ে আমার ছোট খোকা এসেছিল সেবার মোটরে কবে, ষণ্টা চার পাঁচ ছিল সবাই। আমি অনেকদিন দেখি নি কিনা, তাই চিঠি লিখেছিলাম। চিঠি পেয়ে বউ নিয়ে দেখা করতে এসেছিল। ছোট বউমা এসে শুধু ডাব আর চা খেয়েছিলেন—পাড়াগাঁয়েব জল খেলেই ম্যালেরিয়া হবে। তাদের অবস্থা ভাল, শিক্ষিত, সব বোঝে তো। রাত কাটাল না এখানে। কোথায় বা শুতে দিতাম,

করেছে, তার ইতিহাস সঙ্কলন কবতে গিয়ে আমরা এই সাহিত্যকে নিম্নলিখিত সময়বেখা দিযে পবিচ্ছিন্ন কবতে পাবি।

১। উক্তব ও প্রথম স্তর—খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ বৎসর থেকে খ্রীষ্টীয় একশত, এই দুই শত বৎসবে প্রাথমিক চিন্তাধারাব রূপাষণ।

২। তার পববর্তী দুই শত বৎসর—খ্রীষ্টীয় তিন শত বৎসর পর্যন্ত পরিণতির ইতিহাস।

৩। তার পরের দুই শত বৎসরের ইতিহাসে এই

না বিছানা, না মশারি। নিজে শুই একটা ছেঁড়া মশারি টাঙিয়ে। সাব্বারাত মশা কামডায়। নিজে ভাল দেখতে পাই নে চোখে যে সেলাই কবব।

আমি কাল আপনার মশারি সেলাই করে দিয়ে যাব জ্যাঠামশাই।

তা বেশ। এস বউমা। একটু গুড সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পাব? খাবার ইচ্ছে হয়, এবছর কিনতে পারি নি। বড্ড দাম। পবটা দিযে থেজুবের গুড নীগে বড ভাল।

খাওয়া শেষ কবে চাটুযো বুড়ো তামাক সাজতে বসল। ননীবালা চলে এল। তার মনে সম্পূর্ণ অন্তরকম ভাব।

স্ববেশকে সে খেতে দিলে। স্বরেশ বললে, বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে মা, এখানে বস।

ননীবালা বললে, তাঁকে তোর মনে পড়ে?

খুব। আমায় নামতা পডাতেন বোজ সকালে উঠে। বাবা যদি আজ থাকতেন!

স্ববেশের গলার স্বব ভাঙা, আবেগে আডষ্ট।

ননীবালা ভাবলে, এই ভাল, এই ভাল। খোকা আজ তোমাব নাম কবছে, তুমি নেই বলে। ওর চোখের জলে তোমার স্মৃতি সার্থক হোক। বেঁচে থাকো মানে মানে খোকার মনে। মন শুকিয়ে যায়, তুমি বেঁচে থাকলে হয়তো চাটুযো জ্যাঠামশায়ের মত তোমাকেও অবহেলা পেতে হত। ভালই হয়েছে তুমি মানে মানে চলে গিয়েছ।

সাহিত্য দুই আকারে পবিপূর্তি লাভ কবেছে (৩০০—৫০০ খ্রীষ্টাব্দ)। (ক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরের আকাবে এবং (খ) সারবস্তুর কবিতায রূপায়ণের মাধ্যমে।

৪। অতঃপব এই সাহিত্যের পরিপূর্তির ইতিহাস তজ্জের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে জড়িত। এই শেষ স্তরে খ্রীষ্টীয় ৬০০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত প্রজ্ঞাপারমিতা-সাহিত্য পবিপত্তি লাভ কবেছিল।

৩২ অধ্যায়ে সমাপ্ত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতাই প্রজ্ঞাপারমিতা-সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ বলে মনে হয়।

খুব সম্ভবতঃ আন্ধ্রদেশে কৃষ্ণানদীর নিকটে অমরাবতী, ধাতুকটক প্রভৃতি স্থানে দাক্ষিণাত্যের মহাসাঙ্ঘিকদের মধ্যে এব জন্মেতিহাস সীমাবদ্ধ। এখানে পূর্বশৈল এবং অপরাশৈল এই উভয় সম্প্রদায়েরই প্রসিদ্ধ মঠ ছিল। কথ্যবস্তুরে যে সকল মতবাদ আন্ধ্রবাসীদের বলে বিশেষ উল্লেখ আছে, সে সমস্ত মহাসাঙ্ঘিকদের বিশেষ মতবাদ। মহাসাঙ্ঘিকদের মতবাদের শ্রেষ্ঠ পরিপোষক “প্রজ্ঞাপারমিতা”র উদ্ভব এখানেই—এ মত সমীচীন বলে মনে হয়।

প্রজ্ঞাপারমিতা-সাহিত্যের প্রসারের সঙ্গে নাগার্জুনের নাম সন্নিবিদ্ধ। অমরাবতীর নিকটবর্তী নাগার্জুনকোণ্ডের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে মনে হয়। দাক্ষিণাত্যের বাজ্র সাতবাহনের নিকট তাঁর “সুহৃৎ” পত্র লিখিত।^১ হর্ষচরিতে বাণভট্ট লিখেছেন যে নাগবাজ্র সাতবাহনের নিমিত্ত নাগদের নিকট থেকে সূত্রসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন। তারানাতের মতে (পৃ ৭১) শ্রাবকেরা বিশ্বাস করতেন যে নাগার্জুনই পাবমিতাসূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। তবে পাতালসূত্র নাগদের থেকে নাগার্জুন যে এই সূত্রসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন, তা বহুস্থলে বিবৃত আছে। ববোদা

মিউজিয়ামে সংগৃহীত “পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকায়”^২ নাগার্জুনের “পাবমিতাসূত্র” সংগ্রহের একটি সুন্দর চিত্র আছে। লামা তারানাতের মতে নাগার্জুন ধাতুকটকেই বাস করতেন।^৩ জগৎগ্যাপট-সূত্রের নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরলিপিতে ভদন্ত নাগার্জুনচায়েব নাম খোদিত আছে।^৪ আন্ধ্রদেশে দ্রাবিড়দের প্রভাব কিছু হওয়া স্বাভাবিক এবং দ্রাবিড়দের মাতৃমুখী সভ্যতার প্রভাবের ফলে বৌদ্ধধর্মে “বুদ্ধ জননী”র উপাসনার ধারা প্রবর্তিত হল কিনা, অবশ্যই চিস্তনীয়।

অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞা-পাবমিতায় (২২৫ সূত্র) কথিত আছে যে জ্ঞানের পুরুতা দাক্ষিণাত্য থেকে পশ্চিমদিকে এবং সেখান থেকে উত্তরদিকে প্রসার লাভ করবে। “প্রজ্ঞাপারমিতা” যত বিভিন্নরূপে চীনদেশে বক্ষিত আছে, প্রায় সব কয়টিতেই এই উক্তি পরিদৃষ্ট হয়।^৫

মূলশ্রীমূলতন্ত্রে বিভিন্নদিকে মহাসাঙ্ঘিকসমূহের প্রচারের বিষয় উল্লেখ আছে এবং সেখানে বিশেষ করে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র দাক্ষিণাত্যেই সমুচ্চারিত হবে।^৬

দাক্ষিণাত্যে প্রজ্ঞাপারমিতার উদ্ভব হলেও এই শাস্ত্র যে কনিষ্কের সময়ে উদ্ভব-পশ্চিম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা স্পষ্টই মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে লিখিত আছে।^৭

(২) Bulletin 1, 1 (1943-44), P 35, Figure 14, Restoration of Prajna-paramita.

(৩) পৃ ৭৩, ৮১, ৩০৩।

(৪) Burgess, Notes on the Amaravati Stupa, 1882, পৃ. ৫৭।

(৫) Matriarchal system

(৬) হয়েং সাং'ব অম্ববাদ দ্রষ্টব্য।

(৭) Obermiller, Analysis of the Abhisamayalankara, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

(৮) III 5. 574

(১) Indian Antiquary, 16, 1887, 169 ft, also JPTS 1886, P 1 ff মূল সংস্কৃতে এই পত্র এখনও আবিস্কৃত হয় নি। বর্তমান লেখকের সংস্কৃতে অম্ববাদ শীর্ষক “মঞ্জু বা” সংস্কৃত পত্রে প্রকাশিত হবে।

দ্বা ন্দি ক

ভূপেন্দ্রমোহন সবকার

ভূময় ডান চোখে একটা চোঙ লাগিয়ে ঘড়ি মেঝামত কবছিলেন। হীরক এসে একটা চেযাব একটু সরিয়ে নিয়ে নীরবে বসে যেন বিজ্ঞান কবতে লাগল।

শুভময় একবার মুখ তুলে দেখে কাজে মন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলেন, কোর্টে যাবে না বুঝি ?

না। আজ যাব না।

হ্যা, আজকেব কথাই তো।—চোঙটা খুলে ফেললেন শুভময় : রোজকাব কথা কি আর বলছি ? রোজ তো যাবেই।—অল্প হাসলেন।

যাওয়া একেবারে বন্ধ কবলে ভাল হয় ?—হীরক আগ্রহভাবে প্রশ্ন করল, বলুন না শুভোদা। জোর করে একটা উপদেশ আমায় দিন—এই তুমি করো, এই তুমি করো না। বলবেন তো ?

এ কি কথা হীরক ?—শুভময় প্রশ্নগুলো তুচ্ছ কবে দিলেন : উপদেশ ? হিঃ।

হীরক সপ্রতিভ হাশ্বের সঙ্গে বলল, হিবাক্রিটাসের ওই কথাটা আমাব ওপরও চলে বোধ করি যে, লাঠি নিয়ে পেছন থেকে তাড়া না করলে গরু ভেড়া মাঠে চবতে যায় না।

শুভময়ও হাসলেন। বললেন, এটা বোধ হয় ঠিক কথা বলেছ। ভাবনা নেই, সে লাঠি আছে পেছনে। রোজই কোর্টে যেতে হবে।

হীরক ক্ষণকাল চুপ কবে থেকে ধীরে ধীরে বলল, তাই যাব।

শুভময় বললেন, এই তো কথার মত কথা। যা করতেই হবে তা নিয়ে নাটক করাব ভণ্ডামি তোমার কাছে আশা কবি না।

হীরক চমকে তাকাল। শুভময়ের দুই দৃষ্টি তারই মুখের ওপর টলমল করছে।

উচ্চস্ববে হেসে উঠল হীরক : শেষ পর্যন্ত বলে দিলেন তো ভণ্ডামি। কি স্বন্দর কবে সত্য কথা বলেন শুভোদা।—গম্ভীর হয়ে গেল হীরকের মুখ।

চোঙটা আবার চোখে দিয়ে শুভময় ঘড়ি মধ্য ডুবে গেলেন।

একজন খন্দের এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, আমাব ঘড়িটা কি হয়েছে ?

শুভময় তাকিয়ে দেখে বললেন, আপনার তো বিক্কেল আসবার কথা ছিল, তাই না ?

হ্যা। কিন্তু এদিকটায় একটু কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম খবরটা নিয়ে যাই। ইয়ে থাকলে নিয়ে যেতাম আর কি।

শুভময় বললেন, হয়ে যাবে। পাঁচটার সময় পাবেন। আচ্ছা।—বলে ভ্রলোক চলে গেলেন।

হীরক উঠে দাঁড়াল। বলল, গুরা স্থলে চলে গেছে ?

মুখ না তুলেই শুভময় জবাব দিলেন, দেখ তো, যায় নি বোধ হয়। ভেতবে গিয়ে এক কাপ চা খেতে চাও তুমি, বুঝলে ? আব আমাকেও এক কাপ দিতে বল।

বুঝেছি।—বলে হীরক ভিতরের দরজা দিয়ে চলে গেল।

* * *

শুক্রা রান্নাঘরে ছিল। মুখ বাড়িয়ে ডেকে বলল, হীরকদা, আহ্নন, এইখানেই বসুন বাবান্দায়।

তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে একটা টুল পেতে দিল শুক্রা। হীরক বসবাব পর বলল, আজ কোর্ট বন্ধ নাকি?

না, যাওয়া হল না আজ। তোমার স্কুল?

শুক্রা একটু স্নান হাসি হেসে বলল, আমাবও যাওয়া হল না বোধ হয়। অবশ্য আশা ছাড়ি নি এখনও।

হীরক বলল, কিন্তু আমার চা চাই যে এক কাপ। শুভোদাও এক কাপ চেয়েছেন। বউদি কোথায়?

শুক্রার জুয়ুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে গেল। বলল, বউদি? তার শরীরটা ভাল নেই।

কি হয়েছে?

তা তো ঠিক বলতে পারব না। দাঁড়ান, চা করে দিচ্ছি।—শুক্রা সরে গেল।

কাতর স্ববেব একটা আহ্নান এল হীরকের কাছে: হীরক ঠাকুবপো, একটু দেখা করে যেযো ভাই।

সাড়া না দিয়ে হীরক শুক্রার উদ্দেশে মুহূষ্মরে বলল, কে, বউদি বুঝি? •

শুক্রা ঘরের ভেতর থেকে শুক্র কণ্ঠে জবাব দিল, হ্যাঁ।

এতটা কাতব হয়ে পড়েছেন এব মধ্যে?—মুচকি হেসে বলল হীরক। পরক্ষণে গলাটা একটু চড়িয়ে বলল, যাই বউদি। এই একটু চা খেয়ে আসছি।

শুক্রা বলল, চাকবি আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, বুঝলেন হীরকদা।

বেন? না না, এখন ছেড়ো না।

তবে কখন ছাড়ব?—বলে একটু বেশী সময় নিল শুক্রা। শেষে বলল, দাদার বড় অস্থবিধে হয়। বউদির শরীরটা প্রায়ই খারাপ হয় তো।

হীরক কিছু বলতে চাইল। কিন্তু বলার বেগটা বোধ হয় শরীরের মুহু সঞ্চালনের সঙ্গেই বেবিযে গেল। চুপ করে রইল।

চা দিয়ে কাছে দাঁড়াল শুক্রা। হীরক বলল, রান্নাব-জন্তে একজন লোক ঠিক করে নাও।

শুক্রা বলল, অনেক বার ঠিক করা হয়েছে। থাকে না কেন?

ভাল লোক তো পাওয়া যায় না, কাজেই বউদির সঙ্গে বগড়া করে চলে যায়।

ও!—বলে চুপ কবে গেল হীরক। চায়ের কাপটা নামিয়ে বেখে উঠল। বলল, বউদির সঙ্গে একটু দেখা কবে আসি।

শুক্রা রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

* * *

মালিকা শুয়ে ছিল। শাড়ি ব্লাউজ আর মুখের সযস্ত প্রসাধনের সঙ্গে কাতব ধ্বনিব অসামঞ্জস্য অতি স্থল দৃষ্টিতেও ধরা পড়বাব মত। কিন্তু যে স্নায়ুতে ধবা পড়ে, হীরকের সে স্নায়ুগুলি সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হয়ে গেল মালিকার অপক্লপ অলস আবেশ-মাথা ক্লপের আঘাতে। আশ্চর্য স্তম্ভর। এই একটা মাত্র প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ অস্বভব কবল হীরক। অংজ প্রথম একটা নতুন আলোতে দেখল মালিকাকে। বার দুয়েক চোখ বুন্ডিয়ে আর তাকাতে পারল না। ব্যথা পেল যেন।

অলস হাস্তে কাতবকণ্ঠে মালিকা বলল, বস ঠাকুরপো।

হীরক একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে বসল।

মালিকা টেনে টেনে বলল, অত জোরে কথা কইতে পারব না, চেয়ারটা আর একটু সরিয়ে এনে বস।

হীরক কাছে বসে বলল, অস্থ করেছ?

মাথাটা তুলতেই পারছি নে।

খুব মাথা ধবেছে বুঝি? হুটো সারিডন খেয়ে ফেলুন।—হীরকের মনটা যেন ক্রমশঃ সবল হয়ে উঠছিল।

মালিকা সেই হাসি হেসে বলল, সারিডন। সারিডনে কি হবে? অস্থখটা তো আব মাথার নয়।

তবে?

মেয়েদের অস্থখের ‘তবে’ নেই কিছু।—মালিকা দৃষ্টি সবিযে নিল। পরক্ষণে আবার মোনালিসা ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলল, হার্টের দোষ হয়েছে।—বলে স্থির দৃষ্টিতে ছবোধ্য হাসিব আডাল থেকে দেখতে লাগল হীরককে।

হীরক বোকার মত তাকিয়ে মুহূষ্মরে বলল, ভাল ডাক্তাব দেখিয়ে ওষুধপত্র খান।

মালিকা মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, কোথায় বা ডাক্তার, কে বা দেখায়। যাক গে, ডাক্তার-ফাক্তাব দরকার নেই। বিকেলে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে ঠাকুরপো ?

কোথায় ?—ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবল হীরক।

যেখানে হোক।—মালিকা মাথাটা এবাব হাতের ওপর বেখে কাত হল। আগাগোড়া দেহটা একটা ঢেউয়েব মত উঠে হীবকের দৃষ্টির সঙ্গে স্থির হয়ে রইল। বলল, ভাল ছবি আছে একটা শুনেছি। তাই চল না।

যাব।—বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল হীবক। মালিকাব দৃষ্টি প্রথর হয়ে অল্পসবণ করতে লাগল। হীরক কোণের দিকে ছোট টেবিলটার ওপর এটা-ওটা নেড়ে-চেড়ে রেখে দিতে লাগল।

মালিকা একটা নিঃশ্বাস চেপে বলল, সময়মত এসে আমাদের নিয়ে যাবে তো ?

হীরক সচেতন হল। বলল, কিন্তু আপনার অস্থায়ী শরীর যে।

তুমি কিছুর জ্ঞান না ঠাকুরপো।—মালিকা আবদারের সুরে বলল, বেড়ালেই যে ভাল হয় আমাদের। সে তো কোনদিন আপত্তি কবে না সেইজন্তে।

কে, শুভোদা ?

হ্যাঁ।

একটু থেমে নিম্নকণ্ঠে মালিকা আবার বলল, তোমাব সঙ্গে গেলে আরও খুশী হয়।

আব কারও সঙ্গে গেলে ?—হঠাৎ প্রশ্ন করল হীরক।

কি আবাব বলবে। বলবাব মুখ আছে নাকি ?

এবার বাধা দিয়ে হীবক বলে উঠল, বউদি, শুভোদা মানুষ নন—দেবতা। অস্তুতঃ আমাদের মত মানুষ নন।

মানুষ নয়, এ কথা তো হাড়ে হাড়ে সত্যি।—মালিকা ফাঁস করে বলে উঠল।

আপনাব পক্ষে তাঁকে বুঝতে পাবা কঠিন।—হঠাৎ কঠিন কথা বলতে পেবে খুশী হয়ে উঠল হীরক : সে আলোচনা করে লাভ নেই।—সমস্ত দৃষ্টি সরিয়ে বাথতে লাগল হীরক : আচ্ছা, আমি আসি বউদি। আর—আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি নে, যদি কোন কাজে আটকে না যাই তবে ঠিক আসব।

মালিকা আঁহত কণ্ঠে বলে উঠল, না থাক। তোমার অস্থাবিধে হবে, দরকার কি।

হ্যাঁ, অস্থাবিধে না হলে ঠিক আসব।—দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়েব সুরে জবাব দিয়ে হীরক বেরোবার জন্য অগ্রসর হল।

কিন্তু আর একজন যুবক প্রবেশ কবছিল ঘরে। হীরক দবজার কাছে এক পাশে সব দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল।

মালিকা পুলকিত স্বরে সমাদর কবে উঠল; বর্ণেশদা। আহ্নন।

হীরক একবার আগন্তকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কবে বেরিয়ে গেল।

শুক্রা উপুড় হয়ে শুয়ে লিখছিল। হীবক চুকতেই মুখ তুলে বলল, বহ্নন।

হীবক বলল, না, বসব না আর। এই বর্ণেশদাটি কে, জান ?

শুক্রা মুখ ফিবিষে জবাব দিল, কি জানি, ঠিক বলতে পারি না। বউদির দিদিব জায়েব ভাই—না কি ওইরকম।

ও, জায়েব ভাই!—হীরক পুনরুচ্চারণ করল কথা দুটি : যাই শুক্রা, বেলা হয়ে গেছে।

শুক্রা উঠে বসে বলল, আচ্ছা। বিকেলে থাকবেন বাড়ি ? বেড়াতে যেতে পারি হয়তো। বউদিব সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি।

বেশ তো।—কিন্তু পবমুহুর্তে হীরকের মুখ শুকনো হয়ে উঠল : উ ? বিকেলে ? কখন ? আমি হয়তো—আচ্ছা, যেযো।

বলে হীবক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। শুক্রা পেছন থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে আবার লেখায় মন দিল।

দুই

ঘড়িতে চাবটে বেজে উঠতেই হীরক চঞ্চল হয়ে উঠে পাষচারি করতে আরম্ভ করল।

যাওয়া উচিত ? উচিত। নইলে বুঝতে হবে আমি দুর্বল। না, দুর্বল নই আমি।

মাঝে মাঝে বাক্য আর মাঝে মাঝে ছবি একটার পর

একটা অগোছালভাবে ভেসে উঠতে লাগল মনের মধ্যে—
চিন্তা যাব নাম।

মালিকার ছবি। হাতের নীচে মাথা দিয়ে কাত হয়ে
শুয়ে আছে—একটা শুক্ক চেউয়ের মত। যেখানে হোক
চল না। নিষে যাবে? তোমাব সঙ্গে গেলৈ কিন্তু
ও খুশী হয়।

কিন্তু গুরা আসছে না কেন এখনও।

গুরার ছবি। ঈষদুঃ—কোমল। বুদ্ধিতে উজ্জল
চক্ষু। কিন্তু কপালে বুদ্ধিব কাঠিন্য।

কপালটা একটু চওড়া বেশী?

মালিকার? আশ্চর্য সুন্দর। আর অত্যন্ত অসৎ।

কিন্তু যাওয়া উচিত। সুন্দর বলে নয়। উচিত বলে।

রণেশদা! আসুন—আসুন রণেশদা।

সহসা হেসে উঠল হীবক। তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপেব হাসি।
চেয়ারটায় বসে পডল আবার। প্যাভলভের কুকুর আমবা
সব। কোন সন্দেহ নেই তাতে। শুভোদা রাইট।
মাছুষের চরিত্র বুঝতে কুকুরের ওপব এক্সপেরিমেন্ট কবার
বুদ্ধির মধ্যে অসঙ্গতি নেই বিন্দুমাত্র।

ই্যা, শুভোদার বোলায় অচল। একমাত্র ব্যতিরেক।

দবজার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গেল হীবকের।

গুরা দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে।

ও, তুমি এসেছ। কখন এলে? এস।

গুরা ভিতরে প্রবেশ করে বলল, দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

হীবক লজ্জিত হল। বলল, কিছু বলছিলাম?
না তো।

শোনা যায় নি কিছু।—গুরা হাসল : কিন্তু মনে মনে
বলছিলেন বোঝা যাচ্ছিল।

ও।—হীবকও হাসল : বস বস।

গুরা বলল।

শুভোদা কি করছেন? দোকানেই আছেন বোধ
করি?

ই্যা।

আর বউদি? ওঃ হো, ভাল কথা। বউদি আমাকে
বলে দিয়েছিল আজ তাকে সিনেমায় নিয়ে যাবা জন্তে।

গুরা অল্প দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, আপনাব বোধ
করি দরকার হবে না আব। তার রণেশদা এসেছে তো।

ও, তাই তো। বাঁচা গেছে।—হীবক হাঁফ ছেড়ে
নিশ্চিন্ত হল। অন্ততঃ গুরার তাই মনে হবে বলে বিশ্বাস
কবল। হেসে বলল, অস্থখ তা হলে ভাল হয়ে গেছে
এ বেলা?

তাই তো দেখে এলাম।

কি দেখে এলে?

উঠে সাজসজ্জা করছেন।

বুঝলে গুরা,—মুহূর্তকাল নীবব থেকে গন্তীব মুখে
হীবক বলল, বড দুঃখ হয় শুভোদাব জন্তে। সেই জন্তেই
একবার ভেবেছিলাম আমিই নিয়ে যাব বউদিকে।
অন্ততঃ বাজে সংসর্গ থেকে তো রক্ষা করা যাবে।

গুরা দৃঢ়স্বরে বলল, দাদাব জন্তে দুঃখ কবাব কিছু
নেই। কাবণ তিনি নিজেকে একটুও দুঃখ করেন না।

হীবক ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সাঁয় দিল : তা
কবেন না। আশ্চর্য মাছুষ। প্যাভলভের কুকুর মন।

বুঝতে না পেবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল গুরা।

হীবক বলল, মাছুষের মনের তত্ত্ব বোঝবার জন্তে
কুকুর নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। ফলে জানা
গেছে যে মন নেই।

মন নেই?

না। ঘণ্টা বাজিয়ে মাংস দিলে কুকুরের জিভে জল
আসে। কয়েকদিন পরে শুধু ঘণ্টা বাজালেই জিভে
জল আসে। আবার দিনকতক মাংস বন্ধ কবে দিলে
জিভে জল আসাও বন্ধ হয়ে যায়, ঘণ্টা বুখাই বাজে।
কাজেই একদল পণ্ডিত বলছেন, আমাদের মাছুষের সব
কাজও এই নিয়মেই চলে। মন চালায় না।

একটু ম্লান হাসি ভেসে উঠল গুরার মুখের উপর।
বলল, কিসে চালায় জানি না। তবে মন না থাকলে
বৈচে যেতাম। খুব সুবিধে হত, তাই না?

জবাব না দিয়ে অশ্রুমনস্ক দৃষ্টিতে গুরার দিকে তাকিয়ে
রইল হীবক। চোখ যখন ফিবিষে নিল, তাকাল ঘড়িব
দিকে। আবার চাকল্য বোধ করল। বলল, তোমার
কি কাজ আছে কিছু? সিনেমায় যাবে?

গুরা চোখ নামিয়ে নিল : না, থাক। বলে আসি।
নি দাদার কাছে।

তোমাদের বাড়ি হয়ে শুভোদাকে না হয় বলেই যাই?

শুক্রা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। চিন্তা কবতে চাইল। কিন্তু মনটা নড়ছে না। অল্পভব কবল। টেবিলের উপর নখ দিয়ে সমস্তে দাগ কাটল কিছুক্ষণ। দাগটাই ততক্ষণ সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে রইল চোখে।

হঠাৎ একসময় বলে উঠল, ওঃ, আপনাব বউদির সঙ্গে দেখা হল না যে!

আব সময় নেই। হীবক উঠে দাঁড়াল : চল। আর একদিন এসো।

শুক্রা উঠল। বাস্তায় নেমে হীরক বলল, বউদিরা কোথায় যাচ্ছে?

কেন, সেখানে যাবেন?

না না।—হেসে ফেলল হীবক। সেইজন্তেই জিজ্ঞেস করছি।

আমি জানি না।—সংশ্রুপে বলল শুক্রা।

বড় রাস্তায় এসে শুক্রা বলল, থাক, বাড়ি যাবার দরকার নেই। চলুন।

শুভোদাকে বলে গেলে ভাল হত না?

দবকার নেই। এসেই বলব।

গতি একটু মন্দ হল হীরকের। বলল, তা হলে ঠিক করে নিতে হয় কোথায় যাব। বাংলা দেখবে, না ইংরিজি? চল, একটা বাংলা ছবিই দেখি।

ইংবিজি দেখব। অনেকদিন দেখি নি ইংরিজি ছবি।

বেশ, চল।

একটু চুপ কবে থেকে শুক্রা হেসে বলল, ওই

যে কি নাম বললেন, প্যাভলভ—আমরা ওই প্যাভলভের কুকুরের মতই চলেছি না কি?

হীবকের মুখখানা কালো হয়ে গেল। বলল, কেন, কিসের থেকে মনে হল তোমাব এ কথা?

শুক্রা বলল, না, এমনি! সিনেমা দেখবাব কোন কথাই ছিল না, হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম।

মুহূর্তকাল গম্ভীর হয়ে থেকে শেষে জোরে হেসে উঠল হীরক। বলল, তা হতে পারে। দুজনই আমবা কোন ঘটাব আওয়াজ শুনেছি কে জানে!

শুক্রা হাসিতে যোগ দিল না, জবাবও দিল না।

* * *

সিনেমা-হল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ পাশে

নাবীকণ্ঠের ঠাকুরপো ডাক শুনে হীরক চমকে দাঁড়াল। মালিকা, পিছনে বর্ণেশ। ছবি নির্বাচনে কোন মানসিক সূত্রে এমন যোগাযোগ হতে পারে প্রশংসা চকিতে মনের মধ্যে খেলে গেল। মালিকার ইংরেজী-জ্ঞান ইংরেজী ছবি দেখাব পক্ষে যথেষ্ট নয়, হীরক জানে।

ওঃ বউদি!—হীবক উচ্ছ্বসিত হবাব চেষ্টা কবল : আপনারাও এখানেই এসেছিলেন?

মালিকা আড়চোখে শুক্রাকে দেখে বলল, তখন বললে না কেন?

কি?

খুলে বললেই হত যে শুক্রাকে নিয়ে আসবে, কাজেই—শেষ করল না কথাটা। হীরক প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, সে বকম কথা থাকলে নিশ্চয় বলতাম আপনাকে। বরং আপনাকেই নিয়ে আসবাব জন্তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু শুনলাম বর্ণেশবাবু সঙ্গে আপনি রওনা হচ্ছেন।

মালিকা নরম স্বরে বলল, তোমার জন্তে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমবা। তাই না বর্ণেশদা? শুক্রার কাছে শুনলে বুঝি?

শুক্রাই জবাব দিল, হ্যাঁ, আমিই খবর দিয়েছিলাম।

বর্ণেশ মাঝখানে পড়ে বলল, আপনারা গেলে সবাই মিলে একসঙ্গে আসা যেত। বেশ লাগিত।

মালিকা হীরককে বলল, ঠাকুরপো, বর্ণেশদার সঙ্গে তোমার আলাপ হয় নি তো?

হীবক আলাপ করে জবাব দিল, হবে ক্রমে। বাস্ত হবার কি আছে। দেখা তো মাঝে মাঝে হবেই।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।—সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল বর্ণেশ। বলেই একটা ট্যান্ডি ডাকল।

হীরক তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা, আপনারা যান আমার একটু কাজ আছে। সেবে যাব।

শুক্রার দিকে চাইল সকলে। মুহূর্তেব দ্বিধাব পরে শুক্রা বর্ণেশের দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন। বাড়ি যাচ্ছেন তো আপনারা?

আপনাবা যেখানে যাবেন।—হেসে বলল বর্ণেশ।

আচ্ছা, আমি চললাম।—বলে হীরক দ্রুতপদে সবে গেল।

নাও, ওঠ গুন্না।—মালিকাই প্রথম কথা বলল গুন্না বসে।

গুন্না উঠে বসল। তারপরে মালিকা উঠল বণেশকে কাছেই মালিকার পাশে বসতে হল।

গুন্নার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব রক্ষা কবেই বসেছিল মালিকা। তবুও মনে হচ্ছিল গুন্না তার ঠিক ঘাড়ের উপরটায় বসে আছে।

বণেশ জিজ্ঞাসা কবল মালিকাকে, কি, সোজা বাড়ি যাবেন তো?

হ্যাঁ।—মালিকা যেন ছকুম দিল।

* * *

ট্যাক্সি থেকেই মালিকা লক্ষ্য কবল দোকান বন্ধ। মালিকাব মুখে দিকে চেয়ে বণেশ সেখান থেকেই বিদায় নিতে চাইল।

বসবেন না?—মালিকা উৎকর্ষা স্ববে বলল।

এখন থাক—

না, চলুন।—মালিকা আবার কি ভেবে বলল, চা খেয়ে যাবেন।

গুন্নার সঙ্গটা এতক্ষণে মালিকাব সন্তিকব মনে হল। মনে মনে হাসল একটু।

শুভময় বইয়ের ওপর থেকে মুখ তুলে একবার দেখেই আবার ঝুঁকে পড়লেন। মালিকা বণেশকে বসতে বলে পাশে ঘবে কাপড় ছাড়তে গেল। ফিবে এসেই দেখল শুভময় বইয়ের ওপরই তেমনি নিবিষ্ট হয়ে আছে। আর বণেশ অপমানিতের মত কালো মুখে নিঃশব্দে বসে আছে।

মালিকা উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলল, গুন্না, তোমাব কি কাপড় ছাড়া হল?—বলে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কবতে শুভময়ের দিকে আঁচচোখে তাকাল। চোখের গতিটা শুভময়ের বন্ধ হয়েছে মনে হল। একটু যেন উৎকর্ষ।

কিন্তু গুন্না কোন জবাব দিল না।

বণেশদা, আপনি বসুন। আমি চা করে নিয়ে আসছি।—মালিকা বলল, সিনেমা দেখে এসে গুন্না বপিশ্রম হয়েছে তো। বিশ্রাম না কবলে গুন্না আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না। তুমি থাকে তো চা?—শুভময়কে জিজ্ঞাসা কবল।

শুভময় মুখ তুলে তাকালেন। ঠোঁটের কোণে একটু

হাসি তুলে বললেন, দিলে থাক। এখন বেশ ভাল হয়ে গেছে দেখছি। সিনেমা দেখলেই শরীর তোমার বেশ ব্যবববে হয়ে ওঠে।

ওঠেই তো!—হাসিমুখ করে জবাব দিল মালিকা। তাতে কি দোষের কথা হল?

কিছু না।—শুভময় তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দিলেন বইয়ের মধ্যে।

চলুন বণেশদা, চা কবতে করতে গল্প করব আপনার সঙ্গে।—বণেশকে নিয়ে বেবিযে এল মালিকা।

বাইবে এসে বণেশ যেন দম ছাড়তে পেরে বাঁচল। বলল, অত্যন্ত অহঙ্কারী ভদ্রলোক, ষাই বলুন। কথাই বলা সম্ভব মনে কবলেন না।

মালিকা অন্তমনস্কভাবে জবাব দিল, অহঙ্কার নয়, অহঙ্কার নয়—

বণেশ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, তা ছাড়া আব কি।

মালিকা হেসে বলল, অহঙ্কার করবে কি নিয়ে বলুন তো?

বণেশ চূপ করে গেল। মালিকাব কৈফিয়ত আবও গোলমালে মনে হল।

মালিকা বলল, তা ছাড়া ব্যবসাতে ভাল টাকা রোজগার কবেন আপনি, তা তো জানেন উনি।

বণেশ সম্ভটিব হাস্তে বলল, ও, তাও জানেন নাকি!

ভিন্ন

ছুটির দিন। হীবক খবরের কাগজ পড়ছিল।

প্রৌঢ়বয়স্ক এক ভদ্রলোক প্রবেশ করে নমস্কার জানাল। দেখেই ভ্রুকুণ্ডিত হল হীবকের। বলল, বসুন। আপনার কাছে এলাম। আমার নাম নন্দলাল।

চিনি আপনাকে।—একটু হেসে বলল হীবক। সবষেব তেলের ব্যবসা কবেন তো?

হ্যাঁ।

বলুন, কি ব্যাপার।

ওই তেলের ব্যাপারই।—নন্দলাল বলতে আরম্ভ কবল, কি অত্যাঁচ দেখুন তো। আমার পাঁচশো টিন তেল আটক করে এখন বলছে কিনা নষ্ট করে দেব সব। তেল যদি আমার খারাপই হয়, বেচতে না দিতে পাব।

আমার তেল আমায় ফেরত তো দেবে? না, তাই না।
মগের মূল্য নাকি?

পচা তেলের গন্ধ গেল যেন হীরকের নাকে।
মাথাটি পিছনে সরিয়ে হেলান দিয়ে বসল। বলল, তাতে
আব সন্দেহ কি? বলে যান—

আ্যা? হ্যাঁ, দেখুন: হেসে বলতে লাগল নন্দলাল,
তেল তো আমাব নিজের তৈরি নয়! আমি যাব কাছ
থেকে নিয়েছি তা হলে তাকেই ধর। এক-আধ টাকার
ব্যাপার তো নয়।

আপনার নিজেরও তো একটা তেলের কল আছে?

নামে মাত্র একটা সামান্য।—বিনয়েব সঙ্গে বলল
নন্দলাল, তাও বন্ধ হয়ে আছে।

তেলেব দোষটা কি হয়েছে বলছে?

নন্দলাল তেলের মত মশণ কণ্ঠে জবাব দিল, কিছু না।
কিছুই নয় মশায়, স্বেচ্ছা হয়রানি করার বুদ্ধি। তেলে
নাকি বিষাক্ত ভেজাল আছে। ওই তেলই বেচলাম
কত এষাবৎ। কই, আমাব তেল খেয়ে মবল কজন
বার করুক?

সেটা এখনও পারে নি বুঝি?

নাঃ।

তবে কেন এ বকম কবছে?—বলে হেসে ফেলল
হীরক। হাসির একটা অর্থ নির্দেশ করতে আবাব একটু
হেসে বলল, মোটা কিছু মাংসে চায় আব কি। তাই না?

নন্দলাল তৎক্ষণাৎ নিম্নকণ্ঠে বলল, সে প্রস্তাব তো
দিয়েছিলাম আমি। না, তখন একেবারে ধর্মভীক যুধিষ্ঠির
সেজে বসল।

ও, সে প্রস্তাবও দিয়েছিলেন তা হলে।

সে সব বাস্তব না দেখেই কি আর আপনাব কাছ
এসেছি। না, সেসব বাকি নেই কিছু। বলে যে এখন
আব হয় না। অনেক দূর পর্যন্ত জানাজানি হয়ে গেছে।

ও।

হ্যাঁ: নন্দলাল শুষ্ক কণ্ঠে বলল, আমি দিনকতক
বাইরে পড়ে থেকেই এতটা হয়ে গেল। বুঝলেন না?

তাই বলুন। আপনি নিজে তখন ছিলেন না এখানে।
সে যাক গে।—হঠাৎ হীরকের আওয়াজে রুদ্ধতার আঁচ
এসে গেল: এখন কি করতে চান বলুন দেখি?

পান্টা কেস কবতে চাই আমি। আমার তেলের
দাম দিক। তারপর যা কববার করুক। নইলে ফেরত
দিক। আব একটা দবখাস্ত করতে হবে আবাব পরীক্ষা
কববার জন্তে। প্রত্যেক টিন আলাদা পরীক্ষা করতে
হবে।

ভাবিকি ধরনেন একটা হাসি হেসে এদিক ওদিক
তাকিয়ে নন্দলাল বলল, বুঝলেন না? আবাব পরীক্ষা
হলে—একটা আশা তো করি। নিজে আছি যখন
এখন।

বেশ।—হঠাৎ সমাপ্তির সুরে হীরক বলল, কাগজপত্র
বেখে যান। কাল আসবেন সকালে।

নন্দলাল চলে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আত্ম-
বিজ্ঞপের একটা বাকি হাসি তুলল হীরক। হাসিটা
তাকে নিজের থেকে আলাদা করে উপবে তুলে দিল যেন।
অমর্যাদাব উদ্দেশ্যে, এই অভিনয়ে খুশী হল একাংশে।
ধিকৃত অপবাংশ হীরকের আত্মবঞ্চনাকে আত্ম-বিকাবের
মহিমা দিল। ধিক। উচ্চারণ করল মনে মনে।

বেবিষে এল ঘব থেকে। হীরকের বিধবা বউদি
তরকারি কুটছিল। একটা পিঁড়ি টেনে পাঁশে গিয়ে
বসল হীরক। বলল, বউদি, একটা শাঁসাল মক্কেল পাওয়া
গেছে আজ।

স্বরীতি খুশী হয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, তাই নাকি।
বেশ অনেক টাকা পাবে তো?

তা পাব।

কেমন, আমি বলেছি না। তোমাব পসার হতে
একটুও দেবি লাগবে না।

হীরক হেসে বলল, এটাকে খুব সম্ভবমামা পাঠিয়েছেন।
আমার পসারের চোটে বোধ কবি আসে নি।

এখন আসবে।—স্বরীতি দৃঢ় বিশ্বাসে আশ্বাস দিল।

এই বকমই সব আসবে বোধ করি।—হীরক হঠাৎ
রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল।

কি বকম?—স্বরীতি খতমত খেয়ে প্রশ্ন কবল।

না, বলছি যে এমনই শাঁসাল মক্কেল হলে তবে তো?
বুঝলেন না?—হেসে উঠে পড়ল হীরক। আবাব বলল,
কিন্তু আমাকেও দাম দিতে হচ্ছে বউদি। খুব চড়া হাবে
দাম দিতে হচ্ছে।

বলে যেতে শুরু করল। স্ববীতি বলল, কোথায় যাচ্ছ?

হীবক দাঁড়িয়ে বলল, একটু ঘুবে আসি।

শুভময়ের বাড়ি?

হীবক হাসতে চেষ্টা করল। বলল, যেতেও পারি। ঠিক নেই।

স্ববীতি ভয়ে ভয়ে বলল, দাম দিতে হচ্ছে—কিসেব কথা বললে?

হীবক হেসে বলল, ও কিছু নয়। ভাল লাগে না শুকালতি কবতে, তাই আর কি।

কি যে বল ঠাকুবপো।—স্ববীতি হাসিমুখ কবে বলল, নাঃ, তোমার ভাল লাগাবার ব্যবস্থা আর দেরি কবা যায় না। আচ্ছা ঠাকুরপো, এখন তো আব তোমার কোন অজুহাতই বইল না। বিয়েটা এবার কবে ফেল।

হ্যাঁ, আব দেবি নয়। এবার কবে ফেলব।

ঠিকঠাক কবেছ নাকি কিছু? স্ববীতি হেসে প্রশ্ন কবল।

না তো। সে তো তোমরা করবে।

বাঃ রে, আমার দোষ দিতে পারবে না। আমি তো বরাবর তোমাকে পীড়াপিড়ি করছি। আমি মেয়েছেলে আব কি কবব।—হঠাৎ স্ববীতির আওয়াজে কান্নার ছোঁয়া লাগল যেন।

অবাক হয়ে তাকাল হীবক : কি হল বউদি। দোষ কে দিল তোমাকে বল তো?

স্ববীতি মুখখানা আড়াল করে ফেলেছিল। হঠাৎ আবাব লজ্জাবোধ করে তাকাতে পারল না। কিন্তু জবাব দিল, না, তাই বলছি যে আমাকে বলতে পাববে না। তোমার জেদ—কিছুতেই কথা শুনবে না—

মুহূর্তকাল চুপ কবে থেকে হাসিমুখ কবে তাকিয়ে স্ববীতি আবাব বলল, লক্ষ্মী ঠাকুবপো, নিজে দেখে শুনে পছন্দ কবে নাও তুমি।

হীবক কোমল স্ববে বলল, আচ্ছা আচ্ছা, তাই নেব বউদি।—বলেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

শুভময়ের দোকান তখনও বন্ধ। হীবক ঘড়ি দেখল, দশটা বাজতে তখনও আধঘণ্টা বাকি। গলির গেট দিয়ে

ভিতরে না ঢুকলে শুভময়ের সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু ভিতরে মালিকা আছে, শুক্লা আছে। মনটা যেন পিছিয়ে এল।

শুভময় বইয়ের ওপর থেকে মুখ তুলে চাইলেন। ধীরে ধীরে মুখেব ওপবকার শিরাগুলো নবম হতে লাগল। প্রসন্নকণ্ঠে বললেন, এস হীবক, বস।

হীবক একখানা পত্রিকা হাতে নিয়ে বসল।

খবর কি বল।—শুভময় বেশ জাঁক কবে আলাপ শুরু করলেন : কাজকর্ম বেশ পাচ্ছ শুনলাম?

হ্যাঁ, পাচ্ছি।—শুভময় ঝাঁজ মিশিয়ে জবাব দিয়েই ভীত হল হীবক। এই স্ববীতি শুভময়ের বিজ্ঞপাত্মক বৃত্তিটাকেই শুধু জাগিয়ে তোলে জানে সে। নীরবে উন্মুখ হয়ে রইল।

একটু মুচকি হাসলেন শুভময় : বিবেকে গ্লানি দিচ্ছে বড়, না?

হীবক সাবধান হয়ে জবাব দিতে সময় নিল। শুভময় আবাব বললেন, অথচ না কবেও পারছ না।—বলে আবাব হাসলেন।

হীবক বলল, বিবেক বলে যেটাকে আপনি বিজ্ঞপ করছেন—

না না, বিজ্ঞপ করব কেন?—শুভময় বাধা দিয়ে বললেন, নাম যাই হোক না কেন, একটা অংশ ওই-জাতীয় কাজ কবছে তো বটেই।

হ্যাঁ, তাই বলছিলাম। আমার বিশ্বাস, অত্যাঁজ কাজ কবা আমি পছন্দ কবি না। কিন্তু, কবছি। কবতে ব্যথা পাই মনে এটা মিথ্যে নয়।—হীবকের স্বর নিঃসন্দেহে ব্যথাতুর হয়ে উঠল।

শুভময় স্থিবিদৃষ্টিতে কিছুকাল তাকিয়ে থেকে নীববে নতমুখে অন্তমনস্ক হয়ে গেলেন।

হীবক যেন গা-ঝাড়া দিয়ে বসল। বলল, আমার কথা যাক গে। আপনার কথা বলুন।

শুভময় মুখ তুলে বললেন, আমার কথা কি বলব, বল?

এমনি চাপাই থাকবেন চিরকাল? কিছুই প্রকাশ কববেন না?

হাসলেন শুভময়। নীৎসেব কথা জান? জ্ঞান নাকি

হৃদয় তার ছাপিয়ে উঠে উপচে পড়বার জন্তে অস্থির কবে
তুলেছিল তাকে। কিন্তু আমার একটু মুশকিল হয়েছে।
হৃদয়টা আমার খুব ছোট নয় বলেই না কি ঠিকমত ভর্তিই
হচ্ছে না। উপচিয়ে বাইবে পড়বে কখন?

এ আপনার অহঙ্কার— না না, বিনয়।

হো হো কবে হেসে উঠলেন শুভময়।—মানে, ও
ছোটের কোনটাই নয়। আসল কথা কি জান? আমার
এখনও জানতে হচ্ছে কবে, বলতে হচ্ছে কবে না।
জানবার বাকি আছে বলেই বোধ কবি। এখন হচ্ছে করবে
বলতে, তখন আর অল্পবোধ কবতে হবে কেন হীবক?

ঘড়ি দেখে বললেন, সময় হয়ে গেছে—দোকানে যেতে
হবে। তুমি তা হলে বসবে?

বেশীক্ষণ বসব না। এই প্রবন্ধটা একটু দেখে যাব।

শুভময় চলে গেলেন।

ভৃত্য বংশী এসে বলল, মা ডাকছেন আপনাকে।

হীরক চমকে উঠল : কে? ও, বউদি?

হ্যাঁ।

পত্রিকাখানা বন্ধ কবে উঠল হীবক। মালিকা
বান্ধাঘরে ছিল। কলবব কবে উঠল : কি ঠাকুরপো,
আডাল দিয়ে গেলে যে বড়? না হয় তোমার বন্ধুদাদার
মত পণ্ডিত নই আমরা। তাই বলে কি আমাদের সঙ্গে
কথা বলাও চলে না?

হীরক অপরাধীর মত বলল, না না, আডাল দিয়ে
যাব কেন। শুভোদার সঙ্গে একটু কথা ছিল। তা
ছাড়া ভাবলাম—মুহূর্তের বিবাম দিয়ে বলল, আপনিই
এখন কথা বলবেন কি না—

বিশ্বযেব সঙ্গে লক্ষ্য কবল হীবক যে কথাগুলো ঠিক
মালিকার মাপমত হয়েছে।

মালিকা খুশী হয়ে বলল, কেন? তা ভাবলে কেন
ঠাকুরপো?

জবাব না দিয়ে হীবক পাঁচটা জিজ্ঞাসা করল, বর্ণেশবাবু
আজ আসেন নি?

ও-মা, ঠাকুরপোকে তো বসতেই দিই নি।—বলে
ঘুরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল মালিকা। একটা আসন
এনে বসতে দিয়ে বলল, বর্ণেশদা? উনি তো আসবেন না
আজ।

কেন?

কোথায় বাইবে গেছেন কাজে।

ও।

কেন, কাজ ছিল তাব কাছে?

নাঃ। কি কাজ থাকবে। এমনি জিজ্ঞেস করছি।

বোজই আসেন শুনেছি, আজকে দেখছি নে। অস্থখ-
বিস্থখ হল নাকি—এই আর কি।

ভাবি চিন্তায় পড়ে গেছ বুঝি!—হেসে ফেলল
মালিকা। পরক্ষণে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, শুক্রাব কাছে
শুনেছ বুঝি? ঠিকই শুনেছ। অবসর পেলেই আসেন
বর্ণেশদা। গল্পগুজব কবে যান। বর্ণেশদা আসেন
বলে সময়টা বেশ কেটে যায়। তুমি তো সময় নষ্ট হবে
মনে কবে দেখাই কব না।

মিছে কথা।—হঠাৎ বলে ফেলে থেমে গেল হীবক।

কি মিছে কথা?—মালিকা মুহূর্তে জিজ্ঞাসা কবল।

হেসে হালকা স্বরে হীবক বলল, আপনার সঙ্গে কথা
বললে সময় নষ্ট হয় না।

তবে কি হয়?—সতর্ক নবম স্ববে বলল মালিকা।
ওপবেব হাইগুলো যেন আশ্বে আশ্বে ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিতে
চাইল। কি আছে নীচে দেখবার চাপা কোঁতুহল ভেসে
উঠল চোখেমুখে।

কান দুটো একটু গরম হয়েছে বোধ করল হীরক।
হঠাৎ দৃষ্টি নত করাও সঙ্গত হয় নি ভেবে সোজা
তাকাল মালিকার দিকে। কিছু বলা দরকার। খুব
তাড়াতাড়ি কিছু বলা দরকার। সহজ, পবিত্র।

বা রে, তাই হয় নাকি। বউদিব মিষ্টি কথায় সময়
নষ্ট হয় কোন্ ঠাকুরপো?—একনিঃশ্বাসে বলে খুশী হল।

মালিকাও হাসল—শুধু টৌটেব মধ্যো। মুখের উপর
বিফল প্রত্যাশার অতৃপ্তির চিহ্ন ফুটে রইল। আগুন দেখা
গেল না। ক্ষণকাল নীববে তাকিয়ে থেকে বলল, দাঁড়াও,
চাষের জল চাপিয়ে দিই।

না, থাক। এত বেলায় আর খাব না চা।

কেন, বউদির চা বুঝি মিষ্টি হবে না?—মালিকা
একটা খোঁচা দেওয়ার আনন্দ লাভ কবল যেন।

হীরক বলল, তা নয়। ডবল মিষ্টি একসঙ্গে ফুরিয়ে
নিতে চাই নে।

মালিকা এবার খুশীতে হেসে উঠল। হঠাৎ চাপা
স্বরে বলল, ফুবোবে না, ফুরোবে না।

হীবক নতদৃষ্টিতে রক্তোচ্ছ্বাস দমন কবতে লাগল।
মালিকা ঘরে ঢুকে গেল। ফাঁক পেয়ে হীবকেব মনের
সমালোচক অংশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। রক্তোচ্ছ্বাসের
কি আছে এতে? সোজাসুজি নির্দোষ জবাব একটা।

মালিকার চাপা স্বরটাও ঘুরে ঘুরে আসছিল মনে।
তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে সেটাকে ছিন্নভিন্ন কবে দিল হীবক।
সহজ দৃষ্টিতে সোজা হয়ে বলল এবাব, আসুক এখন।

একটু পবে মালিকা বেবিযে এল। হাসিভরা চোখেব
ওপব পড়ে তৎক্ষণাৎ নীচে পড়ে গেল হীবকেব চোখ।
নিমেষেব জ্ঞা। পবক্ষণে নিজেকে বলতে শুনল, কই
বউদি, চা হল আপনার?

বাঃ, চোখের পলকেই বুঝি চা হয়ে যায়?—হেসে
জবাব দিল মালিকা।

ও, এতক্ষণে চোখেব একটা পলক পড়ল বুঝি?—সহজ
রসিকতা কবতে গেল হীবক।

কার, তোমার?

জবাব দিতে একটু বিলম্ব হল হীবকের। বলল,
আমারই হওয়া উচিত। হলে—কিন্তু আমার মতে অনেক-
বার পড়েছে পলক।

তা হলে আমারই বোধ কবি একবার পড়েছে!—
মালিকা হাসিমুখে অনাবশ্যক কথাটাকে টেনে নিয়ে
চলল।

কেন?

কেন, কি করে বলব। কারণ কিছু আছে নিশ্চয়ই।

শুক্রকে দেখে থেমে গেল মালিকা। হীবকও লজ্জিত
মুখে দম বন্ধ কবে চুপ কবে তাকিয়ে বইল।

শুক্রা দুব থেকেই জিজ্ঞাসা কবল, হীবকদা কখন
এলেন?

এই তো কিছুক্ষণ। ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে বোধ
হয় দেখা হল না আজ।

ওঃ।—বলে একটু হেসে ঘরে চলে গেল শুক্রা।

দেখি, জল বোধ করি ফুটেছে।—বলে মালিকাও
ভিতরে গেল। একা মুখখানা কালো করে বসে বইল
হীবক।

কিছুক্ষণ পরে মালিকা চা এনে দিল হীবককে।

শুক্রাব ঘরের দিকে তাকিয়ে ডেকে বলল, শুক্রা, চা খাবে
নাকি?

শুক্রা জবাব দিল, না।

মালিকা আর এক কাপ এনে নিজে খেতে আরম্ভ
করল। হেসে বলল, না খাবে তো ভালই হল। জল
চাপিয়েছিলাম মোটে দু কাপেব।

নীববে চা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল হীবক।

চললে ঠাকুরপো?

হ্যাঁ, যাই।

কেন জানি না খুশী হল মালিকা। শুক্রা আব বেরোয়
নি—চকিতে খেলে গেল মনে। বলল, ছুটির দিন,
বাড়ি গিয়ে কি করবে? এখানেই থেয়ে যাও—আঁা?
হ্যাঁ, তাই কর ঠাকুরপো।

না না, আব একদিন খাব। বাড়িতে বউদি ভাববেন।

মালিকা উঠে পড়ল : ভাববে না। এত বড়
জোযান দেওরটা—হারিয়ে যাবে নাকি?—হেসে উঠল
মালিকা। তুমি বসে গল্প কর। আমি রান্নাটা শেষ
করে ফেলি। শুক্রাকে ডেকে দিছি, তাব সঙ্গে গল্প কর।
শুক্রা—

শুভ্রন, আমাব যে— তা ছাড়া—

বস তুমি। তা ছাড়া আর কী আছে পরে
শুনব।—বলে মালিকা তার ঘবেব দিকে চলে গেল।
শুক্রা বেরুছিল, তাকে বলল, ঠাকুরপো এখানে থেয়ে
যাবে শুক্রা।

তাই নাকি।—শুক্রা অল্পছলিত ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞেস
করল।

মালিকা জবাব না দিয়ে অস্তপদে ঢুকে গেল ঘরে।
শুক্রা বীরপদে হীবকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

হীবক হেসে বলল, বউদি নিজেই নেমস্তন্ন করেছেন,
আমার হয়ে নিজেই গ্রহণ করেছেন। এখন আমার হয়ে
খাওয়ার কাজটাও সেরে দেবেন কি না সেইটে জিজ্ঞেস
কবতে হবে।

তাই জিজ্ঞেস করুন না বউদিকে।—শুক্রা হাসিমুখ
করে বলল।

করব।—বলে উৎসাহের অভাবে চুপ করে গেল

হীবক। মালিকা বংশীকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে এসে হীবকের দিকে এক বলক হাসি নিষ্ক্ষেপ করে ভেতবে গেল।

শুক্রা বলল, তা হলে চান করে আসুন তাড়াতাড়ি।

হ্যাঁ, তাই যাই। বাড়ি থেকে চান করে আসি।—
হীরক বলল।

মালিকা শুনে দরজার কাছে এসে বলল, তা হবে না।
অত সামাজিক কুটুম্বিতের নেমস্তম্ভ খেতে দেব না আমি।
বাড়ির ছেলের মত এখানেই চান কবতে হবে। জামাটা
খুলে ফেল না ঠাকুরপো।

হ্যাঁ, তাই খুলুন।—বলে শুক্রা নিজের ঘরের দিকে
চলে গেল।

কথাকটা তন্ন তন্ন কবে খুঁজল হীরক। প্রচ্ছন্ন
কিছু আছে কিনা। অবশেষে জামাটা খুলে ফেলল।
রাখবার জায়গার অভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

মালিকা ভেতর থেকে দেখল। চুপি করে দেখতে
লাগল। জামাব নীচেকাব কাঁচা সবল শরীরের তেজ
এসে ঘেন গায়ে লাগল তার। দেহটা মালিকার ঘেন
ভারি হয়ে গেল। ধীবে ধীবে বাইরে এসে একটু হেসে
বলল, আমার কাছে দাঁও। ঘরে বেধে আসি।

ঘরে। আমি রেখে আসছি।—হীবক উঠতে গেল।

দাঁও না আমার কাছে।

ধমক খেয়ে জামাটা মালিকাব হাতে দিয়ে দিল
হীরক। অদ্ভুত একটা আনন্দের শিহরণে বোমাস্কিত
হয়ে উঠল। কেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন উঠে পড়ায় বোমাস্কিত
ধীরে ধীরে কেটে গেল। ধবস্তুরি—এই প্রশ্ন। ভেবে
হাসল মনে মনে। আমার ভগবান। এই প্রশ্নই বোধ
করি ভগবান!

অনার্যত শরীরে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল হীরক। দাঁড়িয়ে
পাষাচারি করতে লাগল। মালিকা এসে আব একটা
তির্ষক হাসি হেসে রান্নাঘরে ঢুকল। ডেকে বলল,
ঠাকুরপো, রান্না দেখবে এসো।

হীবক দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মালিকা ফিরে
তাকাল। তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল মুখে। কোন কথা
না বলে কড়ায় মন দিল আবার।

হীরক বলল, বেশী হাঙ্গামা করলে কিন্তু আমি খাব না।

ও মা, কি আবার হাঙ্গামা করব।

প্রকাশ্য কথাব নীচে নীচে হীরকের মন নিষ্ক্রিয়
দর্শকের মত অস্পষ্ট একটা কোতুক বোধ করছিল। সেদিন
শাযিতা মালিকাকে সে দেখেছিল। আজ মালিকা তাকে
দেখছে। তার পুরুষ-উপস্থিতি মালিকাকে ঘিরে রেখেছে।
সুখী কবেছে। স্পষ্ট অস্বস্তি বঁকরল হীরক।

খাওয়ার কিছু কষ্ট হবে তোমার।—মালিকা বলল।

তা হোক। আজকে একটু কষ্ট পেলেই আনন্দ পাব।
তা হলে খুব আনন্দ পাবে ঠাকুরপো!—হেসে উঠল
মালিকা।

হ্যাঁ, তাই চাই।—বলে হেসে লঘুপদে সরে গেল
হীরক।

শুক্রা! মনে হতেই স্বাচ্ছন্দ্যটা কেটে গেল অনেক-
খানি। শুক্রাব ঘরের সামনে গিয়ে বলল, শুক্রা, কি কবছ?
আসুন।—শুক্রা উঠে এসে বসল। ঘরে ঢুকে শুক্রার
পরিত্যক্ত বইখানা তুলে দেখতে লাগল হীবক।

বসুন।—শুক্রা বলল, বসবেন না?

না, বসব না।—হীরক আনমনে বলে উঠল।

হেসে হালকা করে শুক্রা বলল, আজ সম্পূর্ণ বউদিব
অতিথি বলে বুঝি এখানে বসবেনও না?

হীরকও তেমনি ভাবে জবাব দিল, তা তো বটেই।
তুমি তো পালিয়েই রইলে সেই ভেবে!

শুক্রা নতমুখে একটা নিঃশ্বাস চেপে নিরুত্তর বইল।
বিছানাব ওপবেই বসল হীরক।

শুক্রা বলল, বইখানা পড়ছিলাম। ভাবলাম আপনি
আসছেন—

মালিকার ডাক শোনা গেল, ঠাকুরপো—

শুক্রা ভুরু কুঁচকে সেই বোঁকে ঘেন হু পা সবে গেল।

হীরক সাড়া দিয়ে বলল, হয়ে গেল আপনার?

হ্যাঁ, হল।—কিছুটা নিম্নস্ববে জবাব দিল মালিকা।

ডাকের অর্থটাকে অনিশ্চিত করে রেখে দিল। বারান্দায়
এসেছিল, আবার ভিতরে চলে গেল।

শুক্রা বলল, যান, স্নান করুন গে।

শুভোদা আসুন।

দাদা তো স্নান সেরে যান দোকানে। ডাকলেই
খেতে আসবেন।

ও, আচ্ছা।—বলে চুপ করে বসে রইল হীরক।

কিন্তু অল্পক্ষণেই হাঁপিয়ে উঠল। অস্বস্তিকর রুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে অকারণে কে যেন তাকে গীড়ন কবছে অবশেষে এই ধবনের অশুভূতি হল তাব। নৈর্ব্যক্তিক ক্রোধের উদয় হল হঠাৎ। বইখানা রেখে দিয়ে উঠল। ক্রোধটা অস্পষ্ট অসন্তোষে পরিণত হল। কথার ধারাটা ঠিকমত মোড় ফিবেছে না। ঠিকমত আসছে না। বলল মনে মনে। দোষ কার? আমার নয় নিশ্চয়।

কই, তোমাদের বংশী কোথায়?—জিজ্ঞেস করল হীরক।

দোখ বংশী এল কি না।—শুক্লা আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠাকুবোপো—

মালিকাব ডাক এল আবার। ডাকের মধ্যে একটা যেন প্রশ্ন ছিল—কেন? ওখানে কেন?

এবার ভাল লাগল হীরকের। গোপনে একটু হেসে বেরিয়ে গেল। বলল, হল আপনার?

এই হল। একটু বস। খিদে পেয়েছে বুঝি?—মালিকা খুশী হয়ে বলল।

হীরক তীব্র প্রতিবাদ কবে উঠল: না না, একটুও খিদে পায় নি আমি। দেরি হলেই বরং ভাল হত।

বল কি! একটুও খিদে পায় নি? এ বয়সে রাফুসে খিদে হবে ছেলেদের, তবে না মেয়েদের খাইয়ে স্ব্থ!

আমাকে খাইয়ে সে স্ব্থ কারও হবে না।—হীরক মালিকার চোখেব ঝিকিমিকি লক্ষ্য না কবে বলল।

মালিকা একটু রুক্ষকণ্ঠে বলল, তাই নাকি! তোমারও তা হলে এ বাড়ির বাতাস লেগেছে! এবই মধ্যে বুড়ো হয়ে গেলে নাকি!

হঠাৎ লক্ষ্য করল হীরক মালিকার চোখ। নতমুখে একসঙ্গে মদের মত তীব্র মধুর আব কটু রসের বজ্রকে বয়ে যেতে দিল নীরবে।

মালিকা বলল, সত্যি। ছেলেদের গোত্রাসে খেতে দেখতে আমার বেশ লাগে। ছোট ছেলেমেয়ে খিদের চোটে নাকেমুখে খায় যখন বেশ দেখতে হয়, না?

নিজেকে মনে মনে গালি দিতে লাগল হীরক। ছিঃ

ছিঃ। একবারেই নির্দোষ একটা কথা। নিজের কদর্য মনে কদর্য অর্থ কবে তারপব আনন্দ আর ভগ্নামি হচ্ছে। — মুখ তুলে দেখল মালিকা সরে গেছে।

চার

স্নান করে হীরক নিজেই শুভমযকে ডাকতে গেল। খেতে চলল শুভোদা। আমার আজ নেমস্তন্ন আপনাব সঙ্গে খাওয়ার।

শুভময হাতেব কাজটা রেখে প্রীতচোখে আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, কতক্ষণ এসেছ?

আব যাই নি তো। এখানেই স্নান করলাম যে।

ও, তাই নাকি? শুক্লা এসেছে বুঝি?

হ্যাঁ, ছাড়লে না কেউ।—শুভমযেব চোখ সযত্নে পরিহার কবতে লাগল হীরক।

শুভময বললেন, কি করবে বেচাবা বল? ওব কথা বলবারও একটা লোক নেই বাড়িতে। ছুটিব দিনটাতে তোমাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ওব বোকামি হত।

হীরক শুধু নতদৃষ্টিতে ঘাড় নেড়ে সায দিল। লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পাবছিল না। মনে মনে বিদ্রূপেব হাসি হাসল। নিরর্থক এই সত্যগোপনের অমর্যাদা থেকে আত্মরক্ষা কববার শক্তিও তার নেই। নিরর্থকই তো, উচ্চারণ করল গলার মধ্যে নিঃশব্দে। মুখে বলার কথাগুলোও মনে মনে বলে বিবেকে শাস্তি বোধ করল—খানিকটা—শুক্লা বলে নি তো থাকতে, বউদি বলেছেন!

চলুন।—আবার ভাড়া দিল হীরক।

চল।—একটু চমকে উঠে পড়লেন শুভময। কর্মচারীকে কাজেব নির্দেশ দিয়ে হীরকেব সঙ্গে ভেতরে গেলেন।

খেতে বসে মিনিটখানেক পবে শুভময বললেন, শুক্লা কোথায়—তাকে দেখছি নে যে?

মালিকা সামনে বসেছিল, জবাব দিল, শুয়ে আছে বোধ হয়।

শুয়ে আছে। কেন?

বসে থেকেই বা কি কববে?—ঝাঁজের সঙ্গে বলল মালিকা।

শুভময় থেমে গেলেন।

খাওয়ার পরে হীরক শুভময়ের সঙ্গে যাচ্ছিল। মালিকা ডেকে বলল, ঠাকুরপোও কি দোকানে যাচ্ছ নাকি?

শুভময় বললেন, না না। তুমি বিশ্রাম কর। তোমার তো শোবার অভ্যেস আছে ছুপুরে। একটু গড়িয়ে নাও।

ক্রতপদে চলে গেলেন শুভময়।

মালিকা বিব্রত হীরককে একরকম টেনে নিয়ে গেল। নিজের বিছানাটা ঠিক করে দিয়ে বলল, নাও, শুয়ে পড়।

হীরক একখানা বই হাতে নিয়ে এসে বসল বিছানায়। একটু হেসে বলল, যদি ঘুমিয়ে পড়ি?

ঘুমবে।

বেশ। আর আপনি খেয়ে এসে বসে কাটাবেন?

আমি এসে তোমাকে ঘুমতে দিচ্ছি নাকি?—উদগত হুট্ট হাসিটা চেপে মালিকা বলল, তোমাকে জাগিয়ে তুলে গল্প করব যে। শুয়ে পড় এখন।

মালিকা চলে গেল।

কিন্তু পড়া এবং ঘুম কোনটাই অগ্রসর হল না হীরকের। অবশেষে বইখানা বুকের ওপর বেখে উল্টোনেড়ে নিঃশব্দে পড়ে বইল।

কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় কার পায়ে শব্দে চোখ বুজল। মালিকা ঘরে ঢুকে হীরকেব চোখের কিনাবে চেষ্টা-জনিত কুণ্ডন দেখে মুখ টিপে একটু হাসল। পাশের ঘবে গিয়ে প্রসাধন কবে ফিরে এসে হীরকের কাছাকাছি দাঁড়াল। পদশব্দ অল্পসবণ করছিল হীবক। মালিকার সহাস্ত দৃষ্টির স্পর্শ অল্পভব করল সর্বদে। নিঃশ্বাস একটু ঘন করে ফেলতে লাগল।

ক্ষণকাল পরেই চোখ খুলল। যেন এইমাত্র দেখে মালিকার উপস্থিতি জানতে পারল। হেসে বলল, মাঝে মাঝে ঘুমুচ্ছি, মাঝে মাঝে পড়ছি। হল আপনাদের?— বলতে বলতে উঠে বসল হীবক।

উঠছ কেন? পড় না শুয়ে শুয়ে।

না না। আপনি বসুন, আর শোব না।

মালিকা এক পাশে বসল। হীরক একটু সবে আরও জাযগা করে দিল। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলল না কেউ।

যাই এবার বউদি।—হঠাৎ বলে উঠল হীবক।

নীরব স্বরের ঘোরটা কেটে গিয়ে ঘরের শুষ্ক হাওয়াটা পাতলা হয়ে উঠল। মালিকা কলরব করে বলে উঠল, সে হচ্ছে না। যাই মানে? আমরা বেড়াতে যাব যে তোমার সঙ্গে।

কোথায়?

সে তুমি ঠিক করবে।

কে কে যাবেন?

মালিকা হেসে বলল, গুল্লা আর আমি। গুল্লাকে বলতে সে রাজী হয়ে গেল।

শেষ শব্দটির অর্থ অমনোযোগের স্বেযোগে হীবককে এড়িয়ে গেল। সে বলল, কিন্তু আমাব যে কাজ ছিল একটু—

স্বস্তির হাসি খেলে গেল মালিকার চোখে। বাধা দিয়ে বলল, সে সব কাজ তুমি কালকে কবো। আর ছুটি নেই। হীবক জবাব দিল না।

মালিকা এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, অবশ্য তোমার যদি সত্যিই অস্ববিধে হয়—তবে থাক।

হীবক তাকিয়ে দেখে সহাস্তে তাড়াতাড়ি বলল, অস্ববিধে হলেই ছাড়ছি নাকি আমি? শীগগির উঠুন তবে, সাজতে আবস্ত করুন আপনারা।

মালিকা হাসিমুখ ফিবিষে বলল, এই তো লক্ষ্মী ছেলে। এইবার লক্ষ্মী মেয়ের মত আপনারা সেজে আসুন তো দেখি।

কেন, এমনিতে কি খাবাপ দেখাচ্ছে আমাকে?

দৃষ্টিটা হীবকের যেন আপন ইচ্ছায় মালিকার শবীঘটার ওপর দিয়ে আগাগোড়া বেড়িয়ে এসে চোখের উপর থামল। দৃষ্টির স্পর্শে অঙ্গগুলি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়ছিল। অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছিল হীরকের। কিন্তু উদ্ধত ধাক্কা খেল চোখেব কাছে।

খিলখিল করে হেসে উঠে দাঁড়াল মালিকা। বলল, কি, পাসের নম্বব দিলে তো?

একশোব মধ্যে একশো।—চক্ষু নত কবে হীরক বলল, চলুন তা হলে, সাজবাব কোন দরকার নেই আপনার।

মালিকা খুশী হল। মুচকি হেসে বলল, এই তো, সব রকমই জান দেখছি। মিছে কথা বলে মেয়েদের কি করে খুশী কবতে হয়—তাই না?

জবাবের দায়িত্ব থেকে হীরককে রেহাই দিয়ে মালিকা দরজাব কাছে এগিয়ে গেল। ডেকে বলল, শুক্লা, তৈরি হয়ে নাও। শীগগির—

ফিবে এসে হীরককে বলল, কাপড়খানা গুণু বদলে আসি, অ্যা?—হেসে আলমারি থেকে শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে পাশেব ঘরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শুক্লা এসে দরজাব সামনে দাঁড়াল। হীরককে একা দেখে মাথাটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে এদিক ওদিক চকিতে দেখে নিয়ে বলল, বউদি কোথায়? আপনারা যান হীরকদা, আমার যাওয়া হল না। ভুলে গেছলাম, আমার একটা কাজ আছে। আমাদের হেড-মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আপনারা যান।

কথাগুলো শেষ করেই শুক্লা দ্রুতপদে চলে গেল।

খানিকক্ষণ দম বন্ধ করে থেকে হীরক একটা উচ্চাঙ্গের হাসি সঙ্গে মনটাকে মুক্ত কবে আনল। ভুল—ভুল। একদিন সব পবিষ্কার হবে। এমন হয়।

পাঁচ

সকালবেলা বসবাব ঘবে হীরক একা। সামনের দরজাব ভিতর দিয়ে দৃষ্টি আকাশের দিকে ছড়ানো।

চিন্তা কবছে হীরক।

চিন্তা করছে না এই ভঙ্গীতে মন চোখ গুটিয়ে এনে সিগারেট ধবাল একটা লঘু ছন্দে। ধোঁয়ার সঙ্গে উত্তপ্ত মনেব স্নায়ু পুনরায় ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। চোখ দুটি আগের মতই আবাব অকর্মণ্য হয়ে বাইরে ভেসে বেড়াতে লাগল।

দেখতে লাগল আগের দিনেব ছবি আব শুনতে লাগল কথা।

বিক্শায় পাশাপাশি মালিকা আর সে।

তুমি সিগারেট খাও না কেন ঠাকুরপো?

খাই—খুব কম।

আছে সঙ্গে? একটা ধবাও না। আমাকে লজ্জা কবছ না কি?

না না। বোকো বোকো।

পানের দোকান থেকে সিগারেট কিনে ধবিষে বিক্শায় এসে বসল হীরক।

উঃ—কি গন্ধ।

আপনার অস্থবিধে হচ্ছে। ফেলে দেব?

না না। তুমি খাও।

খুট কবে হুইচ বদলে আর একটু আগেব দিকে আলো ফেলল মনটা।

ট্রামে—

এখানে নামতে হবে।

হাসিময় স্তবে আবার—চল আমার এক বন্ধুব বাড়ি বেবিষে আসি?

চলুন।

বেশ একটু দূর হবে এখান থেকে। গলিঘুঁজি দিয়ে যেতে হবে—একটা রিক্শ করাই ভাল। কি বল?

অহেতুক হাসি মালিকাব।

অধেকের বেশী জাযগা জুড়ে আঁরামে বসল মালিকা। স্বাস্থ্যবতী। চকিতে নতুন করে লক্ষ্য কবল হীরক।

বসতে গিয়ে মালিকাব পাশে আটকে মুহূর্তেব জন্তু থেমে রইল হীরক। মালিকা সরে বসবার চেষ্টা কবল যেন। চাপ লেগে মাংসই খানিকটা সরে বসে গেল মাত্র।

বিক্শাগুলো এত ছোট কবে!—মালিকার সলজ্জ কণ্ঠস্বব।

* * *

শব্দ করে হেসে উঠল হীরক। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সব। দৃষ্টি ফিবে এল ঘরের মধ্যে। সিগারেট ছোট ছোট টান দিল কষেকটা।

* * *

শুভোদা, বউদিকে আজ বেড়িয়ে আনলাম অনেক।

বেশ করেছ।—শুভময়ের সংক্ষিপ্ত জবাব।

বেশ কবেছ! বেশ করেছ! অর্থ?

হৃদয়স্বট্টা হঠাৎ দ্রুত চলতে আবস্ত করল হীরকের। শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল। শূন্য মনে পোড়া সিগারেটের ধোঁয়াব দিকে তাকিয়ে বইল।

কিন্তু সবষের তেলের সেই ভদ্রলোক এখনও আসছে না কেন! হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল হীরকের। তাড়াতাড়ি ফাইল খুলে পড়তে শুরু কবল।

নন্দলাল প্রবেশ করল।

সবষের তেল! মনে হল হীরকেব। অভ্যর্থনা করে উঠল, আসুন।—নামটা মনে করতে পাবল না।

নন্দলালবাবু।—বুঝতে পেরে হেসে মনে কবিয়ে দিল
নন্দলাল।

ই্যা, তারপব? খবর সব বলুন।

নন্দলাল আত্মপূর্বিক সব কথা আর একবার বর্ণনা
করে গেল।

হীরক আজ পাকা ওকালতি প্যাচের নানা বকমের
প্রশ্ন কবে আপন বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে নন্দলালকে নানা ভাবে
অভিভূত কবতে চেষ্টা কবল। যথেষ্ট ফল হয়েছে মনে
হল যখন তখন ছেড়ে দিল।

শেষ কথা বলে দিল, এখন আপনাব ভাগ্য আর
আমাব হাতযশ।

নিজেব মাপমত কথা পেয়ে নন্দলাল লুফে নিল
কথাটা। বলল, ঠিক বলেছেন। ওই হল আসল কথা।

নন্দলাল চলে গেল।

ভিতবে পর্দা সরিয়ে সুরীতি এসে দাঁড়াল। বলল,
চান কববে না ঠাকুরপো? না, আজও নেমস্তন্ন আছে?

রোজ রোজ আর কে নিমন্ত্রণ করবে বল!—হেসে
হীরক উঠল চেয়ার থেকে। কাল তোমার বাগ হয়েছিল
খুব, না বউদি?

শোন কথা।—সুরীতি খুশীব সুরে বলল: সত্যি
বলছি, আমার খুব ভাল লেগেছে। পুরুষমানুষ, একটু
অনিয়ম অত্যাচার করবে না? কত চিন্তা করেছি
আমি সাবাদিন।

হীরক হেসে উঠল: বেশ, চিন্তা কবতে হয়েছে বলে
খুশী হয়েছে বুঝি?

সুরীতি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল, তাই বললাম
বুঝি। খবর পর্যন্ত দিলে না একটা—চিন্তা হবে না? যখন
শুনলাম সব—ভাল লাগল। শুভমসবাবুব বউটি বেশ
হাসিখুশী। আমাব বেশ লাগে। গুরুার মত গম্ভীর নয়।

হীরক বলল, গুরুাকে ভাল লাগে না তোমার?

মহুর্তকাল হীরকের মুখের দিকে তাকিয়ে বইল
সুরীতি। শেষে বলল, ভাল লাগবে না কেন। ভালই
তো। তা বলে শুধু তার সঙ্গেই বেড়াতে হবে
না কি।

বলেই ভীত হয়ে উঠল সুরীতি। মুখ ফিরিয়ে বলল,
তুমি এস ঠাকুরপো। আমি দেখি ঠাকুর কি কবছে।

সুরীতি চলে গেলে হীরক একটু হেসে উঠে পড়ল।

* * *

বিকেল কোর্ট থেকে ফিরে একটু বিশ্রাম করেই
আবার বেবিয়ে পড়ল হীরক। একটু হেঁটে না বেড়ালে
শরীর ঠিক থাকবে কেন। তাই একটু ঘুরে আসা এই
আর কি।

কিন্তু শুভোদার সঙ্গে একবার দেখা কবা দরকার।
একটু হাঁটতেই হঠাৎ যেন মনে হয়ে গেল হীরকেব।

শুভময়ের দোকানের কাছে গিয়ে থেমে দাঁড়াল
হীরক। কিন্তু শরীরটা হীরকেব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
কাজের সময় মনের অপেক্ষা করে না। প্রায় অজান্তেই
কখন যেন গলিব দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

গুরুার ঘব বন্ধ। মালিকার ঘরের সামনে গিয়ে
দাঁড়াল হীরক।

মালিকা বিছানায় হাতের ওপর মাথা রেখে
অর্ধশায়িতা। রণেশ সামনে বসে।

এস ঠাকুরপো।—মালিকা উঠে ভাল হসে বসল।

আসুন।—বর্ণেশও সম্বর্ধনা করল।

হাসিমুখ করতে হল হীরককে: এই যে, ভাল আছেন?

মালিকা সরে বসে পাশে হাতের একটা মুদ্র আঘাতে
জাযগা দেখিয়ে দিল: বস এখানে।

বসবার সঙ্গে সঙ্গে হীরকের দৃষ্টি পড়ল রণেশের ওপর।
একটা কালো ছায়া যেন বর্ণেশের মুখে ওপর দিয়ে সবে
গেল—ধবা পড়ল হীরকেব চোখে। ছেলেমানুষী খুশীতে
চকচক করে উঠল হীরকেব মুখ।

বাজে টুকিটাকি কথায় সময় কাটতে লাগল। সে
কথায় মন ছিল না কাবও। নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছে
তিনজনই।

অলক্ষ্য পেরেই বর্ণেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। লক্ষ্য
করল হীরক। রণেশ ঘড়ি দেখতেই চাঞ্চল্য মালিকার
ওপরও সংক্রামিত হল। সন্দেহ দৃঢ় হল হীরকের। চেপে
ভাল হয়ে বসল সে।

অবশেষে বর্ণেশ বলে উঠল, আর দেবি করলে টিকিট
ছুটো নষ্ট হয়ে যাবে যে। আমাদের আবার থিয়েটারের
টিকিট কেনা হয়ে গেছে কিনা।—হীরকেব দিকে তাকিয়ে
হেসে কথাটা শেষ করল।

ওঃ, তাইতো!—মালিকা উঠে দাঁড়াল। হীরককে বলল, তুমি আসবে জানলে তো তিনখানাই একসঙ্গে করা যেত। এখন টিকিট পাওয়া গেলেও একজায়গায় তো আর বসা যাবে না।

হীরক এবার উঠল : না না, আপনাবা যান।— বলে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

শুভময় মুখ তুলে হীবকের আসন নেওয়া পর্যন্ত তাকে অহুসবণ করলেন স্নিগ্ধদৃষ্টিতে। শেষে বললেন, কি খবর বল?

কিছুই না। এলাম আপনাব কাছে।

ওরা কেউ নেই বুঝি বাড়িতে?

মুখের ওপর বস্তুর চাপ বোধ কবল হীরক। বাইরের শব্দ বা কথা দেহের মধ্যে রক্ত-চলাচলের ওপর ক্রিয়া করে কি ভাবে অনেকদিন চিন্তা কবেছে সে। কিন্তু বুঝতে পাবে না। আজও বুঝতে পাবল না, কিন্তু ক্রিয়াটা বোধ করল।

হঠাৎ সামনে একটু ঝুঁকে কিছু দেখবাব ভঙ্গীতে মাথাটা নীচু কবল হীবক। কিন্তু পরক্ষণে আবার মাথা তুলে বলল, অ্যা? ও—না। ওরা কেউই নেই। শুক্লা নেই। বউদি ছিলেন। এইমাত্র থিয়েটারে গেলেন রণেশবাবু সঙ্গে।

বণেশ! কোন্ রণেশ? ও, হ্যাঁ। তা তুমি গেলে না থিয়েটারে?

নাঃ।

শুভময় কাজে মন দিলেন আবার।

কিছুক্ষণ পরে হীরক বলল, আমি যাই শুভোদা—

আচ্ছা এস। শুভময় চোখ না তুলেই জবাব দিলেন।

ছয়

রণেশ ট্যাক্সি কবেছে। ট্যাক্সি করে যেতে হাওয়ায় উড়ে বেড়ানোর আশ্বাদ পায় মালিকা। মালিকা যত হালকা হচ্ছিল রণেশ তত ভারি হয়ে উঠছিল। মালিকা প্রায় অনর্গল কথা বলছে। রণেশ হাঁ আর হ্যাঁতে জবাব দিচ্ছে।

হঠাৎ রণেশও হালকা সুরে বলল, থিয়েটারে যেতে আবার ভাল লাগছে না। বরং বেড়িয়ে আসি।

সোল্লাসে বাজী হল মালিকা : সেই ভাল। চলুন। আমারও ভাল লাগছে না বসে বসে থিয়েটার দেখতে।

মাঠের দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে আবার চুপ করল বণেশ। মুখের রাস্তা বন্ধ থাকায় সমস্ত চাক্ষু্য প্রকাশ পাচ্ছিল কপালের রেখায় আবার শবীরের ছোট ছোট সঞ্চালনের মধ্যে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল মালিকাব দিকে।

মন আবার মুখ রণেশের একসঙ্গে চলে না। প্রথমেভাবে ক্রিয়াশীল মনের তাড়নায় মুখ বোবা হয়ে উঠল।

অবশেষে মালিকাও নীবব হল।

কিছুক্ষণ পরে বণেশ হঠাৎ আবার বলে উঠল, হীরকবাবু তো বিয়ে করেন নি—তাই না?

না।—চমকে অবাক হয়ে তাকাল মালিকা। পরে উৎসাহের সঙ্গে হেসে বলল, কেন, কোন মেয়েটেকে আছে নাকি আপনাব খোঁজে?

কপালের রক্তের চাপ যেন একটু কমে গেল বণেশের। একটু হেসেও ফেলল। বলল, না না, এমনই জিজ্ঞেস কবলাম।

মালিকাব মুখখানা ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুচকি হেসে বলল, হীবক ঠাকুরপোকে নিয়ে এলে কিন্তু বেশ হত, তাই না?

না। মোটেই ভাল হত না।—রণেশ হাসিমুখ কবেই জবাব দিল।

কেন? ভাল হত না কেন বলুন তো?

তা বলব না।

চাপাকর্ষে কলকল করে হেসে উঠল মালিকা। পরক্ষণে নীবব হয়ে গেল।

মিনিটখানেক পরে অকস্মাৎ রণেশ প্রায় চোঁচিয়ে উঠল, রোকো বোকো—

মালিকা চমকে উঠেছিল। বলল, কি হল?

মুহূর্তকাল যেন দ্বিধার জন্তে অপেক্ষা করল বণেশ। পকেটের উপর দিয়ে বাব দুই হাত বুলিয়ে জড়ানো সুরে বলল, হোটেলের একবাব ফিরে যেতে হচ্ছে যে। ব্যাগটাই ফেলে এসেছি।

মালিকা রণেশব চোখেব দিকে তাকাল। রণেশ
৬- দৃষ্টি এডিয়ে গাড়ি চালাতে হুকুম দিল হোটেলের
ঠিকানায়।

হোটেলের সামনে বণেশ আগে গাড়ি থেকে নেমে
মালিকাকে ডাকল, এস, দেখে যাও আমার ঘবটা।

মালিকা ধীরে ধীরে নেমে এল।

মালিকাকে ঘরে বসিয়ে বেথে রণেশ ক্রতপদে নেমে
গিয়ে ট্যান্ডিটা বিদায় দিয়ে এল।

অঙ্ককাব হয়ে এসেছিল। ঘবে ঢুকে দরজা বন্ধ কবে
দিয়ে আলো জ্বলে দিল রণেশ।

মালিকা উঠে দাঁড়াল : ব্যাগ পেয়েছেন ? চলুন তা
হলে।

রণেশ কাঁপছিল। হঠাৎ মালিকার হাত ধরে টেনে
বসাল বিছানার ওপর। অক্ষুট কণ্ঠে বলল, বস।

প্রথম মুহূর্তে মালিকাব দেহটা নিম্পন্দ অবশ হয়ে পবের
আক্রমণের জন্ত প্রতীক্ষা করল। কিন্তু সময় পেয়ে স্পন্দন
ফিবে পেল পবের মুহূর্তে। মন ক্রিয়াশীল হল।

অপমান! অপমানই তো। মনে হল মালিকাব।
আর বসে থাকা বিশ্রী অস্ত্রায়।

পবমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল রণেশ।

কিন্তু মালিকার প্রতিক্রিয়া তখন সবল হয়ে উঠেছে।
বণেশ এখন দুর্বল। তার বুকের উপর দুই হাতে ধাক্কা
দিয়ে হেঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত কবে দরজার কাছে গিয়ে
দাঁড়াল মালিকা। চাপা মৃদু কণ্ঠে দম নিতে নিতে বলল,
আবার উঠলে চেঁচাব আমি।

রণেশ ব্যাহত কুকুবের মত সজল করণ দৃষ্টিতে
তাকিয়ে রইল। মালিকার মনে হল জিভটাও যেন তেমনি
বেরিয়ে আছে।

এসব কি!—মালিকা নিজের কাছেও মহীয়সী হয়ে
উঠল : ছিঃ। তা হলে আমি আর—

অকস্মাৎ পবিবর্তন ঘটে গেল রণেশব। সোজা হয়ে
বসে চাপা কর্কশ কণ্ঠে বলল, ওঃ, বুঝেছি তা হলে ওই
হীরকের সঙ্গে।

কি!—মালিকা চমকে উঠল। হাত বাখল দরজার
ছিটকিনিব ওপর। কণ্ঠে শ্লেষ ঢেলে বলল, হীবক। তাব
সঙ্গে আপনার তুলনা।

ওঃ, তাই নাকি!

কিন্তু শেষ করতে পাবল না রণেশ। তার অঙ্গীল
মুখভঙ্গী দেখেই মালিকা দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

* * *

হীবকের বাড়ির সামনে এসে থামল মালিকা।

হীরক বাইরেব ঘরেই বই পড়ছিল। মালিকা
অধোমুখে যখন ঢুকল ঘবে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে
রইল সে। মুহূর্তপবে বলল, সঙ্গে কেউ নেই?

না।—বলে সামনের চেয়ারটায় বসল মালিকা।
টেবিলেব ওপর হাত দুখানা বেথে মুখখানা তার মধ্যে
লুকিয়ে ফেলল। কান্না চাপবার ভঙ্গীটাও ফুটে
উঠল।

হীরক উঠে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিমূঢ়েব মত ডান
হাতটা মালিকাব মাথার কাছাকাছি বাব দুই ঘুবিয়ে
আনল। হঠাৎ সিনেমার ছবির এমনি হাত খেলানোর
অভিনয় মনে পড়ে গেল। হাত নামিয়ে নিল। মৃদু ব্যস্ত
কণ্ঠে বলল, বউদি, কি হয়েছে? বউদি—

ডাকবার সময় হাতখানা অজ্ঞাতসারে তেমনি মালিকাব
খোঁপার কাছে নিয়ে ফিবে এল আবার। ভিতরের
দরজার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে দেখে নিল একবাব।

মালিকা মুখ তুলল। চোখ ভাল হয়েছিলে নিজেই
অনুভব করল। ভারী ভাঙা গলায় বলল, আমাকে বাড়ি
পৌঁছে দিয়ে এস ঠাকুরপো।

মালিকাব মুখখানা লক্ষ্য কবছিল হীরক। কাজেই
কথাগুলো শুনতে পেল একটু বিলম্বে।

যাচ্ছি।—বলে তৎক্ষণাৎ যেন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল
হীরক।

রাস্তায় নেমে হীরক এবাব সহজ কণ্ঠে বলল, কি
হয়েছে বউদি?

প্রায় অন্ধকাবেও মালিকা দু হাতে চোখ ঢাকল
একবাব। তাবপরে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, আমার বলবার পথ
নেই ঠাকুরপো।—মুহূর্তপরে ভয়াবহ গভীর স্ববে একটা
মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, বণেশ—

হীবক থমকে দাঁড়াল। বলল, রণেশ— কি?

মালিকাব বলতে কষ্ট হচ্ছে যেন, তবু বলল, আমাকে
ফাঁকি দিয়ে হোটলে নিয়ে—

হীৰকেব দম বন্ধ হবার উপক্ৰম হল। ক্ৰোধে এং
কোতুহলে কাঁপছিল।

চেষ্টা কৰেছিল, কিন্তু পাবে নি। মালিকাব স্ববে
এবাব খানিকটা খুশীৰ স্পৰ্শ লেগে গেল : খানিকটা গৰ্ব—
পালিয়ে এসেছি।

আনন্দেৰ নিঃশ্বাস ফেলতে পাবল না হীৰক। বেদনা
ৰয়ে গেল, অনিৰ্দেশ্য হয়ে উঠল মাত্ৰ। কোন জবাব না
দিখে নীৰবে চলতে লাগল। হঠাৎ বলে উঠল, বদমাশ।

আমি জানতাম, এ বকম মতলব আছে ওৰ।

মালিকা হীৰকেৰ সবেগ গতিৰ সঙ্গ তাল রাখবাব
জন্তে প্ৰায় ছুটছিল। কোন জবাব দিল না। একবার টাল
সামলাবাব জন্তে হীৰকেৰ বাঁ হাতটা ধবে ফেলল। হীৰক
খামল। মালিকা হাত ছেড়ে দিখে মুছুস্বৰে বলল, একটু
আন্তে চল।

হীৰক ধীবে হাঁটতে শুক কবে সংকুচিত স্বৰে বলল,
কি হয়েছিল বলুন তো সব।

বলব।—মালিকা আগ্ৰহেৰ স্বৰে জবাব দিল। সব
বলব তোমাব কাছে। এখন নয়, পবে।

এখনই বলুন না।—হীৰকেব চাপা স্বৰ একটু কৈপে
অনুরোধেৰ মত হয়ে বেবিয়ে এল।

কি বলব ?

এই থিয়েটাৰে গেলেন, সেখান থেকে হোটলেই বা
কী বলে নিয়ে গেল। আৰ তারপরে কি হল—

মালিকা হোটেল-প্ৰবেশ পৰ্যন্ত বৰ্ণনা কৰে খামল
একটু। শেষে বলল, ওৰ ভাবভঙ্গি দেখেই আমাব কেমন
সন্দেহ হল। ও ঢুকতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম
ব্যাগ নিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি।

তারপর ?

তাবপরেই তো ওই হল। ও জোৰ কৰে ধরল।
আমি ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে বেবিয়ে এলাম।

কিন্তু তখন তো দাঁড়িয়ে ছিলেন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু, বিছানাব ওপৰ ?

হ্যাঁ।

জোৰ কবল বুঝি ?

হ্যাঁ। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে তখুনি ছাড়িয়ে নিলাম।

তা হলে আৰ কিছু—

আৰ কিছুই নয়। ছুটে বেবিয়ে এলাম ঘৰ থেকে।

হীৰক কিছুক্ষণ চুপ কৰে থেকে একটা নিঃশ্বাস চেপে
বলে উঠল, লম্পট। পশু।

মালিকা একটু কাছ ঘেঁষে নীচু গলায় বলল, ওব
কাছে এ সব কথা কিন্তু না বলাই ভাল।

হীৰকেৰ মুখ দিখে ঠিক ওই স্বৰে ফিসফিস কবে
বেবিয়ে গেল, আচ্ছা।

আবাব কিছুক্ষণ নীৰবে কাটল।

একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি।—একটু হাসিৰ
সঙ্গে হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল মালিকাব : ও বলে কি
জান ? বলে যে, কেন, হীৰকবাবুৰ সঙ্গে তো—

থেমে বলল, আমি মুখে বলতে পারব না সব। আমি
বললাম যে তাব সঙ্গে তোমাব তুলনা হয় না কি।

খট কবে শরীৰটা যেন বন্ধ হয়ে গেল হীৰকেব। কিন্তু
পা দুটো চলছিল। এব পরে ? এব পবে ? মনটা যেন অতল
সময়ের গহ্বরের দিকে ঝুঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা কবল।
সভয়ে চোখ বুজে পিছিয়ে এল তখনই।

ও কি বলল ?—শেষে জিজ্ঞাসা কবল হীৰক।

তখনই বেবিয়ে এসেছি আমি। আৰ দাঁড়াই নি তো।

লম্পট, পশু।—হীৰক কথাব আডাল সৃষ্টি কৰতে
লাগল : প্ৰথম থেকেই আমাব ভাল লাগে নি লোকটাকে।
মালিকা নীৰবে হাঁটিতে লাগল।

* * *

শুক্কা রান্নাঘরের বারান্দায় ছিল তখন। মালিকাব
সঙ্গে হীৰককে দেখে নিঃশব্দে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে
ভিতবে চলে গেল।

মালিকার ঘবের সামনে খামল হীৰক। বলল, আমি
যাচ্ছি।

ঘবের মধ্যে ফিরে দাঁড়িয়ে মালিকা মুছুস্ববে বলল,
বসবে না ?

না, শুভোদার সঙ্গে একটু আলাপ কৰে যাব।

তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিষ্কেপ কবল মালিকা।

হীৰক অন্ত দিকে তাকিয়ে চকিত হাসিৰ রেখাটাকে
ঢেকে বলল, না এমনি। অন্ত কথা।

* * *

শুভময় লিখছিলেন। খাতাখানা বন্ধ করে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বসালেন হীবককে। প্রথম কিছুক্ষণ একাই এমন ভাবে কথা বলে গেলেন যে হীবকের কথা বলার কোন প্রয়োজন হল না। উঠতে দিলেন না বুঝতে পাবল হীরক।

অনেক দিন তোমাব সঙ্গে গল্প কবা হয় নি। আজকে ছাড়ছি নে তোমাকে সহজে। ক দিন থেকেই খুব কথা কইতে ইচ্ছে করছে, সময় কম পাই বলেই বোধ হয়। তোমাকে বলা হয় নি এখনও, লিখতে আবস্ত কবেছি।

একটু থেমে আবার বললেন, যখন যা ভাবছি বা ভেবে এসেছি, লিখে রাখতেই শুরু কবলাম। না লিখে কেমন পাবছি না আব। কোন প্রচণ্ড দার্শনিক থিওরি আশা কব না কিন্তু। যখন যে সম্বন্ধে যা সত্য বলে মনে হচ্ছে লিখে যাচ্ছি। এবং সোজা চলবাব চেষ্টা কবছি। সত্যের দিকে পেছন দিয়ে উল্টো দিকে রওনা হয়ে সত্য দর্শন করবার হাতকব প্রয়াস আমি কবব না।

হীবক এতক্ষণে কথা বলল, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে লিখছেন তো?

হাসলেন শুভময় : না। একটা বিষয় সম্বন্ধে নয়—সমস্ত বিষয়। তবে ই্যা, সবগুলো মিলে একই বিষয়। মানুষ! আজকে কি লিখে রাখলাম জান? সদা সত্য কথা কহিবে। এই কথাটা মানুষের সবচেয়ে বড় নোঙর।

হীরক হাসিমুখে তাকিয়ে রইল। ছেলেবেলায় পড়া লাইনটা কানে বাজতে লাগল যেন।

শুভময় বললেন, এই নোঙরে বাঁধা আছে বলেই মানুষ আজও একেবারে ভেসে যায় নি। নইলে মেসোজোয়িক যুগের জন্তুর মত নিজের ওজনে বেসামাল হয়ে কবে শেষ হয়ে যেত।

হীরক বলল, আর একটু পরিস্কার করে বলুন।

শুভময় একটু নড়াচড়া কবে প্রস্তুত হয়ে নিলেন যেন। বললেন, দেখ, বেশীর ভাগ মানুষই আজও অসৎ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিথ্যাবাদী, চোর, ঘুষখোর, বিশ্বাসঘাতক, লম্পট প্রবঞ্চকের সংখ্যা অফুৎস্তু। বাদবাকি সবই প্রায় ভণ্ড। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ সমাজ করে,

দল কবে, জাতি কবে, একটা নয় অনেকগুলো কবেও টিকে আছে। আশ্চর্য নয়?

আশ্চর্যই তো।

ওই, নোঙর কবা আছে—সদা সত্য কথা কহিবেব নোঙর। লক্ষ্য করছ নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলে কেউ স্বীকার করতে চায় না। ধবা পড়লে লজ্জা পায়। নানা বকমে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা কবে। লজ্জা পায়—ব্যক্তিগতভাবে, জাতিগতভাবেও। এক বাষ্ট্র কেন অগ্র বাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে, ওজুহাত সৃষ্টি কবে? লজ্জা পায়। ওতেই আটকে আছে। মাঝে মাঝে ফসকে যায়, মরে, মারে—নোঙর-ছেঁড়া হাল ভাঙা নৌকোব মত এখানে ওখানে ঠোঁড়র খাষ, ক্ষতি হয় অনেক। আবার নোঙর বাঁধে।

সেও তো ভণ্ডামি!—হীরক আন্তরিক অল্পভূতিব সঙ্গে বলল, বাঁধল বলে ভণ্ডামি করে না কি?

সেও ভণ্ডামি!—শুভময় জোর পেলেন আরও : অত্যন্ত কদর্য সত্য। কিন্তু ওতেই কাজ হয় অনেকখানি। সত্যের ভণ্ডামিও ভাল যে। কাজে লাগে। সব দেশ যখন সাধু সাজবাব ভণ্ডামি কবে দেখতে অবস্থা হাতকব হয় খুব। কিন্তু কাজ হয় অনেকখানি। সাধুতাব মুখোশ বজায় রেখে বদমায়েশি করা খুব সহজ মনে করো না।

বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হীবকের দিকে তাকালেন শুভময়। ভিতর পর্যন্ত দেখা যাবে ভয়ে চোখ নত করল হীরক।

ব্যক্তিব পক্ষেও তাই!—শুভময় শেষ কবলেন বক্তব্যটা : সাধু সাজতে হয়, নইলে হয় না। ওই নোঙর।

হীরক কথাটাকে ব্যাপক ক্ষেত্রে নিয়ে গেল। তাহলে আপনি আশাবাদী? মানুষের সভ্যতা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে না?

শুভময় অল্প হেসে বললেন, কোন বাদীর কথা নয় এটা। এই জগ্রে হচ্ছে না ধ্বংস - এই আমার বক্তব্য।

কিন্তু নোঙর ছিঁড়লে ধ্বংস তো হবে? সেইটে বন্ধ করবাব পথের কোন ইঙ্গিত—

না, কোন ফরমুলা আমি দিই নি।—মানুষখানেকে ব্যঙ্গের স্বরে বললেন শুভময় : বহু অবতার, বহু মনোবী বহু ফরমুলা দিয়েছেন—অনেকটা মেড-ইজিব মত। আমি

আব বাডাতে চাই নে। ভগুমির স্নায়ু যতদিন মাহুষের শরীরে কাজ করবে সমষ্টিগত ভাবেও মাহুষ ততদিন বিব্যাট ভগুমির রাজত্বে বাস করবে তাতে সন্দেহ নেই আমার। ইয়া, ইঙ্গিত দেব আমি, ওই ভগুমির উচ্ছেদেব জন্তে। অস্ততঃ নিষ্ক্রিয় করে রাখবার জন্তে।

হীরক হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, ভগুমিরও আলাদা স্নায়ু আছে বুঝি?

শুভময় একটু চিন্তা কবে জবাব দিলেন, না। ভগুমি কোন আদিম প্রবৃত্তি হতে পারে না। ওটা বুদ্ধির আমদানি। ভগুমির প্রয়োজনের উচ্ছেদ প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ভগুমির বুদ্ধিটাকে ইনহিবিট করতে হবে, দাবিয়ে দিতে হবে। ক্রমে ওব উচ্ছেদ হয়ে যাবে তাহলে।

তা কি সম্ভব?

খুব সম্ভব। বাস্তবঘাটে স্বন্দরী নাবীর ওপব লোভটাকে সভ্য মাহুষ নিষ্ক্রিয় করে দিতে পেবেছে যখন সবই পারে সে। কুকুরের জিন্তে জল আনানো-যায়, আবাব বন্ধও করা যায়।

হেসে উঠল হীরক : কণ্ডিশনিঙ?

খুব দরকার। যে সব বৃত্তিতে মাহুষের শুধু দুঃখই বাড়ে বলে সকলেই স্বীকার কবে, কণ্ডিশনিঙ কবে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করে তোলাই দুঃখমুক্তির প্রধান পথ।

কি ভাবে হবে?

দেখ, অধিকাংশ লোক অত্যায বা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে কেন জান? লোকে কি বলবে, লোকে কি ভাববে, এই ভয়ে। কতকগুলি কাজের ওপর সামাজিক ঘৃণা এত গভীর এত বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে তাদের হাত থেকে মাহুষ অনেকটা মুক্ত হয়েছে। ধর, অসহুপায়ে টাকা জমানোর ওপর এমন গভীর ঘৃণার সৃষ্টি কি সম্ভব নয়? তেমনি ভগুমির ওপব? কি যুদ্ধের ওপর?

হীরক বলল, কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে।

শুভময় ঘাড় নেড়ে বললেন, ইয়া, সময় লাগবে। কারণটা তুমি বলতে পার নি। ওই সব অত্যাযের ওপর সামাজিক ঘৃণা কাগজেকলমে এখনও আছে। অর্থাৎ আছে ভগুমি। আসলে ঘৃণা নেই। যথার্থ ঘৃণা সৃষ্টির

পরিবেশ হলেই কণ্ডিশনিঙ হবে। কাজেই সময় তো লাগবেই।

বলে কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটু হেসে বলে উঠলেন, তা লাগুক।—বলে যেন ছেদ টেনে দিলেন প্রশংসার উপর। তারপর আবাব বললেন, আব কি খবর বল? তোমার বউদি ভাল আছেন?

ইয়া, ভালই।

হীরক বিদায় নিতে পারছিল না। আরও কথা শুভময়ের বলবাব আছে এই বকম একটা ধারণা মনের মধ্যে অনিশ্চিত আকারে ঘুবিছিল।

শুভময়ই বললেন, আচ্ছা, বাত হয়ে গেছে।

হীরক তৎক্ষণাৎ উঠে বেবিষে গেল—

সাত

মালিকা ঘরের মধ্যে একা বসে মাঝে মাঝে টোট টিপে হাসছিল, আবাব গম্ভীর হয়ে পড়ছিল। কিছুক্ষণ এমন কাটিয়ে শেষে শুয়ে পড়ল। বংশী খাওয়ার জন্তে ডাকতে এলে বলে দিল, শরীর ভাল নেই, আমি খাব না। শুক্লাকে খেতে বল।

শুভময় খাওয়ার পরে ঘরে এলেন। আবাব চলে গেলেন। যাওয়ার আগে দরজাব কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিয়ে বললেন, শরীর খারাপ হয়েছে বুঝি?

মালিকা অল্প দিকে তাকিয়ে বলল, ইয়া।

আহা, ও বেচাবাব দোষ কি বল? তোমাব সঙ্গে ভাল রাখতে পারছে না।

চমকে তাকাল মালিকা। কাব? কে?

না, আব কারও কথা বলছি নে।—হেসে উঠলেন শুভময় : তোমার শরীরটার কথা।

নিঃশব্দে বেবিষে গেলেন শুভময়।

রাগ হল মালিকার শুভময়ের ওপর। ক্রমে অসহ্য ঘৃণায় যেন মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল শুভময়কে, কিন্তু পারল না। সমস্ত ঘটনার যোগস্বত্রেব এক দিকে বীধা আছে শুভময়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময়ে নিজেকেই অপবোধী মনে হল মালিকার। পরক্ষণে সমস্ত শরীরটাই যেন বিদ্রোহ করে উঠল। না। দায়ী সে। দোষ তার। দোষ তার।

ধীবে ধীরে শান্ত হয়ে এল আবার। হোটেলের দৃশ্যটা
ভেসে উঠল চোখের সামনে।

আবার হীরকের সঙ্গে বাস্তাব দৃশ্য। হীরকের কথা,
তার কমানো বাড়ানো চলাব বেগ, তার নীববতার গাঢ়
ভঙ্গীর কথা মনে হতেই চোখ বুজে একটু হাসল মালিকা।

উন্মুখ হয়ে নিশ্চল হয়ে রইল কিছুক্ষণ। 'যুম এল না।
শুক্রা ঘরে গেল, দরজা বন্ধ করে দিল, বংশী কলতলায়
কাজ করছে, সব শব্দ শুধু শব্দের সাড়া দিয়ে যাচ্ছে কানেব
মধ্যে—অর্থহীন।

শুভময় ঘরে এলেন অনেক বাত্মিতে। মালিকা উৎকর্ণ
হয়ে শুভময়ের পায়েব শব্দ অনুসরণ করতে লাগল। আলো
নিবিঘে দিয়ে শুভময় শুয়ে পড়লেন তাঁব বিছানায়।
একবার তার দিকে তাকালেন, চোখ বুজেও যেন স্পষ্ট
টের পেল মালিকা। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়ে থেকে শেষে
বাব ছই এপাশ ওপাশ করে কিছু শব্দ সৃষ্টি কবল। 'সে
যে জেগে আছে খবরটা জানানো হয়ে গেলে আবার স্থির
হয়ে বইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ ছুখে, অভিমানে, ক্রোধে
মালিকাব বুকটা বারকয়েক ঢলে উঠল। চোখে জল
এল।

কখন চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, কখন উঠে পড়েছে
টের পাশ নি মালিকা। শুভময়ের পাশে জড়সড় হয়ে
শুয়েই থিকার দিল নিজেকে—ছিঃ ছিঃ। সঙ্গে সঙ্গে
আবার মনেব কোণে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ছবিগুলো জেগে
উঠে এক ঝলক নীরব হাসি এনে দিল মুখে। বলে উঠল,
আঃ, এত ছারপোকা হয়েছে ওই বিছানাটায়! কাল
গরম জল ঢালতে হবে।

কিছুক্ষণ পবে এল শুভময়ের প্রত্যাশিত হাতখানা।

* * *

সকালে উঠে স্থায়ী মালিকা সংসারের কাজে লেগে
গেল। শুক্রাকে কাজ করতে দিল না। বরং সময়মত
বেঁধে থাইয়ে দিল। শুক্রা স্থলে চলে গেল।

বিশেষ কোন কাজ নেই আব। শুভময়েব খাওয়া
হয়ে গেলে আবার দোকানে চলে যাবে। তাবপরে
একেবারেই অখণ্ড অবসব। বর্ণেশ আজ আসবে না।
কিন্তু হীরক!

হীরক সেদিন এল না।

তারপরের দিনও এল না কেউ।

শুক্রা স্থলে, শুভময় দোকানে, মালিকা একা
চতুর্থ দিন একখানা চিঠি লিখে বংশীকে পাঠিয়ে দিল
হীরকের কাছে।

* * *

হীরক সেদিন শুভময়ের কাছ থেকে ফিরে এসে কঠিন
প্রতিজ্ঞায় নিজেকে বেঁধে ফেলল। আর না! আর না!

না, পরের দিন বিকেলে আবার ধমক দিয়ে উঠল
নিজেকে। মালিকার বাড়ির দিকটা পিছনে ফেলে দৃঢ়
পদক্ষেপে বিপরীত দিকে বেড়াতে গেল।

বাত্মিতে ফিবে স্থরীতিকে বলল, বউদি, শোন।
তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। কি করা যায় বল তো?
বিষে না কবা পর্বন্ত মাহুষ না কি ছেলেমাহুষ থাকে।
লোকে বলে সে আবার ভাল উকিল হতে পারে না কি?
দেখ দেখি।

স্থবীতি গম্ভীর হল। বেশ তো বিয়ে করেই ফেল
না। কে বাবণ করছে। লোকের ছুতো করবারই বা
দরকার কি তাব জন্তে?—শেষ দিকে হাসতে হল
স্থরীতিকে।

তোমরা ব্যবস্থা না করলে আমি কি করি বল? আমার
কাছে তুমি একটু বল।

বা, এখন আমার দোষ দিচ্ছ!—স্থবীতি প্রায় কেঁদে
ফেলল। আমি কত সাধ্য-সাধনা কবছি তোমাকে।

না না, দোষ দিচ্ছি নে বউদি। বলছি যে এইবাব
একটা দেখে শুনে যা হয় কব।

আমি মামাকে বলেছি তো অনেকদিন। আবার
বলব।

হ্যাঁ, বল।—হীরকের কণ্ঠস্বব দৃঢ় হল : শুক্রাকেই
বিষে করতে চাই। মামা গিয়ে কথাবার্তা বলে এলে
ভাল হয়।

স্থরীতির ঠোঁটটা একটু যেন উল্টে গেল : শুক্রা!
ওর যে স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়। গায়ে তো মাংস এক-
রকম নেই বললেই চলে।

মাংস দিয়ে কি করব?

স্থরীতি লজ্জায় নতচক্ষু হল। ঠোঁট চেপেও হাসি
চাপতে পাবল না। জবাবটাও সম্বরণ করতে পারল না।

বেশ, তুমি যদি ভাল মনে কর তবে মাংস ছাড়া শুধু হাড়ই দেখ।

নিজেব স্বস্থ দেহের স্বডোল হাত দুখানার ওপর চোখ পড়ল স্ববীতির। বেশীক্ষণ তাকাতে পাবল না। একটা নিঃশ্বাস নিঃশব্দে চেপে আবার বলল, শুক্রার মত নিয়েছ বুঝি?

মত? না। মত নেওয়া হয় নি তো।

বেশ তুমি। শুক্রার মত আগে নিতে হবে তো। তারপরে তো কথা হতে পারে?

হীরক একটু চিন্তিত এবং অপ্রতিভ হল। বলল, হ্যাঁ। ওব মত আছে-কিনা জানা দবকারই তো।

আব কিছুদিন থাক। মনে মনে সিদ্ধান্ত করল হীবক।

* * *

চতুর্থ দিনেও হীরক সংকল্প ঘোষণা কবে উঠছিল—না, আর নয়। এই সময় বংশী এসে চিঠিখানা হাতে দিল।

চিঠি হাতে নিয়ে শরীবটা কেঁপে উঠল, হীরকের। নিম্নস্ববে জিজ্ঞাসা করল, কে দিয়েছে রে?

মা দিয়েছেন।

ভাঁজ খুলে পড়তে আরম্ভ করল হীরক।

‘ঠাকুরপো, এ কদিন তোমার পথ চেয়ে ছিলাম। একা একা থাকি। গল্পগুজব না কবতে পাবলে, বেড়াতে না পাবলে হাঁপিয়ে উঠি। বণেশদা আর আসে নি। তুমি যদি না আসতে পাব—জানিয়ে দিও। ইতি বউদি’

পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাসি খেলে গেল হীরকের শরীবে। তৎক্ষণাৎ সজোরে সেটাকে অস্বীকার কবে চিঠিখানা টুকরো টুকরো কবে ছিঁড়ে ফেলল। হাত মুঠো করে শক্ত হয়ে বসে বইল কিছুক্ষণ। বংশীকে লক্ষ্য কবল হঠাৎ।

আচ্ছা তুমি যাও বংশী।—দীর কণ্ঠে বলল হীরক।

কিছু বলতে হবে না?

হ্যাঁ—আমি যাচ্ছি।

বংশী চলে গেল।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাচ্ছি। হীরকের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হয়ে উঠল। যাওয়া দরকার। রক্ষা করতে। ভয়ে

পেছিয়ে থেকে সর্বনাশ হতে দেব? অত দুর্বল নই আমি।

তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ল হীরক। বাঁচাতে হবে। শুভোদ্যব জন্তে এটুকু করতেই হবে।

মহেশ্বের বান ডেকে এল হীবকের শরীরে।

শুক্রা বাড়ি আছে কিনা কে জানে। কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ এই কথাটা একটা ধাক্কা দিল হীরককে। সে হয়তো ভুল বুঝবে। উপায় নেই। যেদিন সব জানতে পারবে মুগ্ধ হয়ে যাবে শুক্রাও। জানে হীরক। সেদিনের আব বিলম্বও নেই।

শুক্রা ছিল না। মালিকা শুয়ে ছিল দেহটা নীলায়িত ছন্দে এলিয়ে দিবে। ঘবে ঢোকবাব সঙ্গে সঙ্গে হীবকের মহেশ্বের বানটা নেমে গিয়ে কাদামাটি বেবিষে পড়ল যেন। চিঠির ভাষা, তার আসা—ছুটো মিলে যে উলঙ্গ অর্থ নির্দেশ কবছিল সেটা স্পষ্ট হয়ে হীবককে সঙ্কুচিত ছোট করে তুলল।

এস।—মালিকা ঈষৎ আবক্তমুখে আহ্বান কবল।

দেহটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল হীরকের। মালিকাব অগোছাল পাবিপাট্য চোখে পড়ল। বংশী এসে খবর দিয়েছে বুঝল। বুঝল যে চিঠি ছেঁড়ার ঘটনাটা বলে নি বংশী। কাছাকাছি একখানা চেয়ার ছিল। এগিয়ে গিয়ে বসল হীবক।

শরীর খাবাপ নয় তো?—নিতান্ত অহেতুক প্রশ্ন করল হীরক।

মালিকা-হাসল। না, এমনি শুয়ে আছি। একা একা কি করি আব বল।

নতমুখে চুপ করে রইল হীরক। তাকাতে পারছিল না। জোব করে মহত্ব ফিরিয়ে আনল অবশেষে। হঠাৎ সহজ স্ববে হাসিমুখ করে বলে উঠল; কই, চা খাওয়াবেন না?

চা খাবে?—মালিকা উঠল। বংশীকে ডেকে জল চাপাতে বলে এসে বসল আবার।

একটু অপেক্ষা করে মৃদু হেসে অভিমানের স্বরে বলল, তুমি এ কদিন আস নি কেন?

না-না কাজের ইষেতে—নীচু স্ববে বলল হীবক। চা খেয়ে চলুন তা হলে—

কোথায় ?

বেড়াতে যাবেন না ?

মালিকা হেসে বলল, আজ থাক। আজ গল্প কবব বসে বসে।

জ্যাট

এব পবে ? এর পরে কি হয় ? জানে না হীবক।

জীবনের বল্গা যেন অকস্মাৎ খসে গেল হীবকের হাত থেকে। বল্গা ছাড়া জীবনের কি অভূত বেগ। কি আনন্দ !

ক্লান্ত হীবক পবম আলস্তে সেই বেগ-স্রোতে ভাসতে ভাসতে পুলকিত হতে লাগল।

* * *

কোন ভয় নেই আপনার নন্দলালবাবু।—হীবক পিছনে হেলান দিয়ে বসল। সবষেব তেলের টিন আপনাব ফেরত পাবেন আপনি। আব না-ও যদি পান। আপনাব গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না—অন্ততঃ সে ব্যবস্থা আমি করব।

নন্দলাল একটু দ্বিধাব সঙ্গে বলল, সে বিশ্বাস আমারও আছে। কিন্তু কথা কি জানেন ? এমন বাজারটা পেলাম না আমি।

পাবেন, পাবেন। তেলের দর আর কমবে না কোনদিন। বরং বাড়বে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল নন্দলাল। কপালে হাত দিয়ে বলল, অদৃষ্ট। আশা তো তাই করি। অদৃষ্টে কি আছে জানি নে।

আমি জানি। অদৃষ্ট ভালই হবে আপনাব।

নন্দলাল দাঁত বার করল। আপনাব আশীর্বাদ।

* * *

আজকে ইংরেজী ছবি দেখব একটা জ্যা ? মালিকার আবদারের স্বর।

চলুন।

তোমাব জন্তেই কিন্তু বলছি। আমি তো বুঝি না কথা।

কথা না বুঝলেও ভাল হলে ভালই লাগবে আপনাবও। যেখানে বুঝব না তুমি বুঝিয়ে দেবে।

বেশ, চলুন।

সক্রিয় প্রেমের দৃশ্যে হীবক আর্ডচোখে তাকিয়ে দেখে মালিকাও তাকিয়ে আছে তাব দিকে। একসঙ্গেই উভয়ে আবাব পর্দাব দিকে দৃষ্টি ফেলে।

* * *

কে, গণেশবাবু যে ! আসুন, আসুন—

নমস্কার।

নমস্কার, নমস্কার। বসুন, বসুন।

এলাম আপনাব ক্রাছে।—গণেশলাল সঙ্গীকে দেখিয়ে বলল, ইনি ঘনকৃষ্ণবাবু। আমাব খালক।

বেশ বেশ। বসুন ঘনকৃষ্ণবাবু। তারপব কি খবর বলুন ?

গণেশলাল বলল, জানেন বোধ হয় ওঁর লোহার কারবাব আছে।

হ্যাঁ।

সেই অপবাধ আর কি। বিনা পারমিটে বিক্রি কবেছে।

ও, ব্র্যাক মার্কেটের কেস ?

কিন্তু প্রমাণ কল্পক।—ঘনকৃষ্ণ ঘৃণু-হাস্তের সঙ্গে মুখ খুলল : কেস কিছু নয়—

সব বলুন, তারপবে বুঝি ব্যাপাবটা।—হীবক উকিলের অধিকার সম্বন্ধে সতর্ক হল।

ঘনকৃষ্ণ আব একটা হাসি ছেড়ে বলল, ব্যাপারটা হল আমাকে লাইসেন্স দিয়েছে মালেক। অথচ আমি রেজিস্টার্ড ডিলার নই। গেজেটে নাম নেই আমার। বে-আইনি করেছে ওবা। আমি যেখানে খুশি বেচেছি। স্বয়োগ পেলে ছাড়ে কে আজকালকার দিনে বলুন ?

তা তো কোনদিনই ছাড়বে না, আজ কাল বলে কথা কি।—নিজের কথা খুশি হল হীবক। ঠিক লাগসই হয়েছে কথাটা। ভাবল।

বলুন। হেঁ হেঁ—

হীবকের মুখ দিয়েও মন্তণভাবে বেরিয়ে পড়ল, এর আর বলাবলি কি, হেঁ-হেঁ। ঠিক আছে। আচ্ছা, কাগজপত্রগুলো নিয়ে আসুন। দেখা যাক।

* * *

আজ শুধু ঘুরে বেড়াব—জ্যা ? ট্রামে, ট্যাক্সিতে, বিকশায়। আব খানিকটা হেঁটে। কি, রাজি ?

চলুন।

তোমার ভাল লাগবে তো?—সংক্ষিপ্ত জবাবে মালিকা।
একটু সন্দিগ্ধ হল।

হীবক অবাক হয়ে বলল, কেন লাগবে না?

মালিকা হেসে ফেলল: তুমি যেন কেমন গম্ভীর হয়ে
পড়ছ, অন্তমনস্ক হয়ে যাচ্ছ মাঝে মাঝে।

কই, না তো। একটুও না।—হীরক সহজ হয়ে
উঠতে চেষ্টা করল।

এব পবে? কত পবে? কি? প্রশ্নগুলো গুনগুন
কবতে থাকে হীরকের অর্ধচেতন মনে।

* * *

কি, শুয়ে আছেন যে?

শবীরটা ভাল নেই। বস।—মালিকা হাতে মাথা
রেখে কাত হল।

কি হয়েছে?

কি জানি, জবই হবে নাকি।—মালিকা কক্ষণ দৃষ্টি
নিষ্ক্ষেপ করল।

হীরক একটা ধাক্কা খেয়ে যেন কিছু ধববার জন্তে এক
পা ঝুঁকে গেল। মালিকার হাতখানা ধরে ফেলল।
তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে বলল, না, জর নয়।

খুব খারাপ লাগছে কিন্তু। ভয় কবে। জব-টব হয়ে
পড়লে একা একা কি যে করব।

ভয় কি।

শুক্রা আজ বোর্ডিংয়ে চলে গেল কিনা!—মালিকা
স্ববদৃষ্টিতে হীবককে ঘিরে রইল।

বোর্ডিংয়ে! কেন?

কি করে বলব। আমাকে তো কিছু বলে নি। ওব
দাদার কাছে কি বলেছে সেই জানে।

বোর্ডিংয়ে আজ থাকবে?

আজ নয়, বরাবর থাকতে গেছে।

হীবক নীরব শূন্যদৃষ্টিতে মালিকার দিকে তাকিয়ে রইল
শেষে সজাগ হয়ে মালিকার দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে লাগল।

মালিকা বলল, কেমন খালি খালি লাগছে। অবশ্য
ওব পক্ষে সুবিধেই হল। স্কুলেব কাছেই বোর্ডিং, কোন
ঝামেলাই বইল না। কিন্তু বাড়িটা কেমন খালি খালি
হয়ে গেল। দুজনে ছিলাম—

একটু থেমে মালিকা বলে উঠল, ওই দেখ, তোমার
একটু চায়ের কথাও বলা হয় নি।—উঠে বসল মালিকা।

না না, আপনি শুয়েই থাকুন না। চায়ের দবকার
নেই আমার।

মালিকা মুখ ফিরিয়ে হাসির রেখাটা গোপন করে
আবাব চাইল হীরকের দিকে। বলল, হ্যাঁ, শোব।
বংশীকে বলে দিচ্ছি।

বংশীকে ডেকে চায়ের কথা বলে আবাব শুয়ে পড়ল
মালিকা।

লজ্জার ভাবে হুয়ে পড়ল হীবক। শাণিত অবস্থায়
সে পছন্দ করে বেশী মালিকা জানে।

এর পরে?

কিন্তু মাথা তুলে নিজেরও অজ্ঞাতমারে হীরক বলে
উঠল, শুক্রা হঠাৎ বোর্ডিংয়ে চলে গেল কেন!

কি জানি।—মালিকা মুখখানা একবার ঘুরিয়ে আবাব
ফিবে তাকাল। নিজে রোজগাব করে নিজের মর্জিমত
চলতেও পাবে। সবই মানায়। দেখি, বংশী কি
করছে।—বলতে বলতে উঠে পড়ল মালিকা।

সুইচটা যে কেটে গেছে হীরক বুঝতে পারল।

* * *

পরের দিন—

মা তো বাড়িতে নেই বাবু!

কোথায় গেছেন?—হীবক চঞ্চল হয়ে উঠল।

কোথায় বেড়াতে গেছেন।—বংশী বুদ্ধি করে বলল।

কেউ সঙ্গে আছে?

না।

একা গেছেন?—অনেকটা আশঙ্কিত হল হীরক। কিন্তু
একা তো যান না কোনদিন? স্বগত উজ্জ্বল প্রশ্ন
হয়ে পড়ল: কোথায় গেলেন? না, তুমি তো জানই
না। আচ্ছা—

চাকল্য গোপন কবতে পারছিল না হীরক। বারকয়েক
পায়চারি করল। হঠাৎ থেমে বংশীকে বলল, আমাকে
কিছু বলতে বলে যান নি তো?

কিছুই বলেন নি।—বংশী ভদ্রতা করে বলল, চা করে
দেব বাবু?

না না, কিছু কবতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

প্রায় টলছিল হীরক। মূর্থ। ঠিক হয়েছে। জড়-
ভরত। জড়-ভবতকে ঘৃণা করে মেয়েরা, ভালবাসে না।
ঠিক হয়েছে।

ঠাকুরপো—

গেটেব কাছে চমকে ফিবে দাঁড়াল হীরক। মালিকা
শুক্রার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। অসজ্জিত।

প্রথম ধাক্কা ছুটে গেল হীরক। ছোট ছেলেব
হারিয়ে-পাওয়া জিনিসের দিকে যাওয়াব মত। তীব্র
আনন্দে, দুঃখে।

মালিকাব মুখ ভীত এবং উজ্জল হয়ে উঠল। শবীরটা
যেন শক্ত হয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল।

কিন্তু কাছাকাছি আসতেই হীরকের গতি স্লথ হয়ে
গেল : বংশী যে বলল আপনি বেরিয়ে গেছেন—

বংশী অপ্রস্তুত হাসির সঙ্গে বলল, আমি ফিরে এসে
দেখি ঘরে তালা। ভাবলাম—

মালিকা চাপা হাশ্বে টলমল করছিল। বলল, বেবোব
মনে করেছিলাম। এ ঘরে এসে একটা বই দেখতে দেখতে
ভুলেই গেছি। চল, ও ঘরে বসি।

হীরক বলল, বেরবেন না ?

নাঃ, আব যাব না।

হীরক মালিকার ঘবে ঢুকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা
করল, কোথায় যাবেন বলে বেরুছিলেন বউদি ?

কোথাও নয় ঠাকুরপো।—হেসে মালিকা একটু আর্দ্র-
স্ববে বলল, আমাদের এখানেই একটা বাড়িতে যাব মনে
করেছিলাম।—মিথ্যাটুকু ঢোক গিলে পার হয়ে গেল :
তুমি এলে না, কোথায় যাব আব।

এইটুকুতেই হীরক ভবে উঠল যেন। খুশী মুখে, আড্ডা
দেহে, লজ্জিত চাউনির মধ্যে কোনখানেই আর কোন
তাড়নার চিহ্নমাত্র নেই মালিকাব মনে হল।

কাল ঠিক চারটেব সময় আসা চাই।—যাওয়ার সময়
হীরককে বলে দিল মালিকা, আমি তৈরি হয়ে থাকব।
নিশ্চয়ই।

* * *

চারটে বাজতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। রাস্তায়
বংশীর সঙ্গে দেখা হল। হীরক বলল, কি বংশী, কোথায়
যাচ্ছ ?

বংশী বলল, এ বেলা আমার ছুটি দিয়েছেন মা।

ওঃ, বউদি আছেন তো ?

আছেন।

হীরক এসে ঘরে ঢুকল। দু পা অগ্রসর হয়েই থেমে
গেল স্থাপুর মত।

অসম্ভূত বেশে আলমাবিব সামনে দাঁড়িয়ে মালিকা
ব্লাউজ হাতে নিয়ে পছন্দ করছিল। হীরকের পায়ের
শব্দে যেন চমকে ঘুরে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্তে উভয়ে
পরস্পরের চোখে চোখে অচল হয়ে রইল। পরক্ষণে
মালিকা ছোট একটা চাপা চিংকাবের সঙ্গে দু হাতে
মুখখানা ঢেকে ছুটে পাশেব ঘবে ঢুকে গেল।

হীরক বাবকয়েক কঁপে উঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর
হতে লাগল।

মালিকা জামা হাতে করে চূপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।
মুখখানা লজ্জা ভয় ও কৌতূকের হাসির আভাসে আরক্ত।
হীরকেব জুতোব শব্দের তালে তালে হলে হলে উঠছিল।

দরজার সামনে এসে শব্দটা থেমে গেল একবার।
মালিকারও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

পরক্ষণে আবার শুরু হল শব্দ। মালিকার সামনে
এসে দাঁড়াল হীরক। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে
বইল হীরকের জলন্ত মবণ-চঞ্চল দৃষ্টিব দিকে।

সহসা নতজান্ন হয়ে হীরকের পায়েব কাছে বসে পড়ল
মালিকা। চাপা আর্তিস্ববে বলল, ক্ষমা কব, ক্ষমা কর।
আমি-ভুল করেছি। যে শাস্তি হয় পরে দিও, এখন যাও
তুমি। যাও, পালাও।

বিদ্রোহবেগে সরে গিয়ে আলনা থেকে একখানা শাড়ি
তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে আবার হীরকেব সামনে এল
মালিকা। সভয়ে দুই হাতে হীরকের কাঁধ ধবে ঝাঁকানি
দিল, ঠাকুরপো, যাও, এখন যাও ঠাকুরপো।

সমস্ত দেহটা হীরকেব আঙুনে-পোডা একখণ্ড লোহার
মত বাঁকা হয়ে নিঃশব্দে জলছিল। উত্তপ্ত স্নায়ুগুলো সব
উত্তত হয়ে স্তব্ধ হয়ে ছিল।

মালিকা পবমুহূর্তে হীরকেব হাত ধবে টেনে নিয়ে
গেল। বড় ঘবেব দরজার সামনে এসে থেমে মুহূ স্ববে
বলল, সব দোষ আমার। তোমাকে কষ্ট দিলাম। ক্ষমা
কব আমন্দক। এখন যাও।

হীরক মাতালের মত টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

নয়

সকালবেলায় অবসাদেব বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে বসে আছে হীরক। ঝড়েব নদীতে নৌকাডুবিব শবে বালুর চবে পড়ে থাকাব স্বাদ পাচ্ছিল। জীবনেব স্রোত চাবদিকে কলকল করে বয়ে যাচ্ছে। হীরক নিলিপ্ত দর্শক। চোখ বুজে দেখছে শুধু।

শান্তি। এই তো শান্তি! সুন্দর।

শান্তি? সুন্দর? হীরক তীব্র বেদনায় সোজা হয়ে বসল হঠাৎ। তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপায়ক হাসিব বেধায় মুখখানা বঁকা করে আবার এলিয়ে দিল দেহটা। একটা অব্যক্ত নালিশ কান্নাব মত গুমবে উঠতে লাগল। অত্মায়, অত্যন্ত অত্মায়।

কাব অত্মায়? হীরকেব যুক্তি মাথা তুলল। শুভোদাব অত্মায়? তিনিই সবচেয়ে বড় বাধা, এই তো। জ্রুহ হীরক নিজেব ওপব যেন চাবুক কষতে লাগল। কুকুর।

কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয়েছে মালিকার অংশ। হীরকেব মনে পড়ে গেল দৃশ্যটা। সুন্দর করেছে।

সুন্দর। শব্দটাকে ভেংচিষে নিল হীরক।

নন্দলালের সঙ্গে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক প্রবেশ করল।

কি, সরষের তেল আর এক চালান ধবা পড়েছে নাকি।—হীরক কঠিন স্বরে বলেই পরক্ষণে একটু হেসে সামলে নিতে ভুলল না: ওটা'ব বিপোর্ট কবে দেবে খবব নিলেন কিছু?

খবব নিষেছি, দেবে শীগগিবই।—নন্দলাল অর্থপূর্ণ হাসিব সঙ্গে বলল, কিন্তু এঁকে নিষে এসেছি আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবাব জন্তে। ইনি জয়গোপালবাবু—

বেশ তো, সুখের বিষয়।—হীরক মাঝখানেই বলে উঠল: কিসের ব্যবসা আপনার? কাপডেব?

জয়গোপাল অবাক হয়ে ঘাড় নাড়ল।

নন্দলাল বলল, জানেন বুঝি? আচ্ছা, আপনি আলাপ করুন জয়গোপালবাবু। আমি উঠি—একটু কাজ আছে বলেছি তো আপনাকে।

নন্দলাল চলে গেল।

কোথায় দোকান আপনার? কি ব্যাপার বলুন তো। আমি ভাবছিলাম যে এর পবেই কাপড হবে।

কি বকম?—জয়গোপাল হাসিমুখেই বলল।

হীরক সচেতন হল: না, কিছু না। আপনি বলুন।

জয়গোপাল বলল, দোকান নেই আমার। দালালি করি।

হীরকের আগ্রহ যেন বেশী হল: খুব ভাল কথা। তাবপবে?

জয়গোপাল মুহূর্তের জন্তে সন্দিক্তভাবে তাকাল। একটু বিলম্ব কবল জবাব দিতে।

হীরক অধীব কণ্ঠে বলে উঠল, বলুন, তাবপর? চুরি কবেছেন কাপড?

জয়গোপাল হতবুদ্ধির মত বলে উঠল, কি বলছেন?

চোরাকারবার কবেছেন তো? না, ঠ্যাঙে জড়িয়ে স্মাগল কবেছেন? না কি গরুর চামড়া বলে বাইবে চালান দিষেছেন? কি কবেছেন, বলুন?

এক নিঃশ্বাসে বলে গেল হীরক। ফাঁক দিল না। অস্বাভাবিক চোখ দুটো যেন সামনে জয়গোপালকে দেখছিল না, দেখছিল তাঁর বিমূর্ত স্বরূপ আর স্বজাতিকে সমগ্রভাবে।

মাঝখানেই উঠে দাঁড়িয়েছিল জয়গোপাল। বিস্ময়বিত দৃষ্টিতে হাঁ কবে তাকিয়ে ছিল। হীরক থামলেও কিছুক্ষণ কিছু বলতে পাবল না।

কত টাকা কামিষেছেন?—হীরক আব এক পবদা চড়িয়ে আবস্ত করল আবাব: টাকার জন্তে আব কি কি কবতে পারেন?

নন্দলালের কাছে তাব জবাব দেব। আপনার হয়েছি কি? মাথার জু বুঝি সবগুলো গেছে?—মাঝখানে কথাগুলো গুঁজে দিল জয়গোপাল।

হীরক বলে যাচ্ছিল, চুবি? তা তো পারেন। ডাকাতি? তাও পাবেন। বিষ্ঠা খেতে পাবেন?

জয়গোপাল বেবিষে রাস্তায় পড়লে থামল হীরক। থেমে হাঁপাতে লাগল। ক্রমে ক্লান্তিব সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এল। মাথাটা খালি হয়ে হালকা হবে গেছে মনে হল হীরকেব।

লবণাস্ত

মায়া বসু

আজ বুঝি দাদা সকাল সকাল বাড়ি ফিরবেন? সিনেমা
ঘাবে বলে সাজগোজ করছ বুঝি বউদি এত
তাড়াতাড়ি?

আর্ট ফুট সরু গলির ওপারে জীর্ণ পুবনো বাড়িটার
মুখোমুখি জানলা থেকে ভেসে এল অত্যন্ত নিরীহ গলার
মেয়েলী প্রশ্ন।

ভুরু দুটি কুঁচকে ঠিক তাব কেন্দ্রবিন্দুটিতে কুমকুমের
টিপটি বসাতে যাচ্ছিল জয়া অথও মনোযোগেব সঙ্গে।
অকস্মাৎ প্রশ্নকর্ত্রী প্রশ্নে চমকে উঠতেই হাতটা নড়ে
গেল। মনের মত স্বগোল না হয়ে টিপটা বেকে গেল
অন্ত দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বি-রি করে জলে উঠল সমস্ত শরীর।
আবার জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে বেহায়া মেয়েটা।
আবার সেই একাগ্র কোতুলী বুদ্ধিতেব দৃষ্টি নিয়ে
তাকিয়ে আছে জয়ার দিকে। জয়ার সাজ-পোশাক
প্রসাধন, জয়ার স্বথ ঐশ্বর্যেব দিকে। নাকি জয়ার স্বামী
অগাধ ভালবাসার দিকে।

কে জানে।

কিন্তু এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে কি বলা যায় ওকে?
মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওকে উদ্দেশ্য করে বাববার বলতে
ইচ্ছে হচ্ছে নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার। এতটুকু যদি
বুদ্ধি বিবেচনা থাকে।

তবুও সেটা মনের মধ্যেই চেপে রেখে মুখের উপকণ্ঠ
বিতৃষ্ণা বিরক্তির ছায়াটাকে সরিয়ে ফেলতে হয়।
মোলায়েম ভদ্রতার মুখোশটা জড়াতে হয় নিত্যদিনের
মত। তারপর তোয়ালে দিয়ে কপালের বাঁকা টিপটা ঘষে
তুলতে তুলতে জবাবও দিতে হয় এক সময় হাসি-হাসি
মুখ কবে।

হ্যাঁ ভাই, সিনেমার টিকিট কাটা হয়ে গেছে
কালকেই। তোমার দাদা সকাল সকাল অফিস থেকে
ফিরে এলে দুজনে একসঙ্গে যাব।

উৎসাহভরে প্রশ্নকর্ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করে, “মধুর
মিলন” বইটা বুঝি? সেই যে একটা বউ, বিনাদোষে
যার স্বামী তাকে ত্যাগ কবেছিল! অনেক দুঃখ কষ্টের
পর স্বামীর দেখা পেল।

এ তরফ থেকে সংক্ষিপ্ত উত্তর গেল, না এটা একটা

ইংরিজি বই। মেট্রোয় হচ্ছে। “মধুর মিলন” বুঝি খুব
ভাল হয়েছে?

খুউ-ব ভাল হয়েছে বউদি। বউটার হুংথে তুমি
চোখের জল সামলাতে পাববে না। আহা! সতীলক্ষ্মী
মেয়েটাকে সবাই মিলে কি কষ্টই না দিলে! তবে শেষে
ওর স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল।

তোয়ালেব ঘষটানিতে কপালের প্রশাধন উঠে
গিয়েছিল। সেটাকে মেক-আপ কবতে করতে উদাসীন
ভাবে জবাব দিল জয়া, আমার ভাই ওসব সেকেন্দ্রে
সতীলক্ষ্মীর হুংথ কষ্টেব বই আর পানপ্যানানি নাকে-কান্না
দেখতে ভাল লাগে না। তুমি দেখেছ বুঝি?

আমি? নাঃ। ও বাড়ির রেগুদির কাছে গল্প
শুনেছি কিনা। ওটা কি মাখছ বউদি? বেশ ফর্সা
দেখাচ্ছে কিন্তু তোমার মুখখানা।

আমি তো আর তোমাব মত ফর্সা আব সুন্দর নই
কমলা, তাই ফর্সা দেখাবাব জন্তে এই ফেস-ক্রীমটা মাখি।—
মুখ লাল করে বেশ তেতো গলায় জবাব দিল জয়া।

এবার সত্যি সত্যিই বোধ হয় লজ্জা পেল কমলা :
ও মা! আমি আবার সুন্দর নাকি! কি যে বল
বউদি।

জয়ার ব্যঙ্গভরা বাঁকা কথা বোঝবার মত বুদ্ধি কমলার
নেই : আমার চেয়ে ঢের সুন্দর দেখতে তুমি। তোমার
মত ফিগার কটা মেয়ের?

লোহাব গরাদ দেওয়া জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে
আছে কমলা। পাডাগাঁয়ের মেয়ে। লম্বা-চওড়া মতেজ
স্বাস্থ্যশ্রী ভরা দেহ। বিছাতের মত বাঁঝাল যৌবন
দুর্বার হয়ে উঠেছে ওব মোটা ময়লা ডুরে শাড়িটার
ভাঁজে ভাঁজে। বয়সে বোধ হয় জয়ার মতই হবে।
অথবো মলিন একমাথা ঘন কালো চুল কোনমতে টেনেটুনে
বাঁধা, তেলজবজবে সিঁথিতে বুড়ো গিন্নীর মতই এক চাবড়া
সিঁহুর। কপালের টিপটিও আকারে কম নয়। চিলেচালা
ছিটের ব্লাউজটা কোনমতে পবতে হয় বলেই যেন
পবা। সাজতে-গুজতে যে ও একেবারেই জানে না এটা
অতি সহজেই বোঝা যায়। সেই সঙ্গেই ওর দিকে
এক পলক তাকালে এটাও বেশ ভাল করে বোঝা যায়,
জয়ার মত ও যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ঘুরিয়ে রঙিন

শাড়ি পরে, প্রসাধন করে দাঁড়াই, জয়া কেন, কলকাতাব অনেক স্ত্রী মেয়েই ওর পাশে নিশ্চয় হয়ে যাবে।

কমলি, ও কমলি, গেলি কোথায়? আবার কোন ফাঁকে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল বুঝি কাজেব সময়? ধন্তি মেয়ে বাবা। এখনি সন্ধ্যা হবে। উঠনে আঁচটা দিয়ে যা বাছা।

কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল, উঠনে আঁচ দিতে খুঁড়িমা ডাকছেন, যাই বউদি।

এক ঝলক বিদ্যুতের মতই ঘুপচি ঘরটা আরও অন্ধকার করে কমলা ছুটে নীচে নেমে গেল।

আমকালচার্ড ইন্সটিটুট কোথাকার।—এবার আবশির প্রতিবিশটিকে ভাল কবে নিরীক্ষণ করতে করতে স্বচ্ছন্দে মুখ খুলল জয়া, একটা কথা কইতেও শেখে নি কারু সঙ্গ। মুখের মরণ আব কি। দিনরাত ইঁ করে কী যে দেখে। ইঁদা বোকা গৈয়ো মেয়েটার কি একটু লজ্জা-সরমও নেই ছাই।

প্রথমদিন স্বপ্নানও ঠিক এই কথাটাই বলেছিল। শুধু প্রথম দিন নয়, তাব পবেও বলেছে বহুদিন—বহুবাব। বেশ কিছুটা বিরক্তির সঙ্গেই।

যাই বল বাপু, মেয়েটা একেবারে ইঁদা বোকা। বুদ্ধিস্বিক্তি তো নেইই, একটু লজ্জা-সরমও নেই।

তোমারই বড় ও জিনিসটা আছে কি না!

স্বামীকে কটাক্ষ করে জয়া মুচকে হেসে বলেছিল, তুমি জানলা খুলে রেখে বেহায়াপনা করতে পার, অল্প কেউ দেখলেই বুঝি দোষ?

ফাঁসি যাবাব মত অত্যাশ্চর্য কাজ কিছু করি নি নিজের ঘরের মধ্যে, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে। বোকার মত খোলা জানলাটা ওই-ই ভেজিয়ে দিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেয়ে দেখলেই পাবত। তা না, খুব বন্ধ জুটিয়েছ বাবা তুমি, সর্বদা যেন পাহারা দিচ্ছে আমাদের। আজকাল তো ওর ভয়ে সব ছেড়ে দিয়েছি। দেখতে পাও না বুঝি?

ঘরেব চাবদিকে বিশৃঙ্খলা। বেডিং, বাস, চেয়ার টেবিল, অল্প-সব জিনিসপত্র ছড়াছড়ি এখানে ওখানে। তক্তাপোশটা মাঝখানে রেখে নীচে নেমে গেছে মুটেরা। তাবই ওপব দুজনে বসে। গস্তীর মুখে। আলোচনাব কেন্দ্রস্থলটি একটু আগেই হাঁকডাক শুনে নীচে নেমে গেছে—আট ফুট দূরব খোলা জানলাটা ছেড়ে।

মালপত্র আগেই এসেছে। ওবা দুজনে এসেছে খানিকক্ষণ। কিছু ভারী জিনিসপত্রও নেই ওদেব সঙ্গে। ইচ্ছে করলে কখন ঘবদোব সাজানো গোছানো হয়ে যেত।

কিন্তু তা হয় নি। ইচ্ছে করেই হয় নি। এবং যা হচ্ছিল এতক্ষণ ধবে, সেটা যে সামনের বাড়ির মুখোমুখি

অন্ধকার ঘুপচি ঘরটার জানলায় দাঁড়িয়ে জয়ারই বয়সী একটি যুবতী মেয়ে, যার মাথায সিঁদুর আছে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ইঁ করে গিলে খাবার মত দেখবে, এতটুকু আড়ালে সরে না গিয়ে, চোখেব পাতা না ফেলে—এ কথা সত্যিই ওরা ঘুণাক্ষবেও বুঝতে পারে নি।

বুঝতে পারবেই বা কি কবে?

সে হুঁশটুকু কি আর ছিল দুজনেব একজনেবও? না জানা ছিল?

নিজেরাই সব কিছু ভুলে নিজের নিয়ে মশগুল হয়ে পড়েছিল—চোখ কান খোলা রাখবার বোধটুকু হাবিয়ে। পৃথিবীতে ওরা দুটি প্রাণী ছাড়া আর কি কেউ কোথাও ছিল, না, থাকে এই সময়টায়?

এমনই এক একটা বহু প্রত্যাশিত, আকাঙ্ক্ষিত সময় আসে বইকি মানুষের জীবনে।

এতকাল ধরে উর্ধ্বমুখী চাতকের নীল আকাশে মেঘ ধোঁজাব মত, আকর্ষণ তৃষ্ণা নিয়ে থর মরুভূমিতে ওয়েসিস ধোঁজার মত, পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা দুজনে একথানা খোলামেলা বড় ঘরের জন্তে। কলকাতা শহরের বড় রাস্তা থেকে শেষ পর্যন্ত অলিগলি মধ্য। হাতে স্বর্গ পাবার মত সেই মনেব মত ঘবখানা পেয়ে যদি ওরা একটু উচ্ছল-চঞ্চল বেসামাল হয়েই পড়ে থাকে প্রথম দিনটায় তবে ওদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় কি?

এক-আধ বছর নয়। পুরো পাঁচ পাঁচটা বছর দুজনেব দেখাসাক্ষাৎ সব কিছুই ঘবের বাইরে। ঘণ্টা দুয়েকেব জন্তে সিনেমায বা পার্কে ময়দানে রেন্টুবেটে, ক্রীমে বাসে পাশাপাশি বসবাব জায়গা জুটলেও তাতে কি মন ভরে? জোয়ার যখন আসে, তখন নদী কি কুল ছাপাতেই চায় না? একজনের হৃদয় যখন উৎকর্ষ ব্যাকুল হয়ে রয়েছে আর একটি হৃদয়ের জন্তে? একটি দেহ আব একটি দেহের স্পর্শের জন্তে!

ঘর মিলতেই সব বাধা দূর হয়ে গেল। রেজিস্ট্রি খাতায় নাম লিখে স্বামী স্ত্রী শুভদিন দেখেই গৃহপ্রবেশ করল।

ঘরে ঢুকেই জয়া উল্লাসে আনন্দে যেন নেচে-উঠল।

দেখা ঘরখানা যেন নতুন দেখছে, খুলীতে উথলে উঠল। কী স্তন্দর। কত বড় ঘরখানা, না? বারান্দার কোণের ওই রামাঘরটাও বেশ কিন্তু। দক্ষিণ দিকে দু-দুটো জানলা এ ঘরে, দেখেছ? মোটা পর্দাফর্দা দেব না বাপু, হাওয়া আটকাবে, ঘর অন্ধকার হবে, কি বল?

হঁ।

যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, সে তখন খালি ঘব পেয়ে পিছন দিক থেকে জয়ার দু কঁধের উপর হাত দিয়ে তার মুখখানা ফেবাবার চেষ্টা করছে নিজের দিকে। জয়ার কোন কথার উত্তর না দিয়ে ব্যস্তভাবে নিজের কাজ করতে সংক্ষিপ্ত ভাবে তার কথায় সায় দিল—হঁ।

সরে যাও। কী হচ্ছে? গলায় রীতিমত অসন্তোষের স্বর ফুটলেও জয়ার ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতই দেখা গেল।

শোন, ড্রেসিং টেবিলটা কিন্তু এই জানলার পাশেই থাকবে, বুঝলে?

হঁ।—জয়ার এলো খোঁপাটা খুলে দিয়ে তাব চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে, স্বপ্নের আশ্রাণ নিতে নিতে স্বধীন উত্তর দিল।

তোমার রাইটিং-টেবিল আর চেয়ারটা ওই কোণটায় থাকবে। ওদিকে জানলা নেই, ভালই হবে। রাস্তা দিয়ে যত সব মেয়েগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে অফিসের কাজই হবে না।—হাতখানা বাড়িয়ে জয়া দেখিয়ে দিল জায়গাটা।

ওর প্রসারিত হাতখানা নিজের গলায় জড়িয়ে স্বধীন উত্তর দিল, হঁ।

জলের কুঁজোটা ওই নর্দমার কাছে রাখব, কেমন?

ওকে আর একটু নিজের দিকে আকর্ষণ করে স্বধীন বলল, হঁ।

তবে ছাড়। কাজে লাগি। জিনিসগুলো গোছাই।

উহঁ।—এতক্ষণ বাদে জয়ার কথায় আপত্তি জানাল স্বধীন: ওসব গোছগাছ এখন পড়ে থাক। তক্তাপোশটা দুজনে বরং ধরাধরি করে ওই দেয়াল ঘেঁষে পেতে বিছানাটা করে ফেলা যাক আগে।

জা কুঞ্চিত হল জয়ার: সব কাজ পড়ে রইল, আগে বিছানা?

বাধা দিল স্বধীন: আহা, কবতে তো সবই হবে। আগে বিছানাটা কবলে, সব কাজ শেষ হলে খেতে খুঁটে টাযার্ড হয়ে এসে চট করে শুয়ে পড়া যাবে।

তা না হয় হল, কিন্তু ও দেয়াল ঘেঁষে নয়। মাথার শিয়রে জানলা খোলা থাকবে, না না তাব চেয়ে বরং এদিকেই পাতা হোক।

উহঁ।—ঘাড় নাড়ল স্বধীন: ওদিকে হাওয়া আসবে না। আমার ঘুম হবে না। তক্তাপোশ এদিকেই পাতা হবে।

বেশ, তবে তোমাব কথাই থাক।—স্বামীর কাছ থেকে বেশ একটু দূরে সরে বসল জয়া: ওদিকেই বিছানা হোক। তুমি একলাই শোবে। আমি নয়।

তুমি বুঝি ছাতে শোবে?—সকৌতুক প্রশ্ন স্বধীনের।

ছাত কেন? ঘরে কি আর জায়গা নেই? ওই কোণে মেঝেয় একটা মাদুব বিছিয়ে আলাদা শোব।

তাই বুঝি? শুয়েই দেখ না। আমি এমনি করে তোমাকে তুলে নিয়ে আসব।

টপ করে জয়াকে দুহাতে তুলে নিতেই জয়া খিলখিল করে হেসে উঠল। দু হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

এতক্ষণে নজরেও পড়ে নি পৃথিবীতে ওরা ছাড়া আরও মানুষ আছে।

সামনের বাড়ির ঘুপচি ঘবটার ছোট্ট জানলাটা খোলাই ছিল। আর সেই খোলা জানলার সামনে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে জয়াব মতই আর একটি মেয়ে। ছায়ামূর্তিব মত। লোহাব গরাদ চেপে ধবা ওর হাতের মুঠোটা শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে সিকগুলোর উপর। সুউন্নত বুক চেপে ধরেছে প্রাণপণে গবাদেব গায়ে। দু চোখে স্কুদিত কোতুহল। কোতুক বিষয় আবও অনেক কিছুব বিচিত্র সংমিশ্রণে, কী এক অস্বাভাবিক ছাতিতে, প্রথব হয়ে উঠেছে ওব দৃষ্টি।

ছিটকে দুজনে দু দিকে সরে গেল।

স্বধীন একেবারে ঘরের বাইরে। আব জয়া বিব্রত আবস্ত মুখে মেয়েটির চোখেব আড়ালে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে কাপড়-জামা ঠিক করতে লাগল।

নডল না, চডল না, সরেও গেল না মেয়েটা জায়গা ছেড়ে। বিন্দুমাত্র বৈলক্ষ্য দেখা গেল না মেয়েটার। এই অগ্ন্যয় অশোভন কোতুহলে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, জয়া আবার গম্ভীর মুখে এদিকে আসতেই যেন কিছুই হয় নি, এমন ভাবে প্রশ্ন কবল, আপনারা বুঝি আজই এলেন?

আরক্ত মুখে জয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ। একটু আগে।

উনি বুঝি আপনার স্বামী?

এই অভূত বোকার মত প্রশ্নে ঘুনে মনে চটে উঠল জয়া। অচা মেয়ে হলে তখনই লজ্জায় মুখ লুকোত। কিন্তু তুমি দেখছি একেবারে দু কান কাটা বেহায়া। মাথায কপালে একগাদা মিঁছুরও তো চাবড়ান রয়েছে দেখছি। এত কাণ্ডকারখানাব পর উনি আমার কে তাও আবার মুখ ফুটে বলে দিতে হবে নাকি! উনি আমার স্বামী হবেন কেন, উনি আমার—

মনের কথা মনেই রইল। কি একটা উত্তর দেবার আগেই নীচে থেকে চিংকার ভেসে এল, কমলি, ও কমলি, রাজ্যের কাজ পড়ে আছে, সাত-সকালে মণিকোঠায় গিয়ে ঢুকেছিস বাছা? কুটনোগুলো কুটেবে কে শুনি?

কমলি নীচে ছুটল ব্যস্ত হয়ে। জয়া যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এতক্ষণ পরে স্বধীনও ঘবে ঢুকল: দোহাই তোমার জয়া, জানলাটা বন্ধ কর। কি নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েটা, আশ্চর্য।

তুমিই বা কি কম?—বাক্যব' দিল জয়া, জানলা খোলাই থাকবে। তাতে যদি তোমার একটু আক্কেল হয়।

তেমন হচ্ছে না থাকলেও কদিন যেতে না যেতেই

ও-তরফেব নিদারুণ আগ্রহে আলাপ জমে উঠল। সংসারের অটেল কাজেব ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলেই কমলা ছুটে ছুটে এসে জানলায় দাঁড়ায় : বউদি, ও বউদি, কি করছ ?

বাধ্য হয়েই জয়াকে সাড়া দিতে হয় এই গায়ে-পড়া ডাকের। হাসিমুখে দুটো কথাও কইতে হয় নবলক প্রতিবেশিনীর সঙ্গে।

কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টিকটু লাগে যখন সুধীন ঘরে থাকে। তখনও কমলার দুর্বীর কোতুহল ওদেব স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে। এই গবমে কি করেই বা মানুষে জানলা বন্ধ করে থাকতে পারে!

আর পর্দা? সে তো আর অনড অটল নয়। সরু গলি দিয়ে দক্ষিণ দিকের সেটুকু হাওয়ার বলক আসে, পাতলা কাপড় সবে বা নড়ে বাবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট।

এ যেন এক মহা যন্ত্রণা! অথচ বলাও যায় না কিছু। সেদিন কমলা কথায় কথায় বলে ফেলল, কাল তোমরা অনেক রাত অবধি গল্প করছিলে, না বউদি? গরমে ঘুম আসছিল না, সব শুনতে পেয়েছি।

সব কেন, কোন কথাই পরিষ্কার শুনতে পাওয়ার কথা নয়। কেন না, গভীর রাতের প্রাণমধুর অস্ফুট প্রলাপ-গুলো গলি পেবিয়ে কমলার ঘরের ভিতর ওর কানে গিয়ে ঢুকবে, এমন জোরে ওরা কথা বলে নি। এটা নেহাতই ঠাট্টার কথা। তবু জন্মা আজ আর রাগ সামলাতে পারল না। হাসিমুখে অথচ বেশ বিজ্ঞপভরা গলাতেই জবাব দিল, তুমি ভাই এমন করে কথা বল যেন তোমার বিষেই হয় নি। আমার কাছে তো বরের কথা বললেই না এখনও। তবু বলি, নতুন বিয়ের পর তুমি বুঝি কোনদিন বরের কাছে শোও নি? রাত জেগে কথা বল নি?

এবার কমলার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, বিব্রতভাবে বলল, না না বউদি, এমনই জিজ্ঞেস করছিলাম।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ল জয়ার। বেশ কোতুহলেব সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ ভাই কমলা, আমি তো অ্যাদিন এখানে এসেছি, তোমার বর তো এর মধ্যে একদিনও আসে নি? কি ব্যাপার বল তো?

ম্লান মুখে বেশ খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে কমলা জবাব দিল, আমার বর আসে না বউদি।

জয়া আশ্চর্য হল : আসে না! আসে না কেন?

এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে কমলা বলল, ঝগড়া হয়েছিল কিনা, ভাই। সে অনেক কথা বউদি, বলা যাবে না এখন। দুপুর বেলা সবাই ঘুমলে তোমায বলব। কেমন?

কমলার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে সত্যি সত্যিই জয়ার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সমবেদনায় ব্যথিত হয়ে উঠল।

জজ পাড়ারগী আমতলার গরীব গেরস্ত ঘরের মেয়ে

কমলা। বড় দুটি বোনকে পাব করেই বাবা ফতুর। তৃতীয়া কমলার বিষে দিতে ভাই বেশ দেবিই হয়ে গিয়েছিল। আবও দুটি নাবালক ভাই আছে। দেখতে শুনতে ভাল বলে কমলাব বাবার খুড়তুতো ভাই, এখন ও ষাঁর কাছে আছে, বিয়ের সম্বন্ধ কবেছিলেন ওর বাবার ধবধরিতে। বড়বাজাবে মাদোয়ারীর দোকানে কাজ কবে ওর বব। অবস্থাও মন্দ নয়। বিষের আগে দেমাপাওনা গয়নাগাটি শাশুড়ী যা চেয়েছিলেন, সব কিছু দিতে রাজী হয়েও সেসব কিছুই দিতে পারেন নি বাবা। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটি গুণগোল। বিষে হয়ে গেলে দিনকতক পর শাশুড়ী দেওরকে দিয়ে কমলাকে বাপেব বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কডায় গুণায় বিষের জিনিসপত্র না দিতে পারলে ওকে আর নিয়ে যাবেন না তাঁবা, স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। অনেক চেষ্টা করে, চিঠি লিখে বার্থ হয়ে অগত্যা মা বাবা কমলাকে কলকাতায় কাকার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাকা মিটমিট কববেন এই ভবমায। কিন্তু কমলা এতদিন এসেছে, ওঁদের ভাব দেখলে মনে হয় ওঁবা ভুলেই গেছেন-সে কথা। কমলা তো আর মুখ ফুটে বলতে পারে না কোন কথা।

জয়া হুঃখিত হল : বরকে চিঠি লেখ নি কেন?

আমি তো ভাল করে লিখতে পারি না বউদি। তবু লিখেছিলাম। উত্তর দেয নি।

কি লিখেছিলে?

কি আবার লিখব। বাবা গরীব মানুষ। অল্পগ্রহ করে অপরাধ ক্ষমা করবেন এই সব।

পোড়া কপাল আমাব!—হতাশভাবে কপাল চাপডাল জয়া। স্বামীর কাছে নাকি ওভাবে চিঠি লেখে?

বড় বড় দুটি সরল বিশ্বাস-ভবা চোখ তুলে তাকাল কমলা জয়ার দিকে : আমি কি তোমায মত লেখাপড়া জানি বৌদি? লজ্জা করে না বুঝি আমার?

তং দেখে আর বাঁচি না! পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ! লজ্জা! লজ্জার মাথা তো খেয়ে বসে আছ। তোমার বর না আসা অবধি আমারও যে প্রাণ ষায যায়।

মনের ভাব মনে চেপে জয়া মুখে বলল, আচ্ছা, শোন। তোমার বরকে আমি এনে দেব। আমি যা যা বলে দেব, তাই লিখবে। দেখবে, মাত্র একখানা চিঠিতেই তোমার বর ছুটে আসবে।

আনন্দে ঝলমল কবে উঠল কমলার মুখ : আসবে!

আসবে না আবার! তোমায তো বিষে করা বর, ওর সঙ্গে বিয়ের আগে দারুণ ঝগড়া হত আমার। একবার সাতদিন দেখা নেই, কথা নেই, কি যন্ত্রণা! শেষকালে এমন একখানা চিঠি ছাডলাম, আসতে পথ পায় না। আর যেই কাছে এল, অমনি আমি কথা বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলাম।

হাঁ করে ওর কথাগুলো গিলছিল যেন কমলা : এ তোমার ভারী অত্যাচার বোদি। মাহুষটাকে ডেকে এমন কবে শাস্তি দেওয়া।

খিল খিল কবে হেসে উঠল জয়া : শাস্তি বলে শাস্তি। পায়ে ধরতে পথ পায় না শেষকালে। থাক গে ও সব কথা। তুমি বুঝবে না, নিপাট ভাল মেয়ে। বর যদি আসে, আমাকে খাওয়াতে হবে কিন্তু।

খাওয়াব। নিশ্চয় সন্দেশ খাওয়াব বউদি।

আর একটা কথা। এতদিন আমার জানলার উকি মেবেছ, সেদিন কিন্তু তোমাব ঘরের জানলা বন্ধ করলে চলবে না। বর দেখতে দিতে হবে।

লজ্জায় সঙ্কোচে কোনমতে কমলা উত্তর দিল, তুমি যা বলবে, আমি তাই কবব বউদি।

সেদিন সন্ধান ঘবে ঢুকতেই জয়া ভুরু কৌচকালো : ঘড়ির দিকে তাকাও। এক ঘণ্টাব ওপর লেট।

কি করব বল ? ঘরের বউ আমল দেয় না। বন্ধুর বউ আটকে রাখল।

শুধু এক ঘণ্টা কেন ? সমস্ত বাত থাকলেই তো পারতে। এলে কেন বাড়িতে ?—চোখ পাকালো জয়া।

হিংস্রটে মেয়ে কোথাকার।—সার্ট খুলতে খুলতে হানিমুখে জবাব দিল সন্ধান।

তা তুমি যাই বল বাপু, তোমার মত কম বয়সের জোয়ান সন্ধানর বর বাড়ি না ফেবা পর্যন্ত আমার শাস্তি নেই।

সন্ধানর কম বয়সের বরকে যদি বিশ্বাস না হয় তবে অতীন অজয় স্তম্ভ ওদেব কাউকে বিয়ে করলেই তো পারতে। তোমার পেছনে ওরা কি কম ঘুর-ঘুর কবত ? নজর তো ছিল এই অধমেব ওপবই।

নজর কি আমার একা ছিল মশাই ? কে জানে, এখনও তাদের মধ্যে কেউ নজবে নজবে রেখেছে কি না।

নাকে দড়ি দিয়ে পাঁচ বছর ঘুরিয়ে আঁচলে গেবো দিয়েও কি তোমার ভয় গেল না ?

ভয় বলে ভয়, মহা ভয়। ওঃ, ভাল কথা মনে পড়েছে। শোন শোন, কমলার বব আসছে।

তাই নাকি। বগড়া মিটমাট হয়ে গেছে ?

রেখে দাঁও তোমাব বগড়া। ওকে দিয়ে এমন একখানা চিঠি লিখিয়েছি, না এসে পারে ? জামাইঘণ্টার দিন কাকা কাকিমা ওর বরকে এখানে নেমস্তন্ন কবেছেন। তবুও বোধ হয় আসত না। তবে চিঠিখানা পেয়ে মনটা নরম হয়েছে। উত্তর দিয়েছে আসবে। দেখ, কমলার বর তোমার চেয়েও বোধ হয় ঢের সন্ধানর।

কি করে জানলে ? কমলা বলেছে বুঝি ?

ও আবার বলবে ? কোনদিনও খণ্ডরবাড়ী বরের কথা বলে না এমন চাপা মেয়ে।

তবে বুঝলে কি করে ?

মেয়েদের মনের কথা বুঝতে মেয়েদের দেরি হয় না গো, দেবি হয় না। দেখছি তো ওকে, ববেব জন্তে পাগল। ওর কথাবার্তায়, ভাবভঙ্গিতে আকুলি-বিকুলি দেখেই মনে হয় এ কথা। নাও চলো তো। খেতে খেতে সব বলছি। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নাও।

কাঁটা হাতে ছোট্ট খুপরিটাকে প্রাণপণে ঝেঁটিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে বাঁধছিল কমলা। জয়াব সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুচকে হাসল : কি করব ভাই, সব কাজ আমাকেই তো করতে হবে। রাগে এ ঘরেই বিছানা হবে কি না।

মনে মনে হাসল জয়া। ধন্য বর-পাগলা মেয়ে বটে ! যার জন্তে তুমি এমন পাগল হয়ে উঠেছ, না জানি তিনি কেমন রাজপুত্রুর। তোমার বর না দেখা অবধি আমারও দেখছি শাস্তি নেই।

মুখে বলল, আমাদেরও আজ নেমস্তন্ন আছে ভাই—বাপের বাড়ি। বাগ্রে ফিরে এগে তোমাব বর দেখব।

কমলা জিজ্ঞাসা করল, কখন যাবে তোমরা ?

সন্ধ্যাবেলা। উনি অফিস থেকে এলে তারপর।

একটু চুপ কবে, অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে কমলা বলল, একটা কথা বলব বউদি ?

বল না ভাই, লজ্জা কেন আমার কাছে ?

তুমি আজ আমায় একটু সাজিয়ে দেবে ? ওই যেমন করে তুমি সাজো ? তোমার কত কি জিনিসপত্র আছে। আমার তো ও সব কিছু নেই, তাই।

স্বচ্ছন্দে হেসে উঠল জয়া : ও মা ! এই কথা ? বেশ তো, বিকেলে গা ধুয়ে সময় করে চলে এসো এখানে। নীল রঙের শাড়ি আছে তোমার ?

আছে বউদি।

ওটা এনো। আব শোন, বাস্তা দিয়ে ফুলের মালা যায় প্রত্যেকদিন, আচ্ছা থাক, সে আমিই কিনে বাথবোখন।

বাপের বাড়ি থেকে নেমস্তন্ন খেয়ে গল্প করে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। জয়াব নির্দেশমত আলো না জেলে সাড়াশব্দ না করে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল সন্ধান। কাল সকালেই ওকে আবার অফিস ছুটতে হবে।

স্পন্দিত বক্ষে নিঃশব্দ পায়ে অন্ধকারে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল এবার জয়া।

প্রচণ্ড কৌতূহলে ও ছটকট কবছে অনেকক্ষণ ধরেই।

ঘরের মিটমিটে আলোটা জ্বলছে। সাময়িক ভাবে একটা পাতলা পর্দাও দেওয়া হয়েছে জানলাটায়। অবশ্য তাতে ঘরের ভিতরকার দৃশ্য দেখার কোন বাধাই হয় নি।

এক পলকের দৃষ্টিতেই বুঝি জয়ার ঠিক কমলার মতই অবস্থা হল। ঠিক যেমন হয়েছিল প্রথম দিন। এদেব প্রণয়লীলা দেখে কমলার।

লোহার গরাদের উপরে জযাব হাতেব মুঠোটা শক্ত হয়ে এটে বসল।

ও-ঘরটা ছাড়া ও-বাড়ি সব আলো নিভে গেছে। সব কোলাহল স্তিমিত। ও ঘরটাকে আজ আর যেন সেই ঘুপচি খুপরি বলে মনেই হচ্ছে না। সারা ঘরে মাষাময় পরিবেশ। মেঝেতে পাতা সাদা ধবধবে বিছানাটায় বিকেলবেলাকার কেনা ফুলের মালা আর অজস্র বেল-জুইফুল ছড়ানো। সে ফুলের গন্ধ বুঝি এখান থেকেই পাচ্ছে জযা। দক্ষিণ হাওষাব বলকের সঙ্গে সঙ্গে।

ফুলশয্যার মতই বিছানার উপরে শুয়ে আছে কমলার স্বামী। কালো হাড়-বাব-করা অস্থিচর্মসার চেহারা। কোটরগত হু চোখেব কোলে পুঞ্জীভূত কালিমা। দুটো উচু বালিশে মাথা রেখে ইঁ কবে নিঃশ্বাস টানছে। হাপবের মত ওঠা-নামা করছে সৰু বুকটা। প্রায় টাক-পড়া মাথাটার চারপাশের চুলগুলোয় সাদার ছোপ। পানদোস্তা-খাওয়া কালচে দাঁতগুলো চোঁটেব ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে বিসদৃশ ভাবে।

পাশেই বসে আছে কমলা। জযাব নিপুণ হাতে

সাজানো প্রতিমার মত। পরনে নীল রঙের শাড়ি, লাল ব্লাউজ। গলায় গোড়ের মালা, খোঁপায় বেলকুঁড়ির। এক বিষত সৰু পিঠেব সঙ্গে প্রায় এক হয়ে আসা স্বামীর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে না কি মালিশ কবে দিচ্ছে— এক মনে।

কি গো, বন্ধুর ফুলশয্যা দেখেই রাত কাটাবে নাকি? এস।

স্বামীর ঘুম-জড়িত আদরভবা আহ্বানে চমকে উঠল জযা। বিকেলে কমলার হাতে করে আনা সন্দেশের বাস্কাটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিল রাস্তার ওপবে। নিঃশব্দে জানলাটা বন্ধ কবে দিল।

ও কি, জানলা বন্ধ করলে কেন! হাওয়া আসবে না যে?—বিস্মিত স্বধীন প্রশ্ন কবল : থুলে দাঁও, ভয় নেই, আমি উকি মারব না।

আজ থাক।—বিছানার এক পাশে শুয়ে-পড়ল জযা।

হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানতে গিয়েই বাধা পেল স্বধীনঃ কি হয়েছে তোমাব, জযা?

আজ থাক।—প্রায় নিঃশব্দ গলায় জযা উত্তর দিল।

অত দূরে কেন? কাছে এস, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব। সরে এস জযা।

অন্ধকারে বালিশে মুখ গুঁজে অবরুদ্ধ কণ্ঠে জযা উত্তর দিল, না না, না। আজ থাক, আজ থাক।

ইন্দ্র

কৃতাস্তনাথ বাগচী

মৃত্যুবে কবেছি আমি নিত্য অস্বীকার
আলোব চূষন যবে নব তৃণাকুরে,
গভীর অন্তরে মোর উৎসুক রক্তাব
ছন্দে ছন্দে জীবনের নৃত্যের নূপুরে।
সে আনন্দ তুচ্ছ কবে পাষণ শাসন,
পলে পলে কণ্টকের দংশনের দাহ,
শ্মশানের বক্ষে পাতে তপের আসন
কূলে কূলে উচ্ছলিয়া পুষ্পের প্রবাহ।
এ বিশ্বভুবনে মোর দীপ্ত অধিকার
স্বরের হুর্জয় বলে, দুঃখের প্রসাদে,
যোর তরে চিবস্তন পূর্ণের ভাণ্ডার
রূপে, রসে, স্পর্শে, গন্ধে, শব্দ আর স্বাদে।
আমার আনন্দ মোবে করিয়াছে দান
প্রাণের অনন্ত বাজ্যে ইন্দের সম্মান।

সঙ্কেত

সুনীলকুমার লাহিড়ী

আবাব আকাশে শকুনিবা ডানা মেলেছে—

অমঙ্গলের অন্তত আভাস ফেলেছে—

আবাব কি তবে শুষ্ক হবে হানাহানি—

জীবনে মরণে রেযাবেষি কবে ক্ষণে ক্ষণে টানাটানি।

শ্মশান-শৃগাল লোভী চীৎকারে কাঁপায় দিক,

ভাকিনীরা চোখে জালিয়ে আগুন চেয়ে আছে অনিমিত্ত।

মধুর-শ্যামল জনপদ হবে ধূলায় লীন,

শিশুকণ্ঠের কলকল গীতিহীন।

দয়ামায়া প্রেম হাসি মমতার ছোঁষাচ লেশ—

রবে না—কঠিন নগ্ন উষব ধরার বেশ।

কল্পনাতে এ বীভৎস প্রেতলোক

দেখেই শিউরে বন্ধ করেছি চোখ—

ইতিহাস তব রঙ্গক্ষেত্রে এ নাট্য হোক লয়।

ফিরে এনো নাকো পুরনো যা কিছু কলঙ্ক, ক্ষতিক্ষয়।

মেঘমল্লার

সন্তোষকুমার অধিকারী

রাত্রির বেদনা নেই, দাহদীর্ণ দিনেব আলোয়
দিগন্তের ছায়া নামে, যেন এক শায়ল স্নিগ্ধতা
রূপ নিল মেঘমল্লের। ধুয়ে গেল বিক্ষত হৃদয়
সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ধূলিলিপ্ত স্নান অক্ষমতা
হঠাৎ সার্থক হয়ে খুঁজে পেল সেই স্বপটিকে—
প্রথম শৈশবে যাকে মনে মনে কবেছি বচনা।
হঠাৎ আবেগ এল মাটিতে আকাশে, দিকে দিকে
বৃষ্টি এল, তবু কেন আজও মোব ঈপ্সিত এল না।

এল না এল না, তাই মল্লারের হৃদয়েব মীড়ে
অবিশ্রান্ত বেদনাব বিচ্ছুরণে তারে খুঁজে যাই।
খুঁজে যাই পথে পথে মেঘে আব বাতাসের ভিড়ে,
জীবনে পাই না যাকে সেই মুগ্ধ আশায় হাবাই।
হারাই যে মন মোব সারাদিন থাকে অন্তবালে,
হঠাৎ বৃষ্টির রাতে বজ্রনীলগন্ধার ধূপ জালে।

অন্ত মন

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

এ মন তোমার নয়, অন্ত মন রয়েছে ওঠানো,
সাধারণ সর্বক্ষেপে সে-মন কি করে দেওয়া যায়।
অসামান্য মুহূর্তেব ঘড়ি-ঘণ্টা যেদিন বাজায়,
তোমার প্রতীক্ষা দিয়ে উৎসবের সেই লগ্ন আনো,
যখন সংলগ্ন হবে অন্ত মন আসক্তিব টানে—
তোমার মনের সঙ্গে, সব বাধা করে অতিক্রম,
যখন সার্থক হবে তিতিক্ষার তপস্কার শ্রম,
যখন রাত্রির ঘুম ভেঙে যাবে প্রত্যাশের গানে।

এ মন তোমার নয়, অন্ত মন রয়েছে ওঠানো,
তোমাকে কি দেওয়া যায় শত অংশে খণ্ডিত হৃদয়।
জ্ঞানার্ণবে এস নাকো, অন্ধকাবে হাবাবার ভয়;
পেয়ে হারানোব দুঃখ আরও তীব্র, তাঁতো তুমি জানো।

নিশ্চিন্ত নির্জনে শুধু অখণ্ড সে-মন দিতে পারি,
যে-মন রয়েছে তোলা, এখনও হয় নি বারোয়ারি ॥

ফিরে আসা...

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

আবার ঢেকেছি দেহ, পবিচিত বিষয় খোঁসে,
নাশায় কুয়াশা-গন্ধ পরিমিত সেই পরিবেশ।
শান্ত-পায়ে ফিরে আসা বিকেলের ভিড ঠেলে ঠেলে
কত নেতা জন্ম নেয় তর্কতীর্থ পাড়াব হোটেল
সেলুনেতে উচ্ছ্বাসি সন্তোজাত বসিকতা নিয়ে।

নিশ্চিন্ত নির্ভব জাগে, বলি, আহা! এই বেশ, বেশ।
আমারই তো নাম গড়া লাখে লাখে তুচ্ছ কথা দিয়ে—
আমারই তো পরিচয়ে ভরা এই নগবীষ বুক।

লেজ নেড়ে ঘুরে যায় তিন পায়ে পাড়ার কুকুর—
দুই বাড়ি প্রতিযোগী, উচ্ছ্বাসে রেডিয়োব স্রব
কাঁপায় সকাল-সন্ধ্যা সব মিলে খাপের মতন—
ঢেকে বাথে মন।

ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ঘরে ফেরে রিক্ত পথিকেরা
জালায় মোমের আলো। ক্ষীণালোক-সুগন্ধ তমসায়
বিষয় বিশাল ছায়া ছায়া কাঁপে দেয়ালের গায়
এই ভাল এই ভাল দেয়ালের বাছ দিয়ে ঘেরা
নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলে যবে ফিরে ক্লান্ত পথিকেরা
এই বেশ, বেশ।

বহুবাব পড়া এই নগবীষ মলিন মলাটে
বিশ্ময় খুঁজি না আমি। অজানা আশ্চর্য পরিচয়।
রক্তরৌদ্রে উদ্ভাসিত কোনও দূব দিগন্ত বলয়
অভ্যন্ত আশ্বাস ভরে নির্জীব জীবন পথ হাঁটে
পরিচিত দিনরাত্রি টোকা দেয় প্রাণের কপাটে
ভালবাসি, ভালবাসি, এই কথা শুধু মনে হয়।

ভালবাসি বহুবাব দেখা এই পৃথিবীকে দেখা
এব মাঝে একাকার। এর বুকে আমি নই একা।
নানা মানুষ্যের স্বরে নিঃশেষে ঢেকে দেয় ক্ষত,
দ্বন্দ্ব বিলীন হয় সংশয় গত অপগত...
এ নগরী চেতনাকে ঘিবে থাকে ছুর্গের মত।

এতই গভীরে চেনা, অবাক নিবিড় পরিচয়
দু সারি দোকানে আলো কাছে এসে হেসে কথা কয়
নিজেকেই খুঁজে পাই চলমান মানুষ্যের ভিড়ে—
চঞ্চল বাসগুলো এলোমেলো ভাবনাব মত
এঁকেবেঁকে সবে যায়। আমাবই থাকার কথা নিয়ে
পথ চলে চলে যায়। পবিমিত আশ্বাস-ভরা
মনের নিকটে বড়, হয়তো শুধুই মনে-করা,
বেঁধে রাখে এ হৃদয় ছাতিহীন অজুহতি দিয়ে ॥

ছোট বাড়ি

বীরেন্দ্র মল্লিক

ছোট বাড়ি, ছোট ঘর,
ছোট ছাদ, সঙ্কীর্ণ জানালা,
ততোধিক আরো স্কীর্ণ শীর্ণ মেঠো পথ
বাহিরে যাবার,—
ছোট এক সীমিত পৃথিবী
ক্ষুদ্রতার।

এ-বিরাট আলোর আকাশ বাহিরের
মাঝে মাঝে ঢেউ তোলে
এবই এক ঘরে!

সহসা খুলেছে খিল,
বিস্ফারিত চোখে তাই বাহিরে তাকাই
সঙ্কীর্ণ আঙিনা দিয়ে তার,
এ মন ধরেছে রূপ
অকস্মাৎ কোনো এক পাখীর পাখার,
মেঘে মেঘে ছায়াপথে দিয়েছে সঁাতার,
বুঝেছি সূর্যের ভাষা, চন্দ্র আর লক্ষ তারকার।
'এ-জীবন বড় এক জীবনেব ছায়া',
এই সত্য মনে মনে কবেছি স্বীকার
বাব বার।

স্থান কিন্তু কোথা এর
এখানের এই ছোট ছাদের তলায়,
এই ছোট ঘরে?

এ হৃদয় ফাটিয়া চৌচির,
দেয়ালেতে মাথা খুঁড়ে মরি,
'আমাকে বাঁচাও' বলি
ডাক ছাড়ি করিয়াছি আর্ত চীৎকার,
বারে বারে ফিরে এসে প্রতিধ্বনি দিয়েছে যে
গুধুই ধিক্কার,
ভ্রমোৎসবের অন্ধরাত্রি উপহাস করে
বারবার।

তবু হায় ক্ষুদ্রতার এ-মৃত পৃথিবী
প্রাণহীন,
আপনার কক্ষপথে পথ হাঁটে নির্বিকার
রাত্রিদিন।

ওরা চলে গেলে

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

স্পর্ধিত হাসি আকাশ আলোবে রাঙায়
স্ববিরের এই কালো স্থপ্তিবে ভাঙায়
পাব হয়ে চলে ভূগোলে লিখিত মাত্রা,
টাদে পৌছিবে, উল্লাসে জয়যাত্রা।

তারপর! তারা সব চলে গেছে শূন্য অসীমেব
হিসাব বিহীন পথ পাব হয়ে গ্রহ তারকায়।
পিছে পড়ে থাকে এই পৃথিবীতে পূর্ণ ক'দিনেব
জীবনের গান ওঠে, বেদনা ও আনন্দ মাথায়
নবতৃণে, আবাব আকাশ নীল! বশিষ্ঠ অন্তবে
সেদিন চলেছে কবি নবজাতকের পথ ধরে।

ধূলোমাটিতেই

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

অতৃণ পথের দেহে বিকেলের রেখাচিত্র আঁকা;
সব তীর্থ ধূলি আজ ছায়া-নীল নিখব বিষ্ময়,
নিবিড় বৃষ্টির দিন আশ্বিনের বৌদ্ধের জগতে
শেষ ক্ষমা রেখে গেল, তবু তার আসার সময়।

এখনো বাজে না কেন? কতো দীর্ঘ দৃশ্যের আকাশ
দিনান্তের বর্ণ নিয়ে মুছে গেল বাতের গভীরে;
তারপর শুষ্ক ভোর, সেই আলো, রোদ ছায়া দিন,
সে কার পাষের শব্দ পাবে বলে গুধু ফিরে ফিরে।

প্রতিদিন ব্যর্থ হলো, তবু ভালবাসার বেদনা
জীবন ঐশ্বর্য তার, শেষ পুণ্য শেষ তীর্থ এই
যা কিছু সে পেয়েছিল যৌবনের অমৃতমন্ডনে,
সব কেন ফেলে গেল, এ পথের ধূলোমাটিতেই!

বলো কেন, বলো বন্ধু? অপার্থিব তারি ছায়াটিতে,
প্রসাদের পাত্র হাতে দাঁড়িয়েছি সবার নিভুতে।

সামান্য

“সমুদ্র”

শালকিয়াতে আমার এক বন্ধুর আত্মীয় দীর্ঘকাল
বোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল,
ডক্টর বোসকে একবার দেখানো। আমাকে বলিলেন,
আমি ডক্টর বোসকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম।

বেশ বেলা কবিয়াই বাহিব হইয়াছিলাম, সেখানেও
দেরি হইল। কলিকাতায় আবাব আসিয়া যখন পৌছিলাম
তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি,
প্রচণ্ড বৌদ্ধ, নীচে পিচের বাস্তা সিমেন্টের ফুটপাথ আর
উপবে ইট-সিমেন্টের বাড়িবাড়ি সারি একসঙ্গে তাতিয়া
উঠিয়া কলিকাতা শহরকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত কবিয়াছে।
বাতাস গবম, নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। বাস্তায় পথচারী
প্রায় নাই। অথচ, ডালহাউসি পর্যন্ত পৌছিয়া দেখিলাম
বাস্তা বন্ধ। হাজার গরমে বা দুর্যোগেও আমাদের
ধর্মাস্থানের ব্যাঘাত হয় না, সেই প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে
কোন এক ধর্মীয় মিছিল বাহির হইয়াছে। বড় বাস্তায়
যানবাহন চলা নিষেধ। বড় বাস্তা ছাডিয়া গলিপথ
ধবিত হইল।

মধ্য-কলিকাতার কতকটা অঞ্চলে সেকালে ছোট
ছোট গলিব একটা জাল বিস্তৃত ছিল, এখন তাহার
অনেকটাই বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহারই একটি সড়ক ও
সপিন গলি ধরিয়া আমাদের ট্যাক্সি চলিয়াছে। একটি
বাক ফিবিয়া দেখিলাম, সম্মুখে পথ বন্ধ। পথের উপর সেই
রৌদ্রেও ছোটখাট একটি ভিড জমিয়াছে, পাশ কাটাইয়া
যাওয়ার জায়গা নাই। পুলিশের গাঁড়িও একটি দাঁড়াইয়া
আছে দেখা গেল।

ট্যাক্সি থামিল। ডাক্তার কহিলেন, কি হল?

ড্রাইভার কহিল, কোই পাকিটমাব হোগা।

ডাক্তার কহিলেন, পকেটমারের জন্তে ওরা গাড়ি নিয়ে
আসে না। দেখ তো।

আমি নামিয়া গেলাম। ভিড ক্ষুদ্র, কিন্তু ঠাসা।
কষ্টে তাহাকে ভেদ কবিয়া মধ্যে ঢুকিলাম। একটি
মানুষ বাস্তার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। মৃত,
হাত ও পা ছড়ানো, কিন্তু দেখিবার মত তাহাব
মাথাটা। গোটা মাথাটাই একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে
কিসের প্রচণ্ড আঘাতে। মাথার সেই বীভৎস আকৃতি
দেখিয়া আমি শিহরিয়া চক্ষু বুজিলাম। তারপর, ফিরিয়া
ডাক্তারকে ডাকিতে যাইব, দেখি তিনি নিজেই ইতিমধ্যে
আমাব পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমার কাঁধের
উপবে একটি হাত রাখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। নিঃশব্দে
চাহিয়া দেহটিকে দেখিতে লাগিলেন। তারপর এক পা দুই
পা করিয়া সরিয়া ঠিক মাথাব সোজা সূজি গিয়া দাঁড়াইলেন।

পাশ হইতে যেটুকু মনে হইয়াছিল, এখন দেখিলাম,
আঘাত তাহাব চেয়েও বড়। মাথার খুলি ফাটিয়া
চৌচিব হইয়াছে এবং টুকরা টুকরা হাড় একেবারে মস্তিষ্ক
ফুঁড়িয়া বসিয়া গিয়াছে, একটা ডিমকে আছড়াইয়া
ভাঙিলে যেমন হয়। রক্ত ও মস্তিষ্ক কিছুটা বাহিব হইয়া
আসিয়াছে ক্ষতমুখগুলি দিয়া। উপুড় অবস্থা, মুখটি
স্পষ্ট দেখা গেল না। যেটুকু দেখিলাম এবং যেটুকু
মনে হইল, লোকটির বয়স বছর চল্লিশ হইবে। মাথার
তালু কেশবিরল, চুল কাঁচা ও ছোট করিয়া ছাঁটা।
পরনে ঘোব বস্তুর ট্রাউজার, সাদা শার্ট, নেকটাই। কোট
বা হ্যাট নাই।

শরতের শোভাযাত্রা... চলুন মেলামেলার মহোৎসবে

এই মহোৎসব আজ শরতের পথে অগ্রসব। সকলের কর্তব্য সপরিবারে যোগদান। তাব জল এখুনি প্রস্তুত হতে হবে। নতুন বেশে সাজতে হবে। নতুন জুতোয় চলতে হবে। সেরা জুতো পাবেন বাটার দোকানে। পদশোভাব এখানে বিচিত্র আয়োজন।

বাহাব ২১০-২৬০
জুপিটব ১৫০-১১৫০
দাম্প ১২.৯৫
নীলা ২৫০
হুজিয়া ১২.৯৫
ইন্ড্রি ২২.৯৫
নেজব ২৪.৯৫

মনে-বাখবেন, দিন যত বাড়ে,
ভিড তত বাড়ে। স্বতবাং আস্থন
সকালের দিকে। সকালের বাজাব
—আবামেব, বাজাব।

Bata

মাথাটা ওরকম করিয়া ভাঙিল কিসেব আঘাতে, তাহা আমাব কর্ননাতে কুলাইল না। এক যদি ভারী গাড়ি চাপা পড়িয়া থাকেন। কিন্তু তাই বা কেন। গাড়িব তলায় পড়িলে মাথাটা পাণেব দিক হইতে চাপিয়া ভাঙিত, তালুর দিক হইতে নয়। তবে কি কোন উঁচু জায়গা হইতে মাথা নীচু করিয়া পড়িলেন ?

উপব দিকে তাকাইয়া দেখিলাম।

সে গলিতে ফুটপাথ নাই, বাস্তব হইতেই বড় বড় বাড়ি উঠিয়া গিয়াছে। দেহটি পড়িয়া ছিল একটি প্রকাণ্ড বাড়িব ঠিক দ্বাবেব সম্মুখে। বাড়িটি তিন তলা, দোতলা তিন তলাব সামনেব দিকটা খোলা ছাত-বাবান্দা, লোহার রেলিং দেওয়া। কিন্তু দোতলাব বারান্দা হইতে পড়িলেও কি এত বড় আঘাত লাগা সম্ভব ছিল ? অন্ততঃ মিনিট দশেক আগের ব্যাপাব বোঝা গেল, ক্ষতগুলির মুখে বস্ত্র জমিয়া শুকাইয়া উঠিতেছে।

ডাক্তারকে কহিলাম, মাথাটা দেখেছেন ?

ডাক্তার কহিলেন, এখন নয়।

পুলিসেব লোক দাঁড়াইয়াই ছিল। ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সও আসিয়া গিয়াছে। দেহটিকে ধরিয়া তাহার চিত করিয়া স্ট্র্যাচাবে শোয়াইল, গাড়িতে লইয়া গেল। তখন দেখিলাম, আঘাতের বেগে চক্ষু দুইটা গহ্বর হইতে প্রায় বাহিব হইয়া আসিয়াছে। মুখ, নাক, কানেব গর্ত রক্তে ভরা।

ডাক্তার কহিলেন, জল কিসের ?

দেহটি তুলিয়া লইতেই আমারও চোখে পড়িয়াছিল, তাহার বুক-পেটের তলায় রাস্তার উপবে জল, পেটের কাছে জামাটাও কিছু ভিজা।

অ্যাম্বুলেন্সও পুলিসের গাড়ি চলিয়া গেল। ভিড পাতলা হইল। আমরা ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠিলাম। কয়েক গজ অগ্রসর হইয়াই ডাক্তার কহিলেন, থাম। ডাক্তার নামিয়া গেলেন। আমিও নামিলাম। পথের উপরে যেখানে দেহটি পড়িয়া ছিল, ডাক্তার সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। দোতলাব রেলিংয়ের সোজাসুজি, যেখানে দেহটা ছিল সেইখানে, রাস্তার উপরে উবু হইয়া খুঁকিয়া কি খুঁজিলেন, পাইলেন না মনে হইল। তারপর পকেট হইতে রুমাল বাহির করিলেন, জলটা অনাবৃত

হইয়া শুকাইয়া উঠিতেছিল, রুমাল ফেলিয়া সেই জল খানিকটা ছুপিয়া তুলিয়া লইলেন। গাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, চল।

কিছু কিছু লোক তখনও সেখানে জটলা কবিতোছে। তাহাবা তাঁহাব কাজকর্ম চাহিয়া দেখিল, কোন আপত্তিও কবিল না, মন্তব্যও কবিল না, হয়তো ভাবিল পুলিসেরই লোক। রুমালটা ডাক্তাবেব হাতেই বহিল, একবার নাকে তুলিয়া শুঁকিলেন, ড্রাইভাবে কহিলেন, জোরে চল।

বাড়িতে ঢুকিয়া ডাক্তার কহিলেন, এক মিনিট। ভিজা রুমালটা তখনও তাঁহাব হাতে। পাশের একটি ছোট ঘর তাঁহাব ল্যাবোরেটরি, ডাক্তার সেই ঘরে ঢুকিলেন। একটু পবেই বাহির হইয়া আসিলেন, কহিলেন, জল। স্রেফ কলেব জল।

তাতে কি প্রমাণ হল ?

সেইটেই তো কথা। কিছু প্রমাণ হল না। আমাব প্রথমটা মনে হয়েছিল ইউবিন। ওরকম আচমকা আঘাতে মারা গেলে সেটা সম্ভব। যদিও গন্ধেই বুঝেছিলাম তা নয়। কিন্তু একেবাবে খাটি জল, রাস্তার ওপবে ওভাবে এল কি করে !

আমি কথা বলিলাম না।

ডাক্তার কহিলেন, তুমি একবার ঘূবে আসবে সেখানে ? এখনই নয়, ধর পাঁচটা নাগাদ ? মানে যখন পথে লোক-চলাচল থাকবে, তুমি গেলেও বিশেষ করে কারু চোখে পড়বে না।

কহিলাম, গিয়ে কি করতে হবে ?

ঘে-বাড়িটার সামনে, সেটা কার বাড়ি বা কিসের অফিস, ইত্যাদি খবর একটু জেনে আসবে। লোকটার পরিচয় যদি জানা যায় তবে তো খুবই ভাল। ওখানকার বাসিন্দা হলে নামটা জানতে পাওয়া কঠিন হবে না। হয়তো লোকের মুখে মুখেই আলোচনা চলছে দেখবে।

আমি কহিলাম, যাব। কিন্তু ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনাব কৌতূহল হল কেন হঠাৎ ?

কৌতূহল হঠাৎই হয়। দুটি জিনিস বুঝতে পাবছি না, বিশ্রী লাগছে। তার একটা বলেছি, জলটা কিসের।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে, আঘাতটা কিসেব। বয়স্ক এবং জোয়ান মানুষ, হাড় শক্ত, এবং মাথার খুলির হাড় অল্প প্রায় সব হাড়ের চেয়েই বেশী শক্ত। মাথার খুলিটা অমন ভিমের মত ভেঙে গেল যার আঘাতে, সে কতবড় শক্তিমানের হাত?

গাড়ি নয়?

না। গাড়ি হলে পাশের দিক থেকে চেপ্টে যেত মাথাটা। এ, তালুব ওপর সোজাহুজি আঘাত। ওপর থেকে উলটে হয়ে পড়েও যায় নি, তা হলে পথের ওপরে তার চিহ্ন থাকত। নেই, আমি দেখেছি।

তা হলে?

তা হলে বাকি রইল, হাতুড়ির ঘা বা ওইরকম কিছু। কিন্তু কত বড় হাতুড়ি, কতখানি জোয়ান হাতের ঘা? যেই মেবে থাক ওকে, একটমাত্র আঘাতে মেরেছে, ধস্তাধস্তি কবে বা বাববাব করে পিটিয়ে মারবাব জায়গা ও নয়। ঘা মেরেই সরে পড়েছে। সে ঘাটি মারলে কে, কি উদ্দেশ্যে, এটা জানার কোতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া, লোকটি খুব লম্বা না হোক, বেস্টেও নয়। তার মাথার ওপরে অতবড় চোট দিতে হলে সে আঘাতকাবীকে অনেকখানি লম্বা মানুষ হতে হবে। আঘাতটা কি ভাবে করা হল না জেনে স্থস্থ লাগছে না।

অতএব বিকালবেলায় ট্রামে কবিয়া গিয়া, পায়ে পায়ে সেই জায়গাটিতে উপস্থিত হইলাম। দুপুরবেলার ভিডের কোন অবশেষ আব নাই সেখানে, কলিকাতা শহর কোন ঘটনাকে অতক্ষণ মনে করিয়া রাখে না। পথে লোকজনের যাতায়াত, মৃতদেহের মাথাটা যেখানে ছিল সেখানে পথেব উপরে তখনও রক্তের দ্রব্য চিহ্ন, গাড়িব চাকায় এবং মানুষের পায়ে পায়ে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

পথের অপব পার্শ্ব হইতে বাড়িটির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ি। বাস্তা পার হইয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। সিঁড়ির সোজাহুজি বারান্দা, ভিতবে চলিয়া গিয়াছে, দুই পাশে দুইটি বড় কক্ষ। তাহাব একটিতে 'বার'—চা শরবত ইত্যাদি পাওয়া যায়, অল্পটি বেস্টোরা।

সম্মুখে দেওয়ালে সাইনবোর্ড টাঙানো, তাহাতে ব্যবসার পবিচয়—নীচে বার রেস্টোরাঁ, উপবতলাটা আবাসিক হোটেল।

ভালই হইল, বাড়িটাতে ঢুকিবার এবং কিছু সময় কাটাইবাব একটা চমৎকার সুযোগ মিলিয়া গেল। সোজা উঠিয়া বেস্টোরাঁ-ঘবে ঢুকিলাম, কিছু খাতের অর্ডার দিয়া বসিয়া গেলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ব্যবসা ভালই চলে মনে হইল। অনেক খরিদারের ভিড, পবিচাবকবা ছুটাছুটি কবিয়াও সকলকে হাতে হাতে যোগান দিতে পাবিতেছে না, মধ্যে মধ্যেই এদিক-সেদিক হইতে বিলম্বপীড়িত খরিদারের অসহিষ্ণু কণ্ঠ শুনা যাইতেছে, আর কতক্ষণ করবে!

আমাব-পক্ষে সেটাও সুবিধা, আমি কোন তাগাদা তাড়া দিলাম না, নিশ্চিন্তে অপেক্ষা কবিয়া বহিলাম। তাবপর খাত আসিল, আমি অতি মন্থবগতিতে একটু একটু কবিয়া খাইতে লাগিলাম। যতটা খাইতেছি তাহার বেশী কান পাতিয়া আছি, চাবিধারের কলবব গুঞ্জনেব মধ্যে আমাব গ্রহণযোগ্য কোন কথা কানে আসে কিনা। অনেকে একা খাইতেছে, অনেকে সদলে। পবিচারকবা ব্যস্তভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। একটা বয়স্ক ভদ্রলোক, সুন্দব স্ত্রীম চেহাবা ও কায়দা-দ্রবস্ত পোশাক, দু-একবার যুবিয়া তদাবক করিয়া গেলেন।

মিনিট পনরো কাটিল। আমার প্লেট খালি হইয়াছে, আবাব একটা কিছু চাহিয়া নইব ভাবিতেছি, একটা পরিচাবক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনাব হয়ে গেলে একবাব দিয়া করে এদিকে আসবেন?

কহিলাম, কোনদিকে?

ভেতবে। সাহেবের ঘরে।

কেন?

তিনি অসুস্থরোধ করলেন।

চল।

আপনাব খাওয়া হোক।

হয়ে গেছে। তুমি আমার বিলটা এনে দাও।

চলুন তা হলে। বিল আমি দিয়ে আসব।

ভিতরের একটি ঘবে একটি লোক একা বসিয়া ছিলেন। সেই লোকটিই।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আসুন।

বসিয়া কহিলাম, কি ব্যাপার ?

ভদ্রলোক কহিলেন, বলব। আপনার খাওয়ায় বাধা দিয়েছি। কি নিয়ে আসবে বলুন ?

কিছুই নয়। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

সে তো মামুলী খাওয়া। আমার এই ঘরে পায়েব ধুলো দিলেন, আমাব তো একটা কর্তব্য আছে।

পরিচারককে কিছু খাত্ত-পানীয় আনিতে আদেশ করিলেন, সে চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে একবাশ খাত্ত আনিয়া হাজির কবিল।

কহিলাম, এ কী করছেন ?

কিছু করছি না।

কিন্তু—

কিন্তু কিছু নেই।

আপনি ম্যানেজাব ?

আমি মালিক।

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি একজন সাধারণ খবদার মাত্র। আপনাদেব বাঁধা ক্লায়েণ্টও নই। জীবনে আব কোনদিন এখানে ঢুকেছি বলে মনে পড়ছে না। আমাকে ডেকে হঠাৎ এত অভ্যর্থনা করছেন, কেন বলুন তো ?

হয়তো, আর কোনদিন আসেন নি বলেই।

তার মানে ? প্রত্যেক নতুন খবদারকেই কি এমন করে ঘরে ডেকে এনে খাওয়ান আপনি ?

প্রত্যেককে খাওয়াই না। কাউকে কাউকে খাওয়াতেও হয়।

কারণ ?

বলছি। শুধুন, এসব তর্ক মিছে। আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। চিনেছি বলেই এখানে ডেকে এনেছি।

আমাকে চিনেছেন, তার মানে ?

মানে, চিনেছি। এভাবে তর্ক করে লাভ নেই।

আমি আসল কথাটাতেই আসছি।

তাই ভাল।

আজ দুপুরে আপনি আমাদের এই রাস্তায় এসেছিলেন। আপনি এবং আপনার সঙ্গী আর এক

ভদ্রলোক। আজকে যে অ্যাকসিডেন্ট হল, তার সম্বন্ধে আপনাদেব ইন্টারবেস্ট আমি লক্ষ্য করেছি।

কি লক্ষ্য করেছেন ?

আপনারা অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য কবে দেখেছেন। তাবপবে আবার ফিবে এসেও তাব সম্বন্ধে কিছু জেনে যাবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের এখানে আপনাকে আর কোনদিন দেখি নি।

যত লোক আসে, আপনি কি সবাইকে চেনেন ?

যাদেব চেনা দরকাব তাদের চিনতেই হয়। আপনি আব কখনও আসেন নি। আজ এসেছেন। সেটা নিশ্চয়ই দৈবাৎ নয়। একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না। ওই ভদ্রলোক কে ?

কেন ?

আপনারা পুলিশে আছেন সেটা বুঝতে পেরেছি। তাঁব নামটি জানতে চাইছি শুধু।

আমরা পুলিশ, কে বললে আপনাকে ?

হেঁ হেঁ, এটুকুও বুঝব না ?

একেবারেই ভুল বুঝেছেন। তিনি হচ্ছেন ডাক্তার একজন, পুলিশের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। আব আমি কবি মাস্টারি।

ডাক্তার। তাঁর নামটি ?

তাব আগে বলুন, আপনার এত কৌতূহল কেন আমাদের নিয়ে ?

কৌতূহল কি আর অমনি হয়, হয় প্রাণের দায়ে। কি বিপদে যে পড়ে গেছি সে তো স্বচক্ষেই দেখে গেলেন তখন।

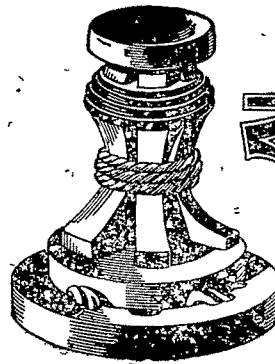
কি দেখে গেলাম ? দুপুরের সেই অ্যাকসিডেন্ট তো ? তার সঙ্গে আপনাব কি সম্পর্ক ? আপনার বিপদই বা কিসের ?

আরে ভাই, আমারই তো সব। বলছি আপনাকে। আমার এটা হচ্ছে হোটেল-কাম-রেস্তোরাঁ। নীচের তলায় রেস্তোরাঁ, ওপরে হোটেল। রেসিডেন্সিয়াল। সম্ভ্রান্ত লোকেবা এসে এসে থেকে যান দয়া করে, কেউ কেউ প্রায় বাধারকমও থাকেন। জাঁক করছি না, ভাল হোটেল, ভাল সোসাইটি বলে নামডাক আছে আমার হোটেলের। কিন্তু এবার আমার সব যাবার উপক্রম।



টানলেই বোঝা যায়

স্বাদে গন্ধে উপাদেয় .. ববাবর সমান
ভালো সিগারেট বলতে ক্যাপস্টান।
হুতবাং লোকে তো বলবেই
“ক্যাপস্টান যে ধবেছে সে-ই মজেছে”।
আপনি যদি আজও ক্যাপস্টান
না ধবে থাকেন,
একবার পবথ কবলেই
ক্যাপস্টানের টানে বাধা পড়বেন।



ক্যাপস্টান

উইলস-এর ক্যাপস্টান-এর
তুলনা নেই

কেন?

যিনি মারা গেছেন, তিনি আমারই হোটেলের বোর্ডার। হোটেলের দোবগোড়ায় যদি তিনি এমন করে পড়ে মারা যান, তবে হোটেলের সুনামে কতটা লাগে, আপনি বুদ্ধিমান লোক বুঝতেই পাবেন।

কিন্তু, হোটেলের সুনামে লাগবে কেন। অ্যাকসিডেন্ট, সে তো যে কোন লোকের হতে পারে, যে কোন জায়গাতে বা সময়ে। হোটেলের দোবগোড়ায় হয়েছে বলেই কি হল?

সে কথা অবশ্য। কিন্তু লোকে তো মানে না। আর, অ্যাকসিডেন্টই কি না, তাও তো কথা।

তার মানে? এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, মানে এর ভেতরে রহস্য কিছু আছে, এমন কথা মনে হল কেন আপনাব? কোন কারণ আছে?

কারণ স্পষ্ট কিছু নেই। কিন্তু, মনে করুন, এ সন্দের একা আমার হয় নি।

আর কার হয়েছে?

আপনাদের। তা নইলে, তখন স্টার্ট কবে গিয়েও আবার ফিরে আসতেন না জায়গাটা দেখতে বা সূত্র খুঁজতে। আজকে আমার এখানেও আপনি চা খেতে আসেন নি। এসেছেন অল্প উদ্দেশ্যে। আমাব ধারণা, এই ব্যাপারেরই সূত্র বা তথ্য খুঁজতে।

কে বললে?

আপনিই বললেন। কোনদিন আসেন না আজই এসেছেন, আগে বাইরে থেকে তাকিয়ে টাকিয়ে তারপর এখানে ঢুকেছেন, যে খাবার আপনি নিয়েছেন তাব তুলনায় অনেক বেশী সময় বসে বসে কাটিয়েছেন। তার মানে, যতক্ষণ সম্ভব এখানে বসে কাটানোই আপনার উদ্দেশ্য। বলুন, ঠিক কিনা।

এমন চমৎকার রকম ধরা পড়িয়া যাইব ভাবি নাই। কহিলাম, স্বীকার করছি, কোতূহল কিছু ছিল। কিন্তু তাতেও আপনার শঙ্কিত হবার কারণ কিছু নেই। মানে, যদি এর মধ্যে অত্যাশ্চর্য কিছু থেকেই থাকে, আপনি নিশ্চয়ই জড়িত নন তার সঙ্গে?

নিশ্চয় না, আলবত না। আমার ভয় আমার হোটেল নিয়ে, তার বদনাম হবাব সম্ভাবনা নিয়ে। দেখুন, সোজা

কথা বলছি আপনাকে। ষোল বছরের অবফ্যান ছেলে কলকাতায় এসে নেমেছিলাম, না ছিল পকেটে পয়সা পেটে বিড়ে, না ছিল পাশে দাঁড়বার কেউ। নিজের চেষ্টায় গায়ের রক্ত জল করে এই হোটেল গড়েছি। এখন বয়স চৌষটি। এখন এর কিছু হলে আমি স্নেহ মরে যাব। সেইজন্মেই, সত্যি বলছি, আপনাকে দেখে আমি ভয় পেয়েছি। আপনি বললেন আপনার সঙ্গী ডাক্তার, আপনি মার্টার। আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। তবু বিশ্বাস করুন, আমার এ ধারণা কিছুতেই যাচ্ছে না যে আপনারা পুলিশ বা পুলিশেরই জানা লোক, এই ঘটনার সূত্র ধরেই আপনাদের আনাগোনা।

আচ্ছা, ধরা যাক তাই হল। তাতেই বা আপনার ভয় কিসের?

বলেছি তো। ভয় আমাব নিজেকে নিয়ে নয়। ভয়, হোটেলকে নিয়ে। সত্যি যদি এটা অ্যাকসিডেন্ট হয়, সেটা স্পষ্ট প্রমাণ হওয়া দরকার। আর যদি এর ভেতরে গোলমাল কিছু থাকে, তবে তারও পুরো মীমাংসা একটা হয়ে যাওয়া দরকার। তা না হলে আমার হোটেলের দুর্নাম হবে, এবং হোটেলের ক্ষতি হলে আমি বাঁচব না। এ আমাব রক্তমাংস দিয়ে গড়া ধন। আমার এই কথাটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করুন, তা হলেই বুঝবেন কেন আমাব আপনাকে দেখে এত ভয়।

ভুললোকেব কথা শুনিয়া মনে হইল, প্রতিটি অক্ষর তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইতেছে, ইহাব মধ্যে আর যাহাই থাক অভিনয় বা প্রবঞ্চনা নাই। একটু ভাবিয়া কহিলাম, ভয় না হয়ে যদি সেটা নির্ভয়ের কাবণই হয়?

মানে বুঝলাম না।

বলছি। আপনাকে মিথ্যে বলি নি, উনি ডাক্তার, আমি মার্টার। কিন্তু, এ ছাড়া আরও একটা পরিচয় আছে আমাদের—মানে আমার নয়, তাঁর। সেটা হচ্ছে, উনি অপবোধ-বিজ্ঞানী বা ক্রিমিনোলজিস্ট। ক্রাইম কোথাও হলে তার তথ্য খুঁজে বাব করা তাঁর ঝোঁক—পেশা নয়, নেশা।

তার মানে? ডিটেকটিভ?

বলতে পারেন ইচ্ছে কবলে। যদিও পেশাদার

নন, পুলিশের সঙ্গে কোন সম্পর্কও নেই—তারা জানেই না ওঁর কথা।

আচ্ছা?

আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমাদের, মানে, ওঁর মনে খটকা লেগেছে ব্যাপারটা নিয়ে। আমরা এখানে এসে পড়েছিলাম দৈবাৎ, বড় রাস্তা বন্ধ ছিল বলে। এসে ব্যাপার দেখলাম। এ বেলা আমি সত্যিই এসেছিলাম, এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর পাওয়া যায় কিনা দেখতে।

কি রকম খোঁজখবর?

যেমন, কি রকম করে ঘটল ব্যাপারটা বা লোকটির নাম পরিচয় কি, উনি এই সময়ে এইখানে এসেছিলেন বা কেন—এই ধরনের যা জানা যায়।

এ সব কথা আপনাকে আমিই বলতে পারি অনেকটা, অন্ততঃ অন্তর চেয়ে বেশী পাবি। বলছি শুধুন। বা আপনিই বলুন দয়া করে, কি কি জানতে চান আপনি, মানে তিনি।

আমি আবার একটু ভাবিলাম। তারপর কহিলাম, তার চেয়ে এক কাজ করুন না। তাঁকেই বলুন। যাবেন আমাব সঙ্গে?

তাঁর কাছে? তিনি কি পাববেন আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে? বাজী হবেন? এত দয়া তাঁর হবে কেন?

তাঁহার কণ্ঠ আবেগে কাঁপিতে লাগিল।

কহিলাম, পারেন যদি, নিশ্চয় বাঁচাবেন। অন্ততঃ এক কথা আপনাকে আমি দিতে পারি, তাঁর কাছে গেলে, তাঁকে বললে, আপনার উপকার হোক বা না হোক অপকাবে হবে না। এবং তাঁর দ্বারা যেটুকু হওয়া সম্ভব, তাব তিনি জ্রুট কববেন না। কবে যাবেন তাঁর কাছে, বলুন।

কবে? ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আজই, এফুনি। এখন গিয়ে পাব তাঁকে?

পাব।

ভদ্রলোক একমুহূর্তে তৈরি হইয়া গেলেন। একজন কর্মচারীকে ডাকিয়া সে রাত্রির মত কাজের ভার বুঝাইয়া দিলেন, দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে রাস্তায় নামিয়া আসিলেন। একটি গাড়ি ইতিমধ্যে দ্বারের কাছে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দ্বার খুলিয়া ধবিয়া কহিলেন, আসুন।

আমার বিবরণ শুনিয়া ডাক্তার হাসিলেন। ধরতে গিয়ে নিজেই ধরা পড়ে গেলে? তা ভাল। আপনি ওর কাছে কি শুনেছেন আমার নামে?

ভদ্রলোকের নাম বিমলবারু, বিমল চ্যাটার্জি।

বলিলেন, শুনেছি আপনি মস্তবড় ডিটেকটিভ। তাই শুনেই ছুটে এলাম। আপনি বাঁচান আমাকে।

ডাক্তার কহিলেন, ডিটেকটিভ যাকে বলে তা আমি নই। সে যাক। আপনার ভয়টা কিসেব? না হয় ধবেই নিলাম এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, খুন। কিন্তু তাতেই বা আপনার জড়িয়ে যাবার কি হয়?

আমার জড়ানো বলে নয়। আমার ওপবে আসবে না। কিন্তু যিনি মাঝে গেছেন, আমারই হোটেলের বোর্ডার ছিলেন। হোটেলের দরজায়ই তিনি মারা গেলেন। এতে হোটেলের বদনাম হতে বাধ্য। পুলিশ এর মধ্যেই খোঁজাখুঁজি কবেছে, কে লোক, কোথায় থাকত, কি কবে হল। তাদের হয়তো এখনও ধাবণা এটা অ্যাকসিডেন্টই, হোটেলের চোকবাব বা বেরোবাব মুখে কোন গাড়ি তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু সে ধাবণা যদি তাদের পালটে যায়, তাহলেই তারা হোটেল নিয়ে টানাটানি করবে।

পালটে যাবে ভাবছেন কেন?

ভাবছি, সত্যি করে ওভাবে গাড়ি চাপা পড়ার কথা নয়, এটা যে-কেউ বুঝতে পাবে।

তার মানে, না বুঝলেও আপনি তাদের বুঝিয়ে ছাড়বেন। গাড়ি চাপা পড়া সম্ভব নয়, কেন? আর হোক সম্ভব না-হোক সম্ভব, আপনি নিজে থেকে সেটাকে গেয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

মানে?

ডাক্তার কহিলেন, মানে কিছু নেই। আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, ও গিয়েছিল আপনার দোকানে বসে খেয়ে আসতে। হয়তো কিছু গল্পগুজব শুনে আসত, হয়তো কিছুই শুনত না। আপনি ওকে দেখেই জাঁতকে উঠলেন, ডেকে নিয়ে হাঁইমাই করে রাশখানেক কথা

বলতে শুরু কবলেন। তাব মানে, আপনিই নিজেকে থেকে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন, আপনার হোটেলের দিকে পুলিশের দৃষ্টি পড়া দরকার। সেটা কেন? আপনি অত্যন্ত নার্ভাস হয়েছেন বলেই? না সত্যি করে আপনার নিজের মনে করবার কারণ আছে এটা খুন, এবং তার রহস্য আপনার হোটেলের মধ্যেই খুঁজতে হবে?

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, খুন বলে আমার মনে হয়েছে, ঠিক কোন বিশেষ কারণে নয়। এককম মনে হবার নির্দিষ্ট কাবণও বোধ হয় থাকে না। বলুন, ইন্সপেক্টর।

আমি তাকেই বলছি নার্ভাসনেস। যাক, সব কথা আমাকে স্পষ্ট খুলে বলুন। তারপর যদি পাবি চেষ্টা করব আপনাকে সাহায্য করতে।

বেশ, বলুন কি বলব।

যিনি মারা গেলেন, আপনার বোর্ডার?

হ্যাঁ।

এঁর পরিচয় কি? কতদিনের বোর্ডার?

উনি হচ্ছেন— আসামের একটি শহরের নাম করিলেন বিমলবারু— হাইস্কুলের হেডমাস্টার।

বটে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার হোটেল বেস্পেক্টেবল লোকদের জন্মে। বিশেষ পরিচয় না পেলে আমি সে লোককে বোর্ডার করে রাখি নে। কলকাতার হোটেলের অনেক দুর্নাম লোকে কবে, আমার হোটেল সম্বন্ধে কোন কথা বলবার সাধ্যি কারুর নেই।

বাঙালী?

না। আসামীজ বলেই আমার ধারণা।

তা, এখানে এসেছিলেন কেন? এখন তো স্কুল ছুটির সময় নয়।

ছিলেন না। মাঝে মাঝে আসতেন। যখন আসতেন আমার এখানে উঠতেন। গত তিন বছর থেকে আমার ক্লায়েন্ট।

খুব ঘন ঘন আসতেন?

আজ্ঞে না। আসতেন, মানে ইউনিভারসিটির কাজেই

আসতেন সাধারণতঃ।* এলেন, দুদিন চাবদিন থাকলেন, এই রকম। বছরে এমন চাব-পাঁচবার আসতে হত ঠুকে।

এসে আপনার হোটেলেই উঠতেন প্রতিবার?

আমার তো তাই ধারণা। অনেক সময়ে আগে থেকেই জানিয়ে দিতেন আসবার তাবিখ, যাতে তাঁর ঘরটি রেডি কবে রাখা যায়।

তাঁর ঘরটি মানে?

তেতলায় সামনের দিকে একটি ঘরে তিনি সাধারণতঃ থাকতেন। এটিই তাঁর পছন্দ ছিল।

কিন্তু হোটেলের ঘর, প্রতিবার তাঁর জন্মে খালি থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। অথ বোর্ডারকে ঠেলে সরিয়ে দিতেন?

না। তাই নিয়ে এক-আধবার মুশকিলেও পড়তে হয়েছে আমাকে। তবে, সাধারণতঃ ওই ঘরটাই দেওয়া যেত তাঁকে। মানে, মাস ধরে থেকে যাচ্ছেন এমন বোর্ডার তো বেশী নয়। বেশীর ভাগই ধরুন দুদিন চাবদিনের যাত্রী। পাঁচ সাত দশদিন আগে খবর পেলে ও-ঘরটি আটকে রাখা বিশেষ শক্ত হয় না।

কিন্তু আগে থাকতে আটকে রাখা মানে ভাড়া লোকসান দেওয়া। তিনি কি সে ভাড়াও মিটিয়ে দিতেন?

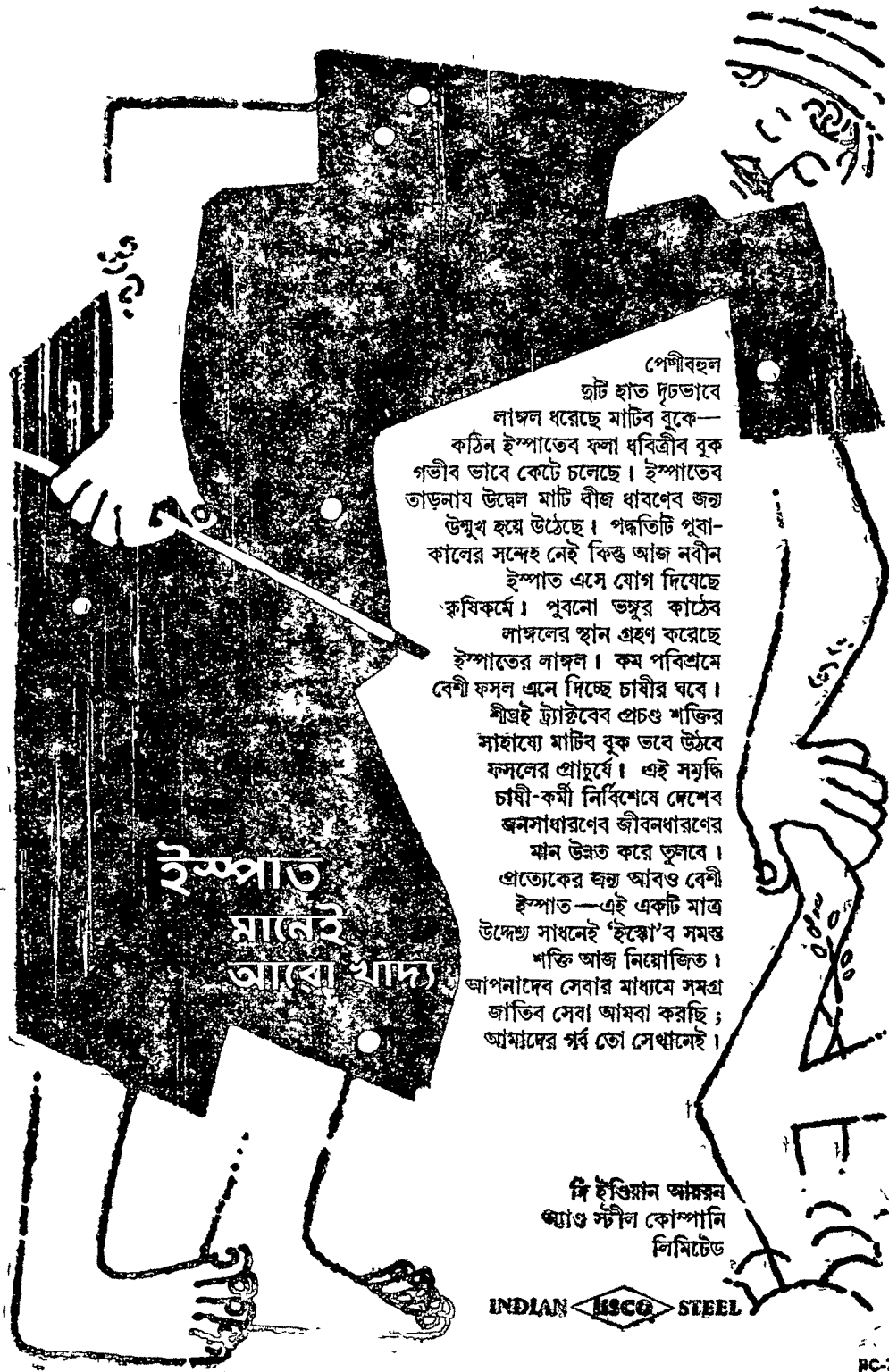
তাব দরকার কি। আমার হোটেল আমি ক্লায়েন্টের সুবিধাটাই আগে দেখে থাকি। তাতে সত্ত্ব সত্ত্ব কিছু লোকসান হয়তো থাকে, তবু শেষ পর্যন্ত আমার পুষ্টিয়ে যায়।

তা হলে ধবে নিচ্ছি, গত তিন বছরে অন্ততঃ বারো-চোদ্দ বার তিনি কলকাতায় এসেছেন। প্রতিবারই আপনার হোটেল উঠেছেন, অন্ততঃ আপনি যতটা জানেন। এবং তার মব্যে অন্ততঃ বার দশেক ওই একই ঘরে থেকেছেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি তো, আপনি বললেন আসামীজ। কলকাতায়

* পাঠকের অবগতির জন্ম : যে-কালের ঘটনা, তখন সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ড বা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থপ্তি হয় নাই। আসাম প্রদেশের স্কুল কলেজগুলি তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছিল।



ইস্পাত
মানের
আবো খাদ্য

পেশীবহুল
ছটি হাত দৃঢ়ভাবে
লাঙ্গল ধরেছে মাটির বুকে—
কঠিন ইস্পাতেব ফলা ধবিত্রীব বুক
গভীর ভাবে কেটে চলেছে। ইস্পাতেব
তাড়নায় উদ্বেল মাটি বীজ ধাবণেব জন্ম
উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিটি পুবা-
কালের সন্দেহ নেই কিন্তু আজ নবীন
ইস্পাত এসে যোগ দিয়েছে
কৃষিকর্মে। পুর্বনো ভঙ্গুর কাঠেব
লাঙ্গলের স্থান গ্রহণ করেছে
ইস্পাতের লাঙ্গল। কম পবিত্রমে
বেশী ফসল এনে দিচ্ছে চাষীর ঘবে।
শীঘ্রই ট্র্যাক্টরের প্রচণ্ড শক্তির
সাহায্যে মাটির বুক ভবে উঠবে
ফসলের প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি
চাষী-কর্মী নির্বিশেষে দেশেব
জনসাধারণেব জীবনধারণের
ম্মন উন্নত করে তুলবে।
প্রত্যেকের জন্ম আবও বেশী
ইস্পাত—এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'ব সমস্ত
শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদেব সেবার মাধ্যমে সমগ্র
জাতিব সেবা আমবা করছি ;
আমাদের পূর্ব তো সেখানেই।

দ্বি ইন্ডিয়ান স্টীল
কোম্পানি
লিমিটেড

INDIAN  STEEL

ইউনিভারসিটির কাজে আসতেন, অথ কোন কাজ থাকত না তাঁর? আত্মীয়স্বজন? বা বন্ধুবান্ধব?

আমার জানা নেই। জানবার কারণও হত না-কিছু।

এলে কি যবেই থাকতেন বেশীভাগ, না বাইরে বাইরে কাটত?

তার কিছু ঠিক নেই। হয়তো সাবাদিন বাইরেই কাটালেন, হয়তো দিনের ভেতবে বেরুলেনই না, তাঁব কাছেই লোকজন এল।

অনেক আসত?

তা আসত বইকি মাঝে মাঝে। অবশ্য, বুঝতেই পারেন, এ সম্বন্ধে খুব নির্ভুল হিসেব দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। হোটেল জায়গা, সাবান্ধব লোক আসছে যাচ্ছে।

কখন কে এল, কার ঘরে গেল, তার হিসেব বাখা আমার কাজ নয়, সম্ভবও নয় আমাব পক্ষে।

আপনার হোটেলের কি যার খুশি যখন খুশি যাতায়াত করতে পারে?

কেন পারবে না। এ তো লেডীজ হস্টেল নয়। সবই রেসপেক্টেবল বোর্ডার। তাঁদের ভিজিটরকে বাধা দিতে যাবার কোন কথাই ওঠে না।

ভিজিটরের নামে যদি চোর-গুণ্ডা এসে ওঠে?

ওঠে নি তো কোনদিন।

আচ্ছা, এবারে কবে এসেছিলেন ভদ্রলোক?

তিনদিন হল।

তারপর?

আজ মীটিং ছিল তাঁর ইউনিভারসিটিতে। মীটিং সেরে কাল বিকেল নাগাদ ফিরে যাবার কথা। সেই জেগেই বেরুছিলেন বোধ হয়।

তা হলে ঘটনা হয়েছে তাঁব বেরবার মুখে? কি কি হল, সব বলুন।

ঠিক কি হয়েছিল বলতে পারব না। আমাব ওটা অফিসে বসবার সময় নয়। দুপুরবেলা কাজের চাপ থাকে না, আমিও খেতে বিশ্রাম করতে চলে যাই। তাই গিয়ে-ছিলাম।

বাড়িতে?

বাড়ি মানেও ওই বাড়িই। দোতলা তেতলা নিয়ে হাটেল, তেতলার পেছন দিকে আমি থাকি।

বেশ, তারপর?

মাত্র খেয়ে উঠেছি, একজন বয় ছুটে গিয়ে ডাকলে। তার সঙ্গেই নেমে এলাম, দেখি এই কাণ্ড। আমি বেবিয় আসবার বোধ হয় মিনিট দু-তিনের মধ্যে আপনারা এসে পড়লেন। তারপর তো, আমি যেটুকু দেখেছি আপনারাও সেটুকু দেখেছেন।

তাব মানে? শোনেন নি?

শুনছি। তার থেকে যতটুকু বুঝেছি সে হচ্ছে : ভদ্রলোক মীটিংয়ে যাবেন বলেই বেরুছিলেন নিশ্চয়। বেস্টোরা বাব তখন খালি, ও সময়ে কেউ খেতে আসে না।

বোর্ডাররা কোথায় থান?

সে ওপবে খাবার ঘর আছে। নিজের ঘরে বসেও থান কেউ কেউ।

তারপর বলুন।

সামনেটা তখন খালি। দরওয়ানও কেউ নেই সেখানে। তাতে বাঁবাঁ রোদ, রাস্তাও সম্ভবত একেবারেই খালি ছিল। বেরিয়ে যাবেন, বাস্তায় পা দিতেই এই ব্যাপার। এখন গাড়িই তাঁকে চাপা দিয়েছে, বা ঘা মেরেই কেউ মেবেছে, সে সন্ধান আপনি করুন বা পুলিশ করুক, আমার কিছু বলবার সাধ্য নেই। চারদিকে সব খালি, বোদেব বাঁজে লোকেব দোরজানুলা বন্ধ, যদি কেউ দেখেও থাকে সে কথা জানবাব উপায় নেই। এক যদি সে নিজে থেকে এসে বলে।

চোখ খারাপ ছিল ভদ্রলোকের? গাড়ি এসে পড়লেও হঠাৎ দেখতে পান নি, এমন যদি হয়?

পডাশোনার সময় চশমা ব্যবহার করতেন, তাও কাজ অল্পসল্প হলে করতেন না। পথে চলতে চশমা পরতে দেখি নি। চোখ অতটা খাবাপ ছিল মনে হয় না।

কানে কম শুনতেন?

অন্ততঃ আমি কখনও সে রকম লক্ষ্য করি নি।

তারপর?

তারপর, আমার যা ধাবণা হয়েছে, ঠিক কি ভাবে বা কোন সময়টিতে মারা গেলেন, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী কেউ নেই। মানে, থাকলেও তাদেব দেখা পাওয়া যায় নি, যতদূর জানি।

মারা যাওয়ার কিছুকাল পবেই হবে, পথচলতি কোন লোক ওই ভাবে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে ওঠে। তাই শুনে আমার দরোয়ান বাইরে বেরিয়ে যায়। তাদের ইঁকাইকিতে একজন দুজন করে লোক জড়ো হয়, আমি ছুটে আসি। এরই মধ্যে খবর পেয়ে পুলিশও চলে আসে।

পুলিস এ নিয়ে খোঁজখবর কিছু কবেছে? আপনার বোর্ডার ছিলেন, সে কথা জানে তারা?

হ্যাঁ। আমবাই বলেছি। আমাদের খাতাপত্র থেকে নামধাম, কবে এসেছিলেন, এ সব কথা তাবা লিখে নিয়ে গেছে। তাঁব ঘরটাও খুঁজেটুজে দেখে গেছে।

তখনই?

না। বডি নিয়ে চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পবে। দু তিনজন অফিসার শুধু এসেছিলেন।

কি বলে গেলেন তাঁরা?

বলবেন আর কি। বিশেষ কিছু প্রশ্নও করেন নি আমাকে। একজন জিজ্ঞেস করলেন, খুন বলে কি আপনাব সন্দেহ হয়?

কি উত্তর দিলেন?

বললাম, আমি কি বলব বলুন। বিদেশী মানুষ, অল্পক্ষণের জন্তে এসেছেন, এখানে তাঁকে চেনেই বা কে। খুন কববে কেউ, আমার তো মনে হয় না।

শুনে কি বললেন তাঁরা?

বিশেষ কিছু বললেন না। একজন শুধু বললেন, আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে, এ অ্যাকসিডেন্ট। যাই হোক, অটোপিসিতে বোঝা যাবে। দরকার হয় তো তখন আবার আসব আপনাকে জামাতে। আমি বললাম, আসবেন বইকি, একশোবার আসবেন। আমার বোর্ডাব—সত্যি যদি কোন ফাউল প্লে থাকে এর মধ্যে, আমারও যথাসাধ্য হেল্প কবব আমি আপনাদের কাজে। তাঁবা চলে গেলেন।

তারপর?

তারপর আব কি। তাঁদের বলেছি, কিন্তু বোঝেন তো, বাঘে ছুঁলে আঠারো যা পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ। কি তাবা ভেবে গেছে সত্যি কবে, বা কোথা থেকে কি খুঁজে খুঁড়ে বার করবে, আমার হোটেল নিয়ে টানাটানি পড়বে, এই ভেবে আমি পাগল হয়ে গেছি। নইলে বুঝুন,

আপনাদের আমি তখন লক্ষ্য কবেছি, ভেবেছি পুলিশেরই লোক। তারপব যখন ওঁকে দেখলাম খেতে বসেছেন গিষে কিন্তু খাচ্ছেন যত তাব চেয়ে বসে বসে সময় কাটাচ্ছেন বেশী, তখন আমার ভয় হবার কথা কিনা বলুন। সোজাসুজি আমার ঘবে গিষে হাজির হলে আমি এতটা যাবড়াতাম না।

সে যাক। যা হয়েছে ভালই হয়েছে। এখন আমার কথা শুনুন। আপনার কথা শুনে একটা ধারণা আমার হয়েছে, এটা অ্যাকসিডেন্ট হোক বা খুনই হোক, আপনার কোন যোগ এর সঙ্গে নেই। অতএব আপনার ওপরে যদি কোন মিথ্যে বিপদ আসবার সম্ভাবনা হয়, সেদিকে আমাব যেটুকু সাহায্য করা সম্ভব আমি করব।

অনেক ধন্যবাদ।

ও থাক। দ্বিতীয় কথা, এটা যদি খুনই হয়, তবে তাব উৎপত্তি বাইরে বা আপনার হোটেলের ভেতরে, সেটা ভেবে দেখতে হবে।

নিশ্চয়। একশোবার। সত্যি যদি তাই হয়, আমার হোটেলের ভেতর থেকেই যদি এর সূত্রপাত হয়ে থাকে, তবে যেমন করে পারেন আপনি তাকে খুঁজে বাব করুন। তাতে যদি আমাব অতি আপন কোন লোকও জড়িয়ে যায়, তাকে আমি বিন্দুমাত্র রেয়াত করব না। আমার একজীবন ধরে তিল তিল করে আমি এই হোটেল গড়ে তুলেছি, এর ক্ষতি আমি সহ করতে পারব না। এ বিষয়ে আমার কোন সাহায্য যদি দরকার হয় আপনাব, আমাকে শুধু হুকুম কববেন, এই আমাব প্রার্থনা। আর যদি এটা খুন হলেও, বাইরের লোকের ব্যাপার হয়?

তা হলে আপনাব সেজ্ঞা দায়িত্বও নেই দায়ও নেই।

বাঁচালেন। আমি তা হলে এখন কি করব বলুন।

কিছু করবেন না। মানে, আপনি এখন এ নিয়ে একেবারেই উচ্চবাচ্য করবেন না। একদম চেপে বসে থাকবেন। ডাক্তার কি রিপোর্ট দেয়, পুলিশ কি বলে, দেখুন। যদি অ্যাকসিডেন্ট বলে, তবে পুলিশ খোঁজ করবে বাস নরির, আপনাকে আর ঘাঁটাতে না। যদি খুন বলে, তবে আপনাকে আবাব প্রশ্ন করতে আসবে। ইতিমধ্যে আপনি শুধু মুখ বুজে আর চোখ কান মেলে বসে থাকবেন। কোন কিছু জানতে পেলে বা সন্দেহ

হলে আমাকে জানাবেন। আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা নিয়ে যান, যদিও ফোনে বেশী কথা না বলাই ভাল।

আমিই চলে আসব।

তাই ভাল। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করবেন, হোটেলের কোন লোক হঠাৎ হোটেল ছেড়ে চলে যেতে চেষ্টা করে কিনা, মানে যদি অস্বাভাবিক মনে হয় ব্যাপারটা। সে বোর্ডারই হোক, বা কর্মচারী চাকর-বাকরই হোক।

বোর্ডারও?

আহা, যে বোর্ডারের স্বভাবতঃ চলে যাবার কথা সে তো যাবেই, তাকে আপনি আটকান কি বলে। কিন্তু ধরুন একজনের থাকবার কথা ছিল আরও কিছুদিন, হঠাৎ বললে আজই চলে যাব—

বুঝেছি। আব কিছ?

আপাততঃ নয়। আপনার বর্তমান বোর্ডার আর কর্মচারীদের পুরো নাম ঠিকানা আমাকে দিতে পারবেন, আজ সকালে যাবা ছিল? বোর্ডারের প্রাইভেট ঠিকানা কি থাকে?

মোটামুটি থাকে। মানে, মফস্বল থেকে আসেন ধাবা, তাঁদের সেখানকার বাস্তার নাম নম্বর না হোক জায়গার নাম।

এঁরও ছিল?

এঁর ঠিকানা তো মনে রাখা সহজ।

এঁর সেখানে কোন খবর কি দিয়েছেন আপনি?

এখনও দিই নি। কিন্তু দেওয়া উচিত নয় কি আমার?

একটু সব্ব করুন। দেখুন পুলিশ কি বলে।

তারাও তাই বলেছে।

ঠিকই বলেছে। আচ্ছা, রাত হল, আজ তা হলো আসুন। নমস্কার।

বিমলবাবু চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার কহিলেন, তুমিও কেটে পড় এবার। কাল সকালে আসবো। দরকার হতে পারে।

খবরবে কাগজ ছড়াইয়া লইয়া বসিয়া আছেন। সবগুলিরই একটি জায়গা খোলা, গতদিনের সেই ঘটনার সংবাদ। সংবাদও সকল কাগজেই এক, শুধু ভাষার ঈষৎ তারতম্য: গতকল্য দুপুরে মধ্য-কলিকাতায় এক রাস্তার উপরে এক অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মৃতের মস্তকে আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

দেখিয়া কহিলাম, সব কাগজেই একরকম লিখল কি করে?

ডাক্তার কহিলেন, তাই লিখবে। এ সব কেসের রিপোর্ট ওদেব নিতে হয় পুলিশের কাছ থেকে।

কিন্তু, বিমলবাবু তো বললেন, ওঁর পবিচয় তিনি পুলিশকে বলেছেন। তবে অজ্ঞাত-পরিচয় বলছে কেন?

ওটা পুলিশের কায়দা। পরিচয় তারা জেনেছে এটা জানাতে চায় না। পবিচয় জানলে সম্বানের স্বত্ব মিলবে, তাই পুলিশ পরিচয় জেনে গেছে জানলেই খুনী সতর্ক হয়ে যাবে, এইজন্ত।

খুন কি সত্যিই এটা?

বিমলবাবুর তাই সন্দেহ। তার কারণ অবশ্য কিছু খুলে বলছেন না, কিন্তু সে সন্দেহ মনে না থাকলে তিনি এমন জুজুর ভয়ে পড়তেন না।

আপনার?

আমি গুণ্যাত্মা লোক, কাউকেই পাণী বলে মনে করি না। আচ্ছা, তুমি তো হোটেলের ভেতরে গিয়েছ। কিরকম বন্দোবস্ত?

খুব ফিটফাট। একেবারে সাহেবি কায়দা নয়, দিশী স্টাইল। কিন্তু পরিচ্ছন্ন। বিমলবাবু যে বলেছেন এর স্বথ্যাতির কথা, সেটা বোধ হয় মিথ্যে নয়।

পরিচ্ছন্ন। তাব মানে, বয়গুলো ময়লা হাফপ্যাণ্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে না। হাফপ্যাণ্টের পেছনে ঘষে ডিশ মোছে না। ডিমের তরকারির খোলা বা গ্লাস কাপের চা আর জল সামনের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে না।

না। কিন্তু এ কথা কেন?

জলটা এল কোথেকে, তাই ভাবছি।

পরদিন সকালে গিয়া দেখিলাম, ডাক্তার অনেকগুলি

পরের দিনটা নিঃশব্দে কাটিয়া গেল।



উৎসব উপহার হিসেবে সেলাই কল আজকাল
এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন? আপনার পরিবার
খুসী হবে সেইজন্য কি? আপনার প্রিয়জনেবা আপনার
বিবেচনাব তারিফ ক'রবে, এই সুন্দর মনমত উপহাট তাদের
জীবনযাত্রার অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই? হ্যাঁ। কিন্তু শুধু
তাই নয়—এই 'সেলাই কল প্রাচুর্যের স্বচ্ছলতার প্রতীক।
আপনার পরিবারের জন্য আদর্শ উপহার। এ বছর 'উষা'-র
নতুন 'প্লামলাইন্ড' মডেল দিয়ে আপনার পরিবারকে চমক
লাগিয়ে দিন। সুন্দর, আধুনিক গডন আর নিখুঁত কাজের জন্য
ভাবতে বাইরে চল্লিশটিও বেশী দেশে সমাদৃত
—এদেশে এই প্রথম
বাজারে ছাড়া হচ্ছে।



সেলাই কল

তাহার পরের দিনও। তাহার পূর্বের দিন কাগজে একটুখানি খবর বাহির হইল : ময়না-তদন্তে বলা হইয়াছে, কোন উচ্চস্থান হইতে পতনের ফলে মৃত্যু হইয়াছে। মৃতব্যক্তি ঘটনাস্থলের উপরেই একটি হোট্টেলে বাস করিতেন। দোতলা বা তিনতলা হইতে পড়িয়া মাথা গিয়াছেন বলিয়া পুলিশের ধারণা। সম্ভবত ইহা আত্মহত্যা।

আমি কহিলাম, যাক, মিটে গেল।

ডাক্তার কহিলেন, গেল না। তুমি বিমলবাবুকে একবার ফোনে ডাক। বলে দাও আজ সন্ধ্যার পরে যেন একবার আসেন।

আটটা আন্দাজ বিমলবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনে হইল তাহার প্রথম দিনেব সে আতঙ্ক কিছুটা কাটিয়াছে, কিছু ধীরেস্থে শ্বাস ফেলিতেছেন।

ডাক্তার কহিলেন, পুলিশ আর গিয়েছিল।

বিমলবাবু কহিলেন, হ্যাঁ। গিয়েছিল, কাল সকালে। কি বললে?

জিজ্ঞেস কবলে, এঁর কথাবার্তাষ বাঁ চালচলনে এমন কিছু লক্ষ্য করেছেন, যাতে মনে কবা যেতে পারে মনে কোন ক্ষোভ বা লজ্জা বা ওই রকম কোন-ব্যাপাব ছিল? মানে, যার জন্তে লোক আত্মহত্যা কবতে পারে?

আপনি কি বললেন?

বললাম, মোটেই না। পুলিশ বললে, তা হলে আমরা যা ভেবেছি তাই—ওটা অ্যাকসিডেন্টই। মানে, গাড়ি চাপা নয়। ওপর থেকে পড়ে গেছেন কোনরকমে, রেলিং টপকে।

তাবপর?

আর বিশেষ কিছু বললে না। সেখানকার ঠিকানা আমার লিখে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু ঠিকানা নিলে কেন?

হয়তো সেখানে অনুসন্ধান করবে। আত্মহত্যার কারণ কিছু থাকলে তাব তো হৃদয় এখানে মিলবে না। মিলবে দেশে, যেখানে বাস বা কর্মস্থল। বা হয়তো শুধু বাড়িতে খবর দেবার জন্তেই। আপনি কোন খবর দিয়েছেন?

না। পুলিশ বারণ করেছিল। আপনিও তাই বলেছিলেন।

তা বটে। তবে, এবার দিয়ে দিতে পারেন মনে হচ্ছে। শুধু এক লাইন লিখে দেবেন, তাঁর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, আপনারা কেউ আসুন। স্থলের নামেই দিতে পাবেন, বাড়ির লোক ঠিক জেনে যাবে। দেখুন কি হয়, কেউ আসে কি না, এসে কি করে বা বলে।

আচ্ছা। যা বলে, আপনাকে জানাব।

হ্যাঁ। ভাল কথা, একটা কথা বলতে পারেন? সেদিন, মানে ব্যাপার যখন হল, ঠিক তার আগেই কোন রুটি কি হয়েছিল আপনারা ও-পাড়ায়?

একেবারেই না—আগুনব মত গরম পড়েছে সারা দিন। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন? রুটি হলে তো আপনিও দেখতেন।

না। আমি ঠিক তখনই ফিরছিলাম শহরের বাইরে থেকে। আর কলকাতার রুটি, তেতা, একরাশাষ প্রাচীন আব এক বাস্তাষ অগ্নিদহন। যাক, রুটি তা হলে হয়নি।

না। আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন, আপনারা কি ধারণা হল কেসটা নিয়ে?

আমাব ধারণা আর নতুন কি হবে। পুলিশই তো বলেছে, অ্যাকসিডেন্ট। আপনারা বায়েল মিটে গেল।

তা গেল। তবু, মানে—

আপনার তা মনে হচ্ছে না। কেন, বলুন তো, আপনাব কি সত্যি মনে করবার কোন কারণ আছে এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, আত্মহত্যা বাত্মনই?

বিমলবাবু কহিলেন, কাবণ যদি বলেন তো—কিছুই নেই। কিন্তু তবু আমাব প্রথম থেকেই কি রকম একটা মনে হচ্ছে—মানে একে-ইনস্টিংক্ট বা ইনটুইশন বলতে পারেন।

নার্তাসনেস বলেছিলাম মনে পড়েছে। বেশ, সেই কথাটাই একটু বুঝে দেখা যাক। পুলিশকে আপনি বলেছেন, আত্মহত্যা করা সম্ভব, এমন কোন কথা তাঁর চালচলনে আপনার মনে হয় নি। কেন?

কারণ, আত্মহত্যা যারা কবে, তাদের মধ্যে লজ্জা ক্ষোভ, ভয় বা ওই রকমের কোন ষ্ট্রং ইমোশন

থাকে, সেটা চাপাও থাকে না সাধারণতঃ। বা হয়তো প্রকৃতিগত বিষয়তা থাকে, মেলাংকলিয়া। কিন্তু একথা আমি আপনাকে বলছি কেন, আপনিই তো ডাক্তার।

তা বলুন। এর মধ্যে তার কোন লক্ষণ ছিল না?

একেবাবেই না। যা ছিল সে বরং এর উলটো।

উলটো মানে?

মানে একটা প্রচণ্ড কনফিডেন্সেব ভাব—তাকে আত্মপ্রত্যয়ই বলুন আর দস্ত বা অহমিকাই বলুন। সেটা বার থাকে সে পরের মাথা ফাটাবে—আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?

কিন্তু সত্যি যদি দস্ত বা অহমিকাই প্রবল থেকে থাকে তাঁর মধ্যে, তবে তো এমনও হতে পারে, সেই জগ্রেই তাঁর শত্রুও আছে।

অসম্ভব নয়।

এবং হয়তো সেই কথা ভেবেই আপনার মনে হয়েছে এটা খুনও হতে পারে?

তাও সম্ভব। মানে, অতটা অ্যানালাইজ করে দেখি নি নিজের মনকে বা ধারণাকে।

বেশ, ধরে নিলাম তাই। কিন্তু দস্ত থেকেই যদি এক সৃষ্টি হয়, হবার কথা তাঁর কর্মস্থলে। এখানে হবে কি উপলক্ষ্যে? আর সেখানকার লোকও ট্রেন ভাড়া খরচ করে এতদূর আসবে না তাঁকে খুন করতে। মানুষ খুন, সে আসামে বসেও কবাব খায়। কলকাতায় আসিই বরং বিপজ্জনক। কলকাতায় অনেক পুলিশ। এক যদি, আপনার হোটেলেরই কোন লোককে খেপিয়ে তুলে থাকেন তাঁর আচরণে। সে রকম কিছু হয়েছে?

না না, সে রকম হবার স্কোপ কোথায়। কতক্ষণই বা থাকতেন ঘরে, আব কতটুকুই বা দেখাসাক্ষাৎ হত আমাদের সঙ্গে। তা ছাড়া ধরুন, হোটেলের কোন বোর্ডার বা কর্মচারী-চাকরবাকরের সঙ্গে হলে, তার জেব দৌড়বে গালাগালি, বড-জোর একটা কাপ-ডিশ ছুঁড়ে মারা পর্যন্ত। খুন অবধি যাবে কেন?

তা তো নিশ্চয়ই।

কিন্তু, কিছু-মনে কববেন না, সব ভেবেও তবু আমি শাস্তি পাচ্ছি না। পুলিশ যা বলেছে বলুক, তবু

আপনি একবার খুঁজে দেখুন, সত্যি করে আমার হোটেলের মধ্যে থেকেই হল কিনা কিছু।

ডাক্তার হাসিলেন : কি রকম হল? এফুগি বললেন হোটেলের ভেতর থেকে হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আবাব এফুগি বলছেন তাই হয়ে থাকতে পারে বলে আপনার সন্দেহ।

সন্দেহ নয়। যদি হয়ে থাকে বলে ভয়। মানে, যুক্তিব দিক থেকে বুঝি অসম্ভব, অথচ মনের মধ্য থেকে ভাবছি, যদি হয়ে থাকে। আপনি আমার সংশয়টা দূর করুন, প্রীজ। শুধু, কি হয়েছে সেটা আমাকে বলে দেবেন, আই উড নো হোয়াট ইজ হোয়াট। আপনার যা ফী হয় আমি দেব।

ডাক্তার আবাব হাসিলেন। আমার ফী নেই কিছু। বেশ, আপনি যখন এতই অস্থির হচ্ছেন, দেখব একবার খুঁজে। তা হলে আপনারও কিছু হেল্প করতে হবে আমাকে।

নিশ্চয়।

আচ্ছা। প্রথমে, আপনার হোটেলের ঘরগুলো, আব তার বোর্ডাররা—মানে ঠিক এই সময়ে যারা ছিল বা আছে—এর একটা পুরো আইডিয়া দিন আমাকে। মুখে মুখে পারবেন, না খাতাপত্র দেখে বলবেন?

মুখে মুখে কিছুটা পারব। আমার বাড়িটা হচ্ছে তিনতলা। একতলায়, সামনে দুটো ঘর—একটা খালি, একটা পানীয়ের।

কি পানীয়?

চা, শরবত, ওভ্যালটিন। মানে সব রকমই—মদ বা নেশা ছাড়া। একতলার পেছনদিকটা হচ্ছে স্টোর, কিচেন। চাকর-বয়রাও ওরই মধ্যে থাকে।

বুঝলাম।

দোতলা আর তেতলা, ছোট ছোট স্টুট। একটা ছোট্ট বদবার ঘর, তার পেছনে শোবার ঘর একখানা, তার পেছনে বাথরুম। এমনি স্টুট—সামনেব দিকে পাশাপাশি ছখানা, পেছনেব দিকে ছখানা। মাঝখানে, মানে তিনখানা স্টুট এদিকে, তিনখানা ওদিকে রেখে, সিঁড়ি।

লিফট?

না। সিঁড়ি। তেতলার পেছন দিকে এই স্টুটেরই
তিনটে একত্র করে নিয়ে আমি নিজে থাকি।

তা হলে আপনার স্টুট হল দোতলায়। সামনে ছয়
পেছনে ছয় বারো, তেতলায় সামনে ছয় পেছনে তিন নয়,
মোট একুশটি। এর সবকটাতেই ভাড়াটে আছে?

সর্বদা থাকে না। আবার অনেক সময় এমনও হয়,
লোক ফিরিয়ে দিতে হয়। অবস্থা অনেকেই দু'চারদিনেব
জন্তে আসে, আবার চলে যায়। একটানা থাকবাব লোক
কম।

বেশ। যিনি মাঝা গেলেন, তিনি থাকতেন কোথায়?
তিনতলায়। একেবারে দক্ষিণ পাশে, সামনের দিকেব
স্টুটে। এটিই তাঁব পছন্দ ছিল।

সবচেয়ে ভাল ঘব বলে?

হতে পারে। প্রথম বাবে এসে এটিতেই উঠেছিলেন,
তাই থেকেও হতে পারে। 'আমাব ঘবটা' বলেই বলতেন
চিঠিপত্রে।

হ্যাঁ, আগে থেকে চিঠি দিতেন, আপনি বলেছেন।
তারপব? তেতলায় আর কজন আছেন?

আপাততঃ বেশী নয়। মানে, বাইরের বোর্ডার বেশী
হয় ছুটিছাটায়।

তেতলায় ছিলেন, সামনের দিকে—উনি এক নম্বর।
দুই-তিন খালি। তাবপর সিঁড়ি। চার নম্বরে একজন
ডাক্তার। তিনিই ববং কিছুদিন একটানা আছেন,
মাসখানেক বা আবও একটু বেশী। পাঁচ খালি। ছয়ে
একজন সিন্ধী বিজনেসম্যান, ঠিক তাব আগেব দিনই
এসেছেন। ইনি বোধ হয় কাল চলে যাবেন। এখন তো
ছেড়ে দিতে বাধা নেই?

বাধা থাকলেই বা আটকাচ্ছেন কি কবে।
আটকাবাব হয়, পুলিশ বুঝবে। পেছনের স্টুটে?

পেছনের একটা স্টুটে আছেন একজন গবর্নেন্ট
অফিসাব, ইঞ্জিনিয়ার। ইনি আগেও এসেছেন দু-তিনবাব।
অফিসেব কাজে আসেন, আবার ফিবে চলে যান। বাকি
দুটো খালি।

দোতলায়?

দোতলায় বারোটা স্টুট। গোটা দুই খালি আছে।
বাকিগুলো ভর্তি। বোর্ডাররা সবই দু-তিন-চার দিনেব।

সকলের বর্ণনা দিতে হলে খাতা খুলতে হবে। তেতলায়
ওই কটি লোক, তাতে আমিও পাশেই থাকি, তাই সহজে
মনে থাকে।

দোতলায় এত ভিড়, তেতলা খালি। কেন?
তেতলায়ই তো হাওয়া বেশী।

ভাড়াও বেশী। তা ছাড়া সিঁড়ি ভাঙতে সবাই
চায় না।

আচ্ছা। সেদিন ঠিক ওই সময়টাতে, তেতলাব
বোর্ডাররা সব কোথায় ছিলেন?

সিন্ধী ভদ্রলোক বাইরে গিয়েছিলেন, বোধ হয় তাঁর
বিজনেসের ব্যাপাবে। ইঞ্জিনিয়ার আর ডাক্তারবাব
ঘরেই ছিলেন।

এঁরা বাঙালী?

হ্যাঁ।

কি রকম লোক?

ইঞ্জিনিয়ার কম বয়স, ত্রিশ-বত্রিশ হবে। আমাব
সঙ্গে অল্পই আলাপ হয়েছে। মোটামুটি বেশ অমাধিক
ভদ্রলোক বলেই দেখেছি। মফস্বলে কোথাও থাকেন।

আর ডাক্তার?

ডাক্তার বয়স্ক লোক। আমার বয়সী তো বটেই,
কিছু বেশীও হতে পারে। তাব মানে, ধরুন পঁয়ষট্টি।
কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল, দেহেব বাঁধুনি ভাল, অতটা বয়স দেখায-
না। ছোটখাট ফিগার, খুব স্মার্ট। কথাবার্তা কম
বলেন, কিন্তু যেটুকু বলেন খুব বিদ্বান-বুদ্ধিমান বলে বোঝা
যায়, অহঙ্কার-অভিমানও নেই। মাসখানেকের ওপব
আছেন। সামনের সপ্তাহে চলে যেতে পাবেন, আজই
বলছিলেন।

কোথাকাব লোক?

নর্থ বেঙ্গলের। বোধ হয় রাজশাহী।

ডাক্তার মানে, এলোপ্যাথ?

সম্ভবত। মানে, ডাঃ সান্তাল বলে চিঠি এসেছে
তাকে, তাই দেখে বুঝেছি। জিজ্ঞেস কবি নি।

কিন্তু ডাক্তার যদি হন, প্রফেশনাল লোক। এখানে
এসে এতদিন আছেন কেন? এখানে প্রফেশন কবেন?

না। আছেন তাঁর নিজের চিকিৎসাব জন্তে।

কি অস্থখ? বললেন না, ভাল স্বাস্থ্য ভাল বাঁধুনি?

ইতিহাস গবেষকের জোথ এড়িয়ে জোলা ...

আদিম মানুষের প্রথম শিলালিপির অর্থ আজ স্বচ্ছ। বহুযুগের নিকরদেশ ইতিবৃত্ত আজ আর কপকথা নয়। কেবল যেটি প্রতিদিনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—মানুষ আর অল্পের সম্বন্ধ—তার ধারাবাহিক ইতিহাস কই? ইতিহাসের পুঁথিকার ভুললেও ভোলেমনি বেদের উদ্গাতা... স্মৃতির ভাষাকার... পুরাণের বচনাকার অর্থশাস্ত্রের জনক। বৈদিক যুগে আর্যবা বালি খেতেন, আশ্চর্য লাগে ভারতে, কিন্তু সত্যি, বালি এবং ধানই ছিল তাঁদের প্রধান খাদ্যশস্য। তারপর এল গম এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু বালি মানুষের খাদ্য হিসেবে থেকে গেল... আজও। ভারতবর্ষে এখনো অসংখ্য মানুষ বালির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বালিশস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বালি ও শুভো বালি সহজে হজম হয় এবং শারীরিক্রিয়ায় সহায়ক হয় বলে বন্দীদের জন্তই এর বহুল ব্যবহার।



‘ববিনসঙ্গ পেটেন্ট বালি’

সর্বাধুনিক কাবখানায় উৎকৃষ্ট বালিশস্য থেকে
স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী হয়।

এই জাত ‘ববিনসঙ্গ পেটেন্ট বালি’ কৃষ্ণ,

শিঙ ও প্রস্তুতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ঝুবা ও বৃদ্ধবাও এ বালি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটল্যান্টিস (ইন্ট) লিমিটেড
(ইংল্যান্ডে সংগঠিত)

অস্থখ, মানে ব্লাড-প্রেসার। আর, পায়ে একটা প্যাচ-মতন আছে, বোধ হয় একজিমা। তাই দেখাতে মাঝে মাঝে ট্রিপিকালে যান। সেইটার জন্তেই এখানে এসে আছেন। প্রফেশন থেকে প্রায় রিটায়ার করে আছেন, প্রেশারের জন্তেই, একদিন বলছিলেন।

প্রেশারের বোগী, তো অত উচুতে ঘর নিলেন কেন?

নিরিবিলি জন্তে। সিঁড়িতে তাঁর বিশেষ ঘাষ-আসে না, কাবণ বাইবে বড একটা বেবোন না। একমাত্র ট্রিপিকালে যাওয়া বা ওইরকম জরুরি কিছু ছাড়া। সে ধরুন সপ্তাহে একদিন বা জোর দুদিন। নইলে ঘবেই থাকেন। খাওয়াটাওয়াও ঘরে বসেই হয়।

ঘবে বসে সারাদিন কি কবেন?

পড়াশোনাই প্রধানতঃ। অনেক বই। তাই নিয়ে এসেছেন।

বেশ। শুভুন। আপনার হোটেলে আমি কাল যাব, বোর্ডার হব। তেতলায়, দক্ষিণ দিকের ঘরটা।

মানে, সেই ঘরটা?

হ্যাঁ। তাঁর জিনিসপত্র এখনও আছে সেখানে?

আছে, সেজন্তে আটকাবে না। বেশী কিছু তো নয়, একটা স্মটকেস, আর ছোট বিছানা একটা, জুতো জোড়া দুই, এইসব। সে আমি অত্র সন্ধ্যাে রেখে দেব।

আজই সরাবাব দবকার নেই। যেমন আছে থাক, আমি কাল গেলে তখন হবে।

কখন যাচ্ছেন?

ধরুন, আটটা নাগাদ। মানে, সাড়ে সাতটায় দিল্লী মেল আসে। আমি হব তাব যাত্রী।

বেশ। আমি অফিসঘরেই থাকব। ওই কথা রইল তা হলে।

হ্যাঁ। ওখানেই খাব কাল রাত্রে। বিছানা কি আপনারা দেন?

দিই, অনেকে নিষেও আসেন।

আমিও নিয়ে যাব। আচ্ছা।

পরদিন ঠিক আটটায় দুইজনে ট্যাক্সি চাপিয়া হোটেলের সম্মুখে গিয়া হাজির হইলাম। বিমলবাবু অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। হোটেলের রেজিস্টারে ডাক্তার নাম লিখিলেন, অসীমকৃষ্ণ দত্ত, এডভোকেট, এলাহাবাদ।

নীচে কিছু করিবাব ছিল না, আমরা সোজা তিনতলায় উঠিয়া গেলাম।

স্মটক বিশেষ বড নয়, কিন্তু ভাল, একজনের থাকিবাব পক্ষে চমৎকাব। ভিতরের ঘরে একটা খাট, একটা কাপডেব আলনা, বাহিরেব ঘরে চেয়াব-টেবিল, একপাশে আয়না ও হাট-র্যাক একত্রে। সম্মুখে পূর্বদিকে অনাবৃত বাবান্দা-ছাত, দক্ষিণে দুইটি বড জানালা। সম্মুখ-দিকে একটা জানালা।

আমাদেব সন্ধে ছিল একটা স্মটকেস ও ছোট একটা বিছানা, হোটেলেরই চাকর লইয়া আসিয়াছে। নামাইয়া দিয়া সে প্রস্থান করিল। ডাক্তার বিমলবাবুকে কহিলেন, আপনি এবার নীচে যান। ঠিক আধঘণ্টা পরে একবার আসবেন।

বিমলবাবু বলিলেন, এর মধ্যে যদি কিছু দরকাব হয়? হবে না।

তবু, হয় যদি তো ঘণ্টা বাজাবেন, এই স্মইচ।

এ ঘণ্টা কোথায় বাজে?

দোতলায়। সেখানে দবোয়ান থাকে, ঘণ্টা দিলেই চলে আসবে। তাকে বলে দেবেন।

বিমলবাবু চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার কহিলেন, চল।

দুজনে ছাতে বাহিব হইলাম। দ্বারের মাথায একটা আলো জালিয়া দিয়াছিলেন বিমলবাবু, সমস্ত ছাতটা আলোকিত।

ডাক্তার কহিলেন, এটা না থাকলে ভাল হত।

আমি কহিলাম, নিবিষে দেব?

না, থাক।

দুইজনে ছাত ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। পাশের দুইটি ঘর তালাবন্ধ। তাবপর সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে কোন কবাট নাই। সিঁড়ি পরে প্রথম ঘরে আলো জলিতেছে, দরজা ভিতব হইতে বন্ধ। এইটি সেই ডাক্তারের ঘব। তাহার পরের দুইটি ঘবও খালি, তালাবন্ধ।

ছাতের প্রান্ত পূর্বন্ত গিয়া ডাক্তার ফিরিলেন। আমাদেব দুজনেরই পায়ে শব্দহীন জুতা। সিঁড়ি ব সোজা ছাতের মাঝামাঝি জায়গাতে, বেলিংয়ের গায়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। আমিও পাশে দাঁড়াইলাম।

ঢালাই লোহার রেলিং, উপরে কাঠের 'পাড'।
অল্পমান ছয় ফুট অন্তর কংক্রিটের থাম, তাহাতে বেলিং
আবদ্ধ। রেলিংয়ের নীচে পাটি ও ছাতের মধ্যে প্রায়
পাঁচ ইঞ্চি ফাঁক। রেলিংয়ের বাহিবে সফ্র কানিশ।
আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছি ঠিক তাহাব সোজা হুজিই
হোট্টেলে প্রবেশের পথ। তখন থাওয়ার সময়, লোকজন
চুকিতেছে বাহির হইয়া যাইতেছে, আমবা মাথার উপরে
দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

ছাতটা লম্বা, বাড়ির সমান মাপে, কিন্তু চওড়া খুব
বেশী নয়, বোধ হয় ফুটছয়েক। নীচে দোতলার ছাতটাও
সম্ভবতঃ সমানই চওড়া, বা আবও কম—অন্ততঃ এটাব
চেয়ে বেশী চওড়া নয়—বেলিংয়ের উপরে বেশ শানিক
ঝুঁকিয়াও দোতলার রেলিং চোখে দেখিতে পাইলাম না।

তিন চাব মিনিটকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া, আমবা ঘবে
ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।
সম্মুখেব দিকে একটা বড় জানালা, সেটাও বন্ধ করিলেন।
ভিতরের ঘরে খাটের উপরে একটা ছোট বিছানা পাতা,
পাশে আলনাব পাথার উপরে স্টকেস, মৃত ব্যক্তির।

ডাক্তার বিছানাটাকে তুলিয়া দেখিলেন, চাদর,
তোশক, সতবন্ধি, সব উলটাইয়া ও টিপিয়া টিপিয়া
দেখিলেন। বিছানাব মধ্যে কাগজপত্র জাতীয় কিছুই
নাই। তাবপব স্টকেসটা লইয়া বসিলেন। তালা বন্ধ
ছিল। ডাক্তার পকেট হইতে একটা লম্বা কাঁটা বাহির
করিলেন, সেইটা দিয়া চাড দিয়া তালা খুলিয়া ফেলিলেন।
বাক্সের মধ্যে মালপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। কাপড়-
চোপড়, কিছু কাগজপত্র ও চিঠি। সেগুলি পরীক্ষা
করিয়া দেখিতে দেখিতে ডাক্তার কহিলেন, পরিচয়টা
ঠিক। হেডমাস্টার সত্যিই, এটা জানা গেল।

আমি কহিলাম, মিথ্যে পরিচয় দেবে কেন?

দেয়ও কেউ কেউ। না, আব কিছু জানবার নেই
এব মধ্যে। পুলিশও নিশ্চয়ই দেখেছে এগুলো।

স্টকেস ওছাইয়া আবার বন্ধ করিলেন তিনি।
বিছানাটা ওটাইয়া বাঁধিলেন। একপাশে সরাইয়া রাখিয়া,
নিজেব বিছানাটা খুলিয়া পাতিয়া লইলেন। কহিলেন,
আজকের মত আর কিছু করবার নেই।

তা হলে আমি এবার চলে যাব?

যাবে, বিমলবাবু আসুন।

বলিতে বলিতে বিমলবাবু আসিয়া পড়িলেন।
কহিলেন, এ কি কাণ্ড, আপনি নিজে নিজে এসব কবতে
গেলেন কেন?

ডাক্তার কহিলেন, তাতে আর কি হয়েছে। এগুলো
কি এখানেই থাকবে, না অল্পত্র নিয়ে রাখবেন?

আপনি কি বলেন?

আপনার যা খুশি।

বেশ, সরিয়েই রেখে দেব। কেউ আসেন তো নিয়ে
যাবেন।

হ্যাঁ। পুলিশ দেখেছিল এগুলো?

দেখেছে।

তবে আর কি। যাক। আপনি আব কিছুক্ষণ
পরে আমাব খাবারটা পাঠিয়ে দেবেন। আজকের মত
আব কিছু কবাব নেই। কাল যা হবাব হবে।

আমাকে বলিলেন, তুমি কাল রাত্রে আসবে, আটটা
আন্দাজ। বাড়িতে বলে এস, এখানেই থাকবে, হয়তো
থেকেও যেতে হতে পারে।

পরদিন রাত্রে, আটটার আগেই গিয়া হোট্টেলে
ডাক্তারের ঘরে হাজির হইলাম। কহিলাম, কি করলেন
সারাদিন?

কিছুই না। ঘুবে ঘুরে হোট্টেলটা দেখলাম। কথা
সত্যি, প্রত্যেকটি বোর্ডারই সভ্য এবং সুস্বাস্ত। বীতিমত
বাছাই না করে বোধ হয় বোর্ডার নেন না ভজলোক।
বাকি সময়টা ঘুমোলাম পড়ে পড়ে।

ঘুমোলেন?

ঘুমোব না তো কবব কি সারাদিন?

সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল?

হল বই কি কিছু কিছু। সকলের সঙ্গে না হোক
অনেকের সঙ্গে। বাঁধাবাড়াও ভাল। বাড়ি ছেড়ে
এসে থেকে গেলেও হয় দিন-কতক।

থাকবেন তাই?

দেখি ভেবে।

ওদিকে? পেলেন কিছু?

পাব আর কি। খেতে পেলাম বারতিনেক, বেশ

গ্যাণ্ড খাওয়া। আর একবার পাব নটাব পরে। দামও নেবে না মনে হচ্ছে।

তা নেবে না। কিন্তু কাজেব কি হল?

হবে আবার কি। যা হবার তাই হবে।

মানে, মাকসেস?

জালালে। আরে, যার কাজ সে করেছে, মাকসেস হল কি হল না সে তাব মামলা। আমাব মাকসেসই বা কি আর ফেলিবই বা কি।

কহিলাম, যাক। এখন, এবার কি কাজ আছে?

কাজ? এখুনি এসে পড়বে। বলিতে বলিতে বিমলবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে এক ভৃত্য, তাহার হাতে কয়েকটি মোটা ও বৃহৎ আকারের খাতা। দেখিয়াই বুঝিলাম, হোটেলের হিসাবপত্রের খাতা।

ভৃত্য চলিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, দিন। বিমলবাবু ও আমি দুইটা চেয়ার লইয়া বসিলাম। ডাক্তার খাতাগুলি এখানে সেখানে পড়িয়া দেখিতে আবশ্য করিলেন। কিছুকাল পাতা উলটাইয়া কহিলেন, আপনি আর এখন বসে কি করবেন। আপনার নিশ্চয়ই কাজ আছে?

তা হোক।

এখানে বসে থাকবার তো দরকার নেই। আপনি ববং এখন নীচেই যান। দশটার কাছাকাছি আমার খাবারটা নিয়ে আসতে বলবেন। আপনিও সেই সময়ে একবার আসবেন। আমাব ততক্ষণে এগুলো অনেকটা দেখা হয়ে যাবে।

আচ্ছা। বিমলবাবু চলিয়া গেলেন। তাঁহার বসিয়া থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন মনে হইল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কাল ধরিয়া ডাক্তার খাতা দেখিলেন। প্রতিটি পাতা উলটাইয়া দেখিলেন, তাবপব কয়েকটি খাতা বিছানাব উপরে পাশাপাশি মেলিয়া রাখিয়া মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছু কিছু কথা একটা কাগজে পাশাপাশি টুকিয়াও লইলেন। খাতার কতকগুলি স্থানে কাগজের টুকরা দিয়া পৃষ্ঠা-চিহ্ন দিলেন, তাবপর খাতাগুলি বন্ধ করিয়া এক পাশে ঠেলিয়া দিলেন। কহিলেন, বোধ হয় বুঝিছি।

আমি খাতাগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলাম। একটা,

বোর্ডারদের বেজিস্টার। নাম, ঠিকানা, ঘরের নম্বর, আসা ও যাওয়ার তারিখ, মোট বিল, প্রাপ্তির স্বীকার।

একটা, মালপত্র কেনাব হিসাব। মালপত্র কন্ট্রোল্লের কাছে কেনা হয়, তাহার দেওয়া মূল্য তালিকা মলাটে আঁটা রহিয়াছে।

একটা, স্টোর বই। কোন দিন কত মাল ভাঙাবে জমা হইল, কত মাল বাহির হইল, কে লইয়া গেল, তাহার নিখুঁত বৃত্তান্ত।

খুব পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করিয়া হিসাব রাখা হইয়াছে। প্রতি বৎসরের খাতা আলাদা, গত তিন বৎসরের ও বর্তমান বৎসরের খাতা।

একখানা, সার্ভিস খাতা—ভৃত্য, পাচক, প্রত্যেকের নাম ধাম, কে কবে আসিল কবে চলিয়া গেল, ছুটির হিসাব, বেতন, চলিয়া যাওয়ার কারণ, সমস্ত কথা। এত নিখুঁত খাতা রাখা আর কখনও দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।

দশটার কিছু পূর্বে খাবার আসিয়া পৌঁছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিমলবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অধীব অবস্থা।

ডাক্তার কহিলেন, দেখলাম মোটামুটি। কয়েকটা কথা মাত্র আপনার বুঝিয়ে দিতে হবে।

বিমলবাবু অধীবতা স্পষ্ট, তবু তিনি সৌজ্ঞেয় হানি কবিলেন না। কহিলেন, আগে আপনারা খেয়ে নিন।

ডাক্তার কহিলেন, সে পবে হবে। আগে কথাটা সারা হোক।

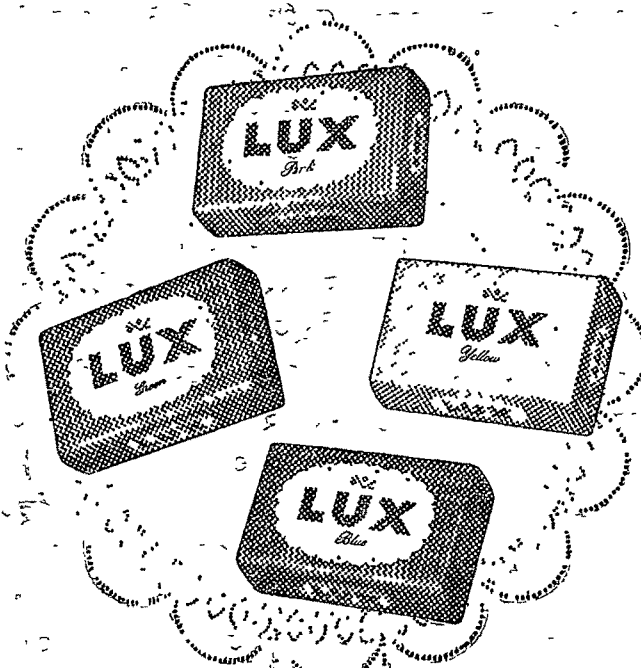
বিমলবাবু কহিলেন, না না। কথা তো সারা রাত ধবেই হতে পারবে। রাত হয়ে গেছে। খাওয়াটাই আগে।

ডাক্তার কহিলেন, আরে, না, এখন খেলে তাড়াহুড়ো কবে খাব, খেয়ে আরাম পাব না। আপনারা সারারাত ভাল, আপনিও রোজ খাওয়াচ্ছেন না। ওটা তখন ধীরে স্বস্থ হবে। আর, কথাও বেশী নয়।

বেশ, বলুন তা হলে, তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই।

ভৃত্য খাবাব সাজাইয়া ঢাকা দিয়া বাখিয়া চলিয়া গেল।

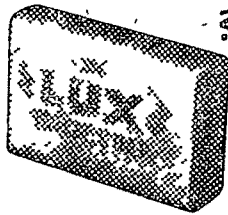
ডাক্তার কহিলেন। চার বছরের খাতা দেখলাম। মোটামুটি আপনার ব্যবসা একই রকম চলছে এই



পূজো
আসছে!

“আমার প্রিয়
লাক্সও তাই
৪ টি রামধনু
রঙে

—আর সাদাটিও রয়েছে!”



রূপসী সুগন্ধি চৌধুরী বলেন

চিত্রতারকার বিশুদ্ধ,
কোমল সৌন্দর্য-সাবান



হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS.104-X52 BG

ক বছর, মানে বোর্ডাবেব সংখ্যা আর আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে যতটা বোঝা যায়।

তা চলছে।

চাকবাকব আপনাব এখানে যারা ছিল গত তিন বছরের মধ্যে, তার মধ্যে অনেকেই টিকে আছে, জনকতক ছেড়ে গেছে। যদি দরকাব হয়, তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে?

মোটামুটি যাবে। দুজম মাবা গেছে। বাকিদের ঠিকানা আছে আমাব কাছে।

একটি কথা আমাকে বলুন। যা দেখলাম, মোটামুটি বোর্ডাব বা মাল বেচাকেনা আপনার প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে প্রায় একই রকম চলছে। কিন্তু গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধবে আপনার বরফ কেনাটা বেড়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই মণখানেক বরফ আপনি বেশী কিনেছেন, আগের সপ্তাহের তুলনায় বা গত কয়েক বৎসরের এই সময়ের তুলনায়। সববতের বিক্রী বেড়েছে বলে? কিন্তু তা হলে তো সববতের মশলা কেনা বা সববত বিক্রীর হিসাবও বাড়ত। এটা কেন?

বিমলবাবু কহিলেন, একটা জিনিস লক্ষ্য কবেন নি। বরফ কেনা বেড়েছে, কিন্তু সে বরফ আমার স্টোর-খাতায় জমা বা খরচ লেখা হয় নি।

ডাক্তাব দুইটি খাতা মিলাইয়া দেখিলেন। কহিলেন, তাই বটে। এতে কি বোঝাচ্ছে?

বোঝাচ্ছে যে কেনা হয়েছে, কিন্তু সে বরফ আমার হোটেলের হিসাবে নয়। ওটা বাড়তি।

কেন? কার অস্থবিস্থ বাড়িতে?

না। ওটা এসেছে, এই ক্লোরাই এক ডাক্তার আছেন, তাঁব জন্তে।

ডাক্তাব মানে, চাব নম্বর ঘর তো? দেখা হয়েছে আজ সকালে। কিন্তু তাঁর জন্তে বোজ এক মণ করে বরফ কেন? কত সববত খান?

তাঁর অনেক রকম কাজ। কি এক রকম মাছ কিনেছেন অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে, নিষে যাবেন। সাই-বেবিয়ার মাছ, বরফ আব বরফ-গলা নদীব মধ্যে বাস। বরফ-জল দিবে জীইষে রাখা হচ্ছে তাদের।

ইন্টারেস্টিং। কাল দেখতে হবে।

কিন্তু বরফ নিষে এত ভাবছেন কেন আপনি?

না না, ভাবব কেন। ওটা হল, খাতাগুলো মিলিয়ে পড়ছি, সবই বেশ গায়ে গায়ে মিলে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখি ওই একটা জিনিস কি বকম খাপছাড়া হয়ে গেল। তাই। স্রেফ আইডল্ কিউরিয়সিটি।

ও।

তা, হিসেবপত্র তো যা দেখলাম আপনাব, খুবই চমৎকার বাখা হয়। অডিটর বা ইনকামট্যাক্স অফিসকে ভয় করবাব তো কিছু নেই আপনাব।

বিমলবাবু একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

ডাক্তার কহিলেন, কে লেখে আপনাব খাতাপত্র?

আমিই লিখি। ও বস্তু নিজের হাতে না রাখলে ব্যবসা টিকবে কেন।

কিন্তু আশ্চর্য কাজ আপনাব। পাকা অ্যাকাউন্টেন্টকে হাবিয়ে দিয়েছেন। ভাল কথা, ডাক্তাববাবুর সেই মাছ, তাব নাম কি জানেন?

না। তা, সে তো তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই হবে।

তাই করব। মানে, ওবকম মাছের কথা বইষে পড়েছি। পাওয়া গেল যখন, একবার দেখে নেব।

বলিতে বলিতে ডাক্তাব হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দরজাব কাছে চলিয়া গেলেন, এক টানে দরজা খুলিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি এক লাফে তাঁহাব সঙ্গ ধরলাম। বিমলবাবু 'কি হল' বলিয়া আমাকে অল্পসরণ করিলেন।

বাবান্দায় আলো। দেখিলাম, একটি মূর্তি, সর্বাঙ্গ বেড়িয়া একটি ঘোর বঙের চাদর, সিঁড়ির মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। ডাক্তার দ্রুতপদে সেই দিকে ছুটিলেন, আমরা পিছনে চলিলাম।

সিঁড়ির মুখে যখন পৌঁছিলাম তখন সিঁড়ি জনশূন্য। সিঁড়িটা দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝখানে একটি চওড়া ল্যাণ্ডিং, সেখানে ঝাঁকিয়া আবার বিপরীতমুখে গিয়া দোতলায় পৌঁছিয়াছে। আমবা সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া চলিলাম। মাঝখানে পৌঁছিয়া দেখি, নীচে হইতে একটি ভদ্রলোক উঠিতেছেন, হালকা রঙের স্ট পরা।

বিমলবাবু কহিলেন, ডক্টর সাহাল, বাইরে থেকে?

ভদ্রলোক কহিলেন, হ্যাঁ, একটু কাজ ছিল। ডাক্তারবেব দিকে চাহিয়া কহিলেন, এই যে! নমস্কাব।

বিমলবাবু কহিলেন, একটা লোককে নেমে যেতে দেখলেন?

সাত্তাল কহিলেন, নেমে যেতে? কি বকম লোক বলুন তো?

চেহারাটা ঠিক বলতে পারব না।

মানে, অচেনা কেউ?

দেখলেন কাউকে?

একটা লোক নেমে গেল বটে আমার পাশ দিবে। সে তো সোজা নীচের দিকে চলে গেল।

কি বকম লোকটা? চাদর মুড়ি দেওয়া?

চাদর? না তো। বিশেষ লক্ষ্য কবি নি, তবে মনে হল হোটেলেরই চাকরবাকর কেউ হবে। কিন্তু ব্যাপার কি?

একটা লোক, ওপরে উঠে এসেছিল। হঠাৎ চুবিব মতলব। আমবা এঁর ঘবে ছিলাম, বেবিঘে পডতেই সট করে সরে গেল।

ডাক্তার কহিলেন, যে লোকটা নেমে গেল বললেন, তার চেহারা কিছু মনে আছে আপনার?

লক্ষ্য করি নি। মানে, আমার অভ্যাসই হচ্ছে নীচের দিকে চেয়ে চলা। হঠাৎ ওপরে চাইলে মাথা ঘুরে যায়—প্রেশাবের গুণ। তা ছাড়া লক্ষ্য করার মত কাবণ তো ঘটে নি কিছু—পাশ কাটিয়ে নেমে গেল, আমি ভেবেছি ওপরে কোন কাজ ছিল, বা সত্যি বলতে ভাবিই নি কিছু।

বিমলবাবু কহিলেন, তাকে দেখলে চিনতে পারবেন? যদি হোটেলের লোকই হয়?

ভদ্রলোক কহিলেন, খুব সম্ভবত পারব না। হোটেলের সবাইকে আমি চিনি নে, আমার তো বাসস্থান আমার ঘবটি। তবে, বলেন তো চেষ্টা করতে পারি। ডাকবেন সবাইকে?

ডাক্তার কহিলেন, না, অতটা দরকার হবে না। বোধ হয় আমাদেরই ভুল। এমনি দরকারে ওরা কেউ উঠে এসেছিল, আমরা আচমকা দেখে ভেবেছি চোবটোব হবে। চলুন বিমলবাবু। বলিয়া ডাক্তার ফিরিয়া আবার উপবে চলিলেন।

তেতলায় পৌছিয়া সাত্তাল কহিলেন, আস্থন না, বসবেন একটু।

আবাব আপনাকে ভোগাব এই বাত্রে?

বাত আর কি। আস্থন, দুটো মিনিট, কি আর হয়েছে।

সাত্তাল চার নম্বর স্টেব দবজা খুলিলেন, আলো জালিলেন, আমবা প্রবেশ কবিলাম। একই মাপেব ঘর, প্রায় একই বকমের সজ্জা।

ডাক্তার কহিলেন, ডেকেই আনলেন, তো একটি নিবেদন।

সাত্তাল কহিলেন, বলুন।

বিমলবাবু বললেন, আপনি নাকি কি মাছ কিনেছেন, সাইবেরিয়ান? একবার দেখতে পারি?

নিশ্চয়। আস্থন দেখবেন।

ভিতরে, বাথরুমের মধ্যে, একটি ছোট বাথটব, তাহার মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি মাছ। সাত্তাল হাতে কবিয়া দুটি একটিকে তুলিয়া দেখাইলেন। চ্যাপ্টা আকার, দুই পাশে কাঁটা, খুব উজ্জল নীল বা সবুজ রঙ।

ধরিয়া দেখিলাম, হিম ঠাণ্ডা। বাথটবেব পাশে মেঝের বরফের বড একটা চাঙড।

ডাক্তার কহিলেন, হয়েছে, ছেড়ে দিন, কষ্ট পাচ্ছে।

সাত্তাল মাছকে আবাব জলে নামাইয়া দিলেন। কহিলেন, হাওয়া সহ্য কবতেও পাবে না বেশীক্ষণ।

ডাক্তার কহিলেন, এর নাম কি?

ক্যাটালিনা মাস্‌পীডা।

এডিবল?

মোটামুটি সব মাছই এডিবল। স্বাদ কি বকম দেখাব ইচ্ছে আছে। মানে, এত কম টেম্পারেচারে মাছ বাঁচতে পারে কি না, তাই নিয়েই বহুকাল তর্ক ছিল। এ মাছ পারে। শুধু পাবে নয়, একেবারেই গরম সইতে পারে না—নরমাল ব্লাড-টেম্পারেচার হচ্ছে চুবানবই ডিগ্রী ফারেনহাইট, জলেব টেম্পারেচার পঁচাত্তরেব বেশী হলেই এবা কাহিল হয়ে পড়ে।* দেখবেন?

না না, কি কাজ এঁদের কষ্ট দিবে। আচ্ছা, উঠি। ভালই হল, আমাব একটা কোঁতুল মিলল। এঁদের কথা বইয়েই পড়েছিলাম, দেখা হল।

আচ্ছা, বাতও হল। আসবেন, আমি তো ঘরেই থাকি প্রায় সারাদিন।

আর আসব কবে, কালই পালাচ্ছি।

কালই ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এসেছিলাম সামান্য কাজে, সে কালই চুকে যাবে। কাল দুপুরেরটা না ধরতে পাবলেও সন্ধ্যাব ট্রেন ঠিক ধরছি। আচ্ছা, নমস্কাব।

ডাক্তারের ঘরে আসিয়া বিমলবাবু কহিলেন, কাল চলে যাবেন ?

বললাম তো।

আমার কাজ ?

সে হবে। কাল দুপুরেও আপনার অক্ষরংস করব। রান্নাটা সত্যি ভাল। তারপর একটা ট্যান্ডি ডেকে চেপে বসব। আপনি কাল সন্ধ্যার পরে একবাব যাবেন।

বিমলবাবু কহিলেন, তা হলে আমার আব চিন্তা করবার কিছু নেই ?

কাল বলব। আপনি আসুন এবার, আমরা খেতে বসি।

বিমলবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, ও ভাল নেই, জুড়িয়ে গেছে। বদলে দিক।

ডাক্তার ততক্ষণ খাবারের ঢাকনা খুলিয়া ফেলিয়াছেন। কহিলেন, কিছু দরকাব নেই। এই বেশ আছে। আর জুড়িয়েও যায় নি পুরোপুরি। এস হে, বসে যাও।

বিমলবাবু কহিলেন, না না, এ অস্থায় হল।

কিছু অস্থায় হল না। বলিয়া ডাক্তার একগ্রাস খাত মুখে তুলিলেন, এই ঠিক হল। বেশী গবম হলে আমি খেতে পারি নে।

বিমলবাবু কহিলেন, করুন যা ইচ্ছে। ওঁর শোবাব জন্তে তা হলে ব্যবস্থা করে দিই, ও ঘবে ?

ডাক্তার কহিলেন, তারও দরকাব নেই, ও খেয়ে উঠে বাড়ি চলে যাবে।

এত বাতে ?

তাতে কি হয়েছে। সিনেমা দেখে ফেরে না রাত বারোটায় ?

পরদিন সন্ধ্যার পবে, বিমলবাবু আব আমি প্রায় একই সময়ে গিয়া পৌঁছিলাম।

ডাক্তার কহিলেন, আসুন বিমলবাবু।

বিমলবাবু বসিতে বসিতেই কহিলেন, এখন, আমার খবর কি বলুন।

কি খবর জানতে চান ? এটা খুন, না আত্মহত্যা, না অ্যাকাসডেন্ট, তাই ? না, আপনার হোটেলের কোন বিপদ এর থেকে আসতে পারে কি না, তাই ?

দুটোই বলুন।

প্রথমটাব জবাব, এটা খুন, বা অন্য কিছু, আমি এখনও স্থির বুঝে উঠতে পারি নি। সময় লাগবে বুঝতে, অবশ্য চেষ্টাও আমি করব। কিন্তু এ কথা আপনাকে বলে দিতে পারি, খুন হোক বা নাই হোক, আপনার হোটেলের কোন লোক এর সঙ্গে জড়িত আছে, বা এর থেকে হোটেলের ওপরে কোন ফ্যাসাদ এসে পড়বে, এমন ভেবে আপনার উৎকণ্ঠিত হবাব কারণ নেই।

নেই, ঠিক বলছেন ?

ঠিক জেনেই বলছি। আপনাকে মিথ্যে স্তোক দিয়ে আমাব লাভ কি হবে ?

এটা খুন কি না, বলতে পারছেন না ?

বললাম তো। সে বলতে হলে আরও অনেক ভাবতে হবে জানতে হবে। সে করুক পুলিশ। আপনার যখন কোন দায়-দায়িত্ব আসবে না, তখন আপনি মিছে মাথা ঘামাতে যান কেন। আপনাকে যা বলবাব, বলে দিলাম। এও বলে দিচ্ছি, মিথ্যে ভাবনায় অস্থির হলে নিজের ঘাড়ে বিপদ টেনে আনবেন হয়তো। ভুলে যান, শ্রেফ ভুলে যান ব্যাপারটাকে।

বিপদ টেনে আনব মানে ?

মানে, যদি সত্যি খুনই হয়, কথাটাকে খুঁচিয়ে তুলছেন বলে হয়তো খুনীর আক্রোশ এসে পড়বে আপনার ওপরে। বা হয়তো পুলিশই তখন বলে বসবে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন কি হয়েছে কে করেছে, নইলে আপনাব এত অস্থিরতা কেন। এইজন্তেই বলেছি, সাফ ভুলে যান ব্যাপারটাকে।

তাই করব। বড় নিশ্চিন্ত করলেন আমাকে। বলিয়া বিমলবাবু পকেটে হাত দিলেন।

একটি মিনতি—আপনাব ফীটা ?

ডাক্তার কহিলেন, আপনাকে তো বলেছি, ফী আমার



লাইফবুয় যেখানে, স্বাস্থ্যও সেখানে!

জ্ঞানের আনন্দ লাইফবুয়ে! লাইফবুয় সাবান মেখে গান করলে শরীরটা
কত স্বচ্ছ হবে লাগে, মনেও এক সজীবতা আনে। ঘবে বাইবে ধুলো ময়লা আপনার
লাগবেই। লাইফবুয়ের প্রচুব কার্যকারী ফেনা ধুলো ময়লার রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়।
পরিবারে সবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে লাইফবুয় রাখুন।

নেই। অস্ত্রধারী কবে যদি, তখন কল দৈবেন, ফী নিয়েই
দেখে আসব।

বিমলবাবু হযতো একটু ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু আব

কিছু বলিলেন না। ডাক্তার কহিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত

হইয়া বাড়ি চলে যান। তারপর যদি নৈহাং দরকাব হয়,

খবর দেবেন।

দরকাব হলেই পাব তো?

নিশ্চয়।

বিমলবাবু চলিয়া গেলেন।

আমি কহিলাম, যা বলিলেন বিমলবাবুকে, সত্যি?

ডাক্তার কহিলেন, কোন্টা সত্যি নয় বলে সন্দেহ

উঠল?

হোটেলের সঙ্গে এ ব্যাপারের—

কোন যোগ নেই।

এটা খুন? না আব কিছু? কিছু বুঝলেন?

রহস্তটা বুঝেছি। বুঝিনি মোটিভটা।

রহস্ত বুঝেছেন মানে?

বহস্ত কথাটা ব দুটো মানে হয়। গোপন তথ্য, আর

ভাষাশা।

কোন্টা বুঝলেন?

দুটোই।

মানে?

তথ্যটা বুঝেছি, জলেব।

কোন্ জল?

পেটের তলাকার।

আর, তামাশা?

খলসে।

হইল। আব প্রশ্ন করা বুধা।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। এই একমাসের মধ্যে চাহিলেন।

ডাক্তার আমাকে এ বিষয়ে আব কিছু বলেন নাই, আমিও কহিলেন, তুমি কবে এসেছ?

আর প্রশ্ন করি নাই—জানিতাম প্রশ্ন করিয়া লাভ আজই। ট্রেন থেকে সোজা চলে এলাম।

হইবে না। রাবুজী কোথায়?

নেই।

কবে হল?

পবন্ত দিন। কাল আমি বেরিযেছি। তাঁর তাই

এক ব্যক্তি গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা হুঁম ছিল।

বাঙলামিশ্রিত হিন্দীতে কহিল, ডাক্তার সাহেব, এই বাড়ি?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ।

কে ডাক্তার সাহেব?

ইনি।

চিঠি আছে।

আমি হাত বাড়াইলাম, সে আমায় হাত অতিক্রম
করিয়া চিঠিটি ডাক্তারের হাতে দিল। সাদা খাম, কোন
নাম-ঠিকানা লেখা নাই।

ডাক্তার খাম ছিঁড়িয়া কয়েকপাতা টাইপ করা কাগজ
টানিয়া বাহির করিলেন। কিছুদূর পড়িয়া, মুখ তুলিয়া
লোকটির দিকে তাকাইলেন, আবার দ্রুত দৃষ্টিতে পড়িতে
লাগিলেন।

লোকটি দাঁড়াইয়া রহিল; আমি সেই ফাঁকে তাহাকে
দেখিয়া লইলাম। চেহারা ও কাপড়ের দৃষ্টে মনে হইল
বিহাবী হিন্দু। দীর্ঘ ও পেশীর ছল দেহ। বয়স অস্তুত পঁয়ষাট,
কিন্তু দেহে জরার চিহ্ন নাই। শিক্ষা বা সহবতের বিশেষ
ছাপ নাই, কিন্তু শক্তি ও পৌরুষের ছাপ স্পষ্ট। ডাকাতের
সদার হইলেই মানাইত ইহাকে।

কাগজটাতে চক্ষু বুলানো শেষ করিতে করিতে ডাক্তার
কহিলেন, এস।

ডাক্তার ঘবে গিয়া ঢুকিলেন; একটা চেয়ারে বসিয়া
কাগজখানাকে আঁতোপান্ত আবাব বেশ মন দিয়া
পড়িলেন।

লোকটিকে বলিলেন, বোসো।

সে মেঝের উপবেই উবু হইয়া বসিল। আমি অল্প-
দূরে একটা চেয়ারে বসিলাম।

দুইবার তিনবার উন্টাইয়া পান্টাইয়া চিঠিটিকে
পড়িলেন ডাক্তার। তারপর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে

চাহিলেন।

কহিলেন, তুমি কবে এসেছ?

আজই। ট্রেন থেকে সোজা চলে এলাম।

রাবুজী কোথায়?

নেই।

কবে হল?

পবন্ত দিন। কাল আমি বেরিযেছি। তাঁর তাই

হুঁম ছিল।

এতে কি লেখা আছে তুমি জান ?
 না। আমাকে শুধু বললেন—
 কি ?
 বললেন, এই চিঠি তাঁর হাতে দেবে। তিনি যা
 জিজ্ঞেস কববেন, সব বলবে।
 সব বলবে ?
 তাই হুকুম।
 তারপর ?
 তারপর আমি দেশে চলে যাব।
 কেন, চাকরি ?
 চাকরি আমার নেই। ছেড়ে দিয়ে এসেছি।
 দেশে যাবে ? দেশ কোথায় তোমার ?
 ছাপরা জিলা।
 বেশ। যা যা জিজ্ঞেস করছি, বল।
 বলুন কি বলব।
 তোমার কথা। বাবুজীর কথা।
 বলব।
 তুমি কতদিন ছিলে সেখানে ?
 বাবুজী যতদিন। একদম প্রথম দিন থেকে। ত্রিশ
 বছর।
 তা হলে সব জান ?
 সব জানি।
 কতদিন হল চলে এসেছ তুমি ?
 চার মাস।
 বাবুজী ?
 তিন বছর।
 বাবুজী কি রকম লোক ছিলেন ?
 দেবতা। মানুষ অমন হয় না।
 বুঝিয়ে বল।
 সে দেশ তাঁর দেশ নয়। তা'বা তাঁকে চায় নি।
 তবু তিনি নিজের সমস্ত জীবন দিয়ে তাকে ভালবেসেছেন,
 তাকে গড়ে তুলেছেন। প্রথম যখন খোলা হল স্কুল—
 আমি চাহিয়া ছিলাম। ডাক্তার আমাকে ইঙ্গিতে
 বুঝাইলেন, কথা বলবে না।
 হ্যাঁ, বল।
 অন্ধকাব হইয়া আসিতেছিল। আমি আলো জালিয়া
 দিলাম।

প্রথম যখন খোলা হল স্কুল, ঘরবাড়ি নেই, ছেলে নেই,
 টাকা নেই। বাবুজীর তখন বয়স অল্প। সবাই বললেন,
 চলে যান। তিনি বললেন, না। আমি এসেছি একে গড়ব
 বলে, গড়ে না দিয়ে আমার ছুটি মিলবে না।

কি তিনি করেছেন তার জন্তে, তিনি জানেন আর
 আমি জানি, আর জানেন রামজী। নিজের মাইনে নেন
 নি, ঘর থেকে টাকা এনে খেয়েছেন, খরচে কুলোয় না বলে
 মাইজীকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে রেখেছেন বছর
 ধরে। মাইনে না পেয়ে মাস্টাববা চলে গেছে, তিনি
 একা একা পড়িয়েছেন, জোর কবে করে লোককে ধরে
 এনেছেন মাস্টাব হবাব জন্তে। লোকের কাছে ভিক্ষা
 মেগে বেবিষেছেন স্কুলের জন্তে টাকা চেয়ে, কেউ দিয়েছে
 কেউ হাঁকিয়ে দিয়েছে। তবু বাবুজী রাগ করেন নি,
 হাল ছাড়েন নি। বলেছেন, ভগবান আছেন আর আমি
 আছি, একে আমি গড়বই। আমি দবোয়ান, লেখাপড়া
 জানি নে, আমি মনে মনে বলেছি, আমিও আছি। টাকা
 পাই নি, দেশে বউ-ছেলে না খেয়ে বয়েছে, বাবুজী
 আমাকে বলেছেন তুমি অল্প চাকরি খুঁজে চলে যাও।
 আমি যাই নি, জেনেছি বাবুজীকে ছেড়ে গেলে বামজী
 গৌসা কববেন।

বাবুজী তখনও নিজে নিজে পড়াশোনা কবেন। কি
 এক বড় পাস দিলেন ওরই মধ্যে। সবাই বললে ডাক্তার
 হয়েছেন, এবার তাঁর অনেক বড় চাকরি মিলবে। বাবুজী
 বললেন, আমাব এই স্কুল ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

দশ বছর, পনরো বছর লড়লেন বাবুজী। তাবপর
 বামজী মুখ তুলে চাইলেন। স্কুল খাড়া হল, বড় হল।
 তখন তার অনেক টাকা, অনেক ছেলে। ছেলেদের
 ভালবাসতেন বাবুজী। পড়া না বুঝলে রাত জেগে
 পড়াতেন, না খেয়ে এলে ঘরে ডেকে এনে খেতে দিতেন,
 অস্থখ কবলে রাত জেগে বসে থাকতেন। একবাব একটা
 ছেলে মবে গেল, বাবুজী কাঁদলেন। তাঁর নিজের ছেলে
 মরে গেছে, সেদিন ও-রকম কাঁদতে দেখি নি। একটা
 ছেলে ফেল হলে তাঁব মনে হত তাঁরই পাপ হল। আর
 সে ছেলে তো ছেলে। বাঙালী বলে হিন্দুস্থানী বলে
 আসামী বলে মুসলমান বলে কোন ভেদ ছিল না। তিনি
 ব্রাহ্মণ, আমি কুম্ভী, অচ্ছুত। কখনও তো বলেন নি তুমি

ছোট। আমিই দূবে দূবে সরে থাকতাম, আমার ওপরে
গোঁসা করতেন তাই নিয়ে। বলিতে বলিতে তাহার স্বর
গাঢ় হইয়া উঠিল।

ডাক্তার কহিলেন, তাবপর ?

তারপর স্কুল অনেক বড় হল। তার নাম হল। তার
টাকা হল। তখন সবাই এল। যারা এতদিন চেয়ে দেখে
নি, তারাই এল কর্তা হতে। ক্রমে কর্তা হয়ে বসল।
স্কুলের মধ্যে তাবাই কর্তাগিরি করবে, তারাই বলবে কোন্
ছেলে পড়তে পাবে কোন্ ছেলে পাবে না। বাবুজী তাতে
রাজী হলেন না, বললেন, স্কুল সবাইয়ের জন্যে, সবাই পড়বে।

চলল লড়াই, দশ বছর ধবে। বাবুজীকে তারা হটিয়ে
দিতে চায়, তাড়িয়ে দিতে চায়। ছেলেরা বলে, খবরদার।
তাই পারে না।

কিন্তু তারা বড় বড় লোক। তাবা যদি চায়, ছেলেরা
কতদিন রুখবে ? তারা তো ছেলেমানুষ। বাবুজীও চান
না ছেলেরা এসব নিয়ে মাথা ঘামায়। তারপর একদিন
বাবুজীকে চলে আসতে হল স্কুল ছেড়ে। আসামীদের
দেশ, তারা বাঙালীকে রাখবে না হেডমাস্টার করে।

তাবপর ?

আরও স্কুল ছিল, কলেজ ছিল, তাবা বাবুজীকে
জানত। তাবা বলল, আমাদের এখানে এস। বাংলা-
দেশের কলেজ বলল, আমাদের কলেজে এস। বাবুজী
গেলেন না কোথাও। বললেন, আমি আব চাকরি কবব
না। একদম দেশে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে
ডাক্তারি করতে লাগলেন। তিনি হমোপ্যাথি জানতেন।
ছেলেদের অস্থির করে, তাই শিখেছিলেন।

তুমি ?

আমি এলাম না। চেয়েছিলাম আসতে, বাবুজী
দিলেন না। বললেন, তুমি গেলে এরা বলবে আমি
তোমাকে ভাঙিয়ে নিয়ে গেলাম।

ঠিকই বলেছেন।

বাবুজী সব কথাই ঠিক বলেন। যিনি ধর্মকে মানেন,
যিনি নিজের লাভ চান না, তিনি বৈঠক বলবেন কার
জন্তে, কার ভয়ে ?

আমি থাকলাম। না থাকা ভাল ছিল। যা দেখলাম
সেই আড়াই বছরে তিন বছরে, সে দুঃখ জীবনে যাবে না।

ছিলে, ছেড়ে এলে কেন ? তারা ছাড়িয়ে দিলে ?

দিত। আমি আগেই ছেড়ে এলাম।

কি হল ?

বলছি সব, দম নিয়ে নিই। সে তাবলে আমার মাথা
গরম হয়ে যায়। তাবা নতুন হেডমাস্টার নিয়ে এল।

নতুন হেডমাস্টার এসেই সব মাস্টার বদলে নতুন
নতুন মাস্টার আনতে লাগল। সব আসামী, সব তাব
দলেব লোক দেখে। পুরনো কেরানী, পুরনো ছাত্র
তাড়াতে লাগল। বাবুজীকে যারা ভালবাসে তাদের
জাযগা নেই স্কুলে। বাবুজী শেখাতেন সত্য আর ধর্ম,
তাব দিন চলে গেল। ইচ্ছেমত ছাত্রকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।
ভর্তি হতে দিচ্ছে না। শুধু বাঙালী বলে নয়।
আসামীকেও।

হেডমাস্টার আসামী ?

আসামী তো মানুষ, ডাক্তার সাহেব। এ মানুষ
নয়। রাগ করবেন না আমার ওপর। আমি অশিক্ষিত,
জানোয়ার। তার ইজ্জত রেখে কথা কইছি না। আমি
দরোয়ান, পাহারা দিই, কুকুরেব কাজ কবি। কিন্তু
কুকুর তাব মনিব চেনে, কে সাধু লোক কে চোর,
চেনে। চোরকে ঢুকতে দেবে না, সেই তার কাজ।
আমাব বাবুজী যে-স্কুল গড়েছিলেন, তাকে যে ভাঙল
সে তাঁকে ভেঙেছে, আমাকে ভেঙেছে। আমার সে
দুশমন। আমি পাপ কবেছি ডাক্তার-সাহেব, তাকে খুন
না করে শুধু চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি। নিজেকে
বাঁচিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। রামজী আমাকে ক্ষমা
করবেন না।

সে কি কথা, খুন করবে কেন ?

ডাক্তার সাহেব, আমি জানোয়াব। আপনারা
লেখাপড়া লোক, বড় আদমী। সাপ যদি ঘরে ঢোকে,
তাকে মারেন না আপনারা ? বাঘ যদি মানুষ মারে,
তাকে মারে না গবর্নমেন্ট ?

আহা, সে হল অল্প কথা।

কেন অল্প কথা। যে একজনকে খুন করছে তার
ফাঁসী হবে। যে একজনের লেখাপড়া নষ্ট করে দিচ্ছে,
তাকে মানুষ হতে দিচ্ছে না, তার দোষ নেই ? এক-
জনেব নয়, অনেক জনেব ? যাকে তার পছন্দ নয়



মমতাময়ী-মায়ের সংসর্গে সদা সেবা
জিনিষই চাই...

মহাকবিদের জন্ম
মায়ের মর্মে
ডালডা

মায়েব বুকেব সবটুকু ডালবাসা দিবে, মা তাঁব সন্তানকে গড়ে তোলেন।
ডালবাসেন বলেইতো মা কেবল ডাল জিনিষই এদেব দিতে চান। সব
ব্যাপাবেই মা সেবা পথই ডালবাসেন। বাল্যবেলাতেও মায়েদেবকেবল
ডালডা-ই পছন্দ। ডালডাৰ বাধা ডাল তবকানী খেমে সবার তৃপ্তি।
সবচেমে সেবা ভেষজ তেল থেকে ডালডা তৈরী। শিশুৰ দৈহিক পুষ্টি
সাধর্মেব প্রয়োজনীয় উপাদান ভিটামিনও এতে বমেছে। মায়ের হাতেব
মিষ্টি বাল্য ডালডা খাবাবে আবও সুস্বাদু কবে তোলে। বেধে তুটি,
খেমে আরন্ধ—তাই আপনাব বাড়ীতেও আজ থেকে ডালডা-ই চাই।



ডালডা বন্যপতি - রান্নার খাঁটি, সেরা স্নেহপদার্থ

তাকেই বলবে পড়তে দেব না, যেখানে লেখাপড়া বসিয়েছে। ক্যাশিয়ারবাবু ছিলেন, তাঁকে বললে, পুর্বনো খাতা-মাফুস হতে! চেয়েছে-তাকে। জোর করে তৈরিকিষে দেবে। পত্র বদলে ফেলতে হবে, দেখাতে হবে বাবুজী স্কুলের মাফুস হতে দেবে না, আমার মত অশিক্ষিত জামোয়ার টাটকা ভেঙেছিলেন। ক্যাশিয়ারবাবুও আসামী বললেন, তাড়াতাড়ি করে রাখবে—বলুন তার দোষ নেই? তাবাসীজ্ঞা নেই? তা পারব না। বলে সেই খাতাপত্র সব লুকিয়ে ফেললেন। হয়তো সে ছেলেদেরও দোষ ছিল। তখন তাঁর ওপরে রাগ পড়ল। ঠিক হল, তাঁর নামো আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না ডাক্তার সাহেব। আমিথ্যে নালিশ দিয়ে বদনাম দিয়ে তাঁকে ভাঙানো। আপনি লেখাপড়া লোক, আপনি লেখাপড়া লোক দেব হবে। একটা পাজী মেয়েমানুষকে ঠিক করল, সে তাঁর হাত, হাল বলে জানেন। কিন্তু, আমি সেই ছেলেদেব-এত নামে বেইজ্জতির নালিশ করবে। আমাকে বললে, কলকাতা হুটু হুটু দেখেছি, তা দেব বাপবা যখন পড়েছে তাদেরও সেই নালিশের সাক্ষী হতে হবে, বলতে হবে আমি নিজে দেখেছি। তাবা সবাই খারাপ নয়। যারা খারাপ দেখেছি। আমি বললাম কিছুতেই করব না। তখন তাদের হয়ে তোলা কথা। আমি বলি নি। তাদের আমি বললে, তোমাকে ডিসমিস করব। আমি বললাম, আমিই নিজে বলেছি, খবরদার, বাবুজী স্কুলকে নোংরা করবে তোমাকে ডিসমিস করছি। বলে, চাকরি ছেড়ে দিযো। তোমবা, অগ্নি স্কুল আছে সেখানে যাও। চলে এলাম।

যাক। তাবপর? কোথায় এলে? তাবপর, বাবুজী বলেছিলেন থাকতে, আমি পারলাম না। বাবুজী দেশে বাড়িতে ছিলেন। সে বাড়ি আমি চাই। বাবুজীর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া স্কুল, সব ভেঙে জানতাম। সেইখানে গেলাম। তাঁকে অনেকদিন গেল। মাস্টার থাকে না, চলে যায়, ছেলেদেব ভাঙিয়ে দেখি নিব। দয়, ছেলে পাস করে না। স্কুলের টাকা সব হাওয়া। তাঁকে বলল সব কথা? সে উড়ে যায়, মেরামত নেই বলে ঘর-বাড়ি ভেঙে সব বলি নি। তাঁর অস্থখ ছিল। বলছি, শুনতে চান? ভেঙে পড়ে যায়। বাবুজী মিজীব সঙ্গে সঙ্গে রোদে ঘুরে শুনতে তিনি বেছাং হয়ে পড়ে গেলেন। ডাক্তার এসে। বাজ অনেক কষ্টে ছাঁশ করল। অনেক দিন শুয়ে বইলেন। ডাক্তার ডলে ফাটত না সেই বাড়ি। সেই থেকে মনমরা হয়ে গেলেন। তাই তারপরে।

আব, কি মেজাজ আর স্বভাব। বাবুজী কাউকে কড়া আর বলি নি। তিনি জানতে চেয়েছেন, তবু বলি নি। তাবপর? থা বলতেন না। বলতে হত না তাঁব। এ লোকটা—

কেন? ক্রাসে ভুল পড়িয়েছিল, একটা ছেলে বলে—

কেন? দু মাস সেখানে থেকে আমি দেশে চলে গেলাম।

কেন? জান হযে গেল, হাসপাতালে গিয়ে মরে গেল। তাবমা কেন?

কেন? গেল হয়ে গেলাম। ছেলেরা ধর্মঘট করল। তাই নিষেধ। তাঁকে না দেখে থাকতে পারি নে। তাঁর সঙ্গেই

কেন? অনেক ছেলেকে ভাঙিয়ে দিলে, বাস্টিকেট কবল। থেকেছি চিবজীবন।

কেন? দেখে দেখে আমাব মেজাজ মন বিঘিয়ে গেল। আর

কেন? কতে প্রাণ চায় না, বাবুজীর নিষেধ মনে করে ছেড়ে

কেন? এসে দেখলাম, তাঁর শরীর খুব খারাপ। তাই আব

কেন? তে পারি নে। তবুও শেষে ছাড়তে হল। কোথাও গেলাম না। চারদিন হবে, আমাকে এই চিঠি

কেন? দিলেন। আপনার ঠিকানা বাতলে দিলেন। বললেন,

কেন? বাবুজীকে ভাঙিয়েছে তাতেও হয় নি, তাঁকে বদনামী

কেন? আমি আব বাচব না। আমি বললাম, ছি ছি, ও কথা

কেন? রতে চাইল হারামীর বাচ্চ। আপ কববেন ডাক্তার

কেন? বলতে নেই। বললেন, শুন নাও। আমি যেদিন মরে

কেন? হবে, আমি ছোটলোক।

কেন? যাব, তার পরদিন তুমি যাবে, এই চিঠি তাঁর হাতে দেবো।

অন্তকে দেবে না। বললাম, আচ্ছা অন্তকে দেব না।

বললেন, হ্যাঁ। তিনি যদি কিছু জানতে চান, বলবে।

আমি বললাম, কি জানতে চাইবেন? বললেন, আমার

কথা। স্কুলের কথা। যাই তিনি জানতে চান, সব বলবে।

আমি বলেছি। আব কিছু বলব?

আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। তুমি বলছ

হেডমাস্টার খাবাপ কাজ করছেন, স্কুলকে নষ্ট কবে

দিচ্ছেন। কিন্তু স্কুল তো তাঁর নিজের সম্পত্তি নয়, স্কুল

সকলের। যদিও ছেলে পড়ে, তারা আপত্তি করত না?

কবে কি করবে, তারা গেলো লোক। অশিক্ষিত।

শিক্ষিতের সঙ্গে তারা লড়বে কি করে?

কমিটি? বাদেব ওপরে স্কুল চালাবার ভার?

তাদেরই তো লোক, ওই জন্তেই এনেছে। তাবা

একে বসিয়ে স্কুলের টাকা খেয়ে মোটা হচ্ছে। তারা ওকে

তাড়াবে কেন?

তারা টাকা খাবে কি করে?

কাজেব ঠিকে নিচ্ছে। তিন হাজার টাকার কাজ

করল, ছ হাজার টাকা বিল পেলে। ওই জন্তেই তো

সব হল। আর তাই তো পুরনো লোকদের ওপরে

রাগ।

ইউনিভারসিটি কিছু বলছে না? ইন্সপেক্টর দেখছে না?

সে, ডাক্তার সাহেব, আমি কি করে বলব।

বডলোকের কথা। আমি যা জানি, বলেছি। আরও

যদি কিছু জানি, বলুন বলব।

ডাক্তার অনেকক্ষণ নীবব হইয়া বহিলেন। তারপর

কহিলেন, তুমি এখন কোথায় যাবে?

দেশে ফিরে যাব।

আজ তো একুশি এলে। আজই যাবে?

হ্যাঁ।

এখানে খেয়ে যাও না।

খুব দয়া আপনার। কিন্তু আমার দরকাব নেই তো।

রাত্রে আমি খাই না।

কেন?

অনেকদিন খাই না। পেটের ব্যথা ছিল, সাধুর ওষুধে

সেরেছিল। সাধু বারণ করেছিলেন সূর্য ভোবার পরে

খাবে না।

আজ রাতটা থেকে যাবে?

না। আমার মন ভাল নেই। আমার কোথাও

থাকতে ইচ্ছে কবছে না।

ডাক্তার আবার চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। একটা

নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কটায় তোমার গাড়ি?

আমার ছুটি?

হ্যাঁ। আমার এখানে আর কিছু কাজ নেই।

তা হলে, এখন কটা?

আটটা।

দশটায় আছে গাড়ি। তা হলে, আমি যাব?

হ্যাঁ। একটা খবর তোমাকে আমি দিচ্ছি। জেনে

যাও।

বলুন।

সে হেডমাস্টার বেঁচে নেই।

কি?

হ্যাঁ। মারা গেছেন।

না। বুট বলছেন আপনি, আমাকে ভোলাচ্ছেন।

না। এই দেখ।

ডাক্তার একটি ফাইল খুলিলেন। একটি এনলার্জ করা

ফটো বাহির করিয়া তাহাব হাতে দিলেন। এই

তো?

হ্যাঁ, ঠিক।

তবে মারা গেছেন, এ কথাও ঠিক।

কবে?

পনব-বুড়ি দিন হবে।

কি হয়ে?

গাড়ি চাপা পড়ে।

দরওয়ান উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া

কহিল, রামজী তাকে সোনার গাড়ি কবে দিন। সে

গাড়িওয়ালার ধরা পড়েছে?

না।

রামজী তাকে বাঁচাবেন। তাকে ধরা পড়তে

দেবেন না।

বলিতে বলিতে সে চক্ষু মুছিল।

তারপর হঠাৎ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হায-রামজী,

বাবুজী এ কথা জেনে গেলেন না।

জানলে কি হত? একজন মানুষ মরেছে, জানলে কি খুশী হতেন তিনি?

না। তাঁব স্কুল রক্ষা পেয়েছে, তাঁব ছেলেবা রক্ষা পেয়েছে, জানলে তিনি শান্তিতে মবতে পারতেন।

হয়তো জানতে পেরেছেন তিনি।

তিনি জানতেন?

না। কিন্তু স্বর্গে গিয়ে নিশ্চয় জেনেছেন। স্বর্গ থেকে তো সবই জানা যায় পৃথিবীর কথা।

ঠিক কথা ডাক্তার সাহেব, ঠিক কথা। আপনি জানী লোক। আমি জানোয়াব। জয় রামজীকী। বলিতে বলিতে সে সটান মাটিতে পড়িয়া ডাক্তারের পদধূলি গ্রহণ করিল। তারপর 'চললাম, ডাক্তার সাহেব, রামজী আপনাকে শাস্তি দিন'—বলিয়া দরজাব দিকে অগ্রসর হইল।

ডাক্তার মুহু হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু তুমি কি কবে জানলে, রামজীর এটা পছন্দ? রামজী কি কোন মানুষের অমঙ্গল চাইতে পারেন?

দরোয়ান ফিরিয়া দাঁড়াইল। দুই চক্ষু মেলিয়া ডাক্তারের দিকে চাহিল। কহিল, রামজী নিজের হাতে রাবণকে মেবেছিলেন।

বলিয়া বাহিব হইয়া গেল।

ডাক্তার অনেকক্ষণ চাহিয়া বাহলেন। তাবপর ধীবে ধীবে কহিলেন, আশ্চর্য।

আমি কহিলাম, কিন্তু আমি তো ভাল বুঝলাম না ব্যাপারটা।

ডাক্তার কহিলেন, বোঝা নি?

অনেকটা বুঝেছি মনে হচ্ছে, কিন্তু খেই মিলছে না। সেই হোটেলের ব্যাপার তো?

হ্যাঁ।

ছবিটা কোথায় পেলেন?

স্ট্রেক্স থেকে সরিয়েছিলাম, একটা আস্ত গুপ। তার থেকে করিয়ে নিষেছি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি হল, আগাগোঁড়া বুঝিয়ে দেবেন? এই নাও।

হাতের কাগজটি ডাক্তার বাড়াইয়া দিলেন। আগারউড মেশিনে, ছোট ছোট অক্ষরে, পরিচ্ছন্ন টাইপ কবা।

অনেকদিনের কথা, কিন্তু সে চিঠির ভাষা আমার প্রায় অবিকল মনে আছে।

ডাক্তার বস্তু,

এই চিঠি যখন আপনি পাইবেন, তখন আমি মৃত। মৃত্যু আসন্ন জানিয়াই চিঠি লিখিয়া বাইতেছি।

আপনার হোটেলের আমার উদ্দেশ্য আমি বুঝিয়াছিলাম। আপনার নাম ও ঠিকানা অতএব আবিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে। প্রথম দিনই আপনাকে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, যখন আপনি জলের নমুনা তুলিয়া লইলেন। অতএব হোটেলের আপনাকে দেখিয়াই সতর্ক হইতে হইয়াছিল।

বরফের রহস্য আপনি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বরফ সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল হইতে অনুমান করিয়াছি। বাহির হইতে আমিই কথা শুনিয়াছি, তাহাও আপনি অনুমান করিয়াছেন। ম্যানেজার ঠকিয়াছিলেন, আপনি ঠকেন নাই।

আমার কাজের উদ্দেশ্য আপনি অনুমান করিতে পারেন নাই। কাবণ, আমার পরিচয় আপনি পান নাই। ম্যানেজার ভুল বলিয়াছেন আপনাকে। আমি 'ডাক্তার', কিন্তু M. B নই, Ph D। আমি ছিলাম ওই স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার।

পত্রবাহক ছিল দরোয়ান। ইহাব মুখে সকল তথ্য শুনিতে পাইবেন। প্রশ্ন করিলেই বলিবে, আমি নির্দেশ দিয়া গেলাম। যদি চান শুনিয়া লইবেন, তাহা হইতে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

মৃত ব্যক্তির কুৎসা করিতে নাই, যাহাকে আমি নিজেই হত্যা করিয়াছি তাহাব নিন্দা-উচ্চারণ আমি করিতে চাই না। দরোয়ান আপনাকে বলিবে।

আমাব জীবনে একটিমাত্র ইষ্টবস্তু ছিল, আমার স্কুল। তাহাকে বাঁচাইবার অন্য উপায় আমি খুঁজিয়া পাই নাই। আইনে এ অনিষ্টের প্রতিকার নাই। আমার জীবনের দিনও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। অগত্যা এই শেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছি। পাপ যা, আমার হউক। আমাব স্কুল হয়তো বাঁচিল, আমার ছাত্রবা নিষ্কৃতি পাইল, এই সান্ত্বনাই আমাব যথেষ্ট।



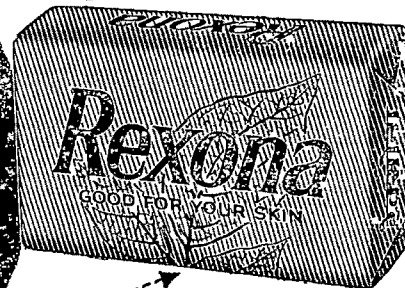
দিনে দিনে

তুকে নবীন লাভণ্য আসে



নতুন রেজোনার পরশে

ষতবারই মাথুন বেজোনা অবাক
পবশ যেন প্রতিবারই আপনাব
তুকে নবীনতা এনে দেয়। ফেবিল
বেজোনা ক্যাডল আছে, বিশেষ
ধরনের এই সৌন্দর্য বর্ধক তেলটি
তুকে প্রতি বন্ধে বন্ধে মাষ আব
তুকে কোমল ও মসৃণ কবে
তোলে, চেহারা আপনাব লাভণ্য
আনে। মিষ্টি গন্ধ ভবা বেজোনা
প্রতিদিন স্নানের পক্ষে আদর্শ
সাবান। একবার মাথলে আপনি
এর গন্ধ অনেকক্ষণ ধবে পাবেন।



নতুন রেজোনার নতুন মোড়ক,
নতুন আকার আব নবীন সবুজ
রঙ আপনাব নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

নতুন রেজোনা-তুকের সেবা যত্নের সহায়ক

বিপদের ভয় আমার ছিল না। সন্ধ্যার রোগের দুইটি আক্রমণ আমার হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় আক্রমণে শেষ হইব। তাহার আগে কাজ সারা করিয়া যাইতে পারিলাম, ইহার জন্ত আমি-কৃতজ্ঞ।

আমার কাজের দায়িত্ব আমার একার। অত্ৰ কেহ কোন প্রকারে ইহার সহিত জড়িত নাই। তবু যদি প্রয়োজন হয়, যদি অত্ৰ কেহ মিছামিছি জড়িত বা বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন আপনি সম্পূর্ণ কাহিনী ব্যক্ত করিবেন, দরোয়ানের সাহায্য লইবেন। এই ভার আপনাকে দিয়া গেলাম। সেই জন্তই এই পত্র রাখিয়া যাইতেছি এবং দরোয়ানকে চিনাইয়া দিয়া যাইতেছি। তাহার নাম ও ঠিকানা আপনি রাখিয়া দিবেন।

যে ভাবে ঘটনাটা হইয়াছিল, তাহাও বলিয়া রাখি। আপনি তো অল্পমানই করিয়াছেন, অত্ৰের জন্ত, যদি প্রয়োজন হয়। আপনার মত সহজে সকলে বুঝিবে না।

ওই স্থলটিকে আমি এক জীবন ধরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি। তারপব ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে। সেজন্ত দুঃখ করি না। একদিন মরিয়াও যাইতাম। কিন্তু তারপর, গত তিন বৎসর ধরিয়া, তাহার সন্ধক্ষে ও আমার পরবর্তী হেডমাস্টারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নানা রকম সংবাদ শুনিয়াছি। আমি গ্রামেব বাড়িতে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম লইতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সংবাদ সেখানেও পৌঁছিত। যাহারা মর্মান্বিত তাহারা জানাটত। শুনিতে শুনিতে আমি প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গেলাম, সহ্য করিতে পারি না। আমার রোগের স্বত্বপাতও তাহা হইতেই।

মাস চারেক পূর্বে দরোয়ান চলিয়া আসিল। সেখানকার অনেক কথা শুনিলাম, যাহা আগে জানি নাই। প্রথম দিন বলিতে বলিতে দরোয়ান কাঁদিয়া ফেলিল। সে নিরঙ্কর, বর্বরমাত্র। শুনিতে শুনিতে প্রচণ্ড ক্রোধে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। সেই আমাব রোগের প্রথম আক্রমণ।

তাবপর, প্রায় এক মাস ধরিয়া, আরও অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলাম। আগে, শুধু ষেটুকু কানে আসিত তাহাই জানিতাম। এবার খোঁজ করিয়া জানিতে গেলাম। অনেক কথা জানিলাম যাহা দরোয়ানও জানিত না। মৃতের নিন্দা করিতে নাই; কিন্তু যে শিক্ষক হিংস্র ক্রোধে ছাত্রকে হত্যা করিতে পারে, এবং তাহার পরেও অহুতপ্ত

হয় না, সে অমানুষ। আমি নরহত্যা করি নাই, একটা হিংস্র ও উন্নত পশুকে বধ করিয়াছি।

এ কথা স্থির বুঝিলাম, এই লোক থাকিলে স্থল নষ্ট হইয়া যাইবে। কর্তা যাহাবা, তাহাবা ইহাকে সরাইবে না, জানা কথা। ইতিমধ্যে বোগের দ্বিতীয় আক্রমণ হইল। তখন স্থির কবিলাম, যা করার আমিই করিয়া যাইব—ঈশ্বরের কাছে যাহাতে গিয়া বলিতে পারি, যে স্থলকে গড়িবার দায়িত্ব দিয়া তিনি আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাব প্রতি আমাব কর্তব্য আমি যথাসাধ্য পালন করিয়া আসিয়াছি। তিনি যদি শুনিয়া বলেন ঠিক কর নাই, তাহার সে ক্রোধ আমি মাথা পাতিয়া লইব।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ওখানেই চলিয়া যাইব। কিন্তু তাহাব অস্ববিধা অনেক। কলিকাতায় তাহাকে আসিতে হইবেই। কলিকাতায় কেহ কাহাকেও চেনে না। কোন্ হোটেলে ওঠে সেটা জানিয়া লওয়া কঠিন হইল না। সকল সংকল্প স্থির করিয়া আমি সেই হোটেলেই আসিয়া উঠিলাম। একই তলায় কাছাকাছি ঘর পাওয়াও কঠিন হইল না। ভাগ্যক্রমে সেটা তেতলা, আমার সংকল্পের অল্পকূল। বুঝিলাম, ঈশ্বর আমার সহায়।

উপর হইতে নীচে কোন জিনিস ফেলিলে সেটা কতক্ষণে পৌঁছিবে তাহা পতনের দূরত্ব এবং সেই জিনিসের আয়তন ও ওজনের উপর নির্ভব কবে। টিলের টুকরা ফেলিয়া তাহা হইতে স্থির করা গেল, ববফের চাঙড়টা কতক্ষণে নীচে পৌঁছিবে। মাছ পোষাব অছিলায় ববফের ব্যবস্থাও করিয়া লইলাম। তাবপর শুধু বসিয়া অপেক্ষা করা। বিশ্ববিজ্ঞানয়ে কখন কখন আসিতে হয় তাহা আমাব অজ্ঞাত নয়।

বরফ ব্যবহার করিবার বুদ্ধিটা স্থির কবিয়াছিলাম অনেক কারণে। অনেক দূরে থাকিয়া আঘাত করা যাইবে, অথচ ইট-সিমেণ্টের চাঙড তিন তলায় লইয়া যাইবার যুক্তি ছিল না, ববফ লইয়া যাইবার যুক্তি আছে। দ্বিতীয়ত, বরফকে তুলিয়া ধরিয়া নিক্ষেপ কবিত্তে হয় না, মেঝের উপব রাখিয়া একটু ঠেলিয়া দিলেই সেটা হডকাইয়া যায়। তৃতীয়ত, ববফ স্বচ্ছ বস্তু, পড়ার সময় কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না। সর্বাপেক্ষা

বড় কথা, কাজ শেষ কবিবাব সঙ্গে সঙ্গে সে চাণ্ড নিজেও ভাঙিয়া গলিয়া ও উবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, আর কোন প্রমাণই থাকিবে না আঘাতটা কিসের—প্রচণ্ড গরম ও রোদ্র আমার সহায় হইবে। বস্তুতঃ সেদিন বাস্তব উপবেব ববফ লোকজন আসিয়া পড়িবার পূর্বেই উবিয়া গিয়াছিল। দেহেব নীচের ববফটা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয় নাই। ওইটুকুই গলদ ছিল, এ জলটুকু না দেখিলে আপনিও সম্ভবত ভাবিতেই পারিতেন না স্ত্রুটাকি।

হোটেলের আমি নিজের নামই ব্যবহার কবিয়াছিলাম। অল্প নাম ব্যবহার করা সঙ্গত হইত না, কারণ আমাকে চেনে এমন লোক অনেক—হঠাৎ মিথ্যাটা ধরা পড়িয়া যাইত। তবু, বাহিবে বিশেষ যাইতাম না। এক স্ত্রবিধা হইল, যাহাব উপরে আমার লক্ষ্য সে আমাকে চিনিত না। প্রথম দিনই সেটা বুঝিয়াছিলাম। অথচ, চিনিলা না কেন তাহাও আশ্চর্য। স্কুলে আমার ছবি অনেক ছিল। হয়তো সেগুলো আব নাই, অথবা হয়তো সেগুলোকে চাহিয়া দেখিবার যোগ্য মনে করে নাই। তাহাবই নিয়তি।

ইহার পবেব ইতিহাস আপনি জানেন। সে আসিল, আমি স্ত্রযোগ মত তাহাব উপবে ববফ ফেলিলাম। সেটা কঠিন ছিল না—তাহাকে বাহিবে যাইতে দেখিলাম; নীচে পৌছিতে পৌছিতে আমি বরফটাকে মেঝেব উপর দিয়া ঠেলিয়া বেলিঙে লইয়া গেলাম। তেতলা তখন খালি। সে যখন বাহির হইতেছে, আমি রেলিঙে ভব দিয়া দাঁড়াইয়া, বয়ুফের চাণ্ড আমার পাষেব তলায়। পাষের একটু ধাক্কা দিতেই সেটা লক্ষ্যস্থলে পৌছিল, আমি সরিয়া আসিলাম। নীচে যখন সাড়া পড়িয়াছে, আমি তখন ঘরেব মধ্যে শুইয়া বই পড়িতেছি। আমাকে সন্দেহ করা সহজ ছিল না। শুধু আপনাব ভাগ্যবলেই ওইটুকু জল থাকিয়া গেল।

শুনিয়াছি, পুলিশ এটাকে দুর্ঘটনা বলিয়াছে। হইতে পারে, সত্যই তাহাবা তাই মনে কবিয়াছে। আবার এও হইতে পারে, ওটা বাহিরের বটনা মাত্র, আসলে এখনও তাহাদের মনে সন্দেহ আছে, সন্ধান চলিতেছে। যদি তাহারা অল্প কাহাকেও সন্দেহ কবিয়া বসে, তবে আমার এই ঘটনা আর গোপন বাখা অন্ময় হইবে, সেই নির্দোষকে বিপন্ন কবা হইবে। এই কথা ভাবিয়াই আমি সমস্ত কথা আপনাকে জানাইয়া গেলাম। সেরূপ

প্রয়োজন বুঝিলে আমার এই চিঠি আপনি পুলিশকে দিয়া দিবেন। আমি যথাবীতি নাম স্বাক্ষর সমেত এটা রাখিয়া যাইতেছি।

আর, সে প্রয়োজন যদি না হয়, তবে এটাকে প্রকাশ কবিবেন কি করিবেন না, সে সিদ্ধান্ত আপনাব বিবেচনার উপরে রহিল। যুতেব আত্মীয়স্বজন যদি জানিয়া থাকেন ইহা দুর্ঘটনা, তবে দুর্ঘটনা নয় খুন এ কথা শুনিলে তাঁহাদের মনের শাস্তি বাড়িবে না। তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত কবা আমার অভিপ্রায় নয়। আমি যাহা করিয়াছি, প্রয়োজন ও কর্তব্যবোধে করিয়াছি; ঠিক করিয়াছি, কি ভুল কবিয়াছি, সে বিচার ভগবানের হাতে।

আমি তন্ময় হইয়া পড়িতেছিলাম, ডাক্তার একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। ইহার পবে আরও দু একটা পৃষ্ঠা ছিল। কিন্তু সেটা উল্টাইবার পূর্বেই ডাক্তার হাত বাড়াইয়া চিঠিটা আমার হাত হইতে টানিয়া লইলেন। কহিলেন, বাস।

আমি তাঁহার দিকে চাহিলাম। কহিলাম, দরোয়ানের নাম ঠিকানা তো আপনি লিখে রাখলেন না।

কি হবে।

ডাক্তারের গলায় নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত স্রব।

যদি দরকার হয়?

হবে না।

ডাক্তার হঠাৎ ঈষৎ হাসিলেন। কহিলেন, এও মজা।

কি?

বিমলবাবু, আব হেডমাস্টার। একজনের হোটেল, একজনের স্কুল। দুই পাগল।

ডাক্তার দিয়াশলাই বাহির কবিলেন। চিঠিটাতে আগুন লাগাইয়া, পিকদানীর মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। সেটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

আমি কহিলাম, এ কি করলেন?

ডাক্তার কহিলেন, আগুন। হাতে রাখতে নেই।

কিন্তু, যদি দরকার হয়?

কেন হবে?

কিন্তু, দরোয়ানেরও তো—

ডাক্তার কহিলেন, দরোয়ান লেখাপড়া শেখেনি, তাই সেই সত্যকে সহজে চিনেছে। তার রামজী তাব বাবণকে বধ করেছেন। তাব রামায়ণ সেইখানেই শেষ।

ভূমিকা

আজ্ঞে না, এটি লঘু প্রবন্ধ নয়, এ রচনাটি হচ্ছে একটি গুরুগম্ভীর সীরিয়াস সাহিত্যকর্ম। লঘু প্রবন্ধেই যদি আপনার অভিরুচি তবে আগে দেখুন।

আপনার কাছে লুকোব না, লেখাটা আমি লঘু প্রবন্ধ বলেই সম্পাদককে চালিয়ে দিয়েছি। পূজো-সংখ্যার লেখা আর রিজ্ঞাপনের ভিড়ে উনি ফাঁকিটা ধবতে পারেন নি। কিন্তু সম্পাদককে ফাঁকি দিয়েছি বলেই আপনাকে কি ফাঁকি দিতে পারি? আপনি হচ্ছেন পাঠক, এই গণতন্ত্রের যুগে আপনিই তো হলেন আসল মালিক আমাদের। সম্পাদক মশাই নিমিত্তমাত্র বই তো নন। আপনার রুচি অল্পস্বাধী আমাদের ভিয়েন বসে, কড়াপাক কি কাঁচাগোলা সে তো আপনার পছন্দ-অপছন্দ হিসেব কবেই। তাই আগেভাগেই বলে রাখছি মশাই, এটি কিন্তু হাক্কা লেখা নয়, দস্তুরমত ভাবি মাল। দয়া কবে পরে যেন আমায় ছুষবেন না।

সীরিয়াস লেখা অবশ্য আমার তেমন আসে না। সেও ওই সম্পাদকেবই দোষ। বহুদিন যাবৎ আমাকে দিয়ে শুধু হাক্কা কাজই করানো হচ্ছে, একবারও কেউ ভেবে দেখছে না এতে আমার সাহিত্য-প্রতিভা এক্সেসাইজের অভাবে কত দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। কিংবা স্থূল হয়েও পড়তে পারে সে প্রতিভা, প্রতিভাব হালচাল বোঝা কি সহজ? না মশাই, আমার সাহিত্য-প্রতিভা সম্পাদকের পার্শ্বায়ুর্গির জন্ত অস্থিচর্মসার কিংবা মেদালস ভুঁড়িদার হয়ে পড়বে, এ আমি সহ্য করতে নারাজ। বিশেষতঃ যখন আমি জানি, আপনি, আমার বিয়েল সমঝদার যে পাঠক সেই আপনি—আজকাল সীরিয়াস লেখার প্রতি যথেষ্ট নেকনজর দিচ্ছেন।

সম্পাদক মশাইকেও একবার বলেছিলাম, আমাকে একটি ভারি কাজেব ভারিক্কি-অর্ডার প্লেস কবতে। একটু শ্রাম্পল পাঠাতেও চেয়েছিলাম ওঁকে। কিন্তু, বললে বিশ্বাস করবেন না, উনি সাফ বলে দিলেন, চাই না।

নমুনা চাই না, এটা কেমন কথাব নমুনা হল শুনি? আমবা বাঙালীরা তো বরাবর নমুনা চেয়ে এসেছি, নমুনার প্রতি আমাদের বৈরাগ্য কই এর আগে তো শুনেছি বলে মনে হয় না। বরঞ্চ মালটি না পেলে আমাদের আপত্তি থাকে না, অনেক সময় তো মাল পেতেই আমাদের আপত্তি, নমুনা যদি পাওয়া যায় বিনি পয়সা, ফ্রী শ্রাম্পলের ফ্রী ল্যান্সার আমরা, নমুনার যমুনাপুলিনে বিহাব করতে পারলে আব কিছু চাই না।

নমুনা-প্রীতির একটি ভাল নমুনা আমাব জ্বী। চৌকো সাবান, গুঁড়ো সাবান, মিঠে সিবাপ, তেতো ওষুধ, কী-একটা-মার্কিন-সিগ্রেট, উল, লেন্স, সিল্ক, এত বস্তুর নমুনা-সংস্করণে ওঁব নিজস্ব নমুনা-মিউজিয়মটি ভরপুর যে বিশ্বের পব দীর্ঘকাল আমার একটা বুক-টিব-টিব গোপন শকা ছিল, পাছে আমাকেও তিনি ওই মিউজিয়মের অন্তর্গত করে ফেলেন। স্বামী বস্তুর একটি নমুনা হিসাবেই হয়তো বা আমাকে অ্যাক্সেসেন্ট কবেছেন, উনি; পছন্দ হলে তবে আসল মাল অর্ডার দেবেন।

সে এক ভীষণ আই-ডেন্ট-নো, মানে—উভয়সঙ্কট! পছন্দ না হলে তো হয়েই গেল, পছন্দ হলেই কি বক্ষা আছে? নমুনা হিসাবে যে স্বামী ভাল, বেশ ভাল, অর্ডার সাপ্লাই হবার পরে কি আর সে তেমন থাকে? বিবাহিত জীবনেব শ্রাম্পল, পারস্পরিক সোয়াদেব নমুনা, নমুনা হিসাবে তার যা ফ্লেবার, সিগারেট কোম্পানীর প্রত্যেকবাব নতুন চালু-করা নতুন মার্কিন সিগারেটেব মত চালু হবার পর কদিন আর থাকে? কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মাবিলে, কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে?

শ্রাম্পল সার্ভে বলে একটা কথা আছে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। (‘আপনি নিশ্চয়ই জানেন,’ এ ফরুলাটা আমি পাঠকদের জন্ত আবিষ্কার করেছি, আপনার উপর

প্রথম ব্যবহার করে দেখলাম। ও-কথা না বললে পাঠকের মনে জানবার আগ্রহ কম হয়, অনেকে ব্যাপাবটা শক্ত ভেবে স্থিৎ করে যান।)

নমুনা-সার্ভের সেই বিখ্যাত উদাহরণটি তো আপনি কেন, আমিও জানি। জ্যোতি বহু বিধানসভায় প্রদ্ব করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে গরুর সংখ্যা কত? গরু-মোষ দপ্তরের মন্ত্রী (এঁর নামটা আমি জানি না, আপনি নিশ্চয়ই জানেন) ফরওয়ার্ড করলেন প্রদ্বটা গরু-বিভাগের সেক্রেটারীকে, সেক্রেটারী ডিরেক্টর অব্ গরু-হারালে-গরু-খোঁজা ডিপার্টমেন্টকে; ডিরেক্টর সাহেব প্রদ্বের কাপি তৈরি করে কবে প্রতি জেলার গরু-আধিকারিককে, জেলা-গরু-আধিকারিক ষথারীতি মহকুমা-গরু-সহাধিকারিককে।

এখন মহকুমা-সহাধিকারিক হচ্ছেন এই গরু-ব্যুরো-ক্রেসির কনিষ্ঠ অফিসার, তাঁর নীচে আর কোন অফিস নেই, পদবীতে সাবডেপুটি, বেতন দু শো টাকা, বৎসবাস্তে ইনক্রিমেন্ট দশ টাকা, একদিন চিন্তাশীল হয়ে বলেছিলেন, “একটা ছাগলেব বাচ্চা কিনে রাখলে এক বছরে তার দাম কমসে কম পনের টাকা বাড়ে, আব আমাদের দাম বাড়ে দশ টাকা!” ভেবে দেখেন নি, ছাগল শুধু ঘাস খায়; আর উনি যা খান তার পুষ্টিকারিতা ঘাসের সঙ্গে তুলনীয় হলেও দামে ঢের আঁক।

সেই দশ টাকা অ্যাক্সিলারেশনের সহাধিকারিক কী আব কবেন, অফিসের সামনে ফুটবল খেলার মাঠে কটা গরু চরে বেড়াচ্ছে তাই গুনে ফেললেন চেয়ারে বসেই। একেবারে শেষ প্রান্তে কালো মতন জন্তুটা গরু না ছাগল ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না বলে ফিপ্টি ফিপ্টি ফর্মুলায় গুটাকে আধখানা গুনলেন। তারপর আর কী! চল্লিশ ফিট বাই তিরিশ ফিট ছাট ইজ বারো শো স্কোয়ার ফিটে সাড়ে ছটা গরু—ব্যাস, ঐকিক নিয়মে মহকুমার মোট এরিয়া পাঁচ শো তিবিশ স্কোয়ার মাইলে কটা গরু কষে ফেললেন বারো মিনিটে।

এবং এই হিসেব পরমানন্দে রিটার্ন জার্নি করল মহকুমা থেকে জিলায়, জিলা থেকে দপ্তরে, দপ্তর থেকে অ্যাসেম্বলিতে; গরুর গড্ডলিকা প্রবাহ! তার এক প্রান্তে সহাধিকারিক, অত্র প্রান্তে জ্যোতি বহু!

এই গল্পটা কিছু আর নির্ভেজাল সত্য নয় (ভাগ্যিস নির্ভেজাল সত্য নয় তাই যোগাড় কবতে পেবেছি, খাঁটি সত্য হলে কি আর খুঁজে পেতাম কিছুতে? খাঁটি জিনিষ তো সবই বাজার থেকে লোপাট হয়ে গেছে কবে), কিন্তু সত্য না হলেও এটি নমুনা-বিজ্ঞানের একটি সমুজ্জল দৃষ্টান্ত। নমুনার উত্তম নমুনা।

নমুনার প্রতি আমাদের, বাঙালী মাত্রেই সহজাত আকর্ষণ। আব সেই বাঙালী যদি সাহিত্যিক হন তবে তো আর কথাই নেই, নমুনা পেলেই তিনি কৃতার্থ।

আমরা, বাঙালী সাহিত্যিকরা, চীনে রেন্তোরার নমুনা দেখেই মহাচীনের ওপর মহাকাব্য রচনা করতে পারি, চণ্ডীমাতা কেবিনে মোগলাই পর্বোটার নমুনা আমাদের কাছে মোগল চিত্রকলা সম্বন্ধে পাঁচশো পাতার গবেষণা লেখবার পক্ষে ষথেষ্ট; বুদ্ধদেব বহুকে দেখেই লিখে ফেলতে পারি ভগবান বুদ্ধের জীবন-উপন্যাস।

সেই জন্তুই সম্পাদককে নমুনা পাঠাতে চেয়েছিলাম, তারি ওজনের সিরিষাস সাহিত্যের। তা ছাড়া আর কী-ই বা পাঠাতে পাবি বলুন—স্পেসিমেন ছাড়া?

সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী ষখন ধরে রাখতে পাবছে না বিরাট মাহুযকে, দক্ষিণ মেরুব উর্ধ্ব জনশূন্য অজ্ঞাত তারার বিরহী রাজিষাপনেব সমবেদনায মাহুয ষখন উদেল, চঞ্চল, জঙ্ঘম, উর্ধ্বমুখ চকোরব মত মাহুয ষখন আকাশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁদের জ্যোৎস্না-আবরণ উন্মোচনে কৃতসঙ্কল্প প্রস্তুত, তখন সেই উনিশ শো একষটি সালের পৃথিবীতে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের অধিবাসী আমি কী-ই বা দেখাতে পারি আর। গাগারিন, শেফার্ড, গ্রিসম ও টিটোত প্রমুখ স্পেসমেনের যুগে মধ্যযুগেব হান্তকর স্পেসিমেন ছাড়া?

ষে নমুনাটি আমি সম্পাদক মহাশয় বরাবরেযু পাঠাবার সঙ্কল্প করেছিলাম, সীরিয়াস সেই সাহিত্যকর্মটি হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। দেখুন, বাংলা ভাষায় সীবিয়াস রচনার কয়েকটি বাঁধাধরা সাবজেক্ট আছে; তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, নন্দনতন্তু, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, জীবনদর্শন ও কলকাতা শহবে সাধারণ শোচাগারের সংখ্যালভতা—এই কয়টি বিষয়েব ওপর শক্তিমান সাহিত্যিকদেব চিন্তাশীল প্রবন্ধ ষথেষ্ট পরিমাণে রচিত

হয়েছে, অতএব ওই বিষয়গুলি নিয়ে আমার গবেষণা করার সার্থকতা তেমন আর নেই। তা হলে বাকী থাকল বোদলেষর, বিজ্ঞান এবং বিডিশিল্লের ওপব দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাব প্রভাব। এর মধ্যে সব কয়টি সম্বন্ধেই সীরিয়াস প্রবন্ধ রচনা করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। বিজ্ঞানকে প্রথম নির্বাচন করেছি, তার কারণ আর কিছু নয়—বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের অভাব। বাংলায় সীরিয়াস প্রবন্ধ লেখবার একটি প্রধান নিয়ম হচ্ছে, বিষয়টিতে লেখকের জ্ঞান অল্প হতে হবে, সাবজেক্টটিতে যদি আপনাব দখল থাকে তবে বচনাটি যথেষ্ট পরিমাণ দ্রুত না-ও হতে পারে, আব দ্রুত বচনা না হলে পাঠক তাকে সীরিয়াস লেখাব সম্মান দেবে না।

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকর্মে যে কয়টি অক্ষমণীয় ক্রটির প্রতি পাঠক ও সমালোচক সমানভাবে জ্রুটিবুটিল, সীরিয়াস প্রবন্ধে স্থপাঠ্যতা—রিভেবিলাটি হল তার মধ্যে সর্বপ্রধান।

সম্ভাব্য সেই ক্রটি এড়াবার জন্য আমি যে প্রবন্ধের নমুনা তৈরি করেছিলাম তা ছিল বিজ্ঞান-বিষয়ক, বাজি রেখে বলতে পারি আপনাবা সে লেখার একটুও মর্মোদ্ধার করতে পারতেন না, অতএব প্রশংসা কবতেন।

হায়, সম্পাদকের অসহযোগ আমাকে সেই গৌবব থেকে বঞ্চিত কবল। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আমার অপ্রকাশিতই থাকল।

ফলে আমার অন্তবে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, আমি সম্পাদক, সীরিয়াস লেখা ও বিজ্ঞান এই তিনটি বস্তুর ওপবেই হাড়ে হাড়ে চটে গিয়েছি। নীচে যে লেখাটি দেখছেন তার সৃষ্টিবহুত্ব বুঝতে হলে আপনাকে এই বিশেষ পার্সপেক্টিভ জানতে হবে।

মূল প্রবন্ধ

“সীরিয়াস লেখা চলবে না, লঘু প্রবন্ধ চলতে পারে”—সম্পাদক মহাশয়ের এই অজুজ্ঞা আমার কাছে পৌছল যে দূত মারফত, তার নাম টেলিফোন।

আর তখনই, সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল, আমার জীবনের অনেকানেক দুর্দশার স্রষ্টা এই টেলিফোন যন্ত্রটি, আমার বহু ট্রাজেডির ভিলেন। টেলিফোনের নিন্দায় আমার অন্তবাত্মা মুখর হয়ে উঠল।

টমাস এডিসন সাহেব যে ফনোগ্রাম আবিষ্কার করেছিলেন, করতে পেরেছিলেন নিঃশব্দ সরল চিত্তে, তার একমাত্র কারণ বোধ কবি ওঁর বধিরতা। নিজে কানে শুনতেন না বলে অশ্রের কান নিয়েও ওঁর তেমন মায়্যা থাকবার কথা নয়। কিংবা মায়্যা থাকলেও হয়তো উনি বুঝে উঠতে পাবে নি ওঁর কীর্তির পুবো মাহাত্ম্য। তাই ফনোগ্রামের পব গ্রামোফোন, তাব পর মেগাফোন, এরা সবাই আমাদের কান নিয়ে যত টানা-হেঁচড়াই করুক, তার জন্য এডিসন সাহেবের ওপর আমার কোন রাগ নেই।

কিন্তু আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল? কি করে আমরা ভুলেও ক্ষমা করব সেই ভদ্রলোককে যিনি নিজে দুটি স্পর্শকাতর কানের মালিক হয়েও আমাদের কান বেঁধে রেখে গেলেন টেলিফোনের নোংরা তারের সঙ্গে?

যন্ত্রের যন্ত্রণা আমবা আর কিছু কম ভুগছি না বোজ। হাসিমুখেই ভোগ করছি এক রকম। ভোগ না বলে উপভোগ কবছি বললেও আপত্তি কবব না আমি। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, সভ্যতার বাডবাডস্তর খাতিরে ইলেকট্রিক ক্ষুর থেকে টেস্ট টিউব বেবী পর্যন্ত অনেক কিছু মেনে নিতে রাজি হয়েছি আমরা। বিজ্ঞানও থাক, আমবাও থাকি—এমনি ধরনের একটা গীসফুল কো-একজিস্টেন্সের পঞ্চশীল সমর্থন করেও; তবু, এই টেলিফোন যন্ত্রটা ববদাস্ত কবতে হয় বলে প্রত্যহ আমি গ্রাহাম বেল সাহেবকে মনে মনে শাপ-শাপাস্ত না করে পারি না।

কেন না, টেলিফোন হচ্ছে পাঠশালার গুরুমশায়দের মত সেই জাতের যন্ত্র যাদের ধারণা কান ধরে না শোনাতে কোন কথা কানের মধ্যে ঢোকে না। ঢুকলেও সৈঁধোতে পারে না মগজ পর্যন্ত, স্তব্ধ করে বেবিয়ে আসে ফাঁক পেলেই। এদিকে আমার আবার কান টানলে মাথা শুধু আসে না—তেতেও ওঠে, হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়ে যায় প্রায়।

আমাব মরমে পশবার রাস্তা আব যেদিক দিয়েই হোক কানের ভিতব দিবা নয়, এ কথা আমি হলপ কবে বলতে পারি। না মশাই, লোকে যে বলে আমার জ্ঞান নাকি আমাকে কানে ধবে ঘোরান, তা হল রূপকার্থে কানে ধবা, সে-কান এ-কান নয় যেখানে ঘটায় ঘটায় টেলিফোনের দৌবায়ে আমি কিস্কর্তব্যবিমূঢ়।

আসলে কানকথা এবং কানে কানে কথা কোনটাই আমি একদম সহিতে পাবি নে। কথা বলা এবং কথা শোনার প্রক্রিয়ায় কান এবং মুখের দৈহিক ঘনিষ্ঠতাই যদি বিধাতার ইচ্ছে হত তা হলে তিনি এ-প্রত্যঙ্গ দুটি প্লেস কবার আবও ঢের সুবিধেজনক জায়গা খুঁজে পেতেন। হাতে কিংবা পায়ে এমন কি পিঠের মাঝ-বরাবরও যদি আমাদের অবণ ও কখন-ইঙ্গিয়েব অধিষ্ঠান হত তবে কানে কানে কথাব একটা মানে খুঁজে পাওয়া যেত যাহোক। কিন্তু যখন দেখি একটি ঢ্যাঙা মানুষের কান আপ্রাণ চেষ্টায় নাগালের মধ্যে এনে একটি বেটে মানুষ (কিংবা মেয়েমানুষ—এ দুটটাই বেশী কমন) ফিস্‌ফিস্‌ কথা শুনিতে চলেছে তখন আমার মনে হয় এরা ব্র্যাসফেমির অপরাধে অপরাধী।

এবং টেলিফোন যন্ত্রের রীতিই হল ছলে-বলে-কোণলে আপনার-আমার কানের ঘাড়ে চড়াও হয়ে কথা শুনিতে যাওয়া।

এককালে ভাবতাম, খুব সম্ভব ওর এই অদ্ভুত প্রতিভার মধ্যেই কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে—কেন যে টেলিফোনের এধারে তার ওধারে তার কিন্তু মাঝখানে একটি মেয়ে। অপারেটর। টেলিফোনের তাব ছুঁলে তবু শব্দ লাগে না, লো ভোল্টেজ কারেন্ট সেখানে—কিন্তু অপারেটর ছুঁয়ে দেখবেন তো একবার ক হাজার ক শো ভোল্টেরাধাক! এবং ওই মহিলা থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে টেলিফোনের কথা শোনানোর প্রবণতার। কথা শোনানোর দক্ষতায় মহিলারা—কেবল অপারেটর বা কো-অপারেটর নয়, নন্-কো-অপারেটর মেয়েরাও—স্বভাবতঃই অতুলন। নন্-কো-অপারেশনকারিগী রেশন-দান হামেশা বন্ধ করে থাকেন, কিন্তু ভাষণ-দান? সে তো চলে চতুর্গুণ উৎসাহে।

ইত্যাদি ভেবে চেষ্টা করতাম টেলিফোনকে সহ্য করতে। টেলিফোনের খাতিরে না হোক, অপারেটরের খাতিরে। দীর্ঘকাল চেষ্টা করোছ আর বলেছি, মেয়েদের মত টেলিফোনদেরও সহ্য করতে হবে—মানুষের প্রতি এ হচ্ছে ঈশ্বরের অভিশাপ। নিরুপায় সহবাস, অনন্তপন্থা সহ-অবস্থান।

কিন্তু এখন এই অটোমেটিকের যুগে টেলিফোনকে সহ্য করার আর কোন যুক্তি খুঁজে পাই বলুন। স্বয়ংক্রিয় এই টেলিফোন-যন্ত্রের কিং কিং যেন জ্বী-ভূমিকাবর্জিত লঙ্কাকাণ্ডের পালা—গার্ল স্কুলের পুঙ্খাব বিতরণী সভায় ছাড়া যার কোন অর্থই হয় না।

আর ডায়াল করা? ওই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে কান

মোচডানো, যে কান মোচডানো বিদ্যুৎ তবঙ্গে প্রবাহিত হয়ে বয়ে যায় আপনার টেলিফোন থেকে আপনার শরীর টেলিফোনে (শব্দ না হলে কেউ কাউকে অমনি অমনি টেলিফোন করে কখনও? টেলিফোন মানেই ছদ্মবেশী শব্দব আক্রমণ।) গিয়ে তান্ত্রিক মন্ত্রের কিং কিং জ্বীং ক্লীং উচ্চারণে সে বেচারীকে বশীকরণ কিংবা উচাটন প্রক্রিয়ায় পাকড়ে নিয়ে আসে তার টেলিফোন যন্ত্রের সামনে, তাতে লটকে তোলে তার কান, তারপর? তারপর ক সেকেণ্ড আগে তারের অপব প্রাপ্তে তার কানকে উদ্দেশ্য কবে ডায়ালের উপব আপনি যে উৎপীড়ন বর্ষণ কবেছিলেন, তারই সবটা স্নদে-আসলে বর্ষিত হয় তার কানে। তাই কোন কেউ আমাকে উদ্দেশ্য কবে তার টেলিফোনের কান মোচড়াচ্ছে বুঝতে পারলেই আমার কান লাল হয়ে ওঠে, আসন্ন বেদনা ও অপমানের আশঙ্কায়।

‘ডায়াল এন্ড ফর মার্ভার’ নামক সার্থক চলচ্চিত্রটি যারা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন সে গল্পের নায়িকার মাথায় কেন খুন চেপেছিল; কেন সে কাঁচি দিয়ে স্ট্যাব করে একটা লোককে খুন করতে পেরেছিল, সবই টেলিফোনের কুপায় অর্থাৎ দৌরাণ্যে। বাত ছপুবে কোন তদ্রমহিলাব টেলিফোন যদি কিং কিং উৎপাতে তাঁর ঘুম ভাঙায়, সে মহিলা বাঙালী হলে পর্যন্ত তাঁব মাথায় রক্ত উঠত, মার্কিন মহিলার পক্ষে সে অবস্থায় খুন করে বসা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

কী বললেন? আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, আপনার কানের নম্বরটি, মানে টেলিফোন নম্বরটি, আমাকে দিন, পর পর তিন বাত আমি ডায়াল কবে আপনার ঘুম ভাঙাব, তিন বাতই শেষে বলব রঙ নাগাব; তাবপর যদি আপনার হাতে একটা খুনখারাবী না ঘটে, তবে—

তবে আমাব টেলিফোন নম্বর আপনাকে আমি জানিয়ে দেব। বিনা আপত্তিতে।

উপসংহার

ভূমিকায় প্রতিশ্রুত সীবিয়াস প্রবন্ধ লিখে উঠতে পারলাম না; পাঠক নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

তবে লঘু প্রবন্ধ হলেও রচনাটি পাঠ করে আপনি একটি সীবিয়াস মরাল লাভ করতে পারছেন। তা হল এই: পাবম্পর্ষহীনতা, অসঙ্গতি এবং নন্সেন্স গুরুগভীর রচনাবই মনোপলি নয়, ওগুলো লঘু প্রবন্ধেও থাকা সম্ভব।

সমস্যা

অচ্যুত গোস্বামী

বেলা সাতটাব সময় অমলিনের ঘুম ভাঙল। পিটপিট কবে তাকাত্তে গিয়ে মশাবিব চালটা চোখে পড়ল। তারপব একটু তেরছাভাবে তাকিয়ে জানলার বাইরে দৃষ্টি দিয়ে দেখল চারদিক বেশ ফরসা হয়ে গেছে। শুষে শুষে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু নিশ্চয় বাড়িব ছাদগুলো, গাছের আগার দিকটা এতক্ষণ বোদে ভবে গিয়েছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়াব সময় হয়ে গিয়েছে অমলিনেব। একটা থেকে সাতটা। পুরো ছ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়েছে সে। একজন পরিণতবয়স্ক মানুষেব ঘুমের পক্ষে সময়টা যথেষ্ট।

অমলিন উঠে মশারির একটা দিক তুলে দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসল। শোষাব অবস্থা থেকে বসার অবস্থায় পৌছনো গেল বহু কষ্টে। এবার একটা হাই তুলে অমলিন হাত দুটো টান টান কবল।

এমনি করে মিনিট পাঁচেক কাটিয়ে দিয়ে অমলিনেব হঠাৎ হাসি পেল এই কথা ভেবে যে এই মিষ্টি মিষ্টি আলস্ত-মধুর সকালটার আয়ু আর কতটুকু। মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই তাকে সকালবেলার অবশ্যকবণীয় কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে। তারপব আধঘণ্টা তার নিজের পড়াশুনা আছে। ঠিক আটটাব সময় চাবটি মেয়ে আসবে তার কাছে। সাড়ে নটা অবধি তাবা পড়বে। তারপর তারা যেতে না যেতেই চান-খাওয়ার তাড়া লেগে যাবে। কলেজে সোষা এগারটাতে আজকে প্রথম ক্লাস শুরু। অবশ্য ক্লাস দেব্বিতে থাকলেও যে অমলিনের খুব বিশ্বাসেব অবকাশ মেলে তা নয়। যেদিন পোনে একটায় ক্লাস সেদিন সে সকালে দুটো টিউশনি কবে।

কাজই জীবন। কাজ কবতে অমলিন কোনদিন পিছপা হয় না।

এই ঘরটা পাণ্ডযায অমলিনের খুব স্তুবিধে হয়েছ। সকলে এটাব নাম দিয়েছে দেডতলাব ঘব—অর্থাৎ গ্যারেজের উপরকার নীচ ছাদওয়ালা ঘবখানা। যাব অভ্যাস নেই সে যদি হঠাৎ এ ঘরে ঢোকে তবে তার মনে হবে যে দম বন্ধ হয়ে আসছে, এই বুঝি মাথাটা ছাদে ঠোকর খেল। কিন্তু ঘরটার আশ্চর্য সৌন্দর্য এইখানে যে মাথা কখনও ঠোকর খায় না। ঠোকর লাগছে না এটা খুব একটা মজার ব্যাপাব নয় কি?

অমলিনের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে বলে এ সব ব্যাপাব আজকাল তার মনেই পড়ে না। এই যবে তার স্তুবিধে এই জন্তে যে কাজেকর্মে তার কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। বাড়ির লোকেরা সিঁড়ি দিয়ে যাতাযাত করে বটে, কিন্তু দবজায় পর্দা লাগানো আছে বলে সে টেবণ পায় না।

ভাগ্যিস এ বাড়িতে এবকমের একখানা ঘর ছিল। না থাকলে কি করে যে অমলিনেব দিন কাটত তা ভাবাই যায় না। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা বউ ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার চেযে বড বিড়ম্বনা মানুষেব জীবনে আর কী হতে পারে। এই যবে সে আছে বলেই দিনেব পর দিন চলে যায়, জীবর সঙ্গে তাব একবারও মুখোমুখি হয় না। বোধ কবি এক বছর কি তারও বেশী সময়ের মধ্যে জীবর সঙ্গে তার একবারও দেখা হয় নি। এই আশ্চর্য সৌভাগ্যেব জন্ত ভাগ্যকে ধন্যবাদ না জানিয়ে কি পারা যায়? ভদ্রমহিলা জানে যে এই বাড়িতে অমলিন নামে একজন মানুষ বাস করে। অমলিনও জানে



নতুন
জীবনের
নতুন
দাবী

পূরণ করতে নবজাতকের
জন্মটিকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
অনির্বচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-গল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিবিষে আনে।

ভাইনো-গল্ট



বেঙ্গল ইন্ডিয়াস কোং লিঃ

যে একই ছাদের নীচে বাস করে এমন একটি মহিলা যাকে নাকি সে একদিন মন্ত্র পড়ে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ কবেছিল। এটা এখন নিছক একটা সরল বিশ্বাসের ব্যাপার। কোন প্রমাণ ছাড়াই আমরা যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কবি, তারাও তেমনি কোন প্রমাণ ছাড়াই পরস্পরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অবশ্য মাঝে মাঝে দেখা হয় জরুরী দরকার থাকলে। দরকারী কথা ছাড়া অল্প রকমের কথা অবশ্য কখনও হয় না। সেদিক দিয়ে উভয় পক্ষই বেশ সজাগ থাকে। ছেলেমেয়েবা ভাল করেই জানে যে তাদের বাবা সাধারণ বাবাদের মত নয়। বাবার সঙ্গে বেশী কথা বললে বাবাকে প্রশ্ন দেওয়া হয়। বেশী প্রশ্ন দিলে তিনি যদি মাথায চড়ে বসে অত্যাশ্চর্য যোগ নিতে চেষ্টা করেন? আর ছেলেদের মনোভাব জানে বলেই অমলিনও তাদের সঙ্গে কখনও অনাবশ্যক বাক্যব্যয় করতে রাজী নয়। কালসাপেব বাচ্চারা যে কালসাপ ছাড়া আর কিছু হতে পারে এরকমের কোন মিথ্যা মোহ পোষণ না করাই ভাল।

ব্রাশের উপর পেট লাগিয়ে নিখে অমলিন সি ডি বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার চোখ দুটো জ্বালা কবে উঠল বাগে। মণীশ সেদিন একটা বিস্ত্রী কথা বলেছিল। মণীশ তার বন্ধু এবং সহকর্মী, এবং তা ছাড়া সে তাকে যথেষ্ট ভালবাসে। তা সত্ত্বেও সেদিন সে অনায়াসে বলেছিল, তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তারা কী করে যে এক ছাদের নীচে থাকে তা নাকি ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

কজন স্বামী-স্ত্রীকে দেখেছে মণীশ তার রুটিন-বাঁধা জীবনে? বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, কটা ক্ষেত্রে মণীশ তা ছাড়িয়ে ভিতবেব সত্যি খবরটা জানতে চেষ্টা করেছে? জীবন সম্পর্কে সত্যিকারের কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ ওপর-ওপর ভাবে মোড়লী কবতে আসে তবে বড় বিবস্ত্র লাগে।

অমলিন এ কথা ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারে যে, বিষের আট দশ বছর পরে কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে পারে না।

বিয়ের পর প্রথম দু-এক বছর বেশ ভালই কাটে। তারপর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্কটা দাঁড়ায় সাদা বাংলায় বললে সেটা একটু ক্লট গোনাতো পারে। সেটা নিছক খেয়োখেয়ির সম্পর্ক।

কলতলায় দাঁড়িয়ে অমলিন মুখের মধ্যে ব্রাশ চালানোর গতি দ্রুততর করল। যারা প্রচলিত অর্থে বুদ্ধিমান তারা নিজেদের আসল সম্পর্কটাকে চাপা দিয়ে বাথতে চেষ্টা করে। অমলিন ওই বকমের বুদ্ধিমান হয়ে মিথ্যার একটা মুখোশ পরে থাকতে রাজী নয়। একটু নরম হয়ে, একটু হীনতা স্বীকার কবে, সে হয়তো স্বামী সঙ্গে আবার একটা বাহ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পাবে। তাতে হয়তো আশেপাশের লোকেরা খুশী বোধ কবতে পারে। কিন্তু ওই একটা জিনিস অমলিন পাববে না। মিথ্যার সঙ্গে আপোস করতে পাববে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা আসলে ব্যবসার সম্পর্ক, আদান-প্রদানের সম্পর্ক। আব যে সব কথা লোকে বলে, প্রেম ভালবাসা প্রভৃতির কথা, সে সবের অস্তিত্ব শুধু বইয়েব পাতায়। আগের দিনে ব্যাপারটা খুব সোজাসজি ছিল। স্বামী জীব ভরণপোষণের দায়িত্ব নিত, স্ত্রী গতরে খেতে তাব প্রতিদান দিত। এখনও সাধারণবিস্ত্র মানুষদের মধ্যে এই নিয়মটাই মোটামুটি চালু আছে। কিন্তু যে সব স্ত্রীদেব পেটে একটুখানি ইঙ্কল-কলেজের বিত্তে ঢুকেছে তারা একটু অত্মরকম ভাবতে শুরু করেছে। তাদের কাছে স্বামীদের অর্থনৈতিক দায়টা যা ছিল তাই আছে। ববং আরও বেড়েছে। শাড়ি, গয়না, প্রসাধন সবতাতেই মানুষের অঙ্গ বেড়েছে। কিন্তু প্রতিদানে আধুনিক স্ত্রীদের নাকি কিছুই দায়দায়িত্ব নেই। তাদের অস্তিত্বই নাকি স্বামীদের যথেষ্ট মর্যাদা দান করে। এবং স্বামীদের কাছে সেটুকুই যথেষ্ট প্রাপ্তি বলে গণ্য হওয়া উচিত।

এটা যদি শোষণের মনোভাব না হয় তবে শোষণ কাকে বলে? এবং স্ত্রীব আব স্বামীর মধ্যে সম্পর্ক যখন শোষণক আব শোষিতের সম্পর্ক তখন অনেক কৌশলে এই সত্যটাকে গোপন করে রাখার কোন দায় অমলিনের নেই। প্রতি মুহূর্তে এই সত্যটাকে সে প্রকট করে রাখতে চায় যে কে শোষিত। স্ত্রীর সংসারের সমস্ত দায় বহন করে, বিনিময়ে কালে-ভদ্রে স্বামীর মুখে দুটো মিষ্টি কথা শুনে

বা বছরের মধ্যে দু-একদিন বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার সময় জীবদ্দশা করে সে কুতর্থা বোধ করতে চায় না।

মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে অমলিন দেখল যে ঝি চা জলখাবার টেবিলে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। চা মুখে দিয়ে দেখল চা ঠাণ্ডা জল হয়ে গিয়েছে। তা তো হবেই। দোতলার সবাই গরম সধুম চা রসিয়ে রসিয়ে খেয়েছে। কিন্তু এই চা তৈরি হয়েছে যাব পয়সায় তার ভাগ্যে ঠাণ্ডা চা। তাই-ই তো স্বাভাবিক।

চা ঠাণ্ডা কেন?—অমলিন জিজ্ঞেস কবল।

গরম চা-ই তো এনেছিলাম বাবু। আপনি আসতে দেরি করেছেন তাই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

তা বটে। যুধিষ্ঠিরের মাসতুত বোন! একবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথা বলে যাচ্ছ?

অমলিন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? চলে যাও।

আজ্ঞে, একবারে কাপ-পিরিচগুলো নিয়ে যাব।

অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি কবে খেয়ে নাও। আমাদের দায় উদ্ধার হোক। বাড়ির ঝি পর্যন্ত যে ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে তার কাবণ বাড়ির গৃহকর্ত্রী'র উসকানি রয়েছে পিছনে। অমলিন কি বোঝে না কিছু?

পেয়লা-পিরিচ নিয়ে ঝি চলে যাওয়ার পর অমলিন বইপড়ার নিয়ে বসল। সে ইতিহাসের অধ্যাপক বলে নিজের বিষয়ের জ্ঞান যথেষ্ট প্রাইভেট ছাত্র পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই নিজের বিষয় ছাড়া আবও তিন-চারটি বিষয় পড়ানোর জ্ঞান সে ছাত্র নিয়ে থাকে। আর পড়ানোটা তো নেহাত ফাঁকিব ব্যাপার নয়। কাজেই নিজে তৈরি হওয়ার জ্ঞান তাকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়।

কিন্তু বই খুলে বসতে না বসতেই বড় ছেলে বলটু এল। সে পড়াশুনায় ভাল; ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে এ বছর থি. ইয়ার ডিগ্রী কোর্সেব ফাস্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে।

অমলিন মুখ না তুলে জিজ্ঞেস কবল, কী দরকার?

তোমাব এক বন্ধু তো ইংরেজি-সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন বাংলায়। তুমি যে বলেছিলে তাব বই এক কপি এনে দেবে?

বলে বেখেছি। যেদিন দেবে সেদিনই পাবে।

আচ্ছা।—বলে বলটু তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

লক্ষ্য করে অমলিন জিজ্ঞেস কবল, আর কোন কথা আছে?

মা বলছিল চল্লিশটা টাকা বেখে যেতে। নয়তো ওই রকম দামের একখানা শাড়ি কিনে আনতে।

শাড়ি কি জ্ঞান?

জান না বাবা? মার বন্ধুর মেয়েব বিয়ে যে কাল। প্রজেক্ট দিতে হবে না?

না, তা অমলিন জানে না। কে আবার তাকে জানাবে এসব খবর। তা ছাড়া তাব জানাবই বা দরকার কি? এক ওই টাকাব ব্যাপারটা আছে বলেই যা একটু অস্ববিধে।

টাকা কি করে আদায় করতে হয় তা অমলিনেব জ্ঞান ভাল করেই জানে। তিন ছেলেমেয়েব পড়াশুনাব পেছনেই তো দু শো টাকা মাস মাস খবচ কবতে হয় অমলিনকে। বলটু প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হয়েছে। ছোট ছুজন এখনও কনভেন্টে পড়ছে। তা ছাড়া বই আছে, প্রাইভেট টিউটর আছে। এই অঙ্কেব চাব ভাগের এক ভাগেব বেশী টাকা যারা খরচ কবতে পাবে না তাদের ছেলেরাও লেখাপড়া শেখে। কিন্তু অমলিনেব ছেলেরা তাতে খুশী হবে কেন? ঘরে দুধলো গাই আছে, দুইলেই তো দুধ পাওয়া যায়।

বন্ধুর মেয়ের বিয়ের জ্ঞান চল্লিশ টাকাব প্রজেক্ট। পাঁচ-ছ টাকা দিয়ে একটা কিছু কিনে দিলেও কিন্তু অনায়াসে চলতে পারত।

অমলিন ব্যাগ থেকে টাকা বেব করে দিয়ে বলল, টাকাই নিয়ে যাও, আমার শাড়ি কেনার সময় হবে না।

অমলিন হয়তো এখন আপত্তি জানাতে পাবত। হয়তো কোন বাদ-প্রতিবাদেব মধ্যে না গিয়ে অনায়াসে বলটুর হাতে বিশটা টাকা তুলে দিয়ে বলতে পাবত এই টাকাব মধ্যে মাকে সেবে নিতে বলবি। আর দিতে পাবব না।

কিন্তু না, অমলিন তা বলতে যাবে না। এদের দাবির অঙ্ক জাঁটাই করে অমলিন এদেব এমন কথা বলার স্বযোগ কখনও দেবে না যে এদের চাহিদা যোল আনা মিটিয়ে দিতে সে কার্পণ্য করে। এদেব সমস্ত অজ্ঞান

দাবি, অর্থহীন অপব্যয়, সমস্ত সে বিনা বাক্যব্যয়ে বরদাস্ত করে যাচ্ছে এবং যাবে। তার সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েও যদি দাবি না মেটে তবে সে ধার করবে। তবু দাবি মেটাতে অস্বীকার করবে না। আপাততঃ অবশ্য তাকে ধাব করতে হচ্ছে না, কারণ অমাহুযিক পরিশ্রম করে সে যা রোজগার করেছে তার পরিমাণ খুব খাবাপ নয়। কলেজে সে চার শো পায়, তা ছাড়া পার্টটাইম, টিউশানি, নোট লেখা প্রভৃতিতে আরও ণ ছয়েক তাকে রোজগার করতে হয়। এই বিপুল পরিমাণ টাকার প্রায় সবটাই অবশ্য ব্যয় হয় মহাদেবীর ত্রিচরণে। তার নিজের জন্ত খরচ হয় বড় ছোর মাসে একশো টাকা।

অবশ্য অমলিন ভাল করেই জানে সে যতই করুক তবু এদের কাছ থেকে সে কোনদিন প্রশংসা পাবে না। সে যে তার দেহের আর মনেব সমস্ত জীবনীশক্তি নিঃশেষে ক্ষয় করে ফেলছে উদ্যাস্ত পবিত্র করে সে-কথা এরা কখনও একবারও মনে করবে না। বরং সাবিত্রী দিনবাত সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছে যে অমলিন জ্বর গয়না বন্ধক বেখে একবার তিন হাজার টাকা ধার কবেছিল। ব্যাপারটা অবশ্য সত্য। কয়েক বছর আগে অমলিনকে একটানা তিন চার বছর বেকাব থাকতে হয়েছিল। সেই সময় সে সাবিত্রীর গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল। সেই থেকে ওদের মধ্যে মনান্তরের সূত্রপাত। তারপব যখন সে জ্বর নামে কেনা বালিগঞ্জ প্লেসের জ মটা বিক্রি করে দেয় সাত হাজার টাকায় তখন মনান্তর স্থায়ী বিচ্ছেদে পরিণত হয়। সাবিত্রী সকলের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলে বেড়ায় জ্বর সম্পত্তি নিয়ে স্বামী যে এমন ছিনিমিনি খেলতে পাবে এ পৃথিবীর মধ্যে কেবল তার জীবনেই ঘটেছে। সম্পত্তিটা জ্বর নামে কেনা হলেও যে স্বামীর টাকাতেই কেনা হয়েছিল এ কথা অবশ্য সে ঘুণাক্ষবেও কাউকে বলে না। তেমনি বন্ধকী গয়না কবে অমলিন ছাড় কবিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছে সে কথাটাও সে উদ্ধ রাখে সব সময়।

এ রকম জ্বীলোক যে কোনদিন অমলিনের প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না তা সে ভাল কবেই জানে। এ সংসারের জন্ত সে প্রাণপাত পরিশ্রম কবে যে টাকা ব্যয় করেছে সে সবই মিছক ভস্মে ঘি ঢালা।

তা হোক, তবু ভস্মেই ঘি ঢেলে যাবে অমলিন সারা জীবন। সে মনে করবে যে এই কাজেব জন্তই সে এ পৃথিবীতে ভগবান কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছে।

বলুটা টাকাটা হাতে নিয়ে এ ঘরে আব এক মিনিটও দাঁড়ায় নি। তা দাঁড়াতে কেন? সে মায়ের উপযুক্ত ছেলে। বাবাব সঙ্গে সম্পর্ক যে শুধু টাকার সম্পর্ক তা সে ভাল কবেই জানে।

আশ্চর্য! ছেলেমেয়েরা সবাই জলেব মত স্পষ্ট করে বুঝে গিয়েছে যে বাবা মাব প্রতি গুরুতর অত্যাচার করেছেন। এখন সংসারের পিছনে তিনি যত টাকাই খরচ করুন তাতে সে অত্যাচার ক্ষতিপূরণ হয় না। সংসারের জন্ত অমলিন যা দেয় সেটা তো নিয়মমত পাওনা মিটিয়ে দেওয়া, তাতে বকেয়া দেনা শোধ হবে কী করে?

মুখে বক্ত উঠে অমলিন মরে গেলেও তাব বকেয়া দেনা শোধ হবে না।

হঠাৎ দারুণ মিসফল রাগে অমলিন টেবিল থেকে কাচের পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে জানলাব দিকে ছুঁড়ে দিল। জানলাব গরাদে ঠোঁকব লেগে পেপারওয়েটটা ঘুবে এসে মেঝের উপর পড়ল সশব্দে। আশ্চর্য, তবু ওটা ভাঙল না।

নাঃ, আজকের সকালটা একেবারে মাটি হল দেখা যাচ্ছে। এখন কি আর অমলিনের পড়াব দিকে মন বসবে। যে সব চিন্তাকে কখনই মনের আনাচে-কানাচেও জায়গা দিতে চায় না, সে সব কেন যে যখন তখন মনে আসে? এ সব চিন্তা একবার মনে এলে অমলিন মনেব সমস্ত স্বৈর্য হাবিয়ে ফেলে। বিরক্তির একশেষ। নিজের প্রতিও বিরক্তিব অবধি নেই অমলিনের মনে।

অল্প পরেই প্রাইভেট ছাত্রী দুটি এসে পড়ায় অমলিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নিজের মনেব থেকে রেহাই পাওয়াব সুযোগ পাওয়া গেল তবু এবাব।

একগাল হেসে অমলিন বলল, এস।

কী মোলায়েম করে হাসছে মেয়ে দুটি। বিনয় আর কৃতজ্ঞতার হাসি! কিন্তু অমলিন জানে এদের গলার কাছে থলিতে ভবা বিষ আছে। না, মেয়েদের অমলিন চেনে—কোন মেয়ে সম্পর্কেই অমলিনের মনে কোন মিথ্যা মোহ নেই। তবু যে সে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী

বোরোলীন- বিশ্বিত লাবণ্য

রুষ্টিব দিন শেষ হোলো। আকাশ এখন স্বচ্ছ নীল।
শব্দেব বোদ্র-দীপ্ত উৎসবেব দিন এলো উজ্জল
পরিবেশ নিয়ে।

আপনাব-ও এখন নিজেকে আবো উজ্জল কবে তোলবাব
বাসনা। আপনাব এই নব রূপায়ণে যুগ্ম-সুবভিত
বোরোলীন ক্রীম উজ্জলতম উপকরণ—আপনাব
প্রমাধনেব অপবিহার্য অঙ্গ।

কোমল স্নিগ্ধ বোরোলীন ক্রীমের ভেষজগুণযুক্ত স্নেহ-
জাতীয় পদার্থ ধূলা আব বোদ্রেব হাত থেকে ত্রুকে
বন্ধা কবে আব আপনাব স্বাভাবিক লাবণ্য ফিবিষে
আনে। বোরোলীন-বিশ্বিত সে মাধুরী আশ্রয়ে আকর্ষণীয়
ও বিশিষ্ট কবে তোলে। নিয়মিত বোরোলীনেব প্রয়োগে
নিজেকে লাবণ্যমণ্ডিত ককন।



ল্যামোলিন-যুক্ত যুগ্ম-সুবভিত
বোরোলীন ফেস্ ক্রীম আজ
প্রমাধনেব এক অপবিহার্য
উপকরণ।

বোরোলীন

ভেষজগুণসম্পন্ন পরম প্রসাধন



জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিঃ ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

পড়াতেই বেশী ভালবাসে তার কারণটা ফ্রেড অনেক আগেই বলে দিয়ে গিয়েছেন। পুনরুজ্জীবিত অনাবশ্যক।

সেদিন কলেজে গিয়ে প্রথম ঘণ্টাতেই অমলিনের মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। বোলকল করতে করতে মনে হল হলের এক কোণে তিন-চারটি ছেলে মনের আনন্দে গল্প করছে। যেন এটা ফুটবল খেলাব মাঠ। অমলিন তৎক্ষণাৎ তাদের ক্লাস থেকে বার করে দিল।

ধানিক পরে মুখ তুলে দেখল একটি ছেলে বিচিত্র মুখ ও হাতের ভঙ্গী কবে একটু দূরেব আব একটি ছেলেকে ইশাবায় কী বোঝাতে চাইছে। তাব রকম দেখে আশেপাশেব ছেলেরা মুচকি মুচকি হাসছে। রাগে পিঙ্কি জলে গেল অমলিনেব। তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকেও বেরিয়ে যেতে আদেশ দিল সে। ছেলেটি আদেশ না মেনে তর্ক আরম্ভ করে দিল। সে-তো কোন গোলমাল করে নি, কেন বাইবে যাবে।

দারুণ বিবক্তিতে অমলিন ক্লাস ছেড়ে বেবিষে চলে এল।

টিচার্স-কমনরুমে এসে একটা সিগারেট ধবিষে অমলিন ভাবতে চেষ্টা করল যে, সে নিশ্চয় কোন শাপগ্রস্ত ঋষি। অভিষাপ না থাকলে সে প্রফেসার হয়ে জন্মাবে কেন? পৃথিবীতে কি ভাল ভাল পেশাব অভাব আছে? জুতো সেলাই আছে, চণ্ডীপাঠ আছে। যে কোন কাজ প্রফেসারিব থেকে ভাল।

তিন চারটি ছেলে ক্লাসেব প্রতিনিধি হিসাবে এসে বলল, সার্ব, ক্লাসে চলুন। আব গোলমাল হবে না।

অমলিন বলল, দেখ বাবা সকল, তোমাদের প্রতি আমার একটুও সহানুভূতি নেই। তোমরা যদি পরীক্ষায় ফেল কর তাতে আমি বরং খুশী হব। আমি তাই চাই। তোমরা যদি জাহান্নমে যেতে চাও আমি তোমাদের সোজা রাস্তাটা দেখিয়ে দেব।

সার্ব, আমরা ফেল করতে চাই না।

কেন? ফেল কবতে তোমাদের এত ভয় কিসের? জান না—বিফলতা সাফল্যের সোপান-স্বরূপ।

অমলিনেব কথাব ঝাঁজে ছেলেব দল মুখচুন করে বেবিষে গেল।

পরেব ক্লাসটায অমলিন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ব্যবহার করল। সে ডাইনে বাঁয়ে কোনদিকে দৃষ্টিপাত করল না। কেউ গোলমাল কবছে কিনা বা কেউ শুনছে কিনা তা সে দেখল না। নিজের মনে অনর্গল একটানা বক্তৃতা দিয়ে গেল সারাটা ঘণ্টা। কী যে বলল তা সে নিজেও জানে না। শুধু এটুকু লক্ষ্য রাখল বলাব ভাষাটা যেন বেশ শক্ত আব অলঙ্কারপূর্ণ হয়। ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে শুদ্ধক। কিছু বুঝতে নাই বা পারল।

বেবিষে এসে অমলিন একটা ফোন পেল। শেফালী আর কবিতা, তার দুই ছাত্রী জানাল যে সন্ধ্যায় তারা পড়বে না। আজ সন্ধ্যা সাতটা থেকে তাদের পর পর পড়ানোর কথা। দেড দেড তিন ঘণ্টা। দুজনকে পড়াতে পড়াতে দশটা বেজে যেত। বাড়ি ফিবতে এগাবটা হত। সেইটেই অমলিনেব চলতি ক্রটিম। হঠাৎ ক্রটিমটার গোলমাল হওয়ায সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। দীর্ঘ চার ঘণ্টা সময় সে কী কবে কাটাবে? নিজের মনের সঙ্গে একা একা থাকতে তাব বড় ভয়।

কয়েকটি ছেলে এসে অমলিনকে ঘিরে ধরল, সার্ব, আজকে বিহার্সাল আছে, থাকবেন কিন্তু।

দিন কষেক পবে কলেজে একটা ফাংশন আছে। ছেলেবা সেদিন নাটক মঞ্চস্থ করবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। এ সব ব্যাপাবে অমলিনই সাধারণতঃ ছেলেদেব সাহায্য কবে থাকে। ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সব টীচারবা যখন বাড়িব দিকে ফেবে তখন অমলিন ছেলেদেব নিয়ে বসে। গাঁটের পয়সা খবচ করে তাদের সিঁড়াড়া আব চা খাওয়ায।

তোমবা এক কাজ কর। আজ সন্ধ্যার পর বস। সাতটার পব।—অমলিন বলল।

অত বাত্রে কি ছেলেবা আসতে পারবে সার্ব।—একটি ছেলে আপত্তি জানাল।

কেন? তাতে অস্ববিধে কি? একদিন একটু পড়া কম হলে কিছু ক্ষতি হবে না।

সেজ্ঞা না সার্ব। বাড়িব গার্জিয়ানবাই আসতে দেবে না।

অমলিন মনে মনে বলল, গার্জিয়ানদের জ্ঞাত তো কত ভয় আজকালকাব ছেলেদের। যত সব!

কিন্তু অনেক বলেকয়েও ছেলেদেব রাজে আসতে রাজী কবাতো পারল না অমলিন। অগত্যা তিনটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত বিহার্গালের টাইম ঠিক হল।

অমলিন বন্ধু মণীশকে ফোনে ডাকল : মণীশ, আজ সন্ধ্যা সাতটায় চলে এস না। বেশ মনের স্বখে আড্ডা দেওয়া যাবে।

আজ সাতটায়? আজ পাবব না ভাই।

কেন? তোমার আবার কী কাজ? টিউশানি তো কর না।

আজ ভাই বউয়ের সঙ্গে একটু বেরুতে হবে। ওব এক বান্ধবীর মেয়ের বিয়ে কাল। শাড়িটাড়ি একটা কিছু কিনতে হবে।

এ কথা শুনে পিভি জলে গেল অমলিনেব। বউয়ের আঁচল ধরে বেড়ানোটা মণীশেব একটা লোক-দেখানো বাতীক। আসলে ওদের এই অহুবাগের বাডাবাড়ির মধ্যেই একটা গভীর বীতরাগ লুকিয়ে আছে। কথাটা অমলিন মণীশকে বলেছেও অনেক দিন। মণীশ বিশ্বাস কবে না, হেসে উড়িয়ে দেয় কথাটা। স্বাভাবিক সাইকোলজি বলে যে একটা বিষয় আছে তা তো পড়ে নি মণীশ। এই জগুই প্রত্যেক মানুষেব সাইকোলজি পড়া উচিত।

অমলিন বলল, ও কাজ তোমার বউ একাই পারবে। সন্ধ্যাটা অমন কবে পণ্ড না করে চলে এস। আমিনিয়াতে মুরগীব রোস্ট খাওয়াব, কথা দিচ্ছি।

কিন্তু এত বড় প্রতিশ্রুতিতেও মণীশের মন গলল না। ইংরিজিতে যেন কী বলে এদের—হেন-পেকড না?

তিনটে পর্যন্ত কলেজ করে সাড়ে চারটে অবধি ছেলেদেব বিহার্গালে সাহায্য করে অমলিন বেরল। পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত পার্ট-টাইমের জায়গায় কাটল।

এবার অমলিনেব ছুটি। নিঃসঙ্গ ভয়াবহ নিষ্করণ সাড়ে চারটে ঘণ্টা তার সামনে।

যদি নটার শোতে সিনেমা দেখতে যায় তাহলেও ছুটি ঘণ্টা চুপচাপ বসে বসে কাটাতে হবে। নিজের মনের সঙ্গে যুঝতে হবে একা।

চিন্তিতভাবে অমলিন হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কে গিয়ে ঢুকল। খোলা আকাশের নীচে ঘাসেব উপর

বসল। পাশের কয়েকটি ভদ্রলোককে একটি ভিথিরি ছেলে গান গেয়ে শোনাচ্ছে। তার গান শেষ হয়ে গেলে সে অমলিনেব কাছে হাত পাতল।

অমলিন জিজ্ঞেস কবল, গান শিখবি?

ছেলেটি বলল, গান? বাবু, এখন সন্ধ্যাব সময় পাঁচজনের কাছে হাত পাতলে দুটো পয়সা পাব।

হাত পেতে আর ক পয়সা পাবি বোকা? আচ্ছা, আমি তোকে আট আনা দেব। নে বোস। একটা ভাল গান শিখিয়ে দি তোকে।

অমলিন ভাল গাইতে পারে না। কিন্তু শেখাতে পারে। মোটামুটি স্ববেব জ্ঞান আছে। সে ছেলেটিকে 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' শেখাতে আরম্ভ কবল পবম উৎসাহের সঙ্গে।

হঠাৎ অমলিনকে চমকে উঠতে হল। সামনে মণীশ। তাব সঙ্গে তার বউ আর ছ-সাত বছরের একটি ছেলে। বউয়েব হাতে একটি পুঁটলিতে নিশ্চয় সন্ধ্যা-কেনা শাড়িখানা জড়ানো রয়েছে।

মণীশ বলল, অমলিন না? দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছি। এখানে কি গানের ক্লাস খুলেছ নাকি?

অমলিন লজ্জিত ভাবে বলল, কী করি? সময় তো কাটাতে হবে।

তাই বলে এই ছেলেকে গান শেখাবে। এ তোমার গানেব মূল্য কী বুঝবে!

কেন, ভিথিরিরা কি মানুষ নয়?

দেখ অমলিন, তোমাকে আমি চিনি। ভিথিরির প্রতি অত দরদ তোমার নেই।

আমার কথা ছেড়ে দাও। তাবপর তুমি এখানে কেন?

মার্কেটিং হয়ে গেল। বউ বলল, চল, একটু বেড়িয়ে যাই—তাই। কিন্তু তোমাব জগু যে চিন্তিত হয়ে পড়লাম অমলিন?

সে কথায় কান না দিয়ে অমলিন মণীশের বউয়ের সঙ্গে শিষ্টাচারমূলক কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দু-চার কথার পব বউটি একটু দূবে বসে তার ছেলেব সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ কবল। আব মণীশ অমলিনেব পাশে

বসল। অগত্যা অমলিন পয়সা দিয়ে ছেলেটিকে বিদায় কবে দিল।

মণীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী আশ্চর্য, তুমি পয়সা কবুল কবে ছেলেটাকে গান শেখাচ্ছিলে?

অমলিন লজ্জিত হয়ে আমতা আমতা করে বলল, মানে—কী করব বল? ছেলেটাব তো সময় নষ্ট হয়।

মণীশ হাসল না। গম্ভীর হয়ে গেল।

জ্বরী সঙ্গে মনকষাকষিটা এতদিনেও মিটিয়ে ফেলতে পারলে না অমলিন?

এর মধ্যে আবাব জ্বরী কথা টানছ কেন ভাই?

তার কাবণ জ্বরী তোমাব সব সমস্যার মূলে। সেইজগুই হয়তো সময় থাকলে তুমি এত বিব্রত হয়ে পড়।

সময় কাটানো সকলের কাছেই একটা সমস্যা।

তোমার মত সমস্যা কাবও কাছে নয়। আমি তো ভেবে পাই না কি করে একই বাড়িতে থেকে তোমরা বাক্যালাপ না করে দিন কাটাতে পার।

ওসব কথা থাক না এখন মণীশ।

না, থাকবে না। আজকে একটা স্পষ্টাঙ্গা আলাপ কবতে চাই তোমাব সঙ্গে। শোন অমলিন, আমার বউ যদি সাতদিন আমাব সঙ্গে এমন করে কথা না বলে থাকত তা হলে আমি কী কবতাম জান?

কি করতে?

আমি ওকে মারতাম। বেপরোয়া ভাবে নিষ্ঠুরে মত মারতাম।

অমলিনের মুখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল।

আমি জানি—মণীশ বলে চলল, জ্বরী গায়ে হাত তোলা জঘন্য অত্যাচার। কিন্তু উভয়ের ভালব জগুই আমি তা কবতাম। একটা অত্যাচার করাব ভয়ে আমি আমাব সাবাটা জীবন ব্যর্থ হতে দিতাম না।

আমার জীবন কি ব্যর্থ?

তা ছাড়া আবার কি? তুমি তো গাড়ি-টানা বলদমাত্র। নিজে খেটে মবছ, আর সেই টাকাষ বউ ছেলেমেয়েরা স্মৃতি কবছে। তারপব শোন। ই্যা, আমি

বউকে মারতাম। এমন যদি আমাবই কোন অত্যাচার জগুই বউ আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করত তবু আমি তাকে মাবতাম।

সে কি?

কেন মারব না? আমি জীবনে একটাও অত্যাচার কবব না এমন কোন দাসখত লিখে দিয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি নাকি? আমি নিশ্চয়ই জীবনে দু-একবাব অত্যাচার করতে পারি। আর জ্বরী নিশ্চয়ই তা সহ্য করবে।

তোমার জীবন-দর্শন তো খুব জোরালো মণীশ?

জোবালো বইকি? আব মাব দিয়েও যদি কোন ফল না হত তা হলে কী করতাম জান? বাড়ি ছেড়ে চলে যেতাম, আর এক পয়সাও বাড়িতে দিতাম না।

বাঃ! খুব কর্তব্যজ্ঞানেব কথা বলছ মণীশ!

যে জ্বরী বা ছেলেমেয়ে আমাব প্রতি কোন কর্তব্য পালন কবে না তাদের প্রতি আমার কোন কর্তব্য নেই। কর্তব্য কি একতবফা ব্যাপার? কক্ষনো না। কেন? আমি কি ফেলনা? ভেসে এসেছি? আমাব জীবনের কোন দাম নেই?

অমলিন হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, মণীশ, তুমি আমাব ব্যাপারটা একটুও বুঝতে পার নি।

খুব বুঝেছি। আমি যা বলছি করে দেখ। মাবতে না পার, ওদের ফেলে বেখে চলে এস। দেখবে তোমাব বউ তোমাব পায়ে ধবে ক্ষমা চাইছে।

কিন্তু ভাই, পায়ে ধরতে পারে—তাতে কি মনের বিষ ক্ষয় হয়ে যাবে?

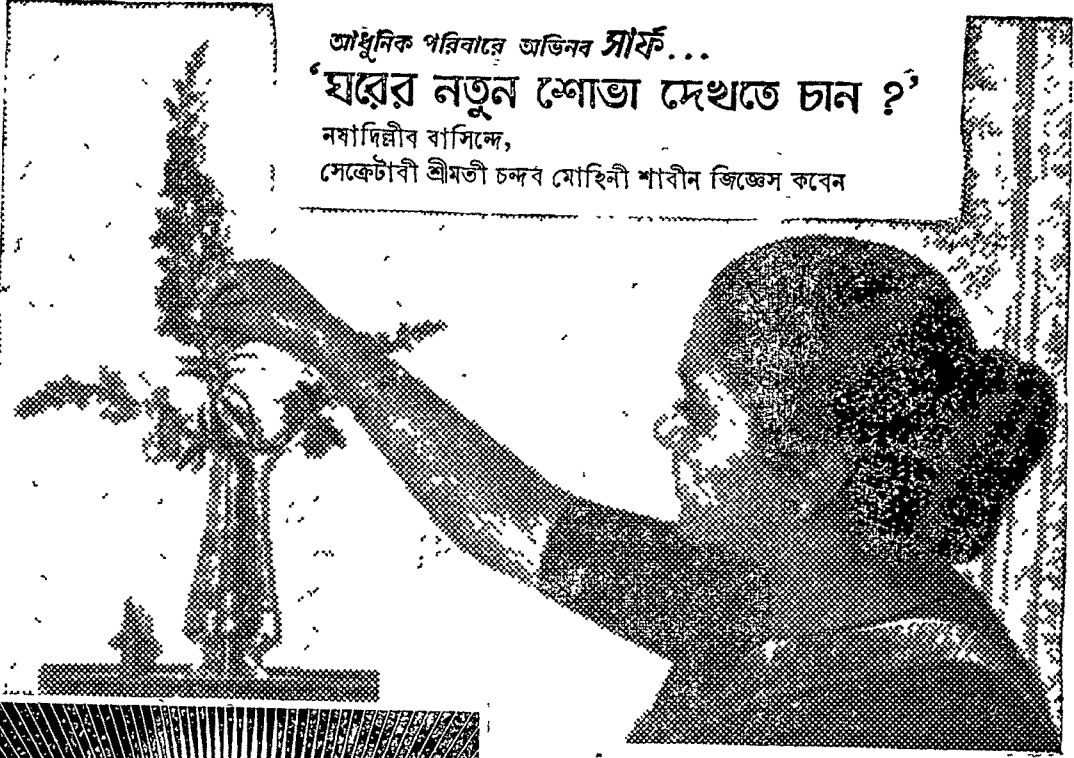
যাবে। তোমার জ্বরী স্বখন বুঝবে তুমি পুরুষমানুষ, তখন তাবও মনে পড়বে যে সে মেয়েমানুষ।

অমলিন হাসল: আমার ব্যাপারটা তুমি একটুও বুঝতে পার নি মণীশ।

খানিক পরে মণীশদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিবতে ফিবতে অমলিন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। মণীশটা একগুঁয়ের মত খালি বকর বকর করে। আসল ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কবে না। সে বোবো না যে অমলিনের সমস্যার কোন সমাধান নেই। এটা অমলিনের নিষিতি।

আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ...
‘ঘরের নতুন শোভা দেখতে চান ?’

নমাদিল্লীর বাসিন্দে,
 সেক্রেটারী শ্রীমতী চন্দ্র মোহিনী শারী জিজ্ঞেস করেন



‘তাহলে বোঝাই নতুন জিনিষ খুঁজে বেড়াতে হবে।
 আমাবতো তাই অভোস’—শ্রীমতী শারী বলেন, ‘খুব
 ভাল ভাবেই সার্ফের পবথ নিয়েছি। কাপড় এতে
 ধবধবে ঝলমলে ফবসা হয়...।’ ‘সার্ফে’ দেদার শক্তি-
 শালী ফেনা। আমি আমাব বাড়ীত্ব স্বব কাপড়জামা,
 সার্ট, প্যান্ট, ব্লাউজ, শাড়ী, ফ্রক, জামা সবই সার্ফে
 কাচি।’ নিজেই একবারটি সার্ফে কেচে দেখুন না !

সার্ফে কাপড়জামা

সবচেয়ে

ফবসা

করে কাচে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

ট্রেড সিক্রেট

বাণু ভৌমিক

এ কাশক বন্ধু চিন্ময় সেনকে বললেন, তুমি ভাল লেখ
এ কথা স্বীকার করি কিন্তু তোমার বই ছাপতে
পারব না। একটা বই ছেপছিলাম, সমস্ত টাকাই
লোকসান হয়ে গেছে। আমি ব্যবসা করি ভাই, তুমি
অল্পত্ব চেষ্টা কর।

অল্পত্ব সব জায়গায় চেষ্টা করেই তবে চিন্ময় সেন
এখানে এসেছিলেন। ব্যর্থমনোরথ হয়ে ভাবেন, তাঁর লেখা
সকলেই ভাল বলেন অথচ কেন তাঁর বই চলে না।

কেন জানেন?—পাশ থেকে কে বলে ওঠে, আপনি
লেখার ট্রেড-সিক্রেট জানেন না।

চমকে তাকান চিন্ময়, সাধারণ চেহাবার আর অদ্ভুত
চোখের একটি ভদ্রলোক। সেই ভদ্রলোকটি হাতছানি
দিয়ে চিন্ময়কে ডাকেন। আব চিন্ময়ও যেন কিছু না
ভেবে না বুঝে ওঁর সঙ্গে চলতে থাকেন।

একটুখানি এগিয়ে গিয়েই একটা নতুন জায়গা। চেনা
অথচ অচেনা। ভদ্রলোক একটু হেসে বলেন, আমাদের এই
জায়গাটার নাম তাজ্জব শহর। আব যে রাস্তাটায় আমরা
দাঁড়িয়ে আছি এর নাম উপগ্রাস-সরণি। দু পাশের বাড়ি-
গুলিতে প্রসিদ্ধ এবং লক্ষপ্রতিষ্ঠ উপগ্রাসিকেরা থাকেন।
আচ্ছা, বলুন তো, এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কে?

কি করে বলব?—অবাক হয়ে চিন্ময় বলেন।

কি আশ্চর্য? বাড়িগুলোর চেহারা দেখেও বুঝতে
পারছেন না?

বাড়ি দূরে থাক বাড়িওয়ালার চেহারা দেখেও তাব
লেখা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে পারি না, লেখা পড়ে তবে
আমরা বলতে পাবি কে কেমন লেখক।

ভদ্রলোকের প্রচুর হাসি চিন্ময়কে অপ্রতিভ করে।

এঁদের বই বিক্রীর টাকা থেকেই এঁরা এই সমস্ত
বাড়ি কবেছেন। কাজেই—

ওঃ, এতক্ষণে বোঝা গেল। পুস্তক-বিক্রীত মূল্য
থেকেই নির্ণীত হয় সাহিত্যিক মূল্য।

কিন্তু চিন্ময় না বলে পারেন না, বই বিক্রির
পরিমাণ দিয়ে কি আর সাহিত্যিক-মান নির্ণয় সম্ভব?
অনেক সময় প্রকৃত সাহিত্য-বসিক অর্থাভাবে বই কিনতে
পারেন না, আবার অর্থবান স্টাইলের খাতিবে বই কেনেন,
আমাদের দেশে অন্ততঃ তাই। আপনাদের এখানে কি
ব্যাপার জানি না।

সর্বদেশে, সর্বকালেই এই ব্যাপার।—ভদ্রলোক বাধা
দিয়ে বলেন, এখানে শত-করা দশ ভাগ লোক শিক্ষিত,
তাব মধ্যে শতকরা আটজন বই কেনেন কিন্তু পড়েন না,
অর্থাৎ তাঁরা ভদ্রতা কিংবা স্টাইলের জন্য কিনতে বাধ্য
হন, আর শতকরা এক ভাগ বই কেনেন এবং পড়েন,
বাকী এক ভাগ কেনেনও না, পড়েনও না।

এ অবস্থায় কি করে বই বিক্রীর ওপর সাহিত্যিক
মতামত স্থির হবে? দেখা যাচ্ছে, যাবা সত্যি সত্যিই বই
পড়ে তারা মুষ্টিমেয়, শতকরা মাত্র এক ভাগ। বাকী যারা
শুধু শুধু বই কেনে তাদের কোন মত নেই এবং মতামতের
মূল্যও নেই। তবু আমরা এই ভাবেই সাহিত্যের মান
স্থির করে থাকি।

এ খুব অস্বাভাবিক।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন চিন্ময়ের দিকে।
তারপরে একটু হাসেন।

সেই হাসি দেখে চমকে ওঠেন চিন্ময়। এ হাসিটা
যেন খুবই পরিচিত। এ যেন তাঁরই হাসি প্রতিফলিত
হয়ে ভাসছে। আত্মার মুখোশ খুলে গেল এতক্ষণে।

চলুন, ওধারে বসি।

দুজনে পত্রবহল একটা গাছের নীচে বসে পড়েন।

এই হচ্ছে সীমাবেধা।—ভদ্রলোক বলেন।

কিসের?

কবিকুঞ্জ ও উপগ্রাস-সরণির। এই গাছটা যদি ভেঙে
যায় তবে মাঝামাঝি হয়ে যাবে, একবার হয়েছিল কিনা।
যাক, যা বলছিলাম—

কি ?

আপনি এ'ব কোন বই পড়েছেন ?

কায় ?

ও-১-এর ।

সে আবার কি ?

ওঃ, আমি ভুলেই যাই যে আপনি নতুন এসেছেন ।

আমরা স্তুবিধের জন্তে উপস্থাসিকদের নাম না বলে ও-১,

ও-২, এরকম বলি ।

প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি কি করে ঠিক করেন ?

বাড়ি মেপে ।

কি ? কি বললেন ?

ই্যা, বাড়ি মেপে মেপে । প্রত্যেক বছর নাগবিকসভা বৎসরের প্রথমে এই ক্রম ঠিক কবে দেন । যাক, ওসব কথা । আপনি ও-১-এব কোন বই পড়েছেন ?

না ।

আপনি গুর প্রসিদ্ধ উপস্থাস 'দিদি-বউদি-মা' পড়েন নি ?

না ।

এক মিনিট অপেক্ষা করুন । ভদ্রলোক দ্রুতপদে কোথায় চলে গেলেন এবং প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে একখানা বই এনে চিন্ময়ের হাতে দিলেন ।

চমৎকার প্রচ্ছদপট । ভাল বাঁধাই । মোটা বই । দামও যথেষ্ট—বার্ধো টাকা ।

দু পাতা পড়েই চমকে ওঠেন চিন্ময় । তির্যক দৃষ্টিতে তাকান ভদ্রলোকের দিকে । তিনি ও'ব দিকেই তাকিয়ে ছিলেন । তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে যায় ।

টোক গিলে আবার পড়তে শুরু করেন চিন্ময় ।

এ কি কাণ্ড ?

কি ?

এ যে—এ যে একদম নকল ।

ভদ্রলোক নিরন্তর শাস্ত গাঙ্গীর্থে তাকিয়ে আছেন ।

আমি জোর দিয়ে বলতে পাবি এটা নকল । আমি এই গল্পটা আগেই পড়েছি । বিদেশী বই । চমৎকার গল্প ।

আপনি কি আশা করেন যে'লোকে চমৎকার গল্প ফেলে খাবাপ জিনিস নকল করবে । গুণগ্রাহী লোক ভালটাই গ্রহণ করেন । এ'রা সবাই গুণগ্রাহী ।

কিন্তু অহুর্বাদের স্বীকৃতি কোথায় ?

স্বীকৃতি ?—ভদ্রলোক হাসেন : অহুর্বাদ কোথায়, এ' তো মৌলিক বচন । পেছনের পাতা উলটে দেখুন ।

শেষের পাতায় খানিকটা সমালোচনাব উদ্ধৃতি । সমালোচক এই উপস্থাসিকেব বহুল প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে এই বইটির । তিনি লিখেছেন, এই বইটির মত একখানি বই শুধু এখানে কেন, কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না । এই বই শুধু তাজ্জব নগরের নয় তামাম বিশ্বের বিশ্বয় ও গৌবব । কি ভাষাব লালিত্যে, কি প্লটের অচিন্তনীয় পরিকল্পনায়, কি চবিত্তসৃষ্টির মাধুর্যে, এই বইখানি বিশ্বসাহিত্যে সর্বোচ্চ আসন অলঙ্কৃত করে থাকবে ।

রাবিশ !—চেষ্টা নিয়ে ওঠেন চিন্ময়, বিশ্ব-সাহিত্যসভা অলঙ্কৃত করবে না, তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে, আর লেখককে পাঠাবে শ্রীষরে ।

আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ?—ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বলেন, এই বইযেব লেখক এবং সমালোচক দুজনেই জানেন যে, এ বই বিশ্বসাহিত্য-দরবাবে কোনদিন যাবে না । কাজেই, পাঞ্জা যখন লড়তে হবে না তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু হাতের আশ্ফালন এবং মুখের ব্যায়াম করলে কি ক্ষতি !

তাই বলে মিছে কথা লিখবে ?

মিছে কথা ? ভদ্রলোক জুঁকুচকে চিন্ময়কেই ধমকে ওঠেন, কে সত্যি কথা লেখে ? কে সত্যি বলে ? জগৎটা মায়া নয়, মিথ্যে দিয়ে তৈরি । আমাদের কথা মিথ্যা, কাজ মিথ্যা, চিন্তা মিথ্যা, চলা মিথ্যা ।

বাঃ বাঃ, কি চমৎকাব ।—ভদ্রলোককে অপমানিত করবার উদ্দেশ্যেই চিন্ময় বিস্মীভাবে কথাটা বলেন ।

ভদ্রলোক কিন্তু অপমানিত হন না । চোখ বুজে বলেন, আপনাব সঙ্গে কথা বলে স্তব পাচ্ছি ।

সে কি !—অপমানিত উক্তির উত্তরে এ'হেন উত্তর শুনে না চমকে উপায় নেই ।

ভদ্রলোক চিন্ময়ের চমক লক্ষ্য করেন না, নিজের মনেই বইটা হাতে নিয়ে বলতে থাকেন, এই বইটা যখন বেরিয়েছিল তখন আমি প্রতিবাদ করেছিলাম । প্রথমে লেখককে বললাম, তিনি কোন কথাই কানে নিলেন না । তাবপরে, একদিন বিদেশী বইখানা এবং তাঁর বই একসঙ্গে নিয়ে জোর কবে তাঁকে পড়ে শোনাতে লাগলাম ।

ভঙ্গলোক চূপ করেন। চিন্ময় অতিষ্ঠ হয়ে বলেন,
তাবপব?

তাব পর? লেখক আমার কথা শুনে পাঁচ মিনিট
উচ্চাঙ্গ হাসি হাসলেন। আমি ঘড়ি ধরে টাইম
দেখলাম পুরো পাঁচ মিনিট। হেসে চায়ের কাপে চুমুক
দিয়ে তিনি কি বললেন, জানেন।

কি?

পাগল।

পাগল?

হ্যাঁ। অবশ্য আমাকে পাগলা গাঁবদে পাঠাবাব মত
ডাক্তারী মনোভাব নিয়ে নয়, আদর করেই বললেন।
আমি তাড়াতাড়ি সরে বসলাম, ভয় হচ্ছিল, যদি পিঠ
চাপড়ে দেন। তাহলে হয়তো ওঁকে মেবেই বসতাম।

পিঠ চাপডাতে না পেরে তিনি কয়েকবার রুমাল
চাপড়ে মুখ মুছলেন। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, শোন।

পূর্বো সিগারেটটা শেষ হল। আমি অ্যাটেনশনের
ভঙ্গিতে বসে রইলাম। তখন তিনি বললেন, শোন,
পৃথিবীর সমগ্র চিন্তাধারায় এক আশ্চর্য মিল আছে।
প্রকৃতপক্ষে চিন্তা এক এবং অদ্বিতীয়।

ব্রহ্মের মত?

লেখক চকিতে একবার আমার দিকে তাকালেন,
বললেন, হ্যাঁ, ব্রহ্মের মত। এই জগতই ব্রহ্মের অপব নাম
বাক্। যাক, যা বলছিলাম, সমগ্র দুনিয়ায় একই ভাবের
লীলা। আব, সূর্যের আলো, চাঁদের হাসি, ফুলের গন্ধ
ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক এক এবং অক্ষয়। লিখতে বসে সব
লেখককে এই একই জিনিস নিয়ে কারবার করতে হয়।

কিন্তু—

কিন্তু, সব লেখক একভাবে লেখে না। তা নইলে
জগতে শুধু একটি মাত্র কবিতা, একটি গল্প এবং একটি
উপন্যাস লেখা হত। প্রকাশভঙ্গীর জগতই দুনিয়ায় এত
বিচিত্র বহু রূপ। ভাব নয়, ভাষাতেই লেখকের শক্তির
প্রকাশ।

একটু থেমে লেখক আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে
বলেন, স্মরণে আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তু অপরেব সঙ্গে
মিলে যাচ্ছে কি না সে প্রশ্ন অবাস্তব। কিন্তু ভাষা?
ভাষা ও স্টাইল তো আমার একান্তই নিজস্ব।

অল্পবাদেব ভাষা নিজস্বই তো হবে। কিন্তু, আপনি
কেন স্বীকার করেন নি যে এটা অল্পবাদ।

কেন কবব?—লেখক এবারে সত্যই রাগ করেন।
এক মিনিট চূপ কবে থেকে ঠকাস করে নামিয়ে দেন
কাপটা। বলেন, আমার লেখা মোটেই অল্পবাদ নয়
সম্পূর্ণ মৌলিক। অল্পবাদ স্বীকার করবে তারা যারা
ভাষা স্থললিত ভাবে লিখতে পারে না, যারা মেবীকে কবতে
পারে না মীবা, ক্লাব-হাউসকে রূপান্তরিত করতে পারে না
কফি-হাউসে। আমাদের লেখা একান্তভাবে নিজস্ব।
আমাদের ভাব আছে, ভাষা আছে, লিপিচাতুর্য আছে,
আমরা জানি কোথায় শুরু করতে হয়, কোথায় থামতে
হয়। আমরা জানি আমাদের দেশ কতটুকু চায়।
আমরা জানি কোথায় মাতালকে দিয়ে চট কবে দেবীবা
পাদমূলে একটি প্রণাম কবিয়ে নিতে হয়। বিদেশী মাল
কতটুকু এদেশ হজম কবতে পারবে তাও জানি আমরা,
ডোজ ঠিক ততটুকুই দিই।

একটু থেমে চোঁচিয়ে বলেন, সাধারণেব জ্ঞান আমাদের
এই যে পবিশ্রম একে ভূমি বলবে বিদেশী। দেশের
জনসাধারণের ক্ষুধার খোরাক দিচ্ছি আমরা আব ভূমি
নাক টেনে এতে বিদেশী ছাপ খুঁজতে এসেছ? প্লট
অপরেব সঙ্গে মিলে যেতে পারে কিন্তু প্লটই তো সব নয়।
আমাব ভাষা, আমাব স্টাইল, তবুও আমি স্বীকার করব
আমাব লেখা অপরেব অল্পকরণ! ছি, ছি!

ধিকারভরা চোখে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকেন লেখক।
তার পরে ছুটে বেরিয়ে যান এবং চায়ের দাম না মিটিয়েই।

ভঙ্গলোকের এই বিবরণেব পব অনেকক্ষণ চিন্ময় চূপ
করে বসে থাকেন, তারপরে উনি নিজেই আবার শুরু
করেন, এই যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা
তাজমহলের নমুনায় তৈরি..

এই বাড়িটা! মসজিদ নাকি?

না। মসজিদের মতও নয় তবে মোগল স্থাপত্যের
অল্পকরণ আছে। যাক, এই বাড়িটা হল প্রসিদ্ধ
ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ও-২-এর। অবশ্য এর
ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়লে আপনাকে ইতিহাস ভুলে
যেতে হবে।

কিছুই মেনে না বুঝি?

‘যদি ভাবেন ঠুকে খুশি করা সহজ...’



‘...তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল কববেন’—বোম্বেব প্রিয়তা আর. আর প্রভু বলেন। ‘কাপড় জামাব বেলাতেও কি উনি কম খুঁতখুঁতে ...!’
‘এখন অবশ্য আমি ওঁর জামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—
প্রচুব ফেনা হুম বলে এতে কাচাও সহজ আর কাপড়ও ধবধবে
ফবসা হুম। ...উনিও খুশী!’
‘কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধবধবে আব ঝালঝলে ফবসা—
সানলাইট ছাড়া অন্য কোন সাবানই আমার চাই না’

গৃহিণীদের অভিজ্ঞতায় খাঁটি, কোমল
সানলাইটের মতো কাপড়ের এত
ভাল যত আর কোন সাবানেই নিতে
পারে না। আপনিও তা-ই বলবেন।

সানলাইট

কাপড় জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী



শুধু অমিল নয়, গরমিলও যথেষ্ট, ইনি খুশিমত সৃষ্টি করেন ঐতিহাসিক চরিত্র, এবং এঁর খেয়াল-খুশিমতই আবির্ভূত হয় তাবা। সন তাবিখেব ধার ধারে না।

আরও মজার ব্যাপার এই যে, ছেলেমেয়েবা সেই ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়েই ইতিহাসেব জ্ঞান অর্জন করে। একদিন বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। বন্ধুটি আমাকে দেখতে পেয়ে বলে, দেখ তো, এটা কি রকম বই। ভাই বলছে এইটে পড়লেই ইতিহাস পড়াব কাজ হয়ে যাবে। ভূমিকায় দেখছি অনেকটা সেই রকম কথা লেখা আছে। তুমি তো ইতিহাস নিয়ে অনেক গবেষণা করেছ।

বইটা হাতে নিয়ে দেখলাম, একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেব সমালোচনার কিছুটা অংশ ভূমিকায় তুলে দেওয়া হয়েছে। এই উপন্যাসেব সঙ্গে ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক নিয়ে তিনি দীর্ঘ প্রশংসালিপি দিয়েছেন। শেষে বলেছেন, আমাদের দেশে প্রামাণ্য ইতিহাস নেই, কাজেই স্থানে স্থানে অসঙ্গতি দৃষ্ট হতে পারে—অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে যদি নাও মেলে তবেও প্রমাণ হবে যে ইতিহাস ভুল, এই ঔপন্যাসিক ইতিহাসই ঠিক।

এ কি কবে হল?—চিন্ময় ভদ্রলোকের ভাষণে বাধা না দিয়ে পারেন না, একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গবেষক কি করে এমন সমালোচনা করলেন।

বলব, সবই বলব।—ভদ্রলোক উত্তর দেন, একজন শ্রোতা যখন পেয়েছি তখন সব কথা বলে বুক হালকা করব। তবে এখন নয়। এখন যা বলাছলাম—

আমার কৌতূহল হল, আমি বইটা নিয়ে গেলাম বাড়িতে। পড়ে দেখি, সে এক আজব কাণ্ডকারখানা। সেই বচনায় ইতিহাস নেই, গল্পও নেই, আছে শুধু গাঁজাব ধোঁয়া। ইতিহাসকে শিখণ্ডী রেখেছে যা-খুশি তাই লেখবার জন্তে। কারণ, আধুনিক যুগ নিয়ে অমন যা-তা লেখা চলে না। তখন ওই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের আবণ্ড কয়েকখানি বচনা পড়লাম, এবং—

এবং কি?—তাগাদা দেন চিন্ময়।

এবং এই সিদ্ধান্তে এলাম যে ঐতিহাসিক উপন্যাস মানেই অসঙ্গতি—ঘটনার অসঙ্গতি, চরিত্রের অসঙ্গতি। আরও দেখলাম যে, এই রকম উপন্যাস লিখে নাম কবতে

হলে কতকগুলি ব্যাপার আঁমদানি করতেই হবে—বইতে আঁমতে হবে কোন তুর্কিনী রূপসী, প্রেমিক বিবহী, সাধক কণ্ঠসঙ্গীতকাব, মাটির তলায় তলিয়ে যাওয়া অপরাধীবা মর্মান্তিক চাঁৎকার।

থামুন থামুন।—পাগলেব মত বকবেন না।

পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম।—ভদ্রলোক বলেন, তারপরেই তো মনটা ঘুরে গেল, শাস্তি পেলাম।

এখানে কি কেউ ভাল লেখে না।

নিশ্চয়ই লেখে, কিন্তু তাবা এ বাস্তব থাকে না। তারা থাকে...থাক, তাদের কথা পবে বলব। এই এঁবাই ভাল লিখতে পারতেন—যদি এঁবা হুংথ পেতেন, হুংথ দিতেন। আঘাত ছাড়া যেমন বাত বাজে না তেমনি বেদনা ছাড়া সাহিত্য বচনা হয় না। এঁদের সাহিত্যে জীবন-স্পন্দন নেই। সাহিত্যের ট্রেড সিক্রেট জেনে নিয়ে কতকগুলি বাঁধা ফবমুলার সাহায্যে এঁরা কাজ চালাচ্ছেন।

ট্রেড সিক্রেট? সাহিত্যে? সে কি?

সব ব্যবসায়েরই সিক্রেট আছে। লেখনীকে যদি ব্যবসায় হিসেবে ব্যবহার করা যায় তবে সাহিত্য নিশ্চয়ই ব্যবসায় এবং তার ট্রেড সিক্রেট থাকা খুবই স্বাভাবিক।

তা লেখার ট্রেড সিক্রেটটা কি?

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে দেশগুত এবং কালগতভাবে কতকগুলি বিষয়বস্তু জনপ্রিয়তা অর্জন কবে। যেমন, আধুনিক উপন্যাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়বস্তু কি?

জানি না।

একটি জনপ্রিয় বিষয় যা নিয়ে আজকাল সবাই প্রায় লিখছেন তা হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের কাহিনী।

খুবই ভাল বিষয়।

চিন্ময়ের কথায় বাধা দিয তিনি নিজের মনেই বলেন, এই কাহিনীর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় জমিদার এবং চাষীর সংগ্রাম। ধরুন, একজন জমিদার—তাকে আপনি পূর্ণ শয়তান এবং ভোগীর প্রতীক করতে পারেন, কিংবা তাঁর মধ্যে কয়েকটি সদগুণেব সমাবেশও কবতে পারেন। তারপরে জমিদারের সঙ্গে চাষীর কলহ হবে, জমিদার চাষীর মেয়ে বা বউকে জোর কবে টেনে নিতে চাইবে, চাষীর বাধা দেবে, চাষীদেব মধ্যে একটি ছেলে থাকবে যে কবি, বংশীবাদক কিংবা পটুয়া—শেষটা সে মরবে।—

এ তো ভাল প্লট। আপনি বিজ্ঞপ করছেন কেন?
না, আমি বিজ্ঞপ কবছি না। কিন্তু কি জানেন,
যারা পাকা ধান কেটে নেবার দুঃখে পাতার পর পাতা
চোখের জল ফেলেন তাঁরা ধানগাছ চোখে দেখেন নি।

সে কি।

হ্যাঁ, তবে শুধুমাত্র, আমাকে একদিন একজন জিজ্ঞাসা
করছিলেন, ধানের ক্ষেত কি দিবে চাষ করে? আমি ঠাট্টা
করে উত্তর দিলাম, ধানের ক্ষেত চাষ করতে হয় কান্তে
দিয়ে। উত্তরে সেই লেখক বললেন, আমি জানতুম—
তবে একবার জিজ্ঞাসা করে নিলাম। সেই লেখক বিখ্যাত
হয়ে গেলেন চাষীদের সম্বন্ধে একটি উপন্যাস লিখে।

ভদ্রলোক আমার কথায় কান না দিবে নিজের
মনেই বলতে থাকেন, এষ আগে উপন্যাসের একটি প্রিয়
বিষয়বস্তু ছিল স্বামীকে চরিত্রহীন কিংবা খেয়ালী করে
স্ত্রীকে সহিষ্ণুতার আদর্শ এবং অল্পমম সতীত্ব ও
পাতিব্রত্যে মগ্নিত করা। কিন্তু এখন ও অচল। আজকাল
কলম ধরে প্রথমেই লিখতে হয় পরকীয়া প্রেম। নায়িকা
বয়সে নায়কের চেয়ে বড় হবে, প্রেমে পড়ে ঘর ছেড়ে
বেরিয়ে যাবে, আবার অনেকদিন পরে কালো কাপড়
পরে রাজির স্বাক্ষরকে সন্তানকে দেখতে ফিরে আসবে.....

বড় বাজে বকেন আপনি।

বাজে বকি। আমাদের দেশের জনপ্রিয় কয়েকটি
উপন্যাস পড়ুন। তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই
প্রমাণিত কবতে হবে যে, যাদের আমরা অসৎ বলে জানি—
যেমন চোর, পকেটমার—এরাই সবচেয়ে সৎ এবং সৎ
লোকেরাই অসৎ। বারবধুরা সতী, গৃহবধুরা অসতী।

কিন্তু, এরকম লেখবার কারণ?

প্রথম যিনি লিখেছিলেন তিনি নিজস্ব নতুন ধরনের
অভিজ্ঞতায় লিখেছিলেন। হয়তো তিনি ভয়ে ভয়ে
লিখেছিলেন, লিখতে সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু না লিখে
উপায় ছিল না। প্রকাশের যত্নটা পাগল করে দিয়েছিল
তাকে। তাই তিনি লিখেছিলেন—আর সেই অদ্ভুত
অভিজ্ঞতা চমকের ডেউ তুলল চারিদিকে। মুখে মুখে ছড়িয়ে
পড়ল সেই কাহিনী, লোকে লাইন দিয়ে কিনল সেই বই।
একদিনে শুধু বিখ্যাত নয়, ধনীও হয়ে উঠলেন তিনি।
তারপরে চলল সেই বাঁধাপথে গড়গড়িয়ে চলা।

কথা বলতে বলতে একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা।
চমৎকাব গডনেব একটি বাড়ি—

এ বাড়িটা কার? প্রশ্ন করি আমি, খুব সুন্দর তো।

নামটিও খুব সুন্দর। প্রেম-শতদল।

অদ্ভুত নাম তো।

হ্যাঁ, বাড়ির মালিক প্রেমের উপন্যাস লিখে বিখ্যাত
হয়েছেন। ওঁর একটা উপন্যাস—

ভদ্রলোক কথা শেষ না করেই একটুখানি হাসেন।

কি? হাসছেন যে!

এককালে এই লেখক ভাল লিখতেন। সত্যিকারের
সাহিত্যিক ছিলেন তিনি। কিন্তু বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে
লেখার স্বজনীক্ষমতা কমে গেল অথচ অর্থের প্রয়োজন
দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। সংসার বড় হয়েছে তো।
ছেলেমেয়ে, নাতি, নাতনী, নাতবউ, নিজের হাজার রকম
ব্যারাম, স্টাইলের খরচ, আরও আত্মমজিক কত কিছু।

প্রকাশককে বই দেবার নাম করে তিনি টাকা আগেই
নিয়ে নিয়েছিলেন, বই দিলেন অত্যন্ত ছোট। ফর্মা পিছু
ওঁদের টাকা। প্রকাশক বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি
যা টাকা নিয়েছেন তার তিন ভাগের এক ভাগও উঠবে
না এই বইতে। কাজেই হয় টাকা ফেরত দিতে হয়
নয় তো আর একখানা বই লিখতে হয়। দুই-ই লেখকের
পক্ষে সমান অসম্ভব। টাকা তিনি খরচ করে ফেলেছেন
আব একাধিক প্রকাশককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নতুন
বইয়েব। কি কবায় যায়? একটু ভেবে ঐ বইটাই
খানিকটা বাড়াবেন স্থির করলেন, কিন্তু বইটাতে প্রেম,
পরিণয় এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে গেছে। কাজেই, লেখক
নায়ক নায়িকাকে পরলোকে পাঠিয়ে সেখানে পুনরায়
প্রেম, ঈর্ষা এবং বিরহানলে ভোগালেন। ..লেখককে টাকা
ফেরত তো দিতেই হল না বরং আবও কিছু প্রাপ্য
হল তাঁর।

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে শাস্ত স্থির এবং সেই অদ্ভুত
দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, এর পরও যদি আপনি লেখার
দ্রোহ সিক্রেট না বুঝে থাকেন তবে আপনার লেখাই বৃথা।

চিন্ময় চমকে কি বলতে যান, কিন্তু তাকিয়েই দেখেন
কেউ নেই। তিনি সেই প্রকাশকের দোকানেই বসে
আছেন।

কি ভাবছেন? গল্পের প্লট?

না। গল্পের প্লট আর ভাবব না—এখন থেকে শুধু
গল্প লিখব।—উত্তর দেন চিন্ময়।

এক বাক্স সন্দেশ

কুমাবেশ ঘোষ

সেদিন আড্ডায় তর্ক বীতিমত ঘোষালো হয়ে দাঁড়াল।
তিল্প বায় বলল, কী কুক্ষণেই কবি লিখেছিলেন,
না জাগিলে সব ভাবত ললনা এ ভারত বুঝি জাগে না,
জাগে না। আজকাল মেয়েগুলো জেগে উঠে এমন
বহিমুখীন হয়েছে যে আব লাগাম টেনে বাখা দায়।

আমি বললাম, তাতে হয়েছেটা কি?

তিল্প রায় শুনে রেগে কাঁই : হয়েছেটা কি? সর্বনাশ
হচ্ছে, দেশটা উচ্ছন্ন গেল যে।

প্রভাত বিশ্বাস বলল, সত্যিই।

তিল্প বায় পেয়ে বসল। বলল, এই নারী প্রগতির
অবশ্যস্বার্থী ফলই তো ফ্যামিলি-প্ল্যানিং। আরে বাবা,
ফ্যামিলিই যেখানে লোপ পেয়েছে সেখানে আবার
ফ্যামিলি-প্ল্যানিং কিসের?

এমন সময় ডাক্তার বীরেন মিত্তির দড়ি-বাঁধা একটি
বড় সন্দেশের বাক্স হাতে ঝুলিয়ে আড্ডায় ঢুকল। সবাই
হেঁচকবে উঠল : কী ব্যাপার? সন্দেশ।

বীরেন মিত্তির হেসে জিজ্ঞেস করল, তার আগে বল
তোমাদের সন্দেশ। কী নিয়ে এত তর্ক?

আমি বললাম তর্কের বিষয়টা।

শুনে মিত্তির হেসে বলল, আশ্চর্য তো। আমাব
দেখছি তা হলে এই সন্দেশ-হাতে নাটকীয় প্রবেশ হয়েছে।

প্রভাত বিশ্বাস বলল, কেন, কেন?

মানে, ডাক্তার বলল : বাইরে না বেরিয়েও যে মেয়েরা
ফ্যামিলি-প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে ঝাড়ু মারতে পাবে, এই
সন্দেশের বাক্সই তার প্রমাণ।

শুনে তিল্প বায়ের মুখ শুকিয়ে গেল : তাব মানে?

শুনে আমিও কৌতূহলী হলাম। বললাম, বস ব্রাদার,
বল শুনি।—টেবিলের একটি খালি কোণ দেখিয়ে দিলাম।

ডাক্তার সেই কোণটায় বসে ক্রোলের উপর বাক্সটি
রেখে বলল, শোনো বলি তবে ব্যাপারটা। এমন ফ্যান্সাদেও
মাছুষ পড়ে। এখন ভাবছি, এ সন্দেশ নিয়ে কবি কী?
তাই তো এখানে—

প্রভাত বিশ্বাস ডায়বিটিস রোগী। গিন্নীর ভয়ে
বাড়িতে মিষ্টি খায় না। তাই সোৎসাহে বলল, এতে আর
ভাববার কি আছে? ও বাক্স সাবড়ে দিতে কতক্ষণ।

ডাক্তার মিত্তির হেসে বলল, বটে!

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আবে বাপু, এখন বাজে
কথা ছাড়ো, আসল কথা পাডো।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ডাক্তার বলল, বছর দেড়েক আগে
আমাব এক ডাক্তার বন্ধুব বেকমেনডেশনে এক ভদ্রলোক
এলেন আমার কাছে। চেহারা দেখে মনে হল, বেশ
পয়সাওয়ালা লোক। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। একগলা ঘোমটা।
তার ওপব গায়ে ওড়না।

আমাব নির্জন চেম্বারে বসে ভদ্রলোক বললেন,
ডাংদাবাবু, ইনি আমাব ইঁজ্রি আছেন। আমার দ্বিতীয়-
বারেব বছ। পেরখমেব বছ তো মবে গেল, কিন্তু
ছেলেমেয়েটুকু হল না। এ বছর ভি কিছু হল না। তাই
জানতে এলাম, কুছ দাওয়াই বা ইনজেকসন। ডাংদাব
কে সি ব্যানাজি পেঠিয়ে দিলেন—আপনি স্পেসালিস্ট
আছেন—

জিজ্ঞেস করলাম, আপনাব বয়স কত?

বললেন, কোতো আব হোবু? পঁচাশ—

আপনাব স্ত্রী?

তিণ।—বলেই বললেন ভদ্রলোক, আমার বাড়িঘর
টাকা পোয়সা কোনও কাজেই লাগবে না, তাই এতো
এতো ভাবনা—

আমি বউটির দিকে একবার তাকাতাই ঘোমটার
ফাঁক দিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল। চোখ নামিয়ে নিলেন
ভদ্রমহিলা।

বললাম, আপনাব ও আপনাব স্ত্রী অনেক কিছুই
পরীক্ষা করতে হবে। বাজি আছেন?

নিশ্চয়ই।

এই পর্যন্ত বলেই বীরেন মিত্তি বামল।

তিতু রায় তাড়া দিলেন, আহা-হা, থামলে কেন ?

আমি বললাম, গো অন—

প্রভাত বিশ্বাস বলল, ডাক্তারদের ওই এক রোগ, সব কিছুই বেকায়দা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা।

বীরেন মিত্তির বলল, আমি কি টকী মেনিন যে একটানা বলে যাব। একটু দম ফেলতে হবে তো।

এদিকে যে আমাদের দম ফেটে গেল।

ডাক্তার বলল, ভদ্রলোক আব তাঁব স্ত্রীকে পরীক্ষা করে দেখলাম, ছেলেপুলে না হওয়াব জন্তে ভদ্রমহিলা দায়ী নন, ভদ্রলোকেই শরীরে সম্ভান জন্ম দেবার ক্ষমতা নেই।

তিতু রায় বলল, এমনও হয় নাকি ?

ডাক্তার বলল, অনেক হয়। এবং আগেকার দিনে এজন্ত বহু স্ত্রীকে বিনা দোষেই কত না গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে, সতীনের সঙ্গেও ঘর করতে হয়েছে কত। যাই হোক ব্যাপারটা দুঃখের হলেও ডাক্তার হিসাবেই সত্যি কথাটা বলতে হল। শুনে ভদ্রলোকের মুখখানা যেন কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। তবে ভদ্রলোক আমাদের মিটিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়েই চলে গেলেন।

বীরেন মিত্তির আবার থামল। বুঝি দম নিল। আমরা চুপ করে বইলাম। জানি, কথা বললেই কথা বাড়বে।

বুঝলে, তারপর আজ এই সন্দেশেব বাক্স। ভদ্রলোক সঙ্গীক সন্দেশের বাক্স হাতে চুকলেন আমার ঘরে। একগাল হাসি। ভদ্রলোক বললেন, ডাংদারবাবু, শেষ পর্যন্ত ছেলে একটা হল। আপুনাকে দেখাবাব পব শেষে মাদুলী কোবচ, পূজো বহুৎ কুছু করে করে শেষে কিলে যে হয়ে গেল ছেলে বোকা গেল না বটে, তবে হয়ে তো গেল।

শুনে আশ্চর্য হলাম। হঠাৎ কেন যেন চাইলাম তাঁর স্ত্রীর দিকে। তিনি ঘোমটার ফাঁকে এতক্ষণ আমাদের নিবীক্ষণ কবছিলেন বোধ হয়, চোখ পড়তেই মনে হল, তাঁর করুণ চোখটিতে মিনতি মাখানো।

তাই ডাংদারবাবু, একটু সোন্দেশ...আপুনার জন্তে...

ভদ্রলোক বললেন এবং বাক্সটা টেবিলেব ওপর রাখলেন। মনে হল, সন্দেশের বাক্সটা যেন টেবিলে বসে

আমার দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ করছে। আমার ডায়গনিসিস ঠিক হয় নি, এইটাই জানাবার জন্তে কি আজ এই সন্দেশবহ ভদ্রলোকের প্রবেশ—এ কথাটাও মনে যে উকি মারল না, তা নয়। তবে ওই ঘোমটার ফাঁকে একটা কালো হরিণ-চোখই আমাকে মুক করে রাখল। ঢোক গিলে বললাম, বেশ বেশ।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, বহু তো আসতেই চায় না।

হামি বোললাম, লোজ্জা কিসেব ? কী বোলেন ?

নিশ্চয়ই ! যাক, এতদিনে ঘর আলো হল আপনাদের।

ঠিক, ঠিক বলেছেন ডাংদারবাবু। বাড়িতে তো লোক আছে বহুত। সরকার, ঠাকুর, চাকর, দাবোয়ান, ড্রাইভার, কিন্তু বাড়িতে একটা-দুটো ছোটো লেড়কা না হলে কি হোয় ? আব বহুভি কি নিয়ে থাকবে ? হামি তো সবটাইম গদিতেই থাকি। বোলেন কিনা—

আমার আর কিছুই বলবার ছিল না। তবু বললাম, ঠিকই তো।

যাবার জন্ত ভদ্রলোক উঠে পেছন ফিরতেই তাঁর স্ত্রী একটু ঘোমটা সরিয়ে ডাগর চোখ দুটি মেলে আমাদের জোড় হাতে নমস্কার জানালেন নীরবে।

মনে হল যেন বললেন, ক্ষমা কর।

তাঁরা চলে গেলেন। আমি বোকার মত সন্দেশের বাক্সের দিকে চেয়ে রইলাম। এবং এই সেই বাক্স।

এতক্ষণ আমবা কেমন যেন সব ভুলে গেছলাম।

সন্দেশ-লোভী প্রভাত বিশ্বাসই চোঁচিয়ে উঠল প্রথমে : ও সন্দেশ খাওয়া মোটেই চলে না।

আমি বললাম, কেন, কেন ?

কেন আবাব ?—তিতু রায় বলল, এ তো সন্দেশ নয়, ধোঁকা। পুরুষকে বোকা বানাল বউটা। আর আমরা পুরুষরাই ওই সন্দেশ খাব গপ্গপ্ করে ! ইডিয়ট।

শুনে সত্যিই আমি বোকাব মত বসে বইলাম।

ক্লাবঘরের সামনে গলিতে এতক্ষণ একটি কুকুর বসে ছিল। বীরেন মিত্তিব বলল, তা হলে ওই কুকুবটাকে দিয়ে দিই সন্দেশগুলো, কি বল ?

হিসাব

শ্রীদেবীপ্রসাদ বায়চৌধুরী

মিতব্যয়ীর যশ অর্জন করিতে হইলে যতটা সংযম ও স্ফুটনিত হিসাবেব প্রয়োজন হয় ততটা তারাপদ-
বাবুর ছিল না। তথাপি সদৃশ আয়ত্ত করিবার জ্ঞান
তিনি প্রাপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বাস্তব ফল
পাওয়া গেল না। সব দিক বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ্যায়ীরা
পবামর্শ দিলেন, নিজেব উপর জুলুম কবিলে কোন সুবিধা
হইবে না। অতএব যাহা ধাতে সম্যক সেইটুকুই কর, খরচা
কমাইবার জ্ঞান শরীর পাত ভাল নয়। বুড়ো বয়সে সুস্থ
থাকিতে হইলে ওসব একটু-আধটু একান্ত দবকাব। যে
কোন লাভের কথাই ভাব না কেন তাহা দাম দিয়া
কিনিতে হয়। দাম কি ভাবে দাও সেটা প্রশ্ন নয়। স্বাস্থ্য
সম্বন্ধে একই যুক্তি খাটে। শরীর ঠিক রাখিতে হইলে
খরচ একটু-আধটু করিতে হইবে বইকি।

স্বস্তুর উপদেশ তারাপদবাবু প্রত্যাখ্যান করিতে
পারেন নাই। তবে স্বাস্থ্যরক্ষার রীতি মানিতে গিয়া
অন্দরমহলে স্থায়ীভাবে অশাস্তিব্যবস্থাও করিয়া
ফেলিলেন। গৃহিণী সুবিধা পাইলেই জানাইয়া দিতেন,
ছাইভস্ম গেলার জ্ঞান সবকিছুই যেতে বসেছে। ত্বাখন-
হাসির মেজ্জা জামাই তো ওই সব গেলার জ্ঞানই মরল।
একেবারে পিলে ফেটে চোচিব। তোমার কপালেও
দুর্ভোগ আছে, তার সঙ্গে আমাকেও নিঃসন্দেহ বিধবা করে
ছাড়বে। এ রকমটি ঘটাব আগে, আমাকে কোন অনাথ
আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। দুঃখ সহ করার অভ্যাসটা আগে
থেকে করে রাখা ভাল।

অনাথ আশ্রমের ব্যবস্থা ও পিলে ফাটার ভবিষ্যদ্বাণী
শুনিবাব জ্ঞান তারাপদবাবু সকাল হইতেই প্রস্তুত
থাকিতেন। কোনদিন মহৎ কর্তব্য হইতে গৃহিণী নিজেকে
বঞ্চিত কবিলে অধিকতর দুর্ঘটনাব সম্ভাবনা ঘনাইয়া
উঠিত। সেদিন এইরূপ একটি কাণ্ড ঘটয়া গেল। দিবা-
নিদ্রাব জ্ঞান গৃহিণী একটি সময় পৃথক করিয়া রাখিতেন।

সেদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটয়াছিল তারাপদবাবু
খবরটি জানিতেন না। নিশ্চিন্ত মনে টেলিফোন করিতে-
ছিলেন। প্রাণ খুলিয়া মশগুলি পানীয়ের নাম করায়
কোন বাধা ছিল না। ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, শেরী, জিন ইত্যাদির
ফরমাশ দিয়া, নতুন দাম জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার যে
মোট অঙ্কেব হিসাব দিল তাহাবই পুনরাবৃত্তি করিয়া
জানাইলেন, দামের জ্ঞান তিনি পরোয়া করেন না তবে
জিনিসগুলো যেন খাটি হয়। আজকের পার্টিতে কথেকজন
বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিতেছেন, তাহাবা যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ শেষ কবিতে পারিলেন না। ডেনজার
সিগন্যালের লাল পতাকাব মতই চোখেব সামনে দেখিলেন
শাড়ির লাল চওড়া পাড পাখার হাওয়ায় মুহূর্ত্ত ললিতেছে।
গৃহিণী যে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা তিনি
বুঝিতে পারেন নাই।

অবাঞ্ছনীয় কিছুই কবেন নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া
নির্বিকার চিত্তে স্থানটি পরিত্যাগ কবাব চেষ্টায় ছিলেন
তিনি। গৃহিণী গম্ভীর স্ববে বলিলেন, বস, কথা আছে।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা কবিলেন, আজ আবার পার্টি কেন ?
এই তো সেদিন পাডা মাতিয়ে কেলেঙ্কারি করলে। গেলার
ব্যাপার তোমার কি থামবে না ? এদিকে সংসারের খবচ
তো এক পয়সাও বাডাবার নামটি নেই, আব গেলার
বেলা কোন দামকেই পরোয়া কর না। জেনে রেখ,
অনটন ঘাড়ে নিয়ে সংসাব চালানো পুছোচ্ছে না উপবি
আয়েব কিছু ব্যবস্থা না করতে পারলে। উপব-তলাটা
ভাড়া দিয়ে দাও, বাড়তি খবচ সামলে নিতে পারি।
হিসাবেব দিকটাও তো দেখতে হয়।

আসল কথা উপব-তলাতেই পার্টির আয়োজন হইত
এবং দলে পড়িয়া তারাপদবাবু নাকি গেলার দিকটা
বাডাবাডি করিয়া ফেলিতেন। এইরূপ ধারণা গৃহিণীর
বন্ধমূল হইয়া গিয়াছিল স্বতরাং তারাপদবাবু নিট জনপান

করিলেও তাঁহাকে মাতাল সাব্যস্ত কবা নিয়ম হইয়া গিয়াছিল। দ্বিমত প্রকাশ করিবাব অধিকার কাহারও ছিল না। তাবাপদবাবু জানিতেন, গৃহিণী হিসাবে চূড়ান্ত না হইলে কোন প্রস্তাব করেন না। বর্তমান বক্তব্যেব পিছনে যাহাই থাকুক, তাহা না মানিলে অনাথ আশ্রমেব কথা উঠিয়া পড়িতে পাবে।

অকস্মাৎ উপর-তলাটা হস্তান্তরিত করিবাব প্রস্তাব সমস্তাব বিষয় হইয়া উঠিল। বাপ-ঠাকুরদাব আমলের পুরাতন আসবাবপত্র সবাইয়া বাথেন কোথায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, উপর-তলা ভাড়া দিলে, ভাড়া আদায় কবার ভার লইবে কে? কলিকাতাব মত শহরে ভাড়াটে পাওয়া খুবই সহজ। ভাড়াড়ে মড়া ফেলিলে গৃহিনীর দল যে-ভাবে মাংস ছিঁড়িয়া খায় এবং দেখিতে দেখিতে সবকিছু গিলিয়া ফেলে সেইরূপ খালি বাড়িও পড়িয়া থাকে না। কিন্তু ভাড়া আদায় কবা ভিন্ন কথা। শহরের মধ্যেই আরও দুইটি বাড়িব মালিকানা-স্বত্ব লইয়া তাবাপদবাবু জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন, গ্রহেব ফেরে বাড়িগুলিকে যেন ভাড়াটিয়ারা গিলিয়া ফেলিল। পুরুষাশ্রুক্রমে ভোগদখলেব দাবিব পবিবর্তে ভাড়াটে উচ্ছেদের মামলায় তাঁহাব প্রাপ্তান্ত অবস্থা হইতেছে। জটিল আইনের সমর্থন থাকায় ভাড়াটিয়ারা বাড়ির মালিককে কিছু না দিয়াই ইচ্ছামত বাড়ি ভাঙিয়া গড়িয়া পরমানন্দে বসবাস করিতেছে। এই জাতীয় মানুষ অপরকে ফাঁকি দিবাব জ্ঞাত মামলায় পিতৃদত্ত নামটাও বেনামি করিয়া ফেলে। মামলাব উপদ্রবে বহুবাব তাবাপদবাবুকে আদালতে হাজিয়া দিতে হইয়াছে এবং চালাক উকিলের জেরায় বিয়াকুব বনিয়া গৃহে ফিবিয়াছেন। এই রকম কখনই ঘটিত না যদি স্বপক্ষীয় উকিলের উপদেশ না মানিতেন। শত্রুপক্ষেব মতলব খারাপ জানিয়া তিনি শিক্ষারূপে মুখ খোলেন নাই। কাবণ তাঁহাকে সাবধান কবা হইয়াছিল, বেফাঁস কিছু বলিলেই তাহা ক্ষতিকব হইতে পারে। পাকে-প্রকাবে বিপক্ষেব উকিল তাঁহাকে মর্কট সাব্যস্ত করিয়াছে, মিথ্যাবাদী বলিয়াছে তথাপি তিনি মুখ খোলেন নাই পাছে বেফাঁস কিছু বাঁহিব হইয়া যায়। ফলে চেষ্টালব্ধ আচরণকেই বিপক্ষীয়রা কাজে লাগাইয়াছে এবং প্রমাণ কবিয়াছে বাড়িওয়ালার বলিবাব কিছু নাই স্তবরাং

ভাড়াটিয়াকে তাহার পূর্ণ স্বত্ব দেওয়া হউক। দৃষ্টান্তগুলি সামনে ধবিয়া গৃহিণীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, পুৰাতন ভাড়াটিয়াবাই যখন আমাদের পাওনা স্বীকাব করিতে নারাজ তখন আবাব নতুনকে ডাকিয়া বামেলা বাড়ানো কেন? কথা শুনিয়া গৃহিণী তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিলেন। মুখ-ঝামটা দিয়া বলিয়া ফেলিলেন, ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। টাকা আদায় ঠিকই হচ্ছে এবং খরচও কি ভাবে হচ্ছে জানি। ভাল কথা, ভাড়া না দাও, চেয়ার টেবিল সোফা আর ওই সব নোংরা ছবি বিক্রি করে ফেল। উল্লঙ্গ স্ত্রীলোকগুলো তেলরঙে আঁকা বলেই কি একরাশ লোকেব সামনে নির্লজ্জের মত সাজিষে বাখতে হবে? আজই ওগুলো বিদায় কর।

তাবাপদবাবু ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। নিতান্তই গোঁ-বেচাবাব মত আরজি পেশ কবিত হইল, আজকেব পার্টিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিব নিমন্ত্রিত হয়েছেন। সকলকে বলা হয়ে গিয়েছে এখন আমি করি কি।

বিশিষ্ট কথাটির ব্যবহাবে যেন কাটা ঘায়ে ছুনের ছিটা পড়িল। গৃহিণী কণ্ঠস্বরকে পাড়া-মাতানোব সুরে তুলিয়াই বলিলেন, কি বললে, বিশিষ্ট। তার মানে বাজ্যেব মাতালদের ডাক পড়েছে?

মাতাল বলিতে যদি বেহুঁশ বোঝায়, আত্মহারা বোঝায় তাহা হইলে যে কোন সাধককেই মাতাল বলিতে হয়। ঋষি হইতে আবন্ত করিয়া কবি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী যে যার নিজেব সাধনা লইয়া আত্মহারা হইয়া আছে। সকলেই প্রকাবাস্তবে নেশাগ্রস্ত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা নেণার তাড়নাতেই চন্দ্রলোকে বসবাসেব জন্ম অস্থির হইয়াছে। প্রগতিশীলতার আন্দোলনে একদল শিল্পী নক্শার নেশায় শুধু মাতাল হয় নাই, সমালোচকদের পর্যন্ত পাগল করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহাবা আবোল-তাবোল বকিতেছে। কবির কথা স্তব্ধ, তাহাদেব সাতখুন মাপ। সে স্ববকে কথা দিয়া কোতল কবিলেও লোকে বলে, ভাবের ধাক্কা ওইরুকমটি ঘটয়াছে। ভাবাধিক্য আব মাতলামিতে তফাত কোথায়?

তাবাপদবাবুর যুক্তি তাঁহার নিকট অখণ্ডনীয় হইলে কি হয় গৃহিণী মাতাল বলিতে তাহাদেরই বোঝেন, যাহারা

পার্টিতে ছাইভস্ম গিলিয়া থাকে। ঠিক যেমন দুশ্চবিত্র বলিতে কেবল একপ্রকারেবই চবিত্রস্থলন বোঝায় অর্থাৎ পৃথিবীতে যাবতীয় জ্বীলোককে মা ও ভগিনী না বলিলেই বুঝিতে হইবে লোকটির চরিত্র খারাপ। গল্প বলিতে বসিয়াছি স্তত্রাং তারাপদবাবুব মুক্তি ঘাটিয়া লাভ নাই, বলাই-বুখা, মুক্তির কথা তিনিও জ্বর সামনে উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু পার্টির বিধানে ভবিষ্যৎকে যেভাবে বেকাব কবিবার ব্যবস্থা করিলেন তাহা মর্মান্তিক। নিষ্পত্তি হইল, যতবাব ঢোক গেলাব তৃষ্ণা অদমনীয় হইবে ততবারই গৃহিণী মেজার গেলাসে ওই বস্তুটি মাপিয়া দিবেন এবং প্রতি-ঢোক ঘডি ধবিয়া ঠিক কবিত্তে হইবে।

সরস পার্টির মধ্যে ঔষধ গলাধঃকবণের প্রথায় মেজাব গেলাসের মাপ-ও সময়ের কডাকডি আসিয়া পডায় তাবাপদবাবু রিত্রত হইয়া পডিলেন। আর চিন্তার কারণ হইল এতগুলো লোকের সামনে পর্দানমীন গৃহলক্ষ্মী নিঃসঙ্কোচে ঢালাঢালি করিবেন কেমন করিয়া। তাঁহাব ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া গৃহিণীকে বলিতে হইল, অত ভাববার কি আছে, অস্থখ হলে মাছুষ কি করে? ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে চিকিৎসার বিধান মানতে হয়। জাখন-হাসিব মেজ জামাই সম্বন্ধে ডাক্তাব এইরকম ব্যবস্থাই করেছিলেন কিন্তু—

তাবাপদবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, আমার তো কিছুই হয় নি।

গৃহিণী উত্তর দিলেন, আহা মরি, কথাব কি ছিবি। কিছু হয় নি কিন্তু যেভাবে চালিয়েছ তাতে হতে কতক্ষণ? এবং হলে তুমি ভুগবে, না আমি?

প্রশ্নের মধ্যে কিছুমাত্র জটিলতা ছিল না। তাবাপদবাবু বুঝিলেন, অনাথ আশ্রমের প্রস্তাব প্রস্তুত হইয়া আছে, গৃহিণীব প্রত্যাশিত উত্তর না পাইলেই মোটা অঙ্কের মাসহাবাব হিসাবও আসিয়া পডিরে। সঙ্কট অবস্থায় অধিক বাক্যব্যয়-বিপদজনক ভাবিয়া তাবাপদবাবু ঢোক গেলাব শর্তগুলি মানিয়া লইলেন।

সন্ধ্যাব দিকে নিমন্ত্রিতবাব একে একে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্ত ব্যবস্থা ঠিকই ছিল। গৃহিণীও অলক্ষ্যে থাকিয়া ঘরের আনাচে-কানাচে নজর রাখিয়া ছিলেন, সান্দ্রী-পাহারার মত টহল দিতেছিলেন। মশগুলি

কেজ্রে উত্তেজিত উচ্ছ্বাসেব কোনরূপ প্রকাশ না-থাকায হঠচিতে গৃহকর্মে ফিবিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অধিকতর বিশিষ্ট ব্যক্তিবও অভাব নাই। দুই-একজন ঘর হইতে বাহিব হইয়া যাইতেছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই বিশিষ্ট গন্ধে ভরপূব হইয়া ফিবিয়া আসিতেছেন। ক্রমান্বয়ে সকলেই বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করায় তারাপদবাবুও অদৃশ স্থান হইতে ঘরে ফিবিয়া আসিলেন। তিনিই প্রথমে ঘর হইতে বাহিব হইয়াছিলেন কিন্তু হিসাবেব দিকটা সামলাইবার জন্ত এতক্ষণ ফিরিতে পারেন নাই। পবের দিন সবকিছু জানাজানি হইয়া গেল। তাহার ফলে গৃহকর্তাব কি অবস্থা হইয়াছিল বর্ণনার প্রয়োজন দেখি না। ভুক্তভোগী মাঝেই অনুমান করিয়া লইতে পাবিবেন।

গ্রহের চক্র ঠিকই ঘুরিতেছিল। উপব-তলা খালি হইয়া গিয়াছে। ভাড়াটে অগ্রিম এক মাসেব ভাড়ার বিনিময়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া গৃহপ্রবেশেব আয়োজন করিতেছেন। উপব-তলার সোফা চেয়ার ইত্যাদি আসবাবপত্র বিদায় হওযায় নীচের তলায় বৈঠকখানাব ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন চালে ফরাশের উপব তাকিয়া পড়িয়াছে—এমন কি পরিবেশকে নিখুঁত কবিবার জন্ত পিকদানিটি পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

ভাড়ার স্বব্যবস্থা হইয়া যাওয়ায় উপরি আয় হইতে গৃহিণী যখন বাড়তি খবচের হিসাব ঠিক করিতেছিলেন সেই সময় বৈঠকখানায় হট্টগোলের সাড়া পাওয়া গেল। সকাল-বেলায় লোকসমাগমের কারণ জানিবার জন্ত গৃহকর্তী জানালাব পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিলেন, তাবাপদবাবু হতভম্ব অবস্থায় বসিয়া আছেন, বেশ একটু সন্তপ্ত ভাব। তাঁহাব সামনে উকিলের-পোশাক-পরা একটি লোক রক্ষভাবে হাত পা নাড়িয়া বাড়িভাড়া সম্বন্ধে কি বুঝাইবাব চেষ্টা করিতেছে। যতীন খুড়া উকিলের উক্তি শুনিয়া ঘোরতর আপত্তি জানাইতেছেন। আপত্তির কথা অযথা ওঠে নাই কাবণ যাবতীয় শর্তে স্বাক্ষরসহ স্বীকৃতির পব পুনবায় ভাড়াটিয়াব-স্ববিধার জন্ত সবকিছু অদলবদল খুড়া মানিতে পাবিতেছিলেন না। উকিলও বে-আইনি প্রস্তাবকে তর্কেব দ্বাবা সঙ্গত প্রমাণ করিতে না পাবায়-কথাকাটাকাটিকে বচসােব কোঠায় তুলিয়া

ফেলিয়াছিলেন। উত্তেজিত উকিলের হাতনাড়া দেখিয়া গৃহিণী বিনাচারে দাঁড়াইল একটি নিবীহ মানুষকে বাগে পাইয়া বলপ্রয়োগ দ্বারা ভাড়াটিয়ার স্বার্থসিদ্ধি ব্যবস্থা করিতেছে। এখনি একটা কিছু না করিতে পারিলে মারপিটে কর্তার অঙ্গহানি স্থানান্তরিত। তাহার পব হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইলেই তো চমৎকাব। এক্ষেত্রে কর্তা তো ভুগিবেন না, গৃহিণীকেই সবকিছু কবিত্তে হইবে। আশু দুর্বহ ঘটনার সম্ভাবনায় উতলা হইয়া উঠিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া তেওযাবী দরওয়ানকে স্থান ও কালোপযোগী উপদেশ দিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। সে লাঠিহস্তে উপস্থিত হইয়া দেখিল একটি পাতলুন-পবা ক্রুশকায ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া কি সব বলিতেছে এবং শূন্তে হাত ছুঁড়িতেছে। কর্তব্যপরাযণ দরওয়ান জানিত এইরূপ অবস্থায় কি করণীয়। সেও কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া বচসারত উকিলের হাত ধরিয়া একটানে ঘব হইতে বাহির করিয়া দিল। ভদ্রলোক যেন চড়ুই পাখির মত চুড়ুক করিয়া উড়িয়া গেল। ঘটনাটি ঘটবার আগে যতীন খুড়া 'কর কি কর কি' বলিয়া দরওয়ানের সৎ উদ্দেশ্যে বাধা দিবার জন্ত উঠিয়াছিলেন, কিন্তু দরজার ওপাশে বউঠাকুরাণীকে দেখিয়া দম-দেওয়া লাট্রু মত একটি গোটা চক্র খাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ভাড়াটিয়া ফন্দিবাজ লোক। পবের বাড়ি ভাড়া খাটাইয়া বেশকিছু জমাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই কারণে মেজাজটা একটু কড়া বাখিতে হইত। তিনি যে একটি কেউকেটা লোক নহেন তাহা প্রমাণ কবিবার জন্ত শাসাইয়া গেলেন এই বলিয়া যে ফৌজদারী মোকদ্দমার সমন পাঠাইতে বিলম্ব হইবে না।

দরওয়ানের শিষ্টাচারবিরুদ্ধ আপ্যায়ন অপ্রীতিকর বোধ হওয়ায় উকিলবাবু একেবাবে গেট পার হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। দৈহিক শক্তির মধ্যে তাঁহার একটি গুণ ছিল, তিনি তীব্রবেগে ছুটিতে পাবিতেন। বিপদের সময় এই শক্তির ব্যবহারে বহুবার ফুটবলের মাঠে প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, সার্জেক্টের ঘোড়াও তাঁহার নাগাল ধরিতে পাবে নাই। নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আইনের সাহায্যে কিভাবে গলাধাক্কার

প্রতিকার কবিত্তে হয় তাহা দেখাইয়া দিবেন। ফৌজদারী মামলার বিশেষ ধারার দৃষ্টান্ত দিয়া জানাইয়া দিলেন হয় মাস শ্রীঘর বাস স্থানান্তরিত।

গলদপূর্ণ ইংরেজী ভাষায় চিৎকার ও আইনের বক্তৃতা শুনিবার জন্ত অল্প সময়ের ভিতর রাস্তায় ভিড় জমিয়া গেল। কলিকাতাব মত শহরের রাস্তায় লোক-সমাগম হইলে এক ঘটনাব উপর নতুন ঘটনা চড়াও হইতেও সময় লাগে না। বর্তমান ক্ষেত্রে চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিল, লোকটা পাগল। আর একজন বলিল, শুধু পাগল নয়, চালাক পাগল। আব একজন জিজ্ঞাসা করিল, ওই বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে যখন গলাধাক্কার কথা বলছে তখন—আর একজন যেন কথাটা ছিনাইয়া লইল এবং শেষ করিল এই বলিয়া, দেখ দেখি কাণ্ডটা, উকিল মানুষ, শিক্ষিত ভদ্রলোক—তার সঙ্গে মতের মিল না হয় নাই হল, তাই বলে গলাধাক্কা দিয়ে বাস্তায় বার করে দেওয়া। টাকাওয়ালার দৈম্যক এইভাবে প্রায় পেলে—এ লোকটিও বক্তব্য শেষ করিতে পারিল না। আর একজন বলিল, কি বললে, গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছে! আর আমবা সকলে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। আমরা আজ এতই তেজহীন যে ছবুত টাকাওয়ালার পাশবিক অত্যাচার মাথা নত কবে সহ্য করব। আপনাব আমাব সঙ্গে আসুন, লোকটাকে ঘর থেকে টেনে বার করে নিয়ে আসি। দেখিয়ে দি মিলিত শক্তির দ্বারা কিভাবে আমরা বলীযান হতে পারি। বন্ধুগণ, আজ জাগবণের দিন এসেছে, তবুও আপনারা যদি আমার আবেদন না মানেন তা হলে এইখানেই আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হব।

যে ভদ্রলোক সত্যগ্রহ পণ করিয়া আত্মোৎসর্গের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন তিনি কোন ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ-নেতা। আপিসের আগে বা পবে সময় ও সুবিধা পাইলেই নেতৃত্বের পায়তাবা অভ্যাস করিয়া লইতেন। জনসেবার বক্তৃতায় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাব যখন প্রায় বিশ্বাসযোগ্য হইয়া আসিতেছিল সেই সময় কে একজন বলিল, পুলিশ।

পুলিস, শব্দটি বাস্তবিকই শুধু আতঙ্কপূর্ণ নয় বৈজ্ঞানিক-

গুণসম্পন্নও বটে। সত্যই পাহারাওয়ালাকে অনেকেই দেখিয়াছিল কিন্তু লোহা-বাঁধানো লাঠিহস্তে বিবর্ত পুরুষকে গেটের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পাহারাওয়ালার উপরওয়ালাকে ফোন করিবার জন্ত পাশের বাড়িতে ঢুকিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় আক্রমণ বা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে উপরওয়ালার উপদেশ না নাইলে চলে না, কারণ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আচরণের বিধি আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে বিবর্ত লাঠিধারীকে কি ভাবে গ্রেপ্তার করিতে হইবে জানা না থাকায় উপরওয়ালাকে ফোনের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ওই উদ্দেশ্যে যে-কোন একটা বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। পাহারাওয়ালার যখন বাহির হইয়া আসিল তখন জানা গেল সে বাড়িতে ফোন ছিল না এবং রাস্তাও তখন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে।

ঘটনাটিকে লম্বা করিয়া দেখাব কোন অজুহাত নাই। লোকজন চলিয়া যাইতে গৃহিণী যতীন খুড়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খুড়ার নিকট সব কথা শুনিয়া বুঝিলেন ব্যাপারটা বেশ গড়াইয়াছে। ভাড়াটেব মত বদলানো মানেই বাড়তি খরচের হিসাবও ফাঁসিয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার জন্ত কাহাকেও দায়ী করিতে হইলে স্বয়ং কর্তাকেই ধবিত্তে হয়। তিনি নরম না হইলে এমন একটি লজ্জাকর ঘটনা ঘটত না। বিচারে যতীন খুড়ারও সায় দিতে আপত্তি ছিল না। সমর্থন সহজলব্ধ হওয়ায়, গৃহিণী ঠিক করিলেন এবার একটা এসপার কি ওসপার কবিয়া ফেলিবেন। লোকসান তো সোজা লোকসান নয়। ভাড়াটিয়ার ব্যাপারটিও পাড়া-মাতানো কেলেকারি হইয়া গেল। বাড়তি খরচের হিসাবে যেগুলি অনিবার্য, সেগুলিকে এখন বাদ দেন কেমন করিয়া? ইহারই ভিতর পুঁটির মা জানিয়া গিয়াছে সামনের মাসে প্রথম সপ্তাহেই কথকতা ও হরিসঙ্কীর্তন হইবে। বায়নার টাকাও দলের অধিকারী অগ্রিম না লইয়া ছাড়ে নাই।

পুঁটির মা পাড়ায় একটি সচল গেজেট। ভিতর-বাড়িতে ভালমন্দ টাটকা খবর শুনিতে হইলে পুঁটির মা ছাড়া গতি নাই। এই তো সেদিনকার কথা, ভোর না হইতেই পাড়ার সকলেই জানিয়াছিল কিভাবে কর্তা সাদ্ধোপাদ লইয়া মাতামাতি কবিয়াছিলেন। খবরটি প্রচার করিল কে? সকলেই জানে পুঁটির মা।

যোষেদেব সেই দ্বিধী মেয়েটা কাহার সহিত পলাইয়াছিল, ধবা পড়িতেই কি ভাবে সিনেমার তারকা হইয়া গেল—এ সবই পুঁটির মা কাছ হইতে পাওয়া যাইবে। স্তব্ধ হরিসঙ্কীর্তন ও কথকতার খবর যে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা শুনিয়াছে তাহারা আগতপ্রায় দিনটিব জন্ত পৌটলা বাঁধিয়া বসিয়া আছে। যাহারা ঠাকুর-নাম শুনিতে আসিবে তাহাদের যৎসামান্য মিষ্টান্ন ও শরবত না দিলে চলে কেমন কবিয়া। এই অবস্থায় বাড়তি খরচের ধাক্কা সামলাইতে হইলে সংসার-খরচ হইতে যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন সেই পুঁজি হইতে টান মাঝিতে হয়। অনটন হইতে সঞ্চয় কবা যে কতটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। এ যাত্রা কোনপ্রকারে সামলানো সম্ভব হইলেও ভবিষ্যৎ পড়িয়া আছে। স্তব্ধ উপরি আয়েব জন্ত স্থায়ী একটা বন্দোবস্ত না কবিলেই নয়।

গভীর চিন্তার পর যে পথ বাহির হইল তাহা কার্যকরী করিতে হইলে কর্তার বিবেকেব উপর চড়াও হইতে হইবে, স্তব্ধ তাগ বুঝিয়া অগ্রসর হওয়া দরকার। নরম কথায় যেখানে শত্রুকে পরাস্ত আপনাব কবা যায় সেখানে উপযুক্ত পথে চলিলে কর্তা বশীভূত হইবেন না? গৃহিণী ভাবিতেছিলেন, কর্তার কষ্টস্বরকে কি ভাবে অর্থোপার্জনের জন্ত কাজে লাগানো যায়। সঙ্গীতকে তারাপদবাবু বিলাসের অঙ্গ ভাবেন নাই। একসঙ্গে হাজার লোকেব বাহবা শুনিবাব জন্তও কখনও তিনি মাইকেব সামনে বসেন নাই। স্বর ছিল তাঁহার আবোধনাব বস্তু, অন্তরের উচ্ছ্বাসকে ধ্বনিব দ্বারা পূজার্য্য দিতে পাবিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। প্রাচীন ঘরোয়ানা চালে তিনি দীক্ষা লইয়াছিলেন। আজও দীক্ষাগুরুপ্রতি তাঁহার ভক্তি অটল বহিয়াছে। এই কারণে আধুনিকপন্থী ও অতিমার্জিতরা তাঁহাকে কালোযাতী পালোয়ান বলিয়া থাকে। খুবই স্বাভাবিক, কারণ তিনি নাকি সুরের বিস্তারে তানের সহিত ধস্তাধস্তি করিতেন, সম আসিলে তাল ঝুঁকিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেও বাধিত না। মার্জিতদেব ধাপ্পা ও ছুঁচোবাজি যে ভাবেই তাঁহাকে জ্বালাইবার চেষ্টা করুক না কেন, স্তব্ধস্বর প্রতি অটল বিশ্বাসকে কেহই টলাইতে পাবে নাই।

এইরূপ বিশ্বাসকে যবোয়া কাজে লাগাইতে হইলে একমাত্র সোহাগজডিত অম্লরোধ ব্যতীত অল্প উপায় নাই। সোহাগেব কাববাবও বহুদিন আগে উঠিয়া গিয়াছে। মধ্য-বয়সে আদ্রিসেব পুনবাবর্তন করিতে হইলে কি ভাবে গোড়াপত্তন কবিবেন তাহাই হইল চিন্তাব বিষয়। সোহাগেব কথা উঠিল, কাবব গৃহিণী জানিতেন সঙ্গীতকে অর্থোপার্জনের জন্ত স্বামী কখনই ব্যবহাব কবিবেন না। সোহাগেব ব্যাপারে গৃহিণী কি ভাবে তাঁহাব কলাকৌশল কাজে লাগাইয়াছিলেন তাহাব বিশদ আলোচনার প্রয়োজন দেখি না, গোপন কথা আড়ালে থাকাই ভাল।

তবে সোহাগের ফলে বাস্তবিকই লোকমানের দিকটা সামলাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রেমের দুর্দান্ত প্রতাপে তারাপদবাব স্বীকার করিয়াছিলেন, উপবি-আষ যখন একান্ত প্রয়োজন তখন সিনেমাব গানও গাহিবেন, গৃহিণীকে আর কাঁদাইবেন না। দুই ফোঁটা চোখের জলে তো গৃহিণী একটা হেস্তুনেস্ত করিয়া ফেলিলেন কিন্তু সত্যবদ্ধ মাহুষটি প্রতিশ্রুতির পবিচর্যা কবিত্তে গিয়া যেসব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ কবিত্তে বাধ্য হইলেন তাহা যে খুব সুখপ্রদ হইয়াছিল এমন কথা-হলফ কবিয়া বলা যায় না।

রাগবাগিণীর সাধনা এক জিনিস আব সিনেমাব গান গাওয়া অল্প ব্যাপার, বিশেষ কবিয়া যেখানে বিরহেব জালায় গায়িকা বা গায়ককে মবিত্তে হয়। চলচ্ছবিত্তে বিরহেব প্রকাশ অতি মর্যাস্তিক দৃশ্য, কারণ গায়কেব একলা জলিলে চলে না, পবিচালক ও শ্রোতাকেও জালাইয়া আনন্দ-দিত্তে হয়। সংক্ষেপে জনপ্রিয় প্রত্যাশা সার্থক কবিত্তে হইলে মরিবার আগে একটি গান না গাহিলেই নয়। মৃত্যুব সহিত গানেব যোগ থাকায় স্ববেক করুণ বসাত্মক করিবার জন্ত শ্বাস ও হেঁচকিব মিশ্রণ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা চলতি চাহিদা, স্তববাং অবর্জনীয়।

একবাব মরিলে রাঁচার দুর্ভোগ হইতে হয়তো গায়ক বক্ষা পাইত কিন্তু শ্বাস বাগ বা রাগিণী যাহাই হোক পরিচালকের ভাল লাগিলে, মৃত মাহুষকে উঠিয়া বসিত্তে হয় গানটি পুনরায় গাহিবার জন্ত।

মৃত্যুকে ভয় করিবার কিছু ছিল না, কারণ তিনি

জানিতেন উহা ভবিতব্যের অনজ্ঞনীয় বিধান। কিন্তু হেঁচকি ও শ্বাসের মিশ্রণে কিভাবে স্ববেক স্বমধুব কবিত্তে হয় তাহা তিনি শেখেন নাই। মিশ্র স্ববেব এই জাতীয় মৌলিকত্ব তাঁহার নিকট মাবমুখী হইয়া উঠিল। একদিকে শ্বাসজড়িত হেঁচকি বাগ, অপব দিকে প্রতিশ্রুতিব মর্যাদা। দুইয়েব টানা পোডেনে তাবাপদবাব আত্মা জাহি মধুসুদন ডাক ছাড়িত্তে শুরু করিয়া দিল, তথাপি জনপ্রিয় গানকে স্বীকার-করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

গোল বাধিল, ছবিঘরে প্রবেশাধিকার লইয়া। এমন একটি পরিবেশে ঢুকিত্তে হইলে কোন মাতব্বরের স্থপারিণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কি বলিলে কোন্ তাবকা সহজে সন্তুষ্ট হয়, কোন্ তাবকাব তাপ কতটা, তাপকে সহ্য কবিত্তে হইলে দর্শনপ্রার্থীর চামড়া কতটা পুরু হওয়া দবকাব, কিছুই তাঁহার জানা নাই।

ইতিমধ্যে ঢোক গেলায় নানারকম বিিন্ন আশায় শুভামুখ্যাবীবাও উধাও হইয়াছে। পরামর্শ করিয়া যে কৃষ্টির সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন তাহাও সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যের প্রতিপত্তিত্তে যাহা এককালে না চাহিত্তেই পাওয়া যাইত তাহা এখন দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাবাপদবাব ঠিক করিলেন, তারকা বাছাই করিয়া কোন লাভ নাই। তাপ একটু-আধটু লাগিবেই, কাছে থাকিলে সহ্যও হইয়া যাইবে। কষেকদিন আগে খবরেব কাগজে পড়িয়াছিলেন, গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলে একজন বেজায় নামকরা তারকাব আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি নটা, গায়িকা ও অভিনেত্রী, একাধাবে সর্বগুণসম্পন্না। কখন তিনি মাটিতে পা রাখিবেন জানিত্তে হইলে গণৎকারেব নিকট ছুটিতে হয়। এমন একটি মহামানবীর দর্শন লাভ করিত্তে হইলে লিখিত আবেদন পাঠানোই সঙ্গত। তারাপদবাব একটি বিনীত পত্র লিখিলেন। পত্রপাঠ উত্তর পাইলেন, অমুক সময় আসিলে অস্থবিধা নাই। হিসাব কবিয়া এইরূপ শব্দ-যোজনায় দূরত্ব বাখাব প্রয়াস এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে তারাপদবাব দমিয়া গেলেন। তথাপি দরদহীন অভ্যর্থনাকে মানিত্তে হইল, মা দুর্গাব নাম স্ববণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হোটেলেব কাছাকাছি আসিত্তেই তাঁহার ট্যাক্সি

খামিয়া গেল। পদযাত্রী ও গাড়ির ভিড়ে পথ বন্ধ হইয়াছে। ট্রাফিক পুলিশেরও পাক্সা নাই, হয়তো ভিড়ের মধ্যে গুম হইয়া গিয়াছে। এ সময় মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের যথযাত্রা যখন সম্ভব নয় তখন অল্পমানের উপর নির্ভর করিতে হইলে কোন রাজা-উজীরের উপস্থিতি কথাই মনে আসে। আসল খবর জানিবাব জ্ঞাত কৌতুহল বাড়িয়া উঠিয়াছিল, গাড়ির পাশেই একজন অল্পবয়স্ক যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত ভিড়ের কারণ কি? প্রশ্ন শুনিয়া লোকটি অবাক। দৃষ্টির ভাষাতেই বুঝাইয়া দিল, ঠাকুর দেখতে এসেছ, কার পূজো তা জান না? তারাপদবাবু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন, প্রশ্নোত্তর না শুনিয়াই বিপবীত দিকে মুখ ফিরাইতে হইল। এদিকেও এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের সামনে পড়ায় আশঙ্কার কারণ ঘটিল। একটি ছাগদাড়িভূষিত ডাঁশা ছোকরা ল্যাম্প-পোস্টের ডগায় বসিয়া একান্ত চিন্তে হোটেলের জানালায় কাহাকে দেখিতেছে। অত দূর হইতে মানুষ চিনিতে হইলে দূরবীনের সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণ দৃষ্টিকে বিশ্বাস কবিলার উপায় নাই। তথাপি উর্ধ্বাসনে বসিয়া লোকটি কি দেখিতেছিল সেই-ই বলিতে পারে। উর্ধ্বের লোকটি যাহাই দেখুক নীচে একজন গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি-পরা লোক উর্ধ্বাসনে অধিষ্ঠিত ছোকরার পা ধরিয়া টান মারিতেছে। সমভার সামলাইতে না পারিলে উপরের লোকটি যে নীচের লোকটির মাথায় আসিয়া পড়িলে সেদিকে তাহাব জ্রফেপ নাই। উপরের মানুষটি যেভাবে ছ'শিয়ার হইয়া বসিয়াছিল তাহাতে অল্পমান করা চলে, গাছে চড়িয়া ফুটবল ম্যাচ দেখা তাহার পেশা। ঝড়বাদলে যাহারা ডালেব উপর বসিয়া অবলীলাক্রমে দেহের সমভার সামলাইতে পারে তাহাদের পক্ষে হেঁচকা টান কিছুই নয়। তবে অতিমাত্রায় বিবক্তিকব হইলে মাঝে মাঝে পা-ঝাড়া দিতেছিল। ওটা অভ্যাসদোষও বলা চলে। নীচের লোক উপরে উঠিবার চেষ্টা কবিলে, উপবণ্ডালা দুই একটি পদাঘাত করিয়াই থাকে, এই আচরণে নতুনত্ব কিছু নাই। অভ্যাসদোষে যাহাই ঘটুক, ঠাকুরদর্শনে ভক্ত যেভাবে আত্মহারা হইয়া যায় ঠিক সেইভাবে লোকটি অপলক দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকাইয়া ছিল। নীচের লোকটিও দর্শন লাভের আশা

লইয়া আসিয়াছিল এবং তারকার রূপ দেখিলে বেশ খানিকটা পুণ্যের খাতায় জমা হইতে পারে তাহা ভিড়ের মধ্যে কাহারও অজানা ছিল না। নীচের লোকটি ডগার কাছাকাছি আসিতে তদ্রাচারকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না, উপরের লোকটি একটি হাতল ছাড়িয়া দিল। এদিকে গ্যাসপোস্টের তলায় গলদ পরীক্ষার জ্ঞাত যে একদিকে খানিকটা খুঁড়িয়া গর্ত করা ছিল তাহা বোধ হয় কেহই লক্ষ্য কবে নাই। অপর দিকে তারকা দর্শনের আশায় উচ্চতার নাগাল সহজলব্ধ দেখিয়া আবও একজন (আনানীই বলিব) নারিকেল গাছে ওঠার পন্থায় যেমনই পোস্টের উপর খানিকটা উঠিয়াছে অমনি পুণ্যাত্মাদেব ওজন সহ্য করিতে না পারায় স্তম্ভটি সকলকে লইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িল। তাবাপদবাবু যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। কয়েকজন চাপা পড়ায় বেশ একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হইল। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি লোক মিলিত চেষ্টার দ্বারা ট্যান্ডির ড্রাইভারকে টানিয়া গাড়ি হইতে নামাইবার জ্ঞাত অস্থির হইয়া উঠিল। এইরূপ ক্ষেত্রে নিবাপদে থাকিয়া চাঁদার মার দিবার জ্ঞাত একতা ও ব্যাকুলতার যে অদ্ভুত যোগ ঘটে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিবার উপায় নাই।

অবস্থার পরিণতি কি হইতে পাবে তাহা কতকটা আন্দাজ করিয়া তারাপদবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন ড্রাইভারের পালা শেষ হইলেই আরোহীর অভ্যর্থনা শুরু হইবে। ঘটনার মূল সূত্রই তো আরোহী, সে অতিমাত্রায় আরাম না চাহিলে গাড়ি বা ড্রাইভারের অস্তিত্বই থাকিত না। আবোহীকে কেহ চিনিয়া রাখে নাই এমন কথাই বা কে বলিতে পারে? স্বভাবঃ স্থানটি পরিত্যাগ না করিলে বিপদ স্থানান্তিত। তারাপদবাবু গাড়ি হইতে নামিয়াই হোটেলের উলটামুখে চলিতে লাগিলেন। বিপদসঙ্কুল কেন্দ্র হইতে বেশীদূর যাইবার আগেই শুনিলেন, দমকল-গাড়ির ঘণ্টা, অর্থাৎ কাছেই কোথাও আগুন লাগিয়াছে। গাড়ি বেগে হোটেলের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। পবে জানা গেল মিলিত শক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত ফলিয়া গিয়াছে। নীতির অভিভাবকরা আবোহীকে শাসন করিতে না পারিয়া গাড়িটাই পুড়াইয়া দিয়াছে। ড্রাইভারের কি হইল ভাবিয়া লাভ নাই।

কথায় বলে 'আপনি ঝাঁচিলে বাপের নাম। গৃহিণী বনিকট সমস্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়া আশা করিয়াছিলেন দুই-একটা সমবেদনার কথা শুনিতে পাইবেন। কপাল জোর হইলে বিচারে করুণাব ছোঁয়াও পাইতে পাবেন। সব শুনিয়া গৃহিণী বলিতেও পারেন, কাজ নেই বাপু তাবকার পিছনে ছুটে। ওরা গুণতুক জানে—লোকে কত কথাই বলে। ঘরেব ছেলে ঘবেই থাক। আমাদের যা আছে তাই দিয়ে চলে যাবে।

সবই ঠিক কিন্তু 'আখন-হাসির মেজ' জামাইটাই গোল বাধাইয়াছে, মরিবার আগে বেশ মোটা টাকা রাখিয়া গিয়াছিল। সেই টাকায় নতুন মোটরগাড়ি কেনা হইয়াছে। দরকার থাকে না থাক বাড়ন্ত মেয়েরা নিত্য নতুন গহনা পবিতেছে। ওদের কি দেমাক, নতুন গহনার বলক লাগাইয়া মাথা নীচু কবাইয়া ছাড়ে। তুলনায় গৃহিণীর অনটন সম্বল। এইরূপ অবস্থায় ক্রিয়াকর্মে গৃহিণী জড়োয়া গহনা পরিলেও, ওরা টিটকারি দিয়া বলিবে, বাপদাদা যা রেখে গিয়েছিল তাই দিয়ে কোন রকমে চলছে, ও-আর কতদিন। তারাপদবাবু সম্ভবপর অল্পকূল ঘটনার আশ্রয় গইলে কি হইবে, প্রতিকূল সম্ভাবনাই সত্য হইয়া উঠিল।

ব্যর্থতাকে প্রশ্রয় দেওয়া গৃহিণী বধাতে সয না। পরম নির্লিপ্ততার সহিত জানাইলেন, কলকাতার মত শহবে অমন ঘটনা নিত্যই ঘটে। স্ত্রতবাং কাজ না পাওয়া পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ ঘটনা আর একবার ঘটিলে গৃহিণী যে হঠাৎ বিনা নোটসে বিধবা হইতে পারেন, তাহা বুঝাইবার জন্ত তারাপদবাবু মনকে দৃঢ় কবিয়া ফেলিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বক্তব্যকে গিলিয়া ফেলিতে হইল। গৃহিণী ব মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, 'অনটনকে না সরাইলে তিনি বিধবা হইতে প্রস্তুত নহেন।

কয়েকদিন পরের কথা। তারাপদবাবু সন্ধানের মাষ্টরকে খুঁজিয়া পাইলেন। 'সিনেমায স্ত্রগায়ক চাই' বিজ্ঞাপন পড়িয়া তারাপদবাবু 'আবেদনপত্র নম্বর-মারা' বাক্সের ঠিকানা পাঠাইলেন। আবেদনপত্রে একটি বুদ্ধির কাজ কবিয়াছিলেন, নিজের নামে স্বাক্ষর দেন নাই। ঠিকানাতেও আত্মগোপনের ব্যবস্থা ছিল। এবার ঠাহার শরণাপন্ন হইলেন তিনি নটী নহেন, স্বর্গের দাবপাল স্বয়ং প্রধান পরিচালক। ভাগ্যবিধাতা-দর্শন দানের পর ভরসা

দিয়াছিলেন, তাঁহার আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা কবা চলিতে পারে তবে সবকিছুই পরীক্ষাসাপেক্ষ। স্বরকে শাষেস্তা না করিতে পাবিলে সিনেমায় ভবাল কালোষাতিব স্থান নাই। সাহিত্যিকবাই বলেন, ও স্বব একবার শুরু হইলে থামিতে চায় না। স্বর সম্বন্ধে সাহিত্যিকেব মত শেষ কথা। সাহিত্যিক বধিব হইলেও তাঁহার মত মানিতে হয়, কারণ মার্জিত রুচির কাঙারী বলিতে সাহিত্যিকেই বোঝায়। তারপর সাংখ্যাজী এবং গায়কের মধ্যে মল্লযুদ্ধ তো আছেই। বীভৎস পালোয়ানী পায়তারা কুষ্টির কেন্দ্রে ভাবিতেই গা ঘিনঘিন করিয়া উঠে। আসল কথা, প্রযোজন অল্পসারে, বেহাগকে মোচড় মারিয়া জৌনপুর্বা বা আসবরী যদি না করা গেল তো স্ববকারের কেরামতি কোথায়। রাগ-রাগিনীর সময়ও বিশুদ্ধ স্বরগ্রায় লইয়া তাহারাই মাথা ঘামাঘ-মাহারা-স্ববের বাঁধনে আডষ্ট। আমরা চাই স্ববের সহজ গতি—যে স্বব জনপ্রিয় হইতে পারে এবং ছক্কাব দারা-মাইক-না ফাটায়।

যে সময় পবিচালক প্রত্যাশার অবশ্যপালনীয় শর্তগুলি বক্তৃতার প্রথায় শুনাইতেছিলেন, সেই সময় তারাপদবাবু আবিষ্কার করিলেন উপস্থিত ভাগ্য-বিধাতা তাঁহার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। এই মানুষটাই দিনেব পর দিন তাঁহার গান শুনিয়া তারিফ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেন না। তাঁহারই টাকায় পানামিক্যেব বড়াই করিতে গিয়া কেলেকাবির স্বব্যবস্থাকবিতে কিছু-মাত্র বিধারিত হন নাই। বেসামাল হইলে লোকের জিম্মায় বাড়ি পৌছানোব ব্যবস্থা কবিতে হইয়াছে এবং 'পরের দিনই গৃহিণী অনাথ আশ্রমেব প্রস্থাব করিয়াছেন। আজ যে পরিচালক ব্যবসায় ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন তাহাও তারাপদবাবুর টাকায়। ঘটনাগুলি মনে পড়ায় তারাপদবাবু ভক্তলোককে চেনাব দাবি পেশ করিলেন। দেখা গেল ভাগ্যদেবতাব অ কুক্ষিত-হইয়া উঠিয়াছে। ভাবটা—এতবড় স্পর্ধা। কিন্তু তাঁহার মত গদীয়ানও যে ভক্ত হইতে পারে তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া হাতের ঘড়িব দিকে দৃষ্টি নিষ্পেক করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আতকাইয়া উঠিলেন। বৃশ্চিক দংশনের মত কিছু ঘটে নাই। সময়ের অপব্যয়ে তাঁহার সর্বনাশ হইতে বসিয়াছিল, নির্লজ্জের মতই সত্যটি বলিয়া ফেলিলেন, কি সর্বনাশ, আর

এক মিনিটও কথা বলার সময় নেই, এখনই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে যেতে হবে। —দেবী আমার জন্তে অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই কবলে তবে আপনাব কথা। এখন বলতে পাবি না আপনাকে দিয়ে চলবে কিনা। —দেবীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, হয়তো তিনি বিশেষ স্থবিধা দিতে পাবেন। যাই হোক আপনি সোমবার সকালে আসছেন তো, তখন দেখা যাবে।

সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও অতি ব্যস্ততাব প্রমাণ দিয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

সোমবার, তারাপদবাবু বিশেষ স্থবিধার আশায় স্টুডিওতে অপেক্ষা কবিতেন। সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া গিয়াছে, পরিচালক বা মর্তের তারকা এখনও আসেন নাই। কখন আসিবেন তাহারও স্থিতি নাই, তবে আসার সম্ভাবনা থাকায় তারাপদবাবু অপেক্ষা কবাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

তারাপদবাবু একলা বসিয়া পরীক্ষার কথাই ভাবিতেছিলেন। সারাটা জীবন স্মৃতিচর্চায় কাটাইয়াছেন, কখনও পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে হয় নাই। শিক্ষার্থী হইয়াই গুরুত্ব ক্রমা কামনা কবিয়াছেন। ধনিব অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা পুরাতন হইলেও নূতনের রূপে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, দুঃখের মাঝে সান্ত্বনা দিয়াছে, অজানা অসীমের সহিত অন্তরের যোগ ঘটাইয়াছে। কখনও স্থবের গম্ভীর নিনাদে মেঘগর্জনের সাড়া পাইয়াছেন, কখনও বসন্তের আলাপে যৌবনের অল্পভূতি ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই আনন্দের সূত্র হইতে নয়া পন্থার প্রয়োজনে নিজেকে পৃথক কবেন কেমন করিয়া। আরও ভাবিতেছিলেন, সমুদ্রতটে একটি বালুকণা পরীক্ষা করিলে তাহাকে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা চলে কিন্তু প্রত্যেকটি কণার বিশেষ-গুণ বিচার করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ, প্রত্যেকটি চির-নূতন। বালুময় তটে অনাদিকালের সঞ্চয় অনন্তকাল পর্যন্ত অক্ষয় থাকিবে। ক্ষুদ্র মাছের জীবনে রত্নাকরের গভীরতা মাপিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। স্মরণ্য পরীক্ষার মানদণ্ডে যে ছাড়পত্র দেওয়া হয় তা অধঃস্তরের শিক্ষা-নবিসের গুণ ব্যাখ্যামাত্র, উহা শিক্ষার শ্রেণী-বিচার। তবে কি তাঁহাকে গীতন্ত্রী জাতীয় একটা কোন ফরমায়-ফেলা

পরীক্ষায় নামিতে হইবে? আত্মপ্রশ্নে নিজের কাছেই ছোট হইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের অগ্নিবর্ষণে পিচের বাস্তা পুড়িতে শুরু করিয়াছে, পোড়ার তাপ পাংগলা হাওয়ার সহিত চতুর্দিকে ছুটিয়া ঘর ও বাহির তাতাইয়া দিতেছে। ক্ষুধায় জঠবাগ্নি জলিতেছে, তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে। পানীয় জল পাইলেও কতকটা জ্বালায় বিরাম হইত কিন্তু কাহাকে বলিবেন একটু জল দাও?

কর্মব্যস্ততায় সকলেই যন্ত্র হইয়া গিয়াছে। সাংকেতিক আদেশে কর্তব্য শেষ কবিতেন। ওবা নিজেরা নড়ে না, বিশেষ ব্যক্তির আদেশ দ্বারা নড়াইতে হয়। আদেশের সহিত বহু প্রকারের আওয়াজ শুনিতেন। ছবিঘরের ভিতরে যেন প্রেতলোকেব হুল্লোড় চলিয়াছে। রহস্যময় উৎসবের আয়োজনে পবিত্র অশ্রুতকব হইয়া উঠিল। গেটের সামনে মোটরের হর্ন শুনিলেই বাবান্দা ছাডিয়া রাস্তার দিকে কতবার উঠিয়া গিয়াছেন তার ঠিক নাই। অস্থিরতার তাগিদে একমাত্র চিন্তা পিছু লইয়াছিল, এইবার বোধ হয় পরীক্ষার পালা শেষ হইবে। মোটর থামে নাই, পদযাত্রীকে পথ ছাডবার সঙ্কেত দিয়া গম্যস্থলে চলিয়া গিয়াছে। সময়ও ছুটিয়া চলিয়াছে আপন গতিতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হইয়া গেল, পরিচালকের দেখা নাই, ধৈর্যও এদিকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে, যে কোন মুহূর্তে একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসিয়া পড়া কিছুই বিচিত্র নয়। সকালে মাত্র এক কাপ চা পান করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। এখানকার কাজ সারিয়া নিশ্চিন্ত মনে আসনে বসিবেন এইরূপ ইচ্ছা ছিল। যৎসামান্য কিছু মুখে দিয়া বাহির হইবার জন্ত গৃহিণী অল্পবোধ কবিয়াছিলেন। কোথা হইতে কর্তা আজ সাহস পাইয়াছিলেন কে জানে। আহা রেব অল্পবোধ নিঃসঙ্কোচে প্রত্যাখ্যান কবিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার কাজেই যাচ্ছি, ফিরে এসে ওদিকটা নজর দেওয়া যাবে। উত্তর শুনিয়া গৃহিণী চটিয়া উঠিয়াছিলেন। খুবই স্বাভাবিক, কারণ পিত্তি পড়িলে প্রতিক্রিয়ার পরিচর্যা গৃহিণীকেই কবিতেন হইবে। অনিবার্য বোগটিব কথা স্বরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কর্তা কর্তব্যসাধনে বাহির

হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেলা বাড়িয়া উঠিতে গৃহিণীর উপদেশ তাবাপদবার হাড়ে হাড়ে অমুভব করিতে লাগিলেন। এখন ঘরে ফিবিয়া আহারের কথা উত্থাপন কবাও চলে না, যে কাজ কবিত্তে আসিয়াছিলেন তাহাও সার্থক হয় নাই। পরিবর্তে নিরম্ব উপবাসে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন শুনিলে, সিদ্ধপুরুষকে গৃহিণী যে শ্রদ্ধা দিয়া পূজা কবিবেন না তাহা কর্তা জানিতেন। বরং মডার উপর খাঁড়ার যা মাবিয়া মজা দেখিবাব জন্ত বলিতে পারেন, যবেব আহার যখন মুখে রোচে না তখন বাইরেই ব্যবস্থা কব। শুধু এইটুকু বলিয়া থামিলে হয়তো দয়া নিংডাইবাব জন্ত আব একবার বলিতেন, এখন খেতে দাও, পবে যত খুশি বকো। কিন্তু এসব বিষয়ে কাহারও পাওনা ফেলিয়া রাখাটাও আবার গৃহিণীর ধাতে সয় না। প্রাপ্য ভিবস্কার দেওয়া হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা পরিশোধ করা তাঁহার স্বভাব। বিনয় হইলে হুদ পর্যন্ত কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দেন। পিত্ত উপলক্ষ করিয়া কাজ সম্বন্ধে অক্ষমতাব কথা উঠিয়া পড়িবেই, তখন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবেন। তখন-হাসির জামাই কেবল গতর খাটাইয়া পয়সা উপায় করে নাই। বুদ্ধিমান লোক কিভাবে পয়সা জমাইতে হয় তাহার অভুলনীয় দৃষ্টান্তও বাখিয়া গিয়াছে। সেই অমর কীর্তিব ফলে আজ মেয়েরা মোটর চড়িতেছে, মনের মতন নতুন গহনা পরিতেছে। তখন-হাসির জামাই ছাড়া আরও অনেকের দৃষ্টান্ত আছে যাহাদের বুদ্ধির সহিত তুলনা কবিলে তাবাপদবার বুঝিবেন নিরেট বোকামিতে তিনি কতখানি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। আশ্চর্যের ব্যাপাব এই যে তথাপি লজ্জায় মুখ ঢাকিবাব মত সংপ্রবৃত্তি তাঁহার আসিল না। আত্মশ্রদ্ধা থাকিলে কোন মানুষই জীবনসংগ্রামে পিছপাও হইতে চায় না। বাঁচাব ক্ষম্বে বিজয়ী হইতে হইলে ক্ষুধার তাড়নাকেও সহ্য কবিত্তে হয়। এইটুকু সহ্যশক্তি যখন নাই তখন এ সংসারে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে ধবিয়া রাখিবে কে? যবে ফিরিলেই যে প্রস্তুত প্রস্তুত গৃহিণী অভ্যর্থনার জন্ত ব্যবহাব করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে অপবাহু পায় হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা আগতপ্রায়। খবব আসিল প্রধান পরিচালক আসিতেছেন না, যাহাবা অপেক্ষায় আছেন তাঁহারা অল্প একদিন

আসিতে পাবেন। পুনবায় আবেদনপত্র পাইলে সময় নির্দিষ্ট হইবে। যে সহকারী খবর দিলেন তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, উপায় কি বলুন, দৈনিক কাজেব প্রোগ্রাম মানতে হলে ওঁকেও ঘড়িব কাঁটা ধরে চলতে হয়। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে বিবাট ভোজের আয়োজন হয়েছিল। মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে একটু বিশ্রাম না নিয়ে পাবেন নি। তাবপবই তারকাসহ স্ত্রীমারযোগে জলবিহারের ব্যবস্থা থাকায়—বুঝতেই পারছেন, আব কি বলব। ভদ্রাচারের বহর ও ঘড়ি দেখিয়া সময়ের ব্যবহাব সম্বন্ধে কৈফিয়ত শুনিয়া তাবাপদবার ঘরে ফিরিবাব জন্ত প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু অধিকতর দুর্ভোগ ওঁদিকেও প্রস্তুত থাকায় স্থিব করিলেন, পথে কোন একটা রেস্টোরাঁয় পিভিনাশের ব্যবস্থা করিয়া লইবন।

রেস্টোরাঁয় ঢুকিবাব আগে টাকার থলিটা পবীক্ষা কবা ভাল। বলাই বুখা, এদিক দিয়াও ইতিপূর্বে তিনি দুর্ভোগেব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। একবার আহারান্তে বিল চুকাইতে গিয়া দেখেন পকেটে পার্স নাই। এবারও পবিত্রাণ পাইলেন না। টাকার থলি খুলিয়া দেখেন, অধিক সময় অপেক্ষার জন্ত টাক্সি-ড্রাইভারকে বকশিশ দিতে গিয়া ব্যাগ প্রায় খালি কবিয়া ফেলিয়াছেন। অশ্রমস্কতায় একটি পাঁচ টাকাব নোট দিতে গিয়া একটির সঙ্গে আরও দুইটি চলিয়া গিয়াছে। যাহা পড়িয়া আছে তাহার বিনিময়ে রেস্টোরাঁর আহার কেনা চলে না। গতাস্তরে যবোষা দুর্ভোগকে স্বীকাব কবিয়া বাড়িমুখে চলিতে লাগিলেন, কাবণ ফিবতি পথেব ভাড়াও তাঁহার নিকট ছিল না। না হাঁটিলেও চলিত কিন্তু ক্যাশ-বাক্সের চাবি গৃহিণীব নিকট বাখিয়া গিয়াছিলেন। বাহিবে ফেলিয়া আসাব সম্ভাবনা থাকায় সাবধানতার প্রয়োজন মানিতে হইত। ক্যাশ-বাক্স খোলার প্রয়োজনে চাবি চাহিলেই গৃহিণী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তাহাব পব ব্যর্থতার বোঝা কি ভাবে বহন কবিয়াছেন তাহাব বিশদ বিবরণ চোকাঠ পার হইবার আগেই দিকে হইবে। ব্যথতা যে ভাগ্যবিধাতার বিধান, ইচ্ছাকৃত নয়, তাহা কুণ্ঠির লিখন দেখাইয়া প্রমাণ কবা চলে। মেজাজ খুব চড়া না থাকিলে অনেক সময় বিশ্বাসও করেন কিন্তু পিভি

পড়ানোর আধকার তাঁহাকে কেহ দেয় নাই, বিশেষ কবিতা বাহিব হইবার সময় গৃহিণী যখন পই পই কবিতা অল্পবোধ করিয়াছিলেন—যা হোক কিছু মুখে দিয়ে যাও। মাছুষ যেন কেবল উদবপূর্ণ করিবার জন্তই বাঁচিয়া থাকে। এই প্রশ্নের পিছনে যে গুট তত্ত্ব আছে তাহা অন্তরমহলে পৌছাইয়া দিবেন কেমন করিয়া। মোট কথা এখন গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আসিয়া পড়িবে। একেই সাবাদিন নির্জলা উপবাস গিয়াছে তাহাব উপর ভবিষ্যৎকে সিনেমা-পরিচালকের কাছ হইতে বন্ধক রাখিয়াছেন—যেখানে প্রত্যাশার স্বপ্ন গুণিতে গুণিতে অনেক সময় আসলই মারা পড়ে।

অবসাদগ্রস্ত দেহ ও মনের এই অবস্থা লইয়া জেবার মুখে পড়িলে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবেন। দবকাব নাই আহাবের কথা ভাবিয়া। তাবাপদবাবু সোজা চলিয়া গেলেন তাহার বসিবার ঘরে। বৈঠকখানার সামনেই তিনকড়ি দাঁড়াইয়াছিল। পুরাতন ভৃত্য। দরদ দেখানোর অধিকার থাকায় প্রথমেই আহাব হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। তাবাপদবাবু ভাবিলেন, উহা গৃহিণীর শেখানো বোল। পরে জানা গেল, বউঠাকুরপুত্র ও আজ সাবাদিন খান নাই। কেবল ঘব আব বাবান্দা কবিতাছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তিনকড়িকে বকিতাছেন, কর্তা কোথায় গিয়াছেন তাহার ঠিকানা রাখে নাই বলিয়া। ঠিকানা বাখিলেই বা কি লাভ হইত, তিনকড়ি যেন ইচ্ছা কবিলেই স্টুডিওর মত পীঠস্থানে ঢুকিতে পারিত। জানা দেবতার মন্দিরে প্রবেশাধিকার সোজা। দক্ষিণাব আডালে পুরোহিতকে মনোমত ঘুষ দিতে পারিলে পাপস্থলন ও দেবদর্শন কোনটিতেই বাধা নাই, কিন্তু অজানার দেহরক্ষী কি ভাবে পথ আগলায় এবং কোন প্রকাবের ঘুষ তাহার মনঃপুত হয় তাহা একমাত্র প্রজ্ঞাধারীই জানেন। স্তবরাং তিনকড়ির মত মাছুষের পক্ষে ওই পথ যে রুদ্ধ তাহা অতিবড় বোকাও বলিয়া দিতে পারে। যাক, ওসব কথা ভাবিয়া লাভ নাই। এখন অবসাদ ও ক্লান্তিকে জয় করিতে হইলে গৃহিণীর সতীনকে কাছ ডাকিতে হয়।

সতীন বলিতে উপস্থিত ওই ছাইভস্মকে বোঝায়। খোশ মেজাজে থাকিলে উত্তেজক তরলকে গৃহিণী সতীন বলিতেন। বিচার করিয়া দেখিলেন উগ্রতবলের সহিত সোহাগ কবিতা হইলে মনকে পুবাপুবি মজাইতে হয়, মজা মন আব যাহাই হউক আতঙ্ক নয়। দুঃখের বোঝায় ক্লান্ত শরণাপন্নকে কখনও প্রত্যাখ্যান করে না। আজ দুঃখের সহিত বোকাপড়ার জন্ত মনকে সব দিক দিয়া প্রস্তুত কবিতা ফেলিয়াছেন। প্রস্তুতির কথা মনে আসিতেই মাথায় নানা চক্রান্ত ঘুরিতে লাগিল। স্বযোগ-অসুস্থদানী আত্মঘাতী যেন নিভূতে চক্রান্তের কথা জানিতে

পারিয়াছিল। কানের কাছে চুপি চুপি বলিয়া গেল, মহাপ্রস্থানের জন্ত আয়োজন চলেছে, সাহস সংগ্রহ করতে পারলে আজই তোমার সব দুঃখের অবসান হবে। হিসাবের বোঝা আব বইতে হবে না। যাবতীয় কর্তব্য থেকে তুমি পাবে মুক্তি। খ্যাতি, অখ্যাতি, হিসাব, বেহিসাব, সংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা সব একাকার হয়ে যাবে। তুমি যে পথের যাত্রী সেখানে সব প্রত্যাশাই অচল।

তারাপদবাবু কিছুক্ষণ ধবিয়া কি ভাবিলেন। চিন্তারত মুখাবয়বে ক্লেশপূর্ণ হাসি আভাস ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। চবম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন।

তারাপদবাবু দুই একটা চুমুক দিয়াই বলিলেন, বাঃ খালি পেট না হলে এমন মজা পাওয়া যায়। আজ প্রবেশ সমর্থনও যেন প্রস্তুত ছিল—একনিঃশ্বাসে সমস্ত গেলাস খালি করিয়া দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। দেখিতে দেখিতে চোখ রক্তবর্ণ ও কপাল ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। তারাপদবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাঃ, এমন না হলে জমে। এতদিন নিজেকে ঠকিয়েছি, খাটিকে জল মিশিয়ে ভাজাল কবার মত বোকামি আব কিছু নেই। খাটিব কারবারই হল চরমকে নিয়ে। আজ দেখা যাক কে বাজী মারে। ওবে তিনকড়ে, আব এক গেলাস ভবে দে, বেণ মজা লাগছে। দ্বিতীয় পাত্র যখন তিনকড়ি কর্তাব হাতে তুলিয়া দিল তখন তাব চোখে জল। সে ভাবিতেছিল কেন এমনটি হল। দ্বিতীয় পাত্রও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইতে ঘন ঘন হেঁচকি টানের মাঝেই কর্তা বলিলেন, ওরে, হারমোনিয়ামটা নিয়ে আয়, বেজায় গান পেয়েছে, একটা গজলী কীর্তনে গলাবাজী কবে দিই।

বাডাবাডি হইতেছে দেখিয়া পুরাতন ভৃত্য নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া ঘব হইতে বাহির হইয়া গেল। বউঠাকুরবাণীর ঘরের নিকটে আসিয়া দেখিল দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সাবাদিন অনাহার আব দুশ্চিন্তায় হয়তো ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। কিছুক্ষণ শান্তিতে থাকুন। এখানে ডাকিয়া আনিলে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। তিনকড়ি ফিরিয়া আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বহিল।

আদেশ মানিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গৃহকর্তা চড়া গলায় জিজ্ঞাসা কবিলেন, দাঁড়িয়ে বহিলি যে, গজলী কীর্তন ভাল লাগে না? তোব ভাল লাগে না তো বয়ে গেল। হাজার হাজার লোকের ভাল লাগে। বন্ধ-অফিসের দিকে তাকিয়ে থাকলে গজলী কীর্তন আর হেঁচকি রাগ ছাড়া গতি নেই। ওরে বোকা, তাই তো ছ্যাচড়া স্বরেব বেয়াজ কবে নিচ্ছি। স্বরের দোড়ে বাজীমাত করতে চলেছি, তুই কোথায় ষোটক নৃত্য নেচে

বাহবা দিবি, তা না চুপটি করে দাঁড়িয়ে বইলি। চুলোয় যাক ঘোড়ার নাচ। তোকে একটা কিছু আনতে বলেছিলাম না? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পাঁজরার হাড় বেবকবা সেই যন্ত্রটা। কি নাম তাব, দুব, মনেও পড়েছে না।

তিনকড়ি বুঝল তিনি হারমোনিয়মের কথাই বলিতেছেন। উত্তরে জানাইল এ বাড়িতে হারমোনিয়ম সে কখনও দেখে নাই। যন্ত্রটি নাই শুনিয়া তারাপদবাবু বলিলেন, নেই তো বয়ে গেল, তুই একটা স্বব ধরে থাক। স্বব কেমন কবিয়া ধরিতে হয় তিনকড়ি জানিত না। বেচারাকে হতবুদ্ধি অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তারাপদবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এতদিন হইয়া গেল এমন একটি সমঝদার লোককে ঐতিকব ব্যাপাবটা শেখান নাই-কেন। ক্রটি সংশোধনের জন্ত তখনই তিনকড়িকে টান মারিয়া পাশে বসাইলেন। ফরাশের উপর কর্তাব সহিত একাসনে বসিতে সে ইতস্ততঃ করিতেছিল কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য কবাব অবস্থা কর্তাব ছিল না। তিনকড়ি জডসড হইয়া বসিতে তাবাপদবাবু দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া হাঁ করাইলেন—তাহার পর বলিলেন, আ-আ-আ কবে আওয়াজ বাব কর।

আদেশ পালিত হওয়ায় তিনকড়িও গলা হইতে যে স্লেম্মাজ্জডিত ঘডঘড ধ্বনি বাহির হইল তাহা প্রায় মৃতপ্রায় ব্যক্তির শ্বাসের মত। শ্বাসের শব্দও এক পদায় না থাকায় তারাপদবাবু চটিয়া উঠিলেন। ধর্মক দিতে গিয়া দেখেন তিনকড়ি কাঁদিতেছে। মধ্যবয়স্ক একটি পূর্ণকায় মানুষকে শিশুর মত কাঁদিতে দেখিয়া গৃহকর্তা হাসিয়া গড়াগড়ি।

হেঁচকির ধাক্কায় হাসির উচ্ছ্বাস হঠাৎ থামিয়া গেল। উন্মাদের মুখাবয়ব বিভিন্ন উচ্ছ্বাসে যেভাবে ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন কবিয়া থাকে ঠিক সেইভাবে হাসির পরিবর্তে তারাপদবাবুর মুখে উপর কালিমাব আবরণ পড়িয়া গেল। নিবিষ্টচিত্তে ক্রন্দনবত তিনকড়িকে দেখিতে লাগিলেন, সত্যই গণ্ড বহিয়া অবিবাক্য অশ্রুধারার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। যাহা দেখিয়া একটু আগে হাসিয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন তাহাই অস্তুব নিষ্পেষিত করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির করিয়া আনিল। জড়িত ভাষায় তারাপদবাবু বলিলেন, চোখেব জলটা ঝাঁটাই মনে হচ্ছে। ঝাঁটি সব সময় জুলন্ত বস্তু, অপব্যয় ভাল নয়।

তিনকড়িকে উদ্দেশ্য করিয়া অপব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ না

দিয়া পাবিলেন না। জানাইলেন, তোব চোখেব জলে আমার স্বার্থ আছে। তাই বলি কিছু জমিয়ে রাখ, পরে আমার জন্তেই কাজে আসবে। উপস্থিত স্বব ধবায় যখন অত অসুবিধা তখন স্ববার সেবাটা বাদ দিস না। প্রভু-ভক্তিতে পুণ্য আছে জানিস তো। পুণ্যের হিসাবে গলদ বাখিস না, লোকমান হবে তোরাই।

এতক্ষণে কথা বলিবাব জন্ত আর একজনের প্রয়োজন মনে কবিলেন না, আপনামনেই নিজের সহিত কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—বেটা তিনকড়ের নামটাও উইলে পুরে দিবেছি। বাকি জীবনটা আরচাকরি কবে খেতে হবে না। বোকামিও দিকটাও বেটার বেজায় খাটি। ওকে সব বলেছি তবু আমাকে জীইয়ে রাখার জন্তে কি আশুভিক চেষ্টা। বোকা না হলে এমন কাজ কেউ করে? মানুষের মন হরদয় বদলাচ্ছে, কোন কারণে উইল যদি বদলে ফেলি, তখন ওব কি হবে?

বোকাব ভবিষ্যৎ কি হইবে সে বিষয়ে খেয়াল ছিল না। সে কেবলই ভাবিতেছিল বউঠাকরণ এইদিকে আসিয়া পড়িলে সবদিক রক্ষা হয়।

তাবাপদবাবু হঠাৎ কোন বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, ইস, আবার সেই বেদনাটা তেড়ে এসেছে। ওব সঙ্গে অনেকদিনেব প্রেম, ঠিক সময় ফিরে এসেছে। তাঁহার চিন্তা সবাক হইয়া উঠিয়াছিল, বলিতে লাগিলেন—সিন্দুক খুললে সামনেই গৃহিণী উইলটা দেখতে পাবেন। এই সময় তাঁহার মুখে স্নিগ্ধ ও শান্তভাবে দেখা দিয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন উইল পড়িলে গৃহিণী আব অনাথ আশ্রমেব চিন্তায় অস্থির হইবেন না। আত্মসাত্বনায় যেটুকু বেদনার উপশম হইয়াছিল তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। অসহ যন্ত্রণায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পা তখন টলিতেছিল। অনির্ভরশীল অঙ্গ দুইটি দেহেব সমভাব সামলাইতে পারিল না, একেবারে ছমডি খাইয়া পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন। মাথাটাই সর্বাগ্রে পড়িয়াছিল। পবক্ষণে দেখা গেল খেতপাথরে বাঁধানো মেঝে বস্ত্র-রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। শুধু মাথা ফাটে নাই, নাক ও মুখ দিয়াও বলকে বলকে রক্ত বাহির হইতেছে।

তাবাপদবাবু সংযমেব খ্যাতি সংগ্রহ না করিতে পারিলেও বৈষয়িক হিসাবটা শেষ পর্যন্ত ঠিক রাখিয়া ছিলেন।

ভাগ

মানবেন্দ্র পাল

এ পাড়ার চেঞ্জারদের ঘুম আসে ঘোড়ার-দলাই-মলাই
শুনতে শুনতে—তাদের ঘুম ভাঙেও ওই শব্দে।

প্রথম প্রথম বিরক্তি ধরে—তাবপর্ণর সহ্য হয়ে যায়।

ঘোড়া একটি; তাব মনিবই বল, সহিসই বল তাও
একটি। কিন্তু হাঁকডাকে অস্থির। হাঁকডাক একা
রজ্জুই করে। ঘোড়ার নাম ধরে ডাকে, তাকে গান
শোনায়, খটাস খটাস করে বাতাসে চাবুকেব শব্দ কবে,
দমাদম হাতুড়ি পিটোয় চাকার ডিলে নাট-বন্ট তুতে।

তবু চেঞ্জাররা সহ্য করে, কারণ পাড়ায় এই একটিমাত্র
টান্কা। কোথাও যেতে-আসতে হলে রজ্জুকে একটু
জানালেই হল। ঠিক সময়ে গাড়ি এনে লাগাবে দোব-
গোড়ায়। এ স্ববিধেটুকু চেঞ্জারদের পক্ষে কম নয়।

একে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার বাইরে এই অঞ্চল।
বাজার এক ক্রোশ দূরে, স্টেশন সিনেমা-হল, মিষ্টির
দোকান এমন কি বারোষারি পূজোতলাটিও দেড় মাইলের
কম নয়। পাড়ায় রজ্জু না থাকলে যে কী অবস্থা হত
কল্পনা করা যায় না। তা ছাড়া রজ্জুর নিজের প্রতি

যেমন, তেমনি তাব গাড়ি আর ঘোড়ার প্রতিও স্বস্তি
অপরিসীম। কালো রঙের ঘোড়াটি। নধর চেহারা।

গায়ে একটি মাছি বসবাব জো নেই। টান্কাটিও তেমনি—
যেন কুরুক্ষেত্রের বীর যোদ্ধাদের রথ। সবুজ রঙ। সে
বঙ রজ্জু নিজে হাতে কবেছে নিপুণ শিল্পীর মত। প্রতিদিন
ধোওয়া-মোছা—গাড়ি যেন বাকবাক করে। পাড়ার
লোকে ঠাট্টা কবে বলে, গাড়ির রঙ, ঘোড়ার পিঠ-আর
রজ্জুব চুল তিনটিই যেন পালিশ কবা।

কথাটা খুব মিথ্যে নয়। আসলে রজ্জু হচ্ছে শিল্পী,
বিলাসী তরুণ। সে টান্কা চালায় কিন্তু গাড়োয়ান নয়।

অবস্থাবিপাকে সে আজ-টান্কাব ব্যবসাস কবেছে, কিন্তু দশ
বছর আগেও সে বাবার সঙ্গে টান্কাষ চড়ে ইস্কুলে গিয়েছে।
সে এক যুগ গেছে।

বাবা কাজ করত বেলে। টাকা আসত ঘরে।

পাকা বাড়ি করেছিল এই চাকবির টাকাতেই। সেই
বাড়িটুকুই আজ ওদের মাথা গোঁজার সম্বল। বাপ মবে
গেল একদিন ট্রেন থেকে পড়ে। কী করে পড়ল তাও কেউ
বলতে পারে না। বাপও মরল, সংসারেও ধরল ভাঙন।
অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। কী কষ্টে তাদের মা যে তাদের
বডমড করে তুললে তা এক সেই মা-ই জানে। কিন্তু
ছেলেবা বড় হবামাত্র যে যাব পথ বেছে নিয়ে দূর-দূরান্তরে
ছড়িয়ে পড়ল। তাদের জন্তে যেমন তাদের মাকে ভাবতে
হয় না তেমনি তারাও কেউ ভাবে না মায়েব জন্তে।
শুধু পালাতে পারে নি ছোট ছেলেটা এই রজ্জু। কাবণ
তখনও তার পাখা গজায় নি।

দারুণ দুববস্থা। কী করে যে সেই বিধবা মহিলা
দিন চালিয়েছেন—ওই রজ্জুকে মানুষ করে তুলেছেন—
তা তিনিই জানেন। রজ্জুও বোধ হয় বোঝে না।
পড়াশোনা হল-না, বয়ে যেতে-বসল অল্প, বয়েস থেকেই।
তাই ছেলের বয়েস কুড়ি হতে না হতেই মা ব্যস্ত হলেন
ছেলের চাকরির জন্তে। জাতিতে এরা খ্রীষ্টান, সেই
স্বপারিশে অনেক চেষ্টা করলেন তার মা—কিন্তু কিছুই
হল না। শেষে পুঁজিপাটা ভেঙে কিনে দিলেন একটা
টান্কা আর ওই ঘোড়া। যা আসে দু-পয়সা। রজ্জু খুশী
হল। তার স্বপ্ন ছিল, বড় হয়ে ড্রাইভার হবে ট্রেনের।
আপাততঃ হল গাড়োয়ান। মন্দ কী! কুড়ি বছরের
নওজোয়ান, কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, তেল-চুকচুকে লম্বা
ব্যাকত্রাশ চুল, সুরু গোঁফের রেখা কালো রঙের আড়ালে
যেন আত্মগোপন করে আছে। পুরনো ট্রান্স খুলে বাপের
ফুলপ্যান্ট কোট বের কবে ছোট্ট ছোট্ট নিয়ে নিজেই ব্যবহার
করছে এখন। ভোববেলা উঠে ভাল করে মুখ ধুয়ে তা
খেয়ে ফুলপ্যান্ট মার্ট বুটজুতো পবে রজ্জু গাড়ি ছোতে।
তাবপব ডান পায়েব ওপর এমন কায়দায় ভর দিয়ে
লাফিয়ে টান্কা উঠে বসে যেন কত বড় খেলোয়াড়।
চাবুক মাবতে হয় না। লাগামটা ধরে একটু নাড়ানই

ঘোড়া ছুটেবে। সাঁওতাল-পবগণার পাথুরে বাস্তা, বিশেষ কবে এই মিউনিসিপ্যালিটির সীমান্তটুকু। কিন্তু বজ্রুব ঘোড়া অভ্যস্ত। সে ঝড়েব মত ছুটে বেরিয়ে যায়। বজ্রু মনে মনে ভাবে—সে যেন তুফান মেলের ড্রাইভার। স্পীড বাড়ছে তো বাড়ছেই। ত্রিশ—চল্লিশ প—ঞ্চা—শ ষা—ট মাইল ঘণ্টায়। রাস্তাব দু পাশেব লোক ভয়ে সবে যায়। এ কী কাণ্ড। গাড়োয়ানটা নেশা করেছে নাকি।

ছোট দাবোগা একদিন তো বলেই বসল, সায়েব, একটু হুঁশিয়ার হয়ে চালিও। কোন্ দিন বিপদ না ঘটে।

কিন্তু তুফান মেলের ড্রাইভাব কখনও লেভেল-ক্রসিংয়ের গেট-ম্যানেব উপদেশে কান দেয় না। তাব লক্ষ্য শুধু লাইন ক্রিয়ার আছে কি না।

কুড়ি বছরের ছেলে। চোখে তার চিরচঞ্চলতা। মন তার চিরঅস্থির। কী যে সে চায়, কী না চায়, কী পেলে খুশী, কী না পেলে দুঃখী তা বোধ হয় সে নিজেও জানে না। পয়সা উপায় করে মন্দ না। সব এনে দেয় মায়ের হাতে। দয়া কবে নয়, স্ববোধ ছেলেব মত মায়ের দুঃখে দুঃখী হয়ে নয়, টাকার ভার তার সহ হয় না বলে। যতক্ষণ না দিয়ে দিতে পারছে ততক্ষণ স্বাস্থ্য হতে পাবে না। আর তার মা, তিনি একটি একটি করে আনি সিকি দোয়ানি দেখে নেবেন, বাজিষে নেবেন। অল্প দিনের চেয়ে ভাড়া কম হলে চিংকার করে পাড়া মাথায় করবেন—নিশ্চয় কোথাও আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল, পাঞ্জি বদমাশ।

এসব কথায় বজ্রু কান দেয় না। মিথ্যে কথা বলার ধার ধারে না। মা যখন গাল দেয়, ও তখন শিস দিয়ে গান কবে চলতি হিন্দু ছবির।

কিন্তু বজ্রুর দুর্বলতা এক জায়গায়। সে হচ্ছে ওই ঘোড়া। জীবনে এই বোধ হয় তাব প্রথম ভালবাসার পাত্র। বাপকে মনে নেই, দাদাবা ত্যাগ কবে গিয়েছে, মা কষ্ট কবে মানুষ কবেছে ঠিক, কিন্তু মায়ের ভালবাসার সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। কাজেই সেও কাউকে ভালবাসতে পারে নি। কিন্তু এই ঘোড়াটা যেন তার সবটুকু ভালবাসা কেড়ে নিয়েছে। তার কালো কালো ~~কালো~~ দুটো কী জীবন্ত! ও চোখের ভাষা বজ্রু বুঝতে

পারে। তাই ঘোড়াকে চান কবানো, দানা খাওয়ানো, দলাইমলাই, আদর-আপ্যায়ন সব তার নিজে হাতে। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, এক এক দিন গভীর রাত্রে চাঁদনী রাতে মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতে বজ্রু অনর্গল কথা কয়ে গেছে ঘোড়ার সঙ্গে। সে সব কী কথা, তা-তো লিখে বোঝানো যায় না।

আজ তোর খুব কষ্ট হয়েছে, না রে?

কী করব বল? মোটা ভাড়া।

আচ্ছা, কাল বেলা কবে বেরোব।

কিন্তু মাটা যা চেষ্টা।

চল, পালাবি? যে দিকে দু চোখ যায়?

কিন্তু, উঃ! মাটা? মবলে বাঁচি!

স্বল্প বাত্রে পাথরের গায়ে ঘোড়ার খুরেব শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়—খটাখট-খটাখট-খটাখট।

শহরের প্রান্তে এই অঞ্চলটা একেবারে নির্জন। পাশেই ঝিঝির করে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী। তার ওপারে চড়াই-উৎরাই। দিগন্তে অস্পষ্ট নীল পাহাড়ের শ্রেণী আর নীল আকাশ মিশে গেছে গলাগলি হয়ে। একশ্রেণীর চেঞ্জাবদেব এই জায়গাটা তাই পছন্দ বেশী।

এ অঞ্চলে খ্রীষ্টানদেরই বাস। দরিদ্র অল্প-শিক্ষিত খ্রীষ্টান পরিবার। প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গেই লতায়-পাতায় একটা যোগসূত্র আছেই। বজ্রু কিন্তু এই সব আত্মীয়দের ধার ধারে না। সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত গাড়িই চালায়। তারপর খেয়েদেয়ে বিশ্রাম। আবার তিনটে থেকে বাত নটা দশটা, এমন কি তেমন ভাড়া পেলে রাত বারোটা পর্যন্ত। যতটুকু সময় পায়, তখন নিভুতে চলে ঘোড়ার পরিচর্যা। বাড়িব বাইরেও তার সঙ্গী এই ঘোড়া। বাড়ি ফিবে এলেও এই ঘোড়া। আব কাবও সঙ্গে তাব কথা নেই, আব কাউকে সে চায় না, আব কাউকে সে ভালবাসে না।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল। এই পাডাতেই তার পিসিমার বাড়ি। হঠাৎ একদিন গিরিডি থেকে এল একটি মেয়ে তার বউদিব সঙ্গে বেড়াতে। কালোকালো ছোটখাটো মেয়েটি। প্রথম যৌবনেব জোয়ার তাব ক্ষীণ দেহটির ওপর যেন আকুলি-বিকুলি কবছে। মেয়েটির রূপও নেই

শুণও নেই। তা না থাক, কিন্তু এমন কিছু আছে যা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না! রজ্জু দুদিন লম্বা কবল। তারপর এক দিন সন্ধ্যার সময়তেই গাড়ি নিয়ে ফিরে এল। ঘোড়া খুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ফুলপ্যাণ্ট আর বুটজুতো পরে একটা সিগারেট ধবিষে মস্‌মস্‌ কবে গিয়ে হাজির পিসিমার বাড়ি।

পিসিমা।

পিসীমা অবাক হয়ে বলল, কী রে, হঠাৎ।

মেয়েটি বসেছিল পিসিমার কাছেই। উল বুনছিল। পিসিমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মেয়েটির দিকে এক বলক দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে বলল, এ মেয়েটি কে পিসিমা? বেশ তো।

পিসিমা হেসে বলল, এক নজবেই মনে ধবে গেল নাকি? ও বউ, কোথা গেলে, শোন শোন।

ঘব থেকে আব একটা যুবতী বেবিষে এল।

এ কে হয় তোব জানিস-তো? বউদি। গিরিডিতে থাকে, যোগাযোগ বাখিস না তো, চেনা হবে কী করে!

রজ্জু লাফিয়ে এসে বলল, এবার থেকে খুব যোগাযোগ রাখব। বউদি, তোমার এই মনটিকে কিন্তু আমার বেশ লাগছে।

মেয়েটি ঘব থেকে চলে গেল না বটে, কিন্তু উল বোনাও আব হল না। মাথা নীচু কবেই কাঁটার মধ্যে ঘর গুন্নতে লাগল।

বউদি মিষ্টি হেসে বলল, পছন্দ হয়েছে? বেশ তো।

আমি ওকে বিয়ে কবব।

মেয়েটির মাথা আরও নীচু হয়ে গেল, বউদি অবিখাসের হাসি হাসতে লাগল। পিসিমা বলল, একবার বন্ গে না তোব মায়েব কাছে, কাঁটা মেরে তাড়াবে।

রজ্জু রেগে বলল, আমি কাবও পবোষা কবি না পিসি। আমি এখনই একে নিয়ে চলে যেতে পাৰি।

বলতে বলতেই মস্‌মস্‌ কবে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা ধবল। সেই অতর্কিত আক্রমণে উল কাঁটা খসে পড়ল মেয়েটির হাত থেকে। বউদি বিস্ময়ে স্তম্ভিত। পিসিমা হাসি চেপে তিবস্কাব কবল, ছাড় শীগ্গিব হতভাগা, নইলে দেব এখনি তাড়িয়ে।

রজ্জু বিজয়ী বীরেব মত সেই হাতখানি ধবে একটু তুলিয়ে ছেড়ে দিল। তাবপর হাসতে হাসতেই আর একটা সিগারেট ধবিষে বলল, আচ্ছা, আজ চললাম। আলাপ হল। বউদি, আমায় একটু মনে রেখ। টা টা।

এই বলে ঝড়ের মত বেবিষে চলে গেল।

বেশ জমে উঠেছে। এখন বেলা এগাবোটা বাজতে না বাজতেই গাড়ি তুলে দেয়। কোনবকমে হাতমুখ ধুয়েই পিসিমার বাড়ি। ওখানে বুবু হাতে চা। ওদিকে

সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার আড্ডা। পিসিমার বাড়িব কম্পাউণ্ডের মধ্যে ইউক্যালিপটাস গাছেব নীচে একটি শান-বাঁধানো বেদী আছে। সেখানেই বুবু সন্ধ্যা নিভৃত মিলনপর্ব। সন্ধ্যা থেকে বাত নটা-দশটা পর্যন্ত মধুচক্র। চলে আসবার সময় একবার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বুবুকে একটু আদব। বুবু লজ্জায় ভয়ে কাঁঠ হয়ে যায়। বজ্জু দু হাতে তাকে কাঁকানি দিয়ে বলে, এত ভয় কিসের? তোমাকে তো বিয়ে কবব।

বুবু বিশ্বাস করে না। বলে, মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা। এই তোমার বুকেব ক্রশ ছুঁয়ে বলছি, বিয়ে কবব—বিয়ে করব—বিয়ে কবব।

এ যেন কেমন নেশা হয়ে উঠেছে। রোজ বুবুকে দেখা চাই—শুধু দেখা নয়, কাছে পাওয়া চাই—শুধু কাছে পাওয়া নয়, আবও কিছু চাই।

এদিকে রজ্জুব মা চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। ছেলেব গাড়ি চালানোয় মন নেই। আঁষ পড়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার দিকে যত্ন নেই। কী হল? দিনরাত কেন ও-বাড়িতে আড্ডা? বুঝতে বাকি রইল না। পাড়া মাথায় করে গালাগালি দিলেন নিজের ছেলের সঙ্গে ননদেব সঙ্গে নবাগতা কস্তাটির সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রেব সূত্রে গেঁথে। রজ্জু শিস দিয়ে গান করে। মায়েব কথা কানেই যায় না। রাগ হলে বলে, আমি থাকব না এখানে।

মা বলে, এখনি দূর হয়ে যা হারামজাদা।

ছেলে বলে, যাবই তো, আব দুদিন সবু কব।

সেদিন বজ্জুর হঠাৎ নজবে পড়ল ঘোড়াটা যেন কেমন রোগা হয়ে গেছে। চমকে উঠল। তাই তো আজ কদিন স্নান করানো হয় নি—ভাল করে দলাই-মলাই করা হয় নি। দুটো কথাও বলা হয় নি ঘোড়ার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি, দানা আনতে গিয়ে দেখে—দানা নেই। ফুরিয়ে গেছে কাল বিকেলেই। খুব লজ্জিত হল। ঘোড়াব কাছে এসে বলল, জানি, খুব বাগ কবেছিস। আমার খুব অস্বাভাব হয়ে গেছে।

ঘোড়াব কালো চোখ দুটো যেন কেমন করুণ হয়ে উঠল। কান দুটো নাড়াল একবার—লেজটা দোলাল।

না না, ও মেয়েটার ওপর বাগ করিস নে। ওকে একটু একটু ভালবাসি বটে—কিন্তু তোর মত নয়।

এই বলে অনেকদিনের মত আজও রজ্জু পিঠ খাবড়ে দিল ঘোড়াটার।

ঘোড়াটা আবার একবার লেজ নাড়ল।

এক মাস পরের ঘটনা।

চুপচাপ বসে আছে রজ্জু। বেশীভ ভাগ সময় বাড়িতেই থাকে, সন্ধ্যার পর চুপিচুপি যায় পিসিমার বাড়ি। সে রজ্জু আব নেই। সে উজ্জলতা নেই, শিস

দিয়ে গান গাওয়া নেই, প্রাণ নেই। এখন কেবল দু চোখে ভয়াবহ দৃষ্টি। কোনও নতুন লোক দেখলেই কেমন যেন চমকে ওঠে। বাড়ির কম্পাউণ্ডে পেয়ারাগাছ-তলায় টাঙ্গাটা পড়ে আছে। গাড়ি আর চলে না। আস্তাবলে ঘোড়াটা বুথাই চিঁহি চিঁহি কবে ডেকে মবে। কেউ তাব কাছে যায় না। বজ্জুব মা কেবলই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন—টাঙ্গার খন্দের চাই। আজ পোলে আজই বেচে দেবেন। এই কদিন কোনও আশ নেই, অথচ ঘোড়াকে খাওয়াতে খাওয়াতে সর্বস্বান্ত হবার যোগাড়। খন্দের জুটেও ছিল। কিন্তু রজ্জু বেচতে দেয় নি। কেন? তার উত্তরও দেয় নি। এই নিয়ে নিত্য ঝগড়া চলেছে মায়ে ছেলেতে।

এক মাসের মধ্যে এই পবিত্রতনটা ঘটল একটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একদিন বিকেলে বজ্জু বুবুকে পাশে নিয়ে টাঙ্গায় বেড়াতে বেরিয়েছিল। সেদিন রজ্জুর মেজাজটা ছিল একেবারে ধরা-ছোঁওয়াব বাইরে। একে সে তুফান মেলের ড্রাইভার, তার ওপর পাশে তাব প্রিয়তমা। মনে করা যাক ওকে নিয়ে সে পালাচ্ছে অনেক দূরে। ইঞ্জিনে ফুলস্পীড। ঘণ্টায় ষাট মাইল। বাড—বাড বইছে যেন। তাকে জড়িয়ে ধরুক না বুবু। ওই তো পাখির মত হালকা শোলা মেয়েটা!

সত্যি সত্যিই গাড়ি ছুটছিল, বুবুও ভয় পাচ্ছিল। যত ভয় পাচ্ছিল ততই বাড়ছিল রজ্জুর উৎসাহ। জোরে, আরও জোরে—

ঠিক এই সময়েই ঘটল দুর্ঘটনা। একটা বুড়ি চাপা পড়ল তার টাঙ্গার নীচে। তখন টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল রজ্জু। কিন্তু বাঁচানো গেল না।

ছোট দারোগা পরামর্শ দিল, সায়েব, গা-ঢাকা দাও। আমরা দেখছি তোমায় বাঁচাতে পারি কিনা।

কিন্তু বুবুকে ছেড়ে একটা দিনও তাব বাইবে থাকার উপায় নেই। তাই সে বাইরে গেল না বটে তবে গা-ঢাকা দিল বাড়ির মধ্যেই।

মা ভয়ে কঁদে কেটে অস্থির, বুঝি ছেলেব ফাঁসিই হয়। বললেন, আব দবকাব নেই টাঙ্গায়, এইবেলা বেচে ফেল। তা ছাড়া লাইসেন্সও কেড়ে নেবে ওরা।

বজ্জু এর কোন উত্তর দেয় নি।

বুবু একদিন বলল, একটা টাঙ্গা নিয়ে মায়েব সঙ্গে রোজ ঝগড়া, ওটা বেচে দিলেই হয়।

রজ্জু মাথা নীচু করে বলল, বেচতে তো হবেই।

তবে?

এখানে কারও কাছে বেচব না।

কেন?

পাগল! আমার ওই টাঙ্গা চালাবে আর একজন। আমাব ওই কালুকে চাবুক মাববে অল্প গাড়োয়ান! এ দৃশ্য আমায় দেখতে হবে।—বলতে বলতে হঠাৎ রজ্জু উঠে দাঁড়াল। চোখ ফিরিয়ে নিল।

তবে কি কববে?—বুবুর স্বরও যেন কেমন কান্না-ভেজা।

যদি বাইরের কোন খন্দের পাই তবেই বেচব।

বুবু হঠাৎ বলে উঠল, বাইবেব খন্দের। গিরিডিতেই আমাব জ্যাঠামশাই আছেন, তিনি টাঙ্গা কিনবেন বল-ছিলেন। চল, যাবে?

রজ্জু একবার বুবুর দিকে গভীরভাবে তাকাল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, ই্যা, যাব।

দবদস্তব হয়ে গেল। বুবু জ্যাঠামশায়ের খুব পছন্দ হল ঘোড়া আর টাঙ্গা দুই-ই। কিন্তু রজ্জুর মোটেই পছন্দ হল না মানুষটাকে। দেখলেই মনে হয় ভয়ানক রাগী। ঠিক যেন তাদের দেশের বারোয়ারি-তলাব দুর্গাঠাকুরেব অস্থর। ওই অস্থবেব হাতেই ঘোড়াটাকে দিয়ে আসতে হল শেষ পর্যন্ত।

খুশি তো?—পানেব ছোপ-ধবা দাঁত বার কবে হাসল বুবুর জ্যাঠামশাই।

বজ্জু উত্তর দিল না। নোট কটা গুনেও দেখল না। কোনরকমে বুকপকেটে গুঁজে ফিরে চলল। না, ঘোড়াটার দিকে আর ফিরে তাকাবে না। ওই যে ডাঁকছে, ওই ডাকের অর্থ একমাত্র বোঝে রজ্জু। কিন্তু আব বুঝেই বা লাভ কী? বজ্জু আগঘে চলল স্টেশনেব দিকে হাঁটতে হাঁটতে। হেঁটে হেঁটেই যেতে হবে স্টেশন পর্যন্ত, তাবপব ট্রেন। আসবার সময় এসেছিল পাকা বাস্তা ধরে টাঙ্গায়। সঙ্গে ছিল বুবু আর তাব বউদি। এই তার জীবনে নিজের টাঙ্গায় শেষ চড়া, বুবুব সঙ্গে এই তাব শেষ সান্নিধ্য।

বেলা এখন একটা।

মনে পড়ল, টাঙ্গা বেচে বুবুদের বাড়ি যাবাব কথা ছিল। ওখানেই নাওয়া-খাওয়া হবে। বুবু এখনও তাব পথ চেয়ে আছে। থাকুক সে। কী হবে! আব তো কখনও গিরিডি আসবে না সে! নতুন ভয় সৃষ্টি হয়েছে; যদি কোনদিন গিরিডি স্টেশনে নেমে চোখে পড়ে যায় তাবই টাঙ্গাটা, আর সেই সঙ্গে চাবুক-খাওয়া হাড়-বের-করা মুমূর্ষু একটা ঘোড়া!

দ্বান্দ্বিক

[৫৮৪ পৃষ্ঠার পূর্ব]

কিছুক্ষণ।

কিছুক্ষণ পরে ওষ্ঠদ্বয় ফাঁক করে মোটা হাসি বেবিযে
এল হীরকেব-মুখেব ওপব। ভাল হল না কাজটা।

পবমুহুর্তে আবার প্রায় চিৎকার করে উঠল, না।
পারব না আমি। না। যা-হয় হোক।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল হীরক। শব্দগুলো
সত্যিই মুখ দিয়ে বেবিযেছে কিনা বুঝতে পারল না।

স্বরীতি পর্দাটা ফাঁক করে দেখে নিল ভিতরটা।

বিস্মিত মুখে ভেতবে চুকে হেসে বলল, কি না—ঠাকুরপো ?
আমি ভাবলাম কার সঙ্গে ঝগড়া করছ।

অকুণ্ঠিত হল হীরকেব। মুহুর্তে বলল, কিছু না—
এমনই।

তা হলেই ভাল।—স্বরীতি লক্ষ্য কবে বিবত হল।
রান্না হয়ে গেছে, চান কববে চল।

কোটে যাব না আজ। তুমি ভেতরে যাও বউদি।

থমকে দাঁড়াল স্বরীতি। চোখ ছিলছিল হয়ে উঠল।

আঃ, যাও না।—হীরকের অধীর কণ্ঠ নির্মম তীরের
মত ছুটে গেল।

আহত শুদ্ধ মুখখানা ছু হাতে ঢেকে বেরিয়ে গেল

স্বরীতি।

অসীম বিরক্তি কাটিয়ে-অল্পতপ্ত হল হীরক। ভিতরে
গিয়ে স্বরীতিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তার ঘরে
চলে গেল। স্বরীতি বসেছিল বিষন্ন ছবিব মত।

হীরক স্বরীতিব একখানা হাত টেনে-তুলে দুই হাতের
মধ্যে ধরে বলল, আমাকে মাপ কর বউদি। আমাব
শরীরটাই বোধ হয় ভাল নেই। নানা কাবণে এত
চঞ্চল আছি। কাকে কি বলছি নিজেই জানি নে।

স্বরীতি অকস্মাৎ হীরকের হাতের ওপর মাথাটা
রেখে ঝরঝর কবে কেঁদে ফেলল। হীরকের চোখও
ঝাপসা হয়ে গেল।

ক্ষণকাল পরে সম্ভর্ণনে মাথাটা তুলে দিখে হাত সরিয়ে
নিল হীরক। স্বরীতি ভেজা চোখ হীরকেব ওপর মেলে

ধবে বলল, তা হলে তুমি চল, চান করে খেয়ে নাও।
খেয়েদেয়ে ঘুমোও আজকে বাড়িতে।

হীরক বলল, তাই কবব। সারাদিন ঘুমোব আজ।
খোকন কোথায়? দেখছি নে যে।

ইস্থলে চলে গেছে।—স্বরীতি আঁচল দিয়ে চোখ মুখ
অকারণে আবার মুছল। হেসে বলল, ওর ইস্থল তো
সকলের আগে শুরু হয়। চল।

* * *

পবের দিন সকালে বেরবার মুখে হীবক স্বরীতিকে
ডেকে বলল, আজও কোটে যাব না বউদি। আজ
কেন, আর যাব না কোনদিনই।

স্বরীতি ভীত দৃষ্টিতে নীরবে এক পলক তাকিয়ে
থেকে শেষে সামনে এসে বলল, কি হয়েছে তোমার
ঠাকুরপো ?

কিছুই হয় নি। ওকালতি আর কবব না।

তা হলে কি কববে? কি কবে চলবে?

যা কবে হোক। না চললে কি করব। আমি
আব চলতে পাবছি না।

হাতের টাকাগুলো হুদিনে নিঃশেষ হয়ে যাবে যে।

যাক।

হীরক চলে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে বেগে হাঁটতে
শুরু কবল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার টিল দিল
বেগে। কোথায় যাব এখন? প্রশ্ন করল নিজেকে।
ভাবতে গিয়ে মনটা যেন শূন্যে ঝুলে বইল। আশ্রয়
পেল না কোনখানে। আশ্চর্য, কোন গন্তব্যস্থান নেই।
কোন কাজ নেই। শরীরের মনের ধরবার মত কোন
অবলম্বনই নেই। তবে?

দম বন্ধ হয়ে এল হীরকেব। সভয়ে বেগে আবার
বাড়ির দিকে বওনা হল।

কোন কথা না বলে স্নান করে এসে হীবক বোকাব
মত একটু হেসে স্বরীতিকে বলল, যা হয় কিছু খেতে দাও

বউদি। কোর্টে একবার যেতে হবে। রান্না তো বোধ হয় হয় নি?

স্বরীতি একটু আডাল দিয়ে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। একটা স্বস্তি হাঙ্গি খেলে গেল মুখে। বলল, হয়েছে বান্না। আব পাঁচটা মিনিট সময় দাও। দেখতে দেখতে হয়ে যাবে।

খাওয়ার পরে ধুতি পাঞ্জাবি পরে কোর্টে চলে গেল হীরক।

দশ

শুধু চোব জুয়াচোব পকেটমাবই কোর্টে মামলা কবতে আসে যদি ধারণা হয়ে থাকে তোমার, তাহলে চিন্তার কথা।—বন্ধু শিবপদ দুশ্চিন্তার ভঙ্গীতে পিছনে হেলান দিয়ে বসল : ভাল লোক, সৎ লোকের বুঝি কোর্টে আসবার দরকার হয় না? তাহলে কেউ ঠকাও না কোনদিন? হুই পার্টিতে মামলা হয়, দুজনেই চোর হবে? ওকালতি তোমার ছেড়ে দেওয়াই তাহলে সঙ্গত হীক।—শিবপদ হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গী-করল মুখের : অজ্ঞাষটা একজন করে আর একজনের ওপরে—এ কথা বোঝাব মত সাধারণ বুদ্ধি তোমার ছিল বলে জানতাম। কি হল হীরক?

হীক চুপ করে গুনছিল। শিবপদ খামলেও কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করেই রইল। হঠাৎ মুখ তুলে যেন লক্ষ্য করল শিবপদ থেমেছে। একটুখানি হাসল হীরক। বলল, এ সব আমিও জানি শিবু।

আশা হল শুনে।—শিবপদ বিজ্রপ কবে উঠল।

হীক বলল, ভাল কেসও এক আধটা করেছি আমি। সেখানেও সত্যি চাপা দিয়ে মিথ্যে দিয়ে সাজাতে হয়েছে।

হবেই তো। সত্যকে রক্ষা করতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে তো দোষ নেই কিছু।

বল কি।

ও, তুমি সেই বাল্যশিক্ষার লাইনটাতে আটকে আছ বুঝি—মিথ্যা বলা বড় দোষ।

হীরক অহুভেজিত কণ্ঠে বলল, আটকে নেই। জানি আমি। ও তো বানানটা শেখা থাকলেই হল। দস্ত স আর তযে য ফল। ব ফলা নয়। আমার ভাইপো

খোকনকে মাস্টার এক দিন বলে দিচ্ছিল। কথাটা তা নয় শিবু। আমি আইনেব কথা বলছি। এমন আইন আর কতকাল থাকবে যেখানে সত্য কথা শব্দেব মার-প্যাচে আইনের কবলে পড়ে মার খাবে?

যতদিন না কোন ত্রাণকর্তা জন্মাচ্ছেন! তোমার ওপর ভবসা করা যাবে কি?—শিবপদ উঠে দাঁড়াল : মাথাটা তোমাব ঠিক নেই হীরক। আবোলতাবোল ধর্মবুলি বার হচ্ছে তোমার মুখ দিয়ে। খুব খারাপ লক্ষণ। চল, একটা ইন্টারেস্টিং কেস হচ্ছে, শুনি গে। ত্রাণকর্তা পরে হয়ো। চল।

শিবপদ হীককেব হাত ধবে টেনে তুলল : চোর বাটপাড় অসাধু সাধু সব মিশিয়ে পৃথিবীটাকে যদি গ্রহণ কবতে না পার তবে সরে দাঁড়াতে হবে হীক। নইলে ওরাই তোমাকে ঠেলে সরিয়ে দেবে।

আমি সবই দাঁড়াতে চাই শিবু।—হীরক ভারী গলায় বলল।

তার মানে জান তো? মরতে চাওয়া।

মরতেই চাই আমি ভাই। হাত ছাড়িয়ে জ্ঞতপদে সব গেল হীক। বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরে শিবপদ পাশে এসে হীকের কাঁধে হাত রাখল। ধীবে ধীরে বলল, তোর বয়সটা বড় পিছিয়ে আছে হীক। যাকে বলে অ্যাডোলেসেন্স, সময়টা এখনও কাটে নি তোব। নইলে এত ভাবালুতা এখনও থাকে?

হীরক একটু বিলম্বে হাসল। বেশ শুষ্ক হাসি। শিবপদ সম্ভষ্ট হল। হীক বলল, তোমার মত পাকতে পারলে বোধ হয় বেঁচে যেতাম। কি বল?

খুব।—সহাস্ত্রে বলে উঠল শিবপদ। তাই কর। আর একটু পাক ভাই। যদি বাঁচতে চাও—চল এখন। হীরককে টেনে নিয়ে গেল শিবপদ।

* * *

কিন্তু চাবটে বাজবার কিছু আগেই হীরক চঞ্চল হয়ে উঠল। শিবপদকে এড়িয়ে বেরিয়ে এল কোর্ট থেকে। জ্ঞতপদে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়িতে ঢুকে বাইরের ঘরেই গুম হয়ে বসে রইল। এত তাড়াতাড়ি কেন ছুটে এল বসে বসে ভাবতে লাগল। স্বরীতি সেখানেই চা জলখাবার এনে দিল বিনা বাক্য-

ব্যাযে। তৎক্ষণাৎ খেতে আরম্ভ করল সে। কিছুক্ষণের জন্তে বৈচে গেল যেন।

খাওয়া শেষ হলে স্বরীতি ভয়ে ভয়ে বলল, তুমি কি বাইরে বেরবে ঠাকুরপো?

কেন বল তো?—হীরক চমকে বলল।

যদি যাও, তা হলে আসবার পথে থোকনেব জামা-গুলো হল কিনা একটু খবর নিয়ে এস।

ও, ই্যা ই্যা। এখুনি যাচ্ছি আমি—কাজ আছে যখন।

আগ্রহেব সঙ্গে কাজ কবতে বেবিয়ে পড়ল হীরক।

* * *

পরের দিন সকালবেলায় বাইরের ঘবে বসে বসে হীরক নিজের মনটা অনেকখানি পরিক্ষাব দেখতে পাচ্ছিল। নরম হয়ে আসছিল সঙ্গে সঙ্গে।

মাছুষেব দোষ কি? কতকগুলো জিনিসেব মিশ্রফল বই তো নয়। পাবিপাঠিক ক্ষেত্র, উত্তরাধিকাবের রক্ত, শিক্ষা, ক্রযেডের সেক্স আর মাক্সের অর্থনীতিব অনিবার্য ফল এই মাছুষ! মাছুষেব দোষ কি!

নন্দলাল এসে বসল গম্ভীরমুখে।

নন্দলালকে দেখেই মাথার স্নায়ুগুলো হীরকেব টনটন করে উঠল একসঙ্গে। এমন কড়া পর্দায় বাঁধা হয়ে বইল যে একটু টোকা দিলেই বনবান কবে বেজে উঠবে অবচেতনায় নিজেবই ধারণা হল হীরকের।

কি—বলুন?—হীরকই প্রথম সন্ধ্যোদন কবল।

ব্যবসায়ী নন্দলাল নিজেকে দমন কবে প্রস্তুত হয়ে নিল। শেষে বলল, জয়গোপালবাবুকে আমিই আপনার কাছে নিয়ে এসেছিলাম।

আমি অল্পবোধ করেছিলাম কি?

আবাব সামলে নিল নন্দলাল: না, তা কবেন নি। তা বলে একজন ভদ্রলোককে আপনি অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন তা ভাবি নি। তাব অল্পবোধ—আপনাব মক্কেল হতে এসেছিল। একটা কথাও না শুনে যদি তাকে আপনি চোর বলতে পারেন, তবে তো আমাকেও আপনি চোর বলতে পারেন?

পারিই তো।

থ হয়ে গেল নন্দলাল। মুহূর্ত পবে শুধু বলল, পারেন।

হীরক একটু সংযত হয়ে কক্ষ কণ্ঠে বলল, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ নেই নন্দলালবাবু। উকিল অনেক আছে। আমাকে দয়া কবে রেহাই দিন আপনাবা। আমি আর পাবব না। এই কথা।

এই কথা?—ক্রুদ্ধ নন্দলাল এব বেশী আর বলতে পারল না।

ই্যা।—হীরক হাত জোড় কবল।

নন্দলাল দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, জয়গোপালবাবু ঠিকই বলেছিল। মাথার গোলমাল।

উত্তরে হীরক আব একবার হাতজোড় করল শুধু। নন্দলাল বেবিয়ে গেল।

এগারো

হীরক চলে গেলেও মালিকা নড়তে পারল না অনেকক্ষণ। আবক্ত মুখে দরজার কাছেই শুক হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। হঠাৎ এক সময় নিজেকে সেখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে টলতে টলতে বিছানাব ওপর উগুড় হয়ে পড়ে গেল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বংশীর ডাকে ধড়মড় করে জেগে উঠে অবাক হল মালিকা। ঘরে আলো জ্বলছে। সভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল হীরক নেই কোনখানে। চোখ দুটো বগডাতে বগডাতে মুচকে হাসল একটু। আশ্চর্য ঘুম!

বংশীকে উলুনে আঁচ দিতে বলে বসে রইল কিছুক্ষণ। অবণ ভাবী দেহটা যেন তুলতে পাবছিল না।

বিকেলের দৃশ্যটা গোড়া থেকে নিজের অংশসহ মনে পড়ে গেল। অদ্ভুত একরকম লজ্জার হাসিতে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। যে হাসি গোপনে শুধু নিজের কাছেই হাসা যায়।

অল্পক্ষণ পরেই গম্ভীর হয়ে উঠল। কান্না পেল মালিকাব। তাডাতাড়ি উঠে কাজে হাত দিল।

খেতে বসে শুভময় হেসে বললেন, কি ব্যাপার। অস্থখ বিস্ত্রখ কিছু হল নাকি তোমাব?

কেন?—মালিকা সতর্ককণ্ঠে পালটা প্রশ্ন কবল।

আজকে বেড়াতে যাও নি যে।

কে বললে তোমাকে?

বংশী অসময়ে চা নিয়ে গেল কি না। শুনলাম ওর কাছে।—শুভময় একটু কৈফিয়তের স্ববে বললেন।

মালিকা শুভময়ের সঙ্গে বাঁধা তারে বন্ধাব দিয়ে উঠলঃ ইচ্ছে হয় নি যাই নি। ইচ্ছে হলেই যেতাম।

যেতেই তো।—হীবক আজ আসে নি?

তোমার কাছে তাব কৈফিয়ত দেব নাকি?

বংশীকে আসতে দেখে শুভময় চুপ করে গেলেন।

* * *

পরেব দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে একটু বসেই আবার শুয়ে পড়ল মালিকা। নিঃফল নিরর্থক দিনটা যেন সামনে থেকে ঠেলে ফেলে দিল তাকে। চোখ বুজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ।

মনটা ক্রমে বিদ্রোহ করতে লাগল। পাবব না আমি। কিছু করতে পারব না।

বংশী চা নিয়ে এসে ডাকল।

টেবিলের ওপর রেখে যা।—চোখ বুজেই বলল মালিকা।

বংশী চলে গেলে চাযের কাপ দৃষ্টির সঙ্গে মালিকার মনটাকে আকর্ষণ কবতে লাগল। বেঁচে উঠল মালিকা। উঠে বসে চাযের বাটিতে অল্প অল্প চুমুক দিতে আরম্ভ করল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে মালিকা সেলাই নিয়ে বসল। আধ ঘণ্টাখানেক পরে সেটা ফেলে রেখে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘড়ির শব্দ কানে আসতেই কান পেতে শুনতে লাগল আর শুনতে লাগল। কিন্তু তিনবার বেজেই বন্ধ হয়ে গেল শব্দটা।

শুভ্র একাকীত্ব যেন বিযাক্ত গ্যাসের মত দম বন্ধ কবে ফেলছে মালিকার। উঠে আবার সেলাই নিয়ে বসল। কিছুক্ষণ দ্রুতগতিতে সেলাই কবে ক্লান্ত হয়ে হাতের ওপব মাথা রেখে বিশ্রাম করতে লাগল।

সহসা হুঁপিয়ে কান্দতে আরম্ভ কবল মালিকা।

বেশ কিছুক্ষণ কান্দবার পরে উত্তেজিত স্নায়ুগুলো প্রশমিত হলে শান্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

এমনি হাসি-কান্না নিদ্রায় আর দিন দুই কাটিয়ে ববিবাব দিন বংশীকে নিয়ে মালিকা হীরকের বাড়ি

উপস্থিত হল। বংশীকে বিদায় কবে দিল রাস্তা থেকেই।

হীরক শুয়েছিল বুকেব ওপর একখানা বই নিয়ে। কড়া নাড়ার শব্দে নিজেই দরজা খুলে দিতে গেল।

মালিকাকে দেখে ভূত দেখার মত-চমকে উঠল হীরক। ভবে আব আকর্ষণে চোখজোড়া স্থির হয়ে রইল-মালিকার চোখেব ওপর।

মালিকার চোখে ছিল হাসি-কান্না আব লজ্জাব অপূর্ব মিশ্রণ।

আজ্ঞন—

বলে মুহূর্তপবে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিল, হীবক। মালিকা ঘরে ঢুকে সোজা গিয়ে বসল টেবিলের সামনে। নতমুখে একটু অপেক্ষা করল হীবকেব জন্ত। মুখ তুলে দেখল হীবক দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তে একটু করুণ হাসির সঙ্গে মালিকা বলল, বস।

হীরক নিঃশব্দে বসল।

মালিকা একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্বরটা হঠাৎ হালকা কবে বলল, যে জন্তে এসেছি। তোমাকে যে এখুনিই একবার আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।

কোথায়?—এবাব তাকাতো পারল হীবক।

শুক্লাব বোর্ডিংয়ে একবাব যেতে হবে।—নত দৃষ্টিতে জবাব দিল মালিকা।

চমকে উঠল হীরক।

একটু থেমে মালিকা আবার বলল, আমি খবব দিয়ে রেখেছি শুক্লাকে দেখা করতে যাব বলে। সে থাকবে।

হীরক কিছু বলতে পারল না তখনও।

কই, ওঠ।—মালিকা তাগিদ দিল।

মালিকাব এমন কঠিনব কোনদিন শোনে নি হীরক। ওর পুরুষ-মনেব মধ্যে কেটে বসে গেল যেন স্বরটা। সেই যন্ত্রণায় যেন উঠে পড়ল।

মালিকাও উঠল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, দিদির সঙ্গে আগে একটু আলাপ কবব, চল।

স্ববীতি মেঝের বসে হিসেব লিখছিল। উঠে এসে মালিকাকে আদব কবে নিয়ে গেল। হীরকের দিকে এক টুকরো হাসি নিক্ষেপ করল।

মালিকা হীবককে বলল, তুমিও এস ঠাকুরপো।

স্বরূপের সঙ্গে গিয়ে বসেই বলল, বেশীক্ষণ বসতে পারব না দিদি। কাজেব কথাটাই বলি।

হীৰক চকিত দৃষ্টিতে তাকাল। স্বরূপে নীৰবে অপেক্ষা করল।

মালিকা একবার নীচের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, উনি পাঠালেন আমাকে আপনাব কাছে। হীৰক ঠাকুরপোর সঙ্গে আমাদের শুক্রাব বিয়েটা আর পেছিয়ে লাভ কি! এ মাসেই যদি হয়ে যায় তাহলে ভাল হয়।

স্বরূপের দৃষ্টি স্থির হল মুহূর্তের জন্ত। কিন্তু হাসিমুখে পরক্ষণে বলল, আমি তো বলে বলে হযবান হয়ে গেছি ভাই। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে বিয়ের মালিক। ওকে বলুন আগে।

বিশ্বয়ের বাষ্পটা কেটে গেলে হীরকের মনটা হাসল একটু। হঠাৎ ঘেন নির্লিপ্ত দর্শকের মত সমালোচনাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করল হীরক। দেখল মহীয়সী হবার ঘোঁক হয়েছে মালিকার।

মনের হাসিটা শেষে মুখেও ফুটে উঠল হীৰকেব।

ওকে আবার কি বলব।—হেসে বলল মালিকা, আপনি যা বলবেন তাই করতে হবে ওকে।

স্বরূপেও হেসে জবাব দিল, শুধু বলতেই তো পারি আমি, বলিও। বিয়েটা তো আমি কবে দিতে পাবি নে?

বলে ফেলে গম্ভীর হয়ে গেল স্বরূপে। ভাবল, বিধবাব পক্ষে কথাটা বেশী চটুল হয়ে গেল।

মালিকা হীরকের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, কিন্তু এবার ওঁর মত আমি আগেই নিয়েছি দিদি।

স্বরূপে দৃষ্টিটা একবার হীরকের কাছ থেকে মালিকা পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনল। মুহূর্তের জন্ত ভাবী হল যেন চোখের পাতাঃ ওঃ, তাই নাকি! বেশ করেছেন।

ক্ষণকালের একটা রুদ্ধ নীৰবতায় ঘবটা ভরে গেল।

স্বরূপে মুহূ স্ববে আবার বলল, এখন তা হলে আমাদের একটু বলতে হবে। তিনিই তো এখন আমাদের অভিভাবক কিনা।

আপনি তা হলে তাঁকে বলুন, আব যাতে দেবি না হয়। চল ঠাকুরপো, আমাদের দিয়ে আসতে হবে। বংশী চলে গেছে একটু কাজে।

হীৰক মালিকার মিথ্যা বলার কোণে মনে মনে আব একবার হেসে ঘর থেকে বেবিষে এল।

আজ তা হলে উঠি দিদি।—মালিকা হাসি গোপন কবে বলল, আপনি একদিন আসুন আমাদের ওখানে ঠাকুরপোকে নিয়ে।

যাব।—স্বরূপে স্থপ্তোত্তিতের মত বলল, তার জন্তে কি আছে।

হীরক প্রস্তুত হয়ে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল ঘরের সামনে। মালিকা স্বরূপের কাছে বিদায় নিল। স্বরূপে বাইরের দরজা পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। হীরক ও মালিকা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল বড় রাস্তাব দিকে।

কিছুক্ষণ নীৰবে হাঁটল দুজন।

মালিকা প্রথম কথা বলল, কিছু বলবে না ঠাকুরপো? আজ হীরকের করুণা হল। দর্শকের করুণা। বলল, বলব।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারল না। ক্ষণকাল পরে বলে উঠল, আজকেব এমন মূর্তিতে আপনাকে দেখব ভাবতেও পারি নি কোনদিন। ভুলতেও পারব না কোনদিন।

পুলকেব শিহরণ উঠল মালিকার মনে। চোঁট চেপে গোপনে উপভোগ করতে লাগল।

হীরকেব দৃষ্টি ছিল সামনের দিকে। মন হয়ে উঠেছে সহজ। বলল, আপনি দেবী।

বলে অবাক হল নিজেই। সামনা-সামনি চোখের দিকে তাকিয়ে এমন ধরনের কথা সে বলতে পারত না।

হঠাৎ মালিকার সত্যি কথা বলবার ঘোঁক এল। মুহূর্তে বলল, তোমার জন্তে। তোমার দিকে তাকিয়ে দেবী ছাড়া আর কিছু হবার উপায় ছিল না।

বলে ফেলে অম্লতপ্ত হল মালিকা। আবার বলল, তোমার ওপব অদ্ভুত একটা দয়া হল। তাতেই দেবী হয়ে গেলাম।

আবারও অম্লতপ্ত হল। নিজের ওপর-বিরক্ত হয়ে শেষে বলল, ও সব থাক। দেবী বলেই যদি মনে করে থাক তবে আরগেব মত আসবে? কথা বলবে? আমি বড় একা ঠাকুরপো।

অন্তবটা যেন মথিত হয়ে গেল হীরকের। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আসব বউদি। নিশ্চয় আসব।

আবাব নীরব হয়ে গেল উভয়ে।

কিছুক্ষণ পবে হীবক হঠাৎ বলল, গুরার কাছে আজ আপনি একাই যান বউদি। আমি বাড়ি গিয়ে দেখা করব।

না, চল।—মালিকা সংক্ষেপে বলল।

তোমাকেই সব বলতে হবে।—মালিকা আবাব বলল : না সে-সবও আমাকেই শিথিয়ে দিতে হবে?—হেসে উঠল মালিকা।

হীরক ঈষৎ সংকোচেব সঙ্গে মুহূষবে বলল, কিন্তু দুজনকে একসঙ্গে দেখলে, খুব খারাপ হবে না?—বলে আবাব লজ্জিত হল।

সে সব আমি ঠিক করে নেব।—মালিকা আশ্বাস দিল : যদি বাজি করাতে পারি ওকে, তিনজনে মিলে সিনেমায় যাব—বুঝলে?

আচ্ছা।

তারপবে আমাকে পৌছে দিয়ে গুরাকে পৌছে দিতে আসবে তখন—তখন কি করবে বল তো?

প্রস্তাব কবব।—হীবক হেসে বলল : জানি, কেমন?

হ্যাঁ, এইতো শিখেছ।—মালিকা বলল : বোর্ডিঙেও তোমাদের দেখা কবিয়ে দিয়ে আমি একটু আডালো থাকব কারও সঙ্গে গল্পসল্প নিয়ে। একটু ভূমিকা করে বেখো তখন।

আচ্ছা। সব মুখস্থ করে রাখছি যাতে ভুলে না যাই।—হীরক সহজ রসিকতা করে বলল।

মালিকা নীচু গলায় বলল, ভুললে তোমাবই বিপদ হবে—আমার কি!

হীবক জবাব দিল না।

হীবককে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মালিকা গুরার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

তোমার দাদা পাঠিয়েছেন আমাকে।—মালিকা প্রথমেরই বলল। কালই তোমাকে বাড়ি যেতে হবে। গুরা বলেন নি, আদেশ করেছেন।

গুরা নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, বেশ তো, যাব—দেখা কবে আসব। আর কি, বলুন?

মালিকা দমল না গুরার নীরসতায়। বলল, আসা আব তোমার চলবে কিনা সে বিবেচনা তোমার অভিভাবকেরা কববেন। আব হ্যাঁ, হীবক ঠাকুরপো বাইরে অপেক্ষা করছে। তোমার সঙ্গে তার কী কথা আছে।

আমার সঙ্গে!—গুরা চকিতে বাইবেব দিকে একবার তাকিয়েই নিবে গেল। অবজ্ঞাভরে শীতল কণ্ঠে বলল, আমাব সঙ্গে আবাব কী কথা।

মালিকা বলল, তোমাব কাছে বলবে। ভেতবে নিয়ে আসব? না, তাব চেয়ে বাইরেই চল। একেবাবে তৈবি হয়ে নাও।

গুরা দৃষ্টি এডিয়ে চুপ করে রইল ক্ষণকাল। মুখের ওপর আবাব কাঠিন্বেব আবরণ টেনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন।

কাপডটা বদলে নাও। সিনেমার টিকিট করা হয়েছে। সিনেমায় আমি যাব না। চলুন।

মালিকা অধীর কণ্ঠে বলল, গুরা, এমন ভুল করো না। ভুল কবে বাগ কবেছ তুমি। খাটি সোনার মত, খাদ নেই কোন—এমন মাছষ। চল, সব কথা বলবার মত একটু সময় দাও তাকে।

গুরা শূন্যদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে বইল। মালিকাব কথাগুলো বারবার বাজতে লাগল কানবে মধ্যে। অগমনস্বভাবেই শেষে তৈরি হয়ে দাঁডাল। নীববে মালিকার অহুসবণ করল।

গুরাব সঙ্গে চোখোচোখি হল হীরকের। দোষীর মত সংকুচিত হাসির আভাস আসতেই ঘূবে ধীবে ধীবে চলতে শুরু করল হীবক। শুধু করুণার অহুভূতি বোধ করল গুরা।

মালিকা নিজেব আডাল থেকে একটু দেখে নিল কোতূহলেব বশে। তারপব একটা রিক্ষা পেয়ে একেবারে উঠে বসল। বলল, আমি একাই যেতে পারব ঠাকুরপো। গুরা, আমি চললাম ভাই। ঠাকুরপোব কি গুরুতর কথা আছে তোমাব সঙ্গে। তা ছাড়া আমার কাজও আছে।

মালিকা চলে গেল হাসতে হাসতে।

শুক্রা কিছুটা সহজ হল : ভাল আছেন?—বলে
কথার স্তূপ রচনা করে দিল নিজেই।

তু—একটা কথার পবই হীরক বলল, কোথাও
বসা যাক।

শুক্রা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

পার্কে ঢুকে বসবাব জায়গা না পেয়ে বেলিঙে ভর
দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াল দুজন।

একবারও শুক্রাব দিকে না তাকিয়ে হীরক ধীবে ধীবে
বলে গেল, যদি বিশ্বাস করতে পাব আমাকে—মানে যদি
আপত্তি না থাকে তোমাব—শুভোদাকে আমি তা হলে
বলতে চাই। আমাদের বিয়ের কথা। বউদির সম্বন্ধে—মানে
তোমাদের বাড়ির বউদি—তিনি বড় একা বোধ করেন।
সঙ্গ চান। আমি সেই অভাবটাই পূরণ কববাব চেষ্টা
করেছি। তাব জন্তেই বক্ষা করতে পেবেছি তাঁকে।
নইলে, সেই যে রণেশদা—অত্যন্ত খাবাপ চরিত্রের
লোক—তাকে শেষে ঘৃণা করতে পেবেছেন। বুঝতে
পাবছ বোধ কবি আমাব কথাটা।—বলে এবাব শুক্রাব
দিকে তাকাল হীবক।

শুক্রা শির সঞ্চালন করল শুধু।

আমি কর্তব্যই মনে কবেছি এবং করি।—বলতে
সভয়ে অন্তরটাকে সংকুচিত কবে ঢেকে ফেলল যেন
হীরক।

এখনও কবি।—জোবেব সঙ্গে পুনর্বাব উচ্চারণ কবে
স্বস্থ হল।

শুক্রা চুপ কবেই রইল। প্রথমার্ধের নাটকীয়ত্বে তার
হাসি পাচ্ছিল। কথাগুলো শুঁড়িয়ে হীবক বলতে পেবেছে
ভেবে খুশী হচ্ছিল। শেষার্ধে একটা অকারণ বাধার
অস্বস্তি এবং সঙ্গে করুণার বেদনা জাগাচ্ছিল মনে।

কোন জবাব না দিয়ে শুক্রা ভাবী চোখ দুটো তুলে
হীবকের চোখের ওপর মুহূর্তেব জন্তে ধরে বাঁধল। এক
ঝলক নীবব হাসিব সঙ্গে দৃষ্টি নত করল। হঠাৎ রোলং
ছেড়ে দিয়ে ধীবে ধীবে চলতে শুরু করল।

হীরকের মনে হল শুক্রাব সব কথাই বলা হয়েছে।
পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

বাত্রে মালিকা শুভময়কে বলল, হীরক ঠাকুবপোর
সঙ্গে শুক্রাব বিষে এ মাসেই দিতে হবে। ঠাকুবপো
তোমাকে বলতে বলেছে। শুক্রাব মত আছে।

শুভময় ক্ষণকাল চুপ কবে থেকে মুচকি হেসে বললেন,
শেষ পর্যন্ত এই ঠিক হল বুঝি?

মালিকা খোঁচা লক্ষ্য করল না। বলল, হ্যাঁ।

বেশ। তাই ভাল।—শুভময় সরলকণ্ঠে বললেন।

একটু থেমে আবাব বললেন, তুমি যে নাটক নভেল
পড, সিনেমা থিয়েটার দেখ—এই জন্তেই আমি পছন্দ
করি সেটা।

কি জন্তে?—মালিকা সন্দ্বিগ্ন হল।

কিছু ভাল ফলও আছে।

তাব মানে?

মানে খারাপ নয় কিছু। যত গ্রামামি করেই কল্পক,
একটা ছেলেমানুষি আদর্শ খাড়া করে মন্দ না। ছেলে-
মানুষদের ওপব সেটা ভালই কাজ করে। নোঙরেব
শিকলে মরচে ধরতে দেয় না।

তাব অর্থ কি বল না?—মালিকা তীক্ষ্ণ সন্দ্বিগ্ন কণ্ঠে
বলল।

কিসেব অর্থ?

যা বলছ?

অর্থ তোমাব বাগবাব মত কিছু নয়।—শুভময় গম্ভীর
মুখে বললেন : বহুদিনের মজবুত নোঙর, ছিঁড়তে পারলে
না তোমরা। হীবক প্রস্তাব কবেছে, শুক্রাব মত আছে,
আমি খুব খুশী হয়েছি।

মালিকা বলল, খুশী হয়েছ শুনে স্বখী হলাম। এবকম
থবব তোমার সম্বন্ধে খুব শোনা যায় না তো। যাক,
এখন শোন। শুক্রাকে কালই বাড়ি নিয়ে আসতে
হবে। আমি বলে এসেছি। তোমার একখানা চিঠি
দিয়ে বংশীকে পাঠাতে হবে কাল। তা হলে চলে আসবে।
আচ্ছা তাই হবে।

বারো

স্ববীতি বিবাহের আয়োজনে উত্তোঙ্গী হল। হীরকেব
ওকালতিব ওপব অস্বাভাবিক বিরাগে ভয় পেয়েছিল
স্ববীতি।

সর্ব ঋতুতে

সর্ব উৎসবে

বাংলার রেশম

* সেই সঙ্গে কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের

বিল্লাট সমাবেশ

* পূজা উপলক্ষে রিবেট ছাড়াও বিশেষ কমিশন

পশ্চিম বংগ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(পশ্চিম বাংলাব শিল্প বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত এবং ভাবত সরকারের
খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত)

ঃ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

১। ১২১, হেরার ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১

২। কুটির শিল্প বিপণি

১১এ, এসপ্ল্যান্ড ইষ্ট, কলিকাতা-১

৩। ১৫৯১এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা-২৯

৪। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

তোশক
বালিশ
কুশন

ডানলাপিলো

যে কোন উৎসবের দিনে

শোভন উপহার

মালিকার কাছে বলল একদিন কথাটা। এখন
বিয়েটা হয়ে গেলে যদি মতিগতি ফেরে।

মালিকা হুশিচস্তাব ভঙ্গীতে প্রশ্ন কবল, একদম ছেড়ে
দিয়েছে বুঝি?—কাবণটা অসুস্থমান কবে হাসল মনে
মনে।

যে সব কেস হাতে ছিল তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে
বাগড়া করে এসেছে।

কেন?

তার পাঞ্জী লোক। সরষেব তেলে বিষ মেশায়,
ট্যান্ড ফাঁকি দেয়, চুবি করে, চোবা কারবাব কবে,—
এমন অধর্মের কাজ সে আর কববে না। শুনেছেন
এককম কথা?

মালিকা বলল, এখন করবে। মেজাজ বিগড়ে গেছিল
আর কি। এবার ঠিক হয়ে যাবে সব।

আপনি বলবেন একটু ঠাকুবপোকে। শুভমযাবাবু
যদি বলেন খুব ভাল হয়। আপনাদের কথা শুনেবে।
বেশ পসার হচ্ছিল, মাথা খাবাপ না হলে নিজে থেকে
এমন কাণ্ড কেউ কবে?

মালিকা আশ্বাস দিয়ে বলল, কিছু ভাববেন না
আপনি। মাথা ঠিক হয়ে যাবে এবার দেখবেন।

* * *

হীবকের মানসিক ভাবসাম্য ফিরে এসেছে। সংসাবে
ভাল আব মন্দ যেন আবশ্যকরূপে গ্রহণযোগ্য হয়ে
উঠছে ক্রমে। বিষয়টা কর্মবাচ্যে বিবেচনার ক্ষমতা
আনতেই কর্তাব উগ্রতা কমে গেল। একদিন নিজেই
শুভমযেব কাছে দুর্বল কণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ কবে বলল,
ওকালতি আমি ছেড়ে দিয়েছি শুভোদা। শুনেছেন
বোধ হয়?

শুভময় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, শুনেছি।
বেশ তো, যা ভাল না লাগে কববে কেন? কিন্তু কী
কববে ঠিক করেছ কিছু?

ঠিক করি নি কিছু। দেখা যাক।

হঁ, বেশ তাড়াতাড়িই দেখা দরকার হবে বোধ হয়।

তা তো হবেই।—হীরক একটু লজ্জিত হল।

শুভময় হঠাৎ বিপজ্জনক ভঙ্গীতে সোজা হয়ে বসলেন।
বললেন, ঠিক কি জন্তে ভাল লাগল না ওকালতি

বল তো? প্রথম দিকে যেটা বলেছিলে তার জন্তে? না
আব কিছু আছে?

আর কী থাকবে।—হীরক নতমুখে বলল, কি কবে
ভাল লাগবে বলুন? অবশ্য—

হ্যাঁ, অবশ্য—শুভময় ঠেলতে লাগলেন হীরককে।

ভাল কেসও থাকে। আইনটা আসলে ত্রাসবিচাবেব
জন্তেই।

তবে?

তা ছাড়া মক্কেলের আসল চবিত্রটা আমার জানবাবও
কথা নয়। আইনেব আশ্রয়ে অগ্রসর হলে—

তাই তো হতে হয় তোমাকে, তাই না?

হীবক একটু হেসে বলল, হওয়া চলে। তবে
আইনেব আশ্রয় মানেই আইনের ফাঁকেরও আশ্রয়—এই
আব কি।

ফাঁক তো আইন কর্তাবাই দিয়ে বেখেছেন?

তা রেখেছেন। সে বিবেচনা আছে তাঁদের।

হীবকের ভঙ্গীটা লক্ষ্য কবলেন শুভময়। কিছুটা
সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, শুধু তাঁদের দোষ দিলে চলবে
না হীবক। তাঁরা বুদ্ধিমান। একেবাবে ফাঁকহীন
ধর্মের অসুশাসনের মধ্যে কত চমৎকাব ফাঁকির রাস্তা
বের কবে নেয মানুষ, ধর্মপ্রবর্তকেবা যা কোনদিন
কল্পনাও আনতে পাবেন নি। এমন মানুষের জন্তে
নির্বেট আইন না কবে কিছু ফাঁক রেখে আইন-কর্তারা
বুদ্ধিমানের কাজই কবেছেন। নইলে দম বন্ধ হয়ে যদি
মবে যেত মানুষ। নইলে সব ভেঙে চূবে বেবিযে আসত।

একটু থেমে বললেন, তা ছাড়া যে যুগে যে স্তরে মানুষ
সমষ্টিগতভাবে এসে পৌঁছয়, সে যুগের ধর্ম বল আইন বল
তার উদ্দেশ্য বৈশিষ্ট্য টিকে থাকতে পারে না তো! টেনে
নামিয়ে নেয যুগ-স্তরে। ফাঁক আব ফাঁকিতে ভর্তি করে
যুগেব যোগ্য কবে নেয মানুষ।

হীবকের দিকে তাকিয়ে যেন নেমে এলেন শুভময়।
হেসে বললেন, তা ছাড়া আইন কবার ভার পড়ে সাধারণতঃ
এই স্তরের মানুষের ওপব কিনা। কাজেই প্রয়োজনমত
আইনই পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, তা খুব পাওয়া যায়।—হীরক হাসিমুখে সায়
দিল।

চুপ করে গেলেন শুভময়। ক্ষণকাল পরে বললেন, তুমি যে সমস্ত কেস ফিরিয়ে দিয়েছিলে তারা অল্প উকিল ধরেছে নিশ্চয় ?

আমি আর খবর পাই নি।—হীৰক ঘণ্টার স্বরে বলল, নিশ্চয়ই ধবেছে। তা ছাড়া আর কি করবে ?

হঠাৎ যেন একটা ইঙ্গিত লক্ষ্য করল হীৰক। তাড়াতাড়ি আবার বলল, তা তো বটেই। আমি ছেড়ে দিলেও অন্তায় বন্ধ হবে না জানি।

শুভময় হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন।

জেনেও পারছি না আমি।—হীৰক শেষ করল।

শুভময় অপ্রত্যাশিতভাবে আহত হলেন। গম্ভীর হলেন। এত সাধারণ স্তরের কথা হীৰকের কাছে : তিনি আশা করেন নি। আবার ভগ্নামি!—মনে মনে বললেন, নইলে কথার মধ্যে আঙুন থাকত। নেই। হয়তো জলেছিল নিবে গেছে।—নিবাশ হলেন শুভময়।

ক্লাস্ত স্ববে বললেন, যা কবতে ইচ্ছে কবে না তাই করতে বাধ্য হওয়ার মতন দুঃখ যেমন আব কিছুতে নেই, তেমনি যা ইচ্ছে কবে তাই কবতে প্রারাব মতন সুখও পৃথিবীতে নেই আব। দুটোই তোমার হাতে বোধ হয়। কিন্তু ইচ্ছেটা আগে যাচাই করে কবে নেওয়া চাই। কোন্ ইচ্ছেটা কোন্ স্নায়বিক উত্তেজনা অথবা দুর্বলতা থেকে এল তাব মূল্য নিরূপণ করা চাই। বুদ্ধির ইচ্ছে আর জীবনের ইচ্ছে। একটারই জয় হবে, যেটার জোর বেশী। দুটো এক হলে মুক্তি।

বলে আলোচনা বন্ধ কববাব ভঙ্গীতে উঠে পড়লেন।

কিন্তু অত সময় নেই হীৰকের। মনের অবসর ক্রমশঃ আবার কম হয়ে আসছে। মনটা কেজ্রীভূত হয়ে উঠছে বিবাহের তারিখের ওপর।

দিন কাটে না। বাড়িতে একেবারেই কাটে না। কোর্টে বেড়াতে যায়। শুধুই বেড়াতে। হীৰক তাই জানে।

আব বিকেলে গুজ্রাদেব বাড়ি। গুজ্রাদেব বাড়ি। রওনা হবাব সময় এখন 'গুজ্রাদেব বাড়ি' এই কথাটা মনে আসে। মালিকার নয়। কিন্তু আগে দেখা করে

মালিকার সঙ্গে। নিঃসঙ্কোচে মালিকা ডেকে আনে গুজ্রাকে। সিনেমা থিয়েটারে যায় একসঙ্গে।

চারদিক থেকে গুজ্রাকে গোপনে দেখতে চেষ্টা করে হীৰক। দেখে সন্তুষ্ট হয়। 'গুজ্রাও সুন্দর! ভাবে। ভেবে পরক্ষণে লজ্জিত হয়। ছিঃ।

কিন্তু অসীম কৌতূহলে 'অনেকদূর পর্যন্ত মনে মনে অগ্রসর হয়ে শেষে সভয়ে পিছিয়ে আসে। না, না। ছিঃ! গুজ্রা কি ভাবে!

তারিখের দিন সাতেক আগে থেকে গুজ্রাদেব বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিল হীৰক। স্তব্বীতি একদিন ঠাট্টা করে বলল, তোমার একটু লজ্জাও করে না ঠাকুরপো? লোকে বলবে কি? দিন কয়েক একটু ধৈর্য ধর। নইলে 'ঠকবে' কিন্তু!

কেন? ঠকব মানে?

বাসরঘরে নতুন বলে মনে হবে না যে! দিন কতক একটু ছটফট না করলে সেদিন তেমন জমবে কেন?

হীৰক হেসে বলল, ঠিক বলেছ। আর যাব না। তোমরা বলে না দিলে জানব কি করে?

বাগ হল হীৰকের সকলের ওপর। কোন মানে হয় না এত লম্বা তারিখের। শূণ্যের ওপর ঝুলে থাকতে পারে নাকি মানুষ এতদিন।

কাজেই কোর্ট, বন্ধুবান্ধব আব সিনেমা-ঘর আশ্রয় হল হীৰকের।

ছেড়ে দেওয়া মক্কেলদেব খবর বাথে হীৰক। খবর দিয়েছে শিবপদ। তাকে ধবেছে সরষের তেলের নন্দলাল। ঘনকৃষ্ণ গণেশলাল আরও বড় উকিল ধরেছে।

শিবপদ বলে, তেল ওর আসলে ভাল ছিল বলে ধবে নিতে কোন্ নীতিতে আটকাচ্ছে?

না, তা আটকাবে কেন।—হীৰকের নির্বিরোধ মানসিক অবস্থা থেকে বেবিয়ে এল : তবে কেমন যেন মনে হয় আসলে ভাল নয়।

অত মনে করবার দরকার কি রে বাপু?

হীৰক হেসে বলল, কিছু না। মনটা বোকার মত কাজ করে বসে আর কি।—বলে সন্তুষ্ট হল হীৰক। মনেব সেই পুরনো রূপটা যেন ঝিলিক দিয়ে গেল।

শিবপদ বলল, অথচ, নন্দলাল লোকটি কিন্তু যাকে বলে, খুব ধর্মভীরু লোক ! জান ?

হীরক ঠাট্টাব স্ববে বলল, না, তা জানি না। ববিবাবে দরিদ্রসেবা করে বুঝি ? না, ধর্মশালা ?

যা শুনেছি শুনলে ভক্তি হবে তোমারও।

হীরক বাধা দিয়ে বলল, ভক্তি আমি খুব করি ওদের। টাকাব পেছনে যাবা নবক পর্যন্ত যেতে পারে তারা নিশ্চয়ই নমস্ত।

শিবপদ গম্ভীর মুখে বলল, কিন্তু টাকার সম্বন্ধে এদের সাধুতাও অসাধারণ। জান, এরা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপাবে একটা মুখের কথার মূল্য রক্ষা করতে হাজার হাজার টাকার পরোয়া করে না। এই নন্দলালই কি একটা ভেজালের বিচির এক গুদাম মাল কিনেছিল মুখে মুখে। কিনেছিল মানে, শুধু বলেছিল নিলাম। হিন্দিতে কি বলে—লিয়া। বাস। তারপরে নানা রকম কডাকডিতে নন্দলাল ভয় পেয়ে গেল। মালটা আর নিতে সাহস পেল না। কিন্তু মুখের কথার তো আর নডচড হবার যো নেই। দামটা চুকিয়ে দিল। একটু দম বন্ধ করে তাকিয়ে থেকে হোঁ হোঁ কবে হেসে উঠল হীরক। বলল, তারপর ?

শিবপদ বলল, তারপর আব কি করবে ? বস্তাগুলো রেখে মালগুলো সব পুড়িয়ে ফেলেছে !

বল কি।

এই রকম লোক নন্দলাল। মোট কথা, ভেজাল আর দেবে না সে।

শুধু এইবারটা ?

না না। এবার তো সে নির্দোষ। ওরাই শত্রুতা করে—

শিবপদ হেসে উঠল—এবাব।

হীরক গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, সত্যি, আশ্চর্য সত্যনিষ্ঠ। ভক্তিও হয়, চিন্তারও কথা।

রীতিমত চিন্তার কথা।—শিবপদ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এখন দেখ চিন্তা করে—

হাসল হীরক।

শিবপদ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, কিন্তু একটা কথা। সরষের তেলটা আব খেয়ে না। নন্দলালের কেসটা হাতে

নেবার পর থেকে আমি তো সরষের তেল বাড়িতে আনাই বন্ধ করেছি। কেমন একটা তেল-চিটচিটে বাতিক হয়েছে। সবই নন্দলালের তেল বলে মনে হয়।

তেরো

এক মাসের ছুটি নিয়েছিল গুলা। বিয়ের দিনকতক পরেই ছুটি ফুটিয়ে গেল। কিন্তু হীরক যেতে দিল না গুলাকে। গুলা দরখাস্ত করে ছুটি বাড়িয়ে নিল।

দিনকতক অহনিশি গুলাকে কেন্দ্র করে ঘুবতে ঘুরতে অবশেষে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল হীরক। ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরতে আবন্ত করল।

মালিকা সেদিন খাঁচার পশুর মত ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন। হীরককে দেখে থমকে দাঁড়াল। ক্রমে বন্ধ-ওষ্ঠদ্বয় চিবে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল কান্নাব মত।

বস—বলবার পবে মালিকা নড়তে পাবল। নড়তে পেরে শরীরটা একটু আলগা হল : গুলা ছেড়ে দিলে যে বড়।

হীরক একটু হেসে বসল। জবাব দিল না।

হঠাৎ আবার চঞ্চল হয়ে উঠল মালিকা। বলল, না, আব বসে দরকার নেই। চল। তোমাদেব ওখানে যাব। গুলাকে একটু দেখে আসি।

হীরক অবাক হল। কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করল।

বেকুবাব মুখে মালিকা বংশীকে বলল, কেউ এলে বলবি আমি চলে গেছি। আর—আচ্ছা দাঁড়া। আমি লিখে বেখে যাচ্ছি। এক মিনিট দাঁড়াও ঠাকুরপো।

ফিরে গিয়ে ছোট এক টুকরো কাগজে কি একটা লিখে এনে বংশীর হাতে দিল। বলল, এইটে তাকে দিবি। চল।

কার আসবাব কথা ?—হীরক পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

কেউ না, পাড়ার একটা মেয়ে।—মালিকা হাঁপাচ্ছিল যেন। হঠাৎ বড় বড় চোখ দুটি হীরকের মুখের ওপর স্থাপন কবে বলল, এতদিনের মধ্যে একটিবারও তুমি আসতে পারলে না ?

আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের
জ্ঞানদীপ্ত শ্রীতি-সম্ভাষণ
জানাই

মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ে দীর্ঘকাল
সততার সঙ্গে আমবা জনসাধারণেব
সেবা করে চলেছি। দেশবাসীর
তৃপ্তিসাধনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

— — —

আমাদের মিষ্টান্নে পরিতৃপ্ত হয়েছেন
বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ।
সাহিত্যরসিক পাঠকদের কাছেও
'সেন মশায়ে'র সমান আদর।
মিষ্টান্ন-জগতে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন

সেনা মশায়ে
সর্বজনপ্রিয় মিষ্টান্ন বিক্রেতা

১১১১ ফড়িপুকুর স্ট্রীট (আমবার), ৪০এ আগুতোব মুখাজি রোড, ১৭১এইচ,
রাসবিহারী আশুভিনিউ, হাইকোর্টের ভিতর এবং লেক রোড মার্কেট।

টেলিফোন ৫৫-৫০২২, ৪৭-৪৪২৫

তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করে সহজ স্ববে আবার বলল,
বিষে কবে আমাদের কথা ভুলেই গেলে বুঝি ?

না না, ভুলব কেন বউদি। কদিন আসতে পাবি
নি। এবার আসব।—অল্পকম্পাব হুব এনে গেল
হীবকের।

মালিকা আর কথা না বলে ক্ষিপ্তপদে হাঁটতে লাগল।
অনেকটা ভয়ানকের মত।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ফিবে তাকাল পেছনেব দিকে।
আবার চলতে লাগল।

মনটা মালিকাব বাড়িব দরজার কাছেই যুবছিল।
দেখছিল রণেশ গেটেব কাছে দাঁড়িয়ে। বংশী চিঠিখানা
দিল, চিঠি পড়ে অকুণ্ঠিত কবে টুকরো টুকরো কবে
ছিঁড়ে ফেলল বণেশ। না, ছিঁড়ল না, হাতেব মধ্যে
পিশতে পিশতে পকেটে ঢোকাল হাতখানা। তাবপব চলে
গেল। সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পেল মালিকা। একবাব
কৈপে উঠল।

* * *

কোর্টেও বেড়াতে যায় হীবক। সময় কাটানোর
জন্তে যায়।

শুক্রাও স্থলে যেতে আরম্ভ কবল। হীবকের মুহু
আপত্তি কাটাতে খুব বেগ পেতে হল না। কিন্তু ফলে
হীবকের জডতা অনেকখানি ভেঙে গেল।

এ দেড়েক টাকাব মাস্টারি একটা চেষ্টা করলে
পাওনা যায় বোধ হয়।—হীবক বলল একদিন।

কোথায় ?—শুক্রা মুহু হেসে জিজ্ঞাসা কবল।

একটা কলেজে—কিন্তু মফস্বলে। দরখাস্ত করব
কিনা ভাবছি।

শুক্রা ঠোট ওল্টাল : তাও আবার মফস্বলে।

এইটুকুতেই বুঝতে পারল হীবক, তা হয় না।

* * *

কিন্তু কোর্টে নিয়মিত বেড়াতে যায় হীবক।

ক্রমে ক্রমে নির্দোষ কাজ কিছু কিছু কবতে আরম্ভ
করল। কিন্তু নির্দোষ কাজ !

ফলে অল্পদিনের মধ্যেই শুক্রাকে চাকবি ছেড়ে দিতে
হল। কোর্ট থেকে ফিরে সেবাপরায়ণা জ্বর হাতে

নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তৃপ্ত হয় হীবক। নানাবিধ তৃপ্তিব
চাপে মনটা যেন নিদ্রা গেল হীবকের।

পান খেতে আবশ্য কবেছে হীবক। বিকেলে কোর্ট
থেকে ফিরে জলযোগেব পরে পান চিবোতে চিবোতে
মনহীন জাবব কাটার স্বর্গে বিচরণ করে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ যখন মনটা জলে ওঠে তখন বলে,
এই পৃথিবী। হয় গ্রহণ কব—না হয় ত্যাগ কর।

কারণ কথাটা যেন ? এটাও ভাবতে ছাড়ে না।
বোধ করি শিবপদ বলেছিল।

হেসে তখনই আবার জাবব কাটতে শুরু করে। ভুলে
যায় সব। ফাইল খুলে বসে।

* * *

মালিকার সঙ্গে আজকাল বিশেষ দেখা করতে পারে
না হীবক। সময় কম। তা ছাড়া মনেও থাকে না বড।
শুভমযেব সঙ্গে দেখা কবে না ভযে। অকারণ
ভীতিতে সঙ্কচিত হয়ে পড়ে তাঁব কথা মনে হলেই।

কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে শুভমযই একদিন
হীবকের বাড়ি উপস্থিত হলেন।

হীবক লজ্জিতকণ্ঠে ‘অনেকদিন যেতে পারি নি কাজের
ভিড়ে’ ইত্যাদি অহেতুক কৈফিয়ত দিয়ে শেষে বলল,
বউদি কেমন আছেন ?

মুহূর্তকাল বিলম্বে শুভময বললেন, বোধ হয় ভালই
আছে। খবর পাই নি তো ?

খবর।—হীবক চমকে উঠল।

সে এখানে নেই।—শুভময বললেন, দিন সাতেক
হল চলে গেছে। বাপেব বাড়ি যাবে বলে গেছে।
বণেশকে জান তো ? তাব সঙ্গে গেছে।

হীবক স্তব্ধ হয়ে গেল।

শুভময একটু থেমে বললেন, আমিও বাইবে যাচ্ছি
কিছুদিনের জন্তে।

কোথায়। কবে ?—হীবক কলবব কবে উঠল।

শুভময হেসে বললেন, একটু ঘুবে ফিরে আসব আর
কি। মালিকা মাস দুই থাকবে বলে গেছে। যেখানেই
যাক ও—ফিবে আসবে আবার আমার কাছে। কাজেই
মাস দুয়ের মধ্যেই আমিও ঘুবে আসব।

হীরক অত্মমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি বলল,
কিন্তু বাড়ি দোকান—এসব ?

সব বন্ধ করে রেখে যাব।—শুভময় বললেন, কিন্তু
বংশীকে নিয়েই মুশকিল। ওকে তোমাব এখানে রেখে
যেতে চাই।

হীরক বলে উঠল, চলুন, ভেতবে চলুন।

শুভময় বললেন, গুল্লাকে ডাক।

হীরক উঠে গুল্লাকে ডেকে আনল। সব শুনে গুল্লা
আবার ভিতবে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে এল। বলল, আমি
তোমাব সঙ্গে বাড়ি যাব দাদা।

যাবি ? চল।

হীরকও নিঃশব্দে উঠে স্থবীতিকে বলে এসে তৈরি হয়ে
দাঁড়াল।

শুভময় খুশী হলেন কি না বোঝা গেল না।

* * *

বাঞ্জে হীরককে নিয়ে গল্প কবতে বসলেন শুভময়।

বুঝল হীরক, মাহুষের আবার কিছু নতুন নোঙব
কববার দরকাব হয়েছে। অনেক কালের পূর্বনো নোঙবে
মরচে ধরতে-ধরতে আসল লোহাটা একেবারেই ক্ষয়ে
গেছে। ওগুলো বাদ দিয়ে নতুন কিছু ঢালাই করা
দরকাব। তাতে হয়তো দুঃখকষ্ট কিছু কমতে পাবে।
এখন আবার এই মতেই আমাকে আসতে হচ্ছে।

থেকে একটু ভাবলেন শুভময়। আবার বলতে
লাগলেন, তায় আব নীতির সঙ্গে মাহুষের যে বিরোধ,
ওটা বুদ্ধির সঙ্গে প্রবৃত্তির বিরোধ। জীবন-বিজ্ঞান যদি
সত্য হয়, এই বিরোধ একদিন মিটে যেতে বাধ্য। যাকে
বলে মুক্তি—তখনই সম্ভব হবে।

একটু হাসলেন শুভময় : এই অবস্থা এক ছিল
বনমাহুষের যুগে। বুদ্ধি বলতে যা ছিল তার সঙ্গে
জীবনবৃত্তির কোন বিরোধ ছিল না। আবার হবে
একদিন। এব মাহুখানের ইতিহাসটাই কদর্য।

হঠাৎ জোরে হেসে উঠলেন শুভময় : তোমার ঘুম
পাচ্ছে হীরক। থাক এখন।

হীরক চমকে প্রতিবাদ কবে উঠল, না না, আপনি
বলুন। আমি শুনিছি।

শুভময় বললেন, যতদিন ওই অবস্থা না আসছে
ততদিন—থেকে একটু হাসলেন : ততদিন আমার আর
মালিকার মধ্যে আপোষ কবতে হবে। বুঝে নিশ্চয়,
আমি বুদ্ধির প্রতিনিধি হিসেবে বলছি। আব মালিকাই
বোধ হয় জীবন। একটাকে অস্বীকার কবে আর একটা
চলতে পাবে না।

* * *

শুভময়ের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গেল হীরক ও গুল্লা।
গাড়িটা ছেড়ে চলে গেলেও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে
হীরক বলে উঠল, আশ্চর্য মাহুষ।

কে।—গুল্লা চমকে উঠল।

শুভোদা। যাকে বলে মুক্ত পুরুষ। চল, ওঁর জন্ত
দুঃখ করলে ওঁকে ছোট করা হয়।

ফেরবাব সময় হীরক হঠাৎ নীববতা ভেঙে বলে উঠল,
সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা কি জান ? শুভোদা যে বউদিকে
কত ভালবাসতেন এই কথাটাই আমরা কেউ
কোনদিন বুঝতে পারি নি। বউদির দুর্ভাগ্য, তিনিও
পারেন নি।



সেই ভদ্রলোক আবার এসেছিলেন। তাঁকে দেখেই চিনতে পাবলাম, ইনিই তিনি।

অল্প কেউ হলে চিনতে হয়তো একটু কষ্ট হত, হয়তো ভাবতে হত কোথায় দেখেছি, কে ইনি।

কিন্তু তাঁকে দেখে চিনতে কষ্ট হল না, দেখা মাত্রই চিনে ফেললাম, ইনিই তিনি, ইনিই সেই ভদ্রলোক।

গেক্সা লুপ্তি পরনে, গেক্সা বস্তুর পাঞ্জাবি গায়ে। নশ্টি নিতে নিতে নাকের ফাঁক দুটো হাঁ হয়ে গিয়েছে।

খুব অমায়িক আর সজ্জন এই ভদ্রলোক।

এর আগে এসেছিলেন মাত্র এক দিন। কিন্তু সেই একটি দিনেই মনের উপর একটা ছাপ এঁকে দিয়েছেন। এঁকে ভোলা তাই কষ্ট।

সে কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নই, সেই জন্তে তাঁকে ভোলার চেষ্টা কবি নে আদবেই। আব, ভুলে গিয়ে লাভটা হবে কি। বলতে গেলে, তাতে লোকসানই হবে। কেন না, মাঝে মাঝে এরকম লোকেব আবির্ভাব চাই, ছুনিয়া যে একেবারে দেউলে হয়ে যায় নি, ছুনিয়া যে কেবলই স্বার্থে আব সংঘর্ষে ভবা নয়, ছুনিয়ায় এখনও যে আশার আলো আছে, তাব প্রমাণ নিয়েই যেন ইনি বিরাজ করছেন। এক-এক সময় তাই একটু গর্বও যেন বোধ কবি। গর্ব বোধ হয় এই জন্তে যে, জীবনে এমন একটি মানুষেব সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার ঘটেছে।

বেশী কথা বলেন না, বেশী হাসেন না, বেশী কাশিও শুনি নি। নশ্টিটা টানেন অবশ্য একটু বেশী। নাকে যায় যতটা তার চেয়ে বেশী পবিমাণ বুঝে পড়ে অবশ্য তাঁর জামায়। তাব জন্তে বিব্রতভাব বা অস্বস্তিবোধ যেন নেই। জামার বড়োব সঙ্গে নশ্টিব বস্ত্র-মিশে যায় বলেই তিনি এতটা উদাসীন কি না বলতে পাবব না। কিন্তু তিনি একটু উদাসীন। তুচ্ছ ব্যাপাবে বিচলিত হতে তিনি বুঝি রাজী নন।

নীবব নিস্পন্দ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতেই তিনি বসেন। আজও সেই ভঙ্গিতেই বসলেন।

আমাব মুখেব দিকে একটু চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন। আমিও আমাব হাতের কলমটা নামিয়ে রাখলাম।

বললাম, খবর বলুন।

হাসলেন-ভদ্রলোক, আমাব প্রশ্নটা শুনে, মনে হল, তিনি একটু মজা পেয়েছেন।

কৌটো থেকে বাঁহাতেব তেলোয় নশ্টি টেলে নিয়ে হাতটা আলগোছে বন্ধ কবে বসলেন।

আবার বললাম, খবর বলুন কিছু।

এবার উত্তর দিলেন তিনি, বললেন, খবর? কি খবর চান বলুন।

যা হোক কিছু একটা।

আবহাওয়া?—বাঁ দিকে ঘাড় একটু কাত করে তিনি বললেন, আবহাওয়ার খবর বলব?

বললাম, তাই বলুন।

তিনি বললেন, প্রবল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে আগামী ত্রিশ-চল্লিশ বছরে। মোটামুটি এইটেই হচ্ছে দেশের আবহাওয়া।

তিনি হঠাৎ থামলেন, মনে হল তাঁব বক্তব্য তিনি যেন শেষ করে ফেললেন ওইটুকু কথা বলেই।

কিন্তু না, তিনি দেশের কথা এবং দেশেব ভবিষ্যৎ নিয়ে বলে যেতে লাগলেন অনেক কথা। বললেন, আমাদের দেশে এখন ভদ্রলোক নেই। ভদ্রলোক জিনিসটা নাকি মানুষেব মধ্যে একটি বিশিষ্ট জীব। মানুষ ভদ্রলোক হয়েই ভূমিষ্ঠ হয় না নাকি। মানুষ জন্মায় মানুষ হয়ে, তার মধ্যে থেকে কেউ কেউ ভদ্রলোক হয়, কিন্তু এ পবিবর্তন ঘটতে সময় লাগে। জীবনকে তা দিতে দিতে মানুষ ফুটেই বেরিয়ে আছে এক-এক জন—

শব্দ করে হেসে ওঠা মাত্র তিনি থমকে থেমে গেলেন, বললেন, হাসলেন?

বললাম, না, হাসি নি। আপনি বলুন।

ভদ্রলোক বললেন, ভদ্রলোক হচ্ছে জাতিতে পাখি।

পাখি হয়েই সে জন্মায় না। প্রথমে তাব যে অবস্থা, তাকে আমবা বলি ডিম। সেই ডিম ফুটেই—

আবার হাসি পেল, হাসিটা গিলে ফেলার চেষ্টা কবতে যাচ্ছি এমন সময় ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফেললেন। আমি লজ্জিত হলাম, অপ্রতিভ হলাম, তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম, চমৎকার। এতটা তলিয়ে আমরা কখনও ভাবি নি তো।

ভেবেছিলাম, আমাব এই তাবিকের কথাটা শুনে তিনি তুচ্ছ হবেন, এবং আমাব হাসি-গোপনের চেষ্টাটা উপেক্ষা করবেন। কিন্তু না, তিনি একটু যেন গম্ভীর হয়ে বসলেন, এবং একটু যেন রুষ্ট চোখেই তাকালেন আমার, কেবল মুখের দিকে নয়, সর্বাঙ্গের দিকে।

বললেন, ভদ্রলোক সাজে হয় না, সজ্জাতেও নয়। ভদ্রলোক যে হবে, সে হবে মজ্জায়-মজ্জায় ভদ্রলোক।

তাঁর কথা শুনে লজ্জায় আমাব মাথা হেঁট হল। আমাব সর্বাঙ্গের সাজে তখন বুঝি একটু ঘটাই ছিল। পরনে ছিল মিহি শান্তিপুরে ধুতি, গায়ে ছিল শৌখীন মটকার পাঞ্জাবি, চোখে রিম-লেস চশমা, পায়ে পাম্পাঙ্গ।

এ সাজ সাধ করে করি নি অবশ্য, বাধ্য হয়ে কবা। বিয়েব নিমন্ত্রণে যেতে হবে। একটু পরেই যাব—ইনি বিদায় নিলেই। বোবাব জন্তে সবে তৈরি হয়েছি, এমন সময়ে তিনি এসে পড়েছেন বলে আমিও একটু বসেছি। কিন্তু সে কথা তাঁকে বলতে পারি নি। বলতে কেন যেন আটকেছে।

বললাম, ঠিক, ঠিক বলেছেন।

অন্য কথা ভাবছিলাম বলে তাঁব মন্তব্যের উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেছে। তা হোক, তবু বললাম ওই কথা—ঠিক, ঠিক বলেছেন।

কি ঠিক। কি ঠিক বলেছি?

ওই যে বললেন, মজ্জায়-মজ্জায় হতে হবে—

কি হতে হবে?

বললাম, ভদ্রলোক।

তিনি বললেন, ইয়েস। ভদ্রলোক যদি পাখিব জাত, তবে তাব স্বভাবও হতে হবে পাখির মতই। ডিমে তা দিয়ে ডিম ফোটালেই হয় পাখির জন্ম। পৃথিবীতে— তিনি

এবার একটু কঠিন বাংলায় বলতে লাগলেন, পৃথিবীতে ডিম্বের আগমনটা তুচ্ছ, সারা পৃথিবীতে যদি গড়াগড়ি যেত অজস্র ডিম্ব, তবে কালবিলম্ব না করে আমরা পৃথিবীকে অষ্টবস্তা দেখিয়ে এখানকার পাট চুকিয়ে পলায়নে মনোযোগ দিতাম। কি বলেন?

তাঁব ভাষার সমাবোহে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, তাই তাঁর বক্তব্যে মন দেওয়া হয় নি। তিনি ঠিক কি বললেন তা ধরতে পারি নি। এইজন্তে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটু খতমত খেতে হল, তবু নিজেকে লুকোবাব চেষ্টা করে বললাম, ঠিক, ঠিক বলেছেন। আব, বলাটাও বেশ সুন্দর হয়েছে। ভাষার উপবেও আপনাব বেশ দখল আছে দেখে আনন্দ লাগল।

এ মন্তব্যে তিনি আশ্চর্যিত হলেন মনে হল। একটু হেসে নিয়ে, এবং একটু নস্টি টেনে নিয়ে তিনি বললেন, ভাষাও হচ্ছে ভদ্রলোক। ভাষাও প্রথমে ভাষা থাকে না, থাকে কতকগুলো শব্দেব সমাহার। তাকে মাজতে হয়, ঘষতে হয়, পালিশ কবতে হয়, তখনই তার রূপ বদলায়— সে হয় ভাষা।

গেকরয়া বঙের লুঙ্গিতে আর গেকরয়া পাঞ্জাবিতে নিজেকে আবৃত করে নিয়েছেন ইনি। মনে হতে লাগল, তাঁর মনও বুঝি হয়ে উঠেছে গৈরিক। খুব শ্রদ্ধা হতে লাগল তাঁব উপর। ভদ্রলোক হতে হলে শুধু যে মটকাব পাঞ্জাবি গায়ে দিলেই হয় না, মনকে বিস্তারিত প্রসারিত ও চতুর্দিকে সঞ্চারিত করে দিতে হয়—সে শিক্ষা-যেন পেয়ে গেলাম এঁব কাছ থেকে। সত্যি, কত জানেন ইনি। শিষ্টতা সম্বন্ধে যেমন এঁর বোধ, ভাষা সম্বন্ধে বোধও তেমনি। নিজের সাজসজ্জার জন্তে নিজের মনকে বিব্রত না রেখে, ইনি এঁর মনকে মাননীয় কবে তোলাব জন্তে মনের প্রচুর ব্যবহার যে করেছেন তা এঁর আচরণে ও ভাষাপ্রয়োগে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

আমি চুপি করে ঘড়ির দিকে একটু চেয়ে নিলাম। সময় অনেকটা কেটে গিয়েছে। দেরি খুবই হয়ে গেল। ভাবতে লাগলাম, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবারও একটা সময় অসময় নিশ্চয় আছে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া নিশ্চয় সমীচীন। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। অথচ কিছু বলতে পারছি নে। তিনি

এসেছেন আমাদের গৃহে, স্ততরাং এ কথা তাঁকে বলা ঠিক শোভন বুঝি হবে না।

ভদ্রলোকের ভজিটাই একটু উদাসীন। হয়তো মাছুষটাও সত্যিসত্যিই উদাসীন। তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, হয়তো আমাদের মুখে একটু ব্যস্ততাব ভাবও ফুটে উঠছে, আমি একটু উশখুশও কবছি, কিন্তু তিনি সেদিকে একটুও মন দিচ্ছেন না। শুধু বলে চলেছেন কথা।

ভদ্রলোক-প্রসঙ্গে ভাষাব কথা উঠেছিল, তিনি এক-নাগাড়ে তার ব্যাখ্যা করে গেলেন। বলতে লাগলেন, ভাষাবও বাইরের চেহারাটা কিছু নয়। ভাষাকে চিনতে জলে ডুব দিতে হবে তার গভীরে। কি, ঠিক বলেছি কিনা, বলুন।

উত্তর না দিয়ে, মাথা নীচু করে বসে আঙুল মটকালাম। সেই শব্দ নিজের কানে যেতেই খুব অস্বস্তি বোধ করলাম। ইশ, কি বকম অভদ্রের মত কাজ করে বসলাম। এ তো একটা অশালীনতা—এইভাবে আঙুল হুমড়ে হুমড়ে শব্দ কবা।

আমি একটু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ভিতবটা আমার একটু ছটফটই কবছে। না, আর দেবি করা ঠিক হবে না। কিন্তু কি করে উঠব—তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না।

ভদ্রলোক বললেন, তবেই ধরুন। ভদ্রলোক হচ্ছে আসলে পাখিরই জাত। তাবা বকবক কবতে পারে, অযথাই সময় নষ্ট করতে পাবে, কিন্তু কাবও কোনও ক্ষতি তারা কবে না। তারা সাতো থাকে না, পাঁচে থাকে না। তারা থাকে নিজের মনকে নিয়ে, নিজের মেজাজকে নিয়ে। কিন্তু এ পাখি কোন্ পাখি জানেন?

মুচকি হেসে মাথা নাড়তে লাগলাম—যেন ধরে ফেলেছি পাখিটাকে। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না।

তিনি পুনরায় বললেন, বলুন। কি পাখি। সব পাখিবও জাত এক নয়। ছোটো পাখা থাকলেই সে পাখি হল না মা।

বললাম, তা তো বটেই।

ভদ্রলোক একটু যেন দম নিতে লাগলেন। আর, আমি ভাবতে লাগলাম অন্য কথা। তাঁব সব কথার সংগতি আর সংজ্ঞা যেন ঠিক ধবতে পাবছি নে আর।

তিনি বললেন, পাবলেন না তো বলতে! একটু চিন্তা করলেই অবশ্য বলতে পাববেন।

কিন্তু চিন্তা করার সময় আমার কই! মনেব অবস্থা এখন তেমন নয়। মন এখন দুশ্চিন্তায় তারাক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কিছু বলতে পাবছি নে কিছুতেই।

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন, অতি সাধারণ পাখি। সে পাখি হচ্ছে পায়বা। লক্ষ্য করে দেখবেন, তাদের মত স্থায়ী জীব নেই—কেন না, তাদের তাড়া নেই, তাগাদা নেই। কাউকে কোনও উৎপাত তারা করে না, কাবও মদ্রে বাগডাৰাটি তাদের নেই। চড়াই বলুন, শালিখ বলুন, কাক বলুন—তাদের একটা না একটা সমস্যা আছে। কিন্তু এরা নিরাঙ্কাট। লক্ষ্য কবে দেখবেন।

লক্ষ্য কবে সত্যিই যেন দেখলাম। স্পষ্ট দেখলাম, প্রত্যক্ষ দেখলাম।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এবাব ওঠা যাক। একটু বেরতে হবে।

কোথায়?

একটা নিমজ্জন আছে।

ও হবি।—তিনি বললেন, তাই এত সাজের ঘট।! এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি।

কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি তাঁর সাজ। কেবল তাঁব সাজই নয় অবশ্য, আমার এই সাজাও।

মিউনিকের চিঠি

কবি স্টিফেন স্পেণ্ডার

দক্ষিণাবঙ্গন বসু

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

কদিন হল এখানে এসেছি। আসছে কালই মিউনিক থেকে বিদায় নেব। এবারের বিদেশ ভ্রমণের প্রথম পর্যায় পশ্চিম জার্মানী সফরেরও এখানেই ইতি।

মিউনিক শহরকে আমার ভাল লাগে। এব আগেও ষখনই এখানে এসেছি এ শহরের একটা আকর্ষণ বোধ করেছি। নিছক আধুনিকতা একে গ্রাস কবতে পাবে নি, সর্বাঙ্গীণ প্রগতিব মধ্যেও এখানকার পরিবেশে, এ শহরের প্রকৃতিতে একটা বনেদী ঐতিহ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। জার্মান সংস্কৃতিব পুরনো ও নতুন ধারাব সমন্বিত রূপকে ব্যাভেরিয়ার এই বাস্তুধানী নগরে যেমন ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় তেমন আর বোধ হয় কোথাও নয়।

মার্কিন লেখক টমাস উল্ফ মিউনিক শহরকে যে জার্মানীর স্বর্গ বলে অভিহিত করেছেন তা সত্যি সত্যি এমন কিছু বাড়িয়ে বলা কথা নয়। উল্ফ তাঁর ‘ওয়েব অ্যাণ্ড বক’ উপন্যাসে ঠিকই লিখেছেন, “Some people sleep and dream they are in Paradise, but all over Germany people sometimes dream that they have gone to Munich in Bavaria—”

শুধু টমাস উল্ফের কথাই বা বলি কেন, গ্যায়টে থেকে টমাস মান এবং হেনরিক হাইনে থেকে গটফ্রিড কেলার পর্যন্ত কত কথাসিদ্ধি ও কবি যে তাঁদের সাহিত্যে ও কাব্যে এই মিউনিক সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তার অনেক কিছুই আপনার জানা থাকার কথা।

যাই হোক, মিউনিক শহরের পরিচয় দেবার জন্তে আপনাকে এ চিঠি লিখছি না। এখানে এসে এবাবকার কিছু অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখব ভেবেই এ চিঠি লিখতে বস। একটু আগেই স্টিফেন স্পেণ্ডারের নিজের মুখে তাঁর কতকগুলো কবিতার আবৃত্তি শুনে এসে হোটেল ফিরেই আপনার কথা মনে হল এবং এ চিঠি লিখতে বসলাম। এখানে ‘Internationale Dichterlesung der Landeshauptstadt’ নামে একটি আন্তর্জাতিক কবিতা আবৃত্তি সমিতি আছে। এই সমিতির আহ্বানে মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী কবিরা এঁদের আয়োজিত অস্থানে নিজ নিজ কবিতা আবৃত্তি করে

যান। তেমনি এক আমন্ত্রণেই স্পেণ্ডার মিউনিকে এসেছিলেন এবং এ শহরের কাব্যমোদীদের তিনি কবিতা শুনিয়ে গেলেন। আমরাও শ্রোতা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে সে অস্থানে উপস্থিত ছিলাম। সে অভিজ্ঞতার কথাই লিখছি। বোধ হয় ১৯৫৫ সনে কলকাতায় আপনার বাড়িতেই স্পেণ্ডারকে প্রথম দেখেছিলাম। তাবপবেও তিনি কলকাতা গেছেন। কিন্তু জার্মানীর পরিবেশে স্পেণ্ডারকে দেখলাম যেন অজ্ঞপ্তে।

সন্ধ্যা আটটা। অত্যন্ত মনোবম পরিবেশ। পুরনো রাজপ্রাসাদের থিয়েটার হল Altes Residenztheater অথবা Cuvillies Theater-এ প্রতিটি আসনে নিশ্চয় শ্রোতা। আগে থেকেই প্রত্যেকের চোখেমুখে কবির আবির্ভাব-প্রতীক্ষা চিহ্ন সুপরিষ্কৃত। ঠিক আটটায় কনসার্টে বিটোফেনের বাজনা বেজে উঠল। বাজনার শেষে যেন আবও গভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সাবাহলটি।

মঞ্চ এসে দাঁড়ালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-অধ্যাপক ডক্টর উলফগাং ক্রেমেন। সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণে কবির পরিচয় দিলেন অধ্যাপক ক্রেমেন। এক সময়ের সাম্যবাদী কবি স্টিফেন স্পেণ্ডার কিভাবে মোহ-মুক্তবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ কবলেন কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাই তিনি বিশ্লেষণ করলেন। জার্মানীর সঙ্গে কবির অনেক দিনের যোগাযোগের কথা এবং সাম্প্রতিক কালে জার্মান কবি রিল্কেব প্রতি তাঁর সুগভীর আনুভূতিব কথাও তিনি উল্লেখ কবলেন। আমার পক্ষে অবশ্য মাঝে মাঝে দু-একটি পবিচিত শব্দ ছাড়া ডক্টর ক্রেমেনের কোন কথাই বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না, কাবণ জার্মানদের সভায় ইংরেজ কবিকে তিনি স্বভাবতঃই জার্মান ভাষাতেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন—যে ভাষায় আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবে অধ্যাপকের বক্তৃতাব মোটামুটি সবটাই প্রায় আমি বুঝে নিয়েছি দোভাষীর মাধ্যমে। বক্তৃতা-শেষে ডক্টর ক্রেমেন কবিকে আহ্বান জানিয়ে অন্তর্হিত হলেন মঞ্চ থেকে।

পবমুহূর্তেই আবির্ভূত হলেন স্বনামখ্যাত কবি। সঙ্গে তাঁর কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ। নিজের কবি-জীবন সম্বন্ধে সামান্য ভূমিকায তিনি প্রকাশ কবলেন কিশোর বয়সে কী ভাবে তিনি শঙ্কিত পদক্ষেপে তাঁর চেয়ে একুশ

বছরের বড় তখনকার দিনের স্মৃতিস্তম্ভিত কবি এলিয়টের সম্মুখে প্রথম উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কত বকমে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। প্রথম জীবনে মাত্র বছর দুয়েকের বড় ডবলিউ এইচ অডেনের সঙ্গে কেমন করে তাঁর বন্ধুত্ব ঘটেছিল এবং কেন তিনি অডেনকে 'the most brilliant poet of his generation' বলে অভিহিত করেছিলেন তাবও সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা দিলেন স্পেণ্ডার। সর্বশেষে তিনি তাঁর জীবনে আইবিশ কবি ইয়েটসের প্রেরণা ও প্রভাব সম্বন্ধেও কিছু বলে ভূমিকা-ভাষণ শেষ করলেন। স্পষ্ট করে কম্যুনিজম সম্বন্ধে কোন কথা না বললেও তাঁর এই ভাষণে আব যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা হল এই, মার্কসীয় দর্শন ততটা নয়, প্রধানতঃ নির্ধারিত মানুষের প্রতি সমতাবোধই স্পেণ্ডারকে এক সময়ে সাম্যবাদ সমর্থনে অল্পপ্রাণিত করেছিল।

এই ভাষণের পর কবি একেব পর এক অনেকগুলো কবিতা পড়লেন। দশটি। তাব অধিকাংশই কবির আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'World within World'-এর পটভূমিকা থেকে, বাকি কয়টি তাঁর হালের রচনা থেকে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবিমনকে বিষিয়ে তুলেছিল। সেই স্মৃতির পটভূমিকায় রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে কবিকণ্ঠ ক্ষুদ্র হয়ে উঠল, কল্পিত স্বরে তিনি উচ্চারণ করলেন "Fox and Lorca claimed as history on the walls, Are now angrily deleted, Or to dust surrender their dust, From golden praise excluded" তারপর 'All the lessons learned, unlearned, ..' ইত্যাদি বলতে বলতে তাঁর যেন কণ্ঠ বোধ হয়ে এল।

অক্সফোর্ডে শিক্ষাশেষে স্পেণ্ডার বছর দুই ধবে জার্মানী সফর করেন। তাব পরেও তিনি আব একবার জার্মানীতে এসেছিলেন। জার্মান শ্রোতাদের সামনে জার্মানী সম্বন্ধে তিনি দুটি কবিতা আবৃত্তি কবলেন। তাব মধ্যে হামবুর্গের ওপব বচিত কবিতাটি আমাব খুবই ভাল লেগেছে। হামবুর্গের লোক, তাব জাহাজঘাট, তাব মনোমুগ্ধকব নগর-পরিবেশ জন-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ফুটে উঠেছে কবিতাটির মধ্যে। স্পেণ্ডার মুখ্যত রোমাণ্টিক চৈতন্যে বিশ্বাসী এবং তাঁর কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই নিবিকর্ষম। নব ও স্নিগ্ধ চিত্রকল্পের ছায়ায় যে বক্তব্য তাঁর কবিতা বহন কবে তা আমাদের মগ্ন-চৈতন্যের গভীরে নিয়ে যায়। তাঁর এই কবিতাটি তাবই একটি দৃষ্টান্ত। 'In Germany in 1929' কবিতায় একটা ছুচিস্তামষ উত্তেজনার স্রব ধ্বনিত হল স্পেণ্ডারের কণ্ঠে। হিটলার তখনও ক্ষমতা অধিকার করেন নি জার্মানীতে, কিন্তু তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে চলেছে। প্রথম মহাযুদ্ধেব

সামান্য সৈনিক হিটলার প্রগতি ও দেশপ্রেমেব নামে বজ্রমুষ্টিতে ক্ষমতা সংহত কবে চলেছেন দেশ-শাসনের পূর্ণ-ক্ষমতা দখলের জন্তে। নাৎসীবাদী ডিক্টেটরশিপের ঘন মেঘাঙ্ককাব ক্রমে ক্রমে ছেয়ে ফেলেছে জার্মানীব আকাশ। কবির অন্তর্দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে। "It was easy to be advanced only to take away the clothes"—নগ্ন অত্যাচারের মধ্য দিয়ে প্রগতিব ধ্বজা উড়তে শুরু হয়েছে তখন জার্মানীতে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাই সতর্কবাণী উচ্চারণ কবেছেন স্পেণ্ডার। তাঁর সেই সতর্কবাণী জার্মানীকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিবিষে আনতে না পাবলেও কবির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিব স্বচ্ছতা স্পেণ্ডার প্রমাণ কবেছেন। ফ্যাসি-বিবোধী কবি-নাযক স্পেণ্ডার এই কবিতায় ভাস্বর।

আবৃত্তি অল্পষ্ঠান শেষ হলে শ্রোতৃদল শান্ত সমাহিত ভাব নিয়ে বেবিষে এলেন হল থেকে। নীববে বাইরে এসে আমবাও আমাদের গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি সেই পরিচিত পথেই এগিয়ে চলল। হিটলাবেব হেড-কোয়ার্টার্স-এব এলাকায় এসে পৌঁছুতেই চমকে উঠলাম। একটু আগেই যে হিটলাবেব জার্মানী সম্পর্কে কবিকণ্ঠে তাঁর স্বরচিত কবিতাব আবৃত্তি—নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে তাঁব তীব্র ধিক্কারধ্বনি শুনে এলাম সেই হিটলারের মূল কর্ম-কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব ভয়াবহ ইতিহাস-চিত্র ঘেন মনের চোখে মুহূর্তের জন্তে ভেসে উঠল। আরও অনেকদিন অনেকবাব এ পথে এমনি আশা-বাণী কবেছি, কিন্তু এমন অল্পভূতি কখনও আর হয় নি। হয়তো আজকের সন্ধ্যার অভাবনীয় যোগাযোগই এ অল্পভূতিব কাণে।

মনে পড়েছে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবাব পঁচিশ বছর পব আর একটা যুদ্ধের মহড়া আবিস্ত হয়েছিল এইখানে—দ্বিতীয় মহাসমরের বিভীষিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই মিউনিকে। এই শহবেই ১৯৩৮ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর সেই কুখ্যাত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ফ্যাসিস্ত ইতালি ও নাৎসী জার্মানীব সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ব্রুটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে। সেই ঘৃণ্য বোবাগপড়াব ফলেই ঘোরতর অশান্তির আগুন জলে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে প্রায় সারা পৃথিবীময়। চাঁদের কলঙ্কের মতই সেই কালিমা মনোবম মিউনিকেব ইতিহাসে একটি চিবস্থায়ী স্মানচিহ্ন।

চিঠি বেশ দীর্ঘ হয়ে গেল, তবে বিবক্তিকর হয়ে পড়েছে কিনা জানি না। রাতও এখন অনেক, তাই এখানেই শেষ কবছি। এবারের ইয়োরোপ সফরের গল্প ববং দেশে ফিরে গিয়ে আপনাব ঘুরে বসেই বলব।

সশ্রদ্ধ নমস্কাবাস্তে, ইতি।*

প্রীতিমুগ্ধ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

* শ্রীযুক্ত সজ্জনীকান্ত দাসকে লেখা চিঠির প্রতিলিপি

সিনেমার নেশা ত্রিলোচনকে হঠাৎই ধরিল। ই্যা, ব্যাপারটিকে হঠাৎই বলা যায়, কেন-না, ইহাব পূর্বে এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে ত্রিলোচন সিনেমা কখনও দেখেন নাই। দেখিবার কথা তাঁহার মাথায় কোনদিন আসেও নাই। তিনি ব্যবসায়ী লোক, ব্যবসায় লইয়াই জীবন কাটাইয়াছেন। আবস্ত কবিয়াছিলেন প্রায় শূন্যহাতে—চিটাগুডেব কারবাব দিয়া। আব তারপর, নানান ব্যবসায়ের নানান কায়দায় এখন তিনি জোড়পতি।

এদিকে সংসাবও তাঁহার পূর্ণ। বিবাহ করিয়াছিলেন পনরো বৎসর বয়সে নয় বৎসরের একবস্ত্র মোক্ষদা-সুন্দরীকে। সেই মোক্ষদা এক্ষণে আড়াই-মনী-ওজনের পবিপূর্ণ গৃহিণী। ছেলেপুলে-নাতিনাতিতে বাড়ি বোঝাই।

কাজেই, সকল দিক হইতেই ত্রিলোচন তলাপাত্র স্তখেই ছিলেন। ব্যবসায়ের কাজ লইয়া দিবারাত্র কখন যে কাটিয়াছে, তাহা নিজেই জানিতে পারেন নাই। অল্প-কিছু মাথায় আসা তো দুবের কথা।

এ-হেন ত্রিলোচন তলাপাত্রকে এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হঠাৎ সিনেমার নেশায় ধরিল।

ব্যাপারটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলা যাউক।

কয়েকদিন ধরিয়াই ত্রিলোচনের মনটা বিশেষ ভাল যাইতেছিল না। একটি বড় বকমের কন্ট্রাক্টের জন্ত কিছুদিন পূর্বে এক বড়-গোছের সরকারী কর্তাকে বেশ-কিছু টাকা খাওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু সে টাকাই গিয়াছে, কাজ হয় নাই। কর্তামহাশয় আবও বেশী টাকা খাইবা কন্ট্রাক্টটি অপর-একজনের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। কাজেই ত্রিলোচনের মন খাবাপ, মেজাজ নিতান্তই রুগ্ন।

এমনি অবস্থায় সেদিন বিকালে অফিসে আপনাব চেয়ারে বসিয়া আছেন, এমন সময় হাজিব হইলেন ঢোলগোবিন্দ শিকদার। ঢোলগোবিন্দ ত্রিলোচনের বাল্য-বন্ধু। বেশ হঠপুঠ হাসিখুশি মাছয়। অবস্থাও মোটামুটি ভালই। কাজেই ত্রিলোচনের সহিত তাঁহার খুব হৃদয়তা।

ঢোলগোবিন্দকে দেখিয়া ত্রিলোচন খুশী হইলেন। একটি স্পেশিয়াল চেয়ার আগাইয়া দিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

ঢোলগোবিন্দ চেযাবে বপু এলাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর? তুমি একরূপ মুখ শুষ্ক করিয়া বসিয়া আছ কেন হে?

আব বলিও না ভাই, সব ব্যাটা জুয়াচোব, ছুঁচো!—বেজার মুখে ত্রিলোচন উত্তর দিলেন।

কেন, কি হইল?

হইবে আব কি, কলিকালে যা হইবাব। ঘোব কলি, ঘোর কলি। গ্রায়-ধর্ম সব রসাতলে গিয়াছে।—বলিয়া ত্রিলোচন সবিস্তারে সকল বিবৃত কবিলেন।

শুনিয়া ঢোলগোবিন্দ বলিলেন, তা যা হইবার হইয়াছে, এখন উহা লইয়া মন খাবাপ কবিয়া আব কি করিবে। তাহাব অপেক্ষা ববং চল একটি সিনেমা দেখিয়া আসি।

সিনেমা! ত্রিলোচন অবাক হইলেন। সিনেমা তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। উহা নিতান্তই ফচকে চ্যাংড়া ছোকবাদের কাণ্ড বলিয়াই তাঁহার ধারণা। কাজেই ঢোলগোবিন্দ যে তাঁহাকে সিনেমা দেখিবাব কথা বলিবে, ইহা ত্রিলোচনের নিকট প্রায় অবিশ্বাসই মনে হইল। ভাবিলেন, হয়তো তিনি শুনিতে ভুল কবিয়াছেন।

কিন্তু না, শুনিতে ভুল হয় নাই। ঢোলগোবিন্দ আবার বলিলেন, ই্যা, সিনেমা। চল, একটি সিনেমা দেখিয়া আসিবে। দেখিবে, মেজাজ ভাল হইয়া যাইবে।

অ্যা।

ই্যা, দেখিবে মন কিরূপ প্রফুল্ল হয়। ঢোলগোবিন্দ উৎসাহিত করিতে চাহেন: চল, উত্তরায় 'হৃদয়ে হৃদয়' হইতেছে, একেবারে হিটু ছবি, হিল্লোলিনী দেবী নাটিকা। উহাই দেখিয়া আসি চল। দেখিবে, হিল্লোলিনীর কী রূপ, কী অ্যাক্টিং, কী গান। আত্মা একেযাবে তব হইয়া যাইবে। মনে হইবে যেন বৈকুণ্ঠে আসিয়াছ।

আঁ।—এত কথা শুনিয়াও ইতস্ততঃ করিতে থাকেন
ত্রিলোচন : বলিতেছ যাইব ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, যাইবে ছাড়া কি ! চল চল। আমি তো
প্রত্যেক সপ্তাহে যাই।

আর কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া ত্রিলোচনকে
একরকম জোব করিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া
পড়িলেন ঢোলগোবিন্দ। আব, সমস্ত পথ গাড়িতে কেবল
হিল্লোলিনী প্রশংসা শুনাইলেন। তাহার রূপ, তাহার
গান, তাহার অ্যাক্টিং—উহাব আর তুলনা নাই। যদিও
তারকারূপে তাহার আবির্ভাব বেশী দিন ঘটে নাই, তবুও
সমগ্র বঙ্গদেশে লোক ইহাব মধ্যেই তাহার নামে উন্মাদ।
পনরো হইতে পয়ত্রিশের মধ্যে যাহাদের বয়স এরূপ
বঙ্গজপুরুষ সকলেই মাসেব মধ্যে অন্ততঃ আটটা দিন
বাত্তিকালে হিল্লোলিনীর স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। প্রত্যেক
বৎসর উজ্জয়িনীক যুবক তাহার জন্তে স্নাইদ্য করে।
আর, প্রতিদিন তাহার নামে এত প্রেমপত্র যায় যে কেবল
সেইজন্তাই তাহাকে পাঁচজন সেক্রেটারি রাখিতে
হইয়াছে। নীচে ত্রিলোচন সব শুনিলেন—কোন কথার
কোন জবাব দিলেন না।

তারপর যথাসময়ে উভয়ে টিকিট কাটিয়া হলে
চুকিলেন। এবং যথাসময়ে শো আরম্ভ হইল। প্রথম
দিকে যতক্ষণ নিউজ রীল, বিজ্ঞাপনের স্লাইড ইত্যাদি
দেখানো হইতে লাগিল, ততক্ষণ ত্রিলোচন কেবলই উসখুস
করিলেন। চাবিদিকে দরজা বন্ধ, অন্ধকার, আর ঘবভর্তি
একগাদা লোক—এদিক-ওদিক তাকাইয়া তাকাইয়া যতই
দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অস্থি লাগিতে
লাগিল। একবার ফিসফিস করিয়া ঢোলগোবিন্দকে
বলিলেন, চল, উঠিয়া যাই। আমাব ভাল লাগিতেছে
না।

ঢোলগোবিন্দ চাপা গলায় ধমক দিলেন, পাগল
হইয়াছ। চুপ করিয়া বসিয়া থাক। আসল বই শুরু
হউক—তখন দেখিবে।

অতএব চুপচাপ ত্রিলোচনকে বসিয়া থাকিতে হইল।
তাকাইয়া থাকিতে হইল পর্দা দিকে।

তাবপর যথাসময়ে শুরু হইল আসল বই—‘হৃদয়ে
হৃদয়’। হিল্লোলিনী দেখা দিলেন। এতক্ষণে ত্রিলোচনের

মনে হইল, ঢোলগোবিন্দ যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য—
হিল্লোলিনী যেমন রূপ তেমনি গুণ। আর, বইটিও খুব
জবর—জমজমাট প্রেমের কাহিনী। উহাব রচয়িতাও
বিখ্যাত ব্যক্তি—এক্ষণকার বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক
শিবশঙ্কু মুখোপাধ্যায়। শিবশঙ্কু যাহা লিখেন তাহাই
বঙ্গসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান হয়, তাহাই সিনেমা
হয়। কাজেই, শিবশঙ্কুর রচনার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন
প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাঁহার রচনা সবই অসাধারণ।
বর্তমান কাহিনীটিও অসাধারণ। ইহাতেও মহৎ সাহিত্যের
সকল লক্ষণই বর্তমান। যথারীতি নাটক-নাট্যকার কলেজে
আলাপ, এবং আলাপমাত্র প্রণয়। তাবপর যথারীতি
প্রচুর চাঁদেব আলো, ফুলবাগান এবং ডুয়েট গান। এবং
সর্বশেষে বহু বাধাবিপত্তি পার হইবার পর সানাইয়ের
বাজনা।

ত্রিলোচন বুঁদ হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

বই শেষ হইয়া গেল, দর্শকেরা সকলে বাহিব হইয়া
গেল—তবুও ত্রিলোচন উঠেন না। ঢোলগোবিন্দ দুই-
একবার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না।
শেষে কহুই দিয়া পেটে গুঁতা দিতেই ত্রিলোচন কোঁৎ
কবিয়া উঠিলেন।

ঢোলগোবিন্দ বলিলেন, চল, শেষ হইয়া গিয়াছে।

ওঃ। চল।

ত্রিলোচন উঠিলেন। হল হইতে উভয়ে বাহির
হইলেন। গাড়িতে উঠিতে উঠিতে ঢোলগোবিন্দ জিজ্ঞাসা
করিলেন, কী—কেমন দেখিলে ? কেমন লাগিল ?

চমৎকার ! চমৎকাব ! অদ্ভুত ! এক্সেলেন্ট !—
ত্রিলোচন উচ্ছ্বসিত হইলেন : খুব ভাল লাগিয়াছে,
ভাই।

তবে যে আসিতে চাহিতেছিলে না ?

আরে, পূর্বে কি ছাই জানিতাম—সিনেমা এইরূপ !—
ত্রিলোচন বলিলেন, খুব ভাল লাগিয়াছে, ঢোল, খুব ভাল।
আহা, যেমন বই—আব তেমনি হিরোইন ! অপূর্ব !

আসিবার সময় ত্রিলোচন সুাবা পথ হিল্লোলিনীর
গুণগান শুনিতে শুনিতে আসিয়াছেন ; যাইবার সময়
গেলেন করিতে করিতে। যখন গৃহে পৌঁছাইলেন তখনও
তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে হিল্লোলিনীর রূপ ভাসিয়া বেড়াইতেছে,

কানে বাজিতেছে তাহার গান—‘হায়, হৃদয়ে যাবেছ
ল্যাং’।

গুনগুন করিতে কবিতাই বাড়ি ঢুকিলেন ত্রিলোচন।
শয়নকক্ষে ঢুকিতেই মোক্ষদার সহিত দেখা হইল। গলায়
মধু ঢালিয়া ‘হৃদয়ে হৃদয়’-এব টিয়ে-ঝুঁটি নাথকের ভদ্রীতে
ত্রিলোচন ডাকিলেন, মুখু, অ মুখু!

কী ই ই?—মোক্ষদা বাক্যব দিলেন।

একবার এদিকে শুনিয়া যাও।—ত্রিলোচন মদনমোহন
হাসি হাসিলেন।

মোক্ষদা আড়াই-মনী বপু লইয়া অনেক কষ্টে নিকটে
আসিয়া দাঁড়াইলেন। ত্রিলোচন ডান হাতের দুই
আঙুলে তাহার খুঁতনি তুলিয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ
লইয়া গিয়া গান ধরিলেন, হায়, হৃদয়ে যাবেছ ল্যাং।

আঃ মরণ!

এক বাটকায় হাত ঠেলিয়া সবাইয়া দিলেন মোক্ষদা।
গলায় ভাঙা কাঁসি বাজাইয়া বলিলেনঃ বুড়া বয়েসে এ
আবাব কী বন্ধ! বলি মদটদ গিলিয়া আসিয়াছ নাকি!

এক মুহূর্তে চুপসাইয়া গেলেন ত্রিলোচন। আমতা
আমতা করিয়া বলিলেন, মদ...সেকি...না না... ছিঃ
ছি...

তবে, তবে অত ফুঁটিটা কিসের?

ফুঁতি মানে ফুঁতি...ইয়ে...

থাক, আর ইয়ে-ইয়ে কবিতা হইবে না।—ধমক
দিলেন মোক্ষদা, এখন দয়া করিয়া তাড়াতাড়ি কাপড়-
জামা ছাড়িয়া গিলিয়া উদ্ধার কর। কত সাধ করিয়া
ঝুঁইমাছেব মাথা দিয়া ঘণ্ট রাঁধিয়া বাখিয়াছি, তা ছুটা
যে খাইব তাহারও উপায় নাই।

কেন, তুমি পূর্বেই ভোজন সমাধা কবিয়া নিলেই তো
পারিতে।—ত্রিলোচন সাঙ্ঘনা দিতে চেষ্টা করিলেন।

থাক, আব দরদ দেখাইতে হইবে না।—আবাব
মধুবর্ণ কবিলেন মোক্ষদাঃ এখন তাড়াতাড়ি যাও।

আচ্ছা আচ্ছা, যাইতেছি।

তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ছাড়িতে থাকেন ত্রিলোচন।

আর, আপন মনেই গজগজ করিতে থাকেন মোক্ষদা,
কিছুই তো খাই না, মুখে বোচে না। শরীর শুকনাইয়া
আধখানা হুইয়া গেল। *বলি একটু গরম-গরম মুড়িঘণ্ট

হইলে বুঝি রুচিবে। তা এমন কপাল যে তাহাও
সময়মত ছুটা মুখে দিবার উপায় নাই। মরণ...মরণ...

খাওয়াদাওয়ার পব যথাসময়ে শুইতে গেলেন
ত্রিলোচন। অন্তর্দিন শয়নের সঙ্গসঙ্গেই ঘুম আসে,
কিন্তু আজ আসিল না। বহুক্ষণ ধরিয়া বিছানায় এপাশ-
ওপাশ করিলেন, চোখ বুজিয়া পড়িয়া বহিলেন, কিন্তু
ঘুম আসিল না কিছুতেই। কেবলই সামনে ভাসিতে
লাগিল ‘হৃদয়ে হৃদয়’-এব সব দৃশ্য, হিল্লোলিনী ব ঢলঢল
মুখখানি, কানে বাজিতে লাগিল তাহার প্রেম-গদগদ
কথা, মধুময় গান।

পাশে শুইয়া মোক্ষদা ভোঁসভোঁস করিয়া ঘুমাইতে
লাগিলেন। গাঁকুগাঁকু করিয়া তাঁহার নাক ডাকিতে
লাগিল। আব, সেই স্বমধুর নাকের ডাক শুনিতো শুনিতো
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন ত্রিলোচন। মনে মনে বলিলেন,
জীবনটা বুধাই গেল। কেবল টাকার হিসাব কষিয়া-
কষিয়াই বুড়া হইয়া গেলাম। না পাইলাম প্রেম, না
পাইলাম বোম্বাং। আহা, হিল্লোলিনী কী সুন্দরী!
কী মধুমাখা কথা! আব, মোক্ষদা—

* * *

পরদিন বিকালেও অফিসের ছুটি হইবার পর ত্রিলোচন
বাড়ি ফিরিলেন না। হিল্লোলিনীর আর-একটি বই
হইতেছিল আব-এক হলে। টিকিট কাটিয়া গেলেন
সেখানে। একা-একাই গেলেন।

তারপরবে দিনও তেমনি।

তাহার পর, যেখানে যত পত্রিকায় হিল্লোলিনীর জীবনী
ছাপা হইয়াছে, ইন্টারভিউ ছাপা হইয়াছে, ছবি ছাপা
হইয়াছে, সব কিনাইয়া আনিলেন। অফিসে তাঁহার
শেল্ফে গাদা-গাদা ছবিওয়ালা পত্রিকা জমিল। সাবান্নিন,
যতক্ষণ অফিসে থাকেন, খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া কেবল সেই-
সকল পত্রিকা পড়েন ত্রিলোচন, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া
বারেবারে হিল্লোলিনীর নামান পোজের ছবি দেখেন।
অফিসেব কোন কাজে তাঁহাকে কেউ পায় না, কর্মচাষীবা
কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আনিলে ধমক খায়।

কিছুদিনের মধ্যেই দেশবিখ্যাত পত্রিকাসকলের কল্যাণে
হিল্লোলিনীব সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব-কিছু জানিয়া ফেলিলেন

ত্রিলোচন। হিল্লোলিনী মাছের ফ্রাই খাইতে ভালবাসে, কিন্তু মাংসের টিকিয়া কাবাব মোটেই পছন্দ কবে না, পান খায়, কিন্তু চুন খায় না, তাহাব ব্রেসিয়াব আসে প্যারিস হইতে, কিন্তু পেটিকোট ওয়াশিংটনের তৈয়ারি। হইলেই চলে না, নভেল ভালবাসে, কিন্তু পড়িতে লবাসে না, সাত বছর তিন মাস আট দিন বয়সেব সময় একবাব রাস্তায় ষাঁড়ের লড়াই দেখিয়া খুব মজা পাইয়াছিল—ইত্যাদি দবকারী খবর সবই ত্রিলোচনের জানা হইয়া গেল।

মনের মধ্যে দিনরাত এই-সকল কথা ঘুরিতে লাগিল। কেবলই চোখেব সামনে হিল্লোলিনী পল্লবিণী লতাব ন্যায় ভাসিতে লাগিল।

বাড়ির লোকেও ত্রিলোচনেব ভাব দেখিয়া অবাক হইয়াছে। কিন্তু কেহ কিছু বুঝে নাই। বিশেষ কথা বলেন না কাহারো সঙ্গে, দিনরাত গুম হইয়া থাকেন, কী যেন ভাবেন মনে হয়। কিন্তু কী ভাবেন, কী ভাবিতে পাবেন, তাহা জানে না কেহই।

মোক্ষদা একদিন জিজ্ঞাসাও করেন, তোমার অস্থখ-টস্থখ কিছু করিয়াছে নাকি ?

না, অস্থখ করিবে কেন!—হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন ত্রিলোচন।

তবে—ব্যবসায় লোকসান খাইয়াছ নাকি ?

নাঃ। ব্যবসায় ভালই চলিতেছে।

তবে ?

তবে কী ?

তবে তুমি অমন শুকাইয়া যাইতেছ কেন ?

কই, না তো।

দেখিতেছি যে।

ও তোমার চোখেব ভুল।

অগত্যা নিরস্ত হন মোক্ষদা।

কিন্তু মন নিরস্ত হয় না ত্রিলোচনের। সে তাহার কাজ সমানে করিয়া যাইতে থাকে।

অবশেষে আব থাকিতে না পাবিয়া ত্রিলোচন ঢোলগোবিন্দকে খবর পাঠান : জরুরী দরকার। অফিস হইতে সোজা এখানে চলিয়া আইস।

যথাসময়ে ঢোলগোবিন্দ হাজির হন। চেয়ার টানিয়া

লইয়া বসিতে বসিতে প্রশ্ন করেন, ব্যাপাব কি, এত জরুরী তলব ?

বস, বলিতেছি।—জবাব দেন ত্রিলোচন। তারপর বলেন, আচ্ছা ঢোল, তুমি আমার সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু কি না ?

হ্যাঁ, তাহাই তো মনে হয়।

না, মনে হয় না—তাহাই। তুমিই আমার সকলের অপেক্ষা বড় বন্ধু। সেই পাঁচ বৎসব বয়স হইতে তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব।

তা তো বটেই। কিন্তু তাহাতে কী ?

তাহাতেই সব। তাই, কেবল তোমাকেই ডাকিয়াছি। আর কাহাকেও বলি নাই।

কিন্তু কেন ?

সেই কথাই বলিতেছি। বলিব বলিয়াই ডাকিয়াছি।

একটুকুণ থামেন ত্রিলোচন। তারপর বলেন, তাই, আমার জীবন-মরণ সমস্ত।

কেন ? কি হইয়াছে ?—কোতুহলী হন ঢোলগোবিন্দ।

আস্তে আস্তে সকল কথা খুলিয়া বলেন ত্রিলোচন, সেদিনের সেই সিনেমা দেখা হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে সব।

ঢোলগোবিন্দ গম্ভীর মুখে শুনেন। তারপর প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে তোমার কি মনে হইতেছে যে তুমি হিল্লোলিনীর প্রেমে পড়িয়া গিয়াছ ?

হ্যাঁ, তাই, তাহাই মনে হইতেছে।—কাতর মুখে বলেন ত্রিলোচন, ‘হৃদয়ে হৃদয়ে’র নাযকের যাহা যাহা হইয়াছিল, আমারও ঠিক তাহা তাহা হইতেছে। বুকের মধ্যে কেবল হাঁচোড়-পাঁচোড় করিতেছে, মনে হইতেছে, একটি নেংটি ইছব যেন খুচখুচ কবিয়া আঁচড়াইতেছে, মনে হইতেছে যেন একটি মুড়ো-ঝাঁটা দিয়া কে কেবলই ঝাঁট দিতেছে।

হুঁ।—গর্জন ছাড়েন ঢোলগোবিন্দ। তাবপর বলেন, আচ্ছা, দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে কি ?

হ্যাঁ।—ঘাড় নাড়েন ত্রিলোচন।

আচ্ছা,—আবাব প্রশ্ন করেন ঢোলগোবিন্দ, মন উড়ু-উড়ু কবিতেছে কি ?

হুঁ।

চোখে ঘুম আসিতেছে না ?

না।

মুখে অরুচি আছে ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, ঝাল সিঙাড়া খাইতে ইচ্ছা করিতেছে ?

ঝাল সিঙাড়া ?

হ্যাঁ। বিবহেব সময় মেয়েরা খুব ঝাল সিঙাড়া খায়।

উহা প্রেমের প্রধান লক্ষণ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

তাহা হইলে আমারও করিতেছে—ঝাল সিঙাড়া খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।

হঁ।

আবার চিন্তাঘিত হন ঢোলগোবিন্দ। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। তারপর বলেন, তাহা হইলে তুমি যথার্থই প্রেমে পড়িয়াছ।

হ্যাঁ ভাই, তাহাই মনে হইতেছে। হিল্লোলিনীকে না পাইলে আমি মরিয়া যাইব।

হঁ। বড়ই মুশকিলের কথা।—গম্ভীর মুখে বলেন ঢোলগোবিন্দ, বয়স হইয়াছে, উহা কিছু নয়। পুরুষ-বাচার আবার বয়স কি? আমাদের পিতৃপুরুষেরা গঙ্গাযাত্রার সময়েও বিবাহ করিয়া গিয়াছেন। তবে কি না, তোমার আবার সংসা-ব-টংসা সব রহিয়াছে।

তাহাতে কি।—বলেন ত্রিলোচন, আমি তো আর বিবাহ কবিত্তে যাইতেছি না। আমি কেবল হিল্লোলিনীর সহিত একটু ভাব কবিত্তে চাহিতেছি—একটু পবিত্র প্রণয়, একটু কামগন্ধহীন ভালবাসা।

হঁ।

না, হঁ না। হিল্লোলিনীর সহিত পবিত্রের ব্যবস্থা তোমাকে কবিয়াই দিতে হইবে। নহিলে আমি আত্মঘাতী হইব, বিবাগী হইব, পলিটিক্স করিয়া জেলে যাইব।

আচ্ছা, দেখি।—বলেন ঢোলগোবিন্দ, আমার এক ভাগিনেয় আছে চিত্র-পরিচালক। দেখি, তাহাকে ধরিয়া দেখি—ব্যবস্থা কিছু করা যায় কিনা।

* * *

ব্যবস্থা হইল কয়েকদিনের মধ্যেই। না হইবার কোন কারণও ছিল না। ত্রিলোচন বিখ্যাত ব্যবসায়ী, বডলোক বলিয়া খ্যাতিও আছে। কাজেই, হিল্লোলিনীর দিক হইতে আপত্তির কিছু ছিল না।

অতএব এক সন্ধ্যায় ঢোলগোবিন্দের ভাগিনে নিশিকান্তের সহিত হিল্লোলিনীর বাড়িতে গিয়া হাজি হইলেন ত্রিলোচন। হিল্লোলিনী ভিতরে ছিলেন। খবর দেওয়া হইল।

তারপর, প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হিল্লোলিনী বাঁ হইলেন—একেবাবে যথার্থ ‘হৃদয়ে হৃদয়ে’র নাটক। খেতপাথরের গ্রায় ধবধবে সাদা গায়ের রঙ, কালো কুচকুচে অজস্র চুল, টানাটানা অপক্লপ ভুরু, আব কাপড়ে-চোপড়ে ভুরুভুরু খোশবু। হ্যাঁ করিয়া তাকাইয়া ‘বহিলেন ত্রিলোচন। মনে হইল, তাঁহার স্বপ্নপিতৃের চারিপাশে হঠাৎ কে যেন একটি স্বগন্ধি মধুর পুলটিন লাগাইয়া দিল। আত্মারাম তঁর হইয়া উঠিল এক নিমেষে।

নমস্কার বিনিময়ে পর আলাপ শুরু হইল। ত্রিলোচন তাঁহার ভক্তিব কথা জানাইলেন। বলিলেন, হিল্লোলিনী দেবি, আজ আমার জীবন ধন্য হইল, আমার পিতাব-পিতামহেব-প্রপিতামহের সকলের জীবন ধন্য হইল। আপনাব গ্রায় শিল্পীর সহিত পরিচয় হইয়া কী যে আনন্দ হইতেছে।

হিল্লোলিনী তাঁহার মুক্তার গ্রায় সাদা স্নন্দর দুইপাটি দস্ত আকর্ণ বিস্তার করিয়া লাজুক-হাসি হাসিলেন। বলিলেন, না না, কী যে বলেন।

ত্রিলোচন জোব দিয়া বলিলেন, না, ইহাতে আপনাব লজ্জাব কিছু নাই। গুণের আদব অবগুই কবিত্তে হইবে। ইহা আমাদের শাস্ত্রবাক্য। বেদেই তো বলিয়াছে... বলিয়াছে...

বলিয়াছে, যে গুণের আদর করে না সে নিতান্তই পামর।—নিশিকান্ত কথা যুগাইয়া দিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিতান্তই পামর।—সায় দিলেন ত্রিলোচন বলিলেন, মহাভারতেও আছে এই কথা।

আছেই তো।—মাথা নাড়িল নিশিকান্ত।

তবেই দেখুন।—এবাব দস্তবিস্তারের পাল ত্রিলোচনেব।

খাবার্তা জমিয়া উঠিল। কিন্তু নিশিকান্ত বসিতে না বেশীক্ষণ—তাহাব স্বটিং আছে। সে চলিয়া

যবে কেবল ত্রিলোচন আব হিল্লোলিনী।

হিল্লোলিনী বলিল, জানেন মিষ্টার তলাপাত্র, আপনাকে আমাব এতটুকুও অচেনা বলিয়া মনে হইতেছে না।

হইতেছে যেন আপনাকে আমি কতদিন ধরিয়া চিন্তিত যুগ, কত জীবন।

হুই, আমারও ঠিক তাই।—খুশীব হাসিতে হইলেন ত্রিলোচন। ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে

লন, জানেন, আপনাকে যখন 'হৃদয়ে হৃদয়ে' প্রথম নাম, আমারও ঠিক তাহাই মনে হইয়াছিল—

আপনাকে যেন আমি আগে চিনিতাম—হয় পূর্বজন্মে, হয় তাহার পূর্বজন্মে, না হয় তাহারও পূর্বজন্মে।

নি যেন আমাব...

হঠাৎ কথায় বাধা পড়িল। একটি চাকর ঘরে

হঠাৎ যেন হিল্লোলিনীকে কেমন-একটু বিব্রত

হল। আপন মনেই বলিল, তাই তো, বড় মুশকিল

ত্রিলোচন না থাকিতে পারিয়া বলিলেন, কি হইয়াছে?

হইয়াছে—মানে, একটু যেন ইতস্ততঃ কবিল

লিনী। তাবপর বলিল, কিছু ফার্মিচাব কিনিয়া—

কয়েকদিন পূর্বে, তাহাব বিল লইয়া আসিয়াছে।

হাতে আমাব এক্ষণে টাকা নাই। সেইজন্ত—

কত টাকা?

খুশী নয়—আড়াই হাজারের মত।

ত্রি!—হঠাৎ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন ত্রিলোচন।

লন, একটি কথা বলিব?

লন।

আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তবে টাকাটা না হয়

আমিই দিয়া দিই।

না, সেকি। আপনি কেন—

কেন। মনে করুন ইহা ভক্তের পূজা। আপনি

হিলে আমি খুবই দুঃখ পাইব।

তাই তো—বড়ই মুশকিলে ফেলিলেন।—চিন্তাম্বিত

দেখাইল হিল্লোলিনীকে। তারপর যেন নিরুপায় হইয়া বলিল, দিন তাহা হইলে। কি আর করিব—আপনাব মনে আমি কষ্ট দিতে পারিব না কিছুতেই।

মুখে হাসি ফুটিল ত্রিলোচনের। পকেট হইতে চেক-বই বাহির কবিয়া থম্‌থম্‌ কবিয়া লিখিয়া চাকরের হাতে দিলেন। চাকর চলিয়া গেল।

হিল্লোলিনী উঠিয়া আসিয়া ত্রিলোচনের পাশেই সোফায় বসিল। বলিল, সত্যিই, আপনি যেন পূর্বের জন্মে আমার কেহ ছিলেন।

কেন, পূর্বের জন্মে কেন?—ভবশ্য পাইয়া ত্রিলোচন তাহাব একটি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইলেন : এই জন্মে কি কেহ হইতে পারি না, হিলু?

হিল্লোলিনী লজ্জায় ঘাড় কাত করিয়া রহিলেন। উত্তর দিলেন না।

ত্রিলোচন আবার গদগদ স্বরে ডাকিলেন, হিলু! হিল্লোলিনী!

হিল্লোলিনী কিছু বলাব পূর্বেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে বজাঘাত হইল। পথেব দিকেব জানালা দিয়া গুণাগোছের চেহাবাব একটি লোক এতক্ষণ উহাদের দিকে তাকাইয়া ছিল। হঠাৎ সে এক লাফে ঘবে ঢুকিল। হিল্লোলিনীব দিকে তাকাইয়া ডাকিল, খেদি।

আতকাইয়া উঠিয়া হিল্লোলিনী ছিটকাইয়া সবিয়া গেল ত্রিলোচনের পাশ হইতে। বলিল, কে, কে তুমি?

অঃ, পোড়াকপাল্যা, তুই আমারও চিনতে পাবতেছস না!—উত্তর দিল গুণাটি, আমি যে তব সোয়ামি—পেবাণবল্লভ। মনে নাই, তুই আমার ঘর খেইক্যা এক বাবুর লগে পলাইয়া আইছিলি। সেই খেইক্যা তরে কতো খুজছি, কিন্তু পাই নাই। হেসে শোনলাম, তুই নাকি খ্যাটার কইর্যা বডোমাল্লব হইছস। তাই দেখতে আইছিলাম কেমন আছস। তর জানলাব পাশে দাড়াইয়া আছিলাম অনেকক্ষণ। দেখলাম, তুই পর-পুরুষেব লগে পিরিত কবতেছস। দেইখ্যা আর সামলাইতে পারলাম না।

কে ছুমি, তোমাকে আমি চিনি না।—আবার চিৎকাব করিয়া উঠিলেন হিল্লোলিনী।

হায় হায় হায়, তর মাথাভা দেহি পুকেব মতই গরম
বইছে।—গুণ্ঠাটি বলিল, দাড়া, তরে একটু ঠাণ্ডা কইব্যা
দিতেছি।

ঘবেব কোণে তেপায়ার উপরে কাচেব কুঁজো-ভর্তি
জল ছিল। গুণ্ঠাটি এক লাফে আগাইয়া গিয়া কুঁজোটি
লইয়া আসিল। হিল্লোলিনীর মাথায় ঢালিয়া দিল জল।
আর আশ্চর্য—সেই জলেব কী শক্তি! হিল্লোলিনীব অঙ্গের
শেতপাথবেব গায় সাদা রঙ গলিয়া গলিয়া ধুইয়া ধুইয়া
পড়িতে লাগিল সেই জলে।

ত্রিলোচন খানিকক্ষণ হাঁ কবিয়া সাদায়-কালোয়
মাথামাখি হিল্লোলিনীর অপকূপ মুখেব দিকে তাকাইয়া
বহিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধমক দিলেন, এই,
ক্যা হোতা হ্যায়। লেডিজকো সম্মান নেহি রাখতা
হ্যায়।

লোকটি ভয় পাইল না। উল্টাইয়া ধমক দিল,
আপনে আবার কেডা বাবু? হইত্যাছে সোষামি-ইস্তিবাব
মত্তে কতা, এব মত্তে আপনে নাক ঢুকাইতেছেন ক্যান?

ত্রিলোচন ধমক খাইয়া চুপ কবিয়া গেলেন।

লোকটি হিল্লোলিনীব দিকে ফিরিয়া বলিল, খেদি,
মাতা এট্টু ঠাণ্ডা হইছে?

হিল্লোলিনী চিংকাব কবিয়া উঠিল, বেরোও
বেবোও, পাজী বদমাশ কোথাকার!

অঃ, এহনো ঠাণ্ডা হয় নাই। র, ঠাণ্ডা কইব্যা
দিতেছি।—বলিয়াই লোকটি হিল্লোলিনীব চুলের রাশি
ধবিয়া মজোবে টান লাগাইল। আর, সে কী টান।
এক টানে অমন সুন্দর চেউখেলানো কৌকড়া-কৌকড়া
চুল সব মাথা হইতে খুলিয়া আসিল।

ত্রিলোচন হাঁ কবিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

লোকটি আবার বলিল, খেদি, এবার মাতাভা এট্টু
ঠাণ্ডা হইছে?

উত্তরে হিল্লোলিনী তারস্বরে গালাগালি
উঠিলেন।

লোকটি বলিল, অঃ, দেখতাছি তর পুবনো দ
না হইলে ঠাণ্ডা হইব না।

বলিয়াই আগাইয়া আসিয়া মজোবে ঠাস
হিল্লোলিনীব মুখে একটু চড় লাগাইল। আর, সে
কী জোর! এক চড়েই হিল্লোলিনীর সুন্দর মুক্তা
ছুই পাটি দস্ত মুখ হইতে বাহিব হইয়া ছিটকাইয়া
কোণে গিয়া পড়িল।

হিল্লোলিনী প্রাণপণে চোঁচাইতে লাগিলেন। ‘
হৃদয়’-এর মন-মাতানো নাথিকা বলিয়া তাঁহাকে
চেনাই যাইতেছিল না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই
কোন মন্ত্রবলে আকাশের তাবকা হিল্লোলিনী অল্প
মাটির খেঁদি হইয়া গেল।

ত্রিলোচনের হাঁ আবার বড় হইল কেবল। এ
মাছি মুখের মধ্যে ঢুকিয়া ভনভন করিতে লাগিল।
মুখ বন্ধ করিতে পারিলেন না।

এমন সময় বাহিবের দরজায় একটি গাড়ি আ
দাঁড়াইল। হাঁসবাস কবিত্তে করিত্তে বিবাট বপু
নামিলেন মোক্ষদা। পিছনে ঢোলগোবিন্দ।

নামিত্তে নামিত্তে মোক্ষদা হুকাব ছাাড়লেন, ব
কোথায় সেই লক্ষ্মীছাড়া অনামুখো হাড়হাবাতে মিন
বুড়া বয়সে পিরিত-বোগ! বাঁটাঁইয়া বিষ কাড়িব অ

চকিত্তে একবাব চারিদিকে তাকাইয়া ল
ত্রিলোচন। দেখিলেন, ঘবেব পিছন দিকেব দর
খোলা, দরজাব পবেই বারান্দা, আব সেই বারান্দা
গিয়া পথে পড়িয়াছে।

নিমেষেব মধ্যেই সব ভুলিয়া গেলেন ত্রিলোচন,
‘হৃদয়’, হিল্লোলিনী, বুকেব হাঁচোড-পাঁচোড, এবং
কি, ডান পায়েব ভয়ঙ্কর গেঁটেবাত্তেব ব্যথা পর্যন্ত।

দক্ষিণের পথে বিপথে

দিন ভোবে, দিগন্তের অরুণ উপাস্ত তখনও ভাল করে আলোষ ভরে ওঠে নি। মহাতামসীর হতে জাগছেন জবাকুহুমসংকাশ দেবতা। তিন দিকে সমুদ্রের উদ্যব বিস্তৃতি। উর্ধ্বে নীলিম আকাশ, নিম্নে পৃথিবী। আমবা বেশ কয়েকজন মানুষ—আরিকান, নরউইজিয়ান, ইংবেজ বাঙালী মাদ্রাজী ঠাি ছেলে-বুড়ো পুরুষ-স্ত্রী, অজ্ঞ বিজ্ঞের দল ভাবতের শেষ বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছি, গাঙ্গী-মন্দিবেব তলার উন্মুক্ত চত্বরে। উর্ধ্বে মুখে চেয়ে আছি অবাক নিষে, দেখছি আকাশেব কোন কোণে, কালোব তল কোলে কেমন কবে আলোর চিড ধরে, সমুদ্রেব ক জ্যোতিষ্য উন্মেষ হয় কোন অপক্লপ শৃঙ্খরেব শে। কবিব ভাষায বলতে গেলে এ যেন long line hesitating hue—হে মাধবী দ্বিধা কেন। একটু, একটু, একটু—আরও, আবও, আরও—হঠাৎ যেন সমস্ত পাকাশ লাল হয়ে উঠল। তিন সমুদ্রের সঙ্গমে তীর্থস্থান সুবে হিরণ্ময় পাত্রখানি মাথা তুলল। আকাশের ঘূষহীন নীল নিভৃতিতে ছড়িয়ে দিলেন দিনমণি নিজেকে কললনাব আলিঙ্গনে। মিলিয়ে গেল অনতিগুপ্তিতা ষার অভিষাব, পালাল মায়াবিনী মঘোনী। বতাববী। বিব সঙ্কে বললাম, সূর্যদেব তোমাব দক্ষিণে এই প্রভাত, তোমাব বামে ওই সন্ধ্যা, এদেব তুমি মিলিয়ে দাও। ব ছায়া ওব আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিষে ধন করুক—এর পূরবী ওব বিভাসকে আশীর্বাদ করুক। ওরে মন খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে অস্তবে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে। সূর্য উঠেছেন—চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্—তিনি ক্রিয়ে আছেন আমাদের দিকে চক্ষুর্মিত্রস্তবরুণস্তাগ্রে—যেন বিশ্বভাবন পবম মিত্রের চোখ করুণাপ্লাবন বরণেব রার মত, এ যেন ভূতভাবন অগ্রণী অগ্নির শুদ্ধ দৃষ্টি। ন পড়ছে শতপথ ব্রাহ্মণের গল্প—ঋষি চলেছেন পূর্বাস্ত্র য ববদবেদমন্ত্র কঠে, সরস্বতী তীব হতে আহিতাগ্নি তে। উষাব উদয়-পথে সে যাত্রা। তাইতো নাম লা প্রাগজ্যোতিষ। তমালতালীবনরাজিনীলার মাঝেও থেছি সে যাত্রা। ঋষি অগস্ত্য চলেছেন—চরৈবেতে রবেতে—শ্রাস্ত হয়ো না রোহিত, এগিয়ে চলো। গতকাল সন্ধ্যায় ত্রিবাঙ্গম থেকে এসেছি কল্যা-মারিকায়, এখান থেকে যাব মাদুরায়। প্রথম পরিচেষব বাট গুট ইঙ্গিত বাত্রেব স্তিমিত প্রদীপেব আবছা আলোষ। আজ সকালে হল তার গুপ্তন মোচন। অল্প রই মগ্নশৈলের চূড়াগুলি ছুঁয়ে বিবেকানন্দ বক্স। ইখানেই বসে থাকতেন পরমশৈব তাপসপ্রবর। তাঁব ানেব ভারতবর্ষ কি ফুটে বেরিয়েছে ভূনাওয়ালার চূপড়ি

শ্রীশ্রুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

থেকে, মুটেমজুর মুদ্রফরাসের ঝুড়ি থেকে, ভাদ্রীব ঘর থেকে, বামকৃষ্ণের স্বপ্ন কি সফল হয়েছে, জীবই শিব-শঙ্কবেব মন্ত্র, চিদানন্দময় আমি। ভারত ভুলিযো না, তোমার উপাস্ত দেবতা উমাপতি শংকর। শিবোহং, শিবোহং।

আজ সকালে আলোর দববাবে যাই বলি না কেন কাল বাত্রেব নিভৃতে তাঁকে বলে এসেছি, হে স্তম্ভবেশ, হে মহেশ্বর, হে লোকনাথ, হে ত্রিলোকী, তোমাকে শত সহস্র নামে পূজো করতে পাবি, কিন্তু বলব না যে তুমি প্রেমিক, তুমি বসিক, মরমী দরদী, তুমি তো নিষ্ঠুর গবজী, মানসমুকুল ভাজো আগুনে। এসে দেখে যাও কাব জন্ত আজও মালা হাতে প্রতীক্ষমানা ওই কুমাবী। তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে যে মঙ্গলস্নান করে বিষ্ণুগাজী হয়ে, পতিমিলনেব উপযুক্ত বসন পরে বর্ধার জলাভিষেকের অবশানে কাশকুহুমে প্রফুল্ল বহুধাব মত কল্যা অপেক্ষা কবছিলেন তোমাব সঙ্গে মিলনেব তবে। আসছেন তাঁব প্রিয়—প্রিয়তর, প্রিয়তম, লগ্ন যে ভ্রষ্ট হয়, এলে না তুমি নিষ্ঠুর, মালা ছললো না দযিতেব কঠে, চোখে চোখে হল না দৃষ্টিবিনিময়, মনে মনে লাগল না তুফান। সিন্ধুতীবে বিরহ হয়ে উঠল নিবিড়, গভীর, মর্মভেদী দুঃসহ, তবু স্তব্ব হয়ে দাঁড়িয়ে বইলেন কুমারী অনন্তা। আজও তিনি দাঁড়িয়ে অতন্দ্র, উদাসিনী কপালিনী ভৈরবী। কেমন কবে তাঁকে ডেকে বলি, রাই জাগো, রাই জাগো, শুকসাবীর সংবাদ এসেছে। কাল সন্ধ্যাবাতে দেখে এসেছি তাঁকে, মন্ত্রমুখরা শঙ্খঘণ্টাব আরতির মাঝখানে ফুল-নারিকেলের অর্ঘ্য দিয়ে বন্দনার মন্ত্র পড়তে পড়তে বলেছি, দেবী, চিরবিরহিণীব বাণী তোমার বুক, তবু তুমি তো শুধু অন্নপূর্ণা নও, সদাপূর্ণা—দাঁও তোমার সেই বিবহবিজয়ী মন্ত্রখানি ফাঁস করে, পৃথিবীব সব তপ্ত ক্রান্ত আতুব মানুষ-মানুষীব কাছে। তুমি তো বিভাপতিব গৌরীব মত শিবের পিছনে ছোট নি—

হম্‌সৌ বহুল মহেসে
গৌরী বিকলমন করথি উদেসে
পুছি'অ পথুক জন তোহী
এ পথ দেখল কহ' বুট বটোহী
অঙ্গমে বিভূতি অল্পপে
কতেক কহব হনি জোগিক সঙ্গপে

আমাব উপব রুপ্ত হয়েছেন মহেশ, গৌরীর মন তাই বিকল, তিনি উদ্দেশ কবে বেড়াচ্ছেন সেই পলাতক ভোলানাথেব, পথের মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা কুবছেন, দেখেছ কি কোন বৃদ্ধ পথিককে যেতে, অঙ্গে তাঁব অল্পপম বিভূতি, যোগীর স্বরূপ আব কত বলব।

মন্দিরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আমবা, একদিকে কাশানের বামায়াণ পাঠ হচ্ছে, আঁব একদিকে—

প্রদীপ জ্বালি খারি পর রাখই

আরতি কবতিহ গাওত গীত

বালকত ও মুখচন্দ

তখন মনে হয়েছিল তুমি তো শুধু শিবপ্রিয়া ভবগেহিনী নও—

যে মানব আমি সেই মানব তুমি কল্পা

প্রেমেব তীর্থবাণি তোমায তৃপ্ত করে নি তৃষিত করে
বেখেছে, তাই সীমাহীন জলেব মধ্যে থেকেও তুমি বলছ—

জল দাঁও আমায় জল দাঁও

আমবাও যে চাইছি সেই তোষতপর্ণ।

কল্পাকুমাৰীকে পেছনে ফেলে ছুটেছি—প্রভাতকালের
দেবী মারীচি তাব অপূর্ব ‘অলীচ’ ভঙ্গীতে আকাশের
উর্ধ্বপথে। পঞ্চাশ মাইল স্পীডে চলেছি মাছুবাব দিকে।
দেবী মীনাক্ষী ডাকছেন, প্রাচীন কবিপরিষদ ডাকছে,
সজ্জম কাব্য ডাকছে, চেলচোর পাণ্ড্যপল্লব নাযকরা
ডাকছে, তামির মূনি অগস্ত্য ডাকছে, আর ডাকছে
আজকের দিনে টেক্সটাইল মিলের নিত্যনূতন ফ্যাশানেব
জলুস, দবাজ ব্যাপারীদের হাটবাজার—তাবা নয় যারা
হাডভাঙা খাটুনি খেটে সেগুলিকে সম্ভব কবে তোলে
শত শত সাম্রাজ্যেব ভয়ভূতপ পরে। কুবেরের রাজ্যে হামিকাম্মা
হীবাপাম্মা দুই-ই দোলে, মহালক্ষ্মীব প্রসাদ মেলে কি ?

দু হাজার বছর আগেকার মাছুবাবর একটি অপূর্ব
বসন্তিক্ত বর্ণনা পাই সেকালের সজ্জম কাব্যে। মাছুবা
নগরীর ঐতিহ্য শুধু নাযকযুগেব মীনাক্ষী মন্দিরেই নয় বা
বিজয়নগর রাজ্যের প্রসাবের বা তার শিল্পকলাব কথাতেই
নয়। তার কাহিনী শুধু মধুরা স্থলপুরাণেই নিবদ্ধ নয়।
ইতিহাসে এই শহরেব খ্যাতি দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত ছিল।
শুধু সিংহল আবব যবদ্বীপের সঙ্গে নয়, স্বদূর রোম-
সাম্রাজ্যের সঙ্গেও নিকট বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। কেউ কেউ
মনে করেন যে উত্তর-ভারতের মথুরার অপভ্রংশই মাছুবা।
আর্য উপনিবেশেব সঙ্গে সঙ্গে হয়তো নগরীব নামকরণ
হয়েছিল। দিবে আব নিবে মিলাবে মিলিবে শুধু কবির
স্বপ্ন নয়, ইতিহাসেব অমোঘ মন্ত্রও। এই মাছুবাতাই
ছিল কবিসঙ্গ। কিংবদন্তী যে, স্বয়ং শিব এর প্রতিষ্ঠাতা
সভাপতি, মুরুগেশ বা কাতিগেশ এব সদস্ত আর তামির
মূনি অগস্ত্য এব উদগাতা। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের
পরিচয়-প্রসঙ্গে এই তামিল সজ্জমের গল্প আমি পূর্বেই
করেছি সেইজন্য তাব আর পুনরুল্লেখ কবব না। কিন্তু
মনে পড়েছে আব একটি গল্প, মাছুবা-ই-কাঞ্চীর কাহিনী।
দু হাজার বছর পূর্বে পাণ্ড্যবাজ নেতুন চেলিয়ানের সভাকবি
‘মারুথানার’ এই নগরীর একটি প্রশস্তি বচনা কবেন
বাজার উদ্দেশ্যে। বাজার মনোবঞ্জন ও দেশেব গর্বে
অভিবঞ্জন ছিল নিশ্চয়ই তবু বাস্তবিক সামাজিক ও
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক আর্থজীবিত সমন্বয়ী সভ্যতা
বিচিত্র প্রকাশ দেখি। কবি প্রথমেই গাইলেন—

সমুদ্র মেথলা এই যে পৃথিবী

কুলে কুলে যাব ভেঙে পড়েছে

নীলাসু রাশিব সঙ্গে তবঙ্গমালা

দূরে যাব দেখা যায় নীলাভ পাহাড়ের শ্রেণী গগন

যেখানে সবই হরিৎ ও শস্তাশ্রামলা

যেখানে আকাশে বাতাসে সবই মধুময়

সবিতৃদেব যেখানে নিয়মিত তাপ দেন

দিনকে কবেন আবাহন

বাজে চন্দের শোভায় যাব দৃশ্য হয় মনোহর

কালে যেখানে পর্জন্ত বৃষ্টি দেয়

জনসাধাবণ যেখানে সর্বদাই সুখী

বৃক্ষ দেয় ফল, মাটি দেয় শস্ত শতগুণে

হে বাজন্, সেই পুণ্যদেশেই তোমাব পিতৃগণ

বাজস্ত করেছেন

কেউ সেখানে বিনা অঙ্গে মবে নি

প্রচুর পর্যাপ্ত আহার

স্ববম্য হর্মে শোভিত বিবাত বস্ত্রাঙলি

যেন নদী বিশেষ

বাজঅমাত্য ও মন্ত্রণাপ্রধান মনীষীবা সেখানে থাকে

ধারা কখনও মিথ্যা বলেন না, সদাই সত্যভাষী

“পত্নিন পালাই” নামে তৃতীয় সজ্জ যুগের আব এক

কাব্যে “কাবেবী পত্নেব” অপূর্ব বর্ণনা পাই। তা

অধীশ্বর তখন বিখ্যাত চোলবাজ কারিকালন্। এখা

দেখছি হরিৎবর্ণ ধাত্তের স্তূপ, নানিকেল ও কদলীবৃ

ছায়া, তালতমানী সমুদ্রের ধাব, সুমিষ্ট আম, কাঁচা আদ

তালেব রস, দিগন্তব্যাপী শস্তক্ষেত্র, মিষ্ট ইক্ষু, বস্ত্র কুক্ক

পরিষ্কৃত লবণ। এখানে শিশুবা খেলা করে আনন্দে

তাদেব আছে ত্রিচক্রবান, পদযুগলে শোভা পায় স্বর্গবল

তালেব বস আব তত্ত্বল থেকে নিষ্কাশিত সুপের মত

ছড়াছড়ি, শুধু মাছুষ-মাছুষীরা খাষ না—বৃষদেব

খাওযানো হয়। মৎস্যজীবীদের গল্প শুনুন কবির কাছে—

মৎস্যজীবীরা থাকে এখানে

সমুদ্রেব ধারে বালিয়াড়ীর পারে

দীর্ঘ বনস্পতির নীচে তাদেব মল্ল ক্রীড়ার স্থান

তাদের প্রিয় খাণ্ড সুমিষ্ট ভজিত চিংড়ী

কচ্ছপের মাংসও তারা ভালবাসে

আর ভালবাসে ফুল কুমুদ কল্লাব চম্পক

গ্রামের বাইরে আছে মিষ্ট জলেব কুপ

ঘুরে বেডায় কুক্কটেব দল, ববাহযুথ, তিস্তিবপাখী।

তাদেব গৃহেব ছাদগুলি নীচু

বাইরে দেখা যায় মাছ ধরবাব জাল, ছিপ,

বড বড বর্শা, ঢাল আর পাথরের স্তূপ

পুরুষদের রক্তবর্ণ চুলগুলি হাওষাষ দোলে

তাদেব গলায় দোলে ফুলের মালা,

হাওবদেব অস্থি দিয়ে তাঁরা তৈয়াবী কবে তববাব
উৎসর্গ কবে জলদেবতাকে

নি করে তালের বস

ত্য করে সমুদ্রের ধাবে

তি পূর্ণিমাষ উচ্ছ্বসিত সাগর জলের সামনে

াগ দেখ নৃত্যে ধীবরকন্ঠারা

তাঁরা কৃষ্ণাঙ্গী চপলচতুর্বা কাজলনয়না

সদিন গৃহকর্ম কবে না নাবীবা

কৃষবা যায না মৎস্ত শিকারে

দিগন্ত ভেসে যায় সাদা মদের ফেনাষ

পাহাড় আব আকাশে হয় ঘন চূষন।

এইতো গেল গ্রামীণ সভ্যতার কথা। নগর-

তারও পরিচয় পাই মাছুবা নগরীব বর্ণনাষ।

টকে বাজাব, বিপনি, পণ্যসম্ভাব, প্রশস্ত পথ, সিংহ-

লির উপর মহালক্ষ্মীর মূর্তি, দিকে দিকে কলগুঞ্জন।

ধাবে ধাবে খাণ্ড ও পানশালা—মধুমিশ্রিত কাঁঠালেব

না, নানা জাতীয় নারিকেল ও শর্করা যোগে পিষ্টক,

বড় মাংসেব খণ্ডসহ স্বগন্ধি অন্ন ও নানা বকমের

দ্রব্য, পান স্থপাবি নাগরিকদেব আহাৰ্য ও ভোজ্য

। আর নাগর বয়সীরা ছিলেন কালিদাসেব ভাষাষ—

পাণ্ডকা বিকচপদ্ব মনোজ্ঞ বক্তৃ নববধুরিব রূপবম্যা।

বলছেন—

ভাস্করে গড়া মূর্তিব মত

তাদের গাত্র চাকচিক্যময়

যেন বালারূপ দীপ্ত—

তাদের গোপন ভীক সজ্জস্ত দৃষ্টি

পুরুষদেব কবে উন্নয়ন

মস্তণ গাত্রবিভা করে চঞ্চল

তাদের শক্ত শুভ্র দশনবাজি

মুক্তাব পব মুক্তাব মত সজ্জিত—

তাদের নবোদগত স্তভোল বক্ষয়ুগল

সৌন্দর্যোদ্দীপক কৃষ্ণ তিলগুলির দ্বাবা রমণীয়

যেন কোন নিপুণ শিল্পীব

কমনীয় অঙ্গণের ক্ষণিক উন্মেষ—

তাদের স্তনিপুণ অঙ্গরাগ ও চারুপ্রসাধনের কথা

হন, উৎসবের দিনেব বর্ণনা দিয়েছেন—সুন্দরীবা যবে

সম্ভারসীমার প্রদীপ জেলে নিজ নিজ প্রিয়জনদেব সঙ্গে

য করে হাশ্বকৌতুকে নৃত্যগীতে মত্ত হতেন তাবও

আমরা দেখি। আবার দেখি শাস্ত্র স্তম্ভ ষড়িদের,

নিপুণ শ্রায়জ্ঞদেব, ধনী শ্রেষ্ঠীদের, অভিজাত বংশের

শাবদ সেনাপতিদের, পুত্রবর্তী মাতাদের, দেবগৃহে

বাদিকাদের। সম্ভ্রমিলনের পরিভূষিত উৎসবই শেষ

নয়। মহাভাবতের সভাপর্বে উল্লেখ আছে যে

মাহিম্যতী নগরে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে সেখানে

যজ্ঞাগ্নি জালাবার ভার মেয়েদেব উপব। চাকওষ্ঠের

ফুৎকাব ছাড়া হোমশিখা প্রজ্জ্বলিত হত না। দক্ষিণে

নারীর স্থান উচ্চে—দ্রাবিড় সভ্যতার এই একটি বিশেষ

দান—মাতা সেখানে পূজিতা। মাছুরা সম্পর্কে আর

একটি পুরনো গল্প বলেই শেষ করি। গল্পটি “শিল্পাধিকবম”

নামে বিখ্যাত কাব্যনাটক থেকে নেওয়া। একে বলা হয়

“The epic of the anklet”। কোবিলন ছিলেন এক

ধনীপুত্র, কন্নগী নামে এক শ্রেষ্ঠিহুহিতাব সঙ্গে তাঁব বিবাহ

হয়। কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে প্রণয়মধুব জীবন যাপন

কবাব পব মাধবী নামে এক নর্তকীর প্রেমে পড়েন

কোবিলন এবং তাবই সদৃশ্যধাবসে নিয়গ্ন হয়ে শুধু সময়

নয়, অর্থ সামর্থ্য সবই জলাঞ্জলি দেন। তারপর মধুপানে

তৃপ্ত হয়ে মাধবী তাঁকে দেয় তাড়িয়ে। ফিরে আসেন

তিনি সাধবী কন্নগীর কাছে। কন্নগী তাঁকে পুনরাষ

ব্যবসায়ে মন দিতে বলে—নিজেব পায়েব বিশুদ্ধ স্বর্ণেব

মল খুলে দেয় তাঁব হাতে। এই পদভূষণটি নিয়ে

কোবিলন আসেন মাছুবাব স্বর্ণবণিকের কাছে বিক্রয়েব

জন্ত। ঠিক এই সময়ে বাণীবও একটি অলংকার চুবি যায়

এবং কোবিলনই সেই তস্কর এই সন্দেহে তাঁর বিনা

বিচাবে শিবচ্ছেদ হয়। কন্নগী স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে

পাগলিনীর মত বাজসভায় উপস্থিত হয়ে তার অগ্ন

পদভূষণটি রাজাকে দেখায় এবং বাজসভার বাইরে এসে

চিংকার কবে বলে,

শোনো শোনো মাছুবাব সতীলক্ষ্মীবা শোনো

আমার স্বামীকে হত্যা করেছে মারা, তাদের কথা

বলি আমি,

বিচারের সিংহাসনে বসে অবিচাব কবেছে তারা

শোনো মাছুরাবিবাসীবা শোনো

মাছুরাবাসী তাব কণ্ঠেব সঙ্গে বলল—হ্যাঁ, বিচাব চাই।

বাজা বসে আছেন সিংহাসনে—বিচার চাইলে নারী,

তার সঙ্গে সেই উদেলিত-হৃদয় জনতা।

বাজাও সেই স্তরের লোক : ভুল হয়েছে, আমি রাজধর্ম

প্রতিপালন করতে পাবি নি, মৃত্যুই আমাব পক্ষে শ্রেয়।

রাজা মারা গেলেন—স্বচ্ছামৃত্যু। কিন্তু কন্নগীর

ক্রোধ উপশম হয় না। সে বললে রাজাব মৃত্যু হয়েছে বটে

কিন্তু রাজ্যের বিনাশ হবে, অভিসম্পাত দিচ্ছি আমি—

সতীসাধবীব অভিসম্পাত। অগ্নি উঠবে জলে, দেবতার

চলে যাবেন নগর ছেড়ে।

মীনাক্ষীদেবীকে প্রণাম করে, তিরুমলানায়কের প্রাসাদ

পিছনে ফেলে, হাজার স্তম্ভের সভ্যমণ্ডপকে নমস্কাব জানিয়ে

তিরুপ্পরগুওরম মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। নমস্কার

কবলাম দক্ষিণকে, তার দক্ষিণ্যকে, তার প্রাক্কে, তাব

নিষ্ঠাকে। ভাবলাম নতুন যুগে, নতুন ভাবের বন্ধনে কি রূপ

নেবে সেদিনকার স্বপ্নগুলি। প্রশ্ন রয়েই গেল। ততঃকিম।

বাংলাদেশের যে সকল সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগ ছিল, কলকাতার ‘রবি-বাসব’ তার মধ্যে অন্যতম, এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ বলাও চলে। কাব্য রবীন্দ্রনাথ রবি-বাসবের অধিনায়ক ছিলেন। অন্য সকল প্রতিষ্ঠানে সভাপতি বা সম্পাদক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন, রবীন্দ্রনাথ আজীবন রবি-বাসবের অধিনায়ক ছিলেন, এখনও স্বর্গত অধিনায়ক রূপে রবি-বাসবে রবীন্দ্রনাথ পূজিত হন। এই পদে অত্র কাউকেই বরণ করা হয় নি। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর গুণ্য উপলক্ষে রবি-বাসবে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও বক্তৃতাতির বিষয়ে এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

রবি-বাসব সাহিত্যসেবিগণের মিলনসভা, পক্ষান্তে বিবিধে পর্যায়ক্রমে কোন সদস্যের গৃহে রবি-বাসবের অধিবেশন বসে। রবি-বাসব ১৩৩৬ সালে ‘মানসী ও মর্মবাণী’ গোষ্ঠীর সুবোধ দত্তের ভবানীপুরের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সার্বজনীন দাদা, রায় জলধর সেন বাহাদুর ছিলেন রবি-বাসবের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। জলধর সেনের মৃত্যুর পূর্বে ১৩৪৬ সালে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র রবি-বাসবের সর্বাধ্যক্ষ পদে বৃত্ত হন। এখনও তিনিই সর্বাধ্যক্ষ আছেন।

রবি-বাসবের প্রথম সম্পাদক ছিলেন হাওড়ার নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, তাবপর হন ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় সম্পাদক হন কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, চতুর্থ সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু ১৩৪১ সালে কার্যভার গ্রহণ করেন, এখনও তিনিই সম্পাদক।

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী বর্ষে রবি-বাসবের ৩২ বর্ষ চলছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক রবি-বাসবের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। সদস্যপদ পঞ্চাশজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় একসঙ্গে সকলকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নি বটে কিন্তু বাজেশ্বর বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, অতুলচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাঃ পঞ্চানন নিষোগী, মুনীন্দ্র

দেব বায়, কবি গিরিজাকুমার বসু, কবি সুনীল সাংবাদিক প্রফুল্লকুমার সবকার, মৃণালকান্তি বসু, হেমেন্দ্রনাথ বায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শিল্পী অধ্যক্ষ রবীনাথ চক্রবর্তী, ফণীভূষণ গুপ্ত, গুরুসদয় দত্ত, এস. ওয়া আলি প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি রবি-বাসবের ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রবি-বাসবে ১৩৪৩ সালে যোগদান করে সেটি ছিল রবি-বাসবের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে। সেদিন আহ্বায়ক ছিলেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওবা শ্রাবণ ১৩৪৩, রবিবার অপরাহ্নে এই অধিবেশন শরৎচন্দ্রের পি ৫৬৬, অগ্নিনী দত্ত রোডের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে কবি একটি দীর্ঘ ভাষণে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে রবি-বাসবের সদস্যদের কাছে অনেক বলেন এবং রবিবাসবের অধিনায়ক পদ গ্রহণে সম্মত হন।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার রবি-বাসবে যোগদান করে ২৫ আশ্বিন ১৩৪৩ তারিখের অধিবেশনে। বেলেঘাটা “প্রফুল্ল কাননে” সেদিনের অধিবেশন বসে। এটি রবি-বাসবের বার্ষিক সম্মেলন। শরৎচন্দ্রের ষাট বয়স পূর্ণ হওয়াতে কবি একটি লিখিত ভাষণে শরৎচন্দ্রের আশীর্বাদ করেন। সেদিনের আহ্বায়ক ‘উদয়ন’-পত্র সম্পাদক সাহিত্যবন্ধু অনিলকুমার দে সাড়ম্বরে অস্থানে বহু গায়ক-গায়িকার সমাবেশ করেছিলেন। ভাস্কর গোপেশ্বর পাল সভায় শরৎচন্দ্রের একটি আত্মমুগ্ধমূর্তি তৈরী করবেন এবং কবির প্রশংসা লাভ করে

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে রবি-বাসব আহ্বান করে ৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩। এই অধিবেশনে কলকাতা সদস্যেরা শান্তিনিকেতনে যান। কবি সেদিন বঙ্গ প্রসঙ্গে গ্রামসংস্কার ও পল্লীশিল্প গঠনে তিনি যেসব করেছেন তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এবং কবির শারীরিক অসুস্থতার জন্য রবি-বাসবের যোগ দেবার অবকাশ ঘটে নি। কবি চলে রবি-বাসব এখনও তাঁর অমর স্মৃতি সগৌরবে করছে।

[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় “নেহেরু সংবর্ধনা-গ্রন্থের” জন্য ১৯৫৩ সনে একটি গল্প দিয়াছিলেন। এতাবৎ তাঁহার প্রকাশকদের ধারণা ছিল এই গল্পের মূল পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছে। ফলে তাঁহার এই গল্পটির অন্তর্ভুক্তি অসম্ভব। “কথাসাহিত্য” কালিক ১৩৬৫ সংখ্যায় ছাপা হয়। শ্রীমান সনৎকুমার গুপ্ত “গল্প-ভাবতী” (১৩ বৈশাখ) পুনরো ফাইল ষাটিয়া আসল মূল বাংলা গল্প বাহির করিয়াছেন। সেইটিই সাধারণের ভ্রম নিবারণ জন্য আমরা পুনর্মুদ্রিত করিলাম।—সম্পাদক : শ চি.]

শনিবন্ধন প্রেস, ৫৭ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হাইতে

• শ্রীজ্ঞানীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮